উপন্যাসসমগ্র
২

উপন্যাস সমগ্র

২

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

"রা-স্বা"

পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের
পাদপদ্মে বিনম্র প্রণামপূর্বক
নিবেদন

নিবেদন

একবার আমার এক বুদ্ধিজীবী, ঈষৎ উন্নাসিক সতীর্থ প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার কি মনে হয় এখনও আপনার আরও কিছু লেখার আছে? প্রশ্ন শুনে ভাবনা হল, তাই তো, আমার কি কখনও কিছু লেখার ছিল? কত লোক তো কিছুই না লিখে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। তাদের তো এমন তাগিদ নেই যে, কিছু লিখে রাখা দরকার! তবে আমি এই মসীজীবিকায় মজে আছি কেন?

এ প্রশ্নের সহজ ও অসহজ দুটো জবাব আছে। আমার এক তেজি লেখক বন্ধু একবার "কেন লেখেন" জিজ্ঞাসিত হয়ে সপাটে বলেছিল, অর্থ ও যশের জন্য। প্রশ্নকর্তা থতমত খেয়েছিলেন। আমিও যদি তাই বলি তা হলে মিথ্যে বলা হবে না। আবার সর্বাংশে সত্য কথনও হবে না।

আমার লেখালেখির শুরু এক দারিদ্র্যদীর্ণ জীবনে। তখন আমার যুবাবয়স। ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য জোটে না, প্রয়োজন অনুপাতে অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র জোটে না, জামা-জুতো-ছাতা সব কিছুরই অনটন। একটা দীর্ঘ সময় এক বাড়ের বয়সে আমি যখন উপোসী শরীর নিয়ে ঘাড় গুঁজে লিখি, তখন এমন ভরসা ছিল না যে, কোনও দিন এসব লেখার কোনও দাম হবে বা বই বেরোলে কেউ কিনে পড়বে, বা কেউ কোনও পুরস্কার দেবে। সুতরাং লেখাকে একটা ভবিতব্য বলে ধরে নিয়ে লিখে যেতাম, সত্যিই অর্থ বা যশের প্রত্যাশাও ছিল না। ধরেই নিয়েছিলাম, ওসব আমার হওয়ার নয়। শুধু ভাগ্য-বলে, আমার লেখাগুলো বড় বড় কাগজে বেরোয়। কিন্তু সেগুলোর খুব একটা প্রশংসা শুনি না। কেউ কেউ বলেন, অ্যাবসার্ড সাইকোলজি নিয়ে লেখা, পরবর্তীকালে একটি যুবক আমাকে বলেছিল, সে যখন ছোট ছিল তখন তার মা তাকে আমার লেখা পড়তে বারণ করেছিলেন।

সান্ত্বনার কথা এই যে, আমার সমসাময়িক তরুণ লেখকগোষ্ঠীর প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর একই অবস্থা, কেউ বেকার, কারও সামান্য চাকরি, কেউ টিউশনি-নির্ভর, নাম-ডাক সেই অর্থে কারও নেই, তবে স্বপ্ন আছে, বাঁধভাঙা উচ্ছল জীবনতরঙ্গ আছে, উদ্দীপনা আছে।

ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের আগে কোনও তরুণীর সঙ্গে আমার কোনও রোমান্টিক সম্পর্ক রচিত হয়নি, সাহস, ভদ্রস্থ চাকরি এবং টাকার অভাবে। জীবনে প্রেম না থাকলেও ভাবনায় বা কল্পনায় তো ছিল। লেখালেখির মধ্যে তার প্রকাশও ঘটত। তবে শুধু প্রেম নিয়ে গল্প লিখতে কলম সরত না। আর সহজ সরল প্রেমের গল্প লিখতে ইচ্ছেও হত না।

'নয়নশ্যামা' যখন লিখি তখন আমি মধ্য তিরিশ পেরিয়ে গেছি, কোনও শারদ সংখ্যায় লেখা, কিন্তু আজকাল নাম মনে রাখা শক্ত হয়েছে। ছোট আকারে লিখেছিলাম, পরে কিছু সংযোজন হয়। এখানে প্রেমটি রাহুগ্রস্ত, একপেশে এবং মোটেই সুস্বাদু নয়। তা বলে নয়নকে ভিলেন ভাবিনি কখনও, বরং ওর বেদনার সঙ্গে আমার সংক্ষুব্ধ যৌবনের বেদনার একটা যোগ আছে।

ঠাকুরের কাজে বেরিয়ে গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়ানো আমার জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। হিল্লি-দিল্লি তখনও যাইনি, বিদেশে যাওয়ার স্বপ্নও দেখতাম না, কিন্তু সুন্দরবন থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই আঁদার পাঁদার ভেঙে ঘুরেছি আর ঘুরেছি। চাষি-গেরস্ত-স্কুলশিক্ষক নির্বিশেষে গুরুভ্রাতাদের বাড়িতে থেকেছি। তাঁরা কেউ সারস্বত মানুষ নন, সাহিত্যজগতের খোঁজখবরও

রাখেন না। তবে তাঁরা এটুকু জানতেন, আমার লেখাটেখা ছাপা হয়। এবং সেজন্য তাঁরা আমাকে একটু নেকনজরে দেখতেন। এই পরিক্রমা আজও, এই পরিণত বয়সেও আমার অব্যাহত আছে। পাহাড়ে-সমুদ্রে বা বিদেশে যাওয়ার চেয়েও আমার কাছে ঢের বেশি প্রিয় বাংলার গ্রামগুলি। উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) গ্রামও বড় কম ঘোরা হয়নি। তাই গ্রামের কথা বা পটভূমি আমার গল্প বা উপন্যাসে বারবার চলে আসে। যেমন এসেছে 'নয়নশ্যামা'য়।

বলে রাখা ভাল 'নয়নশ্যামা' উপন্যাসটি নিয়ে নীতিশ মুখোপাধ্যায় একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিল সেই সত্তরের দশকে, তাকে বেশ লড়াই করে ছবিটি শেষ করতে হয়েছিল, দুর্ভাগ্য তাঁর যে, ছবিটি রিলিজ হয়নি। তেমন বাণিজ্যিক সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল না বলেই ছবি দীর্ঘকাল পড়ে ছিল। কয়েক বছর আগে সেটি টিভিতে বারকয়েক দেখানো হয়। আমি চলচ্চিত্রের সমঝদার নই, কিন্তু ছবিটি আমার বেশ ভালই তো লেগেছিল। কেন রিলিজ হল না কে জানে। নীতিশ পরিচালক হিসেবে দাঁড়াতে পারল না, অথচ তার ক্ষমতা উপেক্ষা করার মতো নয়।

রামায়ণী প্রকাশ ভবন থেকে 'নয়নশ্যামা' বই হয়ে বেরোয়। খুব বেশি লোক বইটি পড়েছে বলে আমার মনে হয় না। তবে এরপর আরও কয়েকজন প্রকাশক পর্যায়ক্রমে বইটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিল।

সমস্যা 'ফেরিঘাট' নিয়েও। কোন কাগজে বেরিয়েছিল তা আজ আর হলফ করে বলার উপায় নেই। সত্তরের বা আশির দশকে কিছু প্রায়-বাণিজ্যিক পত্রিকা প্রকাশ পেত, সেগুলো এখন আর নেই, মনে হয় দেবাশিস দাশগুপ্তর অনুরোধে লিখেছিলাম, দেবাশিস তখন একটি পত্রিকায় সামান্য বেতনের চাকরি করত। আর্থিক অবস্থা খারাপ। কিন্তু পরে দেবাশিস সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে বেশ খ্যাতনামা হয়ে ওঠে, আর সুখের দিন আসতে-না-আসতেই তার অকাল-প্রয়াণ ঘটে।

'ফেরিঘাট'-এও খানিকটা আমি আছি। ওই আশ্চর্য 'ফেরিঘাট'-এর ছবি বাল্যাবধি আমি বারবার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। আমার গোলমেলে কল্পনার জগতে অনেক অশৈলী কাণ্ড ঘটে যেসব লোককে বলার মতো নয়। জানলে লোকে "পাগল" বলে দোষ দেবে আমাকে। এক পাগলামির সঙ্গে আমার আবাল্য সহবাস। যে আমাকে জ্বালায়, পোড়ায়, কাঁদায়, আবার যে কখনও কখনও লেখায়ও। 'ফেরিঘাট'-এ পাগলামি আছে, আর আছে আমার এক উদ্বাস্তু পিসি, নিজের দিকে না তাকিয়ে সংসারের জন্য রিক্ত হওয়া এক পিসতুতো দিদি, আছে আমার দুর্দিনের বড় বন্ধু কল্যাণ (অল্পদিন আগে প্রয়াত) এবং আরও কয়েকজন প্রিয় মানুষ।

আমার কাছে স্বস্তির কথা, 'ফেরিঘাট' ক্ষুদ্রাকার উপন্যাস হলেও খুব একটা উপেক্ষিত হয়নি। বিক্রি তেমন না হলেও নানান মানুষদের কেউ কেউ পড়েছেন। আমার কাছে ওটুকুই যথেষ্ট। কেউ পড়লে এবং বুঝলেই আমি খুশি। বুঝে গালাগাল দিক, তাতেও আনন্দ।

পূজা সংখ্যা আনন্দবাজারে লিখেছিলাম 'আশ্চর্য ভ্রমণ'। রমাপদ চৌধুরী তেমন কোনও মন্তব্য করেননি। কিন্তু এই গোলমেলে উপন্যাসটি যে অনেকেই বুঝতে পারেননি তা টের পেতে দেরি হল না। আমার মধ্যে যে না-ছোড় পাগলের বাস, সে মাঝে মাঝে আগল ভেঙে বেরিয়ে কাগজে-কলমে তার প্রলয়-নাচন নেচে যায়। আমার কিছু করার থাকে না। 'আশ্চর্য ভ্রমণ' তারই কীর্তি। কিন্তু এই 'আশ্চর্য ভ্রমণ' লিখতে লিখতে আমি আমার কৈশোর-যৌবনের যে মায়াময় আশ্চর্য আলো-আঁধারিতে বিচরণ করেছি, তাও তো মিথ্যে নয়! লোকে ভালবেসে পড়ল না হয়তো, কিন্তু আমার অনেক চোখের জল, অনেক আনন্দের বিচ্ছুরণ যে ওতে মিশে আছে। অবহেলিত এই বইটির মধ্যে ছত্রে ছত্রে আমি মিশে আছি। অবহেলিত হই, তুচ্ছ হই, সামান্য হই, আমাকে এ বইয়ের আনাচে কানাচে পাওয়া যাবে, যদি কেউ কখনও খোঁজে। লেখায় অনেক মিথ্যে-সত্যি থাকে, আবার থাকে কিছু সত্যি-মিথ্যেও, কিন্তু সে সবই লেখকের উপলব্ধ জগতের সত্য। 'আশ্চর্য ভ্রমণ'-এর অলীকতার মধ্যে, কুজ্ঝটিকার মধ্যেও, টুকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এক রুগ্ন, লাবণ্যহীন

অনাকর্ষক কিশোর, মা ছাড়া যাকে কেউ তেমন করে ভালবাসল না কখনও, এক বুক অভিমান নিয়ে যোগ্যতাহীন সেই কিশোর বাস্তবের দ্বারস্থ হয়ে ঘা খেয়েছে বড় কম নয়। তবু তার স্বপ্ন-বাস শেষ হয়নি আজও।

'আশ্চর্য ভ্রমণ' যদি কেউ নাও পড়ে, ক্ষতি নেই। মুদ্রিত রয়ে গেল, এটুকুও তো সান্ত্বনা।

সাগরময় ঘোষের আদেশে 'দেশ' পত্রিকায় 'যাও পাখি' উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিক লিখতে শুরু করি, তখনও আমি ত্রিশের কোঠায়। মায়ের পর যে দ্বিতীয় মানুষটি এই অকৃতী, প্রতিষ্ঠাহীন, বিদ্যাহীন, ভীরু ও অকর্মণ্য যুবকটিকে কিছু মূল দিয়েছিলেন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। আদ্যন্ত জীবনমুখী, প্রাণবান, দুরন্ত আশা ও ভরসাবাদী মানুষটি অসংখ্য অভিঘাতের মধ্যেও এক সুস্পষ্ট জীবনরেখা নির্ধারণ করেছিলেন মানুষের জন্য। অর্থী প্রার্থীদের ভিড়ে মিশে-থাকা এই নগণ্য যুবকটিকে তিনি কখনও আলাদাভাবে চিহ্নিত করেননি, বিশেষ মর্যাদাও দেননি, তবু তাঁর অপার্থিব চোখ মায়ের চোখের মতোই কখনও কখনও লেহন করে গেছে আমাকে। শুধু তাঁরই জন্য আজও আমি যষ্টিচ্যুত নই। সেই তাঁরই কথা ছড়িয়ে রয়েছে, নানাভাবে, 'যাও পাখি' উপন্যাসে। এই উপন্যাস তাই ঠাকুরময়, পাঠক-পাঠিকারা আমার সযত্ন-রচিত এই রচনাটিকে অবহেলা করেননি। অনেকেই পড়তেন। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতেন, শেষ অবধি ব্রজগোপালকেই আমি মেরে ফেলব কি না। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন আমার অতি প্রিয় গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মশাই, ব্রজগোপালকে মেরে ফেলবেন না তো! অনুরূপ দুশ্চিন্তায় ছিলেন সাগরদা স্বয়ং।

আমি সনাতনপন্থী না আধুনিক তা ভেবে পাই না। কোন কোঠায় নিজেকে ধরব বলা মুশকিল। লেখক হিসেবেই আমার গুরুত্ব কী? কখনও সখনও মন ভাল থাকলে ভাবি, আমি বোধহয় তেমন ফ্যালনা লেখক নই। আবার কখনও কখনও বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখলে দমে গিয়ে ভাবি, এঃ, আমার দ্বারা কিছু হল না।

'যাও পাখি' নিশ্চিত খানিকটা সনাতন মূল্যবোধের যাজন করে। সেটা একটা দিক। আবার অন্য একটা দিকও আছে, যখন যুবক ও যুবতীদের কথা এসেছে। গ্রাম আছে, শহরও আছে। সবসময়েই আমার দুই নৌকোয় পা। শহর আর গ্রাম। রিখিয়ার মায়ের মধ্যে আমার মায়ের ছায়া আছে।

মায়ের কথা আমার নানা লেখায় বার বার এসেছে, আজও আসে। কবে দেহ ছেড়েছেন মা, তবু আজও যেন জ্বলজীয়ন্ত। এখনও যেন 'রুণু' ডাক কানে আসে। মা ডাকছে আমাকে, যেমন ডাকত ছেলেবেলায়। অপেক্ষায় আছি, একদিন মা এসে অভাগা ছেলেটির হাত ধরে বলবে, চল তো, আর এই হাটে-বাজারে পড়ে থাকতে হবে না তোকে। 'যাও পাখি'র মধ্যেও মায়ের কথা আছে, যা লিখতে আমার কলম কখনও ক্লান্ত হয় না।

বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিল সুবোধ দাশগুপ্ত। স্বেচ্ছায় আঁকতে চেয়েছিল। 'দেশ'-এ প্রকাশিত আমার প্রথম গল্পটিরও অলংকরণ করেছিল সে। এই পাগলা শিল্পী অনেক বড় জায়গায় যেতে পারত। তেমন গা করল না। ভারী বন্ধু ছিল সুবোধ, অনেককাল দেখা নেই।

কোনও অপ্রধান কাগজে বেরিয়েছিল 'জীবনপাত্র'। বলা ভাল উপন্যাসটির অসম্পূর্ণতা আছে। পরে খেটেখুটে মেরামত করা যেত, কেন যেন এই ইচ্ছে হয়নি। এই ছোট্ট রচনাটিতে আমি নিজেকে সঞ্চারিত করিনি, কতিপয় কুশীলবকে এনেছি। নারী ও পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের বন্ধনকে আমি বড় মূল্য দিই। কারণ এই বন্ধনের ভিত্তিতেই পরিবার শক্ত পায়ে দাঁড়ায়, আর পরিবারের শক্তিই রচনা করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। সম্পর্কের বন্ধনকে ঠাকুর বড় মূল্য দিতেন। তাঁর সন্নিধানে যাওয়ার আগে আমি সম্পর্কের বন্ধনকে মূল্য দিইনি।

'জীবনপাত্র' কেমন উপন্যাস কে জানে। নিজের লেখা আমি কখনও বিচার করে উঠতে পারিনি আজও। লেখা এবং ছাপা হয়ে গেলে আমারও আর যেন তেমন দায় থাকে না।

আগে আনন্দবাজার পত্রিকার 'দোল সংখ্যা' বলে একটা বিশেষ সংখ্যা বেরোত। আনন্দবাজার

পত্রিকার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল এক দোলের দিন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করতেই দোল সংখ্যা। শারদীয়র চেয়ে কিছুটা কৃশ আকার। বেশ জনপ্রিয় ছিল এই সংখ্যাটি। কয়েক বছর হল বন্ধ হয়ে গেছে।

নকশাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কিছু আঁচ আমার জীবনকেও বেশ নাড়া দিয়েছিল। স্কুলে পড়াতাম, কাজেই আন্দোলনের শরিক ছাত্রদের সামলাতে হিমশিম খেতে হত। দুবার স্কুলে আগুন দেওয়া হয়, বোমা ফাটে। আমারই এক ছাত্র স্কুলের একশো গজের মধ্যে দিনে-দুপুরে একজনকে খুন করে। প্রায়ই পুলিশ আসত স্কুলে। পরীক্ষা বয়কট, ক্লাস বয়কট, হামলা লেগে থাকত নিত্যদিন। ক্লাসের দেয়ালে দেয়ালে মাওয়ের ছবি আর স্লোগান লেখা। ক্লাসে ঢুকে শিক্ষককে খুন করার ঘটনাও খবরের কাগজে বেরোচ্ছে প্রায়ই। রাজনীতি থেকে আমি বরাবর দূরত্ব বজায় রাখি। দলীয় রাজনীতি আমাকে কখনও আকর্ষণ করেনি। তবু সাধ্যমতো ছাত্রদের পড়াতে পড়াতেই তাদের হিংসা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েছি। তাতে লাভ হয়তো হত না, কারণ সেটা হুজুগের সময়। তবে ছাত্ররা শুনত।

'শ্যাওলা'য় প্রত্যক্ষ রাজনীতি নেই, কিন্তু নকশাল আন্দোলনের ফল-আউট বা প্রতিক্রিয়া অবসন্নতার কথা আছে। ভাগ্যক্রমে কিছু সাধুবাদ পাওয়া গিয়েছিল এবং নিন্দেমন্দও কম জোটেনি। সব মিলিয়ে এই গ্রন্থখানি অনালোচিত থাকেনি। মার্কসবাদ বিষয়ে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আর সেই অনধিকার চর্চা আমি করিও না। এই উপন্যাসে শুধু বাস্তবচিত্রটাই ছিল আমার উপজীব্য।

সাহিত্য বিচারের সর্বজনগ্রাহ্য কোনও সাধারণ মাপকাঠি নেই। শেষ অবধি পাঠক বা পাঠিকার ব্যক্তিগত রুচি বা সংবেদনশীলতাই বোধহয় আসল কথা।

পাঠকের মতিগতি বুঝবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম। তার চেয়ে নিজের মতো লিখে যাওয়াই শ্রেয়। যে যা বলে বলুক। আমার নিবেদন এটুকুই, আমার জীবন, আমার পাগলামি। আমার অভিভূতি থেকে এই ব্যক্ত জগৎকে যেটুকু বুঝেছি সেটুকুই, গরিবের বাড়ির নেমন্তন্নের মতো, সাজিয়ে দিলাম। অতিথি গ্রহণ করবেন কি না তা তো জানি না।

সূচি

নয়নশ্যামা

বাস থেকে নেমেই শ্যামা নয়নকে দেখতে পেয়েছিল।

বাস যেখানে থেমেছে, সেখানে জাতীয় সড়কের ধারেই হাট বসেছে। ছোট হাট, তবু সেখানে ব্যাপারির ভিড়, ক্রেতাদের আনাগোনা। মুরগির ঝাঁপি সাজিয়ে একজন দোকানি বসে আছে। তার পাশেই একজন বুড়ো চাষি একটা হাড়-বের-করা গোরু নিয়ে দাঁড়িয়ে। এটা গো-হাটা নয়। তবু বুড়ো কী ভেবে তার গোরু নিয়ে এসেছে কে জানে! সেই মুরগির ব্যাপারি আর গোরু-অলা বুড়োর মাঝ বরাবর নিতান্ত বেমানান পাকা জলপাই রঙের দামি প্যান্ট আর গাঢ় হলুদ জামা গায়ে নয়ন দাঁড়িয়ে ছিল। চোখে উগ্র জ্বালা, ঠোঁটে সিগারেট।

বাস থেকে প্রথমেই শ্যামা নামল, তারপর বাবা আর মা। শ্যামা নামতে নামতেই নয়নকে দেখতে পেল, ভিড়ের মধ্যেও। একপলক দেখা। বুকটা চমকে উঠেছিল শ্যামার। পরমুহূর্তেই অবশ্য নয়ন গা-ঢাকা দিল ভিড়ের মধ্যে। শ্যামা পলকে চোখ ঘুরিয়ে বাবা-মার মুখ দেখে নিল। বাবা-মার মুখ দেখে বোঝা যায় যে তারা নয়নকে দেখেনি।

অনেকদিন ধরেই নয়ন পিছু নিয়ে আছে। সব জায়গাতেই পিছু নেয়। কিন্তু এতটা আসবে, আগে-ভাগে এসে অপেক্ষা করবে তা কল্পনা করেনি। তার ভিতরটায় এতক্ষণ নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে আসার যে আনন্দটা ছিল তা হঠাৎ কেটে গিয়ে ভিতরটা হঠাৎ পোড়োবাড়ির মতো ভয় ভয় ভাবে ছেয়ে গেল। ভয়টা নয়নের জন্যে। যদি বাবা-মা টের পায় নয়ন এখানে এসেছে তবে কী যে হবে!

হেমন্তকাল। কলকাতায় এ সময়ে শীত নেই। দুপুরে এখন পাখা চলে। শ্যামা গরম জামা কিছু আনেনি। কিন্তু সড়কে পা দিয়েই সে বাতাসে চোরা শীতের টান টের পেল। উঁচু জাতীয় সড়কে দিগন্তের হাওয়া এসে লাগছে। ভিতরটা কেঁপে ওঠে শ্যামার। ভয়ে, শীতে।

কাঁধের শালটা বাবা ভাল করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে মার দিকে ফিরে বলল, বলি নি তোমাকে মফঃস্বলে এ সময়েই শীত পড়ে যায়।

তাই তো দেখছি। ভর দুপুরেও বেশ বাতাস! এই বলে মা ভেলভেটের খাটো স্টোলটা জড়িয়ে নেয়।

বাবা শ্যামার দিকে ফিরে বলে, তুই তো কিছুই আনলি না। ফেরার সময়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসবি। একেই পাকা টনসিল তোর, আমার শালটা নে বরং।

আমার তো গরম লাগছে।

বাবা একটু হাসে, ওসব কম বয়সের কথা। গবম নেই।

মা বলল, আঁচলটা জড়িয়ে নে গলায়।

শ্যামা তাই নেয়। তার শীত করছে ঠিকই। একটু আগে বাসে গাদাই ভিড়ে বসে সে ঘামছিল। মানুষের গায়ের ভাপে একটা গরম আছে তো। এখন খোলা বাতাস বলে, না কি নয়নকে দেখেছে বলে কেন যেন তার শীত করছে, কাঁটা দিচ্ছে গায়ে।

এইখানে দিব্যি হাট বসেছে দেখছি।

বাবা একটুক্ষণ নাবালের হাটটার দিকে চেয়ে দেখে। ততক্ষণ প্রায় শ্বাস বন্ধ করে থাকে শ্যামা।

বাবা চোখ ফিরিয়ে বলে, ফ্রেশ ডিম-টিম, মুর্গি শাকপাতা পাওয়া যায়, ফুলকপি-টপিও উঠেছে বোধহয়। ফেরার সময়ে যদি হাতে সময় থাকে তো দেখা যাবে।

থলে-টলে তো আনোনি। মা বলে।

রুমাল আছে, শ্যামার ভ্যানিটি ব্যাগটাও বড়-সড়—

শ্যামা এতক্ষণে একটু হাসে—আমার ব্যাগে শাকপাতা ঢোকাবে নাকি?

শাকপাতা না হোক, ডজনখানেক ডিম এঁটে যাবে। আঁটবে না?

যদি ডিম ভাঙে তো ব্যাগের দফা শেষ। তখন আর একটা কিনে দেবে তো?

অফিস থেকে রিটায়ারমেন্টের সময়ে ফেয়ারওয়েলে পাওয়া চমৎকার বেনারসি লাঠিখানা একবার ওপরে তুলে আবার নামিয়ে বাবা বলে, ওরে ভাবিস না, হাট যখন একটা থলেও ওখানে কিনতে পাওয়া যাবে।

বাবা, সব জায়গায় তোমার কেবল খাই-খাই।

বাবা একটু হাসে, বলে, খেতে আর তোরা দিস কোথায়! নুন বারণ, ফ্যাট বারণ, এত সব বারণে আর খাওয়ার থাকে কী?

ব্লাডপ্রেসার দু'শোর কাছাকাছি ওঠে কেন? তুমি প্রেসার ঠিক রাখো আমরা সব বারণ তুলে নেব।

আর কমেছে। এটাই শেষ রোগ! একটা তো হয়ে গেছে, আর দুটো স্ট্রোক মোটে পাওনা।

শুনে শ্যামা চুপ করে থাকে। চোখ ছলছল করে। মা ধমক দিয়ে বলে, সব সময়ে তোমার অকথা-কুকথা। যে কোনও ভাল কথার মাঝখানেও তুমি কেবল তোমার রোগ ভোগের কথা তুলে ফেলো। ওটা ভাল নয়।

জাতীয় সড়ক ধরে একটু এগোলেই ঝকঝকে নতুন একটা কংক্রিটের পোল। নীচে ছোট্ট একটা নদী তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। পোল পেরোলেই বাঁ ধারে একটা বিরাট আমবাগান। জাতীয় সড়ক থেকে একটা মেটে রাস্তা নেমে আমবাগানে ঢুকে গেছে।

পোলের ওপর দাঁড়িয়ে বাবা তার নকশাকাটা সুন্দর লাঠিগাছ তুলে মেটে রাস্তাটা দেখিয়ে বলে, ওই হচ্ছে রাস্তা। এখান থেকে মাইলখানেক যেতে হবে।

শ্যামা পোলের রেলিং ধরে ঝুঁকে নদীটা একটু দেখে। জল বড় পরিষ্কার। সেই জলে তার ছায়া পড়ে। চারটে নৌকো পাড়ে বাঁধা। জলের নীচে মাছের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে। জল থেকে চোখ তুলে শ্যামা একবার হাটের দিকে তাকায়। কিছুই বোঝা যায় না। কয়েকটা গোরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, চালাঘরের নীচে দোকানে দোকানে মানুষ। রঙচঙে জামাকাপড় ঝুলছে এধার-ওধার। হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যান্ট পরা নয়ন কোথাও নেই। শ্যামা একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে, শুনতে পায় মা বলছে, রাস্তা তুমি ভারী চেন কিনা।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলে, চেনার কী? এসব গাঁ-গঞ্জ জায়গা, কলকাতার গোলকধাঁধা তো নয়! বাসে তিনজনকে জিজ্ঞেস করে সিয়োর হয়ে নিয়েছি।

তা হোক। তবু এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও। সেবার তুমি দেওঘরে বেড়াতে বেরিয়ে রাস্তায় হারিয়ে ফেলেছিলে, মনে নেই! বুড়ো বয়সে কী কাণ্ড।

আরে, সে তো কানাওলায় ধরেছিল বলে। নিজের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছি অথচ বাসা চিনতে পারছি না। কানাওলা হচ্ছে একরকমের স্পিরিট।

তা হোক, তবু জেনেশুনে রাস্তায় নামা ভাল।

হাতে একটা ছোট্ট শোলমাছ নিয়ে এক গেঁয়ো হাটুরে হাট সেরে ফিরে যাচ্ছে, বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে, মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির রাস্তা তো ওইটে, না?

ওইটেই। আমবাগানের ভিতর দিয়ে চলে যান। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবেন তো! এখান থেকে মাইলখানেক।

আপনিও ওদিকে যাবেন নাকি?

না। আমি যাব বামুনগাছি। সোজা কোশখানেক গিয়ে ডানহাতি।

ওই দিকটায় লোক-চলাচল নেই?

আছে, তবে কম। মোনা ঠাকুরের জন্যেই আজকাল লোকজন যায়। হাট ফুরোলে কিছু লোক ফিরবে। কিন্তু একা হলেও ভয় নেই। রাস্তা নিরাপদ।

সাপখোপ?

লোকটা একটু হাসে, দিনের আলো রয়েছে, ভয় কী। লাঠিটা একটু ঠুকে ঠুকে চলবেন। সাড়া পেলে ওরা রাস্তা ছেড়ে দেয়। মানুষকে সবাই ডরায়। চলে যান, ভয় নেই।

শ্যামা নয়নকে আর দেখতে পেল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা খিঁচ ধরে রইল। নয়ন খামোকা এতদূর আসেনি। এসেছে যখন কাছে আসার চেষ্টাও নিশ্চয়ই করবে। ও এখন মরিয়া। ওর প্রাণের ভয় নেই।

বাবা একবার গলা খাঁকারি দিয়ে লাঠিটা বার কয়েক রাস্তায় ঠুকে নিল। বলল, চল।

বড় রাস্তা ছেড়ে তারা মেটে রাস্তায় নামল। তারপরই আমবাগানে ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেল জাতীয় সড়ক, ওপারের হাট, নয়ন। গো-গাড়ির চাকায় রাস্তা এমনভাবে ভেঙে দুধারে বসে গেছে যে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। আপনা থেকেই তারা আগুপিছু হয়ে গেল। সামনে বাবা, তারপর মা, সবশেষে শ্যামা।

বাবা হাতঘড়ি দেখে বলল, মোটে পৌনে দুটো। আমরা আস্তে হাঁটলেও গিয়ে ফিরে আসতে ঘণ্টা তিনেকের বেশি লাগবে না। সন্ধের আগেই বাস ধরতে হবে।

মা একটু বিরক্ত হয়ে বলে, মঠে-মন্দিরে যাওয়ার সময়ে অত ফেরার তাড়া থাকলে হয় না। তুমি বাপু বড্ড ঘরকুনো হয়েছ আজকাল।

বাবা একটু থতিয়ে গিয়ে বলল, তা নয়। আসলে দিনকাল তো ভাল নয়, তোমাদের গায়ে সোনার গয়না-টয়না রয়েছে।

লোকটা তো বলল ভয়ের কিছু নেই।

ওসব লোকের কথা কি ধরতে হয়? বলে দিল ভয় নেই, তা বলেই কি ভয় নেই? দেশে আনএমপ্লয়মেন্ট, খরা, বন্যা। চারদিকে উপোসি অভাবী লোক। এ সময়ে চোর গুন্ডা, বদমাশ দেশে বাড়েই।

তারের যন্ত্র যেমন বাজে তেমনি তীব্র স্বরে গাছে গাছে পাখিদের ডাক বেজে যাচ্ছে। শুকনো পাতা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে পায়ের তলায়। শ্যামার বুক কাঁপছে। একটা পাখির শিস কানে এল। উৎকণ্ঠ হয়ে শুনল শ্যামা। নয়ন নানারকমের শিস দিতে পারে।

বাবা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বলে, কী ঠান্ডা সুন্দর নির্জন জায়গা এসব। কলকাতায় আমরা যে কী নরকে থাকি। শব্দ আর শব্দ।

মা বলে, গাঁ-গঞ্জ তো ঠান্ডা হবেই।

বাবা আবার হাঁটতে হাঁটতে উদাস গলায় বলে, কলকাতার জমিটা বেচে দিয়ে এসব দিকে চলে এলে কেমন হয়। ফ্রেস বাতাস, ভাল তরিতরকারি, ডিম-দুধ মাছ—

মা বলে, ও তোমাদের মুখের কথা। কলকাতা তোমাদের বশীকরণ করে রেখেছে। সেবার দেওঘরে গিয়ে একমাসও থাকিনি, তুমি কী হুড়োহুড়ি শুরু করলে—এখানে সিগারেটের টোবাকো পাওয়া যায় না, এ নেই, সে নেই—কুড়ি দিনের মাথায় ফিরে আসতে হয় তোমার জন্যেই তো! তুমি আবার থাকবে গাঁয়ে।

বাবা হাসে, বলে, সে অবশ্য ঠিক। এক সময়ে যখন মফঃস্বলে চাকরি করতাম তখন কলকাতার নামে ভয়-ভয় করত। তারপর কলকাতায় একটা বড় সময়ে থেকে কলকাতার সুবিধেগুলোয় এমন

অভ্যাস হয়ে গেল, আর কোথাও সে আরামটা পাই না। ধরো গ্রীষ্মকালে যদি কখনও ফুলকপি খেতে ইচ্ছে করে, কিংবা অসময়ে গলদা চিংড়ি—সে কেবল ওখানেই পাবে। অন্য কোথাও—

শ্যামা হাসে, বাবা, আবার?

চারদিক গভীর অরণ্য-ছায়ার কোথা থেকে আবার সেই শিসটা শোনা যায়। পাখির ডাকের মতো, কিন্তু পাখির ডাক কি না, তা শ্যামা বুঝতে পারে না ঠিক। উৎকর্ণ হয়ে শোনে। তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়।

রাস্তার ওপর গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে রোদ এসে পড়েছে। দুলছে আলো-ছায়া, দোলে রহস্য। বিচিত্র অচেনা পাখিরা ডাকে। কে জানে সেইসব অচেনা পাখিদের একজন হয়ে নয়ন ডাকে কি না। পিছন ফিরে একবার তাকায় শ্যামা। সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট খায়।

সাবধানে আয়। মা হাত বাড়িয়ে বলে।

ঠিক আছে মা।

কদবেলের গন্ধ পাচ্ছ? বাবা জিজ্ঞেস করে।

মা বাতাস শুঁকে বলে, কী একটা গন্ধ যেন চামসে মতন।

বাবা শ্বাস ফেলে বলে, বাঁদরলাঠি, সেই যে লম্বা লম্বা, সেগুলো ভাঙলেও এরকম গন্ধ বেরোয়।

বুনো কুলের ঝোপ পেরোবার সময়ে বাবা শ্যামাকে ডেকে দেখায়, এই কুল দেখ, বড় পুঁতির মতো হয়, পাকলে ভারী মিষ্টি, মানিকপুরের জঙ্গলে কত খেয়েছি।

বাতাস এখানে ভারী পরিষ্কার, সতেজ, বাতাসে বন্য গন্ধ, ভেজা মাটির সোঁদা মিষ্টি গন্ধটি। ছায়ায় কেমন শীত-শীত করে। শ্যামা তার আঁচল গায়ে জড়ায়! ভিতু খরগোশের মতো চারদিকে চায়। টুপ টুপ পাতা এসে পড়ছে গাছ থেকে। জলের ফোঁটার মতো টুক করে একটু শব্দ হয় কি হয় না। এই ছায়াটি, এই নির্জনতা, এই অচেনা জায়গার সৌন্দর্য কী নিবিড় সুন্দর বলে মনে হত হেমন্তের এই গড়ানে দুপুরে! শ্যামার চোখে যদি নয়নের হলুদ জামা আর জলপাই-রঙা প্যান্টটা না ছায়া ফেলত।

আগাছা রাস্তার মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে। আঁচলে টান পড়তেই শ্যামা কেঁপে ওঠে, তারপর লজ্জিত মুখে গাছের কাঁটা থেকে তাড়াতাড়ি আঁচল ছাড়ায়। জোরে হাঁটা বাবার বহুকালের অভ্যাস। স্বভাবতই বাবা এগিয়ে যায়, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে তার আর মার জন্য। আগু-পিছু তারা চলে।

তোমার ইচ্ছের জন্যই আসা। কিন্তু আমার মন বলে, তন্ত্রে-মন্ত্রে কিছু হবে না। বাবা উদাস গলায় বলে।

মা চুপ করে থাকে। তাদের মাঝখানে একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

শ্যামা স্তিমিত, নরম গলায় বলে, মোনা ঠাকুরের খুব নামডাক।

শুনেছি। কিন্তু আমরা হচ্ছি ঘরপোড়া গোরু। বুকের মধ্যে ভয়টা সব সময়ে থম ধরে থাকে। তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল বেরিলিতে, তাও পাঁচ বছর হয়ে গেছে। পাঁচ বছরে কত কী হয়ে যায় মানুষের, তার ওপর পাগল মানুষ। বলে বাবা বড় করে শ্বাস ছাড়ে।

মার পা ধীর হয়ে আসে। তারপর একটু ধরা গলায় বলে, যা হবার তা হয়েছে, তুমিও তো আর জ্যোতিষ নও।

সন্ন্যাসী-ফকিরের পিছনে তো কম ঘোরা হল না।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন ঘুরব। আমরা চোখ বুজলে তখন তার যা হওয়ার হোক।

বাবা মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে হয় না যে সে বেঁচে আছে।

বে-ফাঁস কথা। এ কথাটা মা কোনওদিন সহ্য করতে পারে না। দাঁড়িয়ে পড়ে মা হাঁফাতে থাকে। তীব্র স্বরে বলে, তোমার কেবল ওই কথা। কিন্তু সে গেছে বলে যতদিন না জানতে পারছি ততদিন

তোমাকেও ঘুরতে হবে। আমাকেও। মার কাছে ছেলে যে কী তা কোনওদিন বাবা বুঝতে পারে না।

বাবা সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে গিয়ে বলে, আমি তো ঘুরিই। ঘুরি না? বলো!

আবার তারা হাঁটতে থাকে। আগু-পিছু হয়ে। অচেনা পাখিরা ডাকে। গাছের ছায়ায় শীত জমে ওঠে। ঠান্ডা মাটি থেকে শীতলতা উঠে আসে। চারদিকে রহস্যময় আলো-আঁধারি। এর মধ্যেই কোথাও অলক্ষ্যে নয়নও চলেছে সঙ্গ দিয়ে। হয়তো পাখি হয়ে। হয়তো গাছের ছায়া হয়ে। শ্যামার বড় ভয় করে।

এখানকার তাড়িটা ভালই। নয়ন ঠোঁটের ফেনা মুছে নেয়। এখন ঠিক এই সময়ে তাড়ি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তার। অনেক কাল নেশা-ভাঙ করেনি সে। ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু কে জানত যে এখানে কলকাতা থেকে মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ মাইল দূরে, ভর দুপুরে এমন শীত করবে! নেশাটা সেই জন্যই করা। তবু, যাকে ঠিক নেশা বলে তা হয় নি।

তাড়িটা কিন্তু ভালই। খারাপ কিছু মেশায়নি। পরিষ্কার গন্ধ, চনচনে স্বাদ। শীত ভাবটা কেটে গেল। ভাঁড়টা ফেলে দিয়ে বলল, তোমাদের এখানে এত শীত কেন হে?

শীত হয় না এ সময়ে। ক'দিন বৃষ্টি গেল পরের পর। আজ দু'দিন টেনে হাওয়া দিচ্ছে দেখছি। তাড়িওয়ালা যুবকটি বলল।

একটু আগে শ্যামা তার মা-বাবার সঙ্গে নেমেছে। কোথায় যাবে তা নয়ন জানে। তাই পিছু নেয়নি, হাট পেরিয়ে দক্ষিণে গেলে একটা বাঁশের সাঁকো আছে। সেইটে দিয়ে পেরিয়ে নয়ন সর্টকাট-এ আমবাগানের গহীন জায়গাটায় পৌঁছে যাবে। তাড়া নেই। ওরা যে জোর হাঁটবে না—এ তো জানা কথা।

নয়ন হাই তুলে জিজ্ঞেস করে, চাষবাস করো?

আজ্ঞে না। বাবা করে একটু-আধটু, বছরের চালটা উঠে আসে। আমার একটা চায়ের দোকান আছে বল্লভপুরে।

তালগাছ কটা?

অনেক। ওইটাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। বলে হাসে তাড়িওয়ালা।

ঝান্ডাওয়ালারা গাঁয়ে আসে না?

আসে।

কোন ঝান্ডা বেশি আসে?

সব রকমই। সবাই ভাল ভাল কথা বলে।

তোমরা কোন ঝান্ডার দলের?

সে কি বলা যায়? আমরা এখন চালাক হয়ে গেছি!

ভোট-টোট দাও?

দিই মাঝে মাঝে।

নয়ন হাসে। বলে, খুব চালাক হয়ে গেছ তোমরা। ফসল-টসল কেমন হয়?

হয়। এদিকটায় বৃষ্টি বেশ। আমনের ফসল ভাল এবার।

ফসল রাখতে পারো? কেটে নিয়ে যায় না?

নেয়, আবার রাখিও। যে যেমন পারে।

নয়ন লোকটার চোখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। লোকটা চোখ নামিয়ে নেয়। নয়ন হেসে বলে, তোমরা খুব চালাক হয়ে গেছ।

চনচনে খিদে পেয়েছে। নয়ন মাটিতে বসে ছিল, এবার উঠল। উঠতেই টের পেল প্যান্টের পিছন দিকটা ভেজা-ভেজা। বৃষ্টি হয়ে গেছে খুব। মাটির ভিতরে চোরা জল। রসস্থ মাটি। নয়ন কয়েক পা জুতোর হিল চেপে হেঁটে দেখল নরম মাটিতে জুতো বসে যাচ্ছে।

পাশেই তেলেভাজার দোকান। সেখানে বেশ ভিড়। গন্ধটাও ছেড়েছে ভাল। কিন্তু যে লোকটা ভাজছে তার কব্জির কাছে একটা শ্বেতীর মতো দাগ দেখে নয়ন আর তেলেভাজা কিনল না। তিনটে কাঁচা মুরগির ডিম কিনে চায়ের একটা স্টলে গিয়ে দু' কাপ চা খেল পর পর। তার পর বাচ্চা ছেলেটাকে ডিম তিনটে দিয়ে খুব অবহেলায় বলল, সেদ্ধ করে দে।

ছেলেটা এক পলক নয়নের চোখে চোখ রাখল। তার পর চায়ের কেটলির পাশেই উনুনের ওপর একটা মগে সিদ্ধ চাপিয়ে দিল।

তিনটে সেদ্ধ ডিমের প্রথমটা খেতেই বিস্বাদে ভরে গেল নয়নের মুখ। নেশার মুখে সেদ্ধ ডিম বড়ই পানসে। কোনওক্রমে আঁশটে গন্ধের দলাটা গিলে সে দুটো ডিম পকেটে রাখল। তারপর ফিরে এল তাড়িওলার কাছে।

আর এক ভাঁড়।

তাড়িওলা ভাঁড় হাতে দিয়ে বলে, নির্ভয়ে খান। এর নেশা খুব পাতলা। বাবু, আপনার কোন ঝান্ডা?

নয়ন ভাঁড় মুখে দিয়ে কুলকুচো করে মুখের বিস্বাদ তাড়িয়ে বলে, জানলে যদি প্যাঁদাও বাপু!

লোকটা হেসে বলে, ওরেব্বাস রে। কলকাতার বাবু আপনারা, ধমক দিলে হেগেমুতে ফেলি।

খুব চালাক, না? আমার ঝান্ডা লাল, বুঝলে? তবে লালটা অনেকটা রক্তের মতো, অন্য সব ঝান্ডার সঙ্গে মেলে না। আমার নিজের ঝান্ডার রঙকে আমি নিজেই ভয় পাই।

লোকটা হেঁয়ালি শুনে চেয়ে থাকে।

নয়ন দাঁড়ায় না। এবার রওনা হওয়া উচিত। শ্যামা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। নয়ন হাঁটতে থাকে। দু' পকেটে দুটো ডিম ফুলে থাকে। নয়ন গ্রাহ্য করে না। লম্বা পায়ে হাটটা পেরিয়ে সে একটা ঢিবির ওপর উঠে আসে। দক্ষিণে সাঁকো, সঠিক জায়গাটা চেনে না নয়ন। এগিয়ে বাঁশঝাড়টা পেরোলে বোঝা যাবে। নয়ন হাঁটতে থাকে। হেমন্তের দুপুরকে শূন্য করে দিয়ে হু হু করে কোকিল ক্ষণেক ডেকে উঠেই চুপ করে যায়। নয়ন ঢিবির উৎরাইটা দৌড়ে নামতে নামতে অবিকল কোকিলের ডাকটা ডাকতে থাকে। কুহু কুহু কুহু...

শ্যামা যতক্ষণ পৃথিবীতে আছে ততক্ষণ ক্লান্তি নেই। সে এখানে এসেছে শ্যামারা আসবার তিন-চার ঘণ্টা আগে। নয়নের হাতে ঘড়ি নেই। থাকলে ঠিক সময়টা বোঝা যেত। ঘড়িটা ইচ্ছে করেই পরেনি নয়ন। যখন শ্যামার জন্য সে কোথাও যায় তখন সে সময়ের পরোয়া করে না। তখন তার কাছে জীবনটাই একটা অখণ্ড, অনন্ত সময়। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কতদূর যেতে হবে তার কোনও ঠিক থাকে না। তবে সবটুকু সময় দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকে। যখন নয়ন এখানে এসেছে তখন হাটটা ভাল করে জমেনি। ব্যাপারিরা আসছে সবে, চত্বরটায় তখনও বিশৃঙ্খলা। জিনিসপত্রের টাল জমছে, চায়ের দোকানের উনুনে তখনও আঁচ পড়েনি। গত তিন-চার ঘণ্টা ধরে নয়ন হাটটাকে জমে উঠতে দেখেছে।

কিংবা বলা যায় নয়ন কিছুই দেখেনি। তার চারধারে পৃথিবীর কিছু অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় মানুষেরা অকারণে ভিড় জমিয়েছে—এইটুকু মাত্র সে টের পেয়েছে। শ্যামা যতক্ষণ আসেনি ততক্ষণ এ জায়গাটার কোনও সৌন্দর্য ছিল না, তাৎপর্য নয়। ততক্ষণ সে অদূরে তাড়ির কলসিটাও লক্ষ করেনি। শ্যামাকে বাস থেকে নামতে দেখে লুকোবার সময়ে সে গিয়ে প্রায় তাড়িওয়ালার গায়ে হোঁচট খেল। তখনই টের পেল। উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে, এ জায়গাটায় শীত পড়েছে বেশ।

বাঁশ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ের রাস্তাটা ঘুরে গেছে। ঝরা বাঁশপাতায় পুরু গালচের মতো হয়ে

গেছে রাস্তা, পা রাখলে নরম লাগে। আরও দু'বার কোকিলের ডাক ডাকল নয়ন।

বাঁশ-ঝাড়টা পেরোলেই দেখা যায় শ্মশান। চাতালটা খাঁ খাঁ করছে। গত রাতে কারা মড়া পুরিয়ে গেছে, কালো আংরার দাগ ছড়িয়ে আছে, ইতস্তত কাঠকয়লা। ওদের ঘর অনতিদূরে। খোড়ো ঘরের সামনে বসে এক মধ্যবয়সী মেয়েছেলে নিজের রুক্ষ চুলে আঙুল ডুবিয়ে উকুন খুঁজছে।

এ ধারে নদীর ওপর একটা বাঁশের সাঁকো আছে না? নয়ন তাকে জিজ্ঞেস করে।

মেয়েছেলেটা তাকে চোখ ছোট করে একপলক দেখে নিয়ে বলে, সে তো ভেঙে গেছে প্রায়। আরও দক্ষিণে।

পেরোনো যাবে না?

মেয়েছেলেটা উদাস গলায় বলে, কে জানে! লোকে তো এখনও পার হয়।

গত তিন-চার ঘণ্টা উগ্র উত্তেজনায় শ্যামার জন্য অপেক্ষা করছে নয়ন। কিছু খায়নি। চনচনে খিদের মুখে পাতলা তাড়িটা তাকে ধরেছে ভাল। গা জ্বালা করছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে ভিতরের গেঞ্জি। গলা বুক শুকিয়ে আসছে। কিন্তু এগুলো কিছুই গ্রাহ্য করার মতো ব্যাপার নয়। খিদে-তেষ্টা, শীত-গ্রীষ্ম কোথায় যে উড়ে যায় এসব সময়ে! চারদিকটা নির্জন হয়ে যায় যেন। কেবল নয়ন থাকে, থাকে শ্যামা।

নয়ন জানে, শ্যামা তাকে দেখেছে। দেখে নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে সে। ওই আমবাগানে আবার তাকে পিছু নিতে দেখলে শ্যামা কী করবে? সেবার পিকনিক গার্ডেনসে তার কলেজেব বান্ধবী আর বন্ধুদের সঙ্গে যখন গিয়েছিল শ্যামা তখনও এইরকম ভাবে দেখা হয়েছিল। শ্যামা তাকে দেখেছিল কিন্তু কিছু করেনি। যদি ইচ্ছে করত শ্যামা, যদি নয়নের সেই পিছু-নেওয়ার কথা বলে দিত তার বন্ধুদের তবে সেইসব বন্ধুরা পিষে ফেলতে পারত নয়নকে। কিন্তু শ্যামা অতটা করেনি। শ্যামা সে রকম মেয়ে নয়। নিষ্ঠুরতা তার স্বভাবে নেই। আবার শ্যামার মতো নিষ্ঠুরও হয় না।

বাঁশঝাড়, কাঁটাঝোপ, বন-করমচার ভিতর দিয়ে উঁচু-নিচু পায়ের রাস্তা চলে গেছে। জঙ্গুলে জায়গা, ঘরবাড়ি বড় একটা দেখা যায় না। বাঁ ধারে আবাদ দেখা যায় গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে। সিকি মাইল গিয়ে নয়ন বাঁশের সাঁকোটা দেখতে পেল। চারদিকে হেমন্তের পাতাঝরা গাছ। নির্জন শীতলতা। সেই নিঝুমতায় বাঁশের সাঁকোটা বুড়ো জীর্ণ হয়ে ঝুলছে। জলে ছায়া দেখছে নিজের। কাছে গিয়ে নয়ন দেখে, পা রাখার জন্য একটি মাত্র বাঁশ অবশিষ্ট আছে, আর দু' ধারে ধরার বাঁশ নেই। পার হওয়া বেশ শক্ত। কিন্তু ওপারে শ্যামা আছে, নয়নের কিছুই তেমন শক্ত মনে হয় না।

বার বার পা পিছলে গেল, ভারসাম্য হারিয়ে পড়তে পড়তে ঝুলে আবার উঠতে হল, তবু হামাগুড়ি দিয়ে সাঁকোটা ঠিকই পার হয়ে গেল নয়ন। তারপর নিবিড় ছায়ায় আচ্ছন্ন বনভূমিতে ঢুকল। তারপর কেবল পাখির ডাক, আর ঝিঁঝির শব্দ এবং বন্য গাছের আর ভেজা মাটির গন্ধ। আগাছা, ঝোপ আর ছায়ার ভিতর দিয়ে রাস্তাটা গেছে। কিন্তু এ রাস্তায় যে লোক চলাচল খুব কম, তা রাস্তার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখলেই বোঝা যায়। পায়ে হাঁটা রাস্তার মাঝখানে ঘাস উঠেছে।

পাখির ডাক নকল করতে করতে নয়ন হাঁটে। যত বিচিত্র ডাক শোনে ততই বিচিত্র ডাক সে হুবহু নকল করে। ভবদুপুরে খিদেপেটে তাড়িটা গেঁজে উঠছে। নয়নের চোখের পাতা ভারী ভারী, শরীরের ভিতরটা ঘুম-ঘুম। হাই উঠছে। কোনও গাছের ছায়ায় শরীরটা একবার পেতে দিলে দিনটা নিঃসাড়ে কেটে যাবে। কিন্তু সে কথা নয়ন ভাবতেই পারে না। সে এগুচ্ছে পশ্চিম দিক থেকে পুবে। শ্যামা এই বনভূমিরই উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে আসছে। রাস্তায় তাদের দেখা হবে। এখন এই আমবাগানের বাতাসে শ্যামার গন্ধ আছে, স্পর্শ আছে। নয়নের হাজার বছর ধরে জেগে থাকতে ইচ্ছে করে।

কিছুদূর গিয়েই নয়ন ভগ্নস্তূপটা দেখতে পায়। বিশাল বাড়ি ছিল কোনওকালে। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে বাড়িটার দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। ইঁটের ভিতর

থেকে, মেঝে থেকে বড় বড় গাছ উঠেছে। চারদিকেই ছড়ানো ইট—পুরনো শ্যাওলায় কালো। পায়ে হাঁটা পথটা ভগ্নস্তূপটা এড়িয়ে ঘুরে গিয়ে অদূরে রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু সে পথে যায় না নয়ন। গেলে রাস্তা থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। সে রাস্তা ছেড়ে ধ্বংসস্তূপটার ভিতরে উঠে যেতে থাকে।

যেখানে ইঁট সেখানেই সাপ। পুরনো বাড়ি, ইটের খাঁজ, এ হচ্ছে সাপের প্রিয় আস্তানা। নয়ন তা জানে, তবু সাপের কথা তার মনেই আসে না। আকীর্ণ শ্যাওলায় পিছল ইঁটের খাঁজে খাঁজে পা রেখে, হোঁচট খেয়ে, তাল সামলে সে বাড়িটার দিকে উঠে যায়। ওই বাড়ির উঁচু ভিত থেকে রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাবে। দেখা যাবে শ্যামাকেও। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখবে নয়ন। বিপদ-আপদের কথা তার মনেও থাকে না।

ওরা আসছে ঘুর রাস্তায়, আস্তে হেঁটে। নয়ন এসেছে চোরা পথে, অনেক তাড়াতাড়ি। তবু নয়নের হঠাৎ ভয় হয় শ্যামা জায়গাটা পেরিয়ে যায়নি তো! তাড়ির ঘোরে তার হয়তো সময়জ্ঞান নষ্ট হয়ে গেছে। সে হয়তো খুব আস্তে হেঁটেছে।

মোটা মোটা কয়েকটা থাম দাঁড়িয়ে আছে। বেশ পুরু দেয়াল। এখন কোথাও কোথাও দেয়ালে পঙ্খের কাজের চিহ্ন দেখা যায়। থামের শীর্ষে কিছু কারুকাজ। একটা লোহার বরগা আড়াআড়ি মাথার ওপর রয়ে গেছে আজও। আগাছা ভেদ করে নয়ন ক্রমে বাড়ির ভিতের ওপর উঠে আসে। চারিদিকে রহস্যময় ফাটল, ভিতরে ভিতরে হাঁ করা জায়গাগুলোতে পাতালের অন্ধকার। চারদিকেই কাঁকড়া-বিছেদের আস্তানা। একটা পিপাসা, একটা শিরা ছিঁড়ে যাওয়া প্রতীক্ষায় তার শরীরটা টান টান। বুকের ভিতরটা ধক ধক করে, চোখ জ্বলে, ঠোঁট শুকিয়ে আসে, জ্বর জ্বর লাগে শরীর। তাড়িটা না খেলেই পারত সে। শরীরটা এখন কেমন কাঁপছে। খিদে মরে গিয়ে দুর্বল লাগে হাত পা। ঘুম পায়।

নয়ন জানলা-দরজাহীন দেয়ালগুলোর ভিতর দিয়ে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরে দেখে। চারদিকে স্তূপ হয়ে ইঁট, বালি আর রাবিশ পড়ে আছে। ঘুরে ঘুরে সে আসে সামনের দিকটায়। একটা প্রকাণ্ড থাম দেখতে পেয়ে দাঁড়ায়। একটু বসতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু বসে না। হাত বাড়িয়ে থামের গায়ে ভর দেয়। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে ওঠে। তার মনে হয়, ভর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থামটা একটু দুলে উঠল। সে সভয়ে প্রকাণ্ড উঁচু থামের দিকে চায়। তারপর হাসে। ভয়টা কেটে যায়। হয়তো তাড়ির নেশায় ভুল বুঝেছে ভেবে আবার থামটার গায়ে ভর রাখে, আবার মনে হয়—থামটা দুলে উঠল। কিন্তু এবার আর চমকে সরে গেল না নয়ন। ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যমনে নির্জন রাস্তাটার দিকে চেয়ে রইল। ভাঙাচোরা রাস্তা, দু'ধারে গোরুর গাড়ির চাকার খাদ, সেই খাদে কাদা জমে আছে। সারা বছর ওই কাদা কমই শুকোয়। চারদিকে পাখি ডাকে। কেবল পাখি ডাকে। অন্যমনে বে-খেয়ালে নয়নও ডাকতে থাকে। প্রথমে দোয়েলের মতো, তারপর কুবো পাখির শব্দ করে, তারপর কোকিলের মতো ডাকে।

তার পর ক্লান্তি লাগে। হরবোলা হয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। চাই নিজস্ব একটি শব্দ, নিজস্ব ডাক। নিজের শব্দটা কোনওদিনই খুঁজে পায় না নয়ন। চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল। ক্লান্তি লাগে, তবু অভ্যাসবশত সে ডাকে। প্রায় সমস্ত শ্রুত শব্দই হুবহু গলায় তুলে আনতে পারে সে। পাখপাখালির বিচিত্র ডাক, চাঁদের দিকে চেয়ে কুকুরের কান্না, বেড়ালের বিবাদ, ইঞ্জিনের হুইশল, কিংবা এ রকম অনেক কিছু। কিন্তু হরবোলা হয়ে থাকার ক্লান্তি বড় ভীষণ। সে তো ওই সব শব্দের কোনওটারই মূল উৎস নয়! সে পাখি নয়, শেয়াল কুকুর বা রেল ইঞ্জিনও নয়। সে নয়ন রায়। তার নিজস্ব শব্দ কোনটা? কোথায় তার নিজের ডাক? যে ডাক শুনলে শ্যামা সাড়া দেবে?

দূর থেকে একটা মেয়েলি গলার অস্পষ্ট স্বর শুনতে পেল নয়ন। উৎকর্ণ হয়ে রইল। তার গায়ে দিল কাঁটা। একটু শুনেই বুঝল এ শ্যামা বা তার মায়ের গলা নয়। বোধহয় একটা বাচ্চা ছেলে তার

বাবাকে ডেকে কিছু বলল, একটা পুরুষের গলা উত্তর দিল। ভগ্নস্তূপের দক্ষিণে বনের মধ্যে তারা কিছু খুঁজছে। গাঁ-গঞ্জের লোকেরাই হবে। নয়ন গা করল না। হাত বাড়িয়ে বুক-সমান আগাছার জঙ্গল থেকে একটা ডাল ভেঙে দাঁতে চিবোতে লাগল। তিতকুটে স্বাদ, গন্ধও বিচ্ছিরি। কিন্তু সেসব তেমন খেয়াল করে না সে। অন্যমনে ডালটা চিবোতে থাকে।

কোনও সুখই কখনও পরিপূর্ণ নয়, বুঝলে! আমাকেই দেখো, চিরকাল ভাল চাকরি করেছি, পয়সা যথেষ্ট পেয়েছি। ছেলেমেয়ের দিক থেকেও সুখীই ছিলাম। একটা ছেলে একটা মেয়ে—সুস্থ সবল। কোথা থেকে কী হয়ে গেল—

তুমি রাস্তা দেখে চলো। হোঁচট খাচ্ছ।

বাবা রাস্তা দেখতে গিয়ে ঝুঁকে লাঠিটা বার কয়েক ঠোকে। তারপর একটা 'হু-উম' শব্দ করে আপনমনেই বলে, কোনও সুখই চিরস্থায়ী নয়।

অদূরে একটা শেয়ালের হাসি শোনা যায়। পরমুহূর্তেই একটা কোকিল হু-হু করে ডেকে উঠেই স্তব্ধ হয়। বাবা থমকে দাঁড়িয়ে বলে, শেয়াল ডাকছে।

মা বলে, তাতে কী। এসব জায়গায় শেয়াল তো থাকবেই।

বাবা চিন্তিত মুখখানা ফিরিয়ে বলে, সে কথা বলছি না। দিনের বেলা শেয়াল বড় একটা ডাকে না।

তোমার বাপু বড় ভয়।

বাবা ভ্রূ কুঁচকে বলে, কোকিলটাই বা হঠাৎ ডেকে উঠে থেমে গেল কেন?

তাতেই বা কী?

কিছু না।

শ্যামার বুকটা খামচে ধরে এক ভয়। শেয়ালের ডাক নয়ন হুবহু ডাকতে পারে তা শুনলে কারও অন্যরকম সন্দেহই হবে না। কিন্তু এ ডাকটা যেন শেয়ালের ডাকের মধ্যে একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে দেওয়া। নয়ন কি তাই করছে? কোকিলের ডাক ডেকেই সে চুপ করে গেল কেন? সে কি শ্যামাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে, সে এখানে আছে, অদূরে?

হরবোলা নয়নকে বাবা তো জানে। যদি নয়ন ডাকগুলো ঠিকমতো না ডাকে তবে বাবা বুঝতে পেরে যাবে। বুঝলে কী হবে তা শ্যামা ভেবে পায় না।

একটা বুনো ঝোপের পাশ দিয়ে রাস্তাটা বেঁকে গেছে। সেই বাঁকটা ঘুরতেই বাবা বাহারি লাঠিগাছ তুলে হেঁকে বলল, ওই দেখ, কোনও রাজারাজড়ার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। কী বিরাট বাড়ি ছিল, অ্যাঁ!

দেখছি।

শ্যামাও দেখল। বাঁ ধারে, রাস্তা থেকে দূরে নয়, কয়েকটা থাম গম্বুজ পুরু দেওয়াল মিলিয়ে বিশাল এক বাড়ি। তাতে অশ্বত্থ, বট আগাছার জঙ্গল। কিছু একটা আন্দাজ করে শ্যামা চেয়ে ছিল। হঠাৎ সে দেখল কিংবা তার চোখের ভুলও হতে পারে—বিশাল ভারী একটা থাম যেন খুব সামান্য একটু দুলে গেল। পলকে মুখ সাদা হয়ে গেল শ্যামার। সে কোথাও কাউকে দেখে নি, কিন্তু হঠাৎ খুব নিশ্চিতভাবে তার মনে হল, নয়ন ওইখানে আছে। ওই থামটার আড়ালে। ওইখান থেকেই সে শ্যামাকে উদ্দেশ্য করে বিদ্রূপ মেশানো শেয়ালের ডাক ডেকেছিল, কোকিল ডেকে থেমে গিয়েছিল। থামটা কি নড়ল সত্যিই? যা পুরনো বাড়ি নড়তেও পারে। যদি থামটা ভেঙে পড়ে এখন, যদি চাপা পড়ে মরে যায় নয়ন, তবে কি শ্যামা দুঃখ পাবে। ঠিক বুঝতে পারে না শ্যামা।

অনেক নীল আর বেগুনে বুনো ফুল ফুটে আছে।

মা, আমি কয়েকটা ফুল তুলি। কী সুন্দর ফুল! শ্যামা বলে।

এসব জঙ্গলে সাপখোপ আছে।

কিছু হবে না। কয়েকটা তুলব।

মা-বাবা দু'জনেই অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। দাদার কথা উঠলেই তাদের এ রকম হয়।

আমরা দাঁড়াই, তুই তোল। মা বলে।

শ্যামা মাথা নাড়ে, দাঁড়াবে কেন? তোমরা এগোও না। বা আস্তে হাঁটো তোমরা, আমি ঠিক পা চালিয়ে ধরে ফেলব।

দেরি করিস না কিন্তু! এই বলে ব্যাপারটায় আর গুরুত্ব না দিয়ে বাবা আর মা হাঁটতে থাকে। দুজনে এখন দাদার কথা বলবে, শ্যামার জন্য দুশ্চিন্তা এখন অবান্তর।

শ্যামা তা-ই চায়। তার ধারণা, ওই পুরনো ভেঙে-পড়া বাড়ির কোনও ঘুপচিতে ঠিক নয়ন আছে। কোনও যাদুবলে নয়ন ঠিক তাদের আগে আগে এসেছে, অপেক্ষা করছে। এটা ভাল নয়। শ্যামা একবার নয়নের মুখোমুখি হতে চায়। এই নির্জন জায়গায় বিপজ্জনকভাবে পিছু নিয়েছে নয়ন? ঠিক ধরা পড়ে যাবে। বাবা যদি দেখতে পায় নয়নকে। গত মাসেও একবার বাবার প্রেসার দু'শো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। দরকার হলে শ্যামা নয়নের পায়ে ধরে বলবে—ফিরে যাও। শ্যামা তাই বাবা-মাকে এগিয়ে দিতে চায়। এখন একা এই বনভূমিতে বেরিয়ে আসুক নয়ন। শ্যামা মুখোমুখি হবে।

বাবা আর মা এগিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল। কিছুক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল দূর থেকে। শ্যামা একটু অপেক্ষা করে রাস্তা ছেড়ে বুনো ঝোপগুলোর কাছে এসে দু' একটা ফুল তুলল অন্যমনস্কভাবে। ফুলের প্রতি তার তেমন কোনও মোহ নেই। গন্ধহীন এইসব বুনো ফুল দিয়ে কী করবে শ্যামা!

শ্যামা কেবল বারবার প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকায় আর অপেক্ষা করে। নয়ন সমস্ত ব্যাপারটাই দেখেছে। দেখেছে শ্যামার মা-বাবা এগিয়ে গেল শ্যামাকে একা রেখে। দেখেছে, শ্যামা এখন একা। এরকম সুযোগ নয়ন ছাড়বে না নিশ্চয়ই?

কিন্তু অপেক্ষা করে লাভ হল না—সমস্ত বনভূমি নির্জন। কোথাও নয়নের সাড়াশব্দ নেই। তবে কি সত্যিকারের শেয়ালই ওরকম ডেকেছিল? নয়ন নয়? শ্যামা একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। বনভূমির কোনও গভীর থেকে দুটো অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পায় শ্যামা। কে যেন কাকে ডাকছে। চারদিকে নির্জন, গভীর ছায়া, শ্যামার গা ছমছম করে। বাতাস দেয়, শীত করে শ্যামার। একটু পিপাসা, জ্বরভাব, একটু ভয়—এইসব মিলে এমন সুন্দর ছায়ায় ঢাকা দুপুরটা অস্বস্তিকর লাগে শ্যামার কাছে।

অনেকটা জমি ফাঁকা ফাঁকা। কয়েকটা বুনো ফল আব কাঁটাঝোপ ছাড়া বাড়িটার সামনের জমিতে কিছু নেই। চারদিকে একসময়ে উঁচুঘেরা-পাঁচিল ছিল। সেই পাঁচিল ভেঙে পড়ে গেছে। কোথাও কোথাও শুধু কয়েকটা অদ্ভুত চেহারার ইটের গাঁথনি দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে দেখার জন্য শ্যামা কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ডাকল নয়ন! নয়ন...

কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু একটু দূর থেকে একটা ঘুঘু পাখির ডাক শোনা গেল। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শুনল। কিন্তু কিছু বোঝবার উপায় নেই। নয়ন সব ডাকই হুবহু ডাকতে পারে। যখন ডাকে তখন নয়ন সত্যি-সত্যিই পাখি হয়ে যায়, কিংবা জীবজন্তু। মানুষ থাকে না। নয়নের ওই রহস্যময়তা মাঝে মাঝে শ্যামার বুকে ভয় হয়ে থাবা গেড়ে বসে।

চারদিক আকীর্ণ পুবনো বাড়িটার ভেঙে-পড়া ইট, কাঠ আর আবর্জনার ভিতরে শ্যামা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইল। ছায়া দোলে, একটা পাথরের ফোয়ারার চারধারে গোল জলাধার দেখা যায়। জল নেই, গাছ গজিয়েছে। ফোয়ারার মুখ কাত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। তার পাশেই একটা গোলাপ

গাছ। একটা লাল গোলাপ ফুটে আছে একা। শ্যামা একটু এগিয়ে গোলাপটা তুলে নিল। তারপর ফিরে এল রাস্তায়। আপাদমস্তক শিউরে উঠে দেখল, নয়ন তার মুখোমুখি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসি। কোমরে হাত।

ধক ধক করে শ্যামার বুকের ভিতরটা নড়ে গেল। সে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল নয়নের দিকে। হলুদ জামা আর পাকা জলপাই রঙের প্যান্ট নয়নকে তেমন কিছু ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না। নয়নের উচ্চতা স্বাভাবিক, স্বাস্থ্য মাঝারি, মুখখানা একটু ভাঙাচোরা হলেও কমবয়সের লাবণ্য আছে! গালের দাড়ি এখনও নরম। গোঁফ জোড়া ছাঁটেনি বলে অনেক বড় হয়ে গাল পর্যন্ত পৌঁচেছে। গায়ের রং না-ফর্সা, না-কালো। একনজরে দেখলে নয়নের ভিতরে দেখবার কিছু নেই। ঘেন্না বা উপেক্ষারও কিছু নেই। বড় বড় চুলে ঘেরা মুখখানায় কেবল চোখ-জোড়াই যা একটু অন্যরকম। শ্যামার দাদার অনেকটা এরকম চোখ ছিল। নয়নের চোখজোড়া খুব নিষ্ঠুর। তাতে সহজে পলক পড়ে না। চোখের তারায় একটু কটা ভাব। মণির মাঝখানে দুটো ছ্যাদা দূর থেকেও দেখা যায়। শ্যামার দাদা বিবেকানন্দর ভক্ত ছিল। খুব ধর্মের বই পড়ত। একা একা ধ্যান করত অনেক রাত পর্যন্ত ঘরে। সাদা দেয়ালে একটা ছোট্ট ফোঁটা বা চিহ্ন দিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকত। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কলিযুগেও মানুষ ইচ্ছে করলে তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারে। দাদা একবার চেষ্টা করেছিল তিন দিনে ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়ার। একদিন সেই চেষ্টায় সকাল থেকে খিল দিয়ে বসল, বহু ডাকাডাকিতেও সাড়া দিল না, দরজা খুলল না। দ্বিতীয় দিনও না। সেদিন পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গেল বাড়িতে, মা কাঁদতে শুরু করে, বাবা অফিসের কাজে বাইরে মফঃস্বলে গিয়েছিল, ফিরে এসে রাগারাগি শুরু করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দরজা ভেঙে যখন দাদাকে বের করা হয় তখন তার চোখ ঘোলাটে লাল, মুখে রক্ত ফেটে পড়ছে, ভুল বকছে। সেই ভুল বকা চলতেই থাকল। বড় ডাক্তার দেখে বলল, পাগলামি শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, আপনারা টের পাননি। অনেক পাগল এরকম থাকে, বোঝা যায় না। মানুষের নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। যখন বাড়িতে একমাত্র ছেলের জন্য উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় সকলের খাওয়া ঘুম ছুটে যাচ্ছে, তখন অন্যধারে পাড়ার ছেলেরা দাদাকে দেখতে পেলেই 'ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী' বলে চিৎকার করে ক্ষ্যাপাত। ব্রহ্মজ্ঞানী শব্দটা শুনলেই চনমন করত দাদা, বড় বড় চোখে চারদিকে তাকাত। অবিরল কথা বলতে থাকত। অর্থহীন কথা। বোঝা যেত, সে যা বলতে চায় তা বাক্য হয়ে বেরোচ্ছে না। কিন্তু সে একটা বিশেষ কথা বলতে চায়। তার কিছু বলার আছে। সেই সময়ে দাদার চোখ ছিল অনেকটা নয়নেরই মতো। শ্যামার মাঝে মাঝে নয়নকে ডাক্তারের সেই কথাটা বলতে ইচ্ছে করে—তোমার পাগলামির শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই, তা বুঝতে পারছ না নয়ন। কিন্তু তা বলে না শ্যামা। বললে নয়ন বুঝি সত্যিকারের পাগলই হয়ে যাবে।

নয়ন দু' পা এগিয়ে এসে বলে, কার জন্য গোলাপ?

শ্যামা কিছুক্ষণ তার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলে, তুমি কেন এসেছ নয়ন?

আগে বলো গোলাপ কার জন্য?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে, নয়ন, তোমাকে দেখলে বাবা কী রকম ক্ষেপে যায় জানো তো! গত মাসেও একবার প্রেসার দু'শো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। উত্তেজনা বাবার পক্ষে ভাল নয়। তোমাকে কতবার বলেছি!

নয়ন তার অকপট মুখে হেসে বলে, যখন গোলাপটা তুলছিলে তখন কার কথা তোমার মনে পড়েছিল শ্যামা?

আমার বাবার জন্য তোমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। শ্যামা রেগে গিয়ে বলে, কোনওদিন তুমি অন্যের কথা ভাবো না। তুমি খুব বাজে হয়ে গেছ, দিন দিন আরও বাজে হয়ে যাচ্ছ।

কপালের ওপর এসে-পড়া ঝুরো চুলের একটা গুছি টেনে নিয়ে আঙুলে জড়াতে জড়াতে গম্ভীর

হয়ে নয়ন বলে, আমি কেবল গোলাপটার কথা জানতে চাইছি শ্যামা। কার জন্য ওটা তুলেছ?

তুমি ফিরে যাও।

শ্যামা, তোমার বাবা আমাকে দেখতে পাবে না, ভয় নেই। আমি তোমাদের রাস্তায় যাব না। আমি যাব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ছায়ার মতো। পাখির ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি ছাড়া কেউ বুঝবেই না যে আমি আছি।

বলে নয়ন সেই অকপট হাসি হাসে।

শ্যামা রেগে গিয়ে বলে, আমিও তো তোমাকে চাইছি না নয়ন। তোমার একটুও আত্মসম্মানবোধ নেই কেন?

নয়ন অবাক হওয়ার ভান করে বলে, আমাকে চাইছ না। তবে গোলাপটা কার জন্যে?

তুমি নও, সে তুমি নও।

সেই রকম অবাক হওয়ার ভান করে নয়ন বলে, নই? আমি নই? কেন নই শ্যামা?

তোমার কথা আমার মনে থাকে না।

খুব থাকে। বলে নয়ন হাসে, তুমি আমাকে ভয় পাও।

তুমি ফিরে যাবে না?

তুমি আমাকে ভয় পাও কেন? তোমার অতগুলো পুরুষ বন্ধুর কাউকে তো তুমি ভয় পাও না।

তোমাকেও পাই না।

পাও, আমি জানি।

শ্যামা স্তব্ধ হয়ে নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তার পর বলে, ভয় পেলে তোমার জন্য একা দাঁড়িয়ে থাকতাম না।

নয়ন ভ্রূ তুলে চোখ বড় করে বলে, আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলে! তবে ফুলটা তুলবার সময়ে আমার মুখ তোমার মনে ছিল শ্যামা?

ইয়ার্কি কোরো না নয়ন। আমি সিরিয়াসলি বলছি, আমার মন ভাল নেই।

কেন?

তুমি সব সময় কেন আমার পিছু নাও? তুমি তো জানো কোনও লাভ নেই! কায়স্থের সঙ্গে আমার বাবা বিয়ে দেবেন না। তোমাকে দেখলে বাবার প্রেসার বেড়ে যায়।

নয়ন তেমনি অকপট হাসিমুখে বলে, তোমার বাবা জাত মানলেও তো তুমি আর মানো না শ্যামা! তোমার বাবা আর ক'দিন? ততদিন বরং অপেক্ষা করব।

শ্যামা মুখ নামিয়ে অসহায়ভাবে বলে, নয়ন, তুমি বয়সে আমার ছোট।

ছোট!

শ্যামা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তুমি চলে যাও!

আগে বলো।

বলব না।

মেয়েরা বয়স লুকোয় অন্যের কাছে আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে। আমার কাছে তো তোমার সে ভয় নেই! তুমি তো আমাকে আকর্ষণ করতে চাও না! আমাকে তোমার ডেট অফ বার্থ বলতে ভয় কী?

অনেকক্ষণ পরে শ্যামা এই প্রথম হাসল, বলল, নয়ন, স্কুল ফাইন্যাল সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমার বয়স চব্বিশ।

নয়ন গম্ভীর মুখে বলে, আমারও তা-ই।

শ্যামা হেসে বলে, না, তোমার আরও কম। তা ছাড়া সার্টিফিকেটে আমার বয়স আরও দু' বছর কমানো আছে। আমার এখন ছাব্বিশ।

নয়ন হাসে, আমারও কমানো আছে, তিন বছর। আমার এখন সাতাশ।

না! তোমার এখন বাইশ কি তেইশ।

সাতাশ। বলে নয়ন হাসে। তার পর আস্তে আস্তে গম্ভীর হয়ে যায়। ব্যথিত মুখে বলে, জাত বা বয়স কিংবা তোমার বাবার মতামত এর কোনওটাই তোমার প্রবলেম নয় শ্যামা, আমি জানি। তোমার আসল প্রবলেম কী?

শ্যামা ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থাকে, তার পর বলে, তুমিই আমার চারদিকে প্রবলেম তৈরি করছ। তুমি ছাড়া আমার আর কোনও প্রবলেম নেই। তুমি দয়া করে চলে যাও।

নয়ন তার সরল হাসিটি হেসে, শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বলে, শ্যামা, আমি ব্রাহ্মণ, আমার বয়স সাতাশ।

তার মানে?

নয়ন শ্যামার মুখখানা তার কটাসে চোখে পান করতে করতে বলে, জাত বা বয়স দুটোই হচ্ছে ইমাজিনেশন, বেহেড কল্পনা। এক সময়ে সমাজের প্রয়োজনে জাত ভাগ করা হয়েছিল। সেটা ছিল একটা আইডিয়া, সেই সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এখন সমাজ বদল হয়েছে, সেই প্রয়োজন আর নেই। রক্তের বিশুদ্ধতাও আর টিকছে না শ্যামা। মেডিকেল কলেজে যাও, দেখবে, কত কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রের রক্ত কত ব্রাহ্মণের শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। জাত-ফাত একাকার হয়ে যাচ্ছে।

আমি তোমার মতো ডাক্তারি পড়িনি নয়ন। ওসব জানি না। আমার বাবা—

নয়ন সে কথায় কান না দিয়ে বলে, আর বয়স শ্যামা? বয়স আর একটা ইমাজিনেশন। মানুষের যে রূপান্তর হয়, পৃথিবীর যে পরিবর্তন হয় সেটা দেখেই মানুষ সময় নামে এক আপেক্ষিক কল্পনাকে আবিষ্কার করে। নইলে, সময় বলে যে সত্যিই কিছু আছে, তার কোনও প্রমাণ নেই। ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের রূপান্তরই হচ্ছে সময়। যদি রূপান্তরকেই সময় বলে ধরো, যদি পরিবর্তন বা অভিজ্ঞতাই বয়স হয় তবে বলি, আমার পরিবর্তন হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা, বিপুল—সে হিসেবে আমার বয়স বোধহয় পঞ্চাশ-ষাট।

অত কথা শোনার সময় আমার নেই নয়ন, বাবা-মা আমাকে না দেখে এক্ষুনি অস্থির হবে, হয়তো ফিরে আসবে।

সে কথাতেও কান দেয় না নয়ন। শ্যামার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, সেবার যখন কয়েকজন শুয়োরের বাচ্চা আমাকে ইউনিভার্সিটির পাশের গলিতে ছোরা মারে তখন মেডিকেল কলেজে আমার শরীরে যারা রক্ত দিয়েছিল—আমার সেই চারজন বন্ধুই ছিল ব্রাহ্মণ। আমার শরীরের অর্ধেক রক্তই তাদের দেওয়া। সে হিসেবে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি।

নয়ন, আমাকে যেতে দাও, তুমি চলে যাও।

শ্যামা, আমি ব্রাহ্মণ। আমার বয়স তোমার চেয়ে বেশি। এ কথা তুমি তোমার বাবাকে বলো।

ওটা তোমার কথা নয়ন, আমার কথা নয়। আমি বাবাকে বলব কেন?

নয়ন একটু হেসে বলে, ঠিক আছে, তবে বোলো না। কিন্তু অপেক্ষা করো শ্যামা, তোমার বাবা বেশিদিন নিশ্চয়ই বাঁচবে না; তার পর—

শ্যামার কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে, রাগে ঘেন্নায় সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে, বার বার তুমি বাবার মরার কথা তোলো কেন? নিজের ওপর তোমার ঘেন্না হয় না?

এক পা পিছিয়ে যায় নয়ন, তারপর তার অনাবিল হাসিটি হাসে। বলে, কেউ কি চিরকাল বেঁচে থাকে?

রাগে দুঃখে শ্যামার চোখ ছল ছল করে। অনেকক্ষণ সে চুপ করে চেয়ে থাকে নয়নের দিকে। গলার কান্না সামলায়, ঠোঁটের কেঁপে ওঠা থামায়। তারপর ধীর গলায় বলে, কবে তোমার এই পাগলামি বন্ধ হবে নয়ন?

যে দিন আমার লাশ পড়ে যাবে।

কথাটা শ্যামাকে চমকে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, ফিরে যাও নয়ন ফিরে যাও।

আমার কি ফিরে যাওয়ার জায়গা আছে শ্যামা? আমি তো সব ছেড়ে বেরিয়েছি। যে জায়গা থেকে রওনা হই সে জায়গায় কদাচিৎ ফিরে যাই। তুমি আমাকে চলে যেতে বলতে পারো, ফিরে যেতে নয়।

তাই যাও নয়ন চলে যাও।

নয়ন বলে, শ্যামা, তুমি খুব দুশ্চিন্তা কোরো না। আজ হোক, কাল হোক আমার লাশ একদিন পড়বেই। নিশ্চিত। তখন আর নয়ন তোমার পিছু নেবে না। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি শ্যামা, ততদিন আমি তোমার পিছু নেবই।

কেন নয়ন?

কী জানি কেন! তুমি এমন কিছু সুন্দর নও শ্যামা। তোমার রঙ শ্যামলা, নাক চাপা, খুঁজলে আরও কিছু ডিফেক্ট বেরবে, তা ছাড়া তোমার স্যটার অনেক। তোমার লাবণ্য থাকতে পারে, কিন্তু সে সব আমি লক্ষই করি না। তুমি যা, তোমাকে তার চতুর্গুণ করে দেখতে পাই। যেদিন আমাকে ওরা স্ট্যাব করে, সেদিন অনেকক্ষণ আমি হিন্দু হস্টেলের গেট থেকে কয়েক গজ দূরে গাছতলায় পড়ে ছিলাম। জ্ঞান ছিল, কিন্তু ডিলিরিয়ামের মতো অবস্থা। চারদিকে স্বপ্নের মতো অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, অ্যান্ড ব্লাড ড্রিপিং আউট। টিপ টিপ করে রক্ত পড়ছে তো পড়ছেই। শরীর থেকে নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে রক্ত। তার কুলকুল শব্দ পাচ্ছি। সেই সময়েও, সেই আশ্চর্য রকমের ভয় আর বিকারের মধ্যেও, তোমাকেই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম, একটা নির্জন মেঠো রাস্তা দিয়ে তুমি হেঁটে যাচ্ছ, কিংবা জানালার কাছে বসে চেয়ে আছ বাইরের এক মেঘলা আকাশের দিকে। সব ঠিক মনে নেই, কিন্তু বার বার তোমাকেই দেখছিলাম, মনে আছে। আতঙ্কে চিৎকার করে বলতে চেষ্টা করেছিলাম—শ্যামা, তুমি সাবধানে থেকো, ভীষণ বিপদ, তোমাকে যেন ওরা না পায়। আবার কখন হয়তো বলছিলাম—শ্যামা, আমি মরে যাচ্ছি, তুমি বিধবা হবে তো?

নয়ন তেমনি অনাবিল হাসি হাসে।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, এ সব আমাকে বোলো না নয়ন, আমার ভাল লাগে না।

তুমি গোলাপটা কার জন্য তুলেছ?

নয়ন, রাস্তা ছাড়ো, আমি অনেক পিছিয়ে পড়েছি। মা-বাবা নিশ্চয়ই আছেন। এক্ষুনি খুঁজতে আসবেন। তুমি চলে যাও। পিছু নিয়ো না।

আমি ছায়া হয়ে যাব শ্যামা, পাখি হয়ে যাব।

দয়া করো নয়ন, তুমি যাও।

দূর থেকে বাবার ডাক শোনা যায়—শ্যামা-আ—

নয়ন রাস্তা ছাড়ে না।

শ্যামা হাতের গোলাপটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এটা তুমি নেবে? নাও।

নয়ন হাত বাড়ায় না, বলে, নেব কেন? আগে বলো, কার মুখ ভেবে তুলেছিলে, কার নাম ভেবে!

তুমি নাও।

কেন নেব?

নাও। দিচ্ছি।

এই দেয়ার মধ্যে কোনও ইঙ্গিত নেই শ্যামা?

না।

তাহলে নিয়ে কী হবে?

রাস্তা ছাড়ো।

দাঁড়াও। তোমাকেও তাহলে একটা জিনিস প্রেজেন্ট করি। বলে পকেট থেকে ডিম দুটো বের করে নয়ন।

শ্যামা অবাক হয়ে বলে, ডিম? ও দিয়ে আমি কী করব?

খাও।

ডিম খাব কেন?

খাব বলে কিনেছিলাম, খেতে পারছি না। খালি পেটে খানিকটা তাড়ি খেয়ে খিদে মরে গেল। তুমি অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছ, তোমার খিদে পেয়েছে।

শ্যামা কুঁকড়ে গিয়ে বলে, না। ডিম নেব কেন? ডিম কেউ কাউকে প্রেজেন্ট করে নাকি? আমার খিদে পায়নি।

নয়ন একটু স্থির চোখে শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, এই ডিম দুটো দিলে এখনও এই দেশে কোথাও কোথাও রাতভর একটা আস্ত মেয়েমানুষের শরীর পাওয়া যায়, জানো?

শ্যামা লাল হয়ে বলে, তুমি... তোমার মুখে কিছুই আটকায় না নয়ন?

নয়ন ধীর স্বরে বলে, মিথ্যে কথা নয় শ্যামা, এই ডিম দুটোর যা দাম তা অনেকের কাছে অনেকগুলো পয়সা। আমি দেখেছি। আমার অভিজ্ঞতার বয়স অনেক।

তুমি বরং মেয়েমানুষের শরীর কিনো নয়ন, আমার পথ ছাড়ো, বাবা এসে পড়বে।

রাগ কোরো না শ্যামা, আমি শুধু ডিম দুটোর আপেক্ষিক দাম বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। দামটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার যা অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এ ডিম দুটোর দাম অনেকের কাছে অনেক, আবার কারও কাছে কিছুই নয়।

শ্যামা হেসে বলে, ফুলের বদলে ডিম?

নয়নও হাসে, ফুলের তুলনায় ডিম অনেক সলিড জিনিস শ্যামা। তুমি জিতে যাচ্ছ। নাও।

শ্যামা একটু ইতস্তত করে। কিন্তু সে জানে, নয়ন বড় দুরন্ত। বাবা এগিয়ে গিয়ে নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে আছে, তাকে না দেখে ফিরে আসবে। এসে যদি নয়নকে দেখতে পায় বাবা, তাহলে কী হবে। ইতস্তত করেও তাই ডিম দুটো নেয় শ্যামা। ব্যাগে ভরে রাখে। যদি এতে রাস্তা ছাড়ে নয়ন, যদি শ্যামাকে ছেড়ে দেয়!

ফুলটার জন্য হাত বাড়িয়েছিল নয়ন। নির্দোষ হাত, শ্যামা সন্দেহ করেনি কিছু। বাড়ানো হাতে ফুলসুদ্ধ শ্যামাকে ঘাড় কাত করে দেখতে দেখতে বোধ হয় নয়নের ভিতরে কিছু ফুঁসে উঠল। এক পলকে শ্যামার ফুলসুদ্ধ হাত ধরে তাকে টেনে নিল সে। শেকড় সমেত উপড়ে গেল শ্যামা। চারদিকটা যেন ঝোড়ো বাতাসে আবছা ধুলোটে হয়ে গেল, কিংবা একটা কুয়াশা ঘিরে ফেলল তাদের—এরকমই মনে হল তার। পরমুহূর্তেই সে নয়নের বিশুষ্ক ঠোঁট তার ঠোঁটে-গালে টের পেল। নয়নের গালের দাড়ি ঘষা খেল তার গালে, পরমুহূর্তে ঝুরো চুলওলা নয়নের মাথা তার কাঁধ থেকে গলার কাছে আশ্লেষে ডুব দিতে থাকে। তাড়ির ঝাঁঝালো গন্ধ পায় শ্যামা, সেই সঙ্গে বহুকাল ধরে রোদে পোড়া চামড়ার উষ্ণ গন্ধ, জামাকাপড়ে ঘাম আর ধুলোর সোঁদা গন্ধ। এমনটা এই প্রথম নয়। অন্তত তিন-চার জন পুরুষ তাকে ইতিপূর্বে আক্রমণ করেছে। নয়নও। তবু এই ঝড় ঠেকানোর কৌশল আজও শ্যামা সঠিক জানে না। মেয়েরা বড় অসহায়। তবু দু' হাতে সে নয়নকে প্রাণপণে রুখবার চেষ্টা করে। চেঁচায়। মারে।

নয়ন সহজে থামত না। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা বাচ্চা ছেলে খুব কাছ থেকেই চেঁচিয়ে বলে ওঠে, বাবা, দেখো—

নয়ন শ্যামাকে ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়। মারকুটে হিংস্র ভঙ্গিতে। মিথুনের

সময়ে বাধাপ্রাপ্ত সাপের মতো। নয়নের সেই সাপের মতো ভঙ্গি দেখে চোখ ফেরাতেই একটা সত্যিকারের সাপ দেখতে পায় শ্যামা।

দৃশ্যটা ভারী অদ্ভুত। ভাঙা, পোড়ো বাড়িটার আগাছার জঙ্গল ভেদ করে দু'জন ভাঙা পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একজন একটা বছর সাত-আটেকের বাচ্চা ছেলে, অন্যজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন গ্রাম্য চেহারার লোক। হাবার মতো দাঁড়িয়ে। ছেলেটার চোখের পলক পড়ছিল না। লোকটারও তা-ই। অদ্ভুত এই যে, লোকটার ডান হাতে লম্বা একটা জ্যান্ত সাপ। সাপের গলার কাছটা মুঠোয় ধরা, সেটা লোকটার হাতে দুটো প্যাঁচ খেয়ে ঝুলছে। আস্ত গোখরো।

শ্যামার বমি পাচ্ছিল হঠাৎ! লজ্জা লজ্জা! বাচ্চা ছেলেটা ওই কাণ্ড দেখেছে, লোকটাও! মথিত গোলাপটা পড়ে আছে রাস্তায়। একপলক দেখল শ্যামা। তার পরই গোলাপটাকে লাফিয়ে পার হয়ে ছুটল সে।

নয়নের মাথার ঠিক ছিল না। যে মুহূর্তে সে শ্যামাকে দু' হাতের ভিতরে পেয়েছে সেই মুহূর্তেই এই বাধা। কত কষ্টে তাকে শ্যামার এত কাছাকাছি আসার সুযোগ করে নিতে হয়। তাই প্রথমটায় রাগে তার ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। হয়তো ছুটে যেত সে, লোকটাকে লাথি মারত, ছেলেটাকে থাপ্পড়, যা নয়নের স্বভাব। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সে লোকটার হাতে ধরা জ্যান্ত গোখরোটাকে দেখে।

নয়নের ভিতরে একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে। যা কিছুর ভিতরে ভয়ঙ্করতা হিংস্রতা আছে তা সে ভালবাসে। যার মধ্যে বীরত্ব বা বেপরোয়া কিছু আছে সে নয়নকে মুহূর্তের মধ্যে টানে। লোকটার হাতে সাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা খুব অনায়াস দক্ষ সাহসীর ভাব ছিল। নয়নের রাগ বাতাসে উড়ে গেল, ফুলের মতো ঝরে গেল। একটু আগে শ্যামার দেহস্পর্শের আগুন নিভে গেল ভিতরে। সে শ্যামার হাত থেকে স্খলিত ফুলটার দিকে চেয়েও দেখল না। যে শ্যামার জন্য সে এত দূরে এসে রোদে দাঁড়িয়ে তীব্র পিপাসায় অপেক্ষা করেছে তার কথা ভুলেই গেল প্রায়। গালের একটা জায়গায় শ্যামার বাঁ হাতের লম্বা নখের একটা আঁচড় পড়েছে বুঝি! সেই জায়গাটা কেবল জ্বালা করছে।

গালে একবার হাত বুলিয়ে এক পা দু' পা করে লোকটার দিকে হেঁটে গেল নয়ন। লোকটার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা এখনও যায়নি। ছেলেটা এখনও হাঁ করে আছে। কৃতকর্মের জন্য তবু একটুও লজ্জা পায় না নয়ন। কোনও জবাবদিহি করারও চেষ্টা করে না। তার গলার স্বরও ঠিক থাকে।

একটু হেসে সে জিজ্ঞেস করে, সাপটা ধরলেন?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ।

কোথায় ছিল?

লোকটা পোড়ো বাড়িটার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, এখানে। এখনও বিস্তর আছে!

কামিয়েছেন?

না, সদ্য ধরলাম তো।

জাত গোখরো। দেখি।

লোকটা সাপটা তুলে দেখায়। নয়ন ঝুঁকে খুব কাছ থেকে দেখে। গভীর শ্বাসের শব্দ করে সাপটা। না এখনও কামানো হয়নি! দুটি সূক্ষ্ম দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে। নয়ন হাসে।

বিষের থলি মনে হয় ভর-ভরন্ত! নয়ন বলে।

আজ্ঞে।

এটাকে নিয়ে কী করবেন?

লোকটা একটু হাসে। ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। নিজের ছেলের দিকে একটু চেয়ে দেখে। তার পর বলে, ছেড়ে দেব।

না কামিয়ে? বলে ভ্রূ ওপরে তোলে নয়ন।

না কামিয়ে ছাড়লে ব্যাটা রুখে আসবে। কামিয়েই ছাড়ব। তার আগে ক'ফোটা বিষ ঢেলে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কৌতূহল বোধ করে নয়ন। বলে, দেখি, কী করে নেন।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাবে না? উনি তো এগিয়ে গেলেন!

কে? নয়ন বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে।

লোকটা চোখের পাতা নামিয়ে বলে, ওই উনি, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন!

শ্যামার কথা মনে পড়ে নয়নের। বিদ্যুৎচমকের মতো। কিন্তু এতক্ষণ মনেই ছিল না। একটু হাসে নয়ন। তার পর বলে, এগিয়ে যাক না। ঠিক ধরে ফেলব পা চালিয়ে। মোনা ঠাকুরের কাছে যাবে, বেশি দূর তো নয়।

ও। মনস্কামনা আছে বুঝি!

আছে।

লোকটা উদাস গলায় বলে, অনেকে আসে। মোনা ঠাকুরের খুব বাড়বাড়ন্ত এখন।

চেনেন?

না চিনবার কী? আমি তো কল্পতরু মন্দিরের পাশেই থাকি।

কী করেন? সাপ খেলান?

লোকটা হাসে, না। সাপ ধরা শিখেছি অনেক কষ্টে। এ আমার শখ। মাঝে-মধ্যে বিষ বেচি, ওষুধ কোম্পানিগুলো কেনে। বলে ছেলের দিকে চেয়ে বলে, সুকুল, কৌটো-বাউটো বের কর।

ছেলেটার কাঁধে একটা ঝোলা। তা থেকে বড় মুখওয়ালা একটা শিশি বের করে আনে। শিশির মুখে পাতলা বেলুন বা ওই জাতীয় কিছুর একটা রবারের ঢাকনা সুতো দিয়ে টান করে বাঁধা। শিশিটা বাঁ হাতে ধরে লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হেসে বলে, তেমন কিছু কান্ড না। দেখুন।

সাপটা হাঁ করেই ছিল, মুখের কাছে শিশিটা আনতেই নড়ে উঠল। দাঁতের কাছে বিষ ঢালার মতো কিছু একটা সে এখন চায়। রাগে আক্রোশে লেজের ঝাপটা মারে। কী সুন্দর সরু ভয়ংকর দাঁত, কী দক্ষতা তার দাঁতে! পাতলা রবার নিঃশব্দে ভেদ করল দাঁত দুটো। লোকটা শিশি সমেত সাপটাকে উঁচু করে দেখাল। নয়ন দেখে, শিশির মধ্যে হালকা রঙের দুটি ফোঁটা পড়ল। লোকটা শিশিটা ছাড়িয়ে নিয়ে নয়নকে দেখায়। বলে, অয়েল প্রোটিন।

নয়ন ওই শব্দ দুটো শুনে বড় চোখে চায়। বলে, আপনি অনেক জানেন দেখছি।

কিছুই না। ও সবাই জানে।

লোকটার হাতে ছেলেটা একটা চাকু ধরিয়ে দেয়। যেভাবে ছেলেরা পেন্সিল কাটে সেরকম অনায়াসে মুখের কাছে সাপের মাথাটা তুলে লোকটা দুটো মোচড়ে দাঁত উপড়ে আনে। ছোট্ট দুটি দাঁত, উপড়ে আনার পর কেমন নিরীহ দেখায়। সুকুল নামে ছেলেটি একটা কাগজে দাঁত দুটো সাবধানে মুড়ে ঝোলায় রাখে। সাপটা ছটফট করে। লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে একটু হাসে। বলে, ওদের দাঁত ওপড়ালে ব্যথা যেমন পায়, আরামও পায় তেমনি। দাঁত দুটো টন টন করে তো! যত বিষ ওদের দাঁতে। মানুষের কোথায় বলুন তো!

নয়ন উত্তর দেয় না। চেয়ে থাকে।

লোকটা সাপের লেজ আর মাথা দু'হাতে চেপে ধরে কী একটু বিড় বিড় করে বলে। তারপর আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে সাপটাকে ঘাসের ওপরে ছেড়ে দেয়। প্রাণ পেয়েই যেন বিশাল লকলকে গোখরো ফুঁসে উঠে ঘাসময় তার কিলবিলে ভয়ংকর গতি ছড়িয়ে দিয়ে একবার ফণা তোলে। নয়ন এক লাফে পিছিয়ে আসে। লোকটা সাপটার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে। সাপটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফণা

নামিয়ে নেয়, তার পর মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে যায়, স্বচ্ছন্দে পার হয় দেয়াল, লম্বা দূর্বাঘাস আর আগাছার জঙ্গলে ঢেকে যায়।

নিঃসাড়ে সাপটাকে দেখছিল নয়ন। চোখ তুলতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সাপটা হাতে ছিল বলেই এতক্ষণ লোকটাকে ভাল করে দেখা হয়নি। এখন চেয়ে দেখল নয়ন, পরনে মোটা কাপড় খাটো করে পরা, গায়ে হাফ-হাতা শার্ট, খালি পা, মাথার চুল যাত্রাওয়ালাদের মতন ঘাড় পর্যন্ত লম্বা। মুখখানা চৌকো, ভাঙা, কিন্তু তা রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য নয়। যারা শরীর খাটায় তাদের শরীরে একরকম মেদহীন রুক্ষতা থাকে। এ লোকটারও তা-ই। নয়নের তুলনায় লোকটা লম্বা, ঘাড়টা মোটা, হাত দু'খানায় শিরা আর পেশি কিলবিল করছে। চওড়া কাঁধ। কিন্তু চোখ দু'খানা বড় নিরীহ, মায়াময়। এতটা স্বাস্থ্য থাকলে মানুষ এমনিতেই একটু মারমুখো হয়। কিন্তু লোকটা তা নয়।

একটুক্ষণ চোখে চোখে চেয়ে রইল নয়ন। কবে যেন নয়নের চোখ ছিল সাধারণ, তাতে আগুন খেলা করত না, তাতে ভাবালুতা ছিল, স্বপ্ন-দেখা ছিল, সেই চোখে মায়া-মমতাভরে চারদিককে দেখার প্রবণতা ছিল তার। কিন্তু সে যেন এক দূর অতীতের কথা। মাত্র চব্বিশ কি তারও কম বয়সে নয়নের কত রূপান্তর হয়ে গেছে। এখন নয়ন জানে, তার চোখে কেউই খুব বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারবে না। আয়নায় নিজের মুখ অনেক দেখেছে সে কিন্তু পরিবর্তনটা কিছুতেই কখনও সে ধরতে পারে না। কিন্তু জানে, জেনে গেছে, তার চোখে একটা বিপুল পরিবর্তন এসে গেছে। তার মনের ছায়া চোখে পড়ে। সেখানে আগুন খেলা করে এখন। লোকটা কিন্তু চোখ সরিয়ে নিল না। চেয়ে রইল। মনে মনে নয়ন লোকটাকে বলল, সাবাস! প্রায় বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছ হে বাপু, নয়নের চোখে এতক্ষণ কেউ চোখ রাখে না।

মুখে খুব সাধারণ পথ-চলতি কথার মতো জিজ্ঞেস করল, কী করেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে, চাষবাস, বললাম তো! আর মাঝে মাঝে সাপ ধরি। বুনো পাতা থেকে ওষুধ তৈরি করি নানারকম। আর, ছেলের সঙ্গে খেলা করি। এই যে সুকুল, এ আমার ছেলে।

শেষ কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলে লোকটা, যেন ছেলের পরিচয়টা দেওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি। মানুষের নানা দুর্বলতা থাকে। নয়ন বলে, আপনাদের এ জায়গাটা বেশ।

গাঁ-গঞ্জ জায়গা, ভদ্রলোকের উপযোগী নয়। বেশ আর কী।

ইলেকট্রিক নেই এদিকে?

কী যে বলেন!

অনেক গাঁয়ে আছে।

এদিকে নেই।

বি ডি ও অফিস?

সে অনেক দূর। তিন মাইল পুবে চকখালি, সেইখানে।

থানা?

লোকটা নয়নের দিকে একটু চেয়ে থেকে হেসে বলে, সেও দূর!

এদিকটায় তবে আছে কী?

আছে মোনা ঠাকুরের জাগ্রত কালী, যা দেখতে বহু লোক আসে। আর আছি আমরা, জঙ্গল আছে, সাপ আছে, আর কী থাকবে গাঁয়ে-গঞ্জে। চলুন দেখে আসবেন, বেশি দূর নয়। আপনার লোকও তো এগিয়ে গেল।

অন্যমনস্ক নয়ন জবাব দিল, হুঁ।

কে হয় আপনার?

কার কথা বলছেন? নয়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

ওই যে উনি, যিনি সঙ্গে ছিল আপনার।
হয় কিছু। বলে নয়ন একটু হাসে।
কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে লোকটা বলে, উনি ফুলটা ফেলে গেছেন। কুড়িয়ে নেবেন না?
নয়ন রাস্তার ওপর পড়ে থাকা ফুলটাকে একটা লাথি মেরে বলে, ফুলের অভাব নেই দেশে।
লোকটা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, ঠিক কথা, তা ছাড়া ফুলের তেমন বাসও নেই। লতানে গাছের ফুল তো।
নয়ন গম্ভীর হয়ে বলে, হুঁ।
লোকটা বলে, বর্ষাকালের ফুল ফল সবই কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে, জলঢোপা।
এদিকটায় থাকার জায়গা পাওয়া যায়?
যাবে না কেন? মোনা ঠাকুরের কল্পতরুর মন্দিরে অনেক জায়গা। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকা যায়। থাকবেন?
নয়ন মুখ তুলে বলে, ভাবছি থাকলে কেমন হয়।
লোকটা হেসে বলে, আপনারা শহর-বন্দরের মানুষ, থাকতে পারবেন না। ওদিকটায় ভদ্রলোকের বাস নেই।
ভদ্রলোকদের মুখে পেচ্ছাপ করি।
ছেলেটা নয়নের কথা শুনে হি হি করে হেসে ওঠে।
কী হল সুকুল? লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে।
পেচ্ছাপ করবে বলছে। মুখে! হ্যাঁ বাবা! ছেলে হেসে কুটিপাটি।
তুমি পা চালিয়ে চলো তো। আমরা পেছু পেছু যাচ্ছি, দম ধরে তুমি খানিক দৌড়ও। লোকটা তার ছেলের পিঠে আলতো চাপড় মেরে এগিয়ে দিতে চেষ্টা করে।
আমি তোমাদের কথা শুনব।
তার চেয়ে দৌড়লে কাজ দেবে। বড়দের সব কথায় কান দিতে নেই।
মুখে কী করে পেচ্ছাপ করবে বাবা, অ্যাঁ?
নয়ন ছেলেটার দিকে ঝুঁকে বলে, ভদ্রলোকদের মুখে কী করে পেচ্ছাপ করতে হয় তা আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। তার বদলে তোমার বাবা আমাকে সাপ ধরতে শেখাবেন।
তারা খানিক চুপচাপ হাঁটে। লোকটা একবার নয়নকে সতর্ক করে দেওয়ার ইংগিত করে বলে, সুকুল কিন্তু আমার ছেলে। ওর সামনে—
কথাটা লোকটা শেষ করে না। নয়ন একটু হাসে। তার পর বলে, আমি ভদ্রলোক নই।
নন?
না।
কেন নন?
পোষায় না।
কিন্তু আপনি তো ভদ্রলোকের মতোই দেখতে, শহরের বাবুভেয়েরা যেমনটি হয়।
সে পোশাকে। ভিতরে আমি অন্য মানুষ।
কলকাতা থেকে আসছেন তো?
নয়ন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, আসছি। কিন্তু সে আমার আগের সাকিন। আসলে আমার জীবন কাটে গাঁ-গঞ্জেই। কলকাতার লোকমাত্রই ভদ্রলোক নাকি!
লোকটা একটু ভেবে বলে, তা অবশ্য নয়। কিন্তু ভদ্রলোকরা যেখানেই থাকুন তাদের জাত যে আলাদা তা দেখলেই বোঝা যায়। সে জাত তো আপনার ঘোচে নি।
ও হচ্ছে গায়ের ঘেমো-গন্ধের মতো, সহজে যায় না।

লোকটা হাসে। ছেলেটাও খি-খি করে হাসে, বলে, ঘেমো-গন্ধ বাবা, কী বলছে দ্যাখো!

আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেবেন?

লোকটা উদাস গলায় বলে, শিখে কী করবেন?

শিখে রাখি। কখনও কাজে লেগে যেতে পারে।

কিছুই কাজে আসে না। আমি শিখেছি বিস্তর কষ্ট করে। সাপুড়েরা তাদের মন্ত্রগুপ্তি নিজেদের মধ্যে ধরে রাখে। আমি এক ওস্তাদের পিছনে বছরখানেক ঘুরে শিখেছি। কিন্তু ব্যাপারটা এত সোজা যে অত কষ্টে শিখবার দরকারই নেই।

কৌশলটা কী?

সাপ কোথায় থাকে তার আন্দাজ যে করতে পারে তার অর্ধেক শেখা হয়ে গেল। তার পরেরটুকু হচ্ছে সাপ সম্বন্ধে ভয়টাকে উড়িয়ে দিয়ে একটু সাহস করা। আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাতের তেলোয় চেপে ধরা। কই মাছ ধরার মতোই সোজা। সাপের দাঁত তার মুখে, সারা শরীরে তো নয়!

আমাকে শেখাবেন?

শেখাতে পারি।

আমার কিন্তু পয়সা নেই।

লোকটা হাসে, বলে, আমার খাওয়ার সংস্থান আছে, সবকিছু বেচি না।

যদি শেখান তো এদিকটায় ক'দিন থেকে যাই।

সঙ্গের লোকেরা?

ওরা আমার কেউ না।

লোকটা একটু থমকে যায়। কী যেন বলি বলি করেও বলে না। সুকুল চলতে চলতে অজান্তে নয়নের কাছে ঘেঁষে আসে। নয়ন তার দিকে একবার মিটিমিটি করে চায়। তার পর বাপ-ব্যাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ কোকিল-ডাক ডেকে ওঠে। কুহু-কুহু করে তার অবিরল এবং অবিকল মিষ্টি ডাকটি উঠে উঠে নেমে আসে হঠাৎ। স্তম্ভিত বিস্ময়ে ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ে! লোকটা মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আরে বাঃ। লোকটা বলে।

আমাকে শিখিয়ে দেবে? ছেলেটা জিজ্ঞেস করে।

দেব। তার বদলে তোমরা যদি আমাকে থাকতে দাও।

দেব। আমাদের বাড়িতে অনেক জায়গা।। ছেলেটা লাফিয়ে গিয়ে তার বাবার হাত ধরে ঝুলে পড়ে, অনেক জায়গা, না বাবা?

ওরা বাপ-ব্যাটা সামনে হাঁটছে, নয়ন পিছনে। লোকটা মুখ ঘুরিয়ে একবার নয়নকে দেখে নিয়ে বলল, এখানে থাকতে চান কেন?

এমনিই। জায়গাটা ভাল লেগে গেছে।

কাজকর্ম কিছু করেন না?

না। ডাক্তারি পড়তাম, ছেড়ে দিয়েছি।

ছাড়লেন কেন?

পোষাল না।

এখন তবে কী করে চলে?

চলে যায়। ওসব নিয়ে ভাবি না।

লোকটা একটু ভেবে বলে, এদিকে এসেছিলেন কেন?

চলে এলাম।

ওই মেয়েটা কে?

ও শ্যামা, আমার বহুকালের চেনা। আগে একই বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। এখন দূরে চলে গেছে ওরা। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।

লোকটা তার ছেলের পিঠে হাত রেখে বলে, সুকুল বাবা, তুমি আগে আগে হাঁটো।

সুকুল অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে হাঁটে। লোকটা নয়নের পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, তাই জঙ্গলের মধ্যে জাপটে ধরেছিলেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে, মোনা ঠাকুরের ওখানে বশীকরণ-টশীকরণ হয়?

লোকটা হেসে বলে, হয়।

বশীকরণ করতে কত টাকা লাগে?

ঠিক জানি না।

নয়ন সন্দেহের চোখে চেয়ে বলে, বশীকরণে কাজ হয় তো? না হলে কিন্তু মোনা ঠাকুরের মন্দির আমি ভেঙে দিয়ে যাব।

লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, মোনা ঠাকুরের মন্দির ভাঙা যায় না!

কেন?

আমি যেমন সাপ ধরি, মোনা ঠাকুর তেমনি মানুষ ধরে। আমি যেমন বিষ নিংড়ে দাঁত ভেঙে ছেড়ে দিই, তেমনি তিনিও মানুষের বিষদাঁত তুলে নেন।

হিপনোটিজ্‌ম্‌, না?

কে জানে!

আমি নয়ন রায়। মোনা ঠাকুরদের মন্দির ভাঙতেই আমার জন্ম। বলে নয়ন একটু আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসে।

লোকটা বলে, আর যদি মোনা ঠাকুরের বশীকরণে কাজ হয়, যদি মেয়েটাকে বশ করতে পারেন তো কী করবেন?

তাহলেও ভাঙব।

কেন?

নয়ন একটু হেসে বলে, শ্যামাকে বশ করতে যেমন চাই, তেমনি মোনা ঠাকুরদেরও উচ্ছেদ করতে চাই।

লোকটা একটু হেসে বলে, যদি দুনিয়া থেকে সব মোনা ঠাকুরের উচ্ছেদ করে দেন তাহলে আবার কাউকে বশীকরণ করার দরকার হলে মোনা ঠাকুরকে পাবেন কোথায়?

মোনা ঠাকুররা না থাকলে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি হবে না। থাকলেই বরং ক্ষতি।

তাহলে শ্যামার কী হবে?

কী হবে?

শ্যামাকে বশীকরণ করবে কে?

কেউ করবে না। তার দরকার হবে না। শ্যামাকে কেড়ে নেওয়ার মতো জোর আমার আছে।

তবে বশীকরণের কথা ভাবছেন কেন?

খুব চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে, ও এমনিই। মোনা ঠাকুরদের ক্ষমতা কতদূর তা একবার নিজের চোখে দেখতে চাই।

লোকটা হেসে বলে, কিছু ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই। উনি বাণ মারেন, মারণ উচাটন জানেন, বশীকরণ জানেন, কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এসে ধুলোয় গড়ায়। মাটি থেকে আধ হাত উঁচুতে উঠে শূন্যে বসে জপতপ করেন তিনি। বলে লোকটা নয়নের দিকে হাসিমুখে চেয়ে থাকে।

নয়ন ভ্রূ কুঁচকে সামনের দিকে চেয়ে থাকে। চিন্তাকুটিল মুখ, খুব অন্যমনস্ক। লোকটার কথা তার কানে গেছে বলে মনে হয় না।

জঙ্গল ক্রমে শেষ হয়ে আসে। আমবাগানের শেষে একটা মাঠ কোনাকুনি পার হয়ে, একটা বড় পুরনো দীঘির কালো জলে নিজেদের ছায়া ফেলে, উত্তরে কয়েকটা ঢিবি, গড়খাইয়ের মতো জায়গা পেরিয়ে সুপুরি বাগান পায় তারা। সেই বাগান পেরোলে একটা শ্যাওলা ধরা পুরনো মন্দির দেখা যায়।

লোকটা নয়নের দিকে ঝুঁকে বলে, দেখেছেন! ওই হচ্ছে মোনা ঠাকুরের আস্তানা। নয়ন গম্ভীরভাবে বলে, হুঁ।

লোকে কয় মাটির পুত্‌লা, কালী আমার মাটির পুত্‌লা। ঢ্যাস্ করে ফেলে দ্যান জলে, ভুস্ করে ডুবে যাবে। তো সব ঠিক। কিন্তু মায়ের গলার মালাখানা মোর ঘোরে কেন রে? বন বন করে ঘোরে কেন মালাখানা? হ্যাঁ? বলে মোনা ঠাকুর একটু হাসে।

মন্দিরের পাশে চৌকো ঘরখানা। সামনে বাঁধানো চাতাল। সেখানে কয়েক জোড়া ছাড়া জুতো। চাতালের ওপাশে বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মতো হিলহিলে শরীরের সুপুরিগাছের সারি। ঘেঁটুবন, আশশ্যাওড়া আর ভাটগাছের জঙ্গল। চারদিক কেমন ঠান্ডা, নিঝুম। শ্যামা আঁচলখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসে।

বাঁশের বেড়ার ওপর মাটির আস্তরণ, তাতে চুনকাম করে ঘরের দেয়াল তৈরি হয়েছে। ওপরে টিনের চাল, মেঝে বাঁধানো। ছেঁড়াখোড়া শতরঞ্চি পাতা। কয়েকটা পাটির আসন। শতরঞ্চিতে মোনা ঠাকুর বসে আছে। গায়ের রঙ তামাটে, বড় বড় চুল, গালে ছাঁটা দাড়ি, তাতে সাদা ছোপ ধরে এসেছে। মুখখানা লম্বাটে, ভাঙা, কিন্তু তার একটা কমনীয় সৌন্দর্য আছে। হাসলে মোনা ঠাকুরকে খুব সরল মনের লোক মনে হয়, গম্ভীর হলে মনে হয় চিন্তাশীল। খালি গায়ে পৈতেটা খুব সাদা দেখায়। বুকে, হাতে, কাঁধে, কানে, নাকে প্রচুর লোম। শরীরের বাঁধুনি কৃশ, কিন্তু শক্ত। পরনে পরিষ্কার একখানা ধুতি। পাশে বিড়ির বান্ডিল আর দেশলাই। মোনা ঠাকুরের মুখে বিড়ি নেভে না। একটা ফেলেই আর একটা ধরায়।

মোনা ঠাকুরের একেবারে সামনে দুটো পাটিতে বাবা আর মা বসে আছে। আশেপাশে আরও দু'চারজন গাঁইয়া লোক। তাদের মুখ চোখ হাবাগোবা, চোখে ভয় আর ভক্তি।

দরজার পাশে একটা পাটিতে বসে ছিল শ্যামা। তার মন ভাল নেই। একটু অন্যমনস্ক হয়ে সে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে ছিল।

মোনা ঠাকুর একটু দুলে বলে, লোকে বলে মাটির পুত্‌লা। তো তা-ই। তবু কালী আমার হাঁটে-চলে, খায়-দায়, চুল ফেরায়, চান করে, আমার কালীর মন খারাপ হয়, কাঁদে-হাসে। পাগ্‌লি।

বাইরে একটা মেঘের ছায়া পড়েছে। চাপ বাঁধা গাছপালা আর জঙ্গল। দিনের বেলায়ও প্রবল ঝিঁঝি ডাকছে। গাছপালাগুলো অন্ধকার সব ছায়া ফেলেছে। ওই আলো-আঁধারির কোথাও নয়ন লুকিয়ে আছে। সারা রাস্তা যত পাখির ডাক শুনেছে শ্যামা, যত দূরাগত শব্দ শুনেছে তত সে চমকে চমকে উঠেছে। মনে হয়েছে, পাখি নয় নয়ন। সব শব্দই করছে নয়ন। সেই হরবোলা তার বিচিত্র সব শব্দ তুলে শ্যামার চারদিকে একটা জাল তৈরি করছে। শ্যামার মন ভাল লাগে না।

মোনা ঠাকুর বাবার দিকে চেয়ে বলে, বাবুমশায়, আপনি কি ছেলের খবরের জন্য এসেছেন?

একটু চমকে ওঠে শ্যামা। লোকটা জানল কী করে? তারা যে দাদার খবরের জন্য এসেছে তা তো বলেনি।

বাবা একটু স্তব্ধ হয়ে তার পর ধরা গলায় বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। আপনি তো অন্তর্যামী।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, অষ্টাসিদ্ধির দুটো সিদ্ধি হলেই এসব বলা যায়। কিছু না বাবুমশাই।

লোকের চোখে-মুখে সমিস্যের কথা লেখাই থাকে। সেটা পড়ার মতো অক্ষরজ্ঞান থাকলেই হল। ওই মেয়েটি কি আপনারই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোনা ঠাকুর হেসে বলে, তা মেয়ের মুখ অত ভার কেন? এ জায়গা ভাল লাগছে না মা? ভয় করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে জানায়, না। তার পর একটু হাসে।

ভয় নেই মা, আমার কালীমায়ের আওতায় বিপদ-আপদ নেই। সাপখোপের মুখে আপনা থেকেই বন্ধন পড়ে যায়, চোর-বদমাশরা অসাড় হয়। যাও মা, ঘুরে-টুরে জায়গাটা দেখে এসো। পশ্চিমে একটা সুড়ঙ্গ আছে, অনেকটা যাওয়া যায় ভিতরে, দক্ষিণে শিবমন্দির আছে। দাঁড়াও, সঙ্গে লোক দিচ্ছি। বলে মোনা ঠাকুর ভিতর-বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকে, তারা, ওরে তারা—

ডাক শুনে উনিশ বছরের একটা লালপেড়ে শাড়িপরা লাজুক মেয়ে এসে ভিতরের দরজায় দাঁড়ায়।

এই মাকে নিয়ে যা তো, সব দেখিয়ে আন। যাও মা, ওই আমার মেয়ের সঙ্গে যাও। কোনও ভয় নেই।

শ্যামা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। উঠে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে তার মন থম ধরে আছে। মুখে কতকগুলি উষ্ণ স্পর্শ এখনও ফোস্কার মত লেগে আছে। মন ভাল নেই।

কোথায় একটা বেড়াল কাঁদছে। মেয়েটির সঙ্গে বাইরে যাবে বলে পা বাড়িয়েও থেমে গেল শ্যামা। নয়ন! নয়ন নয় তো? আতঙ্কিত মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী ডাকছে?

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে তাকে দেখছিল, হেসে বলল, বেড়াল। আমাদের বেড়ালটার বাচ্চা হারিয়ে গেছে, কাঁদছে কাল থেকে।

চাতালে পা দিতেই বাতাস লাগল। বাতাসটা হিম। চারদিকে বেশি গাছপালার জন্যই বোধ হয়।

শ্যামা বলল, তবে যে শুনলাম, মোনা ঠাকুর বললেন, এখানে কোনও অমঙ্গল হয় না। বেড়ালটার বাচ্চা তাহলে চুরি গেল কেন?

মেয়েটি খুবই সাধারণ। গিন্নি-বান্নির মতো ঢিলে করে ফেরতা ঘুরিয়ে শাড়ি পরেছে। কপালে তেল-সিঁদুরের বড় একটা টিপ। সিঁথি সাদা। মুখে সরলতা আর বিস্ময়। শ্যামার সাজগোজ দেখছে বার বার। প্রশ্ন শুনে চোখ দুটো বড় করে বলে, মানুষকে সাহস দেওয়ার জন্য বাবা অনেক সময় ওরকম সব কথা বলেন। নইলে এখানেও কত ঘটনা হয়। আমারই এক ভাই তো চার বছর আগে কলেরায় মারা গেছে।

তাহলে কি ওসব মিথ্যে কথা?

মেয়েটা ঠিক-ঠাক জবাব দিতে পারে না। কিন্তু সরল মুখে সে খুব হাসে। তার পর বলে, না, বাবা ঠিক মিথ্যে কথাও বলে না। যার বিশ্বাস আছে, তার অমঙ্গল হয় না।

তবে আপনার ভাই মারা গেল কেন? মোনা ঠাকুরের তো বিশ্বাস আছে।

মেয়েটা হেসেই বলে, ওসব আমি ঠিক বুঝি না। বাবা আমাদের সঙ্গে তো বেশি কথা বলে না। কী করে জানব বলুন! আমরা শুধু জানি, বাবার কাছে অনেক লোক আসে, বাবা তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

শ্যামা চাতালের সিঁড়িতে পা দিয়ে বলে, কালীর গলার মালা সত্যিই ঘোরে?

মেয়েটা বলে, আমরা তো ওসব দেখতে পাই না। বাবা যখন পুজো করে তখন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর।

যাঃ, আমি তো কালো।

খুব কালো না। তবে ফর্সা হলে আপনি ঠিক রাণীর মতো হতেন। আজকাল কলকাতায় গয়না পরার চল নেই, না?

কেন?

আপনি তো পরেননি।

আমার বেশি গয়নাই নেই। তা ছাড়া দিনকাল তো ভাল না, গয়না পরলে যদি চোর-ডাকাত পিছু নেয়?

আপনি যা সুন্দর! চোর-ডাকাত না হোক ছেলে-ছোকরা পিছু নেবেই।

শ্যামা একটু গম্ভীর হয়ে যায়।

আপনি এটা কী শাড়ি পরেছেন? শিফন?

না, এটা কমদামি শাড়ি। ব্রাসো।

মেয়েটার হাসি তার চোখেও উপচে পড়ে। সে মিটমিটে হাসিচোখে চেয়ে বলে, আমাদের কিন্তু ওসব জোটে না। পুজোর শাড়িই পরি আমরা। এই দেখুন না পরে আছি, লালপেড়ে। তার ওপর আবার খাটো।

বলে খুব হাসে। শ্যামার তক্ষুনি মেয়েটাকে ভাল লাগতে থাকে। সে সমবেদনার গলায় জিজ্ঞেস করে, কেন, ভাল শাড়ি আপনার পরতে নেই?

বাবা পরতে দেয় না, কিনে দেওয়ারও লোক নেই।

গ্রামদেশে ভাল শাড়ি পাওয়া যায় না?

মেয়েটা মাথা হেলিয়ে বলে, খুব যায়। কলকাতায় নতুন শাড়ি বেরোলে তিন দিনের মধ্যেই এদিকে চলে আসে। গাঁয়ের মেয়েরা সবাই পরে। আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে তো, আমাদেরই জোটে না।

মন খারাপ লাগে, না?

লাগবে না? সাজগোজ করার বয়সই তো এটা, নয়?

শ্যামা একটু হেসে বলে, বিয়ে হলে পরবেন, তখন তো আর বাধা থাকবে না।

বিয়ে কে দিচ্ছে!

কেন?

বাবা তার কালী ছাড়া কিছু বোঝেই না। আমি কত বড়টা হয়ে যাচ্ছি কে খেয়াল রাখে! মা ভয়ে বিয়ের কথা তোলে না। এই করেই আমার দিদি একটা বাজে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেল।

শ্যামা একটু থমকে গিয়ে বলে, সে কী!

সত্যিই।

শ্যামা একটু হেসে বলে, তবে তো মোনা ঠাকুরেরই সমস্যা অনেক!

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, না। বাবার কোনও সমস্যা নেই।

এগুলোই তো সমস্যা। যার বেড়ালের বাচ্চা মরে যায়, মেয়ে পালিয়ে যায়, সেই তো সত্যিকারের দুঃখী লোক। সে কী করে অন্যের ভাল করবে?

মেয়েটা একটু উদাস গলায় বলে, কিন্তু তবু বাবার কোনও সমস্যা নেই।

কেন?

মেয়েটা মুখে আঁচল দিয়ে হেসে বলে, আসলে আমরা তিন বোন, আমার মা, আমাদের মরা ভাইটা, আমাদের বেড়াল, এরা বাবার কেউ না। বাবা হচ্ছেন মোনা ঠাকুর, মস্ত ভক্ত সাধু। আর আমরা, তার পরিবারের লোকেরা হচ্ছি এই আপনাদের মতোই বাইরের লোক, বদ্ধ জীব। বাবার কাছে আপন-পর বলে ভেদ নেই। যেদিন আমার ভাই মারা যায় সেদিন বাবার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। বাবা ওই চালাতে বসে লেবুকাঁটা দিয়ে সেই কাঁটা তুলছিল। দৌড়ে গিয়ে যখন বাবাকে

খবর দিলাম তখন কাঁটা তোলা হয়নি। বাবা খবরটা শুনল, তার পর আস্তে আস্তে খুঁটে কাঁটা তুলল, তার পর ভিতর-বাড়িতে গেল।

শ্যামা বলে, সে কী!

মেয়েটা হাসে, বলে, সত্যি বলছি। বাবার কোনও সমস্যা নেই। আপনাদের সঙ্গে যেমন সুরে কথা বলেন, আমাদের সঙ্গেও তেমন করেই কথা বলেন। আমরা বাবাকে মোনা ঠাকুর বলেই চিনি, বাবা বলে নয়।

চাতাল পেরিয়ে একটা মঠ মতো। দক্ষিণে দ্বাদশ শিবের মন্দিরের গা ভেদ করে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। মন্দিরের গায়ে শ্যাওলা।

এসব মন্দির কি বহু দিনের পুরনো?

কয়েকশো বছর বোধ হয়। শিব মন্দিরে তক্ষক ডাকে। মেয়েটা হেসেই বলে।

সুড়ঙ্গটা কোন দিকে?

পশ্চিম দিকে। দেখবেন? না কি এমনি বেড়াবেন?

শ্যামা মেয়েটির দিকে চায়। সরল সোজা মুখ, অকপট চোখ। কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু টের পাওয়া যায়, এই মন্দির, মোনা ঠাকুর, এসবের ওপর মেয়েটির কোনও টান নেই। মেয়েটা এই মন্দিরের দেবতা বা তার পূজারীকে গ্রহণ করেনি।

শ্যামা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনি আপনার বাবার সবকিছু বিশ্বাস করেন না?

মেয়েটা চোখ বড় করে হেসে বলে, করব না কেন? আপনাদের যেমন বিশ্বাস আমাদেরও তেমনই বিশ্বাস। তবে, মেয়েটা চুপ করে থাকে।

তবে কী?

বলছিলাম, আমার ভাই মরে যাওয়ার দিন ওই যে বাবাকে পায়ের কাঁটা তুলতে দেখেছিলাম ওটা কখনও ভুলতে পারি না। একজন মরে যাচ্ছে, আর বাবা কাঁটা তুলছে, কেমন যেন মনে হয়। ঠিক যেন সংসারের একটা কাঁটা বাবা তুলে ফেলছে। এরকম করে ভাবলে ভয় করে।

শ্যামার বুকের ভিতরটা গুড় গুড় করে। সে আস্তে করে বলে, কিন্তু বাবার মুখ দেখে উনি কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন আমরা কার খোঁজে এসেছি।

মেয়েটা কিন্তু কোনও কৌতূহল দেখায় না, কেবল বলে, বাবা তো সবই ঠিক বলে। আমরা জানি। নইলে লোকে আসবে কেন?

অনেক লোক আসে?

অনেক। ছুটির দিন হলে এ সময়টায় লোক গিজ গিজ করে। কলকাতা থেকেই বেশি আসে।

শ্যামা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার এক দাদা পাঁচ বছর হল হারিয়ে গেছে।

মেয়েটা উত্তর দেয় না। মাথা নিচু করে হাঁটে। শ্যামার তখন মনে পড়ে, এ মেয়েটার ভাই মরে গেছে, একটা মাত্র ভাই। এর দুঃখ আরও বেশি হওয়ার কথা। তার দাদা বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে। এ মেয়েটার ভাই নিশ্চিত ভাবে মারা গেছে।

শিব মন্দিরের পাশে একটা টিউবওয়েল দেখে শ্যামার তেষ্টা পায়। বলে, একটু জল খাব।

আমি বাড়ি থেকে এনে দেব?

না, না। ওই তো টিউবওয়েল।

আঁজলা করে খেতে অসুবিধে হবে না?

দূর।

তবে চলুন আমি কল টিপে দিই। এখানকার জল খুব মিষ্টি।

জল খাওয়ার সময়ে নিচু হয়ে শ্যামা হঠাৎ শুনতে পেল, কোকিল ডাকছে। সারা গায়ে কাঁটা দিল তার। মুখ তুলে বলল, কী ডাকছে?

ওমা! কোকিল। মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শ্যামা স্থির হতে পারে না! প্রশ্ন করে, সত্যিকারের কোকিল?

তা নয় তো কী?

অনেক সময়ে মানুষ কোকিলের মতো ডাকতে পারে।

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে বলে, এখানে কে আবার মানুষ কোকিল ডাকতে আসবে? আমি জন্ম থেকে কোকিলের ডাক শুনছি। এ সত্যিকারের কোকিলের ডাক।

শ্যামা জল খেয়ে আঁচলে মুখ মুছে বলে, আমি একজনকে জানি যে হুবহু কোকিলের মতো ডাকে। ধরা যায় না যে মানুষ ডাকছে।

মেয়েটা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে, কিন্তু এ মানুষের ডাক নয়। ওই শিমুল গাছে কোকিল বসেছে। সারা দিনই ডাকে। আমি চিনি ওই ডাক।

চারদিকে ঝোপ-ঝাড় আর গাছে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ হয়। রোদের মুখ থেকে মেঘ সরে গেছে। তবু এইখানে রৌদ্রের ততদূর উজ্জ্বলতা নেই। গাছের ছায়ারা পড়ে আছে। শ্যামা তার মুখে গালে নয়নের স্পর্শ ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

সুড়ঙ্গটা দেখবেন? মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

চলুন, দেখি। কখনও দেখিনি।

দেখার কিছু নেই। মেয়েটা উদাসভাবে বলে, আমরা তো জন্ম থেকে দেখছি।

এ সবই কি আপনাদের সম্পত্তি?

না। দেবত্র। এক জমিদার দেবত্র করেছিল। তার আর বংশ নেই। আমাদের কিছু ব্রহ্মত্র জমি আছে। আমরা এই মন্দিরের চার পুরুষের পুরুত।

এখানেই জন্মেছেন?

মেয়েটা হেসে বলে, তবে আর কোথায়?

ভাল লাগে এ জায়গা?

মেয়েটা মাথা নেড়ে বলে, একদম না। অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। কেউ যদি নিয়ে যেতে চায় চলে যাব।

শ্যামা হেসে ফেলে। বলে, এ জায়গার ওপর আপনার এত রাগ কেন?

মেয়েটা হেসে বলল, আপনার মতো একটা রঙিন সুন্দর শাড়ি পরতে ভীষণ ইচ্ছে হয়, জানেন।

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে। তারা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে হাঁটে।

মেয়েটা বলে, খুব সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে। বাসে-ট্রামে-মোটরগাড়িতে চড়তে ইচ্ছে করে, রেডিও শুনতে ইচ্ছে করে।

এখানে কিছু নেই?

মেয়েটা অন্যমনস্ক ভাবে বলে, মাঝে মাঝে অমাবস্যার পুজোয় এই মাঠে সিনেমা দেখানো হয়। যাত্রাওলারা আসে। অনেক বছর আগে একটা সার্কাসও এসেছিল। সেই সার্কাসের একটা লোক খেলা দেখাত, তাকে সিংহ থাবা দেয়। সার্কাসের লোকেরা তাকে এইখানেই ফেলে গেল। সে এখনও আছে। ওই দিকে মন্দিরের উত্তর বাঁশ-ঝাড়টার পিছনে থাকে। বাবা দেখতে পারে না।

কেন পারে না?

এই গাঁয়ের সে-ই একমাত্র লোক যে এ মন্দিরে আসে না।

কেন?

মেয়েটা ম্লান একটু হাসে। বলে, তার একটা ছেলে আছে। তার বউ ছেলের জন্ম দিয়েই মারা যায়। বাবা বলে, ছেলেটা ওই লোকটার নয়! কী ঘেন্নার কথা বলুন। কিন্তু লোকটা বলে যে ছেলেটা তারই। এই নিয়ে ঝগড়া। বলে মেয়েটা আবার হাসে মুখে আঁচল দিয়ে।

তার পর আবার বলে, এখানে কিছু নেই। কেবলই মনে হয়, আমাদের একটা আদ্যিকালের পোড়ো অন্ধকার জায়গায় ফেলে রেখে চারদিকে পৃথিবীটা এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতা থেকে কত লোক আসে, তাদের যত দেখি তত ওই কথা মনে হয়। বাবা তাদের দুঃখের কথা শোনে, আর আমি দেখি তাদের পরনে কত রঙিন কাপড়ের পোশাক, কী রকম ঝলমলে মুখ চোখ, কেমন দূর মাখানো তাদের চেহারায়!

শ্যামা হাসি চেপে বলে, কিন্তু এ তো কলকাতা থেকে খুব দূর নয়।

মেয়েটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, দূর কেন হবে! কত লোক এখান থেকেও চাকরি করতে যায় রোজ, কিংবা সিনেমা দেখে আসে, কেনাকাটা করতেও যায়। কাছেই একটা-দুটো শহরও তো আছে। কিন্তু আমরা ঠাকুরবাড়ির মেয়ে বলেই কোথাও যাওয়া হয় না।

মেয়েটা থেমে গিয়ে বলে, ওই হচ্ছে সুড়ঙ্গের রাস্তা।

একটা উঁচু বেদীর মতো বাঁধানো জায়গা! চারটে থাম, ওপরে সুন্দর একটা চুড়োওয়ালা ছাদ। ছাদের নীচে একটা ছোট্ট ঘর, তার দরজাটা খোলা। মেয়েটা সেদিকে চেয়ে বিস্বাদ মুখে বলে, ওই। যাবেন?

কতদূর গেছে সুড়ঙ্গটা?

বেশি দূর নয়। একটু গিয়েই দেখবেন ছাদ ভেঙে পড়েছে, ইটের ডাঁই, আর আগাছা। বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরীর মন্দিরে এরকম সুড়ঙ্গ আছে, শুনেছি।

সাপখোপ নেই তো?

মেয়েটা মুখে আঁচল তুলে হেসে বলে, কত কী আছে! আমরা ছেলেবেলায় চোর-চোর খেলতে যেতাম ওর ভিতরে। বড় হয়ে আর যাই না। অনেকে গুপ্তধনের লোভে খুব খোঁড়াখুঁড়ি করত একসময়। কেউ কিছু পায়নি।

শ্যামা হেসে বলে, আমরা যদি কিছু পেয়ে যাই?

মেয়েটা হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ে।

ঘরে ঢুকে প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই শ্যামা থেমে পড়ে। সামনে গভীর অন্ধকারে নেমে গেছে সিঁড়ি। একটা চামচিকে ডেকে ওঠে।

অন্ধকার যে!

কোনও ভয় নেই। আমি আগে যাচ্ছি।

মেয়েটা শ্যামাকে পেরিয়ে আগে নামে। শ্যামা পিছনে। আবার হঠাৎ চামচিকে ডেকে ওঠে। এবার একটু দূর থেকে!

মেয়েটা থমকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার নাম কী?

শ্যামা।

মেয়েটা হাসে, বলে, আমার নাম তারা।

জানি।

আমাদের নামের একই অর্থ।

শ্যামা মাথা নাড়ে। হাসে।

শ্যামার মন্দিরেই আপনি এসেছেন। অন্ধকারকে কি খুব ভয় শ্যামাদি?

শ্যামা অপ্রতিভ ভাবে হেসে বলে, আমরা তো ভাই শহরের মানুষ, অন্ধকারকে একটু ভয় পাই। তবে থাক, গিয়ে কাজ নেই।

কেন?

আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। অনেকদিন নামি নি কিনা!

গভীর অন্ধকার তলদেশ থেকে হঠাৎ একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে। শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে শোনে।

তিন-চার ধাপ সিঁড়ি নেমে গলা পর্যন্ত অন্ধকারে দু'জনে একটু দাঁড়িয়ে রইল। সামনে তারা, পিছনে শ্যামা।

তারা একটা শ্বাস ফেলে বলল, আপনার কি নামতে খুব ইচ্ছে করছে?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলল, না। বলে সে উঠতে লাগল।

ওপরে এসে, ফাঁকা জায়গায় এবং আলোতে মেয়েটাকে বিমর্ষ দেখাল। শ্যামার দিকে চেয়ে সে বলল, জানেন, আমার সেই ভাইটা মরে যাওয়ার পর থেকেই আমি কেমন যেন ভয়-ভয় পাই। নির্জনে বা অন্ধকারে থাকতে পারি না, কিছু মনে করলেন না তো শ্যামাদি? সুড়ঙ্গটা দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার।

শ্যামা অন্যমনস্ক ছিল। খুব অন্যমনস্ক। আসল ডাক আর নকল ডাকের পার্থক্য বোঝা যে কী মুশকিল! সে তারার কথার উত্তর দিল না।

এখনও বেলা আছে। সূর্যের আলো আরও কিছুক্ষণ থাকবে। কেবল পশ্চিমের আকাশে একটা ধোঁয়াটে অস্বচ্ছতা ঘুলিয়ে উঠছে। নিবিড় গাছপালার ওপর দিয়ে একটা বিবর্ণ আকাশ দেখা যায়। এই ঋতুতে এ রকম হয়। মাটির তাপ ওঠে, কুয়াশা জমে স্থির বাতাসে ধুলো ভেসে থাকে। সেই অস্বচ্ছতার আড়ালে সূর্যকে পরিষ্কার গোল চাঁদের মতো দেখা যায়। উজ্জ্বলতা নেই তার। চারপাশে আকাশের সেই অস্বচ্ছতা এক রকম ছায়া ফেলেছে।

মোনা ঠাকুর তার আসন ছেড়ে উঠে গেছে। মা আঁচলে চোখ মুছছে। বাবা স্তব্ধ হয়ে বসে। শ্যামা গিয়ে তার মায়ের পাশে বসল।

কী হল মা?

মা বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে ধরল তাকে, যদি সত্যি হয় শ্যামা, তবে আমি কালীর সোনার চোখ গড়িয়ে দেব।

কী হয়েছে বলো না।

মা সোমা ঠাকুরের শূন্য আসনটার দিকে চেয়ে ধরা গলায় বলে, ও নাকি বেঁচে আছে। হৃষীকেশ বা হরিদ্বারের দিকে আছে। সন্ন্যাসী হয়েছে, মাথার অসুখ নেই।

বাবা একটা শ্বাস ফেলে বলে, আমি ডেফিনিট হতে পারছি না!

মা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঝেঁঝে উঠে বলে, আমরা কিছু বলার আগেই উনি কী করে বুঝলেন যে আমরা ছেলের কথা জানতে এসেছি। তুমি তোমার ডেফিনিট নিয়ে থাকো গে। আমি হৃষিকেশ যাব।

বাবা মৃদুস্বরে বলে, এসব বিষয়ে সিওর হওয়া যে কী মুশকিল তা তুমি পুরুষ হলে বুঝতে। এত বছর অপেক্ষা করার পর আশা করতে ভরসা পাই না।

মা বলে, তুমি না পাও আমি পাচ্ছি।

বাবা চুপ করে থাকে।

শ্যামার ভিতরটা মুচড়ে ওঠে ব্যথায়। আবার আনন্দেও। দাদা কি আবার ফিরে আসবে। দাদা কি আর বেঁচে আছে। আবার ফিরে যদি আসে, যদি আবার প্যান্ট-শার্ট পরে। আড্ডা মারতে বেরোয়, যদি আবার খাওয়া নিয়ে মার সঙ্গে ঝগড়া নিয়ে বসে! যদি আবার আগের মতো তারা চারজন রাতের খাওয়ার পর লুডো বা তাস নিয়ে বসে! কত চাল চুরি করত দাদা, মা দেখেও দেখত না। আবার কি সে সব হবে ঠিক আগেকার মতো। ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। শ্যামা মনে মনে ধরেই নিয়েছিল, দাদা নেই। কোনও নদীর পাড়ে বা রেললাইনের ধারে, কিংবা বড় মাঠের মধ্যে সেই পাগল মানুষটা শেষ হয়ে পড়ে আছে, এ রকমটাই মনে হত তার, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ধক করে কেঁপে উঠত বুক। বাবা প্রায় সময়েই বলত, দ্যাখো গে, কোথাও ভিক্ষে-টিক্ষে করছে বোধ

হয়। মার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দাদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। মায়ের কথা, বাড়ির কথা সে ভুলে গেছে বলেই আসছে না। একদিন ঠিক ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মতো ফিরে আসবে। আবার 'মা' বলে ডাকবে, বিয়ে করবে, চাকরি করবে। শ্যামার ঠিক বিশ্বাস হয় না। এসব তো সিনেমায় হয়, গল্পে হয়, কিন্তু তার দাদার বেলায় হবে কি?

তাকে কাছে টেনে, আদর করে, কপালের চুল সরিয়ে দিয়ে গাঢ় আনন্দের স্বরে মা বলল, শ্যামা, একটু পরেই সন্ধ্যে লেগে যাবে মা, আমরা আরতিটা দেখে যাব।

দেরি হয়ে যাবে না?

হোক গে। এ বড় জাগ্রত দেবতার স্থান! একটু থাকি।

বাবা বিড় বিড় করে বলে, দিনকাল ভাল নয়।

মা বড় চোখে বাবার দিকে চায়। বাবা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

উদাস একখানা মাঠ। শেষ বেলার বালিরঙের আলো পড়ে আছে। একখানা টিনের দোচালার দাওয়ায় বসে বাপ-ব্যাটা।

ছেলে মুখ তুলে বলে, বাবা, দাদুবুড়ো কেমন করে হাঁটে?

দাদুবুড়োর কোমর বাঁকা, কুঁজো হয়ে মাজায় হাত রেখে হাঁটে।

কামড়ায় না?

কামড়ায়।

কেমন লাগে?

লাগে না। দাদুবুড়োর দাঁত নেই তো, কেবল মাড়ি। কামড়ালে কাতুকুতু লাগে।

সুকুল হেসে গড়িয়ে পড়ে। তার বাবা হাসতে গিয়ে দেখে, কোনাকুনি মাঠ পার হয়ে নয়ন আসছে। কোকিল ডাকে। কোকিলের ডাকই নয়নের বেশি প্রিয়।

সে কাছে আসতেই ছেলের বাপ হাসে, বলে, শ্যামাপাখির ডাক পারেন না?

নয়ন খুব গম্ভীর। মাথা নাড়ে। না।

কী হল ওখানে?

কিছু না। এখানে আরতি হবে।

বসুন।

নয়ন দাওয়ার একধারে বসে। সুকুল উঠে তার দিকে চায়।

কোথায় গিয়েছিলে?

কল্পতরুর মন্দিরে।

মোনা ঠাকুর ভীষণ রাগী। কামড়ায়।

নয়ন কেবল মৃদু একটু হাসে।

তুমি আমাকে কখন পাখির ডাক শেখাবে?

কাল থেকে শেখাব।

আমি ঘুমোলে চলে যাবে না তো?

না।

সুকুল নিশ্চিন্ত মনে তার বাবার দিকে চেয়ে বলে, বাবা, সিংহটা তোমাকে কেমন করে থাবা দিয়ে মেরেছিল বলো।

লোকটা নয়নের দিকে চেয়ে হাসে। বলে, এই গল্প ও কতবার শুনেছে, তবু রোজ শুনবে।

নয়ন ঝুঁকে বলে, কী গল্প?

গল্প না। একটা ঘটনা।

আপনাকে সিংহ থাবা দিয়েছিল?

লোকটা উদাস গলায় বলে, সিংহ কি না কে জানে। আদুবুড়ো বলত, সেটা কেশরী বাঘ।

সেটা কী?

সিংহই আসলে। তবে গাউস সাহেবের গরিব সার্কাসে আর কত বড় সিংহ হবে! আদুবুড়ো বলত— আসলে সিংহ হয় গহিন জঙ্গলে, সেখানে মানুষ যেতে পারে না। গাউস একটা কেশরী-বাঘ ধরে এনে সিংহ বলে চালাচ্ছে। আমাদেরও সেই ধারণাই ছিল।

আপনি সার্কাসে ছিলেন? খেলা দেখাতেন?

দেখাতাম। প্রথম-প্রথম। চুল দিয়ে লোহা তুলতাম, কিলিয়ে পাথর ফাটাতাম। গায়ের জোর ছিল খুব। একদিন তাঁবুর দড়ি খাটাতে গিয়ে পড়ে যাই। মাজা ভেঙে শেষ হয়ে গেলাম। গাউস অবশ্য লোক খারাপ ছিল না। দলে রেখে দিল। ফাই-ফরমাস তামিল করতাম, বাঘ-সিংহকে খাবার দিতাম, হাতির জন্য কলাগাছ কেটে আনতাম। এই সামনের মাঠে একবার গাউস সাহেব তাঁবু ফেলল। নির্জন জায়গা বাঘ-সিংহের ডাকে কেঁপে উঠল। তা এইখানেই সেই ঘটনাটা ঘটে। দুপুরবেলা খাবার দিতে সিংহের খাঁচায় নেমেছি। বুড়ো আধমরা সিংহ, নড়াচড়া করত না বড় একটা, খাঁচায় ঢুকলে হাই তুলে নিরীহ চোখে চাইত। দেখেশুনে মনে হত, আদুবুড়োর কথাই ঠিক। এটা সিংহ নয় বটে, কেশরী বাঘই হবে। সেদিন কী খেয়াল হল, মাংসের একটা বড় টুকরো সিংহের নাকের সামনে নেড়ে সরিয়ে নিচ্ছিলাম। দেখি ব্যাটা করে কী। এইরকম পাঁচ-সাতবার করবার পরও সে ব্যাটা কেবল হাই তুলল, আর চোখ পিট পিট করল। মজা পেয়ে আবার তার নাকের সামনে মাংস দুলিয়ে সরিয়ে নিই। ঠিক বুঝতে পারি না। হঠাৎ বেমক্কা সব আল্‌সেমি ঝেড়ে ফেলে সিংহটা লাফিয়ে উঠল। সে কী ডাক। ভিতরটা আমার ফেটে গেল যেন। সেই ডাক সামলাবার আগেই উপর্যুপরি কয়েকটা থাবা। তার পর এক ঝটকায় আমাকে পেড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর দাঁড়াল সে। পাঁজরার একটা হাড় গেল মট করে ভেঙে। সময়মতো গাউসসাহেব চাবুকের শব্দ না-করলে আজ আর আমাকে সুকুলের বাবা হতে হত না। বলে লোকটা তার ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাসতে থাকে।

সুকুল বলে, দেখি দাগ।

লোকটা জামা সরিয়ে পিঠ দেখায়। নয়ন দেখে, সেখানে গভীর এবং লম্বা ক্ষতের চিহ্ন। সে জিজ্ঞেস করে, তার পর কী হল?

কী আবার হবে! একটু দূরে মহকুমার হাসপাতালে মাস চারেক পড়ে রইলাম। ততদিনে গাউস পাততাড়ি গুটোল। আমারও সার্কাস ভাল লাগছিল না বলে পিছু নিলাম না। এই গাঁয়ের একজন লোক তখন আমাকে ধরে ছিল তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। বিয়ে করলে বিশ বিঘে জমি দেবে, ঘর দেবে, নগদ বিদায়ও দেবে কিছু। মেয়েটাও মন্দ ছিল না। বিয়ে করে থেকে গেলাম। সেই মেয়েই সুকুলের মা। বেশিদিন বাঁচেনি।

লোকটা চুপ করে মাঠের বালিরঙের আলোর দিকে চেয়ে রইল। একটু অন্যমনস্ক। কী যেন ভাবল। তার পর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বলল, বাবা সুকুল, তুমি বই নিয়ে একটু বসো। আমি রান্না চাপাই। ঘরে অতিথি আছে।

ঘরে সবকিছুই সাজানো। একদিকে বাপ-ব্যাটার খাট, অন্যধারে একটা ন্যাংটো চৌকি। চতুর্দিকেই সুকুলের খেলনা। চাল থেকে বেলুন ঝুলছে, দেয়ালে পেরেকে লটকানো ঘুড়ি-লাটাই, কাচের আলমারি বোঝাই পুতুল, খেলনা-পিস্তল, ভেঁপু, লাট্টু, কলের ঘোড়া। আলনায় সুকুলেরই রং-বেরঙের জামাকাপড়। একধারে সুকুলের পড়ার টেবিল, তাতে পড়ার বইয়ের পাশে রাজ্যের

ছবির বই। পরিষ্কার করে মোছা একটা ঝকঝকে লণ্ঠন রাখা।

লোকটা নয়নকে ঘরটা দেখিয়ে বলে, এ হচ্ছে সুকুলেরই ঘর। সুকুল যখন বড় হবে, তখন ওর বিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।

সুকুল ঝাঁপিয়ে গিয়ে বাবাকে ধরে, কিল মারে নীরবে।

লোকটা হাসে, ছেলেকে সামলাতে সামলাতে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা. যাব না। তুমি বই খুলে বসো। আমি ভিতরের বারান্দায় বসে রান্না করি।

ভিতরে অন্ধকার উঠোন। তাতে জোনাকি পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নয়ন চুপ করে বসে চেয়ে ছিল। দূরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। তার কান সেইদিকে।

লোকটা ভাত চাপিয়ে এসে পাশে বসে বিড়ি ধরায়।

কিছু হল?

না।

সুড়ঙ্গে নেমেছিলেন নাকি? মাথার চুলে ঝুল লেগে আছে।

নেমেছিলাম। কিন্তু ও নামেনি।

নামল না কেন?

নয়ন ঠোঁট উলটে বলে, কী জানি! বোধহয় আপনাদের মোনা ঠাকুর আগেভাগে সব জেনে ওকে সাবধান করে দিয়েছে।

ঠাকুরকে দেখলেন?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে, দেখেছি। দূর থেকে।

কেমন মনে হল?

যেমন হয়।

পারবেন?

কী?

উচ্ছেদ করতে?

নয়ন একটু হাসে। তার পর আস্তে করে বলে, একটা বোমা মারলেই উড়ে যায়।

লোকটা ধীরে ধীরে বিড়িটা টানে। তার পর চিন্তা করে বলে, শত্রুকে দুর্বল ভাবতে নেই।

নয়ন একটু নড়ে। গালে একটা মশা মারে ঠাস করে। পায়ের পাতা খস খস করে চুলকোয়। কান খাড়া করে আরতির ঘণ্টা শোনে। হঠাৎ বলে, আপনার টর্চ আছে?

আছে একটা। আমার নয় সুকুলের। ছোট্ট টর্চ, তেমন জোরালো নয়।

দিন তো। বলেই উঠে দাঁড়ায়।

চললেন কোথায়?

ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

চিনতে পারবে না?

না। অন্ধকার আছে। টর্চটা নিচু করে ফেলব।

গলার স্বর?

নয়ন হেসে বলে, আমি হরবোলা।

লোকটা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে ছোট্ট টর্চটা এনে দেয়। নয়ন কয়েকবার চারদিকে আলো ফেলে দেখে নেয়। বলে, চলবে।

ঘর দিয়ে বাইরে যাওয়ার সময়ে সুকুল তাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, এ কি চলে যাচ্ছ?

না সুকুল। ফিরব।

কখন?

তুমি একটু জেগে থাকো। তোমার ঘুমোবার আগেই ফিরব।

যদি না ফেরো?

নয়ন টর্চটা উঁচু করে দেখিয়ে বলে, তোমার বাতি নিয়ে যাচ্ছি তো, এটা ফেরত দিতেও ফিরব।

ফিরো কিন্তু। কাল থেকে ডাক শিখব।

আরতির ঘণ্টা এখনও বাজছে। মাঠটা কোনাকুনি দ্রুত পার হতে থাকে নয়ন। জোনাকি পোকার মতো আলো জ্বালে আর আলো নেভায়।

মোনা ঠাকুরের শরীর ছন্দে দুলে যায়। কী সুন্দর তার শরীরের কারুকাজ। যে-কোনও নর্তকের চেয়ে নমনীয় তার শরীর, বেতের মতো। কখনও পিছনে হেলে, কখনও সামনে ঝুঁকে নাচে। আলোয় দেখা যায়, মোনা ঠাকুরের মুখে এক বিহ্বল হাসি, চোখে জল, দৃষ্টি সম্মোহিতের মতো মোহাচ্ছন্ন। তার প্রকাণ্ড ছায়া দেয়াল জুড়ে, এক অপ্রাকৃত ছায়াব সঞ্চার করে। সেই দৃশ্য দেখে শ্যামার ভয় করে! এ যেন এক অন্য জগতে চলে এসেছে সে। ধুনো আর গুগ্‌গুলের গন্ধের সঙ্গে ঘষা চন্দন আর ফুলের গন্ধ মিশে গেছে। মন্দিরের বদ্ধ বাতাসে শতাব্দী ধরে সঞ্চিত শীতলতা! এ যেন এই জগৎ নয়।

মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বাবা চোখের জল মোছে। শ্যামার হাত-পা আড়ষ্ট লাগে, পিপাসা পায়। তার মাথা ঝিম ঝিম করে। মনে হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। সে স্পষ্ট দেখতে পায় আরতির ঘণ্টার সঙ্গে নাচতে নাচতে, কেঁদে হেসে মোনা ঠাকুর কালীর সঙ্গে কথা বলছে। বিপুল কালীমূর্তির দুই চোখে ভয়াল দৃষ্টি, লোল জিহ্বায় আলো পড়ে ঝিকিয়ে ওঠে হিংস্রতা। ঘাম তেল গড়িয়ে নামছে মুখ বেয়ে। শ্যামা চোখ ফিরিয়ে নেয়। অনেকক্ষণ অসাড় লাগে তার মন। মনে হয়, মোনা ঠাকুরের কথার উত্তরে ওই মূর্তি এক্ষুনি হেসে উঠবে, কথা বলবে।

আরতি শেষ হতে হতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তখনও মোনা ঠাকুর মাটিতে পড়ে আছে। কাঁদছে।তার পর অসাড় হয়ে গেল। মোনা ঠাকুরের রোজ আরতির শেষে ভর হয়।

দৃশ্যটা দেখে বাবা স্তব্ধ হয়ে থাকে! মা শব্দ করে কাঁদে। শ্যামার শরীরে ঘাম দেয়।

ঘোর-ঘোর একটা মানসিক অবস্থা বহু দূর পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। রওনা হতে হতে পৌনে আট। রাস্তা অন্ধকার। গাঁয়ের লোকেরা কিছুদুর সঙ্গে সঙ্গে এল, তার পর তারা তিনজন। আর কেউ নেই। কেউ কথা বলতে পারছে না এখনও।

আমবাগানের সামনে এসে বাবা থমকে দাঁড়ায়, মুখ ফিরিয়ে বলে, এ যে ভীষণ অন্ধকার! কী করে যাবে?

মা'র এখনও সঠিক জ্ঞান ফেরেনি যেন। মা কাঁদছে এখনও। ধরা গলায় বলে, ভয় কী! চল ঠিক চলে যাব।

যেতে তো হবেই। কিন্তু এই অন্ধকারে খুব রিস্কি। বেলাবেলি চলে গেলে কোনও ঝামেলা ছিল না।

তোমার কেবল পিছু টান। কোথাও তোমার সঙ্গে গিয়ে শান্তি নেই। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার, সেখানে দু' দণ্ড মনটাকে রাখতে হয়, ঘরের চিন্তা করলে কি চলে?

বাবা বিড় বিড় করে বলে, সাপখোপ কত কী আছে হয়তো।

তবু যেতেই হবে। বাবা শ্যামাকে ডেকে বলে, তোকে নিয়েই ভয়, আমরা দুনিয়ার বার। তুই মাঝখানে থাক, সামনে আমি পিছনে তোর মা। বলে বাবা গলা খাঁকারি দেয়। দু'-তিন বার হাতে তালি বাজিয়ে শব্দ করে।

শ্যামা এই সময়েও ওই কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে বলে, ও কী করছ?

দেশ-গাঁয়ে অন্ধকারে এভাবে শব্দ করে হাঁটতাম। জীবজন্তু সব শব্দ পেয়ে সরে যায়।

বাবা বার বার গলা খাঁকারি দিয়ে হাঁটে। সামনের পথ খুবই আবছা। রাস্তা উঁচুনিচু। বার বার পায়ে ঠক্কর লাগে। কয়েক পা হেঁটেই বাবা বলে, কী করে যাবে? হাঁটাই যাচ্ছে না।

চল তো, যা হবার হবে। মা কালী আমাদের দেখবেন। মা ধমকে বলে।

তবু বাবা সাহস পায় না। সাবধানে হাঁটে। পা দিয়ে রাস্তা হাতড়ে।

নয়ন কী চলে গেছে! শ্যামা উৎকর্ণ হয়ে চারিদিককার শব্দ শুনবার চেষ্টা করে। ঝিঝির শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। এক-আধটা প্যাঁচার ডাক দূর থেকে শোনা যায়। ওই কি নয়ন? কে জানে।

এদিকে রাতে লোক-চলাচল নেই দেখছি! বাবা চিন্তিত গলায় বলে।

মা ঝংকার দিয়ে বলে, তোমার অত ভয় থাকলে তুমি পিছনে এসো। আমি সামনে যাচ্ছি।

বাবা একটু রেগে গিয়ে বলে, তুমি বড় সাহসী কিনা! মেয়েছেলের এগারো হাতে কাছা হয় না, বড় বড় কথা।

তোমাদেরই কাছা দেওয়া উচিত নয়। ঘোমটা দাও। তখন থেকে কেবল চোর-ডাকাত সাপ-খোপের কথা বলে যাচ্ছ।

তোমাদের আর কী? সঙ্গে পুরুষ মানুষ রয়েছে। সব হ্যাপা সে সামলাবে। তোমাদের গা আলগা দিয়ে থাকলেই হল।

কথা বেশি দূর গড়াল না। সামনের অন্ধকারে জোনাকি পোকা জ্বলছিল। তার মধ্যে একটা জোনাকি যেন একটু বড়। একবার অনেকক্ষণ জ্বলে নিভে গেল। লক্ষ্য করে শ্যামা বাবাকে ডেকে বলে, বাবা, সামনে টর্চ হাতে কেউ যাচ্ছে। দ্যাখো।

বাবাও দেখল। বলল, মনে হচ্ছে। তোরা পা চালিয়ে আয় তো।

মা ঝংকার দেয়, কী বুদ্ধি! যদি ছেলে-ছোকরা হয় তবে কি আমরা হেঁটে তাকে ধরতে পারব? ডাকো না লোকটাকে, দাঁড়াতে বলো।

বাবা বিড় বিড় করে একবার বলে, কেমন লোক কে জানে! তার পরই গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে, ও মশাই, শুনছেন, এই যে—

সামনের বাতিটা থামে। একটা টর্চের মুখ চক চক করে ওঠে। তারা এগোয়।

লোকটাকে দেখা যায় না। টর্চটা নিচু করে ধরা। একটু মোটা ভাঙা গলায় লোকটা বলে, কিছু বলছিলেন আজ্ঞে?

বাবা বলে, কোন দিকে যাবেন? বড় রাস্তা পর্যন্ত?

ওদিকেই।

আমরাও যাব। অন্ধকারে বড় বিপদে পড়েছি।

চলুন না, আমার সঙ্গে চলুন। কোথায় এসেছিলেন, কল্পতরু মন্দিরে নাকি?

হ্যাঁ। বড় জাগ্রত দেবতা। যা দেখে গেলাম ভোলবার নয়। আপনি কি এদিককার লোক? বাবা জিজ্ঞেস করে।

পাশের গাঁ। মোনা ঠাকুরকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি।

কেমন লোক?

কী আর বলি বলুন। তবে উনি আমাদের এই এলাকার গৌরব।

শ্যামা টর্চের আলোর আভায় প্রথমে প্যান্টের রংটা চিনতে পারে। তার পর হলুদ শার্টটার আভাস পায়। গায়ে কাঁটা দেয় তার। শীত করে। নয়ন আড়ালে থাকলে যত ভয়, কাছে এলে এত ভয় করে না শ্যামার। কিন্তু বাবা-মা'র সামনে এভাবে আসা ভীষণ বিপদজনক! যদি ধরা পড়ে যায় নয়ন! হাত-পা শিরশির করতে থাকে তার।

তারা হাঁটে। আগে নয়ন, তার পিছনে তারা তিনজন সারিবদ্ধ।
বাবা নানা কথা বলতে থাকে। নয়ন মোটা ভাঙা গলায় উত্তর দেয়।
এদিকের কোনও ডেভেলপমেন্ট হয়নি, না? বাবা বলে।
কোন দিকটারই বা হয়েছে বলুন?
রাস্তাঘাট কেমন এখানে?
যেমন দেখছেন। এই সব রাস্তায় হেঁটেই আমরা বড় হলাম।
বিপদ আপদ?
সাপখোপ আছে।
চোর-ডাকাত?
শুনি না তো বড় একটা।
বাবা একটু গম্ভীর থেকে বলে, চোর-ডাকাত না থাক, অভাব তো আছে। অভাবী মানুষ, দুঃখী মানুষ যত বাড়বে ততই অমঙ্গল। সেই সব মানুষই রং পালটে চোর-ডাকাত হয় কিনা! তা ছাড়া লাশ-ফেলা পলিটিক্স আছে। কাজেই ভয়-ভীতি এখন সর্বত্র।
তা অবিশ্যি ঠিক। তবে এদিকে কখনও কিছু হয়নি। তবে হবে।
কী করে বুঝলেন?
দেশের অবস্থা দেখে বুঝছি। শিগগির দেখবেন, এদিকেও লাশ পড়ছে।
শ্যামা অন্ধকারে আপন মনে একটু হাসে। কোথায় যেন বুনো ফুল ফুটেছে। তার গন্ধ পায় শ্যামা। মনটা চনচন করে ওঠে। ভাল লাগে। ওই তো টর্চ হাতে নয়ন সামনে চলেছে। এখন আর কোনও ভয় নেই। তারা ঠিক বাস-রাস্তায় পৌঁছে যাবে।

একটা আল টপকে দিলেই মোনা ঠাকুর ফিনিশ। তার মা কালীর পায়ের তলায় শুয়ে রক্ত-বমি করতে করতে চোখের পটল ওলটাবে। নয়ন সব জানে। তবে কিনা নয়নের সঙ্গে মোনা ঠাকুরের কোনও ঝগড়া নেই। কিন্তু লেগে যাবে এক দিন।
মন্দিরের আরতি হয়ে গেছে। শিকের দরজা পড়ে গেছে মন্দিরে। শিকের ফাঁক দিয়ে বিগ্রহ দেখা যায়। কালীমূর্তি বাঙালিমাত্রেরই আজন্ম চেনা। সেই জিভ-বের-করা আধ-ন্যাংটো নৃমুণ্ডমালিনী। কোন ভক্ত যেন সোনার চোখ গড়ে দিয়েছিল, সেই সোনালি চোখে প্রদীপের আলো ঝলসাচ্ছে, আর গায়ের ঘাম তেল! নয়নের কোনও আগ্রহ ছিল না, কেবলমাত্র মন্দিরটার কারুকাজ আর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছু কৌতূহলবশত সে জুতো ছেড়ে মন্দিরের বারান্দায় উঠে এল। ফুল বেলপাতা ধুনো গুগ্‌গল এসব গন্ধ তো আছেই, কিন্তু সব ছাপিয়ে ওঠে এক-দেড়শো বছরেব ছায়ায় ঢাকা শ্যাওলা-পড়া সেঁতসেঁতে গন্ধ। মন্দিরের বারান্দাটা ঠান্ডা হিম। চামচিকে আর কবুতরের শব্দ পাওয়া যায়। কেউ কোথাও নেই। নয়ন ঝুলন্ত ঘণ্টাটায় একবার টং শব্দ করে, তার পর শিকের দরজাটা নেড়ে দেখে। তালা-দেওয়া বারান্দার দিকে দু' পাট ভারী, লোহার গুল মারা দরজা খোলা রয়েছে, সে দুটো আরও রাতে বন্ধ করে দেওয়া হবে। দুটো শিক দু' হাতে ধরে নয়ন মন্দিরের আধ-অন্ধকার ঘরখানা দেখল। এই ঘরে মোনা ঠাকুরের ভর হয়, দৈববাণীও হয় নাকি। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ভূতের গায়ের গন্ধে ম ম করে চারদিক। দুটো শিক দু' হাতে চেপে নয়ন কালীর সোনার দুটো চোখের দিকে স্থির চেয়ে রইল একটুক্ষণ। এই চোখে প্রাণসঞ্চার হতে কেউ কেউ দেখেছে। নয়ন চেয়ে থাকে। আলো-আঁধারিব ভিতর থেকে দু'খানা সোনার গয়না লক্ষ্য করে নয়ন। বিগ্রহের বেদি পুরোটা রুপো দিয়ে মোড়া। এই হচ্ছে মোনা ঠাকুরের স্টেজ। সঠিক আলো গন্ধে শব্দে রহস্যময়

আবহ, দর্শকরা নিরক্ষর গরিব ভবিষ্যৎ-ভিরু মানুষ, এই মঞ্চে মোনা ঠাকুর ভর হওয়া রামকৃষ্ণের অভিনয় করে। দর্শকরা রোমাঞ্চিত হয়। চোখের জল ফেলে। তবু মোনা ঠাকুরের ওপর কোনও আক্রোশ ছিল না নয়নের। কারণ এ অঞ্চলে সে আজই প্রথম এসেছে। এসেছিল শ্যামার পিছু নিয়ে। শ্যামা কোনওদিনই পাত্তা দিল না তাকে। নয়ন সবই বোঝে। তবু ছাড়তে পারে না। শ্যামা তাকে ভালবাসে না হয়তো। তাতে নয়নের খুব বেশি কিছু যায় আসে না। হৃদয়ের খেলা পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। এটা প্রয়োজনের যুগ। কাউকে কাউকে কারও প্রয়োজন হয় মাত্র। যেমন, নয়নের প্রয়োজন শ্যামাকে। যদি সারা জীবনের জন্য নাও হয় ক্ষতি নেই, অন্তত কিছুদিনের জন্য শ্যামাকে তার পেতেই হবে।

ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে। শ্যামা আজ তার মা-বাবার সঙ্গে এইখানে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে আসবে এই খবরটা নয়ন শ্যামাদের বাচ্চা চাকরটার কাছে আজ সকালেই পেয়ে যায়। সময়টা জানা ছিল না। তবু অনেক সকালেই সে জাতীয় সড়কের ধারে বাস থেকে নেমে গাঁয়ের হাটে অপেক্ষা করছিল। তখনই হাটের লোকজনের কাছে সে মোনা ঠাকুরের সব কাহিনি জেনে নেয়। শ্যামারা এসেছিল হেমন্তের বিকেল যখন মানুষজনের ছায়া দীর্ঘতর করেছে, ধানের রূপসি মুখে কনে দেখা আলো তখন। শ্যামাকে সে একবার দেখেছিল মাত্র, তার পরই ভিড়ে ডুব দেয়। কারণ শ্যামার বাবা মা'র তাকে দেখলে স্ট্রোক হওয়ার ভয় আছে। নয়ন জানত, শ্যামারা যাবে আমবাগানের ভিতর দিয়ে। সেটা দীর্ঘ পথ। নয়ন হাটের লোকজনের কাছে জেনে নিয়েছিল, মোনা ঠাকুরের কালী মন্দিরে যাওয়ার একটা জঙ্গুলে ছোট পথ আছে। ভাঙা বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে যাওয়া যায়। খানিকটা তাড়ি গিলেছিল সে তার পর। যখন হাঁটা দিয়েছে তখনই মাথাটা এলোমেলো, ঠিক মনে নেই, আবছা মনে পড়ে, একটা ভাঙা বিপজ্জনক সাঁকো বুকে হেঁটে পেরিয়ে জঙ্গল ভেদ করে আমবাগানের ভিতর একটা ভাঙাবাড়িতে শ্যামার পথ চেয়ে ছিল সে। পেয়েও ছিল শ্যামাকে। কী সব উলটোপালটা কাণ্ড করেছিল যে! শ্যামার বাবা-মা একটু এগিয়ে গেছে তখন, আর শ্যামা পোড়ো বাড়িটার হাতায় ভাঙা ফোয়ারার পাশে একটা লতানে গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ তুলছিল। সে সময় নয়ন তাকে আক্রমণ করে। উলটোপালটা কী সব বলেছিল যেন, বিয়ে করতে চেয়েছিল শ্যামাকে। তার পর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সবটাই তাড়ির ঘোরে। নইলে অতটা হয়তো করত না। ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বাচ্চা ছেলেকে এক হাতে ধরে, অন্য হাতে একটা জীবন্ত গোখরো সাপ নিয়ে তাদের পথে এসে পড়েছিল। ছেলেটা চিৎকার করে ওঠায় তার ওই উন্মত্ত আবেগ কেটে গিয়েছিল।

নয়নের একটা দোষ এই যে কোনও একটা ব্যাপারে তার মন বেশিক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। তার মনটা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচবোর্ডের মতো। মুহুর্মুহু লাইন পালটে কানেকশন নেয়। লোকটার হাতে ওই সাপ দেখে সে শ্যামাকে ভুলে লোকটার পিছু নেয়।

এই জায়গার কিছুই নয়ন চেনে না। শ্যামারা শেষ বাসে চলে গেল। শ্যামারা বাবা-মা টের পায়নি যে নয়ন এতদূর এসেছিল। সবই ঠিক আছে। কিন্তু এখন বড় একা লাগছে তার। নিঃসঙ্গ অবসাদগ্রস্ত।

কালীর সোনার চোখের দিকে চেয়ে সে খুব গভীরভাবে শ্বাস নিল। দেড়শো বছরের পুরনো একটা গন্ধে ভরে গেল বুক। তাড়ির কিছু নেশা এখনও তার মাথার মধ্যে রয়ে গেছে। টলমল করছে মাথা। ঠিকমতো চিন্তাশক্তি এখনও ফিরে আসছে না। হরবোলা নয়ন দুটো শিস দিল। অবিকল তিতিরের মতো। তার পর পুরনো মন্দিরের গাছ শুঁকে শুঁকে বারান্দায় ঘুরে বেড়াল খানিকটা। অন্ধকার চারদিকে। মোনা ঠাকুরের বাড়ির বাইরের ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যায়। সে শুনেছে আরতির পর ওই ঘরে একটা ধর্মসভা হয়। গাঁয়ের চাষিরা আসে, সাধারণ মানুষেরা আসে, বুড়ো-বউ-বাচ্চারা ঘিরে বসে। মোনা ঠাকুর তাদের ধর্মের কথা শোনায়। শ্যামারা এখানে কেন

এসেছিল তা ঠিক জানে না নয়ন। তবে আন্দাজ করতে পারে, শ্যামার দাদা বছর পাঁচেক আগে পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ হয়। বহুকাল ধরেই শ্যামাদের পরিবারের ওই একটা দুঃখ, বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ওরা যায় পাগল ছেলের খোঁজ পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শ্যামা নিজেই। রংটাই যা ময়লা শ্যামার, নইলে শ্যামার চটক আছে। ওই কালো রং উপেক্ষা করে পুরুষেরা ওর জন্য পাগল। তাদের কাউকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা শ্যামার নেই। সর্বোপরি রাহুর মতো নয়ন লেগে আছে পিছনে। শ্যামাকে নিয়েও ওদের ভয় কম নয়। কে যেন কবে টান দিয়ে শ্যামাকে নিয়ে যায়! তার সঙ্গে কবে শ্যামার বিয়ে হবে এটা জানাও ওদের দরকার। সেই কারণেই মোনা ঠাকুরের কাছে আসা।

মোনা ঠাকুরকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাববে কি না ঠিক বুঝতে পারে না নয়ন। প্রতিদ্বন্দ্বী তার অনেক, প্রতিদিনই এক-আধজন বেড়ে যায়। মন্দিরের ঘণ্টায় আর একবার টং করে শব্দ করে সে অন্যমনস্কভাবে। মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘর থেকে একটা লোক লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে দূর থেকেই প্রশ্ন করে, কে?

নয়ন উত্তর দেয় না, লোকটা এগিয়ে আসে, জবুথবু বুড়ো একটা লোক। হেমন্তের শীতেই মাথা-মুখ ঢেকে চাদর জড়িয়েছে। কুঁজো হয়ে মাঠটা পেরিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে বলে, কে আজ্ঞে?

কেউ না। মন্দির দেখতে এসেছি। আমাকে চিনবেন না।

লোকটা গলায় কফের শব্দ করে বলে, এত রাতে কোথা থেকে এলেন আজ্ঞে?

যেখান থেকেই আসি না, আপনার কী?

লোকটা স্তম্ভিত, এবং ভীত মুখে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ। নয়ন একটা সিগারেট ধরায়, মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই লোকটা লণ্ঠন তুলে ধরে আছে। নয়ন লোকটার মুখ দেখে। সর্বভারতীয় মুখ একখানা, পথে-ঘাটে বাজারে হাটে গঞ্জে এরকম একই রকম বৈশিষ্ট্যহীন মুখ যে নয়ন কত দেখেছে। এসব মানুষকে একজনের থেকে আর-একজনকে আলাদা করে চেনাই মুশকিল।

লোকটা লণ্ঠন নামিয়ে নিয়ে বলে, দেখুন আজ্ঞে। মন্দির দেখতে বাধা কী? মায়ের মূর্তিখানা বুক ভরে, নয়ন ভরে দেখে নিন। তবে কিনা দিনকাল খারাপ।

নয়ন ঝেঁঝে উঠে বলে, কীসের খারাপ?

লোকটা নরম সুরেই বলে, গাঁয়ে অচেনা লোক এলে মানুষের একটু ধন্ধ লাগে। ছেলে-ছোকরারাও সজাগ। গাঁ চৌকি দেয়। আপনি নতুন নাকি আজ্ঞে?

তা দিয়ে আপনার কী?

জিজ্ঞেস করি আর কী! এত রাতে নতুন লোক বলেই বলছি। অচেনা জায়গা।

নয়ন একটু হাসে, তা মায়ের স্থান যখন, ভয় কী?

লোকটা কিছু বলে না। চেয়ে থাকে একটু। তার পর বলে, ঠাকুর তো আসরে বসে গেছেন। যদি যেতে চান তো চলে আসুন।

চকিত লোকটা লাফ দিয়ে নয়ন উঁচু বারান্দা থেকে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে মাঠে নামে। লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, ঠাকুর কে?

মোনা ঠাকুর আজ্ঞে, আর কে হবেন! মনোময় দেবশর্মা তিন পুরুষে এই মন্দিরের পূজারী। ওঁর ঠাকুরদা নরবলি দিতেন। দু' হাতের দশ আঙুলে ওঁদের যা শক্তি তা দিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র এধার ওধার করে দেন। নাম শোনেননি?

তাড়ির নেশাটা এখনও ফিকে হয়ে লেগে আছে। নয়ন নইলে একটা উত্তর দিত ঠিক। দিল না। কেবল একটু হাসল। অবশ্য উত্তর দিলেও লাভ ছিল না। এরা যা একবার বোঝে তা সহজে ভোলে না। সে শুধু বলল, মোনা ঠাকুরের কাছে গেলে বশীকরণ করবে না তো?

কী বললেন?

বলি ভেড়া বানিয়ে রাখবে না তো?

লোকটা হাসে, ঠাকুর কত কী করে তার আমরা কী জানি! তবে ভয় পাই না। উনি কাউকে ভয় দেখান না বড় একটা। ক্ষতিও করেন না।

আপনি যান। আমি সময় হলে যাব।

লোকটা বিনীত ভাবে বলে, রাতে ঘণ্টার শব্দ করলে মায়ের বিশ্রাম ভেঙে যায়। মায়ের শয়ন হয়ে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। লোকটা তেমনি কোলকুঁজো হয়ে অন্ধকারে ফিরে যায় লণ্ঠন হাতে।

পকেট থেকে সুকুলের দেওয়া টর্চটা বের করে কুয়াশামাখা অন্ধকারে এধারে ওধারে ফেলে নয়ন। মন্দিরের ওপাশে একটা পুরনো সুড়ঙ্গ আছে। বেশিদূর যাওয়া যায় না। রাস্তা বুজে গেছে। প্রাচীন কালে মানুষেরা সুড়ঙ্গ তৈরি করত। সব প্রাচীন সুড়ঙ্গই বোধ হয় এখন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রাচীন সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন। নয়ন তা জানে। একটা আলু টপকালে কোথায় যাবে মোনা ঠাকুর!

কিন্তু মোনা ঠাকুরের ওপর তেমন কোনও রাগ নেই তার। বলতে কী একজন মোনা ঠাকুর এখানে আছে বলেই শ্যামারা এইখানে এসেছিল আর এসেছিল বলেই আমবাগানে এক পলকের জন্য শ্যামার দেহের স্বাদ পেয়েছিল সে। অবশ্য মোনা ঠাকুরের সঙ্গে একটা লড়াই শেষ পর্যন্ত তাকে লড়তেই হবে। ধর্মকে উচ্ছেদ করাই হবে শেষ কাজ। মন্দির ভেঙে চৌরস করে যাবে রাজপথ, মসজিদ-গির্জা ভেঙে তৈরি হবে খেত। তাতে সোনার ধানে ঢেউ খেলবে, কিংবা তৈরি হবে শিশুদের জন্য বাগান, যুবক-যুবতীর মিলনক্ষেত্র। কী যে হবে তা নয়ন জানে না। কিছু একটা হবেই। হয়তো সেই সুদিন দেখার জন্য সে বেঁচে থাকবে না।

নয়ন বারান্দাটায় আবার ওঠে। উঁচু হয়ে বসে সিগারেটে শেষ কয়েকটা টান দেয়। তার আজকাল কেন যেন মনে হয়, আর খুব বেশিদিন সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না। তার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

উত্তুরে একটা বাতাস এল হঠাৎ। নয়নের শীত করে ওঠে। সে জবুথবু হয়ে বসে। চারদিকের নিস্তব্ধ শীতলতা অনুভব করে। আর শ্যামার কথা ভাবে। কালো, সুন্দর এবং দুর্লভ শ্যামার কথা, এই মন্দিরে আজ শ্যামা এইখানে এসেছিল।

থুতু ফেলে নয়ন উঠল। গায়ের পাতলা শার্টটা ভেদ করে বাতাস লাগছে। শ্যামার পিছু পিছু ফিরে যায়নি নয়ন। যায়নি ওই সাপওলা লোকটার জন্য, হয়তো মোনা ঠাকুরের জন্যও। শ্যামাকে ঠিকই পেয়ে যাবে নয়ন, চিন্তা নেই। আপাতত মোনা ঠাকুর আর সাপওলা লোকটার রহস্য ভেদ করে যাওয়াটাই তার কাছে দরকার।

মোনা ঠাকুরের বাইরের ঘরে কয়েকটা ঝকঝকে লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকজন লোক এধার ওধার বসে আছে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে মোনা ঠাকুর। তেমন কিছু চেহারা নয়। শরীরটা মেদহীন ঝরঝরে, গায়ের রং তামাটে, শুধু চোখ খুব উজ্জ্বল। খালি গায়ে একটা সাদা উড়ুনি মাত্র জড়ানো। হাঁটু দুটো বুকের কাছে তোলা। পাশে বিড়ির বান্ডিল, দেশলাই।

নয়ন খোলা দরজায় দাঁড়াতে মোনা ঠাকুরই তার দিকে প্রথম তাকাল, সেই তাকানোর মধ্যে কোনও বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। প্রতিদিনই বহু মানুষ আসে তার কাছে, সুতরাং মোনা ঠাকুর আর বিস্মিত হয় না। কেবল ঘরের অন্য লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল। বুড়োটা এসে বোধ হয তার কথা আগেভাগে বলে রেখেছে।

আসতে পারি? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ল। উত্তর দিল না।

নয়ন ঘরে ঢুকে চারদিকে একবার তাকায়। তার ভাবভঙ্গি সহজ এবং উদ্ধত। এই লোকগুলোর চেয়ে যে সেসব বিষয়ে উন্নত, এরকম একটা তাচ্ছিল্যের ভাব সে ইচ্ছে করেই ফুটিয়ে তোলে। চারদিকে কয়েকটা ছোট পাটির আসন পাতা। সে একটু পিছনের দিকে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। ঘরে কোনও কথা নেই। সবাই চুপ। যেন তার উপস্থিতিই ঘরের আবহাওয়াকে অস্বাভাবিক করে দিয়েছে। কেউ কথা বলছে না, সবাই অলক্ষ্যে নিঃশব্দে তার দিকে লক্ষ্য রাখছে। যেন এক্ষুনি কিছু একটা ঘটাবে নয়ন, কিছু অদ্ভুত কথা বলবে। সবাই তাই অপেক্ষা করছে।

মোনা ঠাকুর আস্ত একটা বিড়ি শেষ করে ফেলল। ততক্ষণ কেউ কথা বলল না। নয়ন দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে চেয়ে আছে। আক্রমণ ইচ্ছে করলেই সে করতে পারে, কিন্তু মুড নেই। আপাতত, সে কেবল দেখে নিচ্ছে। হাটে মানুষজনের কাছে সে শুনেছে মোনা ঠাকুর এ অঞ্চলের প্রধান মানুষ। কয়েকটা গাঁ জুড়ে অখণ্ড রাজত্ব। হাত দেখা, কোষ্ঠী বিচার, সাপের বিষ নামানো, মারণ বশীকরণ সবই মোনা ঠাকুরের হাতের পাঁচ। সম্মোহনবিদ্যায় ওস্তাদ। কলকাতা থেকেও ছুটির দিনে বিস্তর মানুষ আসে তার কাছে।

এরকম কোনও মানুষের কথা শুনলেই নয়ন ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাড়ার গুন্ডা কিংবা রাজনৈতিক নেতা কিংবা যে কোনও লাইনেই কেউ প্রধান হয়েছে শুনলে নয়নের ভিতর একটা স্বাভাবিক আক্রমণ করার ইচ্ছে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে লোকটাকে তার জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে ধুলোয় পিষে দিতে ইচ্ছে করে। এই পৃথিবীতে তার তুল্য বা তার চেয়ে বড় কেউ আছে, এই চিন্তাটাই সে সহ্য করতে পারে না।

বিড়িটা শেষ করে মোনা ঠাকুর তার দিকে তাকায়। নয়ন একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। চোখাচোখি তাকিয়ে মোনা ঠাকুর নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, বাবুমশাই, জায়গাটা কেমন লাগল?

নয়ন ঘাড়টা পিছনে হেলিয়ে অবহেলায় বলল, খারাপ কী?

এদিকেই কি ক'দিন থাকার ইচ্ছে?

থাকতে পারি। ঠিক নেই।

জায়গাটা ভালই। তবে কিনা আপনারা শহর-গঞ্জের মানুষ।

আমি শহর-গঞ্জের মানুষ একথা কে বলল?

নন?

নয়ন একটু হেসে বলে, না। আমি সব জায়গার মানুষ। গ্রামেরও।

মোনা ঠাকুর একটু চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ পরে বলে, আসলে গাঁ আর শহর জুড়েই তো মানুষের জীবন। কোন ঠাঁইয়ে তার বাস তা থেকে বিচার হয় না। তা এখানে উঠেছেন কোথায়?

সাপওলা একটা লোক আছে, তার বাড়িতে রাতটা থাকব।

সাপওলা লোক শুনে আবা র সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে।

মোনা ঠাকুরের মুখে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, সাধারণ গলায় বলে, সাপওলা লোক তো একমাত্র জগদীশ। তা তার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে না কি?

থাকলেই কী?

কিছু না। জিজ্ঞেস করলাম। মানুষজনের পরিচয় জেনে রাখাটা আমাদের অভ্যাস। তা হলে আপনি তার আত্মীয় নন?

নয়ন দেয়ালে মাথাটা হেলিয়ে অবহেলায় বলল, না; আমি একটা মেয়ের পিছু নিয়ে এখানে এসে পড়েছিলাম। পথে সাপওলা জগদীশের সঙ্গে আলাপ।

মেয়ের পিছু নেওয়ার কথা শুনে দু'-একজন তার দিকে তাকাল। মোনা ঠাকুরের মুখ তেমনই ভাবলেশহীন। নয়ন গ্রাহ্য করল না।

থাকবেন?

দেখি। আমার কিছু ঠিক নেই।

মোনা ঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাতড়ে বিড়ির বান্ডিল থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরায়। তার পর হঠাৎ একটু হাসে। নয়নের দিকে চেয়ে বলে, সে আমাকে দেখতে পারে না।

কে?

জগদীশ।

নয়ন চুপ করে থাকে।

মোনা ঠাকুর নিজেই বলে, জগদীশ এ গাঁয়ে আসে সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে। তোমার মনে আছে হরিপদ, সিংহের থাবা খেয়ে জগদীশের সেই যে পাঁজর ভেঙেছিল?

লণ্ঠনওলা লোকটা বোধহয় আফিং খায়। উড়ুনি জড়িয়ে উবু হয়ে মাথা ঝুলিয়ে বসে আছে। নিজের নাম শুনে মুখটা তুলে গলায় কফের ঘড়ঘড়ে একটা শব্দ করল মাত্র।

মোনা ঠাকুর নয়নের দিকে চেয়ে বলে, জগদীশ বড় কালীভক্ত ছিল। মায়ের থানে রোজ আসত। আমি একদিন তাকে বলি যে আমি কালীটালি কিছু জানি না। আমি গুরু জানি। আমার পুজো হচ্ছে আসলে গুরুর পুজো। সে তখন উলটে বলল, তা হলে আপনি ভন্ড, কালী মানেন না তো পুজো করেন কেন? আমি উলটে বললাম, তো রামকৃষ্ণদেব পুজো করত কেন? বেদান্ত মানলে তো মূর্তি পুজো চলে না। রামকৃষ্ণ ঠাকুরও আসলে যার পুজো করত সে দক্ষিণা কালী নয় গো, সে হচ্ছে গুরু। ঠাকুর নিজেই বলেছেন, মেয়েরা ততদিনই পুতুল খেলে যতদিন তাদের বে না হয়। সেই থেকে জগদীশের সঙ্গে আমার বখেরা। তা বাবুমশাই, বলেন তো কোনটা ঠিক। এই মূর্তিপুজো না গুরুপুজো?

নয়ন ঠিকমতো শুনছিল না। শুধু বলল, কে জানে। মানুষের কত বাতিক থাকে!

আপনি গুরু মানেন না?

না!

মোনা ঠাকুর একটু, খুব সামান্য মাত্র, একপরদা উত্তেজিত গলায় বলে, আপনি কখনও কারও কাছ থেকে কিছু শেখেননি? এমন কি অ-আ-ক-খও নয়?

নয়ন বিরক্ত হয়ে বলে, শিখব না কেন?

তবে?

তবে কী? কারও কাছ থেকে কিছু শিখলেই সে গুরু হয়ে যায় না কি?

না মানলে হয় না, মানলে হয়।

তা হলে তো আমার গুরু অনেক। যার কাছে যা শিখেছি, সবাই গুরু!

তাই তো। আপনার চেয়ে যার জ্ঞান-গুণের ওজন বেশি সে-ই গুরু। ওজনওলা লোক চাই। যার যেমন ওজন সে তেমন গুরু। আপনার গুরুদের মধ্যে কার ওজন সবচেয়ে বেশি বাবুমশাই?

নয়ন একটু হাসে! তার পর বলে, কার্লমার্কস।

মোনা ঠাকুর একটুও চমকায় না। বলে, সে তো সে-ই আপনার সবচেয়ে বড় গুরু।

আপনি মূর্তি মানেন না? তবে যে হাটে শুনলাম আপনার কালীমূর্তি নড়ে-চড়ে, কথা কয়?

মোনা ঠাকুর নিভন্ত বিড়িটায় আর একবার আগুন দেয়। নয়নের দিকে চেয়ে থাকে। তার পর বলে, বাবুমশাই, মেয়েটা কে?

নয়ন উদাস গলায় বলে, ওই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব।

শুনে লোকজন নড়ে চড়ে বসে। লণ্ঠনওলা লোকটারও ঝিমুনি চোট খায়।

মোনা ঠাকুর ঠান্ডা গলাতে বলে, ও, তার পর একটু চুপ থাকে, তার পর ধীরে বলে, এটা মেয়ে তার বাপ-মা'র সঙ্গে এসেছিল বটে আজ বিকেলে। শ্যামলা রং, মুখে চোখে শ্রী আছে। সে-ই কী?

সে-ই। ওরা আপনাকে কী বলেছে?

মোনা ঠাকুর একটু অন্যমনস্ক চোখে শূন্যে চেয়ে থাকে। তার পর বলে, ওই মেয়েটার বড় ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। সে বছর পাঁচেক ধরে নিরুদ্দেশ। মোনা ঠাকুর আবার বিড়ি ধরায়, তার পর বলে, এমনিতে তো সংসারটা সুখেরই হওয়ার কথা ছিল। বুড়ো-বুড়ি, একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে, ঝুট-ঝামেলা কিছু নেই। তবু একটা গাঁট পড়ে গেল! ভারী দুঃখ ওদের।

নয়ন অধৈর্যের গলায় বলে, শুধু ওদের ছেলের কথা জিজ্ঞস করল? আর কিছু না?

মোনা ঠাকুরের মুখে একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে, বলে, আর তো মনে পড়ছে না। হাসিটা ঠোঁটে রেখেই মোনা ঠাকুর তার দিকে চেয়ে থাকে একটুক্ষণ, তার পর বলে, তা পাত্রী তো ভালই বাবুমশাই। লেগে যান।

বিদ্রূপটা ধরতে কষ্ট হয় না তার। ভিতরটায় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তবু বাইরে সে শান্তই থাকে। স্থির ও কঠিন চোখে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে সে বলে, আমাদের বিয়ে কোনও শালা আটকাতে পারবে না।

মোনা ঠাকুর একটু নরম, যেন বা সান্ত্বনার সুরে বলে, আটকানোর কি। করবেন বিয়ে। গরিব-গুরবো, কুঠে-ভিখিরিও বিয়ে করে। ও আর এমন কী? করলেই হয়।

তার মানে?

বললাম বিয়ে তো আখছারই হয়। অঘোন পড়ল তো শানাই ধরল পোঁ। কান ঝালাপালা, বিয়ের মাসে এই মায়ের থানেই কত নতুন বর-বউ আসে। বিয়ে সবাই করতে পারে। কলকাতার ফুটপাতে ভিখিরিদের বিয়ে দেখেননি?

নয়নের ভ্রূ কুঁচকে আসে, ভ্রূর তলা দিয়ে সে মোনা ঠাকুরকে নিরীক্ষণ করে বলে, বিয়ে যে হয় তা আমিও জানি। কিন্তু বিশেষ একজনের সঙ্গে বিশেষ আর একজনের বিয়ে হয় কি না সেটাই সমস্যা।

আপনার বাধা কী?

আমরা তেলি, ওরা বামুন। ওর বাবা-মা এ বিয়ে চাইছে না।

মোনা ঠাকুর সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলে, আর মেয়েটা?

সে ও চাইছে না। কিন্তু জাতের জন্য নয়, বাবা-মার জন্য। কিংবা অন্য কারণ থাকতে পারে।

তা হলে?

তা হলেও কিছু যায়-আসে না। আমি ওকে জোর করে কেড়ে আনব। কোনও শালা কিছু করতে পারবে না।

কে কী করবে বাবুমশাই?

নয়ন স্থির দৃষ্টিতে মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে বলল, ওরা ওদের ছেলের কথা ছাড়া আর কিছু বলেনি?

কী বলবে?

আমার কথা? বলেনি যে নয়ন নামে একটা লক্কড় ছেলে শ্যামার পিছনে ছায়ার মতো ঘোরে? বলেনি সেই ছেলেটার জ্বালায় ওদের মেয়ে রাস্তায় হাঁটতে পারে না?

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, না।

নয়ন একটু হাসে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনি বাণ মারতে পারেন?

মোনা ঠাকুর নয়নের চোখে চোখে চায়। তার পর মাথা নেড়ে বলে, ওসব আমি জানি না।

নয়ন অবাক গলায় বলে, জানেন না? কিন্তু লোকে বলে, আপনার বিজনেস-ই হচ্ছে বাণ মারা। সেই যে মাটিতে ছবি এঁকে ছোরা বসিয়ে দিলে যার ছবি আঁকা হয়েছে সে মুখে রক্ত তুলে, পা ছুঁড়ে দাপিয়ে মরে যায়? ওরা আপনাকে বলেনি নয়ন রায়কে বাণ মারতে হবে?

মোনা ঠাকুর দুঃখিত করে বলে, না বাবুমশাই।

নয়ন একটা কৃত্রিম স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলে, যাক, বাঁচা গেল।

মোনা ঠাকুর তার দিকে মিট মিট করে চেয়ে থেকে বলে, বাণ মারার চিন্তা করে খুব কি ভয় পেয়েছিলেন বাবুমশাই?

নয়ন কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে, ভীষণ।

আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না।

কী মনে হয় না?

যে আপনার ভয়-ডর আছে।

নয়ন একটু হাসে। তার পর শান্ত বিদ্রূপের গলায় বলে, আপনি তো ছবিতে বাণ মারেন! কিছু লোক আছে যারা সত্যিকারের মানুষটাকেই বাণ মারে, সামনা-সামনি। আপনার বাণের চেয়ে এই বাণ আরও বিপজ্জনক। দেখবেন? বলে নয়ন তার শার্টটা কোমরের কাছ থেকে টেনে তোলে, তার পর হাত দিয়ে পেট আর তলপেটের মাঝামাঝি দু'-আড়াই ইঞ্চি একটা গভীর ক্ষত দেখায়। কয়েকজন লণ্ঠন তুলে ঝুঁকে পড়ে। দেখে। মোনা ঠাকুর উদাস মুখে বসে থাকে।

বছর চল্লিশ বয়সের ধূর্ত চেহারার একটি লোক ঝুঁকে দাগটা দেখে মুখে চুকচুক শব্দ করে বলে, কী হয়েছিল?

স্ট্যাব। ঠান্ডা গলায় বলে নয়ন।

জোর বেঁচে গেছেন, ছোরাটা ঠিকমতো টানতে পারেনি। পারলে বাঁচতেন না।

মোনা ঠাকুরের দিকে চেয়ে নয়ন বলে, যারা আমাকে হিন্দু হোস্টেলের পাশের গলিতে এক রাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারা আপনার চেয়ে অনেক ভাল বাণ মারতে পারে। তাদের বাণে ভুলচুক হয় না। কলকাতায় এবং অন্য জায়গায় এরকম বিস্তর লোক নয়ন রায়কে বাণ মারার সুযোগ খুঁজছে। ভয় পেলে আমার চলে না মোনা ঠাকুর।

মোনা ঠাকুর উত্তর দেয় না। চিন্তিত মুখে অন্যমনস্ক হাতে হাতড়ে বিড়ির বান্ডিলটা খোঁজে। নয়ন তার দিকে চায়। লণ্ঠনওলা বুড়োর ঝিমুনি পুরোপুরি কেটে গেছে, হাঁ করে চেয়ে আছে নয়নের দিকে, গলায় অবিরল কফের শব্দ হচ্ছে ঘড়ঘড়। একজন প্রৌঢ় মানুষ নস্যি রঙের খদ্দরের চাদর গায়ে সামনে বসে আছে, কালো হাতে সাদা একটা ঘড়ি, চোখে চশমা, বোধহয় গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার, নাড়ুগোপালের মতো থলথলে মুখ। লোকটা মোনা ঠাকুরের দিক থেকে ইতিমধ্যেই অর্ধেক ঘুরে বসেছে নয়নের দিকে। মুখে একটা বিস্মিত বোকা হাসি। চল্লিশ বছরের ধূর্ত চেহারার লোকটা নিশ্চিত পঞ্চায়েতের লোক, রোগা রোগা হাত-পা, মাথার চুলে প্রচুর তেল, গায়ে বিয়ের শালটা আধময়লা ধুতির ওপর বেমানান। লোকটা অনেকখানি ঘেঁষে নয়নের কাছাকাছি এসে গেছে। তার চোখে-মুখে চঞ্চল কৌতূহল। মোনা ঠাকুরের বাঁ ধারে আরও দু'জন লোক বসে আছে। তারা চাষিবাসি শ্রেণীর, ভাবলেশহীন এবড়ো-খেবড়ো মুখ। চোখে নির্বুদ্ধিতার নিষ্প্রভতা। তারা নয়ন আর মোনা ঠাকুরের চাপান-ওতরটা ঠিকমতো বুঝতে পারছিল না এতক্ষণ। ছুরি-ছোরার কথায় একটু চাঙ্গা হয়ে চেয়ে দেখছে নয়নকে। খুন-খারাপি যে তারা কিছু না দেখেছে এমন নয়, তবে নয়নের চোটপাটের কথাবার্তা যে তারা পছন্দ করছে তা তাদের মুখে সম্ভ্রমের ভাব দেখেই বোঝা যায়। মোনা ঠাকুরের ডান ধারে পুঁটুলির মতো তিন-চার জন মেয়েছেলে। তাদের রি-অ্যাকশন নয়ন এই অল্প আলোতে ঠিক বুঝতে পারল না। তবে এটা ঠিক, মোনা ঠাকুরের দিক থেকে সকলের মনোযোগ নিজের দিকে এনে ফেলেছে। সেটা পেরেছে বলে একটু তৃপ্তি বোধ করে নয়ন। এখন ইচ্ছে করলেই সে মোনা ঠাকুরের আসনটিকে একটি ধাক্কা দিতে পারে, কিন্তু তা দেবে না নয়ন। সময়ের অপেক্ষা করা ভাল। তা ছাড়া, মোনা ঠাকুরের ওপর নয়নের যথেষ্ট রাগ হচ্ছে না।

অনেকক্ষণ বাদে মোনা ঠাকুর একটা শ্বাস ফেলে। নয়নের দিকে চায়। তার পর জিজ্ঞেস করে, আপনার কি অনেক শত্রু?

নয়ন আত্মবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে, অনেক।

কেন বাবুমশাই?

সে কথার উত্তর না দিয়ে নয়ন হঠাৎ বলে, আপনি আমাকে বাবুমশাই বাবুমশাই বলছেন কেন?

শহরের মানুষ আপনারা, সয়-সম্মান করা ভাল।

শহরের মানুষ কি আলাদা কিছু? আমি শহর গ্রাম আলাদা করে বুঝি না। এই যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা যেমন, আমিও তেমনি।

তাই কি হয়! জায়গা বুঝে আমরা মানুষ চিনি।

শহরের মানুষকে আপনারা বেশি সম্মান করেন কেন?

তারা যে তা-ই চায়। গাঁয়ের লোকেরা তাদের সমকক্ষ তো নয়।

ওটা ছেঁদো কথা। আসলে আপনারা নিজেদের খাটো ভাবেন।

তা হোক বাবুমশাই, তা হোক। লোককে শ্রদ্ধা-সম্মান করার শিক্ষা ভালই। ওতে ক্ষতি হয় না।

নয়ন ধরতে পারে,কথাটার দ্বিতীয় অর্থ আছে, যা তাকেই বলা। নয়ন গায়ে মাখল না। কেবল বলল, আমার... আমার শত্রুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না?

আজ্ঞে।

ওই যে যেমন আমি ওই মেয়েটাকেই চাই বলে ওর মা-বাপ আমার শত্রু, তেমনি আমি আরও অনেক কিছু চাই বলে আরও অনেকে আমার শত্রু।

মোনা ঠাকুর চুপ করে বিড়িতে টান দেয়। বিড়ি খাওয়ার একটা নিজস্ব ধরন আছে তার। যেন ধোঁয়া তার বুক পর্যন্ত পৌঁছয় না, গলা থেকেই ফিরে আসে। দু'-একবার ছোট্ট টান দিয়ে বলে, মেয়েমানুষের ক্ষমতা অনেক। মা হয়ে, বউ হয়ে, মেয়ে হয়ে কত খেলা যে দেখায়। পুরুষের জান লবেজান। তা মেয়েমানুষ বাদে আপনি আর কী চান?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে, মেয়েমানুষ চাই বটে, তবে ওই মেয়েটিকেও চাই। ওকে না পেলে আমার খিদে মিটবে না।

কথাটার নির্লজ্জতা সবাইকে স্পর্শ করে। এই নির্লজ্জতারও একটা স্বীকারোক্তির মতো আকুলতা আছে। এর সাহস সবাইকে আকর্ষণও করে। ল্যাংটো কথার জোর বেশি।

নয়ন বলে, আর যা চাই তা হচ্ছে ক্ষমতা মোনা ঠাকুর। এই জায়গায় আপনার যেমন ক্ষমতা, দেশ জুড়ে তেমনি ক্ষমতা চাই। ক্ষমতা পেলে কী করব তার কি কোনও ঠিক আছে? তবে হয়তো আপনাকে এবং আপনার মতো লোকদের উচ্ছেদ করব। মন্দির-মসজিদ-গির্জা ভেঙে তৈরি করব রাস্তা, খেত, শিশুদের জন্য বাগান। বড়লোকদের ধরে চাবকাব তারা বড়লোক বলে, গরিবদের ধরে চাবকাব তারা গরিব বলে। অলস আর চোরদের তাড়িয়ে দেব। কত কী প্ল্যান আছে আমার! দেখবেন।

মোনা ঠাকুর একটু হেসে বলে, মেয়েমানুষদের ধরে চাবকাবেন তারা মেয়েমানুষ বলে আর পুরুষদের তারা পুরুষ বলে।

তা কেন? আমি কি পাগল? মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটো দু' রকম প্রাকৃতিক সৃষ্টি। সেটা তাদের দোষ নয়।

তো গরিব বা বড়লোক হওয়াটা কি দোষের?

নিশ্চয়ই। যে বড়লোক সে পাঁচজনেরটা একা ভোগ করে বলে দোষী, যে গরিব সে নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে পারে না বলে দোষী।

এটা যুক্তি নয়, নয়ন জানে! কিন্তু কুযুক্তির মধ্যেও জোর প্রকাশ করাটা তার স্বভাব। তাতে কাজ হয়।

সবাই চুপচাপ তার দিকে চেয়ে আছে। আত্মতৃপ্তিতে তার ভিতরটা টল টল করে। নয়ন বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরায়। হেডমাস্টার আর গ্রাম-পঞ্চায়েতের লোক দু'জন কথা বলছে গুন গুন করে। লণ্ঠনওলা বুড়ো স্খলিত চাদরটা দিয়ে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছে। বাইরে অবিরল ঝিঝির ডাক। দূরে একঝাঁক শেয়াল চিৎকার করে। কুকুর কাঁদে। জ্যোৎস্না ফুটেছে নাকি! কুয়াশায় মাখা জ্যোৎস্নার দৃশ্য নয়নের বড় প্রিয়! মলিন পৃথিবীর গায়ে কে যেন ছবি এঁকে দেয়! অলৌকিক ছবি।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল নয়ন। ঠিক সেই সময়ে সে মেয়েটিকে দেখল। ভিতরের দরজায় কপাটের আড়ালে ছায়ায় মেয়েটি মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। বিকেলেও দেখেছিল, শ্যামার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন্দিরের মাঠে। মোনা ঠাকুরের মেয়ে। মুখ চোখ খারাপ নয়। শরীরটাও ভালই। ভোগের চাল-কলা খেয়ে দিব্যি আছে। এমনিতে মেয়েটির প্রতি নয়নের কোনও আকর্ষণ বোধ করার কথা নয়। কিন্তু শ্যামা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে, তার নাগালের বাইরে, এই চিন্তাটা তার ভিতরে একটা আক্রোশ জাগিয়ে তোলে। শোধ নিতে ইচ্ছে হয়। ভীষণ খিদে জেগে ওঠে। এই মেয়েটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেললে এক ধরনের তৃপ্তিকর অবসাদ আসত তার। ভিতরটা তার কখনও জুড়ায় না। কখনও না। কেবল যখনই সে কোনও মেয়েকে আক্রমণ করে, উন্মোচন করে ফেলে তার সবকিছু, নিংড়ে নেয় দেহ, কেবল তখনই একটা অবসাদের প্রলেপ পড়ে ভিতরটায়। নইলে সে জ্বলছে, জ্বলছে।

কপাটের ছায়া থেকে মেয়েটির চোখ তারই চোখে পড়ে আছে। সে তা স্পষ্ট অনুভব করে। নির্লজ্জের মতো তাকিয়ে থাকে! হেডমাস্টার একবার গলা খাঁকারি দেয়, পঞ্চায়েতের লোক নড়ে চড়ে নয়নের আরও কাছে আসে, নয়ন সে সব খেয়ালই করে না। তাকিয়ে থাকে।

মোনা ঠাকুর হয়তো নয়নকে তাকিয়ে থাকতে লক্ষ্য করেই অনুচ্চস্বরে বলে, কপাটের আড়ালে কে রে? তারা?

মেয়েটি আলোর মধ্যে আসে। হাতে চাবি। বলে, বাবা মন্দিরের কপাটে তালা দেব?

দে। উদাস গলায় বলে মোনা ঠাকুর।

পরনে পুজোর খাটো কাপড়, খোলা এলোচুল, মাজা পরিষ্কার শরীর, সতেজ দাঁত। সাজগোজ নেই বলে মেয়েটার সুস্বাদ শরীর তাকে আরও আকর্ষণ করে! তক্ষুনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে নয়ন, হাত-পা নিশপিশ করতে থাকে। তার দাঁতে দাঁত চাপে সে। চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে মেয়েটা এক ঝলক চোখ তাকে দিয়ে যায়। আত্মবিস্মৃতের মতো মেয়েটার পিছু নেওয়ার জন্য নয়ন উঠে দাঁড়ায়। সে ইঙ্গিত বোঝে, সে নিমন্ত্রণ পেয়ে গেছে।

দাদা কি চললেন? বলতে বলতে পঞ্চায়েতের লোকটা তার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়, বলে, আমিও জগদীশের বাড়ির দিকেই থাকি, কুমোরপাড়া, চলনু এগিয়ে দিই।

আমার সঙ্গী দরকার হয় না।

দু'-চারটে কথাও বলব খন, চলুন না।

'শুয়োরের বাচ্চা'। মনে মনে গালি দিল নয়ন। তার ভিতরটা ঝিমিয়ে এল।

বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে ঠিকই। কুয়াশার পাতলা আবরণ চারদিকে। একমাত্র এই হেমন্তেই এরকম অপার্থিব ব্যাপারটা দেখা যায়। দরজা থেকে দৃশ্যটা দেখে নিয়ে সে মুখ ফিরিয়ে মোনা ঠাকুরকে বলে, চলি।

মোনা ঠাকুর ঘাড় নাড়ে, তার পর বলে, বাবুমশাই, আজ সারা বিকেল এ অঞ্চলে খুব কোকিল ডেকেছে, তিতির পাখি ডেকেছে, আরও কত কী পাখি! পাখির ভাষা যারা বোঝে তারা জানে ওসব আসল পাখি নয়। নকল।

নয়ন একটু হাসে। তার পর বলে, আপনি পাখির ভাষা জানেন।

মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে না। মুখে বলে, কিন্তু কেউ কেউ জানে।

লোকজন একটু অবাক হয়ে দু'জনকে দেখছিল, সেই হেডমাস্টার লোকটা বলে উঠল, বাস্তবিক ঠাকুরমশাই, আজ কোকিলের ডাক খুব শুনেছি বটে। এ সময়ে এত ডাকে না তো!

নয়ন বা মোনা ঠাকুর কেউ কোনও উত্তর দিল না লোকটার কথায়। কেবল নয়ন বলল, মোনা ঠাকুর, মনে হচ্ছে আপনি পাখির ভাষা জানেন। নইলে ওটা যে নকল ডাক আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারেনি।

মোনা ঠাকুর চুপ করে থাকে।

নয়ন হঠাৎ বলল, কিন্তু মোনা ঠাকুর, মানুষের মানব-কথা যখন পাখির ডাক হয়ে যায় তখন সে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আপনার নেই। ওই নকল ডাকেও কিছু কথা বলা ছিল।

মাঠের রাস্তাটা মন্দির ঘুরে নাবালে নেমে গেছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। অক্ষম আক্রোশে দৃশ্যটা দেখলে নয়ন। এমন নির্জনে একাকী ব্যাধ ও হরিণ। পঞ্চায়েতের লোকটা ভালুকের মতো তার গায়ে গা ঘষড়াচ্ছে। কিছু বলছে। নয়ন শুনছে না। মেয়েটার পা সিঁড়িতে ধীর হয়ে এল। শেষ দুটো সিঁড়িতে দু'টো পা রেখে মেয়েটা জ্যোৎস্নায় চেয়ে আছে তার দিকে। তারই দিকে। এ-সব সময়ে কোনও ভাষা ব্যবহারের দরকার হয় না, শরীরই তো কথা, শরীর-গন্ধে শরীর চলে আসে কাছে। বৃথা তখন ভাষার ব্যবহার। নয়ন জ্বলে। হাত মুঠো পাকায়।

পঞ্চায়েতের লোকটা বলে, বুঝলেন?

মাঠ ঘুরে তারা নাবালে নেমেছে। মেঠো পথে একটা মাটির ঢেলায় হোঁচট খেয়ে সামলে নয়ন জিজ্ঞেস করে, কী?

লোকটা সিদ্ধ পুরুষ।

কে?

মোনা ঠাকুর।

ও।

তবে ওঁর ঠাকুরদার আরও ক্ষমতা ছিল। শুনেছি তাঁর চোখের দিকে তাকানো যেত না।

ও।

জগদীশের সঙ্গে আপনার আগে চেনাশুনা ছিল না?

না।

লোকটা বড্ড গোঁয়ার।

নয়ন চুপ করে থাকে। হুঁ হা কিছুই করে না। তবু লোকটা বলে, কী হয়েছিল জানেন? জগদীশ এসেছিল এক সার্কাসওলার সঙ্গে। খেলা-টেলা দেখাত না বড় একটা, বাঘ-সিংহীকে খাবার দিত। একদিন খাবার দিতে গিয়ে সিংহ খেপে থাবা মারে। পাঁজর ভেঙে হাসপাতালে পড়ে রইল আট ন'মাস। সেই সময়ে তার খুব দেখাশোনা করেছিল হারাধন বারিক। জগদীশকে সেই-ই তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। বেশ কয়েক বিঘে জমি, নগদ টাকা এসব পেয়ে বিয়ে করে এই গাঁয়েই জমে গেল জগদীশ। বিয়ের সাত মাস বাদে তার ছেলে হল, বুঝলেন? বলে লোকটা খিক খিক করে একটু হাসে।

অন্যমনস্ক নয়ন বলে, বুঝেছি।

কী বুঝলেন?

বিয়ের পর জগদীশের ছেলে হল তো! সকলেরই হয়।

দুর মশাই! ছেলে ঠিক সময়ে হলে তো দশ মাস লাগার কথা। এ তো হল সাত মাসে। কিছু বুঝলেন না। আরও দেখুন, জগদীশের চালচুলো নেই, ভিনদেশি, কেউ চেনেও না তাকে, তবু হারাধনদা তার সঙ্গেই বিয়ে দিল কেন। দু' হাজার নগদ, দশবিঘে জমিও তো সোজা কথা নয়। গাঁয়েও সুপাত্রের অভাব ছিল না। সব যোগাযোগ করে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝে যাবেন।

জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! অপার্থিব ছবি মলিন পৃথিবীর গায়ে। এই সময়ে কোনও আবর্জনা চোখে পড়ে না নয়নের। সে মুগ্ধ এবং সম্মোহিতের মতো হাঁটতে হাঁটতে বলে, ও।

হারাধনদার মেয়েটা ছেলের জন্ম দিয়ে মরে গেল। বেঁচেই গেল বলা যায়। সত্যিকারের বেঁচে থাকলে পাড়াগাঁ-দেশে বিস্তর কথা শুনতে হত থাকে।

হুঁ।

লোকটা খিক খিক করে একটু হেসে বলে, কিন্তু জগদীশের বিশ্বাস ওই ছেলে তারই। বুকের পাঁজর করে রেখেছে। ছেলের কোষ্ঠী করতে এসেছিল মোনা ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরমশাই কোষ্ঠী করলেন বটে, কিন্তু ছেলের বাপের নাম কোষ্ঠীতে লিখলেন না। জগদীশের সঙ্গে ঠাকুরমশাইয়ের ঝগড়া তখন থেকেই। জগদীশ বলে, আমিই ওর বাপ। মোনা ঠাকুর মাথা নেড়ে বলে, এর ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম। বুঝলেন মশাই, আমাদের মুখ থেকে এসব কথা বেরোলে তা আন-কথা কান-কথা, লোকে দোষ ধরে, বলে কুচ্ছো গাইছি। কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের কথা তো আর ফেলবার নয়! ও তো বাকসিদ্ধের কথা। মোনা ঠাকুরের মুখ থেকে কথাটা বেরোতেই লোকের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল। গাঁয়ে রটে গেল সব ব্যাপার-স্যাপার, যারা বিশ্বাস করত না তারাও বিশ্বাস করতে লাগল। জগদীশ সেই থেকে নিজে নিজে একঘরে। পাছে ছেলের কানে কথাটা যায় সেই ভয়ে সে কারও সঙ্গে মেশে না, কারও বাড়ি যায় না, শ্বশুরবাড়ির ছায়াও মাড়ায় না। চাষ-বাস করে, বনে-বাদাড়ে সাপ ধরে বেড়ায়। বলে, আমিই গাঁয়ের লোকদের একঘরে করে দিয়েছি। বুঝুন আস্পদ্দা।

গাছের ছায়ায় জ্যোৎস্নার আঁকিবুকি। কোনও গেরস্তর উঠোন তারা পেরিয়ে যাচ্ছিল। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। এ দেশের কুকুরগুলো পর্যন্ত কাজের নয়, ভাবল নয়ন। মানুষগুলোর মতোই অপদার্থ। উলটাবাগে দুটো লোক হেঁটে আসছে, একজন বলে, কে, দিগিন নাকি?

হয়।

কাল তো সাক্ষী দিতে সদরে যাচ্ছ!

যাব।

আমার ফর্মটা এনো। সঙ্গে কে?

আনব। ইনি জগদীশের বাড়ি এসেছেন।

লোকটা দাঁড়িয়ে যায়, কোন জগদীশ? সাপওলা?

হুঁ।

তার আবার কে এল? তিন কুলে তো তার...

লোকটার কথার উত্তর না দিয়ে তারা হেঁটে যায়। একটা ভেজা উদ্ভিদের গন্ধ উঠে আসছে আশপাশ থেকে। হাওয়া ঝলক দেয় মাঝে মাঝে। এদিকটায় বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। খেজুর গাছের গলায় কলসি। পায়ের পাতা ঘাসে পড়লে টপ টপ জল ঝরছে ঘাসের গা বেয়ে। শুকনো পাতা খসছে গাছের। শীতে নাকে জল সরছে। নয়ন দুটো হাত বুকে চেপে ধরে।

আপনার কথাগুলি কিন্তু বেশ পষ্ট-পষ্ট।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, মশাই কি পলিটিক্স-টলিটিক্স করেন না কি?

কেন?

জিজ্ঞেস করছি। কার্ল মার্কসের কথা বললেন কিনা!

ও এমনিই।

লাল-ঝান্ডার লোক এদিকেও আছে অনেক। তবে গাঁ-দেশের মানুষ তো সব, ঠিক ঠিক কিছু বোঝে না। আবছা-আবছা ধরে নেয় ঠিক বিশ্বাসও করে না।

কেন?

সবাই তো গাঁয়ের লোকের ভালই করতে চায় মশাই, কিন্তু একদলের ভালর সঙ্গে আর একদলের ভাল যে বনে না। চাষি-বাসি গেঁয়ো লোকের মাথাও তো তেমন শার্প নয়, সব দলের ভাল ভাল কথা তো সেইসব ভোঁতা মাথায় সেঁদোচ্ছে! শেষে মাথার ভিতরে সব ভাল কথা খটাখটি লাগিয়ে তালগোল পাকায়। তখন আবার কথাগুলো ঝেড়ে ফেলতে তারা মায়ের থানে একটা ঢিপ করে নিয়ে যে যার কাজে লেগে যায়।

বলে লোকটা খিক খিক করে হাসে।

নয়ন উত্তর দেয় না।

লোকটা গতি ধীর করে বলে, আমি বাঁ ধারে যাব।

আচ্ছা।

লোকটা গাছের ছায়ায় একটা শুঁড়ি-পথে ঢুকে যায়।

সুকুল জেগেই ছিল। আবজানো দরজা ঠেলে সে ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই সুকুল মশারি তুলে বাইরে আসে। উত্তেজিত গলায় বলে, তুমি শেয়াল ডাক ডাকছিলে?

না তো!

তবে যে শেয়ালের ডাক শুনলাম এইমাত্র!

সে সত্যিকারের শেয়াল সুকুল।

সুকুল বলে, একবার ডাকো না।

চিন্তান্বিত মুখে নয়ন বলে, এখন শুয়ে পড়ো। কাল সকালে তোমাকে অনেক ডাক শেখাব।

ভিতরের বারান্দায় রান্না করছিল জগদীশ। সাড়া পেয়ে ভিতরে এল। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য আর চাষাড়ে চেহারার জগদীশ। কিন্তু তার মুখে নির্বুদ্ধিতা নেই। একটু হয়তো ভালমানুষি আছে কিন্তু উজ্জ্বল চোখজোড়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে বোঝা যায় যে চোখ দু'খানা অনেক কিছু লক্ষ করে।

জগদীশ সতর্ক চোখে তাকে লক্ষ করে হঠাৎ চাপা গলায় বলল, অনেক দেরি হল আপনার।

নয়ন জামাটা খুলে কাঠের চেয়ারের পিঠে রেখে বলে, মোনা ঠাকুরের একটা ইন্টারভিউ নিলাম।

কী মনে হয়?

কিছু না ফাঁকা আওয়াজ। একটা আলু টপকালেই...

জগদীশ মাথা নাড়ল, বলল, মোনা ঠাকুর শক্তিমান লোক।

কীসের শক্তি?

জগদীশ একটুক্ষণ ভেবে বলে, কারও প্রতি খুব ভালবাসা থাকলে মানুষ একরকমের শক্তি পায়! এই যেমন সুকুলকে ভালবাসি বলে আমি অনেক কিছু উপেক্ষা করতে পারি, অনেক সইতে পারি। ঠিক সেই রকম। মোনা ঠাকুরের ভালবাসা তার গুরুর ওপর। ওইখানে মোনা ঠাকুরের ফাঁকি বড় একটা নেই। শক্তিও সেখানে। আপনি বিশ্বাস করেন না?

নয়ন অন্যমনস্ক ছিল, তার চোখের সামনে শ্যামার মুখ। সে বলল, করি।

যদিও মোনা ঠাকুরের সঙ্গে আমার সদ্‌ভাব নেই।

কেন?

জগদীশ একটু ম্লান হাসে, তার পর বলে, কিছু শোনেননি? গাঁয়ের সবাই তো জানে, আর বলাবলিও করে।

নয়নের খুব খারাপ লাগল হঠাৎ। সুকুল মশারির বাইরে বসে চৌকি থেকে পা দোলাচ্ছে।

মুখখানায় শৈশবের সুন্দর হাবলা ভাব। একটু হাঁ মুখ, চোখে অপার কৌতূহল। মাথার চুল অনেককাল কাটা হয়নি বলে চুলের চালচিত্তির মুখখানাকে ঘিরে ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। অবাক চোখে নয়নকে দেখছে সুকুল। ভাবছে, এ লোকটা কী করে অমন পাখির ডাক ডাকে! ইস, ঠিক তো পাখির মতোই!

রাতকানা একটা গুবরে পোকা ভোঁ চক্কর দিচ্ছে। দেয়ালে-দেয়ালে ঠোক্কর খাচ্ছে। সুকুল মুখ তুলে পোকাটা দেখে বলে, বাবা, দ্যাখো এরোপ্লেনপোকা।

নয়ন সুকুলের সুন্দর মুখখানা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

জগদীশ বলল, যে যা-ই বলুক, সুকুল আমারই।

সুকুল তার বাবার দিকে চাইল। বড় বড় দু'খানা চোখে একটা স্বাভাবিক কাজলটানা ভাব আছে। বিষণ্ণ চোখ। জগদীশের দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গি এমন আকুল যে নয়নের আবার একটা শ্বাসকষ্টের মতো হয়। সে মুখটা ফিরিয়ে জগদীশকে বলে, ওসব আমি পাত্তা দিই না।

গুবরে পোকাটা চক্কর তো দিচ্ছেই। দেয়ালে-দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নেমে আসছে। সুকুলের মাথা ছুঁয়ে গেল বুঝি! জগদীশ তড়িৎ পায়ে গিয়ে একটা ঝাপটা মারল। কোন কোণে কোথায় ছিটকে পড়ল পোকাটা।

নয়ন বলল, ও পোকা কামড়ায় না।

জানি। তবু সতর্ক থাকা ভাল।

সতর্কতার কথা শুনে নয়ন একটু হাসে। বলল, আপনি যদি অত সাবধানী তো ছেলেকে নিয়ে সাপ ধরতে যান কেন?

জগদীশ গিয়ে সুকুলের পাশে বসে। বসতেই ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সুকুল। শুয়ে নয়নের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জগদীশ বলে, ভয়ঙ্করদের নির্বিষ করার শিক্ষা থাকা ভাল। একদিন তো সুকুলকে নিজে- নিজেই চলতে হবে! ওকে তাই তৈরি করে দিচ্ছি।

সুকুল হাই তোলে। জগদীশ আলতো হাতে ওকে চাপড়ায়। মায়ের মতো।

নয়নের দিকে চেয়ে বলে, বারান্দায় বালতিতে জল তোলা আছে, হাত-মুখ ধুয়ে নিন।

নয়ন বাধ্য ছেলের মতো ওঠে।

দরজার পাশেই দড়ির দোলনায় দুটো বেঁটে সাপের ঝাঁপি ঝুলছে। তার পাশে একটা স্ট্যান্ডের ওপর কাচের বাক্স। নয়ন দাঁড়ায়। কাচের বাক্সটার মধ্যে দুটো কেউটে। মাথায় রুইতনের চিহ্ন। শরীর পাক খেয়ে আছে। নিঃসাড়, ঘুমন্ত যেন।ঝুড়ি দুটোর গায়েএকবার হাত রাখল নয়ন। নিস্তব্ধ। একটু হাসল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কোলে আধ-ঘুমন্ত সুকুলের মুখের দিকে চেয়ে আছে। মৃদুস্বরে গল্প বলছে। বাইরের কুকুর কাঁদছে চাঁদের দিকে চেয়ে।

হাত-মুখ ধুয়ে নয়ন এসে দেখে সুকুল ঘুমিয়ে পড়েছে। তার চারধারে যত্নে মশারি গুঁজে দিয়ে জগদীশ একটা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে কাঠের চেয়ারটায়। দুটো চোখ শূন্য। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় তার আধখানা মুখ আলোকিত, বাকি আধখানা আবছায়। মুখের রেখাগুলো পাথরের মূর্তির মতো স্থির। নয়নের হঠাৎ মনে হয় দুঃখচাপা জগদীশকে যে রকম ভালমানুষ আব নির্বিষ মনে হয় ততটা সে নয়। খোঁচা খেয়ে ওর ভিতর থেকে প্রবল হিংস্রতা আর সিংহনাদ বেরিয়ে আসতে পারে।

কাচের বাক্সটার সামনে দাঁড়ায় নয়ন। মৃদু আবছা আলোয় তাদের দেখা যায়। সাপ আর সাপিনী। আবছা সরীসৃপ শরীর দুটো বালুর ওপর অনেক রেখা এঁকেছে। তীব্র আগ্রহে নয়ন দেখে। তার শ্বাস গভীর ও দ্রুত হয়। হাত দুটো নিশপিশ করে। কেমন ফুল তোলার মতো অনায়াসে জগদীশ বন-জঙ্গল থেকে তাদের গোপন শরীর তুলে আনে।

হ্যারিকেনটা তুলে আনে নয়ন। কাচের বাক্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে। কী চমৎকার সতেজ

কালচে শরীর! যখন ছোবল তোলে তখন কী মারাত্মক আকর্ষণকারী সেই আক্রমণের ভঙ্গি। বিষ! বিষ! আর চিন্তাশূন্য আক্রমণ।

বাক্সটার গায়ে ছোট্ট দুটো টোকা দেয় নয়ন। তারপর দুটো জোরে টোকা দেয়।

জগদীশ পিছন থেকে বলে, কী করছেন! ও দুটোর আবার বিষদাঁত উঠেছে, কামাতে হবে। চলে আসুন।

আমি দেখব।

কী?

ওদের...কথাটা শেষ না-করে হাসে নয়ন। বিলোল হাসি।

কী বলছেন? জগদীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

একটা হতাশার শ্বাস ফেলে নয়ন বলে, কিছু না। চলুন খেয়ে নিই।

জগদীশ বলে, চলুন।

বলে ওঠে।

রাত খুব বেশি হয়নি। কিন্তু পাড়াগাঁ বলে অনেক রাত মনে হয়।

খেতে বসে জগদীশ হঠাৎ বলে, মানুষ কোনও কোনও ব্যাপারে নিয়ম মানে না। কিন্তু জীবজন্তুবও একটা নিয়ম আছে।

কীরকম?

জগদীশ একটু হেসে বলে, আপনি ওই সাপ দুটোর কী অবস্থা দেখতে চেয়েছিলেন?

নয়নের মুখটা লাল হয়ে যায়, সে তরলভাবে হাসতে থাকে। বলে, ভালবাসা।

জগদীশ মাথা নেড়ে বলে, বুঝেছি! তাই বলছিলাম যে মানুষ সময় মানে না, দিনক্ষণ মানে না। এ এক আশ্চর্য। পৃথিবর শ্রেষ্ঠ জাত সবচেয়ে বেশি প্রকৃতির নিয়ম ভাঙে। সাপ কুকুর বেড়ালও মানুষের মতো এত নির্লজ্জ নয়। তারা নিয়ম মেনে চলে। একজোড়া সাপ আর সাপিনী এক জায়গায় আছে বলেই যে তারা যা-খুশি করবে এমনটা দেখা যায় না। ঠিক সময়টি এলে, খিদে জাগবে, আর তখনই মাত্র আপনি যা দেখতে চাইছেন দেখতে পাবেন। নইলে শতবার ওই বাক্সটা নাড়ালেও লাভ হবে না।

বলে জগদীশ হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলে, মানুষের মতো বেলাজা কেউ নয়। খিদে না পেলেও খাবে! খাওয়া, ভোগ এসবই তার সর্বস্ব।

খেয়ে উঠে জগদীশ সুকুলের বিছানায় শুতে গেল। পাশের ঘরে নয়নের বিছানা। সুন্দর পরিপাটি মশারি টাঙানো, জলের গেলাসটি ঢাকা দেওয়া, কোথাও খুঁত নেই। ঠিক যেন মেয়েলি হাতের কাজ। কার যে কোথায় ভাত মাপা থাকে! নইলে নয়ন তো আজ বিকেল অবদি লোকটাকে চিনতই না, এখনও যে চেনে তা নয়। শুধু জানে লোকটা সাপ ধরে, ছেলেকে (সে নিজের হোক আর অন্যেরই হোক) বড্ড ভালবাসে। আর জানে, লোকটা গৃহকর্মে নিপুণ।

ছাঁচবেড়ার ঘর। ফুটো-ফাটা আছে। হেমন্তের গড়ানে রাত। টেনে বাতাস দিয়েছে একটা। শুকনো পাতার শব্দ পাওয়া যায়। দুদ্দাড় শেয়াল বা কুকুর দৌড়ে গেল উঠোন ভেঙে। বাতাসের শিস শোনা যায় বেড়ার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। এতে কোনও অসুবিধে হয় না তার। গত এক বছর তার জীবন এ রকমই কেটেছে। সেবার বুড়ি ঝি সুখিয়ার চোখে ছানি পড়লে সে দেশে গেল। বাড়িতে লোক ছিল না। তখন সুন্দরবনের দিকে বান ডেকেছিল বলে কলকাতার ফুটপাত ভরে উঠেছিল জোয়ানমদ্দ মেয়ে-পুরুষে। কালো কালো চেহারার হাবা মানুষ সব, দিনমানে ভিক্ষে করে, রাতে চুরি। ফুটপাথে ছেঁড়া কাঁথার সংসার বিছিয়ে ছানা-পানা জাবড়া-জাবড়ি করে বসে। ঝাঁকড়া চুলের উকুন মারে, গালাগাল দিয়ে পরস্পর ঝগড়া করে। গা-ছাড়া ভাব। বান হয়েছে তো করব কী, এই রকম গা-সওয়া নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকে কলকাতার রাস্তায়। গাছতলায়

বেলাশেষে কুড়োনো কাঠ কাগজ ঠেসে ইঁটের উনুন জ্বেলে মেটে-হাঁড়িতে নাড়ি-ভুঁড়ি, তরকারির খোসা, গরম ভূষি, খুনসেদ্ধ চাপায়! তারই মধ্যে আবার পাথরের টুকরো ফুটপাথে ঘষে মশলা বাটে। সেইসব আধা-মানুষের সমাজ থেকে একটা নোনা মেয়েমানুষ তুলে আনল বড় জামাইবাবু। শাশুড়ি ঠাকরুণের কষ্ট বুঝে ঝি ঠিক করে দিয়ে গেল। নোনা মেয়েছেলেটার গা-গতর যে ভাল তা দিন সাতেক খাওয়া-দাওয়া করার পরই বোঝা গেল। কোল-পোঁছা একটা ছেলে, স্বামী হাজত খাটছে কার বাজারের থলে টেনে দৌড়েছিল বলে। ঝাড়া হাত-পা সেই মেয়েটিকে নয়ন লক্ষ করেছে কখনও-সখনও। লক্ষ একবার করলে নয়নের দেরী সয় না। সন্ধের ঘোরেই বাড়ি নিঝুম। বাবা উকিল মানুষ, বাইরের ঘরে মক্কেল ঠাসা, দম ফেলার সময় নেই। মা হাই ব্লাডপ্রেসার নিয়ে সন্ধ্যের পরই মশারির নীচে চলে যায়, হাতপাখা নাড়ে। ঠাকুর রান্নাঘরে। মেয়েছেলেটা সিঁড়ির নীচে ছেলে ঘুম পাড়াতে গেছে। সেই সময়ে নয়ন গিয়ে তাকে ঠেসে ধরে। চালটায় ভুল ছিল। চেঁচানিতে মক্কেলসুদ্ধ বাবা চলে এসেছিল। বেড়ালের মতো ছুটেছিল নয়ন। কিন্তু মক্কেলদের মধ্যে একজন ছিল দৌড়ের চ্যাম্পিয়ন।সদরে তাকে জাপটে ধরে ফেলল। পরে অবশ্য উকিলবাবুর ছেলে শুনে সে খুবই ম্রিয়মান হয়ে পড়ে, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেই রাতেই বাবা তাকে বের করে দেয়। সেই মেয়েমানুষটাকেও। সেই থেকে বাইরে-বাইরেই কাটে নয়নের। কোনও কিছুর ঠিক থাকে না। খাওয়া, শোওয়া এইসব অবশ্য ভাববার ফুরসৎই পায় না সে। তারটা দশজনই ভেবে আসছে এক বছর ধরে। নয়ন কেবল শ্যামার কথা ভাবে, বা আর কিছু। বাড়িব সদর বন্ধ হলেও মায়ের জন্য খিড়কিটা এখনও বন্ধ হয়নি। কলকাতায় ফিরলে সে বাড়িতেই থাকে। একটু বেশি রাত করে ঢুকতে হয়, এই যা। বাবা টের পায় হয়তো, দেখি-না-দেখি-না করে এড়িয়ে যায়।

কাজেই এই সুন্দর পরিপাটি বিছানাটিতে তার ঘুম না-হওয়ার কারণ নেই। বলতে কী, জগদীশের আশ্রয় না জুটলে হয়তো-বা মোনা ঠাকুরের মন্দিরের বারান্দায় পড়ে থাকতে হত। এই শীতে, খোলা হাওয়ায়, গেঞ্জির ওপর একটামাত্র শার্ট সম্বল করে।

ঘুম তবু আসছে না। মাথাটা বড্ড গরম। শরীরও। মোনা ঠাকুরের মন্দিরের কথা ভাবতে গিয়েই হঠাৎ সে জেগেই এক মায়া দেখল। কুয়াশায় মাখা সেই অলৌকিক জ্যোৎস্না, মন্দিরের প্রাচীন সাদা সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপে বঙ্কিম সুন্দর ভঙ্গিতে শরীর ভেঙে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তার চোখ চেয়ে আছে নয়নের দিকে। বিভ্রম? না। মাথা নাড়ে নয়ন। একথা ঠিক, সে মেয়েদের এখনও চেনে না। চিনবার বয়সও নয়। সে মাত্র চব্বিশ পেরোল। মেয়েদের বুঝতে বয়সও চাই। সে তো এখনও জানে না কেন শ্যামা খেলা করে তাকে নিয়ে, কেন-বা সেই সুন্দরবনের নোনা মেয়েমানুষটিকে চেঁচিয়ে বলেছিল, হারামির বাচ্চা! মেয়েদের না চিনেও নয়নের মনে হয়, ওই মেয়েটি মন্দিরের শেষ দু'টো সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ঘাটের পৈঠায় স্নানের আগে মেয়েরা যেমন দাঁড়িয়ে জলে নিজের ছায়া দেখে, তেমনি ছায়া দেখতে চেয়েছিল নয়নের চোখে।

ঘুম হবে না। নয়ন মশারির মধ্যেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে থেকে একটা সিগারেট ধরায়। ধোঁয়ায় মশারির ভিতরটা ভরে ওঠে। হ্যারিকেনের গন্ধ পায় সে। উঠে বাইরে আসে। পায়চারি করে। শরীর। শরীরই সব। জগদীশ কী একটা তত্ত্বকথা বলছিল! খিদে, ভোগ এ হচ্ছে মানুষের সর্বস্ব। জীবজন্তুরা মানুষের মতো নির্লজ্জ নয়।

নয়ন একটু থমকে দাঁড়ায়। অথচ মানুষ ছাড়া আর কেউ পোশাক পরে না। পোশাক পরে কেন? মানুষ কি জানে না যে পোশাকের ভিতরে তার শরীরটা ন্যাটো! সব মানুষই জানে মেয়েমানুষের শরীরে কী আছে, কিংবা কেমন করে সেই শরীর ব্যবহার করা যায়। তবে কেন মানুষ পোশাক পরে।

নয়ন একটি হাসে আপনমনে। ক্ষমতা হাতে পেলে সে নিয়ম করবে, পোশাক পরা চলবে না। বেহায়া, নির্লজ্জ, সবই তো জানো তোমরা, তবে কেন ওই পোশাক? ছেড়ে ফেলো, ছেড়ে ফেলো, উদোম হও, লজ্জার কী আছে? পরস্পরের ন্যাংটো শরীর দেখো, লজ্জা জুড়িয়ে যাবে হে!

সাপদুটো এখন কী করছে? এই মায়াবী জ্যোৎস্নার শীত রাত্রিটি, এই তো সময়। এখনও কি নিস্পৃহ দড়ির মতো শুয়ে আছে? যখন একটি মেয়ে শরীরের অভাবে নয়নের চোখে ঘুম নেই।

দরজাটা ঠেলতেই খুলে যায়। হ্যারিকেনের পলতে নামানো। মৃদু দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসে জগদীশের বিছানা থেকে। নিঃসাড়ে ঘুমোলে সুস্থ মানুষের শ্বাস ওরকম দ্রুত হয়। তা ছাড়া গাঁয়ের মানুষ, ঘুমটা গাঢ় হওয়ারই কথা।

নয়ন নিঃশব্দে হ্যারিকেনের কল ঘুরিয়ে আলোটা উস্কে দিল। আলো হাতে কাচের বাক্সটায় ঝুঁকে দেখল, যেমন দেখেছিল খানিক আগে তেমনি দুটো পড়ে আছে। ন্যাংটো কালো শরীর! শীতল। নিস্পৃহ। খুব মৃদু দুটো টোকা দিল নয়ন। তারা নড়ল না।

এভাবে ওদের উত্তেজিত করা যাবে না। শব্দ করলে জগদীশ জেগে যাবে। নয়ন বাক্সটা ভাল করে দেখে। সাধারণ বাক্স। একটা কবজায় পুঁচকে তালা ঝুলছে। পকেট থেকে ভাঁজ করা ছুরিটা বের করে নয়ন। ফলাটা তালার ভিতর ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতেই আলগা হয়ে গেল। গা-টা একটু শির শির করে তার। সাপদুটো নড়লও না।

নিঃশব্দে ডালাটা তুলে ফেলল সে। বাক্সের ভিতর থেকে একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ নাকে আসে। সম্ভভত ইঁদুর বা ব্যাঙ খেতে দেওয়া হয়েছিল ওদের, তারই কোনও টুকরো-টাকরা পড়ে পচছে। একটু দূর থেকে সাবধানে উঁকি দেয় নয়ন। ভয়ের কিছু নেই। যদি মাথা তোলে ছপ করে ডালাটা ফেলে দিলেই হবে। আপাতত ওদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে দেওয়া দরকার। নয়ন কখনও সাপদের মিলন দেখেনি। না-ঘুমোনো সময়টাও কেটে যাবে অন্যমনস্কতায়।

বিছানা ঝাড়ার ঝাঁটাটা ঘরের কোণে। একটা শলা খুলে নয়ন সাবধানে বাক্সের ভিতরে একটা খোঁচা দেয়। গায়ে লাগে না। বালিতে গেঁথে যায়। অনভ্যাসের হাত। আবার খোঁচা দেয়। এবার কোণের বিড়ে-পাকানো সাপটার গায়ে লাগে ঠিকই। কিন্তু সে নড়ে না। কোনটা মাদী, কোনটা মদ্দা তা অবশ্য সে চেনে না। তবু ওটাকে তার মদ্দা বলেই মনে হয়। মেয়েমানুষের রাগ বেশি।

দুটো-তিনটে খোঁচা বৃথা গেল। সাপটা কেবল মাথাটা একটু সরিয়ে নিল, শরীর নাড়ল! নয়ন ডালাটা প্রায় বন্ধ করে ধরে রইল। সাপটা আবার ঝিমিয়ে পড়তেই ডালাটা আবার সাবধানে তুলে ফেলল সে। আবার কাঠিটা স্পর্শ করল শরীরে...

কালো-বিদ্যুৎ কখনও দেখেনি নয়ন। দেখল। বিশ্বাস হয় না, এত দ্রুত ঘুম থেকে খাড়া দাঁড়িয়ে যেতে পারে কেউ। একটা প্রবল শ্বাসের শব্দ হল কেবল। একপলকের মুগ্ধতায় আর একটু হলেই হাতটা সরিয়ে নিতে ভুলে গিয়েছিল সে।

ডালাটা খাড়া তোলা ছিল, কোনদিকে পড়বে সেটা সিদ্ধান্ত নিতে একটুক্ষণ খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে ডালাটা আর একটু হলে বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু তার আগেই একটা মসৃণ ছোবল খেয়ে সাপটা বাক্সের কার্নিশ বেয়ে ঝুলে পড়েছে। কিছু করার নেই।

কালো একটা স্রোতের মতো নেমে আসছে। নেমেই আসছে সরীসৃপ চিকন শরীরখানা। ডালাটা পড়েছে কিন্তু হালকা ডালাখানা তাকে চেপে রাখতে পারছে না। স্বচ্ছন্দ শরীরটা বেয়ে আসছে সুন্দর মুক্তির দিকে, প্রতিশোধের দিকে।

নয়ন হ্যারিকেনটা ফেলে এক লাফে পিছিয়ে আসে। পাগলের মতো চেঁচায়, জগদীশবাবু...জগদীশবাবু...

চোখের পলকে মশারি প্রায় ছিঁড়ে জগদীশ বেরিয়ে আসে। হ্যারিকেনটা কাত হয়ে দপ দপ করছে, তেল পড়ছে গড়িয়ে। এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে যাবে সব। কালো অন্ধকারে সাপের কালো শরীরটা জগদীশও খুঁজে পাবে না।

কী? কী?— বলে জগদীশ গর্জন করে। ঘুম-লাগা চোখে মাথায় কিছু বুঝতে পারে না।

নয়ন কেবল 'সাপ' কথাটা উচ্চারণ করতে পারল।

জগদীশ এক ঝটকায় আগে হ্যারিকেনটা সোজা করল। সেটা নিভল না। কিন্তু আলো ঘুলিয়ে ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। সাপটাকে দেখতে পেল নয়ন। দরজার দিক থেকে ঘুরে মুখটা তুলেছে। চোখে জ্বালা, মুখে শ্বাস।

জগদীশ মুহূর্তের মধ্যে সাপুড়ে হয়ে গেল। কুঁজো হয়ে দু'টি সতর্ক জাগ্রত হাত উদ্যত করে এগিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে। মুখোমুখি। নয়ন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখে।

মানুষের ছোবল কত সুন্দর হয় তা দেখল নয়ন। এত সুন্দর কিছু সে কখনও দেখেনি। জগদীশ ঢেউ হয়ে গেল যেন। চকিতে শরীর ঝুঁকল। হাত প্রসারিত হল! এত দ্রুত যে বিশ্বাস হয় না। বাঁ হাতে সাপটাকে ফুলের মতো যেন গাছ থেকে তুলে নিল সে। এত অনায়াসে, যেন যে-কেউ করতে পারে।

ডালাটা খুলে, জগদীশ সাপটাকে ভিতরে ছেড়ে দেয়। সেটা আবার শরীরটাকে পাকে পাকে জড়ায়। মাথা কোলে নিয়ে ঝিমিয়ে পড়ে।

জগদীশ নয়নের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রুক্ষ স্বরে বলে, এটা কী হল?

নয়ন সামান্য একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, ঘুম আসছিল না।

কী দেখতে চেয়েছিলেন?

ওই, সেটা।

দাঁতে দাঁত ঘষল জগদীশ। অস্বাভাবিক ধীর গলায় বলল, এই ঘরে সুকুল আছে, আপনি জানেন না? যদি সুকুলের কিছু হত!

ওটা বেরিয়ে আসবে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু যদি বিছানায় যেত সাপটা? ওখানে আমার সুকুল আছে।

নয়ন বুঝতে পারে, তার অনুমানই ঠিক। বাইরে ওই বিষণ্ণ ভালমানুষির আড়ালে তীব্র হিংস্রতা রয়ে গেছে জগদীশের। রাগে চাপা গলা। সমস্ত শরীরে টান, রগ, শিরা-উপশিরা এই ম্লান আলোতেও দেখা যাচ্ছে।

মজা, না? বলেই জগদীশ আচমকা তার চাষাড়ে হাতে একটা থাপ্পড় কষায়। নয়ন ভাবতেও পারেনি। চড়টা বোমার মতো ফাটল তার কান, গলা, কণ্ঠা জুড়ে। মাথার মধ্যে সাইরেনের শব্দ বেজে উঠল হঠাৎ।

পড়ে গিয়েও টাল সামলে নিল সে। হাত বাড়িয়ে কাঠের চেয়ারটা ধরে দম নিল।

বেইমান! জগদীশ বলে।

মার কিছু কম খায়নি নয়ন। কিন্তু মার দেখলে সে পালায়ওনি কখনও। এ তার জল-ভাত। যেখানে মার সেখানে উল্টে মার দেওয়ার জন্যই সে জন্মেছে। চড়টা সামলেই দু'টো হাত তার আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে গেল।

কিন্তু একটা বিশাল গাছের মতো জগদীশ দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো মাটিতে পোঁতা, দু'খানা চাষাড়ে হাত তাকে বলের মতো ছুঁড়ে লুফে নিতে পারে।

মুঠো শিথিল করে শরীরের ভর চেয়ারের হাতলে ছেড়ে নয়ন জগদীশকে একটু দেখল, বলল, অতিথি নারায়ণ।

বলে হাসল।

জগদীশ গম্ভীরভাবে বলল, অতিথির ভেক ধরে চোর-ডাকাত এলে সে তখন নারায়ণ থাকে না। গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আমি দরজার বাঠাম দিয়ে দিচ্ছি। ফের কোনও বাঁদরামি করলে ঘাড় ধরে বের করে দেব।

নয়ন একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। লোকটাকে তার দারুণ ভাল লাগছে এখন। দারুণ।

মসজিদবাড়ির বাইরের ঘেরা-দেয়ালটায় নোনা ধরেছে। গেটটা পাল্লা হারিয়ে হাঁ করে আছে। ভিতরে একটা চমৎকার মাঠ। নির্জন। মসজিদের গায়ে একটা মোটা লতা উঠেছে, অশ্বত্থ গজিয়েছে! ভিতরের মাঠের একটেরে একটা কাঠচাঁপা গাছ। খুব ফুল এসেছে। তলায় বিছিয়ে আছে ফুল। এই ফুলটার তেমন আদর নেই। কেউ কুড়োয় না, ঘর সাজায় না। ফুলের দোকানে এই ফুল বিক্রি হতেও দেখেনি শ্যামা। কিন্তু হলদেটে সাদা রঙের এই ফুলটার চাপা গন্ধ শ্যামার বড় ভাল লাগে। সে একবার চারধারে দেখল। কেউ নেই রাস্তায়, দু'-চারজন সাধারণ চেহারার মানুষ ছাড়া। মসজিদের ভিতরেও লোকজন বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। এই অঞ্চলটায় মুসলমানরা বড় একটা থাকে না এখন। আজান-ধ্বনি শোনা যায় না। আগে যেত, যখন সে খুব ছোট ছিল। তখন একটা পেয়ারাগাছ ছিল এখানে, আর ছিলেন হাজিসাহেব। বদনার জলে ওজু করতে করতে তাদের দুই ভাই-বোনের গাছে চড়া দেখতেন। নমাজের সময়ে বাচ্চারা ছোটাছুটি করলে অসুবিধে হবে বলে ছোকরা মোল্লা কি বুড়ো মৌলবি তেড়ে এলে তিনি আটকাতেন। তাদের ডেকে বলতেন, শব্দ কোরো না। পেয়ারা পাড়ো। য'টা খেতে পার ততটা । নষ্ট কোরো না।

হাজিসাহেব নেই। কেউই নেই। নিস্তব্ধতা আছে। দু'-একজন কেয়ারটেকার থাকে হয়তো-বা। মানুষ যে কোথায় চলে যায়! বড় হয়ে অবধি বাড়ি থেকে দু' পা দূরে মসজিদের মাঠে কখনও আর আসেনি শ্যামা, ভুলে গিয়েছিল।

আজ বহুকাল বাদে সে নির্জন মাঠটায় ঢুকে পড়ল। সকালের রোদ এখন ঈষদুষ্ণ। ভালই লাগে। বাতাস দিচ্ছে। 'কিরিচ' শব্দ করে চুল ঘেঁষে চড়াই উড়ে যায়। কী সুন্দর নিস্তব্ধতা! আর গাছগাছালির ছায়া!

কাঠচাঁপা ফুল কয়েকটা কুড়োলো শ্যামা। স্কার্ফের আঁচলে তুলল। একটু ঘুরে দেখল চারদিকে। মসজিদের চাতাল ঝাঁট দেওয়া! মেঝে পরিষ্কার। বাতাসে ধূপগন্ধ। মেহেদীর ঝোপে পাখিব হুড়োহুড়ি।

হঠাৎ কোকিল ডাকে। চমকে ওঠে সে। কোকিল! না নয়ন?

স্খলিত আঁচল থেকে দু'-একটা ফুল পড়ে যায়।

সেই যে মোনা ঠাকুরের মন্দিরে যেতে আমবাগানে দেখা হয়েছিল, তার পর আর তাকে দেখেনি সে। ফিরেছে কি নয়ন? কে জানে!

নিমগাছ থেকে একটা সত্যিকারের কোকিল উড়ে গেল। তবে নয়ন নয়, কোকিলটাই ডেকেছিল। শ্যামা নিশ্চিন্তে একটু হাসে। একটা ফুল তুলে গন্ধ শুকল। মৃদু গন্ধই তার প্রিয়। বুক ভরে ওঠে না গন্ধে, কেবল স্মৃতির মতো, গত রাত্রির স্বপ্নের রেশের মতো অস্পষ্ট গন্ধ।

গত রাতেও দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। প্রায়ই দেখে। সকাল থেকে মনটা ভার হয়ে আছে। বাবার জন্য একটা ফুল-হাতা, উঁচু গলার সোয়েটার বুনতে শুরু করেছিল। পান্নাদির বাড়িতে গিয়েছিল প্যাটার্ন তুলতে। আসলে প্যাটার্ন তোলাটা ছল। ঘরে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। হরিদ্বার যাওয়ার গোছগাছ শুরু হয়েছে, মা-বাবা যাবেই। মোনা ঠাকুর বলেছে, ওইদিকেই কোথাও দাদা আছে সন্ন্যাসী হয়ে। পূর্বস্মৃতি নেই বলে ফিরতে পারছে না। শ্যামার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আশা হয়।

হরিদ্বার কি কোথাও যেতে শ্যামার ইচ্ছে করছিল না এখন। বাবার শরীর ভাল না । মাঝে মাঝে প্রেসার দু'শো ছাড়িয়ে যায়। বিদেশ-বিভুঁয়ে তারা মা আর মেয়ে বাবাকে নিয়ে কোন আতান্তরে পড়ে কে জানে! কিন্তু মা-বাবাকে ঠেকানো যাচ্ছে না, অনেক বুঝিয়েছে সে, বেশি বোঝাতে গেলে ঝগড়া হয়ে যায়।

বাবা হরিদ্বার গিয়ে মারা গেছে—এ রকমই একটা দুঃস্বপ্ন সে দেখেছিল কাল। সকালটা তাই মনের অন্ধকার নিয়ে কাটছিল। পান্নাদির বাড়িতেও প্যাটার্ন তোলা হল না। আজ ছুটির দিন, ওরা পিকনিকে যাচ্ছে কল্যাণীতে। বলল, চল না, মাসিমাকে বলে তোকে নিয়ে নিই। শ্যামা রাজি হয়নি।

রাজি হয়নি অভিমানে। তার কোনও আনন্দ করতে চাই। বাড়িতে অবিরল শোক লেগে আছে গত পাঁচ বছর ধরে। বিরাম নেই। দীর্ঘশ্বাসে বাসার বাতাস ভারী। মাত্র তিনটি প্রাণী তারা। পরিবারটা বড় হলে হয়তো একজনের শোক ভুলে থাকা যেত। মোটে তিনজন বলেই হারিয়ে যাওয়া চতুর্থ জনের কথা ভোলা যায় না। চার পায়া একটা আসবাবের একটা পা ভেঙে গেলে সেই পায়ার দিকেই যেমন ঝুঁকে থাকে আসবাব, তেমনি হারানো দাদার স্মৃতিতে ঝুঁকে আছে তারা। খেতে বসতে কাজ করতে দাদার কথা এসে পড়ে। মা কাঁদে, বাবা সান্ত্বনা দেয়, তার পর নিজে কাঁদে। শ্যামার চোখে তখন জল আসেই, তাই তাদের আনন্দ নেই। গত পাঁচ বছরে বাবা শ্যামার বিয়ের চেষ্টাই করেননি। প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, ছেলেটা নেই, ওই মেয়েটা মাত্র আমাদের সম্বল। অন্ধের নড়ি। ও গেলে থাকব কী করে?

তবু গত পাঁচ বছরে দু'-তিনটে পাত্রপক্ষ দেখেছে শ্যামাকে, পছন্দও হয়েছে। বিয়ে হয়নি বাবা-মার গরজের অভাবে। পাত্রদের মধ্যে একজনকে খুব পছন্দ ছিল শ্যামার। স্নিগ্ধ চেহারার দীর্ঘ ছেলেটি। মুখখানা গম্ভীর। বিলেত-ফেরত ডাক্তার। প্র্যাকটিশ যখন সবে জমে উঠেছে সেই সময়ে লোকটাকে হঠাৎ অল্প বয়সেই ধর্মে পায়। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। বিলেত থেকে ঘুরে আসার পর ছেলেটির একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হল। দিনক্ষণ সব ঠিক। বিয়ের দিন গায়ে-হলুদের স্নান করতে গিয়ে মেয়েটির কেঁপে জ্বর আসে। ধুম জ্বর উঠতে-না-উঠতেই গায়ে মায়ের দয়া বেরোয়। ঝেঁপে গুটি উঠেছিল। বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বোকা মেয়েটা যখন বুঝতে পারল যে তার মুখখানার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার প্রাণের চেয়ে শরীরের মায়া বেশি হল, প্রায়ই কাঁদত, ও মা গো, এই মুখে তাঁর ঘর করতে যাব? রোগ সারার মুখে মেয়েটা টিক বিশ খেয়ে বাঙুর হাসপাতালে মারা যায়। ছেলেটি সেই থেকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াত। কী যেন খুঁজত, কাকে যেন। তার পর দেওঘরের এক আশ্রমে থেকে যায়।

আশ্রমবাসী সেই বিলেত-ফেরত ডাক্তারের মা-বাবা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা সেই আশ্রমে গিয়ে পড়ে রইলেন। ছেলের গুরুদেব বললেন, বিয়ে করবে না কেন? বিয়ে কর। বনের চেয়ে ঘরের সন্ন্যাসীই পাগল বেশি। বনের সন্ন্যাসী দিয়ে কী হয় রে? কাম দমন করতে চাস নাকি। ওসব জোর করে করতে গেলে মাথার দফা শেষ হয়ে যাবে। পরমপিতাই কাম দিয়েছেন, সে তো এমনি নয়, তারও কিছু প্রয়োজন আছে বলেই দিয়েছেন। ওর দমন ওভাবে হয় না, জোর করতে গেলে উল্টো বিপত্তি। সুষ্ঠু ব্যবহার করো, স্ত্রীর প্রতি কামভাবেই কেবল ভাবিত হোয়ো না, তা হলেই হবে। ভাল ঘর দেখে জাতে কাটে কর।

সেই ডাক্তার নিজেই এসেছিল দেখতে? হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরা, ধুতি, লম্বা, কৃশ কালো চেহারাটি। ভারী ধীর। গম্ভীর। ঘরে ঢুকলে ঘরটা থম থম করে। বুকের মধ্যে গুরু গুরু ডাক ওঠে। বাবা কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি এই অল্প বয়সেই কেন সন্ন্যাসী বাবা?

সে উত্তর দিয়েছিল, সন্ন্যাসী কোথায়? আমি তো সংসারীই। কেবল সংসারের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

সেটা কেমন?

ছেলেটা একটু ভেবে বলল, আপনার ঘরের পাশে যদি আবর্জনা থাকে তবে মশা মাছি জীবাণুর উৎপাত বাড়ে। বাড়ে না? নিরাপদে থাকতে গেলে তাই আপনার ঘরের মতোই ওই বাইরের ময়লাও পরিষ্কার করা দরকার! তেমনি নিজের পরিবার-সংসারের ভালর জন্যই চারপাশটাকে ভাল রাখা দরকার। এই ভাল রাখতে গেলেই সংসারের পরিধি বেড়ে যায়। কেবল নিজের ভালর জন্য করলেই ভাল থাকা যায় না।

বাবা উত্তরে বলেছিল, তো তার জন্য আশ্রম কেন? ঘরে থেকেও তো হয়।

আশ্রম মানে যেখানে শ্রম করে কাজগুলো হাতে-কলমে শিখতে হয়। শেখা হলেই সংসারে ফিরে আসা! সেকালের ব্রহ্মচারীরা ভাল গৃহী হওয়ার জন্যই ব্রহ্মচর্য করে মনটাকে উদার, শান্ত ও আনন্দিত ও স্থির করে নিত। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বিস্তার, ব্রহ্মচারী মানে বিস্তারে বাস করা। চারপাশটাকে জেনে নেওয়া। এই জানা সংসারে তাকে সাহায্য করে। আমি সংসার-বিমুখ নই।

ধীর স্থির কথা। বিনীত এবং অকপট স্বর।

বাবা তবু মনস্থির করতে পারছিল না। অস্বস্তি বোধ করছিল।

বলল, তুমি কেন গেলে?

ছেলেটা বিষণ্ণ একটু হাসল। কী মায়াময় হাসিটি! অনেকক্ষণ উত্তর দিল না। তার পর আস্তে করে বলল, আর একবার আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তা কি শুনেছেন?

শুনেছি।

ছেলেটা আবার মাথা নিচু করে চুপ হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, মেয়েটির যখন বসন্ত হয়েছিল তখন আমি মাঝে-মাঝে তাকে দেখতে যেতাম। ডাক্তার হিসেবেই যেতাম। মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনও পূর্ব-পরিচয় ছিল না, এই যেমন আজ এসেছি আপনার বাড়িতে সে রকমই উপলক্ষে মেয়ে দেখতে গিয়ে তাকে দেখা, সে খুবই সুন্দরী ছিল। বসন্ত হওয়ার পর তার সেই সৌন্দর্য যে কোথায় গেল! একটি সুন্দরী মেয়ের বসন্ত হলে ডাক্তারের খুব একটি প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু রুগি দেখা এক কথা, আর নিজের ভাবী স্ত্রীকে ওই অবস্থায় দেখা আর এক কথা। আমার মন খারাপ হয়ে যেত। তবু মনকে আমি স্থিরই রেখেছিলাম। ওই মেয়েকেই বিয়ে করব। আমি তাকে তাই প্রায়ই দেখতে যেতাম। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখত, কথাবার্তাও বলত না। চুপচাপ তার বিছানার পাশে বসে থেকে চলে আসতাম। একদিন গ্রীষ্মের বিকেলে দেখতে গেছি। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। তাতে নিমডাল বাঁধা, ঘরে আবছা আলো পড়ছে। মেয়েটি শুয়ে ছিল দেয়ালের দিকে মুখ করে। আমি চেয়ারে বসা। মশারিটা তুলে দেওয়া হয়েছে যাতে আমি তাকে দেখতে পাই। তিনদিকে মশারি ফেলা, একদিকের মশারি তোলা। ফলে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন থিয়েটারের স্টেজ-এর মতো। সে শুয়ে আছে, শরীরের যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা লালচে মারাত্মক গোটায় ভরা। গোটা গলে পুঁজ আর রস চাপটা বাঁধছে। এলোচুল বালিশে ছড়ানো, দৃশ্যটা করুণ, ভয়ংকর। দেখছিলাম। পশ্চিমের জানালার নিমডালের ফাঁক দিয়ে লালচে আলোর কুচি এসে বিছানায় পড়েছে। চৌখুপি আলো কাঁপছে, দুলছে। কোনওদিন সে যা করে না, সেই সময়ে হঠাৎ মুখ ফেরাল। বস্তুত রোগ হওয়ার পর তার মুখ ও রকম স্পষ্টভাবে সে কখনও আমাকে দেখায়নি। মুখখানা ফুলে-টুলে বিশ্রী দেখতে হয়েছে। কিন্তু তাতে চমকাবার কিছু নেই। আমার মন তো প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখ দু'খানার দৃষ্টি দেখে আমার কেমন লাগল। মানুষের খুব অভিমান হলে চোখে যেমন একটা আলগা আলো আসে ঠিক সে রকম কিছু ছিল তার চোখে। জলভরা, লালচে এবং আগুনের মতো যা এসে ছোঁয়। তক্ষুনি মনে হল, একে পাহারায় রাখা দরকার। চোখে চোখে না রাখলে এ মরবে. এর মরার ইচ্ছে জেগেছে। কিন্তু এ রকম মনে হওয়াগুলো কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, আমাদের কত সময়ে কত কিছু মনে হয়। তার ওপর ঘরটার আলো স্পষ্ট নয়, মশারির মধ্যে একটা ধোঁয়াটে ভাব, আর সেই আলোর চৌখুপিগুলো, সেগুলোর কোনও ছিটেফোঁটা তার চোখে পড়ে ওরকম দেখাচ্ছিল কি না—এ সবই আমি ভাবতে লাগলাম। সেই সময়ে আমি হঠাৎ খেয়াল করি, ঘরে একটা জর্মিসাইডিসের চেনা গন্ধ। আর পোকামারা বিষের গন্ধ। সেই গন্ধ আমার নিত্যসঙ্গী। তবু হঠাৎ সেদিন সেই গন্ধ বুকের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে একটা আকুল ইঙ্গিত করছিল। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কেন আমার মন একটা অস্পষ্ট কিছু বলতে চাইছে। উঠে আসবার সময়ে দেখি, কে যেন পোকামারা বিষের শিশিটা ছোট আলমারির মাথায় রেখে গেছে। চলে আসতে গিয়েও থমকে শিশিটা দেখলাম। একবার হাত বাড়িয়ে ধরলামও,

ভাবলাম কাউকে বলি শিশিটা সরিয়ে নিতে। তারপর সচেতন মনে ভাবলাম, থাকগে। কী হবে!

ছেলেটা চুপ করে আবার একটু ভাবল। তার পর ম্লান এবং সুন্দর হাসিটি হেসে বলল, এই হচ্ছে গল্প। মেয়েটা মারা গেল। হাসপাতালে নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তার মরার ইচ্ছেটাই ছিল প্রবল। সেটা নিয়ে ভাববার কিছু নেই। চুকে-টুকে গেছে। কিন্তু তার পর থেকেই আমার মনে একটা প্রশ্ন এল। প্রশ্ন এই— আমি কেন সেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম? আর কেন তা উপেক্ষা করেছি? আমি যদি এতই আনাড়ি যে বুঝতে পেরেও সাবধান হতে জানি না তবে তো একদিন আমার অতীত বিদ্যাও সঠিক প্রয়োগ করতে পারব না! সংকট যখন আসে তখন মানুষের সবচেয়ে বড় বিদ্যার পরিচয় হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থিরভাবে জোরের সঙ্গে যে সিদ্ধান্ত নিতে জানে না, কোন সিদ্ধান্ত সঠিক এ বিষয়ে যার দ্বিধা থাকে সে অবিশ্বস্ত। চিন্তা করতে করতে আমি দেখলাম, মানুষ যত তুচ্ছ ভুলই করুক, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভুলের পিছনে থাকে তার জীবনের যত কাজকর্ম, যত অভ্যাস, যত আচরণ। জল খেয়ে কাচের গেলাসটি টেবিলের ধারে রাখতে গিয়ে ভাবলাম, এখানে রাখছি কারও ধাক্কা লেগে পড়ে ভেঙে যাবে হয়তো! ভাবলাম, তবু আবার রেখেও দিলাম। ভাবলাম, থাকগে, এক্ষুনি ভিতরবাড়ি থেকে লোক এসে নিয়ে যাবে। তখন পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হাঁটু লেগে টেবিলটা নড়ল। গেলাসটা নড়ে উঠে আবার স্থির হল। ভাবলাম, গেলাসটা পড়ে যাবে। টেলিফোন বাজছে, দৌড়ে গিয়ে ধরি। কে একজন ফোন করে একটা ঠিকানা দিল লিখে রাখতে। টেলিফোন রেখে তাড়াতাড়ি এসে ঠিকানাটা লিখে রাখতে যাচ্ছি। ডায়েরিটা খুঁজছি। তখন গেলাসটার কথা ভুলে গেছি। জরুরি ঠিকানাটা লিখে রাখা দরকার, ডায়েরিটা কোথায়? ফাইলের তলায় চাপা ডায়েরিটা পেয়ে 'ইউরেকা' বলে টেনে বার করতে যাচ্ছি, তখন হঠাৎ কনুই লেগে ফটাস করে পড়ে ভাঙল, ওটা কী? সেই গেলাস!

ছেলেটা বাবার মুখের দিকে ক্লান্ত চোখ দুটো পরিপূর্ণ মেলে দিয়ে বলল, তুচ্ছ একটা ভুল। কিন্তু ভেবে দেখলে এর পিছনে আমার সমস্ত জীবনটাই কাজ করছে।ওই দীর্ঘকালের অভ্যাসজনিত আলস্য। কাজ ফেলে রাখা, অন্যে এসে নিয়ে যাবে—এই পরনির্ভরতা, দুর্ঘটনার আশঙ্কা করেও উপেক্ষার সর্বনাশা শিথিলতা। জরুরি কাজের সময়ে বিশৃঙ্খলা। সবকিছুকে একযোগে দেখার ক্ষমতা, আর সব মিলিয়ে একটা সাময়িক অন্ধত্ব। যে এরকম ছোট্ট ছোট্ট ভুল করে তার জন্য বড় বড় ভুল অপেক্ষা করে থাকে। মেয়েটি মরে যাওয়ার পর নিজের এই অন্ধত্ব এবং সিদ্ধান্তের অভাব আমাকে পাগল করে দিল। আমার কেবলই মনে হতে লাগল আমি রুগির সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারব না, ভুল ওষুধ দেব হয়তো, অপারেশন করতে হাত কাঁপবে এবং কোনও মানুষের মুখ দেখে তার সম্বন্ধে কেবলই উল্টোপাল্টা ভেবে যাব। নিজের সম্পর্কে এই বিশ্বাসের অভাব মানুষের মস্ত এক শত্রু। তখনই ঠিক করি ডাক্তারির চেয়ে বড় কিছু শিক্ষা আমার দরকার। সেই শিক্ষা জীবন যাপনের। ক্ষুদ্র চোখে আমরা যা দেখি তা যথেষ্ট নয়, চাই ব্যাপক দৃষ্টি। কোনও কিছু দেখলে তার সবটা দেখা চাই, কোনও কিছু জানলে তার সবটা জানা চাই। কে শেখাবে আমাকে?

ছেলেটি মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলল, আমি তখন গুরুর সন্ধানে বেরোই। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য নয়, সংসারী হওয়ার জন্যই। কিন্তু এমন সংসারী যার ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিমুক্ত। যে স্থির, আত্মবিশ্বাসী, যে ভুল করে না।

বাবা খুশি হয়েছিল হয়তো। অনেকক্ষণ আলাপ করেছিল ছেলেটির সঙ্গে। ছেলেটি এক পলকমাত্র দেখেছিল শ্যামাকে। দ্বিতীয়বার চোখ তোলেনি। কিছু জিজ্ঞেস করেনি। তবু শ্যামা জানত, সে শ্যামাকে পছন্দ করেছিল।

বাবা কেবলই দ্বিধা করতে লাগল। সন্ন্যাসী ছেলে, আশ্রমে থাকে, নিরামিষ খায়! শ্যামা কি পারবে? কয়েকবার শ্যামাকে ডেকে ওই কথা জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। শ্যামা উত্তর দেয়নি। মনে

মনে সে উন্মুখ ছিল সেই পুরুষটির জন্য। প্রস্তুত ছিল। তার মনের ভিতর শাঁখ, উলুধ্বনি বেজেছিল ঠিকই। কেউ শোনেনি।

বাবার উত্তর না পেয়ে তারা আর আসেনি ! কী হল সেই ছেলেটির কে জানে! মানুষ যে কোথায় যায়!

নির্জন মসজিদের চত্বরে শ্যামা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। মনে এক অভিমান। কার ওপর কে জানে! হয়তো দাদার ওপর! কেন পাগল হয়ে চলে গেলি? দ্যাখ তো, আমাদের কী করে রেখে গেছিস! ফিরে আয় লক্ষ্মী দাদা আমার, একটা ঝুঁকে-পড়া দিক তুলে ধর। আমরা চারজন হলে সংসারটার দাঁড়ানো হয়। কেন যে চলে যাস তোরা! কেন যে চলে যায় মানুষ! দূরে যায়! মরে যায়! হারিয়ে যায়! কেন রে! কোথায় গেল মেহেদিরঙা দাড়িওলা হাজিসাহেব? কোথায় সেই কাশীর পেয়ারা গাছ? আর সেই মসজিদের পিছনে দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি দোলনচাঁপা? কী সুন্দর গন্ধ তার! কিছু নেই দ্যাখ। কেন রে হারিয়ে যায় মানুষ? গাছপালা!

মাঝে মাঝে তার অভিমান হয় মা-বাবার ওপরও! কেন তোমাদের অত শোক? উৎসবের মতো শোক তোমাদের। মন খুঁড়ে তোমরা দুঃখ তুলে আনো রোজ। দুঃখই তোমাদের ভাল লাগে। নইলে কেন ভুলতে পারো না? পাছে ভুলে যাও সেই ভয়ে রাত জেগে তোমরা ছেলের কথা বলো, অবসর সময়ে বসে ভাবো ধ্যান করো। কেন? ভাল লাগে বলে? ঘরের বাতাস তোমাদের সেই দুঃখের ভার নিয়ে ভারী হয়ে থাকে। এক কলি গান গাইতে পারি না আমি, মনে হয় বুঝি গান গাইলে বাড়ির ভিতরে দুঃখের পবিত্র মূর্তিটি— যা তোমরা রচনা করেছ, তা বুঝি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে! আয়নায় মুখ দেখতে যাই, অমনি মনে হয়, আয়নায় মুখ দেখছিস মুখপুড়ি, তোর না দাদা নেই? যে ছিল তোর খেলার সাথী, প্রিয়জন, সে না নেই!

অভিমান তার নিজের ওপরেও. কেন যে বড় হতে গেলাম! কেন যে বুঝতে শিখলাম, ভাবতে শিখলাম, টের পেতে শিখলাম! কী দরকার ছিল এ সবের? তার চেয়ে জন্মে শিশু হয়ে থাকলাম না কেন? সেই তো ভাল হত সবচেয়ে! অবোধ শিশু হয়ে চেয়ে থাকা! কেবল বিস্ময় আর আনন্দ। খিদে মিটলেই ঘুম। আর আহ্লাদ!

অভিমান আরও অনেক শ্যামার। বুক টই-টুম্বুর করে। এমনই কপাল তার! দেয়াল টপকে নয়ন এসে চিঠি রেখে যায় ঠিক। ভোরবেলা প্রায়ই চিঠি পায় সে। তাদের বাসার দুটো ঘর। সামনের ঘরে বাবা-মা, পিছনের ঘরে সে। তার শিয়রের জানালার পাশ দিয়ে মেথর বা কয়লাওলা আসার একটা গলিপথ। গলিটা বাড়িরই অংশ, উঁচু দেয়াল, সামনে দরজা। কড়াক্কড় করে শিয়রের জানালা বন্ধ করে শোয় শ্যামা। তবু সকালে উঠে যখনই জানালা খোলে, ভোরের প্রথম আলোটি, কি শীতের কুয়াশা কিংবা রুপোলি বৃষ্টি দেখে দিনটা সুন্দর লাগে, মনটা ভাল হয়ে যায়, তখনই দেখতে পায়, জানালার খাঁজে নীল খাম, কিংবা ভাঁজ করা চিঠি। সব চিঠিতেই সেই এক কথা, 'বিয়ে করো, না হলে মরব।' কিংবা 'মেরে ফেলব শ্যামা, জানো তো আমি খুনে।' চিঠি দেখে মনটা ঝাঁৎ করে ডুবে যায়। মা-বাবা দেখার আগেই সে চিঠি নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে, উনুনে দেয়। চোখে জল আসে। বাইরে কোকিল ডাকলে, মাটির বেহালা বাজলে, বউ-কথা-কও কথা বললে, শ্যামা চমকে ওঠে। নয়ন নয় তো! কপাল!

ইচ্ছে করলেই পিকনিক যেতে পারত সে। হই-হুল্লোড় করে কাটিয়ে আসত! কিন্তু সব ঘটনা মিলে-মিশে একটা গভীর অভিমান বুকে থম ধরে থাকে। নিজেকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে হয়। কষ্ট পা শ্যামা, আরও কষ্ট পা। গান গাস নে, কোথাও যাস নে, মুখ দেখিস নে আয়নায়। তোর আনন্দ পেতে নেই!

গাছের ছায়ায় শিশির এখনও শুকোয় নি! পায়ে পায়ে জল ঝরে পড়ছে। হাঁটতে শ্যামার ভালই লাগে। একা। মসজিদবাড়ির এই পোড়ো ভাবটা তার সঙ্গে মিলে যায়। এখানে সে দাদার সঙ্গে কত খেলেছে! কিছুই ভোলেনি সে। এখানে সে এবার থেকে আসবে। রোজ। বসে থাকবে একা একা।

অভিমানটা বিকেল পর্যন্ত রইল।

পাঁচটা নাগাদ তার পিসতুতো দিদি কমলা আর তার স্বামী শঙ্কর ট্যাক্সিতে এসে হাজির। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ভিতরে ঢুকেই হাঁক-ডাক শুরু করল শঙ্করদা, শ্যামা, শিগগির সাজপোশাক করে নাও, সিনেমায় যাচ্ছি। তোমার টিকিট কাটা আছে।

ওর ওইরকম। আগে থেকে খবর দেবে না, হঠাৎ এসে হুড়ো দেবে।

বুঝেছি, কারও টিকিট বাড়তি হয়েছে, তাই আমাকে নিতে এসেছেন! শ্যামার গলায় সকালের অভিমানের রেশ এখনও।

মাইরি না, তোমার মুখখানা মনে করেই কেটেছি।

যদি এসে আমাকে না পেতেন?

তা হলে বেচে দিতাম। হিট ছবি, বেচলে দু'চার আনা বেশিই পেতাম। জলদি করো।

আমি যাব না।

কমলা মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, যাবি না কী? তোর ইচ্ছেয় নাকি! পুজোয় যে পিওর সিল্কটা মামা দিয়েছে সেটা পর আজ। কী যে করিস ভাল শাড়িগুলো দিয়ে। সব জমিয়ে রাখছিস বাক্সে।

ইচ্ছে করছে না রে কমলাদি। মন ভাল নেই।

ওমা। সে আর নতুন কথা কী! তোর আবার কবে মন ভাল থাকে?

যাঃ! কবে মনখারাপ দেখেছ?

শঙ্করদা বলে, ওটা ওর ব্যক্তিত্ব কমলা। অনেক মেয়ে আছে যাদের মনখারাপ থাকলে ভাল দেখায়।

ইয়ার্কি হচ্ছে? শ্যামা হাসে।

মাইরি না , তোমার চোখ দু'খানা যা ঢুলুঢুলু, ওতে হাসি ছ্যাবলামি ভাল খেলে না। মনখারাপ তোমার থাক শ্যামা, কেবল মাঝে-মাঝে একটু মুখোশ খুলো, বাব্বাঃ, মেয়েরা সুন্দর দেখাবার জন্য যে কত কষ্ট করতে পারে! একটা মেয়ে ছিল যাকে বাঁ দিক থেকে বেশি সুন্দর দেখাত, সেই থেকে তার অভ্যাসই হয়ে গেল লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে বাঁ দিকে ফিরে থাকা, ওই ভাবে মেয়েটার একটা দোষ দাঁড়িয়ে গেল, সোজা হয়ে কথা বলতে পারে না, তাকাতে পারে না, বাঁ দিকে কেতরে তাকায়, কথা বলে। ঘাড়ে ক্র্যাম্প হয়ে গিয়েছিল। কী জ্বালা!

আমি সে রকম নই মোটেই।

তোমাদের সেই সন্নিসি ডাক্তার আমাকে বলেছিল, মেয়েটি ভারী দুঃখী মনে হয়। দুঃখীরাই ভাল, তারা ঈশ্বর সকাশে তাড়াতাড়ি যেতে পারে।

কোন সন্নিসি ডাক্তারের কথা বলছ? কমলা জিজ্ঞেস করে।

ওই যে অরিন্দম ব্যানার্জি এম-আর-সি-পি, দেওঘরের আশ্রমে যে আছে সে-ই। আমি তো ওই একটা সম্বন্ধই এনেছিলাম শ্যামার। সবই ফার্স্ট ক্লাস ছিল, একটু ডিফেক্ট ওই সন্ন্যাসটা। ওটা না হলে...

শ্যামা কথা বলল না, বুকটা একটু চমকাল মাত্র।

ট্যাক্সিতে শ্যামা আর শঙ্কর দু'ধারে বসেছে, মাঝখানে কমলা। পাড়ার মোড়টা পেরোতে গিয়ে একটা চায়ের স্টল আর রক দেখিয়ে শঙ্করদা বলে, শ্যামা, এসব অঞ্চলের ছেলে-ছোকরাগুলো গেল কোথায়! দিন-রাত আড্ডা দিত, চুরি-ছিনতাই করত, টিটকিরি দিত! সব হাপিস হয়ে গেল না কি?

কী জানি! দেখছি না তো! পাড়াতেও ঘোরে না।

জিভ দিয়ে একটা চুক চুক শব্দ করে শঙ্করদা বলে, হাপিসই হয়ে যাচ্ছে শ্যামা। খুব ধরপাকড় হচ্ছে তো! কিছু পুলিশ নিয়ে গেছে, কিছু মরেছে নিজেদের হাতেই, কিছু পালিয়েছে। সব পাড়াতেই ছেলে-ছোকরা কমে যাচ্ছে। আফশোসের কথা।

শ্যামা হাসে, কেন?

তোমাদের খাঁটি অ্যাডমায়ারার তো এরাই ছিল!

কমলা ধমক দেয়, থাম তো!

থামবার কী! আমার তো মনে হয় তোমার সবচেয়ে বড় অ্যাডমায়ারার ছিল কাবুল, ভুল বানানে প্রেমপত্র লিখত, কিন্তু কী ভালবাসা! তোমার বিয়ের পরই কাবুল নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, না?

ওকে অ্যাডমায়ারার বলে না।

ওরাই খাঁটি অ্যাডমায়ারার। শ্যামা, তোমারও একজন আছে না? নয়ন না কী যেন নাম!

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে নিল।

সে এখনও বেঁচে-বর্তে আছে তো? না কি হাপিস হয়ে গেছে?

শ্যামা মুখটা ফিরিয়ে বলল, শঙ্করদা, ওকে কিছু করতে পারেন না? বড্ড জ্বালায়।

রিসেন্টলি কিছু করেছে নাকি?

করেছে।

কী?

বাবা-মা'র সঙ্গে ক'দিন আগে একটা মন্দিরে গিয়েছিলাম না? সেইখানেও পিছু নিয়েছিল। একটা মস্ত আমবাগান পেরিয়ে যেতে হয়। বাবা-মা একটু এগিয়ে গিয়েছিল, আমি বুনো ফুল তুলতে দাঁড়িয়েছি, সেই সময়ে আমার রাস্তা আটকেছিল। সাহস বড় বেড়ে গেছে।

কাছে আসার চেষ্টা করেছিল নাকি?

হুঁ!

শঙ্করদা একটু চুপ করে থাকে। কমলা বলে, ভাবিস না। ওরা ওইরকম। কাবুল আমাকে কম জ্বালায়নি।

ও মাঝে-মাঝে আমাকে খুন করবে বলে শাসায়। শাসানিটা মিথ্যে নয়, ও পারে। বলল শ্যামা।

শঙ্করদা চিন্তিত মুখে চুপ করে থাকে একটু। বলে, কী করব শ্যামা, এদের মুকাবেলা করতে হলে একটা প্রস্তুতি দরকার। দুঃখের বিষয় আমার তা নেই। ভদ্রলোক হয়েই গেলাম। দেখি যদি কিছু করা যায়।

উদ্বেগ নিয়ে কমলা বলে, তুমি আবার কী করবে? নয়নকে আমি চিনি। রাসবিহারীতে যারা একজন এস-আইকে মেরেছিল ও তাদের দলে ছিল। ওসব এলিমেন্টের সঙ্গে খবরদার লাগতে যেয়ো না। শ্যামার পিছনে ঘুরছে ঘুরুক। শ্যামার একটা বিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সন্ন্যাসীঠাকুরকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমরা ভাল করোনি শ্যামা। মানুষটার মধ্যে একটা ভারী সৎ ব্যাপার ছিল। শঙ্করদা বলে।

শ্যামা মৃদু শ্বাসের স্বরে বলে, আমি কী করব?

কমলাও বলে, ও কী করবে? ওর মতামতের কোনও দাম আছে নাকি! মামা আর মামী কেবল ছেলে-ছেলে করে ক্ষেপে থাকলে ওর কোনওদিন বিয়ে হবে না। ওঁদের মতামত ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদেরই কিছু করতে হবে। হ্যাঁরে শ্যামা, নয়ন কি বাড়াবাড়ি করছে খুব? আগে তো কেবল চিঠি-টিঠি দিত, আর কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত?

থমথমে মুখে শ্যামা বলে, এখনও যায়। আমার কিছু ভাল লাগে না কমলাদি।

কমলা মুখ ফিরিয়ে শঙ্করদার দিকে চেয়ে বলে, তোমার খোঁজে আর ছেলে নেই? কত তো আড্ডা দাও বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের মধ্যে কাউকে পাও না? আমি কালই একবার উমার বাসায় যাব তো, আই-সি-আই-এর একজন ইঞ্জিনিয়ার ছেলে আছে ওর পাশের ফ্ল্যাটে, দু'বার বিলেত গেছে...

ওসব বিলেতবাজ পাত্র ছাড়ো। খাঁটি দিশি ছেলে দেখো।

আহা, তোমার সন্নিসিঠাকুরও তো বিলেত-ফেরত।

সে লোকটা বিলেতের গন্ধ মুছে ফেলেছে।

বিলেতের দোষ কী। তোমার যত...

কিছুই না। কিন্তু কমলা ইংরেজ আমলেও বিলেত-ফেরতের এত কদর ছিল না, এখন যতটা হয়েছে। বিলেত-ফেরত নিয়ে এখন হাই কম্পিটিশন, সুবিধে হবে না। তার চেয়ে দিশি পাত্র যোগাড় করা সোজা।

তাই দেখো না। তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাওয়া দরকার। মামা-মামীর উদাসীন ভাব আমার ভাল লাগে না। শেষে দেখো আইবুড়ো থেকে থেকে লাবণ্য ঝরে যাবে, গালে মেচেতা ধরবে, তখন যার-তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। শ্যামা, তুই ভাবিস না রে, কাল থেকেই আমি লাগছি।

শ্যামা ম্লান হাসে।

বিকেলটা তবু ভালই কাটল। সিনেমার পর রেস্টুরেন্টে খুব খাওয়াল শঙ্করদা।

শ্যামার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, সেই ছেলেটার কি বিয়ে হয়ে গেছে? তোমরা অন্য পাত্র খুঁজবে কেন। সেই তো বেশ ছিল। কিন্তু শ্যামার বড় লজ্জা করে।

শঙ্করদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, শ্যামা, কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লে সব মেয়েরই কিছু স্যুটার জোটে। তোমার তেমন কেউ নেই? আমি শুনেছি, তোমার অনেক স্যুটার।

শ্যামা চায়ের কাপে মাথা নিচু করে বলে, ছিল তো।

তাদের কাউকে পাত্তা দাওনি, না ?

শ্যামা মাথা নেড়ে বলে, না। তার পর হাসতে থাকে।

তোমার সবই ভাল, কেবল ওই একটাই ডিফেক্ট। তুমি ভারী ভীতু আর আনস্মার্ট।

কমলাদি ঝংকার দিয়ে বলে, আর স্মার্ট হয়ে কাজ নেই। যা আছে বেশ আছে। যারা নিজে বর খুঁজে বিয়ে করেছে তারা কিছু বেশি সুখে নেই।

তুমি বড্ড সেকেলে। শ্যামা, তোমার মত কী?

শঙ্করদা, আমি কিছু বুঝি না।

কেমন পুরুষ তোমার পছন্দ সে সম্পর্কে কখনও কোনও আইডিয়া করোনি?

আইডিয়া কি ধরা-ছোঁয়া যায়? আইডিয়া আইডিয়াই থাকে।

তবু বলো না।

কমলা রাগ করে বলে, বলে কী হবে। কোনও মেয়েই সে রকম পুরুষ পায় না ঠিক যেমনটি সে চায়, আবার যাকে পায় তাকে নিয়েও তার চলে যায়। ভাবে, আমি এ রকমটিই চেয়েছিলাম।

কমলাদি বেশ গম্ভীর মুখে বলছিল। শুনে শঙ্কর এক চোখে হেসে বলে, তা তুমি কেমন চেয়েছিলে?

কপট শ্বাস ফেলে কমলাদি বলে, তার সঙ্গে তোমার তুলনা হয় না।

যাকে পেয়েছ তাকে নিয়ে চলছে তো?

নিজে বুঝে দেখ।

বুঝেছি।

শ্যামাকে জ্বালিও না। ওকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ওর তেমন কোনও পছন্দ-অপছন্দ নেই। ও সত্যিকারের ভাল মেয়ে।

শঙ্করদা শ্যামার দিকে চেয়ে বলে, সত্যি? কখনও ভাবী স্বামীর কথা ভাবো না? কখনও না?

শ্যামা একটু হাসে। ম্লান সেই হাসিটি তার। বলে, ভেবেছি।

আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করে শঙ্কর, কেমন?

শ্যামা চোখটা একটু বোজে। শীর্ণ, কালো, দীর্ঘ একটি আবছা চেহারা দেখতে পায়। চোখ দু'খানা উজ্জ্বল এবং আবিলতাহীন। আস্তে করে বলে, তেমনি পুরুষ, যে খুব ভালবাসে। খুব। কখনও দোষ

ধরবে না আমার। আর সে নিজে খুব ভাল হবে। আর কিছু না।

শঙ্করদা হতাশ হয়ে পিছনে হেলান দিয়ে বলে, দূর! ও থেকে কিছু কি বোঝা যায়। ভাবলাম কী না জানি সব স্পেসিফিকেশন শুনব। যাঃ। এই বেয়ারা, বিল!

হতাশ হলেন?

হব না? ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার কিংবা স্মার্ট কিংবা সুন্দর— কত কী স্পেসিফিকেশন ছিল। তুমি সত্যিকারের ভাল মানুষ শ্যামা। ভাল মানুষকে আজকাল কী বলে জানো তো?

কী?

লেদ্রু। তুমি পারফেক্ট লেদ্রু।

কমলাদি বলে, ও ঠিক বলেছে। মেয়েদের পছন্দসই পুরুষ হওয়া অত সোজা নয়। ন্যাং ন্যাং করে অনেকেই ঘোরে পেছনে, জোর করে ভালবাসা আদায় করে। কিন্তু পছন্দসই পুরুষ খুব রেয়ার।

শ্যামা কমলাদিকে ঠেলা দিয়ে বলে, কী যা-তা বকছ কমলাদি! শঙ্করদাও তো বলতে পারে পুরুষদের পছন্দসই মেয়েও আমরা কেউ নই।

কমলাদির চোখ মুখ সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়ে যায়, স্বামীর দিকে তীব্র চোখে চেয়ে বলে, বলুক না! বলে দেখুক!

সিগারেট মুখে শঙ্করদা হেসে হাতজোড় করে বলে, আমি বলিনি। বলছি না। আমি যেমনটি চেয়েছি তেমনটিই পেয়েছি। শ্যামা, তোমার কমলাদিকে যৌবনের কাননদেবীর মতো দেখতে নয়?

আমি তো দেখিনি। তবে অনেকটা সেইরকম মনে হয়। বলে হাসে শ্যামা।

দেখনি! বলে ভারী অবাক হয় শঙ্করদা, দেখনি কাননদেবীর ছবি?

কী করে দেখব? আমাদের সময়ে সে সব ছবি তো দেখানো হয় না।

একটু গুম হয়ে থেকে শঙ্করদা বলে, বাস্তবিক আমাদের কত বয়স হয়ে গেল! আমরা কৈশোরকালে কাননদেবীর গান গাইতাম, ছবি দেখতাম। তোমাদের সঙ্গে আমাদের জেনারেশন গ্যাপ বোধহয় এইটাই! আমাদের সময়কার ক্রেজ তোমাদের সময়কার বিস্মৃতি! আরে বাঃ!

কমলাদি বলে, ওঠো, আর কথা বাড়াতে হবে না। আমি আমার মতো দেখতে। কারও কৈশোরের হিরোইন হতে চাই না, আমি যেমন ঠিক তেমনি।

সবাই তা-ই কমলা। কিন্তু শ্যামা, তোমাকে ঠিক বোঝা গেল না। কমলাদির সামনে লজ্জা পাচ্ছ বলতে, বুঝতে পারছি। একদিন না হয় আমাকে গোপনে তোমার স্পেসিফিকেশনটা জানিয়ে দিয়ো।

ফেরার সময়ে ট্যাক্সিতেও একবার শ্যামার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সেই লোকটা এখন কোথায়! জিজ্ঞেস করল না।

শঙ্করদা কমলাদির ওপাশ থেকে ঝুঁকে বলল, শ্যামা তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হব। তোমার স্পেসিফিকেশন থাকলে বলো, বিশেষ কাউকে পছন্দ থাকলে তা-ও বলো, নেগোশিয়েট করব।

শ্যামা একটা শ্বাস ফেলে কেবল। বলে, বিয়ের চেয়েও আমার একটা চাকরি বেশি দরকার।

কেন?

বাবার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। আর একটাও বোধহয় শিগগিরই হবে, দাদার জন্য এত উদ্বেগ ইদানীং, মোনা ঠাকুর বলেছে হরিদ্বার বা হৃষীকেশ কোথাও সন্ন্যাসী হয়ে দাদা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো আমরাও চললাম বুনো মোষ তাড়াতে। এই শরীরে বাবার ওই সব দূর দেশে, পাহাড়-টাহাড়ে ঘুবে বেড়াতে কী যে হবে! আমার সব সময়ে বাবার জন্য ভয়। কাল রাতেও স্বপ্ন দেখেছি। বিশ্রী স্বপ্ন।

ভেবো না শ্যামা।

ভাবনা কি কারও পোষ মানে? ভাবি, বাবার কিছু যদি হয় তবে আমাদের কী হবে! একটা চাকরি

থাকলে তবু ভরসা থাকে।

কমলাদি মাথা নেড়ে বলে, চাকরি দিয়ে কী হবে রে মুখপুড়ি! মামার টাকা কিছু কম নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির অ্যাতো টাকা রয়েছে ব্যাঙ্কে, বাড়িটাও তো অনেকটা হয়ে গেছে। তোর চিন্তা কী?

আমার বিয়ে দিতেও তো খরচ আছে।

ওমা! খরচ তো ওই একটাই। মামা-মামির মতো এমন লাইট ফ্যামিলি ক'টা আছে! চাকরির চিন্তা ছাড়, তোর বিয়ে দিয়েও মামার অনেক থাকবে। মামা খুব কেপ্পন ছিল, জমিয়েছে অনেক।

যাঃ!

যাঃ বলিস না শ্যামা। মামার সারা জীবনের সবচেয়ে বড় খরচ ছিল খাওয়ার। খাওয়া-খাওয়া করে চিরকাল পাগল। আমকাতল, চিতলপেটি, ইলিশ ভাপে, মুড়োর ডাল, এইসব নিয়ে সারাটা জীবন খরচ করল, মামির গায়ে একটা গয়না বা দামি শাড়ি দেখলুম না। কেপ্পন বলব না তো কী? তোর বিয়েটাই বা মামা দেব-দিচ্ছি করে দিল না কেন? কত ভাল সব সম্বন্ধ এসেছিল! খরচের ভয় না তো কী?

কী সব বলছ? বলে ধমক দেয় শঙ্করদা।

ঠিকই বলছি। পাগলের কি চিকিৎসা নেই? দিলীপ তেমন পাগল তো ছিল না! একটু আনব্যালান্সড ছিল, তা রাঁচি বা লুম্বিনীতে রাখলে ভাল হয়ে যেত না? মামা গেল কবিরাজি আর হোমিওপ্যাথি করতে। মামি কত দুঃখ করেছে। শ্যামা, কিছু মনে করিস না, দিলীপকে খুঁজে পেতে এখন যে খরচ হবে তার অর্ধেক খরচে দিলীপের চিকিৎসা করে ওকে ভাল করা যেত। খাওয়ার খরচ ছাড়া মামা আর কোন খরচটা করেছে! নইলে বাড়িটা...

শঙ্করদা ব্যগ্রভাবে প্রসঙ্গটা ঘোরায়, খাওয়া ছাড়া বাঙালি যে কিছু বোঝেই না। রোজ ট্রামে-বাসে রাস্তায়-অফিসে যত আলোচনা শুনি সবটাই খাওয়ার। পলিটিক্সের কথা, দর্শনের কথা, সব কথার মধ্যেই বাঙালি ঠিক খাওয়ার কথা তুলে ফেলবে। বাঙালি খাওয়ার চিন্তা নিয়ে ঘুম থেকে ওঠে, খাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোতে যায়। মামার দোষ কী?

কথা ঘুরিয়ো না। আমার রাগ হয়!

শঙ্করদা সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, কার ওপর?

পুরুষ জাতটার ওপর। ভারী নিমকহারাম। আর স্বার্থপর।

শঙ্করদা শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে।

ওদের বিয়েটা ভালবাসার নয়। কিন্তু ভালবাসাটা ক্রমে জন্ম নিচ্ছে। ওদের কাছে গেলে সেই চাপা স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু শব্দ পাওয়া যায়। ওরা গতিময়, বহমান। শ্যামার মন চনমন করে। আলোকলতার শরীরে যখন আঁকশি জন্মায়, ছোট্ট ছোট্ট কোঁকড়ানো বাহুর মতো শূন্যে প্রসারিত হয়ে অবলম্বন ধরতে চায়। তেমনি শূন্যতার মধ্যে শ্যামা একজনকে খোঁজে। প্রকাণ্ড গাছের মতো সে। ঝড়ে-ঝাপটায় স্থির।

দিনটা ভালই কেটে গেল শ্যামার। আবার কাটলও না। সারাটা রাত বুকের এক ধারটা, মনের এক ধারটা ফাঁকা লাগল। আজ রাতে সে স্বপ্ন দেখল না, কিন্তু ঘুমটাও তেমন হল না গভীর। সকালে খানিকটা বেলায় উঠে তার ক্লান্তি লাগল খুব। শিয়রের জানালা খুলতেই দেখল রোদ আজ বড় তেজি। ফটফটে। জানালার খাঁজ শূন্য। নয়ন বেশ কিছুদিন হল চিঠি রেখে যাচ্ছে না। নয়নের হল কী?

কাকভোর। পাখির ডাক সদ্য শোনা যায়। শিশির-ভেজা মাটির গন্ধ এখন বাইরে। উঠোনে হলুদ গাঁদা আলো করে ফুটেছে। শিউলি জমেছে গাছের তলায়। দিনের আলো সব মানুষকেই বাইরে ডাকে।

অবিকল মুরগির ডাক শুনে সুকুলের ঘুম ভাঙল। তড়বড় করে উঠে বসে সে! বাবাকে নেড়ে উত্তেজিত গলায় বলে, বাবা ঘরের ভিতরে মুরগি ডাকছে গো।

জগদীশ পাশ ফিরে ঘুমচোখে সুকুলের দিকে চায়। সুকুলের চোখে-মুখে সব সময়ে একটা অবাক ভাব। নতুন মেলায় গেলে কচি-কাচাদের যেমন হয়, যতই দেখে মেলার বাহার ততই বাক্য হরে চেয়ে থাকে, তেমনই সুকুলের চারধারে দুনিয়ার মেলা লেগেই আছে। তার বিস্ময় ফুরোয় না। এই ভোরে বন্ধ ঘরের ভিতরে আবছায়ায় সুকুলের সরল মুখশ্রী দেখলে বুকের ভিতরে যেন ধূপগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। আর সব ভুল পড়ে যায়।

জগদীশ মৃদু গলায় বলে, মুরগি নয় বাবা, ও নয়নখুড়ো।

সুকুলের গালের এক ধারে এঁড়ানির দাগ, চোখ দু'টো ফোলা ফোলা। চুল হামলে পড়েছে কপালে, কিছু উঁচিয়ে আছে, ভেঙে পড়েছে কান ঢেকে। সব মিলিয়ে এক যশোদাদুলালের ছবি।

নয়নখুড়ো? দেখি তো!

বলে মশারি তুলে লাফিয়ে নামে সুকুল!

এই ভোরে নয়নের ওঠার কথা নয়। বহুকাল ধরেই ঘুমহীনতার রোগ তার। মাঝে মধ্যে সে ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। তার প্রিয় বড়ি সোনেরিল। ক্রমশ বড়ির মাত্রা বেড়ে এখন একসঙ্গে তিনটে-চারটে খায়, কখনও-বা তারও বেশি। তার পর একধরনের আচ্ছন্নতা নিয়ে পড়ে থাকে। খুব দুঃস্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেও হিজিবিজি চিন্তা করে। কখনও সে ডাক্তার দেখায়নি।

জগদীশ সেই রাতের ঘটনার পর মাঝখানের দরজা বন্ধ রাখে। কেউটে দুটোর বিষদাঁতও কামিয়ে ফেলেছে। কিছু দেখার নেই। সারা রাত বিছানায় শুয়ে বসে, ঘরে পায়চারি করে আর সিগারেট খেয়ে কাটায় সে। মাথা অসম্ভব গরম হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তখন দরজা খুলে উঠোনে যায়। তারা-ভরা আকাশ থেকে হিম ঝরে পড়ে, টুপটাপ পাতা খসার শব্দ। গাছেরা অলক্ষ্যে নিষ্পত্র হয়ে যাচ্ছে। আজকাল দু'-তিনটে দমকা বাতাসে গাছ ন্যাড়া হয়ে যায়। গভীর রাতে তারের যন্ত্রের মতো ডাকে ঝিঁ ঝিঁ, কাঁদে শেয়াল কুকুর, বাদুড় ডানা ঝাপটায়। জ্যোৎস্নায় ভোরের স্বপ্ন দেখে ভুল করে জাগবার ডাক দিয়ে ককিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে পাখি। তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তসীমায় চাঁদ নেমে ঝুলে আছে। নিষ্পত্র গাছের শেষ হলুদ পাতাটির মতো দুল দুল করছে ক্ষয়া ভাঙা চাঁদ, ভোরের প্রথম বাতাসেই খসে পড়ে যাবে। নিঃঝুম দৃশ্যটির দিকে চেয়ে থেকে নয়নের আচমকা মনে হয়, এখানে কেন পড়ে আছি? কী চাই আমি?

উত্তর তার জানা নেই। সে এমন অনেক কাজ করে যা কেন করে তা তার জানা থাকে না। এক রকম নেশারু ঘোরের মধ্যে সে চলে। রেগে যায়, উত্তেজিত হয়। কামুক হয়ে পড়ে। এক সময়ে মনে হয় শ্যামাকে ছাড়া সে আর একদিনও বাঁচবে না। পরমুহূর্তেই মনে হয়, শ্যামাকে দিয়ে কী হবে? তার কাছে চারদিক সব সময়েই আলো-আঁধারি। যেন বা তার জীবনযাত্রা কেবলই এক বনভূমির ছায়ায় ঢাকা আবছায়া পথটি বেয়ে। দিনের আলো আছে, আবার নেইও। কিছুই স্পষ্ট নয় সেখানে। এই অনন্তভূমিটি কোনওদিন ফুরোবে না, মনে হয়।

ভোরের প্রথম পাখিটি যখন ডাকল তখন পুবের আকাশ ছাইরঙা। একা ভূতের মতো নয়ন উঠোনে দাঁড়িয়ে। স্থির ও একাকী। পাখিরা ক্রমে তার চারধারে ডাকতে থাকে। তার পর ওড়ে। দূরে ব্রাহ্মসময় ঘোষণা করে মুরগির ডাক। সারা ভোর জুড়ে নানা শব্দের আজান ধ্বনিত হয়। তখন হিমে ভিজে গেছে নয়নের চুল, তার গা ববফ, চোখে শীতের অশ্রুবিন্দু। শরীরের বোধ তার নেই। সংবিৎ ফিরে পেয়ে নির্ঘুম, জ্বালা-ধরা চোখ সে একবার হাতের পিঠে মুছে নেয়।

ভোরে এই যে চতুর্দিকে জেগে ওঠা এটা টের পেয়ে নয়নের বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধক করে নড়ে যায়। যার ঘুম নেই, তার জেগে ওঠাও নেই। এই সুন্দর ভোরবেলাটির সঙ্গে নয়নের নিজস্ব চেয়ে থাকার কোনও মিল নেই। ভারী একা লাগে তার। ভয় করে সে কেন ঘুমোয় না?

ঘরে এসে নয়ন তার পার্সটা আর একবার খোঁজে। কোনায় কি খাঁজে যদি এক-আধটা বড়িও খুঁজে পাওয়া যায়। নেই। সে জানে। কাল রাতেও খুঁজেছে। হতাশ নয়ন আবার পায়চারি করে কিছুক্ষণ।

বিছানার চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ায় নয়ন, র‍্যাপারের মতো। দরজা টেনে শিকলি দিয়ে বেরোবার আগে অবিকল মুরগির মতো একবার-দু'বার ডাক দেয়। পাশের ঘরে সুকুলের গলার স্বর পায়। বাবাকে ডেকে কী যেন জিজ্ঞেস করছে সুকুল। জগদীশ উত্তর দিল।

উঠোনটা পার হয়ে সে রাস্তা ধরে। ঝোপঝাড়ের পাশে রাস্তাটা আঁকাবাঁকা কেমন পড়ে আছে। সাদা হাড়ের মতো রং। আবছায়া এখনও। পুবে কেবল ফ্যাকাশে রঙের ওপর লাল একটা ছোপ ধরেছে। গাছপালায় ঝুলে আছে অন্ধকার। পরিষ্কার ঠান্ডা বাতাস শ্বাসে ঢুকে বুক চিরে দিচ্ছে।

কোথাও যাওয়ার নেই। তার পথ সবদিকে খোলা। দূর থেকেই মোনা ঠাকুরের পুরনো মন্দিরের ওপর জাপানি ছবির মতো একটা অশ্বত্থচারাকে আকাশের গায়ে আঁকা দেখা যায়। পৃথিবীর সব মন্দিরের গায়েই বোধহয় অলক্ষ্যে অশ্বত্থচারা জন্মেছে এখন। গভীর শিকড় নেমে যাচ্ছে মন্দিরেব অভ্যন্তরে নালী ঘায়ের মতো। মোনা ঠাকুরদের দিনকাল শেষ হয়ে এল। খামোখা আল টপকাবার পরিশ্রম। দরকার নেই। অশ্বত্থের চারাটি মুখ উঁচিয়ে তো বলেই দিচ্ছে, শেষ শুরু হয়ে গেছে। দেরি নেই।

নয়ন নাবাল মাঠটি থেকে মন্দিরের চত্বরে উঠে আসে। নির্জন। কেবল পাখির ডাক, আর পতনশীল পাতার শব্দ। একবার সে মন্দিরটার মুখোমুখি দাঁড়ায়। লোহার গুল বসানো ভারী দুটো কাঠের পাল্লা বন্ধ। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে।

মাটিতে পড়া ফুলে পুজো হয় না। রাতে তাই শিউলিতলায় কাপড় বিছিয়ে রাখে তারা। সকালে কুড়িয়ে নেয় রাশি ফুল। শিউলিতেই ভরে যায় সাজি। তার পর স্থলপদ্ম আর জবা।

স্থলপদ্ম এ সময়টায় রাশি রাশি ফোটে। নিচু ডালগুলো শেষ করে তারা আঁকশি দিয়ে উঁচু একটা ডাল নুইয়ে আনছে। ফুলটা এসেও গেছে আঙুলের ছোঁয়ায়! আর একটু... একটু...। টুপ করে একফোঁটা হিম শিশিরের জল তার গালে পড়ল। হাসল তারা। ডালটা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে গাল মুছল। শীত করে তার। বড্ড শীত করে। পদ্মটা পাড়ল না তারা। থাক একটা-দুটো পদ্ম। গাছের ফুল গাছে থাক।

কুয়োর পাড়ে জবাগাছটা ভিজে শরীরে দাঁড়িয়ে। ঝুপসি। ফুল তুলবার আগে তারা এই আবছায়া ভোরের আলোতে কুয়োয় ঝুঁকে জল দেখল। জল নীচে নেমে গেছে অনেক। সেই কোন পাতালে একটা গোল আয়না বসানো, তাতে ফিকে ফিরোজা রং। স্থির জলে তারা নিজের ছায়া দেখল। কিছু বোঝা যায় না। না রং, না মুখ-চোখ। একটা ভূত যেন সে। এই ভোরবেলা ঘুম থেকে সদ্য উঠে তাকে কেমন দেখাচ্ছে? কে জানে। তাদের ঘরে একটা বড় আয়নাও নেই যে দেখবে। কাঠের আয়না, তাতে আবার ঝাঁপ ফেলার বন্দোবস্ত আছে। সেই ঢাকনার ওপর ফুল পাতা পাখি আঁকা, লেখা— সুখে থাকো। মরি মরি, কে যে আয়নাটা কিনে এনেছিল! সেই সুখের আয়নার ঢাকনা খুললে ঢেউখেলানো কাচে নিজের মুখখানা দেখে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে। আজ পর্যন্ত কম দিনই সে নিজের কোমর পর্যন্ত প্রতিবিম্ব দেখেছে। যদি কখনও দিন পায় সে, একটা বড় আয়না কিনবে। নিজের দিকে চেয়ে বসে থাকবে। নিজের কত কী দেখার থাকে, কেউ বোঝে না।

সবার আগে বাবার গুরুপুজো, চক্রের দিকে চেয়ে ধ্যান, জপ তার পর বিনতি প্রার্থনা। ততক্ষণ

বাবা এদিকে আসবে না। তারা নিশ্চিন্তে আবছায়া ছায়াটির দিকে চেয়ে থাকে। ছায়ার পিছনে আকাশ কী উঁচুতে! সে কি খুব রোগা? ছিপছিপে, না রোগা? কোনটা বলবে তাকে মানুষ? কালো, না শ্যামবর্ণ? মুখখানা কেমন তার?

অনেক পাখি-পক্ষী আর মুরগির ডাক সে শুনছিল এতক্ষণ। এ সময়ে ওরা তো ডাকবেই। চমকায়নি। হঠাৎ শুনতে পেলে, মন্দিরের চাতালে, কি বারান্দায়, কোথায় যেন খুব কাছেই একটা মোরগ ডাকছে।

ডাকার কথা নয়। কাছাকাছি মোরগ পোষে না কেউ। পুষলেও মন্দিরে আসতে পারে বলে ছাড়ে না, বাবা শুনলে...

তারা দুই হাতে তালি দিয়ে বলল, হুশ।

আবার মুরগি ডাকল। পরিষ্কার ডাক। মন্দিরের বারান্দাতেই উঠে এল বুঝি! তারা গাছপালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল। ফুলকপি উঁকি মারছে সদ্য, খেতের ঢিবিগুলো পেরিয়ে বেড়ার ধারে এল। বলল, হুশ।

দেখা গেল না। মন্দিরের চাতাল ফাঁকা, বারান্দা শূন্য।

আড়াল থেকে আবার মুরগি ডাকে। আনন্দিত ডাক।

তারা বেড়াটা টপকে পার হয়। পাখির মতো উড়ে আসে মন্দিরের বারান্দায়। হাততালি দিয়ে 'হুশ হুশ' শব্দ করে ছোটে। প্রথমটায় দেখতে পায় না কিছু। কিন্তু মনে হয় গোল বারান্দাটা দিয়ে একটা পায়ের শব্দ মন্দিরের দেয়ালের আড়ালে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটা হলুদ জামার অংশ চকিতে দেখা গেল। মিলিয়ে গেল দেয়ালের ওপাশে।

তারা দাঁড়িয়ে সতর্ক গলায় বলে, কে?

উত্তর নেই।

আমি কিন্তু লোক ডাকব।

নয়ন বারান্দাটা থেকে লাফ দিয়ে ঘাসে নামে। অন্ধকার আর নেই। উঁচু গাছের মগডালে প্রথম আলোর লাল কণাটি এসে পড়েছে। আলো ফুটবার সময়টি বড় সুন্দর। ফুল যেমন ফোটে। তার পর থেকে শুরু হয় দিন। দিন তারার ভাল লাগে না। মানুষ জেগে উঠলেই পৃথিবীটা নোংরা হয়ে যায়।

নয়ন উঁচু বারান্দার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। মেয়েটার পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। শ্বাসের শব্দ। নয়ন অপেক্ষা করে। পিছনে তাকায় না। উদাস চোখে পুব দিকে চেয়ে থাকে। তার শরীরে ঘুমহীনতার জ্বালা। শরীর বুঝি-বা একটু ক্লান্ত। তার খোলা শরীরের ওপর দিয়ে শীত গ্রীষ্ম চলে যায়, চলে যায় দিন রাত। তবু একটুও ঘুম আসে না। সোনেরিল ফুরিয়ে গেছে। আনা হয়নি। ধ্যুৎ তেরি!

মেয়েটা এগিয়ে আসে। থমকায়।

একটু চুপ। নয়ন ফিরে তাকায় না।

কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

সিগারেটের একটা গোল ধোঁয়া জট খুলতে খুলতে নিথর বাতাস বেয়ে উঠে আসে।

তারা ভয় পায়। কে?

নয়ন ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল। তেলহীন মুখ-চোখ তার, রাতে ঘুমোয়নি বলে শরীরের রস টেনে গেছে। হাসতে গিয়ে নীচের ঠোঁটটা চড়াৎ করে ফেটে গেল। জিভে রক্তের নোনা স্বাদ পায় নয়ন। তার চুল রুক্ষ, চোখের কোলে কালি। মেয়েটার ভয় পাওয়ারই কথা।

সে বলে, আমি নয়ন রায়। সুকুলদের বাড়িতে—

ও। তা এখানে কেন?

মায়ের স্থান। আসতে তো বাধা নেই।

তারা কী বলবে ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থেকে বলে, একটা মুরগি ডাকছিল এদিকে, সে কি আপনি?

নয়ন মাথা নাড়ে।

কেন ডাকছিলেন ওরকম। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

এমনিই। খেয়াল হল।

তারা একটু চেয়ে থাকে। তার পর হঠাৎ আঁচল মুখে তুলে 'খুক' করে হেসে ফেলে। সামলে বলে, কাল সুকুল বলছিল বটে একজন হরবোলা এসেছে তাদের বাড়িতে। এতক্ষণে বুঝলাম সে আপনিই তবে।

আমিই।

সকালের আলোতে মেয়েটাকে সাদাসিধে দেখাচ্ছে। তেমন কিছু দেখার নেই! তবে কিনা যৌবনে কুক্কুরী ধন্যা। তাই মেয়েটির শরীর লাউডগার মতো ডাঁটো, চামড়ায় ঘামতেলের মতো চিকচিক। সবচেয়ে সুন্দর তার দীর্ঘ চুল। মস্ত একটা এলোখোঁপায় বেঁধে রেখেছে। নয়ন ঊর্ধ্বমুখে মেয়েটিকে ক্ষুধার্ত চোখে একটু দেখল, বলল, আমি অনেক ডাক ডাকতে পারি।

তারা শ্বাস ফেলল। বলল, ওসব ডেকে কী হয়।

মানুষ চমকে যায়।

এই কথা বলে, একটু অর্থপূর্ণ হাসে।

তারা অস্বস্তি বোধ করে বলে, বাবা এক্ষুনি আসবে।

আসুক না।

তারা আবার কথা হারিয়ে ফেলে। বিস্ময়ে চেয়ে থাকে একটু। তার পর মুখ ফিরিয়ে বলে, ফুলের সাজি কুয়োপাড়ে ফেলে এসেছি। ওই যাঃ! যদি কাকপক্ষী ছুঁয়ে দেয়!

বলে আবার পাখির মতো উড়ে যায় সে। পালায়।

নয়ন বারান্দায় তেমনি ঠেস দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে। বাগানে মেয়েটি এখন একা। চারদিকে ঝোপঝাড়, নির্জনতা। ইচ্ছে করলেই পিছু নিতে পারে নয়ন। কেউ লক্ষ করবে না। লক্ষ করলেই বা কী? নয়ন গ্রাহ্য করে না। শীতের সুন্দর বাগানে মেয়েটিকে জ্বালানো যেত। কিন্তু আজ তার সে রকম কোনও ইচ্ছে নেই। কোনও দিন ঘুমের জন্য দুঃখ করে না সে। না ঘুমোনো তার অভ্যাস। কিন্তু আজ হঠাৎ একটু ঘুমের জন্য তার বড় তেষ্টা পায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঘুমের কথা ভাবে। তার কেন ঘুম নেই?

লোকটা চাষা না ভদ্রলোক বোঝা যায় না। মাল দিয়ে কাপড় পরে খালি গায়ে কেমন মাটি কোপাচ্ছে দেখ। কী তেজ শরীরে, বাঁট পর্যন্ত কোদাল গেঁথে যাচ্ছে মাটিতে। হুবহু চাষার মতো মুখে নাকে হুমুস শব্দ শ্বাস ছেড়ে উল্টে দিচ্ছে গভীর চাপড়া। রোদ এখন তেজি। শরীরটার থাকে-থাকে পেশি সেই রোদে ঝলসায়। উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া ছেড়েছে, বেলা বাড়ল। লোকটার গায়ে ঘাম, থুতনির কাছে এক ফোঁটা দুল দুল করছে। মাটির চাপড়াগুলো রোগা হাতে একটা ঘুরপি দিয়ে ঠুক ঠুক করে ভাঙছে সুকুল। তার গায়ে পুরোহাতা হলুদ সোয়েটার।

মেহেদির নিচু বেড়াটা ডিঙিয়ে নয়ন জমিতে নেমে আসে। একটু দূর থেকে দেখে। সুকুলের রং ফরসা, নরম-সরম গা, মুখখানা লম্বাটে ছাঁদের, চোখ দুটো দিঘল। জগদীশের সঙ্গে কোনও মিল নেই। জগদীশের শরীর চৌকো, মুখ চৌকো, চোখ গর্তে, গায়ের রং কালোই, তবে মিশমিশে নয়। সুকুল হয়তো তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। যদি পেয়ে থাকে তবে বলতে হবে, ওর মা সুন্দরীই ছিল।

নয়নের দীর্ঘ ছায়াটা সুকুলের গা ছুঁতেই সুকুল মুখ ফিরিয়ে চেঁচাল, নয়নখুড়ো।

উম্।

সকালে তুমি মুরগির ডাক ডেকেছিলে?

হুঁ!

আমাকে শিখিয়ে দাও।

দেব।

বেড়ালের ঝগড়াটা শিখিয়ে দাওনি কিন্তু। ওই যে দুটো বেড়ালে যখন ঝগড়া হয়, যখন গায়ে জলের ছিটে দিলে একজন আর-একজনকে বলে, তুই আমার গায়ে মুতলি, অন্যটা বলে, তুই আমার গায়ে মুতলি, কী রকম করে বলে যেন? ফ্যাঁ-ও-ফ্যাঁ-অ্যা-ফ্যাঁস ফ্যাঁস— বলো না।

জগদীশ একবার তাকিয়ে তার কাজ করে যায়। কথা বলে না। কেবল সুকুলকে ধমক দেয় একটা, আমার কোপানো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু, তোমার চাপড়া ভাঙা পড়ে রইছে। থাক তবে তোমার পালা রোয়া হবে না—

সুকুল তাড়াতাড়ি চাপড়া ভাঙতে ভাঙতে হি হি করে হাসে। বলে, পোড়েলদের বুড়ো কাল বলছিল, কী কাণ্ড বাবু, এই দিনে এমন কোকিল ডাকে কেন রে? এত কোকিলের মচ্ছব লাগল কেন। কী জানি বাবু, কোন অলুক্ষুণে ব্যাপার। জানে না তো যে, তুমি ডাকো।

জামগাছটার গোড়ায় কিছু ঘাস। গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নয়ন। একটু অন্যমনস্ক। রোদে পাথুরে লোকটা মাটি উলটে দিচ্ছে। ও রাতে কী নিঃসাড় ঘুমোয়! তবে কি পরিশ্রমই ঘুমের ওষুধ? না কি পুত্রস্নেহ? স্বাস্থ্য নয় তো? একটা শ্বাস ফেলে নয়ন। কী ভাবছে আবোল তাবোল! সবাই-ই তো ঘুমোয়। ঘুম আসে বলে। তার আসে না।

পলকের মধ্যে কাঠা দেড়েক খেত কুপিয়ে ফেলে জগদীশ। এখন খেতের শেষে দাঁড়িয়ে গামছায় ঘাম মুছছে। পায়ের কাছে দাঁড়ানো কোদালখানা। হেসে বলল, হেরে গেলি সুকুল! ঠুক ঠুক করে এখন সারাদিন লেগে যাবে তোর।

গামছায় গা মুছতে মুছতে জগদীশ এসে পাশে বসল। কোমর থেকে বিড়ির বান্ডিল বের করল। আর লাইটার। বলল, কোথায় গিছিলেন?

ঘুরে এলাম।

আলায়-বালায় ঘুরলেন তো অনেক। কী খুঁজছেন আসলে?

নয়ন বলল, আমাকে সাপ ধরা শিখিয়ে দেওয়ার কথা ছিল আপনার!

জগদীশ চুপ করে থাকে। সে রাতে নয়নকে চড় মারার পর থেকেই বোধহয় তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। নয়নের সব কথার উত্তর সে দিচ্ছে না দু'দিন। বিড়িটা ধরিয়ে খুব আরামে দীর্ঘ টান দিয়ে ঘন ধোয়া আস্তে ছেড়ে দিল। আরামের কাশি কাশল খুক খুক করে।

শিখবেন?

নিশ্চয়ই।

তবে গুরু বলে মানুন।

নয়ন একটু তাকায়, মানে?

জগদীশ হাসে, এসব গুপ্তবিদ্যা, কাউকে শেখানো যায় না অমনি। যদি শিষ্য হয় তবে শেখানো চলে।

নয়ন একটু হেসে বলে, আপনারা সবাই এত গুরু গুরু করেন কেন? মোনা ঠাকুরও গুচ্ছের গুরুতর কথা বলে গেল সেদিন। ব্যাপারটা কী!

জগদীশ দূরের দিকে চেয়ে বিড়িটা শেষ করে। তার পর হঠাৎ একটা শ্বাস ফেলে বলে, শহরের মানুষ গুরুর মর্ম কমই বোঝে। সেখানে সবাই গুরু। গাঁ-গঞ্জের লোকেরা গুরু মানে, কারণ, তারা

প্রকৃতির নিয়ম জানে। নিয়মই বলে দেয়, গুরু ছাড়া কিছু হয় না। উটকো লোককে কেউ কিছু শেখায় না। একটা আধবুড়ো নোংরা অশিক্ষিত লোককে গুরু মেনে, একবছর তার পদসেবা করে তবে আমি শিখেছিলাম। সে ভারী কষ্ট। লোকটাকে ঘেন্নাও হত। হেগে কাপড় ছাড়ত না, দাঁত মাজত না, গায়ে চিমসে গন্ধ, চোখে কেতুর, কথায় কথায় মেজাজ নিত, জাতেও জলচল না। তবু লোকটার পিছনে ঘুরতাম নেশাখোরের মতো। মাঠে-ঘাটে ছিল তার সাপের বাগান, যেতে যেতে ফুল তোলার মতো বিষধরদের টুকটাক তুলে নিত ঝাঁপিতে। না-কামানো সাপ বের করে সকাল-বিকেল একা একা খেলত। তার সেই কাণ্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। হ্যাঁ, গুরু বটে। লোকটার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তবু আমি মাঝে মাঝে পাথরঘাটায় তার কবরের কাছে যাই সুকুলকে নিয়ে। বসে থাকি কবরটার পাশে। বেশ লাগে।

নয়ন চুপ করে থাকে।

জগদীশ একটু হেসে বলল, গুরু মানতে বলায় রাগ করলেন?

নয়ন মাথা নেড়ে বলল, না। তবে আমার গুরু-ফুরুতে বিশ্বাস নেই।

জগদীশ বলে, তা হলে শেখানো চলে না।

কেন?

গুরু না মানলে বিদ্যেটা একদিন অবিদ্যে হয়ে দাঁড়াবে। গুরু যেন রক্ষাকবচ, সে না থাকলে একদিন বিষধরই খাবে আপনাকে। গুরুর দেওয়া নিষেধ বারণ আছে, সে-সবও শ্রদ্ধার সঙ্গে মানতে হবে। নইলে বিদ্যে কিছু না। আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি নিয়ম ভাঙতেই জন্মেছেন। আপনি বিদ্যে নিয়ে বিপদ করবেন।

নয়ন একটু হাসে। বলে, তা হলে শেখাবেন না?

জগদীশ মাথা নাড়ে, না। বললাম তো আপনাকে কিছু শেখানো বড় বিপদ। রাতবিরেতে উঠে যদি সাপ-সাপিনীর হরগৌরী দেখতে চান তা হলেই হয়ে গেল।

নয়ন একটা ঢিল ছুঁড়ে বলে, ঠিক আছে। আমি নিজেই শিখে নেব।

জগদীশ অবাক হয়, নিজে শিখবেন! কী করে!

নয়ন হাসে, কায়দাটা খানিকটা বুঝে গেছি। একটু প্র্যাকটিস দরকার। ও হয়ে যাবে।

জগদীশ গম্ভীর গলায় সতর্ক করে দেয়, ও কাজও করতে যাবেন না। ও বড় হীন জীব। ওস্তাদ ছাড়া আর সবাই তার বধ্য। এ কেবল একটা-দুটো কায়দা নয়, এ হচ্ছে একটা শাস্ত্র। সর্পচরিত্র জানা কি শুধু একটা-দুটো সাপ ধরতে দেখেই হয়ে যায়?

দেখা যাক।

জগদীশ মাথা নাড়ে, ও হয় না। আপনি না শিখে ধরতে গেলে হয় নিজে মরবেন, নয়তো সাপকে মারবেন। দুটোই খারাপ।

আপনি সাপ মারেন না?

উরেব্বাস রে! মারতে পারি।

কেন, মারলে কী হয়?

যারা শাস্ত্র জানে তারাই জানে মারতে নাই কেন? প্রকৃতির কোনও জীব ফেলনা নয়। মারতে শুরু করলে তো সবই মেরে ফেলতে পারি, তখন মাথায় রক্তক্ষরণের ওষুধ আসবে কোত্থেকে?

ওটা যুক্তি নয়। সংস্কার।

তা হবে। আমি অত ভাবি না। গুরুর নিষেধ আছে, তা-ই যথেষ্ট। জলে ডাঙায় অন্তরীক্ষে জীব চলে-ফিরে বেড়ায় গুরুর দয়ায়। বেড়াক।

তবে ধরেন কেন?

ধরি তাকে জানবার জন্য। চেনা-জানা কী পাপ? যেমন মানুষ চিনি, তেমনি সাপও চিনি,

পাখি-পক্ষী চিনি। কত কী জানার আছে পৃথিবীতে। সুকুলবাবা, তোমার কি হাত ব্যথা করছে?

চিকন গলায় সুকুল উত্তর দেয়, না তো।

চলে এসো বরং। বাকিটা বিকেলে কোরো। তোমার তো নরম সরম হাত পা, সইবে না। রোদটাও তেজালো।

সুকুলের সুন্দর মুখখানা তেতে লাল, মুখে হাসি, হাতের চেটোয় রোদ থেকে চোখ আড়াল করে চেয়ে বলল, দাঁড়াও না, কামিনী গাছটা অবধি করি, তার পর এসে নয়নখুড়োর কাছে ডাক শিখব।

জগদীশ মুখটা ফিরিয়ে নয়নকে বলে, শুনছেন?

কী?

ও ডাক শিখবার জন্য আপনাকে গুরু বলে মেনেছে। আপনি কিন্তু সাপ ধরতে শেখার জন্য গুরু মানছেন না।

নয়ন হালকা গলায় বলে, কাউকে গুরু মানা আমার গুরুর নিষেধ।

কে গুরু?

কার্ল মার্কস।

জগদীশ একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। তার পর আস্তে করে বলে, নামটা চেনা-চেনা লাগছে। শহরে যখন বসত ছিল একসময়ে তখন শুনতাম বটে নামটা। অনেকদিন শুনিনি।

ঠাট্টা কি না ধরবার জন্য নয়ন জগদীশের মুখটা দেখল। তার ভাঙা চৌকো মুখে কোনও ভাব প্রকাশ পায় না। একটা ভালমানুষি বা বোকামি সেখানে স্থায়ী বাসা নিয়েছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে বলল, তাঁর চেলা একসময়ে আমিও ছিলাম। বঙ্গবাসীতে ছাত্র ফেডারেশন করতে বছরখানেক তাঁরও চেলা ছিলাম। তার পর শরীর ডাক দিল। তখন কোঁৎ পেড়ে বিশাল ওজন তুলতাম, বানরের মতো রিংয়ে ঘুরতাম, অনায়াসে করতাম গ্রেট সার্কেল, উঁচু-নিচু প্যারালাল বার, রোমান রিং, ভল্টিং বক্স, কত কী করতাম! ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন লাহিড়ীদা। গুরু। তিনি ডেকে বললেন, তোমাব হবে হে। সব ছেড়ে-ছুড়ে লেগে পড়ো। কাছের গুরু দূরের গুরুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল আমাকে। নইলে মার্কস সাহেবকে নিয়ে একটা তোলপাড় করার ইচ্ছে ছিল আমার।

নয়ন শান্ত গলায় বলে, আমার ইচ্ছেটা এখনও আছে।

ভাল। বিশ্বাস থাকলেই ইচ্ছে জোর পায়। লেগে থাকুন। সাপখোপ নিয়ে ভাববেন না।

নয়ন ঠান্ডা কৌতুকের গলায় বলে, আপনি আমাকে ভয় পান!

জগদীশ অবাক গলায় বলে, ভয় পাই?

নয়ন আস্তে হাত বাড়িয়ে জগদীশের মাংসল প্রকাণ্ড কাঁধে রাখে, পেশিবহুল হাতখানায় হাত বুলিয়ে বলে, এই বিশাল শরীর, শাবলের মতো হাত, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন? সেই রাতে চড় কষালেন, আমি জবাবি কিছু করিনি, চড়টা মেনেই নিয়েছি। আপনিও জানেন আমাকে ওই দু'হাতে পিষে মেরে ফেলা যায়, তবু আমাকে আপনার ভয় কেন?

প্রকাণ্ড চেহারার জগদীশ কথাটা শুনে কেমন একটু কুঁকড়ে যায়, তার চোখে-মুখে অস্বস্তি স্পষ্ট লক্ষ করা গেল। বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে বলল, কীসে বুঝলেন?

নয়ন এক ধরনের ঠান্ডা হাসি হাসে। বলে, জগদীশবাবু, আপনিও জানেন, আমিও জানি। আপনি চড়টা মারলেও ভয়টা আপনার উড়ে যায়নি।

জগদীশের বিড়িটা ধরেনি। দু'-একবার টিপে-টুপে সেটা ফেলে দিল সে। বলল, ঘরের দরজা বন্ধ রাখি বলে বলছেন? তা আপনার বিদঘুটে কাণ্ড-কারখানাকে ভয় পেতেই হয়। পাগুলে কাণ্ডকে কে না ভয় করে?

নয়ন মাথা নেড়ে বলে, আর কোনও ভয় নেই?

আবার ভয় কীসের?

ভয় যে কীসের তা কি আমি জানি? তবে লোকে ভয় পায় দেখেছি।

ওটা বাড়িয়ে বলছেন।

হবে। নয়ন উদাস গলায় বলে। তার পর হঠাৎ জগদীশের দিকে চেয়ে বলে, আপনার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে?

না। কেন?

আমার খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কতদিন যে ঘুমোইনি!

ঘুমোননি কেন?

ঘুম আসে না। এদিকে তো কোথাও সোনেরিল বড়িও পাওয়া যাবে না।

বকখালিতে ওষুধের বড় দোকান আছে। দেড় ক্রোশ। ওষুধ ছাড়া ঘুম আসে না?

না। ঘুমোতে পারি না। ইচ্ছে করে পড়ে কাঠ হয়ে ঘুমোই। স্বপ্ন দেখব না, চিন্তা করব না, একবার ওরকম ঘুম ঘুমোতে পারলে একটানা কয়েকদিন পড়ে থাকতাম।

জগদীশ একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, তার পর বলে, ঘুমোন না বটে। তাই সারারাত পাশের ঘরে মাঝে মধ্যে পায়ের শব্দ শুনি। জেগে থেকে করেন কী? শরীরে আবল্যি আসে না?

আসে। সারা রাত কী যে যন্ত্রণা! বড় একা লাগে। একটা ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করে। রেগে যাই। তাড়ি, বাংলা, সব খেয়ে দেখেছি। ঝিমুনি আসে। কিন্তু সে ঠিক ঘুম না।

আমার কাছে মোদক আছে। খেয়ে দেখবেন?

দেখেছি। যত নেশা সব করেছি। কিন্তু নেশা তো ঘুম নয়।

ভারী মুশকিল দেখছি।

আগে কষ্ট হত না। আজকাল হয়।

দুপুরে অনেকক্ষণ ডাক শিখল সুকুল। বারান্দায় বসে। ক্লান্তিকর, তবু অনেক রকম ডাক ডাকল নয়ন। কুকুর শেয়াল বেড়াল পক্ষী। নানাজনের গলার স্বর নকল করল। সুকুলের চোখ চক চক করল, মুখে-চোখে ভীষণ কৌতূহল।

আরও ডাকো। সে বলল।

সুকুল, একদিনে সব শিখতে নেই।

সুকুল জেদ ধরে, ডাকো না. শুনি।

এ সব শিখে কী হয়?

আমি শিখব। আমি হরবোলা হয়ে যাব।

কেন?

রাস্তা দিয়ে অনেক ডাক ডাকতে ডাকতে যাব, তুমি যেমন যাও। লোক বুঝতেই পারবে না যে সুকুল যাচ্ছে। চমকে উঠবে।

লোকে চমকাতে ভালবাসে না সুকুল। দেখ, আমাকেও কেউ ওই জন্যই ভালবাসে না।

আমি বাসি। খু-উ-ব।

নয়ন হাসে। হাসতে তার কষ্ট হয়। ঠোঁটে রক্ত জমে আছে। চোখে জ্বালা। সকালে একহাঁড়ি খেজুর রস নামিয়েছিল জগদীশ। অনেকটা খেয়েছে সে। শরীর ঠান্ডা হয়নি। জ্বরের মতো লাগে। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সে একটু চোখ বোজে।

এই নয়নখুড়ো, ঘুমোচ্ছো যে! চোখ খোলো, বলে সুকুল তার চোখে আঙুল ঢোকাতে চেষ্টা করে। চোখের পাতা ধরে টানে।

নয়নের চোখ খুলতে ইচ্ছে হয় না। বাইরে একটা সাদা চাদরের মতো রোদ আজ। চেয়ে থাকলে চোখ জলে ভরে আসতে চায়।

'সুকুল' বলে বেড়ার আগলের ধার থেকে কে ডাকল। মেয়ে গলা। সুকুল টপ করে উঠে দুদ্দাড় দৌড়ে গেল।

বেড়ার ওপাশে তারা দাঁড়িয়ে। হাতে কলাপাতায় ঢাকা একটা কাঁসার বাটি। স্নানের পর এখন চুল এলো। পরনে একটা লাল টুকটুকে শাড়ি। মোম-মাজা শরীর। বোধহয় কোথাও কোনও ব্রণ বা গোট নেই। দাঁতগুলো বড় ঝকঝকে। কপালে একটা তেলসিঁদুরের বড় টিপ। চোখে কাজল দিয়ে থাকতে পারে, চোখ দুটো বড় ডাগর দেখাচ্ছে দূর থেকেও।

তারা দাঁড়াল না । সুকুলের হাতে বাটিটা দিয়ে বলল, একসময়ে চুপ করে যেয়ে বাটিটা দিয়ে আসিস।

চলে যাওয়ার আগে একবার সজল বিদ্যুৎ হেনে গেল নয়নের দিকে। এক পলক মাত্র। তার পরই পিছন ফিরে বাঁশঝাড়ের আড়াল হয়ে গেল।

কী সুকুল? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

সুকুল বাটিটা নাকের কাছে তুলে গন্ধ নেয়।

নতুন গুড় গো! দেখ, এখনও গরম। জ্বাল দিচ্ছিল সকাল থেকে। খাবে?

না, তুমি খাও। মেয়েটা মোনা ঠাকুরের মেয়ে না?

সুকুল মাথা নাড়ে, তারা-মা।

মা কেন?

আমি মা ডাকি। তারা-মা ডাকতে শিখিয়েছে। সকলের সামনে ডাকি না তো, আড়ালে ডাকি।

কেন মা ডাকতে শিখিয়েছে সুকুল?

ইচ্ছে। দেখ, তারা-মা কাল পিঠে-পায়েস দিয়ে যাবে। যা হয় ওদের সব দিয়ে যায় চুপি চুপি।

কেন?

আমাকে ভালবাসে তো! পাঁচজনের সামনে দিলে নিন্দে হবে।

নিন্দে হবে কেন?

কী জানি! লোকে বলে বাবা নাকি তারা-মাকে বিয়ে করবে। ধ্যাৎ, বাজে কথা। বাবা বিয়ে করবেই না।

নয়ন একটু হাসে। অন্ধি-সন্ধি একটু-আধটু বুঝতে পারে সে। কোথাও একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে। যেখানে মানুষ সেখানেই ঘোঁট।

ভুঁইচাষ বড় প্রিয় জগদীশের। এ সময়টায় রবিশস্যের চাষ। তা থেকেও কিছু আয় হয়।

চক্ষুলজ্জা বড় জিনিস। সে চাষা নয়, জমির মালিক। আধা ভদ্রলোক। কাজেই, অতএব বর্গাদার রাখতে হয়েছে। ছাতা মাথায় পিছু পিছু ঘুরছে সে।

চাষিটা রোগা-ভোগা বটে। ফাল তেমন গভীরে ঢুকছে না। এই যে ওপরের মাটি এ হল গে একশো বছরের পুরনো। ওপরে হাত-তিনেক পুরু জমি উলটে-পালটে আবহমান চাষ চলে আসছে। এই পুরু আস্তর সরালে নীচে আছে সেই কুমারী। ওপরের এই বুড়ি-বিয়োনি জমি দিয়ে আর কতকাল চলবে! অনাবাদী ফেলে রেখে আর কেমিক্যাল সারে এ জমি পানসে হয়ে আসছে। ফসলের ঢল নেই। গভীর গর্ত খুঁড়ে সেই অনূঢ়া ভুঁইয়ের রূপ দেখতে ইচ্ছে করে তার। উঠে এসো গো কুমারী, দেখি তোমার কালচে সোনা রং, লাঙলের ফালে ফালে ঘুচে যাক লজ্জা, ঢল দাও ফসলের। তার ইচ্ছে করে পৃথিবীর ওপর থেকে ওই পুরু বুড়ি-বিয়োনি আস্তরটা তুলে ফেলে। কিন্তু তা হয় না। তত জোর লাঙলের ফালে নাই।

চাষিটা মরকুটে শরীর ভর দিয়ে ঠিকমতো গাঁথতে পারছে না। চাঙড় উপড়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন হচ্ছে না।

তামাক খাওগে। বুঝলে! জিরিয়ে ঠান্ডা হও, আমি দেখছি। বলে হাঁক দেয় সে। গায়ের পিরাণটা খুলে ফেলে, মাল দিয়ে কাপড়টা পরে নেয়, গামছা বাঁধে কপালে। জমিতে নেমে যায়।

জিনিসটা বড় ভাল লাগে তার। লাঙলটা যখন সে মাটিতে গাঁথে তখনই সে মাটির গভীর নরম মায়া টের পায়। ঠিক যেন মেয়েমানুষের শরীর। পায়ের আঙুল উঠে দু'খানা লোহা-হাতে সে চেপে ধরে হাতল। রি রি করে কেঁপে ওঠে মাটি। আনন্দে, যন্ত্রণায়। উপড়ে আসে গভীর শীতল কালচে-সোনা মাটি। ভারী এক রকমের তৃপ্তি পায় সে। 'অ-ড়-ড়-ড়' করে বলদ দুটোকে তাড়া করে। তার হু-হুংকারে বলদ দুটো নিষ্পেষিত ঘাড়ে ছোটে।

মেল ছেড়েছে গো! রোগা-ভোগা চাষিটা গাছতলা থেকে হেঁকে বলে। হাসে খুব। জগদীশের গায়ের জোর এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

ঘাম ফুটে উঠতে থাকে। শরীরে ছলাৎ ছল রক্তের শব্দ। দাঁতে দাঁত। লড়াই। উঠে এসো গো কুমারী মা, উঠে এসো। মাটি ওলটায়, তবু জগদীশের মন ভরে না। গভীর, আরও গভীর মাটি চাই, যে মাটিতে মানুষের হাল পড়েনি কখনও। গুপ্তধনের মতো সেই মাটি কোথায় কোন পাতালে এখন? ভারী লাঙলটা একবার তোল্লা দিয়ে ঝাঁকিয়ে বসায় সে। র-য়ে র-য়ে ফেটে যাচ্ছে ভুঁই, চৌচির হয়ে যাচ্ছে, নানা ঢঙের ঢেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। পায়ে মাটির স্বাদ, দু' হাতে মাটির কাঁপন উঠে আসে লাঙল বেয়ে। সুখ। তার সুখ এ রকমই। চাষাড়ে।

দূরে মাথা তোলা দিয়ে আছে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের চুড়োর কলস। তার ওপর একটা লাল নিশেন ছিল, এখন নেই। নিশেনের বদলে গজিয়েছে দুরন্ত অশ্বত্থ। বহু দূর থেকেই দেখা যায়। উত্তর দিকে চষবার সময়ে মন্দিরটা চোখে পড়ে। উলটোবাগে ঘুরলে দেখা যায় পৃথিবীর সীমা। সেখানে ছায়ার মতো গাছপালা, শিমুলের বীজ ফেটে তুলো যেমন ওড়ে তেমনই উড়ে যাচ্ছে হালকা আঁশমেঘ। ঘুরলে আবার মোনা ঠাকুরের মন্দির। বাঁশবন আর আমবাগানের মাথার ওপর উঁচিয়ে আছে। মোনা ঠাকুর নিজেও ওরকমই ওঁচানো। সবার ওপর মাথা তুলতে চায়।

মাথাটা নামিয়ে নিয়ে মাটির গভীর খালগুলো দেখে জগদীশ। বিড় বিড় করে কথা বলে, সুকুল আমার ছেলে নয়, সে কি আমি জানি না? হায় গো, এ-সব তো বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারে। বউটার ওপর রাগ করতাম। সে পা চেপে ধরত। সুকুলের বাপের নাম সে কখনও বলেনি। কী করব। পেলে তার বুকে এমনি লাঙল চেপে দু' ভাগ করে দিতাম না।

গভীর গভীরতর ডুবে যেতে থাকে লাঙল। অবিশ্বাস্য চাষ দেখে আধবুড়ো চাষি চেঁচিয়ে বলে, মাটিকে যে জল করে ফেলা হল! আরে বাঃ! বসুন্ধরা গলে যায় যে! বাঃ বাঃ!

চাষের বাহার সে বোঝে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে।

মাটির গভীর খাঁজে খাঁজে অন্ধকার। জগদীশ চেয়ে থাকে। নোনা ঘাম নেমে আসে ভ্রূ বেয়ে, চোখের কোণ বেয়ে। থুতনি বেয়ে। বিড় বিড় করে বলে সে, বাপ কে? অ্যাঁ! কে বাপ তবে আমার সুকুলের? এ বড় আশ্চর্য কাণ্ড! সুকুল আমার, বাপ ভিন্ন। অ্যাঁ! কত খুঁজেছি আড়ালে-আবডালে! যে-ই হোক। ছেলে আমার। খবরদার কোনও শালা যদি ফের কথা তোলে! সুকুল বড় হচ্ছে, বুঝতে শিখছে। বড় ভয়। যদি জানতে পারে? কী লজ্জা! খবরদার তোমরা সব, খববদার, কথা ওর কানে তোলে যদি কেউ চোয়াল খসিয়ে দেব, জিভ উপড়ে দেব সকলের। সার্কাসে আমি পাঁচ মন লোহা তুলতাম, মনে থাকে যেন।

লেবুকাঁটা দিয়ে চমৎকার একখানা টিপ পরে তারা। সস্তা কুমকুম বড্ড জেবড়ে যায়। লেবুকাঁটা দিয়ে পরলে বড় টিপটার চারধারে ফুটকিগুলো ভারী বাহার দেয়। ঢাকনা-খোলা আয়নাটা একটু একটু দূরে ধরল তারা। আয়নার ছায়ায় ঢেউ খেলছে। খেলুক। তবু বোঝা যায়, এ মেয়ের এখন যৌবনকাল। পোকামাকড় ভিড় করবার সময়। মুখ টিপে সে হাসে। পরমুহূর্তেই এক দুঃখ খেলা

করে যায় বুকে। পাউডার নেই, ঠোঁটের রং না, কিছু না। প্রদীপের শিষে কাজললতা উলটে কালি ফেলে একটু কাজল চোখে দেওয়া, তাও চুরি করে দিতে হয়। বাবা দেখলে ঠান্ডা গলায় বলে, কালি কি সাজ! চোখে লোভ আসে। উত্তেজক।

ঢাকনায় লেখা, সুখে থাকো! মরি মরি! কী বা লেখার ছিরি! সুখে থাকো বললেই সুখে থাকে লোক? তারার সুখ নেই। রঙিন শাড়ি, ভাল আয়না, সাজগোজ, সিনেমা থিয়েটার, রেডিয়োর গান, পুরুষ সঙ্গী... কত কী চায় মেয়েরা।

পশ্চিমের জানালায় রোদ সরে এল। নিমগাছের ছায়াটা উঁকি দিচ্ছে মেঝেয়। ওই ছায়াটা হুঁশ করে অন্ধকার হয়ে যায়। শীতের বেলা বড্ড তাড়াতাড়ি যায়।

সুকুলের বাবা আজ চাষে গেছে। এই তার ফেরার সময়। নাবাল মাঠটা দিয়ে হনহন করে হেঁটে আসে বিশাল মূর্তি, মাঠের মাঝখানটিতে একবার থমকে দাঁড়ায়। দূর থেকে কালীমায়ের মন্দিরের দিকে একবার হাতজোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে চলে যায়। মন্দিরে আসে না। তারার বাবা সুকুলের কোষ্ঠীতে বাপের নামের জায়গাটা খালি রেখেছিল। সেই থেকে রাগ।

কামিনী গাছটার ঝুপসি ছায়ায় নিজেকে আড়াল করে জগদীশকে প্রায়ই দেখে নেয় তারা। জগদীশ তা জানে। এক-আধদিন দেখাও হয়ে যায় এধারে-ওধারে। জগদীশ গা করে না। তারা কি সুন্দর নয়? নাই হল, সুন্দরী ছাড়া কারও দিকে তাকাতে নেই? তারার কিছুই কি দেখার নেই জগদীশের? পাথর! পাথর! ছেলের জন্য এত ভালবাসা কোথা থেকে আসে? ওই বুকটা থেকেই তো! একই বুক একজনের জন্য গলে ঘি, অন্যজনের বেলায় পাথর! ভারী আশ্চর্য!

শোনো সবাই, তারা ঠিক করে রেখেছে একদিন গলায় দড়ি দেবে। সেদিন খুব খাবে তারা। মাছের মুড়ো, পাঁঠার ঠ্যাং, পিঠে-পায়েস, চালতার অম্বল। সাজবে খুব। যে বাসন্তী রঙের চকরা-বকরা শাড়িটা দিদি লুকিয়ে দিয়ে গেছে, সেইটে পরবে সেদিন। খোঁপায় ফুল গুঁজবে। চন্দনের ফোঁটা পরবে মুখে। বিয়ের কনেটি সেজে অনেকক্ষণ আয়নায় দেখবে মুখ। সেদিন খুব জ্যোৎস্না ফুটবে। ঋতুটি হবে বসন্ত। দক্ষিণের পেয়ারা গাছটার ডালে ঝুলন ঝোলাবে সে। একা একা রাধা। কৃষ্ণবিরহিনী। সেদিন বিরহই তার মিতা। মরার সময়ে লোকে চিঠি লিখে রেখে যায়, বলে যায়, সে নিজেই মরছে। তারা লিখবে না কিছু। হঠাৎ মরে যাবে। এবার তোমরা খুঁজে বের করো— কেন তারা মরেছে! জগদীশ, সুকুলের বাপ কে এটা খুঁজে খুঁজে হয়রান! তোমাকে আর একটা হয়রানি দিয়ে যাব জন্মের শোধ! তারা কেন মরল! খুঁজে খুঁজে বের করো সারা জীবন ধরে। বেশ হবে! জন্মের শোধ।

কামানোর পর সাপদুটো ঝিমিয়ে গেছে। কাল ওদের দুটো ব্যাঙ দিয়েছিল জগদীশ। গিলেছে! দুটোরই পেট ফুলে আছে! ঢিপির মতো একটা জায়গায়। নিম-খোরাকি! একবার খেলে বহুদিন আর কিছু খায় না। ঝিম মেরে পড়ে থাকে। নয়ন কাচের ভিতর দিয়ে উগ্র চোখে চেয়ে থাকে। লক্ষ্য রাখে! কিন্তু না, ওদের পরস্পরের শরীরের প্রতি বড় নিস্পৃহতা। এ বড় অদ্ভুত। এরকম একটা বাক্সে নয়ন আর শ্যামা থাকলে?

নয়ন একটু হাসে।

এ জীবনে নয়ন আর কোনওদিন ঘুমোবে কি? আশ্চর্য, ঘুমের জন্য তার কোনও চিন্তা ছিল না; কোনওদিন। হঠাৎ আজকাল মাঝে মাঝে ঘুমের কথা তার মনে হয় কেন? এক-দেড় প্যাকেট সিগারেট, দু'-এক ঢোঁক বাংলা, আর চিন্তা— এই নিয়েই তো দিব্যি রাত কেটে যেত! আজ কেন ঘুমের চিন্তা? কে তাকে ঘুম পাড়াবে? শ্যামা? শ্যামা! চোখ জ্বলে যায় তার।

দুটো ঝাঁপি দড়িতে ঝোলানো। ওপরেরটায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে নয়ন। ভিতর থেকে একটা শ্বাসের শব্দ আসে। এই ঝাঁপি দুটোয় দু'জন গোখরো আছেন। ঠান্ডা মেজাজ। চট করে কামড়ান

না। কামানো, নিরাপদ। ঢাকনা খুললে যখন তারা মাথা তুলবে তখন পারবে কি নয়ন সাহস রাখতে? তেমন শক্ত নয়। জগদীশকে দেখেছে মুখের সামনে হাত নেড়ে সরিয়ে নেয়। মাথাটা তখন একটু নীচে ঝুঁকে পড়ে। জগদীশের বাঁ হাত তখন টপ করে পিছন দিক থেকে ধরে মাথাটা। অনেক সময়ে লেজ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে ফেলে। নিচু মাথা আর তুলতে পারে না। শক্ত নয়। পারবে নয়ন।

ভেবে দেখলে শ্যামাকে তার কিছুই দেখানোর নেই। কত কিছু দেখাতে সাধ যায়! কী ভালবাসো শ্যামা? মানুষ খুন? সুন্দর পোশাক? বিনীত ব্যবহার? না কি গান শুনতে চাও? উপহার ভালবাসা? অপহৃত হতে চাও? কী শ্যামা? তোমার জন্য আমি ফুটবল খেলোয়াড়ও হতে পারি। কিংবা গায়ক। অভিনেতা। যা চাও তাই হব।

ঝাঁপিটার গায়ে আর একবার আলতো হাতে চাপড় দেয় সে। ভিতরে এবার দুটো দ্রুত তীক্ষ্ণ শ্বাসের শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোনো শ্যামা, কীরকম শব্দ হয়। বিরক্ত হচ্ছে, রেগে যাচ্ছে। শোনো শ্যামা, কীরকম শব্দ! ঝাঁপি খুললেই কপিশ বিদ্যুৎ চমকে উঠে দাঁড়াবে। বিদ্রোহী। মুক্তিকামী। কী ভয়ংকর! সম্মোহনের হাত বাড়িয়ে আমি ধরে নেব তাকে। কত খেলা দেখাব। দেখ।

সুকুল জামতলায় খেলছে। অনেক সঙ্গী জুটেছে তার। জগদীশ একঘরে, কিন্তু সুকুল নয়। গাদির কোট পড়েছে মাঠে। সুকুল পাকা খুঁটি। চেঁচিয়ে বলছে, আমার কোটে আসিস না, আমি পাকা। দান কেটে যাবে।

খেলা খুব জমে গেছে। সুকুল এখন আসবে না।

ওপরের ঝাঁপিটা সাবধানে দড়ির দোলনা থেকে তুলে আনে নয়ন! বেশ ভারী। সাপ যে এত ভারী হয় তা জানত না। বয়ে নিতে কষ্ট হবে। হোক!

বিছানার পাতলা চাদরটা দিয়ে ঝাঁপিটাকে বাঁধে সে। একটা ঝোলার মতো করে নেয়। ঝাঁপির ভিতর অবিরাম পাক খোলা আর শ্বাসের শব্দ হয়। নয়ন দাঁত টিপে হাসে। না সাপ, না শ্যামা, কাউকে বিশ্বাস নেই। কিন্তু কী করে তাদের ধরতে হয় তা শিখে যাবে নয়ন।

ঝোলা হাতে নয়ন নিঃসাড়ে মেহেদির বেড়া ডিঙিয়ে জঙ্গুলে জায়গায় ঢুকে পড়ল। রাস্তা দিয়ে যাবে না। গাছের আড়াল-আবডালে গেলেও সে ঠিকই পৌঁছবে। জায়গাটা চেনা হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ শরীর আছড়ে সাপটা এখন নিশ্চুপ। বোঝাটা হাত বদল করে বাঁশঝাড় পেরিয়ে বুকসমান কসাড় জঙ্গল ভেদ করে মোনা ঠাকুরের মন্দিরের পিছনটায় উঠে আসে। মোনা ঠাকুরের বাগান। এটা ঘুরে সে আমবাগানে গিয়ে পড়বে। বাগানের বেড়া ঘেঁষে সে হাঁটে।

মন্দিরটার ডগায় অশ্বত্থচারাটি চোখ তুলে দেখে নয়ন। একটু হোঁচট খায়। গোরুর দড়ি বাঁধার খুঁটি কে যেন উপড়ে নেয়নি। বোঝাটা আবার হাতবদল করে নেয় সে!

নাবাল মাঠটায় আলো ফিকে। পশ্চিমে একটা কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে। সূর্যটা ঘোলাটে। জগদীশ এখুনি ফিরবে। সে ফিরবে মাঠ দিয়ে, ততক্ষণে আমবাগানে ঢুকে যাবে নয়ন। দেখা হবে না। নয়ন একটা শিস্ দিল। অবিকল দোয়েলের মতো। বড় মিষ্টি ডাক পাখিটার। পরমুহূর্তে শ্বাস আটকে আটকে, পেটে খাঁজ ফেলে, কুঁজো হয়ে সে একবার-দু'বার কোকিল ডাকল। তার বড় প্রিয় ডাক।

মোনা ঠাকুরের বাগানের শেষে একটা ঝুপসি কামিনী গাছ ঝুঁকে তার ছায়া ফেলেছে নীচের নাবাল মাঠটিতে। ছায়াটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে।

ওই মাঠ পেরিয়ে সেই আশ্চর্য চাষাটি আসবে। কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে রোজই তাকে দেখে তারা। তারা যে দেখে তা কি ও জানে না? জানে। জেনেও পাথর। পুরুষ নও নাকি? শরীরে তো মাংসের বাহার, মন কোথা? বাসনা কোথা? পুরুষ হবে পুরুষের মতো, গনগনে আঁচ থাকবে তার, থাকবে কামনা। তা নয়, এ হচ্ছে গিয়ে মুক্তপুরুষ। ছেলে থাকলে আর জমি থাকলেই কি হল? মেয়েমানুষ চাই না? বাপু, তুমি হচ্ছ হিজড়ে।

একটু আগেই আজ এসে পড়েছে তারা। বেলা আছে। পশ্চিমে একটু ঘোলাটে ভাব বলে বেলা আন্দাজ পায়নি। কামিনী ঝোপটার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে প্রজাপতিদের ওড়াউড়ি দেখে। ডাঁস, মশা আর আলোর পোকা উড়ে যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে পিন পিন করে মশা মাথার ওপরে। কুয়ো থেকে কে জল তুলছে। ভরা বালতি থেকে ছলাৎ করে জল উপচে জলে পড়ল। পিছনে গাছের আড়াল আছে। তবু একটু সেঁটে দাঁড়ায় সে। বুকটা একটু একটু কাঁপে। কিশোরীর হৃদয় কাঁপবেই। মুখে একটু শোষভাব। কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে। এই উত্তেজনাটুকু তার ভালই লাগে। নাবালের মাঠ দিয়ে মাটিমাখা প্রকাণ্ড মানুষটা রোজ যায়। হাত দশেক তফাত থাকে তারার শরীর থেকে। সেই দশহাত শূন্যতা জুড়ে কত ইচ্ছার ঢেউ তারা বইয়ে দেয় রোজ। সে কখনও ফিরেও দেখে না।

দোয়েলের একটা শিস। তারা চমকায়! এত জোর ডাকল, কাছেই! পরমুহূর্তে তার কানের পরদা ফাটিয়ে একটা কোকিল কাঁদে। ডাক নয়, যেন কান্না। বড্ড বুকভাঙা ডাক। মিতা বুঝি উড়ে গেছে কোথা!

ঝোপের ভিতর থেকে আস্তে মুখ বাড়ায় তারা।

লাফ দিয়ে একটা খন্দ পেরিয়ে হলুদ জামা পরা ছোকরাটা সামনে এল! লুকোবার সময় পেল না তারা! মুখটা টেনে নিল আড়ালে, কিন্তু ও দেখছে ঠিক। দাঁড়িয়ে গেল।

বোঝাটা হাতবদল করে ঝোপের পাশে একটু দাঁড়াল। তারার বুক ঢিপ ঢিপ করে!

একটা শ্বাস ফেলল ছেলেটা। তার পর চলে যাবে বলে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে এল! বলল, দেখে ফেলেছি!

তারা চুপ।

কী হচ্ছে এখানে?

কিছু না। বাগানে দাঁড়িয়ে আছি। তারা অস্ফুট স্বরে বলে।

ছোকরাটা হাসে। বিচ্ছিরি হাসি ওর। বোঝাটা মাটিতে রেখে হালকা পায়ে বেড়ার কাছে আসে। তারা শ্বাস বন্ধ করে থাকে।

বাগানে দাঁড়িয়ে থাকা, না আর কিছু?

আর কী!

আচমকা ছেলেটা লাফ দিয়ে বেড়াটা পার হয়ে আসে। চেঁচাতে গিয়েও চেঁচাল না তারা। কী সাহস ওর।

ছেলেটার পায়ের শব্দ হয় না। বাতাসের ওপর চলে-ফেরে যেন। ঝোপটা ঘুরে মুখোমুখি চলে এল। মুখখানা দেখে আপনা থেকেই একটা ভয়ের চিৎকার গলায় উঠে আসছিল। সেটা সামলাল তারা। পেটের ভিতরটা গুর-গুর করে উঠল।

ছোকরাটার পিঙলে চুল বাতাসে উড়ো-খুড়ো হয়ে আছে। চোখের নীচে বসা কালি, কাটা-ফাটা ঠোঁট, ভাঙা চোয়ালে রগ ফুটে আছে। চোখ দুটো লালচে, জ্বলজ্বলে। ওপরের পাতাটা আধবোজা। হঠাৎ বুক চমকে ওঠে দেখলে।

তারা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, কী চান আপনি?

সুকুল তোমাকে মা ডাকে কেন?

তারা ঢোঁক গিলল। কারও জানার কথা নয়। কেবল সুকুল জানে আর সে নিজে। আড়ালে সুকুলকে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে সে। বোকা ছেলেটা, পেটে কথা রাখতে পারেনি।

তারা বলল, কই না তো!

ছোকরাটা ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলে, তোমরা মেয়েরা মিথ্যেবাদী। তুমি সুকুলকে মা ডাকতে শিখিয়েছ কেন?

শেখাইনি, ও নিজেই ডাকে। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে বলে।

মিথ্যেবাদী। চাপা স্বরে বলে ছোকরাটা।

না।

বাবা শুনলে হেঁটোকাঁটা ওপরকাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলবে। তারা তাই কেবল বাতাস গিলল। ছেলেটার পিঙলে চুল ফণা ধরে আছে। মুখে না খেতে পাওয়া ভাব। শরীরটার তামাটে রং থেকে রাগের তাপ আসছে।

সেজে-গুজে কার জন্য দাঁড়িয়ে আছ? জগদীশ?

তারা মাথা নাড়ে। কানের পুঁতির ঝুমকো দুটো গালে এসে ঝাপটা মারে। সে মাথা নেড়ে জানায়, না।

ছোকরাটা একটু হাসে। তার পর ঠান্ডা গলায় বলে, আমি জানি।

কী জানেন?

সব। যদি মোনা ঠাকুরকে বলে দিই তবে জগদীশ উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

যা জানেন তা ঠিক নয়।

তোমরা মিথ্যেবাদী। মোনা ঠাকুর যখন বাণ মারে তখন কী হয় জানো তো? মুখে রক্ত তুলে, দাপিয়ে মরে যায় তরতাজা মানুষ। জানো?

তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে।

জগদীশেরও তাই হবে। ছোকরাটা হালকা স্বরে বলে।

না।

কী না? বলে এগিয়ে আসে ছোকরাটা।

বড়দি পালিয়ে গিয়েছিল একটা চামচিকের সঙ্গে। মোনা ঠাকুর হইচই করেনি, পুলিশে খবর দেয়নি, খোঁজেনি। বিয়ের দু' মাসের মাথায় মুখে রক্ত উঠে সেই চামচিকেটা মরেছিল। সবাই বলে, মোনা ঠাকুর বাণ মেরেছে। সেটা মিথ্যেও নয়। বাবা ঠিক বাবা নয় তারার কাছে। অন্য সকলের কাছে যেমন 'মোনা ঠাকুর' তার কাছেও তেমনি। রহস্যময় এক শক্তির অধিকারী ভয়ংকর পুরোহিত। চতুর্দিকে বিস্তৃত তার সম্মোহন আকাশে বাতাসে জাল ছড়িয়ে রেখেছে। অদৃশ্য চক্ষু লক্ষ রাখছে সব দিকে। তারা নিথর হয়ে চেয়ে থাকে। বুকটা জ্বলে যায়। কোনওদিকে পথ খোলা নেই।

ছোকরাটার শ্বাস মুখে পড়তেই চকিতে চটকা ভেঙে মুখ তোলে তারা। কত কাছে এসে গেছে দেখ! মাগো! তারা পিছোতে যাবে ছেলেটা হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল।

পালাচ্ছ?

এটা কী? ছাড়ুন। তারা ছটফট করে।

আমি মোনা ঠাকুরকে বলে দেব।

না।

ছোকরাটা হাসে। তারার হাতখানা নাকের কাছে তুলে গন্ধ শুঁকে বলে, তোমার গা পরিষ্কার, কোনও গোটা নেই, মোলায়েম!

ঝটকা দেয় তারা। কিন্তু হাত খসে না। সাঁড়াশির মতো ধরে রেখেছে।

ছোকরাটা আপন মনে বলে, প্রচুর ক্লোরোফিল তোমার শরীরে। তাজা ভিটামিন, আর ক্যালসিয়াম। দুরন্ত লিভার, আর হার্ট। তোমার কোনও অসুখ নেই।

ছাড়ুন। আমি চেঁচাব।

না, চেঁচাবে না। খুন করে ফেলব।

বলতেই তার চোখ ঝলসে ওঠে। স্তিমিত গলায় আবার বলে, তোমাকেও। জগদীশকেও! মোনা ঠাকুরের বাণে অনেক সময় কাজ হয় না। কিন্তু আমার বাণে হয়। আমি মানুষ মেরেছি তারা।

তারার চোখে পলক পড়ে না। দুরন্ত মুহূর্তগুলি কেটে যাচ্ছে। শরীরে একটা রক্তের হলকা বয়ে যাচ্ছে।

ছোকরাটা হাতখানার গন্ধ আর একবার শুঁকল। তার পর বলল, তোমাকে আজ আমার একটা গোপন কথা বলে দিলাম। মানুষ মারার কথা। আজ অবধি আর কাউকে বলিনি।

পশ্চিম দিগন্তে একটা মলিন সূর্য ঝুলে আছে। ডুবে যাচ্ছে না। বাতাস বন্ধ। পৃথিবীতে সময় থেমে গেছে হঠাৎ। ছোকরাটা মুখ নামিয়ে আনে কাছে, চাপা গলায় বলে, যাকে একবার গোপন কথা বলে দেওয়া যায় তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না। তোমাকে বিশ্বাস করি না আর। বুঝেছ?

আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায় ছোকরাটা। কাঁধে ঝাঁকি দেয়। কাঁপনটা নিজের শরীরেও টের পেল তারা।

আমি আবার আসব। হঠাৎ আসব। তোমাকে পাহারা দিতে। আমার গোপন কথাটা কাউকে বলেছ কি না দেখতে আসব। বার বার। তোমাকে শান্তিতে থাকতে দেব না। আমি একবার যার পিছু নিই তার শান্তি থাকে না। বলে সে হাসে।

তারা অনেক কষ্টে অস্ফুট গলায় বলে, কী সব বলছেন!

সে কথায় কান না দিয়ে ছেলেটা পৃথিবীর রাজার মতো গলায় বলে, আবার যখন আসব তখন তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব।

কী? ভয়ার্ত তারা জিজ্ঞেস করে।

ক্লোরোফিল, কিংবা ক্যালসিয়াম, ভিটামিন কিছু একটা। ঠিক জানি না। অনেকদিন আগে আমি ডাক্তারি পড়তাম, সেকেন্ড ইয়ারে ছেড়ে দিই। সব ভুলে গেছি। কিছু একটা চাই যা আমাকে ঘুম পাড়াবে। বুঝেছ?

তারা কিছু বোঝেনি। তবু ছাড়া পাওয়ার জন্য মাথা নাড়ল।

আজ আর সময় নেই।

বলে হঠাৎ নিস্পৃহভাবে তারার হাতটা ছেড়ে দিল নয়ন। বলল, জগদীশ আমাকে চড় মেরেছিল একদিন, বুঝলে। আমাকে চড় মেরেছিল। যে আমাকে মারে তার ছাড় নেই! আমি ফিরব! বুঝলে! ফিরব।

ছোকরাটা ঘুরে চটপটে পায়ে আবার বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। ঝোলাটা তুলে নিল হাতে। একবারও ফিরে না তাকিয়ে জঙ্গল ভেঙে মিলিয়ে গেল।

তারা নিঝুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার নরম হাতখানায় পাঁচ আঙুল বসে যাওয়ার লালচে দাগ। ব্যথা করছে। চোখ ভরে টলটলে জল এল তার। তার পর হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দরগার পিছনের ঢিবিটা পেরোলে একটা বাঁশঝাড়। সেটা ডাইনে রেখে দু' কদম হাঁটলেই নাবাল মাঠটা দেখা যায়। বাঁয় উঁচুতে মোনা ঠাকুরের মন্দির। মাঠের শেষে রাস্তাটা ঘুরে গেছে।

দূর থেকেই দেখা যায়, রাস্তার বাঁকটাতে সুকুল দাঁড়িয়ে। এত বড় মাঠটা সামনে বলে সুকুলটাকে যে কী ছোট্ট আর একা দেখায়। শেষবেলার আলোয় এখন কুয়াশার ভাব। মাটি থেকে ধুলোটে অস্বচ্ছতা উঠে আসে। বড় আবছা চারদিক। বড় মায়াময়। এ সময়টায় আলো ক্ষয়ে গিয়ে পৃথিবীর ওপর একটা স্বপ্নের সর পড়ে। সত্যি নয় কিছু। আলো ক্ষয় হয় এ সময়ে। দূর থেকে সুকুলকে মনে হয় মাঠের ওপর একটা দাগ মাত্র। বুকটা ফাঁকা লাগে জগদীশের।

মাঠের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে রোজ জগদীশ মন্দিরের দিকে হাতজোড় করে একটা প্রণাম ছুঁড়ে দিয়ে যায়। আজ দূর থেকে সুকুলকে দেখে বুকটা কেমন করল। মাঠখানা বুকে নিয়ে ছোট্ট সুকুল দাঁড়িয়ে। একা। বাবার জন্য চেয়ে আছে। মিথ্যে। বাবা কোথায় সুকুলের? তবে কি সবই এরকম? সাঁঝবেলায় সন্ধের ঝুঁঝকো আঁধার যেমন স্বপ্নের সর তেমনি? বুকটা কেমন করল। জগদীশ আজ

মাঠের মাঝখানে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, কাছে যাই না মা, দোষ নিয়ো না। তোমার মন্দিরের চারধারে লোকনিন্দের কাঁটাবেড়া। আমার যা হোক তা হোক, সুকুলকে দেখো। দেখ না, অভাগা ছেলেটা পৃথিবীতে কী রকম একা। মাঠ বুকে করে পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ওর কেউ না। জানে না তাই। এই মোহ চিরকাল রেখো মা। জগৎসংসারে মোহ ছাড়া মোয়া বাঁধে না।

কামিনী ঝোপটার আড়াল থেকে সাজপরা একখানা মুখ রোজই চেয়ে থাকে। লক্ষ করেছে জগদীশ। আজও করল। দেখি না দেখি না করে রোজ পেরিয়ে যায় জায়গাটা যেমন পোড়ো জায়গা রামনাম করতে করতে পেরোয় ভীতু মানুষেরা। জগদীশও পেরোয়। বন্ধনকে তার বড় ভয়। বাঁধা বাউন্ডুলে ছিল সে। গাউস সাহেবের দলের সঙ্গে উজেন ভাঁটেন বয়ে যেত দেশ-দেশান্তরে। সেই জগদীশ এখন শিকড় ছেড়েছে মাটিতে। ভুঁই, ঘর, ছেলে। তবু কিছুই তার নয়, সে জানে। সুকুল একটু বড় হোক, হাত-পা ঝেড়ে আবার সে বেরিয়ে পড়বে। সংসারে তার এই স্থিতি চায় না। সংসারে থিতোবার লোক আছে, সে সেই লোক নয়।

পেরিয়েই যেত জগদীশ। কিন্তু বাগড়া দিল কান্নার শব্দটা। তারা কাঁদছে। জগদীশ একটা শ্বাস ফেলে। সুকুলকে গোপনে 'তারা-মা' ডাকতে শিখিয়েছে মেয়েটা। বোঝে জগদীশ সবই।

কী ভেবে দাঁড়িয়ে গেল জগদীশ। কান্না ব্যাপারটা ভাল না। বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

ঝোপের পাশে অবিরল ফোঁপানি। হেঁচকির মতো শব্দ হচ্ছে।

জগদীশ আস্তে করে বলল, ঠাকুর এসব দেখলে বড় রাগ করে। এ ভাল নয়।

ওপাশটা চুপ। ভীতু খসখসে একটা শব্দ হয়। শ্বাস চাপবার চেষ্টা হচ্ছে। তার পর হঠাৎ ছোট্ট একটা প্রশ্ন উড়ে আসে, কেন?

জগদীশ বলে, মন চাইলেই কি সব হয়?

কেন হয় না? আবার প্রশ্ন উড়ে আসে।

জগদীশ বিষণ্ণ ভাবে মাথা নেড়ে বলে, হয় না। মোনা ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কোরো, তিনিই বলবেন, হয় না।

ওপাশটা একটু চুপ করে থাকে, কী যেন ভাবে। তার পর হঠাৎ ভারী ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করে, আপনি ব্রাহ্মণ না?

জগদীশ হাসে, বামুন ঠিকই। হালদার বংশ। উপনয়নও হয়েছিল। শরীর খেলাতে গিয়ে সেই যে পইতে ছেড়েছি, আর নেওয়া হয়নি।

তবে বাধা কী?

জগদীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বাধা অনেক। নিচু জাতে বিয়ে করেছিলাম বলে ব্রাত্যদোষ। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কী?

সুকুলের বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে।

সতর্ক এবং বেদনার গলায় বলে জগদীশ। স্বরটা খুব নীচে নেমে আসে। তার পর মুখ তুলে বলে, ওই সন্দেহ নিয়ে যে-ই আমার ঘর করতে আসুক, আমি তাকে সইতে পারব না।

আমি কিছু ভাবি না।

জগদীশ তবু মাথা নাড়ে, গাঁয়ে পাঁচটা কথা উঠবে। লোকে ঘোঁট পাকাবে। গোলমাল হবে। মোনা ঠাকুর খুশি হবে না—

আপনি বাবাকে ভয় পান?

জগদীশ শ্বাস ছাড়ে, বলে, কে না পায়?

তবে কী উপায় হবে?

উপায় দেখছি না। বেঁচে থাকতে গেলে কিছু ছেড়ে-কেটেই থাকতে হয়। অবস্থাটা মেনে নেওয়াই ভাল।

যদি কলকাতায় পালিয়ে যাওয়া যায়?

উরেব্বাস!

কেন, সর্বনাশ হয়ে যাবে নাকি?

হবে। মাটির গন্ধ না পেলে আমি থাকতে পারব না। মাটির বড় মায়া।

আপনার আবার মায়া-দয়া!

একটা দীর্ঘশ্বাস উড়ে আসে।

সুকুল এতক্ষণে বাপকে নিরিখ করেছে। কোনাকুনি ছুটে আসছে এঞ্জিনের মতো। জগদীশ বলল, যাই।

আচ্ছা।

এ রকম ভাবে থেকো না। লোকে দেখলে কী বলবে?

আমি থাকব। রোজ। আমার ইচ্ছে।

জগদীশ মাঠের শূন্যতায় এগিয়ে গেল। দু' হাত বাড়ানো। শূন্যতাকে ভরে দিয়ে সুকুল আসছে। আসছে।

ভারী সাপটাকে বয়ে আনতে কষ্ট গেছে খুব। পাকাসাপ, থলথলে চর্বি বোধ হয় গায়ে। নয়ন ঝাঁপি খুলে দেখেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়েছে। অমনি ভিতর থেকে প্রবল শ্বাসের শব্দ পেয়েছে। দাঁতে দাঁত টিপে একধরনের হাসি হেসেছে সে। ভীতু একটা জ্বালাময় আনন্দ।

সন্ধের বাসটা পেল নয়ন। পায়ের কাছে সারাক্ষণ ঝাঁপিটা সতর্ক পাহারা দিল, যেন পাহারা না দিলে মূল্যবান ঝাঁপিটা কেউ চুরি করে নেবে। মাঝে মাঝে ঝুড়িটায় লাথি মারল। শ্বাসের শব্দ পেল। পাশে বসা একটা মানুষ একবার জিজ্ঞেস করল, কী আছে ওটাতে?

নির্বিকার গলায় নয়ন জবাব দিল, একটা গোখরো সাপ।

সাপ! লোকটা চমকে উঠে পড়ে, বলে, কী সাংঘাতিক!

মানুষজন তার দিকে কৌতূহলে তাকায়। ঝুড়িটা অনেকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করে।

দূর-পাল্লার বাস বলে সিগারেট ধরালে কেউ কিছু বলে না। নয়ন কাউকে গ্রাহ্য না-করে বাইরের দিকে চেয়ে সিগাবেট ধরায়। তার পর একমনে সিগারেট টেনে যায়। বাইরে ভিতরে একটা তীব্র ছটফটানি তার। হাত-পা একভাবে রাখতে পারে না। এ পাশ ও পাশ হয়। বিড় বিড় করে নিজেকে বলে, সব প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেলে ঘুম আসবে। ঠিক ঘুম আসবে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। সদর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা কোনও বাধা নয়। সদর দিয়ে সে কদাচিৎ বাড়িতে ঢোকে। আজও ঢুকল না। গলির দরজা টপকে ঢুকল। ঝাঁপিটার জন্য কষ্ট হল খুব। ঝাঁকুনি খেয়ে ব্যাটা ভিতরে গজরাচ্ছে। কর্কশ দেওয়ালের ঘষাটায় কনুইটা ছড়ে গেল অনেকটা। কিছুই গ্রাহ্য করল না সে। ভিতরের দরজা খুলে দিল রাঁধুনি লোকটা। দরজা খুলে তাকে দেখেই সন্ত্রস্ত ভাবে সরে গেল। গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, বাবুর বড় অসুখ।

কার?

বড়বাবুর।

ও। বলে নির্বিকারভাবে নিজের ঘরে গেল সে। সে থাক বা না থাক তার বিছানা পরিপাটি পাতা থাকে রোজ। খাওয়ার ঘরে খাবার ঢাকা থাকে। এই নিয়ম করে রেখেছে মা। বেশি রাতে ফিরলেও কোনও অসুবিধে হয় না।

ঘরে ঢুকে ঝাঁপিটা যত্নে খাটের তলায় রেখে জামাটা খুলে শুয়ে সে সিগারেট ধরাল। কার অসুখ যেন বলছিল লোকটা!

উঠে আবার খাওয়ার ঘরে এল। বারান্দায় জল আর ঝাঁটার শব্দ হচ্ছে!

কার অসুখ বললে?

বড়বাবুর।

কী হয়েছে?

কী জানি! অজ্ঞান মতো হয়ে আছেন কাল থেকে। মা বলেছে আপনি এলেই খবর দিতে।

দোতলায় সিঁড়ির তলায় একবার দাঁড়াল নয়ন। সিঁড়ির বাতি নেভানো। ওপরটা নিস্তব্ধ। সিঁড়ি ভাঙতে তার ইচ্ছে করছিল না। বাবার জন্য তেমন কিছু উদ্‌বেগও বোধ করল না সে। কোনও দিনই করে না।

সিঁড়িতে গোটা দুই বেড়াল শুয়ে। একটুক্ষণ বেড়ালের ঘুম দেখল সে। বাবা এই রাতে মারা গেলে শ্মশান-ফশানে যাওয়ার ঝামেলা অনেক। ভেবে সে একটু বিরক্ত হল। মরে-ফরে যাওয়াটা যে সংসারে কেন আছে! এগুলো উঠে গেলেই ভাল।

আবার ঘরে এসে সে বাতি নিভিয়ে শুয়ে জেগে থাকে। তার পর হঠাৎ উঠে বাতিটা জ্বেলে ঝাঁপিটা বের করে।

একটা কপিশ শরীর পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে। দেখলে গা শির শির করে। নিঝুম হয়ে পড়ে আছে সাপটা। হাতটা একবার বাড়াল নয়ন, তার হাতের ছায়া পড়ল সাপটার মুখে। সাহস পেল না সে, হাতটা আবার সরিয়ে আনল।

একটা স্কুটার ছিল নয়নের। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করেছিল বলে বাবা কিনে দিয়েছিল। সেই স্কুটারটা নয়ন চালাত ঝড়ের মতো। হালকা জিনিস, চিৎপুরে একবার রাস্তার গর্তে ঝাঁকুনি খেয়ে নিয়ে ওলটায়। দ্বিতীয়বার একটা ট্রামকে টপকে যেতে গিয়ে ভবানীপুরে একটা স্টেটবাসের পিছনে ভিড়িয়ে দেয় নয়ন। তিনবারের বার বর্ষাকালের জলে-ডোবা লাইব্রেরি রোডে সেটা পড়ে যায় আধখোলা ম্যানহোলের ভিতরে। জখমটা গুরুতর হয়েছিল। কালীঘাটের একটা গ্যারেজে দিয়েছিল, সেখানে আজও পড়ে আছে। আনা হয়নি। স্কুটার আর ভাল লাগে না নয়নের। যদি কখনও কেনে একটা স্পোর্টস কারই কিনবে নয়ন। বাবা মরে গেলে কিনতে কোনও ঝামেলা হবে না। একটা সেকেন্ড হ্যান্ড এম জি স্পোর্টস কার দেখেও রেখেছে নয়ন।

স্কুটার যখন চালাত তখনকার একজোড়া চামড়ার দস্তানা আর গগলস আলমারিতে পড়ে আছে। নয়ন উঠে গিয়ে আলমারি খুলে দস্তানা জোড়া বের করে আনল। দস্তানাটা পুরু, দু' পাল্লা চামড়ার মাঝখানে তুলোর গজ ভরা। সে দুটো হাতে পরে নিল সে। তার পর সাপের ঝুড়িটার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। তেমনি নিঝুম পড়ে আছে সাপটা। মাথাটা ছোট্ট দেখাচ্ছে। কী করে ফণাটা মুহূর্তের মধ্যে অতটা চওড়া করে ফেলে!

নয়ন হাতটা বাড়াল। মাথাটার এক বিঘৎ দূরে হাতটা নিয়ে গেল সে। হাতের ছায়াটা নাড়তে লাগল সাপের মুখের ওপর। তার পর চকিতে আঙুল বাড়িয়ে একটা খোঁচা দিল সে। সাপটা নড়ল না। নড়লে কী হবে তা নয়ন ভাবে না। কাছাকাছি জগদীশ নেই, সে একা। তবু নয়ন আবার আঙুলের খোঁচা দিল। আবার।

চমকে মুখ তোলে সাপ। ছোট্ট মাথাটার দু' পাশে ছড়িয়ে যায় হাতের পাতার মতো ফণা। শেকড়ের মতো ছোট্ট জিবটা বেরিয়ে আসে। বারবার। ঘন শ্বাসের শব্দ। একটু দোলে। ছোবল দেবে নাকি?

সাপটার উদ্ধত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিটা দেখে নয়ন। চোখ ভরে দেখে। যা কিছুটা ভয়ংকর তা-ই তার প্রিয়। দস্তানা-পরা হাতটা সন্তর্পণে বাড়ায় সে। কিছু বুঝবার আগেই সাপটা চাবুকের মতো

মুখটা আছড়ে ফেলে নয়নের হাতের ওপর। দস্তানা-পরা হাত, তাই কিছুই টের পেল না নয়ন। কিন্তু খুব চমকে গেল। সাপ যে কতটা গতিময়, কী মারাত্মক তার চকিত আক্রমণ তা টের পায়, এই গতিটাই নয়নকে ভারী অবাক করে। জগদীশ এর চেয়েও দ্রুতবেগে হাত বাড়ায় এবং হাত সরিয়ে নেয়। নয়নকে শিখতেই হবে।

কিন্তু সাপটা আর ছোবল দেয় না। সে হয়তো নিজের বিষদাঁতহীন অক্ষমতা বুঝতে পারে। তাই মাথাটা নামিয়ে শরীরটাকে জলধারার মতো স্বচ্ছন্দে ঝুড়ির কানার ওপব দিয়ে টেনে মেঝের ওপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে চলতে থাকে। সাপটা যে কত বড় তা এই প্রথম বুঝতে পারে নয়ন, ফলে তার গায়ে কাঁটা দেয়।

সাপটা নয়নের দিকে ফিরেও তাকায় না। প্রথমে আলনার তলা, তার পর আবার ঘুরে খাটের নীচের অন্ধকারে যেতে থাকে। নয়ন একটু স্তব্ধ থাকে। তার পরই দাঁতে দাঁত টিপে নিজের কাঁপা শরীরকে সামলে হাত বাড়িয়ে খাটের তলার অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। সাপটা আবার পাকে-পাকে শরীর জড়াচ্ছে। সন্তর্পণে নয়ন হাত বাড়ায়। সাপটা মুখ তোলে, শ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে নয়নকে সতর্ক করে দেয়। নয়ন থেমে যায়। ওর দ্রুতবেগটাকেই নয়নের ভয়।

উদ্যত হাতটা বাড়িয়ে রেখেই নয়ন খর চোখে সাপটাকে দেখে। সাদা বুকটা তুলে, ফণা মেলে সাপটাও দেখে নয়নকে। নয়ন হাসে। তার পর নয়নের হাতটাই সাপটাকে অবিকল সাপের মতো ছোবল দেয়। গলার নীচে চেপে ধরে সাপটাকে হিঁচড়ে নিয়ে আসে সে। ছটফট করে সাপটা, সমস্ত শরীর আছড়ায়। নয়নের হাতটা পাকে পাকে জড়াতে থাকে।

হঠাৎ সমস্ত বুক পেট জুড়ে একটা বমির ভাব আসে নয়নের। ঘেন্নায় শরীর রি রি করে। সাপের ঠান্ডা শরীরের স্পর্শ তার হাতটাকে হিম করে দেয়। পাগলের মতো সে হাত ছুঁড়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দেয় ওটাকে, তার পর হাঁফাতে থাকে।

সাপটা মেঝেময় ছড়িয়ে কিলবিল করে। তার পর আবার ঝাঁপিটার পাশ দিয়ে খাটের তলায় চলে যেতে থাকে।

নয়ন দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢোকে, দস্তানা খুলে গলায় আঙুল দেয়। বেসিনে উপুড় হয়ে হড়হড় করে বমি করে। টক-তেতো স্বাদ, শরীরটা কাঁপতে থাকে।

মুখে-চোখে জল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে টের পেল, মাথায় ভয়ংকর যন্ত্রণা হচ্ছে। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। শরীরটা যেন বাতাস দিয়ে তৈরি, এমন হালকা লাগে।

দেয়াল ধরে ধরে ঘরে এল নয়ন। টেবিল হাতড়ে সোনেরিলের কৌটোটা বের করল। একসঙ্গে তিনটে কি চারটে—না গুনে মুখে নিয়ে জল দিয়ে গিলল। সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে কিছুক্ষণ সিগারেট খেল।

একটা ঝিমুনির ভাব আসছে। একটু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। এক-আধবার সাপটার কথা মনে হয় নয়নের। ভাবে উঠে গিয়ে ওটাকে ঝুড়িতে ভরে রাখা উচিত। কিন্তু শ্লেটের ওপর লেখা যেমন মুছে যায় তেমনি নানা হিজিবিজি চিন্তা স্বপ্নের মতো চোখের সামনে এসে যায়। সাপটার কথা খেয়াল থাকে না। হাতটা বিছানার বাইরে এলিয়ে পড়ে আছে, দু' আঙুলে ধরা সিগারেটটার ছাই লম্বা হয়ে ঝুলে আছে, মাথা ভর্তি স্বপ্ন, চোখ জুড়ে আসছে...

ঘুমিয়েই পড়ত নয়ন। দরজার মৃদু শব্দ শুনে চোখ কষ্টে খোলে সে।

কে রে?

নতুন চাকরটা ঘরে উঁকি দেয়, দাদাবাবু বড়বাবুর অবস্থা খারাপ। মা আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

নয়ন প্রথমটায় বুঝতে পারে না, জিজ্ঞেস করে, কার অবস্থা খারাপ বলছিস?

বড়বাবুর, আপনার বাবা মশাইয়ের।

ও, মাথাটা একটু ঝাঁকায় নয়ন। তার পর উঠে বসে বলে, কী হয়েছে?

কী জানি, অবস্থা কাল থেকেই খারাপ যাচ্ছে। খুব অসুখ।

নয়ন উঠল। খুবই ক্লান্ত লাগছে তার। সোনেরিল খাওয়ার পর শরীরটা একরকম নেশায় ভরে ওঠে। নড়াচড়া ভাল লাগে না। তবু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে বাবার ঘরে এল সে।

খুব মৃদু নীল ঘুম-আলো জ্বলছে ঘরে। প্রকাণ্ড মেহগিনির পালংকের ধারে টেবিল, তাতে ওষুধপত্র রাখা! পালংকের নীচে সাদা বেডপ্যান, জলের বালতি। ঘরে ওষুধের গন্ধ। উঁচু বালিশে মাথা রেখে নয়নের বাবা শুয়ে। শরীরটা স্থির নয়। ডান পা-টা ক্রমাগত নড়ছে, ডান হাতটা কপালের কাছে উঠে যাচ্ছে বারবার।

নয়ন দরজা থেকে তিন-চার পা হেঁটে বাবার বিছানার কাছে দাঁড়াল। শিয়রের কাছে মা বসে আছে। মা জিজ্ঞেস করল, খেয়েছিস?

গলাটা ভাঙা। বোধহয় খুব কেঁদেছে মা, নয়তো ঠান্ডা লাগিয়েছে, মা'র কথার জবাব না দিয়ে নয়ন জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

কী জানি, পরশু রাতে খাওয়ার আগে বাথরুমে গিয়েছিল, হঠাৎ দৌড়ে ফিরে এল, কী যেন সব আবোল তাবোল বলল, শুয়ে পড়ল হঠাৎ। ডাক্তাররা তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না। তবে শিরা থেকে রক্ত নিয়ে গেছে পরীক্ষা করতে।

নয়ন বলল, জ্ঞান নেই?

না তো। কোনও সাড়া দিচ্ছে না।

নয়ন ভীত চোখে চেয়ে বলে, তবে ডান পা-টা নড়ছে কেন?

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কে জানে! ক্রমাগত নড়ছে। দিনরাত কামাই নেই। কী যে হবে। তুই খাসনি?

না।

খেয়ে নে।

নিচ্ছি, রাতে তুমি জাগবে নাকি।

না, নার্স রাখা হয়েছে। এক্ষুনি এসে পড়বে। তুই খেয়ে নে যা। ঘুম থেকে উঠে কোথাও যাস না সকালে, কখন কী হয়।

নয়ন বাবার দিকে একটু চেয়ে রইল। জ্ঞান নেই, সাড়া নেই, তবু দুটো অঙ্গ নড়ছে। ডান পা, ডান হাত, লক্ষণটা একটু চেনে নয়ন।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, পিত্তের বমি হয়েছিল?

মা একটু থমকে গিয়ে বলে, হয়েছিল।

কখন?

একটু আগে। কেন?

নয়ন মা'র দিকে একটু চেয়ে রইল। আবছা আলোয় ভাল দেখা যায় না। শিয়রের কাছে খাটের বাজুতে পিছনে হেলে বসে আছে মা। শরীরটা মোটা, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। তার ওপর মোটা, ভারী সব গয়না, আঁচলে আধকেজি ওজনের এক থোলা চাবি। এসব নিয়েই একটু পরে গড়াগড়ি খেয়ে কাঁদতে হবে। পরনে চওড়া পাড়ের শাড়ি, সিঁথেয় সিঁদুরের দাগে ঘা... নয়ন বাবার দিকে চেয়ে মনে মনে বলে, গুডবাই স্যার, আর দেখা হচ্ছে না তাহলে!

যাচ্ছি।

মা জিজ্ঞেস করে, ওই বমি হলে কী হয়?

কী আবার হবে?

তবে জিজ্ঞেস করলি কেন?

এমনিই।

তুই তো ডাক্তারি একটু শিখেছিলি, বুঝিস না অবস্থাটা?

আমার বোঝাবুঝি দিয়ে কী হবে, বড় ডাক্তার দেখছে যখন!

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার পর বলে, যা খেয়ে নে।

নয়ন নেমে আসে। রাঁধুনি খাওয়ার ঘরে অপেক্ষা করছে। খাওয়ার টেবিলে আরও একজন বসে খাচ্ছে। কালো মতো একটি মেয়ে। খুব সাধারণ চেহারা, রোগা, না তাকালে কিছু এসে যায় না। মেয়েটা তাড়াহুড়ো করে শেষ কয়েকটি গ্রাস খাচ্ছিল।

নয়ন মুখোমুখি বসল। বলল, ব্যস্ত হবেন না, আস্তে খান।

মেয়েটা মুখ তুলে অপ্রতিভ গলায় বলে, আমি গেলে আপনার মা শুতে যাবেন। ওঁরও শরীরটা...

নয়ন একটু হাসে, শুয়ে আর কী হবে? রাত পোয়াবে না।

নার্স মেয়েটা চুপ করে থাকে।

খান।

মেয়েটা খায়।

রাঁধুনি প্লেটে খাবার সাজিয়ে আনে নয়নের জন্য। নয়ন একটু নাড়াচাড়া করে। দু' এক গ্রাস খায়, মেয়েটা উঠে যাওয়ার আগে একবার সন্তর্পণে নয়নের দিকে তাকাল। নয়ন একটু হাসল। বন্ধুত্বের হাসি।

আঁচিয়ে ঘরে এসে আরও দুটো সোনেরিল গেলে নয়ন। সিগারেট ধরায়। বিছানার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ তার সাপটার কথা মনে পড়ে। নিচু হয়ে খাটের তলাটা দেখে সে। নিঝুম হয়ে খাটের নীচের আবছায়ায় পড়ে আছে লক্ষ্মীছেলের মতো। নড়েনি।

নয়ন একটা হাই সামলায়। দস্তানা জোড়া খুঁজে হাতে পরে নেয়। তার পর খাটের তলায় হাত বাড়ায়।

বিরক্ত হয়ে ছিটকে ওঠে সাপটা। কিন্তু নির্বিষ অক্ষম তার আক্রোশ। মুহুর্মুহু কয়েকবার সে নয়নের হাতে মাথা কোটে। চুম্বনের মতো তা নয়নের হাত ছুঁয়ে যায়। নয়ন আর ভয় পায় না। দ্বিধা বোধ করে না। হিংস্রতরতায় দু'টি হাতে সে গলা টিপে সাপটাকে টেনে এনে মেঝেতে ছেড়ে দেয়।

সাপটা তার ফণা তোলে। নয়নের কোমর সমান বা তার চেয়েও উঁচুতে। নয়ন সেই উদ্যত মুখে ঠাস করে একটা চড় মারে। সাপটা ঢলে পড়ে আবার চিতিয়ে ওঠে। আক্রোশে রাগে হিংস্রতায় তাকে পরপর কয়েকটা চড় দেয় নয়ন। বলে, শুয়োরের বাচ্চা, ঢোক ঝাঁপিতে, ঢোক... তোর বাবা ঢুকবে...

বলে মাথাটা চেপে ধরে নয়ন মেঝেতে ঠুকে দেয়। লেজ ধরে তুলে প্রায় আছাড় মারে। কেন যে এই আক্রোশ তা বুঝতে পারে না সে, কিন্তু তীব্র জ্বালাময় আনন্দ বোধ করে। সাপটা কী বোঝে কে জানে! অবশেষে তাকে ঝাঁপিতে পাকিয়ে রাখে নয়ন। তার শ্বাস, জিব, চোখ—কোনও কিছুকেই গ্রাহ্য করে না।

ঝাঁপিটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তার পর খাটের তলায় সেটা ঠেলে দিয়ে বিছানায় বসে। সিগারেটটা আড় করে খাটের রেলিংয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে কাঠ ধরে ফেলেছে। রেলিংয়ের কাঠ জ্বলে গেছে অনেকখানি, ধোঁয়াচ্ছে। সিগারেটটা তুলে নিয়ে খাটের পোড়া জায়গাটায় একবার আঙুল ঘষল নয়ন। আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানতে লাগল। শরীর জুড়ে ক্লান্তি নেমে আসছে অন্ধকারের মতো।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে নয়নের চোখে স্বপ্ন ভেসে বেড়ায়। সে জগদীশকে দেখতে পায়। একটা প্রকাণ্ড বাগানে ফুল তুলছে। বাঁ হাতে একটা সাজি। ফুল তুলে সাজিতে রাখছে জগদীশ। কিন্তু সাজিতে রাখা ফুল সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে সাপ। সাজি থেকে অজস্র সাপের ফণা উঁচু হয়ে আছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা চলে এল। সোনেরিলের ঘুম।

বিকেলে বেরোবার মুখে শ্যামার বাবা ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর শালটা ঘাড়ে নিয়ে, হাতে চমৎকার লাঠিগাছটা একবার নামিয়ে বেরোতে যাচ্ছে সেই সময়ে কাণ্ডটা ঘটল।

বাইরের সিঁড়িতে পা রেখেছে মাত্র, সেই সময়ে দেখা গেল একটা লোক সিঁড়ির মুখেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে হাফশার্ট আপ পরনে খাকি প্যান্ট, পায়ে কেডস্। চোখ-মুখ ফোলা ফোলা, চোখ লাল, মাথাটা জুতোমারা মাথার মতো উলোঝুলো, ধুলোটে। চুর-চুর মাতাল লোকটা শ্যামার কাকা তড়িৎ চৌধুরী। বংশের কুলাঙ্গার। পরিবারে এমন কেউ নেই যে তাকে না সমঝে চলে।

শ্যামার বাবা ভূত দেখার মতো চমকে সিঁড়ি থেকে পা তুলে নিল! মাতাল অবস্থায় না থাকলে তড়িৎ চৌধুরীকে ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু এই অবস্থায় তার ভিতরকার সব জমে থাকা কথা ওগড়ায়। শ্যামার বাবা বুঝল তার ভাই এখন ওগড়াবে। সিঁড়ি থেকে পা তুলে ভিতরে চলে এল, সদরটা বন্ধ করতে করতে টের পেল, তার হাত কাঁপছে, বুকে বেড়ে যাচ্ছে রক্তচাপ, মাথা ঝিমঝিম। দরজা বন্ধ করতে করতেই শুনল মাতাল হারামজাদা চেঁচিয়ে বলছে, ওই যে শালা সরিৎ চৌধুরী দরজা দিচ্ছে, ওই যে শালা বেওয়া বিধবার জমি খাস দখল করেছে যে ব্যাটা...

চেঁচামেচিটা শুনতে পেল শ্যামাও। সোয়েটারটার শেষ কয়েকটা কাঁটা বোনা এখন বাকি। দিন-রাত ক'দিন ধরে বুনছে শ্যামা। ফুলহাতা সোয়েটার, উঁচু গলা, তার ওপর প্যাটার্নটাও গোলমেলে—বড্ড পরিশ্রম গেছে। পিঠ টনটন করে, চোখে ঝাপসা দেখে, মাথা টিপটিপ ব্যথা করে। তবু শেষ হয়ে আসছে বলে হাত থামায়নি শ্যামা। আজ রাতে বাবাকে পরিয়ে দেখবে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিজের বিছানায় বসে সে বুনতে বুনতে হঠাৎ চিৎকারটা শুনতে পেল। হাত কেঁপে একটা ঘর গেল পড়ে। কাকার গলা। মাসে-দু'মাসে এক-একদিন কাকা এরকম মাতাল হয়ে আসে, বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, রাস্তার লোক পাড়ার লোক জড়ো করে গালমন্দ পাড়ে। সেইসব গালমন্দের কোনও মানে হয় না। কাকা লোকটা হাইকোর্টে ফোলিও টাইপ করে। বাঁধা মাইনে নয়। ফোলিওর ওপর কমিশন পায়। তার বউ থাকে বাপের বাড়িতে, কাকার বিধবা শাশুড়ি মেয়েকে নিজের বাড়িতে একখানা বারান্দা সমেত ঘর লিখে দিয়েছেন, পাছে সেটা ভাইরা বেহাত করে সেই ভয়ে। তা ছাড়া কাকার সঙ্গেও বনিবনা নেই. সেই বউ স্কুলে চাকরি করে দুটো ছেলেমেয়েকে খাওয়ায়। কাকা গলা পর্যন্ত মদ গিলে যখন দুঃখ বোধ করে তখন দাদার বাড়ির সামনে বা শ্বশুরবাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচায়; শ্যামার বাবার অপরাধ টালিগঞ্জে যে জমিটায় বাড়ি তুলছে সেটা কাকার শাশুড়ির কাছ থেকে সস্তায় কেনা। খাটাল ছিল, সেটা তুলে দিয়েছে শ্যামার বাবা। কাকার বিশ্বাস জমিটা বাবা না কিনলে শাশুড়ি সেটা কাকার নামে লিখে দিত। একসময়ে কাকার সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে থাকত শ্যামারা, নয়নদের পাড়ায়। সে সময়ে কাকার সঙ্গে নয়নের খুব ভাব ছিল। আজও আছে কি না কে জানে! শ্যামা পরিষ্কার শুনতে পায় কাকা চিৎকার করে বলছে, আমার বউকে কানমন্তর দিয়ে ভেন্ন করেছে কোন শালা ওই সরিৎ চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করুন আপনারা। বুকে হাত দিয়ে বলুক ওই ব্যাটা আমার বউকে বলেছে কি না—বউমা, মাতালটার ঘর কোরো না তুমি! বলেছে কি না...! পাপ করেছে বলেই ওর ছেলে পাগল হয়ে বেরিয়ে গেছে, ওর শান্তি আছে? শালা সাধু-তান্ত্রিকের পেছনে পয়সা ঢালে, মায়ের পেটের ভাই আমি পেটে আলসার হাতে বাত নিয়ে নুলো হয়ে যাচ্ছি, আমাকে একটা পয়সাও ছোঁয়ায় না...

পড়ে-যাওয়া ঘরটা সাবধানে কাঁটায় ফের তুলল শ্যামা। এখন আর বোনাটা এগোবে না। কাঁটা মুড়ে রেখে ওঠে শ্যামা। বাইরের ঘরে বাবা চেয়ারে বসে ঘামছে, পাশে দাঁড়িয়ে মা। পাখাটা পুরো জোরে ঘুরছে। রক্তচাপটা বিপজ্জনক সীমানাতেই ঘোরাফেরা করে বাবার। কখন যে সীমাটা ছাড়িয়ে যায় শ্যামার সেই ভয়!

শ্যামা একটু হেসে বলে, বাবা, অমন করছ কেন? কাল তো আমরা মুরগি খাচ্ছিই।

কাকা যেদিন গালমন্দ করে তার পরদিন সকালে মুরগি হাতে এসে বাবার পায়ে পড়ে। তার পর

কেটেকুটে বাড়ির পাশের গলিটায় স্টোভ জ্বেলে নিজেই রান্না করে। নুন ছাড়া খানিকটা তুলে রাখে বাবার জন্য। মা খায় না, বাকিটা কাকা আর শ্যামা খায়। এটাও নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কাকা গাল দিলে পরদিন মুরগি হবেই।

আর মুরগি! বাবা অসহায়ভাবে মুখখানা তুলে বলে। শ্বাস ছেড়ে বলে, কী পাপে যে ওর শাশুড়ির জমিটা কিনেছিলাম!

মা ঝাঁঝ দিয়ে বলে, কেন কিনে দোষটা কী করেছ শুনি! ঠাকুরপোর শাশুড়ি জমিটা তো বেচতই।

বাবা লালচে মুখখানা তুলে বলে, বেচত তো বেচত! আমি নিমিত্তের ভাগী না হলেই হত। ভেবে দেখ, আমার বাড়ি করার তো কোনও অর্থ নেই। আমরা বুড়ো-বুড়ি চোখ বুজলে ও বাড়িতে থাকবে কে?

মা হঠাৎ চুপ করে বাবার দিকে সোজা একটু চেয়ে থাকে, তার পর জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে চোখ, খ্যাপাটে গলায় বলে, বাড়িতে থাকবে কে! কেন আমার টোকন ফিরবে না ভেবেছ? তোমার ধারণা কি যে আমার টোকন নেই? অ্যাঁ!

বাবা ইতস্তত করে বলে, সে কথা বলিনি। আঃ, তুমি বড্ড কথা ঘোরাও, বলছিলাম কি—

তোমার কথা আমি সব বুঝি।

শ্যামা নিঃশব্দে গিয়ে সদরের ছিটকিনিটা খুলল। মা-বাবা ঝগড়া করছে, তাই লক্ষ করল না।

রাস্তায় বিকেলের ভরভরন্ত আলো। কাকা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, তার চারধারে লোক জমেছে। ওধারের পার্কে খেলা হচ্ছিল, খেলা ভেঙে এসেছে কয়েকটা ছেলে, জুটেছে কিছু ভবঘুরে, কিছু ঝি-চাকর শ্রেণীর লোক। কাকা শ্রোতা পেয়ে ডিঙ মেরে যতদূর সম্ভব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলছে, শালা আমার বউকে যেমন ভেন্ন করেছে তেমনি ওর বউ-মেয়েও ভেন্ন হবে। আমার শাশুড়িকে ভজিয়ে যে জমি দখল করে বাড়ি তুলছে সেখানে ইঁদুর-বাদুড় ঘুরবে, শকুন পড়বে...

কাকা যখন এরকম অবস্থায় এসে চেঁচায় তখন শ্যামাদের বাড়ির কেউই বাইরে বেরোয় না। তাদের ভয় করে। তবু বাবার প্রেসারের কথা ভেবে ক্ষণেকের জন্য শ্যামা ভয় ভুলে গেল। বারান্দার রেলিং থেকে ঝুঁকে ডাকল, কাকা।

কাকা তখন স্বরচিত একটা ছড়ার মতো অনর্গল বকে যাচ্ছে, এই আমি তড়িৎ চৌধুরী ওই শালার মায়ের পেটের ভাই, কিন্তু আমার শালা গো-ভাগাড়ে ঠাঁই। আই হ্যাভ এ পুয়োর বেলি, মনের দুঃখে মদ গিলি। মশাইরা... বলতে বলতে শ্যামার ডাক শুনে তড়িৎ চৌধুরী ব্রেক কষে তাকাল। তাকিয়েই রইল শ্যামার দিকে, মুখখানা একটু হাঁ করে। তার পর বলল, কী বলছিস?

ভিতরে এসো।

না।

না কেন? যা বলার বাবাকে মুখোমুখি বলো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

আলবৎ চেঁচাব। তোর বাবাকে বেরিয়ে আসতে বল।

বলে তড়িৎ চৌধুরী শ্যামার দিকে পিছন ফিরে আবার চেঁচাতে শুরু করে—মশাইরা শুনুন... ওই যে আমার ভাইঝি শ্যামা...ও নয়ন নামে একটা ছেলেকে ভালবাসে...ডিপ লাভ, ভেরি ডিপ লাভ...কিন্তু চামার সরিৎ চৌধুরী তবু বিয়ে দেবে না। কারণ কি জানেন? ছেলেটা তেলি...হা হা...তেলি! তেলি আবার কী মশাইরা, অ্যাঁ! মানুষ মানুষ, তার আবার তেলি বামুন কিছু আছে নাকি আজকাল? মেয়েটা ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে একদিন মরবে, ছেলেটা আত্মহত্যা করবে দেখবেন। ওই যে আমার ভাইঝি, ওই শ্যামা, ওটার বিয়ে হবে না...

রাস্তার লোকেরা শ্যামার দিকে চেয়ে আছে। সচেতন হয়ে শ্যামা সেটা বুঝতে পারে।

লজ্জায়-অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করে তার মুখ। দেওয়ালের আড়ালে সরে আসে শ্যামা। মুখ লুকিয়ে পালিয়ে আসে ঘরে। থরথর করে তার শরীর কাঁপে।

আধঘন্টাটাক চেঁচিয়ে কাকা চলে গেল। নিঃঝুম হয়ে গেল বাড়িটা। রাতে তারা কেউ ভাল করে খেতে পারল না। ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বাবা জিজ্ঞেস করে, তড়িৎ নয়নের কথা কী বলছিল রে?

শ্যামা মাথা নত করে বলে, কী জানি।

বাবা চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, নয়ন ওকে মদ-টদ খাওয়াচ্ছে হয়তো। শ্যামা, খুব সাবধানে থাকিস। আমি শিগগিরই তোর বিয়ে দিয়ে দেব।

মা ঝংকার দেয়, পাত্র কোথায় যে বিয়ে দেবে?

আমি সেই ডাক্তার ছেলেটার কথা ভাবছিলাম। বাবা বলে, ছেলেটা বড় ভাল ছিল।

আশায়-আনন্দে হঠাৎ ভিতরে ভিতরে শিউরে ওঠে শ্যামা।

মা মুখখানা পাথরের মতো করে বলে, সন্নিসি-টন্নিসির সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না।

শ্যামার বুকটা অন্ধকার হয়ে যায়।

বাবা মিনমিন করে বলে, নয়ন যদি তড়িৎকে হাত করে থাকে তবে বড় ভয়ের কথা। তড়িৎ মদ খেলে তো যা-তা বলে, শ্যামার নামেও বলবে এর পর থেকে। তাই ভাবছি—

তাই বলে যার-তার হাতে মেয়ে গছিয়ে দিতে হবে নাকি!

যে-সে তো নয়। বিলেতফেরত বড় ডাক্তার, মতি ফিরলে একদিন লাখ টাকা কামাবে।

কামাক। তবু বলব, ও ছেলে অপয়া। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক ছিল সে মেয়েটা দুম করে মরে গেল, সেটা ভুলো না। তার ওপর ভাবের পাগল লোক, ওদের কি বিশ্বাস আছে?

তবে তুমি কী করতে বলো?

মা একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, কী বলব? আমার কি মাথার ঠিক আছে! এ সময়ে টোকনটা কাছে থাকলে আমি এত ভাবতাম না।

বলে মা চোখে একটু আঁচল চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর বলে, যার-তার হাতেই যদি মেয়ে দেবে তো বরং নয়নের হাতেই দাও না কেন!

কী বলছ এসব?

ঠিকই বলছি। অনেক ভেবে দেখেছি। জাতে ছোট তাতে আর আজকাল তো কিছু আটকায় না। মেয়ে নিজে থেকে ছোট জাতে রেজিস্ট্রি করে এলে কী করতে? ফেলে দিতে? তাই বলছি, নয়ন তো উকিলবাবুর এক ছেলে, বিস্তর টাকা-পয়সা। ছেলেটা শ্যামার জন্যই কেমন বাউন্ডুলে হয়ে গেল, নইলে সেও তো ছাত্র ভালই ছিল, ডাক্তারি সেও পড়ত। বিয়ে না দিলে সে ছেলে হাঙ্গামা করবে না? হয়তো বোম কি ছোরা মারবে, কি আরও কত কাণ্ড করতে পারে। তাই বলছিলাম, মেয়ের বিয়ে দিয়ে চলো আমরা নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ি টোকনকে খুঁজতে।

শ্যামা পাত ছেড়ে উঠে যায়।

মায়ের কাছে টোকনই সব, শ্যামা কেউ না, এই সত্যটা ভাবতে ভাবতে শ্যামা রাতে বিছানায় অন্ধকার মশারির বাইরে মশার শব্দ শুনতে শুনতে খানিকক্ষণ জেগে রইল। খুব দূরের একজন মানুষ শ্যামার স্মৃতিতে ক্রমে আবছা হয়ে আসছে। সেই মানুষটির জন্য এক উন্মুখ পিপাসা আজও আছে। থাকবে কি?

শ্যামা পাশ ফিরে শোয়। ফাঁকা বিছানার একটা ধারে একদিন একজন মানুষ জায়গা নেবে। কে সে? নয়ন? নয়নের কথা ভাবতেই শ্যামার শরীরটা কেমন কুঁকড়ে যায় অনিচ্ছায়। তবু যদি নয়নই হয়? হায় ঈশ্বর! শ্যামার ভিতরে এক প্রকৃতিদত্ত প্রতিরোধ আর অনিচ্ছা নয়নের প্রতি ফণা তুলে আছে। মায়ের কথাটা ভাবে শ্যামা। অভিমানে চোখে জল চলে আসে।

ভোররাতে শ্যামা শুনতে পায়, বাইরে একটা ময়না পাখি ডাকছে। চমৎকার কথা বলে পাখিটা। প্রথমে 'রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ' বলে ডাকল, তার পর বলল, 'ওঠো, ওঠো, চোর এসেছে', আধঘুমের মধ্যে আলস্যভরে শুনছিল শ্যামা। চমৎকার ডাক শিখেছে পাখিটা। তার পরই ভয়ংকর চমকে ওঠে সে। শুনতে পায়। পাখিটা তার জানালার কাছ ঘেঁষে ডাকছে—'শ্যামা, শ্যা—মা তোমার চিঠি, তোমার চিঠি...' তার পর পাখিটা চুপ করে যায়।

নয়নপাখি!

শ্যামা উঠল না, কিন্তু সম্পূর্ণ জেগে শুয়ে রইল।

সকালবেলায় শ্যামা নয়নের চিঠিটা পেল শিয়রের জানালা খুলে। জানালার বাইরের খাঁজে সাদা খামের চিঠিটা পড়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামা চিঠিটা হাতে নিল। নয়ন যতক্ষণ বেঁচে আছে, মুক্তি নেই।

চিঠিতে লেখা—চৌরাস্তায় একবার এসো। না এলে সারাদিন বসে থাকব। মনে রেখো। সারাদিন।

শ্যামা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল।

সময় নিল শ্যামা। অনেকক্ষণ। ভাবল খানিক। তার পর বেলা বাড়লে তাঁতের সাদা খোলের একটা শাড়ি পরে, চুলটা আঁচড়ে চটি পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

চৌরাস্তায় গাছতলার পশ্চিমার চায়ের দোকানটার পাশে নয়ন দাঁড়িয়ে। হাতে চায়ের ভাঁড়। শ্যামাকে দেখে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে হাসল দূর থেকেই।

ওর ঝাকড়-মাকড় চুলে একটু সবুজ পাতা খসে পড়েছে। আটকে আছে পাতাটা। অদ্ভুত দেখাচ্ছে নয়নকে। তীব্র, তীক্ষ্ণ, জ্বালাধরা চেহারা। সুন্দর নয়, কিন্তু ওর দিকে দু'বার তাকাতে হয়। চলন্ত রাস্তা ওর পিছনে, মানুষজন ব্যস্তভাবে যাচ্ছে, একটা ট্যাক্সি উড়ে গেল, বাস দাঁড়াল। সেই চলন্ত দৃশ্যকে পিছনে রেখে নয়ন দাঁড়িয়ে। চুলে সবুজ একটা পাতা। গা-টা শির শির করে শ্যামার। ভয়? হবেও বা।

কী চাও নয়ন?

নয়ন মাটিতে রাখা একটা ঝোলা বাঁ হাতে তুলে নিল। বলল, ওদিকে একটা কবরখানা আছে না?

মসজিদ।

মসজিদই হবে। সেখানে মাঠটা নির্জন। চলো।

কেন?

কথা আছে।

কথা শেষ হয়ে গেছে নয়ন।

নয়ন অকপট হাসি হাসে। বলে, দূর, কথা কি শেষ হয়? শোনো শ্যামা, আমার খুব একটা সময় নেই। বাবা বোধহয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে। বাবা গেলে অনেক ঝামেলা। আমাকে দেরি করিয়ো না। বলে নিই। চলো।

শ্যামা মুখ ফিরিয়ে নেয়। নয়ন হাঁটতে থাকে।

শ্যামা তার পিছনে।

মাঠটা আজও ফাঁকা। রোদ পড়ে আছে।

তোমার বাবার কী হয়েছে নয়ন?

সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিস। আশা নেই।

তা হলে তুমি এখানে কেন? এখন তো তোমার বাড়িতে থাকাই উচিত।

উচিত! ঠিকই তো। কিন্তু তোমার জন্য একটা জিনিস বয়ে এনেছি অতদূর থেকে, না দেখিয়ে

যাই কী করে? তা ছাড়া লাভ কী? বাবার জ্ঞান নেই। জ্ঞান থাকলেও আমাকে তার কিছু বলার ছিল না, বা আমার কিছু শোনার ছিল না। আমরা একবাড়িতে থাকতাম, এইমাত্র।

তবু তুমি যাও। তোমার মায়েরও তো একজন সহায় চাই এ সময়ে।

তুমি আমাকে যা হোক বলে তাড়াতে চাইছ শ্যামা। আমি তো বলছি, কাজ হলে যাব। আমার বাবার জন্য দুঃখ পেয়ো না শ্যামা, আমি পাই না। যারা মরবার জন্য সবসময়ে প্রস্তুত থাকে তারা কাউকে মরতে দেখলেও স্থির থাকে। স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যায়।

শ্যামা শ্বাস ফেলে বলে, এ তো যে কেউ নয়। তোমার বাবা।

নয়ন একটু বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি বড় সেকেলে শ্যামা। বাবা বাবা বাবা! বাবা তো কী? বাবা তো একটা লোকের সঙ্গে সম্পর্ক-চিহ্নিতকরণের অভিধা মাত্র। বেশি কিছু নয়। তাই কেউ বাবা তুলে গাল দিলে আমার কোনও রি-অ্যাকশন হয় না।

নয়ন নিচু হয়ে চাদরের গিঁট খুলল। ঝাঁপিটা বের করে ঘাসের উপর রাখল সযত্নে। শ্যামার দিকে চেয়ে হাসল।

শ্যামা ঝাঁপিটা দেখে। অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। নয়ন পকেট থেকে চামড়ার দস্তানা বের করে দু' হাতে পরে নিল।

ওটাতে কী আছে নয়ন?

নয়ন খুব খুশির হাসি হাসল, সাপ। একটা গোখরো সাপ শ্যামা।

বলেই চকিতে ঝাঁপির ঢাকনাটা তুলে নিল।

কপিশ একটা শরীর পাকে-পাকে জড়িয়ে আছে। গায়ের ঝকঝকে আঁশে রোদ চলকে ওঠে।

শ্যামা দু' পা পিছিয়ে আসে, নয়ন! বলে আর্তস্বরে ডাকে।

ভয় নেই শ্যামা।

শ্যামা এক অদ্ভুত চোখে নয়নের দিকে তাকায়। পরমুহূর্তে সাপটার দিকে।

তুমি পাগল।

সাপটা একটু অনড় রইল। তার পর আস্তে তার পিচ্ছিল শরীর পাক ছাড়তে থাকে। ঝাঁপির কাণার ওপর দিয়ে মুখ বের করে। তার পর হড়হড় করে নেমে আসতে থাকে ঘাসে, মাটিতে। আসছে তো আসছেই, শরীরের যেন তার শেষ নেই।

শ্যামা একটা চাপা চিৎকার করে প্রথমটায় মুখ ঢাকল, তার পর হঠাৎ ঘুরে দৌড়তে লাগল। কিন্তু পারল না। অভ্যেস নেই তার ওপর শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছে পায়ে।

নয়ন দৌড়ে এসে তার বাঁ হাত চেপে ধরে বলে, দোহাই, ভয় পেয়ো না। আমি তো আছি। দেখো।

বলে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নয়ন দৌড়ে ফিরে গেল। সাপটা ততক্ষণে সর সর করে দেয়ালের ইটের খাঁজের দিকে অনেকটা চলে গেছে। নয়ন দৌড়ে গিয়ে দস্তানা-পরা আনাড়ি হাতে সাপটার ঘাড় চেপে তুলে আনল। লকলকে সাপটা মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে ছোবল দিতে চেষ্টা করে। একটুর জন্য পারল না। নয়ন ঝাঁকি দিয়ে সেটাকে নির্জীব করে দিয়েছে।

শ্যামার দিকে চেয়ে নয়ন হাসে, বিষদাঁত নেই।

শ্যামা বিশাল চোখে চেয়ে থাকে।

আর সেই চোখ দু'খানা মুগ্ধ হয়ে দেখে নয়ন। ঠিক এরকমটাই সে চেয়ে এসেছে এতকাল। এরকম বিস্ময়-মাখানো মুগ্ধ চোখে শ্যামা তাকে চেয়ে দেখবে।

ঝাঁপির ভিতরে মুখটা ঢোকাতেই সাপটা আপনা থেকেই অভ্যস্ত পাকে জড়িয়ে নিঃঝুম হয়ে যায়। ঝাঁপিটার ঢাকনা বন্ধ করে দিল নয়ন।

কাল সারা রাত ধরে ওটাকে নিয়ে প্র্যাকটিশ করেছি। শিখে যাব শ্যামা।

শ্যামা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারে না। তার পর জিজ্ঞেস করে, কী শিখে যাবে?

ধরা। কিছু না। জগদীশ খুব চাল নিল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা একদম সোজা।

জগদীশ কে?

একজন। সাপ ধরে। ওস্তাদ লোক, কিন্তু শেখাতে চায় না।

তুমি সাপ ধরতে শিখছ? কেন?

তোমার জন্য।

শ্যামা বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলে, আমার জন্য?

তোমার জন্যই। তোমাকে চমকে দেব বলে। দিইনি!

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলল, দিয়েছ। অনেকদিন আমি এমন চমকাইনি।

শিশুর মতো খুশিতে হাসে নয়ন। ওর রগ-ওঠা, চোখ-বসা মুখখানা স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তার মাথার চুলে এখনও সবুজ পাতাটা লেগে আছে। সে আস্তে করে বলে, শ্যামা, আমি সব পারি। সব।

নয়ন, তুমি বাড়ি যাও।

কেন?

তোমার বাবার কাছে যাও।

নয়ন একটু চমকে বলে, ওঃ ভুলেই গিয়েছিলাম। যাচ্ছি শ্যামা।

বলে তাড়াতাড়ি চাদরটা দিয়ে ঝাঁপি বাঁধে নয়ন। বাঁধতে বাঁধতেই মুখটা তুলে বলে, শ্যামা, তুমি ঠিক যেমন চাও আমি ঠিক তেমনটি হব। দেখে নিয়ো। আমাকে সময় দাও শুধু।

শ্যামার একটু মায়া হয়। আবার ভয়ও। সেই পুরনো কথা নয়ন আজও বলে যাচ্ছে!

সাপটাকে কোথাও ছেড়ে দিয়ো নয়ন।

নয়ন একটু হাসে, কেন শ্যামা? আমার জন্য ভয় পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

ওটার বিষদাঁত নেই।

গজাবে।

নয়ন একটু ভ্রূ কুঁচকে ভাবে, তার পর বলে, তখন দেখা যাবে।

শ্যামা আস্তে করে বলে, নয়ন, এ রকম পাগলামি করছ কেন? আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য এতটা করার কোনও মানে হয় না।

নয়ন হি হি করে হাসে, এবার যদি আমাকে বিয়ে না করো শ্যামা, তবে একদিন তোমার ঘরে এটা চুপ করে ছেড়ে দিয়ে আসব।

তা হয় না নয়ন।

কী হয় না?

তোমার সঙ্গে বিয়ে।

কেন?

আমি তোমাকে ভালবাসি না।

সে কথা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু তোমাকে বাসতেই হবে।

কাঙালপনা করতে তোমার ঘেন্না হয় না?

তার পর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্যামা মনস্থির করে বলে, নয়ন, আমি আর একজনকে ভালবাসি।

নয়ন চমকে যায়। চেয়ে থাকে। শ্যামা অস্বস্তি বোধ করে চোখ সরিয়ে নেয়।

নয়ন অবাক গলায় বলে, শ্যামা, এ রকম কথা আগে কখনও বলোনি। তোমার অনেক ফ্যান, বহু ছেলে ঘুরেছে তোমার পিছনে, কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে।

নয়ন, আমি সত্যি বলছি।

লোকটা কে?

তুমি চিনবে না, সে দূরের লোক।

তবু শুনি। কী করে সে?

ডাক্তার।

ডাক্তার? নয়ন শুকনো জিব ঠোঁট দিয়ে চাটে। তার পর আকুল গলায় বলে, কয়েকটা বছর সময় আমাকে দাও শ্যামা, আমি ডাক্তারি পাস করব। দিনরাত পড়ব।

আমি ডাক্তারটাকে ভালবাসি না। মানুষটাকে।

সে কেমন মানুষ বলো। আমি হুবহু তার মতো হব।

শ্যামা ম্লান একটু হাসে। বলে, বাড়ি যাও নয়ন। বাবার কাছে যাও।

সাপের ঝাঁপিটা হাতে নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, দৃশ্যটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় শ্যামা। তার পর ঝাঁপিটার ভিতরে মৃদু একটা শ্বাসের শব্দ হয়।

উকিলবাবুর জ্ঞান আর ফেরেনি।

সাপের ঝুড়ি ঝোলায় নিয়ে যখন ফিরল নয়ন তখন বেলা এগারোটা। বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফুল এবং মালা হাতে কয়েকজনকে দেখা গেল। বাড়িটা খুব নিস্তব্ধ। কেবল ওপরতলায় মা শ্বাসকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে একরকম কান্নার শব্দ বের করছে মাঝে-মাঝে।

নয়ন শান্তভাবে তার ঘরে চলে গেল। সাপের ঝুড়িটা সাবধানে রাখল খাটের নীচে, একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে রইল একটুক্ষণ। কিছুক্ষণ সে তার বাবার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। পারল না। হাল ছেড়ে সে শ্যামার মুখটা ভাববার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, তাও পরিষ্কার মনে পড়ল না। শ্যামার বদলে নার্স মেয়েটির মুখখানা ভেসে উঠল চোখে। একটু হাসে নয়ন। ঘুমহীন চোখজোড়া জ্বালা করে। সিগারেটের ধোঁয়া উড়ে আসে চোখে। চোখ বোজে। তার পর ক্লান্তিহর ঘুমের কথা ভাবে কাঙাল নয়ন! সে কবে একটু ঘুমোবে সোনেরিল না খেয়ে?

চাকর-বাকররা উঁকি দিচ্ছে। ডাকতে সাহস পায় না কেউ। নয়ন আধবোজা চোখে দরজার পর্দায় কয়েকটা ছায়ার আনাগোনা দেখল। তার পর উঠল ধীরে-সুস্থে। একবার ওপরে যাওয়া দরকার। শ্মশানে যেতে হবে। এ সময়টায় সে কলকাতায় না থাকলেই ভাল হত।

ঠাকুরটা ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে। খবরটা নয়নকে দেওয়ার জন্য চোখ-মুখ উদগ্রীব। সব মানুষেরই এই একটা দুর্বলতা থাকে, খবরটা ভাল হোক বা মন্দ হোক, সবার আগে সে খবরটা পৌঁছে দিয়ে সে এক ধরনের তৃপ্তি বোধ করে। যেন একটা কম্পিটিশনে জিতে গেছে। ঠাকুরদার মুখে-চোখেও সেইরকম উত্তেজিত ভাব। নয়ন বেরোতেই সে কাছে এসে বলে, বাবু, বড়বাবু নেই—

নয়ন একটু বিস্ময়ের ভান করে বলে, নেই? কোথায় বেরিয়েছে? এত বেলায়?

চাকরটা খাওয়ার টেবিলে ন্যাতা বোলাচ্ছিল। আসলে ন্যাতা বোলানোটা কাজ নয়, নিজেকে মোতায়েন রেখেছে ওইখানে, নয়ন বেরোলে খবরটা দেবে, কিন্তু নয়নের কথা শুনে চালাক চাকরটা ফিক করে একটু হেসে সামলে গেল, বলল, বেরোননি। মারা গেলেন একটু আগে।

নয়ন গম্ভীর চোখে চাকরটাকে একটু দেখল। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল চাকরটা।

নয়ন ঠাকুরকে ডেকে বলে দিল, আমার ঘরে এর মধ্যে কেউ যেন ঝাঁট-ফাঁট দিতে না যায়, দেখিস। ঘরে আমি একটা গোখরো সাপ পুষছি। কেউ যদি ঢোকে টের পাই তবে জুতিয়ে কিন্তু বাড়ি থেকে বের করে দেব।

ঠাকুরটা সভয়ে ঘাড় নাড়ে।

নয়ন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে। অনেক লোক জমেছে ওপরতলায়। বার লাইব্রেরি থেকে তার বাবার বন্ধুরা এসেছে, মক্কেল এসেছে, আর আত্মীয়স্বজন। ফুল আর ধূপকাঠির গন্ধে টেঁকা যায় না। নয়নকে দেখে মা আর একবার শ্বাসকষ্ট চেপে কাঁদবার চেষ্টা করে। কিন্তু তেমন কোনও শব্দ হয় না। দু'-একজন বুড়ো বয়স্ক আত্মীয় নয়নকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে অনিচ্ছার সঙ্গে। তারা নয়নকে চেনে। দু'-একটা কথা বলে তারা চুপ করে যায়, বৃথা জেনে।

কিন্তু নয়নের মুখে একটা বিষাদের ভাব ফুটেছিল ঠিকই, সে তার ক্লান্তির জন্য। ঘুমহীন জ্বালাধরা চোখের কোলে কালি, ভাঙা মুখে শিরা-উপশিরা, পিঙ্গল এলোমেলো ধুলোটে চুল। নার্স মেয়েটা খাটে শোয়ানো দেহটার মাথা এবং বুক জুড়ে বার লাইব্রেরি থেকে পাঠানো একটা প্রকাণ্ড ফুলের মালা সাজিয়ে রেখে নয়নের কাছে এগিয়ে এল। বলল, আপনি খুব ভেঙে পড়েছেন।

নয়ন একটু হাসতে গিয়ে হাসল না। বলল, মাথাটা বড্ড ধরেছে। আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ওইরকম কিছু আছে?

না। আমি ওসব রাখি না।

তবে কী আছে?

মেয়েটা একটু ইতস্তত করে বলে, কী চাই বলুন, কাউক ডেকে আনিয়ে দিই।

নয়ন একঘর লোকের চোখের সামনেই মেয়েটির দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে বলল, অ্যাসপিরিন না থাকে, ক্লোরোফিল বা ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন, কিছু নেই? নাথিং?

মেয়েটা বোবার মতো ঘাড় নাড়ে।

নয়ন দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলে বলে, শ্মশান পর্যন্ত হেঁটে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে!

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন নির্ভাবনায় বলে, কেন কষ্ট হবে জানেন? শ্মশানে যাওয়ার সময়ে কেউ আজ কথা বলবে না। একটা ট্র্যাজিক ব্যাপার তো। কিন্তু অতদূর রাস্তা চুপ করে মুখ বুজে যাওয়া ভারী কষ্টের। আমি এখন অনেক কথা বলতে চাই।

মেয়েটার চোখে-মুখে ক্রমশ একটা ভয়ের ভাব ফুটে ওঠে। নয়ন তা লক্ষ করে। আস্তে করে বলে, আপনি যাবেন না শ্মশানে?

আমি! আমি কেন যাব?

গেলে দোষ কী? আমি বরং একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করি। ডেডবডি নিয়ে শ্মশানবন্ধুরা যাবে। আমরা ঘুরপথে অন্য রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাব। শ্মশানে যাচ্ছি বলে মনেও হবে না, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। চলুন না।

না।

মেয়েটা মাথা নাড়ল। তার পর খাটের কাছে ফিরে গেল আবার।

ফ্ল্যাশলাইট লাগানো ক্যামেরা হাতে দু'জন লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে বিরক্ত হয়ে নয়ন বারান্দায় বেরিয়ে এল। মরেই গেছে লোকটা, তবু তার ছবি কেন যে তুলে রাখে মানুষ! মরা মানুষের ছবিতে মানুষটা চিরকাল মৃতই থেকে যাবে।

বারান্দায় বাতাস আর রোদ খেলা করছে। রেলিংয়ে দুটো চড়াই। 'কিচিক কিচিক' শব্দ করে লাফিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আসছে। খেলছে। অন্যমনেই নয়ন আপনা থেকেই শব্দটা গলায় তুলে আনল। ডাকতে লাগল '--কিচিক্—চি-র্-র্-র্—কিচিক্—'

শ্মশান থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল। নয়ন স্নান করেনি। আদিগঙ্গার এক হাঁটু কাদায় নেমে এক কোষ ময়লা জল তুলে মাথায় চাপিয়েছিল। ফেরার সময়ে ইচ্ছে করেই দলছুট হয়ে একা একটা

রেস্টুরেন্টে ঢুকে এক কাপ চা আর গোটা কয় সিঙ্গাড়া খেল। তাতেই বুক জুড়ে অম্বল উঠল ঠেলে। শরীরটায় একটা জ্বালাভাব। সারাটা দিনের রোদ, চিতার আঁচ, ধোঁয়া—সব মিলিয়ে চড়চড় করছে গায়ের চামড়া।

বাড়িতে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে ঠান্ডা জলে স্নান করে নয়ন। কোরা কাপড় পরে খাওয়ার ঘরে এসে দেখে নার্স মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। হাতে ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ, চুল আঁচড়ানো, পায়ে চটি।

চলে যাচ্ছেন? নয়ন জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটি সামান্য একটু হাসে, বলে, যাচ্ছি। তবে আপনার মায়েরও নার্সিং দরকার, তাই কাল সকালে আবার আসব।

নয়ন হাই তুলে বলে, রাতে নার্সিংয়ের দরকার হয় না বুঝি?

হবে না কেন? রাতের শিফটের নার্স এসে গেছে।

বলে মেয়েটি হাসল, তার পর নয়নকে ভীষণ চমকে দিয়ে বলল, এই নার্সটি কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে।

নয়ন একটু বোকা বনে গিয়েছিল। এতটা আশা করেনি। একটু থমকে গিয়ে বলে, আচ্ছা।

মেয়েটা চলে যায়।

ঘরে এসে নয়ন কয়েকটা ঘুমের বড়ি গিলে পড়ে থাকে।

তার বাবা কত টাকা রেখে গেছে তার হিসেব নয়ন রাখে না। তবে, অনেক টাকা, অনেক। নয়নের বাকি জীবনটা কিছু না করলেও এসে যাবে না। তার বাবা ছিলেন উকিল মানুষ। আয়কর ফাঁকি দিতে ওস্তাদ লোক। ব্যাঙ্কের লকার, মায়ের গয়না, লুকনো টাকা—সবকিছুর হিসেব নয়ন বোধহয় কোনওদিনই বের করতে পারবে না। কলকাতায় আরও একটা বাড়ি আছে তাদের, হাজারখানেক টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। বাবা মাঝে মাঝে শাসিয়ে বলত বটে, সব সম্পত্তি উইল করে ভারত সেবাশ্রম সংঘকে দিয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবিক সেটা করার মতো যথেষ্ট মানসিক জোর তার ছিল না। নয়ন জানে, তার বাবা তাকেই সব দিয়ে গেছে। তার এক দাদা আছে। দীর্ঘকাল আগে সেই দাদা আপন পিসতুতো বোনকে বিয়ে করেছিল ভালবেসে, বাবা তাই তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। সেই দাদা বাইরে ভাল চাকরি করে। তাকেও শেষ পর্যন্ত বাবা কিছু দিয়ে গেছে কি না কে জানে। সেই দাদা হয়তো কিছু দাবি-দাওয়া করতে পারে। করুক। নয়নের তাতে কিছু যায় আসে না, সে যে নিজে বেশ কিছু টাকা-পয়সা হাতে পাবে, এই খবরটাই যথেষ্ট।

ভাবতে ভাবতে সোনেরিলের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায় নয়ন। তার পর স্বপ্ন দেখে। মোনা ঠাকুরের কালীমূর্তি জ্যান্ত হয়ে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছে। জগদীশকেও দেখা যায়, মাফলারের বদলে গলায় একগাদা সাপ জড়িয়ে খুব কাশছে। এমনি পাগলাটে খ্যাপাটে সব স্বপ্ন।

সোনেরিলের ঘুম নয়নের বেশিক্ষণ থাকে না। ওষুধটা তাকে আজকাল আর তেমন ধরছে না। রোজ খায় বলেই বোধহয়। মাঝরাতে নয়নের ঘুম ভাঙল। ঘরের বাতিটা জ্বলছে, পায়ের দিককার জানালা খোলা। ভীষণ ঠান্ডা আসছে। বিছানার চাদর তুলে নয়ন মুড়ি দিয়ে বসে সিগারেট খেল। রাতটাই অসহ্য, কিছু করার থাকে না।

জানালাটা বন্ধ করে নয়ন সাপের ঝুড়িটা বের করে। দু' হাতে চামড়ার দস্তানা পরে ঢাকনাটা খোলে। সাপটা ঘুমোচ্ছে। দেখে নয়ন ভারী হিংসে বোধ করে। সাপটাকে খোঁচাতে আঙুল উচিয়েছিল নয়ন। তার পর আবার সাবধানে ঢাকনাটা চাপা দিয়ে ঝুড়িটা খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তার পর একঘেয়ে এই জেগে থাকা থেকে মুক্তি পেতে সোনেরিলের কৌটোটা টেবিলের ওপর খুঁজতে লাগল। আর হঠাৎ তখনই মনে পড়ল, নার্স মেয়েটি বলে গিয়েছিল, রাতের শিফটের নার্স দেখতে সুন্দর। মনে পড়তেই নয়ন আপনমনে একটু হাসে।

সিঁড়ি বিয়ে বেড়ালের মতোই নিঃশব্দে উঠে আসে নয়ন। মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ। সে মৃদু

টোকা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে মিহি মেয়ে গলায় প্রশ্ন আসে, কে?

দরজাটা খুলুন।

পায়ের শব্দ ভিতরে দরজার কাছে আসে। নয়ন উত্তেজনা বোধ করে।

আপনি কে? প্রশ্ন আসে।

আমি নয়ন।

নয়ন কে, আমি চিনি না।

এ বাড়ির ছেলে। আমার মাকে দেখতে এসেছি।

ও!

পরমুহূর্তেই ছিটকিনির শব্দ। দরজা খুলে যায়।

সুন্দর! না, মোটেই না। ভারী হতাশ হয় নয়ন। বড্ড রোগা মেয়েটি। গায়ের রং ফ্যাকাশে। দেখলেই বোঝা যায়, মেয়েলি রোগে ভোগে। ম্যাল-নিউট্রিশন। ক্যালোরি খায় না। প্রোটিন নেই। ভিটামিন সি-এর অভাব। তবু মেয়ে।

মেয়েটি দরজা ছেড়ে দিয়ে বলে, উনি ঘুমোচ্ছেন।

কে?

নয়ন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

আপনার মা। আপনি তো মাকে দেখতেই এসেছেন।

ওঃ, হ্যাঁ। থাক, ঘুমোচ্ছে যখন ঘুমোক।

চিন্তা নেই। উনি সামলে উঠেছেন।

নয়ন হাসল। বলল, আসলে আমার বাবা আর মা'র মধ্যে রিলেশনটা তেমন ভাল ছিল না। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারত না।

মেয়েটা কথা বলল না। অপ্রস্তুতভাবে চুপ করে রইল।

নয়ন জিজ্ঞেস করে—আপনি কী করছেন?

তেমন কিছু না। অ্যালার্ট থাকছি, যদি কিছু দরকার হয়।

বোরিং লাগছে না?

আমার অভ্যাস আছে।

তা তো আছেই। তবু বড় একঘেয়ে। আমারও ভীষণ ইনসোম্‌নিয়া। একা জেগে থাকতে যে কী কষ্ট!

মেয়েটা চুপ করে থাকে।

নয়ন বলে, চা খাবেন?

চা?

চা। আমি নিজে করব, তারপর দু'জনে গল্প করতে করতে খাব। আসুন না নীচের খাওয়ার ঘরে।

মেয়েটা ইতস্তত করে।

নয়ন মৃদুস্বরে বলে, মা নিশ্চয়ই ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোচ্ছে?

না। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।

তবে জাগবে না। নিশ্চিন্তে আসুন।

নয়ন পিছু ফিরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চটপট সিঁড়ি ভেঙে নীচে আসে। চায়ের সরঞ্জাম সাজানোই থাকে খাওয়ার ঘরে নয়নের জন্য। ঘুমহীন রাতে সে উঠে কখনও কখনও চা খায়। দু কাপ জল চাপিয়ে নয়ন খাওয়ার টেবিলে এসে বসতে না বসতেই মেয়েটি এল। মায়ের ঘরের অল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যায়নি। এখন দেখল নয়ন, মেয়েটির মুখশ্রী খুব খারাপ নয়। দাঁতগুলো একটু উঁচু, নাক ভোঁতা, তবে চোখ দু'খানা ভালই। সিঁথিটায় সিঁদুর থাকতে পারে, নয়ন সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

মেয়েটি অবাক চোখে নয়নকে দেখছে। হয়তো ভয়ও পাচ্ছে। যে লোকটার বাবা আজ সকালে মারা গেছে তার এমন সহজ ভাব দেখেই হয়তো বিস্ময়।

নয়ন চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে মেয়েটির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হাসে, বলে, বাবার সঙ্গে আমার রিলেশনও ভাল ছিল না। উই ওয়্যার মিউচুয়াল এনিমিজ।

মেয়েটা চুপ করে থাকে। কী বলবে ভেবে ঠিক করতে পারে না।

নয়ন বলে, কিন্তু তবু বাবার কয়েক লাখ টাকা আমিই পাব।

মেয়েটা ভ্রূ তুলে সামান্য কৌতূহলের গলায় বলে, কয় লাখ?

নয়ন ঠোঁট ওল্টায়, কে জানে! বিশ-ত্রিশ লাখ হতে পারে! দশ-বারো লাখও হতে পারে। বাবার অঢেল ব্ল্যাক মানি ছিল।

টাকাটা পেয়ে কী করবেন?

নয়ন চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসতেই মেয়েটি জিজ্ঞেস করল।

কী করব! কী আবার, ওড়াব।

ওড়াবেন মানে? ওড়াবেন কেন?

অত টাকা নিয়ে আর কী করা যায়। চাকরি করব না, ব্যবসা করব না, কিছু করার দরকার হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার বেকার সমস্যা নেই। আমার সমস্যা সময় নিয়ে। আয়ুর লম্বা সময় জেগে থেকে কাটিয়ে দিতে হলে টাকা ওড়ানো ছাড়া কী করা যাবে!

মেয়েটা ঠিক বুঝল না, একটু সময় নিয়ে বলল, জেগে থেকে কেন বলছেন?

আমার ইনসোম্‌নিয়া। বড্ড কষ্ট। ঘুম হয় না। সেই নির্ঘুম সময়টায় আমি চলে যাব রাতের ক্লাবে—যেখানে সারারাত নাচ গান হয়। একটা গাড়ি কিনে সারা রাত ধরে চালাব রাস্তায়-রাস্তায়। মাইনে করা লোক রাখব যারা সারারাত আমার সঙ্গে জেগে থেকে তাস দাবা খেলবে, গল্প করবে। একটা প্রোজেক্টার মেশিন কিনে সারারাত ফিলম ঘুরিয়ে ছবি দেখব। সোনেরিলে আজকাল আর ঘুম তেমন হয় না। সব ওষুধেরই ইম্‌মিউনিটি আছে। ভয় হয়, এর পর আর ঘুমের ওষুধে কাজই হবে না। সারাটা জীবন জেগে থাকতে হবে।

মেয়েটা ডান গালে একটা আঙুল ছুঁইয়ে বসে তাকিয়ে আছে। খুব অবাক দৃষ্টি। একটুও ঠাট্টার ভাব নেই মুখে। সিরিয়াস ধরনের মেয়ে। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে বলল, অনেক সময় সেরেও যায়।

কীরকম?

নয়ন কৃত্রিম আগ্রহ দেখায়।

একটা মেয়েকে চিনতাম যে ঘুমোত না বলে তার স্বামী তাকে সেতার কিনে দেয়। সারা রাত ধরে মেয়েটা আলাদা একটা ঘরে বসে সেতার বাজিয়ে সময় কাটাত। প্রথমে টুংটাং করতে করতে আস্তে আস্তে সে সুর বুঝতে শেখে। সেতারের প্রাণটাও সে একদিন ধরতে পারে। সারা রাত ধরে সে সেতারে ডুবে থাকতে শিখল। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে সে সেতারের শব্দ পার হয়ে সুরের নিস্তব্ধ জগতে পৌঁছে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সে সেতার থামিয়ে চুপ করে ঝুম হয়ে বসে থাকত। সে আমাকে বলেছিল, ওই ভাবে বসে থেকে সে এক নিস্তব্ধতার সুর শুনতে পেত। শুনতে শুনতে সে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

নয়ন হাসল, এ তো গল্প।

গল্প নয়। তবে গল্পের মতোই। মেয়েটা সেরে গেছে।

সত্যি?

সত্যি।

টেবিলের ওপরের মসৃণ খয়েরি সানমাইকায় ধীর গতিতে নয়নের হাতটা এগিয়ে যায়। নয়ন লোল হেসে বলে, আমি যাকে বিয়ে করব তার সঙ্গে আমার একটা শর্ত হবে।

কী শর্ত?

সারা রাত তাকে জেগে থাকতে হবে। দিনের বেলায় সে যত খুশি ঘুমিয়ে নিক, কিন্তু রাতে, রোজ রাতে আমাদের বাসর জাগা। কেউ বোধ হয় রাজি হবে না। না?

হতে পারে।

কে হবে। আমি জানি, মেয়েরা রাত বারোটার বেশি জাগতে ভালবাসে না। তারা বড় ঘুমকাতুরে।

বলতে বলতে নয়ন হাত বাড়ায়। মেয়েটা একটা হাতে মাথার ভর রেখে হেলে বসেছে। নয়ন ভঙ্গিটা দেখল। চওড়া টেবিল প্রায় অতিক্রম করেছে তার হাত। সে হাতখানা তোলে ফণার মতো।

আপনি পারবেন না?

কী?

মেয়েটা চমকে উঠে বলে।

ঝপ করে ছোবল দেয় নয়নের হাত। উত্তপ্ত ব্যাকুল হাতে মুঠো করে ধরে একরাশ বকুলের নরম করতাল। পিষে ফেলে নির্যাস নিংড়ে নিতে নিতে বিকৃত ভয়াল গলায় বলে, আমার সঙ্গে জেগে থাকতে। রোজ। পারবেন না?

লক্ষপতির সঙ্গে জেগে থাকতে কোন মেয়ে রাজি নয়? এ মেয়েটিও হয়তো রাজি হত। কিন্তু নয়নেরই দোষ। সে যা চায় তার জন্য সময় দেয় না। মেয়েটা 'ছাড়ুন ছাড়ুন' বলে চাপা গলায় চিৎকার করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। হাঁফায়। চেয়ার-টেবিলের ঘোর শব্দ ওঠে নিশুত রাতে। চাকর-বাকর জেগে যাবে। তাই নয়ন আর চেষ্টা করে না। মেয়েটা দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায়।

নয়ন ঘরে গিয়ে সাপের ঝুড়িটা টেনে আনে। ঝাঁপি খুলে দস্তানা-পরা হাত এগিয়ে টেনে তোলে সাপটাকে। মুখোমুখি ভয়ঙ্কর দু'জন দু'জনের দিকে তাকায়। তার পর শুরু হল আক্রমণ। এবং প্রতি-আক্রমণ। রাত ভোর হয়ে আসে।

দিনের বেলায় আবার চমৎকার বোধ করে নয়ন। ঘুমের জন্য তার একটুও দুঃখ হয় না। শরীরটা হালকা লাগে। চায়ের সঙ্গে গোটা দুই অ্যাসপিরিন গিলবার পনেরো মিনিট পর আধকপালে মাথা ধরাটাও ছেড়ে গেল।

খবরের কাগজ অনেকদিন দেখা হয়নি। আজ খাওয়ার টেবিলের ওপর কাগজটা পড়ে আছে দেখে তুলে নিল। বরাবর সে খেলার পাতাটা আগে দেখে। খুলে দেখল, দলীপ ট্রফির একটা আঞ্চলিক খেলা চলছে ইডেনে। আজ দ্বিতীয় দিন।

কিছু না ভেবেই নয়ন পোশাক পালটাল। জলপাই রঙের প্যান্ট, লাল জামা, গলায় রঙিন সিল্কের মাফলার, চওড়া বেল্ট, চোখে রোদচশমা। বেরিয়ে সে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনল। দোকানের আয়নায় নিজের ধারাল চেহারাটা দেখল একটু। দেখতে দেখতে শিস দিল। দু'হাতে চুলগুলো চেপে ঠিক করে নিচ্ছিল, সে সময়ে লক্ষ্য করল দোকানদার মহাদেব তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই মহাদেব বলল, বাবু, কা'ল তো বড়বাবু মারা গেলেন।

হ্যাঁ মহাদেব। আফসোসের ব্যাপার।

নয়ন গলায় যথেষ্ট দুঃখ ফোটাতে চেষ্টা করে!

তো ইটা আপনার কী পোশাক হল? ই সময়ে কেউ প্যান্ট-শার্ট পরে? নোতুন কাপড় পরে তো!

ঝাঁৎ করে ভুলটা ধরতে পারে নয়ন। কখন যে বে-খেয়ালে কোরা কাপড়টা ছেড়ে অভ্যাসবশত রোজকার মতো প্যান্ট-শার্ট পরেছে তা বুঝতেই পারেনি। ভুল হয়ে গেছে বড়। পাড়ার চেনা লোকেরা অবশ্যই দেখেছে নয়নকে এই পোশাকে! নয়ন জিভ কাটল।

ভুলটা শোধরাতে নয়ন তাড়াতাড়ি পাড়ার রাস্তাটা হেঁটে পার হয়ে আসে। অচেনা মানুষজনের মধ্যে এসে স্বস্তি বোধ করে। ট্যাক্সি ধরে বড় রাস্তায়। শোকের পোশাকটা ভুল করে ছেড়ে ফেলেছে

ঠিকই। তবু ট্যাক্সিতে বসে ভুলটার জন্য আবার ভালই বোধ করতে থাকে সে। একজনের মৃত্যুর ঘটনা আর একজনের পোশাকে বিজ্ঞাপনের মতো ঝুলিয়ে রাখার মানে হয় না। নয়নের মুখে তো লেখা নেই যে গতকাল তার বাবা মারা গেছে! স্বাভাবিক পোশাকে সে বরং বেশ সহজ বোধ করতে থাকে।

মাঠে সে সাইট স্ক্রিনের পাশে গ্যালারিতে উঠে বসে। বেশ ভিড়। ভিড়ে কেউ কারও চেনা নয়। নয়ন অলস ভঙ্গিতে বসে খেলা দেখে।

ইস্ট জোন-এর সাত নম্বর খেলোয়াড় সেঞ্চুরি করবে বলে কেউ ভাবেনি। কিন্তু সারাটা সকাল ঠুকে ঠুকে খেলে ছেলেটা নব্বুইয়ে যখন পৌঁছে গেল তখন প্রথম খেলাটায় কিছু উত্তেজনা বোধ করে নয়ন। একটু ঝুঁকে বসে। ছেলেটা একটা ওভার মেডেন দিল। তার পর পর পর দুটো চার মেরে এবং একটা রান নিয়ে পৌঁছল নিরানব্বইয়ে। সারা মাঠে উত্তেজনা, চিৎকার। শক্ত পাল্লার সাউথ জোনের সঙ্গে এমন হাড্ডাহাড্ডি ব্যাটিং কেউ আশা করেনি। নয়ন উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে চেঁচিয়ে বলল, রান—ওঃ একটা রান—

বসে পড়ুন—পেছন থেকে কে চেঁচাল। তার পর জামা ধরে টানল নয়নের। নয়ন শুধু গায়ে পড়া আরশোলা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে পিছনে হাত নিয়ে অচেনা হাতটা ঝেড়ে ফেলল।

লাঞ্চের আগে শেষ ওভার। পাঁচটা বল পাঁচটা বোমার মতো। সাত নম্বর ব্যাটসম্যান মাঠের চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গেছে। স্কোরবোর্ডটা দেখে নিয়ে পর পর পাঁচটা বল ঠেকিয়ে দিল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। খেলছে না। পারছে না।

ওঃ, একটা রান!

নয়ন চেঁচায়। তার দেখাদেখি আশেপাশের হাজার হাজার জন গ্যালারিতে উঠে দাঁড়াতে থাকে। 'বসে পড়ুন' চিৎকার করতে করতে বসা লোকেরা দাঁড়িয়ে ওঠে। মাঠের মাঝখানে একটা রানের জন্য প্রার্থনারত ছেলেটা ছয় নম্বর বলটা খেলতে পারল না। বোল্ড।

খানকির বাচ্চা! শালা!

পাগলের মতো চেঁচাল নয়ন মাথার চুল চেপে ধরে। তার পর আবার চেঁচাল, ইয়ে করগে বাঞ্চোৎ—

বাচ্চা একটা ছেলেকে নিয়ে এক বাবা সামনের বেঞ্চে বসে। ভদ্রলোক নয়নের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকায়। নয়ন সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চোখে তার নিজের চোখ ফেরত দেয়। লোকটা আস্তে আস্তে মাথা ঘুরিয়ে তার টিফিনের বাক্স খোলে।

লাঞ্চ!

নয়ন গ্যালারি থেকে অনেকটা নিচুতে চ্যানেলে লাফ দিয়ে নামে। আধকপালে মাথাধরাটা আবার শুরু হয়েছে। সারাক্ষণ মুখে রোদ, মাথায় উত্তেজনা, নাকে ধুলো। মাথা ধরতেই পারে।

গ্যালারির নীচে ছায়া। বাঁশের বেড়া দেওয়া খাবারের দোকানে ভিড়। এক কাপ চায়ের জন্য নয়ন একটু ঘোরাঘুরি করল। কিন্তু শান্তভাবে, ঠেলাঠেলি না করে কোথাও চা পাওয়ার উপায় নেই। খিদে-তেষ্টায় পাগল হয়ে মানুষেরা হামলে পড়ছে।

কিন্তু নয়নের একটু চা বড় দরকার।

বাঁশের চৌখুপি ঘেরা দোকানটার কাছে গেল নয়ন। গায়ে গায়ে লোক দাঁড়িয়ে। হাজারটা হাত দোকানির দিকে বাড়ানো। 'এই আমারটা—আমার এক কাপ চা, দুটো কাটলেট' এই সব চিৎকারে একটা দাঙ্গার মতো ভাব। মানুষেরা ক্ষেপে আছে। তপ্ত, শুষ্ক মানুষ। এক্ষুনি ফাটবে। বাইরের দোকানের চেয়ে দ্বিগুণ দামের খাবার। আর চা—পয়সা বাড়িয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। তিনটে পশ্চিমা দোকানদার নাজেহাল হচ্ছে। দিশেহারার মতো সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

নয়ন শান্তভাবে কনুই দিয়ে একটা মাড়োয়ারিকে সরিয়ে বাঁশের বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। উঁচু কিন্তু ঠান্ডা গলায় বলল, এক ভাঁড় চা—

কথাটা কোথাও পৌঁছল না, যে লোকটা প্রকাণ্ড কেটলি থেকে চা ঢালছে সে নয়নের কাছ থেকে দু' বিঘৎ দূরে মাত্র। নয়ন আবার আগের মতোই চেঁচিয়ে বলল, চা—

লোকটা শুনল না। পিছন থেকে মাড়োয়ারিটা নয়নকে সরানোর চেষ্টা করছে শরীরটা ঠেলে সামনে এগিয়ে দিয়ে। নয়নের গলার স্বর ডুবে যাচ্ছে চারদিকের চিৎকারে।

নয়ন তৃতীয়বার বলল, চা—আ—আ—

তার বাড়ানো হাত শূন্যে রইল। মাথা ধরাটা ফিরে আসছে। বাড়ছে। মাথার ভিতরে চমকে উঠেছে রগ।

অনেক দিন আগে শিয়ালদায় বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ছাত্র ধরা পড়েছিল। সেই থেকে একটা ছাত্র-হাঙ্গামার সূত্রপাত। নয়ন তখন হিন্দু স্কুলে শেষ ক্লাসে পড়ে। হাঙ্গামা শুনে বেরিয়ে এসেছিল। শিয়ালদার কাছে ছাত্ররা রাস্তা আটকে ট্রামে বাসে আগুন দিচ্ছে তখন। পুলিশ ছিল না। নয়ন তখন একদল ছাত্রের সঙ্গে ভিড়ে গেল। এগারোটা ট্রাম সরাসরি দাঁড়িয়ে। তার শেষ দুটোতে আগুন দিয়েছিল নয়ন। একাই লাফিয়ে উঠেছিল ট্রামে, যাত্রীদের শাসিয়ে নেমে যেতে বলেছিল। একভিড় লোক মেড়ার মতো সুড় সুড় করে নেমে গেল। আর নয়ন ব্লেড দিয়ে সিটের খোসা ছাড়িয়ে ছোবড়া বের করে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তার পর বেনেটোলা লেনের মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—শিয়ালদার আকাশ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে যাচ্ছে এগারোটা ট্রামগাড়ি।

সেই দৃশ্যটা হঠাৎ দেখতে পেল নয়ন।

আর একবার একটা ফিলমের রিলিজের দিন ভারতীতে হাউসফুল। লবিতে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে টিকিট না পেয়ে। যদি কেউ বাড়তি টিকিট বিক্রি করে এই আশায়। সেই সময় একটি চশমাপরা ভালমানুষ মেয়ে টিকিট ফেরত দিতে এলে একরাশ লোক মেয়েটাকে ছেঁকে ধরে। প্রায় ত্রিশজনের ভিড়ের মধ্যে মেয়েটি দুটো টিকিট মুঠোয় ধরে কান চেপে দাঁড়িয়ে অসহায় চোখে চেয়ে ছিল। কাকে টিকিট দেবে ঠিক করা তখন তার পক্ষে অসম্ভব। বহু লোক পাঁচ-দশটাকার নোট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চিৎকার করছিল—'আমি দশ দেব,' 'আমি পাঁচ,' 'আমি আগে ওকে ধরেছি'। নয়ন দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে এগিয়ে যায়। দু'-চারজনকে হিঁচড়ে সরিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে আড়াল করে দাঁড়ায়। তার পর একপলক চিন্তা না করে বিনা দ্বিধায় মেয়েটির কনুই চেপে ধরে একটু জোরের সঙ্গে ভিড়টা কেটে বেরিয়ে আসে। বিশ-ত্রিশজন বোকার মতো চেয়ে দেখে। নয়ন লবির এক কোণে মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে যথার্থ দামে টিকিট দুটো নিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিল। কেউ একটিও কথা বলেনি। বরং দু'-একজন শ্রদ্ধা-প্রশংসার চোখে তার দিকে চেয়ে দেখেছিল।

নয়ন আর চেঁচাল না। চেঁচিয়ে লাভ নেই। চা-ওলা লোকটা এই ভিড়ে নয়নকে আলাদা করে চিনবে না। চেনাতে হলে কিছু করতে হবে। ভিড় ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে নয়ন জানে।

বাঁশের বেড়াটা কেউ ডিঙোয়নি ভদ্রতাবশতঃ। নয়ন এক পলকও দ্বিধা না করে বেড়াটা ডিঙিয়ে গেল। চোখের নিমেষে চা-ওলার হাত থেকে কেটলিটা কেড়ে নিল। ঝুড়ি থেকে একটা ভাঁড় তুলে চা ঢালতে লাগল।

বাইরে লোকেরা একটু সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। তার পর বুঝল, অরাজকতার ইঙ্গিত, লুটের গন্ধ। পরমুহূর্তেই হাজারটা মানুষ পার হয়ে আসতে লাগল বাঁশের বেড়া। মড় মড় করে বাঁশের বেড়া ভেঙে পড়ার শব্দ। দৌড় পায়ের আওয়াজ, লাফিয়ে পড়ার শব্দ। ইতর একপাল ছেলে কাটলেটের থালাটা কয়েকটা থাবায় উড়িয়ে নিল, চপের ঝুড়ি থেকে কে একমুঠো ছুঁড়ে দিল শূন্যে। কেকের বয়ামটার দিকে বাড়ানো হাতগুলো খাবলা মেরে দলা পাকানো কেক তুলে নিচ্ছে মুঠো ভরে। কে

একজন চেঁচিয়ে বলছে, 'শালা হারামিরা তিনগুণ দাম নেয়। লোট্ শালাদের। মেরে তক্তা করে দে।' তিনটে পশ্চিমা বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল। তার পর লুট আর লুট।

নয়ন ভিড় ছেড়ে কষ্টে বাইরে এল। এক ভাঁড় চায়ের অর্ধেক তখনও তার হাতে ধরা। একটু দূর থেকে সে লুটের দৃশ্যটা দেখল দাঁড়িয়ে। তারপর ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে গ্যালারির ছায়া পার হয়ে মাঠের বাইরে বেরিয়ে এল। খেলা দেখতে আর ইচ্ছে করছিল না তার।

কাকা মুরগি নিয়ে এল ঠিকই, তবে পরদিন নয়। এল দিন পনেরো পর। হাতে প্রকাণ্ড পা-বাঁধা লাল মুরগি, অন্তত এক কেজি মাংস হবে, অন্যহাতে মিষ্টির বড় বাক্স। সঙ্গে ঝাঁকামুটের মাথায় প্রকাণ্ড ঝুড়িতে আনাজপাতি। মহার্ঘ নতুন ফুলকপি, বড় বেগুন থেকে শুরু করে ঘিয়ের কৌটো পর্যন্ত। কাকার পরনে ফিনফিনে ধুতি, পাঞ্জাবি। একেবারে বরকর্তা। মুখে অপরাধী হাসি।

বাইরের ঘরে শ্যামার বাবা বসেছিল। রবিবারের সকাল দশটা। শ্যামার বাবার হাতে খবরের কাগজ, পাশে চা। ছোটভাইকে ঢুকতে দেখে একটু তাকাল। জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে একবার বলল, এত সব! কী ব্যাপার?

আর কোনও কথা হল না। কোনওদিনই কথাবার্তা তেমন হয় না। হলেও কাকার মাতলামির প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় বাবা। আজও ব্যাপার দেখে আবার খবরের কাগজে চোখ নামিয়ে নিল।

জিনিসপত্র রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে কাকা মাকে বলল, বউদি, একটা কথা আছে।

কী কথা?

বলছি। বলে কাকা এসে শ্যামার ঘরে উঁকি মারে।

মুখ বাড়িয়ে বলে, উনুনটা ধরা তো শ্যামা।

ঘর গোছাচ্ছিল শ্যামা, মুখ ফিরিয়ে কাকাকে দেখে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, কেন?

তুই ধরা তো। কেন, সে খাওয়ার সময়ে বুঝবি।

শ্যামা মুখখানা ভার রেখেই বলল, এত সব কিনে এনেছ কেন? এমনিতে তো বলো তোমার পয়সা নেই।

কাকা একটু বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে বলে, নেই তো নেই, তা বলে মাঝে-মধ্যে একটু খাওয়া-দাওয়া করব না! গরিবেরা তো খেয়েই মরে।

শ্যামা একটু খর গলায় বলে, পয়সা পাও কোথায়?

কাকা একটু থমকে যায়। সকলেই জানে, শ্যামা নরম মেয়ে। তার গলায় ঝাঁঝ খুব কম শোনা যায়।

কাকা থমকে থামে একটু, তার পর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে, যেখান থেকেই পাই তাতে তোর কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

কোথা থেকে পয়সা পাও সেটা আগে বলো, নইলে ওসব ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমরা খাব না।

তুই না খাস খাওয়ার লোক আছে, চেঁচাস না।

আমি চেঁচাব। ওসব এ বাড়িতে কেউ খাবে না, তোমার লজ্জা করে না নিজের দাদা-ভাইঝি সবাইকে জড়িয়ে চেঁচিয়ে পাড়ার লোকের কাছে যা তা বলে যাও! নিজেকে কী ভাবো তুমি? তোমাকে বাবা-মা ভয় পেতে পারে, আমি পাই না। তুমি ওসব নিয়ে চলে যাও।

কী বললি!

বলে কাকা তড়পাতে চেষ্টা করে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তড়িৎ চৌধুরীর মুখটা তেমন খোলে না। কথা হারিয়ে যায়। মদ খেলে হুড় হুড় করে কথা আসে। তবু কাকা তোতলাতে তোতলাতে বলে, তোর বাড়ি যে বের করে দিবি? আমার দাদার বাড়ি—

রান্নাঘর থেকে মা উঠে এসে দু'জনের মাঝখানে পড়ে। তড়িৎ চৌধুরীর পিঠে হাত রেখে বলে,

এসো ঠাকুরপো, আমি তোলা উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি। শ্যামা, তোর না আজ কমলাদের বাসায় যাওয়ার কথা! যা, ঘুরে আয়।

যখন সময় হবে যাব। তুমি কাকাকে চলে যেতে বলো।

ছিঃ, কী সব বলছিস!

তড়িৎ চৌধুরী স্তিমিত গলায় বলে, শুনছেন বউদি শ্যামার কথা। সেই ছোট্ট নরম-সরম শ্যামা আর নেই। আজকাল ভোট-টোট দেয়, বয়স্থা হয়েছে—

বলে একটু ম্লান হাসবার চেষ্টা করে কাকা।

হয়েছিই তো। বেঁচে থাকলে সকলেরই বয়স হয়। একমাত্র তোমারই বয়সবুদ্ধি হয় না। কোন আক্কেলে তুমি রাস্তার লোকের কাছে নয়নের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কথা বললে? আমি তোমার ভাইঝি না? ও বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে, কে বলেছে তোমাকে যে নয়নের সঙ্গে আমার ভাব?

চুপ কর শ্যামা!

মা ধমক দেয়।

কিন্তু শ্যামার চুপ করার মতো অবস্থা নয়। তার নাকের পাটা ফুলে উঠেছে, চোখ বিস্ফারিত, ঠোঁট কাঁপছে। জ্বলজ্বলে চোখে সে মা'র দিকে চেয়ে বলে, তুমি জানো না, এ সবই নয়নের কারসাজি। এত জিনিসপত্র এ সবই নয়ন পাঠিয়েছে। জিজ্ঞেস করো।

নয়ন! ভারী অবাক হয় কাকা, নয়নের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? কী যা-তা বলছিস!

ঠিকই বলছি। তুমি চলে যাও।

মা কাকার পিঠে হাত রেখে ঠেলে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলে, ও পাগল মেয়ে! তুমি চলো তো ঠাকুরপো, কী কথা বলবে বলছিলে যে!

একা ঘরে শ্যামা দাঁড়িয়ে থাকে। নিঝুম।

গোলমাল শুনে বাবা উঠে এসেছিল। আবার ফিরে গিয়ে একটা প্রেসারের ট্যাবলেট খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। বাড়িটা আবার চুপচাপ হয়ে যায়। যেন কিছুই হয়নি, সব ঠিক আছে।

শ্যামার জানালার পাশেই বাড়িতে মেথর আসবার গলি। সেইখানে বসে কাকা মুরগি কাটল। ধুতি পাঞ্জাবি ছেড়ে গামছা পরে নিয়েছে। মুরগিটার 'কঁ-কঁ' ডাক, তার পরই ডানা ঝাপটানোর শব্দ পায় শ্যামা।

গলিমুখো রান্নাঘরের জানালা দিয়ে মা কাকার সঙ্গে কথা বলছে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকতে তো দেরি আছে?

মা জিজ্ঞেস করে।

দেরি কী! আজকাল একমাস অশৌচ আর কে মানছে? গতকালই শ্রাদ্ধ চুকে গেল। পনেরো দিনে।

মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তা উকিলবাবু রেখে-টেখে গেল কেমন?

পাঁচ-সাত লাখ তো শুনছি সাদা টাকাই। পাঁচটা ইন্সিওরেন্স থেকে আরও লাখ দুই পাওয়া যাবে। ব্যাঙ্কের লকার-টকার তো এখনও খোলাই হয়নি, বাড়িতে স্টিলের আলমারিতেও না হোক আরও দু'-আড়াই লাখ পড়ে আছে। দুঁদে উকিল ছিল, দু'হাতে লুটেছে। দু'খানা বাড়ি—

এর পর মা'র গলার স্বরটা হঠাৎ নেমে যায়।

চোখে জ্বালা। বুকে একটা ভয় বেড়ালের থাবার মতো আলতো বসে আছে। শ্যামা সামান্য সেজে বেরিয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে অন্যমনস্কভাবে বসে থাকা বাবাকে কেবল বলে গেল, বাবা, কমলাদির বাড়ি যাচ্ছি। এবেলা ফিরব না।

হুঁ।

বাইরে আজ শীতের বাতাস দিচ্ছে। তার সঙ্গে নরম রোদ। পার্কটা হেঁটে পার হতে ভারী ভাল

লাগছিল শ্যামার। বড় রাস্তায় এসে ফাঁকা ট্রামে উঠে বসল।

কমলাদি দরজা খুলেই বলে, কত দেরি করলি। সকালে আসার কথা ছিল। তোর শঙ্করদা তোর জন্যে বসে থেকে থেকে এইমাত্র আড্ডা দিতে বেরোল। আয়।

রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনে চাপানো প্রেসার কুকার। মাংসের গন্ধে ভুর-ভুর করছে চারদিক। ঘরের মধ্যে একটু ঘুরে ঘুরে দেখে শ্যামা। খাট পালং, আলমারি, টেলিফোন সব সুন্দর সাজানো। বেশ আছে ওরা। বাড়িটা ঠান্ডা, শান্ত, ভালবাসার চিহ্নগুলি চারদিকে ছড়ানো।

শ্যামা, মাংসটা চেখে যা! কমলাদি ডাকে।

যাই।

রান্নাঘরের দরজায় মোড়া পেতে বসে শ্যামা। টুকটাক নানা কথা হতে থাকে।

ঝাল বড্ড কম দিয়েছ। পানসে!

কী করি বল! ওর যে গ্যাসট্রিক। অনেকটা আদাবাটা দিয়েছি।

তোমাদের বড্ড সাহেবি রান্না।

ওর তো এরকমই পছন্দ, সেদ্ধ, নির্ঝাল। আমি মাঝে মাঝে আলাদা ঝাল গড়গড়ে করে রেঁধে নিই। কিন্তু রোজ তো ইচ্ছে করে না, তাই আমারও কেমন এইসব বিস্বাদ রান্নাই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করলে পার্সোনালিটি থাকে না, জানিস। কর বিয়ে, বুঝবি।

শ্যামা ঠোঁট ওলটায়, বয়ে গেছে বিয়ে করতে। চাকরি খুঁজছি।

খোঁজ। চাকরি করলে আরও ভাল বিয়ে হবে। আজকাল সবাই চাকরে মেয়ে চায়।

ইস, বিয়ে করলে চাকরি করতে বয়ে গেছে।

ও কথা বলিস না। আজকাল একজনের রোজগারে সংসার চলে নাকি। চললেও শখ-শৌখিনতা কিছু করা যায় না। আমারই মাঝে মাঝে চাকরি করতে ইচ্ছে করে।

আমার ভাল লাগে না। বিয়ে করলে হাত-পা ছড়িয়ে সংসার করব—সেই ভাল। বউকে সুখে রাখতে পারে না যে মানুষ, তাকে বিয়েই করব না!

কমলাদি কপির ডাঁটার চচ্চড়ি বসিয়ে বলে, ভাগ্যিস তোর তবে সেই ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়নি। শুনেছি লোকের দানে তার দিন চলে। কী অবস্থা হত তোর!

শ্যামার বুকের ভিতর কোথায় যেন যন্ত্রপাতি নড়াচড়া শুরু করে। শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। ভারী ঝামেলা। কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না সে। উঠে গিয়ে বেসিনে হাত-মুখ ধোয়।

শঙ্করদা দুপুর পার করে ফিরল। হাসি-ঠাট্টায় খাওয়ার পাট চুকতে গড়িয়ে গেল বেলা। তিনজনে ফিস খেলল খানিকক্ষণ। তার পব গড়াল। খাটে কমলাদি আর শ্যামা, ইজিচেয়ারে শঙ্করদা।

শ্যামা চোখ বুজে শুয়ে ছিল। সেই অবস্থাতেই বলে, শঙ্করদা।

উঁ।

আমার একটা চাকরি দরকার।

কেন?

খুব দরকার।

সিগারেটের প্যাকেটের ওপর একটা সিগারেট লম্বালম্বি ঠুকতে ঠুকতে শঙ্করদা বলে, বিয়ের পর চাকরি কোরো, ডেগমাস্টারি।

বিয়ে করব না।

কে বলল করবে না।

আমিই বলছি।

কিন্তু তোমার জন্য একটা পাত্র যে প্রায় ঠিক করে ফেলেছি, আজকালের মধ্যেই কথাটা পাড়তে তোমাদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা।

শ্যামা একটু হাসে, চোখ দুটো দুই আঙুলে চেপে রেখে বলে, এক পাত্রপক্ষের প্রস্তাব নিয়ে সকালেই কাকা এসেছে।

পাত্র কী করে?

শ্যামা শ্বাস ছেড়ে বলে, কিছু করে না। বাপ বড়লোক ছিল, মরেছে, ফলে ছেলে এখন বড়লোক হয়েছে। বয়েসে ছোট, জাতও এক নয়।

সে কী! শঙ্করদা চমকে বলে, এ কেমন বিয়ের প্রস্তাব তোমার কাকা আনলেন?

কমলাদি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর পিঠের তলা থেকে নিজের আঁচলটা ছাড়িয়ে এনে শ্যামা পাশ ফিরে বলে, আপনার পাত্রটি কেমন শুনি।

শঙ্করদা শ্যামার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, বলে, এ পাত্র ভালই। আমাদের বন্ধুর মতো, তবে আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ইঞ্জিনিয়ার। মুশকিল হচ্ছে কিছু দাবি-দাওয়া করবে। হাজার তিনেক নগদ।

শ্যামা চোখ বুজে নিঝুম পড়ে থাকে একটুক্ষণ। তার পর বলে, তার চেয়ে চাকরিটাই ভাল লাগবে আমার। বিয়েটা থাক।

শঙ্করদা অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, মাথা হেলিয়ে শ্যামার দিকে চেয়ে। তার পর বলে, শ্যামা।

উঁ।

একটা সত্যিকথা বলবে?

কী?

তুমি কাউকে ভালবাসো?

দুর।

বাসো, কিন্তু কোনও কারণে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে না। হয়তো সে তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে। সত্যি কি না বলো।

না।

তবে ফ্যাক্টটা কী?

কিছু না।

সেই সন্ন্যাসী ডাক্তারকেই তোমার পছন্দ নয় তো শ্যামা? ভেবে দেখো।

আবার সেই যন্ত্রপাতির নড়াচড়া। তার শরীরের ভিতরে একটা লিভার ওঠে-নামে, হুইল ঘোরে, ধক ধক করে স্টার্ট নেয় ইঞ্জিন। শ্যামা তার কেঁপে ওঠা হাত আঁচলে ঢাকে, বালিশে মুখ লুকোয়।

কী হল?

কিছু না।

শঙ্করদা নীরবে সিগারেট খায়। অনেকক্ষণ বাদে বলে, আমি এর মধ্যে আরও ভাল করে খোঁজ নিয়েছি শ্যামা। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তুমি সেই সন্ন্যাসীর ঘর করতে পারবে না সত্যিই।

শ্যামা চুপ করে থাকে।

শঙ্করদা বলে, তার বাঁধা মাইনের চাকরি নয়। লোকের দেওয়া জিনিসে তার সংসার চলবে, তার ধারণা লোকের সেবা করে মানুষের অযাচিত দান পাওয়াই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ব্রাহ্মণোচিত। সে তোমাকে সুখে রাখার চেষ্টাও করবে না। প্রতিদিন তোমার রাত ভোর হবে হাঁড়ির চিন্তায়, ভিক্ষায় চলবে পেট। স্বামীর সঙ্গও পাবে না তুমি। সে লোকটা উদয়াস্ত যাজন করে বেড়ায়, ছ'মাস ন'মাস বাইরে বাইরে ঘোরে। বউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখবে একটু—এমন স্বভাব নয়। তার জীবনে উন্নতি নেই, প্রমোশন নেই, ইন্সিওরেন্স, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, ব্ল্যাক মানি—কিচ্ছু নেই। তার কাছ থেকে কোনও উপহারও কোনওদিন পাবে কিনা সন্দেহ। ফুল্লরার বারোমাসের গীত হবে তোমার শ্লোগান। পারবে শ্যামা?

শ্যামার চোখভরে জল আসে। কিছু বলে না।

শঙ্করদা মাথা নেড়ে বলে, পারবে না। ওরকম জীবন স্বেচ্ছায় বেছে নেবে কে? যার গতি হয় না সে হয়তো নেবে, কিন্তু তুমি নেবে কেন? আজকালকার মেয়ে তুমি, তোমার এতটা সেন্টিমেন্ট থাকার কথা নয়। থাকলে বুঝব তুমি বোকা।

হৃৎপিণ্ড একটা পাম্প মেসিনের মতো ঝলকে ঝলকে জল তুলে আনছে চোখে। বুকটা ব্যথা করে। আস্তে আস্তে কান্নায় শরীরটা কেঁপে ওঠে। পারবে না শ্যামা। জানে, পারবে না। ওই জীবন তার নয়। তবু সেই দূরবর্তী মানুষটার ছবি কেন ছুঁয়ে থাকে তাকে।

শঙ্করদা মৃদু গলায় বলে, আমি অনেক ভেবেছি। মানুষটাকে আমারও বড় ভাল লাগে শ্যামা। লোকটা আমাকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে আমি একসময়ে ওর ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিতেও রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু কমলা দিল না। বলল, যদি ওর মতোই তোমারও অবস্থা হয়। সেটা অবশ্য হত না। ওদের আশ্রমের অনেক লোকই ভাল কাজকর্ম করে, বড় চাকরি করে, সংসারও করে। দীক্ষা নিতে ভয় পেলাম। তুমি কেঁদো না, সব শুনে যদি রাজি থাকো, তবে বলো ওর সঙ্গেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।

শ্যামা সময় নিয়ে সামলে উঠে বসল। তার পর মাথা নেড়ে বলে, না শঙ্করদা। ওই জীবন আমি পারব না।

আমিও তাই বলি। তা হলে ইঞ্জিনিয়ারের এ সম্বন্ধটা করব কি শ্যামা? তুমি মত দিলে সামনের রবিবার তোমাকে ওরা দেখতে যাবে।

শ্যামা নিজের কোলে মুখ নামিয়ে বসে রইল।

বিকেলের দিকে কমলাদিকে ঠেলে তোলে শঙ্করদা, এই, চা করবে না?

আমি করছি।

বলে শ্যামা উঠে গেল রান্নাঘরে। চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল যখন তখনই টেলিফোনের রিং শুনতে পেল। সারাদিন আজ টেলিফোনটা বাজে নি। শব্দটা তাই নতুন লাগল শ্যামার কাছে। হঠাৎ দমকলের আওয়াজের মতো। নিশুতরাতে বুক কেঁপে ওঠে।

শঙ্করদা চেঁচিয়ে বলল, শ্যামা, তোমার ফোন।

একটু চমকায় শ্যামা। নয়ন নয় তো?

নয়নই। টেলিফোন তুলেই শ্যামা মিষ্টি একটা পাখির ডাক শোনে। তার পরই নয়ন বলে, শ্যামা!

বলছি।

কী করছ?

কিছু না।

একটা জিনিস শোনো।

কী?

শোনো না। কান পেতে থাকো।

শ্যামা কান পাতল। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারল না, তার পর একটা শ্বাস ছাড়ার মতো বাতাসের শব্দ হয়।

শুনেছ?

কিসের শব্দ?

সেই সাপটা।

শ্যামা হিম হয়ে যায়।

শ্যামা!

বলো।
সাপটার দাঁত উঠেছে। আজ সকালে দেখলাম, ছোট্ট হুলের মতো দেখা যাচ্ছে।
শ্যামা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, সেটা আমাকে বলে কী হবে?
ইনফর্মেশনটা দিয়ে রাখলাম।
আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি—
ছেড়ো না। তা হলে আবার ফোন করব। তোমার দিদি-জামাইবাবুর কাছে তোমার তা হলে প্রেস্টিজ থাকবে না।
কী বলতে চাও বলো।
আমার বাঁ হাতে টেলিফোন, ডান হাতে সাপের গলা ধরে আছি। ওটা বিড়ে পাকিয়ে আমার কোলে পড়ে আছে। খুব রেগে আছে ইদানীং। দিনরাত আমি ঘুম থেকে টেনে তুলি। খেলা করি। কাজেই সুযোগ পাওয়ামাত্র ও আমাকে কামড়াবে। এক্ষুনি কামড়াতে পারে। পাকা ম্যাচিওরড গোখরো। বিষের থলি ভরভরন্ত—বুঝলে?
শ্যামার হাত কাঁপতে থাকে। বলে, বুঝেছি।
নয়ন বলল, তোমার কাকা একটা খবর দিয়ে গেল এই মাত্র।
কী খবর?
তোমার মা-বাবা রাজি। কাকা রাজি করিয়েছে। তাকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম।
শ্যামা আস্তে করে বলে, তাতে কী হল?
কিছুই না শ্যামা, তুমি রাজি না হলে কিছুই না। আমি জানি। তবে তোমার বাবার মত পাওয়া গেছে—সেটাও কম কথা নয়। তুমি ভয় পেয়েছিলে।
আমি রাজি নই।
তোমাকে রাজি করানোর জন্যই এই টেলিফোন। শ্যামা, তুমি রাজি না হলে আমি আমার ডান হাতের মুঠোটা আলগা করে দেব। সাপটা তৈরি আছে। এখন ভেবেচিন্তে বলো। আমি ইয়ার্কি করছি না।
নয়ন!
আত্মবিস্মৃতের মতো নামটা উচ্চারণ করে শ্যামা। এতক্ষণ নামটা উচ্চারণ করেনি পাছে কমলাদি আর শঙ্করদা জেনে ফেলে।
নয়ন ধীর গলায় বলে, বলো শ্যামা, শুনছি।
তুমি কি পাগল?
হতেও পারি। আমি যে কী তা ভেবে পাই না। তবে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি এত তাড়াহুড়ো করতাম না শ্যামা, অপেক্ষা করতাম। কিন্তু তুমি সেদিন একজন ডাক্তারের কথা বলেছিলে, সেই থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি এক্ষুনি জানতে চাই। বলো।
তা হয় না।
তবে ছেড়ে দিই?
আঃ নয়ন।
ওপাশে একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। তার পর রিসিভার পড়ে যাওয়ার শব্দ।
শ্যামা খুব সাবধানে টেলিফোনটা রাখল। তার পর টেবিলটায় ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।
কী হয়েছে রে? বিছানা ছেড়ে কমলাদি উঠে আসে।
ওকে বোধ হয় সাপে কামড়াল। উদভ্রান্তের মতো বলে শ্যামা।
কাকে?
নয়নকে।

সে কী! কী বলছিস যা-তা?

কী জানি!

শ্যামা মাথা ঠিক রাখতে না পেরে চারদিকে টালুমালু চেয়ে বলে, ইয়ার্কিও হতে পারে!

তুই এদিকে আয় তো, বিছানায় বোস। ওগো, তুমি পাখাটা আস্তে করে ছেড়ে দাও তো।

ইয়ার্কিই। সাপের শব্দটা টেলিফোনে হুবহু নকল করেছিল নয়ন। শ্যামাকে টেলিফোন করার সময়ে সাপটা তার কাছে ছিলই না।

গতরাতে নয়ন দশটা সোনেরিল খেয়েছিল গুনে গুনে। ঘুম আসে নি। ইমমিউনিটি এসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পৃথিবীর সব ঘুমের ওষুধের প্রতিক্রিয়া একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন অবিরল জেগে থাকবে নয়ন, একটা অস্পষ্ট ভয় বুকের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে।

কাল রাতে একটা ব্যাঙকে ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের ছুঁচে খোঁচার আধমরা করে সাপটাকে খেতে দিয়েছিল নয়ন। খুব খিদে ছিল ওটার। যখন মুখটা তুলে ব্যাঙটাকে ধরল, তখনই নয়ন লক্ষ করে সাপটার সামনের দুটো দাঁত হুলের মতো জেগে উঠেছে। আগে লক্ষ করে নি সে। লক্ষ করে গা-টা একটু শিরশির করেছিল তার। নয়নের সব অত্যাচারের কথা ও কি মনে রেখেছে? কে জানে! ঝাঁপিটা সাবধানে আবার চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে সে। খোলেনি।

শ্যামা রাজি হল না। হবে না। জানত নয়ন। দিন আর রাতের দু'জন নার্স মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখে নয়ন। উপহার দেয়। সুন্দর সব কথা বলে। ভাড়াটে মেয়েদের কাছেও ঘুরে এসেছে সে এর মধ্যে কয়েকবার। কিন্তু জুড়োয় না! কিছুতেই জুড়োয় না নয়ন। শরীরের মধ্যে কী একটা তার নেই! সে কি ক্লোরোফিল? ভিটামিন? ক্যালসিয়াম? ফেলে রাখা মেটেরিয়ামেডিকা, অ্যানাটমির বই খুলে খুলে রাত জেগে দেখে সে। কিছু বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে ভাবে, সে আমেরিকা, ফ্রান্স বা মোনাকোতে চলে যাবে। সেখানে সারারাত ফুর্তি করার অঢেল জায়গা। মদ খাবে, নাচবে, জুয়া খেলবে, মেয়েছেলে পালটে দেখবে রোজ। বিদেশে সারারাত শহর জেগে থাকে। কিন্তু কিছু স্থির করতে পারে না সে।

কয়েকদিন বাইরে ঘুরে আসে সে। তার পর ঘরে ফিরে এক গভীর রাতে সাপের ঝুড়ির ঢাকনাটা খোলে।

প্রস্তুত ছিল না নয়ন। অপ্রত্যাশিত সাপটা ঝাঁপির ঢাকনা খোলা মাত্র লক লক করে জেগে ওঠে। ও বুঝতে পেরেছে কি যে ও এখন সশস্ত্র! একটা চকিত লাফে সরে যায় নয়ন। সাপটা শরীর ক্রমশ উঁচু থেকে উঁচুতে তুলে ধরতে থাকে। নয়নের বুক সমান উঁচু তার তীব্র ফণা। মিটমিটে চোখে নয়নের চোখ আটকে রাখে মায়াবী সম্মোহনে কিছুক্ষণ। তার শিকরের মতো চেরা জিভ দ্রুত নড়তে থাকে। অসম্ভব ফোঁসফোঁসানিতে ভরে যায় ঘর। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নয়ন। তার পর ধীরে ধীরে সাহসভরে অভ্যাসবশত সে তার দস্তানা-পরা হাতটা এগিয়ে দেয়।

আক্রমণ। প্রতি-আক্রমণ। নয়নই জেতে। একসময়ে ছোবল দেওয়ার মুখে ধরে ফেলে ঘাড়। তার পর হাঁফাতে হাঁফাতে হাসে। ধীরে ধীরে ঝাঁপির ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় সাপটাকে। দস্তানা খুলে সিগারেট ধরায়। বিছানায় বসে থাকে জেগে। সারা রাত। কখনও বা মুঠো মুঠো সোনেরিল খেয়ে দেখে। বৃথা।

একদিন শ্যামার কাকা হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল, নয়ন, শ্যামার বিয়ের কথা চলছে।

নয়ন উদাস গলায় বলে, কার সঙ্গে?

খবর পাইনি। তবে এক পার্টি ওকে দেখে পছন্দ করে গেছে।

নয়ন চুপ করে থাকে। কিছু একটা করা উচিত, তার মনে হয়। কিন্তু বড় গভীর ক্লান্তি তার আজকাল।

মাঝে-মাঝে এমন হয়, পুরনো ব্র্যান্ডের সিগারেটটা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। তখন মানুষ বিরক্ত হয়ে ব্র্যান্ডটা পালটে নেয়। তেমনই কিছু একটা ভাবল নয়ন, ব্র্যান্ডটা পাল্টে নেবে কি না। তার পর আর সেই ভাবনাটাও রইল না। সম্পূর্ণ শূন্য মাথায় সে বসে রইল।

সে বুঝতে পারে, শ্যামা নয়, কিছু নয়, একটু ঘুম ছাড়া সে আর কিছু চায় না।

সাপটাকে জগদীশের কাছে দিয়ে আসবে ভেবেছিল। কিন্তু দিল না নয়ন। রেখে দিল। থাক। সে আজকাল ইঞ্জেকশন নেয় নিজে নিজে। তার পর ঘুমোয়। একদিন যখন ইঞ্জেকশনের ক্রিয়াও কমে আসবে তখন ভয়ঙ্কর ওই দাঁতওলা সাপটাকেই জাগাবে সে।

কে জানে ওর দাঁতেই শেষ ঘুমের ওষুধটা রয়ে গেছে কি না।

ফেরিঘাট

সিঁড়ির তলা থেকে স্কুটারটা টেনে নিয়ে রাস্তার পাশে ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড় করাল মধু, তার হাতে পালকের ঝাড়ন। মুছবে। মুছলেও খুব একটা চকচকে হয় না আজকাল। রংটা জ্বলে গেছে, এখানে-ওখানে চটা উঠে গেছে। বেশ পুরনো হয়ে গেল স্কুটারটা।

জানালা দিয়ে নীচের রাস্তায় স্কুটারটা একটুক্ষণ অন্যমনে দেখল অমিয়। বহুকালের সঙ্গী। মায়া পড়ে গেছে। কল্যাণ তিন হাজার টাকা দর দিতে চেয়েছিল। জিনিসটা ইটালিয়ান বলে নয়, মায়া পড়ে গেছে বলেই বেচেনি অমিয়। তা ছাড়া একবার বেচে দিলে নতুন আর কেনা হবে না। অমিয়র দিন চলে গেছে।

মুখ ফিরিয়ে অমিয় টেবিলে সাজানো এক প্লেট টোস্ট, একটা আধসেদ্ধ ডিম, এক গ্লাস দুধ, নুন-মরিচের কৌটো, চামচ—এ-সব আবার দেখে। সকাল আটটা কি সোয়া আটটা এখন। সাড়ে আটটায় সে রোজ বেরোয়। বেরোবার আগে সে রোজ টোস্ট ডিম নুন-মরিচ দিয়ে খায়। দুধ পান করে। আজ কিন্তু খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতেও তার অনিচ্ছা হচ্ছিল। খিদে নেই। বমি-বমি ভাব। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, বার বার উঠে সিগারেট খেয়েছে। সকালে অনেকক্ষণ স্নান করেছে চৌবাচ্চা খালি করে। তবু শরীর ঠিকমতো ঠান্ডা হয়নি। খাওয়ার কথা এখন ভাবাই যাচ্ছে না।

টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি রোজকার মতো হাসি বসে নেই। শোয়ার ঘরের দরজায় হাসি দাঁড়িয়ে আছে। কাল রাতে হাসিও বোধহয় ঘুমোয়নি। ঘুমোলে যে ছোট ছোট অবিরল শ্বাস পড়ে ওর, সেই শব্দ তো কই শোনেনি অমিয়। বেত আর বাঁশ দিয়ে তৈরি ভারী সুন্দর একটা খাট শখ করে কিনেছিল হাসি, যখন অমিয়র সুদিন ছিল। পুরনো বড় খাটটা বেচে দিয়ে অমিয় কিনে নিল একটা সোফা-কাম-বেড। সেই থেকে দু'জনের বিছানা আলাদা। বেতের খাটে হাসি, সোফা-কাম-বেডে অমিয়। সেইটাই কি মারাত্মক ভুল হয়েছিল?

বস্তুত তো ছোটবেলা থেকেই অমিয় যৌথ পরিবারে মানুষ। সেখানে বড় খাটের সঙ্গে আর একখানা বড় খাট জোড়া দেওয়া। বিশাল মাঠের মতো বিছানা, শামিয়ানার মতো বড় মশারি। দাদু-ঠাকুমা শুত, আর সেই সঙ্গে তারা রাজ্যের ছেলেপুলে। পরিবারের অর্ধেক এক বিছানায়। যারা সেই বিছানায় শুয়ে বড় হয়েছে তারা আজও কেউ একে অন্যের সঙ্গে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি, যে যার কাজের ধান্দায় আলাদা হয়ে ভিন্ন সংসার করেছে, দাদু-ঠাকুমা মরে গেছে কবে। তবু সেই প্রকাণ্ড বিছানার স্মৃতি আজও অমিয়র পিসতুতো, জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো ভাই আর বোনদের কাছ থেকে খুব দূরে সরাতে পারেনি। দেখা হলে সবাই অকৃত্রিম খুশি হয়, এক-আধবেলা জোর করে ধরে রাখে, প্রাণপণে খাওয়ায়, কত পুরনো দিনের গল্প হয়।

অমিয় খেতে পারছে না। একদম না। একটা টোস্ট মুখে তুলে দেখল। ভাল টোস্ট হয়েছে, মুড়মুড় করে ভেঙে যাচ্ছে দাঁতের চাপে। তবু অমিয়র কাছে কাঠের গুঁড়োর মতো বিস্বাদ লাগে। ডিমটা থেকে আঁশটে গন্ধ আসে। দুধটাকে খড়িগোলা মনে হয়। অমিয় টোস্ট হাতে ধরে রেখে এক বার চেষ্টা করে হাসির দিকে তাকায়। আসলে তাকাতে তার ভয় করছিল।

চোখে চোখ পড়ে। হাসির কোনও দ্বিধা নেই, ভয় নেই। এমন নিষ্ঠুর মেয়ে অমিয় খুব কমই দেখেছে। অমিয়কে কখনও হাসি সমীহ করেনি। আজ পর্যন্ত বলতে গেলে হাসি সঠিক বউ হয়নি

অমিয়র। ইচ্ছে হয়নি বলে হাসি সন্তান-ধারণ করল না আজ পর্যন্ত। না করে ভালই করেছে। তা হলে এখন অসুবিধে হত। হাসি তাই অমিয়র চোখে সোজা চোখ রাখতে পারে। ভয় পায় না। অমিয়র কাছে তার কোনও দায় নেই।

আমি কিন্তু কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। হাসি সকালে এই প্রথম কথা বলে।

অমিয় ভ্রূ তুলে বলে, কী বললে?

হাসি বলে, আমি কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব। এখানে তো আমার নিজস্ব কিছু নেই।

কী নেবে?

এই কয়েকটা শাড়ি-ব্লাউজ, সাজগোজের জিনিস, একটা সুটকেস, কয়েকটা টাকা...

অমিয় শান্ত গলায় বলে, নিয়ো। বলার দরকার ছিল না।

বলেই নেওয়া ভাল। দরকারে নিয়ে যাচ্ছি। দরকার ফুরোলে ফিরিয়ে দেব।

শরীরের ভিতরটা তিড়বিড় করে অমিয়র। কিন্তু কিছু বলে না। বলা মানেই আবার অশান্তি। ছোট কথার ঢিল ছুড়ে হাসি দেখতে চায় মজা পুকুরটায় কীরকম ঢেউ ওঠে। মজা পুকুর ছাড়া অমিয় নিজেকে আর কিছু ভাবতে পারে না।

হাসি আবার বলে, এ সংসারে আমি তো কিছু নিয়ে আসিনি, কাজেই নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

অমিয় উঠল। টেবিলে তার টোস্ট ডিম আর দুধের ওপর মাছি উড়তে লাগল, বসতে লাগল।

স্কুটারটা রোদে দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় জানালা দিয়ে এক বার দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নেয়। দরজার উপর একটা ছবি টাঙানো আছে। ছবির চারধারে একটা মালা কবে টাঙানো হয়েছিল, মালাটা গত বছরখানেক ধরে শুকিয়ে এখন রুদ্রাক্ষের মালার মতো দেখায়। ছবিতে ধুলো পড়েছে। বেরোবার সময়ে রোজই এক বার ছবিটার দিকে অভ্যাসবশত তাকিয়ে বেরোয় সে। এক বার হাতজোড় করার ভঙ্গি করে বেরিয়ে যায়।

আজও তাকাল।

বেরোবার মুখে দরজা থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, যা খুশি নিয়ে যেয়ো।

হাসি বলল, যা খুশি নেব কেন? যা না হলে চলবে না সে-রকম দু'-একটা জিনিস ধার নেব। আবার ফিরিয়ে দেব।

অমিয় বলল, আচ্ছা।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আর হাসির কথা মনে থাকে না। দু'-চার দিন বৃষ্টির পর গরম কমে গেছে। আকাশ গভীর নীল। বাতাস পরিষ্কার। স্কুটারটা মৃদু গোঙানির শব্দ করে ছুটছে। ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে যত অপ্রীতিকর কথা ভুলিয়ে দিয়ে মাথা পরিষ্কার করে দেয়। পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে কালো রাস্তা। কলকাতার এক রকম সুন্দর গন্ধ আছে। বর্ষার পর রোদ উঠলে প্রায়ই গন্ধটা পায় সে। রাস্তার পর রাস্তা পার হয় অন্যমনে।

ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় তার অফিস। ফুটপাথ থেকেই সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে খাড়া। সিঁড়ির পাশেই ফুটপাথে একটা গেঞ্জি, ব্রেসিয়ার, রুমাল, আন্ডারওয়্যারের স্টল চালায় আহমদ। অমিয়র স্কুটারটা সারা দিন সে-ই পাহারা দেয়। রুমালটা আন্ডারওয়্যারটা আহমদের কাছ থেকেই নেয় অমিয়। বদলে আহমদ স্কুটারটা নজরে রাখে। দরকারে অল্প-স্বল্প টাকা ধার দেয়। অমিয়র দু'-চারজন পাওনাদারকেও সে চিনে রেখেছে। নীচের তলা থেকেই তাদের তাড়ায়, বলে, তিনতলার সিঁড়ি খামোখা ভাঙবেন কেন, একটু আগেই বেরিয়ে গেছেন।

সিঁড়িটা সত্যিই খাড়া। উঠতে জান বেরিয়ে যায়। সিঁড়ির আট ধাপে একটা ছোট্ট চাতাল। সেই চাতালটা আহমদের একটা সংসার। দুপুরে তার ভাত আসে, কাছেই কোনও স্কুলে পড়ে তার দুই ছেলে, টিফিনে তারাও এসে হাজির হয়। চাতালে বসে অন্ধকারে বাপ-ব্যাটারা ভাত খায়। গা ঘেঁষে লোকজন ওঠানামা করে, ধুলো ওড়ে, কাঠের সিঁড়ি কাঁপে, তবু তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। চাতালের এক

দিকে আহমদের পোঁটলা-পুঁটলি, দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো জামা-কাপড়, জুতো।

তিনতলায় উঠতে আজ বেশ কষ্ট হল। অফিস বলতে যা বোঝায় তা তো নয়। ঘরটা বড়ই, তার তিন অংশীদার। আসলে ঘরটার মূল ভাড়াটে কল্যাণ। দশ-বারো বছর আগে এই ঘর ভাড়া নিয়ে তৃষ্ণা অ্যান্ড কোং খুলেছিল। আজও কোম্পানি আছে, কল্যাণও আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, সেই ঘরে পাশাপাশি টেবিলে আরও দু'টো কোম্পানি চালু হয়েছে। একটা রজতের, একটা অমিয়র। তারা দু'জন কল্যাণের সাবলেটের ভাড়াটে। একই ঘরে এ রকম চার-পাঁচটা কোম্পানিও চলে। একটা টেলিফোন আর একটা ঠিকানা থাকলেই কলকাতায় ব্যবসায় নামা যায়।

মিশ্রিলাল বসে আছে। একমাত্র মিশ্রিলালকেই আহমদ কখনও ঠেকাতে পারেনি। ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঠিক তিনতলা পর্যন্ত উঠবেই, উঠে অমিয়কে না দেখলে বসে থাকে, বসে থাকতে থাকতে ঝিমোয়। বিকেল পর্যন্তও বসে থাকে সে। অমিয়কে দেখে মিশ্রি এক বার চোখ তুলে নামিয়ে নিল। হাতে একটা টেন্ডারের চিঠি।

রাজেন গ্লাসে ঢেকে জল রেখে গেছে। টেবিলে কাগজপত্র প্রায় কিছুই নেই। দু'টো চিঠি। টেন্ডার। চিঠি দু'টো দেখে রেখে দিল সে। চেয়ার টেনে বসল। রাস্তার ওপারে গভর্নমেন্টের একটা স্টোর। লরি থেকে মাল খালাস করছে। রাস্তায় ট্রামের শব্দ হচ্ছে, বাস যাচ্ছে। কাচের পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে শব্দ আটকাল অমিয়।

মিশ্রি বলল, কিছু দেবেন নাকি?

ও-সপ্তাহে।

ও বাবাঃ, তিন মাস হয়ে গেল। আমিও মাল তুলতে পারছি না, একজনকে নিয়ে তো আমার কারবার নয়!

ও-সপ্তাহে এসো।

পুরো চাইছি না, কিছু দিন।

কোত্থেকে দেব? পেমেন্ট চার মাস আটকে আছে।

কেন?

সেনগুপ্ত চারটে এয়ারকন্ডিশনিং মেশিন কিনেছিল, চারটে স্ক্র্যাপ। মেশিন আমার অর্ডারে খাইয়ে ঝগড়া করে ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল! তখনও জানতাম না যে স্ক্র্যাপ মেশিন খাইয়ে গেছে প্যাটারসনে। প্যাটারসন থেকে সেদিন চিঠি এসেছে, মেসিন স্ক্র্যাপ, পেমেন্ট হবে না। সব বিল আটকে রেখেছে। সাত হাজার টাকার।

চুক চুক করে জিভে একটা ক্ষোভের শব্দ করে মিশ্রিলাল।

সেনগুপ্ত ডুবিয়ে গেল একেবারে!

অমিয় একটু হাসে। বলে, ডুবিয়ে যাবে কোথায়? ঠিক পেয়ে যাব।

বিলটার জন্য কবে আসব? আমার তো বেশি নয়, মোটে ন'শো টাকা। আমি গরিব মানুষ।

মিশ্রি, বিলের আশা ছাড়ো। বরং আমাকে আরও কিছু ধার দাও। নগদ না দিলে মাল দাও। আমার হাতে তিনটে টেন্ডার। দু'টো লোয়েস্ট হয়েছে, আর একটাও পেয়ে যাব। এখন সেনগুপ্ত নেই, আমি একা। টাকা মার যাবে না।

মিশ্রি গলা চুলকোয়। বলে, তিন মাসে পেমেন্ট পাচ্ছি না। কী যে বলেন। পুরনো লোক বলে ছাড়ছি না আপনাকে। কিন্তু কম্প্রেসারের পার্টসের জন্য লোকে ছিঁড়ে ফেলছে আমাকে। নগদ টাকার ছড়াছড়ি। এ-সব মাল এখন ক্রেডিটে দেয় কোন বুদ্ধু?

অমিয় জলটা একটু একটু করে খায়। স্বাদটা ভাল লাগে। তেষ্টা পেয়েছে খুব। গ্লাসটা আবার ঢেকে রেখে বলে, এবার কাটো তা হলে।

সামনের সপ্তাহে আবার আসব।

রোজ আসতে পারো। কিন্তু লাভ নেই।

বললেন যে আসতে। কিছু দেবেন। মোটে তো ন'শো টাকা।

ধৈর্যশীল মিশ্রিলাল ঝগড়া করে না। করলে করতে পারত। কিন্তু শান্ত মুখেই উঠে যায়। আবার ঠিক আসবে।

অমিয় নতুন টেন্ডারের চিঠি দু'টো টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে অন্যমনস্কভাবে; ছেঁড়া টুকরোগুলো টেবিলের ওপর সাজায় তাসের মতো। চেয়ে থাকে। সেনগুপ্ত কোথাও না কোথাও আছে ঠিক। কলকাতা হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়, তাতে ডুবসাঁতার কাটা যায়। কিন্তু একদিন না একদিন দেখা হবেই।

আজ-কালের মধ্যেই হাসি চলে যাবে। আজ বিকেলে বাসায় ফিরবার ইচ্ছে নেই অমিয়র। ফিরে খুব খারাপ লাগবে। হাসি যে কোথায় যাচ্ছে তা অমিয় জানে না। বোধহয় প্রথমে বাপের বাড়ি যাবে আসামে। তারপর বাগনানের কাছে এক গ্রামে, যেখানে ও চাকরি পেয়েছে, আগামী মাস থেকে চাকরি শুরু করবে। তারপর কী করবে হাসি? চাকরি করবে? তারপর? চাকরিই করবে! চাকরিই করে যাবে বরাবর! কিছু মনে পড়বে না! একা লাগবে না! খারাপ লাগবে না!

কল্যাণ টেবিলের ওপর পা তুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে! তৃষ্ণা কোম্পানি দাঁড়িয়ে গেছে। দু'জন কর্মচারী আউটডোরে ঘুরে বেড়ায়, কল্যাণকে কেবল অফিসটা দেখতে হয় আর ইনকাম-ট্যাক্স। কোম্পানি দাঁড়িয়ে গেলে আর তেমন ভাবনা নেই। রজতের টেবিল খালি। বড় একটা থাকে না রজত, প্রচণ্ড খাটে আর ঘোরে। দাঁড়িয়ে যাবে।

অমিয় নিঃশব্দে বসে থাকে কিছুক্ষণ। ভাবনা-চিন্তা করার মতো মাথার অবস্থা নয়। মনে হয় বেশি ভাবতে গেলেই মাথায় সমুদ্রের মতো বিশাল ঢেউ উঠে সে পাগল হয়ে যাবে।

বসে থাকলে এ-রকম হবেই, অমিয় তাই উঠল।

কল্যাণ এক বার তাকিয়ে বলল, কোন দিকে যাচ্ছেন?

যাই এক বার প্যাটারসনে। ওদের কাল মিটিং গেছে। লাহিড়ী বলছিল একটা ডিসিশন হবেই। যদি কিছু হয়ে থাকে দেখে আসি।

মিশ্রিলাল কত পায়?

ন'শো।

গতকাল আমি একটা পেমেন্ট পেয়েছি। শ'চারেক দিতে পারি। মিশ্রিকে আপাতত কাটাবেন না, কিছু দিয়ে হাতে রাখুন।

কেন?

ফুড সাপ্লাইয়ের টেন্ডারটা ধরে রাখুন। মিশ্রিকে কিছু খাওয়ালে ক্রেডিটে আবার মাল দেবে।

আপনি তো দু'শো অলরেডি পান।

দেবেন এক সময়ে। পালাবেন কোথায়?

আবার চোখ বোজে। কল্যাণ ও-রকমই। খুব মহৎ কাজও খুব অবহেলার সঙ্গে করে। অমিয় ঠিক কৃতজ্ঞতা বোধ করতে পারে না। মনটা সে-রকম নেই। সেনগুপ্ত পালিয়েছে, হাসি চলে যাচ্ছে। ব্যবসা ঝুল।

নীচে এসে স্কুটারটা চালু করে সে। ভিড় কাটিয়ে ধীরগতিতে এগোয়।

কাচের টেবিলে ছায়া পড়তেই লাহিড়ী মুখ তোলে।

ভাল খবর মশাই।

কী?

আবার অর্ডার পাবেন। আপনার টেন্ডার আমরা নেব। কাল খুব লড়ালড়ি হল আপনার জন্য।

কত টাকার অর্ডার?

কম। হাজার পাঁচেক। কিন্তু ব্যাড বুকে আছেন এখন, এই অর্ডারই আপাতত পাঁচলাখের সমান। মেশিনগুলো যদি পালটাতে না পারেন তবে অন্তত মেরামত করে দেবেন, বিল কিছু ছাঁটকাট হবে। সাত হাজারের জায়গায় হাজার চারেক পেয়ে যাবেন কিন্তু সেটা পাবেন মেশিন মেরামতের পর।

অমিয় ম্লান মুখে বসে থাকে। খবরটা ভালই। খুব ভাল। কিন্তু পাঁচ হাজারের অর্ডার ধরাও মুশকিল। পেমেন্টটা আটকে রইল।

লাহিড়ী চা বলল। তারপর জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে, খারাপ দেখছি যে।

কিছু না। শরীরটা ভাল নেই।

বয়স কত?

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

লাহিড়ী গম্ভীর ভাবে বলে, ড্রিঙ্কস?

একটু-আধটু।

মেয়েছেলে?

নীল।

স্মোক?

দিনে চল্লিশ-পঞ্চাশটা।

চেক আপ করান। হার্ট, ব্লাড, ইউরিন।

চা এসে যায়। দামি চায়ের গন্ধ। ভাল লাগে অমিয়র। আস্তে আস্তে চেখে চেখে খায়। প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশান পুরনো কোম্পানি। ব্রিটিশারদের হাত থেকে গত বছর কিনল এক পাঞ্জাবি। দশ বছর ধরে প্যাটারসনের সঙ্গে ব্যবসা করছে অমিয়। সকলের সঙ্গেই চেনা হয়ে গিয়েছিল, গুডউইল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেনগুপ্ত ডুবিয়ে দিয়ে গেল। পুরনো সাপ্লায়ার বলে প্যাটারসন অমিয়কে ছাড়াল না, কিন্তু নিচু নজরে দেখবে এখন, বেশি টাকার অর্ডার দিতে ভয় পাবে!

লাহিড়ীর খাঁই বেশি নয়। ওয়ান পার্সেন্ট নেয় বিল থেকে। অন্য পারচেজ-অফিসারদের বায়নাক্কা অনেক। সেই তুলনায় লাহিড়ী দেবতা।

অমিয় উঠে বলল, অনেক ধন্যবাদ।

লাহিড়ী হাসল। বলল, সেনগুপ্তর খবর কী?

খবর নেই।

ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

ও-সব মাল আমরা চিনি। আপনিই চিনতে পারেননি।

অমিয় দীর্ঘশ্বাসটা চেপে রাখে।

নীচে এসে আবার স্কুটার চালু করে অমিয়। কোথাও যাওয়ার নেই। সব জায়গায় পাওনাদার বসে আছে। হাজার দশ-বারো টাকার ক্রেডিট বাজারে। গোটা দুই বিলের পেমেন্ট সামনের সপ্তাহে পাওয়া যাবে। তার আগে অমিয়র কোথাও যাওয়া হবে না। পেমেন্ট পেলেই কিছু ধার শোধ হবে। হাতে কিছুই থাকবে না।

প্যাটারসন ওগিলভি অ্যামালগামেশন পিছনে ফেলে অমিয়র স্কুটার ধীরগতিতে, ভ্রমরের গুঞ্জন তুলে চলতে থাকে। উদ্দেশ্যহীন।

চললে বাতাস লাগে। থেমে থাকলে গুমোট। একটা পেট্রল পাম্পে থামতেই গুমোটটা টের পায়

স্নে। তিনটে গাড়ি তেল নিচ্ছে কাজেই একটু অপেক্ষা করতে হয় তাকে। কাঁচা পেট্রলের গন্ধে একটা মাদকতা আছে। গন্ধটা বরাবর ভাল লাগে তার। মন চনমন করে ওঠে। বুক ভরে সে পেট্রলের গন্ধ নেয়। ঝিমোয়। কয়েক মুহূর্তেই শার্টের নীচে ঘাম কেঁচোর মতো শরীর বেয়ে নামে। হাতের তেলো ভিজে যায়।

পিছনে একটা গাড়ি তীব্র হর্ন দেয়। অমিয় ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ চায়। সামনের গাড়ি চলে গেছে। অমিয় এগোয়। ট্যাঙ্ক-ভরতি তেল নেয়। আবার স্কুটার ছাড়ে। উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে থাকে।

মধ্য কলকাতার অফিসপাড়ায় কত বাড়ি তৈরি হচ্ছে। দারুণ দারুণ বাড়ি, লাখ লাখ টাকা খরচ। ভিতরে কোটি কোটি টাকার লেনদেন।

অফিস, কোম্পানি, ব্যাঙ্ক, জীবনবিমার বাড়ির ছায়ায় ছায়ায় অমিয় তার স্কুটার চালায়। শরীরের ঘাম মরে আসে। হাসি কিছু টাকা চেয়েছে। কত টাকা তা বলেনি। স্টিলের আলমারিতে শ'তিনেক আছে মনে হয়। অমিয়র পকেটে বড় জোর শ'খানেক। হাসি জানে, অমিয় এখন দড়ির ওপর হাঁটছে, তাই বেশি নেবে না বোধহয়। হাসি টাকা চায় না। মুক্তি চায়। কিন্তু ওকে এ সময়ে কিছু টাকা দিতে পারলে অমিয় খুশি হত।

সোনাদা যে-ব্যাঙ্কে চাকরি করে সেই ব্যাঙ্কটা পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থামে অমিয়। বছর তিনেক আগেই সোনাদা অ্যাকাউন্টস অফিসার ছিল। এখন কি আর-একটু ওপরে উঠেছে? সাহেবি ব্যাঙ্ক, একগাদা মাইনে পায় সোনাদা। কপালটা বড় হয়ে হয়ে অনেকটা মাথা জুড়ে টাক পড়েছিল। এখন বোধহয় টাকটা পুরো হয়ে গেছে। সোনাদা বরাবর গম্ভীর। দেখা হলে হাসে না, কথাও বেশি বলে না। পাত্তা না দেওয়ার ভাব। কিন্তু অমিয় জানে, সোনাদা মানুষটা বাইরে ওইরকম, ওর মুখে কথা কম, ভাবের প্রকাশ কম। কিন্তু এখনও অমিয়কে দেখলে ওর চোখের পাতা কাঁপে। স্নেহে, মমতায়। কত কষ্ট করেছে সোনাদা! বড় কষ্টে মানুষ।

অমিয় স্কুটার থেকে নেমে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কটায় ঢুকে যায়। সোনাদার কাছে কোনও কাজ নেই। তবু এক বার অনেক দিন বাদে দেখা করে যেতে বড্ড ইচ্ছে করছে। মনটা ভাল নেই।

কাউন্টারে ভিড়। অজস্র সুন্দর কাউন্টারে ছাওয়া চার দিক। রঙিন দেওয়াল, টিউব-লাইট—সব মিলিয়ে ব্যাঙ্কটার ভিতরটা বড় চমৎকার।

জিজ্ঞেস করতেই একজন পিয়ন সোনাদার ঘর দেখিয়ে দেয়। ঘষা কাচের পাল্লা। বাইরে টুলে বেয়ারা বসে আছে। একটা টেবিলের ওপর সাজানো স্লিপ, ডটপেন।

নিজের নাম লিখে অমিয় স্লিপ পাঠায়। একটু পরে বেয়ারা এসে ডাকে।

প্রকাণ্ড টেবিলের ও-পাশে সুন্দর পোশাকের সোনাদাকে প্রথমটায় আত্মীয় বলে ভাবতে কষ্ট হয় তার। গোলাপি রঙের টাক মাথায়, নীলাভ কামানো গাল, খুব ব্যস্ত।

এক বার চোখ তুলে আবার কাগজপত্রে ডুবে গেল। বসতেও বলল না। অমিয় একটু হেসে নিজেই বসে।

সোনাদা ওইরকমই। বসতে বলে না। জানে, বসতে বলার কিছু নেই। অমিয় তো বসবেই। এটা তার সোনাদার ঘর নয় কি?

ছোটবেলা থেকে তারা ভাইবোনেরা একে অন্যকে আপন বলে ভাবতে শিখেছিল। যৌথ পরিবার ওই একটা রক্তের গূঢ় সম্পর্ক তৈরি করে দিয়ে গেছে। এ জীবনে ওটা আর ভাঙবে না।

সোনাদা এক বার একফাঁকে প্রশ্ন করে, শরীরটা দেখছি শেষ করেছিস?

হুঁ।

কেন?

শরীরটা ভাল নেই।

কোম্পানি লালবাতি জ্বালেনি তো?

জ্বালছে।

জ্বালাই উচিত। তখন যদি ব্যাঙ্কের চাকরিটা নিতিস, আজ কত মাইনে হত জানিস?

কত?

হাজার খানেকের ওপরে। গর্দভ।

মাসে ওর চেয়ে অনেক রোজগার আমি করেছি। ব্যবসা বলে তোমরা গুরুত্ব দাও না। বাঁধা মাইনের লোকেরা ব্যবসাকে ভয় পায়।

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকায়। কোথায় একটা গোপন বোতাম টেপে, বাইরে রি রি করে বেল বাজে। বেয়ারা এলে সোনাদা চা আনতে বলে। তারপর আবার কাজেকর্মে ডুবে যায়।

ঠান্ডা ঘরখানা। অমিয়র ঝিমুনি আসে।

সোনাদা আবার চোখ তুলে তাকে দেখে, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, প্রবলেমটা কী?

তুমি বুঝবে না। অমিয় শ্বাস ছাড়ে, তারপর বলে, সোনাদা, তুমি কি প্রমোশন পেয়েছ?

চাকরিতে থাকলে প্রমোশন হয়। তোর মতো ব্যবসাদাররা চিরকাল ব্যবসাদার থেকে যায়।

তুমি কি খুব বড় পোস্টে আছ?

সোনাদা হাসে। মাথা নাড়ে।

তা হলে আমার ব্যবসার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ধার পাইয়ে দাও না!

তোকে ধার দেবে কেন? ইন্ডাস্ট্রি বা এগ্রিকালচার হলেও না হয় কথা ছিল।

যদি সিকিউরিটি দেখাই, যদি হাই ইন্টারেস্ট দিই?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে বলে, তোর আবার সিকিউরিটি কী? একটা পুরনো স্কুটার, ত্রিশ নম্বর ধর্মতলায় একখানা ভাগের অফিস। আর কী আছে তোর? বড়জোর একখানা রিফিউজি সার্টিফিকেট, তা সেখানাও বোধহয় হারিয়ে ফেলেছিস! কাজে লাগাতে জানলে রিফিউজি সার্টিফিকেটও মস্ত অ্যাসেট—কিন্তু তা তুই লাগালি কোথায়?

অমিয় চুপ করে থাকে।

সোনাদা আবার জিজ্ঞেস করে, প্রবলেমটা কী?

অমিয় উত্তর দেয়, তুমি বুঝবে না। মানুষ কত রকম গাড্ডায় যে পড়ে সোনাদা!

তোর গাড্ডাটা কী রকম?

অমিয় শুধু হাসে। চার দিকে এক বার তাকায়। যে চেয়ারে সে বসে আছে তা ফোম রাবারের গদিওয়ালা, টানলে শব্দ হয় না, ভীষণ ভারী। টেবিলখানা লম্বা এল-এর মতো। ঘসা কাচের দরজা, ঢেউখেলানো কাচ দিয়ে তৈরি ঘরের পার্টিশন। ও-পাশে লোকজন চললে কাচের ঢেউয়ে বিচিত্র প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই একখানা চেম্বার করতেই ইন্টিরিয়র ডেকরেটর অন্তত দশ-বিশ হাজার কি তারও বেশি নিয়েছে। এ-রকম একখানা অফিসঘর বানাবার ইচ্ছে তার অনেক দিনের। হবে না আর। এ-রকম নিস্তব্ধ কাচের ঘর, মাছি উড়লে যেখানে শব্দ পাওয়া যায়, এ-রকম ঠান্ডা ঘর, ফোম রাবারের গভীর তলিয়ে যাওয়া গদি, বিচিত্র ডিজাইনের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, আলো—এইসব আর কোনও দিন হবে না।

লাঞ্চে তুমি কী খাও সোনাদা?

তোর মুণ্ডু।

এই ঘরটা সাজাতে কত খরচ পড়েছে?

তোর মতো দশটা ব্যবসাদারকে বিক্রি করলে যত ওঠে।

এরা তোমার বাড়ি-ভাড়া দেয়? গাড়ি?

সোনাদা তাকে গ্রাহ্য না করে কাজ করে যায়। কিন্তু সোনাদার কপালে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দেয়। কাজ করতে করতেও এক-আধবার চোরা চোখে অমিয়কে দেখে নেয়।

অমিয় বলে, উঠি।

বোস। প্রবলেমটা কী বলে যা।

কিছু না।

টাকা সত্যিই চাস?

অমিয় মাথা নাড়ে, না।

দরকার হলে ম্যাক্সিমাম হাজারখানেক নিতে পারিস। ব্যাঙ্কের টাকা নয়, আমার টাকা।

কোনও দিন নিয়েছি?

সোনাদা চুপ করে থাকে।

অমিয় বলে, তুমি যদি সাপ্লায়ার হতে, কিংবা সুদখোর মহাজন, কি আমার ক্লায়েন্ট, তো নিতাম। তুমি আমার সোনাদা, কিন্তু আমার ব্যবসার কেউ নও। তোমার কাছ থেকে নিলে আমি তোমার আর পাঁচজন আত্মীয়ের মতো নিচু হয়ে যাব।

তার মানে?

অমিয় হাসে, আমাদের আত্মীয়দের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে সাকসেসফুল। তোমার কাছ ঘেঁষে বহু আত্মীয় ঘোরাফেরা করে, আমি জানি। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, আমি তাদের দলে নই।

সোনাদা একটু হাসে।

সোনাদা, আমার একটা প্রবলেমের কথা তোমাকে বলব? শুনবে ঠিক?

সোনাদা ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। ছোট্ট একটা নড করে।

আমি প্রায়ই একটা স্টিমারঘাটকে দেখতে পাই।

সোনাদা নড়েচড়ে বসে বলে, কী রকম?

আমি যেন উঁচু বালির চড়ায় বসে আছি। অনেক দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি গড়িয়ে গেছে—আধমাইল—একমাইল—তারপর ঘোলা জল—একটা জেটি—প্রকাণ্ড নদী দিগন্ত পর্যন্ত। কখনও কখনও দেখি, রাতের স্টিমারঘাট—কেবল বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলে, জেটির গায়ে জলের শব্দ—ও-পারে ভীষণ অন্ধকার। কেন দেখি বলো তো?

সোনাদা তাকিয়ে থাকে।

এ কি মৃত্যুর প্রতীক নাকি? অমিয় বলে।

ইয়ারকি হচ্ছে?

ইয়ারকি নয় সোনাদা। কাজকর্মে, ঘুরতে-ফিরতে হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে ওই বালিয়াড়ি, আর বালিয়াড়ির পর জেটি, জল—এইসব ভেসে ওঠে।

সোনাদার চোখ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ব্যস্ত সোনাদা একটু হেলান দিয়ে বসে। টেবিলের ওপর থেকে হাতড়ে ইন্ডিয়া কিংসের সোনালি প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরায়। মৃদু ধোঁয়ার গন্ধ অমিয়র নাকে এসে লাগে। সোনাদার সামনে খায় না, নইলে এই মুহূর্তে তারও একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যৌথ পরিবারের শিকড়-বাকড় সব রয়ে গেছে ভিতরে। সোনাদার সামনে কোনও দিনই আর সিগারেট খাওয়া যাবে না।

সোনাদা বলে, এ-সবই নস্ট্যালজিয়া। আমারও হয়। দেশের বাড়িতে করমচা তলার ছায়ায় মাটির ওপর শ্যাওলা গজাত। সেই ঠান্ডা জায়গাটার কথা হঠাৎ কেন যে মনে পড়ে।

অমিয় মাথা নাড়ে, না এটা শৈশব-স্মৃতি নয়। স্টিমারঘাট আমি আর ক'বার দেখেছি। দু' তিন বার বড় জোর। তারপরই তো কলকাতায় পার্মানেন্ট চলে এলাম। তা ছাড়া সেই স্টিমারঘাট তো দেশে যাওয়ার গোয়ালন্দি ঘাট নয়। এটা কেমন যেন ধু ধু বালুর চর, নির্জন অথৈ ঘোলাজল, ও-পারটা দেখা যায় না।

সোনাদা হাসে। বলে, ভাল খাওয়া-দাওয়া কর। হাসিকে নিয়ে কিছুদিন বাইরে-টাইরে ঘুরে আয়।

অমিয় অবাক হয়ে বলে, কেন?

তা হলে ও-সব সেরে যাবে।

সারাতে চাইছে কে? আমার তো খারাপ লাগে না। কলকাতার ভিড়ভাট্টা গরম, ঘাম, কাজকর্মের ভিতরে মাঝে মাঝে হঠাৎ ছুটি পেয়ে একটা অচেনা স্টিমারঘাটে চলে যাই, বালিয়াড়িতে বসে থাকি, বেশ লাগে। একে সারাব কেন? শুধু জানতে চাইছি, ব্যাপারটা কী। তুমি জান?

উত্তর দেওয়ার সময় পায় না সোনাদা। স্টেনোগ্রাফার পারশি মেয়েটি ঘরে ঢোকে। লম্বা ফরসা, ভাঙাচোরা মুখ। তবু মুখে একটা অদ্ভুত শ্রী আছে। দারুণ একখানা বাটিকের শাড়ি পরনে। মেয়েটা সোনাদার ডান দিকে গিয়ে নিচু হয়ে একটা টাইপ করা চিঠি দেখায়। কথা বলাবলি হয়। ততক্ষণ অমিয় মেয়েটার শাড়ি দেখে। হয়তো বা এ-রকম শাড়িতে হাসিকে ভাল মানাত। হাসির কথা মনে পড়তেই অমিয়র এক ধরনের শারীরিক কষ্ট হয়। বুক-পেট জুড়ে একটা তীক্ষ্ণ বেদনার আভাস পাওয়া যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। বুক ধড়ফড় করে। একটা চেক-আপ বোধহয় অমিয়র দরকার ছিল। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, ইররেগুলার জীবন, অতিরিক্ত চা আর সিগারেট, ব্যবসার উত্তেজনা, শক, সব মিলিয়ে ভিতরটা ভাল থাকার কথা নয়। হাসিকে এই শাড়িটায় বোধহয় এখনও মানায়। নীলের ওপর হলুদ বাটিকের কাজ। পকেটে একশোর কাছাকাছি টাকা আছে। বাজার ঘুরে এক বার খুঁজে দেখবে নাকি শাড়িটা। অবশ্য তা আর হয় না। হাসি বড় অবাক হবে, তাকিয়ে থাকবে, বা দু'-একটা বিদ্রূপাত্মক কথাও বলতে পারে। দরকার নেই। হাসি নিষ্ঠুর। তার হৃদয় নেই।

মেয়েটা ফাইলিং ক্যাবিনেটে কাগজপত্র ঘাঁটে। সোনাদা আবার কাজকর্মে ডুবে যায়। একজন-দু'জন করে অফিসে লোকজন আসে। সুন্দর পোশাকের চটপটে লোকেরা। সোনাদা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে, চমৎকার ইংরেজিতে কথা বলে। বিজনেসের পিক-আওয়ার। সোনাদার দম ফেলার সময় নেই।

এক ফাঁকে অমিয় বলে, সোনাদা, উঠি।

কাগজপত্র ঘেঁটে কী একটা খুঁজে পায় সোনাদা। সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে অমিয়কে বলে, সামনের সোমবার মিন্টুর জন্মদিন। তোর বউদি হয়তো হাসিকে খবর দিয়েছে। তবু বলে রাখছি, বিকেলের দিকে হাসিকে নিয়ে চলে যাস, রাতে খেয়ে একেবারে ফিরবি।

আচ্ছা।

তোর স্টিমারঘাটের ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখব।

অমিয় হাসে। জন্মদিনে যাওয়া হবে না। স্টিমারঘাটের কথা সোনাদা ভুলে যাবে।

ব্যাঙ্কটা থেকে বেরোতেই জ্বরো কলকাতা চেপে ধরে। কী তাপ রোদের। গুমোট।

অমিয় তার স্কুটার চালু করে। কোথায় যাবে, ভেবে পায় না, তবু যায়। যেতে থাকে।

টিফিন। কিন্তু টিফিনের সময়েও সোমাদি বাইরে যায় না, আড্ডা মারে না। নিজের জায়গায় বসে থাকে। প্রকাণ্ড হলঘরের একধারে টাইপিস্টদের সারি সারি মেশিন। সব খালি। কেবল সোমাদি ঠিক বসে আছে। ডান হাতে একখানা এককামড় খাওয়া টোস্ট, আলতো ভাবে ধরা, বাঁ হাত মেশিনে ছোবল মারার জন্য উদ্যত। অমিয় এগিয়ে যেতে শুনল টুক করে মেশিনের একটা অক্ষর লাফিয়ে উঠল। অমিয়র করুণা হয়।

সোমাদির বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে নয়। সিঁথির কাছে চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে প্লাস পাওয়ারের চশমা। রোগা গড়নের বলে বয়স খুব বেশি দেখায় না, কিন্তু দীর্ঘদিনের ক্লান্তির ছাপ আছেই। নাকের দু'ধার দিয়ে গভীর রেখা নেমে গেছে, মেচেতার ছোপ ধরেছে মুখে। বছরে বড়জোর এক-দু'-দিন ছুটি নেয়। চোদ্দো বছর টানা চাকরি করছে আয়রন অ্যান্ড স্টিল কন্ট্রোলে, তবু চাকরি পাকা হয়নি। কন্ট্রোল উঠে যাবে বলে চাকরি কারওই পাকা নয় এখানে। ওর বিয়ের

জন্য কেউ তেমন করে চেষ্টাই করল না। পিসেমশাই মারা যাওয়ার পর একটা চাকরিতে ঢুকেছিল, তারপর চাকরিই করে গেল। বার দুই দুটি ছেলেকে বোধহয় ভাল লেগেছিল। তাদের একজন ছিল ভিন্ন জাতের, অন্যজনের ছিল কম বয়স। হল না। হবেও না। সোমাদি তা জানে বলেই কোথাও আর যায় না। মনপ্রাণ দিয়ে চাকরি করে। ছুটি পেলে হাঁফ ধরে যায়।

টোস্টটা আর-এক কামড় খাওয়ার জন্য মুখের কাছে এনে সোমাদি তাকায়। প্রথমটায় বোধহয় চিনতেই পারে না। তাকিয়ে থাকে।

সোমাদি, কেমন আছ?

সোমাদি টোস্টটা রেখে দিয়ে একটু চেয়ে থেকে বলে, বেরো বেরিয়ে যা।

কেন?

লজ্জা করে না? এক বছরের মধ্যে এক বার মাকে দেখতে যাওয়ার সময় হয়নি? কতবড় অসুখ গেল মা'র, তোকে দেখার জন্য আকুলি-বিকুলি, তিনটে চিঠি দিলাম, একটা উত্তরও দিসনি। বেরো। —কেন এসেছিস?

তুমি কত মাইনে পাও?

তাতে কী দরকার? চালাকি ছাড়।

চালাকি না। সত্যিই জিজ্ঞেস করছি।

ভারী তো ব্যবসা। অফিসে মাছি ওড়ে, সেই ব্যবসা করেই তোর সময় হয় না? অমানুষ!

একটা চেয়ার টেনে অমিয় বসে নিজের থেকেই। মাঝখানে মেশিন, ও-পাশে সোমাদি। বলে, এর পরের জেনারেশনে আর এইসব চোটপাট শোনা যাবে না সোমাদি। যা বকাবকি করার তা তোমরাই করে নিলে।

তার মানে?

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে একটা ফ্যামিলি আছে। স্বামী স্ত্রী আর বাচ্চা ছেলে একটা। একদিন সাজগোজ করে বিকেলে কোথায় বেরোচ্ছে, ছেলেটার গাল টিপে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছ বাবু? সে উত্তর দিল—ঠাকুমার বাড়ি। বুঝলে সোমাদি,—কথাটা সেই থেকে বুকে মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয়। ঠাকুমার বাড়ি! মাই গড, ঠাকুমার বাড়ি যে একটা আলাদা বাড়ি, সেখানে যে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া যায় তা আমরা ভাবতেই পারি না এখনও। ঠাকুমার বাড়ি আবার কী? ঠাকুমা যে আমাদের রক্ত-মাংস মজ্জায় মিশে আছে—তার বাড়ি কী করে আলাদা বাড়ি হয়। এই যে তুমি আমাকে বকছ, পিসিমাকে দেখতে যাইনি বলে, এ-সব সম্পর্কের টান আমাদের সময়েই শেষ। এরপর পিসতুতো মামাতো ভাইবোনে দেখা হলে হয়তো হাতজোড় করে নমস্কার করবে, আপনি আপনি করে কথা বলবে। বলবে, এক দিন কিন্তু আমাদের বাড়িতে যাবেন, কেমন। খুব খুশি হব।

সোমাদি একটু হাসে। বলে, তোর সঙ্গে তো আমাদের সম্পর্ক তা-ই দাঁড়িয়ে গেছে। এক বছরে ঢাকুরিয়া থেকে বেহালা যাওয়ার সময় হয় না, কী করে বুঝব যে সম্পর্ক রাখতে চাস?

গত এক বছর ধরে আমি ভাল নেই সোমাদি।

কী হয়েছে?

তুমি কত মাইনে পাও বললে না?

জেনে কী হবে?

এমনিই। কৌতূহল। বলো না।

সব কেটে-ছেঁটে পৌনে আটশো। হাসি কেমন আছে?

ভাল। গত বছর তুমি একটা স্টিলের আলমারি কিনেছ আর একটা সিলিং ফ্যান, না?

সোমাদি হাসে, এ বছর একটা সুতোর কার্পেট কিনেছি, ড্রেসিং টেবিল করেছি, গ্যাসের উনুন কিনেছি। দেখে আসিস।

পৌনে আটশোর মধ্যে কী করে ম্যানেজ করো? তোমার তো উপরিরও রাস্তা নেই।

এইসব জানতেই এসেছিস? হাসিকে নিয়ে কবে যাবি বল?

তোমার পোষ্যও তো কম নয়। পিসিমা, নীতা তোমার এক জ্যাঠতুতো ভাই তোমার কাছেই থাকে, কী করে ম্যানেজ করো?

কী করব! তোরা ভাইরা তো আর মাসোহারা দিস না, ওতেই কষ্টে সৃষ্টে ম্যানেজ করে নিই। একটা টোস্ট দিয়ে টিফিন সারি, বিড়ি-সিগারেট খাই না, সাদামাটা পোশাক করি, সিনেমা দেখি কালেভদ্রে, কোথাও বেড়াতেও যাই না। তোদের তো তা নয়। হাসির খবর কিছু বললি না, বাচ্চাকাচ্চা হবে নাকি?

তুমি খুব কষ্ট করো, না সোমাদি?

দূর পাগলা, তোর হয়েছে কী? এ-সব বলছিস কেন?

তুমি এত কষ্ট করছ কেন?

কেন আবার, নিজের জন্য।

দূর। নিজের জন্য কষ্ট করে সুখ কী। কষ্ট করলে করতে হয় ভালবাসার মানুষের জন্য। তুমি সবচেয়ে বেশি কাকে ভালবাসো সোমাদি?

কী জানি? তোর হয়েছে কী?

কিছু না!

হাসিকে নিয়ে কবে যাবি? হাসি তো আমাদের ভাল করে চিনলই না।

যাব একদিন ঠিক। আগে বলো, তুমি কার জন্য এত কষ্ট করছ?

বললাম তো, নিজের জন্য।

তবে তো তুমি নিজেকে ভালবাসো।

বললাম তো, বাসি।

আমি বাসি না।

তুই হাসিকে বাসিস। ভালবাসলেই হল।

নিজেকে ভালবাসলে হাসিকেও ভালবাসা যায়। এই যে তুমি নিজেকে ভালবাসো বললে, স্বামী-পুত্র হলে তাদেরও বাসতে, বাধা হত না। ভালবাসা তো মাস-মাইনে নয় যে টান পড়বে।

হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস নাকি? কী হয়েছে বল? দরকার হলে আমি না হয় গিয়ে হাসিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিটমাট করে আসি। মাত্র তিন বছর হল বিয়ে, এখনই ঝগড়াঝাটি হলে—

পাকামি কোরো না। ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে তুমি কী জানো? ওই ব্যাপারে আমি তোমার সিনিয়র।

তা হলে এই গরম দুপুরে ঘামে নেয়ে এসে ভালবাসা ভালবাসা করছিস কেন? কিছু খাবি? বেয়ারা ডেকে কিছু আনিয়ে দিই। একটা ডিমভাজা—না গরমে একটু দই খাবি?

আমার মুশকিল কী জানো?

কী?

আমি হাসিকে ভালবাসতাম, ব্যবসাকে ভালবাসতাম, স্কুটারকে ভালবাসতাম, কিন্তু এইসব ভালবাসার মাঝে মাঝে একটা স্টিমারঘাট এসে পড়ছে।

স্টিমারঘাট?

হুঁ।

সোমাদি চেয়ে থাকে। বলে, কী বলছিস?

খুব উঁচু বালিয়াড়ি থেকে তুমি কখনও কোনও নির্জন ফেরিঘাট দেখেছ? একটা জেটি—তারপর বিশাল ঘোলা জলের নদী...ও-পারটা ধু ধু করে...দেখা যায় না। দেখেছ? আমি চোখ বুজলেই দেখি।

সোমাদির মুখটা কেমন হয়ে যায় যেন। বয়েস হয়ে যাওয়া, কৃচ্ছ্রসাধনের ছাপওলা নীরস মুখ সোমাদির। তবু কয়েক পলকের জন্য যেন একটা কোমলতা গাছের ছায়ার মতো মুখে খেলা করে। মুখের কর্কশ রেখাগুলি লাবণ্যের সঞ্চারে হঠাৎ ডুবে যায়।

কোন স্টিমারঘাটের কথা বলছিস? কলকাতার গঙ্গা, না কি গোয়ালন্দ, আমিনগাঁতেও ফেরিঘাট দেখেছিলাম।

ও-সব নয়। এ একটা অন্য রকম ফেরিঘাট। বহু দূর পর্যন্ত বালিয়াড়ি, তারপর ঘোলা জল— চোখ বুজলেই দেখতে পাই। ভীষণ ভয় করে, আবার ভীষণ ভালও লাগে।

আমি ঠিক জানি, তুই হাসির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস। কিংবা ব্যবসাতে মার খেয়েছিস। কত টাকা রেখে গিয়েছিল মামা?

হাজার দশেক।

সেটাই ভুল হয়েছিল। কে যে তোর মাথায় ব্যবসা ঢুকিয়েছিল। বাঙালি ছেলে আবার কবে ব্যবসা করতে শিখেছে। তার চেয়ে একটা বাড়ি করে ভাড়াটে বসিয়ে গেলে—

স্টিমারঘাটটার কথা তুমি কিছু জানো না, না?

কী জানব? তোর মাথায় যত সব পাগলামির পোকা। হাসিকে নিয়ে কবে আসবি বল?

তোমার কিছু মনে হয় না? স্টিমারঘাট বা ও-রকম কিছু?

সোমাদি হাসে। বলে, আচ্ছা জ্বালাতন! ভাবনা-চিন্তা করার সময় কোথায় আমার বল তো? সকাল সাড়ে আটটার লেডিজ স্পেশাল ধরতে বেরোই, মাইলখানেক হেঁটে বাস রাস্তা, অফিসে সারাক্ষণ কাজ, ফিরতে ফিরতে আটটা হয়ে যায়। তখন শরীরে থাকে কী? খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্নও দেখি না।

অমিয় শ্বাস ফেলে। বলে, তুমি কাঠ হয়ে গেছ।

একটু ইতস্তত করে সোমাদি বলে, তোর দেশের পুকুরঘাটের কথা মনে পড়ে। খুব বড় বড় কচুপাতা বাতাসে নড়ত। মাছ ফুট কাটত জলে। কদমগাছের ছায়ায় আমরা গঙ্গা যমুনা খেলতাম। মনে হওয়ার কি শেষ আছে! কত কী মনে হয়। ও-সব নিয়ে ভাবনার কী। হাসির সঙ্গে ভাব করে ফেল। ফেরার সময়ে একখানা শাড়ি আর দু'টো সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে যা। কালকের দিনটা হোটেল-রেষ্টুরেন্টে খাস। এ-রকম একটু-আধটু করলেই দেখিস আর ঝগড়া হবে না।

তুমি এ-সব কবে থেকে ভেবে রেখেছ সোমাদি! বিয়ে হলে বরের সঙ্গে কীরকম সব মান-অভিমান হবে, সব ভেবে রেখেছিলে। আর বলছ, ভাববার সময় পাও না।

সোমাদি হেসে ওঠে। বলে, ঠিক বলেছিস।

একজন-দু'জন করে মেশিনগুলোর সামনে মেয়েরা এসে বসছে। টিফিন শেষ।

অমিয় উঠে দাঁড়ায়।

চলি।

সোমাদি প্লাস পাওয়ারের চশমার ভিতর দিয়ে তাকায়। চোখে অন্যমনস্কতা। বলে, সম্পর্কটা রাখিস অমিয়। মাকে গিয়ে দেখে আসিস। হার্ট ভাল না, কখন কী হয়ে যায়।

যাব।

অফিসে এসে অমিয় দেখে, কেউ নেই। দুপুরের ডাকে ইনশিওরেন্সের একটা চিঠি এসেছে। গত বছরের প্রিমিয়াম বাকি। বছর তিনেক আগে, বিয়ের পরই দশ হাজার টাকার একটা পলিসি করিয়েছিল। দু'বছর প্রিমিয়াম টেনেছে। যাকগে, পেইড আপ্ হয়ে যাবে।

গ্লাসের নীচে চাপা দিয়ে কল্যাণ একটা চিঠি রেখে গেছে— বাগচী, হায়দার তাগাদায় এসেছিল। ভুজুং ভাজুং দিয়ে বিদায় করেছি। ইনকাম-ট্যাক্সের অজিতকে এক বার ফোন করবেন, ওকে

আপনার কথা বলা আছে। ওর দাদা একটা লোন সোসাইটির মেম্বার, একটা লোন পাইয়ে দিতে পারে। আমি সিনেমায় যাচ্ছি, আজ ফিরব না। রাজেনের কাছে চারশো টাকা রাখা আছে। কাল সকালেই গিয়ে মিশ্রিলালকে দিয়ে আসবেন। ফুড-সাপ্লাইটা ছাড়বেন না—

চোখটা একটু ঝাপসা লাগে। চিঠিটা রেখে দেয় অমিয়। অফিস-ঘরটা নির্জন। পাখার হাওয়ায় কোথায় যেন একটা কাগজ উড়বার শব্দ হয় কেবল। অমিয় বসে হাই তোলে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে।

বিকেলের দিকে রজত ফিরে এসে ডাকে, বাগচী—

উঁ।

আমার কাছে কেউ এসেছিল?

না।

দূর! কেউ আসেনি!

রাজেনকে জিজ্ঞেস করুন তো।

করেছি। ও তো বিশ বার বাইরে যাচ্ছে চা খাবার সিগারেট আনতে। আমার মোটর পার্টসটা দিয়ে গেল না শালা রায়চৌধুরী। কাল ডেলিভারি নিতে আসবে।

অমিয় আড়মোড়া ভাঙে। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। বাইরে এখনও ফরসা রোদ।

রজত তার চেয়ার টেনে বলে, ব্যবসার মুখে পেচ্ছাপ। ভিসা পেয়ে যাচ্ছি কাল।

কবে রওনা?

দিন পনেরোর মধ্যে। প্রথমে ডুসেলডর্ফে যাব মাধুর কাছে। সেখান থেকে বন হয়ে কাজের জায়গায়। দাঁড়ান, আজ আমি চা খাওয়াব, সন্দেশ খাবেন?

খাব। খুব খিদে পেয়েছে। অমিয় বলে।

বেল বাজায় রজত। রাজেন এলে চা সন্দেশ আনবার পয়সা দেয়। তারপর অমিয়কে বলে, খুব দামি সিগারেট কী আছে বলুন তো?

আপনি তো খান না।

আজ খাব।

ইন্ডিয়া কিংস।

রাজেনের দিকে ফিরে রজত বলে, ইন্ডিয়া কিংস এনো এক প্যাকেট, আর দেশলাই। বাগচী, যাওয়ার আগে একটা পার্টি দেব।

অমিয় হাসে।

শুধু একটা ভয়, বুঝলেন বাগচী!

কী?

এর আগে গুরুপদ গিয়েছিল। ল্যাংগুয়েজ জানত না বলে ওকে ফেরত পাঠিয়েছে। আমিও ভাল জানি না। ওদিকে ব্রজগোপালদাকে দিয়ে জার্মান ভাষায় করেসপন্ডেন্স করেছি, নিজে শেখবার সময়ই পেলাম না। শেষে গুরুপদর মতো ফেরত পাঠাবে না তো?

সকলের কপাল সমান না।

চেয়ারটা পিছনে হেলিয়ে একটু দোল খায় রজত। ভাবে। বলে, অবশ্য মাধুও জানত না। কোম্পানি ওকে তবু রেখে দিয়েছে।

অমিয় রজতকে একটু দেখে। অন্তত দশ বছরের ছোট রজত। বাচ্চা ছেলে। কোনও জমিতেই শেকড় নেই। কলকাতায় জন্ম-কর্ম। অমিয়র মনে হয়, কলকাতায় জন্মালে মাটির টান থাকে না। রজতের খুব ইচ্ছে, আর ফিরবে না। একটা আবছায়া স্টিমারঘাট চোখের সামনে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অমিয় ক্যালেন্ডারের ছবিটা দেখে। একটা মেয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় একটা

কলসি, কোমরের কলসিটা কাত করে ধরা তা থেকে অঝোরে জল পড়ে যাচ্ছে।

রজত মুখ তুলে বলে, আমার একটা লাভ অ্যাফেয়ার প্রায় ম্যাচিওর করে এসেছিল বুঝলেন বাগচী!

হুঁ।

সেটার কী করব বলুন তো?

আপনার কী ইচ্ছে?

ইচ্ছে নেই।

অমিয় চেয়ে থাকে।

রজত আবার বলে, চলেই যাচ্ছি যখন, তখন আবার এখানে একটা ফ্যাকড়া রেখে যাই কেন! মেয়েটা হয়তো অপেক্ষা করবে। করতে করতে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাবে। এক ফাঁকে এসে অবশ্য বিয়ে করে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু তার আর কী দরকার! ওখানেই যখন বরাবর থাকব তখন ওদিকেই বিয়ের সুবিধে। তাই মেয়েটাকে সব বুঝিয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাব। ভাল হবে না?

অমিয় মাথা নেড়ে বলে, হবে।

রজতকে খুশি দেখায়। সে এক বার শিস দেয়, দু'কলি গান গুন গুন করে গায়।

কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হচ্ছে। কেউ আসছে। টপ করে নিজের অজান্তেই উঠে পড়ে অমিয়।

রজতবাবু, কেউ এলে কাটিয়ে দেবেন। আমি বোসের ঘরে ফোন করতে যাচ্ছি।

রজতের অভ্যাস আছে। অনেক দিন ধরেই অমিয়র সময় ভাল যাচ্ছে না। রজত মাথাটা হেলিয়ে একটু হাসল, ঠিক আছে ঠিক আছে। বাগচী, উই আর কমরেডস আফটার অল—

সিঁড়ি দিয়ে যে উঠেছে সে যে-ই হোক অল্পের জন্য অমিয়কে ধরতে পারল না। অন্ধকার প্যাসেজটা প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে এল অমিয়।

বোস বুড়ো মানুষ। দুই ভাই পাশাপাশি চেয়ারে বসে থাকে। এক সময়ে ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার হিসাবে একটু নাম ছিল। এখন কিছু নেই। অফিস আছে। এই পুরো তিনতলাটা তাদের লিজ নেওয়া। লিজ নিয়ে কল্যাণের তৃষ্ণা এবং আরও কয়েকজনকে অফিস ভাড়া দিয়েছে। ওইটাই আয় এখন। জটাওয়ালা একজন তান্ত্রিক এসে প্রায়ই দুই ভায়ের মুখোমুখি বসে থাকে। আজও আছে। ঠান্ডা অন্ধকার ঘরে তিনজন বয়স্ক, নিস্তব্ধ মানুষ। কোনও কাজ নেই।

টেলিফোনটার সামনে একটু দাঁড়ায় অমিয়। কাকে ফোন করবে বুঝতে পারে না। কোনও নম্বর মনে আসে না। তবু হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নেয়, ডায়াল টোন শোনে। কিড়-কিড় শব্দ হয়। কোনও নম্বর মনে আসে না। তবু অমিয় আঙুল বাড়ায়। দুইয়ের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে ডায়াল ঘোরায়। তারপর তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত—। অপেক্ষা করে। টেলিফোন একটু নিস্তব্ধ থাকে। তারপর খুট করে একটা শব্দ হয়। পরমুহূর্তে হঠাৎ অমিয়কে চমকে দিয়ে ওপাশে একটা দীর্ঘ টানা মুমূর্ষু চিৎকার শোনা যায়—অমিয়—ও—ও, অমিয়—ও—ও—

অমিয় কেঁপে ওঠে প্রথমে। 'কে?' বলে চিৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর বুঝতে পারে, ওটা এনগেজড সাউন্ড। ধীর কান্নার মতো বিষণ্ণ শব্দ। কত বার শুনেছে সে। আসলে মনটা ঠিক জায়গায় নেই। ফোনটা আবার রেখে দেয় অমিয়। দাঁড়িয়ে থাকে। একটু আগে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে এল তা ভাবতে চেষ্টা করে। অন্ধকার সিঁড়িতে আবছায়া নতমুখ একটা অবয়বকে এক ঝলক দেখেছিল। একটু সময় কাটানো দরকার।

আবার ডায়াল ঘোরায় অমিয়। সম্পূর্ণ আন্দাজে। কোন নম্বরে আঙুল তা তাকিয়ে দেখে না। খুব খিদে পেয়েছে অমিয়র। মুখটা তেতো-তেতো। বোধহয় পিত্তি পড়েছে। সকাল থেকে সে প্রায় কিছুই খায়নি। মাথাটা ঘোরে। শরীর দুর্বল লাগে। এর পর থেকে অফিসের নীচে, খোলা রাস্তায়

আর স্কুটারটা রাখা যাবে না। নীচে স্কুটারটা দেখে সবাই বুঝতে পারে, অমিয় অফিসে আছে। আহমদকে বলবে একটা গোপন জায়গায় বন্দোবস্ত করতে। ঘড়ির দোকানের পাশে একটা এঁদো গলি আছে—সেখানে রাখলে কেমন হয়?

ফোনটা কানে চেপে ধরে থাকে অমিয়। ডায়াল টোন থেমে গেছে। এইবার নম্বর আসবে। অমিয় অপেক্ষা করে। স্পষ্ট শুনতে পায় ওপাশে দু'একটা কলকবজা নড়ছে, লিভার উঠছে। প্রথমে ভার্টিকাল তারপর হরাইজন্টাল খোঁজ শুরু করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র! কিন্তু নম্বরটা খুঁজে পাচ্ছে না। খুঁজছে—প্রাণপণে খুঁজছে যন্ত্রটা। খুঁজে পাচ্ছে না। অমিয় অপেক্ষা করে। যন্ত্রের শব্দ থেমে যায়। নম্বরটা কি পাবে না অমিয়? সে অপেক্ষা করে।

যন্ত্রটা অস্ফুট শব্দ করে, তারপর প্লাগ দেয়। রিং করার শব্দ হয় না, এনগেজড থাকারও শব্দ হয় না। কিন্তু তবু কানেকশন ঠিকই পায় অমিয়। স্পষ্ট বুঝতে পারে, ও-পাশে টেলিফোন হাতে নিয়েছে এক গভীর নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতায় খুব উঁচু থেকে বালিয়াড়ি নেমে গেছে বহু দূর। ধু ধু বালিতে শব্দহীন জ্যোৎস্না পড়ে আছে। হাড়ের মতন সাদা বালি—গড়ানে—তারপর অন্ধকার জেটি, ঘোলা জল। শেয়ালের চোখের মতো চকচক করে ওঠে জোনাকিপোকা। এ-পারে দিনের আলো থেকে ও-পারে গভীর রাতের মধ্যে চলে যায় টেলিফোন। সেখানে বাতাসের শব্দ নেই, জলের শব্দ নেই। বালির ওপরে একটা সাপের খোলস উলটে পড়ে আছে। বালিতে ঢেউয়ের দাগ। বহু দূর-দিগন্তব্যাপী সেই নিস্তব্ধতা টেলিফোন ধরে থাকে ও-পাশে। অমিয় সেই নিস্তব্ধতাকে শোনে।

ক'দিন ধরেই ইঁদুরের খুটখাট সারা বাড়িময় শুনছে হাসি। কখনও ওয়ার্ডরোবে, কখনও খাটের তলায়, জুতোর র‍্যাকে, রান্নাঘরে। অবিরল দাঁতে কেটে দিচ্ছে সংসার। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে মাঝে মাঝে শুনেছে এক ঘর থেকে আর-এক ঘরে চি-চিক-চিক আনন্দিত চিৎকার ছুটে যাচ্ছে। কুড়-কুড়-কুড়-কুড় কাটার শব্দ হয়েছে। হাসি তেমন গা করেনি। কাটছে কাটুক।

সকালে অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার পরই হাসি গোছগাছ করতে বসেছে। থাকে থাকে সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার জমে গেছে। এতসব পরার সময় হয়নি। ট্রাঙ্ক ভরতি রয়েছে শাড়ি, র‍্যাকে নানা রকমের জুতো, ড্রেসিং টেবিলে সাজগোজের অসংখ্য টুকিটাকি। এ-সব কিছুই নেবে না সে। দু' চারটে মাত্র নেবে...যা না হলে নয়।

নীচের থাক নাড়া দিতেই হাসি দেখতে পায় ইঁদুরের কাটার চিহ্ন। তার সায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ারের এখানে-সেখানে ফুটো। গরম-জামার থাক ভরতি জামা-কাপড় কেটে রেখেছে। কত কী কেটেছে দেখার জন্য হাসি সব জামা-কাপড় নামিয়ে মেঝেতে স্তূপ করে। একটা পুরনো ফুলহাতা সোয়েটারে জড়ানো দু' বান্ডিল চিঠি। চিঠির বান্ডিল তুলতেই ঝুরঝুর করে কাগজের টুকরো ঝরে পড়ে। অমিয় দু' দফায় দিল্লি আর কানপুর গিয়েছিল। প্রথমবার দু' মাস, দ্বিতীয়বার মাসখানেকের জন্য। আর দু' বার বাপের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন করে ছিল হাসি। সেইসব সময়ে অমিয় লিখেছিল এইসব চিঠি। ইঁদুর নষ্ট করে গেছে। সবচেয়ে ওপরের চিঠিটা খুলে কয়েক পলক দেখে হাসি। ছিদ্রময় প্রেমপত্র। 'প্রিয়তমাসু...' হাসি পড়তে থাকে... 'তোমার জন্য ভীষণ (ফুটো) হয়ে আছি। কবে আসছ? তোমার জন্য এমন (ফুটো) লাগছে যে কী বলব। আমার (ফুটো) ভিতরটা তো তুমি (ফুটো) পাও না...রানি আমার, আমার (ফুটো), কবে (ফুটো)? তোমার জন্য আমি সব (ফুটো) পারি। তাড়াতাড়ি চলে (ফুটো)...'

হাসি একটু হাসে। চিঠিটা দেখে নয়। প্রেমপত্র লিখতে অমিয় জানে না। দু'-চারটে দুর্দান্ত এলোমেলো আবেগের লাইন লিখেই তার সব কথা ফুরিয়ে যায়। কোনও ইনল্যান্ডের একটার বেশি ফ্ল্যাপ ভরতি করতে পারেনি সে।

ছিদ্রময় এই চিঠিগুলো নিয়ে কী করবে তা ঠিক করতে পারে না সে। নিয়ে যাবে? না কি পুড়িয়ে

ফেলবে? ভাবতে ভাবতেই আবার পুরনো পুলওভারে চিঠিগুলো জড়িয়ে ওয়ার্ডরোবে আগের জায়গায় রেখে দেয়। থাকগে। থাকতে থাকতে একদিন পুরনো হয়ে হয়ে ধুলো হয়ে যাবে আপনা থেকে।

মধুকে ডেকে হাসি ন্যাপথলিন আনতে বলে, আর ইঁদুর-মারা বিষ। তারপর একে একে ট্রাঙ্ক বাক্স, স্টিলের আলমারি—সবই খুলে ফেলে সে। জামা-কাপড় নামায়, ছিদ্র খুঁজে দেখে। সব জায়গাতেই হয়েছে ইঁদুরের দাঁতের দাগ। ভিতরে ভিতরে সব ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে। আবার সব গোছ করে তুলতে বেলা গড়িয়ে যায়। সঙ্গে নেওয়ার জন্য সাদামাটা কয়েকটা জামা-কাপড় আলাদা করে রাখে হাসি। দু'-একটা প্রসাধন। কিছু টাকা। কবে যাওয়া হবে তার কিছু ঠিক নেই। দার্জিলিং মেলে এখন সামার-রাশ। জামাইবাবুকে রিজার্ভেশন করতে বলা আছে।

ঘর-দোর আবার ঝাঁট দেয় হাসি, আটার গুলিতে বিষ মিশিয়ে রাখে ওয়ার্ডরোবে, খাটের তলায় রান্নাঘরে। স্নান করে খেয়ে উঠতে বেলা দুটো বাজে।

মেঝেয় শতরঞ্জি পেতে একটু গড়িয়ে নেয় হাসি। মেঝে থেকে শীতভাব উঠে আসে শরীরে। বাইরে রোদের মুখে ছায়া পড়েছে। মেঘ করল নাকি! বুকের ওপর সিলিং ফ্যানটার ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ব্লেডগুলো একটা প্রকাণ্ড স্থির বৃত্ত তৈরি করেছে। ঘূর্ণিঝড়ের মতো। বাতাস নেমে এসে মেঝেতে চেপে ধরে হাসিকে! মধু রান্নাঘর ধোলাই করছে। কলঘরে জলের শব্দ। দূরে মেঘ ডাকছে। জানালা-দরজায় সবুজ পরদা ফেলা। ঘরে একটা সবুজ আভা। হাসি একটু চেয়ে থাকে, কিন্তু কিছুই দেখে না। দেখার জন্য সে চেয়েও নেই। দুই ঘরের এই যে ছোট্ট বাসা, এই কি সংসার? খাট আলমারি, খাওয়ার টেবিল, ড্রেসিং টেবিলের আয়না—দৃশ্যমান যা-কিছু আছে, যা ধরা-ছোঁয়া যায় তার কোনওটাই কি মানুষের সঙ্গে আর-একটা মানুষকে আটকে রাখতে পারে? ঘরে দরজা দিয়ে দাও, শরীরে শরীর মিশিয়ে ফেলো, সারাবেলা বলো ভালবাসার কথা পোষা পাখির মতো, ওয়ার্ডরোবে জমে উঠুক প্রেমপত্র—তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। সরকারি দপ্তরে হাসি আর অমিয়র বিয়ের দলিল নব্বই-একশো বছর ধরে জমা থাকবে, অত দিন ধরে তাতে লেখা থাকবে যে তারা আইনগতভাবে স্বামী-স্ত্রী। তবু কিছুই প্রমাণ হয় না। হাসি পাশ ফিরে শোয়।

খামের ওপর সাঁটা একটা ডাকটিকিট জলে ভিজিয়ে খুব সাবধানে তুলে নিচ্ছে হাসি। খামের ওপর টিকিটের চৌকো চিহ্ন একটা থেকে যাবে—থাকগে। না কি কোনও দিনই টিকিটটা ঠিকমতো সাঁটা ছিল না খামের গায়ে? দুটো শরীর কেবল পরস্পরকে ডাকাডাকি করেছে এতকাল? মন নয়, বিশ্বাস নয়, নির্ভরতা নয়।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত— কলকাতা কলকাতা!

গরিব ঘরেই জন্ম হয়েছে হাসির। তার বাবা কাছাড়ের এক ছোট্ট চা-বাগানের কেরানি। তারা ছয় ভাইবোন। হাসি চতুর্থ। লেখাপড়ার কোনও সুযোগ ছিল না। শিলচরে থাকত এক মাসি, তার ছেলেমেয়ে নেই। সেই মাসিই নিয়ে গেল হাসিকে, পালত পুষত। শিলচর কলেজ থেকেই সে বি এ পাশ করে, শিলচরেই শেখে মণিপুরি নাচ। লেখাপড়া, নাচ, গান-বাজনা—এ-সবই হাসি শিখত প্রাণ দিয়ে। এইসব লোকে শেখে কত কারণে। হাসির কারণ ছিল ভিন্ন। হাস্যকর সে কারণ, তবু কত সত্য।

ছেলেবেলা থেকেই তার মন বলত— কলকাতা, কলকাতা! চা-বাগানে তার ছেলেবেলা কেটেছে। চার দিকে ঘন গাছের বেড়াজাল, বৃষ্টি পড়ত খুব, আবার রোদ উঠলে চা-পাতার মাতলা গন্ধে ম-ম করত বাতাস। রাতে ফেউ ডাকত, শেয়াল কাঁদত, তাদের বাড়ির আনাচে-কানাচে এঁটোকাঁটা খেতে আসত শুয়োরের মতো মুখওয়ালা বাগডাশা। ঝিঁঝির ডাক রাতে অরণ্যকে গভীর করে তুলত। শীতকালে পড়ত অসহ্য শীত, মাটির ভাপ কুয়াশার মতো হয়ে বর্ষাকালে চরাচর আড়াল কবত। পাহাড়ি পথ হঠাৎ বাঁক ঘুরে রহস্যে হারিয়ে যেত। তারা ভাইবোনেরা উতরাই ভেঙে

দৌড়ে দৌড়ে খেলত ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। দীনদরিদ্র ছিল তাদের পোশাক, আসবাব। তাদের ছোট্ট বাড়িটিতে তাদের অতজনের ঠিক আঁটত না। সেই বাগানে তার ছেলেবেলায় প্রথম বাবার কাছে কলকাতার গল্প শোনে। বেশিরভাগই কলকাতার দৃশ্যের গল্প। গাড়িঘোড়া আলো দোকান আর লোকজনের গল্প। বাবা গল্প বলতেন সুন্দর, আস্তে আস্তে, সময় নিয়ে, প্রতিটি দৃশ্য যেন নিজেও প্রত্যক্ষ করতেন। সেইসব গল্পে তাঁর যৌবনকালে কলকাতার ছাত্রজীবনের নানা দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকত। আর থাকত কলকাতা ছেড়ে আসবার বিরহ-যন্ত্রণা। হাসির মনে সেই প্রথম কলকাতার নাম বীজের মতো ঢুকে যায়। সে বাবাকে বলত, চলো না বাবা, কলকাতা যাই। বাবা স্থির থেকে বলত, দূর! আর যাওয়া হবে না। সেখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, কোনও কাজ নেই সেখানে, খামোখা টাকা-পয়সা খরচ করে চার দিনের রাস্তার ধকল সয়ে কার কাছে যাব? হাসির মন বলত— কেন, কলকাতার কাছে।

শিলচর ছিল সুন্দর ছিমছাম শহর। লোকজন বেশি না, গাড়িঘোড়া বেশি না, চার দিকে জঙ্গল-ঘেরা ছোট্ট শহর। সেখানে মাসির বাড়িতে এসে সে প্রথম শহরের স্বাদ পায়। সুন্দর সেই স্বাদ। তখন তার মনে কলকাতার বীজটি ফেটে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। সে বুঝতে পারে—শহর—শহরের মতো জায়গা নেই। সাত বছর সে শিলচরে কলকাতার আরও বিচিত্র গল্প শোনে বন্ধুবান্ধবীর কাছে। মাসিদের আত্মীয় হারুকাকার ক্যানসার হয়েছিল, সে গেল চিকিৎসার জন্য কলকাতায়। শচীন নামে কলেজের একটি ছেলে বেশ কবিতা লিখত, সে গেল কলকাতায় বড় কবি হওয়ার জন্য। অনুরাধা ক্লাসিকাল গাইত গৌহাটি রেডিয়ো থেকে। সে প্রায়ই বলত, মফস্‌সলে কিছু হয় না, শিখতে হলে যেতে হবে কলকাতা। হাসির মন বলতে থাকে— কলকাতা, কলকাতা। তুমি গান গাও? নাচো? কবিতা লেখো? তুমি চাকরি চাও? উন্নতি চাও? তোমার মরণাপন্ন অসুখ! তবে কলকাতা যাও। যাও কলকাতায়। এক বার কলকাতা থেকে ঘুরে এসো। মানুষকে কলকাতা সব দিতে পারে। খ্যাতি, টাকা, প্রাণ পর্যন্ত। কলকাতা থেকে যারা শিলচরে ফিরে যায় সেইসব বন্ধুদের কাছ ঘেঁষে কলেজে বসত হাসি। দেখত—ঠিক। ওদের মুখে-চোখে আলাদা দীপ্তি, ঝলমলে আনন্দিত ওদের পোশাক, গায়ে কলকাতার মিষ্টি গন্ধ। মাসিকে বলত, মেসোকে বলত, কী গো তোমরা! ভারী ঘরকুনো, চলো এক বার কলকাতা যাই। মাসি-মেসো সমস্বরে বলত, সে ভারী দূরের রাস্তা, পথের কষ্ট খুব, একগাদা টাকা খরচ, তা সেখানে গিয়েই বা হবে কী? যা ভিড়, গণ্ডগোল, মারপিট—আমাদের মতো সুন্দর নিরিবিলি শহর নাকি সেটা? চোর পকেটমার, রকবাজ ছেলে, রাজনীতি—দূর দূর—

যাওয়া হত না। হত না বলেই হাসির কল্পনায় কলকাতা ক্রমে ক্রমে এক বিশাল ব্যাপক রাজত্ব স্থাপন করে। কলকাতায় যেন বা আলাদা সূর্য ওঠে, আলাদা চাঁদ, কলকাতা শূন্যে ভাসমান বুঝি বা। কলকাতাকে ঘিরে যে-সব কল্পনা হাসির—সে-সব কল্পনা কলকাতার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলের মতো তার ভিতরটা তছনছ করে দিয়ে যেত। কলকাতা কল্পনা-লতা তার ওপর দু' চোখের পল্লবের ছায়া ফেলেছিল। কলকাতা বলে বোধহয় কিছু নেই তবে। লোকে কেউ কখনও যায়নি। সবাই মিলে যোগাযোগ করে বানিয়েছে গল্প। যারা কলকাতার কথা জানে তারা, নিজেদের মধ্যে চোখ-টেপাটেপি করে, কানাকানি করে, যুক্তি করে, হাসিকে এক কাল্পনিক শহরের কথা শোনায়। কলকাতার খণ্ডিত ছবি সে অনেক দেখেছে ভূগোলের বইতে, খবরের কাগজে, ক্যালেন্ডারে। কখনও জি-পি-ও-র ঘড়ি, হাওড়া ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া, মনুমেন্ট, তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না। ক্রমে সে বুঝতে পারে, কলকাতার দৃশ্য নয়, রাস্তা-ঘাট আলো নয়; নয় তার দোকান-পাট কিংবা বিচিত্র পসরা—এ-সবের অতীত, কিংবা এ-সব মিলিয়ে কলকাতা এক মন্ত্রের মতো। কিংবা কলকাতা কি জ্বলন্ত পুরুষ তার বুকে রহস্যের শেষ নেই, সীমাহীন তার নিষ্ঠুর উদাসীনতা, চুম্বকের মতো তার আকর্ষণ! দূরদূরান্ত থেকে, প্রেমিকারা চলেছে কলকাতার দিকে! কেবলই চলেছে!

কলকাতা এক প্রেমিকেরই নাম। জ্বলন্ত দুর্বার এক প্রেমিক পুরুষ। কলকাতায় এক বার গেলে আমি আর ফিরব না, ভাবত হাসি।

হাসি লেখাপড়া শিখত কলকাতায় যাবে বলে। গান শিখত, নাচ শিখত—কলকাতায় যেতে হলে কোনটা যে দরকার হবে, কোনটার সূত্রে কলকাতায় যাওয়া হবে তা বুঝতে পারত না। কিন্তু হাস্যকর হলেও এ-কথা খুবই সত্য যে তার সবকিছুর পিছনেই ছিল কলকাতা, কলকাতা। বিয়ের সম্বন্ধ মাসিই খুঁজছিল। হাসি একদিন খুব লজ্জার সঙ্গে তাকে বলে, যদি বিয়ে দাও তো কলকাতায় দিয়ো। মাসি অরাজি ছিল না। কিন্তু অত দূরের পাল্লায় ঠিকমতো যোগাযোগ কে করে!

সেই সময়ে ডিগবয়ের তেল কোম্পানির এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে চমৎকার সম্বন্ধ এসে গেল হাসির। বিলেত-ফেরত ছেলে, বেশ স্মার্ট চেহারা, দেড়-দুই হাজার মাইনে। হাসিকে পাত্রপক্ষ পছন্দও করে গেল। মণিপুরি নাচে, রবীন্দ্রসংগীতে শিলচরে তখন হাসির বেশ নাম। রং চাপা হলেও বড় সুশ্রী ছিল হাসি। সবাই জানত হাসির ভালই বিয়ে হবে। হয়েও যাচ্ছিল। পাত্রের ঠাকুমা মারা গিয়েছিল মাস আষ্টেক আগে, চার মাস পর কালাশৌচ কাটবে। তখন অস্থি বিসর্জন দিয়ে বিয়ে হবে—ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেল পাটিপত্র। এমনকী আশীর্বাদের ব্যাপারে কালাশৌচ ওঁরা মানেননি। হাতে তখন চার মাস সময়। মাসির অ্যালবামে পাত্রের ফোটো সাঁটা হয়ে গেছে, পাশে হাসির ফোটো। মাসি মাঝে মাঝে হাসিকে অ্যালবামের সেই পাতাটা খুলে দেখাত— দ্যাখ হাসি!

হাসির মন বলত, কলকাতা, কলকাতা। বহু দূরে এক বিশাল পর্বতের মতো মহিমান পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিককে কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে টানছে চুম্বক পাহাড়ের মতো। সেখানে গেলে ফিরত না হাসি। যাওয়া হবে না কি!

কাছাড়ের এক লোকনাট্য দল সেবার কলকাতায় যাচ্ছে। তারা হাসিকে দলে নিতে রাজি। হাসি মাসিকে গিয়ে ধরল, এখনও চার মাস বাকি। এক বার ঘুরে আসি মাসি। মাত্র তো পনেরোটা দিন।

বিয়ের আগে কলকাতায় গিয়ে নাচবি-গাইবি, সেটা কি ভাল দেখাবে? পাত্রপক্ষ যদি কিছু মনে করে!

হাসি হাসে, কলকাতার জলে রং ফরসা হয়, জানো না?

অনেক বলা-কওয়ায় মাসি রাজি হল।

কলকাতা কীরকম দেখতে, তা আজও হাসি সঠিক জানে না। প্রথম দিনের মতোই। বহু দূর থেকে একটা যৌবনকালের প্রতীক্ষা নিয়ে সে যখন কলকাতায় নামল তখন আর রাস্তার কষ্টের কথা মনেও ছিল না, খুব পিপাসা পেয়েছিল, বিবেকানন্দ ব্রিজ পেরিয়ে আসার সময়ে যে গুমগুম আওয়াজ করেছিল রেলগাড়ি, সেই আওয়াজ শিয়ালদা পর্যন্ত তার বুকের ভিতরে কলকাতার শব্দতরঙ্গ তুলেছিল। শিয়ালদার ঘিঞ্জি কলকাতা সে তো চোখে দেখেনি। শুভদৃষ্টির সময়ে কেউ কি বরের মুখ ঠিকঠাক দেখতে পায়, নির্লজ্জ ছাড়া? সে গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে পা দিতেই এক দুরন্ত পুরুষের প্রকাণ্ড উষ্ণ বুকের মধ্যে চলে এল। গর্জমান এক কামুক পুরুষ যার শিরা-উপশিরায় প্রাণস্রোত, যার আদরে অবহেলায় সর্বক্ষণ জীবন বয়ে যাচ্ছে। সেই প্রথম পুরুষটির আদরে লজ্জায় চোখ বুজেছিল বুঝি হাসি। চোখ আর খোলা হল না। কলকাতা তার চার দিকে সর্বক্ষণ এক শিশু বয়সের বিস্তৃত রঙিন মেলার মতো কাল্পনিক হয়ে রইল।

জ্যাঠতুতো দিদির বাড়িতে উঠেছিল হাসি, চিৎপুরের এক ফ্ল্যাটবাড়িতে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে সে একদিন লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানও করল। কিন্তু সারাক্ষণ সে কেবলই তার শিরায় শিরায় উল্লসিত রক্তের স্পন্দনে কলকাতার শব্দ শুনল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে টের পেল তার যুবতী বুক কলকাতার পাথুরে বুকের সঙ্গে মিশে আছে। একের হৃদ্‌স্পন্দন মিশে যাচ্ছে আর একজনের সঙ্গে। আমি তোমাকে ছেড়ে কী করে আবার ফিরে যাব—মনে মনে বলত হাসি।

পাশের ফ্ল্যাটে এক দম্পতি ছিলেন, আর ছিল অমিয়। দম্পতি অমিয়রই দিদি-জামাইবাবু। এ

ফ্ল্যাটে হাসিরও দিদি-জামাইবাবু। দুই পরিবারে যাতায়াত ছিল। সামনের বারান্দাটা কমন। সেইখানে দাঁড়িয়ে কলকাতা দেখতে দেখতে হাসি কত দিন দেখেছে পাশের ফ্ল্যাট থেকে সুন্দর পোশাক পরে অমিয় বেরোচ্ছে, নীচে রাস্তায় রাখা তার স্কুটার। স্কুটারে চলে যেত ছেলেটা, যাওয়ার আগে তাকে লক্ষ করত। কিন্তু অমিয়কে কেন লক্ষ করবে হাসি? কলকাতার প্রেমিকা কেন গ্রাহ্য করবে অন্য পুরুষকে?

দুই পক্ষের দিদি-জামাইবাবুরা প্রায় রাতেই খাওয়ার পর কিছুক্ষণ ফিশ খেলার আসর বসাতেন। হাসি থাকত, অমিয়ও। দু'পক্ষের কথাবার্তা মাঝে মাঝে হাসি আর অমিয়কে ঘেঁষে যেত। সে-সব ঠাট্টার গুরুত্ব ছিল না। হাসির দিদি-জামাইবাবু জানতেন হাসির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে।

হাসি অমিয়কে তেমন করে লক্ষ করত না ঠিকই, কিন্তু তার মন বলত—কলকাতা, কলকাতা।

অমিয় খুব বেশিমাত্রায় লক্ষ করেছিল হাসিকে। কতটা তা হাসি টের পায়নি। কিন্তু একদিন অমিয় খুব দুঃসাহসের সঙ্গে প্রস্তাব করেছিল, চলুন, আমার স্কুটারে আপনাকে কলকাতা দেখিয়ে আনি। প্রথমদিন হাসি রাজি হয়নি। কিন্তু কয়েক দিন পরে হয়েছিল। কলকাতার মেয়াদ তখন শেষ হয়ে এসেছে। কয়েক দিন পরই হাসি চলে যাবে।

মসৃণ, সুন্দর ক্যাথিড্রাল রোড হয়ে ময়দানের দিকে স্কুটার ছুটিয়ে অমিয় প্রস্তাব দিয়েছিল, যদি কিছু মনে না করেন—

কলকাতা—কেবলমাত্র কলকাতার জন্য হাসি থেকে গেল। কয়েকটা কাগজপত্রে সই করে বিয়ে, বাড়িতে চিঠি লিখে ব্যাপারটা জানানো, তারপরই ঢাকুরিয়ার ফ্ল্যাট।

হাসির মন বলত—কলকাতা, কলকাতা!

হাসির জীবনে অমিয় কোথাও ছিল না। যৌবনকালে একশো ছেলে ভালবেসেছে হাসিকে। শিলচর জুড়ে ছিল তার প্রেমিকেরা। তাদের মধ্যে ছিল আসামের রঞ্জি ট্রফির ক্রিকেট খেলোয়াড়, কবি, অধ্যাপক, ছাত্রনেতা, ভবঘুরে। তাদের অনেকের সঙ্গে হাসির দীর্ঘকালের সম্পর্ক। কোথায় ছিল অমিয়! পাত্র হিসেবেও অমিয় তো কিছুই না। সদ্য ব্যবসা শুরু করেছে! কয়েকটা অর্ডারে লাভ পেয়ে কিনেছে স্কুটার, দু' হাতে টাকা ওড়ায়, পোশাক কেনে। সেই অমিয় হাসির জীবনে এসে গেল! এসে গেল, আবার এলও না। সারা দিন টাটা-বিড়লা হওয়ার আশায় সারা কলকাতা দৌড়ঝাঁপ করে যখন অমিয় ফিরত, তখন সদর খুলে অমিয়কে দেখে একটু অবাক হয়ে এক পলকের জন্য হাসি ভাবত—আরে এ লোকটা কে? স্বামী? তার মনে পড়ত, সারা দিন সে অমিয়র কথা ভাবেইনি!

শরীরে শরীরে কথা হত ঠিকই। অমিয়র প্রথম দিকের ভালবাসা ছিল তীব্র, শরীরময়, আক্রমণাত্মক। হাসি সেই খেলায় আগ্রহভরে অংশ নিয়েছে। কিন্তু সে কতটুকু সময়ের ভালবাসা? শরীর জুড়োলেই তা ফুরোয়। তারপর আর আগ্রহ থাকে না অচেনা পুরুষটির প্রতি। হাসি তখন থেকে নিষ্ঠুর।

চিৎপুরের দিদি-জামাইবাবু এসে বলতেন, হাসি, তোমার বাবা-মা আমাদের দোষ দিয়ে চিঠি লিখেছেন, আমবা কী লিখব ওদের?

দোষ! আপনাদের দোষ কী?

দোষ নেই ঠিকই, তুমি ভালবেসে বিয়ে করেছ, কিন্তু আমাদের বাসায় থেকেই তো ব্যাপারটা ঘটল!

ভালবাসা! হাসি ভারী অবাক হত। ভালবাসা কীসের! কাকে! অমিয়কে? অমিয়কে তো সে কোনওকালে ভালবাসেনি। সে ভালবেসেছিল কলকাতাকে। বিশাল কলকাতার কতটুকু প্রতিদ্বন্দ্বী অমিয়? অমিয়কে জানালায় এসে বসা চড়াইপাখির মতো তুচ্ছ মনে হত তার। যার সঙ্গে হাসির বিয়ে ঠিক হয়েছিল, বা তার শিলচরের অন্য প্রেমিকেরা—তাদের তুলনাতেও অমিয় কিছুই না। কিছুই না। অমিয় কেবল কলকাতায় হাসিকে আশ্রয় দিয়েছে।

বিয়ের ছ' মাস পরে মাসি আর মেসোমশাই এসেছিলেন।

এটা কী করলি হাসি? সেই ডিগবয়ের ছেলেটা বিয়েই করল না।

হাসি উত্তর দেয়, আমি যা চেয়েছিলাম, পেয়েছি।

কী চেয়েছিলি?

হাসি মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, কলকাতা।

তিন বছরে ডাকটিকিটটা ভিজে ভিজে আলগা হয়ে এসেছে। খামের গা থেকে এবার সাবধানে তুলে নেবে হাসি, একটা চৌকো দাগ থেকে যাবে কি? থাক। শরীর বহতা নদীর মতো, শরীরে কোনও চিহ্ন থাকে না। অমিয়কে শরীরের বেশি দেয়নি হাসি।

সিলিংফ্যানের ঝকঝকে ইস্পাতের রঙের ঘূর্ণি বৃত্তটা দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল হাসি। উঠে দেখল রোদের মুখে বসেছে কালো মেঘ। গুড় গুড় শব্দ হচ্ছে। পুবের বাতাসে পরদা উড়ে আসছে। উদ্ভিদহীন কলকাতায় প্রকৃতির বন্য গন্ধ নিয়ে আসে বৃষ্টি।

পাশ ফিরতেই খুব অবাক হয়ে হাসি দেখে, শতরঞ্জির একধারে তার মাথার কাছেই একটা ছোট্ট লালচে ইঁদুর মরে পড়ে আছে। শিশু শরীর ইঁদুরটার, উদোম ন্যাংটো, মুখে নির্দোষ একখানা ভাব, চুপ করে মরে গেছে কখন। আহা রে! এত দূর এসেছিলি কেন? কিছু বলতে চেয়েছিলি আমাকে? লাল টুকটুকে হাত-পা, সুন্দর সতেজ লেজ, রেশমের মতো রোমরাজি, ঠোঁটে গোঁফের নরম সাদাটে চুল। আস্তে আস্তে উঠে বসে হাসি। তার একটু কষ্ট হয়। বিষ সে নিজে মিশিয়েছিল।

উঠে মধুকে ডাকে হাসি, ঘরগুলো খুঁজে দেখ মধু, ইঁদুরগুলো কোথায় কোথায় মরে পড়ে আছে। পচে গন্ধ বেরোবে।

চারটে বেজে গেছে। জামাইবাবুকে একটা ফোন করা দরকার। রিজার্ভেশনটা যদি পাওয়া যায়!

জলে কলকাতার ভঙ্গুর প্রতিবিম্ব পড়েছে, ভেঙে যাচ্ছে। জল হলে এক কলকাতা অনেক কলকাতা হয়ে যায়। ঢাকুরিয়া থেকে বাস ধরে হাসি গড়িয়াহাটায় এসে পেট্রল পাম্প থেকে জামাইবাবুর অফিসে টেলিফোন করে।

জামাইবাবু, আমি হাসি।

বলো।

আমার রিজার্ভেশনের কী হল?

হয়নি। দার্জিলিং মেলে ভীষণ ভিড় হচ্ছে। এখন সামার রাশ।

রেলে যে কে আপনার বন্ধু আছে চেকার?

থাকলেই বা, সিটি বুকিংগুলো দেখে এসো না। তিন দিন ধরে লাইন দিয়ে বসে আছে লোক—কোথায় কত টিকিটের কোটা আছে সব তাদের মুখস্থ, একটা টিকিট কম পড়লে আস্ত রাখবে?

এত লোক যাচ্ছে কোথায়?

কলকাতা থেকে পালাচ্ছে; আবার কলকাতায় পালিয়ে আসবে বলে।

আমার মনে হয়, আপনি গা করছেন না।

তা তো করছিই না।

কেন?

তুমি সুখের পাখি উড়ে যাবে, আর আমরা পড়ে থাকব হাঁফিয়ে ওঠা ভ্যাপসা কলকাতায়—তা কি হয়!

আমার যে যাওয়াটা দরকার।

কেন?

যাব না কেন?

ওপাশে জামাইবাবু একটা শ্বাস ফেলে।
হাসি, গতকাল অমিয় আমার কাছে এসেছিল।
হাসি তীক্ষ্ণ গলায় বলে, কেন?
ভয় পেয়ো না। সে তোমার চলে যাওয়া আটকানোর ষড়যন্ত্র করতে আসেনি।
হাসি চুপ করে থাকে।
ও এসেছিল একটা স্টিমারঘাটের কথা বলতে।
স্টিমারঘাট!
স্টিমারঘাট। ও আজকাল মাঝে মাঝে একটা স্টিমারঘাট দেখতে পায়।
তার মানে?
তার মানে তোমাকেই আমরা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।
স্টিমারঘাটের কথা আমি কী জানি। কোথাকার স্টিমারঘাট?
তার আগে বলো, ওর ব্যবসার অবস্থা কী?
হাসি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, বোধহয় ভাল না। বাজারে অনেক ধার জমে গেছে।
আর এ-সময়ে তুমি সুখের পাখি উড়ে যাচ্ছ?
আমি কী করব জামাইবাবু?
ওপাশে জামাইবাবু আবার চুপ।
আমার রিজার্ভেশনের কী করবেন বলুন? কাছে-পিঠের রাস্তা হলে আমি রিজার্ভেশন ছাড়াই চলে যেতাম। কিন্তু চার দিন ধরে যাওয়া তো সেভাবে সম্ভব না।
দেখছি।
আমার কিন্তু সময় নেই। আর পনেরো দিনের মাথায় খুশির বিয়ে। তারপর ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব। বুঝলেন?
বুঝেছি। কিন্তু অমিয়র স্টিমারঘাটের কী হবে?
আমি কী জানি।
হাসি, অমিয়র ওজন কত?
হাসি হেসে ফেলে। বলে, আমি কি দাঁড়িপাল্লা?
না। কিন্তু বউরা তো স্বামীর ওজন জানে। জানা উচিত।
ফোন রেখে দেব কিন্তু।
আমি ইয়ারকি করছি না। অমিয়কে দেখে মনে হয় অন্তত কুড়ি কেজি ওজন কমে গেছে।
হাসি একটা শ্বাস ফেলে। অমিয় বোধহয় তাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তাতে হাসির কিছু যায় আসে না।
জামাইবাবু, আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করিনি। আমাদের মধ্যে কোনও ভুল-বোঝাবুঝি নেই।
তোমার দিদির সঙ্গে আমার রোজ চার বার করে ঝগড়া হয়, আর ভুল-বোঝাবুঝি? আমরা জীবনে কেউ কাউকে বুঝব না। কিন্তু গত চার মাসেও আমার ওজন দুই কেজি বেড়েছে।
ওজনের কথা বলছি না।
আমি ওজনের পয়েন্টেই স্টিক করতে চাই। হাসি, অমিয়র ওজন কমে যাচ্ছে কেন?
আমার রিজার্ভেশনের কথাটা মনে রাখবেন। ছেড়ে দিচ্ছি—
ছেড়ো না। শোনো, স্টিমারঘাটের কথা ও তোমাকে কখনও বলেনি?
না।
আশ্চর্য!
আশ্চর্যের কী? ও আমাকে অনেক কথাই বলে না।

কিন্তু স্টিমারঘাটের ব্যাপারটা বলা উচিত ছিল।

কেন?

স্টিমারঘাটটা ও খুব স্পষ্ট দেখতে পায়, আর এমনভাবে বলে যে আমিও যেন সেটা দেখতে পাই। শুনতে শুনতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল।

কীরকম স্টিমারঘাট সেটা?

খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি বহু দূর গড়িয়ে নেমে গেছে... কিন্তু ফোনে অতসব বলা যায় না। তুমি ওর কাছে শুনো।

আমি শুনব কেন জামাইবাবু? আমার কৌতূহল নেই।

তুমি আসাম থেকে কবে ফিরবে হাসি?

বললাম তো, খুশির বিয়ে হয়ে গেলেই। ফিরে এসে স্কুলে জয়েন করব।

সেটা তো ফেরা নয়। স্কুলে মানে বাগনানের কাছে যাবে, গ্রামে। কিন্তু তুমি অমিয়র কাছে কবে ফিরবে হাসি?

হাসি উত্তর দেয় না। ফোনটা খুব আস্তে ক্রাডলে নামিয়ে রাখে।

আজ কলকাতা বৃষ্টির পর বড় সুন্দর সেজেছে। সূর্যের শেষ আলো সিঁদুরগোলা রং ঢেলেছে রাস্তায় রাস্তায়। গড়িয়াহাটার বাড়িগুলোর গায়ে সেই অপার্থিব রং। জলে ছায়াছবি। রাস্তাগুলো ভেজা, রাস্তার নিচু অংশে পাতলা জলের স্তর জমে আছে। সেই জল থেকে আলোর অজস্র প্রতিবিম্ব উঠে আসে। একা একা হাঁটতে বড় ভাল লাগছে হাসির। মোড়ের দোকানগুলোর শো-কেসে সে সুন্দর শাড়িগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল একটু। পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল। কী ভিড় চার দিকে! তবু এ ভিড় বড় রঙিন। বাগনান থেকে হয়তো প্রায়ই আসা হবে না, কিন্তু পুরনো ভালবাসার টানে ছুটিছাটায় ঠিক চলে আসবে হাসি, উঠবে চিৎপুরে দিদি-জামাইবাবুর কাছে। একা একা ঘুরবে কলকাতায় যেমন সে গত তিন বছর ধরে ঘুরেছে এবং ক্লান্ত হয়নি। কলকাতার রূপ কখনও ফুরোয় না।

একটা মরা বেড়াল পড়ে আছে বৃষ্টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে। ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামতে বেড়ালটাকে ডিঙিয়ে গেল হাসি। পচা গন্ধ, কাছেই বসে কোনও নেমন্তন্ন-বাড়ির এঁটো-কাটার রাশ খবরের কাগজে জড়ো করে বসেছে এক ভিখিরি মেয়ে তার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। হাসি ট্রামলাইন পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। তার মন বলে, আজও বলে—কলকাতা, কলকাতা।

চলে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল অমিয়, ঠিক সে সময়ে নিঃশব্দ পায়ে কালীচরণ এল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ হয়নি। অমিয় একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

চলে যাচ্ছিলেন? কালীচরণ জিজ্ঞেস করে। তার মুখে ঘাম, উৎকণ্ঠা।

হুঁ।

আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।

অমিয় চুপ করে থাকে।

গত দু' মাস কিছু চাইনি। জানতাম আপনি অসুবিধেয় আছেন। কিন্তু এখন আমার বড় ঠেকা। পেমেন্টের একটা তারিখ দিন এবার।

অমিয় জিজ্ঞেস করে, সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ হয়নি কেন কালীচরণ?

কালীচরণ একটু থমকে যায়। চেয়ে থাকে। অমিয় হাত বাড়িয়ে ওর ঘেমো হাতখানা ছুঁয়ে বলে, কাঠের সিঁড়িটা বড় পুরনো হয়েছে, বেড়াল বাইলেও শব্দ হয়। তুমি কী করে শব্দ না করে উঠলে? তুমি বেঁচে আছ তো! ভূত হয়ে আসোনি তো কালীচরণ? কিংবা পাখায় ভর করে?

কালীচরণ একটু হেসে একটা ময়লা রুমালে মুখ মোছে। তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। হার্ডওয়ার বাজার যদিও কালীচরণের পায়ের তলায়, কিন্তু তবু বাইরের চেহারায় সে ভদ্রলোক

থাকেনি। ময়লা মোটা ধুতি, গায়ে লংক্লথের হাফ-হাতা জামা, পায়ে টায়ারের চটি।

বাগচীবাবু, আমার মেয়ের বিয়ে। তিন হাজার যদি আপনার কাছে আটকে থাকে তো আমি গরিব, কী দিয়ে কী করব?

অমিয় একটু চুপ করে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে, দুটো সরকারি অর্ডার আছে কালীচরণ, পনেরো হাজার টাকার। করবে?

আপনি পেয়েছেন?

অমিয় মাথা নাড়ে, আমারই। কিন্তু আমি করব না। তুমি করো তো তোমাকেই ছেড়ে দিই।

কালীচরণ সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনি কত পার্সেন্ট নেবেন?

এক পয়সাও না। শুধু পেমেন্টের জন্য আমাকে একটু সময় দাও।

অর্ডার দেখি, বলে কালীচরণ হাত বাড়ায়।

অমিয় অর্ডারের কাগজপত্র বার করে দেয়।

কালীচরণ কয়েক পলক অর্ডারের কাগজপত্র দেখে বলে, মাত্র আট পার্সেন্ট উঁচু দর দিয়েছেন! তাও হচ্ছে একমাস-দেড়মাস আগেকার দর। গত এক মাসে মেশিন পার্টস, কয়েল আর স্প্রিংয়ের দর দশ থেকে কুড়ি পার্সেন্ট বেড়েছে। পনেরো হাজার টাকার অর্ডার, অফিসার আর বিল ডিপার্টমেন্টকে খাইয়ে হাজারখানেকও ঘরে তোলা যাবে না। পরিশ্রম পোষায়?

তুমি করবে না?

কালীচরণ একটু হাসে, করব না কেন? ব্যবসা চালু রাখতে হলে কাজ ধরতেই হবে, লোকসান হলেও।

গায়ের জামা খুলে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে রজত টেবিলের উপর শুয়ে ছিল। তার রায়চৌধুরী এখনও আসেনি। শুয়ে থেকেই মুখ ফিরিয়ে বলল, কালীচরণ, বাগচীর জায়গায় আমি হলে অর্ডার দু'টো কেড়ে নিয়ে তোমাকে ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম।

কেন?

সরকারি অর্ডারের জন্য হাজারটা লোক হন্যে হয়ে ঘুরছে। তুমি ভদ্রলোক হলে লোকসানের কথা বলতে না। পনেরো হাজারে তোমার অন্তত ছ' হাজার মার্জিন থাকবে।

কালীচরণ বিড়বিড় করে বলে, দেনা-পাওনার কথা উঠলেই সব জায়গায় খিচাং—

রজত ধমক দিয়ে বলে, দেনা-পাওনা আবার কী। বাগচীর তিন হাজার ওই অর্ডারে শোধ হয়ে গেল। আর এসো না।

তার মানে? তিন হাজার টাকা আমি এখনও পাই—

না পাও না। তোমাকে সেনগুপ্ত এনেছিল, তার আমলে তুমি সাপ্লায়ার ছিলে। পারো তো তাকে খুঁজে বের করো।

তাকে পাব কোথায়?

বাগচী তার কী জানে কালীচরণ? ছোট কোম্পানি, আট-দশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল, আর লায়াবিলিটি সব রেখে গেল—এটা কি মগের মুল্লুক?

আমি তার কী জানি।

তোমাদের সঙ্গে সেনগুপ্তর সাট আছে, আমি জানি! সে-ই তোমাদের পাঠাচ্ছে তাগাদায়। যাতে বাগচী বিপদে পড়ে। বাগচী ভাল লোক কালীচরণ, দেনা সে সব মেনে নিচ্ছে, সরকারি অর্ডার বিলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু মনে রেখো গড়বড় করলে ঝামেলা হবে।

কালীচরণ চুপ করে থাকে।

রজত হাই তুলে বলে, সকলের দিন সমান যায় না। বাগচী তোমাদের অনেক বিজনেস দিয়েছে। এখন বেরোও—

কেউ তার হয়ে বোঝাপড়া করুক, কিংবা তাকে করুণা করুক, এটা আজও পছন্দ করে না অমিয়। সেইটুকু অহংকার তার এখনও আছে। তবু সে কিছুই বলে না। চেয়ে থাকে।

দুর্বল চোখে একটু চেয়ে থেকে কালীচরণ উঠে পড়ে।

শ্লথ ভঙ্গিতে টেবিল থেকে রজত তার চেয়ারে নেমে বসে। অলস ভঙ্গীতে বুশশার্টটা চেয়ারের পিঠ থেকে খুলে নিয়ে গলায় দিতে দিতে অমিয়র দিকে তাকায়। চোখে ভর্ৎসনা।

কেমন লজ্জা করে অমিয়র। চোখ সরিয়ে নেয়। অর্ডার দু'টো রাখবার জন্য তাকে অনেক বার কল্যাণ বলেছিল। তিন-চার মাস কোনও অর্ডার পায়নি অমিয়, এই দু'টো পাওয়াতে দিন সাতেক আগে তারা তিনজন অফিসঘরে একটা ছোট উৎসব করেছিল। সবীর থেকে রেজালা আর তন্দুরি রুটি এনেছিল, আর কে সি দাসের সন্দেশ। কল্যাণ মুখার্জি, রজত সেন আর অমিয় বাগচী—তারা কেউ কারও বন্ধু নয়। একটা ঘরে তিনটে টেবিলে তাদের তিনটে আলাদা কোম্পানি। যে যার ব্যবসার ধান্দায় ঘোরে। রোজ দেখাও হয় না। কিংবা খুব কম সময়ের জন্য দেখা হয়। তবু কী করে যেন তাদের মধ্যে বুনো মোষের মতো পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা এসে গেছে। তারা কেউ কখনও তিনটে কোম্পানিকে এক করার কথা বলেনি। তারা বন্ধুও নয়, তা হলে কী? তা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু বাগচীর কিছু হলে আপনা থেকেই রুখে দাঁড়ায় মুখার্জি আর সেন, যেমন সেনের কিছু হলে রুখে ওঠে বাগচী আর মুখার্জি। বোধহয় এই ঘরটাই তাদের এই সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে।

সেনের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অমিয় মাথা নিচু করে ছিল।

রজত ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা ছুড়ে দেয় অমিয়র টেবিলে। বলে, আপনার ঠোঁটে সন্দেশের গুঁড়ো লেগে আছে বাগচী, মুছে নিন।

অমিয় একটু হাসে। সহজ হতে চেষ্টা করে। বলে, আমার দ্বারা সাপ্লাইটা হত না সেন।

রজত ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে, গত তিন মাস আপনি বিজনেস পাননি বাগচী। এই অর্ডারটা ছাড়তে আপনাকে আমরা বারণ করেছিলাম।

আমি পারতাম না।

আমরা চালিয়ে দিতাম।। আফটার অল উই আর কমরেডস।

রজত ওঠে। তার ডেস্ক, আলমারি বন্ধ করতে করতে হঠাৎ একটু হেসে বলে, জার্মানি থেকে আপনাকে কী পাঠাব বলুন তো! ঘড়ি? শেভার? না কি কলম? তার চেয়ে জব ভাউচার একটা পাঠিয়ে দেব বরং—কী বলেন?

রজত নিজেই হাসে, কিন্তু মিসেসকে রেখে আপনি তো যাবেন না। গিয়েও শান্তি পাবেন না। ম্যাবেডদের ওই এক বিপদ।

সে-কথার উত্তর না দিয়ে অমিয় তার গভীর অন্যমনস্ক মুখ তুলে বলে, সেন, লক্ষ করেছেন কালীচরণের পায়ের কোনও শব্দ হয় না!

কী বলছেন? রজত ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে।

বলছি, যাদের পায়ের শব্দ হয় না তারা খুব ডেঞ্জারাস। সেনগুপ্তরও হত না।

সেনগুপ্তর উল্লেখে রজতের মুখটা ঝুলে পড়ে। চাপা গলায় সে বলে, বাস্টার্ড। আপনাকে কি সেনগুপ্ত হিপনোটাইজ করেছিল বাগচী? কী করে তবে সে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকা তুলে নিল, আদায় করে নিল চার-চারটে বিল-পেমেন্ট, সমস্ত লায়াবিলিটি কী করে আপনার ঘাড়ে ফেলে গেল?

অমিয় এক বার হাত উলটে তার অসহায়তা প্রকাশ করে মাত্র। কথা বলে না। হতাশ গলায় রজত বলে, ব্যবসা আপনার কর্ম নয় বাগচী। আপনি ভিতু হয়ে যাচ্ছেন, লোককে দাবড়াতে পারেন না।

সেনগুপ্তর পায়ের কোনও শব্দ হত না— সত্যটা আবিষ্কার করে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে

অমিয়। কালো ছিপছিপে সুপুরুষ এবং হিংস্র সেনগুপ্ত ছিল বার্ড কোম্পানির চাকরে। চাকরি নামে মাত্র, সে ছিল কোম্পানির টিমের নামকরা গোলকিপার। খেলার জন্যই চাকরি পেয়েছিল। পোস্ট থেকে পোস্টে উড়ে শট আটকাত, বহুবার পেনাল্টি ধরেছে। অবধারিত একটা লিফট পেত, কিন্তু সেবার হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে পড়ে রইল ছ' মাস। উন্নতির আর আশা নেই দেখে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করতে এল অমিয়র সঙ্গে।

তখন অমিয় মারাত্মক পোশাক পরত, দারুণ হাসত, পিচের রাস্তার মতো গড়গড়ে ইংরেজি বলত। সাপের মতো সাবলীল ছিল তার নড়াচড়া, ক্রূর চোখ, ঘন ভ্রূ। সেনগুপ্ত তার দিকে সম্মোহিতের মতো চেয়ে থাকত। একটা সময় ছিল তখন সেনগুপ্তর মতো বিপজ্জনক ছেলেকে নিপুণভাবে চালাত অমিয়। তখন সাপ্লায়ারেরা সাবধানে মাল দিত, ছ' মাস ন' মাস তাগাদা করত না। অর্ডার আসত ঝাঁকে ঝাঁকে। চোখা, চালাক, সাহসী অমিয় হিংস্র মারকুট্টা সেনগুপ্তকে ব্যবহার করত ব্যবসার ডেকর হিসেবে, কখনও তাকে বানাত দেহরক্ষী, কখনও তাকে আউটডোরে ঘুরিয়ে আনত সেলসম্যান হিসেবে! সেনগুপ্তকে তৈরি করেছিল সে-ই। তারপর কবে থেকে—কবে থেকে যেন—বহু দূরের এক অচেনা নির্জন ফেরিঘাট জাহাজের মতো ধীরে অমিয়র কাছাকাছি চলে আসতে থাকে। তখন থেকেই সে মাঝে মাঝে সেনগুপ্তর দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে চমকে উঠত। সে দেখতে পেত, তার সামনে স্বাভাবিক পোশাক পরা সেনগুপ্ত নয়, সেনগুপ্তর পরনে কালো শর্টস, লাল টকটকে গেঞ্জি, দস্তানা পরা দু'টো হাত থাবার মতো উদ্যত হয়ে আছে, মাথায় টুপি, টুপির ছায়ায় দু'টো আলপিনের মতো চোখ, ফণা তুলে দুলছে এক হিংস্র গোলকিপার, অমিয়র সব রাস্তা বন্ধ করে সে দাঁড়িয়ে।

মানুষের পতনের কোনও শব্দ হয় না। তবু আশপাশের কিছু লোক ঠিক কেমন করে টের পায়, এ লোকটার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কোনও দিন দীর্ঘ টেন্ডার টাইপ্ করতে করতে হঠাৎ চোখ তুলে সেনগুপ্ত হয়তো দেখেছিল, অমিয় ভীত চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। কিংবা হয়তো কোনও দিন অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করে দু'জনে বেরোনোর সময় অন্ধকার সিঁড়িতে সেনগুপ্তর আগে আগে নামতে দ্বিধা করেছে। কিংবা এ-রকমই কোনও তুচ্ছ কিছু লক্ষণ দেখেছিল সেনগুপ্ত। বুঝেছিল ব্যবসাতে অমিয়র দিন শেষ, তার শুরু। বুঝেছিল সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা। বুঝেছিল আরও অনেকে। সবার শেষে বুঝেছে অমিয়। স্পষ্টই নিজের ভেতরে সে এখন এক দিনাবসান টের পায়, প্রত্যক্ষ করে সূর্যাস্ত। বহু দূর থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে এক নির্জন ফেরিঘাট আর জেটি, তার অতলান্ত জল। অমিয় মুখ তোলে, কিছু বলছেন সেন?

একটা মেয়েকে কী করে রিফিউজ করতে হয় বাগচী? আমি কোনও ল্যাঙ্গুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। না কি জার্মানিতে গিয়ে চিঠি দেব?

অমিয় একটু হাসে, ল্যাঙ্গুয়েজের দরকার হয় না সেন। রিফিউজাল মনে থাকলেও লোকে ঠিক বুঝে নেয়। ডোন্ট বদার।

মাইরি! তা হলে বেঁচে যাই।

অমিয় হাসে।

চলি বাগচী। সিগারেটের প্যাকেটটা আপনি রেখে দিন। যদি রায়চৌধুরী আমার মোটর পার্টস নিয়ে আসে তবে আমার হয়ে ওর পাছায় তিনটে লাথি কষবেন, তিনটে—ভুলবেন না—

অমিয় অনেকক্ষণ বসে থাকে। অফিসঘরটা অন্ধকার হয়ে আসে। অমিয় আলো জ্বালে না। রাস্তার নানা আলোর ছায়াছবি এসে সিলিংয়ে কাঁপতে থাকে, দেয়ালে চমকায়। কাকের পাখার মতো অবসাদ নেমে আসে অমিয়র শরীর জুড়ে।

বাড়ির দেয়ালের কোনও গোপন কোণে হঠাৎ উঁকি দেয় এক অশ্বত্থ চারা। কেউ লক্ষ করে না। কলকাতায় শ্যাওলা জমে, দেয়ালের চাপড়া খসে পড়ে। কেউ লক্ষ করে না। কিন্তু ওইভাবেই

অলক্ষিতে শুরু হয় একটা বাড়ির ক্ষয়। অমিয় নিজের ভিতরে সেই অশ্বত্থের গোপন চারাটিকে খুঁজছে। অনুসন্ধান করছে। শ্যাওলা জমল কোথায়, কোথায়ই বা খসে পড়ছে চাপড়া। খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু এ তো ঠিকই যে, সে সেনগুপ্তকে ভয় পেতে শুরু করেছিল একদিন। অথচ ভয়ের তেমন কারণ ছিল না। গোলকিপারের পোশাক বহুকাল আগেই ছেড়ে ফেলেছিল সেনগুপ্ত, খুলে রেখেছিল দস্তানা, ক্রমে হয়ে আসছিল অমিয়র বশংবদ। সাপুড়ে কবে আবার তার ঝাঁপির সাপকে ভয় পেয়েছে?

কিন্তু এর জন্য তো সেনগুপ্ত দায়ী নয়।

সারা কলকাতা দৌড়-ঝাঁপ করত অমিয়, আর তার স্কুটার। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির সামনে থেকে ভারী স্কুটারটা অবলীলায় টেনে তুলত সিঁড়ির তলায়, শিস দিয়ে সিঁড়ি ভাঙত অমিয়। ভাবত দরজা বন্ধ করেই সে এক সুন্দর জগতে চলে যাবে। কিন্তু প্রায়দিনই সে অর্গলহীন দরজা ঠেলে এক আবছা অন্ধকার ঘরে ঢুকত। পরিত্যক্ত বাড়ির মতো ঘর। দেখত, হাসি তার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেই। হয়তো শুয়ে আছে, কিংবা দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। মুখোমুখি হতে হাসির চোখে সে বিস্ময় দেখতে পেত। কোনও দিন বা দেখত, হাসি ঘরে নেই।

পরস্পর আশ্লিষ্ট রতিক্রিয়ার সময়ে সে কি দেহসংলগ্ন হাসির শীৎকার শোনেনি? অনুভব করেনি তার শিহরন, বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা? লক্ষ করেনি মুখমণ্ডলে মুক্তোর মতো স্বেদবিন্দু? করেছিল। হাসির শরীরে অর্গলহীন দরজা খুলে ফেলে অমিয় দেখেছে, সেখানেও এক আবছা অন্ধকার ঘর—পরিত্যক্ত ঘরের মতো নিরিবিলি—সেখানে হাসি সাজেগোজে চুল বাঁধে, আয়নায় দেখে মুখ, প্রতীক্ষা করে—অমিয় সেই ঘরে ঢুকলে হাসি যেন অবাক মুখ তুলে নীরব প্রশ্ন করে, তুমি কে?

মারাত্মক ঘটনা ঘটেছিল একদিন। গতবারে। জ্যাঠামশাইয়ের মেয়ে অনুর বিয়েতে যাবে তারা। সে আর হাসি। ধুতি-পাঞ্জাবি কোনও দিনই পরে না অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবিতে কোনও দিন অমিয়কে দেখেনি হাসি। বিয়েতে যাওয়ার সময়ে অমিয় সেদিন ওয়ার্ডরোব খুঁজে হাঁটকে বের করেছিল পাঞ্জাবি আর ধুতি। বহু যত্নে পরিশ্রমে ধুতির কোঁচা কুঁচিয়েছিল সে। অন্য ঘরে তখন হাসি সাজগোজ শেষ করে সবশেষে তার বেনারসি পরছে। হাসি বেরিয়ে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা অমিয়কে দেখে ভ্রূ ওপরে তুলে হেসে ফেলবে, বলবে, ওমা, তোমাকে যে চেনা যাচ্ছে না। এ-রকমই হবে বলে ভেবেছিল অমিয়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এ-ঘরে, ও-ঘরের দরজার দিকে মুখ, মুখে অপ্রতিভ হাসি। হাসি বেরিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু একটুও অবাক হয়নি। ঘড়ি দেখে কেবল বলেছিল, বড় দেরি হয়ে গেল, বর এসে গেছে বোধহয়—তোমার হল? একসঙ্গে তারা বেরোল, ট্যাক্সিতে উঠল, গেল বিয়েবাড়ি। সেখানে অমিয়কে পরিবেশন করতে হয়েছিল, বরযাত্রীদের তদারকও। দৌড়-ঝাঁপে পাঞ্জাবির ভাঁজ গেল নষ্ট হয়ে, ধুতি গেল দুমড়ে-মুচড়ে, ঝোল-তেলের দাগ ধরল তাতে। ফেরার সময়ে আবার ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে আসছিল তারা। অমিয়র মুখে বিকেলের প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাসির সামনে দাঁড়ানোর সেই অপ্রতিভ হাসিটি কখন বিষণ্ণ ক্লান্তিতে ডুবে গেছে। শরীরের ঘামে, ঝোলে, তেলে ন্যাকড়া হয়ে গেছে তার পোশাক। হাসি তবু লক্ষ করেনি। ট্যাক্সিতে হাসির খোঁপা থেকে বেলফুলের মালার গন্ধ আসছিল, আর প্রসাধনের সুবাস, গয়নার টুং-টাং শব্দ। অভিজাত মহিলাকে ভিখিরি যেমন দেখে, তেমনই হাসির দিকে ভয়ে ভয়ে এক বার চেয়েছিল অমিয়। বলেছিল, হাসি, আমি আজ অন্য পোশাক পরেছিলাম। তুমি দেখোনি।

হাসি চমকে বলল, কই?

অমিয় হাসল, দেখছ না?

হাসি ভ্রূ কুঁচকে বলল, নতুন পোশাক কোথায়, এ তো ধুতি আর পাঞ্জাবি, তুমি তো প্রায়ই পরো।

পরি! কবে পরেছি?

পরোনি? হাসি একটু ভেবেটেবে বলে, গতবার মিঠুর কাকার শ্রাদ্ধের সময়ে পরেছিলে না?

না। অফিস থেকে এসেই তো তোমাকে নিয়ে বেরোলাম, পোশাক পালটানোর সময় ছিল না।

তা হলে বোধহয় জামাইবাবুদের ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে।

না।

তবে নিশ্চয়ই দীপালির বিয়ের সময়ে—

তাও নয় হাসি।

কী জানি! আমার তো মনে হচ্ছে তুমি পরেছ, আমি দেখেছি।

না হাসি, তুমি দেখনি।

হাসি একটু হাসল, তারপর বলল, দেখি, কেমন দেখাচ্ছে। বাঃ বেশ তো, একদম নতুন মানুষ! তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না!

শুনে কেমন একটু ভয় এসে ধরেছিল অমিয়কে।

এইসব তুচ্ছ ঘটনা থেকেই কি মানুষের ভয় জন্ম নেয়! মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ভয়! গুরুত্ব না পাওয়ার ভয়!

গির অরণ্যে এক বার সিংহ দেখতে গিয়েছিল অমিয়। বহুকাল আগে। দেখেছিল পিঙ্গল জটার মাঝখানে রাজকীয় গম্ভীর মুখ সিংহ বসে আছে, তার চার দিকে কয়েকটা সিংহী ঘুরঘুর করে কাছে আসছে, গা শুঁকছে, গরগর শব্দ করে জানাচ্ছে তাদের প্রেম। পিঙ্গল জটার সিংহ গ্রাহ্যই করছে না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ, উদাসী, নির্মম সিংহকে দেখেছিল অমিয়, দেখেছিল তার ভয়ংকর পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, নিষ্ঠুরতা। বারে বারে তার পায়ের কাছে মাথা নত করে দিচ্ছে প্রেমিকরা, সে ফিরেও দেখছে না।

সেই সিংহটির কথা ভাবলে নিজের তুচ্ছতাকে বুঝতে পারে অমিয়, আজ। সে স্কুটারের পিছনে হাসিকে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ক্যাথিড্রাল রোডে, উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে বের করেছিল, মিষ্টি মোলায়েম কয়েকটা কথা মনে মনে তৈরি করেছিল আগে থেকে। বিয়ের পর সে কত খুশি করতে চেয়েছে হাসিকে, নিজেকে বারবার নানা পোশাকে সাজিয়ে ডামির মতো দাঁড়িয়েছে হাসির সামনে। হাসি তাকে ভালবাসেনি।

গিরের প্রায়ান্ধকার অরণ্যে একটা সিংহকে প্রায়ই ভাবে অমিয়। সেই সিংহকে কেউ নারীপ্রেম শেখায়নি। প্রকৃতিদত্ত পুরুষকার বলে সে উদাসী নির্মম! মানুষেরাও কি নয় সেই সিংহের মতো! পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, পিঙ্গল কেশর-ঘেরা মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—পুরুষ এ-রকমই ছিল বহুকাল থেকে। কে তাকে শেখাল নারীপ্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রেমভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা!

বলতে গেলে তখন থেকেই অমিয়র পতনের শুরু, যখন সে হাসির কাছে ক্যাথিড্রাল রোডে, ময়দানের সুন্দর বাতাসে স্কুটারে ভেসে যেতে যেতে ভিক্ষা চেয়েছিল হাসিকে। তখনই তার পতনের, ক্ষয়ের প্রথম অশ্বত্থ চারাটি উঁকি দিয়েছিল অলক্ষ্যে।

সেই পতনের প্রথম চিহ্ন ছিল এই, সে সারা দিন হাসির কথা ভাবত। নির্বিকার হাসির কথা, তার নিষ্ঠুরতা, উপেক্ষা—ভাবতে ভাবতে তার ঘুম হত না। ডিগবয়ের তেল কোম্পানির বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনিয়ারটির কথা বলত হাসি, বলত তার শিলচরের প্রেমিকদের কথা, তার মণিপুরি নাচের কথা। শুনতে শুনতে ভিতরে ভিতরে উন্মাদ হয়ে যেত অমিয়। কিনে আনত পোশাক প্রসাধন—হাসির মনের মতো সাজত, হাসিকে খুশি করার জন্য সুন্দর কথা ভেবে রাখত সারাদিন, অন্যমনস্ক হাসির কাছে অনর্গল বলত, সে একদিন বড় হবে, খুব বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস ম্যাগনেট। সে হাসির জন্য শাড়ি কিনেছিল, গয়না, চমৎকার সব আসবাব, একটা ফ্রিজও। হাসি কিছুই তেমন আদর করে

নেয়নি। অমিয়কেও না। রাতে শরীরে শরীর মিশিয়ে দিত অমিয়, মিশিয়ে ভাবত—পেয়েছি, পেয়েছি তোমাকে। তারপর মুখের স্বেদবিন্দু মুছে তৃপ্ত হাসি যখন পাশ ফিরে ঘুমোত, তখন উত্তপ্ত মাথায় সারা রাত ছিল অমিয়র জেগে থাকা। নিজের সেই পতন তখনও টের পায়নি অমিয়, তখনও গির অরণ্যে দেখা পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সেই সিংহের ছায়া তার চোখে পড়ত না। সে আধোঘুম থেকে চমকে জেগে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলত তখন, খুব জোরে স্কুটার চালাতে ভয় পেত, তখন থেকেই তার নিজের ভবিষ্যৎ এবং কর্মক্ষমতার ওপর সন্দেহ জন্মাতে থাকে। আর জন্ম নেয় ভয়।

ব্যবসা হচ্ছে তারের ওপর হাঁটা। সবাই লক্ষ রাখে, মানুষ কখন টলছে, পড়ো-পড়ো হচ্ছে, কখন পা ফেলছে না ঠিক জায়গায়। লক্ষ রেখেছিল তার সাপ্লায়াররা, পারচেজাররা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা আর সেনগুপ্ত। সি এম ডি-এর একটা বিল-পেমেন্ট গোপনে আদায় করেছিল সেনগুপ্ত, চেক ক্যাশ করেছিল। অমিয় টের পেয়েছিল দেরিতে। দুর্দান্ত সেনগুপ্তর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল খুব। সেনগুপ্ত তার ক্যাপিটাল তুলে নিয়ে গেল। আর অন্যমনস্ক, দুঃখিত অমিয়র চোখের আড়ালে আদায় করে নিয়ে গেল আরও তিনটে বিল-পেমেন্ট। সেগুলো টের পেতে আবও অনেক দেরি হয়েছিল তার। কলকাতার রাস্তার ভিড়ে আজও সেনগুপ্তকে খুঁজে বেড়ায় অমিয়। কিন্তু দেখা হলে কী করবে তা বুঝতে পারে না। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায়, কালো শর্ট, লাল টুকটুকে গেঞ্জি, দস্তানা পরা দুটি উদ্যত হাত, টুপির ছায়ায় আলপিনের মতো দুটি হিংস্র চোখ—সেনগুপ্ত ফণা তুলে দুলছে। পোস্টে পোস্টে উড়ে যাচ্ছে সেনগুপ্ত, পেনালটি আটকাচ্ছে বেতের মতো শরীর বেঁকিয়ে। আশ্চর্য! সেনগুপ্তর খেলা কোনও দিনই দেখেনি অমিয়, তবু চোখ বুজলেই ওই কাল্পনিক ভয়ংকর দৃশ্যটিই সে দেখতে পায়।

বাইরের লড়াইয়ে যে হারতে থাকে, সে তত ভিতরে ঢুকে কল্পনার দৃশ্য দেখে। কল্পনায় প্রতিশোধ নেয়; কল্পনায় ভয় পায়। হাসির জন্যই কি? কে জানে!

অমিয় আলো জ্বালল না। অন্ধকারেই উঠল। দু'-একটা কাগজ গুছিয়ে রাখল, বন্ধ করল ডেস্ক, চাবি কুড়িয়ে নিল। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ওপর থেকেই বৃষ্টির গন্ধ পায় অমিয়। ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে লাগে।

গাড়ি-বারান্দার তলায়, এক-ভিড় লোক বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে দাঁড়িয়ে আছে। স্কুটারটা ফুটপাথে তুলে রেখেছে আহমদ। স্কুটারটা ছুঁয়ে বাইরের ঝিরঝিরে বৃষ্টি একটুক্ষণ দেখে অমিয়। তারপর স্কুটারটা টেনে বৃষ্টিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। বৃষ্টির ঝরোখার ভিতর দিয়ে তার প্রিয় স্কুটার চলে লঞ্চের মতো জল ভেঙে। অমিয় ভিজতে থাকে। কপালের ঘামের নোনা স্বাদ জলে ভিজে গড়িয়ে এসে স্পর্শ করে তার জিভ। একটা সুন্দর কাচের বাসন ভেঙে ছড়িয়ে পড়লে যেমন দেখায়, বৃষ্টির ভিতর তেমনি শতধা বিদীর্ণ কলকাতার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। চার দিকের কাচের টুকরোর মতো ধারালো, রঙিন, ভঙ্গুর কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

গড়িয়াহাটা পর্যন্ত একটানা চলে এল সে। তারপর খাড়াই ভেঙে স্কুটার উঠতে থাকে গড়িয়াহাটা ব্রিজের ওপর, ধনুকের পিঠের মতো সম্মুখ আড়াল করে উঠে গেছে রাস্তা। স্কুটারের মেশিন গোঙাতে থাকে ভয়ংকর। বরাবর এইটুকু উঠতে ভাল লাগে তার। ঝড় তুলে স্কুটার উঠতে থাকে। ব্রিজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুতে উঠে এলে হঠাৎ দিগ-দিগন্তের বাতাস ঝাপটা মারে এসে, চার দিকে বহু দূরের বিস্তার ডানা মেলে দেয়। সামনে স্বচ্ছন্দ উতরাইয়ের শেষে তার বাসা। বাসায় হাসি।

প্রবল বৃষ্টির ফোঁটা বর্শাফলকের মতো ঝকঝকে হয়ে ছুটে আসে। মুখের চামড়া ফেটে যায়। ব্রিজের সবচেয়ে উঁচু বিন্দুটিতে বাতাস-পাগল বৃষ্টির ফোঁটা খরশান। স্কুটার টাল খায় এখানে। ডান দিকে একটা অন্ধকার মাঠে বিস্ফোরকের মতো বিদ্যুৎ ফেটে পড়ে। এমন বাদলার দিন—এই দিনে হাসির কাছে ফিরে গিয়ে কী হবে অমিয়র?

অমিয় উতরাই ভেঙে নেমে আসে। বড় রাস্তার ওপর ওই দেখা যায় অমিয়র বাসা। দোতলায় আলো জ্বলছে, উড়ছে সবুজ পরদা। বাইরের দিকে একটা ঝুল-বারান্দা। অমিয় একপলক তাকায়। তারপর অচেনা বাড়ির দিকে চেয়ে যেমন চলে যায় রাস্তার লোক, তেমনিই না থেমে চলতে থাকে অমিয়। স্কুটার ভেসে যায়।

বহু দূর পর্যন্ত সোজা চলে তার স্কুটার। তারপর বাঁক নেয়। রাস্তার আলো এখানে ক্ষীণ, বহু দূরে দূরে। দু' ধারে গাছ-গাছালি, ব্যাঙের ডাক শোনা যায়, রাস্তায় লোকজন বিরল। এক-আধটা দোকান খদ্দেরহীন, আলো জ্বেলে বসে আছে দোকানি। এইসব রাস্তা পার হয়ে অমিয়র স্কুটারের আলো পড়ে একটা লেভেল ক্রসিংয়ের সাদা লোহার গেটে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় লাফায় হালকা স্কুটার, ভেঙে পড়তে চায়। অমিয় দাঁতে দাঁত চেপে হাতল সোজা রাখে। লেভেল ক্রসিংয়ে লাইনের মাঝখানে গভীর খন্দ, তাতে জল জমে আছে। ঝাঁকুনিতে ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে পড়তে চায়। গর্তে পড়ে জলে ঢেউ তোলে স্কুটার। অমিয়র জুতো-মোজা ভিজে যায়। লেভেল-ক্রসিং পার হয়ে অন্ধকার কাঁচা রাস্তা। রাস্তার দু' ধারে ফাঁকা জমিতে দু'-একটা ঘুমন্ত বাড়ি চোখে পড়ে। স্কুটার গোঙায়, তবু এগোয় ঠিক। বহুকাল আসা হয় না এদিকে। রাস্তাটা একটু গোলমেলে লাগে। স্কুটার থামিয়ে হেড লাইটটা বার কয়েক চারধারে ফেলে অমিয় স্কুটার ছাড়ে। এগোয়। অনেকটা গিয়ে ডান ধারে ইটখোলাটা দেখতে পায় অমিয়। নাবাল মাঠে জল জমে গেছে। কী গম্ভীর ব্যাঙের ডাক। মনে হয় রাত নিশুতি হয়ে গেছে। ইটখোলার গা বেয়ে একটা শুঁড়ি পথ। দু' ধারে এই বর্ষায় আগাছা জন্মেছে খুব। পিছল হয়েছে রাস্তা, ক্ষয়ে গেছে। সেই রাস্তায় স্কুটার এগোয় না। এঁটেল মাটিতে চাকা পড়ে একই জায়গায় ঘুরতে থাকে। অমিয় টেনে তোলে। আবার এগোয়।

একটা নিমগাছ ছিল এখানে, আর কলার ঝাড়। সামনে উঠোন। মনে করতে চেষ্টা করে অমিয়। স্কুটার অনিচ্ছায় বহন করে তাকে। অনেকটা ভিতরে ঢুকে যায় সে। চার দিকে বাড়িঘর নেই। আলো নেই। কোনও মানুষ চোখে পড়ে না। অমিয় এগুতে থাকে। আঁকাবাঁকা পথে স্কুটার ঘোরে। কাদা ছিটকে আসে, ব্যাঙ লাফায়, জলের কল কল শব্দ হতে থাকে। বিদ্যুৎ চমকায় জলে-স্থলে। অমিয় প্রাণপণে চেয়ে দেখে, চিনতে চেষ্টা করে জায়গাটা। বহুকাল আসা হয়নি। বহুকাল।

স্কুটার লাফিয়ে উঠে একটা কলার ঝাড়ে আলো ফেলে এক মুহূর্তের জন্য। আভাসে একটা নিমগাছ দেখা যায় অবশেষে। উঠোন জলে ভাসছে। একটা অন্ধকার বেড়ার ঘর, টিনের চালে অবিরল বৃষ্টির শব্দ উঠছে। অমিয় স্কুটাব থেকে নেমে উঠোনের আগল ঠেলে গোড়ালি-ডুব জলে পা দেয়। ডাক দেয়, খুড়িমা! ও খুড়িমা!

দরজা খুলতেই একটা হ্যারিকেনের ম্লান হলুদ আলো দেখা যায়।

কে?

অমিয় বারান্দায় উঠে আসে। একটা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে বোকা চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শোভনাদিব ছেলে ভাসান। অমিয় চিনতে পারে।

ভাসান, আমি অমিয়মামা। খুড়িমা কেমন আছে?

ছেলেটা ঠিক চিনতে পারে না প্রথমে, বিশ্বাস করতে পারে না। বোকা চোখে চেয়ে থেকে একটু সময় নেয় বুঝতে। তারপর বলে, অমিয়মামা? তুমি এই রাতে? কী হয়েছে?

অমিয়র হঠাৎ লজ্জা করতে থাকে। কী বলবে সে! এত রাত্রে মানুষ বড়জোর বাড়ি ফেরে। কোথাও যায় না।

ভিতর থেকে ঘুম-ভাঙা বুড়ি-গলায় কে জিজ্ঞেস করে, কে রে? কে এল রে ভাসান?

অমিয়মামা।

কে অমিয়?

ভাসান আলোটা সরিয়ে দরজা ছেড়ে বলে, ভিতরে এসো অমিয়মামা। দিদিমা ভাল নেই। হার্ট খুব খারাপ।

অমিয় তার ভেজা জুতো ছাড়ে। জামা-প্যান্ট থেকে যত দূর সম্ভব জল ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ঘরে ঢুকতেই ম্লান আলোয় বহুদিন আগেকার সেই ঘরখানা দেখে। হারিকেনের গন্ধে ঘর ভরা, বিছানায় মশারি ফেলা! মশারির ভিতর হাতপাখা নড়ার শব্দ। খুড়িমার কাছে মা মরার পর বহুদিন শুয়েছিল অমিয়। ঘুমের মধ্যেও খুড়িমার পাখা নড়ত নির্ভুলভাবে।

কে এলি রে? মশারির ভিতর থেকে প্রশ্ন আসে।

আমি খুড়িমা, আমি অমিয়।

একটা অস্ফুট শব্দ করে খুড়িমা, গোঁজা মশারির এক দিক তুলে বুড়ো মুখখানা বের করে। চোখে আলো লাগতে মিটমিট করে তাকিয়ে বলে, অমিয় মানে মেজোঠাকুরের ছেলে?

ভাসান ধমক দেয়, তো আর কে অমিয় আছে?

হারিকেনটা তোল তো ভাসান, দেখি। অমিয়, কাছে আয়। দেখি তোর গা। ঠিক তুই তো?

ভাসান বলে, শার্টটা ছেড়ে ফেলো অমিয়মামা। ইস! তুমি খুব ভিজে গেছ।

অমিয় বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, খুড়িমা, তুমি এত বুড়ো হলে কবে? এত বুড়িয়ে যাওয়ার কথা তো ছিল না তোমার!

তুই কি এই বৃষ্টিতে এলি? কী হয়েছে তোর? খারাপ খবর আছে কিছু? কাছে আয় না, দূরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

তুমি কাকার থেকে চোদ্দো বছরের ছোট ছিলে, তবে বুড়ো হলে কী করে?

মশারি তুলে খুড়িমা উঠে বসে। গা উদোম। কাপড় খসে গেছে। কোমরের কাপড় ঠিক করতে করতে বলে, তোর কাকা গেছে বিশ বছর আগে, তখনই আমার পঞ্চাশ পুরে গেছে। বয়সের হিসেব তুই কী জানবি? মেজোঠাকুরের বুড়ো বয়সের সন্তান তুই! তোর জন্মের সময়ে মেজোঠাকুরের বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, তোর মা'র চল্লিশ। তোর এখন বয়স কত?

পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ।

তবে? বয়সের হিসেব ঠিক রাখতে পারিস না তোরা। কাছে আয় তো দেখি, কী-রকম ভিজেছিস!

খুড়িমা হাত বাড়িয়ে অমিয়কে ধরে কাছে টেনে নেয়। সমস্ত শরীরে মরা হাতখানা দিয়ে সেঁক দেওয়ার মতো চেপে চেপে ধরে তার শরীর দেখে।

তুই কি পাগল? এমন কাক-ভেজা কেউ ভেজে? ভাসান, জামা-কাপড় দে এক্ষুনি, তার আগে গামছা দে। রাখুকে বল এক পাতিল আগুন করতে, সেঁক না-দিলে ও মরে যাবে।

খুড়িমা, তুমি কেমন আছ?

কী জানি! ডাক্তার বলেছে, ভাল না। কাপড়ে-চোপড়ে হেগে-মুতে ফেলি, আর বুকে একটা চাপ ব্যথা হয়। কতকাল আসিস না।

আজ তো এলাম।

এটা কী-রকম আসা। তোর মাকে আমি রোজ স্বপ্নে দেখি। আমার ভরসায় তোকে ছেড়ে গিয়েছিল, তাই রোজ এসে খবর নিয়ে যায়। বাইরের নিমগাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাকে। বহুকালের পুরনো ঝগড়া শত্রুতা তার সঙ্গে। ক'দিন পর আমিও তো তার কাছে যাব, এখন যদি তোর কিছু হয় তো সে আমাকে আস্ত রাখবে? এই বৃষ্টিতে ভিজে এলি, তুই কেমন পাগল? ও ভাসান—

দিই।

তাড়াতাড়ি দে।

খুড়িমা, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি, চলে যাব। এখন আর জামা-কাপড় ছেড়ে কী হবে?

তোর বর্ষাতি নেই? ছাতা কিনিসনি? ওরে তোরা ওঠ, ও ভাসান, পাখিকে বল চা করবে, রাখুকে ঠেলে তুলে দে, পাতিলের আগুনটা করে দিক, আমি ওকে সেঁক দেব। অমিয়, কেন এসেছিস? অমিয়র বলতে ইচ্ছা করে, এইজন্যই। কিন্তু তা বলে না অমিয়, বলতে নেই। চুপ করে থেকে তার বুকে-পিঠে মাথায় কঙ্কালসার হাতখানা অনুভব করে সে। এইটুকুর জন্য এত রাতে, দীর্ঘ পথ জল কাদা ঝোড়ো বাতাস ভেদ করে এসেছে সে।

কেন এসেছিস? আমাকে দেখতে? আমি মরে গেলাম কি না দেখতে এসেছিস? বলতে বলতে খুড়িমা একটু কাঁদে। বলে, সত্যিই খুড়িমাকে ভালবাসিস অমিয়? তোর বউ বাপের বাড়িতে গেছে নাকি? বাচ্চা-কাচ্চা হবে না তো?

না।

তোর বাচ্চা হয় না কেন রে? অ্যাঁ! কী করিস তোরা? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি? বুড়ো বয়সে হলে মানুষ করার সময় পাবি না। এখন হইয়ে ফেল।

চুপ করো খুড়িমা।

আমার তো ছেলে নেই। ভাসানকে বলি তোর খবর আনতে। তা সে তোর দোরগোড়ায় গিয়ে গিয়ে ফিরে আসে, ভিতরে ঢোকে না, এসে বলে— মামা বাড়িতে থাকে না, মামিকে চিনি না, লজ্জা করে। আমি অবাক হই। মামিকে আবার চেনার কী আছে। গিয়ে কোলে বসে পড়বি, আবদার করবি, জ্বালাবি—তাতেই চিনবে।

চুপ করো, তুমি চুপ করো।

চুপ করব কেন? অমিয়, কেন এসেছিস?

তোমাকে দেখতে।

ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে রাখী আর পাখী। কেটলিতে জল ফোটে। পাতিলে কাঠকয়লার আগুন জ্বালে রাখী। অমিয় খালি গায়ে, ধুতি পেঁচিয়ে বসে। তাকে ঘিরে হারিকেনের আলোয় একটা ছোট উৎসব শুরু হয়।

আমার কেউ নেই অমিয়। শোভনা তার তিন ছেলেমেয়ে রেখেছে আমার কাছে, রক্ষা। ভেবেছিলাম, শোভনা আমার মেয়ে আর তুই ছেলে। তুই কেমন ছেলে?

পাতিলের আগুনের ওপর দুই হাত মেলে ধরে খুড়িমা। গরম হাত দু'খানা এনে তার গায়ে চেপে চেপে ধরে। কতকালের পুরনো এক রক্তস্রোত আর-এক রক্তস্রোতের খবর নিতে থাকে।

বাখু, ভাত চড়াসনি?

না তো! মামা কি খেয়ে যাবে?

খেয়ে যাবে না তো কী? কোথায় খাবে?

আমি খাব না খুড়িমা।

কেন খাবি না? বউ রেঁধে রেখেছে বলে? গেরস্তর ঘরে কখনও ভাত নষ্ট হয় না। খেয়ে যা। আপিস থেকে এলি তো?

হ্যাঁ।

পাখী, তুই একটু হাত গরম করে সেঁক দে। আমি একটু শুই, বুকটা কেমন করে।

কথা বোলো না।

বলব না! কেন? কাছে এসে বোস আরও। তোর বউকে বিয়েতে আমি গয়না দিইনি, না? কী দিয়েছিলাম যেন?

পাখী মুখ তুলে বলে, দিয়েছিলে। নাকছাবি।

ওঃ। নাকছাবি আবার গয়না! অমিয়, তোর ছেলেমেয়ে হলে একছড়া গোঠ দেব। তিন ভরি সোনা। তুই কোথায় থাকিস যেন?

ঢাকুরিয়া।

সে কি অনেক দূর? যদি দূর না হয় তো তোর বউ, কী নাম যেন, তাকে নিয়ে আসিস। ভাসান, পাখী, তোরা ওর সঙ্গে কথা বলছিস না কেন? কথা বল।

তুমি অত তাড়া দিলে কথা বলবে কখন? চা করছে, গা সেঁকছে, ভাত রাঁধছে, ওদের তো বসতেই দিচ্ছ না।

তাড়া কি সাধে দিই! তোর মাকেই আমার ভয়। তার মুখের বড় ধার ছিল। এখনও এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে জিভ শানাচ্ছে, আমি গেলেই ধরবে আমাকে। হ্যাঁ রে, পরের মেয়ে বউ হয়ে এসে আপনজন হয়ে যায়, আর পরের মা কিছুতেই কি মা হতে পারে না? কেন এসেছিস অমিয়?

খুড়িমা, তুমি আমাকে গল্প বলো।

কীসের গল্প শুনবি?

আমার গল্প বলো। আমি কেমন ছিলাম?

তুই? তুই আবার আলাদা কী ছিলি! আর পাঁচজনের মতোই ছিলি তুই। শিশুকালে সবাই এক থাকে, বড় হয়ে আলাদা রকমের হয়।

তবু বলো।

খুব দুষ্টু ছিলি। ভীষণ। মা ছিল না বলে তোর আদর ছিল সবচেয়ে বেশি। আশকারা পেয়ে মাথায় উঠেছিলি। তোর দিদি নানি সেই তুলনায় ঠান্ডা ছিল। পারুলিয়ার বাড়িতে একটা মস্ত দিঘি ছিল—তার এপার-ওপার দেখা যায় না, তার কালো জল খুব গভীর, বড় বড় মাছ ছিল। দিঘির পারে একটা ডিঙিনৌকো বাঁধা থাকত—তাতে চড়ে মাঝদিঘিতে শ্বশুরমশাই মাছ ধরতে যেতেন। সেই ডিঙিনৌকোয় চড়ে এক দুপুরে তুই আর নানি চুপি চুপি দিঘির মাঝখানে চলে গিয়েছিলি। চিৎকার শুনে আমরা দিঘির পাড়ে গিয়ে দেখি, নানি উঠে দাঁড়িয়ে বৈঠা তুলে চেঁচাচ্ছে, তুই নৌকোর এক ধারে ঝুঁকে আছিস। কেতরে নৌকোটা ভেসে আছে। সে যে কত দূর চলে গিয়েছিলি তোরা—এই টুকু টুকু দেখাচ্ছিল তোদের। চার দিক থেকে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে কিন্তু তোরা এত দূরে যে পৌঁছতে পারছিল না। নৌকোটা কেবলই কাত হচ্ছিল তখন, তুই ঝুলে ছিলি, পড়ে যাচ্ছিলি। কী ভয় আমাদের!

তুমি কী করেছিলে?

আমি! আমি কী করব? বোধহয় খুব চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তোরা মা-মরা দু'টো ভাইবোন কেন যে ওই বিদঘুটে খেলা করতে গিয়েছিলি! লোকে বলাবলি করেছিল যে তোদের ভূতে পেয়েছে। কেন গিয়েছিলি অমিয়?

আমরা কী করে ফিরে এলাম আবার?

কেউ ধরাব আগেই তুই ঝাঁপ দিয়েছিলি জলে। তোকে কেউ ধরতে পারেনি। একা সাঁতরে এলি পাড়ে। খুব রোখ ছিল তোর।

খুড়িমা, আমি একটা জলের স্বপ্ন খুব দেখি।

কী-রকম জল?

অনেক জল, অথৈ জল। একটা খুব বড় নদী, তার ও-পার দেখা যায় না। তার একধারে একটা বিরাট বালিয়াড়ি, আর একটা স্টিমাব বাঁধার জেটি। সেখানে কেউ নেই। বালির ওপর একটা কেবল সাপের খোলস পড়ে আছে।

খুড়িমা হঠাৎ রোগা, মরা হাত বাড়িয়ে অমিয়র হাত ধরে। বলে, অমিয়, কী বলছিস?

একটা স্টিমারঘাটের কথা। একটা বালিয়াড়ির কথা।

খুড়িমা একটু চুপ করে থাকে।

খুড়িমা তুমি এই স্টিমারঘাটের কথা কিছু জানো?

খুড়িমা, আস্তে আস্তে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে, না তো! স্টিমারঘাটের কথা কী জানব! তুই কবে থেকে এটা দেখিস?

অমিয় একটু ভাবে। তারপর বলে, অনেক দিন থেকে। এক দিন ঘুমের মধ্যে ওই স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। তারপর আবার ঘুমোই, আবার সেই স্বপ্ন। তিন বার করে স্বপ্নটা দেখে আর ঘুম হল না। একা একা শুয়ে খুব ভয় করতে লাগল। মনে হল, কেউ পাশে থাকলে খুব ভাল হত।

বউয়ের সঙ্গে কি তোর ঝগড়া অমিয়?

কেন, ও-কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

এই যে বললি—তুই একা শুস। একা শুবি কেন অমিয়? বউ বিছানায় নেয় না? আলাদা শোয়? তা তার এত গুমোর কীসের? ওই জন্যই তোদের বাচ্চা হয় না—

খুড়িমা স্টিমারঘাটের কথাটা আগে শোনো।

কী শুনব! স্টিমারঘাটের কথা আমি কিছু জানি না। রাখু, ভাতটা টিপে দ্যাখ, হাঁ করে গল্প শুনছিস, ভাত গলে যাবে। একটু ডাঁটো থাকতে নামাস, অমিয় ঝরঝরে ভাত ভালবাসে। ভাসান, কত রাত হল রে?

ন'টা।

অমিয় যাওয়ার সময়ে টর্চ জ্বেলে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিস। আমি একটু চোখ বুজে থাকি। আমার মনটা ভাল লাগছে না।

কেন খুড়িমা?

তুই কেন স্টিমারঘাটের কথা বললি? ও-সব অলক্ষুণে কথা, মন বড় খারাপ হয়ে যায়।

খুড়িমা মশারির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে নেয়, হাতপাখার মৃদু শব্দ হতে থাকে। রাখু এসে বলে, মামা, রান্না হয়ে গেছে। বসবেন না?

অন্যমনস্ক অমিয় ওঠে।

খেয়ে উঠে পোশাক পরছিল অমিয়। খুড়িমা ঘুমচোখে বলে, ভেজা পোশাক আবার পরছিস অমিয়, ঠান্ডা লাগবে না? ওগুলো ছেড়ে রেখে যা—

রাখু বলে, উনুনে ধরে শুকিয়ে দিয়েছি দিদিমা।

ওতে কি শুকোয়? সেলাইয়ের জল থেকে যায়। স্টিমারঘাটের কথা যেন কী বলছিলি অমিয়?

তুমি তো শুনতেই চাইলে না।

খুড়িমা একটু অস্ফুট শব্দ করে। তারপর বলে, ছেলেবেলা থেকে তুই বড় একা। সেই জন্যে তোর দুঃখ নেই তো অমিয়? তোর মা-বাপ নেই—সে বড় দুঃখ। আমি তোর মা হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাইলেই কি হওয়া যায়! নিজের মেয়েটা, এই যে সব নাতি-নাতনি—এ-সব থেকেও তো কেমন একা লাগে। রাত-বিরেতে ঘুম ভাঙলে কারও নাম মনে পড়ে না। ডাকতে গিয়ে দেখি, মাথা অন্ধকার লাগে। মনে হয় কেউ নেই আমার। সে বড় কষ্ট। ভাবি মানুষের আপনজন কে-ই বা আছে! তুই কেন এসেছিলি যেন অমিয়?

তোমাকে দেখতে।

একটা শ্বাসের শব্দ হয়। খুড়িমা বিছানায় পাশ ফিরে শোয়। তারপর বলে, স্টিমারঘাটের কথা কেন বললি? কী জানি কেন, আমিও ঠিক একটা ধু ধু বালির চর দেখতে পাই এখন, অনেক দুরে একটা ঘাট, তারপর অথৈ জল...সাবধানে যাস অমিয়, উঠোনটা পিছল, রাস্তা ভাল না, অনেক রাত হয়েছে!

খুড়িমা, তুমি ঘুমোও।

ঘুম কি আসে। ভাসান টর্চটা ধর। অমিয় তোর বউয়ের নাম যেন কী?

হাসি।

হাসি! হাসির কেন বাচ্চা হয় না রে? আঁট-বাঁধ দিয়ে রেখেছিস নাকি?

অমিয় চুপ করে থাকে।

বাচ্চা না হলে বউ আপন হয় না। আঁটকুড়ি নয় তো? ডাক্তার দেখাস। তোর কেউ নেই অমিয়, বাচ্চা-কাচ্চা হলে একটু বাঁধা পড়বি। কিন্তু বয়স হলে আবার সেই—

কী?

সেই যে কী যেন বললি! সেই স্টিমারঘাট—অথৈ জল...অমিয় সাবধানে যাস—

মেঘ কেটে ভয়ংকর জ্যোৎস্না পড়েছে। অমিয় নির্জন রাস্তায় তার স্কুটার চালায়। বাতাস লাগে, জল-মাটির গন্ধ পায় সে। চলতে থাকে। হাসি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। অমিয়র ঘুম হয় না আজকাল।

দূরে সিংহের ডাকের মতো মেঘগর্জন শোনা যায়। গির-অরণ্যে দেখা এক সিংহের অবয়বের ছায়া পড়ে অমিয়র চোখে। সে চলতে থাকে!

স্কুটারের শব্দ ঠিকই শুনতে পেল হাসি। আধো-ঘুমের মধ্যেও। যেন এতক্ষণ সে এই শব্দের অপেক্ষায় ছিল। উঠে ঘড়ি দেখল সে। রাত এগারোটা বেজে গেছে। অমিয়র জন্য তার কোনও কৌতূহল নেই। সে শুধু আধো জেগে ছিল বলে মাঝে মাঝে রাস্তার চলমান স্কুটারগুলির শব্দ শুনে উঠে এক বার ঘড়ি দেখেছে। কোনও স্কুটারের শব্দই এতক্ষণ থামেনি।

হাসি শুনতে পেল, অমিয় স্কুটার টেনে সিঁড়ির নীচে নামিয়ে রাখছে। আবার বিছানায় এসে শুয়ে থাকল হাসি। আগে আগে অমিয় এলে অন্তত খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসত সে। মুখোমুখি দু'চারটে কথা হত। খাওয়ার পর ছিল তাদের বাঁধা রতিক্রিয়া। এখন আর হাসি খাওয়ার টেবিলে যায় না।

সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে অমিয়র পায়ের শব্দ, ভেজানো দরজা ঠেলে ও-ঘরে ঢোকে। জামা-কাপড় ছাড়ে। বাথরুমে যায়।

ও-ঘর থেকে একটা চৌকো আলো এসে এ-ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। অমিয়র রাত্রে ভাল ঘুম হয় না— হাসি জানে। অনেক রাত জেগে ও বই পড়ে। সিগারেট ধরানোর শব্দ হয় রাতে, পায়চারির শব্দ হয়, কাশির।

চৌকো আলোটাতে একটা মানুষের ছায়া পড়ে। বাঁকা ছায়াটা, একটা কাঁধ উঁচু দেখায়, মাথাটা বেঁকে পড়ে আছে।

হাসি চেয়ে থাকে।

দরজার কাছ থেকে অমিয় বলে, কেউ এসেছিল?

হাসি মৃদুগলায় বলে, টেলিফোনের লোক! কাল তোমার টেলিফোন দিয়ে যাবে।

টেলিফোন! একটু অবাক হয় অমিয়।

বলল, তুমি তিন বছর আগে অ্যাপ্লাই করেছিলে, এত দিনে মঞ্জুর হয়েছে!

টেলিফোন দিয়ে আমি এখন কী করব?

হাসি একটু হাসে। বলে, লোকের সঙ্গে কথা বলবে। কত কথা আছে মানুষের, শোনার লোকেরও অভাব নেই।

আমার কোনও কথা নেই।

কে বলল নেই! শুনতে পাই, তুমি লোককে একটা স্টিমারঘাটের কথা বলো।

সে-কথা থাক হাসি। আর কে এসেছিল?

এক বুড়োমতো ভদ্রলোক, তোমার পিসেমশাই। তাঁর মেয়ের বিয়ের চিঠি রেখে গেছেন।

চিঠি দেখেছি। তিনি কিছু বলেননি?

বলেছেন। পরশু বিয়ে, আমি যেন অবশ্যই তোমাকে নিয়ে বিয়েতে যাই। অনেক বার বললেন। আমি বলেছি, যাব। চা করে খাইয়েছি। অনেকক্ষণ বসে ছিলেন তোমার জন্য।

আর কিছু বলেননি?

না। বোধহয় কিছু বলার ছিল, তোমাকে বলতেন। আমাকে কিছু বলেননি।

বলেছিলাম, রেখার বিয়েতে এক হাজার টাকা দেব। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে ভাবিনি।

দেবে যখন বলেছিলে তখন তো দেওয়াই উচিত। তাঁর পোশাক দেখেই মনে হয় অবস্থা ভাল না।

কোথা থেকে দেব?

তুমি আমাকে যে-সব গয়না দিয়েছিলে সব স্টিলের আলমারিতে আছে। দরকার হলে নিতে পারো, আমি তো নিচ্ছি না।

আমাদের বংশের কেউ কখনও ঘরের জিনিস বেচেনি।

তা হলে কী করবে?

বুঝতে পারছি না।

হাসি লক্ষ করে একটা ধুতি জড়িয়ে অমিয় দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের ওপর ওর খালি গা। পিছন থেকে আলো এসে পড়েছে ওর গায়ে। মাথাটা বোধহয় ভেজা, পাট-করা চুল থেকে আলো পিছলে আসছে। লম্বাটে হাড়সার দেহ অমিয়র। অমিয় রোগা হয়ে গেছে কি না তা ঠিক বুঝতে পারে না হাসি। এ-সব বোঝা খুব মুশকিল। ওই দেহটির স্বাদ সে বহু বার পেয়েছে। তার দুই হাতে, নগ্ন শরীরের আনাচে-কানাচে আজও ছড়িয়ে আছে সেই স্বাদ। কত বার সে বেষ্টন করেছে ওই শরীর, মথিত হয়েছে। তবু ওই শরীরের সব খবর তার জানা নেই।

অমিয়র ঠোঁটে একটা সিগারেট একটু জ্বলে উঠল। সেই আগুনটাই বোধহয় একটা আশ্লেষ তৈরি করে হাসির শরীরে। সে শরীরের ভঙ্গি বদলায়। হঠাৎ প্রশ্ন করে, তোমার ওজন কত?

অমিয় একটু থমকে থাকে। প্রশ্নটা বুঝতে না-পেরে জিজ্ঞেস করে, কী বলছ?

তোমার ওজন কত?

কেন?

এমনিই জিজ্ঞেস করছি। জামাইবাবু বলছিল, তুমি নাকি রোগা হয়ে গেছ। তোমার কি ওজন কমে গেছে?

কী জানি।

তুমি ওজন নাও না?

না।

হাসি একটু শ্বাস ফেলে বলে, আমার রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি। কলকাতায় আমাকে আরও কয়েক দিন থাকতে হবে।

থাকবে। তাতে কী?

আমি দিদি-জামাইবাবুর কাছে চলে যেতে পারতাম এ ক'দিনের জন্য। কিন্তু সেখানে পাশের ফ্ল্যাটে তোমার দিদি-জামাইবাবু থাকেন। গেলে ওঁরা নানা রকম সন্দেহ করতে পারেন বলে যাইনি।

যেমন তোমার ইচ্ছে।
খুশির বিয়ের তারিখ এসে গেল। রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছে না। কী যে করব!
প্লেনে চলে যাও।
তুমি ভাড়া দেবে? অনেক ভাড়া কিন্তু।
দেব।
তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ।
প্লেনের ভাড়া কত?
দু'-তিনশো হবে বোধহয়। আমি ঠিক জানি না। তোমার ব্যবসার অবস্থা কী?
ভাল নয়।
খুব খারাপ?
হুঁ।
কী-রকম খারাপ?
উঠে যাওয়ার মতো।
কেন?
হাসি, আমি প্লেনের ভাড়া ঠিক দেব।
হাসির ঘুম পায়। সে হাই তুলে বলে, দরজার পরদাটা টেনে দেবে? চোখে আলো লাগছে।
পরদিন দুপুরবেলা জামাইবাবুকে ফোন করে হাসি।
জামাইবাবু, রিজার্ভেশন যদি না পাওয়া যায় তো আমি প্লেনে যাব।
তার দরকার নেই, তেরো তারিখের একটা স্লিপার বার্থ পাওয়া গেছে।
পাওয়া গেছে? সত্যি?
সত্যি। সুখের পাখি এবার উড়ে যাও।
হাসি চুপ করে থাকে।
ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ হাসি?
না।
কাল ছেড়ে দিয়েছিলে। একটা প্রশ্নের জবাব দাওনি।
জামাইবাবু, আমাদের মধ্যে কোনও ঝগড়াঝাটি হয়নি। কথাবার্তা বন্ধ হয়নি। কাল রাতেও অনেকক্ষণ আড্ডা মেরেছি। আমরা সম্পূর্ণ নরমাল। এমনকী কোর্ট-কাছারির কথাও ভাবছি না।
তবে কি ফিরে আসার কথাও ভাবছ?
না!
তুমি কোথা থেকে ফোন করছ হাসি?
কেন?
ফ্রিলি কথা বলতে পারবে?
আমি বাসা থেকে ফোন করছি।
বাসা থেকে! বাসায় কবে ফোন এল?
আজ। বছর তিনেক আগে অ্যাপ্লাই করেছিল, আজ কানেকশান দিয়ে গেছে।
ফোন কেন নিতে গিয়েছিল অমিয়? দুপুরে অফিস থেকে তোমার সঙ্গে প্রেম করার জন্য?
হবে হয়তো।
ফোন কোম্পানির মতো বেরসিক দেখিনি। যখন পাখি উড়ে যাচ্ছে তখনই এল ফোন! এখন দুপুরে কার সঙ্গে কথা বলবে অমিয়? বেচারা!
কী বলছিলেন বলুন।

ডিগবয়ের তেল কোম্পানির সেই ইঞ্জিনিয়ার, সে এখনও বিয়ে করেনি শুনেছি। সত্যি?

সত্যি।

সে কখনও তোমার সঙ্গে দেখা করেছিল হাসি?

হাসি একটু দ্বিধা করে বলে, না না।

তবে কী করেছিল?

একটা দীর্ঘ চিঠি দিয়েছিল। তাতে বারবার একটা প্রশ্ন করেছিল— আমার কী দোষ? আমাদের অপরাধ কী? আপনি কেন এমন করলেন? আরও লিখেছিল, যদি কখনও নিজের ভুল বুঝতে পারি তবে যেন তাকে জানাই, সে সারা জীবন অপেক্ষা করবে, নিঃশর্তে গ্রহণ করবে আমাকে...জামাইবাবু, আপনি কি শুনছেন? আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না।

শুনছি। বলো।

সে এই কথা লিখেছিল। আরও লিখেছিল, তাদের কালাশৌচের মধ্যেই যে তারা আমাকে আশীর্বাদ করে রেখেছিল, সেটাও তারই আগ্রহে। তার ভয় ছিল, আশীর্বাদ করে না রাখলে ওই সময়ের মধ্যে আর-কেউ এসে আমাকে বিয়ে করে ফেলবে। তখন শিলচরে আমার সুটার অনেক, ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি পেতুম...শুনছেন?

শুনছি।

কালো হলেও তো আমি সুন্দরী-ই। তার ওপর দারুণ নাচতাম, গাইতাম। আমার পায়ে পুরুষদের মাথা নূপুরের মতো বাজত।

ও-পাশে জামাইবাবু বহুক্ষণ শ্বাস ধরে রেখে আবার অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস ছাড়ে। হাসি হাসে।

কিছু বুঝলেন জামাইবাবু?

বুঝলাম।

কী?

তুমি আর ফিরবে না হাসি।

ও-পাশে জামাইবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। হাসি অপেক্ষা করে।

হাসি, স্টিমারঘাটটা সাবধানে পার হয়ো। ও-জায়গাটা ডেঞ্জারাস।

হাসি চমকে উঠে বলে, স্টিমারঘাট! কোন স্টিমারঘাট?

বাঃ, ফারাক্কায় তোমাকে ঘাট পেরোতে হবে না?

ওঃ। বলে স্তব্ধ হয়ে থাকে হাসি।

একা যাচ্ছ, আমরা চিন্তায় থাকব। ও-পারে বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসে তোমার রিজার্ভেশন আছে, ভুল করে দার্জিলিং মেলে উঠো না।

ভুল ট্রেনে ওঠাই কি আমার স্বভাব জামাইবাবু?

জামাইবাবু একটু চুপ করে থেকে বলে, ভুল ট্রেনের কথা বলছ হাসি! কিছু ইঙ্গিত করছ কি? তবে বলি, আমাদের আমলে ভুল ট্রেনে উঠলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হত। হয়তো ভুল জায়গায় গিয়ে পৌঁছোতাম। কিন্তু তবু যেতে হত। তোমাদের আমল আলাদা। তোমরা ভুল ট্রেন বুঝতে পারলেই চেন টেনে নেমে পড়তে পারো।

আমরা ভাগ্যবান।

দেখা যাক। আমি আরও কিছুদিন বাঁচব হাসি।

হাসি হাসে।

এখনও সাত-আট দিন সময় আছে, এ ক'দিন কী করবে হাসি?

কী করব! ঘুরব, ঘুরে বেড়াব!

কোথায় যাবে?

কোথাও না। কলকাতা—কেবল কলকাতায় ঘুরব—ইচ্ছেমতো।

কলকাতায় আর কোথায় ঘুরবে, কী আছে কলকাতায়?

কী আছে? কী জানি! আমি তো বিশেষ কোথাও যাব না। আমি ঘুরে বেড়াব রাস্তায় রাস্তায়। রঙিন দোকান দেখব, আলো দেখব, পার্কে বসে থাকব, কলকাতা পুরনো হয় না।

কলকাতায় তুমি কী পেয়েছ হাসি?

কী পেয়েছি! হাসি তা ভেবে পায় না। সে চোখ বুজে থাকে। মনে মনে বলে, কলকাতা! কলকাতা আমার প্রেমিক। জ্বলন্ত এক পুরুষ কলকাতা। সে আমাকে সব সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে টেনে এনেছিল, সুখী হতে দেয়নি। সে আমাকে নিয়ে আরও কত খেলা খেলবে, তোমরা দেখো।

হাসি, ফোন কি ছেড়ে দিয়েছ?

না তো।

তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসও যে শোনা যাচ্ছে না।

শুনছি। বলুন।

এ কয়দিন অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরো।

ও-মা! ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরব না কেন? এই তো ওর পিসতুতো বোনের বিয়েতে যাচ্ছি একসঙ্গে। ওর স্কুটারে বহুদিন চড়িনি। ভাবছি ওর স্কুটারের পিছনে বসে এ-ক'দিন ঘুরে বেড়াব। অফিসপাড়া, কলেজ স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিটের রেস্টুরেন্ট দেখে বেড়াব দু'জনে। জামাইবাবু, আপনি কি ভাবছেন আমার প্রেজুডিস আছে? একদম নেই। আমরা দু'জনে কথা বলি, হাসি-ঠাট্টা করি, কখনও ঝগড়া করি না। এমনকী মাঝে মাঝে এক বিছানায়...জামাইবাবু, শুনছেন?

কী ভয়ংকর!

কী?

তোমার নিষ্ঠুরতা।

মাথা আস্তে আস্তে পিছনে হেলিয়ে দিচ্ছিল হাসি। ক্রমে পিঠ বেঁকে গেল পিছনে, মাথা প্রায় স্পর্শ করল পিঠ। কত উঁচু বাড়ি। উঠে গেছে তো উঠেই গেছে। কী বিশাল বাড়িটার বুক, কী পাথুরে গড়ন! দেখতে দেখতে নেশা ধরে যায়। হ্যারিংটন স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটার ঠিক পায়ের তলা থেকে চূড়া দেখার চেষ্টা করল হাসি, তার মুখে ঘাম জমে গেল বেদনায়।

বাব্বাঃ! আপনমনে বলল সে। হেসে আঁচলে এক বার মুখ মুছে নিল। কলকাতার প্রোথিত ইমারত চার দিকে, তার মাঝখানে নিজেকে ধূলিকণার মতো লাগে তার। কান পাতলে—পাতালের খরস্রোতা নদীর গর্জনের মতো উতরোল কলকাতার গম্ভীর শব্দ শোনা যায়। কী রোমাঞ্চ জাগে শরীরে! কলকাতা—তার চার দিকে উষ্ণ কল্লোলিত কলকাতা!

হাসি পায়ে পায়ে পার হয় রাস্তা। ময়দানের দিকে ট্রাম লাইন পেরোলে দেখা যায় সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এলোমেলো পড়ে আছে—যেন-বা যে খুশি নিয়ে যেতে পারে। ঘনপত্র গাছের ছায়া। পাতা ঝরে পড়ছে। পাখিরা ফেলে দিচ্ছে কুটোকাটা। নিবিড় ছায়া এখানে। পায়ের নীচে ঘাস, পাতা। নির্জনতা; হাসি পায়ে পায়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটে। কিছুই দেখে না, অথচ সবকিছু অনুভব করে তার সর্বগ্রাসী মন।

সামনেই একটা কালো হেরাল্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নতুন চকচকে গাড়ি। গাড়ির বনেটে হাত রেখে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে। ফরসা, মজবুত চেহারা, লম্বা জুলপি, ঘন বড় চুল, চৌকো মুখ। রঙিন চৌখুপিওলা শার্ট তার পরনে, আর জলপাই-রঙা সরু চাপা প্যান্ট, পায়ে চোখা জুতো, কোমরের চওড়া বেল্টের বকলশে একটা ইস্পাত রঙের ইংরেজি 'ডি' অক্ষর ঝলসে ওঠে। কবজির ঘড়িতে

মোটা সোনারঙের চেন। মানুষটা হাসিকে দূর থেকেই লক্ষ করে। অন্যমনে একটা ঘাসের ডাঁটি তুলে আলস্যভরে চিবোয়। হাসি এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে। সেই হাঁটা দেখে লোকটা। দেখে তার পোশাক, মুখশ্রী, তার বুক, চোখ। চোখই বেশি লক্ষ করে। চেয়ে থাকে। একটা লক্ষণ খুঁজে দেখে। বোধহয় লক্ষণটা মিলে যায়। মিলিয়ে লোকটা হাসে। একটু বড় এবং মসৃণ দাঁত তার। ধারালো। হাসির একটুও ভয় করে না। সে এগোতে থাকে। লোকটা হাসে। হাসি এগোয়। হেরাল্ড গাড়িটার গায়ের পালিশে হাসির ছায়া পড়ে। লোকটা বনেট থেকে হাতের ভর তুলে নেয়। ঝুলে-পড়া শার্ট, কোমরে গুঁজে এক পা এগিয়ে আসে। আর-এক পা। আর-এক পা এগুলেই হাসির পথ আটকাতে পারে, ছুঁয়ে ফেলতে পারে হাসিকে। ডাক দেয়—মিস—ও মিস—

হাসি ছেলেটার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসে। প্রশ্রয়ের হাসি। ছেলেটা লক লক করে ওঠে লোভে। দাঁতাল হাসি হাসে। বেল্টের 'ডি' অক্ষরটা ঝলসায়। ভাঙা গলায় ডেকে বলে, আই হ্যাভ এ কার মিস—

হাসি বড় বড় চোখে ছেলেটাকে দেখে। ছেলেটা টেরও পায় না, ঠিক তার পিছনেই উদ্যত আঠারো তলা উঁচু এক হিংস্র ইমারত। সেই ইমারতের সামনে তাকে কত তুচ্ছ, এইটুকু পতঙ্গের মতো দেখায়। হাসি সেই ইমারতের ফ্রেমে ছেলেটার ক্ষুদ্রতা মাত্র একপলক অবাক হয়ে দেখে। ছেলেটা ঝুঁকে ফিস ফিস করে কী যেন বলে। অমনি ময়দান থেকে মার মার করে ছুটে আসে বাতাস, তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে যায়। হাসির করুণা হয়। তার প্রেমিক কলকাতা চার দিকে জেগে আছে সহস্র চোখে। উদাসী, নির্মম, আবার ঈর্ষায় কাতর। যদি ইঙ্গিত করে হাসি তবে অমনি তার প্রেমিক কলকাতা পিছনের ওই আঠারোতলা বাড়িটার চূড়া হয়ে মড় মড় করে ভেঙে পড়বে ছেলেটার মাথায়। গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেবে মাটিতে। কিন্তু করে না হাসি। শুধু মুখটা ফিরিয়ে নেয় অবহেলায়। একা একা ঘোরে বলে এ-রকম কত মানুষ কত বার তার পিছু নিয়েছে, ডাকাডাকি করেছে ইঙ্গিতে, কীটপতঙ্গের মতো সব ছোট মাপের জীব। কলকাতার গায়ে উড়ে এসে বসে, আবার উড়ে যায়।

হাসি হাঁটতে থাকে। কত দূর দূর হেঁটে যায় হাসি। কখনও ট্রামে ওঠে। কিছু দূর যায় আবার নেমে পড়ে। ধ্বংসাবশেষ দুর্গের শেষ একটি মাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেন্ট দাঁড়িয়ে আছে দেখে। দেখে, গঙ্গার কোল জুড়ে শুয়ে আছে হাওড়ার পোল। তার চোখের পাশ দিয়ে ভেসে যায় ভাঙা টুকরো সব দৃশ্যাবলী, ছায়া পড়ে, ভেঙে যায়। চকিতে মানুষের চোখ ঝলসে ওঠে। কানাগলির মুখ সরে যায়। গভীর গভীর অগাধ কলকাতার ভিতর হারিয়ে যায় হাসি। ভোগবতীর গম্ভীর নিনাদের মতো কলকাতার কত শব্দ হয়।

জাহাজঘাট! হাসি থমকে দাঁড়ায়। মাস্তুল। জল! না এখানে নয়। এ তো কলকাতা থেকে বিদায়ের বন্দর। এর অর্থ তো ছেড়ে যাওয়া। মাস্তুল অদৃশ্য রুমাল উড়িয়ে বিদায় জানায়। জাহাজ ভেসে যাবে দূর সমুদ্রে। হাসি ফিরে দাঁড়ায়। এখানে নয়, এখানে নয়। এখানে কলকাতার শেষ। জীবনের শেষ, এখানে অচেনার শুরু। হাসি ফিরে আসে।

সেনগুপ্ত নিয়ে গেছে অনেক। হিসেব করলে কত দাঁড়াবে তা ভেবে দেখেনি অমিয়। হিসেব করা সে প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। ক্যাপিটাল শেয়ার আর সেই সঙ্গে লভ্যাংশ মিলে একটা বেশ বড় অঙ্কের টাকা। অমিয় আটকাতে পারেনি। কিন্তু তবু সেটা কিছু নয়। সেনগুপ্ত বা তার টাকা কোনওটার অভাবেই ব্যবসা আটকাত না। যদি অমিয় খাড়া থাকত। তরতরে তাজা জোয়ান বয়সের মানুষের কাছে এ আবার একটা সমস্যা ছিল নাকি। ছিল না—অমিয় তা জানে, কিন্তু সে কেমনধারা মেঘলা

মানুষ হয়ে গেল। দিন না ফুরোতেই আলো মরে গিয়ে ঘনিয়ে এল দিনশেষ।

দুপুরে অমিয় আজকাল কিছুই খায় না। লাঞ্চ সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। কল্যাণ বা রজত সবাই এ সময়টায় বাইরে থাকে, পাঞ্জাবি হোটেল বা গাঙ্গুরামে টিফিন সারে। ডিউক রেস্টুরেন্টে নতুন একটা আড্ডা হয়েছে কল্যাণের। সেখানে সারাটা দুপুর কাটায় কখনও কখনও। অমিয় একসময়ে যেত। এখন টিফিনের সময়টায় বসে থাকে চুপচাপ। 'রাজেন এক কাপ চা রেখে যায় না-বলতে। আজ চায়ের সঙ্গে একটা শালপাতার ঠোঙায় কয়েকটা দেওঘরের প্যাঁড়া রেখে গেছে। কোন ভাই যেন এনেছে দেশ থেকে।

চা-টা খেল অমিয়, প্যাঁড়া ছুঁতে ইচ্ছে করল না। পেটে খিদে মরে একটা গুলিয়ে ওঠা ভাব। সবাই তাকে লক্ষ করে আজকাল। সে যে খায়নি, সে যে বিপাকে পড়েছে। ভাবতে চোখদু'টো ঝাপসা হয়ে আসে। রাত্তিরে অফিস-বাড়িটা ফাঁকা থাকে। তখন রাজ্যের দেশওয়ালি মুটে মজুর রিকশা বা ঠেলাওয়ালাকে এখানে এনে তোলে রাজেন। এক রাত্রির বসবাসের জন্য মাথা পিছু দু'চার আনা করে নেয়। তারা দিব্যি ফ্যানের হাওয়া খায়। অনেক রাত অবধি বাতি জ্বেলে গল্পসল্প করে। মাসের শেষে মস্ত অঙ্কের ইলেকট্রিক বিল আসে। তাই রাজেনকে তার সাইড় বিজনেসের জন্য বিস্তর বকাবকি করেছে অমিয়, কল্যাণ আর রজত। সেই খারাপ ব্যবহারটুকুর জন্য এখন প্যাঁড়াগুলির দিকে চেয়ে একটু বুকটা টনটন করে। রাজেন আজকাল না বলতেই টিফিনের সময়ে কোনও কোনওদিন একঠোঙা মুড়ি বাদাম হাতের কাছে রেখে যায় নিঃশব্দে। এ-সবই সহৃদয়তার নিদর্শন। কিন্তু অমিয়র ভিতরটা জ্বালা করে।

দুপুরের দিকে পিসেমশাই ফোন করলেন।

অমিয়, আমি সেদিন তোর বাসায় গিয়েছিলাম। রেখার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে রে!

শুনেছি পিসেমশাই, পাত্র কেমন?

খুব ভাল। টাটার ইঞ্জিনিয়ার, তবে দাবি-দাওয়া অনেক।

অমিয় একটা শ্বাস ছাড়ল। পিসেমশাই আবার বললেন, মেয়েটার সুন্দর মুখ দেখে পছন্দ করেছে, নইলে গরিব ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করার মতো পাত্র তো নয়।

পিসেমশাই আপনার কত দরকার?

পিসেমশাই লজ্জিত হন বোধহয়। একটু নীরব থাকেন। তারপর আস্তে করে বলেন, দরকারের কি শেষ আছে অমিয়! প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা যা অবশিষ্ট ছিল সবই প্রায় তুলেছি। কিছু ধার-কর্জ করেছি। এখনও দু'-তিন হাজার কম পড়বে। আলমারিটা এখনও কেনা হয়নি, সোনার দোকানেও যা আন্দাজ করেছিলাম তার বেশি পড়ে গেল।

ঠিক আছে, আমি হাজারখানেক দেব।

দিতে তোর কষ্ট হবে না তো?

কষ্ট কি পিসেমশাই? রেখার বিয়েতে আমার তো দেওয়ার কথাই ছিল।

পিসেমশাই হাসলেন ফোনে। বললেন, কথা দিয়েছিস বলেই আবার কষ্ট করে দিস না।

অমিয় একটু আহত হল। সে দিতে পারবে না—এমন যদি কেউ ধরে নেয় তবে তার আহত হওয়ারই কথা।

সে একটু নিচু স্বরে বলল, পিসিমা বেঁচে থাকতে, সেই কবে ছেলেবেলায় আমি পিসিমাকে প্রায় সময়েই বলতাম, রেখার বিয়ে আমি দেব, সে-কথা তো রাখতে পারলাম না পিসেমশাই।

পিসিমার উল্লেখে পিসেমশাই নীরব হয়ে গেলেন। অনেকটা পরে যখন কথা বললেন তখন টেলিফোনেও বোঝা গেল, গলাটা ধরে গেছে।

বললেন, তা হোক, ছেলেবেলায় মানুষ কত কী বলে। যা দিতে পারিস দিস।

আচ্ছা পিসেমশাই।

শোন, বউমাকে বিয়ের দু'-এক দিন আগে আমাদের এখানে পাঠাতে পারবি না? বিয়ের কাজকর্ম মেয়েছেলে ছাড়া কে বুঝবে!

হাসিকে বললে হাসি রাজি হবে কি না তা কে জানে। তাই অমিয় উত্তরটা ঘুরিয়ে দিল, সেদিন যখন গিয়েছিলেন তখন নিজেই তো বউমাকে বলে আসতে পারতেন।

লজ্জা করল। বউমা তো আমাকে খুব ভাল চেনেন না, দু'-এক বার মাত্র দেখেছেন, তুইও সাহেবি কায়দায় বিয়ে করলি, সামাজিক অনুষ্ঠান হল না!

অমিয় লজ্জা পায়। বলে, তাতে কী?

সামাজিক বিয়ে হলে সেই অনুষ্ঠানে সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে নতুন বউয়ের চেনাচিনি হয়ে যায়। তোর বেলায় তো সে-রকম হয়নি, তাই একটু দূরের মানুষ হয়ে আছি আমরা। তবে তোকে বলি অমিয়, বউমা ভারী ভাল হয়েছে। পরিচয় দিতে কত যত্নআত্তি করল। আজকালকার মেয়েদের মতো নয়।

অমিয় উত্তর দিল না।

অমিয়।

বলুন পিসেমশাই।

পারিস তো বিয়ের আগে হাসিকে পাঠিয়ে দিস।

দেখি।

দেখিটেখি নয়, এয়োর কাজ করার লোক নেই।

আচ্ছা।

ছাড়ছি, বলে পিসেমশাই ফোন রাখলেন।

ফোনটা রেখে অমিয় তিন বুড়োর দিকে তাকাল, তিনজনই পাথর হয়ে বসে আছে।

একেই কি স্থবিরতা বলে! তান্ত্রিক লোকটা এক বার চোখ তুলে অমিয়র দিকে তাকায়, মাথায় জটা, কপালে মস্ত লাল একটা ফোঁটা, চোখ দু'টোয় বেশ তীব্র চাউনি। হেসে এবং তাকিয়ে হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল, টাকা!

অমিয় হাসে। উলটো দিকের দুই বুড়ো খুব আগ্রহের সঙ্গে তান্ত্রিকের দিকে ঝুঁকে বসল, বাবা যদি এবার কিছু বাণী দেন।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল, টাকা।

তান্ত্রিক তার দুই ভক্তের দিকে চেয়ে আস্তে করে বলল, টাকা।

ভক্ত দু'জন কী বুঝল কে জানে। জুল জুল করে চেয়ে থাকে।

অফিসঘরে এসে অমিয় ফাঁকা ঘরটার চার দিকে চাইল। কেউ নেই। কাগজপত্র হাওয়ায় নড়ে শব্দ করছে। পুরনো ফ্যান থেকে একটা ঘট-ঘটাং শব্দ উঠছে।

কিছুক্ষণ বসে থাকল অমিয়। রেখার বিয়ে, এক হাজার টাকা দিতে হবে।

অমিয় বেরিয়ে এল।

স্কুটারটা এখনও তার আছে। বেশিদিন থাকবে না। কল্যাণকে সে দিয়ে দিয়েছে, যতদিন ও না নেয় তত দিন তার। আহমদ একটা মফস্সলের লোককে জাঙ্গিয়া গছানোর চেষ্টা করছে। অমিয়কে দেখে নিচু গলায় বলল, সাহা ব্রাদার্স থেকে লোক এসেছিল তাগাদায়, হটিয়ে দিয়েছি। আবার তিনটের পর আসবে।

অমিয় উত্তর না-দিয়ে গিয়ে স্কুটার চালু করে।

যে-ব্যাঙ্কে অমিয়র অ্যাকাউন্ট আছে তা অনেকটা তার ঘরবাড়ির মতো হয়ে গেছে, বহুকাল ধরে একই ব্যাঙ্কে সে টাকা রাখছে, তুলছে, চেক বা ড্রাফট ভাঙাচ্ছে। সবাই মুখ-চেনা হয়ে গেছে। কেউ কেউ একটু বেশি চেনা। এবং একজনের সঙ্গে পরিচয় আরও একটু গভীর।

ব্যাঙ্কের বাইরে স্কুটার রেখে অমিয় ভিতরে আসে! সোনাদার ব্যাঙ্ক যেমন বড়, আর হালফ্যাশানের এ-ব্যাঙ্কটা তেমন নয়। প্রাইভেট আমল থেকেই এর মলিন দশা, কাউন্টারের পুরনো কাঠ গাঢ় খয়েরি রং ধরেছে, দেয়ালের রং বিবর্ণ, কাঠের পার্টিশনগুলো নড়বড় করে।

কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা অমিয় বহু দিন হল বন্ধ করে দিয়েছে। সেভিংসে কিছু টাকা থাকা সম্ভব, পাশবইটা বহুকাল এন্ট্রি করানো হয়নি। কত টাকা আছে কে জানে।

টোকেন ইসু করার কাউন্টারে এক সময়ে নীপা চক্রবর্তী বসত। ভিতরের দিককার একটা ঘরে বসে আপন মনে কাজ করে। পাবলিকের সামনে আর থাকে না।

কাউন্টারের মেয়েটি ফোর ওয়ান নাইন নাইন অ্যাকাউন্ট লেজার খুলে দেখে বলল, না, হাজার টাকা তো নেই। দু'শো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে!

অমিয় যন্ত্রের মতো শব্দ করে— ও।

আরও দু'টো ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে অমিয়র। কিন্তু সেখানে আর যাওয়ার আগ্রহ হয় না। খুব বেশি নেই। যা আছে তাতে হাত দেওয়া যায় না। হাসি চলে যাবে। অনেক পেমেন্ট বাকি। একটা হতাশা ভর করে তাকে। মুখটা বিস্বাদ। খালি পেটে সম্ভবত পিত্ত পড়েছে। মাথার মধ্যে একটা রিমঝিম। চোখের সামনে একটু অন্ধকার, অন্ধকারে উজ্জ্বল কয়েকটি তারা খেলা করে মিলিয়ে গেল। দুর্বলতা থেকে এ-রকম হয়।

দু'টো বাজতে আর খুব বেশি দেরি নেই। বেলা দু'টোয় সব জায়গায় টাকা-পয়সার ওপর ঝাঁপ পড়ে যায়।

ভিতরের দিকে একটা করিডোর গেছে। ওদিকে একটা বাইরে যাওয়ার দরজা আছে। ব্যাঙ্কের সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে ওদিক দিয়ে যাতায়াত করে লোক। ব্যাঙ্ক আওয়ারের পরে এসেও বহু দিন ওই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে অমিয়, চেক ক্যাশ করে নিয়ে গেছে। নীপা চক্রবর্তী ওইটুকু ভালবাসা দেখাত।

দু'শো পঁয়ত্রিশ টাকায় হাত দিল না অমিয়। থাকগে। সে করিডোর ধরে ভিতরের পার্টিশনের কাছে এসে দাঁড়ায়। কাঠের পার্টিশনে কাচ লাগিয়ে বাহার করার চেষ্টা হয়েছে। ময়লা ঘোলা কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় লম্বা লম্বা টেবিলের ওপর ঝুঁকে কয়েকজন কাজ করছে। তৃতীয়জন নীপা। শ্যামলা রং রোগা শরীরে ইদানীং একটু মাংস লেগেছে। মুখখানা নোয়ানো বলে ভাল দেখা যায় না। কিন্তু অমিয় জানে মুখখানা ভালই নীপার। টসটসে মুখ বলতে যা বোঝায় তা-ই। বড় বড় দু'খানা চোখ ভরে একটা নরম সৌন্দর্য ছড়িয়ে থাকে। চোখে কাজল দেয় নীপা, কপালে টিপ পরে, সাদা খোলের শাড়ি পরে বেশির ভাগ সময়ে। রঙিন পরলে হালকা রঙা। গায়ের রং চাপা বলে চড়া সাজ কখনও করে না। তাতে ও ফুটে ওঠে বেশি।

অমিয়র সঙ্গে নীপার এমনিতে কোনও সম্পর্ক ছিল না।

চেক জমা দিয়ে টোকেন নেওয়ার সময়ে, বা অ্যাকাউন্টের টাকার অঙ্ক জানতে এসে, মুখোমুখি একটু বেশিক্ষণ কি দাঁড়াত অমিয়?

চোখে চোখ পড়লে সহজে চোখ সরাত না বোধহয়? মাঝে মাঝে একটু-আধটু হাসত কি? সে যাই হোক, তাদের চেনাজানা ছিল খুব সহৃদয়তায় ভরা। অনুভূতিশীল। ব্যাঙ্ক আওয়ার্সের পরে এসে অমিয় বলত, একটু জ্বালাতে এলাম।

নীপা মৃদু অহংকারী হাসি হেসে বলেছে, কে না জ্বালায়! জ্বলে যাচ্ছি। দিন কী আছে...বলে হাত বাড়িয়ে চেক নিত।

রোগা মেয়ে পছন্দ করত অমিয়। মোটা বা বেশি স্বাস্থ্যবতী তার পছন্দের নয়। বুকের স্নিগ্ধ ফল দু'টি মুখ তুলে চেয়ে থেকেছে পুরুষের দিকে। কনুই বা কবজির হাড় তেকোনা হয়ে চামড়া ফুঁড়ে উঠে থাকত না। শরীরের চেয়ে অনেক আকর্ষক ছিল গলার স্বরে নম্রতা। অমিয় ছাড়া আর কাউকে

কখনও ঠাট্টা করে কথার উত্তর দিয়েছে এমনটা অমিয় দেখেনি। খুব সিরিয়াস ভাবে কাজ করত। মেয়েরা অফিসের কর্মচারী হিসেবে বেশির ভাগই ভাল হয় না। যেখানে তিন-চারটে মেয়ে জোটে সেখানে কাজ হওয়া আরও মুশকিল! কিন্তু নীপা ছিল অন্য রকম। শনিবার যখন প্রচণ্ড রাশ হয়, কিংবা কোনও ছুটির আগে যখন টাকা তোলার ধুম পড়ে যায় তখনও নীপাকে বরাবর নিচু গলায় লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে অমিয়, দেখেছে মুখে স্নিগ্ধ হাসি, অবিরল ব্যস্ততার মধ্যেও নানা লোকের অপ্রয়োজনীয় বোকা প্রশ্নের উত্তর দিতে। একদিন দু'জন অল্পবয়সি ছোকরা স্রেফ ইয়ার্কি দিতে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়েছিল। তারা উইথড্রয়াল স্লিপ নিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা লিখে জমা দিয়ে টোকেন নিল। ব্যাপারটা ধরতে দু'মিনিটের বেশি লাগেনি নীপার। লেজার বইটা খুলে অ্যাকাউন্ট দেখে যখন তার উচিত ছিল দারোয়ান ডেকে ছোঁড়া দু'টোকে বের করে দেওয়া, তখনও সে বিনীত ভাবে তাদের ডেকে বলেছিল—সইয়ে যে নাম লিখেছেন তার সঙ্গে অ্যাকাউন্টের নাম মিলছে না। ছেলে দু'টো সাহস পেয়ে আরও কিছু ইয়ারকি দেয়, একজন বলে, তা হলে অ্যাকাউন্ট খুলব। ফর্ম দিন। নীপা আশ্চর্য, ধৈর্য ধরে রেখে ওদের ফর্মও দিয়েছিল যেটা ওরা কিছুক্ষণ কাটাকাটি করে ছিঁড়ে ফেলে চলে যায়। দৃশ্যটা অমিয়র চোখের সামনে ঘটে। নীপা স্বাভাবিক হাসি হেসে বলেছিল তাকে, এ-রকম প্রায়ই হয়। আমরা কিছু মনে করি না।

তখনও হাসির সঙ্গে দেখা হয়নি। এ হচ্ছে প্রাক-হাসিতিক ঘটনা। তখন অমিয় মাঝে মাঝে নীপার কথা ভাবত বিরলে। মনে-পড়া শুরু হয়েছিল, ভাবতে ভাল লাগত। ঘন ঘন তখন ব্যাঙ্কে যাওয়ার দরকার পড়ত তার। রাজেন বা সেনগুপ্তকে পাঠালেও যখন কাজ চলে তখনও সে নিজেই যেত। নীপা যেদিন আসত না সেদিন ক্ষুণ্ণ হত সে। পরদিন এলে অনুযোগ করত, কাল আসেননি কেন? কাল আমার পেমেন্ট পেতে অনেক দেরি হয়েছে।

নীপা সে-অনুযোগের সহৃদয় উত্তর দিত। বলত, রোজ তো আসি। এক-আধদিন না এলে বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়। যন্ত্র তো নই।

এ-ধরনের কথা নীপা একমাত্র তার সঙ্গেই বলত এবং তখন চোখে চোখে মানুষের গভীর হৃদয় গোপন বার্তা পাঠাত না কি।

ব্যাঙ্কের বাইরে দেখা হয়েছিল মোটে এক দিন। গ্র্যান্ট স্ট্রিটের একটা দোকানে নীপা পুজোর জামা-কাপড় কিনতে ঢুকেছিল। অফিসের পাড়া। অমিয় ডাব খাচ্ছিল পাশের পানের দোকানটায়। নীপা দেখেনি। অমিয় ভিতরে ঢুকে নীপাকে ধরল, এই যে!

নীপার সঙ্গে অফিসের আরও দু'টি মেয়ে ছিল। তারা একটু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে দেখল অমিয়কে। নীপারই ভ্রূ সহজ ছিল। মুখে হাসি ফুটল সহৃদয়তার। অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়ার কথা বলতে পারত। কিন্তু খুব আন্তরিক লাজুক গলায় একটা ঘন নীল পাছাপেড়ে শাড়ি তুলে দেখিয়ে বলল, দেখুন তো, এটা অদিতিকে মানাবে না? অদিতি সঙ্গী মেয়েদের একজন। ফরসা। অমিয় হেসে বলে, নীল শাড়ি সবাইকে মানায়।

যতক্ষণ শাড়ি কিনেছিল ওরা ততক্ষণ নীপা চোখের শাসনে আটকে রাখল অমিয়কে। অমিয় যত বার বলে, এবার যাই, কাজ আছে। তত বার নীপা বলে, দাঁড়ান। মেয়েরা ঠিক ঠিক শাড়ি পছন্দ করতে পারে না। পুরুষেরা অনেকে পারে। আমাদের শাড়ি পছন্দ করা হয়ে গেলে যাবেন।

শাড়ি কেনা হলে সঙ্গিনীরা চলে গেল। বোধহয় একটা ষড়যন্ত্র করেই। নীপা একা হয়ে বলল, এবার আমাকে সাউথের বাসে তুলে দিন তো।

অমিয় তার স্কুটার দেখিয়ে বলে, বাসের দরকার কী! যদি সাহস থাকে তো উঠে পড়ুন। পৌঁছে দিয়ে আসি।

ও বাবা! স্কুটার! পড়ে-টড়ে যাব, কখনও চড়িনি।

অবশেষে উঠেছিল নীপা স্কুটারেই। মাঝপথে একটা রেস্টুরেন্টে চা খেয়ে নিয়েছিল তারা।

অনেক কথাও হয়েছিল। এলোমেলো কথা। আর কথার মাঝখানে লজ্জার সংকোচের এবং আকর্ষণের ঝাপটা এসে লাগছিল। মাঝে মাঝে কথা বন্ধ হয়ে যায়। নীরবতা নৈকট্যকে অদ্ভুতভাবে টের পায় তারা।

শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হয়নি। টালিগঞ্জের খাল পাড় পর্যন্ত নীপাকে পৌঁছে দিল অমিয়। তারপর সিগারেট জ্বেলে থেমে-থাকা স্কুটারে বসে দেখল নীপা নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময়ে অনেক বার পিছু ফিরে চেয়ে দেখল তাকে। মুখটায় স্মিত গভীর একটা বিশ্বস্ততা।

না, কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত। হয়তো হতে পারত। মাঝপথে হাসি এসে সব তছনছ করে দিল। তুলে নিল তাকে। নিল, আবার নিলও না। বড়ঘরের মেয়েরা যেমন নিত্য নূতন জিনিস কিনে সে-সব জিনিসের কথা ভুলে যায় দু'দিন পর। অবহেলায় ফেলে রেখে দেয়। তেমনি অমিয়কে কবে ভুলে গেছে হাসি।

ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে কয়েক পলক চেয়ে থাকে অমিয়। নীপা টের পায়। মুখ তোলে।

অমিয় একটু হাসে। নীপাও একটু হাসে। ওর সিঁথিতে সিঁদুর। হাসিটা তেমনি। সহৃদয়তায় ভরা। দেখে ভিতরে একরকম ছুঁচ ফোটার যন্ত্রণা হয়। ঘোলা ময়লা কাচের ভিতর দিয়ে প্রায়ান্ধকার করিডোরে দাঁড়ানো অমিয়কে চিনতে পেরেছে নীপা।

চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে এল।

কী খবর? আবার বুঝি জ্বালাতে এসেছেন? নীপা করিডোরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে।

অমিয় মাথা নাড়ল। বলল, না। কোনও দিন আপনাকে কাজ ছাড়া দেখি না। আজও দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

কাজের জায়গায় দেখা হলে কাজ ছাড়া কী করে দেখবেন?

অমিয়র এখন আর সাহসের অভাব হয় না। সে বলে, অকাজের জায়গায় কেমন দেখাবে কে জানে!

আশেপাশে ব্যস্তসমস্ত লোকেরা যাচ্ছে-আসছে। নীপা বলে, বলুন না বাবা কী কাজ আছে। কোনও চেকের ক্লিয়ারেন্স আসেনি নাকি!

ও-সব নয়। অ্যাকাউন্টে টাকাই নেই। চেক জমা দিই না অনেক দিন।

সে তো জানি।

কী করে জানলেন?

আপনার অ্যাকাউন্টটা দেখি মাঝে মাঝে। আজকাল কেবল উইথড্রয়াল হচ্ছে, জমা পড়ে না। কী ব্যাপার?

অমিয় একটা শ্বাস ফেলে। মাথা নেড়ে বলে, আপনি আমাকে মনে রেখেছেন!

মনে রাখব না! ব্যাঙ্কের সব ক্লায়েন্টকে আমার মনে থাকে।

বানানো কথা। মিথ্যে।

অমিয় একটা বিষ-বোলতার কামড় খায় এই কথায়। বলে, কোনও পক্ষপাত নেই, না?

নীপার মুখে একটু দুঃখের ছায়া খোঁজে অমিয়। পায় না। হাসিকে বিয়ে করার পর মাস দুই বাদে নীপার বিয়ে হয়। কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করেনি। জানায়ওনি। কিন্তু জানাবার দরকার হয় না। অমিয় তখন বিয়ের পর দেদার টাকা ওড়াত। হাসিকে স্কুটারের পিছনে বসিয়ে নিয়ে আসত ব্যাঙ্কে। টাকা তুলত আর টোকেন নিয়ে অপেক্ষা করার সময় কলকলাত দু'জনে। সে-সব কি দেখেনি নীপা? তেমনি আবার দু'মাস বাদে নীপার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছে অমিয়। কেউ কাউকে প্রশ্ন করেনি। জেনে গেছে।

নীপার মুখে তাই কোনও দুঃখের ছায়া নেই। কিন্তু তবু সে কেন অমিয়র অ্যাকাউন্টের খবর রাখে?

অমিয় বলে, আপনার টিফিনের সময় হয়নি?

হয়ে গেছে। কেন?

হতাশ অমিয় বলে, হয়ে গেছে! আমি ভাবছিলাম আজ আপনাকে খাওয়াব।

তাই বা কেন! কোনও খাওয়া কি পাওনা হয়েছে। নীপা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে হাসল।

অমিয় মাথা নেড়ে বলল, খাওয়ার জন্য নয়।

তা হলে?

অমিয় বুঝল, নীপার সঙ্গে আসলে তার কোনও বোঝাবুঝি তৈরি হয়নি। এমন অধিকার তার নেই যে সে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে যেতে পারে বিশ্বস্ত নীপাকে। এখন তার উচিত হবে ভদ্রতাসূচক দু'-একটি কথা বলে চলে যাওয়া।

কিন্তু চলে যেতে পারে না অমিয়। আস্তে করে বলে, আপনি মিস চক্রবর্তী ছিলেন, এখন কী হয়েছেন?

নীপা একটু তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বোধহয় মনে মনে বলে, আর যা-ই হই, বাগচী হইনি। তাকিয়ে থেকে নীপা মৃদুস্বরে বলে, আমার বুঝি কাজ নেই। কী দরকার বললেই তো হয়।

আমার জানা দরকার, আপনি চক্রবর্তী ছেড়ে কী হয়েছেন!

নীপা মৃদু হাসল বটে, কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে গেল একটু। বলল, চক্রবর্তীদের অনেক গোত্র হয় জানেন তো! আমি চক্রবর্তী থেকে চক্রবর্তীই হয়েছি। গোত্রটা আলাদা। জেনে হবে কী!

এমনি, কৌতূহল।

আপনার চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে। আনঅফিশিয়াল কথাটা বলে ফেলেই বোধহয় লজ্জা পায় নীপা। মুখ ফিরিয়ে বলে, চলি।

অমিয় মাথা নাড়ল, তারপর করিডোর ধরে হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। দরজাটার কাছ বরাবর এসে ফিরে তাকায়। নীপা দাঁড়িয়ে আছে।

অন্য মেয়ে হলে এই অবস্থায় চোখে চোখ পড়তেই পালিয়ে যেত। নীপা পালাল না। হাতটা তুলে তাকে থামতে ইঙ্গিত করল। তারপর ঢুকে গেল ভিতরে।

অমিয় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করে। একটু বাদেই নীপা আসে। হাতে ব্যাগ, ছোট ছাতা, মুখখানায় একটু রক্তাভা। কাছে এসে বলে, আজ ছুটি নিয়ে এলাম। বাড়ি যাব।

অমিয় অবাক হয়। বলে, বাড়ি যাবেন?

হ্যাঁ।

তা হলে আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন যে!

নীপা উত্তর দিল না।

রাস্তায় এসে তারা ঝিরঝিরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। অদূরে অমিয়র স্কুটার। অমিয় স্কুটারটা দেখিয়ে বলে, আজ আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি। যাবেন?

মুখ নিচু করে নীপা মাথা নেড়ে বলে, না। রাধাবাজারে আমার স্বামীর ঘড়ির দোকান আছে। কাছেই। এখন ওখানে যাব। সেখানে আমাদের গাড়ি আছে। তাতে ফিরব। এখন আমি নর্থ-এ থাকি। পাইকপাড়ায়।

ও। অমিয় বুঝতে একটু সময় নেয়। নীপাকে ছাড়া নীপার আর কিছুই জানত না অমিয়। এখনও জানে না। শুধু ঘড়ির দোকান, স্বামী, গাড়ি আর পাইকপাড়া শব্দগুলো তার ভিতরে খুচরো পয়সার মতো হাত খসে পড়ে গিয়ে গড়াতে থাকে।

আপনি কী যেন বলতে চেয়েছিলেন। বললেন না।

অমিয় কষ্টে হাসে। ঘড়ির দোকানে স্বামী। স্বামীর গাড়ি। আর গাড়িতে পাইকপাড়া। এ সবই খুব রহস্যময় লাগে তার কাছে। নীপার কেন স্বামী থাকবে। সে কেন স্বামীর গাড়িতে পাইকপাড়া যাবে।

কেন সে আজও অমিয়র নিজস্ব জিনিস নয়, তা ভেবে এক ধরনের ক্রোধ আর হতাশা মিশে যায় তার ভিতরে।

সে বলল, শুনুন।

কী?

আপনার সম্পর্কে কিছুই কোনও দিন জেনে নেওয়া হয়নি।

নীপা মৃদু হেসে বলে, জানাটা কি দরকার ছিল?

আমার সম্পর্কেও আপনি কিছু জানেন না।

না। তবে আপনার বউকে দেখেছি। খুব সুন্দর বউ।

অমিয় স্থির চোখে নীপাকে দেখে। ঠিক। হাসি নীপার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী। হাসিও কালো। নীপার মতোই। তবু হাসির মুখ-চোখ, শরীরের গঠন অনেক উঁচু জাতের। নীপার হিংসে হতে পারে।

অমিয় মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, আমরা কেউ কারও সম্পর্কে জানলাম না কেন?

নীপা এ-কথার উত্তর দিল না। কারণ, এ বড় বিপজ্জনক কথা। উত্তর হয় না।

অমিয় বলল, স্কুটার থাক, চলুন আপনাকে রাধাবাজারের দিকে একটু এগিয়ে দিই। পথে বরং এক কাপ চা খেয়ে নেব।

তারা হাঁটতে থাকে। নীপা মাথা নত রাখে। অমিয়কে সে যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিচ্ছে সে-বিষয়ে সচেতন। দূরত্ব বজায় রাখছে। বোধহয় ভয়ও পাচ্ছে মনে মনে। আবার বোধহয় চাইছেও, অমিয় তাকে কিছু বলুক।

আজ এমন করছেন, কী হয়েছে আপনার? নীপা তার মস্ত চোখ তুলে হঠাৎ বলে।

আশপাশ দিয়ে কলকাতার দৃশ্যাবলী মিলিয়ে যাচ্ছে ডাইলিউশনে। রেলগাড়ির মতো বয়ে যাচ্ছে কলকাতা। সেই গতিশীলতার মধ্যে তারা ধীরে হাঁটে। অমিয় বলে, আমার ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট কী বলছে?

নীপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ও!

আবার হাঁটতে থাকে তারা। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট পার হতে হতে অমিয় বলে, আমি ভাল নেই নীপা।

নিজের নাম শুনে একটু চমকে ওঠে নীপা। চমকটা ঢাকা দিয়ে মৃদুস্বরে বলে, কেন? ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের কথা ভেবে?

না। অমিয় বলে, আমি তোমাকে ভালবাসতাম। কিন্তু সে-কথা কখনও বলা হয়নি। এই অপরাধে।

নীপা ঠোঁট কামড়ায়, মাথা নত করে।

কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে। চার দিকে মানুষ আর মানুষের মধ্যে, প্রবল গাড়ির আওয়াজের মধ্যে এক নিস্তব্ধতার ঘেরাটোপ নেমে আসে।

অমিয় হঠাৎ দাঁড়ায়। ভিতরে বিষবাষ্প জমে উঠেছে আজ।

নীপা তার দিকে মুখ তুলে তাকায়। দুটি চোখ বাষ্পময়। কিছু বলতে চায়।

অমিয় আস্তে করে বলে, দেখা হবে। আবার।

কোথায়?

অমিয় তেমনি আস্তে টরে-টক্কার মতো মৃদু লয়ে বলে, একটা স্টিমারঘাট আছে। সেইখানে সকলের দেখা হয়।

কোথায়? নীপার কপালে ভাঁজ পড়ে।

ধু-ধু গড়ানে বালিয়াড়ি বহু দূর নেমে গেছে। তারপর কালো গভীর জল। একটা ফাঁকা শূন্য

জেটি। অথৈ জল। ওপরে একটা কালো আকাশ ঝুঁকে আছে। বালির ওপরে পড়ে আছে একটা সাপের খোলস। হাহাকার করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেখানে।

অবাক চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা।

অমিয় বলে, দেখা হবে।

তারপর হেঁটে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল অমিয়।

নীপা খুব ধীরে ধীরে হাঁটে। ভাবে। মুখে কয়েকটা দুশ্চিন্তার রেখা খেলা করে যায়। তারপর কখন যেন চোখ ভরে জল আসে। জলভরা চোখে চেয়ে দেখে। কলকাতা শহরটা কেমন ভেঙেচুরে গেছে! আবছা, অস্পষ্ট আর অলীক হয়ে গেল চারধারে। অর্থহীন হয়ে গেল জীবন। বেলুনের মতো ফেটে গেল বাস্তবটা।

চোখের জল মুছে নেয় নীপা। ভুল রাস্তায় চলে যাচ্ছিল। সতর্ক হয়ে ফিরে এল সঠিক রাস্তায়। মানুষটা কেমন! খুব অদ্ভুত, না? ফের জল আসে চোখে। ওর অ্যাকাউন্টে মোটে দু'শো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে, নীপা জানে।

স্বামীর দোকানের দিকে হাঁটতে থাকে নীপা। কলকাতা শহর চার দিকে, তবু কেবলই মনে হয়, বালিয়াড়ির ভিতরে ডুবে যাচ্ছে পা। সামনে জল। জলের শব্দ। কেউ কোথাও নেই, কেবল বাতাস ঝড়ের মতো বয়ে যায়। মাথার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে।

টাপে টোপে প্যান্ডেলের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে উঁকি দেয় কুকুরের মুখ। তারা আসছে সতর্ক পায়ে। ক্রমে ক্রমে। বেড়ালেরা আসছে নিঃশব্দে, ভিখিরিরা বাইরের গাছতলায় অনেকক্ষণ বসে আছে। একটা ভিখিরির ছেলে ঢুকে গেছে প্যান্ডেলে। কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে পাতার ঠোঙায় কুড়িয়ে নিচ্ছে এঁটো-কাঁটা। মাংসের হাড়, লুচির টুকরো, মাছের কাঁটা জড়ো করছে এক জায়গায়। খাঁ খাঁ করছে প্যান্ডেল। স্টিক লাইট জ্বলছে, ঘুরছে পাখা, এঁটো পাতা উড়ে উড়ে পড়ছে মাটিতে। উৎসব-শেষের বীভৎসতা চার দিকে।

বর-বউ শোওয়ার ঘরে চলে গেল। নিয়ম নয়, কিন্তু আজকাল তো কেউ আর বাসর জাগে না। প্যান্ডেলের এক কোণে এখনও যজ্ঞের ছাই পড়ে আছে, দু'টো রং করা চিত্রিত পিঁড়ি এখনও তোলা হয়নি, দেবদারু পাতায় সাজানো দরজায় মঙ্গল কলস, রঙিন কাগজের শিকল দুলছে হাওয়ায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অমিয় দৃশ্যটা দেখে। সে এ-রকমভাবে বিয়ে করেনি। কয়েকটা সই করে তারা বিছানায় চলে গিয়েছিল।

পিসেমশাইয়ের হাতে এক হাজার টাকা দেওয়া গেছে অবশেষে। গতকাল সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েছে অমিয়। টাকা-টাকা করে। প্যাটারসনের লাহিড়ী শুনে বলল, দূর মশাই, কে-বি ফিট করুন না।

কে-বি কী?

কাবলে। আপনার যদি জানাশুনো না থাকে আমি ফিট করে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধানে ট্যাকল করবেন। এক হাজার ধার নিলে দু' হাজার লিখে দিতে হবে।

সে কী?

ভয় নেই, আসলে ওরা লাইসেন্স-ওলা মানিলেন্ডার, গভর্নমেন্টের বেঁধে-দেওয়া সুদের বেশি আইনত নিতে পারে না। আপনাকে লেখাবে ছয় পারসেন্ট সুদ, নেবে তার দ্বিগুণের বেশি। যদি বাইচান্স আপনি সুদ নিয়ে ঝামেলা করেন, তখন মামলা করবে দু' হাজার টাকার ওপর। আর যদি

সুদ ঠিক মতো দিয়ে এক হাজার শোধ দেন তা হলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু সাবধানে ট্যাকল করবেন।

আজ সকালে টাকা পেয়ে গেছে অমিয়। এক হাজার। পিসেমশাইকে কথামতো দেওয়া গেল। রেখার বর ভালই হল। টাটার ইঞ্জিনিয়ার। দু' হাজার নগদ, গোদরেজের আলমারি, সিঙ্গল খাট দু'টো, সোফাসেট, পনেরো ভরি গয়না। পিসেমশাইয়ের বোধহয় আকাশ-বাতাস চাঁদ-সূর্যের আলো ছাড়া আর কিছু রইল না। অমিয়র জন্য সারা দিন হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলেন বুড়ো মানুষ। অমিয় এসে টাকাটা হাতে দিতেই উদ্ভাসিত হয়ে গেল মুখখানা। চোখের কোলে জল। বললেন, ভাবলাম তুই বুঝি আর এলি না! ভয়ে তোর অফিসে ফোন করিনি, যদি খারাপ খবর শুনি!

অমিয় একটু হেসেছিল।

হাসি আজ কিছুতেই ট্যাক্সিতে উঠতে চায়নি। বলেছে, এত সুন্দর রাত আজ। বাতাস দিচ্ছে, চাঁদ উঠেছে, বন্ধ গাড়িতে বসে কেন যাব! আমাকে তোমার স্কুটারে নিয়ে চলো।

তা-ই এনেছে অমিয়। তার কোমর ধরে বসে এল হাসি। মেয়েদের দঙ্গলে মিশে গেছে এখন। উৎসবে হাসিকে চেনা যায় না।

রাস্তায় পার্ক-করা শেষ দু'টো মার্ক টু গাড়ির একটা ছেড়ে গেল সোনাদাকে নিয়ে। যাওয়ার সময়ে সোনাদা মুখ বাড়িয়ে বলল, অমিয় তোর সঙ্গে কথা আছে।

কী কথা?

সেই যে, মনে নেই কী বলেছিলি?

কী সোনাদা?

তুই বড় পাজি অমিয়, চিরকাল পাজি ছিলি।

কেন?

আমার বয়স হচ্ছে না রে? এই বয়সে মানুষ একটু গুছিয়ে বসতে চায়, এই বয়সেই তো সংসারের ভোগ-সুখ, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে।

অমিয় চেঁচিয়ে হেসে বলেছে, ঠিকই তো।

তবে তুই কেন আমাকে স্টিমারঘাটের কথা বলতে গেলি?

কেন, কী হয়েছে?

অমিয়, তুই কী বলিস তুই জানিস না! তুই চিরকালের পাজি। জানিস না, ওটা বলতে নেই! অমিয়, তুই চলে আসার পর থেকেই আমার বড় অস্থির লাগে। রাতে ঘুম হয় না। সারা দিন যখন-তখন অন্যমনস্ক হয়ে যাই। কেবলই মনে পড়ে— স্টিমারঘাট— স্টিমারঘাট।

শেষ মার্ক টু-টা দাঁড়িয়ে আছে। ওটা কার তা জানে না অমিয়। গাড়িটার আড়ালে তার স্কুটার হিম হয়ে আছে। হ্যান্ডেলটা এক দিকে বাঁকানো। দেখে মনে হয়, ক্লান্ত মানুষ যেমন বসে বসে ঘুমোয় তেমনি ঘুমোচ্ছে।

পরিবেশনের সময়ে এঁটো-আঁটার গন্ধে গা গুলিয়েছে বলে কিছু খায়নি অমিয়। হাসি কখন আসবে কে জানে! রাত অনেক হয়েছে। পায়ে পায়ে প্যান্ডেল ছেড়ে খোলা মাঠে আসে অমিয়। ঠান্ডা। দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছে। সেই বাতাসে আকাশ-জোড়া এক বৃক্ষ নড়ে ওঠে, বকুলের মতো খসে পড়ে একটি তারা।

অন্ধকার বারান্দায় দুই বুড়ো বসে আছেন। বরের মামা, আর পিসেমশাই। বরের মামার দু'গালে পানের ঢিবি। তিনি পিসেমশাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলছেন, পুরুতরা আজকাল বড় শর্টকার্ট শিখেছে বিয়াই, আধ ঘণ্টায় কুসুমডিঙে সেরে ফেলল। আমার বিয়ের সময়ে চার ঘণ্টা লেগেছিল যজ্ঞে। কনে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাকে ঢুলতে দেখে আমি চিমটি কেটে জাগিয়ে দিই।

পিসেমশাই মুখ তুলে বলে, তুই কিছু খাসনি অমিয়?

না। বমি-বমি করছে।

খুব খেটেছিস। সোমাকে বলি তোকে একটু শরবত করে দিক।

না, আমি এবার চলে যাই।

অমিয়, লোকজন খেয়ে কী বলল? কিছু দোষ ধরেনি তো?

বরের মামা পিচ ফেলে বললেন, আজকালকার বাজারে যা করেছেন যথেষ্ট।

ঘরে মেয়েদের ভিড়। অমিয় দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে। হাসিকে দেখা যায় না।

সেই ভিড় থেকে সোমাদি এগিয়ে আসে, অমিয়, কী খাবি?

কিছু না।

আমি তো নেমন্তন্নের রান্না খেতে পারি না, তাই এ-ঘরে একটু ঝোল-ভাত রেঁধে রেখেছি। খাবি তো আয় ভাগ করে খাই।

হাসি কোথায় সোমাদি?

ওকে তো সব ঘিরে রেখেছে। বলছে, তুমি ফাঁকি দিয়ে রেজেস্ট্রি বিয়ে করেছ, আমাদের খাওয়া মার গেছে। এবার খাওয়াও। অমিয়, হাসি দেখতে কী সুন্দর হয়েছে।

রাত অনেক হয়ে গেল সোমাদি। হাসিকে ডাকো।

তোর তো স্কুটার আছে, ভুস করে চলে যাবি। রাত হলে ভয় কী? তোকে একটু দই-মিষ্টি এনে দিই?

সোমাদি, তুমি এত কষ্ট করো কেন?

কীসের কষ্ট?

খুব খাটো তুমি, টিফিনের পয়সা বাঁচাও, এত খেটে কী হবে সোমাদি?

তোকে তো বলেছি, আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন?

সোমাদি, একটা স্টিমারঘাট—

অমিয়, আমার এখনও অনেক কিছু করা বাকি, টাকা জমাচ্ছি, আমার অনেক দিনের শখ, একটা রেকর্ড-চেঞ্জার কিনব। রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের গানের অনেক রেকর্ড। শোন অমিয়. তুই নাকি রেখার বিয়ের জন্য মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়েছিস। সত্যি?

সোমাদি, তোমাকে সেদিন বলছিলাম—

কী বলছিলি?

একটা ফেরিঘাটের কথা—

অমিয়, মেসোমশাইকে এক হাজার টাকা দিয়ে খুব ভাল করেছিস। আমারও দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কী করে দেব? জানিস তো, গত চোদ্দো-পনেরো বছর আমার চাকরির ওপরই সংসার চলছে। রেখাকে একটা আংটি দিলাম, তাতেই ধার হয়ে গেল। তুই টাকা দিয়ে ভাল করেছিস। মেসোমশাই সবাইকে ডেকে ডেকে তোর দেওয়া টাকার কথা বলছেন।

সোমাদি—

শোন অমিয়, এখন আর আমার চাকরি করতে ভাল লাগে না রে। তুই যে সেদিন গিয়ে বললি, ভালবাসার লোক না থাকলে রোজগার করে সুখ নেই, সেটা বাজে কথা নয়। এখন আমি বুঝতে পারি সংসারে আমার যেটুকু আদর তা ওই চাকরিটার জন্য। এ-চাকরিটা যদি ছাড়ি তবে দেখব আমি কিছু নই, কেউ নই। আজকাল তাই ভীষণ টায়ার্ড লাগে। বাসায় ফিরে রাত্রে এমন মন খারাপ লাগে! একটা ইজিচেয়ার কিনেছি, সামনের মাসে কিনব একটা রেকর্ড-চেঞ্জার। বুঝলি অমিয়, বারান্দায় অন্ধকারে বসব। উঠোনে থাকবে অন্ধকার, চুপচাপ বসে চেঞ্জার চালিয়ে দেব— গান হবে— দুঃখের গান— বিরহের গান.... শুনতে শুনতে কাঁদব হয়তো— আর মনে পড়বে... কী মনে পড়বে রে অমিয়...?

অমিয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো জানো সোমাদি...

সোমাদি মাথা নেড়ে চাপা গলায় বলে, জানিই তো, জানব না কেন? মনে পড়বে...

পিসেমশাই সামনে এসে দাঁড়ান। কুঁজো দেখায় তাঁকে, বুড়ো দেখায়। অমিয়র দিকে অপলক একটু তাকিয়ে থেকে বলেন, আমি ভাবতাম ওর পিসিমা মরে গেছে বলেই বোধহয় অমিয় আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, কিন্তু তা নয়। সোমা, অমিয় আমাকে—

জানি মেসোমশাই। অমিয় বড় ভাল ছেলে।

পিসেমশাই শ্বাস ছেড়ে বলেন, আমি বড় একা হয়ে গেলাম। শেষ মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। সোমা, মাঝে মাঝে আসবি তো? অমিয় তুই?

আসব না কেন!

কী কথা হচ্ছিল তোদের?

সোমাদি মাথা নিচু করে বলে, কিছু না মেসোমশাই, অমিয় মাঝে মাঝে একটা ফেরিঘাটের কথা বলছে—

ফেরিঘাট! কীসের ফেরিঘাট? কী রে অমিয়?

স্টিমার বাঁধার জেটি, জল...

ওঃ। পিসেমশাই হাসেন, স্টিমারঘাট মনে পড়তেই খালাসিদের মাংস রান্নার গন্ধ নাকে এসে লাগে এখনও। গোয়ালন্দে পারাপারের সময়ে ওই গন্ধ যে কী ভাল লাগত। বুঝলি, বাহাদুরাবাদে একবার কাজলি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম—সরষেবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল— তেমন আর কখনও কি খাওয়া হবে? এক কাঠা চালের ভাত তুলে ফেলেছিলাম। তুই কোন ফেরিঘাটের কথা বলছিস অমিয়? গোয়ালন্দ? না কি...

কী জানি? আমি ঠিক জানি না। খুব উঁচু একটা বালিয়াড়ি গড়িয়ে নেমে গেছে বহু দূর পর্যন্ত... কালো ছোট্ট একটা জেটি... নির্জন... বালিতে একটা সাপের খোলস পড়ে আছে কেবল... আবছায়ায় জল দেখা যায়... সে কী জল...অনন্ত, অথৈ এক নদী বয়ে যাচ্ছে...

পিসেমশাই আর একটু কুঁজো হয়ে যান। একটা শ্বাস ফেলে বলেন, এখন এই বাড়িতে আমার একা কাটবে, বাদবাকি যে ক'টা দিন আছি। অমিয়, রাত হল রে, বউমাকে নিয়ে যাবি, অনেকটা রাস্তা, এইবার বেরিয়ে পড়। সোমা, তুই তো আজ যাবি না, না?

না।

অমিয় আর দেরি করিস না। সোমা, বউমাকে ডেকে দে।

দিই।

বড় একা লাগবে, বুঝলি অমিয়? মাঝে মাঝে বউমাকে নিয়ে চলে আসবি। দু'-চার দিন করে থেকে যাবি। মনে করিস, আমি তোর এক বুড়ো ছেলে, আমার তো কেউ রইল না...

অমিয়র স্কুটার ডাকছে। গুড় গুড় গুড় গুড়। পিছনে হাসি। বাতাস সামনে থেকে পিছনে বয়ে যাচ্ছে। তবু মাঝে মাঝে এক এক ঝলক হাসির গন্ধ এসে নাকে লাগে। হাসির গন্ধ! তা তো নয় হাসির আবার গন্ধ কী? ও তো ওর খোঁপার বেলফুলের গন্ধ, সেন্ট আর প্রসাধনের গন্ধ।

হাসির মুখ দেখতে পাচ্ছে না অমিয়। কেবল তার দু'খানা হাত অমিয়র কোমর বেষ্টন করে আছে। এক বার ঝুঁকে নিজের পেটের কাছে হাসির জড়িয়ে থাকা হাতের পাতাদু'টি দেখল অমিয়। আঙুলে আংটি ঝলসে ওঠে। মোমে মাজা আঙুলগুলি কী নরম হয়ে লেগে আছে তার পেটে।

হাসি দুরন্ত শ্বাসের সঙ্গে বলে, আরও জোরে চালাও না।

কেন?

জোরে না চালালে স্কুটারে ওঠার আনন্দ কী!

হাসি, আমার স্কুটারটা পুরনো হয়েছে। স্পিড নেয় না।

পচা, তোমার স্কুটারটা পচা।

অমিয় হাসে। তিন, সাড়ে তিন বছর আগে ক্যাথিড্রাল রোডে, এই স্কুটারে...

জ্যোৎস্না ফুটেছে কেমন, দেখছ?

হুঁ।

ঠিক দুধভাতের মতো জ্যোৎস্না, আমার খেতে ইচ্ছে করে।

হাসি, তুমি কবে যাচ্ছ?

তেরোই।

তোমার যদি টাকার দরকার থাকে...

সামনে ওটা কী, ওই উঁচু মতো?

গড়িয়াহাটা ব্রিজ।

ওমা! ওর ওপর দিয়ে তো রোজ যাই-আসি, কই অত উঁচু বলে তো মনে হয় না, ঠিক টিলার মতো দেখাচ্ছে দেখো। চা-বাগানে আমরা ছেলেবেলায় টিলা থেকে ছুটে নামতাম... একবার দৌড় শুরু করলে আর থামা যায় না, কেবলই গতি বেড়ে যায়।

হুঁ।

তোমার স্কুটারটা পচা। আর-একটু জোরে চালাও না।

কেন?

আমার স্পিড ভাল লাগে।

গুড় গুড় করে স্কুটার ডাকে। গড়িয়াহাটা ব্রিজের গোড়া থেকে চড়াই ভাঙে। অমিয় স্পষ্টই টের পায় তার বয়স্ক স্কুটারটার এই চড়াই ভাঙতে কষ্ট হচ্ছে। খুব বেশি দূর নয় আর, সে মনে মনে তার স্কুটারকে বলে, 'আর একটু কষ্ট করো স্কুটার। তারপর অন্ধকার সিঁড়ির নীচে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোবে।'

ব্রিজের ওপর ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়াবে?

হাসি, অনেক রাত হয়েছে।

ক'টা বাজে?

বারোটা চল্লিশ।

হোকগে। তুমি দাঁড়াও।

ব্রিজের ঠিক ওপরটায় বাতাসের জোর বেশি' আকাশের কাছাকাছি উঠে তারা দাঁড়ায়। হাসি রেলিঙের কাছে চলে যায়। ডেকে বলে, দেখো, কত দূর পর্যন্ত কী ভীষণ জ্যোৎস্না। সব দেখা যাচ্ছে। এত রাতে কলকাতা কখনও দেখিনি।

অমিয় বাতাসে সিগারেট ধরাতে পারছিল না। বার বার দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যাচ্ছে। সে স্কুটারের ওপর না-ধরানো সিগারেট মুখে নিয়ে বসে রইল। হাসি তাকে ডাকে না। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে হাসি একা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত অনন্ত শহরটি দেখে মুগ্ধ চোখে। এখন যদি নিঃশব্দে অমিয় তার স্কুটারকে ব্রিজের ঢালুর ওপর দিয়ে গড়িয়ে দেয়, যদি চলে যায়, তা হলে হাসি অনেকক্ষণ টেরই পাবে না। যে অমিয় চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরিয়ে স্কুটার এবং অমিয়কে না-দেখে একটুও অবাক হবে না হাসি। তার মনেও পড়বে না যে, এই ব্রিজের ওপর সে অমিয়র সঙ্গে এসেছিল, তার স্কুটারে। হাসির মনেই পড়বে না।

না-ধরানো সিগারেট মুখে অমিয় অপেক্ষা করে। বাতাসে আকাশজোড়া এক বৃক্ষ নড়ে। বকুলের মতো খসে পড়ে তারা। অমিয় অপেক্ষা করে।

এক দিন যায়। দু'দিন যায়।

দীর্ঘ টেন্ডার টাইপ করতে করতে অমিয়র কাঁধ ব্যথা করে। চোখে ঝাপসা দেখে। সিগারেটে-সিগারেটে জিভ বিস্বাদ। রাজেন চা এনে রেখে গেছে। খাওয়া হয়নি।

বাগচী। কল্যাণ ডাকে।

উঁ?

আপনার কি কিছু টাকার দরকার?

অমিয় হাসে।

রাজেনের কাছে আমি আরও ছ'শো টাকা রেখে দিয়েছি। আমি থাকি বা না-থাকি, যখন দরকার হয় নেবেন।

অনেক ধার হয়ে গেল মুখার্জি।

আপনার সময়টা ভাল যাচ্ছে না। সেনগুপ্তের কোনও পাত্তা পেলেন?

না।

কত টাকার বিল পেমেন্ট নিয়ে গেছে?

প্রায় সাত হাজার।

ওকে খুঁজে পেলে কী করবেন—

কিছুই না। কেবল একটা কথা বলব—

কী কথা?

বলব...

অমিয় আর বলে না। বলতে পারে না। টাইপরাইটারের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখ। চোখে মেঘ। বাষ্পরাশি জমে ওঠে। সে দেখে, টাইপ করা লাইনের অক্ষরগুলো কে যেন আঙুলের টানে লেপে দিয়ে গেছে। কালো রেখার মতো দেখায়। লাইনগুলো ধীরে আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে থাকে। দুলতে থাকে। অমিয় দেখতে পায়, লাইনগুলো দুলতে দুলতে ঢেউ হয়ে যাচ্ছে। ...ঢেউ আর ঢেউ। ফুলে উঠছে জল—অনন্ত অথৈ মহাসমুদ্রের মতো জল। কালো মহা আকাশ ঝুঁকে আছে তার ওপর। বালিয়াড়ি ধু-ধু করে সাদা হাড়ের মতো। গড়ানে বালি, বালির ওপর ঢেউয়ের দাগ। সাপের খোলস উলটে পড়ে আছে।

মুখার্জি, আমি আপনাকে একটা জিনিস প্রেজেন্ট করব।

কী?

আমার স্কুটারটা।

তা কেন বাগচী। এখন আপনার সময় ভাল যাচ্ছে না। প্রেজেন্ট সুসময়ে করবেন।

এই ঠিক সময় মুখার্জি। স্কুটারটার আর আমার দরকার নেই।

কল্যাণ একটু চুপ করে থাকে, যদি দরকার না থাকে তো ওটা আমি কিনে নিতে পারি।

না মুখার্জি, আমাদের বংশে কেউ কখনও ঘরের জিনিস বেচেনি। আমি ওটা আপনাকে দিয়ে দেব। অভাবের সময়েই দেওয়া ভাল, সুসময়ে দেওয়া হয় না।

কল্যাণ চুপ করে থাকে।

রাজেনের কাছে টাকাটা আছে বাগচী, দরকার হলে নেবেন।

আচ্ছা।

টেন্ডার সিল করে অমিয় বেরোয়। মেঘ কেটে রোদ উঠছে। চার দিকে পাথুরে শহর। প্রতিদ্বন্দ্বী কলকাতা। নীচে স্কুটারটা দাঁড়িয়ে আছে। অমিয় চেয়ে থাকে। তারপর স্কুটার ছাড়ে।

লাহিড়ী।

উঁ।

টেন্ডার দিয়ে গেলাম।

আচ্ছা। দেখব।

লাহিড়ী, প্যাটারসন কি এখনও আমাকে বিশ্বাস করে?

লাহিড়ী হাসে। বলে, ও-সব রোমান্টিক কথা ছাড়ুন। কে কাকে বিশ্বাস করে! অর্ডার আপনি পাবেন। ঠিকমতো রেট দিয়েছেন তো, যেমন বলেছিলাম?

দিয়েছি।

ঠিক আছে।

অমিয় বেরোয়। ঘুরতে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের অফিস ছুঁয়ে যায়।

বাগচী।

উঁ?

ল্যাংগুয়েজ নিয়েই সবচেয়ে মুশকিল।

অমিয় হাসে। বলে, কেন?

রজত হাই তুলে বলে, কিছুতেই ল্যাংগুয়েজ খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ মেয়েটা রোজই মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভারী অস্বস্তি।

চেয়ে থাকে কেন?

বোধহয় এক্সপেক্ট করে, জার্মানি যাওয়ার আগে আমি তাকে ফাইনাল কিছু বলে যাব। বাঙালি মেয়েদের জীবন খুব অনিশ্চিত তো। অথচ আমি কিছু বলতে পারছি না। ল্যাংগুয়েজ নিয়েই মুশকিল।

কবে যাচ্ছেন?

হরি সিং-এর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেছি। দিন কুড়ির মধ্যেই চলে যাব।

আমাদের একা লাগবে।

জানি। আফটার অল উই ওয়্যার কমরেডস। বাগচী, আপনার জন্য কী পাঠাব বললেন না?

ভেবে দেখি।

সেনগুপ্তকে যদি কখনও খুঁজে পান বাগচী, গিভ হিম অ্যান এক্সট্রা কিক ফর মি। মনে রাখবেন।

অমিয় হাসে।

মিশ্রিলাল এসে চুপ করে বসে থাকে, ধৈর্য ধরে।

বাগচীবাবু।

জানি মিশ্রিলাল।

আপনি তো আর কোনও অর্ডার পেলেন না! বিজনেসের কী হবে? আমি ডুবে যাব না তো।

বোধহয় দূরে কোথাও মেঘ-গর্জনের মতো একটা শব্দ হয়। অমিয় কান পেতে শোনে। শার্সির বাইরে আজ প্রবল রোদ। কোথাও মেঘ নেই, তবুও শব্দটা কোথা থেকে শোনে অমিয়? এক বার চোখ বোজে সে। অমনি এক পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত-বিদ্যুৎ সিংহ তার চোখে ছায়া ফেলে দাঁড়ায়। গভীর অরণ্যের ছায়ায় বহু দূরের সিংহ ডাকে—মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে।

সে বলে, ডুববে না মিশ্রিলাল। আমি আছি। থাকব।

হাসির সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না আজকাল। রাত পর্যন্ত সে বাইরে থাকে। ফিরে এসে দেখে,

হাসির ঘর ফাঁকা। বোধহয় হাসি কলকাতায় তার চেনাশোনা মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, দেখে সিনেমা-থিয়েটার, বোধহয় তার নেমন্তন্ন থাকে খাওয়ার। কে জানে। মধু তাকে চা করে দেয়। জিজ্ঞেস করে, বাবু, আপনার গাড়ি!

দিয়ে দিয়েছি একজনকে।

বুড়ো মধু বিড় বিড় করে কী যেন বলে। বোধহয় জীবনের অনিত্যতার কথা নিজেকে শোনায়।

রাত বেড়ে যায়। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে! ঘুম হয় না। উঠে বসে অমিয় আলো জ্বালে। অফিসের কাগজপত্র দেখে। টেন্ডারের খসড়া তৈরি করে। সে-সময়ে ভেজানো দরজা ঠেলে হাসি আসে। নিঃশব্দে ঘরে চলে যায়। কাপড় ছেড়ে কলঘরে ঢোকে। বেরিয়ে আসে, জল খায়। শুয়ে পড়ে।

তাদের মধ্যে কোনও কথা হয় না। হাসির যাওয়ার দিন এসে গেল।

রোদের তাপ আজকাল খুব বেড়ে গেছে। অমিয়র তাই কষ্ট হয় খুব। অনেকটা হাঁটতে হয়। কল্যাণ প্রায়ই বলে, বাগচী, স্কুটারটা নিয়ে বেরোবেন।

অমিয় হাসে। নেয় না। কল্যাণ কয়েকদিনে ভালই শিখে গেছে চালাতে। ও যখন স্কুটার চালায় তখন মুগ্ধ হয়ে দেখে অমিয়। ভাল লাগে। হিংসে হয় না।

রজতের কোনও কাজ নেই আজকাল। ব্যবসা সিল করে দিয়েছে। তবু রোজ এসে দেখা করে যায়।

কবে ফ্লাই করছেন সেন?

বলিনি আপনাকে? বিশ তারিখ, টিকিট পেয়ে গেছি।

বাঃ। ভাল খবর।

বাগচী ইউ আর সাফারিং টু মাচ।

ধারগুলো শোধ করতে হবে সেন।

পালিয়ে যান না। সেনগুপ্তকে কে আর ধরতে পেরেছে।

ঠিক দেখা হবে একদিন—তখন? অমিয় হাসে।

বাগচী, যদি সত্যিই কেটে পড়তে চান তো ব্যবস্থা করতে পারি।

কী রকম ব্যবস্থা?

জব ভাউচার। তিন মাসের মধ্যে আপনাকে নিয়ে যাব।

অমিয় হাসে।

কখনও কখনও শূন্য ঘরে, তার টেবিলের ওপর বিশাল সিংহ এক লাফ দিয়ে উঠে আসে। ধক ধক করে জ্বলে তার শরীর, পঞ্জরসার দেহ, পিঙ্গল কেশর। মুখে বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার। পুরুষের এ-রকমই হওয়ার কথা ছিল। কে তাকে শেখাল নারী-প্রেম, হাঁটু গেড়ে প্রণয়ভিক্ষা, মোলায়েম ভালবাসার কথা! অপরূপ মগ্ন হয়ে দেখে অমিয়।

তারপর টাইপরাইটার টেনে নিয়ে বসে।

আপনি বার বার কেন একটা স্টিমারঘাটের কথা বলেন জামাইবাবু?

আমি বলি না। অমিয় বলে। তুমি ওর কাছ থেকে কখনও শুনে নিয়ো।

কী করে শুনব! আমি কাল চলে যাচ্ছি।

শুনলে ভাল করতে।

কেন?

জামাইবাবু টেলিফোনের অন্য প্রান্তে শ্বাস ফেলে।

হাসি, আমাদের বয়স হয়ে গেল।

হঠাৎ এ-কথা কেন?
কী জানি! আজকাল হঠাৎ কাজকর্মের মাঝখানে বয়সের কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে—
কী?
স্টিমারঘাট— তুমি সাবধানে যেয়ো হাসি। গঙ্গার ওপর ব্রিজটা যে কবে ওরা শেষ করবে!
আমি পাগল হয়ে যাব জামাইবাবু, স্টিমারঘাটের কথাটা আগে বলুন। কোন স্টিমারঘাট?
ফরাক্কা।
না, ফরাক্কার কথা আপনি বলছেন না।
জামাইবাবু চুপ করে থাকে।
বলবেন না?
তুমি অমিয়র কাছে শুনো।
ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে কখন? ও অনেক রাতে ফেরে, খুব সকালে বেরিয়ে যায়।
কাল স্টেশনে অমিয় যাবে না?
বলেছিল তো যাবে। অফিসে কাজ আছে, সেখান থেকেই সম্ভব হলে স্টেশনে যাবে।
তবে আর সময় হবে না।
কীসের?
স্টিমারঘাটের কথা শোনার। ফোন রেখে দিচ্ছি হাসি—
হাসি রিসিভার রেখে দেয়।
পরমুহূর্তেই আবার তুলে দ্রুত ডায়াল করে।

হ্যালো আমি অমিয় বাগচীর সঙ্গে কথা বলতে চাই। এক্ষুনি, জরুরি দরকার। একটু অপেক্ষা করতে হয়। তারপর অমিয়র গলা ভেসে আসে, বাগচী বলছি।

শোনো, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে।
কী কথা?
তুমি আমাকে একটা কথা কোনও দিন বলোনি।
কী?
স্টিমারঘাটের কথা। সবাইকে বলেছ, আমায় ছাড়া। এক বার আমাকে বলবে?
আমার সময় নেই হাসি।
কেন?
আমি খুব ব্যস্ত।
কেন ব্যস্ত?
অনেক কাজ হাসি! আমাদের সময় তো বেশি নয়।
বলবে না?
সময় বড় কম হাসি।
স্টিমারঘাটের অর্থ কী?
কী করে বলব। আমিই কি জানি?
কী আছে সেখানে?

কিছু নেই। শুধু একটা উঁচু বালিয়াড়ি, ধু ধু বালি গড়িয়ে নেমে গেছে, একটা সাপের খোলস উলটে পড়ে আছে। বালির শেষে দূর থেকে একটা কালো জেটি দেখা যায়। তারপর জল। সে খুব অথৈ জল, অনন্ত জল, প্রকাণ্ড এক নদী, তার ওপর কালো আকাশ ঝুঁকে আছে...

হাসি স্তব্ধ হয়ে থাকে।
এর মানে কী?

আমি জানি না। তবে মনে হয়, এখানে এক দিন সকলের দেখা হবে।

কেন?

...

কেন?

...

কেন?

...

কেন?

প্যাটারসনের অর্ডারটা আজ বেরিয়েছে।

সকাল থেকেই অমিয় ঘুরছে বাজারে। ভাদ্র মাস পড়ে গেল প্রায়। রোদের তাপ অসম্ভব। মাঝে মাঝে ধুলোর ঝড় ওঠে। ঘূর্ণি হাওয়ার মতো হাওয়া দেয়। হাঁটতে খুবই কষ্ট হয় অমিয়র। তবু সে হাঁটে। মাঝে মাঝে স্পষ্ট দেখতে পায় সামনে, ভিড় ভেদ করে চলেছে এক প্রকাণ্ড সিংহ। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহটিতে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ে বৈরাগ্যের ধূসর রং, চোখে দূরের প্রসার। সিংহ মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে দেখে নেয়। দেখে নেয়, অমিয় ঠিকঠাক চলছে কি না।

অমিয় চলে। সাপ্লায়ারদের কাছে ঘোরে। দোকান যাচাই করে। সে আছে। থাকবে।

স্টিমারঘাটের ছায়াটা চকিতে ভেসে ওঠে চোখে। মিলিয়ে যায়। দেখা হবে, একদিন সকলের সাথে দেখা হবে।

দুপুরের দিকে অফিসে ফিরে একটা সিগারেট মুখে টাইপরাইটারের সামনে বসে অমিয়। টাইপ করতে থাকে।

কল্যাণ ঘরে ঢুকেই বলে, এ কী বাগচী?

কী?

আপনি এখনও যাননি?

কোথায়?

কাল যে বলছিলেন আজ দার্জিলিং মেলে আপনার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন!

ওঃ।

ভুলে গিয়েছিলেন?

অমিয় লজ্জিত হয়ে হাসে। সে ভুলে গিয়েছিল। হাসির কথা তার মনেই ছিল না।

ক'টা বাজে মুখার্জি?

বারোটা চল্লিশ। পঞ্চাশে ট্রেন ছেড়ে যাবে।

তা হলে আর গিয়ে কী হবে!

উঠুন তো। নীচে স্কুটার রয়েছে— তাড়াতাড়ি করুন, হার্ড লাক—পেতে পারেন। উঠুন, উঠুন—

দেরিই হয়ে গেল অমিয়র।

স্কুটার থেকে নেমে সে দ্রুত পায়ে উঠে এল স্টেশনের হলঘরে। আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসছে মানুষ—যারা প্রিয়জনদের বিদায় জানাতে এসেছিল। কোলাপসিবল গেটের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অমিয় শূন্য রেল লাইনটা দেখে। বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়, লাইনটা চকচক করছে। কয়েকজন লোক বেরিয়ে আসছিল। তারা সরে যেতেই অমিয় দেখতে পেল হাসি দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে সুটকেস। সে একা।

কী হল?

হাসির মুখ চিন্তান্বিত। কপালে ভ্রূকুটি। কেমন যেন আস্তে আস্তে চিন্তা করে বলল, আমি ট্রেনটা ধরতে পারিনি।

কেন?

পারলাম না।

কেন?

হাসি খুব বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। বলে, কী জানি। আমাকে কখনও জিজ্ঞেস কোরো না।

অমিয় একটু হাসে।

আজকাল অমিয় যখন সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ঘুমোয় তখন তার স্বপ্নের মধ্যে উপর্যুপরি সিংহের ডাক শোনা যায়।

মেঘ-গর্জনের মতো সেই ডাক। মাটিতে লেজ আছড়ানোর শব্দ হয়। পিঙ্গল কেশর, পঞ্জরসার দেহে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ, গায়ের ধূসর রঙের বৈরাগ্য, চোখে দূরের প্রসার—সিংহেরা তার ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। উপর্যুপরি ডাক দেয়, মেঘ-মাটি কেঁপে ওঠে। ঘুমের মধ্যে অমিয় হাসে।

অন্য ঘরে হাসির তেমন ঘুম হয় না। বহু দূর থেকে এক অচেনা রহস্যময় স্টিমারঘাট এগিয়ে আসে। সে দেখে ধু ধু বালিয়াড়িতে চাঁদের আলো পড়েছে। পড়ে আছে সাপের খোলস। উঁচু থেকে দেখা যায়—গড়ানো বালিয়াড়ির শেষে জেটি, তারপর অনন্ত নিঃশব্দ জলরাশি—অথৈ। সেই স্রোতের ওপর আবহমান কাল ধরে ঝুঁকে আছে কালো আকাশ। ওইখানে সকলের দেখা হবে। কেন না, তারা বিশ্বস্ত থাকেনি নিজের প্রতি, এই দুর্লভ পার্থিব জীবন নিয়ে তারা হেলাফেলা করেছিল।

এ-সব সে নিজেই ভাবে। ভাবতে ভাবতে ভাবনা পালটে ফেলে। বারংবার সে ওই স্টিমারঘাটের অর্থ খুঁজতে থাকে। খুঁজে পায় না। কিন্তু না-বুঝেও সে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে অপলক চেয়ে থাকে। জলে চোখ আপনি ভেসে যায়।

আশ্চর্য ভ্রমণ

১

মশাইরা, ওই লোকটাকে একটু চুপ করতে বলবেন? কিছু লোক আছে যাদের গলায় কোনও ভাল্‌ভ থাকে না, অনর্গল কথা বেরিয়ে আসে। লোকটাকে লক্ষ করুন, যখন ট্রেনে উঠেছিল তখন একটা ক্রিম রঙা ভাল স্ট্রেচ প্যান্ট আর ইজিপসিয়ান বা টেরিকটনের হালকা রঙের চেক শার্ট ছিল পরনে। অনেকক্ষণ ট্রেন জার্নি করতে হবে বলে হিসেবি লোকটা ট্রেনে উঠেই এতগুলো মেয়ে-পুরুষের সামনে একটা লুঙি মাথা দিয়ে গলিয়ে নিয়ে দাঁতে চেপে ধরে লুঙির আড়ালে হড়হড় করে প্যান্ট ছাড়ল। জামাও। এখন দিব্যি গেরস্তের মতো গেঞ্জি আর লুঙি পরে বেঞ্চে পা তুলে বসেছে। হাতে হাতপাখা নড়ছে, সঙ্গে আটপৌরে একটা বউ, একটা বড় ছেলে, একটা ছোট মেয়ে। বউ বা ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলছে না। ও বসেই সামনের বেঞ্চে বসা মুখোমুখি একজন বিনয়ী চল্লিশের কাছাকাছি লোকের সঙ্গে তখন থেকে প্রথমে ফারাক্কা ব্রিজ, তারপর রাজনীতি, তারপর কন্যাকুমারিকা ভ্রমণের গল্প বলছে। লোকটার বয়স কত হবে? পঞ্চাশ! তা হতে পারে। এ বয়সে মানুষ কথা বলতে ভালবাসে। কেন বলুন তো! যে কারণই থাক, অত কথা, একনাগাড়ে শুনলে আমার পেট গুলোতে থাকে, মাথা ভার হয়, আর ভীষণ ক্লান্ত লাগে। ওকে একটু চুপ করতে বলুন ভাইসব। এটা ওর বাড়ি নয় যে লুঙি আর গেঞ্জি পরে বসবে, কিংবা হাতপাখায় হাওয়া খাবে। তাও সহ্য হয়, কিন্তু কথা!

আমি শুনতে পাচ্ছি কামরার সব মানুষই কিছু কিছু কথা বলছে। কে কাকে ডাকল, কে একটা মেয়ে খুব হাসছে—তাকে দেখতে পাচ্ছি না। পাশের কিউবিকলে কুলির সঙ্গে একজনের ঝগড়া শুনছিলাম একটু আগে। সেসব গায়ে লাগে না। কিন্তু ওই একনাগাড়ে কথা, অবিরল কথা, একই কণ্ঠস্বরে—ওটা ভীষণ একঘেয়ে। ওকে একটু চুপ করতে বলুন। ঠিক বটে, ওকে চুপ করার কথা আমারই বলা উচিত, কেননা আর সকলের হয়তো আমার মতো কথার অ্যালার্জি নেই। কিন্তু আমি মশাই, কখনও কাউকে প্রকাশ্যে, অনেকের সামনে কিছু বলতে পারি না। কারণ, প্রকাশ্যে কথা বলা মানেই হচ্ছে পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। যেই কেউ বাসে বা ট্রামে, লোকজনের সামনে কিছু বলতে শুরু করে, তখনই দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোক তার দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠে। হয়তো সবাই ভাবে এইবার এই একজন কিছু বলবে। শোনা যাক, এ লোকটা সাংঘাতিক কিছু বলতে পারে কি না। এই বলে সবাই তার দিকে উৎকর্ণ হয়ে তাকায়, কিছু একটা প্রত্যাশা করে। আমি যখনই টের পাই যে, লোকে আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, আমার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে, বা আমার কাছে কিছু প্রত্যাশা করছে, তক্ষুনি আমি ঘাবড়ে যাই। আমার কথা আটকে যায়। ভাবনা-চিন্তা সব ছাই হয়ে ঘোলাটে মেরে যায়। তাই পারতপক্ষে আমি প্রকাশ্যে অচেনা জনসাধারণের সামনে কখনও মুখ খুলি না। বাসে-ট্রামে আমি কদাচিৎ লোককে সরে দাঁড়াতে বলি, বা সরে বসতে। রাস্তায়-ঘাটে সব সময়েই আমি চলাফেরা করি ফেরারি আসামির মতো সভয়ে। কলকাতায় আমার অন্তত তিনবার পকেটমার হয়েছে। কিন্তু একমাত্র প্রথমবার আমার ন' টাকা সমেত মানিব্যাগটা প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে হাওয়া হয়ে গেলে আমি

হ্যারিসন রোড আর চিৎপুর জংশনের কাছে দশ নম্বর বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতর বলে উঠেছিলাম, আরে! ম্যানিব্যাগটা পকেটমার হয়ে গেল! সে কথা শুনে সবাই আমার দিকে অতি কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। তারপর শুরু হল কথা—ক' টাকা ছিল মশাই? ভাল করে দেখুন। বাসে-ট্রামে একটু সাবধানে...ইত্যাদি। লজ্জায় মরে যাই। তার মধ্যে নীচের তলার কন্ডাক্টর আবার গলাটা বাড়িয়ে বলল, টিকিট কাটার সময়ে অনেকের দেখেছি পকেটমার হয়, দাদারটা আবার সেরকম নয় তো। সবাই হেসেছিল। তাই পরের দু' বার যখন আমার পকেটমার হয়, দ্বিতীয়টা প্রথমটার প্রায় দশ বছর পর, এবং তৃতীয়টা দ্বিতীয়বারের পাঁচ বছর পর, তখন প্রথমটার স্মৃতি থেকে অভিজ্ঞতাবলে আমি টুঁ শব্দও করিনি। খুব স্থির ও ঠান্ডা মাথায় প্রায় হাসিমুখে এবং স্বাভাবিক ভাবভঙ্গির সঙ্গেই আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি। কেউ টেরও পায়নি যে আমার পকেটমার হয়েছে। আছে বটে কেউ কেউ যারা ট্রামে-বাসে ঝগড়ার জন্য মুখিয়ে থাকে, এবং যে কোনও উটকো কারণেই ঝেঁঝে উঠে চমৎকার যুক্তিতর্ক ও অপমান মিশিয়ে দারুণ চ্যাম্পিয়নের মতো ঝগড়া করে। যেমন আমার বন্ধু বিমল। একটা লোকের সঙ্গে নাগাড়ে আধঘন্টা ঝগড়া করে বিমল তাকে রাগিয়ে এমন বেহেড করে দেয় যে লোকটা তেড়ে এসে বলে, ফের কথা বললে দাঁত খুলে নেব। তাতে বিমল বিচ্ছুর মতো হেসে বলেছিল, দাদা বুঝি ডেন্টিস্ট? এ কথায় চারদিকের সবাই, যারা অনেক প্রত্যাশা এবং মনোযোগের সঙ্গে ঝগড়াটা শুনছিল, তারা এমন পেট কাঁপিয়ে হেসে উঠল যে লোকটা মাথা নিচু করে পরের স্টপেই নেমে যায়। আমরা আজও জানি না যে ওই পরের স্টপটাই লোকটার গন্তব্য ছিল কি না। আমার আর এক বন্ধু দেবু একবার দুইয়ের বি বাসে দুটো লোককে বাগবাজার থেকে টানা ডালহৌসি অবধি এক নাগাড়ে ঝগড়া করতে শুনেছিল। তবে বউবাজারের মোড়ের কাছে এসে দু'জনেরই কথা ফুরিয়ে যায়, আর পরস্পরকে অপমান করার মতো কথা তাদের স্টকে ছিল না, দমেরও কিছু ঘাটতি হয়ে থাকবে। তবু দুটো বেড়ালের মতো তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আক্রোশে ফুঁসছিল, এবং তখনও একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে বলছিল, অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ। সেই অন্যজন এর দিকে চেয়ে বলছিল, ঙ—ঙ—ঙঃ! এভাবে ভাষাহীন ঝগড়াটা ডালহৌসিতে এসে দুজনে নেমে যাওয়ার পর থামে। আমরা আজও জানি না, নেমে যাওয়ার পরও তারা দু'জন ব্যাপারটা আরও কিছুদূর পর্যন্ত চালিয়েছিল কি না। কেউ কেউ এরকম পারে। যেমন একবার ভিড়ের ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো একজন বেঁটে ও অন্যজন লম্বা লোককে ঝগড়া করতে দেখেছিলাম। বেঁটে লোকটা তোতলা বলে ঝগড়ায় সুবিধে করতে পারছিল না। তাই সে একটা স্টপে নেমে পড়ে হঠাৎ ডান পা তুলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পাছায় কপাৎ করে একটা লাথি কষিয়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল। লাথি-খাওয়া লোকটা প্রথমে বুঝতেই পারেনি সেটা লাথি ছিল কি না। ভিড়ের মধ্যে কত গুঁতো লাগে। সবাই যখন চেঁচিয়ে বলল, ও মশাই, আপনাকে লাথি মেরে পালাল যে! ধরুন ধরুন, ওই যাচ্ছে! তখন লম্বা লোকটা একটা হাতব্যাগ বগলে চেপে লাফ দিয়ে নেমে দৌড়োতে লাগল। তার ভাবভঙ্গি দেখে রাস্তার শান্তিপ্রিয় লোকেরা তখন তাকে ধরে ফেলেছে, আহা, কী করছেন মশাই! ছেড়ে দিন। লম্বা লোকটা আটকা পড়ে কেঁদে ফেলে আর কী, ছেড়ে দেব! ছেড়ে দেব কী মশাই। ও লোকটা আমাকে লাথি মেরে পালাচ্ছে। বলতে বলতে মরিয়া হয়ে লোকটা সবার হাত ছাড়িয়ে দৌড়োল। দৌড়ে সে যখন প্রায় বেঁটে লোকটাকে ধরে ফেলেছে তখন বেঁটেজন হঠাৎ দাড়িয়াবান্দা খেলার খেলুড়ির মতো নিচু হয়ে বাঁই করে উল্টোবাগে সরে গেল। লম্বা লোকটা যতবার তাকে ধরতে যায় ততবারই সে নানা কায়দায় সরে গিয়ে হাঁটতে থাকে। কী করুণ দৃশ্য! লাথি-খাওয়া লম্বা লোকটা কিছুতেই লাথি-মারা বেঁটে লোকটাকে ধরতে পারছে না। রাগে ফেটে পড়ছে তার মুখ, চোখে জল, বার বার সে চেষ্টা করছে ধরতে। বেঁটে লোকটা পালিয়েও যাচ্ছে না, কেবল চোর-পুলিশ খেলছে। চওড়া ফুটপাথ জুড়ে, প্রকাশ্য দিবালোকে সেই ব্যাপারটা

কতক্ষণ চলেছিল বলা শক্ত। বাস আমাকে-সুদ্ধু দৃশ্যটা পার হয়ে এসেছিল। আমি মশাই, এসব নানা কারণেই রাস্তা-ঘাটে মুখ খুলি না।

ওই লুঙিপরা লোকটাকে কিছু বলাও আমার পক্ষে সম্ভব নয় বন্ধুগণ। যদি আমার হয়ে আপনারা কেউ বলেন! অবশ্য বন্ধুগণ, আমি জানি যে আপনারা অধিকাংশ লোকই আমার মতো। রাস্তায় ঘাটে, প্রকাশ্যে আজকাল কেউ বড় একটা কথা বলতে চায় না, দু' চারজন মুখফোঁড় ছাড়া। আমরা অধিকাংশই নীরবতার সমর্থক, কিছু ভিতু এবং লাজুকও। সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে আমরা বেঁচে-বর্তে থাকি, এবং যদিও এখন আর মানুষের ব্যক্তিগত সম্মান বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই, তবু খুবই সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে আমরা আমাদের ধোঁয়াটে আত্মসম্মান জিনিসটাকে রক্ষা করে চলি।

আপনাদের কারও কাছে ব্যথা কমানোর বড়ি আছে কি ভাইসব? গত কিছুদিন যাবৎ আমার একটা দাঁত বড় কষ্ট দিচ্ছে। ডানদিকের নীচের পাটির একদম শেষের বড় দাঁতটার নাম আমি দিয়েছি বড়দা। আর ঠিক তার আগের দাঁতটার নাম দিয়েছি মেজদা। এই মেজদাই হচ্ছে কালপ্রিট। কবে যেন সুপুরি খেতে গিয়ে দাঁতের একটা দেয়াল ধসে পড়ে। তারপর থেকেই মেজদা মাঝে মাঝে ঝিলিক দেয়। গভীর রাতে ব্যথায় ঘুম ভেঙে গেলে আমি উঠে বসে মেজদার সঙ্গে কথা বলি, জানো তো মেজদা, অধিকাংশ ডেন্টিস্টই, ভাঙা দাঁত সম্পর্কে একটাই কথা বলে। তারা বলে, এ দাঁতের তো আর চিকিৎসা নেই, আসুন তুলে দিই। তা মেজদা, তোমার কি উচ্ছেদ হওয়ারই ইচ্ছে! এ কেমনতর উল্টোবুদ্ধি তোমার! যে ক'দিন পারো নিজের ভিত আঁকড়ে থাকাটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। কোন বোকা চায় ভিত থেকে উচ্ছেদ হয়ে আস্তাকুঁড়ে যেতে? নিজের ভবিষ্যৎ বুঝে কাজ করো মেজদা, আখের বলে একটা কথা আছে। কিন্তু বহু বলা সত্ত্বেও মেজদা শোনে না। মাঝে মাঝে সেই অবিমৃষ্যকারী জল ঘোলা করবেই। যেমন এখন ঝিলিক মারছে। পুরো ডান দিকটা ধরে গেল ব্যথায়। চোখে জল আসছে। মাথাটাও ব্যথা করছে দাঁতের ঝিলিকে। ভাইসব, কারও কাছে বড়ি নেই?

না বন্ধুগণ, আমি কারও কাছেই প্রকাশ্যে ট্যাবলেট চাইতে পারব না। যদি সহৃদয় কেউ থাকেন, যিনি মুখ দেখে ভিতরের ব্যথা টের পান, তিনি এগিয়ে আসুন অমোঘ পেইন-কিলার ট্যাবলেট নিয়ে। আর এই লুঙিপরা লোকটাকে বারণ করুন কথা বলতে। এখন ও কী বলছে আমি দাঁত ব্যথায় তা আর শুনতে পাচ্ছি না। কেবল বমন-উদ্রেককারী ওর গলার একঘেয়ে স্বর শোনা যাচ্ছে। মেজদা তাতেই আরও ক্ষেপে যাচ্ছে।

কোথায় ট্রেনটা থামল দাদা? বর্ধমান নাকি! কে যেন দরজার কাছে চেঁচিয়ে বলছে, উঠবেন না, উঠবেন না, এটা রিজার্ভড কামরা! সাবাস মশাই, ওইরকম স্পিরিটই তো চাই। কাউকে উঠতে দেবেন না। আমাদের হয়ে আপনি লড়ে যান তো! আমি খুবই ঈর্ষা বোধ করছি আপনার প্রতি। রেলের কামরায় বে-আইনি অনুপ্রবেশকারীদের আমি কখনও ধমকে ওরকম রাগের সঙ্গে কিছু বলতে পারিনি কোনওদিন। বড় জোর মিন মিন করে বলেছি, এটা তো রিজার্ভড কামরা। এমনভাবে বলেছি যে পরিষ্কার বোঝা গেছে কামরাটা রিজার্ভড কি না সে বিষয়ে আমারই সংশয় ও দ্বিধা রয়ে গেছে। ফলে আমি যে কামরা পাহারা দিই তাতে বরাবর উটকো লোক উঠে ভিড় করেছে। না বন্ধুগণ, আমি প্রতীক অর্থে কথাটা বলছি না। আমি যেরকম ঠিক সেই রকমই বোঝাতে চাইছি। মেজদা প্রচণ্ড ব্যথাচ্ছে। লুঙিপড়া লোকটা কথা বলছে। এখন আমার মাথা পরিষ্কার নেই। তার ওপর তো কামরাটার কেবল বসবার ব্যবস্থা আছে, শোওয়ার নেই। সারা রাতটা জেগে বা বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে যেতে হবে। এই প্রচণ্ড দাঁত ব্যথা নিয়ে সেটা তবু সওয়া যেত। কিন্তু ভাইসব, দেখুন কপাল, আমার এই কিউবিকলে একজনও যুবতী মেয়ে নেই, সুন্দরী তো দূরের কথা। মোট বারোজনের মধ্যে লুঙিপরা লোকটার বউ আর বাচ্চা মেয়েটা বাদে আর দশজনই পুরুষ। মাঝে-মধ্যে এরকম গ্রহদোষ আমাদের হয়। সারা রাত কোন দিকে চেয়ে থাকব বন্ধুগণ? আমাদের

পিছনের খোপে একটা মেয়ের গলা পাচ্ছি। আর অনেকটা দূরে একদম শেষপ্রান্তে বোধহয় এক পাল কলেজের ছাত্রী যাচ্ছে, খুব কলকল করছে তারা। কিন্তু হায়, আমি তো সেখানে নেই! আমার নিয়তি এই লাবণ্যহীন খোপটাই আমার জন্য নির্দিষ্ট রেখেছিল।

দেশলাইটা? এই যে। ভাববেন না যে দেশলাইটা দিতে গিয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা শুরু করব মশাই। না, আমার স্বভাব সেরকম নয়। আমি নির্বোধ কি না তা আমি সঠিক জানি না। তবে এইটুকু জানি যে আমি ভাল কথা বলতে পারি না। যদি কেউ কথা বলে তবে তার উত্তরে বড় জোর হুঁ-হাঁ দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু এখন আমার সে মনোভাবও নেই। মেজদা আমাকে একদম ভালবাসছে না। সে আমাকে ছেড়ে যাবেই। দার্জিলিঙে পৌঁছেই, তখনও যদি মেজদা ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে, তা হলে মেজদাকে উচ্ছেদের নোটিশ দিতেই হবে। আমার ধারণা, দার্জিলিঙের ঠান্ডায় দাঁতের ব্যথা বিলম্বিত পার হয়ে দ্রুত-এ পৌঁছে যাবে। কাজেই মেজদার ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকারময় মনে হচ্ছে। সে যাকগে। ওঃ দেশলাইটা! হ্যাঁ দিন। দেশলাই জিনিসটা খুব অদ্ভুত। তুচ্ছ জিনিস তো, তাই চুরির দোষ অর্শায় না। কখন যে কারটা কার পকেটে চলে যায়!

না মশাই, এখন যে আমি কথা বলতে চাইছি না তা শুধু মেজদার জন্যই নয়, বা আমাদের এই খোপে যুবতী মেয়ে নেই বলে রাগ করার জন্যও নয়, কিংবা ওই লুঙিপরা লোকটা যে এখন বেনারসের রাবড়ির গল্প করছে তার জন্যও নয়। আমরা এখন যেদিকে যাচ্ছি সেই উত্তরদিকে, একটা ছোট্ট শহরে বহুকাল আগে এক শীতকালের ভোরবেলায় একবার একটা কোকিল ডেকেছিল। ডেকেছিল না বলে বরং বলি, কেঁদেছিল। সেরকম ডাক আমি আমার জীবনে আর দ্বিতীয়বার শুনিনি। ভাইসব, কোকিলের ডাক আমি আরও কতবার শুনেছি জীবনে! কিন্তু আমার জীবন শুরু হয়েছিল ওই একটিমাত্র কোকিলের ডাকে। সে যেন বন্ধ ঘড়ির চাবিকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছিল জোর করে। বুকের হৃৎপিণ্ড হঠাৎ তুলে আছড়ে চালু করে দিল, ধমনীতে ধমনীতে মেল ট্রেনের মতো ছুটল রক্তস্রোত। শৈশবের অবচেতনার ঘুম থেকে আমি সচেতনতার মধ্যে জেগে উঠেছিলাম। কোটি বছরে একটা কোকিল মাত্র একবারই ওরকম ডাকে। আমার জীবনে, আমি জানি, আর ওরকমভাবে কোকিল কখনও ডাকবে না। তবু একবার আমি ঘুরতে ঘুরতে সেই ছোট্ট শহরে যাব। শুনেছি, সে শহর আর ছোট নেই, মস্ত বড় হয়েছে। তবু একবার নানা জায়গায় নানা স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে খুঁজে আমাকে একবার ঘুরে আসতেই হবে।

ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলি। বন্ধুগণ, আপনারা সবাই যে যার শৈশবের কথা একবার ভেবে দেখুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন আমাদের শৈশবে একটা অবোধ ঘুমন্ত সময় যায়। জন্মের পর থেকে শিশু হাসে, কাঁদে, খায়, তারপর কথা বলে, হাঁটে, পড়ে গিয়ে ব্যথা পায় কিংবা অসুখে ভোগে। অর্থাৎ সব অনুভূতিই তার থাকে। তবু তার চারদিকে এক অচেতনতার আবরণ রেশম পোকার গুটির মতো তাকে ঘিরে থাকে। হয়তো আড়াই তিন বা চার বছর বয়স পর্যন্ত সময়টা এরকম অবোধ বিস্মৃতির সময়। তাই বড় হয়ে কেউই সেই অতি শৈশবের কথা মনে করতে পারে না। আমার ডান হাতে, কনুইয়ের ঠিক ওপরে দৃশ্যমান এক গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে। দু' বছর বয়সে পিসির কোল থেকে বঁটির ওপর পড়ে গিয়ে ওটার সৃষ্টি, মা'র কাছে শুনেছি। কাটা জায়গাটা পরে সেপটিক হয়ে যায় এবং ডাক্তার দু'বার ওটা অপারেশন করেন। কিন্তু কিছুতেই অত বড় ঘটনাটা আমি মনে করতে পারি না। এরকম সকলেরই। অবশ্য সকলের সমান নয়। কারও কারও ঘুমন্ত শৈশব কিছু দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারও স্বল্পস্থায়ী। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমাদের সকলেরই অতি শৈশবে একটা ঘুমন্ত অবোধ অবচেতন সময় গেছে। আস্তে আস্তে আমাদের চারধারের সেই অবচেতনতার গুটি খসে গেছে, আমরা সচেতন হয়ে শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীতে জেগে উঠেছি। আমি সেই বোধটাকে টের পেয়েছিলাম একবার।

আমার জীবনে সেই ঘুমন্ত শৈশবের খোলসটা থেকে বেরিয়ে আসার ঘটনাটা খুবই প্রত্যক্ষ ও

স্পষ্ট। খুব ধারের ছুরি দিয়ে কে যেন আমার ঘুমন্ত ও জাগ্রত শৈশবকে দুই ভাগ করেছে। আমি স্পষ্ট সেই ভোরবেলার কথা মনে করতে পারি। তখন শীতকাল। কাটিহারে কী প্রচণ্ড শীত পড়ত ভাবা যায় না। খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ওভারকোট গায়ে বাগানে বেরিয়ে এসেছিলাম: চারধারে কুয়াশাময় নিস্তব্ধতা। রেলের বিশাল সাহেববাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বাগান। কুয়াশায় দেখা যাচ্ছে লাল পপি ফুল অসংখ্য প্রজাপতির মতো গাছে গাছে বসে আছে, ডালিয়া ফুটেছে খুব। বাগানের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা মস্ত মাদার গাছ ছিল। শীতে জবুথবু সেই গাছটার মগডাল কুয়াশায় আবছা। খুব বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে রহস্যময় আলো-আঁধারে বাগানের দিকে চেয়ে আছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ হু-হু-হু-হু করে মাদার গাছ থেকে কোকিলটা ডাকল। প্রথমে চমকে উঠলাম। ওই নিস্তব্ধ সকালে দু'-চারটে পাখি ডাকছিল, কিছু পাতা খসছিল অস্পষ্ট শব্দে শিমুল গাছ থেকে, বহু দূর থেকে মালগাড়ির শানটিংয়ের আওয়াজ আসছিল। কিন্তু এসব শব্দ ছিল নিস্তব্ধতারই অঙ্গ। কিন্তু সব নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে তীব্র ও ভয়ঙ্কর সুন্দর স্বরে হঠাৎ ওই আশ্চর্য কোকিলের ডাক। আমি চমকে কেঁপে উঠলাম। আমার সেই বোধহীন শৈশবের ভিতরে সেই ডাক অবিরল প্রপাতের জলধারার মতো গড়িয়ে পড়ছিল। অবিরল ডেকে যাচ্ছে কোকিল, দাঁড়ি-কমা নেই, ক্লান্তি নেই। ছুরির ধারের মতো, ছুঁচের মতো, তীব্র আলোকরশ্মির মতো আমার ভিতরে সে ডাক ঢুকে যাচ্ছিল। শব্দে শব্দে পাগল হয়ে আমি শিশির-ভেজা ঘাস মাড়িয়ে দৌড়ে গেলাম বাগানের গভীরে। মাদার গাছটার নীচে আকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আমি ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে খুঁজছি কোকিলটাকে। দেখা গেল না। কিন্তু সেই আশ্চর্য কোকিল আড়াল থেকে কেবলই ডাকল আর ডাকল। কাঁদল আর কাঁদল। আমি আনন্দে কিংবা দুঃখে অস্থির হয়ে সারা বাগানে ছুটে বেড়াতে লাগলাম। ওই শব্দ কখনও চাবুকের মতো আমাকে তাড়া করে, কখনও চুম্বকের মতো কাছে টেনে নেয়। কিন্তু স্টিমারের আলোর মতো সেই শব্দ এতকাল রহস্য ও দুর্বোধ্যতায় ঢাকা পৃথিবীর রূপ এবং আমার ভিতরকার 'আমি'কে হঠাৎ চিনিয়ে দিল। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে হঠাৎ শান দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলল সে, স্পর্শকাতর করে দিয়ে গেল। আমি কি হেসেছিলাম, না কি কেঁদেছিলাম? কে জানে! তবে এইটুকুই স্থির জানি যে, সেই ডাক যে ভোরে শুনেছিলাম সেই ভোর থেকে আমার শৈশবকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। তার আগের দিন থেকে বাকি শৈশব অস্পষ্ট। কোথা থেকে শীতকালের অসময়ে এসেছিল সেই কোকিল? সেকি কেবল আমাকে জাগিয়ে তোলার জন্যই? বন্ধুগণ, তাই ওই কোকিলের ডাক আমি কখনও ভুলতে পারি না।

কত বছর হয়ে গেল। আমি আর দ্বিতীয়বার সেরকম কোকিলের ডাক শুনিনি। হয়তো সেই কোকিলটাও সারা জীবনে ওরকম আর ডাকেনি। হয়তো সেই আশ্চর্য ডাক শেষবারের মতো ডেকে সেই কোকিল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছেড়ে চলে গেছে। আর আসবে না। বন্ধুগণ, ভাইসব, মশাইরা, আপনাদের কারও জীবনে কি কখনও ওইভাবে কোকিল ডেকেছিল? দেখুন, আজও সেই ডাক মনে হলে আমার কান্না পায়। আবার গভীর এক আনন্দ আজও স্টিমারের মতো আলো ফেলে যায় অন্ধকার বুকে।

কার্শিয়াং, টুং, সোনাদা, ঘুম, তারপরই দার্জিলিং। টয়-ট্রেনের কামরায় ঝুম হয়ে বসে আছি। কিছু দেখছি না। চোখ খোলা রাখাটাই একটা সমস্যা। মেজদা হঠাৎ রেগে-মেগে এভারেস্টের মতো উঁচু হয়ে উঠল নাকি! দুটো দাঁতের পাটি এক করলেই কেন তবে অবধারিত মেজদার মাথায় সবার আগে চাপ পড়ছে? সেই চাপে প্রাণ যায়। মাইরি মেজদা, এতকাল ঘর করে এবার সত্যিই চললে?

যে অধ্যাপক-বন্ধুর বাড়িতে আমি উঠব, সে দেখি দার্জিলিং স্টেশনে বশংবদ হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট কালো, গাছপালা সবুজ, বাড়িঘর ম্যাড়ম্যাড়ে আর আকাশ ময়লা মশারির মতো দেখাচ্ছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝি শীতের

তাড়া খেয়ে আর ধসের ভয়ে চেঞ্জাররা অধিকাংশই পালিয়েছে। গাড়ি থেকে মোট পঞ্চাশ-ষাটজন লোক নামল।

আমার বন্ধু মলয় হালদার বাঁদুরে টুপি, ওভারকোট, দস্তানায় একদম অচেনা মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে কোনও আবেগ প্রকাশ করল না। কেবল নিমীলিত চোখ চেয়ে ধীর গলায় বলল, ক'দিন আগেও চার পার্ট ট্রেন এসেছে। এখন মোটে দুই পার্ট। এখন কেউ দার্জিলিঙে আসে?

তার মুখ থেকে দার্জিলিঙের নির্মল বাতাসে চড়া অ্যালকোহলের গন্ধ এল।

মেজদার জন্য কথা বলা পর্যন্ত আসছে না। মলয় সেজন্য অপেক্ষা না করে নিজেই ফের বলল, তুই রুমালে গাল চেপে আছিস কেন?

আমি বললাম, দাঁত।

সে বলল, ব্যথা?

আমি বললাম, ভীষণ। আগে একজন ডেন্টিস্টের কাছে চল, তারপর বাসায় যাব।

সে বলল, চল।

গেলাম। প্রৌঢ় ডেন্টিস্ট যখন একটা বাঁকানো শলা দিয়ে দাঁতটাকে খোঁচা দিচ্ছিলেন, তখন প্রবল যন্ত্রণার মধ্যেও আমি মৃদু একটা অ্যালকোহলের গন্ধ পাচ্ছিলাম। দাঁত খুঁচিয়ে ডেন্টিস্ট বললেন, এ তো সিলিং চলবে না। ওয়াল ভেঙে গেছে, কেভিটিও নার্ভ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তুলে ফেলতে হবে।

খুব চড়া অ্যালকোহলের গন্ধ পেলাম। কষ্টে বললাম, তাই দিন।

ডেন্টিস্ট মাথা নেড়ে বললেন, আজ নয়। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, ব্যথা কমলে তোলা যাবে।

আমি আরামদায়ক দাঁত তোলার চেয়ারটায় রাজার মতো যেমন বসেছিলাম তেমনি থেকেই বললাম, আমার দাঁতগুলোর অবস্থা কীরকম?

ডাক্তার হিটারে জল গরম করছিলেন হাত ধোওয়ার জন্য। মুখ ফিরিয়ে বললেন, খুব খারাপ।

চেম্বারের একদিকে কাচের জানালা। পর্দা সরানো। হঠাৎ দেখি আকাশের ময়লা মশারিটা কে যেন চালি করে তুলে ফেলেছে। আকাশ ঝকঝক করছে, পরিষ্কার। আর সেই আকাশে নিখুঁত একটা দাঁতের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা উঁচু হয়ে আছে। তার কোথাও দেয়াল ভাঙেনি, পোকায় খায়নি। একটা হালকা মেঘ আটকে আছে দাঁতে, রোদের খড়কে সেটাকে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে।

ডাক্তার হাত ধুতে ধুতে বললেন, অনেক আগেই আপনার ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল। তা হলে দাঁতটা বেঁচে যেত।

যদিও আমি পাবলিকের সামনে কথা বলতে পারি না, কিন্তু যে কোনও একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে আবার দ্বিধা আসে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, ডাক্তারের কাছে আমি বরাবরই দেরি করে যাই।

কেন?

আই হেট ডক্টরস।

খুবই আপত্তিকর কথা। কিন্তু আমার ভাগ্য ভালই যে ডাক্তার কিছু মদ্যপান করে আছেন। কিছু অ্যালকোহল পেটে থাকলে অনেক কথাই গায়ে লাগে না। আমার কথা শুনে ডাক্তার হেসে বললেন, কেন বলুন তো?

প্রচণ্ড ব্যথায় মেজদা আরও কয়েক সেন্টিমিটার উঁচু হয়ে উঠল। তবু যেহেতু আমি একজন ডেন্টিস্টের চেম্বারেই বসে আছি, সেই হেতু মনস্তাত্ত্বিক এক ধরনের সাহস কাজ করছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল ঘুঁষি অবিরল খেয়েও যেমন সহনশীল মুষ্টিযোদ্ধা অটল থাকে, তেমনি আমিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মেজদার ঘুঁষি খেতে খেতেও মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে বললাম, দেখুন, আমার শরীর সম্পর্কে আমার চেয়ে সব সময়েই ডাক্তাররা বেশি জানে, এ ব্যাপারটা আমি সহ্য করতে

পারি না। যে শরীরটা আমি গত ছত্রিশ বছর ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি, তার ভিতরকার সব খবর একজন উটকো ডাক্তার জানে, আমি জানি না। তাই ডাক্তারদের সম্পর্কে আমি জেলাস।

ডাক্তার ফের হাসলেন।

আমি বললাম, আরও একটা কারণ আছে।

ডাক্তার হাই তুললেন। বুঝলাম, যদিও আমার কথা শুনবার মতো উৎসাহ তাঁর বড় একটা নেই, তবু এই প্রায়-অফ-সিজিনে হাতে কাজ নেই বলেই বোধহয় তিনি একটা আড়াল থেকে ফিকে হলদে রঙের পানীয় ভরা একটা গ্লাস বের করে এনে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী?

একবার খুব সর্দি হয়ে আমি আমার কর্মস্থলে চার-পাঁচ দিন কামাই করি। যখন ফের কাজে যোগ দিতে যাই, তখন একটা দরখাস্তে সত্যি কথাটা লিখে ছুটির আবেদন করি। তখন কর্তৃপক্ষ বলেন যে দরখাস্তের সঙ্গে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দরকার। আমি তাদের জানাই যে, আমার একটা বিচ্ছিরি আধকপালে সর্দি হয়েছিল। আমি ডাক্তার দেখাইনি, নিজেই নানা ধরনের ট্যাবলেট খেয়েছি। তাঁরা বললেন, এতে হবে না, মেডিক্যাল সার্টিফিকেট অবশ্যই দিতে হবে। আমিও সেটা জানতাম। তবু পরীক্ষামূলকভাবে আমি আরও কিছু চিঠিপত্র লিখি। ম্যানেজিং কমিটি এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে জানাই যে, আমি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেব না, কারণ সেটা মিথ্যাচার হবে। আমি সৎ লোক, আমার আবেদনটিও সত্য। সুতরাং সেটাই গ্রাহ্য হোক। কিন্তু বৃথা, আমার আবেদন গ্রাহ্য হল না। সেই ক'দিনের ছুটি একস্ট্রা-অর্ডিনারি লিভ হিসেবে দেখানো হল, আমার সে ক'দিনের মাইনে কাটা গেল। তারপর আমি একজন ডাক্তারের কাছে গিয়ে চারটে টাকা দিয়ে একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পেয়ে যাই। ডাক্তার লিখে দিলেন যে, আমার লাম্বাগো এবং জ্বর হয়েছিল, তিনিই আমার চিকিৎসা করেছেন এবং তাঁর নির্দেশেই আমি কাজে যাইনি। সাজানো মিথ্যে কথা। এবার সেই সার্টিফিকেটটার সঙ্গে ফের একটা দরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম যে, সঙ্গের মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটা সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং জোচ্চুরি। মাত্র চারটি টাকার বিনিময়ে ওটা আমি কিনেছি। তবু কি তাঁরা এরকম মিথ্যাচারপ্রবণ হতে তাঁদের কর্মচারীদের উৎসাহ দেবেন? এর ফলে প্রবল হই-চই হল, কিন্তু নিয়মটা পাল্টাল না।

ডাক্তারটির ধৈর্য অসীম। ফের হেসে বললেন, তা আপনি কী করতে চান? নিয়ম কি সহজে পাল্টানো যায়?

আমি মেজদাকে মনে মনে একটা ধমক দিয়ে ডাক্তারকে বললাম, কিন্তু আমি সত্যি কথা বলেছি। আমি মানুষটিও সৎ। আমার স্টেটমেন্ট কেন নেওয়া হবে না? আর, সবাই যখন জানে যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট টাকা দিয়ে কেনা যায়, এবং বহু মেডিক্যাল সার্টিফিকেটই সম্পূর্ণ মিথ্যা, তখন সেটাই কেন গ্রাহ্য হবে? ডক্টর, আর ইউ নট লাইসেন্সড্ টু টেল লাইজ অ্যাট টাইমস্? তার মানে অনেক ডাক্তার কখনও কখনও লাইসেন্সড লায়ারস?

ডাক্তার ফের হাই তুললেন।

আমি বললাম, সেই কারণেই আই হেট ডক্টরস।

বলে ভিজিট দিয়ে উঠে এলাম। ভিজিটারস রুমে এসে দেখি ছেঁড়া ঢাকনার সোফায় শুয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে মলয়। নেপালি কুলিটা আমার বাক্স-বিছানার ওপর বসে বিড়ি টানছে।

স্টেশনের দুই থাক নীচে মলয়ের বাসা। ছোট্ট কাঠের বাসাটি। ঘরে ঘরে চমৎকার দেয়াল জোড়া কাচের শার্সি লাগানো জানালা। নিটোল দাঁতের মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দাঁত ব্যথায় আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মলয়ের বউকে সেই বহুকাল আগে ওদের রেজিস্ট্রি বিয়েতে সাক্ষী দিতে গিয়ে দেখেছিলাম। মুখটা মনে নেই। তার দিকেও ভাল করে তাকালাম না। ব্যথাহরা দুটো ট্যাবলেট একসঙ্গে খেয়ে বিছানা নিলাম। মেজদা, বিদায়। আমার প্রথম দাঁত তুমিই, যে আমাকে

ছেড়ে যাচ্ছ। কিন্তু এই যে তুমি যাচ্ছ তার মানে হচ্ছে, শরীরের এক জায়গায় একটা নিখুঁত নকশার ভিতরে একটা খুঁত ঢুকে গেল।

বিকেলে ঘুম থেকে উঠেই টের পেলাম মেজদা চুপ করে আছে। চারদিকে হিমযুগ। কম্বল মুড়ি দিয়ে উঠে বসলাম। বিছানার পাশেই একটা নিচু বেতের টেবিল, তাতে অনেক বই আর পত্রিকা ছড়ানো। একটা বছর তিনেকের বাচ্চা ছেলে কাগজপত্র ঘাঁটছিল। আমি উঠে বসতেই সে বলল, হ্যালো।

হ্যালো। আমি বললাম।

বাচ্চাটা প্রচুর সোয়েটার, টুপি, গরম প্যান্ট, মোজায় ঝুব্বুস হয়ে আছে। চার চোখের কোলে কান্নার দাগ শুকিয়ে আছে, ফাটা গালে বসা ময়লা। বহুকাল বুঝি তাকে পরিষ্কার করানো বা স্নান করানো হয়নি। গায়ের গরম জামাগুলোও ভয়ঙ্কর নোংরা, যেন বহুকাল সেগুলো গা থেকে খোলা হয়নি। বাচ্চাটা হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়াতে আমি তার হাত ধরেই টের পাই হাতে চটচটে আঠা মতো কী যেন। বোধহয় লজেন্সের আঠা। ঘেন্না করল।

বাইরে একটা ছাইরঙা বিকেল। আকাশে মেঘ আছে কি না ঠিক বুঝলাম না। শার্সি সব বন্ধ, তবু এমন শীত করছে যে মনে হয় প্রবল জ্বর এসেছে বুঝি। বেতের টেবিলটায় সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাইটা রেখেছিলাম। দেখছি না। বাচ্চাটারই কাজ হবে।

নিচু হয়ে টেবিলের তলা থেকে শূন্য প্যাকেট আর অন্য ধারে কেবল রাংতায় মোড়া সিগারেট দেখতে পেয়ে তুলে আনলাম। দেশলাইটাও। বাচ্চাটা তাকিয়ে আছে। তাকে বললাম, তোমার মাকে চা দিতে বলো।

তক্ষুনি সে গুটগুট করে চলে গেল।

টেবিলে অত ম্যাগাজিন দেখে একটা তুলে নিয়ে দেখেই চমকে গেলাম। একটা ভয়ঙ্কর ধরনের ইলাস্ট্রেটেড ইংরিজি যৌন পত্রিকা। বাচ্চাটা এটাই উল্টোপাল্টে দেখছিল এতক্ষণ। নিরাবরণ এবং সুন্দরী মহিলাদের ছবি। কিছু মিথুন দৃশ্যের ফটোগ্রাফও আছে। সেটা রেখে অন্যগুলো একে একে তুলে দেখি, হয় যৌন না হয় তো ফিলমের ম্যাগাজিন সব। বেশির ভাগই ইংরিজি, দু'-একটা বাংলাও আছে।

এই সামনের ঘরটাই মলয়ের স্টাডি-রুম বুঝতে পারছি। উঠে ঘুরে ঘুরে বুক-শেলফ দেখলাম। ওর বিষয় ছিল কেমিস্ট্রি, ডক্টরেটও করেছিল যতদূর জানি। এখন কেমিস্ট্রির বইয়ের ওপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে, মাকড়সা জাল বুনেছে।

বাচ্চাটা আবার গুটগুট করে হেঁটে এল ঘরে। নোংরা কিন্তু বড় সুন্দর মুখখানা তুলে বলল, আঙ্কল, মাদার ইজ নট হোম।

ওর ইংরিজি শুনে একটু থমকে গিয়ে বলি, হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ফাদার?

সে অকপটে বলল, ড্রাঙ্ক। স্লিপিং।

বলি, ইজ নোবডি অ্যাবাউট?

সে বুঝতে পারল না। চেয়ে আছে। হেসে বাংলায় বলি, আর কেউ নেই?

সে মাথা নেড়ে বলে, ওনলি আয়া।

আমি বিনীত হয়ে বলি, টেল হার টু মেক টি।

সে চলে গেল। আমি বসে রইলাম। মেজদা চুপ করেছে বটে, কিন্তু তিনধারিয়ায় দু' টুকরো পাউরুটি আর এক কাপ তত-গরম-নয় চা ছাড়া দুপুরে আমি কিছু খাইনি। খিদে পেয়েছে। চা না হলে এখন হেড অফিসে ঘড়ি টিকটিক করবে। মেজদার যন্ত্রণার চেয়ে মাথার যন্ত্রণা কিছু কম নয়। ছত্রিশে আমি অনেক অভ্যাসের দাস। বিকেলের চা না হলে বিকেল পেরোলেই মাথা মেঘলা হয়ে যায়।

দার্জিলিঙে আমার কিছু দেখার নেই। বাইরে ছাইরঙা একটা বিকেল। সামনে অনেকখানি গড়িয়ে নেমে গেছে শহর। ডান পাশে শহর উঠে গেছে বহু দূর। বর্ধমানের রাজবাড়ির নীল গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। সবই দেখা। খুব ছেলেবেলায় একবার বাগরাকোট হয়ে তিস্তার ওপর সেকালেব অদ্ভুত করোনেশন সেতু হয়ে মিলিটারি জিপ-এ শিলিগুড়ি এসেছিলাম। সেখান থেকে বাবা দেখিয়ে দিয়েছিল, ওই হচ্ছে দার্জিলিং পাহাড়। সন্ধেবেলায় সেই পাহাড়ের গায়ে মালার মতো আলো জ্বলে উঠল। দেওয়ালির রাতের মতো তিনধারিয়ার সেই আলো দেখেছিলাম, এক আমার বয়সী মেয়ের সঙ্গে বসে। সে মেয়েটির সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি, কিন্তু মুখখানা মনে আছে, কী সুন্দর মুখ! পরদিন ফের করোনেশন ব্রিজ আর বাগরাকোট হয়ে ফিরে গিয়েছিলাম। দার্জিলিঙের পাহাড় বহুদূর রয়ে গিয়েছিল। বড় হয়ে আরও কয়েকবার দার্জিলিঙে বেড়িয়ে গেছি। দু'বার হোটেলে আর দু'বার এক খ্রিস্টান মিশানে থেকে গেছি। আশ্চর্য! তবু কেবলই মনে হয়েছে, শৈশবে শিলিগুড়ি থেকে দেখা দার্জিলিং পাহাড় আজও সেই একই দূর রয়ে গেছে। সেই দূরত্ব আজও অতিক্রম করা যায়নি।

গায়ের পোশাক এখনও খোলা হয়নি। পরনে প্যান্ট আর পুল-ওভার রয়ে গেছে। ওপরে কেবল একটা মাফলার নিয়ে চায়ের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার জানা দরকার, কেন আমি কোনওদিনই শিলিগুড়ি থেকে শৈশবে দেখা দার্জিলিং পাহাড় আজও পৌঁছোতে পারিনি।

শীতের জন্য প্যান্টের পকেটে দু'হাত ভরে মাথা নিচু করে হাঁটছি। চড়াই ভাঙতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। অভ্যাস নেই বলে দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় লোক চলাচল খুবই কম। দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাচ্ছিলাম। সামনেই রাস্তাটা মোড় নিয়েছে। সেই মোড় পেরিয়ে হঠাৎ আড়াল থেকে একটা মেয়ে নেমে আসছিল। তার পরনে লম্বা কোট, কোটেরই সঙ্গে লাগানো ঘোমটার মাথা ঢাকা, হাতে বাজারের বাস্কেট। পিছনে পাহাড়ের নগ্ন লাল এবড়োখেবড়ো পটভূমি। মেয়েটা অন্যমনস্কভাবে হেঁটে আসতে আসতে হঠাৎ মুখ তুলে আমাকে দেখল। দেখেই একটু ম্লান হেসে বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

বড় চমকে উঠি। চিনি না তো! অচেনা মহিলার দিকে চেয়ে একটু ইতস্তত করে বলি, এই যাচ্ছি একটু।

বেড়াতে?

হুঁ।

মহিলাটি আর কয়েক পা কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, চা খেয়েছেন? আমার আয়াটি তো একদম হাবা, খাবারদাবারও নিশ্চয়ই কিছু দেয়নি? আমি সব সাজিয়ে রেখে গেছি, বলে গেছি যেন সাহেব উঠলেই দেয়। দেয়নি তো?

ও হোঃ! বুঝতে পেরে আমি হেসে ফেলি। এই তবে মলয়ের বউ? বলি, না। ভাবলাম একটু ঘুরে এসে খাব।

তাই কি হয়? চলুন, খেয়েদেয়ে বেরোবেন। দাঁতের ব্যথা কমেনি?

কমেছে।

মলয়ের বউ আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার ঘোমটার চালচিত্রের ভিতরে পাশ-ফেরানো মুখখানিতে এই ছাইরঙা আলোতেও কয়েকটি খুঁত পরিষ্কার দেখতে পেলাম। আমার মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমি প্রায় সকলের মুখে এবং সর্বত্রই কিছু না কিছু খুঁত দেখতে পাই। আলটপকা দেখলে মলয়ের বউ দেখতে বেশ। যাকে ঢলঢলে মুখ বলা যায়, তাই। চোখ দুটিও খুব বড়। যার চোখ সুন্দর তার মুখশ্রী যেমনই হোক, ওই চোখের জন্যই সে সুন্দর হয়ে ওঠে, এটা বরাবর দেখেছি। মলয়ের বউয়ের চোখ সুন্দর। কিন্তু তবু ওর খুঁতগুলো আমার চোখ এড়ায় না। যেমন—নাকটা লম্বা। নাকের হাড় এক জায়গায় ভাঙা। মুখে অজস্র ছিটে-তিল থাকার জন্য চামড়ার রং সব জায়গায় সমান নয়। ওর বাঁ ভ্রূ-তে একটা চুল অনেকখানি লম্বা হয়ে কপালে উঠে

আছে। ওপরের পাটির দাঁত সামান্য উঁচু হওয়ায় ওর নাকের নীচের দিকের গড়নটা ভাল নয়।

মলয়ের বউ হাসিটা মুখে থাকতে থাকতেই বলে, কিছু কেনাকাটা করার ছিল, তাই বেরিয়েছিলাম। আপনার অসুবিধা হল।

না, কিছু অসুবিধে হয়নি।

মলয়ের বউ একটা শ্বাস গোপন করল বলে মনে হল। বলল, সবই নিজের হাতে করতে হয়। সারাদিন তাই সময় পাই না। আমার হল শিবের সংসার।

ওর নামটা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ওদের রেজিস্ট্রি বিয়েতে সাক্ষী দিয়েছিলাম। সে বহুকাল হয়ে গেল। কী একটা মস্ত বড় নাম আছে মলয়ের বউয়ের শুচিস্মিতা বা মধুক্ষরা গোছের। কিন্তু মলয় ওকে বার বার একটা ডাকনামে ডাকছিল। ভারী মজার নামটি। এখন সেটা মনে পড়ছে না। নামটা অনেকটা ঢেঁকুর, হেঁচকি, হাঁচি বা ওইরকম গোছের কিছু। কিংবা ঘড়ি, কৌটো, চাবি বা চশমা গোছের কোনও নাম। যাই হোক, মনে পড়ছে না। নাম বড় ভুলে যাই।

আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে মলয়ের বউ ভিতরে গেল এবং তক্ষুনি ফিরে এসে বলল, ভিতরের ঘরে আসুন না, আপনার বন্ধু উঠেছে।

ভিতরের ঘরটার জানালার পাশেই দেয়ালের মতো পাহাড়ের লাল আর এবড়োখেবড়ো আড়াল। তাই এ ঘরে আলো আসে না। একটা হলুদ বালব জ্বলছে। এলোমেলো বিছানায় স্তূপাকার লেপ-কম্বল, সোয়েটার-কম্ফর্টার, দোমড়ানো বালিশ, হট-ওয়াটার ব্যাগ পড়ে আছে। খাটের রেলিংয়ে ঝুলছে প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, আন্ডারওয়ার, গেঞ্জি। আর সেই রাজ্যের জিনিসের মধ্যে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে মলয়, মাথায় তিব্বতি টুপি, গলায় কম্ফর্টার, গায়ে এখনও সেই ওভারকোট, প্যান্টও ছাড়েনি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে খুবই কাতরভাবে বসে আমার দিকে চেয়ে প্রথম কথা বলল, তলপেটে একটা ব্যথা ক্রনিক হয়ে গেছে, জানিস! বেশিদিন বাঁচব না। বলে লেপ, কাঁথা আর কম্বলগুলোকে অক্ষম হাতে টেনে টেনে বিছানায় আমার বসবার জায়গা করে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, বোস। টুকি বোধহয় চা-ফা দেবে। চা খাবি, না কি একটু হুইস্কি?

টুকি! হ্যাঁ টুকিই তো মলয়ের বউয়ের নাম। মলয়কে বললাম, চা।

বাচ্চাটা ঘুরঘুর করে কী যেন খুঁজছে ঘরে। একটা বেঁটে আলমারির ওপরটা দেখার জন্য টুল টেনে আনল শব্দ করে। তারপর একটা বেবি-কট-এর ভিতরে বিস্তর পরীক্ষার খাতার বান্ডিলের তলা দেখল হাটকে-মাটকে। খাটের তলায় উঁকি মারল। তারপর সোজা খাটে উঠে মলয়ের পায়ের ওপর চাপা বিশাল লেপটার তলায় ঢুকে গেল গুঁড়ি মেরে।

মলয় তার অসহায় হাতে লেপের তলায় যেখানে বাচ্চাটা উঁচু হয়ে আছে, সেখানে একটা থাপ্পড় মেরে অত্যন্ত বিষ-গলায় বলল, গেট আউট, গেট আউট সোয়াইন।

বাচ্চাটা চমকাল না। লেপের তলায় সে তার খেলনা-পিয়ানো খুঁজে পেয়ে বের করে আনল। একবার কটাক্ষে বাবাকে দেখে গুটগুট করে ঘর থেকে চলে গেল। একটু পরেই তার পিয়ানোর শব্দ আসতে লাগল পাশের ঘর থেকে। কপালটা ডান হাতে টিপে ধরে মলয় বলে, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

হট-ওয়াটার ব্যাগটা দেখলাম হিম ঠান্ডা হয়ে গেছে। বহুকাল মলয়ের খবর রাখি না। লোকপরম্পরায় শুনেছিলাম ও চন্দননগর কলেজ থেকে টাকী, তারপর সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ, কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ হয়ে অবশেষে দার্জিলিঙে বদলি হয়ে এসেছে। মলয় কোনওদিনই চিঠিপত্র লেখা পছন্দ করে না, আমিও না। কেবল দার্জিলিঙে আসার দিন কুড়ি আগে ওকে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, এবার শীতের বন্ধে ওরা দার্জিলিং-এ থাকবে কি না। ও মাত্র তিন লাইনে উত্তর দিল—ছুটিতে কোথাও যাই না। যাওয়ার জায়গা নেই। এখানে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তিনবার ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খুব শীত। তবু আসতে চাইলে চলে আয়। আমি আছি।

ওর বড় ছেলে সম্পর্কে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করছিলাম। ছেলেটাকে দেখছি না। বেঁচে আছে তো? বিয়ের কয়েক বছর পর ওদের ছেলে হয়েছিল, তার এখন প্রায় ছ' সাত বছর বয়স হওয়ার কথা।

বিছানাটা এত ঠান্ডা যে ভেজা-ভেজা লাগছে। নাকের ভিতরে একটা তরল সর্দির জন্ম হল যেন কখন থেকে। গলার দু'ধারে ব্যথা। মেজদা একটা ঝলকানি দিয়ে ফের নিভে গেল। আর একটা গরমজলের ব্যাগ উঁকি মারছে লেপের তলা থেকে। সেটা টেনে এনে দেখি, ঠান্ডা। হাতে হাত ঘষে খুব হাল্কাভাবে বললাম, তোর বড় ছেলেটা কোথায়? দেখছি না।

উঃ! বলে মুখ তোলে মলয়। একটা যন্ত্রণা চেপে রেখে বলে, হ্যাংওভারটাই সবচেয়ে বিশ্রী। তাই সারাদিন নেশা কাটলেই ভয় পাই। বড় ছেলে? তাকে কার্শিয়াঙে একটা বোর্ডিংয়ে দিয়েছে টুকি। ছেলেটা খুব বদ হয়ে যাচ্ছিল। টুকির সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হয় আজকাল। সেসব শুনে অনেক খারাপ কথা শিখে গিয়েছিল।

তোদের ঝগড়া হয়?

ভীষণ। মারপিটও হয়। বলে মলয় খুব অসহায়তা আর ক্লান্তিতে দেয়ালে মাথা হেলিয়ে দিল। বলল, আমার কলিগ-টলিগ কেউ আমার বাসায় আসে না। কলিগ কেন, কেউই আসে না। অনেকদিন বাদে তুই এলি। কিন্তু থাকতে পারবি না। এত অশান্তি যে কেউ থাকতে পারে না। তুই বিয়ে করিসনি?

না।

তা হলে করিস না।

শিবের সংসার কথাটা মিছে বলেনি টুকি। বছর দশেক আগে টুকি এই শিবের সংসারে আসে খুবই অদ্ভুতভাবে। তখন আমি নবীন পাল লেন-এর একটা বোর্ডিংয়ে থাকি। সারাদিন কাজকর্ম নেই, মাসের প্রথমে বাবা টাকা পাঠায়, বার তিনেক এম.এ. পরীক্ষার ফি জমা দিয়ে পরীক্ষা দিইনি, সকালে ব্যায়াম করে ডিমের পোচ খেতাম, রাতের শোয়ে হিন্দি সিনেমা দেখা হত প্রায়ই। সত্যিকারের কোনও কাজ ছিল না। একদিন উদ্‌ভ্রান্তভাবে দুপুরবেলায় মলয় এসে বলল, ইন্দ্রজিৎ, আজ আমি বিয়ে করছি। কিন্তু খুব নার্ভাস লাগছে। একটা রিস্কি কাজ করতে পারবি?

মলয়ের কোনও একটা গ্রহের দোষ ছিল। তার প্রেম প্রায়ই পাকত না। নইলে ভাল ছাত্র, খুব দাপুটে ফুটবল আর ভলিবল খেলোয়াড়, চওড়া হাড় আর বড়সড় কাঠামোর মলয় উপেক্ষার পাত্র ছিল না। তবু আমরা জানি, বার চারেক হয়-হয় করেও মলয়ের প্রেম টেকেনি। তার প্রেমিকাদের বিয়ে করে নিয়ে যেত অন্য লোক। প্রতিবারই প্রেমিকার বিয়ের খবর পেয়ে মলয় চিৎকার করে বিশ্ববাসীকে জানিয়েছে যে সে এবার মদ খাবে, এবং খারাপ মেয়েদের পাড়ায় যাবে।

কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না, মলয় নিজে থেকেই বহু পুরনো একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ বের করে দেখাল। চার বোন বসে আছে। প্রায় একই রকম চেহারা তাদের। বসা দু'জন একটু মোটা, দাঁড়ানো দু'জন কিছু রোগা। দাঁড়ানোদের একজনকে দেখিয়ে সে বলল, এই হচ্ছে টুকি। একসময়ে ও আমাকে রিফিউজ করেছিল। রিসেন্টলি খবর পাঠিয়েছে যে ও আমাকে এখন ভালবাসে। অবশ্য মাঝখানে বছর পাঁচ-ছয় দেখাশোনা হয়নি। চেহারাটা ঠিক এরকম আর নেই। এখন একটু বয়সের ছাপ পড়েছে। ফটোটা কীরকম দেখছিস?

বললাম, ভাল। বেশ ভাল।

মলয় খুশি হয়ে বলল, খবর পেয়ে দেখা করতে গিয়ে প্রথমেই বলে ফেললাম, দেখ, আমার বুক হাফসোল আর হাফসোল-এ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এখন আর সিওর না হয়ে কিছু করতে চাই না। আই ওয়ান্ট ম্যারেজ ফার্স্ট। এসব শুনে ও রাজি হয়ে গেল। এই আমার প্রথম সাকসেস, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ওর বাড়ির লোকেরা রাজি নয়। ভয়ঙ্কর ঝামেলা করছে। ও কোথাও একা বেরোতে পারে না, সবসময়ে ভাইয়েরা পাহারা দেয়, মা-পিসি বা ওইরকম সব বয়স্ক আত্মীয়রা বাড়ির

চারধারে নজর রাখছে। স্বজাত-স্বঘর। কোনও বাধা নেই, তবু দেবে না। কারণ, ওই টুকির রোজগারেই সংসার চলে। চাকরি-করা মেয়ে তো, তাই ছাড়তে চায় না। একমাত্র ওর বুড়ো বাবা রাজি, কিন্তু তাঁর মতের কোনও দাম নেই। প্যারালাইসিস হয়ে এক বছর পড়ে আছে বিছানায়। তাই ঠিক হয়েছে আমরা পালিয়ে বিয়ে করব। আজ বিকেল চারটেয় আমি ট্যাক্সি নিয়ে যাব, ওর বাড়ির উল্টোদিকে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে তিনবার হর্ন দেব। ও ছুটে বেরিয়ে এসে উঠে পড়বে। কেউ বাধা দিতে এলে দরকার মতো ঘুষিফুষিও চালাতে হতে পারে। রেজিস্ট্রার খাতা খুলে বসে থাকবে, আমরা ট্যাক্সি করে গেলেই বিয়ে দিয়ে দেবে। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আমার নার্ভাস ডায়েরিয়া। হাত-পা অবশ লাগছে নার্ভাসনেসে। কয়েক গ্যালন জল খেয়েছি সকাল থেকে। বুদ্ধি ঠিক রাখতে পারছি না। এতকাল পর প্রথম সাকসেস, বিশ্বাস হচ্ছে না। ওদিকে টুকি এতক্ষণ তৈরি হয়ে বসে আছে, কিন্তু আমি কিছুতেই যেতে পারব না, গেলে আসল সময়ে ঠিক হাগা-টাগা পেয়ে যাবে। আমার বন্ধুদের মধ্যে তুই-ই সবচেয়ে মারকুট্টা আর স্মার্ট আছিস। তুই যা।

কথাটা ডাহা মিথ্যে। আমি কোনওকালে স্মার্ট ও মারকুট্টা ছিলাম না। তবু সেই উদ্দেশ্যমূলক প্রশংসা শুনেও খানিকটা গরম হয়েছিলাম। একটু গাঁই-মাঁই করে আমি রাজি হই। যদিও খুবই নার্ভাস লাগছিল, তবু নিষ্কর্মা জীবনে একটা অ্যাডভেঞ্চার তো এল! পাইকপাড়ায় টুকিদের বাড়ির সামনে পৌনে চারটেয় ট্যাক্সি থামিয়ে তিনবার হর্ন দিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা সাদা দোতলা বাড়ি থেকে স্যুটকেস হাতে অচেনা একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। তার পিছনে পিছনে বুড়ি ছুঁড়ি আর ছোকরা-গোছের জনা পাঁচ-সাত মিলে খেউ-খেউ করতে করতে আসছিল। বুড়িদের দু'জন তার হাত টেনে ধরবার চেষ্টা করল। তারা কাই-মাই করে কী বলছিল তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু টুকি খুব মহীয়সীর মতো গম্ভীর মুখে, দৃঢ়তার সঙ্গে ট্যাক্সির কাছে চলে এল। আমি দরজা খুলে ধরলাম। আমার চোখে রোদ-চশমা, নাকের নীচে মোটা গোঁফ, সিঁথি কাটা চুল অর্থাৎ আমি মলয় নই। টুকি ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়ে থমকে বলল, আপনি?

আমি চাপা গলায় বললাম, আমি মলয়ের বন্ধু। উঠে পড়ুন।

টুকির থমকটা তখনও যায়নি, বলল, ও কোথায়?

আমার বোর্ডিংয়ে। নার্ভাস ফিল করছে বলে আসেনি।

টুকি তবু ইতস্তত করে। ততক্ষণে তার পুরো পরিবার এসে ট্যাক্সি ঘিরে ফেলে বেদম চেঁচাচ্ছে। তাদের মেয়ে নাকি দিন-দুপুরে চুরি হয়ে যাচ্ছে, শিগগির কে কোথায় আছ এসো গো। মেয়ে গুম হয়ে গেল যে! তাই শুনে রাস্তায় লোক জমে গেছে, পাড়ার বাড়িঘরের দরজা-জানালা-বারান্দা লোকে ভরে যাচ্ছে। তার ওপর টুকি আমাকে চিনতে পারছে না। আর ট্যাক্সিওয়ালা তখন বার বার আমাকে ধমকাচ্ছে, হাঙ্গামা না করে আমি যেন ট্যাক্সিটা এখনই ছেড়ে দিই। কয়েকটা পাড়ার ছেলে, কিংবা টুকির ভাই-টাই কেউ হবে, পটাপট রাস্তা থেকে ঢিল কুড়িয়ে ট্যাক্সির দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল। লক্ষ্য স্থির না থাকায় টুকির আত্মীয়-স্বজনদের গায়ে ঢিল এসে পড়তেই একটা তুমুল চেঁচামেচি। আমি তীব্রগলায় টুকিকে ধমক দিয়ে বললাম, উঠে পড়ুন।

টুকি কিছুটা ঢিলের ভয়ে, কিছুটা বোধহয় আত্মসম্মান রক্ষার জন্য উঠে পড়ল। ট্যাক্সিওয়ালা জান-এর ভয়ে জোর চালিয়েছিল গাড়ি। অনেক দূর পর্যন্ত পিছন থেকে ঢিল এসে পড়েছিল, খেউ-খেউ চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছিল টুকির স্বজনরা।

আমার সেই বীরত্বের কাহিনী দীর্ঘকাল বন্ধু এবং পরিচিত মহলে প্রচারিত হয়েছে। এরপর আরও কয়েকবার অনুরূপ কাজের জন্য দু'-চারজন বন্ধু বা চেনা মানুষ আমাকে হায়ার করতে এসেছে। আমি রাজি হইনি।

দুটো ঠান্ডা হট-ওয়াটার ব্যাগ কোলে নিয়ে বসে আছি। কিছু করার নেই। লেপের তলা থেকে আর একটা ব্যাগ বের করে দিয়ে মলয় বলল, দ্যাখ তো, এটা বোধহয় এখনও একটু গরম আছে।

ধরে দেখি, গরম নেই, তবে গায়ের ভাপে লেপ-চাপা থাকায় একটু উষ্ণ ভাব। ভেজা শীত গায়ের তাপ শুষে নিচ্ছে। কোথাও একটু গরম নেই। হাতে হাত ঘষি। মলয় আঙুল দিয়ে চোখের পাতা টেনে খুলে চারদিকে তাকিয়ে বলল, টুকি কি বেরিয়ে গেল?

আমি বললাম, না।

ভিতরের ঘর থেকে কাপ-প্লেটের আওয়াজ পাচ্ছি। টুকি তার বাচ্চাকে ধমকাল—কেন তুমি রেকর্ড প্লেয়ারের ওপর বসেছিলে? ওটা কি নাগরদোলা? জানোয়ার কোথাকার, যাও, চলে যাও এখান থেকে!

কথার সঙ্গে সঙ্গে চড়-চাপড়ের শব্দ হয়। বাচ্চাটা কাঁদে না, কিন্তু গুট গুট করে এ ঘরে চলে আসে। তাকে দেখেই মলয় হুমকি দিয়ে ওঠে—এই, গেটাউট, গেটাউট!

বাচ্চাটা ফের ভিতরের ঘরে চলে যায়। তার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখতে পেলাম না। খুবই নির্বিকার মুখ।

টুকি আর তার বুড়ি নেপালি আয়া যখন ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, টুকির পায়ের দিকে তাকিয়ে আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মেয়েদের পায়ে মোজা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। তার ওপর টুকি একটা সাদা রঙের মোটা উলের মোজা পরেছে।

কেক, প্যাটিস, মিষ্টি—সবই দোকানের কেনা খাবার। চা-টা দ্রুত ঠান্ডা হয়ে আসছে। আমি তাই আগে এক কাপ চা হড়হড় করে মিকশ্চারের মতো গিলে ফেললাম।

একদম ভাল লাগছিল না। বাইরে ছাইরঙা বিকেলটা মরে পোড়া কয়লার মতো হয়ে এল। টুকির মুখে একটা বিরক্তি আর গোপন রোগের অবসাদ ফুটে আছে। মলয় এখনও নিজে থেকে চোখ খুলতে পারছে না। আঙুল দিয়ে চোখের পাতা টেনে এক হাতে হাতড়ে হাতড়ে চায়ের কাপটা তুলে নিতেই স্পষ্ট দেখা গেল ওর হাত কাঁপছে, চায়ের কাপ-প্লেটে একটা থরথরানির শব্দ। ওদের বাচ্চাটা একমুঠো কেক দলা পাকিয়ে ইলেকট্রিক বালবের দিকে ছুঁড়ে মারল। কেউ গ্রাহ্য করল না।

সকালে ফের বৃষ্টি পড়ছে। কী ভয়ঙ্কর শীত! কেবলই মনে হয় শরীর ভরে বুঝি জ্বর আসছে। হাত-পা অবশ লাগে, বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

একটু বেলা হতেই, আটটা নাগাদ আকাশের মেঘ কেটে গেল। মলয় তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। টুকি তার বাচ্চাকে বাথরুমে নিয়ে গেছে। আমি পোশাক পরে বেরিয়ে আসি।

মেঘ কেটে যেতে শীতটা আরও ক্ষুরের ধারের মতো চনচনে হয়েছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। আমি ম্যাল পার হয়ে খুব আস্তে আস্তে অবজারভেটরির দিকে উঠতে থাকি। উইনডামেয়ার হোটেলের প্রকাণ্ড রঙিন ছাতাগুলো আজও লাগানো হয়েছে। ছাতার তলায় চেয়ার টেবিল, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। হোটেল পার হয়ে একটু উঠতেই ডানদিকে কয়েকটা হানিমুন কটেজ। সেগুলো নিঃঝুম, শূন্য। সবাই চলে গেছে।

মহাকাল মন্দিরে উঠেও উত্তর দিকে কিছু দেখা গেল না। মেঘে ঢাকা। অনেক নীচে কেবল রেসকোর্সটা দেখা যাচ্ছে, ভেজা, শূন্য। দু'-একটা পায়রা পাখা ঝাপটায় আশেপাশে। চারধারে মন্ত্র লেখা নিশানগুলি উড়ছে ফিস-ফিস করে। বহুকাল আগে কুচবিহার মিশনারি স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরীক্ষা ভাল দিইনি, তাই মহাকালের কাছে মানসিক করেছিল মা, আমি পাশ করলে মহাকালে পায়রা উৎসর্গ করবে। আমি পাশ করে গেলাম, পায়রা দুটো অবশ্য দীর্ঘকাল দেওয়া হয়নি। কয়েক বছর বাদে আমার ধর্মভীরু মায়ের তাগাদায় এখানে এসে পায়রা উড়িয়ে দিয়ে যাই।

উৎসর্গ করা শ'য়ে শ'য়ে পায়রা আজও আছে। জানি না, আমার ছাড়া পায়রা দুটো আজও আছে কি না, থাকার কথা নয়। ওরা বেশিদিন বাঁচে না। তবু পায়রার ডানার শব্দ চারদিকে একটা বিস্মৃতির পরত ভেঙে ফেলতে থাকে।

আমার এটাই মুশকিল। মনে পড়ে, বড় বেশি মনে পড়ে। কীভাবে সুখী মানুষ হওয়া যায় এই বিষয়ে কিছু বিদেশি বই আমি প্রায়ই পড়ি। অতীতের প্রতি বেশি ভালবাসা, অতিরিক্ত শৈশবস্মৃতি মানুষকে বর্তমানের প্রতি নিস্পৃহ, উদাসীন করে তোলে। অসুখী করে।

রেলিংয়ের ওপর একটা পায়রা ঘাড়ে মুখ ডুবিয়ে রোদে বসে আছে। আস্তে তার পিঠ ছুঁই। সে একটু সরে বসে। উড়ে যায় না। আমার সেই পায়রা দুটো নিশ্চিত তাদের সন্তানসন্ততি রেখে গেছে। এটা হয়তো তাদেরই নাতিপুতি কেউ হবে। এই ভেবে তাকে আর একটু আদর করি। লোমের ভিতরে আঙুল ডোবাতেই পায়রার নরম হাড় আর উষ্ণতা আঙুলে লেগে যায়। সেই স্পর্শটা অনেকক্ষণ হাতে লেগে থাকে। মহাকালে পায়রা ওড়ানোর কথা ভুলতে পারি না। অসুখী হওয়াই আমার নিয়তি।

ফেরার পথে ম্যাল-এ কিছু লোকজন দেখা গেল। উত্তরে এখনও মেঘ জমে আছে। জলাপাহাড়ের তলায় গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে এক চাপ কুয়াশা। তবু ম্যাল-এ রোদ পড়েছে। লোকজনের মধ্যে আমি বেশ কয়েকজন বাঙালি চেহারার যুবতীকে দেখতে পাই। প্রচুর গরমজামায় তাদের যৌবনোচিত জিনিসগুলি ঢাকা, ফলে হোল্ডঅলে বাঁধা বিছানার মতো দেখাচ্ছে। শুধু মুখশ্রীর প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশি। কাজেই একটা আধভেজা, ঠান্ডা বেঞ্চে বসে আমি সিগারেট ধরিয়ে ফেলি। মেজদা খুব ক্ষীণভাবে জানান দিচ্ছে যে সে এখনও হাল ছাড়েনি।

সবচেয়ে সাহসী যে মহিলাকে দেখছি, তার পরনে একটা টমেটো রঙের নাইলনের শাড়ি, আর একটামাত্র হাফকোট রয়েছে গায়ে। তার হাতে দস্তানা বা পায়ে মোজাও নেই। একটু মোটাসোটা ও ফর্সা মহিলাটি একটা টাট্টু ঘোড়ার ওপর একটা বাচ্চা ছেলেকে বসে থাকতে সাহায্য করছে। উল্টোদিক থেকে সহিসও অবশ্য ধরে আছে ছেলেটিকে। ঘোড়াটি নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে পাহাড় ও প্রকৃতি দেখছে। মহিলার খাটো ব্লাউজের নীচে কিছুটা পেট এবং আদুড় গলা ও মোজাহীন পা দেখে আমার নিজেরই শীত করছিল। মেয়েরা পারেও।

বন্ধুগণ, মাঝে-মধ্যে হঠাৎ পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা কি একটা 'ক্লিশে'? অর্থাৎ পুরনো কায়দা? কিন্তু ভাইসব, আমার জীবনে এরকম সব ঘটনাই ঘটে—যা শুনলে হঠাৎ খুব চটকদার মনে হয়, অথচ আসলে কিছু নয়।

এই যেমন ওই ফর্সা মোটা মহিলাকে কয়েকবারই আমার চেনা-চেনা মনে হল! মাথার ঘোমটাটি কাঁধের ওপর খসে পড়তেই আমার মনের ভিতর এক বিচক্ষণ ইন্দ্রজিৎ বলে উঠল—ভাগ্যিস, মিতুনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি ইন্দ্রজিৎ।

ঠিকই। আমি ভাগ্যবান। নইলে ওই মোটা, বয়স্কা ও ভয়ঙ্কর রকমের বহির্মুখী চেহারার মহিলাটি আজ আমার বউ হত। আজ এই ম্যালের ঠান্ডা বেঞ্চে শীত-কাতর ছাত্রিশ বছর বয়সী সে ইন্দ্রজিৎ বসে আছে, সে তত বোকা নয়। কিন্তু পিছু ফিরে তাকালে সেই ইউনিভার্সিটির আমলের যে ইন্দ্রজিৎকে আবছা দেখা যায় সে বড় বোকা ছিল। তার ভবিষ্যৎদৃষ্টি ছিল না। শীতে কেঁপে উঠে আমি ইন্দ্রজিতের ভাগ্যকে সাধুবাদ দিলাম।

বন্ধুগণ, ওই মহিলাটি আমার পুরনো প্রেমিকা। আমার না বলে বলা ভাল, ইন্দ্রজিতের। কারণ, নানা বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এই যে আজকের আমি ইন্দ্রজিৎ, এর প্রেমিকা কিছুতেই ওই মিতুন নয়। মিতুন যার প্রেমিকা ছিল সে অন্য ইন্দ্রজিৎ। অবশ্য সে মিতুনও আলাদা।

সেই বোকা ইন্দ্রজিতের একটা প্রেম হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময়। তখন অবশ্য ইন্দ্রজিৎ খুব বেশি প্রেমে পড়ত। সেটাই ছিল তার হবি। কিন্তু সে কখনওই মেয়েদের সঙ্গে কথা

বলার সাহস পেত না। কিন্তু খুব অসহায়ভাবে, নিয়তির নির্দেশের মতো একা একা প্রেমে পড়ে যেত। যেমন সেই জয়া ঘোষ নামে মেয়েটি, রোল নাম্বার ফোরটিন। এম-এ ক্লাশের প্রথম ছ' মাস সে জয়া ঘোষের দিকে তাকিয়ে থেকে ক্লাস নষ্ট করেছে। শুধু অপলক তাকিয়ে থাকলে যে-কোনও মেয়েই সেটা টের পায়। না পাওয়াই আশ্চর্য, জয়া ঘোষও পেয়েছিল। প্রথম একমাস খানেক জয়া ইন্দ্রজিতের দিকে চোখ পড়লেই চোখ সরিয়ে নিত, খুব বিরক্তির ভাব দেখাত, কখনও কখনও লজ্জার ভাবও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়া ঘোষও চশমার ভিতর দিয়ে একটু ট্যারা চোখে ইন্দ্রজিৎকে দেখত। দুজনেরই ক্লাস নষ্ট হত। কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ জয়ার সঙ্গে কথাই বলতে পারল না। দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে সে জয়ার কথা খুব আন্তরিকভাবে বলে ফেলেছিল। তা শুনে সুবোধ, বিভূতি, মিহির সবাই অবাক। বলল, তা কথা-টথা বল। ঝুলিয়ে রেখে লাভ কী? ইন্দ্রজিৎ খুব ভয় পেয়ে বলল, ও বাবা, সে আমি পারব না।

শ্রীগোপাল মল্লিক লেন-এর ভিতর হানাবাড়ির মতো একটা বাড়িতে ছিল ইউনিভার্সিটির একটা আর্টস হোস্টেল। তার নীচের তলার ড্যাম্প লাগা অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জাগ্রত অবস্থার বারো আনা সময় সে জয়ার চিন্তা করেছে। উঁহু জয়ার সঙ্গে খুব সাদামাটা ভাবে তার আলাপ হবে না। আগে একটা ভুল বোঝাবুঝি হবে, একটা রাগারাগি হবে, জয়া তাকে খুব অপমান করবে, এবং তারপর জয়া ইন্দ্রজিতের মহত্ত্ব বুঝতে পেরে অভিমান আর আত্মগ্লানিতে চোখে জল আর বুকভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে একদিন সামনে এসে মাথা নত করে দাঁড়াবে। কিন্তু নাটক সেইখানেই শেষ হবে না মাঝখানে আরও কিছু আবেগপ্রবণ ঘটনা ঘটবে। ইন্দ্রজিৎ কি সহজে ধরা দেবে জয়ার কাছে!

এসব ভাবত ইন্দ্রজিৎ, সময়টা ভারী চমৎকার কেটে যেত। সেই ষোলো-সতেরো বছর আগেও সিনেমায় বা সস্তা নভেলে এরকম সব গল্প থাকত। আর ইন্দ্রজিৎ ঠিক এরকমই সব গল্পের রোমান্স দিয়ে জয়া আর তার প্রেমের গল্প তৈরি করত মনে মনে। ক্লাসে নোট নিত না, হোস্টেলেও কদাচিৎ বইপত্র ছুঁত।

একবার সেমিনারে জয়া ঘোষ ঠিক ইন্দ্রজিতের পাশে এসে বসল। বোধহয় ইচ্ছে করেই। চোখ দিয়ে ইন্দ্রজিৎ তাকে অনেক জ্বালিয়েছে, এবার সে বোধহয় চোখের খেলাকে একটা কার্যকরী চেহারায় দাঁড় করাতে চাইছিল। দু'জনেই নার্ভাস, জয়া কিছু কম।

সেমিনারে একজন নামজাদা কবি-অধ্যাপক বাংলা অনুবাদের সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। জয়া ঘোষ হঠাৎ বলল, আপনি তো নোট নিচ্ছেন না, কলমটা একটু দেবেন? আমার কলমটায় কালি ফুরিয়ে গেছে।

খুব ভুল করেছিল জয়া। তার কলমের কালি ফুরোল কি না কে জানে, কিন্তু ইন্দ্রজিতের বুক থেকে প্রেমটুকু সেইক্ষণে পদ্মপাতার জলের মতো ফুরিয়ে গেল। খুব কাছ থেকে জয়ার দিকে তাকাতেই সে জয়ার কয়েকটা ভীষণ খুঁত দেখতে পেল। যেমন, জয়ার ওপরের ঠোঁটের লোম কিছু বড়, নাকের দু'ধারে রেখা গভীর, ভ্রূতে চুল প্রায় নেই, মুখের চামড়া খসখসে, কথা বলার সময়ে জয়ার দাঁত দেখা যাচ্ছিল, ফোলা মাড়ি এবং দাঁতে হলদে রং।

ইন্দ্রজিৎ কলমটা দিল, যথাসময়ে ফেরতও পেল ধন্যবাদ সহ। জয়া বলল, মাথা ধরেছে, একটু চা খেলে হত।

স্পষ্ট নিমন্ত্রণ, আহ্বান। ইন্দ্রজিৎ চুপ করে রইল খুবই রূঢ়ভাবে। পরদিন থেকে জয়ার দিকে আর কখনও তাকায়নি। সময়টা একদম ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ প্রেম ছাড়া থাকতেই পারত না। জয়া ঘোষের প্রতি অপছন্দ এসে যাওয়ার পর সাতদিন খুব খারাপ কাটে। তারপরই সে ঐন্দ্রিলা মুখার্জির প্রেমে পড়ে। ঐন্দ্রিলা অন্য সেকশানের মেয়ে, সুন্দরীই বলা যায়, তবে কিছু মোটাসোটা। ক্লাসে বসে তার দিকে তাকানোর প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সে অন্য সেকশনে পড়ে। ইন্দ্রজিৎ তাই অফ পিরিয়ড বা দুই পিরিয়ডের মাঝখানের লঘু

সময়টুকুতে 'বি' সেকশনের সামনে পায়চারি করত। কিন্তু ঐন্দ্রিলার বোধহয় অনুভূতি খুব প্রখর ছিল না। সে বুঝতেই পারল না যে ইন্দ্রজিৎ তার জন্যই ক্লাসের সামনে ওরকম পায়চারি করে। ইন্দ্রজিতের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে সে নোট নিত, পাশের মেয়ের সঙ্গে গল্প করত, করিডোর দিয়ে হেঁটে যাতায়াতের সময়েও ইন্দ্রজিৎকে দেখে তার কোনও ভাবান্তর হত না। যেন সে গোরু, গাছ, দেওয়াল বা বৃষ্টি দেখছে এমনভাবেই কখনও-সখনও সকলের সঙ্গে ইন্দ্রজিৎকেও দেখেছে। সেটা দেখা নয়। এবং সিক্সথ ইয়ারে উঠতে না উঠতেই ঐন্দ্রিলার বিয়েও হয়ে গেল। সামারের পর সে এক সিঁথি ভর্তি সিঁদুর নিয়ে ক্লাসে এল।

সিক্সথ ইয়ারে উঠেও সেই বোকা ইন্দ্রজিৎ তখনও কোনও মেয়ের সঙ্গেই মুখোমুখি আলাপ করতে পারেনি। সেই জন্য তার ভারী দুঃখ হত। করিডোরে ছেলেরা মেয়েরা কেমন পরস্পরকে নাম ধরে ডাকাডাকি করে। মাধুরী কেমন অধীরকে ডেকে একদিন বলল, তোর সিগারেটটা দে তো, দু' টান খাই। অধীর তার এঁটো জ্বলন্ত সিগারেট দিল, মাধুরীও খেল। তার ওরকম সব হয় না, অবশ্য এরকম সাদামাটা জলের মতো মেলামেশা পছন্দও করত না ইন্দ্রজিৎ। তার ধারণা ছিল, মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে রহস্যময়, তীব্র আবেগ ও অভিমানপূর্ণ, স্পর্শকাতর, সে নিজে থেকে কোনও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবে না, বরং কোনও মেয়ে যদি কখনও খুব অদ্ভুত কোনও পরিস্থিতি তৈরি করে তার কাছে আসে তো আসুক। সে অপেক্ষা করত, অপেক্ষা করতে ভালবাসত। একদিন তাদের টিউটোরিয়াল গ্রুপের দিদিমণি টাইপের বয়স্কা মহিলা নেলী রায় তার পাশেই বসে বলল, আগের দিন আসিনি, কী নোট দিয়েছে একটু দেখাবেন? ভয়ঙ্কর বিতৃষ্ণায় মুখ সরিয়ে নিয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। এরকম দু'-চারজন আকর্ষণহীনা তার সঙ্গে কথা বলেছিল। কত যুবতী চারদিকে, তবু ইন্দ্রজিতের প্রতি কেউই কৌতূহলী নয় কেন? না কি আছে কেউ! ইন্দ্রজিৎ হয়তো টের পাচ্ছে না। আড়াল থেকে কেউ হয়তো দেখছে ইন্দ্রজিৎকে, লক্ষ রাখছে! যেমন তুষারক্ষেত্রে ধীরে ধীরে গভীর হ্রদের জন্ম হয়, তারপর একদিন সেই উৎস থেকে উৎসারিত স্রোত ধেয়ে যায় সমুদ্রের দিকে, তেমনি সেই আড়ালের যুবতীটির বুকে গোপনে তৈরি হচ্ছে সেই হ্রদ! চারদিকে লক্ষ রাখত ইন্দ্রজিৎ, কে তাকে দেখছে, কে-ই বা তার দিকে তাকিয়েই পলকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে ধরা পড়ার লজ্জায়। তেমন কাউকে ধরতে পারেনি ইন্দ্রজিৎ, দু'-চারজনকে কেবল সন্দেহ হয়েছিল।

কিন্তু মুশকিল এই যে, একমাত্র ক্লাস ছাড়া অন্য কোথাও মেয়েদের খুব কাছাকাছি পাওয়া ইন্দ্রজিতের ভাগ্যে ঘটত না। কিন্তু এম.এ. ক্লাসে সে আমলে সুন্দরী মেয়ের রীতিমতো অনটন ছিল। সুন্দরীরা স্কুলের পরই প্রেম এবং বিবাহের রন্ধ্রপথে খসে যেতে শুরু করে। আই.এ. বা বি.এ. ক্লাসের পর ঝাড়াই বাছাই হয়ে অবশিষ্ট থাকে খুবই কম। নিতান্তই দু'-তিনজন এসে এম.এ. ক্লাসে পৌঁছোয় বটে, কিন্তু ততদিনে তারা খুবই বিচক্ষণ হয়ে ওঠে, আবেগ প্রবণতা প্রায়ই থাকে না। তার ওপর তাদের স্তাবকসংখ্যাও এত বেশি যে সেই স্তাবকদের দেয়াল ভেদ করে ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ করা খুবই কষ্টকর ছিল তাদের পক্ষে। মুখচোরা, লাজুক এবং তত সুন্দর নয় ইন্দ্রজিৎকে লক্ষ করবেই বা কেন তারা? তবু ইন্দ্রজিৎ অপেক্ষা করত, অপেক্ষা করতে ভালবাসত।

ওই যে ম্যাল-এর ক্ষীণ রোদে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে একটা বাচ্চা ছেলেকে বসিয়ে ধরে আছে, কে বিশ্বাস করবে এখন যে ওই মিতুন ছিল সেই মুষ্টিমেয় সুন্দরীদের একজন, যারা প্রেম এবং বিবাহের অনেক বিপজ্জনক খানাখন্দ পেরিয়ে এম-এ. ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছেছিল! আর সেই পিপাসার্ত এবং রোমান্টিক ইন্দ্রজিৎ এই আমি কেমন নিরাসক্তভাবে দৃশ্যটা দেখছি! বিয়ের বহু বছর পর যেমন স্বামী তার স্ত্রীর দিকে নিরাসক্তভাবে তাকায় আমার দৃষ্টিও সেইরকমই। তদুপরি আমি ভাগ্যবান এই কারণে যে, আমার সঙ্গে মিতুনের শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। সেই ইন্দ্রজিৎ যে আমিই ছিলাম, সেটা ভাবতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। আর সেই কষ্ট এমনই বেদনাদায়ক যে মেজদা পর্যন্ত তাতে সায় দিয়ে কয়েকবার চমকে উঠল।

বন্ধুগণ, আমার বিশ্বাস মানুষের জীবনে ইচ্ছাপূরণের ঘটনা এক-আধবার ঘটে। যেন তখন সমস্ত পৃথিবীকে উপেক্ষা করে ঈশ্বর অলক্ষ্যে তার কাছেই এসে দাঁড়ান। তখন মানুষের মনে যে প্রার্থনা থাকে তা পূরণ করে দিয়ে চলে যান। সেই শুভক্ষণটাকে অবশ্য মানুষ ঠিক চিনতে পারে না। সে হয়তো তখন ভাবছে, ইস, কাল যে অফিসে ছাতাটা ফেলে এলাম, সেটা কি আর পাওয়া যাবে? পাওয়া যায়, এবং শেষ পর্যন্ত কেবল ছাতাটাই সে পায়। ঈশ্বর আর কিছু দিতে পারেন না, দেওয়ার অসীম ক্ষমতা থাকলেও। আমি একটি মেয়েকে জানি, একবার চাইবাসায় নিরালা দুপুরে ঘুম থেকে উঠে একটা ঘুঘুর করুণ ডাক শুনে তার মনে হয়েছিল, ইস, এখন যদি হেমন্তর সেই গানটা হত। ভাবতে ভাবতেই সে অন্যমনে ট্রানজিস্টার ছাড়তেই, আশ্চর্য, হেমন্তর সেই গানটাই বেজে উঠল। মেয়েটা এত অবাক যে, দীর্ঘকাল ব্যাপারটা ভুলতে পারেনি। আমি ঘটনাটা শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। সে কী হারিয়েছিল তা সে জানত না।

ভাইসব, তা আমার জীবনেও, আমি টের পাই, সেই শুভক্ষণ এসেছিল এবং চলে গেছে, সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়েই, সিক্সথ ইয়ারে। আমি না বলে ইন্দ্রজিৎ বলাই ভাল। তখনকার ইন্দ্রজিৎ এখনকার আমার মতো সেয়ানা ছিল না। ইন্দ্রজিৎ জানত না কখন ঈশ্বর এসে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে তাকে বলে গেছেন, তথাস্তু।

তাই ইন্দ্রজিৎ যেমন চেয়েছিল তেমনই ঘটনা ঘটল একদিন। স্পেশাল পেপারের ক্লাস করে সে যখন ফিরছিল, তখন করিডোরে জানালার ধারে দাঁড়ানো দুটি মেয়ে তাকে দেখে ফিস ফিস করে কী বলাবলি করল, তারপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে হেসে উঠল। ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে তাকাতেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, এবং মুখ ফিরিয়েও তারা আঁচল চাপা দিয়ে হেসেছিল আরও খানিকক্ষণ। তাদের মধ্যে একজন ছিল ওই মিতুন। কী সুন্দর দেখতে ছিল মিতুন। টানা টানা চোখ, ফর্সা গা, লম্বাটে মুখ, ক্লাসে সে-ই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর ছিল।

ইন্দ্রজিতের বরাবরই এক দোষ। মান-অপমান রাগ-বিরাগ সবই তার হয় কিছু দেরিতে, ঘটনা ঘটে যাওয়ার অনেক পর। কেউ তাকে অপমান করল কি না, বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখাল কি না এটা বুঝতে তার সময় লাগে। অনেক ভেবে, এবং ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যখন সে বুঝতে পারে যে এটা তাকে অপমান করা হয়েছে বা উপেক্ষা করা হয়েছে তখন সে একা একা রেগে ওঠে বা লজ্জাবোধ করতে থাকে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যায়, কিছুই করার থাকে না। তখন ইন্দ্রজিৎ একা একা মনে মনে প্রচণ্ড রাগ-অভিমানকে হজম করতে থাকে। এবং এইভাবেই তার একটা ক্রনিক অম্বলের অসুখের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাইসব, তা বলে মনে করবেন না যে ইন্দ্রজিতের স্পর্শকাতরতা কিছু কম ছিল। মোটেই তা নয়, বন্ধুগণ। তবে ঘটনার মুহূর্তে ইন্দ্রজিৎ সব সময়েই কিছু দিশাহারা হয়ে যেত। কী করা উচিত বা কী বলা উচিত তা সে ঠিক করতে পারত না। তার রিফ্লেক্স ছিল কিছু বিলম্বিত, প্রতিক্রিয়া হত দেরিতে। আজও হয়।

সে রাতে ইন্দ্রজিতের ঘুম হয়নি। পরদিন সে ইউনিয়নের সেক্রেটারি এবং তার বন্ধু নেপালের কাছে গিয়ে হাজির। ভোটের জন্য নেপাল প্রায় সব ছেলে এবং মেয়েকে চিনত, খাতিরও রাখত। ইন্দ্রজিৎ তাকে গিয়ে বলল, একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে নেপাল। আমি খুব ইনসাল্ট ফিল করছি। কাল আমাকে দেখে মিতুন চৌধুরী আর মোহিনী রায় হেসেছে। আই ওয়ান্ট অ্যান এক্সপ্ল্যানেশন।

নেপাল তেমন উত্তেজিত হল না। আবার ইলেকশন আসছে, তাই সে খুব ব্যস্ত তখন। সব শুনে-টুনে বলল, তোকে দেখে হাসবে কেন? এমনিই হেসেছে হয়তো, তুই সে সময়ে পাস করছিলি, তাই ভেবেছিস।

ওসব ইন্দ্রজিৎ অনেক ভেবেছে। অনেক ভেবে তবেই সে সিদ্ধান্তে আসে। এই তার স্বভাব। তাই সে ঘটনাটা আর একবার বিশ্লেষণ করে নেপালকে বলল, বুঝেছিস? সে সময়ে করিডোরে আর

কেউ ছিল না। ওরা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে একজন আর একজনকে ফিস ফিস করে কী বলল, তারপর হাসল।

ইলেকশনের চিন্তায় চিন্তিত নেপাল তেমনি গা-না-করা ভাব করে বলল, দেখি।

নেপাল দেখেছিল। আর তার ফলটা হল মারাত্মক। সে সময় ইন্দ্রজিৎ কল্যাণ নামে তার এক বন্ধুর সঙ্গে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইউনিভার্সিটির দীর্ঘ এবং জনশূন্য করিডোরগুলিতে ঘুরে বেড়াত। আর সে-বছর কোন টিম লিগ জিতবে বা কোন খেলোয়াড় সামনের বছর কোন টিমে যাবে এইসব নিয়ে গল্প করত। সেদিনও ওইরকম গল্প করতে করতে তারা একটা বাঁক ঘুরে তাদের ক্লাসের মুখোমুখি হতেই দেখতে পেল, নেপাল দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে, আর তাকে দেয়ালের সঙ্গে গেঁথে অর্ধচক্রাকারে গুটি ত্রিশেক মেয়ে দাঁড়িয়ে কাউ-কাউ করছে। তাকে দেখেই নেপাল সেই নারীব্যূহের ভিতর থেকে একখানা উদগ্রীব হাত তুলে চেঁচিয়ে বলল, ইন্দ্রজিৎ, এই যে এখানে।

ইন্দ্রজিৎ দৃশ্যটা দেখেই বিপদের গন্ধ পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। নেপালের ডাকাডাকির উত্তরে সে কেবল—'পরে হবে, পরে হবে' বলে পালানোর চেষ্টায় ছিল। অত মেয়ে একসঙ্গে দেখে এবং তাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। সে জানত, অত মেয়ের সামনে সে একটাও কথা বলতে পারবে না, হয়তো কেঁদে ফেলবে।

কিন্তু নেপাল ছাড়ল না। তারও জান-এর ভয় আছে। ছুটে এসে সে ইন্দ্রজিতের হাত চেপে ধরে বলল, তোকে নিয়েই হচ্ছে। ওরা বলছে, তোকে নিয়ে ওরা হাসাহাসি করেনি। মেয়েদের মধ্যে ব্যাপারটা চাউর হয়ে যাওয়ায় সবাই খাপ্পা। তুই ওদের সঙ্গে মুখোমুখি করে নে। নইলে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। পজিসনও খারাপ হয়ে যাবে।

অতএব ইন্দ্রজিৎকে যেতে হল। নেপাল টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল মেয়েদের পিছনে। দিয়ে সে ফের অর্ধচক্রাকার ব্যূহের ভিতরে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। মেয়েরা নেপালের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে রইল, কেবল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ইন্দ্রজিৎকে দেখে নিল কয়েকজন।

নেপাল ডাকল, ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্রজিৎ স্বপ্নোত্থিতের মতো বলল, অ্যাঁ।

এইবার তোর কথা বল। কে তোকে দেখে হেসেছে?

কেউ না। ইন্দ্রজিৎ ঢোঁক গিলে বলল।

ভীষণ উত্তেজিত ও ভীত নেপাল বলল, কেউ না মানে?

ইন্দ্রজিৎ বলল, মানে সবাই নয়, দু'জন।

তারা কারা?

দুজনের নাম তক্ষুনি মনে করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল ইন্দ্রজিৎকে। তার ওপর মিতুন চৌধুরী যেহেতু সুন্দর সেইহেতু তার নামটা মুখেই আনতে পারছিল না। অনেক কষ্টে বলল, মোহিনী রায়।

আর একজন কে?

রোল নাম্বার টুয়েন্টি থ্রি।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। মিতুন চৌধুরী তার দিকে ফিরেও না তাকিয়ে নেপালকে বলল, কী বলছে ও? আমরা! আমি?

তক্ষুনি এত ধকলের জন্যই বোধহয় ইন্দ্রজিতের একটা মরিয়া সাহস এল। বলল, আপনিই তো!

মিতুন চৌধুরী ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আপনাকে চিনিই না। এমন কী আপনি যে আমাদের ক্লাসে পড়েন তাও জানতাম না। হাসা তো দূরের কথা।

গল্পে উপন্যাসে বা সিনেমায় এরকমই হয়। এইভাবেই শুরু হয়, শেষ হয় অন্যভাবে। যেমনটা

ইন্দ্রজিৎ চেয়েছিল তেমনটাই ঘটছিল। কিন্তু 'চিনিই না' কথাটা শুনে তখনই নিভে গেল ইন্দ্রজিৎ। তার প্রতিক্রিয়া কিছু দেরিতে হয় ঠিকই, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল যে, এই অপমানই পৃথিবীর শেষতম অপমান। এরপর সে আর মানুষ থাকবে না, হয়তো মেঘ হয়ে যাবে, কিংবা ঘাস—যাদের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। সে যে এক ক্লাসে পড়ে, তাও জানে না মিতুন চৌধুরী? এ কেমন কথা? ভারী অবাক হয়েছিল ইন্দ্রজিৎ। তবে কি এরকম অনেকেই আছে যারা জানে না যে, সে এক ক্লাসে পড়ে, বা এক পৃথিবীতে বাস করে!

কিন্তু ঈশ্বর তার সহায়। সে তখন একটা অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিল। ভেবেচিন্তে নয়, যেন তার কণ্ঠ থেকে ঈশ্বর কথা বললেন। সে বলেছিল, চেনেন না? ওঃ, তা হলে আমারই ভুল। তা হলে বরং আমিই ক্ষমা চাই। আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। চলি রে নেপাল।

বলে সে চলে এল। গোপনে চোখের জল মুছল। বস্তুত তার নিজের অস্তিত্ব বিষয়ক সংকট নিয়ে সে এত বেশি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল যে, নিজেকে অপমানিত পর্যন্ত বোধ করতে পারছিল না। পুরো একটা দিন সে মেঘ বা ঘাস হয়ে ছিল।

পরদিন ফের ইউনিভার্সিটিতে তাকে ধরল নেপাল— শোন ইন্দ্রজিৎ, কথা আছে।

ঘাস-ইন্দ্রজিৎ খুব অচেনা গলায় বলল, কী?

গতকাল সবাই চলে গেলে মিতুন একা এসে আমার কাছে সব স্বীকার করেছে!

মেঘ-ইন্দ্রজিৎ বলল, কী বলেছে? আমাকে চেনে? আমি যে আছি তা জানে?

নেপাল অত কূট প্রশ্ন বোঝে না। বলল, খুব জানে। আর ওরা সত্যিই তোকে দেখে হেসেছিল।

কথাটা শুনে ইন্দ্রজিৎ যেন খুশি হল। এতক্ষণ তার অস্তিত্ব ছিল না, এখন আবার অস্তিত্বটা ফিরে আসছে। হেসেছিল? তা হাসুক না, তবু তো অস্তিত্ব স্বীকার করছে! বলল, তাই নাকি?

নেপাল বলল, গ্রীষ্মকালে একদিন তুই নাকি চুল ছেঁটে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে ক্লাসে এসেছিলি। সেই দেখে সব মেয়েরা তোকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিল। তারপর তোকে দেখলেই ওরা আর হাসি সামলাতে পারে না। তুই টের পাস না হয়তো, কিন্তু ওরা হাসে। সেদিন হঠাৎ মুখোমুখি হেসে ফেলেছিল বলে তুই ধরে ফেলেছিস।

সমস্ত পৃথিবী ফাটিয়ে ইন্দ্রজিতের চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল, রাগে। দুশো মাইল এক নাগাড়ে দৌড়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল, অপমানে।

সে ঘাড়ে পাউডার দিয়ে ক্লাসে গিয়েছিল! তাকে নিয়ে মেয়েরা গোপনে হাসাহাসি করে! আর সে কেবলই ভাবে, কোথায় কোন তুষারক্ষেত্রে গোপনে তৈরি হচ্ছে হ্রদ, একদিন স্রোত ঠিক আসবে তার দিকে!

কয়েকদিন ঘুমোয়নি ইন্দ্রজিৎ। ক্লাসে যায়নি। চুল ফের ছেঁটে ফেলল একদিন। রাতে ঘুমোত না বলে সেই প্রথম সে তার বিছানায় ছারপোকার অস্তিত্ব টের পায়। আগে হা-ক্লান্ত হয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়ত নিঃসাড়ে। টের পেত না। এখন জেগে থেকে পেল। এক সকালে চৌকি বের করে ফুটন্ত গরম জল ঢেলে অবাক হয়ে দেখল, কয়েক হাজার ছারপোকা জলের মধ্যে কালোজিরের মতো ছড়িয়ে থিক থিক করছে। অনেক রক্ত খেয়েছে শালারা—এই ভেবে সে ওই চূড়ান্ত মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যেও দুধ মাখন আর প্রোটিন খেতে শুরু করে। দিনে ঘুমোত। ফলে কয়েকদিনেই তার চেহারা ভাল হয়ে উঠল।

ইচ্ছাপূরণের ঘটনাটি ঘটে এরপর, এক বৃষ্টির দিনে। অধ্যাপকরা কেউই প্রায় আসেননি। ছাত্রছাত্রীও খুব কম। আগের রাত থেকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। ট্রাম-বাস ভাল চলছে না। আকাশে গভীর মেঘ। প্রথম দুটো ক্লাস হল না। ইন্দ্রজিৎ ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাতে গিয়ে কিছুতেই ড্যাম্প-লাগা দেশলাই জ্বালতে পারছিল না।

পিছন থেকে কে যেন বলল, ইন্দ্রজিৎবাবু!

ইন্দ্রজিতের কাঁধ ও ঘাড় শক্ত হয়ে গেল, অনেকটা আর্থারাইটিস হলে যেমন হয়।

মিতুন খুব নরম গলায় বলল, ভুল হয়েছিল। ক্ষমা চাইছি।

বলে মিতুন মাথা নিচু করবার আগেই ইন্দ্রজিৎ ঘুরে ভাগ্যক্রমে ওর টানা টানা চোখে ভরে-আসা জল দেখতে পেয়েছিল।

ভাইসব, হয়তো ঠিক বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু এইভাবেই, অর্থাৎ যেভাবে চেয়েছিল ইন্দ্রজিৎ, ঠিক সেইভাবেই ঘটেছিল সব। ঈশ্বর মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে 'তথাস্তু' বলে চলে যান। আর আমাদের সাদামাটা সাধারণ জীবনও মাঝে মাঝে তাই গল্প, উপন্যাস বা ফিল্‌ম হয়ে ওঠে।

কী চমৎকার দৃশ্যটি! মিতুন মাথা নিচু করে সামনে দাঁড়িয়ে। বাঁ-হাত তুলে চোখের পতনশীল অশ্রু মুছে নিল। সবকিছুই ইন্দ্রজিতের ফেবারে। তবু ইন্দ্রজিৎ অমোঘভাবে কিছু ব্যাপার দেখতে পেল, যা দেখা তার উচিত নয়। যেমন, মিতুনের মাথার চুল খুব পাতলা। আরও পরে লক্ষ করেছিল, ওর দাঁতগুলো ফাঁক-ফাঁক, ওর চলনে একটা পাশদোলানি আছে।

এ সব সত্ত্বেও অবশ্য প্রেম হয়েছিল ঠিকই। বোধহয় সেটা চলেছিল মাস তিনেক।

৩

দুপুরে টুকি উল বুনতে এসে বসল আমার ঘরে। উল-বোনাটা উপলক্ষ মাত্র, আসলে ওর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছিল, আমার কাছে এবার কিছু পতিনিন্দা করতে চায়। ভিতরের ঘরে যথারীতি মলয় পড়ে আছে বেহুঁশ হয়ে।

শীতটা আমার একদম সহ্য হয় না। বিস্তর লেপ কম্বল চাপা দিয়েও একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। ওম পাচ্ছি না। হাত-পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে, শরীরের ভিতর সেই থরথরানি। জ্বর আসার মতো। সর্দি হলেই আমার একশো চার পাঁচ ডিগ্রি জ্বর উঠে যায়। দিনে একটা করে পাঁচ শো মিলিগ্রাম সি ভিটামিন ট্যাবলেট খাচ্ছি। তবু মনে হচ্ছে, সর্দিটা লাগবেই।

টুকি একটা গরম চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে নোংরা ঢাকনায় ঢাকা সোফায় বসেছিল। আমি ওকে দেখে উঠে বসেছি।

টুকি বলল, আপনার হট-ওয়াটার ব্যাগ গরম আছে তো?

ক্লিষ্ট একটু হেসে বললাম, না।

না? বলে উঠে এল টুকি, বিছানার লেপ কম্বল সরিয়ে গরম জলের ব্যাগ খুঁজতে যাচ্ছিল।

বাধা দিয়ে আমি বললাম, হট-ওয়াটার ব্যাগ দেয়নি কেউ।

দেয়নি? ও হরি! বলে টুকি ফের সোফায় গিয়ে বসে বলল, আমাদের আয়াটা ওইরকম। দশবার বললেও ভুলে যায়। আপনার কষ্ট হল।

না না, কষ্ট নেই. দুপুরে আর বেশি গরমের দরকার কী?

বাইরে মেঘলা ছিল। একটু আগেও বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। টুকি একটু আনমনা চোখে বাইরে চেয়ে থেকে বলল, এ বছর খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ভয়ঙ্কর শীত পড়বে এবার। বলে একটা আচমকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সবাই নেমে গেছে, ওর কলেজের কোনও কলিগই এখন নেই। কেবল আমরাই পড়ে থাকব। সারাটা শীত এই নিরালায় কীভাবে যে কাটবে!

আমি সমবেদনার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথাও যান না?

টুকি সকৌতুকে একবার আমাকে দেখে বলল, কোথায় যাব? আমাদের কে আছে বলুন তো! ওর তো কেউই নেই। বলে ফের একটু আনমনা থেকে টুকি আমার দিকে চেয়ে হাসল, বলল, আর সেই যে হাঙ্গামা করে বিয়ে করলাম, আপনি তো নিজের চোখে দেখেছেন, সেই থেকে বাপের

বাড়ির সঙ্গেও আমার সম্পর্ক নেই। বাবা মারা গেছেন, মা মৃত্যুশয্যায়, দাদারা-ভাইরা সব বাড়ির দখল নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করছে। আমার খোঁজও নেয় না।

বলতে বলতে টুকি কাঁদল। খুব নয়। একটু। তবে চোখের জল গোপনও করল না।

আমি সবই জানি। মলয়ের বাবা তখনকার পূর্ব-পাকিস্তানে থাকতেন।

মলয়কে তিনি আবার ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণাও করেছিলেন। ফলে কলকাতায় মলয় ছিল একেবারে একা, স্বজনশূন্য। বিয়ের কিছু আগে ওর বাবার মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে কোনও এক জ্ঞাতি পোস্টকার্ড দিয়েছিল, তা সে চিঠি দেড়মাস পর ওর হাতে আসায় ও গুরুদশাও পালন করেনি। শ্রাদ্ধ-শান্তিও নয়। শুধু সেই বিকেলে কিছু কম কথা বলেছিল। আর কোনও শোকের চিহ্ন দেখিনি। কোত্থেকে তার পড়ার বা থাকার খরচ আসত সে রহস্য জানি না। তবে তার কেউ ছিল না, এটা জানি। আজও মলয়ের টুকি বা বাচ্চারা ছাড়া কেউ নেই। বাস্তবিকই কেউ নেই।

টুকি বলল, সিজনের সময়ে এখানে প্রত্যেকের বাড়িতে লোক আসে। ওর কলিগরা বলে, দার্জিলিংয়ে এসে বড় বিপদে পড়েছি। আত্মীয় আর বন্ধুদের আনাগোনায় অস্থির। টুরিস্ট স্পটে আর পোস্টিং নেব না। আমি সে-কথা শুনে দুঃখ পাই, জানেন? আমাদের বাসাতে কেউ আসে না। আত্মীয়স্বজন তো নেই-ই, তা ছাড়া ওর বন্ধু-বান্ধবও খুব বেশি ছিল না। অনেক দিন বাদে আপনি এলেন।

একটু অবাক হয়ে বলি, কেউ আসেনি কখনও?

এসেছিল। টুকি মাথা নিচু করে কাঁটার ঘর গোনার ভান করে বলে, এক বার আমার এক মাসতুতো বোন বিয়ের পর তার বরকে নিয়ে এসেছিল। গতবার সামারে। কিন্তু আপনার বন্ধু এমন করতে লাগল যে, মাত্র দেড়দিন থেকে ওরা হোটেলে ঘর পেয়ে চলে গেল।

কী করেছিল মলয়?

ওদের সঙ্গে কিছু করেনি। আমার সঙ্গে। বলে টুকি বুঝি ফের কাঁদে। সামলে নিয়ে বলে, আমাকে সহ্যই করতে পারে না। যখন ঝগড়া হয় তখন এমন সব কথা বলে যে কোনও আব্রু রাখে না। সকলের সামনেই বলে। আমার বোন আর ভগ্নিপতি লজ্জায় পালিয়ে গেল। এখনও আমার বাপের বাড়ির দিকের আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ আসতে চায়, আমি তাদের চিঠি লিখে বারণ করে দিই। প্রথম প্রথম ভাবতাম, ও বুঝি আমার দিককার আত্মীয়স্বজনদের সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তা নয়। আজকাল ও কাউকেই সহ্য করতে পারে না। গত পুজোর কিছু আগে ওর আগের কলেজের হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট এলেন। সঙ্গে বউ, দুটো বড় বড় মেয়ে। ওঁরা শিলিগুড়ি থেকে মোটরে সকালবেলাতেই চলে এসেছিলেন। আপনার বন্ধু সকালবেলায় খুব একটা নেশা করে না, কেবল খোঁয়াড়ি ভাঙতে একটু-আধটু খায়, আর মেজাজ খারাপ করে বসে থাকে। কিন্তু সেদিন যেই ভদ্রলোক এলেন, অমনি আপনার বন্ধু ইচ্ছে করে এমন মাতলামি শুরু করল যে কী বলব! ভদ্রলোককে চারবার প্রণাম করল, তাঁর স্ত্রীর পায়ের ওপর পড়ে পাঁচ মিনিট ধরে অকারণে ক্ষমা চাইল, আর তাঁদের যুবতী মেয়েদের গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে এমন আদর করতে লাগল যে, পারলে তাঁরা ধুলো-পায়ে বিদায় হয়। একটা বেলা কোনও রকমে কাটিয়ে বিকেলে নানা অসুবিধের কথা বলে তাঁরা অন্য কলিগদের বাড়িতে গিয়ে উঠে বাঁচেন।

আমি হেসে ফেলেছিলাম। টুকি হাসল না। বলল, হাসছেন? আমার গা জ্বালা করে। যত দিন যাচ্ছে ততই খারাপ হয়ে যাচ্ছে ও। কোনও মানুষকে সহ্য করতে পারে না। যতক্ষণ পারে মাতাল হয়ে ঝিম মেরে থাকে। বাদবাকি সময় একা বসে থাকে ভ্যাবলার মতো।

কলেজ করে কী করে?

সে অভ্যাস। তা ছাড়া, ওদের প্রিন্সিপাল ভালমানুষ, ওকে বেশি ক্লাস করতে হয় না। কলেজের পর আর-এক মাতাল কলিগের বাড়িতে গিয়ে ব্রিজ খেলে, সেখান থেকে মাতাল হয়েই ফেরে।

রাতে প্রায়দিনই এসে খায় না, অজ্ঞান হয়ে ঘুমোয়। আমি কেবল শীতকালটার কথা ভাবছি, ও ওইরকম ঝিম হয়ে থাকবে, একটা বাচ্চা আর একটা বুড়ি আয়া সম্বল করে একা আমি কী করে যে থাকব! অবশ্য এ সময়টায় জাম্বুরও শীতের ছুটি হয়ে যায়, কিন্তু এবার ও আসবে না। আমার সেই মাসতুতো বোনের কাছে যাবে, রাঁচিতে। ওদের স্কুলের এক টিচার রাঁচিতে থাকেন, তিনিই নিয়ে যাবেন, কথা হয়ে আছে। আমি আপত্তি করিনি, এখানে থেকে কী হবে! শীতকালটা বড্ড একা লাগবে। জাম্বু থাকলে ভাল হত। কিন্তু ওরই বা এখানে কোন আনন্দের ব্যাপার আছে? তার চেয়ে রাঁচি গেলে ভাল থাকবে। আমাদের মতো মা-বাপের কাছে বেশি না থাকাই ভাল।

আমি কয়েকটা হাঁচি দিলাম। অদ্ভুত ঠান্ডা পড়েছে আজ। হাত-পা নাড়তে পারি না। গাঁটে-গাঁটে ব্যথা। ব্যথাহরা গুচ্ছের ট্যাবলেট ওপর-চাপান দিয়ে মেজদাকে চুপ করিয়ে রেখেছি। কিন্তু এই শীতে তার গোড়া অবদি শিউরে ওঠে মাঝে মাঝে। টুকির দুঃখের কথা লেপ-কম্বলের ভিতর দিয়ে আমার খুব গভীরে যায় না। আসলে আজকাল কারও দুঃখেই তেমন দুঃখিত বোধ করি না। কী যে এক ধরনের দুঃখের প্রতিরোধ তৈরি হয়ে গেছে ভিতরে! খুব বেশি পেনিসিলিন খেলে যেমন আর পেনিসিলিনে কাজ হতে চায় না, এও তেমনি। দুঃখের কথা রোজই কিছু অপরিষ্কার শ্বাস-বায়ুর সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যায়, আবার শ্বাসের সঙ্গেই বেরিয়েও যায়। ভিতরটা নাড়া খায় না তেমন। তবু কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে যাই, মলয়ের এ-রকমই কিছু হবে বলে বরাবর মনে হত। কী বলব, কোনও উপমাই ঠিক মনে আসছে না। যেমন, ডাকঘরে মাঝে মাঝে এমন সব খাম দেয় যাতে ঠিকমতো আঠা লাগানো থাকে না, জলে ভিজিয়ে লাগিয়ে দিলে জুড়ে যায়, শুকোলেই চড়চড় করে খুলে হাঁ করে থাকে, ভিতরে কিছুই ধরে রাখতে পারে না। মলয়েরও আঠা কিছু কম। বরাবরই কম ছিল। উপমাটা জুতসই হল না বুঝি, কিংবা বরং ওর সঙ্গে ট্রানজিস্টার রেডিয়োর একটা তুলনা করা যেতে পারে। ট্রানজিস্টার রেডিয়োর যেমন এরিয়াল লাগে না, প্লাগ দেওয়ার দরকার হয় না, আপনিই বাজে, নিজের ভিতরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ মলয় কি তেমন? সংসারে ওর কারও সঙ্গেই যোগাযোগ বা সম্পর্ক না রাখলেও চলে! কারও কাছ থেকেই ওর কিছু নেওয়ার নেই!

আমি আমার শরীরের শীত, দাঁত-ব্যথা, মাথা-ধরা ইত্যাদি কষ্টগুলো সহ্য করতে করতে খুব আলগা ভাবে বললাম, আপনিও চলে যান না রাঁচিতে, বেড়িয়ে আসুন।

টুকি বোনা রেখে আমার দিকে চেয়ে ছিল। বলল, ঘরে তা হলে কিছু থাকবে না। সব চুরি হয়ে যাবে। বলে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে নিজের করতল দেখল সে। পরে বলল, একেবারে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সে চেষ্টাও ক'বার করেছি। কিন্তু ও তখন হাতে-পায়ে ধরে আটকায়। বলে, তুমি চলে গেলে আমার ভীষণ ভূতের ভয় করে, খিদে পায়। আরও বলে, তুমি চলে গেলে আমি একদম মদ্যপ আর চরিত্রহীন হয়ে যাব। যেন ও এখন মদ্যপ নয়।

চরিত্রহীনতার কথাটা আমি আর তুললাম না। হাসতে গিয়ে হঠাৎ চড়াক করে ঠোঁট ফেটে গেল। জিভে রক্তের নোনতা স্বাদ পেলাম।

ও-ঘরে মলয় জেগেছে। কোনও শব্দ হয়নি। ব্যাটা গোয়েন্দার মতো জাগে! আমরা টের পেলাম যখন ও একটা ব্যথা-বেদনার কাতর শব্দ করে ডাকল, টুকি!

টুকি উত্তর দিল না।

মলয় ও-ঘরে আপন-মনে বলল, বেরিয়ে গেছে।

সিগারেট ধবানোর শব্দ পেলাম। টুকি উঠে ও-ঘরে গেল।

কোথায় ছিলে? মলয়ের গলা।

ও-ঘরে।

আমার খিদে পায় না নাকি? বলে হঠাৎ চেঁচাল মলয়। প্রচণ্ড চেঁচানি।

আস্তে। ঘরে লোক আছে।

কে লোক?

তোমার বন্ধু।

মলয় তেমনি চেঁচিয়ে বলে, তুমি উত্তর দিলে না কেন?

ইচ্ছে করেই দিইনি।

বাইরে দুপুরের রোদ চিকচিক করছে এখন। আমার পোশাক পরাই আছে। ও-ঘরে ধুন্ধুমার ঝগড়াটা লেগে উঠছে শুনে, আমি নিঃশব্দ উঠে জুতো পরে বেবিয়ে আসি।

অনেকটা দূর পর্যন্ত আমি মলয়ের গলার স্বরটা শুনতে পাচ্ছিলাম। ও ভীষণ চেঁচাচ্ছে। রাস্তার বাঁক পেরোতেই স্বরটা আর শোনা গেল না। অন্যমনে আমি গালে হাত বুলোলাম। হাতে উলের দস্তানা পরা, তবু টের পেলাম গালে তিন দিনের দাড়ি খড়খড় করছে। এত খড়খড়ে যে দস্তানা থেকে খানিকটা উলের আঁশ বোধ করি থুতনিতে লেগে রইল। থাকলে থাকুক গে। দাড়ি কামানোয় বড্ড আলসেমি আমার। তা ছাড়া এই শীতে কিছু করতে ইচ্ছেও করে না। ঠান্ডায় কান কটকট করছে, নাক দিয়ে অবিরল জল পড়ছে, চোখের কোল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। এ অবস্থায় দাড়ি কামানোর কথা ভাবা যায় না। কেই-বা দেখছে আমাকে! আমার মুখটা কিছু লম্বা ছাঁটের, গালে মাংস কম। সেইজন্য একদিন দাড়ি না-কামালেই আমাকে বড্ড রোগা দেখায়। তবু আমি এক দিন পর পরই দাড়ি কামাই। প্রথম যখন সেফটি রেজারে দাড়ি কামাতে শুরু করি, তখন থেকেই উলটো টান দিয়ে দিয়ে আমার দাড়ি নারকোলের দড়ির মতো কড়া হয়ে গেছে। থুতনির বা গলার কাছের দাড়িতে অনেকবার রেজার চালাতে হয়, ফলে রোজই দাড়ির গোড়া ফেটে পুঁতির মতো রক্তবিন্দু বেরিয়ে আসে। ফুসকুড়ির মতো ওঠে। একটা দিন বিশ্রাম পেলে ফুসকুড়িগুলো মিইয়ে যায়। তখন কামাতে সুবিধে। তা ছাড়া বন্ধুগণ, সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে দাড়ি একটু বড় হলেই কামাতে ভাল, সদ্য-ওঠা দাড়ির চেয়ে। আমার এক সম্পর্কের ভাই বিলেতে মাস্টারি করে। বেশ আছে। বাড়ি করেছে, গাড়ি কিনেছে, মহা আরামে দিন কাটায়। গত বছরও এসেছিল, গোপনে একটা কথাই বলেছিল আমাকে, খুব আরামে আছি ভাবছ? যদি শীতকালে অন্ধকার থাকতে উঠে বাতি জ্বেলে রোজ দাড়ি কামাতে হত তো বুঝতে। সে যে কী কষ্ট! বন্ধুগণ, এ কষ্টটা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝি। কিন্তু বোঝে না আমার বন্ধু বিজয় সেন। সে রোজ দু'বেলা দাড়ি কামায়। সারাদিন সে একটা কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টার, বিকেলে আবার তার পার্টি থাকে। তারও দাড়ির গোড়া আমার মতোই। সে এক বার আমেরিকা ট্যুর-এ গিয়ে চার-পাঁচ রকমের কেবল অটোমেটিক শেভার এনেছিল, সেইগুলো দিয়ে কামায়। আমি তার যন্ত্রপাতি দেখে এক দিন অবাক হয়ে বলেছিলাম— তুই কি কেবল দাড়িই কামাস? সে গম্ভীরভাবে বলেছিল, না। টাকাও। বস্তুত বন্ধুগণ, আমারও মনে হয় দাড়ি কামানোর সঙ্গে সফলতার একটা ক্ষীণ যোগাযোগ আছে। যদিও ভাইসব, আমি জানি না দাড়ি কামানো থেকেই সফলতা আসে, না সফলতা থেকেই দাড়ি কামানো, তবু বলতেই হয়, দুনিয়ার সফল লোকেরা রাত পোহাতেই দাড়ি কামায়।

এইসব অন্যমনে ভাবতে ভাবতে গভীর অন্যমনস্কতায় লাডেন লা রোড ধরে ম্যাল-এ উঠে এসেছিলাম। এক খণ্ড মেঘ গড়াতে গড়াতে বাঁ ধারে উপত্যকায় নেমে যাচ্ছে। এখন রোদের খেলা চার দিকে। উত্তরের পাহাড় দেখা গেল, আবার ঢেকে যাচ্ছে মেঘে। কাঞ্চনজঙ্ঘার গলায় মালার মতো একটা মেঘ পাক খেয়ে আছে, চুড়োটা শূন্যে এক ক্রেন থেকে কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে মনে হয়, মাঝখানটা মেঘে খেয়ে ফেলেছে।

রোদে আজ কিছু মানুষ জুটেছে এখানে। বাচ্চারা ছুটছে, একটা বাচ্চা চাকা লাগানো জুতো পরে গড়িয়ে আসছিল হড়হড় করে, তার পিছনে তার মা ছুটে আসছে 'পড়ে যাবে, পড়ে যাবে বাবু' বলতে বলতে। এ বেলা তার গায়ে কোটও নেই, শুধু গলায় একটা শালের মাফলার জড়ানো। পরনে একটা মেজেন্টা রঙের সিন্থেটিক শাড়ি। ওই রঙেরই একটা ফুলহাতা গরম ব্লাউজ আছে গায়ে। নিতুন।

বাচ্চাটা আমাকে পার হয়ে গড়িয়ে গিয়ে আর একটু হলেই লাডেন লা রোডের ঢালুতে পড়ত। চাকা লাগানো জুতোয় সে কত দূর, কী রকম গতিতে নেমে যেত বলা মুশকিল। আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কিন্তু বাচ্চাটা যে করেই হোক থেমে গেল। মিতুন গিয়ে ধরল তাকে। 'বড্ড দুষ্টু হয়েছ বাবু, একদম কথা শোনো না।' বলতে বলতে তাকে ফের চাকায় গড়িয়ে নিয়ে আসছিল মিতুন। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছিলাম।

দেখা হয়ে গেল।

মিতুন বলল, তুমি?

আমার মাঙ্কি ক্যাপটা মাথার ওপর গোটানো রয়েছে। সময় মতো সেটা টেনে নামানো হয়নি। এখন আর কী করা যাবে? বললাম, সকালেই তোমাকে এখানে দেখেছি।

দেখেছ? মিতুন অবাক, তবু কথা বলোনি?

খুব শীত করছিল। আমি বললাম।

মিতুন খুব অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। ছেলেটা সেই ফাঁকে ফের চাকার জুতোয় গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে মিতুন আবার ছুটল 'বাবু! বাবু!' বলতে বলতে। আমি দস্তানা খুলে গালে হাত বোলালাম। বেশ দাড়ি। কেমন দেখাচ্ছে আমাকে? শীতের কথাটা হঠাৎ বললাম কেন? পাগল ভাববে না তো?

মিতুন হাঁটু গেড়ে বসে তার বাচ্চার জুতো থেকে চাকা খুলে বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে ফের আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অকপট বিস্ময়ভরা চোখ চেয়ে বলল, তুমি? ভাবতে পারছি না।

এ-রকম মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায় মিতুন। বলে আমি নাকের গড়ানো জল মুছে নিলাম রুমালে।

ও বলল, কই আর দেখা হয়! সেই ইউনিভার্সিটির পর এই প্রথম দেখা হল। কবে এসেছ এখানে?

কাল।

মোটে? বলে ফের অবাক হয়ে মিতুন বলে, আমরা সেই কবে এসেছি। ট্রেনের রিজার্ভেশন পাওয়া যায়নি বলে আটকে আছি, নইলে আরও পনেরো দিন আগেই আমাদের নেমে যাওয়ার কথা।

এখনও পাওনি?

পেয়েছি। কাল চলে যাচ্ছি। যা বৃষ্টি, কেবল ভয় হচ্ছে আবার না ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তুমি ক'দিন থাকবে?

বেশি না। কাল-পরশুই নেমে যাব।

মিতুন খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, তা হলে কালই চলো না। আমাদের তিনটে রিজার্ভেশন আছে, তার মধ্যে ঠেসে-ঠুসে তুমিও যেতে পারবে। যাবে?

আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলি, আমি এক্ষুনি কলকাতায় ফিরব না মিতুন। আরও কয়েক জায়গা হয়ে তারপর যাব।

অ্যাভয়েড করলে না তো?

না না।

মিতুন খুব হাসল। বলল, দাড়ি কামাওনি কেন?

খুব শীত করছিল। আমি আবার বলি। এ বাক্যটা দ্বিতীয়বার বলা হল।

মিতুনের দুই গালে আর নাকের ডগায় লাল আভা, ঠান্ডার দেশে কিছুদিন থাকলেই এটা হয়। তিন-চারটে বিউটি স্পট দেখা দেয় মুখে। আমারও যদি ও-রকম লালিমা হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চিত দাড়ির জন্য দেখা যাচ্ছে না। মিতুন খুব মায়া-দয়া নিয়ে হাসি-মুখে চেয়ে থেকে বলল, তোমার বরাবরই খুব শীত করত।

এখনও করে। আমি বললাম। মনে আছে, মিতুনের সঙ্গে প্রেমটা শীতকাল পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কলেজ স্ট্রিটের ওয়াই-এম-সি-এ তখন প্রেমের জন্য চিহ্নিত জায়গা ছিল। পরদা-ফেলা কেবিনগুলি ছিল প্রেমের প্রথম ভয়-ভীতি কাটানোর চেষ্টার। বয়-বেয়ারারা কেবিনে ঢুকত পেছনে ফিবে। খুব সুন্দর ব্যবস্থা। আজও সেই ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। যা বলছিলাম, ঋতু বদলের সময়ে আমার বছরের দু'-তিনবার ঠান্ডা লেগে যায়, সর্দি হয়, জ্বর উঠে যায় একশো তিন-চার বা পাঁচ। সেবার মিতুনের সঙ্গে আমার প্রেমের বছরেও লেগেছিল। মিতুনের সঙ্গে সেই কাঁচা সর্দি-লাগা মুখ নিয়ে বসে দেদার কথা বলেছিলাম। বড় সংক্রামক রোগ। ঠিক এক ঘণ্টা পরেই মিতুন হাঁচতে থাকে, এবং চোখে জল আসে। জ্বরের জন্য মাঝখানে তিন দিন প্রেমের বিরতি দিতে হয়েছিল। চতুর্থ দিন দু'জনে ফের গিয়ে সেই কেবিনে বসলাম। দু'জনেরই গলায় মাফলার, স্বর ভারী, চুল রুক্ষ। এবং ঘণ্টাখানেক আমরা খকখক কাশি আর মাঝে মাঝে হাঁচি দিয়েই আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন করেছিলাম, কথা খুব সামান্যই হয়েছিল।

মিতুন বলল, চলো, আমার বর আর ননদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

বর নয়, ননদ কথাটাই আমার ভিতরে বঁড়শির মতো গেঁথে গিয়ে সুতোয় টান লাগিয়ে দিল। আমি মিতুনের সঙ্গে যেতে যেতে বললাম, ওঃ, কত দিন হয়ে গেল!

মিতুন প্রতিধ্বনি করে বলল, কতদিন।

সেই শীতকালটা তখনও ভাল করে কাটেনি, তার আগেই মিতুনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণা ও বিশ্বাস, যখন মিতুনের বিয়ে হয় তখনও আমার কাছ থেকে সংক্রামিত সেই সর্দির কিছুটা ওর বুকে অবশিষ্ট ছিল। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! একজনের কাছ থেকে পাওয়া সর্দি নিয়ে অন্যজনের সঙ্গে মালা বদল! আবার সেই সর্দি যদি ওব কাছ থেকে ওর বরের ভিতরেও সংক্রামিত হয়ে থাকে তবে কী মারাত্মক ব্যাপার হয়েছিল, এক বার ভেবে দেখুন মশাইরা। প্রেমের চেয়ে সর্দি কত বেশি প্রত্যক্ষ ও সত্য!

মিতুনের বর আর ননদ একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসে আছে। বরটি বোধহয় ঘুমোচ্ছিল। কোলের ওপর মাথা ঝুঁকে আছে। তাকে উপেক্ষা করে ননদটিকেই আমি দেখি, এবং খুব আশান্বিত হয়ে উঠি। গায়ের রং শ্যামলাই বলা যায়। কিন্তু ভারী মিঠে রং। চোখ-মুখ খুবই অনুভূতিশীল, জাগ্রত। একটু রোগা কি? কোট-টোট পরা বলে বোঝা যায় না। তবে খুবই কম বয়সি। কুড়ি-বাইশের বেশি নয়।

আমি ফের দাড়িতে হাত বোলালাম। খড়খড় করছে। না কামালে আমাকে রোগা দেখায়। বোকার মতো আমি আজ দাড়ি কামাইনি।

মিতুনের ননদ সনাতনী অবশ্য দাড়ি-ফাড়ি গ্রাহ্য করল না। ওর বয়সি মেয়েদের কাছে পুরুষ মাত্রই আয়না বিশেষ। কিছু মেয়ে আছে, এই বয়সে কোনও পুরুষকেই উপেক্ষা করে না। বরং প্রত্যেক পুরুষকেই খুব বেশি পাত্তা দেয়, এবং তাদের হাবভাব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে লাইফ-সাইজ আয়নার মতো নিজেকে দেখে যাচাই করে নেয়।

সনাতনী খুব আগ্রহের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলল, ওঃ, এই বুঝি তোমার সেই ইন্দ্রজিৎ, বউদি? এঁর কথাই বলতে?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বলি, কী বলেছে মিতুন?

সনাতনী একমুখ হাসি নিয়ে বলল, সব বলেছে। আপনার সঙ্গে বউদির প্রেম ছিল।

সনাতনীর চমৎকার দাঁত দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, তবু চমকানোটা ঠেকানো গেল না। বললাম, যাঃ।

মেয়েটি ভীষণ কৌতূহলী হয়ে আমাকে দেখছিল, দুই চোখে দিপ দিপ করে আলো জ্বলে উঠল। সেই আলো আমার মুখে ফেলে সে খুঁজছে, কী দেখে তার বউদি এই লোকটার সঙ্গে প্রেম করত। দেখছে, আমি দাড়ি কামাইনি। থুতনিতে দু'-চারটে দাড়ি পেকেছে, মোটা গোঁফেও দুটো সাদা চুল

সবসময়ে খাড়া হয়ে থাকে। সে দুটোকে আমি দাড়ি কামানোর সময়ে প্রায়ই কাঁচির ডগা সাবধানে ঢুকিয়ে গোড়া থেকে কেটে দিই, এখন দিইনি, পাকা দুটো গোঁফের চুল নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে। তার ওপর আমাকে রোগাও দেখাচ্ছে নাকি? মেয়েটার চোখের সামনে আমি প্রচণ্ড হীনম্মন্যতায় মিইয়ে যাচ্ছিলাম।

কাঞ্চনজঙ্ঘা তার গলা থেকে মেঘের মালাটা খুলে কখন পাশের আর-একটা পাহাড়কে পরিয়ে দিয়েছে। এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধারালো, কুটিল শরীর। ব্যায়ামবীরের মতো শরীরের সব পেশি ফুলিয়ে সে আমাদের দেখাচ্ছে! কিন্তু দেখবে কে! মিতুনের স্বামীকে যেমন, তেমনি কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও আমি এক পলক দেখে উপেক্ষা করলাম। সনাতনীও গ্রাহ্য করল না কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। সে এখন তার বউদির ভূতপূর্ব প্রেমিককে দেখছে, খুব অবাক। বলল, বউদি, কী দারুণ রোমান্টিক ব্যাপার, না?

মিতুন বলল, কী?

এই দেখা হওয়াটা ওঁর সঙ্গে তোমার!

হ্যাঁ, দারুণ। এই বলেই মিতুনের চোখে পড়ল, তার ছেলে ম্যালের রেলিং টপকানোর চেষ্টা করছে। অমনি 'বাবু! বাবু!' বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল।

সনাতনীর সামনে একা দাঁড়িয়ে আমার একটু লজ্জা করছিল। আমার টাকরা জ্বালা করলে, আর গলা খুশখুশ করলেই বুঝতে পারি যে আমার সর্দি লাগবে। তেমনি এই একটু শীতভাবের মতো লজ্জা বোধ করলেই আমি টের পাই যে, আমি ফের প্রেমে পড়েছি। সনাতনীর মুখের দিকে আমি তাকাতেই পারছিলাম না। খানিকটা লজ্জায়, খানিকটা ভয়ে। লজ্জাটা প্রেমের। আর ভয় হচ্ছে, কোনও মানুষেরই মুখশ্রী বা দেহলাবণ্য তো নিখুঁত নয়। সনাতনীর মুখ বা চেহারায় কোনও খুঁত নজরে পড়লেই আমার প্রেম-ভাবটা চট করে না কেটে যায়।

বসুন না। সনাতনী বলল।

বসলাম। ও মাঝখানে ওপাশে মিতুনের স্বামী এখনও ঢুলছে—খুব চমৎকার ব্যালান্সে শরীরটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ভেঙে মুখটা নুয়ে পড়েছে। কোলের ওপর একটা দামি ইয়াসিকা ক্যামেরা বিপজ্জনক ভাবে পড়ি-পড়ি হয়ে আছে। অবশ্য সেটা একটা সরু স্ট্র্যাপে গলার সঙ্গে ঝোলানো। আমি অন্য পাশে বসলাম। বেঞ্চটা স্যাঁতস্যাঁত করছে। জলা পাহাড়ের দিক থেকে ভূতের মতো এক খামচা কুয়াশা নেমে আসছে। দুটো রুগ্‌ণ টাট্টু ঘোড়ায় চেপে এক জোড়া অল্পবয়সি মাড়োয়ারি স্বামী-স্ত্রী সেই কুয়াশায় ঢুকে আবছায়ায় রহস্যময় হয়ে গেল।

বড়দা, ইনি হচ্ছেন সেই ইন্দ্রজিৎবাবু। সনাতনী দাদাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে বলল।

তার দাদা সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে সম্পূর্ণ জাগ্রত চোখে চেয়ে হাতজোড় করে বলল, ও।

কিন্তু নামটা চিনতে পারল বলে মনে হল না।

সনাতনী বলল, বুঝতে পারছ না?

লোকটা বলল, ঠিক প্লেস করতে পারছি না।

সনাতনী একটু চাপা গলায় বলে, বউদির সেই ইন্দ্রজিৎ। ইউনিভার্সিটির। মনে পড়ছে?

ওঃ! বলে লোকটা নড়েচড়ে বসে ভারী খুশির হাসি হাসে। ফের হাত জোড় করে বলে, আমি সুব্রত রায়।

আমিও ফের হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। মিতুনের ওপর একটু রাগ হচ্ছিল। আমাদের প্রেমের ব্যাপাবটা ও এত প্রচার করে দিয়েছে!

সনাতনীর কোলের ওপর দিয়ে সুব্রত এক প্যাকেট ফিল্টার টিপড কিং সাইজ দামি সিগারেট বাড়িয়ে দিল। হাতটা সনাতনীর কোল পর্যন্তই পৌঁছেছিল, আমি সিগারেটের জন্য হাত বাড়িয়ে সনাতনীর কোলের উপরকার বিপজ্জনক বিকিরণটি নীরবে অনুভব করলাম। হাতটা শিরশির করছিল।

সুব্রতর বয়স আমার মতোই হবে বোধহয়। কিংবা বছর দুয়েকের বড় হতে পারে। বেশ পয়সাকড়ি আছে, বোঝা যায়। পরনে একটা সাদা-কালো চেক-এর গরম সুট, গলায় কাশ্মীরি স্কার্ফ, হাতের ঘড়িটা দেখা যাচ্ছিল—খুব দামি বিশাল ঘড়ি। সুব্রত সিগারেট জ্বালিয়ে ঠ্যাং সামনে ছড়িয়ে চিত হয়ে আকাশমুখো ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কাওয়ার্ড।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, কে?

আপনি। বলে সুব্রত হাসল হা-হা করে। ম্যাল-এর লোকেরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। কিন্তু ওই হাসিতেই প্রমাণ হয় যে, সুব্রতর বন্ধু হতে এক মিনিটও লাগে না কারও।

সে একটু বেঁটে লোক, বসা অবস্থাতেও বোঝা যায়। স্বাস্থ্যটা মোটার দিকেই। চোখে-মুখে বড়-ঘরের আহ্লাদি ছাপ আছে। তবে বোকা নয়, বেশ চালাক-চতুর মুখ-চোখ।

সনাতনী সম্মোহিতের মতো আমার দিকে অপলক চোখে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, কী মিষ্টি!

আমি ভয়ে ভয়ে বলি, কী?

আপনাদের সেই অ্যাফেয়ারটা।

আমি অবাক হয়ে বলি, কোন অ্যাফেয়ারটা?

আপনার আর বউদির। কী মিষ্টি আর রোমান্টিক! প্রথমটায় শুনে তো আমি বিশ্বাসই করিনি। ঠিক সিনেমা বা উপন্যাসের মতো। শুনে আমি বউদির হাত ধরে ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলাম, বউদি, সত্যি এ-রকম হয়েছিল? বানিয়ে বলছ না তো! সত্যি বলছ? আমাকে ছুঁয়ে বলো।

আমি একবারেই বিশ্বাস করেছিলাম। সুব্রত হাই তুলে বলে।

মোটেই না বড়দা। সনাতনী তার দাদার দিকে ফিরে ঝগড়ার গলায় বলে, মোটেই তুমি বিশ্বাস করোনি। তুমি শুনে বলেছিলে, মেয়েরা স্বামীর কাছে নিজের দাম বাড়ানোর জন্য ওরকম কত ফলস প্রেমের গল্প বলে। তাই শুনে বউদির সে কী রাগ!

আবার হাই তুলল সুব্রত, বলল, ওঃ, মুখে যাই বলি, ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস করেছিলাম। অ্যান্ড আই ওয়াজ জেলাস। কেবল মনে হত, আমি স্বামী হলে কী হয়, মিতুনের নায়ক অন্য একজন।

আহা! সনাতনী তার দাদাকে বকবার মতো করে বলে, যে পায় সেই আসল নায়ক। না ইন্দ্রজিৎবাবু?

রোদটা ঢেকে গিয়েছিল। ফের রোদ উঠেছে। আমি সনাতনীর কথায় মাথা নাড়লাম। বটেই তো, যে পায় সেই নায়ক।

সুব্রত ঘন ঘন হাই তুলছে। বলল, শরীরটা ঠান্ডা মেরে গেল যে রে সুন্তি!

সনাতনী মুখ ফিরিয়ে বলল, তা হলে আর কী! যাও আবার গিলে এসো।

যাব? বলেই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সুব্রত! খুব আন্তরিকভাবে আমাকে বলল, চলুন, দু' পেগ করে চাপিয়ে আসি। নইলে নিউমোনিয়া ধরে যাবে। লাঞ্চে একটু খেয়েছিলাম, সেটা কেটে গেছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমি খাব না।

খান না। সুব্রত অবাক হয়ে বলে, টিটুটালার নাকি?

না না। আমি বিব্রত হয়ে বলি, আসলে খেতে ভয় পাই। মাতাল হলে অনেক গুপ্তকথা নাকি লোকে বলে ফেলে।

সুব্রত সেই হা-হা হাসি হাসল। সনাতনী তাকে ধমক দিয়ে বলে, তুমি খাবে তো যাও না। আমরা বসে গল্প করি। যাও।

তোর বউদি টের পেলে ম্যানেজ করিস। বলে সুব্রত চলে গেল।

মিতুনকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ওর ছেলেটা খুবই দুরন্ত বোঝা যাচ্ছে। ছেলের পিছু পিছু হয় স্টেপ অ্যাসাইডের দিকে, নয়তো অবজারভেটরির দিকে, কিংবা অন্য কোনও দিকে চলে গেছে

নিশ্চয়ই। তাতে কোনও অসুবিধে নেই। আমি আর সনাতনী পাশাপাশি বসে আছি। কাঞ্চনজঙ্ঘার গা থেকে ঠিকরে এসে একটা আলো আমাদের রাঙা করে রেখেছে।

এত মিষ্টি আর রোমান্টিক যে বিশ্বাস হয় না। সনাতনী আমার দিকে তেমনি সম্মোহিতভাবে তাকিয়ে বলল, আপনি এখনও বিয়ে করেননি, না?

খুব আশান্বিত হয়ে আমি বলি, না।

কী অদ্ভুত! ভাবা যায় না। সনাতনী বলে, আমি এখন সেই একই ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, কিন্তু ও-রকম ঘটনা ভাবাই যায় না। প্রথম দিন থেকেই ছেলেদের সঙ্গে তুই-তোকারি, আড্ডা, সিগারেট কেড়ে খাওয়া। কিছু রোমান্স নেই। সবাই ভীষণ সেয়ানা, সেলফ কনশাস।

খুব সমবেদনার সঙ্গে বলি, হ্যাঁ, এখন আর সেই লাজুক, ভীরু, মুখচোরা ছেলেও তো দেখা যায় না।

মুখটা একটু বিরস হয়ে গেল সনাতনীর। বলল, না, না, লাজুক মুখচোরা ছেলে আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না। ছেলেরা হবে স্মার্ট, সাহসী, ফ্র্যাঙ্ক। মুখচোরা লাজুক আর অন্যমনস্ক পুরুষ একদম ভাল লাগে না।

আমার খুব শীত করে ওঠে। বার বার থুতনির দাড়িতে হাত বোলাচ্ছি। সনাতনী লক্ষ করছে দেখে হাত নামিয়ে নিই। ফের অজান্তে হাত চলে যায় থুতনিতে। দাড়ি।

বউদি আপনার কথা খুব বলে। সনাতনী ফের সম্মোহিতের মতো তাকায়, বলে, বউদির ধারণা আপনি ওকে ভীষণ অপমান করেছিলেন। বউদির যখন দাদার সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে, তখন নাকি বউদি আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। যেদিন রেজিস্ট্রি হওয়ার কথা সেদিন নাকি আপনি আসেননি!

দুঃখিত চিত্তে আমি মাথা নাড়লাম। ঠিকই। লুকিয়ে লাভ কী! মিতুন সব বলে দিয়েছে।

কেন? সনাতনী জিজ্ঞেস করল।

সব কি বলা যায়! ওই যে মিতুনের দাঁতগুলো সামান্য ফাঁক ফাঁক ছিল, গায়ে একটু স্থূলতা ছিল, ওর হাঁটা-চলায় একটা পাশদোলানি লক্ষ করা যেত, বয়সও ছিল আমার সমান কিংবা একটু বড় বা ছোট—এ-সব নিয়ে আমি কয়েক দিন প্রচণ্ড ভেবেছিলাম। মিতুনের চুলও তেমন ঘন ছিল না। আরও কিছু খুঁত ছিল—তা সে-কথা থাক। কিন্তু এ-সব ব্যাপার আমি খুব হিসেবি বুদ্ধি নিয়ে পাটোয়ারের মতো বসে বসে বিচার করে দেখেছিলাম। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল বয়সটা। আমি যখন মধ্য-যৌবনে পৌঁছব, ততদিনে মিতুন বেশ বুড়োটে মেরে যাবে, যেমন এখন গেছে।

সনাতনীকে বললাম, আসলে হুইমসিক্যালি কিছু করা আমার ইচ্ছে ছিল না। তখনও চাকরি করি না, বাবার পয়সায় হোস্টেলে থাকি, সদ্যমাত্র এম এ পরীক্ষায় ড্রপ দিয়েছি। এ-সব ভেবে আর—

সনাতনী ভারী সুন্দর একটা সুগন্ধী নিশ্বাস ফেলে বলল, ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু এসব কমার্শিয়াল কারণ ছাড়া কি অন্য কোনও কারণ ছিল না? বউদিকে নাকি আপনি পরে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, ওকে হারানোর ভয়েই আপনি ওকে বিয়ে করেননি। বিয়ে করলেই নাকি প্রেম নষ্ট হয়ে যায়! বউদি এ-রকম একটা গল্পও কোথায় পড়েছিল, বিয়ের রাতে নায়ক পালিয়ে যাচ্ছে, পাছে সে নায়িকাকে পেয়ে রহস্য নষ্ট করে ফেলে!

আমি গভীর শ্বাস ফেলে বলি, সত্যি।

সনাতনী একনাগাড়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। চোখে অপার্থিব সম্মোহিত দৃষ্টি। বলল, কী মিষ্টি! কী রোমান্টিক! বউদির সঙ্গে আর আপনার এর পর দেখা হয়নি, না?

দুঃখিত চিত্তে আমি বলি, না।

ইস! ও আরও দুঃখের সঙ্গে বলল, এখানেও দেখা না হলে ভাল হত। বউদি তো এখন বেশ মোটা হয়ে গেছে, ছেলের মা, গিন্নিবান্নি। এ চেহারাটা না দেখলেই ভাল ছিল আপনার।

ওই মিতুনের ছেলে দৌড়ে আসছে। পিছনে মিতুন। হাঁফাচ্ছে। ছেলেটা সোজা আসতে আসতে

হঠাৎ বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ফের অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। মিতুন পারল না ধরতে। খসে-যাওয়া আঁচলটা কাঁধে তুলে খুব ক্লান্ত পায়ে চলে এল আমাদের কাছে।

উঃ! বলে মিতুন বসে কিছুক্ষণ দম নিল। কথা বলতে পারছে না। আমরা খুব সমবেদনার সঙ্গে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাস্তবিক মিতুন বেশ মোটা হয়ে গেছে। ও কেন গায়ে গরম জামা বেশি রাখে না তাও বুঝলাম। ছেলের পিছনে প্রায় সময়েই ছোটাছুটি করে করে ওর বোধহয় ঘাম ছুটে যায়। মিতুন বেঞ্চে রাখা হাতব্যাগ থেকে একটা ত্রিপুরার বাঁশের তৈরি ফোল্ডিং পাখা বের করে হাওয়া খেতে খেতে বলল, হাঁপিয়ে গেছি, সুস্তি, তুমি যাও না, একটু বাবুকে দেখে রাখো। আমি আর পারছি না।

সনাতনী সেইরকম সম্মোহিত ভাবেই আমার দিকে চেয়ে চমৎকার একটু হেসে বলল, যাচ্ছি। বলেও চোখ সরাল না! তেমনি বিভোরভাবে বলল, বউদি বড্ড বোকা, তাই হুট করে দাদাকে বিয়ে করে একদম ঠান্ডা হয়ে গেল। আমি হলে কিন্তু ইন্দ্রজিৎকে ছেড়ে দিতাম না। পিছু নিতাম। যত দিন না ইন্দ্রজিৎকে পাচ্ছি, তত দিন তার পিছনে ধাওয়া করতাম। সারা জীবন। দরকার হলে লন্ডন, টোকিও, নিউইয়র্ক—যেখানে যেত ইন্দ্রজিৎ, ঠিক সেখানে ফলো করে চলে যেতাম। কী থ্রিলিং ব্যাপার হত বলুন তো! বলে ফের হেসে সে চোখ টিপে বলল, আপনারা একটু একা থাকুন। বলে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে দম ফিরে পেয়ে মিতুন আমার দিকে তাকাল। আমার আবার শীত করছিল।

মিতুন খুব স্বাভাবিক কৌতূহলে বলল, আমার বরটা কোথায় গেল বলো তো?

এই একটু! কাছেই। বলে গলা খাঁকারি দিলাম।

ও বুঝতে পেরে হাসল। বলল, ড্রিঙ্ক করতে?

তাই বলছিল।

আমারও একটু ইচ্ছে করছে এখন। যা টায়ার্ড লাগছে, একটু হলে বেশ হত।

তুমি খাও? আমি ব্যথিত বিস্ময়ে বলি।

ও সান্ত্বনা দিয়ে বলে, এখানে এসে একটু-আধটু খাচ্ছি। এই তো আজ লাঞ্চেই খেয়েছি। এখনও বোধহয় গন্ধ আছে। বিশ্বাস করছ না তো! বলে মুখটা এগিয়ে এনে বলল, দেখো, শুঁকে দেখো। বলে হাঁ করল।

আমি চোখ বুজে ফেললাম। মেয়েদের মুখের অভ্যন্তর দেখতে আমার কোনওদিনই ভাল লাগে না।

গন্ধ পেলে? ও বলল।

হুঁ।

কীসের গন্ধ বলো তো?

এলাচির।

ও হাসল, ও হরি! সে তো দুপুরের যাওয়ার পর দুটো বড় এলাচি আর একটা ছোট এলাচি খেয়েছিলাম। কিন্তু ব্রান্ডিও খেয়েছি, মাইরি! আমার কর্তাটিকে কেমন দেখলে?

ভাল, বেশ ভাল।

খুব। ও বলল, দু'রকম পুরুষ আছে, জানো? লেডি কিলার আর লেডি হিলার। আমার কর্তাটি দ্বিতীয় টাইপের। মেয়েদের ব্যথা-বেদনা-দুঃখ ও ভীষণ বোঝে। আর সব সময়ে প্যাসিফাই করার চেষ্টা করে। যখন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে আসছি তখন খুব কেঁদেছিলাম। অমন কান্না মেয়েরা আজকাল আর শ্বশুরবাড়ি যেতে কাঁদে না।

বলে একটু অন্যমনস্কভাবে চুপ করল মিতুন। তারপর যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলল, আমার অবশ্য কান্নার কারণও ছিল। তার কিছুদিন আগেই একজন আমার সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা

করেছে। আমি ঘুমের ট্যাবলেট কিনতে গিয়েও পাইনি। প্রেসক্রিপশন ছাড়া দোকানদাররা দিতে রাজি হয়নি।

আমি খুব লজ্জার সঙ্গে মাথা নিচু করি।

ও বলে, সে যাকগে। আমি শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময়ে যখন কাঁদছিলাম, তখন হঠাৎ দেখি আমার বরও চোখের জল মুছছে। সেই দেখে এমন মায়া হল, বুঝলে। সব সময়ে আমার দুঃখে সুব্রত দুঃখ পায়। তাই আমি ওকে লেডি হিলার বলি। এমন কী ছেলে হওয়ার সময়ে আমার যখন পেইন উঠল, তখন ওরও পেইন হয়েছিল। রিফ্লেক্স পেইন আর কী! সুব্রত ভীষণ ভাল, জানো?

আনন্দে আমারও চোখে জল আসছিল। সামলে গেলাম।

আমার খুব শীত করছে। একটা গানের কলি মনে পড়ে কেবল—যেথা গান থেমে যায়, দীপ নেভে হায় মিলনের নিশি ভোরে, যদি মনে পড়ে সেথায় খুঁজিও মোরে...। শেয়ালদা সাউথ থেকে কিছুকাল কালীঘাট স্টেশন পর্যন্ত ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেছিলাম। তখন হাফপ্যান্ট পরা, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে একটা অন্ধ লোককে দেখেছি, গলায়-বাঁধা সিংগল রিডের হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইত। পুরনো আমলের গান শুনে বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ়দের বুঝি যৌবন দিনের নানা ব্যথা-বেদনার কথা মনে পড়ত, তাই অনেককে খুব অন্যমনস্ক হয়ে যেতে দেখেছি। একটা বুড়ো লোক এক বার লোকটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে খানিকটা গেয়েও ফেলেছিল। তা সেই অন্ধ লোকটা গাইত নিখুঁত। চোখ বুজে শুনলে মনে হত, জগন্ময় সামনে দাঁড়িয়ে গাইছে। এক এক কামরায় লোকটাকে পাঁচ-সাত টাকাও রোজগার করতে দেখেছি।

কী ভাবছ? মিতুন জিজ্ঞেস করল।

আমি মনে মনে একটু চমকে উঠি। গানের কলিটা দিব্যি গুনগুন করছিল মনের মধ্যে। হঠাৎ চিন্তাটা কখন অর্থনীতির দিকে বেঁকে গেছে। আমি সেই অন্ধ লোকটার কথা অবাক হয়ে ভাবছি: প্রতি কামরায় পাঁচ টাকা গড় রোজগার হলে একটা ট্রেনের দশটা কামরায় রোজগার হয় পঞ্চাশ টাকা। আর দিনে এ-রকম দশটা ট্রেনেও যদি গান গেয়ে থাকে লোকটা তো তার দিনের রোজগারই ছিল পাঁচশো টাকা। কাটান-ছাড়ান দিয়ে যদি দিনে তিনশোও ধরি, তবে মাসে গিয়ে কত দাঁড়ায়? ন' হাজার! ভাবা যায় না। ভাবা যায় না।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, সবই মনে পড়ে। আমি বড় বোকা ছিলাম।

কিংবা খুব চালাক। মিতুন বলল।

আমি অপরাধীর মতো মুখ নিচু করে রইলাম। এবং ফের আমার সেই অন্ধ লোকটার কথা মনে পড়ল। 'যেথা গান থেমে যায়, দীপ নেভে হায়...' এই বিরহের মন-খারাপ-করা গানের পিছনে কী বিশাল অর্থনীতি! লোকটাকে অবশ্যই আয়কর দিতে হত না এবং সে মাসে নিট ন' হাজার টাকা কামাত, বছরে এক লক্ষ আট হাজার টাকা? আমি আরও কাটান-ছাড়ান দিয়ে হিসেব করতে লাগলাম। ধরা যাক, লোকটা প্রতি ট্রেনে মোট পাঁচটা কামরায় পাঁচ টাকা করে পঁচিশ টাকা রোজগার করত, এ-রকম পাঁচটা ট্রেন থেকে রোজগার হত একশ পঁচিশ। তা হলে মাসে দাঁড়াচ্ছে তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ, বছরে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা!

তাও ভাবা যায় না। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে ঊর্ধ্বমুখ সেই অন্ধ ভিখিরির বিরহের গানটানগুলোর নতুন একটা অর্থ পেয়ে যাচ্ছি।

আমি বললাম, না মিতুন, আমি মোটেই চালাক ছিলাম না। আমার চেয়ে ঢের বেশি চালাক লোক পৃথিবীতে রয়ে গেছে। আব সেই ভেবেই আমার মন মাঝে মাঝে খুব খারাপ হয়ে যায়। একটা হাফপ্যান্ট পরা, গেঞ্জি গায়ে, গলায় হারমোনিয়ামওয়ালা অন্ধ ভিখিরিও আমার চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান মিতুন। বলেই থেমে গেলাম। মিতুন বুঝবে না। বলে লাভ নেই।

মিতুন একটু অবাক হয়ে চেয়ে ছিল আমার দিকে। বলল, হঠাৎ ভিখিরির সঙ্গে নিজের তুলনা

করছ কেন ইন্দ্রজিৎ! ভালবাসা কি তোমাকে ভিখিরি করেছে নাকি? বলে মুখে আঁচল তুলে হাসল মিতুন।

আবার সেই পুরনো দিনের বিরহের গান। 'ভালবাসা মোরে ভিখারি করেছে...'

শীতে কেঁপে উঠে বললাম, গানের গলা থাকলে বিরহী ভিখিরি হওয়া যে কী ভীষণ প্রফিটেবল, তা তুমি জানো না।

মিতুন বুঝল না, বুঝবে না জানতাম। সেই অন্ধ ভিখিরির চিন্তা আমাকে এমনই পেয়ে বসেছে যে, কিছুতেই চিন্তাটা তাড়াতে পারছি না। বন্ধুগণ, গায়ের কোথাও মাছি বসলে তাড়িয়ে দিয়ে দেখবেন, ফের উড়ে এসে সেখানেই বসেছে। বার বার একই জায়গায় মাছি এসে বসবেই। বড় জেদি। আমার চিন্তাগুলিও অবিকল মাছির মতোই। উড়িয়ে দিলেও ফের এসে বসে। অনেকক্ষণ ভুলতে পারি না। তখন যে কোনও কথাই বলি, তার মধ্যে বিদঘুটে চিন্তার ছায়া এসে পড়ে।

মিতুন বলল, পুরনো কথা থাক ইন্দ্রজিৎ। আমার কোনও দুঃখ নেই।

আমারও। বলেই ঢোক গিললাম।

মিতুন অকপট ব্যথাতুর চোখে চেয়ে বলল, জানি।

তার ওই অদ্ভুত স্বরে 'জানি' কথাটা আমার বুকে ছোরার মতো গেঁথে গেল। তাড়াতাড়ি বললাম, আমি আজও বিয়ে করিনি মিতুন।

সে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়েছিল। ধীরে ফের আমার মুখের ওপর দুটি বড় বড় চোখ স্থাপন করে দ্বিধাভরে জিজ্ঞেস করল, কেন ইন্দ্রজিৎ?

তোমার জন্য।

বলেই আমি সর্দির প্রথম হাঁচিটি হাঁচলাম। মিতুন অভিজ্ঞতাবলে একটু সরে বসল। মুখটায় আঁচল চাপা দিয়ে বোধহয় বীজাণুর সংক্রমণ আটকাল।

তারপর বলল, তাতে আমার কী যায় আসে ইন্দ্রজিৎ? একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, একদিন গড়িয়াহাটায় নেপালদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাকে আমি তোমার কথা জিজ্ঞেসও করিনি। কিন্তু সে বোধহয় ভাবল যে, আমি এখনও সেই ব্যাপারটা মনের মধ্যে পুষে রেখেছি। তাই নিজের থেকেই তোমার অনেক খবর দিল। বলল, তুমি এক বার ব্যবসা করতে গিয়েছিলে, এক বার কিছুদিন ওকালতিরও চেষ্টা করেছ, ছ'বার চাকরি ছেড়েছ, আর বিয়ে করোনি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। আমি দু'বার ইস্কুল মাস্টারি, দু'বার প্রফেসারের চাকরি, আর দু'বার কেরানিগিরি ছেড়েছি। ল' পাশ করেছিলুম মনের দুঃখে, কিছু করার ছিল না বলে। পসার জমাতে পারিনি। একটা ভারী মজার ব্যবসা করতে গিয়েছিলাম মিতুন। লোকে বুঝল না।

মিতুন সামান্য হাসছিল, বলল, কীসের ব্যবসা?

সেটা ছিল একটা ইনসিওরেন্সের ব্যবসা। প্রেম ও বিবাহ বিষয়ক বিমা। ধরো ক-এর সঙ্গে খ-এর জেনুইন প্রেম হয়েছে। কিন্তু তাদের বিয়ে হবে কি না তা তো কেউ বলতে পারে না। হয়তো মা-বাবার আপত্তি আছে, বা অন্য কোনও প্রেমিক হুড়ো দিচ্ছে, কিংবা কিছুদিন প্রেম করার পর তাদের নিজেদেরই আর পরস্পরকে ভাল লাগল না। প্রেমের এই অনিশ্চয়তার জন্যই তখন ক আর খ গিয়ে তাদের প্রেমটা বিমা করে এল। যদি তাদের প্রেম বিয়েতে পর্যবসিত না হয় তবে তারা দু'জনেই টাকা পাবে। প্রিমিয়াম কম, পলিসিও খুব বেশি টাকার করা চলবে না।

মিতুন একটা তিরতিরে হাসির ঝর্না খুলে দিল। বলল, মাগো।

আমি হাসলাম। বললাম, হাসি পাচ্ছে, কিন্তু ব্যবসাটা সত্যিই হাস্যকর ছিল না মিতুন। প্রেমে ব্যর্থ হলে যদি সঙ্গে সঙ্গে কিছু টাকা হাতে আসে, তবে কত ভাল হয় ভেবে দেখো। ইচ্ছে করলে কাশ্মীর বা কুলু ভ্যালি বেরিয়ে আসা যায়, নেশা করা যায়, একটা স্টিরিও সিস্টেম কিনে ঘরে বসে গান শুনে দুঃখ ভোলা যায়। তা ছাড়া টাকাটাই তো ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের কাজ করে; তেমনি আবার ধরো,

বিয়ের পর নতুন বর-বউ এসে তাদের ম্যারেজ ইনসিওর করল। যদি বিয়ে কখনও ভেঙে যায়, সেপারেশন বা ডিভোর্স হয় তো সেক্ষেত্রেও দু'জনেই মোটা টাকা পাবে। ডিভোর্সের পর যে সুখী হয়েছে সে ওই টাকায় আরও সুখ কিনবে, যে দুঃখী হয়েছে সেও দুঃখ ভুলবার উপায় খুঁজে পাবে। টাকা জিনিসটা অনেকটা ফোম-রাবারের মতো, বেশি দুঃখ-টুঃখ গায়ে লাগতে দেয় না। এই আইডিয়া নিয়ে আমি ব্যবসা করতে গেলাম, ঘর-টর ভাড়া করে সাইনবোর্ডও লিখতে দিয়েছিলাম, কিন্তু লাইসেন্স বের করতে পারলাম না। যে শোনে সেই হাসে।

মিতুন অনেকক্ষণ পর হাসি সামলে বলে, বেশি বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করলে মানুষের যে কত বাতিক গ্রো করে! আমার এক ভাশুর আছে, সব সময়ে পাউরুটি কিনতে হলেই বালিগঞ্জ থেকে বড়বাজারে যাবে। ওখানেই নাকি ভেজালহীন পাউরুটি একটামাত্র দোকান থেকে বিক্রি হয়। হাতঘড়িটা ক'বার দম দেয় জানো? দিনে চার বার। সকালবেলায় চাবি চারবার ঘুরিয়ে ঘড়িটার ব্রেকফাস্ট হয়, দুপুরে আট পাক দিয়ে লাঞ্চ, বিকেলে চার বার ঘুরিয়ে টি, রাতে ফের আট বার পাক দিয়ে হয় ডিনার। ঘড়ি আর ভাশুর একসঙ্গে চলে।

মিতুনের হাসি থামে না। আমি একটু গম্ভীর হই। মিতুন হঠাৎ আমার সর্দির কথা ভুলে গিয়ে আমার ডান কাঁধের ওপরে প্রায় ঢলে পড়ে বলল, ইন্দ্রজিৎ, এবার বিয়ে করো।

সেই মুহূর্তে ভুতুড়ে কুয়াশা কেটে সোনার রোদ ঝরে পড়ল চারদিকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেদার সোনালি রোদের চওড়া তক্তা টেরছা হয়ে এসে পড়ল চারদিকে। কাঞ্চনজঙ্ঘা মাসল ফুলিয়ে বুক দিয়ে একটা মেঘের চাঁই ভেঙে ফেলে হাততালির জন্য গম্ভীরভাবে অপেক্ষা করছে।

আর বাস্তবিক, ঠিক এ সময়ে একটা হাততালির শব্দও হল। আমি ভীষণ চমকে উঠলাম। এবং চকিতে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, একটা হাততালিতে পাহাড়টা খুশি হয়নি, আরও চায়। ভ্রূকুটি করে চেয়ে আছে। দু'-একটা হালকা মেঘের বল নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লোফালুফি করছে।

যে লোকটা হাততালি দিচ্ছিল সে কিন্তু থামেনি। সমানে হাততালি দিয়ে যাচ্ছে। এবার সে হাততালির সঙ্গে মাতাল গলায় বলল, বিউটিফুল! ব্রাভো!

তাকিয়ে দেখি, মিতুনের বর সুব্রত। দুটো ভ্রূ ঈষৎ ওপরে তোলা, কপালে ভাঁজ, মুখে স্খলিত হাসি। আমি তাকাতেই আঙুল তুলে বলল, এক মিনিট। বলে ক্যামেরাটা বাগিয়ে ধরল।

মিতুন আমার কাঁধের কাছ থেকে মাথা সরিয়ে নিয়েছে ঝট করে। এবার ভ্রূ কুঁচকে স্বামীকে ধমক দিল, কী হচ্ছে কী?

সুব্রত গম্ভীরভাবে বলল, এক মিনিট। বলে ক্যামেরা ফোকাস করতে লাগল। পারছিল না। হাত সরে সরে যাচ্ছে। মিতুন উঠে গিয়ে ওর নড়া ধরে টেনে এনে পাশে বসিয়ে দিল।

সুব্রত বসে খানিক কাশল। তারপর আমার সঙ্গে এক লহমায় বন্ধুত্ব পাতিয়ে বলল, ইন্দ্রজিৎ, তুমি একটা বলদ। আমি তোমাদের ঘনিষ্ঠ ছবিটা তুলতে যাচ্ছিলাম, তুমি তখন ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে কি মুন্ডু দেখছিলে?

আমি স্তিমিত গলায় বললাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা।

দুস শালা! কাঞ্চনজঙ্ঘা পাথর আর বরফের পাহাড়, অনেকদিন একই রকম থাকবে। কিন্তু এই দুর্লভ ভঙ্গিটা তো চিরকাল ক্যামেরার জন্য বসে থাকবে না!

মিতুন খুব রেগে গিয়ে চাপা গলায় বলল, ছবি তুলতে চেয়েছিলে তো চুপচাপ দূর থেকে তুললেই পারতে। লোক জানিয়ে ও রকম হাততালি দিয়ে চেঁচাচ্ছিলে কেন? সবাই কী ভাবল বলো তো!

সুব্রত পা টান করে সামনে ছড়িয়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে বলল, দৃশ্যটা এত বিউটিফুল লাগল যে, আনন্দটা সামলাতে পারিনি। হৃদয় থেকে কোলাহল উঠে এল। মনে হচ্ছিল, আমাদের

যেন বিয়ে-টিয়ে হয়নি, আমি এক নবীন যুবক। আর তুমি কুমারী এক যুবতী। এবার ওই ইন্দ্রজিৎ শালার সঙ্গে আমার জোর ফাইট হবে তোমাকে নিয়ে, খুব ফাইট হবে। আর তোমার সঙ্গে দারুণ প্রেম হবে আমার একদিন। তারপর ইন্দ্রজিৎকে তোমার কাছ থেকে আমি কেড়ে নেব।

এই বলে সুব্রত ঢুলতে লাগল। খুব খেয়েছে। শেষ বাক্যটা ও সম্পূর্ণ ভুল বলল। 'ইন্দ্রজিৎকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব' এই কথাটাই ভুল, হবে 'তোমাকে ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে কেড়ে নেব'। কিন্তু মাতালরা ও-রকম উলটোপালটা বলে। আমি কিছু মনে করলাম না।

সুব্রত ঘুমিয়ে পড়েছে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি মিতুনের দিকে চেয়ে বললাম, কাকে মিতুন?

মিতুন আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, কী কাকে?

আমি একটু হতাশ হয়ে বলি, মনে নেই, একটু আগে যে বলেছিলে 'ইন্দ্রজিৎ এবার একটা বিয়ে করো!'

ও। বলে মিতুন হাসল। বলল, কাকে তা কী করে বলি! ভাবিনি তো।

ভাবেনি? আশ্চর্য! এই এত হাতের কাছে সনাতনী থাকতেও মিতুন আমার জন্য কাউকে ভাবেনি? যদিও সনাতনীকে কোথাও এখন দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবত মিতুনের ছেলের পিছু নিয়ে ছুটছে। তবু একটা টু দিলেও বোধ হয় সনাতনী শুনতে পাবে। এত কাছে সনাতনী, তবু মিতুল ভাবেনি! না ভেবে পারে কী করে? এটা কি চূড়ান্ত অভদ্রতা নয়?

সুব্রত চটকা ভেঙে হাই তুলল। মাঝখানে মিতুন, দু' পাশে আমরা। সুব্রত ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে বলল, একটা সিগারেট দে তো ইন্দ্রজিৎ।

'তুই' শুনে আমি অবাক। 'আপনি' থেকে এত তাড়াতাড়ি কেউ 'তুমি' এবং তা থেকে 'তুই'তে নামতে পারে, এ আমি জীবনে দেখিনি। এবার সনাতনীর বদলে মিতুনের কোলের ওপরে এবং বুকের নীচে বিপজ্জনক আবহমণ্ডলে আমাদের সিগারেটের লেনদেন হল। সিগারেট নিয়ে সুব্রত একটু চোখ টিপল। ফের হাই তুলে বলল, মিতুন, তুমি ইন্দ্রজিৎকে আবার ভালবাসতে পারো না? একটুখানি?

কী যা-তা বলছ?

পারলে বেশ হত। ঠান্ডা মেরে গেছি, আবার একটু তেতে উঠতাম। একঘেয়ে ভাল লাগে না।

মিতুন ঝাঁঝরে উঠে বলে, তা তো লাগবেই না। তাই এখনও সুদেষ্ণা আর ভারতীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছ! বলে আমার দিকে ফিরে মিতুন বলে, জানো ইন্দ্রজিৎ, কী বদমাশ এই লোকটা! বিয়ের আগে একগাদা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াত। এখনও সেই মেয়েগুলো রেগুলার আমাদের বাড়িতে আসে, আড্ডা মারে। আর, আমিই তাদের চা করে খাওয়াই।

সুব্রত আবার হাই তুলে বলে, ভীষণ ঠান্ডা, বুঝলি ইন্দ্রজিৎ? জীবনটা বেজায় ঠান্ডা। আমি একদিন নিউমোনিয়া হয়ে মরে যাব। বলে ফের ঘাড় এলিয়ে দিল সুব্রত। ঘুমোতে লাগল।

আমি খুব সামান্য আশার সঙ্গে মিতুনকে বললাম, ভাবোনি এখনও?

মিতুন ভ্রূ তুলে বলল, কী ভাবিনি?

আমি কাকে বিয়ে করব!

মিতুন গম্ভীর হয়ে বলল, আহা। বিয়ের কথাতে যে অস্থির হয়ে পড়লে বড়!

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, বয়স হচ্ছে মিতুন। নাউ, অর নেভার।

মিতুন হেসে ব্যাগ থেকে একটা উলের বল আর দুটো কাঁটা বের করে বুনতে বুনতে বলল, কী করো-টরো আগে শুনি। স্বভাব-চরিত্র কেমন? বাড়িতে পুষ্যি ক'জন?

কী অপমান! কী গর্হিত অপমান। আমার সঙ্গে রেজিস্ট্রি করবে বলে এসে যে মেয়েটা একদিন হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল, সে এখন আমাকে যাচাই করছে! অবিকল পাত্রীর পিসি-খুড়ির মতো।

ম্লান হয়ে গেলাম। এক চাপ কুয়াশা এসে চার দিকে ঢেকে ফেলল। একটা গুন্ডা মেঘ

কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে একেবারে ‘নেই’ করে দিল।

শীতে কাঁপা গলায় বললাম, আমি একটা ব্যাঙ্কে আছি মিতুন। সরকারি ব্যাঙ্ক।

অফিসার না কেরানি? মিতুন নিস্পৃহ গলায় জিজ্ঞেস করে।

প্রায়-অফিসার। আর-একটা প্রমোশন পেলেই—

মিতুন হাই তুলে বলল, কত পাও-টাও? আচ্ছা যাকগে, সে জেনে নেওয়া যাবে। ক'জনের সংসার?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চোখে জল আসছে, অবশ্য শীতে না দুঃখে তা বলা মুশকিল। কিন্তু গলায় কথা এল না। দ্বিতীয় হাঁচিটা এল অসময়ে।

আবার মুখটা সরিয়ে নিল মিতুন। দুই হাতে কাঁটা ধরা আছে বলে মুখে চাপা দিতে পারল না। সর্দির ব্যাপারটা আমি ভুলিনি এখনও। এই সর্দি একদিন প্রেম হয়ে মিতুনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তারপর প্রেম ফের সর্দি হয়ে বেরিয়েও গিয়েছিল বুক থেকে।

কিন্তু এ-সব ভাবার সময় আমার নেই। ওরা কাল চলে যাবে। সময় বড় কম। তাই মিতুনের সর্দির ভয় উপেক্ষা করে আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, শোনো মিতুন, খুব সিরিয়াস একটা কথা বলছি। আমি কাকে বিয়ে করতে চাই, জানো?

মিতুন ভয়ার্ত মুখে চেয়ে মুখটা যথাসম্ভব সরিয়ে নিয়ে হেলে বসে বলল, কাকে ইন্দ্রজিৎ?

ওই যে তোমার ননদ, কী নাম যেন—

সুস্তি? বলে অবাক হয়ে তাকায় মিতুন।

আমি মাথা নাড়লাম।

মিতুন এত অবাক যে আমার সর্দির কথা ভুলে গিয়ে সোজা হয়ে বসল। একটা শ্বাস ফেলে বলল, সুস্তি! কিন্তু—

আমি আশাভঙ্গের গন্ধ পেয়ে ব্যগ্র হয়ে বলি, কেন, কেউ আছে ওর?

মিতুন তাকিয়ে চিন্তান্বিত গলায় বলে, সে তো অনেক আছে। কিন্তু সে কথা ভাবছি না, তোমার বয়স কত ইন্দ্রজিৎ?

ছত্রিশ।

যাঃ! মিতুন অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে, ছত্রিশ হয় কী করে? আমার থেকে তুমি কি তবে সাত বছরের বড়?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। আমরা একই সঙ্গে এম এ পড়তাম, একই বয়সে প্রায়। আমি কখনও ফেলও করিনি যে বয়সে বেশি হব। কিন্তু বয়সের কথা থাক মিতুন। আমি এখনও ব্যায়াম আর আসন করি সকালে। আর বয়সের কথাটা কি তোলা ভাল হচ্ছে মিতুন?

কী বাজে বকছ? আমি এমনি বয়সের কথা তুললাম।

আমি জানি, আজ থেকে পনেরো-ষোলো বছর আগে যখন আমি এম এ পড়তাম, তখন আমার বয়স ছিল একুশ-বাইশ। তুমি আমার চেয়ে সাত বছরের ছোট হলে তোমার বয়স ছিল চোদ্দো-পনেরো। সেটা অসম্ভব।

আঃ! অত বোকো না তো! বলে মিতুন বিরক্ত হয়ে মুখটা বিকৃত করে বলে, একটা কথা পেলে সেটাকে তোমরা বড্ড ঘাঁটো। চুপ করো। আমাকে একটু ভাবতে দাও, সুস্তিকে তুমি তো এই একটু আগে প্রথম দেখলে, হঠাৎ এত পছন্দ হয়ে গেল কী করে?

আমি চুপ করে একটু হাসলাম কেবল। কী বলব? নিরন্তর এইভাবে আমি প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। একটার পর একটা। প্রেম যেন এক গহীন খাদ, তার তলা নেই, আর আমারও পড়ে যাওয়ার শেষ নেই। এবার কোথাও আমার আছড়ে পড়ে যাওয়াটা একান্ত দরকার। হাত পা ভাঙে ভাঙুক, মরলে মরব, তবু এই পতনশীলতা শেষ হোক।

একটু বাদে আমি সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করি, ভাবছ মিতুন?

মিতুন গম্ভীর গলায় বলে, ভাবছি। তোমাদের গোত্র তো শাণ্ডিল্য?

হ্যাঁ। আমি আশান্বিত হয়ে বলি, আমরা ব্যানার্জি। তোমরা?

ওরা রায় লেখে। কাশ্যপ গোত্র আসলে। বিয়ে হয়।

আমি প্রবল একটা বিদ্যুচ্চমক টের পাই বুকে। মেঘ কেটে ফের সোনার রোদ উঠেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে লাল করে দিয়েছে কমজোরি রোদ। খবর পেয়ে রডোডেনড্রন ঝোপ থেকে একটা প্রজাপতি উড়ে এসে আমার নাকের সামনে তার হলুদ ডানা চমকাল কিছুক্ষণ কর্তব্য হিসেবে। তারপর ফিরে গেল বিষয়-কর্মে।

তা হলে? আমি বললাম।

মিতুন শ্বাস ফেলে বলল, বাব্বা, তোমরা পুরুষরা হ্যাংলাও বটে বাপু! আচ্ছা সুস্তি আসুক, বলে দেখব।

বলতে বলতেই মিতুনের ছেলেকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। পিছনে সনাতনী।

আমি টপ করে উঠে পড়ে বললাম, দোহাই মিতুন, আমার সামনে বোলো না। আমি চলে যাচ্ছি। একদম চলে গেলে, যখন আর আমাকে দৌড়ে গিয়েও ধরা যাবে না বলে মনে হবে, তখন বোলো।

ওমা! কেন? বোসো, তোমার সামনেই বলছি।

না, না। আমি ভীষণ ঘাবড়ে যাই। বলে আমি পালিয়ে আসি।

৪

কী নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন এই অরণ্য! এ-রকম কখনও দেখিনি। চারধারে গায়ে গায়ে কালো গাছ। বেত-ঝোপের মতো। গাছের রং এত নিকষ কালো হয়? দেখিনি তো কখনও। আর গাছগুলোও কী ভীষণ ভুতুড়ে; তাদের কারও কোনও শাখা-প্রশাখা নেই, পাতা নেই, একটাও ফুল ফোটেনি কোথাও। যেন দাবানলে কবে পুড়ে গিয়েছিল, তাই শাখাহীন, নিষ্পত্র গাছের দগ্ধ কাণ্ডগুলিই কেবল দাঁড়িয়ে আছে। একটাও পাখি কখনও উড়ে এসে বসেনি এই গাছে, বাসা বাঁধেনি, ডিম পাড়েনি, গান গায়নি। কেবল চারধারে নিকষ গাছগুলি অন্ধকার কোলে করে বসে আছে। আমি তার ভিতর দিয়ে চলেছি। মন দুঃখে ভারাক্রান্ত। এমন করুণ অরণ্য দেখলে কার না মন খারাপ হয়! মাঝে মাঝে এক একটা ধপধপে সাদা গাছ অন্ধকারেও চকমক করে ওঠে। ঠিক যেমন যুদ্ধের সময়ে ব্ল্যাকআউটে মানুষেরা ধাক্কা খাবে বলে গাছে সাদা রং দেওয়া হত ঠিক সে-রকম। খুব উঁচু নয় গাছগুলো, খুব মোটাও নয়। অনেকটা বেত-ঝোপের মতো, কিন্তু একটাও কাঁটা গায়ে লাগে না। বরং আমি যখন তাদের ভেদ করে চলেছি তখন তারা নুয়ে নুয়ে পড়ছে বিনীত মানুষের মতো। ভারী অদ্ভুত এখানকার মাটি।। মাটি বলে মনেই হয় না। তুলতুল করছে নরম, নাচলে ফোম রাবারের মতো দোল খায়। আমি কয়েকবার নেচে মাটিতে দোল খেলাম। ধুলো বালি কাঁকর কিচ্ছু নেই, শুধু সব জায়গায় ওই ফোম রাবার। ভারী অদ্ভুত জমিটা তো! একটু এসেই দেখি, বিশাল এক খাদ, খাদের ওপাশে আর একটু ঘন বড় ঝোপ। তারপর একটা উঁচু টিলা চোখা হয়ে অনেক দূর উঠে গেছে। বিস্ময়ভরে আমি সেই অদ্ভুত পাহাড়টা দেখি। জাপানের ফুজিয়ামার মতো নিখুঁত পাহাড়। আর তার গায়ে পাশাপাশি দুটি বড় গুহা, এক মাপের। আর সেই গুহা থেকে উষ্ণ বাতাস বেরিয়ে আসছে মাঝে মাঝে। খাদটা অনেক ঘুরে পার হয়ে কাছে এসে পাহাড়ের গায়ে পা রাখলাম। নরম পাহাড়, এও ফোম রাবারের তৈরি। পা বসে যায়, কিন্তু কোনও ছাপ থাকে না। পা তুলে নিলেই ফের নিটোল হয়ে যায়। অদ্ভুত। কিছুদূর ফাঁকা জমি হাঁটতে হাঁটতে মস্ত এক পুকুরের কাছে চলে আসি।

সুন্দর লম্বাটে একটা দিঘি যেন। পাড়ে লম্বা সরু নিষ্পত্র আর শাখাহীন গাছের সারি। আমি পা বাড়িয়ে হঠাৎ পুকুরে নেমে পাড়ি। জল বেশি নয়, গোড়ালিও ডুবল না। আর কী ভীষণ পিছল! দু'বার আছাড় খেয়ে সাবধানে এগোই ভারসাম্য রাখতে রাখতে। মনে হয় পুকুরের মেঝেটা একরকম নরম সাদা মার্বেলে তৈরি। সবটা সাদা নয়, মাঝখানে গোল একটা কালো চত্বর। ঠিক তার মাঝখানে একটা কুয়ো, তার মুখটা স্বচ্ছ মার্বেলে ঢাকা। আমি সেই কুয়োয় উঁকি দিই। অত্যন্ত গভীর অতল কুয়ো। তাতে অনেক দৃশ্য ভেসে বেড়াচ্ছে জলের ওপর। উঁকি দিয়েই আমি চমকে উঠে বুঝতে পারি, খুব নিষিদ্ধ জায়গায় আমি উঁকি দিয়েছি। উঠে দাঁড়িয়ে আমি আমার পিছনের পথটার দিকে তাকাই এবং সব বুঝতে পারি।

আমি আসলে এতক্ষণ আমার নিজের মুখের ওপর দিয়ে হেঁটে এলাম। ওই অরণ্য আমারই না-কামানো দাড়ি-গোঁফ, নাকের পাহাড়। এখন আমি নিজেরই চোখের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। চোখেব জলে আমার গোড়ালি এখনও ডুবে আছে। তবে কি আমি ঘুমের আগে কেঁদেছিলাম? না কি ঘুমের মধ্যেও আমি কাঁদি? আমি চোখের ফুটোয় চোখ রাখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেন কাঁদো ইন্দ্রজিৎ? কেউ উত্তর দিল না। কিন্তু শুনতে পেলাম, সেই গভীর গুহার মধ্যে হু-হু করে একটা কোকিল কাঁদছে আর কাঁদছে। মাদার গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে স্তম্ভিত ইন্দ্রজিৎ। বুঝতে পারি, এই কুয়োর মধ্যেই ইন্দ্রজিতের গোটা জীবনটা মাইক্রোফিলম করে রাখা আছে। কিছুই হারায়নি। আমি গোড়ালি সমান জলে দাঁড়িয়ে দূরের সেই দাড়ির জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকি। কপাল! ইন্দ্রজিৎ যে কেন আজ দাড়ি কামাল না! এই একটু দাড়ির জন্য না জানি তাকে কত রুগ্‌ণ লেগেছিল! সনাতনী কি রুগ্‌ণতা পছন্দ করবে? আর, কালোর মধ্যে কয়েকটা বেমানান পাকা দাড়ি?

পুকুর উপচে জল গড়িয়ে পড়ল ইন্দ্রজিতের গাল বেয়ে। আমি গোড়ালি দিয়ে জল ঘেঁটে দিলাম। পায়ের পাতা দিয়ে আরও চলকে দিলাম জল। কাঁদুক, ইন্দ্রজিৎ একটু কাঁদুক।

স্বপ্নটা ভাঙল সকালে। ঘুম ভাঙতেই প্রথমে দাড়িতে হাত দিলাম। আধ ইঞ্চির কিছু কম হবে। শুঁয়োপোকার মতো শিরশিরিয়ে দিল হাতের তেলো। মনটা খাট্টা হয়ে গেল। গোটা দুই গরম জলের ব্যাগ ছিল লেপের মধ্যে, তা ঠান্ডা মেরে গেছে। নাড়তেই তাদের ভিতরে জল পেট-ডাকার মতো কলকল করে উঠল। বাইরে রোদ দেখছি। কিন্তু তবু কী শীত!

বাথরুম থেকে কাঁপতে কাঁপতে ফিরবার সময় দেখি, মলয়ের মশারি নড়ছে। দাঁড়ালাম, স্ট্যান্ড থেকে মশারির দুটো ফাঁস খোলা। চোপসানো মশারির ভিতর থেকে জালবদ্ধ রুই মাছের মতো ছটফট করতে করতে মুখ বাড়িয়ে বেরিয়ে এল মলয়।

চোখের পাতা আঙুল দিয়ে টেনে খুলে আমার দিকে মিটমিট করে চেয়ে বলল, আজ ক'দিন?

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, কীসের ক'দিন?

তুই ক'দিন হল এসেছিস?

ও। বলে হাসলাম, বললাম, থার্ড ডে।

ও মাথা নেড়ে বলল, রেকর্ড। থার্ড ডে পর্যন্ত কেউ থাকতে পারেনি এ বাসায়।

কেন?

ও ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলল, আমি আর টুকি নাকি খুব ঝগড়া করি। তাই।

ঝগড়া করিস কেন?

আমি করি না। তবে টুকি বলে, আমি করি। আমি ভাবি, টুকি করে। কে যে আসলে করে তা বোঝা মুশকিল। এ বাড়িতে বোধহয় একটা ঝগড়ার ভূত আছে, সেই ব্যাটাই আমাদের লাগিয়ে দেয়। তবে, আমি করি না। ঝগড়ার ভয়ে আমি সব সময়ে নেশায় থাকি।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, একহাতে তালি বাজে না মলয়।

বাজে। মলয় খুব অবহেলায় বলল, আমাদের ছেলেবেলায় একটা চাকর ছিল, ফন্টে। সে পারত।

তার কবজির জয়েন্টটা ভাঙা ছিল বোধহয়। হাতটা জোরে নাড়লে হাতের তেলোটা লটপট করত। ফটাস ফটাস করে সেই কব্‌জির ওপর ঘা খেয়ে তালির শব্দ তুলত। আমরা একহাতে তালি বাজানো দেখেছি ইন্দ্রজিৎ। কেউ কেউ পারে।

আমি হেসে বলি, সে বাজলেও ঝগড়া কিন্তু বাস্তবিক একা করা যায় না। একজন প্রতিপক্ষ তো চাই।

মলয় বিষণ্ণ মুখে মাথা নেড়ে বলে, আমার দিদিমাকে দেখিসনি তাই বলছিস। খুব ঝগড়াটে ছিল। তার ঝগড়ার চোটে দাদামশাই অকালে মারা যান। ছেলেরা সব আলাদা হয়ে যায়। মেয়েরা টপাটপ যাকে-তাকে বিয়ে করে সরে পড়ে। ঝি-চাকর পর্যন্ত ছিল না। ফাঁকা বাড়িতে একা দিদিমা তখন কাক, বেড়াল এদের সঙ্গে ঝগড়া করত। কাক এসে ডেকেছে, কি বেড়াল জানালায় উঁকি মেরেছে তো দিদিমার মুখ ছুটত। তখন কাক বা বেড়াল যদি ডাকত তো দিদিমা দ্বিগুণ রেগে শাসিয়ে বলত, ফের মুখে মুখে জবাব দিচ্ছিস গু-খেগোর ব্যাটা? বলে মলয় হাতের তেলো চিত করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, একাও ঝগড়া হয়।

আমি প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলে বললাম, টুকি চা করছে দেখে এলাম। ওঠ।

চায়ের কথায় মলয় মুখ বিকৃত করল। আমি দাঁড়ালাম না।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি দাড়ি কামিয়ে নিলাম। গোঁফ ছাঁটার ছোট কাঁচিটা আনা হয়নি। থাকগে। মোটা গোঁফ এখনকার ফ্যাশন। কেবল একটাই অসুবিধে, গোঁফের চুল বেড়ে এসে আঁকশির মতো ঠোঁটের চামড়ায় লেগে সুড় সুড় করে। বার বার জিভ দিয়ে চেটে গোঁফের ডগা সরিয়ে দিতে হয়।

সর্দিটা এখনও ঠিক মতো লাগেনি। আমি তিন রকম ভিটামিন খাচ্ছি। কাল রাতে ফুটবাথ নিয়ে মোজা পরে শুয়েছি। তরুণ সর্দি অবশ্য জায়গা দখলের চেষ্টা করছে গলায়, বুকে, মাথায়। ভিটামিনেরা লড়ছে। আমার শরীরটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে লড়াই দেখছে। যে জিতবে সে তার গলাতেই মালা দেবে।

মালার কথাতে মনটা চমকে ওঠে। একটা বিনি সুতোর মালা কি কোথাও গাঁথা হচ্ছে কাল রাত থেকে? কারও বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে এক অদৃশ্য প্রজাপতি কি মালা গাঁথেনি?

একটু বেলা হতেই আমি যথাসাধ্য সাজ-পোশাক করে বেরিয়ে পড়লাম।

স্টেশনের কাছে বড় রাস্তায় উঠবার মুখেই আমার সেই ডেন্টিস্ট ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওপর থেকে তিনি দেখছিলেন আমাকে। ঠিক যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। গম্ভীর মুখ, গায়ে মস্ত কালো ওভারকোট, মাথায় টুপি, চোখে ভর্ৎসনা। আমি আর তার সঙ্গে এর মধ্যে দেখা করিনি।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, ব্যথাটা কমেছে ডাক্তারবাবু, তবে আপনার কাছে যাওয়ার সময় পাইনি। শিগগিরই যাব।

উনি গম্ভীর ভাবে বললেন, আপনি কে?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বলি, চিনতে পারছেন না? বলে পরশু দিনের ঘটনা বললাম। উনি আমাকে প্রকাশ্য রাস্তাতেই হাঁ করতে বললেন। আমি হাঁ করলাম। উনি ভিতরে উঁকি দিয়ে বললেন, চিনেছি। সেই আপনি, যার ডাক্তারদের ওপর খুব রাগ?

আজ্ঞে।

উনি বললেন, দাঁত দেখে লোক চিনি। নইলে কারও মুখই আমার মনে থাকে না।

দাঁতটা কি তোলা একান্ত দরকার ডাক্তারবাবু? আমি ক্ষীণ আশার স্বরে জিজ্ঞেস করি।

তোলাই উচিত। দুষ্ট দাঁতের চেয়ে—

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, শূন্য মুখ ভাল?

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, না। দুষ্ট দাঁতের চেয়ে বাঁধানো দাঁত ভাল। দাঁতটা তুলে বাঁধিয়ে নিন, কিছু অসুবিধে হবে না। আমার নিজের সব ক'টা দাঁতই বাঁধানো।

শীতে আমি কেঁপে উঠি। বাঁধানো দাঁত! বাঁধানো দাঁত! ভাবতে ভাবতে বিদায় নিয়ে আমি চড়াই ভাঙি। বাঁধানো দাঁত, পাকা চুল, বয়স। এখনও বিয়ে হল না! ভাবতে ফের শীত করে।

রাঙা রোদের চেলি পরে কাঞ্চনজঙ্ঘা বসে আছে। মাথায় অপরূপ একটা সিঁথিমৌর। একটা মেঘের টায়রা ঝুলছে কপাল থেকে। আমার দিকে এক ঝলক কটাক্ষের রোদ ছুড়ে দিল।

লোবো'র দোকান থেকে বেরিয়ে একটা বুড়ো-মতো ক্ষয়া, ছোট চেহারার লোক আমার আগে কাশতে কাশতে যাচ্ছে। তার পরনে একটা মিলিটারি রঙের পুরনো পুলওভার, কারখানার চিমনির যে-রকম অদ্ভুত রং হয়, তেমন রঙের আর তেমনি চেহারার একটা পাতলুন, দুই বগলে দুটো মস্ত পাউরুটি। লোকটাকে আমি লক্ষই করতাম না। কিন্তু ওর হাঁটাটা কিছু অদ্ভুত। ডান পা-টা সামনে বাড়ানোর সময়ে ও একটা লাথি মারার ভঙ্গি করছিল। ঠিক যেন একটা অদৃশ্য ফুটবল লাথি মারতে মারতে নিয়ে চলেছে। অন্যমনস্কতার মধ্যেও আমি ওর হাঁটা লক্ষ করলাম। আমার মনের মধ্যে টিক টিক করে কী যেন নড়ে উঠল। একটা স্মৃতি। একটা দৃশ্য!

আজ সকালটাই শেষ সুযোগ। দুপুরের গাড়িতে মিতুন ওরা চলে যাবে। আমি তাই তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম। ম্যাল-এ ওরা নিশ্চয়ই খুব বেশিক্ষণ থাকবে না। বাঁধা-ছাঁদা আছে। বুড়ো লোকটাকে নিয়ে আমি ভাবলাম না।

অন্যমনস্কভাবে আমি হাঁটতে হাঁটতে লোকটাকে পেরিয়ে যাচ্ছি, একবার বে-খেয়ালে ওর মুখের দিকে তাকালাম। লোকটা কাশছে। একটা কম্ফর্টার গলা থেকে খুলে খুব কষ্টের সঙ্গে আবার গলায় জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। পারছে না, দুই বগলে দুটো পাউরুটি। হাত তুললেই বিপদ।

ভাবলাম, ওকে একটু সাহায্য করি। হয়তো এই সামান্য উপকারটুকুর জন্যই ঈশ্বর আমার উপঢৌকন সাজিয়ে রাখবেন অদূরের ম্যাল-এ। মানুষের ভাগ্য কোথায় কীভাবে ফেরে, কোন কর্মফল কীভাবে ফলে তা তো জানা নেই।

আমি লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, দিন, আমি বেঁধে দিচ্ছি।

লোকটা জল-ভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে কাশিতে ভাঙা গলায় একটু অবাঙালি টানে বলল, তার চেয়ে পাউরুটি দুটো ধরলে হয় না? মাফলারটা আমিই বরং বাঁধি।

ঠিক। আমার খেয়াল ছিল না। পাউরুটি দুটো ধরলাম, লোকটা সাংঘাতিক শক্ত করে মাফলার বাঁধছে। তার মুখটা হাঁ হয়ে আছে, সামনের দিকে একটামাত্র খয়েরি দাঁত। মুখটা খামচা খামচা শীতের চিমটিতে লাল হয়ে আছে। আমার মনের মধ্যে আবার টিকটিকি ডাকল।

আমি হঠাৎ বললাম, চেলু না?

লোকটা ফঁৎ করে একটা শব্দ করে হাঁ হয়ে তাকাল। ফের কাশির দমক সামলে বলল, কৌন চেলু?

তুমি চেলু না? নবীন পাল লেন-এর কাছে কোথাও থাকতে?

আমি? লোকটা অবাক।

তুমিই। আমি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে বলি, তোমাকে আমি প্রায়দিনই দেখেছি, পুরনো কাগজের গুদামেব সামনে বসে বিড়ি খেতে। লোকে বলত পকেটমার।

আমি চেলু-উলু কোই নাই। আমি পবন সিং।

আমি ধৈর্য হারাই না। নষ্ট করার মতো সময়ও আমার হাতে নেই। তাই বললাম, শোনো, বছর চৌদ্দ আগে আমহার্স্ট স্ট্রিটের কাছে এক ভুজাওলা খুন হয়। তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে। আমি একা বৈঠকখানা দিয়ে ফিরছিলাম নাইট শো দেখে। আর কেউ দেখেনি, কিন্তু আমি ঠিকই দেখেছি—

কী?

তুমি খুন করেছিলে। তোমার হাতে এই বড় একটা ভোজালি ছিল। পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি।

লোকটা হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে পাউরুটি দুটো কেড়ে নিল। বলল, ঝুট।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কাউকে বলিনি। হুজ্জত আমি ভালবাসি না। কিন্তু জেনে রাখো, আমি সাক্ষী আছি। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।

সময় ছিল না। লোকটাকে নিয়ে আর বেশি ঘাঁটালাম না। যাকগে, বহু দিন হয়ে গেছে। পুরনো কথাটা তুলতামও না আমি। নিতান্ত লোকটা মিছে কথা বলে আমাকে চটিয়ে দিল, তাই।

আমি প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ম্যাল-এ চলে আসি। প্রথমটায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো চার দিকে চেয়ে ওদের কাউকেই দেখতে পাই না। অনেক লোক রয়েছে আজ ম্যাল-এ। উত্তর দিকের রেলিঙের কাছে বেশ সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু লোক কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখছে। গাছের ছায়ায় চিকরি-কাটা রোদ পড়েছে তাদের গায়ে।

আমি ঘুরে ঘুরে লোকের মুখ দেখে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘাড়ের কাছে কার একটা শ্বাস পড়ল। চমকে ফিরে তাকালাম। না, মিতুন নয়। চেলু। বিরক্ত হয়ে বললাম, এখন যাও তো। আমার জরুরি কাজ রয়েছে। পরে কথা হবে।

লোকটা বুঝল বোধহয়। পাউরুটি বগলে নিয়ে একটু করুণ চোখে চেয়ে থেকে চলে গেল ধীরে ধীরে। আমি খুঁজতে লাগলাম।

একজন ফিরোজা শাড়ি পরা, শাল গায়ে মহিলা দূরবিন কষে পাহাড় দেখছিল। আমি ডাকলাম, মিতুন!

মিতুন দূরবিন নামিয়ে হেসে এগিয়ে এল, হল না ইন্দ্রজিৎ। কিছু বুঝতে পারলাম না।

আমি হাঁফাচ্ছিলাম। এতক্ষণে চড়াইয়ে উঠবার ক্লান্তি টের পাচ্ছি। কথা আসছিল না মুখে।

মিতুনের কষ্ট হল বোধহয় আমার অবস্থা দেখে। বলল, তুমি হাঁপিয়ে গেছ। এসো বসি। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই কখন থেকে একা এসে অপেক্ষা করছি। ওরা সব বাঁধা-ছাঁদা করছে।

দু'জনে বসলাম পাশাপাশি। দম ফিরে পেয়ে বললাম, কী হল?

মিতুন ঠোঁট উলটে বলল, কিছু হল না। কাল রাতের খাওয়া হয়ে গেলে সুস্তি যখন শুতে যাচ্ছে, তখন ডেকে কথাটা পাড়লাম। বলেই মিতুন আমার দিকে এক বার কটাক্ষ করে বলে নিল, ভেবো না যে তুমি যেমন হ্যাংলার মতো বলেছিলে তেমনটাই বলেছি। বরং তোমার দিকটা টেনেই বলেছিলাম। সাজিয়ে গুছিয়ে একটু ভূমিকা করে নিয়ে তবে বললাম।

আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, কী হল?

শুনে ভীষণ খুশি হল। মুখটা স্বপ্ন-স্বপ্ন হয়ে গেল খুশিতে। একটু শিউরেও উঠল আনন্দে। আমাকে ফট করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, কী দারুণ ব্যাপার বলো তো বউদি! মোটে আমার উনিশ-কুড়ি বছর বয়স, এর মধ্যেই এই নিয়ে পঁচিশটা প্রোপোজাল পেলাম। কী দারুণ ব্যাপার, বলো তো! এই বলে আমাকে ছেড়ে দৌড়ে চলে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, আর আপন মনে বলে, কী দারুণ ব্যাপার, না? দার্জিলিং আসার পর থেকে এ পর্যন্ত কেউ প্রোপোজ করেনি। এই প্রথম। এই বলে শুতে চলে গেল। আমার একটু অস্বস্তি লাগছিল, হ্যাঁ বা না কিছু তো বলল না! তাই ফের ওর ঘরে গিয়ে দেখি, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমন্ত মুখটাতেও একটু সুখের হাসি লেগে আছে, আর ঘুমন্ত চোখ দুটোও যেন এক স্বপ্নে বিভোর। খুব ভাল লাগছিল দেখতে ওকে।

আমি সচেতন হয়ে বললাম, কী হল? বলেই বুঝতে পারলাম, প্রশ্নটা কয়েক বার করেছি।

কিছু হল না। কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘের ছায়ায় ম্লান হয়ে গেছে। লগ্ন পার হয়ে গেল, তার বর এল না। বিয়ের সাজ ছেড়ে ফেলেছে লগ্নভ্রষ্টা কনে।

মিতুন দুঃখিত মুখে বলল, আজ সকালেও ভাবছিলাম কিছু বলবে বুঝি। ওমা, কিচ্ছু না। কেবল বার বার আয়নায় মুখ দেখছে। কিছু বোঝা গেল না। তাই লজ্জার মাথা খেয়ে ফের জিজ্ঞেস করলাম। ও খুব ভাবের ঘোরে বলল, বউদি, এই বয়সে এতগুলো প্রোপোজাল! কী দারুণ বলো তো! তখন বুঝতে পারলাম, ও তোমার কথা ভেবেই দেখেনি, শুধু ক'জনের ভোট পেল সেইটে হিসেব করছে। বলে একটা কটাক্ষ করে বলল, আমরা কিন্তু এ-রকম ছিলাম না ইন্দ্রজিৎ।

আমি মাথা নাড়লাম।

মিতুন উঠে বলল, চলি ইন্দ্রজিৎ, আর সময় নেই। কলকাতায় আমাদের বাসায় যেয়ো এবার গিয়ে। খুব ভাল লাগবে।

যাব? বলে আমি তাকাই।

মিতুন একটু নত হয়ে বলল, যেয়ো। সুন্তি না বলুক, আমি তো বলছি। আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি ইন্দ্রজিৎ। তোমাকে দেখলে বড্ড মায়া হয়। বলে চলে গেল মিতুন।

তিন দিন বাদে মেজদা এক্ষুনি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ঝিরঝির করে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। তার মধ্যেই একটা লোক সামনে এসে দাঁড়ায়, দুই বগলে দুটো পাউরুটি। বলে, বাবু, কী হল?

অন্যমনস্ক আমি মাথা নেড়ে বললাম, হল না।

লোকটা মাথা চুলকোবার চেষ্টায় হাত উঁচু করতে গিয়ে থেমে, মাথা নিচু করে চুলকে নেয়। বলে, আমি চেলু-উলু কোই নাই।

তুমিই চেলু। বলে বিরক্ত হয়ে আমি উঠে পড়লাম।

লোকটা আমার কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলে, আমি শও রুপিয়া দিব আপনাকে। আমি চেলু-উলু কোই নাই। বলে একটা মাত্র দাঁত দেখিয়ে খুব হাসল সে।

আমি তাড়া দিয়ে বললাম, ভাগো হিঁয়াসে।

লোকটা পালিয়ে গেল।

ঠিক দুপুরে একটা খাদের ধারে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে আমি দেখলাম, দুপুরের ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল। বিদায়ের রুমাল উড়ল না। কেউ বলল না, দেখা হবে। দার্জিলিঙে আর কিছুই রইল না। শুধু মেঘ-বৃষ্টি-রোদ শীত ছাড়া।

অন্যমনস্কভাবে ফিরে আসছিলাম। শেষ ভ্রমণকারীরা ফিরে যাচ্ছে। দার্জিলিং জনশূন্য হয়ে গেল প্রায়। শহরটা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, ভুতুড়ে হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। জনমানুষ দেখা যায় না।

আমাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে একটা অশরীরী গলা যেন বলে উঠল, ভুজাওয়ালা আমার জরুকে নিয়ে নট্‌খট্‌ করেছিল।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, চেলু। খাদের একদম ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বগলে পাউরুটি দুটো নেই, কিন্তু ডান বগলে সিকিমি রাম-এর একটা চ্যাপটা বোতল থার্মোমিটারের মতো সযত্নে চেপে ধরে রেখেছে। খাদের একদম ধারে দাঁড়ানো, অল্প অল্প দোল খাচ্ছে শরীরটা। আমি হাঁ করে তাকালাম।

সাচ বাত। চেলু হাসি-হাসি মুখে বলল।

তার বুড়ো-সুড়ো মুখে এমন একটা অকপট এবং সরল মিথ্যেবাদীর ছাপ ছিল যে, আমার ভিতরে বহুকাল আগের ঘুমন্ত এক জুনিয়ার উকিল জেগে উঠল। বাস্তবিক, আমি এক বার আইন পাশ করে কিছুদিন জুনিয়ার ছিলাম। চেলু সেই ঘুমন্ত উকিলটাকে খুঁচিয়ে তুলল।

আমি চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে জেরা করার স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, তখন তোমার জরু ছিল?

লোকটা চোখ সরিয়ে নিয়ে হঠাৎ বিনয়ের সঙ্গে বলে, ছিল একটা।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। ধমক দিয়ে বললাম, ঝুট। তোমার বউ ছিল না। বরং ভুজাওয়ালার বউ ছিল। আর তুমি তার বউয়ের সঙ্গে নটখট করেছিলে।

সম্পূর্ণ আন্দাজে বলা। কিন্তু লেগে গেল।

লোকটা খুব ব্যথিত হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর আরও বিনয়ের সঙ্গে বোকা-মুখে মাথা চুলকে বলল, ঠিক ইয়াদ হচ্ছে না। তবে ওই কিসিমের কিছু হোবে। তো আমি আপনাকে দো শো রুপিয়া দিব। লোক পুছলে বলবেন যে, আমি চেলু-উলু কোই নাই।

আমার ভিতরকার উকিলটা জেগেই গেছে। সহজে ঘুমোবে না। খুব গম্ভীরভাবে বললাম, তুমিই চেলু। তোমার কেসটা পরে ভেবে দেখব। এখন যাও তো, আমার মেজাজ ভাল নেই।

লোকটা কোনও কথা না বলে একটা সেলাম কবল। সার্কাসের ক্লাউন যেমন ভাঁড়ামি করতে করতেও অনেক শক্ত খেলা দেখায়, তেমনি খাদের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে মাতাল শরীরের চমৎকার ভারসাম্য রাখতে রাখতে আর টলতে টলতে লোকটা চলে গেল। ডান পাটায় তেমনি একটা অদৃশ্য ফুটবলে লাথি মারতে মারতে। মাতালরা অবশ্য বড় একটা দুর্ঘটনায় পড়ে না।

আমি কত দূর বিষণ্ণ ও হতাশ হয়েছি তা ঠিক বুঝতে পাবছি না। তবে বুকে মাঝে মাঝে একটা পেরেক ঠোকার যন্ত্রণা হচ্ছে। আমার চারদিকের পৃথিবীটা ছাইবর্ণ। অল্পস্বল্প বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে যাচ্ছি, কিন্তু গ্রাহ্য করছি না। এক চাপ সাদা অবয়বহীন কুয়াশা গড়িয়ে নেমে আসছে। শরীরের ভিতরকার প্রতিরোধ কমে যাচ্ছে। টের পাচ্ছি সর্দি ও ভিটামিনেব লডাইতে ভিটামিনেরা জোর মার খাচ্ছে সর্দির হাতে। আমার শরীর সর্দিকেই মালা দেবে বলে তৈরি হয়েছে।

আপাদমস্তক কুয়াশায় ডুবে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ি। চার দিকে অদৃশ্য বৃষ্টির ফোঁটা হেঁটে চলেছে। সেই শব্দে একটু উন্মুখ হয়ে উঠি। ক'দিন জোর বৃষ্টি গেছে, যদি রাস্তার ধস নেমে রেলগাড়িটা আটকে যায়? বুকের ভিতরটায় দপ করে আলো জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভিটামিনেরা দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করে সর্দির ভাইরাসকে। সর্দি পিছু হটে যায়। শরীর তার উদ্যত মালা নামিয়ে রাখে।

পরমুহূর্তেই ভাবি, কী লাভ? সুস্তির কাছে আমি আয়না বই তো নই। কী লাভ! ভাবতেই ভিতরকার আগুনটা মিইয়ে যায়। ভিটামিনেরা মাথা নিচু করে সরে আসে। সর্দির ভাইরাস লুঠেরার মতো শরীর দখল করতে থাকে।

৫

বিকেলে টুকি আমার জিভের তলা থেকে থার্মোমিটার টেনে নিয়ে দেখে বলল, একশো দুই।

আমি ম্লান হেসে বললাম, চার পর্যন্ত উঠবে।

কেন যে এ সময়ে দার্জিলিঙে এলেন। আরও আগে আসা যেত না?

আমি চোখ বুজে বললাম, অনেক আগে আসার জন্য চেষ্টা করছিলাম। প্রত্যেক দিন রিজার্ভেশনের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতাম, ঘুলঘুলি পর্যন্ত পৌঁছবার অনেক আগেই টিকিট শেষ হয়ে যেত। এইভাবে রোজ গিয়ে দাঁড়াই, আর ফিরে আসি। অর্ধেক ছুটি এইভাবে শেষ হয়ে যায়। অবশ্য আশেপাশে ব্ল্যাকাররা ঘুরে বেড়াত, দশ, পাঁচ বেশি দিয়ে অনেকেই তাদের কাছ থেকে টিকিট কিনে নিল। আমি ভাবলাম, দেখিই না প্রপার চ্যানেলে কত দিনে পাওয়া যায়। সেইটে পেতে গিয়েই এত দেরি। পনেরো দিনের চেষ্টায় পেলাম।

টুকি একটা শ্বাস ফেলে বলে, এসে কষ্ট পেয়ে গেলেন।

আমিও শ্বাস ফেলে বললাম, ভীষণ কষ্ট।

টুকি অন্যমনস্ক হয়ে বলে, এ বছর বৃষ্টিটাও ছাড়ছে না। জলপাইগুড়ি কুচবিহারে খুব বন্যা হয়েছে শুনছি। কলকাতার ট্রেন বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

জ্বরের ঘোরে আমি চেয়ে থাকি। বন্যা? আমার ভিতরটা হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মাথার ভিতরে ছুরির ধারের মতো একটা ব্যথা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখের ডিম দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যন্ত্রণায়। ক্রমশ চেতনার বেলাভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি এক মহাসমুদ্রের দিকে। জ্বরের ঘোরে বাস্তবতার মধ্যে কে যেন চামচে নেড়ে মিলিয়ে দেয় খানিক স্বপ্ন, স্মৃতি, মতিভ্রম। বন্যার কথায় চোখের সামনে আলিপুরদুয়ারের সেই ছেলেবেলার বন্যা ভেসে আসে।

ভরা বর্ষার পর একদিন সকালে উঠে দেখি বহুদূর পর্যন্ত একটা জলের চাদর বিছিয়ে আছে। মাঠ-ঘাট দেখা যায় না। তখন আলিপুরদুয়ার জংশনের নতুন পত্তন হচ্ছে মাত্র। অনেক মাঠ ছিল, ফাঁকা জমি ছিল। আমরা থাকতাম পশ্চিম দিকে, রেল লাইনের ওপারে।

বহু দূর পর্যন্ত সেই জল দেখে একটু কেমন শিউরে উঠেছিলাম। আমাদের কোয়ার্টারের পাশেই রেল লাইন। সকালে সেদিন কোনও ট্রেন এল না। সবাই বলছে লাইন ভেঙেছে। গাড়ি বন্ধ। আমাদের তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। মিলিটারি আমলের একটা গাড়ির পেট্রল ট্যাঙ্ক কী করে আমাদের ঘর-গেরস্থালিতে ঢুকে গিয়েছিল। সেটাকে মা চালের ড্রাম বা জলপাত্র করবার অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু বিদঘুটে আকৃতির জন্য সেটা কোনও কাজেই লাগত না। প্রতিবার যারা কোয়ার্টারের জানালা-দরজা রং করতে আসত তারা ওটাকেও রং করে দিয়ে যেত আমাদের অনুরোধে, সেই অকেজো ট্যাঙ্কটাকে ভেলা বানিয়ে ভেসে পড়বার চেষ্টা করলাম। কিছু দূর সেটা ভেসেও গেল বেশ। সামনের মাঠ পার হয়ে একটা নিচু জমি, সম্ভবত সেখান থেকে মাটি তুলে রাস্তার ভিত উঁচু করা হয়েছিল। সেইখানে এসেই ট্যাঙ্কটার মুখের ন্যাকড়ার ছিপি গেল খুলে। পাক খেয়ে সেটা ডুবে যাচ্ছিল। লাফিয়ে নেমেই আমি টের পেলাম, আমাদের নিত্যকার দেখা পরিচিত সেই মাঠটায় আমার ডুব-জল। আর জলে একটা চোরা টান। বৃষ্টির জমা জল নয়, কোথা থেকে যেন জল আসছে। ভয়ংকর জল।

সাঁতরে ফিরে এসে দেখি, বাসার সামনে সিঁড়ির নীচে গোড়ালি ডুব-জল ছিল, এখন সেখানে আরও এক বিঘত বেড়ে গেছে। বাবা চিন্তিত মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ঘরের ভিতরে চাকর রামজী আর মা মিলে জিনিসপত্র উঁচু জায়গায় তুলছে। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায়, ক্রমশ জলের চাদরটা উঁচু হয়ে উঠছে। সামনের রাস্তাটায় ওধার থেকে এক ঝলক পাতলা স্রোত এ পাশে এসে পড়ছে তখন। সেই জলের ভিতর দিয়েই মা, আমার ছোট ভাইবোন আর দিদিকে নিয়ে উঁচু ভিতের তালুকদার বাড়িতে চলে গেল। বাবা আর আমি রইলাম।

এক অফুরান, অজানা উৎস থেকে জল আসছেই, আসছেই। আমাদের বারান্দার ভিত-এ ছলাৎ-ছল করে ভাঙছে ঢেউ। সামনের মাঠের ওপর দিয়ে নদীর ধার থেকে কারা কলার ভেলায় ভেসে আসছিল। দেখলাম, হঠাৎ জলের একটা ঘূর্ণিতে ভেলাটা পাক খেয়ে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। মাথায় মোটঘাট নিয়ে লোকে বুক-জল ভেঙে চলেছে উঁচু ডাঙায়। তখন ডাঙা বলতে রেল লাইনের বাঁধটা জেগে আছে। আমাদের বারান্দায় কানায় কানায় জল উঠে এল দুপুরের আগেই। জলে কত কী ভেসে যাচ্ছে গেরস্থালির জিনিস। আমি কোমর-জলে নেমে গিয়ে একটা কৌটো ধরলাম। ফাঁকা দেখে জলে ফেলে দিলাম ফের।

চেনা জায়গাটা পালটে গেছে হঠাৎ। চেনা রাস্তাঘাট নেই, মাঠ নেই, গাছ ডুবে যাচ্ছে—সে এক অদ্ভুত বিস্ময়। থমথম করে করে জল বেড়ে যাচ্ছে।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, জলে যেয়ো না। স্রোত।

দুপুরের মধ্যেই বারান্দা ডুবে পাতলা জলের স্রোত নিরীহের মতো চৌকাঠ ডিঙোল। বাবা আর আমি খাটের প্রতিটি পায়ার নীচে চারটি করে ইঁট দিয়ে উঁচু করলাম। খাটের ওপর তোশক গুটিয়ে

ট্রাঙ্কবাক্স রাখা ছিল, বেজায় ভারী। বাবা একটা আগাথা ক্রিস্টির বই খুলে খাটে বসে রইলেন। ঘরে অবিরল জল ঢুকছে। ঘোলা স্রোতময় জল। স্রোতের ভিতরে একটা গভীর টানের শব্দ। যেন পিছনে এক গুপ্ত মহাসমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ ঘটে গেছে।

বাবা খাটের ওপর থেকে জিজ্ঞেস করেন, কত জল?

আমি একটা কাঠের রুল টানার স্কেল ডুবিয়ে মেপে বলি, ছ' ইঞ্চি।

ক্রমে স্কেলটার ডুব-জল হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এক ফুট ছাড়িয়ে গেল। প্রবল একটা স্রোতের শব্দ চার দিক থেকে পাক খেয়ে খেয়ে আসে। সেই জলের মধ্যে চবাস চবাস করে ফের বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। ঘরের মধ্যে কেমন করে ঢেউ দিচ্ছে জলে। পুরনো জুতোর বাক্স, কাঠের রিল, ঘর মুছবার ন্যাতা, পুরনো ঝাঁটা, পায়খানার মগ চোখের সামনেই খোলা দরজা দিয়ে ভেসে চলে গেল মহাসমুদ্রে। কোমর-সমান জলে দাঁড়িয়ে মহা আনন্দে এঘর-ওঘর করি। রাশি রাশি ঘুরঘুরে পোকা জলের কানায় ওপরে দেয়ালে সেঁটে আছে। একটা মস্ত বিছে দেয়ালে লেগে ছিল, সাড়া পেয়ে চিড়চিড় করে জলে নেমে ফের গিয়ে একটা কাঠের বাক্সে সেঁধোল। পায়খানা ভাসিয়ে গু ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে-দোরে।

বাবা উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করেন, কত জল?

জল মাপি না আর। জলের ওপর থেকে খাটের উপর পর্যন্ত মেপে বলি, আর এক ফুট বাকি।

বিকেল হতে না হতেই মেঘের আড়ালে আলো মরে এল। অনেক খুঁজে-পেতে রান্নাঘরের দুটো কংক্রিটের তাক-এর একটায় হ্যারিকেন পেয়ে জ্বাললাম। তক্ষুনি নজরে পড়ে একটা বাটিতে ঢাকা পাঁচ-ছ'টা সেদ্ধ ডিম। ডিম বোধহয় রাতের জন্য রেখে গেছে মা। একটা ডিম খাই। দুটো হ্যারিকেন জ্বেলে একটা বাবাকে দিই, অন্যটা তুলে ধরে ফের এঘর-ওঘর করি। জলে আলো পড়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে হয়। আমাদের চেনা ঘর-দোরে কে যেন বাইরের দুনিয়াকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘরের আব্রু ঘুচিয়ে অচেনা পৃথিবীর সঙ্গে তাকে এক করে দিয়েছে জল।

হাত-পা সিঁটিয়ে আসে। কখনও উঁচু পড়ার টেবিলে উঠে বসে থাকি। দেখি, কত কৌটো, শিশি, ভাঙা বাসনপত্র, পোঁটলা-পুঁটলির স্তূপ যত্ন করে জলের নাগালের বাইরে ওপরে তুলে রেখে গেছে মা। সংসারের কত অকেজো জিনিসও কাজে লাগবে বলে অকারণে তুলে রাখা হয়। সেই স্তূপের ওপরে বসে দেখি, মানুষের জমানো জিনিসের দিকে হাত বাড়িয়ে আসে নির্দয় উদাসীন পৃথিবীর দুর্যোগ।

এক বার জলে নেমে দেখি আমার বুক ছাড়িয়ে যাচ্ছে প্রায়। বাবা ও-ঘর থেকে ভয়ার্ত গলায় ডাকেন, ইনু, তুমি কোথায়?

এ ঘরে।

সাবধান! স্রোত।

স্রোতটা টের পাই। সাঁতরে ও-ঘর থেকে এ-ঘরে আসি। খাট আর ইঞ্চি ছয় বাকি আছে। ঢেউ উঠে খাটের ওপরটাও ভিজে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ঘর থেকে স্রোতের টানে উঠোনের দিকে ভেসে যাচ্ছে একটা ছাইদানি। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, জলের চাপে, স্রোতে তা বন্ধ করা যায় না।

বাবা বই বন্ধ করে বললেন, এবার কী হবে? আরও যদি বাড়ে?

ভয় পেয়ে বলি, কী করব বাবা?

তুমি কোনও তাকের ওপর উঠে বসে থাকো। খুব জল ঘেঁটেছ।

সবটুকু ডুবে যেতে আর খুব বেশি দেরি ছিল না। বাইরের জগতে কোনও মানুষের শব্দ নেই। একটা রেল ইঞ্জিনও কু দিল না। কেবল প্রবল বৃষ্টির শব্দের ভিতর দিয়ে জলের ঢেউ ভাঙার শব্দ এল। রান্নাঘরের তাকের ওপর বসে একটার পর একটা ডিম শেষ করি। হ্যারিকেনের আলোয় দেখি, থোপা থোপা কেঁচো জমে আছে আশেপাশে। একটা হেলে সাপ জল ভেঙে লিকলিক করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জল থমথম করে। জল গভীর। দরজার মাঝ বরাবর ছাড়িয়ে আর-একটু ওপরে উঠেছে।

বাবা ডাকেন, ইনু!

আমি বলি, এখানে।

জলের ওপর দিয়ে দু'জনের স্বর অন্য রকম হয়ে যায়। আমরা কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারব না, বুঝলাম। স্রোতময় জল আমাদের মাঝখান দিয়ে মহাসমুদ্রের দূরত্ব রচনা করছে। সেই সময়ে হাতে আধ-খাওয়া ডিম থেমে থাকে। জলের কল্লোলে কী একটা মহা-ভয় ও মহা-আনন্দ ভেসে আসে। হ্যারিকেনের আলোয় জল নাচে। আমাকে প্রার্থনা করে। হা-হা আনন্দে কখন ফের লাফিয়ে পড়ি জলে। তোলপাড় কবি চারিদিক। দুই ঘরের মাঝখানে অন্ধকার স্রোত পেরোই। লণ্ঠন উঁচু করে বসে বাবা সভয়ে জল দেখেন। সেই উঁচু-করা লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মানুষের তুচ্ছতা বুঝতে পেরে সেই শিশু-বয়সেও বুঝি কেঁদেছিলাম।

আজ ফের দার্জিলিঙে জ্বরের ঘোরের মধ্যে সেই বন্যাটা এল। চার দিকে জল আর জল। লণ্ঠন উঁচুতে ধরে চেয়ে আছে কে? বাবা! না, বাবা নয়, ও তো টুকি।

দার্জিলিঙে বন্যা হচ্ছে না তো টুকি?

টুকি হাসে, দার্জিলিঙে যেদিন বন্যা হবে, সেদিন সৃষ্টি রসাতলে যাবে বুঝলেন?

তবে কি আলিপুরদুয়ারে?

টুকি থার্মোমিটার জিভের তলায় গুঁজে দিয়ে বলে, ডাক্তার আনতে যাচ্ছি, দাঁড়ান।

আমি মাথা নাড়ি, না। আমার জ্বর বেশিক্ষণ থাকে না। সুটকেসে কয়েকটা পেনিসিলিন আছে, আর পেইনকিলার। ওতেই হবে। জল কত উঠল? থার্মোমিটার মুখে নিয়েই বলি।

দাঁড়ান, দেখছি। বলে থার্মোমিটারটা আরও একটু ঠেলে দিয়ে বলে, কথা বলবেন না, ভেঙে যাবে।

আমি জলের কল্লোল শুনতে পাই। ভেঙে গেছে পোল, ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়তলিতে। অঝোর বৃষ্টি। সুস্তি, মিতুন ওরা সব ঝাপসা বৃষ্টির দিকে চেয়ে বসে আছে। পুরো এক শতাব্দী যদি ওই অঝোর বৃষ্টি না থামে? সব আটকে থাকবে। আমি দার্জিলিঙে, সুস্তি রাজপথে, ক্রমে জল উঠে আসবে ছ' হাজার ফুট উঁচুতে। ক্রমে জল—

টি এক্স আর মল্লিকবাবুর বড় মেয়ের পেটে একটা ব্যথা উঠেছিল, পেটের মধ্যে একটা নাড়ি জড়িয়ে গিয়েছিল অন্যটার সঙ্গে। কুচবিহার বা জলপাইগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে গেলে বাঁচত। কিন্তু সেবার বন্যায় সব বন্ধ। কোথাও নেওয়া হল না। আলিপুরদুয়ারের হাসপাতাল কিছুই নয়। অপারেশন করার ব্যবস্থা ছিল না। লক্ষ্মীদি মরে গেল। ভরা আঠারো বছরের যুবতীর মৃতদেহ সেই প্রথম দেখি, চেনা মানুষের মড়াও সেই প্রথম।

ভোলা যায় না। আমার কণ্ঠদেশ ছুঁয়ে জলের বাড়ন থামল। আধঘণ্টা ওই ভাবেই থেমে রইল জল। তারপর কমতে লাগল। রাত দশটার সময়ে আমাদের ঘরে আধফুট পলিমাটি আর অজস্র পোকার গিজগিজ রেখে জল বারান্দার কানার নীচে নেমে গেল। মা, ভাইবোন, রামজী সব ফিরে এল। কোদাল আর টিনের টুকরোয় পলি পরিষ্কার করছি। সব ডিম খেয়ে ফেলার জন্য মা আমাকে বকছে। মল্লিকদের কোয়ার্টার থেকে কান্নার আওয়াজ এল সে-সময়ে। আমরা সবাই থেমে উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম।

বাবা বলে উঠলেন, লক্ষ্মীকে আনল বোধহয়।

মা ডিমের কথা ভুলে চোখ মুছে বলল, আহা, লক্ষ্মীটা এসে কত সেলাই-ফোঁড়াই করে নিয়ে গেছে আমাদের বাসা থেকে। এই সেদিনও লেস-এর নতুন নকশা তুলে নিয়ে গেল।

এক-দুই মিনিট আমরা লক্ষ্মীদির জন্য চুপ করে রইলাম। কিন্তু সময় তো বেশি নয় মানুষের। ফের পলি পরিষ্কার করতে লাগি। মা রান্না চাপায়। আর আমাদের ঘর-সংসারের সেই নানা

কাজ-কর্মের মধ্যে দূর থেকে এক শোকের বাতাস এসে বয়ে গেল বারবার।

জল কত টুকি?

চার।

আমি চোখ চাই। হেসে বলি, জ্বর নয়। জল।

জল খাবেন?

মাথা নেড়ে বলি, না।

তবে?

চোখ বুজে বলি, কিছু নয় টুকি। আপনি বুঝবেন না। বলে পাশ ফিরে শুয়ে থাকি।

আমার চারপাশে সেই কৈশোরের বন্যার জল বয়ে আনে কত ঘর-গেরস্থালির জিনিস। জল থেকে আমি একটা ভাসন্ত কৌটো তুলে নিই। ঢাকনা খুলে দেখি তাতে ছুঁচ, কুরুশকাঠি, হরেক রঙের সুতো। ফেলে দিই। একটা বিছে প্রশ্নচিহ্নের মতো বাঁকা হয়ে লেগে আছে দেয়ালে। জলের ওপরে উঁচুতে লণ্ঠন তুলে ধরে আছে বাবা।

সকালে ঘুম ভেঙেই বুঝতে পারি, জ্বর ছেড়ে গেছে। প্রচণ্ড শীত। বাইরে শার্শির গায়ে ঘন কুয়াশা লেগে আছে। কিছু দেখা যায় না।

উঠে বসতে ইচ্ছে করে না। নড়তে ইচ্ছে করে না। জ্বরের পর শরীর বড় অবসন্ন। ক্লান্ত। শুয়ে থাকি। কোনওখানে কোনও শব্দ নেই। কেবল সাদা কুয়াশা, কাচের শার্সি, আর আমি।

অনেক বেলায় টুকি ঘরে আসে। আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টুকি এসে জাগাল, উঠুন। শরীর কেমন? বলে কপালে হাত রেখে খুশি গলায় বলে, ওমা! জ্বর নেই তো!

আমার জ্বর বেশিক্ষণ থাকে না। এক বার একজন ডাক্তার বলেছিল, আমার শরীরের নাকি প্রতিরোধ-শক্তি খুব বেশি। তাই অমন ধাঁ করে জ্বর উঠে যায়। আবার কমেও যায়।

টুকি হেসে বলল, আহা! কাল রাতে বুঝি ডাক্তার আসেনি! আপনি তো অচৈতন্য। ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিল, ওষুধ খাওয়ানো হল। এমনি এমনি কমেনি মশাই। আমি অনেক রাত পাশে বসে বার বার ব্যাগের জল পালটে গরম জল ভরে ভরে বিছানা গরম রেখেছি।

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, এত কাণ্ড! টের পাইনি তো!

টের পাবেন কী করে! যা জ্বর! বলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল টুকি। গলা নামিয়ে বলে, আপনার বন্ধু কাল রাতে যা কাণ্ড করেছে তা বলার নয়।

কী?

বলতে লজ্জা করে। বলে সে সজল চোখে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে বলল, কাল আমি অনেক রাত পর্যন্ত এ ঘরে ছিলাম। ও তো জানতও না যে আপনার জ্বর হয়েছে। বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ মাঝ-রাতে উঠে বিছানায় আমাকে না দেখে উঠে এসেছে। আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বলল, তুমি ওর ঘরে গিয়ে কী করছিলে? এই বলে যে কী রাগ করল! কোনও কথাই বোঝাতে পারলাম না। ওর তখন বিশ্বাস হয়ে গেছে যে আমি—বলে টুকি চোখের জল মুছল। একটু সামলে নিয়ে বলল, তাই প্রথমে মারল। তারপর ফের অনেক আদর করল। শেষে আবার মদ গিলে পড়ে রইল।

কেন?

কে বলবে! ওইরকম। যাকগে, ও-সব নিয়ে আপনি যেন ভাববেন না। আমাদের সম্পর্কটা একটু ভুতুড়ে। উঠুন চা করছি।

মলয় অনেক বেলায়, প্রায় এগারোটায় উঠে চোখের পাতা আঙুলে টেনে পৃথিবী দেখল।

আমাকে দেখে বিস্ময়ভরে বলল, তুই?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমিই।

যাসনি এখনও?

না।

সাবাস। এ প্রায় বিশ্ব রেকর্ড। কেউ পারেনি এ পর্যন্ত।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তুই টুকিকে ত্যাগ কর।

কেন?

আমি ওকে বিয়ে করব।

বিয়ে? বলে মলয় মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সচেতন করার চেষ্টা করল, নিজের পায়ে চিমটিও কাটল। বলল, নেশাটা খুব জোর ধরেছে দেখছি। কী বললি?

ঠিকই শুনেছিস।

আমি গম্ভীর। মলয় ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে থেকে বলে, বিয়ে? টুকিকে?

বিয়ে। টুকিকে। বলে আমি সিগারেটের প্যাকেট খুলছিলাম। মলয় অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়াল। আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম।

সিগারেট ধরিয়ে মলয় হঠাৎ মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলল, টুকির তো বিয়ে হয়ে গেছে! না কি! বলে আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ মাথা নেড়ে বলল, যাঃ, তা হয় না। আমাকে রেঁধে দেবে কে?

আয়া।

মলয় তখন আর-কিছু ভেবে না পেয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বলে, আর আমার মশারি টাঙিয়ে দেবে কে?

আমার ভিতরকার জুনিয়ার উকিলটা হাই তুলে জেগে উঠল। আমি তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বললাম, দার্জিলিঙে মশা নেই। মশারির দরকার হয় না।

মলয় উদাসভাবে বলল, হয়। মশার জন্য নয়, মশারি টাঙালে শীত কিছু কম লাগে। তাই আমরা টাঙাই।

আমি সওয়াল করার ভঙ্গিতে বললাম, তাতেও আটকায় না। মশারি এক বার টাঙালেই তোর এক জীবন চলে যাবে। দরকার মতো মশারি থেকে বেরিয়ে আসবি, দরকার মতো ফের ঢুকে যাবি। মশারি না-খুললেই হল।

মলয় ভীষণভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ ধমকে উঠল, আমার ছেলেরা তোকে বাপ ডাকবে নাকি?

না। কাকা কিংবা আঙ্কল।

হতাশ হয়ে মলয় বলে, সব তা হলে আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলি। টুকি কী বলে! ও কি রাজি হয়েছে?

আমি একটু দ্বিধাভরে বলি, ওকে এখনও বলিনি। তবে বললে রাজি হবে বলেই মনে হয়।

মলয়ের মধ্যেও বোধহয় এক ঘুমন্ত উকিল জেগে ওঠার লক্ষণ দেখায়। মলয় চোখের পাতা টেনে যত দূর সম্ভব তীক্ষ্ণভাবে আমাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুই কি টুকিকে ভালবাসিস?

আমি একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। প্রশ্নটা খুব শক্ত। তবু চোখটা সরিয়ে নিয়ে আমি বলি, বাসব।

গভীর একটা শ্বাস ফেলে মলয় বলে, তা হয় না ইন্দ্রজিৎ। তুই টুকিকে ভালবাসতে পারবি না। ওর অনেক ডিফেক্ট, লক্ষ করিসনি? প্রথমত, বয়স হয়ে গেছে, চর্বি হয়ে ফিগারটাও আগের মতো নেই। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, নাকটা ভাল নয়, তার ওপরে অসম্ভব মেজাজ। বলে মলয় খুব নিশ্চিন্তের হাসি হেসে বলে, তোকে তো জানি, কী ভীষণ খুঁতখুঁতে তুই। সেই কী একটা খোঁধ, কোন

একটা মুখার্জি, একজন কী যেন চৌধুরী—এদেরও প্রেমে পড়েছিলি তুই, মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

মলয় বলল, শেষ পর্যন্ত কারও সঙ্গেই তোর হল না। তার মানে, তুই কাউকেই শেষ পর্যন্ত ভালবাসতে পারিসনি! টুকিকেই কি পারবি ইন্দ্রজিৎ? খুব রিস্ক নিচ্ছিস! ওর ডিফেক্টগুলোও একটু ভেবে দেখ।

আমার ভিতরের উকিলটা ফের হাই তুলে পাশ ফিরে শুল। আমি গম্ভীর একটা শ্বাস ফেললাম। কথাগুলো ভেবে দেখার মতো।

উঠতে যাচ্ছিলাম, মলয় বলল, শোন।

কী?

আরও একটা অসুবিধা আছে।

কী সেটা?

আমি টুকিকে ভীষণ ভালবাসি। ওকে ছাড়া এক দিনও থাকতে পারি না। ভীষণ ভালবাসি।

আমি অবাক হয়ে বলি, ভালবাসিস?

ভয়ংকর। মলয় বলে, তোকে একটা ভূতের কথা বলেছিলাম না? আমাদের ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপারটা সেই ব্যাটাই করে। নইলে, আমি তো ভেবেই পাই না, টুকি ছাড়া আমার আছেটা কে?

মলয়ের ছোট ছেলেটা গম্ভীরভাবে ঘরে এসে সোজা বাপের লেপের মধ্যে ঢুকে গিয়ে কী যেন খুঁজছে। মলয় ধমক দিয়ে বলল, কী খুঁজছ এখানে?

ছেলেটির করুণ গলা লেপের তলা থেকে শোনা গেল, অ্যামব্রেলা।

সত্যি সত্যি ছেলেটা বিছানার জঙ্গল থেকে একটা ছাতা টেনে আনল বাইরে। গম্ভীরভাবে চলে গেল। ছেলের চলে-যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে মলয় ভাবালু গলায় বলে, মাই সন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে, তুই টুকিকে নিয়ে গেলে আমার থাকল কী বল? মাতাল হয়ে পড়ে থাকি, তাই লোকে ভাবে আমার হৃদয় নেই। ভয় খাই রে ইন্দ্রজিৎ, কে কবে টুকিকে টেনে নিয়ে চলে যায়। তা হলে আমি একদম জমি ধরে নেব, আর উঠব না।

আমার বুকটা কেমন করে ওঠে। চোখে জল আসতে চায়। ধরা-গলায় বলি, নেব না।

নিবি না তো? মলয় উৎসাহের সঙ্গে বলে।

না। কথা দিচ্ছি।

নিস না। আমি ওকে ভয়ংকর ভালবাসি। তুই বরং টুকিকে গিয়ে কথাটা বলে আয়।

কী?

ওকে গিয়ে বল যে আমি ওকে ভীষণ ভালবাসি, ওকে ছাড়া বাঁচব না। যা।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, দাঁড়া। টুকি বাজারে গেছে, আসুক।

মলয় আমার আর একটা সিগারেট নিয়ে ধরায়। খুব অধৈর্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে, আসছে না কেন বল তো? কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো?

না, কী হবে! রোজ বাজার করছে।

কী জানি, বড় ভয় করে। টুকি যা দুষ্টু না। সব সময়ে লাফিয়ে বা দৌড়ে চলাফেরা করবে। কোথায় কখন পড়ে-টড়ে যায়। দাঁড়া, গিয়ে দেখে আসি বলে মলয় উঠতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে টুকি ঘরে এসে ঢুকল। মুখ গম্ভীর, হাতে বাজারের বাস্কেট। এক বার আমাদের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিক্ষেপ করে ভেতর দিকে চলে গেল।

মলয় খুব অবাক হয়ে টুকিকে দেখল, যতক্ষণ দেখা গেল চোখ ফেরাল না। তারপর একটা শ্বাস ফেলে বলল, ইন্দ্রজিৎ, টুকিটা যা সুন্দর হয়েছে না, দেখতে! অনেকদিন পর ওকে ভাল করে দেখলাম।

ও-ঘরে টুকির গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। ছেলেকে বলছে, কেন তুমি ছাতা নিয়ে তাক থেকে লাফ দিলে? ছাতাটা কি প্যারাস্যুট? এখন ছাতাটা সারাতে কে যাবে?

মলয় চাপা গলায় বলল, যা ইন্দ্রজিৎ। গিয়ে বলবি যে, আমি ওকে ভীষণ ভালবাসি। ওকে ছাড়া বাঁচব না। যা।

আমি যাচ্ছিলাম। মলয় ডেকে বলল, দাঁড়া।

কী?

সে ইট উইথ ফ্লাওয়ারস।

ফ্লাওয়ারস! কিন্তু এখন ফুল কোথায় পাব?

বাইরে আগাছার মতো কত গাঁদা ফুটে আছে। তাই একটা তোড়া বেঁধে নিয়ে যা।

বাইরে কুয়াশা কেটে গিয়ে ফুটফুটে রোদ উঠে পড়ল। কাঞ্চনজঙ্ঘা অহংকারে আরও দু' হাজার ফুট উঁচু হয়ে উঁকি মারছে। দেখে নিচ্ছে, আর ক'জন ভ্রমণকারী অবশিষ্ট আছে দার্জিলিঙে। এখনও মুষ্টিমেয় কিছু আছে। তাই কাঞ্চনজঙ্ঘা আলো-ছায়ার পরম্পরায় নানা রকম খেলা দেখাতে থাকে। যখন শেষ ভ্রমণকারীটিও চলে যাবে, যখন তাকে দেখার আর কেউ থাকবে না, তখন সে তার শীতের দীর্ঘ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়বে।

বিস্তর গাঁদা ফুটে আছে। আর মাঝে মাঝে লাল গোলাপ, ডালিয়া। আমি কাশতে কাশতে ফুল ছিঁড়ছি, এমন সময়ে সামনেই একটা খাড়াইয়ের ওপর থেকে একজন ডাকল, বাবু!

মুখ তুলে দেখি চেলু, একটা মাত্র দাঁতে খুব অমায়িক হাসি হাসছে। আমাকে তিনটে আঙুল তুলে দেখাল।

কী? আমি প্রশ্ন করি।

তিন শ'ও দিব। আমি পবন সিং, চেলু-উলু কোই নাই।

তুমিই চেলু। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, এখন আমার কাজ আছে। তুমি যাও।

লোকটা ম্লান মুখে চলে গেল। আমি কাশতে কাশতে তোড়া বাঁধি। মনটা ভাল নেই। এত রোদের মধ্যেও চার দিকে একটা পোড়া ছাইয়ের রং দেখি। দার্জিলিঙের শেষ আকর্ষণটুকু কাল দুপুরের গাড়িতে চলে গেল। আমি গভীরভাবে সুন্তির কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতে সে যেন শরীর ধারণ করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

তাকে বললাম, সনাতনী!

সে সম্মোহিতের মতো বলে, উঁ।

ফুলের তোড়াটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম, নাও। আমার কথা ফুলই বলবে।

সনাতনী তোড়াটা নিয়ে বুকে ছুঁইয়ে বলল, কী মিষ্টি! কী রোমান্টিক!

ফুল কী বলছে সনাতনী? শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি। আপনি আমাকে—

হ্যাঁ। ভীষণ।

আমাকে ছাড়া—

আমিও। সনাতনী বলল।

ঠিক এই কথায় টুকি বেরিয়ে এসে বলে, এ কী, কালই আপনার একশো চার জ্বর গেছে, আর এই ঠান্ডায় ফুল তুলছেন যে বড়? শিগগির ভেতরে গিয়ে লেপ চাপা দিন, আমারই ভোগান্তি।

সুন্তির ঘোর তখনও আমার মাথা থেকে যায়নি। এদিকে মলয়ের শেখানো কথাগুলিও মাথায় খেলছে। ফুলের তোড়াটা টুকির দিকে এগিয়ে দিয়ে খুব বিষণ্ণ মুখে বললাম, ফুলের কথা কি শুনতে পাও টুকি?

টুকি অবাক হয়ে বলে, ফুলের কথা! সে আবার কী?

আমি গম্ভীর গলায় বলি, ফুল বলছে, আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

টুকি তোড়ার জন্য হাত বাড়িয়েছিল। যেন মুহূর্তে ফুলের মধ্যে সাপ দেখে সরিয়ে নিল হাত। তারপর হঠাৎ তার মুখ হয়ে গেল সাদা, কুঁকড়ে সরে যেতে যেতে সভয়ে বলতে লাগল, না না, তা হয় না ইন্দ্রজিৎবাবু। তা হয় না। আপনি খুব ভুল করছেন।

আমি ম্লান হেসে বললাম, কথাটা আমার নয় মলয়ের।

কী কথা?

আমি 'তুমি' ছেড়ে ফের 'আপনি' করে বললাম, মলয় আপনাকে বলতে বলেছে যে, ও আপনাকে ভীষণ ভালবাসে। আপনাকে ছাড়া ও বাঁচবে না। ও বলেছিল, সে ইট উইথ ফ্লাওয়ার্স।

টুকি গভীর শ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঈষৎ লাল হয়ে বলে, ছি ছি, কী কাণ্ড বলুন তো? তাই আপনি রোগা শরীরে এসে ফুল তুলছেন এই শীতে! যান তো, ঘরে যান।

মলয়কে কী বলব?

ও কেমন লজ্জা পেয়ে বলে, কী আবার! বলবেন ফুলের তোড়াটা আমি নিয়েছি।

আর কিছু বলার নেই? যেমন আপনি ওকে ভীষণ ভালবাসেন, ওকে ছাড়া বাঁচবেন না?

যাঃ। বলে টুকি মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

ও কিন্তু শুনবার জন্য খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে।

তা হলে বলবেন। টুকি বলে।

আমি আস্তে জিজ্ঞেস করি, উইথ ফ্লাওয়ারস?

হাসতে গিয়েছিল টুকি। হাসির মধ্যেই দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে নামল।

৬

বন্ধুগণ, আমি আমার হারানো দার্জিলিং এবারও খুঁজে পেলাম না। সেই কবে শিলিগুড়ি থেকে দেখা এক রহস্যময় মহাপর্বত মেঘের মতো ডেকেছিল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা কোথায় কোন সুদূরে চলে গেছে। কত বার আসি, মনে হয়—এ নয়। এ শহর তো নয়। আমার সেই শৈশবের চোখে একটা শহরের ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল কল্পনায়। কিছুতেই সে-ছবি মিলিয়ে যায় না। সে এক অদ্ভুত সুন্দর ম্লান-আলোর উপত্যকা, চারধারে নীল পাহাড় হাসিমুখে চেয়ে আছে, শহরের মাঝখান দিয়ে নদী, নদীর ওপর ঝুলন্ত পোল। আকাশে রামধনু-রঙা নানাবর্ণের মেঘ ভেসে যায়। পথে পথে স্থলপদ্ম ফুটে থাকে। রাস্তা আকীর্ণ থাকে ঝরা ফুলে। দোয়েল শ্যামা ডাকে, আসে হরবোলা কাকাতুয়া। স্বর্গের পাখিরাও আসে। ফুলের মধু খেতে প্রজাপতিদের সঙ্গে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়ায় মেয়ে-পরীরা। মানুষ সেখানে জেগেও স্বপ্নের ভিতর বাস করে।

মশাইরা, দার্জিলিঙে ফুল ফোটে, পাখি গায়, মেঘ ভেসে যায়। তবু কিছুতেই ছবিটা মেলাতে পারি না। তাই পাঁচ দিনের মাথায় ফিরে যাচ্ছি। ছুটি খুব বেশি বাকি নেই। আমার আরও কিছু দেখে যাওয়ার বাকি আছে। যেমন কাটিহারের সেই মাদার গাছটা—যেখান থেকে সেই আশ্চর্য কোকিল ডেকেছিল। কিংবা আলিপুরদুয়ার জংশনের পশ্চিমের মাঠটা, যেখানে ডুবে গিয়েছিল পেট্রলের ট্যাঙ্ক। কিংবা কুচবিহারের সেই ইস্কুলবাড়ি—যেখানে হোটেলের কাঁচা ঘরে প্রথম থাকতে গিয়ে মায়ের জন্য মন-কেমন-করায় ইন্দ্রজিৎ কেঁদেছিল হাপুস নয়নে।

মলয়ের কাছে বিদায় নিতে যাই। বলি, মলয়, যাচ্ছি।

নেশার ঘোর থেকে মলয় চোখ টেনে খুলে তাকাল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, উইথ টুকি? অর উইদাউট টুকি?

একটা বিখ্যাত টনিক কিনতে গেলে দোকানদার যেমন সব সময়ে জিজ্ঞেস করে নেয়, উইথ ক্রিয়োজোট, অর উইদাউট ক্রিয়োজোট? কিংবা টুথপেস্ট কিনতে গেলে জিজ্ঞেস করে, উইথ ক্লোরোফিল, অর উইদাউট ক্লোরোফিল? ঠিক সে-রকম স্বরেই মলয় জিজ্ঞেস করে।

আমি অহংকারের সঙ্গে বললাম, উইদাউট টুকি।

থ্যাঙ্কস। ওকে বলিস যে আমি ওকে ভীষণ—

বলেছি। আমি গাম্ভীর্য বজায় রাখি।

উইথ ফ্লাওয়ারস! ও বলে। আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে বলে, কেউ পারে না। তুই পারলি।

কী পারলাম?

এত দিন থাকতে। ওই ভূতটা কাউকে থাকতে দেয় না।

আমি একটা শ্বাস ফেললাম। টুকি ছলছলে চোখে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, কী করে থাকব বলুন তো!

আপনাদের খুব জ্বালিয়ে গেলাম। বলে ছেলেটাকে একটু আদর করি। আজও ওর গালে 'ক্যান্ডি'র আঠা। আমার হাতটা চটচটে হয়ে গেল।

টুকি বলল, শীত আসছে। একদম একা থাকব। ভীষণ একা।

কুলির মাথায় মাল তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। চড়াইয়ের একটা বাঁক পার হতেই মলয়ের বাড়িটা আড়াল পড়ে যায়। তখন আর ওদের জন্য কষ্ট হয় না। স্টেশন পর্যন্ত উঠতে উঠতেই ভুলতে থাকি। ভুলে যাওয়াই ভাল, ভুলে যাওয়াই স্বস্তিকর।

হাঁফাতে হাঁফাতে স্টেশনের মোড় পর্যন্ত উঠে এসেই দেখতে পাই, আজও নিজের প্রস্তরমূর্তি হয়ে ডেন্টিস্ট মশাই দাঁড়িয়ে আছেন। বাস্তবিক আমার এক বার সন্দেহ হল, দার্জিলিঙের অধিবাসীবৃন্দ হয়তো সময় থাকতেই তাদের প্রিয় দাঁতের ডাক্তারের একটি মূর্তি তৈরি করে এখানে স্থাপন করেছেন। মূর্তিটি খুবই নিখুঁত, সন্দেহ কী? তেমনি গম্ভীর মুখশ্রী, দু' চোখে ভর্ৎসনা।

আমি লজ্জিতভাবে সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যাসবশে হাঁ করলাম। উনি জীবন্ত হয়ে উঠে আমার দাঁত দেখে বললেন, ইন্দ্রজিৎবাবু না ? যিনি ডাক্তারদের পছন্দ করেন না!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উনি অত্যন্ত কঠোর গলায় বললেন, চলে যাচ্ছেন?

আমি খুব অনুতপ্ত হয়ে বলি, দাঁতটা তোলার সময় হল না।

উনি শ্বাস ছেড়ে বললেন, কষ্ট পাবেন। দাঁতের জন্য মায়া হচ্ছে বুঝতে পারছি। কিন্তু দাঁত একটি অভ্যাসমাত্র। গত চোদ্দো বছর ধরে আমার আসল দাঁত নেই। বলে তিনি দাঁত কিড়মিড় করে আমাকে তার নিখুঁত বাঁধানো দাঁত দেখিয়ে বললেন, কেউ বুঝতেই পারে না যে এ নকল দাঁত। আমি নিজেও ভুলে যাই। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, আমার বাঁধানো দাঁতে কাঁকর পড়লেও আমি শিউরে উঠি, খড়কে দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করি, ভাল পেস্ট দিয়ে দাঁত মাজিও। এমন কী আমার দাঁতেও মাঝে মাঝে ব্যথা হয়।

বলেন কী? খুবই অবাক হই।

অভ্যাস। বললেন ডাক্তার, তাই বলছিলাম, দাঁতটা তুলে ফেললেও পারতেন। দুষ্ট দাঁতের চেয়ে—

বাঁধানো দাঁত ভাল। আমি তাড়াতাড়ি স্লোগান পূরণ করলাম।

উনি খুব গম্ভীর স্বরে বললেন, আবার বড় আশা ছিল যে, আপনার দাঁতটা আমিই পাব। বলে তিনি হতাশার ভাব করে আবার স্ট্যাচু হয়ে গেলেন।

আমি সেই প্রস্তর-মূর্তিকে একটা কুণ্ঠিত নমস্কার এবং অস্ফুট 'আসি' বলে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। মনটা বিষাদে ভরে গেল। 'আমার বড় আশা ছিল যে, আপনার দাঁতটা আমিই পাব' এই হৃদয়বিদারক বাক্যটা কিছুতেই ভুলতে পারি না। উনি আমার বেয়াড়া দাঁতটাকে চেয়েছিলেন মাত্র। কী ক্ষতি ছিল দিয়ে দিলে? ভাইসব, আমি কাউকেই বড় একটা উপেক্ষা করতে পারি না। যখনই বাজারে যাই, আলুওলা-পটলওলা ডাকাডাকি করে, কেউ যদি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এক বার বলে 'বাবু নিয়ে যান' তো আমি গলে যাই। এ-রকম কোমলমতি ও কোমলহৃদয় বলে যে-ঢ্যাঁড়শ আমি জন্মে খাই না, তা-ও ঢ্যাঁড়শওলা আধ কেজি ব্যাগের মধ্যে গুঁজে দেয়। বাসায় ধূপকাঠির স্তূপ থাকতেও একটা খোঁড়া ধূপকাঠিওলা প্রায় দিনই আমাকে চিমসে গন্ধওলা সব কাঠি গছায়। ফুটপাথের দোকান থেকে ওই স্বভাবের দরুন কত অকেজো জিনিস কিনে এনেছি। তার মধ্যে লাল বেলুন, বাঁশি, লজেন্স, ঝুটো গয়না সবই আছে। এমনই চক্ষুলজ্জা আমার যে, যখন পাজি মুদি ওজন কমায় বা পুরনো খবরের কাগজ কিনতে এসে কাগজওলা যখন ওজন বাড়ায়, তখনও আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে পাখি বা প্রজাপতি দেখি। সেই আমার কোমল হৃদয় একজন ডেন্টিস্টের জন্য ব্যথিত হবে না কেন? কোনও দিন ভুলব না, তিনি আমার কাছে একটা মাত্র দাঁত চেয়েছিলেন।

দুপুরের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে একবুক শূন্যতা নিয়ে। এতই শূন্য যে তার বুক ঝাঁঝরা করে খোলা জানালা-দরজা দিয়ে রোদ, বাতাস এবং চড়াইপাখি আনাগোনা করছে। সে যেন যাওয়ার গাড়ি নয়। মনে হয় সে যেন আসবার গাড়ি। একটু আগেই সে এসে পৌঁছেছে, আর সব যাত্রী নেমে যাওয়ার পর সে দাঁড়িয়ে আছে, ধোলাই হতে যাবে বলে।

সন্দেহে আমি একজন কালো কোট-পরা লোককে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা, গাড়ি যাবে তো?

তিনি উদাস উত্তর দিলেন, রোজই তো যায়।

বুঝতে পারলাম, দার্জিলিং থেকে চলে যাওয়ার আর প্রায় কেউই নেই। আমিই বোধহয় শেষ ভ্রমণকারী, চলে যাচ্ছি। এমন ফাঁকা গাড়ি দেখে আমি খুব বেছে বেছে একটা কামরায় দেখলাম, বেঞ্চের গায়ে একটা হলুদ প্রজাপতি বসে আছে। সেইটেয় উঠলাম।

জানালা দিয়ে দেখি, কাঞ্চনজঙ্ঘা 'উঁকি' মেরে দেখে নিচ্ছে, আমি উঠেছি কি না। শেষ ভ্রমণকারী চলে যাচ্ছে, তার আর কোনও কাজ রইল না। একটা হালকা মেঘের রুমাল উড়িয়ে সে আমাকে বিদায় জানাল। গত কিছুদিন যাবৎ সে ভ্রমণকারীদের অনেক কসরত দেখিয়েছে। আর কেউ দেখার রইল না। তাই সে পায়ের কাছ থেকে একটা ধূসর মোটা মেঘের কম্বল টেনে নিয়ে গা ঢাকা দিল, শুধু নাকখানা জেগে রইল উঁচুতে। তারপর ঘুমোতে লাগল। এমনকী বাতাসিয়া লুপ পার হয়ে গাড়ি যখন চলেছে, তখন আমি স্পষ্ট পাহাড়টার নাকের ডাক শুনতে পেলাম।

এক ফাঁকা কামরায় বসে আমি অবাক হয়ে পাহাড়ের নাক-ডাকা শুনতে শুনতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলাম।

উঠে একটু এদিক-ওদিক ভাল করে দেখতে গিয়েই অবাক হই, একটা বেঞ্চের পিঠের আড়ালে কুঁকড়ে শুয়ে বাস্তবিক একটা লোক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। রোগা ছোট্ট মতো লোক, মুখটা একটা পুরনো গোল টুপি দিয়ে ঢাকা, পাতলুনের হাঁটুর কাছে পটি, আর নোংরা কোটের পকেট থেকে পিস্তলের নলের মতো একটা সিকিমি রাম-এর বোতলের মুখ বেরিয়ে আছে।

টুপিটা তুলে নিয়েই আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। লোকটা তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসল। মাথাটা এদিক-ওদিক ঝাঁকিয়ে ঘুম বা দুঃস্বপ্ন জলকণার মতো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল মাথা থেকে। জল থেকে উঠে আসা হাঁস যেমন ঝাড়ে।

তারপর একটা মাত্র দাঁত দেখিয়ে খুব হাসল সে। হাত তুলে চারটে আঙুল দেখিয়ে বলল, চারশ'ও দিব। আমি চেলু-উলু কোই নাই। ভুজাওলা-উজাওলা কোই কিসিকো সাথ আমার জান পহছান ছিল না।

আমি গম্ভীর ভাবটা বজায় রেখে বললাম, গাড়িতে উঠলে কখন? স্টেশনে তোমাকে দেখিনি তো!

লোকটা প্রশ্রয় পেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, স্টেশন থেকে না। ছোট ট্রেন তো আহিস্তা যায়। আমি রাস্তা থেকে টুক করে রানিং গাড়িতে উঠলাম, দেখলাম কী আপনি পাহাড়-উহার দেখছেন। তো ডিস্টার্ব না করে একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করে নিলাম।

খুবই সস্তা সিগারেট। এই ব্র্যান্ড আমি খাই না। তবু মায়াবশে আমি একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ডাকলাম, চেলু!

লোকটা একটু চমকে উঠল। তারপর ব্যথাতুর মুখে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, পবন সিং।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

সে খুব ব্যথিত হয়ে বলল, পাঁচশও। শালা ভুজাওলা আমার জরুকে নিয়ে—

আমি ধমক দিয়ে বললাম, না। তুমি ভুজাওলার বউকে নিয়ে—

সে খুবই তেতো মুখে বলে, হোবে। অ্যানেক দিনের কথা তো, ঠিক ইয়াদ হচ্ছে না। তো সেই জরুটা ভুজাওয়ালার ভি ছিল না।

তবে কার ছিল?

ঠেলাওয়ালা রামরিখের। কিন্তু—বলে লোকটা টুপি তুলে মাথা চুলকে বলে, কিন্তু রামরিখের ভি জরু ও ছিল না। ছাতুওয়ালা রঘুবীর তাকে দেশ থেকে ফুসলিয়ে এনেছিল। কিঁউ কী, দেশে ওই জরুটার দুসরা আদমি ছিল। কিন্তু সে আদমিটার আগেও অন্য কেউ ছিল। ঠিক বুঝা মুশকিল বেপারটা।

তবে জরুটা ছিল কার? আমি ফের জুনিয়ার উকিলটার জেগে ওঠা টের পাই।

লোকটা উদাসভাবে বলে, কৌন জানে! ছাতুওয়ালা রঘুবীর তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসে। রঘুবীরকে কুছ পয়সা-উইসা দিয়ে জরুটাকে রামরিখ নিয়ে নিল। তো রামরিখকে একদিন তাড়ির সঙ্গে জরী পিইয়ে দিল ভুজাওয়ালা, রামরিখ মিটিয়া কলেজে মরে গেল, আর জরুটাকে নিয়ে ভাগল ভুজাওয়ালা। তারপর—বলে খুব অস্বস্তির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে থাকে চেলু।

আমি আগ্রহী হয়ে বলি, দারুণ মেয়ে তো! তো সেই মেয়েটা এখন কোথায়?

উত্তর না-দিয়ে চেলু তার কোটের বোতাম খুলে, শার্ট খুলে বুকটা আদুড় করে ফেলছিল। আমি ভাবলাম, লোকটা বুঝি বুকের হৃৎপিণ্ডের জায়গাটা দেখিয়ে খুব রোমান্টিক গলায় বলবে, এইখানে।

আশ্চর্য এই যে, লোকটা সত্যিই তার বুকের হৃৎপিণ্ডের কাছে জায়গাটা দেখিয়ে বলল, এইখানে।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, দেখুন, আলোতে ভাল করে দেখুন। বলে সে জানালার দিকে ঘুরে বসে বুকটা দেখাল। দেখি হৃৎপিণ্ডের ওপর দিকটায় মস্ত একটা কাটা দাগ। দাগটা দড়ির মতো ফুলে তেলতেলে হয়ে আছে।

চেলু বুকের বোতাম আঁটতে আঁটতে বলল, ফুনসেলিং-এর তেলওয়ালা শালা চাক্কু মেরে জরুটাকে নিয়ে ভাগল। আমি এক বরিষ হাসপাতালে ছিলাম।

তা হলে সেই তেলওলার সঙ্গেই এখন—

চেলু মাথা নেড়ে বলে, না, না। তেলওয়ালা এখন মাদারিহাটে কাজ-কারবার করে, আমাকে কিছু টাকা-উকা দিয়ে মিটমাট করে নিয়েছে। জরুটা তার কাছেও নাই।

মাথা গরম হয়ে গেল। বললাম, তবে?

লোকটা রাম-এর বোতলের মুখটা শক্ত হাতে চেপে ধরে বলে, কৌন জানে! তেলওয়ালার কাছ থেকে এক গাড়িওয়ালা নিয়ে ভাগে।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, গাড়িওয়ালার কাছেও নিশ্চয়ই নেই!

লোকটা খুব গম্ভীরভাবে বলে, সে বাত ঠিক। গাড়িওয়ালার লাশ দুই মাহিনা পরে গুলমা স্টেশনে পাওয়া যায়। তো বাবু, আমি পাঁচশো রুপিয়া দিব, মিটমাট করে নিন। আমি চে.. উলু কোই নাই। লোকে পুছলে বলবেন কি আমি পবন সিং।

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, তুমিই চেলু।

চোখের পলকে লোকটার আরও এক বছর বয়স বেড়ে গেল। মুখের চামড়া আর-একটু কুঁচকে যায়, চোখ আরও ঘোলা, পিঠটা একটু কুঁজো। লোকটা রাম-এর বোতল তুলে হড়হড় করে মুখে ঢালল। কিন্তু সেটা না-গিলে কলকল করে কুলকুচো করতে লাগল। খুবই ব্যথিত মুখ।

কুলকুচো শেষ করে সে রামটা গিলে ফেলল এবং মুখ থেকে ফুড়ুক করে কুলের বিচির মতো একমাত্র দাঁতটাকে ছুড়ে ফেলে দিল বাইরে। তারপর যখন ঢেকুর তুলল লোকটা, তখন দেখি তার মুখটা সম্পূর্ণ ফোকলা।

সে গম্ভীর মুখে বলল, ছ'শও।

দাঁতের প্রতি এমন উদাসীনতা আমি কদাচিৎ কারও দেখেছি। মেজদা আমার মাড়ির হাড়-মাংস চিবিয়ে খাচ্ছে, তবু মায়াবশে আমি তাকে তুলিনি। দার্জিলিঙে এক ডেন্টিস্টকে বিষণ্ণ ও হতাশার অন্ধকারে রেখে এসেছি। এখনও বাক্যটা ভুলতে পারি না 'আমার বড় আশা ছিল যে, আপনার দাঁতটা আমিই পাব'। আমার পুরো বত্রিশটা থেকে তাঁকে একটাও দিয়ে আসতে পারিনি। রবি ঠাকুরের কবিতায় পড়েছিলাম, এক কৃপণ রাজা-ভিখারিকে ঝুলি থেকে একটামাত্র কণা ভিক্ষে দিয়েছিল। তা সেই কণা সোনার কণা হয়ে ফিরে এসেছিল। ডেন্টিস্টও তো বলেইছিলেন, আমার দেওয়া দাঁতও তিনি ফিরিয়ে দেবেন সোনারুপো বা প্লাস্টিকে বাঁধিয়ে। আমি দিতে পারিনি। আর এই লোকটা, যার দাঁতের বংশে বাতি দিতে একটিমাত্র অবশিষ্ট ছিল, সেটাও কত অনায়াসে ভ্রূক্ষেপই না করে কুলের বিচির মতো ফুড়ুক করে ফেলে দিল।

এই প্রথম আমি চেলুর প্রতি একটু শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়ি। মুহূর্তের মধ্যে আরও এক বছর বয়স বেড়ে যাওয়াতে লোকটা আর-একটু জড়সড় হয়ে বসে। বসে মিটমিট করে আমার দিকে চেয়ে বলে, ছশ'ও বাবুজি?

আমি চিন্তিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে বললাম, গাড়িওলা খুন হওয়ার পর কী হয়েছিল?

লোকটা ফের ফোকলা হাসি হেসে বলে, শুনতে চান? গাড়িওয়ালার এক চাচাতো ভাই ছিল, কাপড়াওয়ালা। কলকাতার বড়বাজারে বহুত বড়া দোকান। তো সেই ভাই—

বুঝলাম। আমি শ্বাস ফেলে বলি, তারপর সেই কাপড়ওলা—

সে মাথা নেড়ে বলে, আর জানি না, তবে আন্দাজ হয় কি কাপড়াওয়ালার ভি চৌপট হয়ে গেছে।

আমি মাথা নাড়লাম। তারপর তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, সেই মেয়েটা দেখতে কীরকম ছিল চেলু?

লোকটা আতঙ্কে ফের বয়স বাড়িয়ে ফেলল। ব্যথিত হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, ছশ'ও। আমি চেলু-উলু কোই নাই। পবন সিং।

আমি কঠিন গলায় বলি, সেই মেয়েটা কেমন ছিল?

লোকটা টুপি তুলে মাথা চুলকে বলে, ভাল ছিল। তবে 'মোস্ট বিউটিফুল' যে-রকম হয় সে-রকম না। অর্ডিনারি ভাল ছিল। পাতলি-উতলি, গোরা-উরা, আর নাক-টাক, চোখ-টোখ সব ভাল। কিন্তু 'মোস্ট বিউটিফুল' না।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, খুব সুন্দর নয় তো তোমরা সবাই পাগল হলে কেন?

চেলু খুব মর্মাহত হয়ে বলে, কিন্তু বহুত পিয়ার জানত লায়লী। যখন যার কাছে থাকত এয়সন প্যার করত যে, তার মরদের গায়ে বাতাস ভি জোরে লাগত না। লায়লীর মতো কে ভালবাসবে?

খুব ভাল খানা পাকাত, বহুত আচ্ছা করে ঘর সাজাত, মরদকে খুশ রাখবার জন্য তার জান কবুল ছিল। ওই দেখলে পুরুষেরা ঠিক থাকতে পারত না। আউরাত তো বহুত পাওয়া যায়, কিন্তু পিয়ার?

আমি গাম্ভীর্য না হারিয়ে বললাম, তো এখন যদি লায়লীর সঙ্গে দেখা হয় তো কী করবে? খুন করবে না?

খুন? বাপরে! বলে চেলু চোখ বড় করে আতঙ্কিত চোখে তাকায়। বলে, খুন কী? এখন তো বুড়ো হয়ে গেছি, তবু ফিন দেখা হলে একদম পায়ের ওপর গিরে গিয়ে বলব, লায়লী, একদফে ঐসন পিয়ার করো মেরে জান। দুনিয়াতে আর কেউ কভি ওইসব পিয়ার করেনি, তোমার মতো। একদফে ফিন করো, আর ওই পিয়ারের রোশনি থাকতে থাকতে আমার চোখের রোশনি খতম হয়ে যাক।

খুন করবে না? অবাক হয়ে বলি।

খুন! খুন আমি কখনও করি না। বলে চেলু চোখের জল মুছে বলল, আপনার সঙ্গে লায়লীর দেখা হবে একদিন। তখন দেখবেন যে লায়লীকে কেউ খুন করতে পারে না। তার হাত কাঠের মতো হয়ে যাবে।

এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলল যে আমার বুকটা ধক করে ওঠে। একটু ভয়ে ভয়ে বলি, না না। লায়লীর সঙ্গে আমার দেখা হবে কী করে?

লোকটা গম্ভীরভাবে বলে, হবে, জরুর হবে। দুনিয়ার সব পুরুষ মানুষের সঙ্গে লায়লীর এক বার করে দেখা হবে।

আমি চমকে উঠে বলি, সে কী?

চেলু মাথা নেড়ে বলে, জরুর হবে। লায়লী আমাকে বলেছিল, হাত-ফেরতা হয়ে হয়ে সে হর-মানুষের কাছে একবার করে যাবে। কিন্তু থাকবে না। কেবল ঘুরবে আর ঘুরবে। ছাতুওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ভুজাওয়ালা, পকেটমারওয়ালা—

আঙুলের কড়ে গুনে হিসেব করতে করতে শেষ শব্দটায় এক বার থেমে আমার দিকে তাকাল চেলু। আমি কিছু বললাম না।

চেলু কিছুক্ষণ গুনে খেই হারিয়ে বলল, আপনার কাছে ভি আসবে। ইনতেজার করুন। আসবেই।

মাঝখানে গাড়ি তিনবার থেমেছিল। কেউ ওঠেনি, কেউ নামেওনি। এখন কার্শিয়াঙের কাছাকাছি চলে এল কি রেলগাড়ি? কিছুতেই বুঝতে পারি না। হঠাৎ চার দিকে এক ভুতুড়ে কুয়াশা উঠে এল কোথা থেকে? এক ধারে গভীর খাদ, অন্য ধারে উঁচু পাহাড়, কিছুই দেখা যায় না। কেবল এক ভেজা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার চার দিকে। আলো মরে গেল। কেবল এক শূন্যের রেল লাইনের ওপর দিয়ে ছোট্ট খেলনা গাড়ি দুলে দুলে কোথায় চলেছে।

গাড়িটা তার ধুকপুক চলার শব্দ দিয়ে বলে, কোথাও না, কোথাও না।

আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। হঠাৎ অনুভব করি, হলুদ প্রজাপতিটা এতক্ষণ পর হঠাৎ উড়াল দিল। অনায়াসে গাড়ির বাইরে চলে গেল, আবার চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে ঢুকে এল ভিতরে। আমার মাথার চারদিকে ফিনফিনে পাখনায় উড়ে বেড়াল খানিক। তারপর আমার মাথায় মৃদু একটু স্পর্শ করে ঝুপ করে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে রইল। গভীরভাবে টের পেতে থাকি, লায়লী এতদিনে ভারতবর্ষের সীমানা ছেড়ে বহু দূর সব শহর-বন্দরে পুরুষের বুকে বুকে ঘুরে ঘুরে এবার তার ফিরে-যাত্রা শুরু করেছে। তার যৌবন যায় না, বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় না, পুরুষের বুকে অনন্ত পিপাসা ও চির অতৃপ্তি জাগিয়ে দিয়ে সে কেবলই চলে।

গাড়ি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কোন শূন্যপথে? কোন অচেনার কাছে? কে সেই চিরযুবতী অপেক্ষা করছে সেইখানে, যেখানে স্টেশনের নামের ফলকে লেখা আছে,'কোথাও না!'

আমি সেই তীব্র মানসিক বিভ্রমে দু' হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠি, চেলু!

চেলু একটা আর্ত চিৎকার দিয়ে দু' হাতে আমাকে আঁকড়ে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, সাত

শ'ও বাবু, সাত শ'ও। অ্যাঁ বাবু? সাত শও? অ্যাঁ! আমি চেলু-উলু কোই নাই। অ্যাঁ! সাত শ'ও? বলতে বলতে চেলু আমাকে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। মুখের লালা, চোখের জল গঙ্গা-যমুনার মতো মিশে যায় তার বুড়ো থুতনির খাঁজে। সে কেবল বলে, সাত শ'ও! সাত শ'ও!

গাড়ি এসে কার্শিয়াঙে থামে।

৭

শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের বাইরে বাগানের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক ভাঁড় চা হাতে উত্তর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার গাড়ি কিছু লেটে আসবে। যদি বেশি লেট হয় তো পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে। যাক, আমার কোনও তাড়া নেই। আমি উত্তর দিকে চেয়ে সেই শৈশবের দার্জিলিং পাহাড় দেখবার চেষ্টা করি।

কিন্তু দেখার জো কী? শিলিগুড়ির অসংখ্য রিকশা চারধারে ঘুরে ঘুরে অবিরল প্যাঁ প্যাঁ করে যাচ্ছে, তার ওপরে অদূরে খোলা ওয়েটিং রুমের পিঁজরাপোল থেকে চ্যাঁ-ভ্যাঁ শব্দ। মিলিটারির গাড়ি এসে থামছে, চলে যাচ্ছে। অনবরত শান্টিংয়ের শব্দ, আর ইঞ্জিনের ভোঁ। তার ওপর বড্ড বেশি আলোয় আলোয় ছয়লাপ হয়ে আছে জায়গাটা। এত আলোতে দাঁড়ালে কিছুই ভাল দেখা যায় না। সামনে কয়েকটা বড় বড় গাছও আড়াল করেছে।

বাবা যখন আমাকে দার্জিলিং পাহাড় দেখিয়েছিলেন তখন শিলিগুড়ি ছিল ছোট্ট একটা নির্জন জায়গা। চার দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতির মধ্যে একমুঠো মানুষের বসত। সেই শিলিগুড়ি তো এ নয়। আমি চায়ের ভাঁড় হাতে অনেকটা পুবদিকে সরে গিয়ে পরিষ্কার দার্জিলিং পাহাড় দেখতে পেলাম। ওই বাঁকা বিছের মতো তিনধারিয়ার আলো, ডাউ হিলের ডগায় দীপাবলী। কিন্তু এ মালটা সাচ্চা নয়। কিছুতেই ঠিক সেইরকম দেখতে পাই না। বারবার চেষ্টা করি। কেমন যেন মনে হয় ওই বিছে-হারের মতো তিনধারিয়ার আলো—ওই গয়নাটা বহুকাল আগে খাঁটি সোনার ছিল। ওটার বদলে কে যেন গিল্টি করা নকল জিনিস বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই পাহাড়টাকেও কে কবে লোপাট করে বিদেশি টুরিস্টদের কাছে দুর্লভ প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর দরে বেচে দিয়েছে গোপনে, তার বদলে এখন একটা ফ্যান্সি পাহাড় দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

না, নেই। সেই পুরনো দিনের দার্জিলিং পাহাড়টা নেই। হতাশ হয়ে নিজের মালপত্রের কাছে ফিরে আসি। সেখানে চেলু বসে পাহারা দিচ্ছে।

আমাকে দেখে সে বুড়িয়ে যাওয়া মুখে হাসল। একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, কিন্তু অর্ধেক খেতে না খেতেই দন্তহীন মুখের অজস্র লালায় সেটা ভিজে ফেটে তামাক বেরিয়ে পড়েছে। দুঃখিত চিত্তে চেলু সেটা ফেলে দিল।

হঠাৎ নড়েচড়ে বসে চেলু বলল, বাবু, আমাকে নোকর রাখবেন?

নোকর? বলে অবাক হই।

চেলু খুব হাসে, নোকর। বুড়া বয়সে যাব কোথায়?

তোমার জরু? বালবাচ্চা?

চেলু হাত উলটে বলে, কোই নেই। দুইবার বিয়া করলাম। তো কারু সঙ্গে বেশি দিন বনে না। আমার দুই নম্বর জরুটা পরশু রোজ ভেগে গেছে।

আমি অবিশ্বাসভরে তার দিকে চেয়ে আছি দেখে সে ফের মাথা নেড়ে বলে, সাচ বাত।

কার সঙ্গে ভাগল, কোথায় গেল, খোঁজ নাওনি?

ফয়দা কী? বলে হাই তোলে চেলু। অলস গলায় বলে, কত লোক আছে দুনিয়ায়, যাওয়ার ভি

কত জায়গা আছে। কারও সঙ্গে কোথাও ভেগে গেছে। তো আমার এখন কেউ নাই, আমাকে নোকর রাখবেন? চোরি-উরি করব না।

আমি চিন্তিতভাবে বলি, ভেবে দেখি।

চেলু একটু অন্যমনস্কভাবে গুনগুন করে গাইতে লাগল, মাহনে চাকর রাখো জি। তারপর হাই তুলে বলে, বহুত নিদ লাগছে। তো আমি এখানে শুয়ে থাকি বাবু, আপনি তো কয়দিন পরে এহি লাইনে কলকাত্তা যাবেন, তখন আমাকে এ জায়গা থেকে ডেকে নিবেন। অ্যাঁ বাবু?

এই বলে চেলু তার কোটটা মাটিতে বিছানার মতো বিছিয়ে পাতল, মাথার টুপিটা দিয়ে বালিশ বানিয়ে শুয়ে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফোকলা মুখে সামান্য হেসে বলল, বেশি দিন আর বাঁচব না। যে ক'দিন আছি থাকতে দিন, পুলিশ-উলিশে খবর দিবেন না। বলে মাথা চুলকে সমর্থনের আশায় চেয়ে রইল।

তুমি ভুজাওলাকে ছুরি মেরেছিলে কেন?

চেলু সটান উঠে বসে সামান্য উত্তেজিত হয়ে বলে, শালা বহুত হারামি ছিল। লায়লী তো ভুজাওয়ালার আউরৎ ছিল না। লায়লী কারও আউরাৎ না। যৌন্ উকে নিবে লায়লী উসিকো হবে। না ভুজাওয়ালার, না ঠেলাওয়ালার, না আর কিসিকো। তো ভুজাওয়ালা লায়লীকে ছাড়তে চায়নি। উসি লিয়ে—

আমি বুঝলাম। গা একটু শিউরে উঠল।

চেলু আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, একটু ভেবে দেখুন। একজন যদি লায়লীকে বেশি রোজ আটকে রাখে তো লায়লী কেমন করে দুনিয়ার সব মরদের কাছে যাবে? সবাই তো লায়লীর ইনতেজার করছে, টাইম তো কারও বেশি নেই।

এই বলে চেলু শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে পড়বার আগে একখানা হাত তুলে বলল, ডেকে নিবেন কিন্তু।

আমি যদি অনেক দিন পরে ফিরি?

ঘুমন্ত গলায় চেলু বলে, আমাকে এইখানে পেয়ে যাবেন। সব সময়।

শিলিগুড়ি জংশনের খোলামেলা ওয়েটিং হলঘরের ভিখিরিদের কাঁথা-কানি, গরিব যাত্রীদের পোঁটলা-পুঁটলির মধ্যে, আর গাড়ির শব্দ, আর বাচ্চাদের চিল-চেঁচানি গোলমালে খুব নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পড়ল চেলু। তাকে এখানে এভাবে রেখে আমি রাতের গাড়ি ধরলাম।

ভাই রেলগাড়ি, আমি কোথায় চলেছি?

রেলগাড়ি তার চলার শব্দ দিয়ে বলে, কোথাও না, কোথাও না।

ঠিক কথা বন্ধুগণ। কোথাও না। মশাইরা, এই কামরায় কোনও আলো নেই। ছিল কোনও দিন, চুরি হয়ে গেছে। অন্ধকারে পাখা ঘুরবারও কোনও শব্দ পাচ্ছি না। তার মানে, পাখাও নেই। ভ্যাপসা গরম। সহযাত্রীদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। গায়ে গায়ে ভিড় গন্ধ, শরীরের তাপ সবই টের পাচ্ছি। মাঝে মাঝে কেবল দেশলাই জ্বলে ওঠে। বিড়ি বা সিগারেটের আগুন কখনও ফুসফুসের ভোল্টেজ বেশি পেয়ে তেজি হচ্ছে, ভোল্টেজ কম পেয়ে মন্দা। সে আগুনে শুধু দু'-একটা মুখের আভাসমাত্র দেখা যায়। ভাইসব, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মুখ আমার দেখা হয়নি। কত মুখ দেখা বাকি রয়ে গেছে। কথার শব্দ আসে, কে কাকে যেন ডাকে, শ্বাস ওঠে-পড়ে, অন্ধকারে সবই টের পাই। জানালায় জানালায় অন্ধকার টাঙিয়ে দিচ্ছে কে, চোখে চোখে ঘুমের মলম। আমি আমার মজবুত সুটকেসটার ওপর বসে দেয়ালের কাঁধে পিঠ দিয়ে ঢুলছি। এটা বাথরুম যাওয়ার পথ, তাই যাতায়াতের পথে বারবার লোকের পা হোঁচট খাচ্ছে আমার গায়ে। উগ্র বিড়ির গন্ধে নাক জ্বালা করে। বাথরুমের দরজা খোলা হলেই অ্যামোনিয়ার গন্ধ এসে ঘুঁষি মারে। কিছু করার নেই বন্ধুগণ,

রেলগাড়ি আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। তার চাকায় চাকায় বৈরাগ্যের শব্দ বাজে, কোথাও না, কোথাও না। ভাই রেলগাড়ি, তবে আমি যাচ্ছি কেন?

খুব কাছ থেকেই কে যেন ডাকল, নগেনবাবু!

আমি ঢুলতে ঢুলতে উত্তর দিলাম, হুঁ।

আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন!

নিশ্চয়ই। এই যে—বলে আমি দেশলাইটা এগিয়ে দিলাম।

বন্ধুগণ, আমি জানি যে আমি নগেনবাবু নই। তবু কী যায়-আসে! অন্ধকারে কে নগেনবাবু, কে ইন্দ্রজিৎ তার চুলচেরা বিচারের কোনও অর্থ নেই। এই বিশাল বিশ্বের মুক্তির মধ্যে, অচেনা পরিবেশে, অন্ধকারে নগেনবাবু হয়ে যেতে আমার কোনও আপত্তির কারণ দেখি না।

কিছুক্ষণ বাদে আমিও অন্ধকারে খুব আন্তরিকভাবে ডাকলাম, নগেনবাবু!

জানি বন্ধুগণ, কেউ না কেউ সাড়া দেবেই।

হুঁ। খুব কাছ থেকেই উত্তর এল।

বিনীতভাবে বললাম, আমার জলের বোতলটা খুব ছোট, শিলিগুড়িতে ভরেছিলাম, ফুরিয়ে গেছে। আপনারটা একটু দেবেন?

নিশ্চয়ই। এই যে—

অচেনা এক নগেনবাবু তার জলের বোতল এগিয়ে দেয়।

বাঁ পাশে কে যেন খইনি ডলা শেষ করে একটা চাপড় মারে। খইনির গুঁড়ো এসে চোখে পড়ে। চোখ ডলতে ডলতে তাকে বলি, আরে এ নগেন, ক্যা করতা হ্যায়?

সে লোকটা সংকুচিত হয়ে সরে বসে।

বন্ধুগণ, আমাদের মধ্যে কে যে প্রকৃত নগেনবাবু, তা বুঝে ওঠা খুবই মুশকিল। প্রকৃত নগেনবাবু কেউ থাকলেও তিনিও সমস্যায় পড়বেন। ভাববেন, আমিই কি নগেনবাবু? না কি আমি নগেনবাবু নই! সে যাই হোক বন্ধুগণ, মানুষ যদি পরস্পরকে নগেনবাবু বলে ডাকতে শেখে তো পৃথিবীতে একটা প্রাথমিক শ্রেণী-চেতনার লোপ হতে পারে। যেমন এই অন্ধকার কামরায় বসে আমারও মনে হচ্ছে, পৃথিবীর কোটি কোটি নগেনের মধ্যে আমিও একজন। এক নগেন মরে গেলেও পৃথিবীতে নগেন থেকে যায়। এক নগেনকে সুপ্তি প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত আর-এক নগেনই তাকে পেয়ে যাবে। নিজেকে সেই নগেন ভেবে সুখে আমি শিউরে উঠলাম।

বন্ধুগণ, এই নগেন কথাটা থেকেই কি নগণ্য কথাটার উৎপত্তি? এই যে আমরা নগণ্য কিছু মানুষ পরস্পরকে নগেন বলে ডাকছি এবং ডাকে সাড়া দিচ্ছি, তার দ্বারা কী প্রমাণ হয়? আপনারা একটু ভেবে দেখবেন। আমরা যারা নগণ্য জনগণের মধ্যে পড়ি তাদের 'জনগণ' না বলে 'জনগেন' বললে কেমন হয়?

যিনি দেশলাই চেয়েছিলেন সেই নগেনবাবু বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যিনি জলের বোতল দিয়েছিলেন সেই নগেনবাবু খুব আলাপী, সহৃদয়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন নগেনবাবু?

অন্যমনস্কভাবে বললাম, কোথাও না নগেনবাবু।

তিনি অবাক হয়ে বললেন, তবে যাচ্ছেন যে!

আমি শ্বাস ফেলে বললাম, যাচ্ছি বটে। কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় না।

কেন, সেখানে বন্যা নাকি? বন্যা যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন সব জায়গায় যেতে পারবেন।

আমি গম্ভীরভাবে বলি, না নগেনবাবু। আমি কোনও বিশেষ জায়গায় যাওয়ার জন্য বেরোইনি। আমি বিশেষ একটা অবস্থায় ফিরে যেতে চাইছি।

কী সেটা? নগেনবাবু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন।

শৈশব। আমি বলি।

এ-কথা শুনে অন্য যে-কোনও নগেন ঘাবড়ে যেত, কিন্তু এ নগেনবাবু একদম ঘাবড়ান না। অন্ধকারে একটু হেসে বললেন, বুঝলেন মশাই নগেনবাবু ভারতীয়দের একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। তারা সবাই বর্‌ন্ ফিলজফার। আমাদের দেশের ভিখিরিও কথায় কথায় এমন চমৎকার দার্শনিক কথা বলে যে, অবাক হতে হয়। শৈশবে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারটা কি একটা ফিলজফি নয় নগেনবাবু?

আমি একটু লজ্জিত হয়ে বলি, না, ঠিক তা নয় নগেনবাবু। কথাটা একটু দার্শনিক হয়ে গেল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। আমি আমার শৈশবের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। তিন চার বা পাঁচ বছর পরে পরে আমার শৈশবের জায়গাগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়ি। অবশ্য সব জায়গায় যাওয়া হয় না, অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে থেকেছিলাম তো!

ঘুরে ঘুরে কী খুঁজে বেড়ান নগেনবাবু? উনি আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করেন।

আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বলি, সেই ছেলেবেলার অনুভূতিগুলি খুঁজি। তখন পৃথিবীটা যেমন ভাল লাগত এখন কেন তেমন লাগে না, তাই খুঁজে বেড়াই।

আপনি কি খুব দুঃখী লোক নগেনবাবু?

খুব। আমি এক বার একটা কোকিলের ডাক শুনেছিলাম। সেই রকম ডাকতে কোনও কোকিল আর পারল না।

উনি একটা শ্বাস ফেলে বললেন, কথাটা মিথ্যে নয়। ছেলেবেলায় মায়ের হাতে ইলিশ মাছের ঝোল খেতাম, বেগুন আর সরষেবাটা দিয়ে রান্না। তেমন আর খেলাম কই? আমার বউ হুবহু সেইরকম করেই রাঁধে, সেই সরষেবাটা আর বেগুন দিয়েই, কিন্তু সে-স্বাদ আর হয় না। ছেলেবেলাটা বেশ ছিল।

আজ্ঞে। আমি বললাম।

কিছুক্ষণ কথা হয় না। তিনি ইলিশ মাছ এবং আমি কোকিলের কথা ভেবেই বুঝি একটু আনমনা থাকি। আর ঠিক সেই সময়ে বাঙ্কের ওপর থেকে অন্ধকারে একটা চিকন সুন্দর মেয়ের গলা ডাক দেয়, বাবা!

'বাবা' ডাকটাই বিশ্বজনীন। অনেকটা 'নগেনে'র মতোই। তাই দু'-তিনজন উত্তর দেয়, কী বলছিস?

মেয়েটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে থেকে আবার সতর্ক এবং চাপা গলায় ডাকে, বাবা!

এবার আমার সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন তিনি বলেন, অত জোরে চেঁচিয়ে বাবা বলে ডাকতে আছে? অন্ধকারে কে কার বাবা বুঝবে কী করে?

মেয়েটি যুবতীই হবে, সুন্দরীও হওয়া সম্ভব, একটু রাগ করে বলে, তুমি কোথায় কী করে বুঝব! চারদিকে সবাই কথা বলছে যে।

নগেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, ডাকছিস কেন?

আমি নামব। মেয়েটি বলে। কী সুন্দর গলা! নিশ্চয়ই গান গায়।

কেন? নগেনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

বাথরুমে যাব।

নগেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, যাবি কোথা দিয়ে, সব লোক রাস্তা আটকে বসে আছে! অন্ধকার তার ওপর। বাথরুমেও বোধকরি কিছু লোক পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে বসে আছে। চেপে বসে থাক।

মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, মা বলছে মাও যাবে।

ওঃ। বলে নগেনবাবু একটু কী ভেবে নিয়ে বলেন, নাম তা হলে, টর্চটা চ্যাঙাড়ি থেকে বের কর, অন্ধকারে কার ঘাড়ে পা দিবি।

চ্যাঙাড়ি নীচের বেঞ্চের তলায়, বরং দেশলাইটা জ্বালো। মেয়েটা বলে।

নগেনবাবু আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, নগেনবাবু, আপনার দেশলাইটা একটু দেবেন?

নিশ্চয়ই। এই যে—বলে দেশলাই এগিয়ে দিয়ে চোখ পেতে থাকি।

মেয়েটা নামছে। নগেনবাবু দেশলাই জ্বালালেন। জংলা শাড়ি-পরা দীঘল একটি মেয়ে সেই দেশলাইয়ের তুচ্ছ আলোটুকু শত গুণ বাড়িয়ে নেমে এল। কৈশোর সদ্য পার হয়েছে, বসন্ত সমাগমে বৃক্ষের মতো তার দেহে পত্র-পুষ্পের সমারোহ। চোখে কাজল দিয়েছিল বুঝি, লেপটে গেছে, আর তাতে চোখ দু'খানা আরও গভীর ও রহস্যময় দেখাচ্ছে। আমি অপলক চোখে চেয়ে রইলাম। আমাকে বিদ্যুৎস্পর্শের মতো চমকে দিয়ে মেয়েটি আমার গায়েই হোঁচট খেল। আর সেই দৃশ্য দেখে লজ্জায় মাথা নুইয়ে নিভে গেল নগেনবাবুর হাতের দেশলাই কাঠিটি।

এমন মনোরম অন্ধকার কদাচিৎ এসেছে আমার জীবনে। মেয়েটির আঁচল আমার মুখময় হয়ে গেল। তার একটি হাত টাল সামলাতে ভর দিল আমারই মাথায়। তার শরীর থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ উঠে আমাকে কোণঠাসা করে ধরে রইল।

একটি মুহূর্ত মাত্র। নগেনবাবু ফের দেশলাই জ্বাললেন। অন্ধকার হরিণের মতো ছুটে পালায়। এই যতটুকু দেখা গেল আলো-আঁধারিতে, তার বেশি দেখতে আমার ভয় করে। যদি ফের কোনও খুঁত নজরে পড়ে যায়? থাক, আমি আর দেখতে চাই না।

বন্ধুগণ, এ-কথা ঠিকই যে আমি মেয়েদের আলো-আঁধারিতে দেখতেই ভালবাসি, স্পষ্ট আলোয়, মুখোমুখি মেয়েদের দেখতে নেই। পৃথিবীর সব মানুষই সুন্দর সুন্দর বলে পাগল হয়। আমারও ছেলেবেলা থেকে সেই পাগলামি। আমাদের এক অধ্যাপক ছিলেন, এ-টি-এম। তাকে আমরা সংক্ষেপে অ্যাটম বলে উল্লেখ করতাম। তিনি এক বার আমাকে বলেছিলেন, ইন্দ্রজিৎ, একটা বেড়ালের চোখে সুন্দর মেয়ে বা কুচ্ছিত মেয়ের কী তফাত বলো তো? তোমরা যে সবাই সুন্দরের জন্য পাগল হও, সেটা কোনও কাজের কথা নয়। একটা বেড়ালের চোখ দিয়ে মেয়েদের দেখবার চেষ্টা কোরো। মোহ কেটে যাবে। তার কথা শুনে আমি সেই চেষ্টা কিছুদিন করেও ছিলাম। এমনকী নিজেকে বেড়াল ভাবতে ভাবতে আমার কিছু বদ-অভ্যাসও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে যাক। একটা বেড়াল কী চোখে মেয়েদের দেখে সে-রহস্য আমার আজও জানা হয়নি। নমস্য অ্যাটম কিন্তু বেড়ালের চোখ দিয়েই মেয়েদের দেখতেন, আজীবন বিয়ে করেননি। মেয়েদের প্রতি কোনও দুর্বলতা দেখাননি, মেয়েরাও দেখায়নি তাঁর প্রতি।

সেভক স্টেশন পার হয়ে গেল। তিস্তা ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ি পার হল আস্তে আস্তে। বুকের মধ্যে উথলে ওঠে ঢেউ। বহু-বহু কাল আগে ওই দূরের তিস্তার ওপর করোনেশন ব্রিজ দিয়ে আমি একটা মিলিটারি জিপে শিলিগুড়ি এসে দার্জিলিং পাহাড় দেখেছিলাম। কিছুতেই সেখানে আর যাওয়া হল না।

ভাই রেলগাড়ি, আমি কোথায় যাচ্ছি?

রেলগাড়ি বলে, কোথাও না, কোথাও না।

আপনার দেশলাইটা! নগেনবাবু বললেন।

থাক না নগেনবাবু, আপনার কাছেই থাক। আমি উদারভাবে বলি।

না নগেনবাবু, আমার টর্চ আছে। দেশলাইয়ের দরকার নেই। উনি বললেন।

তখন বাঙ্কের ওপর থেকে এক বয়স্কা মহিলার গলা বলে, থাক না, দেশলাইটা রেখেই দাও বরং। টর্চ তো চ্যাঙাড়ির ভেতরে। আবার কখন আলোর দরকার হয়। দেশলাইটা রেখে দাও।

নগেনবাবু ভীষণ ভদ্রতা করে বললেন, না না, তা হয় না। পরের দেশলাই, আপনি নিন নগেনবাবু।

আমি অনিচ্ছার সঙ্গে বলি, থাক না।

না, না। উনি লজ্জার সঙ্গে বলেন।

তখন ওপরের সেই বয়স্কা মহিলা বলেন, রুমি, তোর বাবা না নিক, তুই ভদ্রলোকের কাছ থেকে দেশলাইটা চেয়ে নে তো। এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, বাবলুটা কীরকম এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে, একটু হলেই ওর হাতের ওপরে বসে পড়েছিলাম।

তখন অন্ধকারেই রুমি ডেকে বলে, শুনছেন, আপনার দেশলাইটা আমাদের দিন।

নগেনবাবুর হাত থেকে আমি খপ করে দেশলাইটা নিয়ে নিই। অন্ধকারে আর-একটা হাত এগিয়ে আসে।

শূন্য হাতড়ে রুমি বলে, কোথায়?

আমিও হাতটা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে বলি, এই যে।

কেউ কারও হাত ছুঁতে পারছি না। কয়েক মুহূর্ত। তারপরই হাতটাকে আর সরতে না দিয়ে আমি আবছা হাতটাকে চেপে ধরি। দু'টি করতল এক হয়ে যায়। মাঝখানে দেশলাই। মনে মনে বলতে থাকি, যদিদং হৃদয়ং তব—

মেয়েটা চাপা গলায় বলে, ছেড়ে দিন।

ধরেছেন তো দেশলাইটা? সতর্ক গলায় বলি।

হ্যাঁ। তেমনি পাখির গলায় মেয়েটি বলে।

ছাড়লাম। বলে ছেড়ে দিয়ে সুটকেসে বসে পড়ি।

সহানুভূতির সঙ্গে মেয়েটি এক বার বলল, আপনার আর দেশলাই আছে তো?

আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, অনেক, অনেক।

নগেনবাবু অন্ধকারেই দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করেন, আমি বসার পর আরও খানিকটা সময় ছাড় দিয়ে বললেন, আপনি কোথায় চাকরি করেন?

ব্যাঙ্কে। খুব উৎসাহের সঙ্গে বলি। মধ্যবিত্ত পরিবার ব্যাঙ্কের চাকুরে পাত্র খুব পছন্দ করে।

ওরা তো বেশ মাইনে-টাইনে দেয়, না? উনি একটু উৎসাহ দেখালেন।

হ্যাঁ। মাইনে ভালই। তা ছাড়া বছরে এক বার সপরিবারে বেড়ানোর খরচ। আমি হেসে যোগ করলাম, অবশ্য পরিবার বলতে আমার বাবা আর মা, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইরা চাকরি করে। বিয়ে-টিয়ে এখনও করিনি।

ব্রাহ্মণ?

ব্যানার্জি। শাণ্ডিল্য।

উনি একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমরা কায়স্থ। বলে উনি নিস্পৃহভাবে ঢুলতে লাগলেন। একটা আলোজ্বালা স্টেশন পেরিয়ে গাড়ি ফের অন্ধকারে পড়ল।

ভাই গাড়ি, কোথায় যাচ্ছি?

গাড়ি বলে, কোথাও না, কোথাও না।

রহস্যময় প্রকৃতি সারা রাত গাড়ির জানালায় দরজায় অন্ধকার রং লাগিয়েছিল। এবার সে জানালার সেই অন্ধকার ঘষে ঘষে তুলে দিব্যি ভোরবেলার সিনসিনারি টাঙিয়ে দিল। দেখি, ভোরের আবছা আলো ফুটেছে। গাছপালা মাঠ নদী দেখা যাচ্ছে। সূর্যও উঠে আসছে নিয়মমাফিক।

আমি আলিপুরদুয়ার জংশনে নেমে পড়লাম। নগেনবাবু, তাঁর স্ত্রী বা রুমি কেউ নামল না। তারা আরও দূরে যাবে। ভোরের আলোয় আমি রুমির মুখ দেখিনি। না দেখাই ভাল। শুধু আমার দেশলাইটা দিয়ে এলাম তাকে। যত বার জ্বালবে তত বার কি মনে পড়বে না? যতক্ষণ দেশলাইতে কাঠি আছে ততক্ষণ আমিও কি বেঁচে রইলাম না রুমির কাছে, বন্ধুগণ?

রিকশাওয়ালা সূর্যনগর পর্যন্ত যেতে তিন টাকা চাইল। রিকশাওয়ালা সর্বত্রই এ-রকম। যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়...

বারবার রিকশা থামিয়ে আমি একটা বাড়ি খুঁজছিলাম। ভাইসব, গগন চক্রবর্তীর বাড়ি চেনেন? একসময়ে সামান্য কম্পাউন্ডারের চাকরি করতেন, সম্ভবত গত চার বছর তিনি শয্যাশায়ী। স্ট্রোক হয়েছিল। বছর চারেক আগে যখন এসেছিলাম, তখন তাঁর বাঁ হাত আর বাঁ পা নড়ে না, মশা এসে সেই হাত-পা থেকে রক্ত খেয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে নিরাপদে চলে যায়। এখনও কি বেঁচে আছেন তিনি? সূর্যনগরে এত বাড়ি উঠেছে, এত গাছপালা গজিয়েছে যে আমি ঠিক চিনতে পারছি না। না, গগন চক্রবর্তীকে বিশেষ করে চেনার কিছু নেই। তবে এই সূর্যনগর পত্তনের সময়ে তিনিই ছিলেন প্রথম বসবাসকারীদের একজন। কেউ কেউ চিনতও তাঁকে। ছোটখাটো, চটপটে মানুষ, একটু তোতলা, রাগী কিন্তু সৎ মানুষ। আমার মামা। চার বছর আগে তিনি আমাকে চুপি চুপি কাছে ডেকে বলেছিলেন, শিঙারা খাওয়াবি?

খাওয়ানো হয়নি। মামি ডেকে বলেছিলেন, এই স্ট্রোক হওয়ার পরও লুকিয়ে-চুরিয়ে খায়। তুমি যেন বাবা, ও-সব কিনে এনো না। অনেক কষ্টে টিকিয়ে রেখেছি।

তা সেই টিকে থাকারই সমস্যা। আপনারা চেনেন না তাঁকে? অবশ্য না চিনবারই কথা। বড় ভুলো-মন মানুষের। চার বছর শয্যাশায়ী থাকলে কেই বা মনে রাখবে!

বুড়ো কবিরাজমশাই অবশ্য চিনতে পারলেন। নাতিকে পায়খানা করাতে নিয়ে এসেছিলেন সামনের কাঁচা নর্দমায়। কবিরাজমশাইকে দেখেই আমি চিনতে পারি। বোধহয় একশো ছাড়িয়ে গেছে বয়স। বেশ চেহারা। লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শকুনের মতো চোখে চেয়ে নাতির মলের প্রকৃতি বুঝবার চেষ্টা করছিলেন বোধহয়।

আমি সামনে নেমে দাঁড়াতেই কবিরাজমশাই বললেন, কে?

বন্ধুগণ, এই এক সনাতন প্রশ্ন, যার বাস্তবিক উত্তর হয় না। সঠিক উত্তর দিলেও লাভ নেই। নিজের জীবন-বৃত্তান্ত শুনিয়ে যে প্রকৃত পরিচয় দেব তারও সময়াভাব।

বললাম, আমি এক নগেন। গগন চক্রবর্তীর বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন?

কোন গগন?

চক্রবর্তী। কম্পাউন্ডার।

কবিরাজমশাই খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, হুঁ। কম্পাউন্ডার। কম্পাউন্ডার হওয়া অত সোজা নাকি! লেবেল দেখে ওষুধ মেলালেই কম্পাউন্ডার হয় না। জ্ঞান চাই। বলে ফের যা দেখছিলেন তাই দেখতে লাগলেন।

আমি বললাম, তার বাড়িটা?

কবিরাজমশাই ঘন পাকা ভ্রূ তুলে বলেন, সে কি বেঁচে আছে?

জানি না।

দেখি না অনেক দিন। নেই বুঝি। আরও ভেতর দিকে যাও, বাঁ দিকে ঘুরে তৃতীয়বাড়ি। সামনে এক জোড়া নারকেল গাছ আছে। তুমি তার কে হও?

ভাগনে!

ভাগনে! কেমনতরো ভাগনে? মামা বেঁচে আছে কি না সে খোঁজ জানো না! বিলেতে ছিলে নাকি?

না, এই যোগাযোগ ছিল না আর কী।

যোগাযোগ রাখতে বারণ করেছিল কে? যাও দেখো গিয়ে আছে কি না। না থাকারই কথা। আজকাল কেউ আর কারও খবর দেয় না। আশেপাশে কত বুড়ো মরে গেল, টেরই পাই না।

একটা কেলো কুকুর ঘুরঘুর করছে দেখে নাতিটা উঠে পড়েছে, ও দাদু, এই কুকুরটা সেদিন

আমাকে চেটে দিয়েছিল! ওই আবার আসছে।

কবিরাজমশাই লাঠি তুলতেই কুকুর পালায়। রিকশায় উঠতে উঠতে শুনি তিনি নাতিকে শাসাচ্ছেন, এই হারামজাদা, উঠে পড়লি যে বড়! বোস, বসে পড়।

নাতি ফের বসে পড়ে।

৮

ভাই রিকশাওলা, আমি কোথায় যাচ্ছি?

তেলহীন চাকায়, চেনে, প্যাডলে একটা কষ্টকর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছিল। সেই শব্দটা ভূতের মতো খোনা সুরে বলে, কেঁউ নেই, কেঁউ নেই।

রিকশা বাঁ দিকে ঘুরতেই আমি সেই জোড়া নাবকোল গাছ আর দরমার বেড়া, টিনের ছাউনির বাড়িটা চিনতে পারি। আগে এই তুচ্ছ বাড়িটাও মামি লেপে-পুঁছে তকতকে রাখত। এখন বড় শ্রীহীন দেখাচ্ছিল। ফটকের মুখে বড় বড় ঘাস উঠেছে, ঝোপঝাড়ে ছেয়ে আছে ছাঁচতলা। মাটির ভিত-এ বড় বড় ইঁদুরের গর্ত।

মামা কি আছে? মামা কি নেই?

আমি রিকশাতেই বসে থাকি। নামতে সাহস হয় না। মামার ছেলেপুলে নেই, নিজে বিছানায় পড়ে থাকে, মামি লেখাপড়া জানে না। তাই বহুকাল মামার কোনও চিঠিপত্র পাই না, খবরও নয়। মা কলকাতায় উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা গত দু' বছর যাবৎ প্রায় দিনই এক-আধবার বলে ওঠে, দাদা কি আর আছে? চারটে চিঠি দিয়েছি, উত্তর এল না। তাই রিকশা থেকে নামতে আমার ভয় করে। মামা যদি না থাকে তবে মাকে গিয়ে কী বলব?

ভাই রিকশাওলা, তার চেয়ে থাকগে, চলো এই দোরগোড়া থেকেই ফিরে যাই। কাজ কি পৃথিবীর সব সত্য জেনে? আমাদের দুঃখময় মানবজীবন দু'-একটা সংবাদ ছাড়াই কেটে যাক। 'খবর নেই,' এইটুকু জেনে রাখাই সুখকর, 'মারা গেছেন' এই দুঃখদায়ক খবরের চেয়ে। নয় কি বন্ধুগণ?

রিকশাওলা জামা তুলে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, এই বাড়ি তো?

হ্যাঁ, এই বাড়িই। ভাই রিকশাওলা, আমি কোথাও যাব না, আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। এ বাড়িতে কেউ নেই। আমি ভুল জায়গায় এসেছি। আমি কোনও খবর নিয়ে যেতে চাই না। ওই দেখো, এ বাড়িটায় কোনও পাখি ডাকছে না, হাওয়া বইছে না, একবুক শোকের বাতাস থমকে আছে। চলো, ফিরে যাই।

কিন্তু বন্ধুগণ, কথাগুলো বলতে পারলাম না। রিকশাওলাব তীব্র চোখের চাউনি দেখে ভারী লজ্জা করছিল। তাই আমি অনিচ্ছার সঙ্গেও নেমে পড়লাম।

রিকশাওলা তিন টাকা চেয়েছিল। কিন্তু রিকশাওলারা সর্বত্রই এরকম। যাহা চায় তাহা ভুল করে চায়...।

আমি কুণ্ঠার সঙ্গে তাকে দুটি টাকা দিতে গেলেই সে খেঁকিয়ে উঠে আলিপুরদুয়ারের রিকশা-ভাড়ার হার সম্পর্কে আমাকে সচেতন করে তুলবার চেষ্টা করছিল। রিকশাওলারা সর্বত্রই এ-রকম। যাহা পায় তাহা চায় না। তাই আমি তাকে অতিরিক্ত মুনাফার ঝোঁক সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকি।

আর এই গোলমালে হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ ও শোকাচ্ছন্ন আমার নেই-মামার বাড়ির একটা ঝাঁপের জানালা খুলে গেল। আর সেই জানলা দিয়ে একটা সিংহগর্জনের মতো পুরুষকণ্ঠ

চেঁচিয়ে রিকশাওলাদের জুলুম বিষয়ে স্পষ্ট মতামত দিতে লাগল।

জানালার মুখটা দেখে আমি বিস্ময়ে এত হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার হাতে ধরে-থাকা নোটগুলো থেকে আমি না গুনে গোটা পাঁচেক নোট রিকশাওলার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, মালগুলো ঘরে তুলে দিয়ে যাও।

রিকশাওলা সঙ্গে সঙ্গে এত সহৃদয় হাসি হাসল যে, সেই মৃত বাড়িটা প্রাণ পেয়ে জেগে উঠল। মূক হয়ে থাকা অজস্র পাখি হঠাৎ তারস্বরে ডাকতে লাগল। নেপথ্য থেকে কে যেন একটা অদৃশ্য পাখা চালিয়ে বাতাস বইয়ে দিল।

আমার বাড়ির লোকের কাছ থেকে বেশি ভাড়া নেওয়া, অ্যাঁ! গগন চক্রবর্তী কি মরে গেছে নাকি রে ব্যাটা? এই বলতে বলতে একটু খুঁড়িয়ে মামা লাঠি হাতে বেরিয়ে এলেন।

রিকশাওলা সভয়ে পালায়। আমি আনন্দে চোখ মুছতে মুছতে প্রণাম করতেই মামা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন, সব বেঁচে-টেঁচে আছে তো?

আমি তাঁর বেঁচে থাকায় এত কৃতজ্ঞ বোধ করছিলাম যে কথা আসছিল না। মাথা নাড়লাম কেবল।

মামা বললেন, এখন আর কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করি না। শুধু বেঁচে আছে কি না সেইটে জানলেই যথেষ্ট।

আমি অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, মামি?

মামা তেমনি সিংহস্বরে বলেন, আছে রে আছে। কানে কম শোনে, রান্নাঘরে খুটখাট করছে বোধহয়।

শুনে চতুর্দিক আনন্দিত হয়ে ওঠে। উঠোনের একধারে শোওয়ার ঘর, অন্য ধারে রান্নাঘর। উঠোনের পূর্ব দিকে কুমড়োর মাচা। তলায় খড়ি কেটে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। রান্নাঘরের পিছনে মস্ত বাগান। সেখানে কলার ঝাড়, কাঁঠালের গাছ, আম-জাম-জামরুলের অভয়-অরণ্য। দেখি, কুমড়োলতায় ফুল ফুটেছে হলুদ বরণ, কাঁচা কুমড়ো-শিশুরা মা-গাছকে আঁকড়ে ধরে আনন্দে ঝুলে আছে। মৌমাছি কিংবা ভ্রমর বা অন্য সব পোকা-মাকড় গুনগুন করে গান গাইছে ফুলে ফুলে। গাছে আম-কাঁঠাল শেষ হয়ে গেছে কবে, তবু সেই গাছগুলিও যেন আগামী মরশুমের জন্য এখন থেকেই গর্ভধারণ করে মৃত্যুর ওপরে নিজেদের সবুজ নিশান ওড়াচ্ছে অহংকারে।

ভুলে আমি মামাকে আর-এক বার প্রণাম করলাম। মামা পুরুষসিংহের মতো একটু পা টেনে টেনে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন, ইনু এসেছে।

যারা কানে খাটো তারা খুব নিচু স্বরে কথা বলে, এটা কি লক্ষ করেছেন বন্ধুগণ? মামিও খুব ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, কে এসেছে?

ইনু।

মামা ফিরে এসে দুটো জলচৌকি পেতে দাওয়ায় মুখোমুখি বসলেন। বললেন, হোমিওপ্যাথিই হচ্ছে আসল চিকিৎসা, বুঝলি! ওসব অ্যালোপ্যাথি, কবিরাজি কিছুই না। ও-সব কত চিকিৎসা করিয়েছি, শেষমেষ জটেশ্বর ফোঁটাফেলা ওষুধ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন হাঁটাচলা করি। বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন, সব খাই। জটেশ্বর বলেছে, সব খাবেন, কিছু বাদ দেবেন না। বলে মামা খুব হাসেন। সেই হাসির উজ্জ্বলতা আমাকে স্পর্শ করে।

আর বন্ধুগণ, ভাইসব, মশাইরা, হে আমার প্রিয় নারীজাতি, এই মুহূর্তে আমি আমার বুড়ো মামার মুখের দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ বুঝতে পারি, মানুষ কোথায় যাচ্ছে। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমি হঠাৎ এই সত্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত হই যে, মানুষ অমোঘভাবে চলেছে তার শৈশবের দিকে। লোকে যে বুড়ো বয়সকে দ্বিতীয় শৈশব কেন বলে, তা বুঝতে পারি এক লহমায়। শৈশবে আমাদেরও ছিল সর্বগ্রাসী খাই-খাই। আমার শৈশব মামার মধ্যে দেখে ভারী ভাল লাগে। কত ভাবে, কত কূট কৌশলে যে

খাওয়ার ফিকির খুঁজতাম, কত কুপথ্যের দিকে ঝোঁক ছিল। এখন আর নেই। কিন্তু কিছুই হারায় না। সবই ফিরে আসে। এবং এই দ্বিতীয় শৈশবেও তার গতি রুদ্ধ হয় না। সে ক্রমশ আরও যায়, এবং আবার মাতৃগর্ভের অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে লুকোচুরি খেলার খেলুড়ির মতো ডাক দিয়ে বলে, টু-কি!

মামা আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন। যদিও মামি কানে কম শোনেন, তবু সতর্কতাবশত মামা স্বর নিচু করে বললেন, গণেশের দোকানে সকালবেলায় অমৃতি ভাজে। একেবারে ঢাকাই অমৃতির স্বাদ। দুপুরের মধ্যেই সেগুলোর রস ঢুকে টসটসে হয়ে যায়। কিন্তু— বলে মামা একটু বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, সন্ধের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। খুব বিক্রি কিনা।

আমিও স্বর নিচু করে বলি, সন্ধের আগেই আনব মামা। দোহাই, মরে-টরে যেয়ো না। বেঁচে থেকো।

মামি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে থমকে পড়েন। তারপর ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন, ওমা, ইনু! তোর মামা বলে গেল, ইঁদুর এসেছে। তা ভাবলাম, সারা বাড়িময় ইঁদুর ঘুরছে, নতুন করে আবার আসবে কী! বসে বসে অমৃতির গল্প শুনছিস নাকি? ও মা, শিগগির জামাকাপড় ছাড়, হাত-মুখ ধো। ওঠ!

ভাইসব, এই সেই ছোট নদী। বিশ হাত চওড়া হবে না। ওপারে সেই আদিম পৃথিবী পড়ে আছে। অবারিত চাষ-আবাদ। সবুজের সমারোহ। নদীর জলে জীবনের কত শব্দ বয়ে যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করি, কোথা হইতে আসিতেছ নদী?

নদী উত্তর দেয়, তোমার শৈশব হইতে।

বুড়ো বয়সের দোষবশত নদী অনর্গল বকবক করে বকাবকি করতে করতে বয়ে যাচ্ছে, এই ন্যাংটো ছেলেটা, ডুবে মরবি যে! উঠে যা, উঠে যা! এম্মা গো, ওই দেখ ভটচায বাড়ির মেজো বউ একগাদা নোংরা ফেলল আমার গায়ে! এই রে, সব ভালমানুষের ছেলেরা এখানে গুচ্ছের পাথর ফেলে শান বাঁধিয়ে বাঁধ দিয়ে রেখেছে, ঘষটানিতে বুক জ্বলে গেল বাবা। গু-খেগোর ব্যাটারা আবার পোল বানিয়েছে আমার ওপর দিয়ে! বর্ষাকাল ফের আসুক, পোল বানানো দেখাচ্ছি। দুই লাথিতে যদি ভেঙে না ফেলি তো...

বুড়ি নদীর প্রতি আমি খুবই সমবেদনা বোধ করি বন্ধুগণ। অবসর নাই তার, নাই তার শান্তির সময়। আমার সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখছি, বয়ে যাচ্ছে তো বয়েই যাচ্ছে। আমি সেই বুড়ি নদীকে ডেকে বলি, ঠাকুমা, ও ঠাকুমা, আমাকে আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাবে?

ক্লান্তিতে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে নদী বলে, আমার কি অত মনে থাকে বাছা! নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখ না, মনে পড়বে।

নদীর ধার ধরে চলে যাই বহু দূর। নানা রাস্তা ঘুরে আলিপুরদুয়ার জংশনের সেই নিচু মাঠের কাছে এসে দাঁড়াই। অনেক বাড়ি উঠেছে। চেনা যায় না। ঠিক কোন জায়গাটায় আমার পেট্রল-ট্যাঙ্কের ভেলাটা ডুবেছিল তা বুঝতে পারি না। অনেক বাড়ির মধ্যে কোনটা আমাদের বাসা ছিল তার দিশা পাই না।

অনেক কষ্টে একটা কাঁকুরে জমি খুঁজে পাই। এ জায়গাটুকু আমি চিনি। এই তো এখানে, আলিপুরদুয়ার ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাওয়ার মাত্র কয়েক দিন আগে, এক সন্ধ্যাবেলা ছোট্ট মেয়ে আশা মিরচান্দানী ঘুরে ঘুরে ভাঙা বাংলায় বার বার বলেছিল, আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না—

এক অদ্ভুত আনন্দে শিউরে ওঠে গা। মনে পড়ে। মনে পড়ে।

এক রবিবারের সকালে দত্তবাড়ির ছেলে এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের ক্যারম খেলায়

তিনজন জুটেছে, একজন কম পড়েছিল, তাই। গিয়ে দেখি, আমার উলটোদিকে জরির ফ্রক-পরা কী সুন্দর একটা মেয়ে! ফরসা, টুলটুলে, ঠিক আলুর পুতুল যেন। আর কী দুষ্টু চোখ। কী মুখর তার ঠোঁট!

প্রথম স্ট্রাইক করার সুযোগ পেয়ে আমি দুটো সাদা সমেত রেড ফেলে দিয়েছিলাম। বন্ধুগণ, ক্যারম আমি কিছুই জানি না। আসলে সেটা ছিল নেহাতই গায়ের জোরে মারা। ঝড়ে বক মরে—বাকিটা আপনারা জানেন।

সেই গুটি ফেলার অঘটন ঘটল, আর আমার জীবনেও এল প্রথম প্রেম। সে কী আসা! দুর্গের প্রাকার ভেঙে শত্রুসৈন্যের মতো মহোল্লাসে চিৎকার করতে করতে নানা ভাব ঢুকে পড়ছে বুকে। পাঁজর গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মনে আছে, প্রথম প্রেম আমার বুকে একটা সত্যিকারের ব্যথার সৃষ্টি করেছিল।

ক্যারম বোর্ডের ওপার থেকে আশা মিরচান্দানী তার অপরূপ চোখ তুলে বিস্ময়ভরে চেয়ে রইল। ঠোঁট নড়ল, কিন্তু কথা সরল না। অনেক কষ্টে কিছু পরে কেবল বলেছিল—হোয়াট এ স্ট্রাইক!

তখন কত বয়স হবে তার? বারো-তেরো!

আমার দান ঘুরে এল, আমি আর গুটি ফেলতে পারি না। হাত ঘেমে যায়, মাথা ঝিমঝিম করে। আশা ওপার থেকে বলে, ইনু, সেভ দি গেম। প্লিজ ইনু! ইউ ক্যান স্নাব দেম ইফ ইউ ট্রাই।

আমাদের প্রতিপক্ষ দত্তবাড়ির ছেলে শিবু, আর আশার দাদা ব্রিজ। দু'জনেই দিনরাত ক্যারম খেলে হাত পাকা করে ফেলেছে। শিবু গুটি ফেলতে ফেলতে বলে, ঝড়ে বক মরে -

বাকিটা আপনারা জানেন।

তো এইভাবেই শুরু হয়েছিল। এই কাঁকুরে জমিটায় আমরা ব্যাডমিন্টনের কোর্ট কেটেছিলাম। অনেক ছেলে জুটে খেলতাম। আমাদের খেলা শেষ হয়ে গেলে আশা আর কয়েকটা মেয়ে টুকটাক করে আকাশে কক তুলে খেলত। নরম-সরম ছিল বলে আশা ভাল খেলতে পারত না। এক বার বেনু নামে একটা মেয়ে জোরে র‍্যাকেট চালানোতে শাটল ককটা এসে আশার চোখের নীচে লাগে। পলকের মধ্যে জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে গেল। আজ পর্যন্ত আমি কোনও মানুষের শরীরে অত লালিমা দেখিনি। সে মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে বলত, ইনু, তুমি আমার সঙ্গে খেলো। তোমার সঙ্গে খেলতে আমার ভাল লাগে। ইউ আর সিমপ্যাথেটিক।

তখন ইংরিজি বলা ছিল ভারী কষ্টকর। মনে মনে অবিরল বাংলা থেকে ট্রানস্লেশন করে বলতে হত। প্রচুর ভুলভাল থেকে যেত। সেই ভয়ে আমি আশার সঙ্গে ভাব বিনিময়ের সময়ে বেশির ভাগ হাসি দিয়ে বা মাথা ঝাঁকিয়ে কাজ চালাতাম।

আমার জন্মদিনে নেমন্তন্নে এসে আশা আমাকে একটা ইংরিজি ট্রেজার আইল্যান্ড দিয়েছিল। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লিখেছিল—টু ইনু অন হিজ বার্থ ডে উইথ লাভ, আশা।

সেই বই আর জীবনেও পড়া হয়নি। বন্যায় অনেক জিনিসের সঙ্গে ভেসে গিয়েছিল সেই বই। আজও শুধু সেই অক্ষরগুলো ছাপা হয়ে আছে বুকের মধ্যে—উইথ লাভ, আশা।

সেবার ওরা বদলি হয়ে চলে গেল। যাওয়ার কয়েক দিন আগে, একদিন বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা আসবার সময়ে এইখানে সেই মারাত্মক খেলা খেলেছিল আশা মিরচান্দানী। অনেকেই ছিল চারধারে দাঁড়িয়ে। মাঝখানে কয়েকজন ঘুরে ঘুরে বলছিল, আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না—

খেলতে খেলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ক্লান্ত খেলুড়িরা বাড়ি ফেরে। আশা যায়নি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে সে, ফরসা মুখ লাল, কপালে ঘাম। তবু সে ঘুরছে ঘুরছে, আর বলছে, আনি মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না—

চারধারে আর কেউ নেই। শুধু আমি। একা আশা ঘুরে ঘুরে আসে, আমার গায়ে ধাক্কা খায়।

ফের সরে যায়। আবার আসে। তুমি আর ঘুরো না আশা এবার খেলা থামাও। এই জটিল বাক্যটা অনেকক্ষণ ধরে ইংরিজিতে মনে মনে ট্রানস্লেশন করার চেষ্টা করছিলাম। পারলাম না। আর সেই পাগলাটে খেলায় উন্মাদ হয়ে বার বার আশা সেই আলো-আঁধারিতে এসে এসে তার নরম গা দিয়ে ধাক্কা মেরে ঢেউ তুলে যাচ্ছে। কী বিভ্রম, কী মায়া ছিল সে খেলায়! যখন অন্ধকারে ঢেকে গেল চারি দিক, তখন প্রেমের দেবতা নেমে এলেন। চার-ধারে এক অলৌকিক ঘেরাটোপ তুলে দিলেন। আশা দু' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল অন্ধের মতো। আমার দু'হাত বাড়ানো। আমার গলা জড়িয়ে উন্মুখ আশা এক বার—মাত্র এক বার আমার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চুমু খেয়েছিল। তারপরই পালিয়ে গিয়েছিল লজ্জায়।

এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এইখানে এক অদৃশ্য পাহাড়ের চূড়ায় কে আমাকে এক বার হাওয়ায় উড়িয়ে এনেছিল। ক্ষণেক আমি তার চূড়ায় দাঁড়িয়ে স্বর্গের ঘণ্টাধ্বনি শুনেছিলাম।

কোথায় চলে গেছে আশা! কোন সফল সিদ্ধি যুবকের ঘর করছে সে এখন!

কাঁকুরে জমিটার ওপর আমি আদরে জুতো ঘষলাম। ঘুরে ঘুরে বারবার জমিটার স্পন্দন টের পাওয়ার চেষ্টা করি। প্রকাশ্য দিনের আলোয় হঠাৎ এক বিভ্রমবশত উবু হয়ে বসি মাটির ওপর। তারপর চোখের জল পড়ে দু' ফোঁটা, গলায় সেই আবেগের দলা উঠে আসে। বিড় বিড় করে বলি, ফিরিয়ে দাও।

কী খুঁজছেন? এই প্রশ্ন আমার পেছন থেকে এল।

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, ছোট্ট মেয়ে একটা। ফ্রক পরা, বারো-তেরো বছর বয়স। বেশ দেখতে।

আমি চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, কিছু না খুকি। কিছু না।

তবে ওভাবে বসেছিলেন যে! আমার দাদু দেখে আমাকে ডেকে বলল, যা তো, দেখে আয়, ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই কিছু হারিয়েছে।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, যা হারিয়েছে তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই বলে আমি চলে আসি। মাঠ-প্রান্তর, লোকালয়ে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াই একটা হারানো বইয়ের ছেঁড়া পাতা। পাই না। বলি, বুড়ি নদী, তুমি আমার কত কী ভাসিয়ে নিয়েছ!

নদী বলে, পাগল, ঘরে যা, ঘরে যা। সব ফিরিয়ে দেব একদিন। তখন বলবি, এত জঞ্জাল কোত্থেকে এল!

কলকাতায় ফিরে গেলে যখন কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবে—কী হে ইন্দ্রজিৎ, কী রকম দেখলে দার্জিলিং? সিনচল লেক দেখেছ, কিংবা টাইগার হিল থেকে বিখ্যাত সূর্যোদয়, আর ঘুমের মনাস্টারি, জলদাপাড়া ফরেস্ট? তখন আমি কী উত্তর দেব? না, আমি এ-সব কিছুই এবার দেখিনি বন্ধুগণ, চোখের জলে আমার চোখ ভরা ছিল।

কটকটে রোদের মধ্যে একদিনের সফরে কুচবিহারে এসে নেমে পড়লাম। চোখে সানগ্লাস, হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ, দাড়ি কামানো, জামা-প্যান্ট দুর্ধর্ষ। এত ভাল দেখাচ্ছিল আমাকে যে, টিকিটচেকার আমার টিকিট চাইল। এখানে টিকিট চাওয়ার নিয়ম এখন আর নেই। দু'বেলা রেল কোম্পানিকে কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়ে একটা আপ আর একটা ডাউন গাড়ি চলে। গাড়ি বোঝাই লোক, কিন্তু বুকিং কাউন্টারে গিয়ে দেখুন বন্ধুগণ, সেখানে আনন্দিত মাছিরা কেমন উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে খেলা করছে। চড়াইপাখি তার বাসা তৈরি করছে ডিম পাড়বে বলে, মাকড়সা জাল বুনছে, প্রজাপতি বসে আছে নাকের ডগায়, একটা মৌচাক বুকিং কাউন্টারের ওপরে সযত্নে রচনা করছে মৌমাছিরা। শোনা যায়, কুচবিহার বামনহাটের লাইনে স্টেশনগুলির বুকিং ক্লার্করা হাই তুলে 'পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জাগে'। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার প্রায়ই ভুতের ভয়ও পায়। এত নির্জন সেখানকার টিকিটঘরের ঘুলঘুলি।

কালো চশমার ভেতর দিয়ে আমি কালচে শহরটিকে দেখি। তোর্সার বন্যায় সেবার কোমর-জল উঠেছিল মিশনারি ইস্কুলে। কিন্তু বন্যার কথা থাক বন্ধুগণ। বরং বলি, কুচবিহারের আকাশে বাতাসে আজও মালবিকা রায়ের ডান গালের আঁচিলটা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জেঙ্কিনস স্কুলের মাঠে এককালের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় এস দত্ত দাঁড়িয়ে, হাতে ব্যাট, একজন বল করছে দত্ত সপাটে মারছেন। চার দিকে ঘিরে চক্রাকারে ছেলেরা অপেক্ষা করছে, দত্ত কিন্তু প্রতিবার একজনের পর একজনকে নির্ভুল ক্যাচ দিচ্ছেন। ওইভাবে ক্যাচ ধরা অভ্যাস করাতেন। আমরা অন্য স্কুলের ছেলে, তারের বেড়ার বাইরে দাঁড়িয়ে লোভী চোখে দেখতাম। ওই যে মিশনারি স্কুল, এখন চেনা যায় না। ওর ঘরে ঘরে টাঙানো ছিল মাতা মেরি ও যিশুর ছবি। হোস্টেল থেকে হ্যারিকেন আর বইপত্র নিয়ে ইস্কুলের নির্জন ক্লাস-ঘরে পড়তে যেতাম রাত্রিবেলা। লণ্ঠনের আলোয় মনে হত, ফোটো থেকে শিশু খ্রিস্ট এইমাত্র নেমে আসবেন।

খাওয়ার ঘণ্টি বাজছে, না! হ্যাঁ বন্ধুগণ, তাই। হোস্টেলে সকালের ভাত খাওয়ার ঘণ্টি বাজছে। যাব? পাত পেতে বসি গিয়ে এক বার!

মদনমোহন বাড়ির সামনে পুকুরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে প্রাচীন পামগাছ। ছায়া পড়ে আছে। একদিন দেখেছিলাম, বহু দূর গ্রাম থেকে মেয়েরা এসে বসে আছে উপোস করে। সঙ্গে সকলের ঘটভরতি জল। রাজা আসবেন, রাজাকে না দেখে তাদের পারণ হবে না। বহুক্ষণ অপেক্ষার পর রাজার মোটরগাড়ি এসে থামল, ব্রিচেস-পরা রাজা নেমে এলেন, সদ্য পোলো খেলার মাঠ থেকে এসেছেন। আমি জীবনে অত অবাক হইনি মানুষের সৌন্দর্য দেখে। সব মানুষের চেয়ে উঁচু, সব মানুষের চেয়ে রূপবান সেই অলৌকিক রাজাকে দেখে হিংসার বদলে এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে গিয়েছিল ভিতরটা। উপবাসী মেয়েরা উপুড় হয়ে পড়ল মাটির ওপর, ঘটের জলে ভিজিয়ে দিল মাটি। কেউ কেউ কেঁদে উঠল আনন্দে। রাজা নিমীলিত চোখে এক বার হাতজোড় করে দাঁড়ালেন, তারপর ভ্রূক্ষেপ না করে বিশাল পদক্ষেপে মন্দিরের চত্বরে ঢুকে গেলেন। তখন তাঁর রাজত্ব চলে গেছে, তবু কী ভীষণভাবে তিনি রাজা ছিলেন!

রাসমেলার সময়ে মদনমোহন বাড়িতে নানা মানুষের মূর্তি করে এখানে-সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়। অবিকল মানুষের মতো দারোয়ান, বাউল, সন্ন্যাসী, মুচি, গৃহস্থবধূ, রিকশাওয়ালা। অবাক হয়ে দেখতাম। এক বার দেখি, একটা দড়িঘেরা জায়গায় চারটে সাধু আর একটা পুরুতের মূর্তি বসানো আছে। সাধুগুলো তো জীবন্ত বটেই, কিন্তু পুরুতটা যেন আরও জীবন্ত। আমি অবাক বিস্ময়ে বলে উঠেছিলাম, আরে, পুরুতটা দেখ, ঠিক আসল পুরুতের মতো! বলতেই পুরুতমশাই খুব বিরক্ত হয়ে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। সবাই হেসে ওঠে এবং আমি লজ্জায় পালিয়ে আসি।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। শীতের সকালে এক রূপমুগ্ধ বালক এই ইস্কুলের পাশের মাঠে কুয়াশা জড়ানো অদ্ভুত সকালে কেডস পায়ে দৌড়োতে আসত। আর দৌড়োতে দৌড়োতে সে সেই আধো-ভেজা উদ্ভিদের গন্ধমাখা আলো-আঁধারে কী করে যেন জিন পরীদের রাজ্যে চলে যেতে পারত। একটা বয়সের পর সে আবার এসে শরীরের ভার নিয়ে বসে আছে সাগরদিঘির পাড়ে। রোদে উত্তপ্ত কাঠের বেঞ্চ। সেই ইন্দ্রজিৎ। তবু সেও তো নয়! এই তো কাছেই মালবিকাদের বাড়ি। কোন লতায়-পাতায় আত্মীয়তা ছিল বলে তাদের বাড়িতে যেতাম গল্পের বই আনতে। মালবিকা কোনও দিন কথা বলেনি। তার ডান গালে একটা আশ্চর্য আঁচিল ছিল, কত নির্জনে একাকিত্বে সেই আঁচিলটার কথা ভেবেছি। সে এখনও আমার স্মৃতিতে কিশোরীই রয়ে গেছে, কেননা আর কখনও দেখা হয়নি। যাব এক বার? চেনা দিলে ঠিক চিনবে। বলব, তখন লজ্জায় যা বলতে পারিনি, আজ বলতে এসেছি। আমার সমস্ত শৈশব হারিয়ে গেছে। তুমি সেটা আমাকে অল্প একটু ফিরিয়ে দেবে?

হিসেব করে বুঝতে পারি—বোকা! বেঁচে থাকলে তারও এখন না হোক ত্রিশের ওপর বয়স। এত দিন কি সে কুমারী হয়ে বসে আছে!

আপনমনে একটু হাসি।

মামার ঘুমের মধ্যে বিকট নাক ডাকে। তবু একই ঘরে আর-একটা বাঁশের তৈরি চৌকিতে আমি ঠিকই ঘুমিয়ে পড়ি। এত ক্লান্তি, শরীরে, মনে। ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখি।

দেখি, একটা টেলিভিশনের পরদায় একটা ছবি। অফিসে চারু পালিত টেলিফোন তুলে বিরক্ত হয়ে কাকে যেন বলছে, রোজ রোজ খোঁজ করেন কেন বলুন তো! বলেছিলে তো সে দার্জিলিং গেছে, মাসের শেষে ফিরবে।...না, কোনও খবর দেয়নি, ছুটিও এক্সটেনশন করেনি। এই বলে বিরক্ত চারু পালিত ফোন রেখে দেয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে, রোজ তোমার ফোন আসছে কেন হে? তুমি রয়েছ দার্জিলিঙে, এদিকে রোজ ক্রিং ক্রিং, মাথা ধরিয়ে দিল।

আমি হেসে বললাম, পালিতদা, আপনি ফোনের ওপর অত চটা কেন?

চটব না? সাহেবরা এই এক যন্ত্র বের করেছে, যে কেউ যে কাউকে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে ডেকে গল্প জমাবে। কাজে ভারী অসুবিধে! তোমার তো আগে এত ফোন আসত না! দার্জিলিং থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো তো বাপু, ফোনের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেলাম।

আসব পালিতদা।

হ্যাঁ তাড়াতাড়ি এসো। ওই ছাই শৈশব না কী যেন দেখতে গেছ, কোন মাথামুণ্ডু কোকিলের ডাক শুনতে গেছ, ও-সব ছেড়ে হুটোপাটি করে চলে এসো। ফোনের গলা ক্রমেই বিরহ-কাতর হচ্ছে। তার ওপর ছুটির এক্সটেনশন চাইলেও পাবে না, পাওনা নেই। এরপর মাইনে কাটা যাবে কিন্তু।

আমি ঘুমঘোরে বললাম, আসছি পালিতদা।

ঘুম ভেঙে উঠে দেখি বেলা হয়েছে। তখন বুদ্ধি-বিবেচনা ফিরে আসে, আর হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। পালিতদাকে একটা সাদামাটা প্রশ্নই করা হল না, ফোনটা করেছিল কে?

মামা লোক ডেকে মস্ত একছড়া আধপাকা মর্তমান কলা কাটালেন গাছ থেকে, এখন কুমড়োর ডগা কাটাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, তেমন কিছুই দেওয়া গেল না। আম-কাঁঠালের সময়টায় যদি আসতিস!

কী দিচ্ছ? এই কলার ছড়া, কুমড়োর ডগা সব নিতে হবে নাকি?

নিবি না? তাই কি হয়! এ-সব মহামায়াকে দিস। আমরা বেঁচে থাকতে এ-সব নিতেই হবে রে।

মামা, প্রেস্টিজ থাকে না যে!

এক খাঁচি অমৃতি এনে দিয়েছিলাম মামাকে। কী খুশি! খাঁচিটা মেঝেয় রেখে চার দিকে ঘুরে ঘুরে অমৃতি দেখেন আর বলেন, বাঃ! বাঃ!

বলেছিলাম, খাও।

আগে তোর মামি এসে গোপালকে নিবেদন করুক, তবে তো খাওয়া। ঘরে বিগ্রহ থাকতে বাঘ-ভালুকের মতো যা পাই তাই কি খাওয়া যায়! সে জো নেই।

মামি এসে তো তোমাকে ইচ্ছেমতো খেতে দেবে না। বরং তুমিই নিবেদন করে নাও।

মামা ভারী অপ্রতিভ হেসে বলেছিলেন, আমি নিবেদন করলে হয় না। আমার বড় লোভের চোখ। ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে মুখ রসস্থ হয়ে যায়। তোর মামিই দেবেখন।

শেষ পর্যন্ত মামিই দিয়েছিলেন। ছেলেপুলে নেই বলে মামির এক বাই, যত রাজ্যের পাড়ার বাচ্চা জুটিয়ে খাবার বিলোনো। খাবার-দাবার বড় একটা আসে না এখন, অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু তবু যদি কিছু আসে তো মামি বিলোবেনই। সেই রসের অমৃতি পনেরো আনা বাচ্চারা খেয়ে গেল। মামি চোখের জল মুছে আনন্দে বললেন, জ্যান্ত গোপালরা খেয়ে গেল। চোখ দু'খানা ভরে যায় দেখলে।

এই নাও, তোমার জন্য আস্ত একখানা রেখেছি, আর একটা ইনু খাবে। এই বলে মামাকে একটা দিলেন।

সে কী কষ্ট মামার! শেষে আমার ভাগেরটা লুকিয়ে মামাকে জোর করে খাওয়াই। কিছু না, একটা অমৃতি মাত্র। বড় কষ্ট হয়। বলি, মামা, আমার কাছে কলকাতায় চলো। ঢের অমৃতি খাওয়াব।

মামা ভারী শিশুর মতো হাসেন, বলেন, যাব, তাড়া কীসের! যাব'খন।

অদূরে নদী বয়ে যাচ্ছে। কত শৈশবকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সে, এখন দেহাবশেষ ছাই পাড়ের শ্মশান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে মাটিকে সরস করবে বলে। নদীর জলে সেই অমোঘ শব্দ।

বলি, আর কবে যাবে মামা?

মামা উদাসভাবে বলেন, যাব'খন সামনের বছর। সব বেঁচে-বর্তে থাকুক। মহামায়াকে যত্ন করিস, মা তো ওই একটামাত্র।

আমার সঙ্গে চলো। মাকে দেখে আসবে।

পাগল! এই সবে ধানপান উঠল। এবার ডাল বসবে খেতে। এখন বেশ দু'বেলা চারটি খাওয়া হয়, বুঝলি। শীত আসছে। ফুলকপি, কড়াইশুঁটি—

কলকাতাতেও ওসব পাওয়া যায়।

দূর বোকা! সে তো বাজারি মাল। আর এ তো আমার খেতে ফলবে। সকালবেলা কপিখেতে গেলে শিশির-ভেজা গজগজে পাতার মধ্যে সাদা মুখখানি দেখা—তার ব্যাপারই আলাদা। তা ছাড়া বুড়িটা আছে, ফাঁকা বাড়িটা আছে। এ সব ছেড়ে কি যাওয়া যায়! এখনও অনেক দিন বাঁচব, বুঝলি! হোমিওপ্যাথিতে কি না হয়! জটেশ্বর বলে, আমাকে একশো বছর হেসে-খেলে বাঁচিয়ে রাখবে। ইচ্ছা-মৃত্যু হবে।

দিনহাটার বিখ্যাত তামাকপাতা মামিকে খানিকটা এনে দিয়েছিলাম। কী খুশি, যেন কেউ কখনও দেয়নি তাকে তামাকপাতা। যখন দোক্তা ভাজলেন সারা বাড়ি মাত হয়ে গেল গন্ধে। সবাইকে ডেকে ডেকে বলেন, ভাগনে আমাদের সোনার টুকরো ছেলে! এই এত দোক্তাপাতা এনে দিয়েছে।

রান্নাঘরের দোরে বসে বলি, মামি, এত একা থাকো কী করে?

মামি বলেন, বাবা, একা কী? গাছপালা আছে, কুকুরটা আছে, বেড়ালটা আছে। পাখি-পক্ষীরা আসে। বুড়োটা সারাদিন প্যান প্যান, ঘ্যান ঘ্যান করে, বেশ সময় কেটে যায়। অভাবের সংসারে কত কাজ থাকে বাবা মানুষের! যত গতর খাটাবে তত সাশ্রয়। পাড়া-প্রতিবেশীরাও আপন বলে দেখে। কিছু একা লাগে না। আর বাড়িটারও তো আত্মা আছে, বুকে করে আগলে রেখেছে, কত ঝড়-বৃষ্টি-বাতাস আটকে রাখে। বেশ আছি।

পিছনের বাগানটায় কোমর সমান জঙ্গল। তারই মধ্যে একটা সরু পায়ে-হাঁটা রাস্তা, কুয়োর পাড়ে লেবুর ঝোপ। সেখানে দাঁড়ালে কত কথা মনে পড়ে। যখন আমরা আলিপুরদুয়ার জংশনে ছিলাম, তখন মামার বাগান থেকে কত বার পাকা কাঁঠাল, আম, জামরুল বয়ে নিয়ে গেছি। এক বার পাকা কাঁঠাল ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে শিবের ষাঁড় গন্ধ পেয়ে তাড়া করেছিল। এক খাবলা কামড়েও নিয়েছিল, মনে আছে।

মামা তখন আড়াই-তিন মাইল রাস্তা হেঁটে চলে যেতেন আমাদের বাসায়। মাকে ডেকে বলতেন, ও মহামায়া, তোরা দেখি পেঁয়াজ খাস!

মা লজ্জার হাসি হেসে বলেছে, তা সাহেববাড়িতে বোনের বিয়ে দিয়েছ, পেঁয়াজ না খেয়ে যাই কোথা! পড়েছি মোগলের হাতে—

মামা মাথা নেড়ে বলতেন, তা বটে। কখনও খাইনি, গন্ধটা কেমন যেন লাগে।

মামা আমাদের বাসাতেই জীবনে প্রথম মাংস খান। আর কখনও খাননি। তাঁদের বংশে মাংসের রেওয়াজ ছিল না। খেতে বসে বললেন, একটা অভিজ্ঞতা বাদ থাকে কেন! একটু খেয়েই দেখি।

খেয়ে বললেন, বেশ তো। শোলমাছের মতোই লাগে। আর-একটু শক্ত এই যা। স্থলের জীব এই প্রথম খাচ্ছি।

মামার বাগানের গাছপালার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ে সব। সেই সব চেনা গাছগুলোকে নিবিড় চোখে দেখবার চেষ্টা করি। কেন যেন মনে হয়, আমার সেই ছেলেবেলায় এইসব গাছগুলি আরও বড় ছিল। এখন কি সব ছোট ছোট হয়ে গেছে? তাদেরও যাত্রা কি শৈশবের দিকে!

আগাছার গায়ে গায়ে নিরামিষভোজী মশারা বসে আছে। বাস্তবিক, লক্ষ করলে দেখা যায়, সব মশা-ই কিছু হিংস্র আমিষাশী নয়। কিছু বিনীত, ভদ্র ও হিংসাশূন্য হৃদয়ের মশা আজও রয়ে গেছে পৃথিবীতে। তারা কেবলমাত্র উদ্ভিদের রস পান করে তৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে। আলিপুরদুয়ারের অন্য মশারা তেমন নয়, তাদের ধূর্তামি সর্বজনবিদিত। কাল রাতেও দেখেছি তারা তাঁতের মশারির জাল ফাঁক করে, চোর যেমন সিঁদ কেটে ঘরে ঢোকে, তেমনি মশারির মধ্যে ঢুকবার চেষ্টা করছে। একটা চতুর মশা জালের মধ্যে একটুখানি মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তারপর আর পারছিল না, তখন আর-একটা মশা এসে তার পিছনে বসে মাথা দিয়ে ঠেলা দিতে লাগল তাকে। দু'জনের সম্মিলিত ঠেলা-ধাক্কায় অবশেষে প্রথমজন জালের মধ্যে ফোকরটাকে একটু একটু ফাঁক করতে পেরে ঢুকে পড়ল। তার পন্থা ধরে পর পর আরও কয়েকজন। কিন্তু এই বাগানে বেঁটে ডাঁটা গাছে, কলাবতীর ঝাড়ে যারা বসে আছে, তারা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। আমি নির্ভয়ে তাদের ধার-কাছ দিয়েই ঘুরতে লাগলাম। তারা গুনগুন করে বলে উঠল, পথ-ভোলা এক পথিক যেন গো সুখের কাননে, তুমি যাও—

বন্ধুগণ, বন্ধুগণ, পৃথিবীতে সময়ের চেয়ে নিষ্ঠুর কিছু নেই। যেদিকেই যাই, দেখি মানুষের ছড়ানো বীজ থেকে গজিয়ে উঠেছে ঘরবাড়ি, মানুষ-ছানা, নতুন গাছ। সব পুরনো মাঠ প্রান্তর হারিয়ে গেছে। চেনা জায়গার সব চিহ্ন মুছে নিয়ে গেছে এক অদ্ভুত অদৃশ্য সময়-নদীর বান। শৈশবে যেমন আলো দেখেছি, অন্ধকার দেখেছি, তার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বুড়ি নদী, তুমি আমার কত কী ভাসিয়ে নিয়ে গেছ!

নদী উত্তর দেয়, পাগল ছেলে, ফিরে যা, ফিরে যা। তোর যা হারিয়েছে সব ফিরিয়ে দেব একদিন। তখন বলবি—এত জঞ্জাল কোত্থেকে এল?

একবোঝা কচুর শাক দিতে এসে কে এক যুবতী মেয়ে মামির রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, ও পিসি, তোমাদের বাড়িতে কে এসেছে গো?

আমি সচকিত হয়ে উঠি। আমি কে এসেছি? সত্যিই তো, আমি কে এসেছি এখানে? আমি তো এখানকার কেউ না। বহিরাগত, আগন্তুক।

মামি ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, ভাগনে। ভাল চাকরি করে। বেশ ছেলে।

যুবতী বলে, আমাদের বিন্তির সঙ্গে সম্বন্ধ হয় না?

আমি রান্নাঘরের বেড়ার ধার ঘেঁষে চুপটি করে লুকিয়ে দাঁড়াই। শুনি মামি বলছে, ওমা, ও তো কচি মেয়ে। আর-একটু ডাগর হলে হয়। তো বিন্তির সঙ্গে কেন, তোর সঙ্গেই সম্বন্ধ করি।

যুবতী হেসে উঠে বলে, হ্যাত। আমার যে সব ঠিক হয়ে আছে!

এই বলে মেয়েটি পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময়ে তাকে একঝলক দেখি। কী আশ্চর্য বন্য চেহারা! বার বার লাগাম ছিঁড়বে, সওয়ারিকে পিঠ ঝাঁকিয়ে ফেলে দেবে, বশ মানবে না, কিন্তু দৌড় করাবে পিছু পিছু। তাকে দেখেই স্মৃতির গাছ নাড়া খায়। পুরনো তোরঙ্গ খুলে জীর্ণ স্মৃতি বের করে দেখি।

কুচবিহারে সেবার স্কুল ছেড়ে সদ্য কলেজে ঢুকেছি। রাজকীয় কলেজ হোস্টেলের তিনটে বাড়ি পাশাপাশি, এক ধু-ধু করা দীর্ঘ করিডোরে পরস্পর যোগাযোগ রাখছে। পুরনো বাড়ি। তার উত্তর দিকের ব্লকটি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকত। মাঝরাতে সেখান থেকে বেড়াতে বেরোত ভূতেরা। অশরীরী পায়ের শব্দ কত বার হেঁটে গেছে নিশুত রাতে, রাত জেগে যারা পড়াশুনো করত তারা

শুনেছে। শান্তনু বড়ুয়া নামে এক অসম সাহসী ছেলে এক বার টর্চ জ্বেলে দেখেওছিল, সামনে দিয়ে পায়ের শব্দ হেঁটে গেল, কাউকে দেখা গেল না।

সেবার তোর্সার বন্যায় কুচবিহার ডুবে গেলে হাজার মানুষ উঁচু জমির কলেজ আর কলেজ হোস্টেলে উঠে জাঁকিয়ে বসে পড়ল। পড়াশুনো বন্ধ। আমরা মোট ছ-সাত জন ছেলে সাঁতার জানতাম বলে আমাদের উদ্ধারকার্যে নামিয়ে দেওয়া হল। হোস্টেল আর কলেজের মেঝেটুকু ছাড়া বাদবাকি শহরের মধ্যে নদী ঢুকে পড়েছে। বহুলোক আটকে আছে শহর আর শহরতলির নানা জায়গায়। কখনও একটা পলকা কলার ভেলায়, কখনও-বা একবুক বা মাথাডুব জল ভেঙে আমরা অধ্যাপকদের উদ্ধার করে নিয়ে আসতাম, মাথায় মালপত্র কিংবা কাঁধে শিশুদের চাপিয়ে। ইংরিজির এক প্রফেসরের এগারোটি শিশু ছিল। তখনও ফ্যামিলি প্ল্যানিং চালু হয়নি। আমরা শিশু পারাপার করতে করতে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাঁফ ছাড়ার জায়গা নেই। আমাদের ঘরে, বিছানায়, বারান্দায় সর্বত্র লোক থিকথিক করছে। ভুতুড়ে বাড়িটা খুলে দেওয়া হয়েছে, ভূতেরা পালিয়েছে প্রাণভয়ে। তবু জায়গা হচ্ছে না। তাই বিশ্রাম বলে কিছু ছিল না। হোস্টেলের রান্নাঘরে বিশাল ডেগভরতি খিচুড়ি রান্না হত। সেই গরম ডেগ গামছা দিয়ে দু'দিকে দু'জন ধরে জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম কলেজে। উপোসী মানুষেরা খিচুড়ি দেখে চেঁচিয়ে উঠত আনন্দে। হাসপাতাল থেকে এক ব্যারেল গুঁড়ো দুধ পাঠিয়ে দিয়েছিল। গরম জলে বালতির মধ্যে খাবলে খাবলে গুলে সেই দুধ নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের দিতাম। বিশ্রাম ছিল না। তারই মধ্যে দেখেছি, আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে সেই শরণার্থীদের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসে আছে। তার চারধারে ছেঁড়াখোঁড়া সব কাঁথা-তোশক, তুচ্ছ দু'-একটা দীনহীন জিনিস, তার বাবা-মা নিতান্ত অশিক্ষিত ও গেঁয়ো। সে যখন কলেজে আসে তখন তার পরিপাটি সাজ ও চলাফেরা দেখে কে বুঝত পারত যে সে ওইরকম এক গেঁয়ো গরিব পরিবারের মেয়ে! সেই নিষ্ঠুর বন্যাই তার সবকিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল বলে কী লজ্জা তার! আমাদের দেওয়া খিচুড়ি সে কিছুতেই থালা পেতে নিত না, সবসময়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে মাথা গুঁজে বসে থাকত, আমরা 'চিনি না, চিনি না' ভাব করে সরে আসতাম সেখান থেকে। দু'দিন প্রায় সে না খেয়ে ছিল দ্বিতীয় দিন রাতে তাকে জোর করে খিচুড়ি দিয়েছিলাম বলে সে কেঁদে ফেলেছিল।

তিনদিনেও বন্যার জল নামল না। পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই জলের ঢল অবিরল নেমে আসছে। আকাশ ঘন মেঘে ডুবে যায় বার বার। জলের ওপর শব্দ তুলে বৃষ্টি পড়ে। একবুক সেই নোংরা জল ভেঙে বৃষ্টির অজস্র প্রহারে জর্জরিত হয়ে যখন মানুষের জন্য খিচুড়ি বা দুধ নিয়ে যাই, তখন আমাদের আড়ালে কিছু লোক ঘোঁট পাকায়। তারা সন্দেহ করে, সরকার সাহায্য দিচ্ছেন, আমরা সেই সাহায্যের টাকা বা চাল ডাল মেরে দিচ্ছি, বদলে অখাদ্য খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রাখছি তাদের। এক সন্ধ্যাবেলা একদল খ্যাপা শরণার্থী হঠাৎ আমাদের ঘিরে ধরল, আমার জলে ভেজা গেঞ্জিটা পিছন থেকে কে যেন এক টানে ছিঁড়ে ফেলল। মা-বাপ তোলা গালাগাল আমাদের ক্লান্ত শরীরের ভেতর ঢুকছে, কিন্তু অপমান বোধ করার মতো শক্তিও তখন নেই, এত ক্লান্ত। যখন তারা আমাদের ক'জনকে টানা-হ্যাঁচড়া করে গালাগাল করছিল, দু'-চারটে চড়-চাপড়ও যখন খাচ্ছি, তখন অন্য কিছু নয়, কেবল অপরিসীম ক্লান্তি টের পেলাম প্রথম। খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করেছিল। হতভম্ব হয়ে ভ্যাবলার মতো বাক্যহারা চেয়ে আছি। ভেজা গা শিউরে শিউরে উঠছে। হঠাৎ সে সময়ে এক তিনকেলে বুড়ি তার কাঁথা গা থেকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে উঠে এল, তার রোগা হাতে কাঁকড়ার মতো ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে লাগল ·লোকজন, আর আশ্চর্য জোর গলায় চেঁচিয়ে আক্রমণকারীদের বাপ-দাদা-চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করতে করতে বলতে লাগল, সোনার টুকরো ছেলেদের গায়ে হাত দিস, বজ্রপাত হবে মাথায়। কিছু লোকের দ্বিধা ছিলই। এক লহমায় তারা একজোট হয়ে আমাদের পক্ষ নিয়ে নিল বুড়ির চেঁচানিতে। সেই বাহে বুড়ির তেজ দেখে আমার

বিস্ময়ভাব আজও কাটেনি। সেই বুড়িরই কাঁথা-কম্বল বস্তার নীচে একটা জ্যান্ত মেয়ে-সাপ লুকিয়ে ছিল। সেইদিনই তাকে প্রথম দেখি। কী বিশাল চোখ, অদ্ভুত এক মায়ামাখানো শ্যামলা রং ছিল তার, প্রকাণ্ড চুল। বনবাদাড়ের তেজি উদ্ভিদের সঙ্গে তার হুবহু মিল। বন্ধুগণ, মানুষ বা মেয়েমানুষ কেউই গাছ নয়, আমি জানি। তবু সেই মেয়েটার মধ্যে একটা উদ্ভিদের ছায়া ছিল। ঝগড়া দেখে সে উঠে বসে আছে, হারিকেনের আলোয় তার চোখ ঝলসাচ্ছে, মুখে কী আশ্চর্য একটা সুখের স্বপ্নভাঙা হাসি। সে উঠে এসে বুড়িকে ধরল, বলল, চলো ঠাকুমা, খুব হয়েছে। বলে আমাদের ক্লান্ত, অনুভূতিহীন, ভ্যাবলা মুখের দিকে চেয়ে সে একটু প্রশ্রয়ের হাসি হেসেছিল বুঝি। আমাদের মৃতদেহগুলিতে প্রাণসঞ্চার হল। আমরা ফের অপমান ভুলে গরম খিচুড়ির হাঁড়ি বয়ে নিয়ে জনে-জনের কাছে যেতে লাগলাম।

সেই জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া শহরের ভেতর থেকে কী করে একটা কাঁঠালি চাঁপা ফুল জোগাড় করেছিল মেয়েটা! চারদিনের দিন সকালে যখন দুধ দিয়ে বেড়াচ্ছি তখন সে ডেকে আমার হাতে ফুলটা দিল, বলল, কেমন বাস দেখেন। তার কথায় অশিক্ষিত গ্রাম্য টান। তবু সেই বাহে মেয়ের দেওয়া ফুলটিই আমার স্কুল-কলেজের জীবনে পাওয়া প্রথম প্রাইজ। যে ছ'-সাতজন সাঁতার জানতাম তার মধ্যে জনা চারেক জলে ভিজে জ্বরে পড়েছে, অবশিষ্ট জনা তিনেক তখন শেষজীবনীশক্তিটুকু দিয়ে লড়ছি। গলা বসে গেছে, কথা বেরোয় না। রোগা হয়ে গেছি। চোখ বসা, ঘুমহীন শরীরে সব লাবণ্য চলে গেছে। কেবল গেঞ্জি কিংবা খালি গা আর হাফপ্যান্ট পরা আমাদের মূর্তি। সেই কাঁঠালি চাঁপা ফুলটা আমাদের শ্রীহীন মুখকে বুঝি অপরূপ লাবণ্য দান করেছিল । বসা গলায় ফিসফিস করে বলেছিলাম, বাঃ, বেশ গন্ধ। মেয়েটি বলল, রেখে দেন।

চারদিনের দিন দুপুরের মধ্যে জলের লেভেল নেমে গেল। অনেকেই চলে গেল বিকেলের মধ্যে। কিছু শহরতলির লোক রয়ে গেল তাদের ঘরদোরে তখনও জল, সাপ, আরও কত কী! সেই মেয়েটাও ছিল। পঞ্চমদিন ভোর থেকে আনাগোনা শুরু করে সুযোগসন্ধানীরা। তারা খবর পেয়েছে, বন্যার ফলে এখন সস্তায় মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে। সকালে-দুপুরে যখন আমরা থাকতাম না, তখন সুযোগ বুঝে তারা চুপি চুপি আসত। বিকেলের দিকে খবরটা রটে গেল। তখন শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চল জলশূন্য হয়েছে। বহু ছেলে জুটে গেল। চারজন ছোকরা মাড়োয়ারি ধরা পড়ল, আর দু'জন বাঙালি। শান্তনুদা একজনের চুলের মুঠি চেপে ধরে কলেজের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। চুল ধরে মাথাটা নুইয়ে দিয়ে আমাকে ডেকে বলল, ইন্দ্রজিৎ, মার। আমি অবাক হয়ে দেখছি, মারব কী! আমি কখনও কাউকে মারিনি যে। শান্তনুদা চেঁচিয়ে ওঠে রাগে, বলে, মার বলছি। আর তখন সেই বাহে মেয়েটা কলেজের বারান্দা থেকে নেমে এল দৌড়ে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, এই লোকটা, এই লোকটাই আমাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিল। মারেন ওকে, নাকমুখ ভেঙে দেন। সেই শুনে মারবার জন্য আমি হাত তুলেছিলাম। শান্তনুদা চেঁচিয়ে বলল, তলা থেকে গদাম করে ওপর দিকে হাত চালিয়ে মার। আর শিরদাঁড়ায় হাঁটু চালা, আমি ধরে রেখেছি, ভয় নেই। আমি তীব্র অনিচ্ছায়, অদ্ভুত দুর্বল হাতে তলা থেকে ওপরে হাত চালিয়ে একটা মারলাম। দুর্বল মার, তবু ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল টপ টপ করে। লোকটা হাতজোড় করে বলছে, মাফ চাই, মাফ চাই। শান্তনুদা ঝাঁকানি দিয়ে আমাকে ধমকায়, ও কী মার হচ্ছে! বরং তুই ধর, আমি মারছি। তা করতে অবশ্য মারকুট্টা ছেলেরা চলে এল, আমাকে সরিয়ে দিয়ে তারা লোকটার খবর করতে লাগল জোরালো হাতে-পায়ে। মেয়েটা উল্লাসে চিৎকার করছিল, মেরে ফেলেন, মেরে ফেলেন হারামজাদাকে।

ভাইসব, আমি মারতে পারি না। যদি সকালে উঠে ব্যায়াম করি বলে আমার শরীরটা তেমন খারাপ নয়। কিন্তু মারধরের জন্য যে একটু আলাদা নিষ্ঠুরতা বা দৃঢ়চিত্ততা—যাই বলুন, দরকার, তা আমার নেই। বন্যার পর থেকে সেই মেয়েটার সঙ্গে আমার কয়েক বার দেখা হয়েছে। কখনও

রাসমেলায়, রথযাত্রার সময়ে, এমনিতে রাস্তায়ও। তাকাতই না। মেয়েটার দিকে চেয়েও আমার অদ্ভুত ভয় হত। লোকটাকে যখন মেরে বাগানের বেড়ার ওপর ভেজা কাপড়ের মতো মেলে দিয়ে রাখা হয়েছিল প্রদর্শনীর জন্য, তখন মেয়েটা তার ফণা তোলা মুখে ফুঁসে ফুঁসে উঠেছিল আনন্দে। তবু কেবলই মনে হয়, এক সকালের দেওয়া কাঁঠালি চাঁপা ফুলটার গন্ধই আমার সারা জীবন ধরে কেন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে? ভুলতে পারি না। বুড়ি নদী, তুমি আমার কত কী ভাসিয়ে নিয়ে গেলে!

নদী বলে, ঘরে যা, ঘরে যা, পাগল ছেলে। সামনেই সমুদ্র, তুই কেন উলটোবাগে বয়ে যাচ্ছিস রে! মনে-পড়ার মতো জঞ্জাল আর নেই। ও-সব ভাসিয়ে দিয়ে সামনের দিকে বয়ে যা।

যে মেয়েটা কচুর শাক দিয়ে চলে গেল সেও ওই মেয়েটির মতোই। তেমনি তীব্র চোখ, তীব্র শরীর, নিষ্ঠুরতা-প্রিয় তার মুখের আদল। তাকে দেখে সেই বন্যার স্মৃতি ফের ভাসিয়ে নিয়ে গেল বুক। মনের মধ্যে কত পলি জমেছে পুরু হয়ে!

রওনা হওয়ার সময়ে মামা আমার হাতে একটা পাকানো কাগজ দিয়ে বলেন, ইনু, এই বাড়িঘর তোর নামেই সব লিখে দিলাম। আমরা মরে গেলে তুই এসে দখল নিস। অনেকটা জমি, তা ছাড়া চাষের জমিও আছে নদীর ওপারে।

আমি কুণ্ঠার সঙ্গে বলি, এখনই মরার কথা কী মামা! একশো বছর বাঁচবে বললে যে। এখন থাক।

নিবি না?

এখন থাক মামা।

তুই যে এ জায়গা বড় ভালবাসিস ইনু! তোকে দেখেই বুঝি। এ জায়গা যে ভালবাসে তাকে ছাড়া কাকে দেব বল? সবাই কি আর মাটি গাছপালা ভিটের প্রাণ টের পায়? এরা সবাই যে-কথা বলে শোনে ক'জন? আমি মরলে তুই এসে মাঝে মাঝে থাকিস। কলকাতার বাবু হয়েছিস, এখানে গেড়ে বসতে পারবি না জানি। তবু মাঝে মাঝে আসিস। আর একটা কথা।

কী মামা?

মহামায়াকে বলিস, যতদিন পারে যেন বেঁচে থাকে। যেমন করে হোক। ভাল হোমিওপ্যাথ দেখাস।

আমি মাথা নেড়ে বিদায় নিই। আগড় ঠেলে দাঁড়িয়ে মামি কাঁদে। মামা সিংহের গর্জনে বলেন, মালপত্র সাবধান। কলার ছড়াটা ফেলে যাস না, কুমড়োর ডগাগুলোয় পারলে একটু জল ছিটিয়ে নিস। ঠোঙায় কুমড়ো-ফুল দিয়ে দিয়েছে তোর মামি, বড়া ভেজে খাস...

শুনতে শুনতে রিকশা সূর্যনগর ছেড়ে চলে আসে।

৯

সন্ধেবেলায় শিলিগুড়ি জংশনে যখন নামছি, তখনও পেছন থেকে কে যেন কোমর ধরে টেনে বলে. নামছ কেন ইন্দ্রজিৎ? এই গাড়িটাই তোমাকে কাটিহারে নিয়ে যাবে। এক বার দেখবে না সেই মাদার গাছটা, যেখানে সেই আশ্চর্য কোকিল ডেকেছিল এক বার? চলো যাই।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না থাক। হয়তো সেই মাদার গাছটা নেই, হয়তো বাড়িটা ভেঙে ফেলেছে।

চলো, এক বার দেখে আসি।

আমি দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বলি, না, আমার ছুটি নেই। পালিতদা বলছে আমার আর ছুটি পাওনা নেই। তা ছাড়া টেলিফোনে কে যেন আমাকে রোজ ডাকছে।

ও-সব ছেঁদো কথা। চলো।

আমি সেই নাছোড় ইন্দ্রজিৎকে মিনতি করে বলি, না ইন্দ্রজিৎ। ওই একটা জায়গায় আমার আর কোনও দিন না যাওয়াই ভাল। গেলেই চিরকালের মতো জায়গাটা হারিয়ে যাবে। থাকগে। আমি বরং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং মেল ধরে চলে যাই কলকাতায়। ছুটি নেই। বলে আমি ইন্দ্রজিতের হাত ছাড়িয়ে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে নেমে পড়ি।

ওয়েটিং হলঘরে সেই একই জায়গায় চেলু শুয়ে আছে। একই ভাবে। চার দিকে দীন-দরিদ্র লোকের ভিড়, বাচ্চাদের চেঁচানি। সেদিন যাদের দেখে গেছি অবিকল তাদের মতোই মানুষ সব, এমনকী মোটঘাট পর্যন্ত একরকম। সেই একইভাবে চেলু শুয়ে আছে।

আমি তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তার নাড়ি দেখি। নেই। বুকে হাত দিয়ে হৃৎপিণ্ডের শব্দ অনুভব করার চেষ্টা করি। শব্দ হচ্ছে না। নাকের কাছে হাত ধরি। শ্বাস চলছে না। আমি আস্তে করে ডাকি, চেলু।

অমনি চেলু দুই চোখ খুলে তাকায়। আমাকে চিনতে পারে। তার মুখটা ব্যথা-বেদনায় আরও একটু বুড়ো হয়ে যায়। কষ্টে দুটো হাত তোলে চেলু। দু' হাতে চারটে করে মোট আটটা আঙুল দেখায়।

আমি বুঝতে পারি। আটশ'।

আমি বলি, ঠিক আছে চেলু।

সে কষ্টে ফিসফিস করে বলে, লেকিন এখুন রুপিয়া-উপিয়া নাই। নোকর রাখবেন তো, খেটে শোধ দিয়ে দিব। লোকে পুছলে বলবেন কি আমি চেলু-উলু কোই নাই।

আচ্ছা চেলু।

পবন সিং। সে বলে।

আচ্ছা পবন সিং।

তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে যায়। এই প্রথম তাকে আমি পবন সিং বলে ডাকলাম। সে আবার তার অতল ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার আগে বলে, যখন ইচ্ছা ডেকে নিবেন আমাকে। এখানেই পেয়ে যাবেন।

আচ্ছা। তুমি ঘুমোও।

আবার নিথর হয়ে যায় সে। পাপবোধে বড় কষ্ট পাচ্ছে। তার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে, আমি স্পষ্ট টের পাই। কিন্তু কোথাও কোনও ফুটো খুঁজে পাচ্ছে না। নানা স্মৃতি, সুখ-দুঃখ, বেঁচে থাকার অভ্যাস সব এসে শরীরের রন্ধ্রগুলিতে ছিপির মতো মুখ আটকায়। আত্মাটা ঘরের মধ্যে তাড়া-খাওয়া চড়াইপাখির মতো ফরফর করে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক বার পাঁজরে ঘা দেয়, এক বার মাথার হলঘরে উড়ে বেড়ায়। চিড়িক করে ডাকে। বেরোতে পারে না।

আমি একা নিউ জলপাইগুড়িতে এসে দার্জিলিং মেল ধরি।

কলকাতায় এসে ফের নিজেকে সেট করে নিই। ঢিলে নাট-বল্টুগুলো একটু টাইট দিই, কাজকর্মের প্লাগ পয়েন্টের সঙ্গে কানেকশন দিই। মা-বাবার হরেক প্রশ্নের আলগা উত্তর দিতে দিতে চটপটে হাতে দাড়ি কামাই, স্নান করি, ভাত খাই, পোশাক পরে নিই। বাবা মর্তমান কলার ছড়াটার ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকে। মা বলে, দাদা বাঁচবে আরও বলছিস?

একশো বছর। তারপরও ইচ্ছা-মৃত্যু।

আহা, তাই যেন হয়।

এ-রকম কলা কলকাতায় হয় না, আর-একটা দাও তো। বলে বাবা হাত বাড়ায় তৃতীয় কলাটার জন্য।

মা শ্বাস ফেলে কলা আনতে যায়।

অফিসে ঢুকতেই পালিতদা, ঠিক স্বপ্নে যেমন, তেমনি মুখ বিকৃত করে বললেন, এসেছ? বাঁচালে।

কেন পালিতদা?

রোজ টেলিফোন। কবে আসবে, কবে আসবে বলে মাথা গরম করে দিল। রোজ বারোটা নাগাদ ফোন আসে। তো বাপু, রেখে যাও কেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেই তো পারো। তা হলে আর ঝামেলা হয় না।

আমি লাজুক হাসি হাসলাম। স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে। আমার বুকের মধ্যে দুরন্ত ধাক্কা দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আত্মাটাও এক বার চিড়িক করে ডাকল। সত্যিকারের ব্যথা হতে লাগল বুকে। প্রচুর জল খেতে থাকি। ঘন ঘন বাথরুমে যেতে হচ্ছিল। দেয়াল-ঘড়ির কাঁটা ট্রাফিক পুলিশের মতো পৌনে বারোটার কাছে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে টেলিফোন বাজে, পালিতদা বিরক্তমুখে ফোন তোলেন, আমি উঠতে উঠতে বলি, আমার?

আরে না। সামন্তর ভায়রাভাই সামন্তকে চাইছে। তুমি বোসো।

একটা বিপজ্জনক বেয়ারার চেক হাত দিয়ে পাশ হয়ে গেল। ইনডেক্স কার্ডগুলিকে ফেলছি। পালিতদাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়, কে ফোনটা করছে রোজ। তবু জিজ্ঞেস করি না। থাক, আর একটুক্ষণ রহস্য থাক। সে নিজেই বলুক, সে কে!

আবার বাথরুম থেকে আসি। ফের জল খাই। প্রায় না-দেখে ফের একটা হাজার টাকার চেক ছেড়ে দিই।

দেয়াল-ঘড়িতে বারোটা। পৃথিবী থেমে আছে। পালিতদা স্থির, তার সিগারেটের ধোঁয়া পর্যন্ত ফ্রিজ হয়ে আছে। একটা লোক পাশ-বই নিয়ে হাত বাড়িয়ে মাঝ-পথে থেমে আছে। পেমেন্ট কাউন্টারের জয়ন্ত টাকা গোনার মাঝপথে আঁকা ছবি। বাইরে ট্র্যাফিক থেমে গেল। কলকাতা মুহূর্তের জন্য থেমে রইল।

খুব অন্যরকম শব্দে ফোন বেজে উঠল। একটু লাজুক শব্দ, দ্বিধায় জড়িত।

আমি পালিতদাকে সুযোগই দিলাম না। গম্ভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলাম।

ইন্দ্রজিৎবাবু আছেন? রহস্যময়ীর গলা।

বলছি। অতিকষ্টে বলতে পারলাম।

ও। বলে থমকে গেল গলাটা।

আপনি কে? আমি জিজ্ঞেস করি।

আপনি কবে ফিরেছেন?

আজই সকালে।

ও।

আপনি কে বলছেন?

একটু থেমে সে বলে, আমি সেই সনাতনী। চিনতে পারছেন?

আমি শ্বাস ফেলে বলি, পারছি।

সনাতনী বোধহয় হাসল, পরিষ্কার মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম।

বলল, আমার একটা কথা ছিল।

কী?

বউদি দার্জিলিঙে আমাকে একটা কথা বলেছিল। সেই কথাটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি।

কথাটা কেমন?

খুব সুন্দর। কিন্তু বউদি বলে যে, ওইরকম কথা বলাই নাকি আপনার স্বভাব। সবাইকেই নাকি বলেন।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, হ্যাঁ, সুস্তি। কিন্তু কথাটা কেউ কানে তোলে না আজকাল।

প্লিজ, আপনি আমাকে সুস্তি ডাকবেন না। ও-নামটা একদম ভাল লাগে না। আপনি সনাতনী ডাকবেন।

আচ্ছা। আমি বলি।

ও-কথাটা আপনি সবাইকে বলেন কেন ইন্দ্রজিৎবাবু? বউদি বলে, আপনি নাকি মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করতে ভীষণ ভালবাসেন। তাই ও-রকম সব কথা বলে মেয়েদের রাজি করিয়ে আপনি একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলেন।

চোখে জল আসছিল। ডান-হাতে ফোন ধরে আছি। তাই বাঁ হাতে ডান দিকের পকেট থেকে কিছুতেই রুমালটা বের করতে পারছি না। হাত বদল করে যে বাঁ কানে ফোন নেব, তারও অসুবিধে। কেন জানি না, বাঁ কানে ফোন ধরলে আমি ভাল শুনতে পাই না।

আমি জিভে আমার অশ্রুর নোনতা স্বাদ পেলাম। তেষ্টা পেয়েছিল, তাই সেই কয়েক ফোঁটা জল জিভে ভিজিয়ে অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলি, আমি কাউকে কাউকে ফিরিয়ে দিয়েছি সনাতনী।

আমাকেও কি ফিরিয়ে দেবেন?

আমি অস্ফুট গলায় বললাম, সনাতনী, একটু অপেক্ষা করো। একটুক্ষণ মাত্র।

সুস্তি গাঢ় গলায় বলে, আহা বেচারা! আমি অপেক্ষা করছি। আপনি একটু ভেবে বলুন।

আমি ভাবতে লাগলাম। পরিষ্কার টের পাচ্ছি, আমার মাথার মধ্যে একটা অক্ষম কম্পিউটার যন্ত্রের ভেতর দিয়ে এর উত্তর খোঁজা হচ্ছে। আমার জীবনের যাবতীয় তথ্য এবং ঘটনার দলিল-দস্তাবেজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যন্ত্রে। নানা শব্দ তুলে যন্ত্রটা উত্তর তৈরি করছে।

আমি সতর্ক গলায় বলি, ধরে আছ তো সনাতনী?

আছি। আপনি ভাবুন।

কম্পিউটার মেশিনটা ছত্রিশ বছরের পুরনো। খুব ভাল কাজ করে না। তবু চেষ্টা করছে প্রাণপণে। যেন কোনও ভুল উত্তর না দিতে হয়। অনন্ত সময় কেটে যেতে থাকে। অফিস-সুদ্ধু লোক চেয়ে আছে আমার দিকে। সনাতনী কান পেতে আছে নেপথ্যে। টেলিফোনের কানেকশন কতক্ষণ থাকবে কে জানে! কত ভেজাল লাইন এসে ঢুকে যাবে, কত অচেনা লোক ক্রস-কানেকশনে অনর্গল কথার ফোয়ারা খুলে দেবে।

আমি বলি, সনাতনী, ধরে আছ তো?

আছি। থাকব।

আমি প্রবলভাবে ভাবতে থাকি। এক সময়ে, সুখে বা দুঃখে, আমার চোখ ভরে আবার জল আসে। মুখে কথা আসছে না। সনাতনী অপেক্ষা করছে।

বন্ধুগণ, ভাইসব, মশাইরা, যন্ত্রটা কী উত্তর দেবে বলুন তো!

যাও পাখি

॥ এক ॥

সোমেন জানে, প্রেমের মূলেও আছে ভিটামিন।

ব্যাপারটা সে টের পেল শনিবার সকালে, বৈঁচী স্টেশন থেকে আড়াই মাইল উত্তরে গোবিন্দপুর গাঁয়ে বহেরুর কিচেন গার্ডেনে বসে। কিচেন গার্ডেন বললে অবশ্য কিছুই বলা হয় না। বহেরু তার বিশাল পরিবারের সবজিটা এই খেতে ফলিয়ে নেয়। আড়েদিঘে খেতটা চার-পাঁচ বিঘে হেসে-খেলে হবে। বহেরু আদ্যিকালের চাষা নয়, কেমিকাল সার, ইনসেকটিসাইডসের সব বৃত্তান্ত জানে। জানে ব্যাঙ্কের সুদের হার, রাইটার্স বিল্ডিংস বা বি-ডি-ও অফিসে গিয়ে মুখচোরা জোড়হাত চাষার মতো ঈশ্বর ভরসায় বসে থাকে না, চোটেপাটে কথা বলে কাজ আদায় করে আসে। বহেরু যে উন্নতি করেছে তা তার এই সবজিখেতের উন্নত সতেজ সবুজ রং সংকেতে জানিয়ে দিচ্ছে। একটু দূরেই চলছে পাঁচ-ঘোড়ার পাম্পসেট। ডিজেলের গন্ধ আর ফটফট শব্দ। বছরে বার দুই সে ভাড়া করে ট্রাক্টর। বহেরুর পরিবারের নামে বা বেনামে কত জমি আছে তার হিসেব সোমেন জানে না। আন্দাজ করে দেড়-দুইশো বিঘে হবে। অনেক আগে যখন এখানে আসত সোমেন তখন অত বাড়বাড়ন্ত দেখেনি। মাঠের ধান উঠে গেছে। পড়ে আছে ন্যাড়া মাথায় সদ্য গজানো চুলের মতো কাঁটা কাঁটা ধানের গোড়া। তবু সেই খেত সারা সকাল ধরে দেখিয়েছে তাকে বহেরু। দু'-চার জায়গায় আগুনের চিহ্ন পড়ে আছে মাটিতে। এ-জায়গায় আখের চাষ হয়। বহেরু মোটা সুতির একটা ভাগলপুরি চাদর গায়ে, পরনে ধুতি আর পায়ে বাটা কোম্পানির মজবুত একজোড়া খাকি রঙের হকিবুট পরে ঘুরে ঘুরে তাকে খানিকটা জমিজিরেত দেখাল। এক বার দাঁড়িয়ে পড়ে সখেদে একটা ঢেলা বুটের ডগায় উলটে দিয়ে বলল, মাটির কি আর নিজের দুধ আছে।

কী বলো বহেরু? সোমেন জিজ্ঞেস করল।

মাটির নিজের রস হল মায়ের বুকের দুধের মতো। কেমিকাল সার হচ্ছে গুঁড়ো দুধ, সেই নকল দুধ মায়ের বুকে ভরে দেওয়া। ছেলেবেলা যেমন স্বাদ পেতেন সবজিতে, এখন আর পান?

সোমেন মুশকিলে পড়ে যায়। শাকসবজির স্বাদ নিয়ে সে মাথা ঘামায় না, পাতে দিলে সে মটর শাকের সঙ্গে খেসারির শাকের তফাত বুঝতে পারে না। চুপ করে রইল।

এ মাটি হচ্ছে এখন ওষুধের জোরে বেঁচে থাকা রুগি। নিজের জোর বল নেই। ওষুধ না পড়লে বছর-বিয়োনি বাঁজা বনে যাবে।

খালধার পর্যন্ত যেতে যেতে রোদ চড়ে গেল। বহেরু ভাগলপুরি চাদরখানা খুলে ফেলল গা থেকে। গায়ে একটা ফতুয়া। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস কে বলবে? হাতে-বুকে ঢিলে চামড়ার তলা থেকে ডিম-ডিম পেশি পিছলোচ্ছে। গর্দানখানা ভাল খাঁড়া দিয়েও এক কোপে নামানো যাবে না, এত নিরেট। চুলে পাক ধরেছে কিন্তু চোখ দু'খানা এখনও রোদে ঝিকোয়। বিশাল লম্বা বহেরু। চাদরখানা খুলে মাটির বাঁধের ওপর যখন দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল তখনই অস্পষ্টভাবে সোমেন ভিটামিনের কার্যকারিতা বুঝতে পেরেছিল। ঢালুতে দাঁড়িয়ে সোমেন দেখে বাঁধের ওপরে শীতের ফিরোজা আকাশের গায়ে বিশাল স্তম্ভের মতো উঠে গেছে বহেরুর শরীর। এখানে রোদে বাতাসেও

ভিটামিন ভেসে বেড়ায় নাকি? সেই সঙ্গে ক্যালসিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিনও? কতকাল ধরে বহেরু প্রায় এক রকমের আছে। নিমের দাঁতনে মাজা স্টেনলেস স্টিলের মতো শক্ত দাঁত দেখিয়ে হেসে বহেরু হাত তুলে খালধারে একটা অনির্দিষ্ট এলাকা দেখিয়ে বলল, এই হচ্ছে আপনাদের জমি, এক লপ্তে পাঁচ বিঘে। পোটাক উজিয়ে গেলে আরও এক বিঘে আছে আপনাদের, সে কিন্তু অনাবাদি, মরা জমি। ঠাকরোনকে বলবেন, সে-জমিতে চাষ দিতে এখনও দু'-তিন বর্ষা লাগবে।

গতকাল তাড়াতাড়ি কিট ব্যাগ গুছিয়ে দুপুরের বর্ধমান লোকাল ধরেছে সোমেন। তাড়াহুড়োয় ভুলভ্রান্তি হয়। আজ সকালে দেখে টুথব্রাশ আনেনি। বহেরুর ছেলে শক্ত দেখে নিমডাল কেটে দিয়েছিল, সকালে সেটা আধ ঘণ্টা চিবিয়ে মাড়ি ছড়ে গেছে, মুখে বিদঘুটে স্বাদ। বহেরুর সত্তর বছরের পুরনো আসল দাঁতগুলোর দিকে চেয়ে সোমেন মুগ্ধ হয়ে গেল। ক্লোরোফিলের কাজ।

কাল রাতে তার সম্মানে বহেরু মুরগি মেরেছিল। এরা ব্রাহ্মণের পাতে নিজেদের হাতের রান্না দেয় না। সোমেনকে নিজে রেঁধে নিতে হয়েছে। খুব তেল-ঘি-রসুন-পেঁয়াজ-লঙ্কা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তেমন কষায়নি বলে মাংসটা জমেনি তেমন। খিদের মুখে একপেট সেই ঝোলভাত খেয়েছে। এগারো ঘণ্টা পর আজ সকালে সেই মাংসের একটা ঢেকুর উঠল। সোমেন হাতের পাতায় চোখের রোদ আড়াল করে ধু-ধু মাঠ ময়দান দেখে।

ফেরার পথে সোমেন জিজ্ঞেস করল, বাবা এখানে এসে করে কী?

বহেরু সামনে হাঁটছে। লাঠিয়াল চেহারা। কাঁধে চাদর ফেলা। উত্তুরে বাতাস দিচ্ছে টেনে। রোদ ফুঁড়ে বাতাসের কামড় বসে যাচ্ছে শরীরে। বহেরুর ভ্রূক্ষেপ নেই। লং ক্লথের ফতুয়ার আড়ালে চওড়া কাঁধ। অহংকারী চেহারা। খুলনা জেলার গাঁয়ে সে ছিল কখনও কামলা, কখনও ডাকাত, কখনও দাঙ্গাবাজ, আবার কিছু কিছু ভাগের চাষও করত, শীতের নদীতে মাছ ধরতে যেত, আবার সোমেনদের দেশের বাড়িতে ঘরামি বা মুনিশও খেটে গেছে। দেশ ভাগাভাগির সময়ে সে একটা সুযোগ নেয়। যশোর আর খুলনার রাস্তায় ঘরছাড়া মানুষদের ওপর হামলা করে সে কিছু কাঁচা পয়সার মুখ দেখে। শোনা যায়, নিজের দলের গোটা চারেক লোককে কেটে সে ভাগীদার কমিয়ে ফেলে। গোবিন্দপুরে এসে এক মুসলমান চাষির সঙ্গে দেশের জমি বদলাবার অছিলায় তাকে উচ্ছেদ করে জমির দখল নেয়। তারপর এই উন্নতি। সেই উন্নতিটাই কঠিন এবং সহজ শরীরের অহংকারে ফুটে উঠেছে এখন।

মুখটা না ফিরিয়েই জবাব দিল বহেরু, কী আর করবেন! বুড়ো মানুষ। এমনভাবে 'বুড়োমানুষ' কথাটা বলল যেন বা সে নিজে তেমন বুড়োমানুষ নয়। একটু ভেবেচিন্তে সাবধানে বলে, সারাদিন পুঁথিপত্রই নাড়াচাড়া করেন, খুড়োমশাইয়ের কাছে সাঁঝ-সকাল খোলের বোল তোলেন, কচি-কাঁচাগুলোকে লেখাপড়াও করান একটু-আধটু, রোগেভোগে ওষুধপত্র দেন। মাঝে মাঝে বাই চাপলে এধার-ওধাব চলে যান। যেমন এখন গেছেন।

কোথায় গেছে কিছু বলে যায়নি?

বহেরু মাথা নাড়ল, কথাবার্তা তো বলেন না বেশি। বলা-কওয়ার ধারও ধারেন না। আমরা ভাবলাম বুঝি কলকাতাতেই গেলেন, ঠাকরোন আর ছানাপোনাকে দেখা দিয়ে আসবেন। গেছেন তো মোটে চার দিন।

না বহেরু, এক মাস হয় আমরা কোনও খবরবার্তা পাইনি!

বহেরু দুশ্চিন্তাহীন গলায় বলে, আছেন কোথাও। উদাসী মানুষ। যেদিন মন হবে ফিরে আসবেনখন। ভাববেন না।

বহেরুর কথাটায় একটু তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। বাবার প্রতি নয়, তার প্রতি বা তাদের প্রতি। যেন-বা বাবা কোথায় আছে তা জেনেও বলার চাড় নেই বহেরুর। বহেরু কি বুঝে গেছে যে বাবার খোঁজে সোমেনদের আর সত্যিই দরকার নেই? খোঁজখবর করাটা বাহুল্য মাত্র?

মাঠটা পার হয়ে এল তারা। বড় রাস্তাটা অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পুরনো, পাথরকুচির রাস্তা। কোনওকালে বোধহয় মেরামত হয়নি, গোরুর গাড়ির চাকায় আর গত বর্ষার জলে চষা জমির মতো এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে, তারই পাশে একা দাঁড়িয়ে আছে বহেরুর খামারবাড়ি। আশেপাশে আর গাঁ-ঘর নেই। গোবিন্দপুরের বসত আরও কিছু উত্তরে। বহেরুর খামারবাড়িতে আটচালা, চারচালা, দোচালা মিশিয়ে দশ-বারোখানা ঘর। আর আছে গোশালা, ঘানিঘর, ঢেঁকিঘর, কাঠের মাচানের ওপর জাল দেওয়া একটা হাঁস-মুরগির পোলট্রিও। প্রায় স্বয়ম্ভর ব্যবস্থা। জামা-কাপড় আর শৌখিন জিনিসপত্র ছাড়া বহেরুদের প্রায় কিছুই কিনতে হয় না।

বাড়ির হাতায় পা দিয়ে বহেরু হাত তুলে উত্তর দিকটা দেখিয়ে বলল, ওই গোবিন্দপুরের লোকগুলো খচ্চর। আমি এখানে নিজের মতো একখানা গাঁ করব। বহেরু গাঁ।

চোখ দুটো আবার রোদে ঝিকোল। ঠাট্টার কথা নয়, বহেরু হয়তো বা পারে। সে ভাগচাষি বা বরগাদার নয়। সে নিজস্ব জোতের মালিক, পয়সায় সোমেনদের কেনাবেচা করার মতো ধনী। তবু যে সে সোমেনদের জমি চষে দেয়, ফসলের দাম দেয়, সে তার দয়া। একসময়ে সে সোমেনদের বাপ-দাদুর নুন খেয়েছে। বাড়ির চাকরবাকরের মতো ছিল। দান উলটে গেছে এখন। সোমেনের বাবা বোধহয় এখন বহেরুরই একজন কর্মচারী মাত্র, বাচ্চাদের পড়ায়, তার অর্থ প্রাইভেট টিউটর, হিসেবনিকেশও বোধহয় কিছু করে দেয়। তার মানে, বাবা এখন বহেরুর ম্যানেজার কিংবা নায়েব। এ পর্যন্ত যখন বহেরু পেরেছে, নিজের নামে একখানা গাঁয়ের প্রতিষ্ঠা করতেও পারবে। জ্ঞাতিগুষ্টি মিলিয়ে বহেরুর পরিবারেই প্রায় এক গাঁ লোকজন।

উঠোন থেকে খোলের শব্দ আসছে। কাল সন্ধেবেলাও শুনেছিল খোলের শব্দ, আবার খুব ভোরে। বহেরুর নব্বই বছর বয়সি জ্ঞাতিখুড়ো দিগম্বরের ওই এক শখ। এ-বাড়িতে বোধহয় ওই লোকটিই স্বার্থশূন্য এক বাতিক নিয়ে আছে। খেতখামার, বিষয়-আশয় বোঝে না। বোঝে কেবল খোলের শব্দ। তাতেই মাতাল হয়ে আছে। ভোররাতে সোমেন ঘুম ভেঙে প্রথমে বিরক্ত হয়েছিল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কাত হয়ে শুয়ে কানে বালিশ চাপা দিয়ে শব্দটা আটকাবার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ। কিন্তু দূরাগত মেঘের গুরু গুরু ধ্বনির মতো শব্দটা খুব সহজেই তার বুকে ঘা মারতে থাকে। চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ওই শব্দটা যেন ওই নিস্তব্ধতারই একটা স্পষ্ট রূপ। বাজনার কিছুই জানে না সোমেন। কিন্তু ক্রমে ওই শব্দ তাকে কিছুক্ষণের জন্য অন্য সব শব্দের প্রতি বধির করে দিল। না-টানা সিগারেটের ছাই লম্বা হয়ে ঝুলে থাকে। সে অনুভব করে তার হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক ডুবডাব শব্দ আস্তে আস্তে বদলে যায়। বহেরুর বুড়ো খুড়োর আঙুলের টোকায় টোকায় নাচে তার আনন্দিত হৃৎপিণ্ড।

সকালে উঠেই সে তাই প্রথমে বুড়ো লোকটাকে খুঁজে বের করে।

বড় ভাল বাজান তো আপনি!

ঘোলাটে ছোট ছোট দুই চোখ, বেঁটেখাটো চেহারা এ-বয়সেও মজবুত, আঙুলগুলোর ডগায় কড়া, ঝুপ্‌পুস এক নোংরা তুলোর কম্বল মুড়ি দিয়ে রোদে বসে ছিল মহানিম গাছটার তলায়। হাতে কাঁসার গ্লাসে চা। সোমেনের কথা শুনে কেঁপে ওঠে বুড়ো, হাতের চা চলকে যায়। বলে, আমি?

আপনিই তো বাজালেন।

বুড়ো থরথরিয়ে কেঁপে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। হাত বাড়িয়ে সোমেনের হাত দুটো সাপটে ধরে ককিয়ে ওঠে, আমি না বাবু, আমি না। গুরু বাজাইছে। মাঝে-মইধ্যে গুরু ভর করে শরীলে....

কথার টান শুনে বোঝা যায় দিগম্বর ঢাকা বা ওদিককার পুব দেশের লোক। যশোর বা খুলনার নয়। তবু কেন যে তাকে জ্ঞাতি বা খুড়ো বলে চালাচ্ছে বহেরু তা কে জানে! সোমেন শুনেছে, বহেরু নানা জায়গার সব গুণী, কিম্ভূত বা অস্বাভাবিক লোক এনে তার নিজের কাছে রাখে। এটাই ওর বাতিক। কী পরিষ্কার টনটনে আওয়াজে ওই খোল বাজছে এখন। কী একটা কথা ফুটি-ফুটি হয়ে

উঠছে। ঠিক বোঝা যায় না। আবার বোঝাও যায়। বহেরুর বিশাল সংসারের নানা বিষয়কর্মের শব্দ উঠছে। কুয়োয় বালতি ফেলার শব্দ, পাম্পসেটের আওয়াজ, শিশুদের চিৎকার, বাসনের শব্দ। কিন্তু সব শব্দের ওপরে খোলের আওয়াজ বধির করে দিচ্ছে পৃথিবীকে।

হলুদ কুঞ্জলতায় ছেয়ে আছে কাঁটাঝোপের বেড়া। সোনা রঙে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তার পাশে বহেরু দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শোনে একটু। তারপর হঠাৎ ফিরে বলে, খুড়োমশাইয়ের খোল কী বলছে বুঝছেন?

সোমেন অবাক হয়ে বলে, না তো! কী?

ভাল করে শুনুন।

সোমেন শোনে। বলছে বটে, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না।

বহেরুর বিষয়ী চোখ দুটো হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তাতে একটা বৈরাগ্যও এসে যায় বুঝি। মাথা নেড়ে বলে, ঘুঘু তাড়া, ঘুঘু তাড়া, ঘুঘু তাড়া...

হাসে বহেরু।

কিন্তু সোমেন অবাক হয়ে শোনে। সত্যিই পরিষ্কার ভাষাটা বুঝতে পারে সে। ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া...

আবার পালটে যায় বোল। বহেরু হাঁটতে হাঁটতে বলে, এখন বলছে চিঁড়ে আন, চিঁড়ে আন, চিঁড়ে আন....

পরমুহূর্তেই আবার পালটে যায় বোল। বাঙ্ময় খোলে বহেরুর খুড়ো আর-একটা কী কথা বলে যেতে থাকে।

বহেরু হাঁটতে হাঁটতে ধুঁধুল লতায় অন্ধকার শুঁড়িপথ ধরে বলে, এবার বলছে মাখিজুখি, মাখিজুখি, মাখিজুখি...

দু'-তিনটে সমের শব্দ ওঠে। খোল বোল পালটাচ্ছে।

বহেরু শ্বাস ছেড়ে বলে, শুনুন, বলছে, দে দই, দে দই, দে দই...

সোমেন দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর হাঁটে আবার। খোল ততক্ষণে ফিরে ধরেছে প্রথম বোল। ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া ঘুঘু তাড়া...

একটু হতাশায় ম্লান হাসি হেসে বহেরু মাথা নেড়ে বলে, সারাদিনই শুনবেন ওই আওয়াজ। যান আপনি বিশ্রাম করেন।

মটরশাকের খেতে সাদা ফুল প্রজাপতির মতো আলগোছে ফুটে আছে। বহেরু যখন খেতটা পার হচ্ছে, তখন গাছগুলি শুঁড় বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করতে চাইছে, এই দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখল সোমেন।

বিশ্রাম করার কিছু ছিল না। বহেরু বয়স্ক লোক, তার ওপর দেশের মানুষ। সিগারেটটা এতক্ষণ ইচ্ছে করেই খায়নি সে। একটা সিগারেট খাবে বলে ঘরে ঢুকল। বাবার ঘর। এই ঘরটায় রাত কাটিয়েছে সোমেন। বড় কষ্ট গেছে।

সরগাছের বেড়ার ওপর মাটি লেপা, ওপরে টিনের চাল। সারা রাত ফাঁক-ফোকর দিয়ে বাতাস ঢুকেছে, আর শব্দ উঠেছে টিনের চালে। একধারে বাঁশের মাচানে বিছানা। গদির বদলে চটের ভিতরে খড় ভরে গদি বানানো হয়েছে, তার ওপর শতরঞ্জি আর পাতলা তোশকের বিছানা। গায়ে দেওয়ার জন্য একটা মোটা কাঁথা। একটা শক্ত বালিশ।

একটা হলদি কাঠের শেলফে কিছু কাচের জার, শিশি, বোতল। কৃষি বিজ্ঞানের কয়েকটা বই। একটা ছোট টেবিল, লোহার চেয়ার। দুটো ঝাঁপের জানালা খুলে আলো হাওয়ার রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তবু ঘরটা আবছা। দীর্ঘ বৃষ্টির দিনে যেমন ঘরের আসবাবে, বিছানায় একটা সোঁদা গন্ধ জমে ওঠে, এ-ঘরে তেমনই এক গন্ধ। মাটির মেঝেয় ইঁদুরের গর্ত, বাঁশের খুঁটির নীচে ঘুণপোকায়

কাটা বাঁশের গুঁড়ো। উইয়ের লাইন গেছে কাঠের তক্তার পাটাতন পর্যন্ত। বাবার বউল-ওলা খড়ম জোড়া আর একটা পিতলের গাড়ু মাচানের নীচে। তার পাশে বড় একটা টিনের, আর একটা চামড়ার স্যুটকেস। দুটোই বিবর্ণ। মশারিটা চালি করে রেখে গেছে কে, ঘরটা ঝাঁটপাটও দিয়েছে, কিন্তু কিছুমাত্র উজ্জ্বলতা ফোটেনি। এই ঘরে তার বাবা থাকে। দিনের পর দিন। এবং প্রায় অকারণে। ভাবতে, বহুকাল বাদে বাবার জন্য একটু করুণা বোধ করে সোমেন।

চেয়ারটায় বসতেই টিনের চেয়ারের কনকনে ঠান্ডা শরীরের নানা জায়গায় ছ্যাঁকা দেয়। তবু বসে থাকে সোমেন। একটা সিগারেট ধরায়।

গত এক মাসে বাবাকে দুটো চিঠি দেওয়া হয়েছে। একটারও জবাব পায়নি। বাবা চিঠি দেবে না, এ তাদের জানাই ছিল। কিছু লোক থাকে যারা ঘর-জ্বালানি কিন্তু পর-ভুলানি। নিম্পর লোকেরা নাম শুনলে কপালে জোড়হাত ঠেকিয়ে বলে সাক্ষাৎ দেবতা। অমন পরোপকারী মানুষ হয় না। কিন্তু ঘরের লোক জানে, ও-রকম খেয়ালি, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর মানুষ আর নেই। এ-রকমই একজন ঘরজ্বালানি লোক হচ্ছে বাবা, যাকে বাড়ির লোক বাদে আর সবাই সম্মান করে। পরোপকারী? হবেও বা। বাবার খুব বেশি রহস্য জানা নেই সোমেনের। সে মা'র কাছে শুনেছে, ভরা যৌবনে স্ত্রীকে রাতে-বিরেতে পাড়াপড়শির ভরসায় ফেলে রেখে বাবা যাত্রা-থিয়েটারে যেত। যাত্রা-থিয়েটারে পার্টও করত না, দেখতেও যেত না। যেত, স্টেজ বাঁধতে যাত্রাদলের সুখসুবিধের ব্যবস্থা করতে। ফুটবল খেলতে না জানলেও গাঁয়ের ম্যাচ-এ বাবা ছিল প্রধান জোগাড়ে মানুষ। গ্রাম দেশে প্রথা আছে, গোলপোস্টের পিছনে একজন কোনও নিষ্কর্মাকে গোলজাজ হিসেবে বসিয়ে দেওয়ার। বাবার কোনও যোগ্যতা ছিল না বলে 'গোলজাজ' হত বরাবর। এ-রকম কোনওখানে কিছু একটা হচ্ছে জানলেই সেখানে ছুটে যেত মহা ব্যস্ততায়, দরকার থাক না থাক, সামান্য যে-কোনও দায়িত্ব নিয়ে সাংঘাতিক ডাক-হাঁক পাড়ত। পাড়াপড়শিদের ফাইফরমাশ খাটত বিনা দ্বিধায়। আশপাশের বিশ গাঁয়ের লোকের কাছে ব্রজগোপাল ছিল অপরিহার্য লোক। ব্রিজ খেলার কারও পার্টনার না জুটলে ব্রজগোপাল তিন ক্রোশ বর্ষার গেঁয়ো রাস্তা ঠেঙিয়ে যেত। খেলতে পারত না তেমন, ভুলভাল ডাক দিত। পার্টনার রাগারাগি করলে অমায়িক হাসত। সবাই জানে, এমন নিরীহ লোক হয় না। কিন্তু বাড়িতে সে-লোকের অন্য চেহারা। পুরুষসিংহ যাকে বলে। সোমেনরা মা'র কাছে শুনেছে, বারোটা রাতে দেড়সের মাংস আর তিনজন উটকো অতিথি জুটিয়ে এনে মাকে দিয়ে সেই রাতেই রাঁধিয়ে ভোর রাতে খেয়ে বিছানায় গেছে। তিথি-না-মানা অতিথির জ্বালায় মা অতিষ্ঠ, বাড়ির লোকজন জ্বালাতন। সারা যৌবন বয়সটা বাবাকে রোজগার করতে কেউ দেখেনি। দাদুর জমিজিরেত আর সেরেস্তার চাকরির আয়ে সংসার চলত। নেশাভাং ছিল না বটে, কিন্তু বাড়ির জিনিসপত্র, এমনকী নিজের বিয়ের শাল, আংটি, ঘড়ি পরকে বিলিয়ে দিতে বাধেনি।

সোমেনরা জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখেছে বাবা বাড়ি ফিরলেই মা'র সঙ্গে ঝগড়া লাগে। প্রথম প্রথম সে-ঝগড়ার মধ্যে মান-অভিমান ছিল। মানভঞ্জনও তারা লুকিয়ে দেখে হেসে কুটিপাটি হয়েছে। বাবা মা'র পায়ে মাথা কুটেছে, আর মা খুশিয়ালি মুখে ভয়-পাওয়া-ভাব ফুটিয়ে বলছে, পায়ে হাত দিয়ে আমায় পাপের তলায় ফেলছ, আমি যে কুষ্ঠ হয়ে মরব! কিন্তু ক্রমে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখেছে ঝগড়ার রকম পালটাচ্ছে। তখন দাদু বেঁচে নেই, দেশ ভাগ হয়েছে। অপদার্থ বাবা কোনওখানে জমি দখল করতে পারল না। ভাড়াটে বাড়িতে সংসার পেতেছে। তবু ধাত পালটায়নি। দু'-তিনরকমের চাকরি করেছে বাবা সে-সময়ে। প্রথমে ভলান্টিয়ার, তারপর রেশনের দোকান, কাপড়ের ব্যবসা। কোনওটাই সুবিধে হয়নি। তবে প্রচুর লোকের সঙ্গে পরিচয় থাকার সূত্রে, সবশেষে বেশি বয়সে একটা সরকারি কেরানিগিরি জুটিয়ে নেয়। কিন্তু বার-ছুট নেশা ছিল সমান। সোমেন মনে করতে পারে, তারা শিশু বয়সে দেখেছে দিনের পর দিন বাবা বাড়ি নেই। বনগাঁ থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বাবা যেত উদ্বাস্তুদের তদারক করতে কিংবা কোনও

মচ্ছবের ব্যবস্থায়, সংকীর্তনের দলে। কোনওটাই কাজের কাজ নয়। বাড়িতে মা আর চারটি শিশু-সন্তান একা। তখন মা আর বাবার ঝগড়ায় মান-অভিমান মরে যেতে লাগল। এল গালাগালি। মা বলত শয়তান, বেইমান, বাবা বলত নিমকহারাম, ছোটলোক। তখন বাবা বাড়িতে না-এলেই তারা ভাল থাকে। পরস্পরের প্রতি আক্রোশ দেখে তাদের মনে হত, মা-বাবার এবার মারামারি লাগবে। মারামারি লাগত না। কিন্তু বাবা আরও বারমুখো হয়ে যেতে লাগল। পাঁচজনে বলত, ব্রজগোপালের মতো সচ্চরিত্র লোক হয় না, অমন নিরীহ আর মহৎ দেখা যায় না। সোমেনরাও সেটা অবিশ্বাস করত না। বাইরে লোকটা তাই ছিল। নেশাভাং বা মেয়েমানুষের দোষ নেই, ঝগড়া-কাজিয়া মেটায়, পাঁচজনের দায়ে-দফায় গিয়ে পড়ে। অমায়িক, মিষ্টভাষী, অক্রোধী। তাকে ভালবাসে না এমন লোক নেই। মা ছিল একটিমাত্র মানুষ যার সংস্পর্শে এলেই বাবার চেহারা যেত পালটে। এবং ভাইস ভার্সা।

বড় হয়ে তারা ভাই-বোনেরা বাবা-মায়ের স্থায়ী ঝগড়াটা মিটিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছে। বাবা কিংবা মা আলাদাভাবে কেউই লোক খারাপ ছিল না। দাদা এক বার মা-বাবাকে টাকা-পয়সা দিয়ে বুড়ো বয়সে লেট হানিমুন করতে পাঠালে পুরীতে। বিশ্বাস ছিল, সমুদ্রের বিশাল বিস্তারের সামনে, আর তীর্থের গুণে যদি দু'জনের মধ্যে একটা টান জন্মায়। কিন্তু মা-বাবা খড়্গপুর পার হতে পারেনি। সেখান থেকে ফিরতি ট্রেনে দুই আলাদা কামরায় চড়ে দু'জনে ফিরে এল। বাসায় ফিরল আলাদা ট্যাক্সিতে। কথা বন্ধ।

বাবা রিটায়ার করার পর অবস্থা উঠল চরমে। তখন বাবা কিছু বেশি সময় বাসায় থাকত। তখন ঝগড়াটা দাঁড়াল, মা বাবাকে বলত, তুমি মরো, বাবা মাকে বলত, আমি মরলে বুঝবে, দুনিয়াটা হাতের মোয়া নয়। লজ্জার কথা এই, ততদিনে দাদার বউ এসেছে, তাদের ছেলেপুলে হয়েছে। দিদিদের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, জামাইরা আসা-যাওয়া করে। তখন মা-বাবা দু'জনেই ছেলেমেয়েদের নিজের নিজের দিকে সাক্ষী মানতে শুরু করেছে। বুড়ো বয়সের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় সবচেয়ে বড় দরকার হয় সাবালক ছেলেমেয়েদের সমর্থন। মা'র পাল্লাই ছিল ভারী। বাবা অভিমানে বাড়ি ছাড়ল। বাবার বাড়ি ছাড়াটা তখন নিতান্তই প্রয়োজন।

এ-কথা সত্যি যে, একমাত্র দাদা ছাড়া বাবার প্রতি তাদের আর কোনও ভাইবোনেরই তেমন টান নেই। ছেলেবেলা থেকেই তারা মাকে জানে। বাবার সঙ্গ তারা কদাচিৎ পেয়েছে। কাজেই, বাবা বাড়ি ছাড়ায় কেউ তেমন দুঃখ পায়নি। দাদাও না।

বাবা লোকটা বাউন্ডুলে হলেও তার একটা খুব বড় শখ ছিল। জমি। দেশ-গাঁয়ের লোকের জমির টান থাকেই। বাবার কিছু বেশি ছিল। মা'র গায়ের কিছু গয়না বেচে বহেরুর হাতে দিয়েছিল সেই দেশ ভাগাভাগির কিছু পরেই। বহেরু মা'র নামে ছ'বিঘে চাষের জমি কিনেছিল। আর নিজের খামারবাড়ির পাশে একটু বাস্তুজমিও। সেই জমিটা তারের বেড়ায় ঘেরা হয়ে পড়ে আছে। রিটায়ারমেন্টের সময়ে বাবা প্রায়ই ছেলেমেয়েদের এবং মাকেও বলত গোবিন্দপুরে বাড়ি করে সকলে মিলে থাকার কথা। কিন্তু ততদিনে তার ছেলেরা কলকাতার জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছে। কেউ এল না। বাবা গৃহত্যাগ করে এল একা। মাঝে মাঝে যায়। দু'মাসে-ছ'মাসে এক বার। চিঠিপত্র দেয় মাঝে মাঝে। দাদা কয়েকবার দেখা করে গেছে। কেউ এলে বাবা অভিমান করে রাগ করে বলে, কেন এসেছ? আমি বেশ আছি।

সোমেন জানে, সংসারের প্রতি, পরিবারের প্রতি বাবার কোনও টান আর নেই। তারাও বাবার কথা ভাবে না বড় একটা। আর পাঁচজন নিস্পর লোকের মতো বাবাও একজন। কোনও টান ভালবাসা, দেখার ইচ্ছে কখনও বোধ করেনি সোমেন। গত পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে সে বাবাকে দেখেছে এক-আধবার। বুড়োমতো, টান-টান চেহারার একজন গ্রাম্য লোক, ঢোলহাতা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরা, সদর থেকে বউদি বা দাদার ছেলেমেয়ে, কিংবা ঝি-চাকরের কাছে বাড়ির লোকের কুশল

জিজ্ঞাসা করে চলে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকত না, বাড়ির জলটলও খেত না। কিন্তু ফিরে আসবার সময় সিঁড়ি ভাঙত আস্তে আস্তে। দু'-এক বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাত। জোরে গলা খাঁকারি দিত। এ-দৃশ্য সোমেন নিজেই দেখেছে। কিন্তু কচালে বুড়োর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলার ইচ্ছে হয়নি।

বলতে কী, বাবার চেহারাটা ভুলেও গেছে সোমেন। দেখা হলে হয়তো চট করে চিনতেই পারবে না। সোমেনের জামার বুকপকেটে বাবাকে লেখা মা'র একটা ছোট্ট চিরকুট আছে। তাতে লেখা—তোমার কাছে কোনও দিন কিছু চাইনি। আমাকেও কিছু দিলে না তুমি। তোমার ইন্সিওরেন্সের পলিসিটা পেকেছে। আমার ইচ্ছা, ওই দশ হাজার টাকায় এখানে একটু জমি কিনি, আমাকে না দাও, রণেনকে অন্তত দাও। ভাড়া বাড়িতে আর থাকতে ইচ্ছা করে না। ইতি প্রণতা ননী।

বোধহয় বাবাকে লেখা মা'র এই প্রথম চিঠি। শেষ বয়সে। খোলা চিঠি, পড়তে কোনও বাধা নেই। আদর ভালবাসার কোনও কথা না থাক, তবু কেমন চমকে উঠতে হয় 'প্রণতা ননী' কথাটা দেখে। 'প্রণতা' কথাটাকে বড় আন্তরিক বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় সোমেনের। এই চিরকুটটা বাবার হাতে দিতে সোমেনের বড় লজ্জা করবে। আবার একটু ভালও লাগবে। ভাল লাগবে ওই 'প্রণতা'টুকুর জন্য। লজ্জা করবে টাকার প্রসঙ্গ আছে বলে। বাবা প্রভিডেন্ড ফান্ডের এক পয়সাও কাউকে দেয়নি। ইন্সিওরেন্সের টাকাটা কি দেবে? দাদাও আপত্তি করেছিল। কিন্তু মা শুনল না। বলল, আমাকে যখন 'নমিনি' করেছে তখন ও-টাকা আমাদেরই প্রাপ্য, কোনও দিন তো কিছু দেয়নি। প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকাটা বহেরুই পাবে শেষ পর্যন্ত, তোরা বাপেরটা কিচ্ছু পাবি না। বাপের সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবি কেন? ও পাগলের কাছ থেকে টাকা নিলেই মঙ্গল। নইলে পাঁচ ভূতে লুটে খাবে।

তাই মা'র চিঠি নিয়ে আসা সোমেনের।

টেবিলের ওপর কাগজপত্র পড়ে আছে, একটা স্বর্ণসিন্দূর খাওয়ার খল-নুড়ি, একটা দশবাতির ল্যাম্প, কিছু চিঠিপত্র, একটা সস্তা টাইমপিস টক টক বিকট শব্দ করে চলছে। চিঠিপত্রগুলো একটু ঘেঁটে দেখল সোমেন। কলকাতার কয়েকটা নার্সারির চিঠির সঙ্গে তাদের দেওয়া চিঠিও আছে। আর আছে আজেবাজে ক্যাটালগ, ক্যাশমেমো, কয়েকটা একসারসাইজ বুকের পৃষ্ঠায় সাঁটা কিছু গাছের পাতা, পাশে নামগোত্র লেখা। পুরনো মোটা একটা বাঁধানো খাতা। তার পাতা খুলে দেখল, প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে লেখা—ডায়েরি। তার পরের পৃষ্ঠায় লেখা—পতিত জমিটায় ভেষজ লাগাইব। তার পরের পৃষ্ঠাগুলিতে পর পর কুলেখাড়া, ঘৃতকুমারী, কালমেঘ ও পুরাতন চালকুমড়ার গুণাগুণ। একটা পৃষ্ঠায় লেখা—'বুড়োনিমের শিকড় হইতে ন্যাবার ওষুধ হইতে পারে, ফকির সাহেব বলেছেন।' তার পরেই লেখা—'তাণ্ডবস্তোত্র জপ করিলে অ্যাজমা সারে।' অন্য এক পৃষ্ঠায়—'ইজরায়েলের এক জ্যোতিষী বলিয়াছেন অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী শাসন করিবে কিছু শুভ্রবসন পরিহিত, দণ্ডধারী যোগীপুরুষ।'

এ-রকম কথা সর্বত্র। বোঝা যায়, বাবা কৃষি, ডাক্তারি, জ্যোতিষী, অকাল্ট ইত্যাদি সব কিছুরই চর্চা করে। ছেলেমানুষি। ডায়েরির কোনও একটা পৃষ্ঠায় চিঠিটা গুঁজে রাখবে বলে শেষদিকের পাতা ওলটাতেই সোমেন দেখে একটা প্রায় সাদা পৃষ্ঠা। ঠিক তার মাঝখানে গোটা অক্ষরে লেখা—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

খাতাটা বন্ধ করে চুপ করে ভাবে একটু। ঘর ভরতি একটি আবছায়ার চৌখুপি। সোঁদা গন্ধ। হঠাৎ ওই গন্ধ আর ওই অন্ধকারটা সোমেনকে চেপে ধরতে থাকে। দমফোট লাগে তার।

বাইরের রোদে এসে সে বুকভরে শ্বাস নেয়। কী সবুজ, কী ধারালো রং প্রকৃতির। কী নিস্তব্ধতা। দিগম্বরের খোলের আওয়াজ এখন আর নেই। দূরে পাম্পসেটটা অবিরল চলেছে।

এইখানে মানুষেরা বেশ আছে। মটর শাকের খেত পার হতে হতে এই বোধ লাভ করে সোমেন। বড় বড় শুঁটি ঝুলে আছে। একটা-দুটো তুলে দানা বের করে মুখে দেয় সে। মিষ্টি। ভুরভুরে

বেলেমাটির একটা খেত তছনছ হয়ে আছে। আলু ছিল বোধহয়, উঠে গেছে। মাচানের পর মাচান চলেছে, ধুঁধুল, শিম, বিন। যেন-বা কেউ শালিমারের সবুজ এনামেল রঙে গাঢ় পোঁচ দিয়ে গেছে চারধারে। হাতের মুঠোয় ধরা যায় না, বিশাল বড় গাঁদা ফুল জঙ্গলের মতো একটা জায়গাকে গাঢ় হলুদ করে রেখেছে।

মহানিমের তলায় বসে আছে দিগম্বর। গাছের গুঁড়িতে ঠেস। মাথা বুকের দিকে ঝুলে পড়েছে। ঘুম। পাশে বশংবদ খোল। রঙিন সুতোর জাল দিয়ে খোলের গায়ে জামা পরানো হয়েছে। লাল-সাদা পুঁতির গয়না খোলের গায়ে। কয়েকটা গাঁদা ফুল গোঁজা আছে। দিগম্বরের নত মুখ থেকে সুতোর মতো লালা ঝুলে আছে।

শীতের মিঠে রোদ পড়ে আছে গায়ে। ঘুম থেকে উঠে আবার বাজাবে। ঘুঘু তাড়া, ঘুঘু তাড়া, ঘুঘু তাড়া।

আমের বৌল এসে গেছে। পোকামাকড় ঝেঁপে ধরেছে গাছটাকে। ঝনঝন শব্দ বাজছে। একটা দোচালার নীচে একপাল বাচ্চা বসেছে বইখাতা শেলেট নিয়ে। বুড়োমতো একজন পড়াচ্ছে। পোড়োরা তাকে ছোট ছোট বেলের মতো মাথা ঘুরিয়ে দেখল। সোমেন জায়গাটা পার হয়ে আসে। কুলগাছের তলায় দুটো সাঁওতাল মেয়ে বসে আছে। জায়গাটায় ম ম করছে পাকা কুলের গন্ধ। একটা মেয়ে মুখ থেকে একটা সাদা বিচি ফুড়ুক করে ছুড়ে দিল, আর একটা কুল মুখে পুরল। বহেরুর দ্বিতীয় পক্ষের মেজো মেয়েটাকে কাল রাতে একঝলক দেখেছিল। তখন গায়ে ছিল একটা খদ্দরের চাদর। গোলপানা মুখ, শ্যামলা রং, বেশ লম্বা, এ ছাড়া বেশি কিছু বোঝা যায়নি। সৌন্দর্য ছিল তার চোখে। বিশাল চোখ, মণিদুটো এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত অনেক সময় নিয়ে ঢলে পড়ে। দশবাতির আলোয় চোখ থেকে এক কণা আগুন ঠিকরে এসেছিল সোমেনের হৃৎপিণ্ডে। সেই মেয়েটিকে এই সকালের রোদে আবার দেখা গেল। গায়ে চাদর নেই। সতেজ লাউডগার মতো লম্বাটে শরীর। একটা ঝুড়ি বয়ে এনে উপুড় করে দিল সাঁওতাল মেয়ে দুটোর একটার কোঁচড়ে।

সোমেন দেখল, মরা ইঁদুর।

মেয়েদের একজন সন্দিহান চোখ তুলে বলে, বিষ দিয়ে মারোনি তো দিদি?

মেয়েটি কপালের চুলের গুছি সরিয়ে অবহেলা আর অহংকারভরে বলল, বিষ দিয়ে মারব কেন? আছড়ে আছড়ে মেরেছি।

এই কথা বলে সে চোখ তুলে সোমেনকে লক্ষ করে। কিন্তু তেমন ভ্রূক্ষেপ করে না। বহেরুর খামারবাড়িতে সর্বত্র ভিটামিনের কাজ দেখতে পায় সোমেন। লাউডগার মতো ওই মেয়েটির অস্তিত্বের ভিটামিনও কিছু কম নয়। এ যে বহেরুর মেয়ে তা একনজরেই বোঝা যায়। চোখা নাক, দুরন্ত ঠোঁট, আর চোখ দুটোতে নিষ্ঠুরতা। জ্যান্ত ইঁদুর হাতে ধরে আছড়ে মারা ওর পক্ষে তেমন শক্ত নয়।

সাঁওতাল মেয়েদুটো উঠে দাঁড়িয়েছিল। লম্বাজনের পেট-কোঁচড়ে ইঁদুরের স্তূপ। সোমেন কয়েক পা গিয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, খাবে?

অবাক চোখে অচেনা লোকের দিকে চায় মেয়েটি। ঘাড় নাড়ল। খাবে।

কীভাবে খাও? পুড়িয়ে?

সাঁওতাল বলতে যেমন সুঠাম শরীর বোঝায় এ মেয়েটির তা নয়। একটু ঢিলে শরীর, বহু সন্তান ধারণের চিহ্ন, বয়সের মেচেতা, আর ধুলোময়লা-বসা ম্লানভাব। প্রশ্ন শুনে দুধ-সাদা দাঁত দেখিয়ে হাসে। বলে, আগে পুড়িয়ে নিই, তারপর কেটেকুটে রাঁধি, যেমন সবাই রাঁধে।

দাঁড়াল না। বহেরুর বাগান এখানে শেষ, ঢালু একটা পায়ে-হাঁটা-পথ মাঠে নেমে গেছে। সেইদিকে নেমে গেল দু'জন। সোমেন মুখ ফিরিয়ে বহেরুর মেয়েকে দেখল। দাঁড়িয়ে আছে এখনও। ব্লাউজের হাতা ফেটে হাতের স্বাস্থ্য ফুটে আছে, ডগবগে শরীরে আঁট করে শাড়ি জড়িয়েছে

বলে ধারালো শরীর ছোবল তুলে আছে। পিছনে একটি কামিনী ঝোপের চালচিত্র, পায়ের কাছে কলাবতী ফুলের গাছ।

॥ দুই ॥

বহেরুর চার-পাঁচটা মেয়ের সব ক'জনারই বিয়ে হয়ে গেছে। তার মধ্যে দু'জন স্বামীর ঘর করে, একজনের বর ঘরজামাই, আর দুটো মেয়েকে তাদের স্বামী নেয় না। এ-সবই সোমেন জানে। এ মেয়েটা ফেরতদের একজন, বিন্দু। বহেরুর কাছ থেকে ধানের দাম বুঝে নিতে কয়েকবার এসেছে সোমেন। তখন এইসব মেয়েরা ছোট ছিল। ধুলোময়লা মাখা গেঁয়ো গরিব চেহারা। ভিটামিনের প্রভাবে লকলকিয়ে উঠেছে। সিঁথিতে সিঁদুর আছে এখনও। বাসি সিঁদুর, অস্পষ্ট।

মেয়েটা সোমেনকে দেখে একটু ইতস্তত করে। সর্দি হয়েছে বোধ হয়, বাঁ হাতে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা কালোজিরের পুঁটুলি। সেটা তুলে বারকয় শুঁকল। অন্য দিকে চেয়ে বলে, আপনার চা হচ্ছে। ঘরে দিয়ে আসব?

চা?

খাবেন না? আপনার জন্যই হচ্ছে।

দিতে পারো।

অত দূর নিয়ে যেতে ঠান্ডা মেরে যাবে। আমাদের ঘরে আসুন না, বসবেন।

সোমেন মাথা নাড়ে। একা ঘরে মন টেকে না। এদের ঘরে দু'দণ্ড বসা যেতে পারে। আগেও এসেছে সোমেন, গন্ধ বিশ্বেসের কাছে কত গল্প শুনেছে বসে। বহুকাল আর আসা নেই বলে একটু নতুন নতুন লাগে। বহেরুর তখন এত জ্ঞাতিগুষ্ঠি ছিল না। একা-বোকা হেলে-চাষা গোছের ছিল তখন। এখন তার উন্নতির সংবাদ ছড়িয়ে গেছে চারধারে। নিষ্কর্মা, ভবঘুরে আত্মীয়রা এসে জুটেছে। সংসার বেড়ে গেছে অনেক। বহেরুও বোধহয় তা-ই চায়। ভবিষ্যতের বহেরু গাঁয়ে থাকবে তারই রক্তের মানুষ সব।

পুরো চত্বরটাই বহেরুর বসত, তবু তার মধ্যেও ঘের-বেড়া দিয়ে আলাদা আলাদা বাড়ির মতো বন্দোবস্ত। কামিনী ঝোপটা ডান হাতে ফেলে ধান-সেদ্ধ-করার গন্ধে ভরা একখানা উঠোনে চলে আসে সোমেন, মেয়েটির পিছু পিছু। জিজ্ঞেস করে, গন্ধ বিশ্বেস নেই?

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, চোখ ছোট করে বলে, থাকে। তবে পাগলমানুষ।

কোথায় সে? তার কাছে কত গল্প শুনেছি!

মেয়েটা হাসে, এখনও গল্প বলে। সব আগড়ুম বাগড়ুম গল্প। ওই বসে আছে।

হাত তুলে বড় উঠোনের একটা প্রান্ত দেখিয়ে দিল।

কটকটে রোদে সাদা মাটির উঠোনটা ঝলসাচ্ছে। চাটাই পাতা, ধান শুকোচ্ছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। তারই এক প্রান্তে বসে আছে বুড়োসুড়ো এক মানুষ। বহেরু গাঁয়ে মানুষের আয়ুর যেন শেষ নেই। গন্ধ বিশ্বেস বহেরুর চেয়ে দশ বছরের বড়, বৈমাত্র ভাই, সোমেন ভাবত, গন্ধ বিশ্বেস মরে গেছে বুঝি। যখন দাদা বা বাবার সঙ্গে এক-আধদিনের জন্য আসত সোমেন তখন সে হাফপ্যান্ট পরে, গন্ধ বিশ্বেস তখনই ছিল বুড়ো। এক সময়ে ডাকাবুকো শিকারি ছিল, সাহেবদের সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরেছে কম নয়। গারো পাহাড়, সিলেট, চাটগাঁ—কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে ব্যাবসা করেছে। সে-সব জায়গার গল্প করত সোমেনের কাছে। উসকে দেওয়ার দরকার হত না, নিজে থেকেই বলত। কবেকার কথা সব। সোমেনের মনে হত, বুঝি-বা ইতিহাসের পাতা থেকে খসে পড়েছে গন্ধ। এখনও সেই লোকটা বসে কাক শালিক তাড়িয়ে ধান বাঁচাচ্ছে। হাতে একটা তলতা

বাঁশের লগি। আশপাশে গোটা চোদ্দো-পনেরো সাদা সাদা বেড়াল তুলোর পুঁটলির মতো পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে। তিন-চারটে দিশি কুকুরও রয়েছে বেড়ালদের গা ঘেঁষে বসে। পাশে একটা শূন্য কলাই-করা বাটি। মুড়ি খেয়েছিল বোধ হয়।

নাম গন্ধ, পদবি বিশ্বাস। কিন্তু সবাই বরাবর ডেকে এসেছে 'গন্ধ বিশ্বেস' বলে, যেন-বা নামটা ওর পদবিরই অঙ্গ। শোনা যায়, বুড়ো বয়সে একটা ছুঁড়িকে বিয়ে করে এনেছিল। সে গন্ধর সঙ্গে থাকতে চাইত না। কারণ, গন্ধর বিছানায় বিড়ালের মুত, কুকুরের লোম, বালিশে নাল শুকিয়ে দুর্গন্ধ। কিন্তু বউয়ের মনস্তুষ্টির জন্য কিছু ছাড়ান-কাটান দেবে, এমন মানুষ গন্ধ নয়। বউ তাই এক রাতে সরাসরি গিয়ে দেওর বহেরুর দরজায় ধাক্কা দিল, শুতে দাও দিকিনি বাপু। না ঘুমিয়ে গতর কালি হয়ে গেল। সেই থেকে সে হয়ে গেল বহেরুর দ্বিতীয় পক্ষ।

ঝগড়া-কাজিয়া তেমন কিছু হয়নি। বেড়াল-অন্ত প্রাণ গন্ধ, কুকুর তার ভারী আদরের। বউ তাদের বেশি কিছু নয়। বিয়ে করলেই আবার একটা বউ হয়। কিন্তু গন্ধ বখেরায় যায়নি। একই সংসারে একটু আলাদা হয়ে থেকে গেছে। সেই বউ-ই এখনও ভাত বেড়ে দেয়, বাতের ব্যথায় রসুন-তেল গরম করে দেয়, বকাঝকাও করে। ওদিকে বহেরুর সন্তান ধারণ করে কিন্তু সিঁদুর পরে গন্ধর নামে।

এ-রকম যে একটা গোলমেলে সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে গন্ধ, তাকে দেখলে মনে হয় না। বৈরাগীর মতো বসে আছে। মুখময় বিজবিজে দাড়ি। ছানি কাটা হয়নি, দু'-চোখে স্পষ্ট মুসুরির ডালের মতো ছানি দুটো দেখা যায়। শীতে কাহিল হয়ে একটা কাঁথা জড়িয়ে বসে, গায়ে বহু পুরনো মিলিটারি পুলওভার, নিম্নাঙ্গে ময়লা ধুতি। ধুতিতে ঢাকা আছে ফুটবলের সাইজের হাইড্রোসিল। চলাফেরায় ভারী কষ্ট তার। এই নিয়ে কত হাসাহাসি করেছে সোমেন।

সামনে সামনে বসতেই বেড়ালগুলো মিটমিটে চোখে একটু চেয়েই চোখের ফসফরাস ঢেকে ফেলল। কুকুরগুলো একটু গর-র শব্দ করে শুয়ে-শুয়েই লেজ নাড়ে।

গন্ধ, চিনতে পারো?

গন্ধ স্থবিরতা থেকে একটু জাগে। রোদ থেকে হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে বলে, কিছু দেখি না।

আমি সোমেন, ব্রজকর্তার ছেলে।

বড়জন?

না। ছোট।

হাসে গন্ধ। বুঝদারের হাসি। হাত তুলে একটা মাপ দেখিয়ে বলে, এইটুকুন ছিলেন। আসেন না তো! বাপের জন্য প্রাণ টানে না?

কলকাতা ছেড়ে আসা হয় না।

একটা শ্বাস ছাড়ে গন্ধ, বলে, সবাই তা-ই কয়।

কী কয়?

কলকাতা ছেড়ে আসা যায় না। সিগারেট নাই?

আছে। খাবে?

খাই।

হাত বাড়ায় গন্ধ। সোমেন সিগারেট দেয়। দন্তহীন মুখে সিগারেট বসিয়ে বড় আগ্রহে টানে গন্ধ। কাশে।

কাশছ তো, খেয়ো না। সোমেন বলে।

হাঁপির টান তুলে কাশে গন্ধ, চোখে জল এসে যায়। হাতের উলটো পিঠে চোখের জল মুছে বলে, যত কষ্ট তত আরাম। এ কাশি আরামের। কতকাল খাই না কেউ দেয় না।

সিগারেটের গোড়া লালায় ভিজে গেছে। থুঃ করে জিভ থেকে তামাকের আঁশ ছিটিয়ে গন্ধ চোখ বুজে টানে। ঝপাস করে ধানের ওপর নেমে আসে কাক। গন্ধ হাত তুলে তাড়ায়, হেঃ ই।

কেমন আছ গন্ধ?

ভালই। বহেরু কষ্ট দেয় না।

চোখটা কাটাও না কেন?

দেখার কিছু নাই। কাটায়ে হবেটা কী? হাতায়ে হাতায়ে সব বুঝতে পারি। বেলাও ঠাহর পাই ধুয়া ধুয়া। খামোখা কাটায়ে হবেটা কী? খরচ।

বিনা পয়সায়ও কাটে। সোমেন বলে, ক্যাম্প করে কাটে।

ঝঞ্ঝাট।

সিগারেটে প্রাণভরে টান মারে গন্ধ। কাশে। বড় আরাম পায়। সামলে নিয়ে বলে, বহেরুর খুব বাড়বাড়ন্ত। দেখলেন সব?

হুঁ।

হাতের গুণ। গাছ ওরে ভালবাসে। আমারে ভালবাসে কুত্তা বিড়াল।

বহেরুর মেয়ে বিন্দু পেয়ালা-পিরিচে চা নিয়ে আসে। পিরিচে চা চলকে পড়েছিল, সেটুকু ঢেলে ফেলে দিয়ে পেয়ালা বসিয়ে যত্নে চা দিল। দুটো বিস্কুট।

শব্দে ঠাহর পেয়ে গন্ধ চেয়ে বলে, বিন্দু নাকি? কী দিলি ব্রজকর্তার ছেলেরে? চা?

কেন? তুমি খাবা?

খাই।

দেব।

ব্রজকর্তার ছেলেরে একটু রস খাওয়াবি না?

ও-রস তো শীতে হিম হয়ে আছে, খেলে ঠান্ডা লাগবে না!

একটু আমারে দে।

দেব।

বলে বিন্দু চলে যায়। আর আসে না।

সোমেনের চা যখন শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, তখন গন্ধ বলে, তলানি থাকলে একটু দিবেন।

এঁটো খাবে?

সব খাই।

সংকোচের সঙ্গে কাপটা একটু চাসুদ্ধু এগিয়ে দেয় সোমেন। বড় শীত। গন্ধ কাপটা গালে চেপে ধরে তাপটা নেয়। আস্তে আস্তে টুকে টুকে খায়। বলে, বহেরু কষ্ট দেয় না। এরা দেয়। মাগিগুলি বজ্জাত। সব মাগি বজ্জাত। দেবে বলে কিছু দেয় না। উপোস থাকি।

বলে নিবিষ্ট মনে চা খায় গন্ধ। অল্প একটু তলানি, টপ করে ফুরিয়ে যায়। গন্ধ আঙুল দিয়ে কাপের তলার তলানির চিনি খোঁজে। গাঁ-ঘরের চা, চিনি একটু বেশিই দেয় ওরা। সবটা গলে না। গন্ধ আঙুলের ডগায় ভেজা চিনি তুলে এনে আঙুল চোষে। একটা বেড়াল নির্দ্বিধায় তার কোলে উঠে আসে, কাপটা শোঁকে। মুখ থেকে আঙুলটা বের করে বেড়ালের মুখে ধরে গন্ধ। বেড়ালটা দু'-এক বার চাটন দেয়। তারপর নির্জীব হয়ে কোলেই বসে ঘুমোয়।

ব্রজকর্তার খোঁজে আলেন নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু বাবা তো নেই।

গন্ধ চুপ করে থাকে একটু। মাঝে মাঝে মাথাটা বোধহয় ঝিম মেরে যায়। ধানের ওপর শালিকের হুড়াহুড়ি শুনে হাত বাড়িয়ে লগিটা নেয়। বলে, হেঃ ই।

তারপর বলে, আসে যাবেন যে-কোনও দিন। ব্রজকর্তার পায়ের নীচে সুপারি, আছেন ক'দিন?

আজই চলে যাব। বাড়িতে ভাববে।

বহেরুর কাণ্ডকারখানা দেখে যাবেন না? কত জমি জোত, ধান-পান, বিশ-তিরিশ মুনিশ খাটে। বহুত পয়সা বহেরুর।

জানি।

গন্ধ হাত বাড়িয়ে বলে, দেন একটা।

কী?

গন্ধ হাসে, চোখ ছোট করে বলে, সাদা কাঠি।

সোমেন বুঝতে পেরে একটা সিগারেট দেয়।

গন্ধ সিগারেটটা নাকের কাছে নিয়ে কাঁচা সিগারেটের গন্ধ নেয়। হাত বাড়িয়ে বলে, দেশলাইটা রেখে যান, পরে খাব।

সোমেন দেশলাই দিয়ে দেয়। খালি কাপটা নিয়ে বেড়ালের খেলা শুরু হয়ে গেছে। শক্ত ঝুনো উঠোনে টঙাস করে কাপটা ঢলে পড়ে। গন্ধ মুখ তুলে বলে, ব্রজকর্তারে বুঝায়ে-সুঝায়ে নিয়ে যান বাড়ি। বুড়ো বয়সে কখন কী হয়।

সোমেন চুপ করে থাকে। মনে পড়ে, ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

গন্ধ নিচু গলায় বলে, এখানে সব শালা পাজি। বহেরু ভাল। কষ্ট দিতে চায় না। কিন্তু মাগিগুলো—এগারো হাতে কাছা নাই যার—ওই গুলান খচ্চর।

কত গল্প শোনাতে গন্ধ, সব ভুলে গেছ?

গল্প?

হ্যাঁ হ্যাঁ, পরস্তাব।

গন্ধ ফোকলা মুখে হাসে হঠাৎ।

মনে থাকে না কিছু।

মানুষের বুড়ো বয়সের কথা ভেবে ভারী একটা দুঃখ হয় সোমেনের। তার বাপ-দাদা গন্ধ বিশ্বেসের কাঁধে চড়েছে। সেই আমান মানুষটা কেমন লাতন হয়ে বসে গেছে এখন।

যাই গন্ধ। বলে সোমেন ওঠে।

পুবের মাঠে রবিশস্যের চাষ পড়ে গেছে। সেই চৈতি ফসলের জমি চৌরস করছে বহেরুর লোকজন। দিগম্বরের খোলের শব্দ ওঠে হঠাৎ। পৃথিবীকে আনন্দিত করে বয়ে যেতে থাকে শব্দ। গাছগাছালির ছায়ায় ছায়ায় রোদের চিকরি-মিকরি। বুনো গন্ধ, মাটির সুবাস।

বেলায় বিন্দু এল তার রান্নার জোগাড় নিয়ে। ঘরের পাশেই বাবার ছোট্ট পাকশাল। কাঠের জ্বালে রান্না হয়। স্তূপ করে কাটা আছে কাঠ, প্যাঁকাটি। কাঠের জ্বালে অনভ্যস্ত রান্না রাঁধতে কাল তার চোখ জ্বলে ফুলে গিয়েছিল। বিন্দুকে বলল, আজ তুমিই রেঁধে দিয়ে যাও। আমার ইচ্ছে করছে না।

বিন্দু চোখ বড় করে বলে, আমি রাঁধব? কাকা তা হলে কেটে ফেলবে।

কাকা? কাকা আবার কে?

বিন্দু মাথাটি নামিয়ে প্যাঁকাটির আগুনে কাঠের জাল তুলতে তুলতে বলে, কে আবার! বহেরু বিশ্বেস।

ভাবী অবাক হয় সোমেন। বহেরু ওর কাকা হয় কী করে? সবাই জানে, বিন্দুর মা বহেরুর দ্বিতীয় পক্ষ। বিন্দুও কি জানে না যে ওই বুড়ো, অক্ষম গন্ধ বিশ্বেসের বিকৃত অঙ্গ থেকে ও জন্মায়নি?

বিন্দু মুখ তুলে বলে, চাল ধুয়ে দিয়েছি, তরকারি মাছ সব কোটা আছে, মশলা বেটে দিয়েছি, আমি সব দেখিয়ে দেব, রেঁধেবেড়ে নিন।

কলকাতায় হোটেলে রেস্টুরেন্টে আমরা বারো জাতের ছোঁয়া খাই।

সে কলকাতায়। এখানে নয়।

অগত্যা উঠতে হয় সোমেনকে।

গনগনিয়ে আঁচ ওঠে। বড় তাপ, ধোঁয়া। বিন্দু এটা-ওটা এগিয়ে দেয়, উপদেশ দেয়, হাসেও। এত কাছাকাছি এমন ডগবগে মেয়ে থাকলে কোন পুরুষের না শরীর আনচান করে! সোমেনের কিন্তু—আশ্চর্যের বিষয়—করল না। বরং সে কেমন নিবু নিবু বোধ করে মেয়েটার সামনে। কেন যে! সে কি ওই প্রচণ্ড শরীর, প্রচুর ভিটামিন, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ক্লোরোফিলে ভরা অতিরিক্ত উগ্রতার জন্য? হতে পারে। অত যৌবন সোমেনের সহ্য হয় না। ওই উগ্র শরীরের সঙ্গে টোক্কর দেওয়ার মতো ভিটামিন তার নেই। মেয়েটা কিন্তু টোক্কর দিতেই চায়। ছলবল করে কাছে আসে, যেন-বা ছুঁয়ে দেবে, ঘাড়ের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, ফুলকপিটা আরও সাঁতলান, নইলে স্বাদ হবে না। তার শ্বাস সোমেনের ঘাড়ে লাগে। সোমেন সরে বসে, মেয়েটা অমনি জিভ কেটে বলে, ছুঁয়ে দিচ্ছিলাম আর কী! তারপর হাসে। সোমেন নপুংসকের মতো ভীত বোধ করে মেয়েটির কাছে। বহেরুকে ও কাকা ডাকে কেন তা কিছুতেই ভেবে পায় না। গা-টা একটু ঘিনঘিন করে তার।

নিজের ভিতরে ভিটামিনের বা প্রোটিনের, বা ওইরকম একটা কিছুর অভাব সে চিরকাল বোধ করে এসেছে। বহেরুর খামারবাড়িতে এই যৌবন বয়সে সেটা তার কাছে আর-একটু স্পষ্ট হয়।

সোমেন একটু আলগোছে, সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করে, শ্বশুরবাড়ি কতদূর?

মেয়েটার মুখভাব পালটায় না, হাসিখুশি ভাবটা বজায় রেখেই বলে, কাছেই। বর্ধমান।

যাও-টাও না?

না।

কেন?

বনে না।

সোমেনের আর-কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

মেয়েটা নিজে থেকেই আবার বলে, আমারই দোষ কিন্তু। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি ননদ দেওর কেউ খারাপ না।

তবে?

যে-মানুষটাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি সেই লোকটাকেই আমার পছন্দ নয়। এমনি মানুষটা মন্দ না, দেহতত্ত্বটত্ত্ব গেয়ে বেড়ায়, এক বোষ্টমের কাছে নাম নিয়েছে। নিরীহ মানুষ। তবে তার কোনও সাধ আহ্লাদ নেই। মেড়া। সে আমার পা চাটত, এমন বাধুক ছিল।

তবে?

সেই জন্যই তো বনে না। আমি লাঠেল মানুষ পছন্দ করি।

সাদা দাঁতে চূড়ান্ত একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। সোমেন ভিতরে ভিতরে আরও মিইয়ে যায়।

সে কীরকম? সোমেন জিজ্ঞেস করে।

ধামসানো আদর সোহাগ যেমন করবে, তেমনি আবার দরকার মতো চুলের মুঠ ধরবে।

বাঁ হাতের কালোজিরের পুঁটলিটা নাকের কাছে ধরে শ্বাস টানে বিন্দু। চোখে চোখ রাখে। সোমেন চোখটা সরিয়ে নেয়। মেয়েটা পুরুষচাটা। বুকের ভিতরটা গুর গুর করে ওঠে সোমেনের, অস্বস্তি লাগে। এক বার ভেবেছিল, আজ রাতটা কাটিয়ে কাল ফিরে যাবে কলকাতায়। বাবার সঙ্গে যদি দেখাটা হয়ে যায়। কিন্তু মেয়েটাকে তার ভাল লাগছে না। রাতবিরেতে এসে যদি ঠেলে তোলে! কিছু বিচিত্র নয়। বহেরুর মেয়ে, নিজের পছন্দমতো জিনিস দখল পেতেই শিখে থাকবে। মনে মনে ঠিক করে ফেলে সোমেন, আজ রাতেই ফিরবে। আটটার কিছু পরে বোধহয় একটা শনিবারের স্পেশাল ট্রেন যায় হাওড়ায়। বিকেল পর্যন্ত বাবার জন্য দেখে ওই ট্রেনটা ধরতে সুবিধে।

ভিটামিনের অভাব তাকে কতটা ভিতু করেছে তা ভাবতে ভাবতে নেয়েখেয়ে দুপুরে ঘুমোল সোমেন।

বিকেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছিল, পোষা বেজি কাঁধে বহেরু এল সে-সময়ে। বলল, চলে যাবেন?

হ্যাঁ।

একটা কথা বলি।

কী?

ব্রজকর্তা এখানে থাকে থাক। অযত্ন হবে না। এখানে বামুন মানুষ নেই। ব্রজকর্তাকে তাই ছাড়তে চাই না। আরামেই আছে।

সোমেন উত্তর দিল না। উত্তর জানা নেই।

একগোছা টাকা হাতে ধরিয়ে দিল বহেরু। বলল, কোমরে আন্ডারপ্যান্টে গুঁজে নেবেন। ঠাকরোনকে বলবেন এবার ধানের দর ভাল। আপনি না এলে মানি-অর্ডার করে দিতাম। আজ কি কাল।

তিন-চার রকমের ডাল, কিছু আনাজপত্র, এক বোতল ঘানির তেল—এই সব গুছিয়ে দিয়ে যায় বিন্দু। বহেরুর লোক স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। বড় একটা চটের থলিতে ভরে দিয়েছে। বেশ ভারী, তবু বোধহয় বওয়া যায়। হাত তুলে থলির ওজনটা পরখ করছিল সোমেন, বিন্দু হেসে আঁচল চাপা দেয় মুখে। মেয়েটার সাহস বেড়েছে। বলল, খুব মরদ।

সোমেন বোকা বনে যায় একটু। মনে পাপ। ইচ্ছে হল, থেকে গেলেও হত আজ রাতে। সে এখনও তেমন করে মেয়েমানুষের গা ছোঁয়নি।

পরক্ষণেই ভাবে, সে ধরেই নিচ্ছে কেন যে, বিন্দু তার সঙ্গে আজ রাতেই একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে চায়?

চা খেয়ে সে গেল বিন্দুর সঙ্গে ময়ূরের ঘর দেখতে। বহেরুর বড় শখ, একটা চিড়িয়াখানা করে তার বহেরু গাঁয়ে। আপাতত গোটাকয় পাখি, একটা ময়ূর, দুটো হনুমান নিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। পরে আরও হবে। উত্তরের সবজিখেতের শেষে বহেরুর সেই সাধের চিড়িয়াখানা। জালে ঘেরা ঘর, উপরে অ্যাজবেস্টাসের ছাউনি। কিছু দেখার নেই। ময়ূর ঝিমোচ্ছে, হনুমান দুটো বিরক্ত। বিচিত্র কয়েকটা পাখি ঠোঁটে নখে নিরর্থক জাল কাটার চেষ্টা করছে। দু'মিনিটেই দেখা হয়ে যায়।

বিন্দু চিড়িয়াখানার পিছনে একটা মখমলের মতো ঘাসজমি দেখিয়ে বলল, মন খারাপ হলে আমি এইখানে এসে বসে থাকি। ভারী নিরিবিলি জায়গা। কেউ টেরই পায় না।

জায়গাটায় দু'-চার পা হাঁটে দু'জনে। সোমেন ভাবে, প্রেমের মূলেও আছে ভিটামিন। এই ডগবগে মেয়েটার কাছে এখন ইচ্ছে করলেই প্রেম নিবেদন করা যায়। মেয়েটাও মুখিয়ে আছে। অবশ্য এখানে প্রেম বলতে শরীর ছাড়া কী। মেয়েটাও কথার প্রেম বুঝবার মতো মানুষ নয়। কিন্তু ভিটামিনের অভাবে সোমেন শরীরে জ্বর বোধ করে, ভয় পায়, নিজেকে অভিশাপ দেয়।

হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বিন্দুর মুখের দিকে চায়। মাথার চুলে অ্যামিনো অ্যাসিডের কাজ। ঘন গহিন চুলে সূক্ষ্ম সিঁথি। মেটে সিঁদুরটুকু ঠিক আছে। গায়ে খদ্দরের হলুদ চাদর, পায়ে হাওয়াই। মুখের গোলভাবটুকুর মধ্যে বেড়ালের কমনীয়তা, এবং বেড়ালেরই হিংস্রতা ফুটে আছে। খর চোখ। সোমেন বলতে যাচ্ছিল, ধরো বিন্দু, যদি আজকের দিনটা থেকেই যাই!

বিন্দু দূরের দিকে অকারণ তাকায় মাঝে মাঝে। এখনও তাকিয়ে ছিল। সোমেন কিছু বলার আগেই তার দিকে চেয়ে বিন্দু বলল, ব্রজকর্তা আসছে।

কই? ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করে সোমেন। টালিগঞ্জের জমিটা তাদের দরকার। বড্ড দরকার।

ওই যে, মাঠের মাঝ দিয়ে আসছে।

॥ তিন ॥

বিন্দুবৎ একটা মানুষ বহেরুর চৈতালি ফসলের খেত ধরে আসছে। কাছে এলে তার মন্থরগতি এবং ক্লান্তি বোঝা যায়। কালচে জমি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাতে রঙিন আলো, একটু কুয়াশার ভাপ জমে ঝুলে আছে মাথার ওপরে। এতটা বিস্তৃতি পিছনে ফেলে আসছে বলেই লোকটাকে ছোট দেখায়। গায়ে র‍্যাপার, ধুতি, হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। গেঁয়ো হাটুরে মানুষ একটা। বাবা বলে মনে করতে কষ্ট হয়।

সোমেন বলল, তোমার চোখ তো সাংঘাতিক! এত দূর থেকে চিনলে কী করে?

চিনব না কেন! নিজেদের লোক। ওঁর চলন-বলন সবই চেনা।

সোমেনের ভিতরে একটা ছ্যাঁকা লাগে। নিজেদের লোক। তবু, ঠিক কথাই, বাবা আর তাদের লোক তো নয়।

একটু সময় নিয়ে মাঠ পার হয়ে আসেন ব্রজগোপাল। খামারে ঢোকার রাস্তা কিছু উত্তরে। সেই দিকে আড়ালে পড়ে যান।

বিন্দু মুখ ফিরিয়ে বলে, যাই, খবর দিই গে।

বিন্দু চলে যাওয়ার পরও ঘাসজমিটায় কিছুক্ষণ একা একা সিগারেট টানে সোমেন। বাবা জামা-কাপড় বদলে স্থিতু হোক, তারপর দেখা করবে। আসলে, তার একটু লজ্জাও করছে। গত কয়েক বছর তারা চিঠিপত্র ছাড়া বাবার খবর নিতে কেউ আগ্রহ বোধ করেনি। বাবাই বরং কয়েকবার গেছে। এতকাল পরে সোমেন এসেছে বটে, কিন্তু সেও খবর নিতে নয়, স্বার্থসিদ্ধি করতে। টালিগঞ্জের জমির প্লটটার সমস্যা দেখা না দিলে সে কোনও দিনই এখানে আর আসত না বোধহয়।

সিগারেট শেষ করে আস্তে ধীরে ঘরে আসতে আসতে শীতের বেলা ফুরিয়ে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে, ব্রজগোপাল মেঝেয় উবু হয়ে বসে ল্যাম্প জ্বালাচ্ছেন।

শব্দ পেয়ে ঘাড়টা ঘোরালেন। জ্বলন্ত ল্যাম্পটা রাখলেন টেবিলের উপর। বললেন, এসো।

বাবার চেহারাটা বোধহয় আগের মতোই আছে। মুখে-চোখে একটা মেদহীন রুক্ষ ভাব। গালে কয়েক দিনের দাড়ি। গায়ের চামড়া রোদে পোড়া, তাম্রাভ। শীতটা চেপে পড়েছে বলে এর মধ্যেই মাথা কান ঢেকে একটা খয়েরি কম্ফর্টার জড়িয়ে নিয়েছেন। সোমেনের চেয়ে বাবা লম্বায় কিছু খাটো। সোমেন একটা প্রণাম করল।

শরীর টরীর ভাল? জিজ্ঞেস করে সোমেন। লজ্জা করে।

আছে এক রকম—প্রেশারটা একটু উৎপাত করে। বাড়ির সবাই কেমন আছে?

আছে ভালই।

যেন-বা দুই পরিচিত লোকের কথাবার্তা। মাঝখানে একটু দূরত্ব কাঁটা-ঝোপের বেড়ার মতো।

আজই চলে যাবে?

সোমেন মুখ নামিয়ে বলে, আজই। নইলে সবাই ভাববে।

থাকতে বলছি না। যাওয়ার হলে যাবে। বলে বাবা খানিকটা বিহ্বল চোখে সোমেনের দিকে চেয়ে থাকেন। সব পুরুষেরই বোধহয় একটা পুত্রক্ষুধা থাকে। বাবার চোখে এখন সেই রকমই একটা জলুস। পরক্ষণেই নিবে গেল চোখ, বললেন, কিছু দরকারে এসেছিলে?

মা একটা চিঠি দিয়েছে ওই ডায়েরিতে গোঁজা আছে।

বাবা একটু তটস্থ হন। হাতড়ে চিঠিটা খোঁজেন। খুবই ব্যগ্র ভাব। সোমেন এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা ডায়েরির পাতা থেকে বের করে দেয়।

গলা খাঁকারি দিতে দিতে বাবা চিঠিটা নিবিষ্টমনে পড়েন। ছোট্ট চিঠি, তবু অনেকক্ষণ সময় লাগে। সোমেনের বুকে একটু চাপ কষ্ট হয়। চিঠিটাতে ব্যগ্রভাবে বাবা যা খুঁজছেন তা কি পাবেন?

বিষয়ী কথা ছাড়া ওতে কিছু নেই। না, আছে, 'প্রণতা ননী'—এই কথাটুকু আছে। ওইটুকু বাবা লক্ষ করবেন কি?

চিঠিটা হাতে নিয়ে বাবা টিনের চেয়ারে বসলেন। মুখের রেখার কোনও পবিবর্তন হল না তেমন। মুখ তুলে বললেন, কলকাতায় বাড়ি করতে চাও?

মা'র খুব ইচ্ছে।

দু'হাতের পাতায় মুখখানা ঘষে নিলেন বাবা।

বাড়ি করার জমি তো এখানেই কেনা আছে।

এ-জায়গা তো দূরে। কলকাতাতেই চাকরি-বাকরি সব।

চাকরি তো চিরকাল করবে না, কিন্তু বসতবাড়ি চিরকাল থাকে। বংশপরম্পরায় ভোগ করে লোক। চাকরির শেষে যখন নিরিবিলি হবে তখন বিশ্রাম নিতে বাড়িতে আসবে।

সোমেন চুপ করে থাকে।

বাবা আস্তে করে বললেন, বাড়ি তো কেবল ইট কাঠ নয়। মনের শান্তি, দেহের বিশ্রাম—এ-সব নিয়ে বাড়ি। কলকাতায় কি সে-সব হবে?

সোমেন এ-কথারও উত্তর খুঁজে পায় না।

কোথায় জমি দেখেছ?

টালিগঞ্জে।

কতটা?

দেড়-দুই কাঠা হবে। আমি ঠিক জানি না। বড় জামাইবাবুর এক বন্ধুর জমি। সেই বন্ধু কানাডায় সেটল করেছে। সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে জমিটা।

সস্তা মানে কত?

হাজার দশেক হবে বোধহয়।

কীরকম জমি?

কর্নার প্লট। দক্ষিণ-পূর্ব খোলা। বড় জামাইবাবুর বাড়ির পাশেই।

বাবা বড় চোখ করে বললেন, অজিতের বাড়ির পাশে? সেখানে কেন বাড়ি করবে তোমরা? আত্মীয়দের কাছাকাছি থাকা ভাল না, বিশেষ করে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির পাশে তো নয়ই। এ বুদ্ধি কার, তোমাব মায়ের?

আপনার অমত থাকলে অবশ্য—সোমেন কথাটা শেষ করে না।

বাবা তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন। কথাটা সোমেন শেষ করল না দেখে বললেন, আমার মতামতের কি কোনও দাম তোমার মা দেবেন? তিনি যদি মনে করে থাকেন তবে আমার অমত থাকলেও ওই জমি কিনবেনই। তবু অমতটা জানিয়ে রাখা ভাল বলে রাখলাম।

এত সস্তায় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। বড় জামাইবাবুই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

বাবা চিন্তিতমুখে বললেন, আমি টাকা না-দিলেও ও জমি তোমরা কিনবেই। ধার-কর্জ করা হলেও, এ আমি জানি। কিন্তু তা হলে এখানকার জমিটার কী হবে?

এটাও থাকুক।

তাই থাকে! পৃথিবীতে যত মানুষ বাড়ছে তত জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ছে। দখল যার, জমি তার। বহেরু যত দিন আছে তত দিন চিন্তা নেই, সে আমাদের বাধ্যের লোক। কিন্তু চিরকাল তো সে থাকবে না। তার জ্ঞাতিগুষ্ঠি অনেক, ছেলেপুলেরা সাবালক। তোমরা দখল না-নিলে তারা ক্রমে সব এনক্রোচ করে নেবে। তখন? আমি যক্ষীর মতো আগলে আছি জমিটা, তোমাদের জন্যই। দেখেছ জমিটা ভাল করে? পশ্চিম দিকে সবটা আমাদের। প্রায় দুই বিঘে।

দেখেছি?

পছন্দ নয়?

ভালই তো। কিন্তু বড় দূরের জায়গা।

বাবা মাথা নাড়লেন। বুঝলেন। একটা শ্বাস ফেললেন জোরে।

তারপর আস্তে আস্তে বললেন, কলকাতাতেও পার্টিশানের পরে খানিকটা জমি ধরে রেখেছিলাম। জবর দখল। হাতে-পায়ে ধরে দেশের লোক নীলকান্ত সেখানে থাকতে চায়। দিয়েছিলাম থাকতে, সময়মতো জমি পেলে সে উঠে যাবে—এ-রকম কথা ছিল। কিন্তু যাদবপুরের ওই এলাকার জমি পাওয়া ভাগ্যের কথা। নীলকান্ত আর ছাড়ল না সেটা। আমি মামলা মোকদ্দমা করিনি। কলকাতায় আমার কোনও লোভ নেই। জানি তো, ও-শহরটা শিগগিরই শেষ হয়ে আসছে।

একটু বিস্মিত হয়ে সোমেন বলে, কেন?

ও-শহর শেষ হবেই। অত বাড়িঘর নিয়ে হয় একদিন ডুবে যাবে মাটির মধ্যে, নয়তো মহামারী লাগবে, না হয় ভূমিকম্প। একটা কিছু হবেই। যার বুদ্ধি আছে সে ওখানে থাকে কখনও?

সোমেন মুখ লুকিয়ে হাসে একটু। এতক্ষণ বেশ ছিলেন বাবা, এইবার ভিতরকার চাপা পাগলামিটা ঠেলা দিয়ে উঠছে।

তুমি বিশ্বাস করো না?

কী?

কলকাতায় একটা অপঘাত যে হবেই? আমি যত দিন ছিলাম তত দিন আমার ওই একটা টেনশন ছিল। এত লোক, এত বাড়ি-ঘর, এত অশান্তি আর পাপ—এ ঠিক সইবে না। মানুষের নিশ্বাসে বাতাস বিষাক্ত। ডিফর্মড, ইমমর‍্যাল একটা জায়গা। ওখানে চিরকাল বাস করার কথা ভাবতেই আমার ভয় করত। নিশুতরাতে ঘুম ভেঙে গেলে শুনতাম, মাটির নীচে থেকে যেন একটা গুড় গুড় শব্দ উঠে আসছে।

কীসের শব্দ?

কী করে বলব? মনে হত, পাতালের জল বুঝি ক্ষয় করে দিচ্ছে শহরের ভিত। যেন ভোগবতী বয়ে যাচ্ছে।

সোমেন চুপ করে থাকে।

বাবা মুখ নিচু করে আত্মগত চিন্তায় ডুবে থাকেন একটুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে বলেন, মোটে দেড়-দুই কাঠা জমি?

হ্যাঁ।

ইচ্ছে করলে একটু শাকপাতা কি দুটো কলাগাছও লাগাতে পারবে না! বাক্সের মতো সব ঘর হবে, গাদাগাদি করে থাকবে, সেটাই পছন্দ তা হলে?

মায়ের ইচ্ছে, বাড়িওয়ালারা বড্ড ঝামেলা করছে।

কেন?

ছেলেরা বিয়েটিয়ে করেছে, ওদের ঘর দরকার। বার বার তাগাদা দেয়, নতুন বাসাও পাওয়া যায় না সুবিধে মতো। মা বলে, কষ্ট করে যদি একটু নিজেদের ব্যবস্থা করে নেওয়া যায়, জমিটা যখন সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে—

টাকা না-দিলেও তো তোমরা জমিটা কিনবেই?

সোমেন উত্তর দেয় না। বাবা উৎসুক চোখে চেয়ে থাকেন।

তারপর বললেন, সময় থাকতে যদি ও-জায়গা ছেড়ে পালিয়ে আসতে পারতে তবে ভাল হত। একদিন দেখবে কলকাতায় দিন-দুপুরে শেয়াল ডাকছে, মড়ার মাথা পড়ে আছে এখানে-সেখানে, জনমনুষ্য কেউ থাকবে না। একটু ভেবে দেখো।

আপনি মাকে যা লেখার লিখে দিন।

এ-সব কথা চিঠিতে লেখার নয়। তোমার মাকে মুখের সামনে কিছু বলাও মুশকিল। ওঁর সবসময়ে একটাই ভাব 'এই পেয়েছি ঝগড়ার গোড়া, আর যাব না বালি-ওতরপাড়া।'

তবে আমি মাকে গিয়ে কী বলব?

এই প্রথম বাবা একটু হাসলেন। বললেন, তোমরা শুধু কিছুতেই এদিকে চলে আসবে না?

আমার কোনও মত নেই।

তোমরা বড় হয়েছ, মত নেই কেন? এই বয়সে নিজস্ব মতামত তৈরি না-হলে আর কবে হবে? তোমাদের যদি এদিকে থাকার মত হয় তবে তোমার মায়েরও হবে। মেয়েরা স্বামীর বিরুদ্ধে যত শক্ত হয়েই দাঁড়াক না কেন, ছেলের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পায় না। ওখানে মেয়েরা বড় কাবু।

সোমেন কথাটার সত্যতা বুঝতে পারে। জীবন থেকেই মানুষ কিছু সহজ দার্শনিকতা লাভ করে। বাবার কথাটা মিথ্যে নয়। সে একটু স্মিত হাসল।

বাবা একটু শ্বাস ফেলে বললেন, বুঝেছি। রণেনই চায় কলকাতায় বাড়ি হোক। তোমারও হয়তো তাই ইচ্ছে। বলে বাবা আবার একটু হেসে মাথা নেড়ে বললেন, তোমাদের চেহারায় কলকাতার ছাপ বড় স্পষ্ট। তোমরা আর দেশ-গাঁয়ে থাকতে পারবে না। আমার ইচ্ছে করে তোমাদের জন্য কলকাতা থেকে দূরে একটা নকল কলকাতা তৈরি করে দিই। তা হলেও হয়তো বাঁচাতে পারতুম তোমাদের।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, ক'টার গাড়িতে যাবে?

যেটা পাই। রাত আটটার গাড়িটা—

পরে ঘড়ি দেখে বললেন, রাত আটটার পর শনিবার গাড়ি খুব ফাঁকা যায়। দিনকাল ভাল নয়, অত রাতের গাড়িতে যাবে কেন? যেতে হলে একটু আর্লি যাও। ভাল হয়, আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে গেলে।

দেরি হলে মা ভাববে। আমার আজই ফেরার কথা।

বাবা চিন্তিতভাবে বললেন, সাড়ে পাঁচটা বাজে, এখন রওনা হলেও রাত আটটার আগে গাড়ি পাবে না।

কিছু হবে না। ঠিক চলে যাব।

বাবা আবার হাসলেন। গাডু-গামছা নিয়ে বৌলওলা খড়মের শব্দ তুলে দরজার কাছে যেতে যেতে বললেন, তোমাদের জন্য আমিও কিছু কম চিন্তা করি না, বুঝলে?

বাবা খড়মের শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে যান। কুয়োতলার দিকেই যান বুঝি। অদূরে জলের শব্দ হয়। দশবাতির ল্যাম্প-এর নীচে খাতাটা পড়ে আছে, তারই একটা পৃষ্ঠায় লেখা আছে—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে। কথাটা ভুলতে পারছে না সোমেন। বার বারই মনে পড়ে। কেমন যেন অস্থির লাগে।

বাবা ঘরে নেই, সেই ফাঁকে বিন্দু এল। নিঃশব্দে। খানিকটা চুপি চুপি ভাব ছিল আসায়। একটু আগে যেমন পোশাক ছিল, তেমন আর নেই। একটু সেজেছে বুঝি। দশবাতির আলোয় ভাল বোঝা যায় না, তবু মনে হয়, চোখে কাজল টেনেছে, কপালে সবুজ টিপ, গায়ে একটা রঙিন উলের স্টোল। একটু অবাক হয় সোমেন, স্টোলটা দেখে। তারপর ভাবে, বহেরু তো আর সত্যিই সাধারণ চাষা নয়, তার মেয়ের ফ্যাশন করতে বাধা কী?

গলা নিচু করে বিন্দু বলে, জিনিসপত্র গুছিয়ে দেব?

গোছানোর কিছু নেই।

আজ থাকবেন না?

না।

ব্রজকর্তার সঙ্গে সব কথা হয়ে গেল?

সোমেন একটু হাসে। ম্লান হাসি।

বিন্দু গলাটা বিষণ্ণ করে বলে, ব্রজকর্তা একা একা পড়ে থাকে। আগে রণেনবাবু আসত, আজকাল কেউ আসে না।

সোমেন নীরবে শুনে যায়। কথা বলে না।

খেয়ে যাবেন না?

কী খাব?

ভাত।

না, দেরি হয়ে যাবে।

মাঝে মাঝে আসবেন।

সোমেন চোখ তোলে। বিন্দু চেয়ে আছে। চোখে পিপাসা।

সোমেন বলে, কেন?

ব্রজকর্তাকে দেখতে। আবার কেন? বলে হাসে।

সোমেন চোখ নামিয়ে নেয়। বুকটার মধ্যে কী একটা মাতামাতি করে।

বিন্দু দু'পা এগিয়ে এসে বলে, ব্রজকর্তার খুব অসুখ করেছিল।

সোমেন চমকে উঠে বলে, কী অসুখ?

বুকের। হার্টের।

কেউ জানায়নি তো!

বাবা ভয়ে জানায়নি, যদি আপনারা ব্রজকর্তাকে নিয়ে যান এখান থেকে। বাবা ওঁকে ছাড়তে চায় না।

অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল?

হয়েছিল। বৈঁচীর হাসপাতাল, তারপর বর্ধমানেও নিয়ে যেতে হয়েছিল ডাক্তার দেখাতে।

সোমেন চুপ করে থাকে।

মাঝে মাঝে আসবেন। আপনাদের জন্য ভেবে ভেবে বুড়োমানুষের বুক ঝাঁঝরা।

একটা শ্বাস ফেলে সোমেন বলে, আচ্ছা, আসব।

আসবেন কিন্তু।

রিকশা পাওয়া যাবে না বিন্দু? আমি এবার রওনা হই।

রিকশা আনতে লোক চলে গেছে গোবিন্দপুর। এসে যাবে যখন-তখন।

খড়মের শব্দটা বাইরে শুনেই বিন্দু পালিয়ে গেল।

বাবা ঘরে আসেন। নিঃশব্দে জামা-কাপড় ছাড়েন। কোণের দড়িতে আলগা হলদে রঙের শুদ্ধবস্ত্র আছে, সেটা পরে নিয়ে খুঁটটা গায়ে জড়ান। খালি গা, ধপধপ করছে পৈতেখানা।

কিছু খেয়েছ-টেয়েছ?

খেয়েছি।

কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

না। বহেরু খুব যত্ন করেছে।

বিছানাপত্র ভাল নয়, রাতে কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই?

তেমন কিছু না। আপনার কী অসুখ হয়েছিল?

অসুখ?

শুনলাম হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। আমাদের জানাননি কেন?

বাবা গম্ভীর মুখে বলেন, তোমাদের জানাব কেন? কলকাতায় ভাল আছ, এত দূরে টেনে এনে কষ্ট দেওয়া।

কষ্ট কীসের?

কষ্টই তো! অভিমানভরে বাবা বলেন। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, বেশ আছি, অসুখ-টসুখ কিছু নেই। এরা আত্মীয়ের চেয়ে বেশি দেখাশোনা করে। তা ছাড়া, আমিও খাড়া আছি এখনও, বসে যাইনি।

আমি বরং মাঝে মাঝে আসব।

কী দরকার! বলে বাবা একটা তিক্ত উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যান। বোধহয় সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত তাঁর ছোট ছেলেটির মুখের সুকুমার ডৌলটুকু দশবাতির আলোয় হঠাৎ তাঁর বড় ভাল লাগে। যখন সংসার ছেড়ে এসেছিলেন তখন ছেলেটা এত বড় হয়নি। বাড়ের বয়স, মুখে শরীরে ভাঙচুর হয়ে ছেলেটা পালটে গেছে। সেই পরিবর্তনটুকু বোধহয় তাঁর ভাল লাগে। পুত্রক্ষুধা টের পান বক্ষ জুড়ে। গলাটা হঠাৎ নরম হয়ে আসে। বলেন, এসো। ইচ্ছে হলে এসো।

সোমেন এই অভিমান দেখে স্মিত হাসে।

বাবা জিজ্ঞেস করেন, চাকরিবাকরি করছ?

না। এখনও পাইনি। চেষ্টা করছি। ব্যাঙ্ক অব বরোদায় একটা হতে পারে।

ভাল।

সোমেন একটু ইতস্তত করে। তাকে কেউ কথাটা বলতে বলেনি। তবু তার বলতে ইচ্ছে করে। বাবা, কিছুদিনের জন্য চলুন আমাদের কাছে।

বাবা একটু অবাক হন, তোমাদের কাছে?

হ্যাঁ।

বাবা একটু হাসেন। বলেন, বরং তুমি চাকরিবাকরি পেয়ে আলাদা বাসা-টাসা করলে ডেকো। যাব।

আপনি যে আমাদের কাছে থাকেন না সেটা বড় খারাপ দেখায়।

থাকলে আরও খারাপ দেখাবে। বাসায় কাক-শালিক বসতে পারবে না অশান্তির চোটে। সব দিক ভেবেই আমি চলে এসেছি। যখন আমি আসি তখন তুমি নাবালক ছিলে, তাই তোমার কথা ওঠে না। কিন্তু রণেন আমাকে আটকাতে পারত। সে আটকায়নি।

বাবা গলা খাঁকারি দেন। মুখে-চোখে রক্তোচ্ছ্বাস এসে যায় বুঝি! বাবা গলাটা প্রাণপণে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলেন, সায়ংকালটা পার হয়ে যাচ্ছে। আমি একটু জপে বসি। তোমার সময় হলে চলে যেয়ো।

সোমেন ঘাড় নাড়ল। উঠে প্রণাম করে নিল।

বিছানায় কম্বলের আসন পেতে বাবা গায়ের খুঁটটায় মাথা-মুখ ঢেকে শিরদাঁড়া সোজা করে বসেন। সোমেন চেয়ে থাকে। কঠোর হওয়ার কত চেষ্টা করে লোকটা। পারে না। ঢাকা শরীরটা একটু একটু কাঁপে। শীতে, না নিরুদ্ধ ক্রন্দনে?

সেই প্রথম যৌবনকালের অভিমান আর ভাঙেনি। অভিমানে অভিমানে নষ্ট হয়ে গেছে ভালবাসা। কেউ কাউকে বইতে পারে না, সইতে পারে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিমানই হয়েছে আরও কঠিন। যত দিন গেছে তত তা আরও কঠিন হয়েছে। বুকের গভীরে চৈত্রের কুয়োর তলানি জলের মতো কিছু ভালবাসা এখনও পড়ে আছে হয়তো। কিন্তু ওই দুস্তর অভিমান পার হয়ে সেইটুকু স্পর্শ করবে কে? ননীবালা না, রণেন না, সোমেন না। ওই অভিমানটুকুই ব্রজগোপালের অস্তিত্ব বোধহয়। তার সঙ্গে নিরন্তর চলে অপেক্ষা আর অপেক্ষা। এই কঠিন পাথরের অভিমান ভাঙবার জন্য কেউ আসুক, সবাই আসুক।

মৃত্যু ছাড়া ব্রজগোপালের এই বৃথা অভিমান থেকে মুক্তি নেই। এই কথা ভেবে রিকশায় বসে উত্তুরে বাতাসে কেঁপে ওঠে সোমেন। পাশে-বসা মুনিশ লোকটা একটা বিড়ি ধরায়।

রাতের ট্রেনটা এল। ইলেকট্রিক ট্রেন নয়। কয়লার ইঞ্জিন, কাঠের বগি। আগাপাশতলা গাড়িটা

ফাঁকা। দু'-একটা কামরায় দু'-চারজন আছে। বেশির ভাগ কামরাই জনশূন্য। বাছাবাছির সময় নেই বলে সামনের কামরাতেই মুনিশ লোকটা ব্যাগট্যাগ সুদ্ধু তুলে দেয় সোমেনকে।

সোমেন গাড়ি ছাড়লে টের পায় তার কামরাটায় সে একদম একা।

॥ চার ॥

ফাঁকা গাড়ির কামরায় সোমেনের একা বড় ভয়-ভয় করে। কোমরে আন্ডারওয়্যারের দড়ির খোপে কয়েকশো টাকা রয়েছে, বহেরুর দেওয়া। দাদা বিয়েতে নতুন ঘড়ি পেয়ে তার পুরনো ঘড়িটা দিয়ে দিয়েছে সোমেনকে। পুরনো হলেও ভাল ঘড়ি, টিসো। সেই ঘড়িটা সোমেনের কবজিতে বাঁধা। বউদির বড্ড ভুলো মন. স্নানের সময়ে সাবান মাখতে অসুবিধে হয় বলে আংটি খুলে রাখে। তারপর প্রায়দিনই ভুলে ফেলে আসে বাথরুমে। কত বার বাড়ির লোক পেয়ে ফেরত দিয়েছে। সোমেন কয়েকবার আংটি লুকিয়ে রেখে সিনেমার বা সিগারেটের পয়সা আদায় করেছে। অবশেষে বউদি জ্বালাতন হয়ে একদিন বলে, ও-আংটি হাতে রাখা মানে হাতি পোষার খরচ। রোজ হারাবে আর রোজ তোমার কাছ থেকে বন্ধকি জিনিস ছাড়াতে হবে। তার চেয়ে ওটা তুমিই আঙুলে পরে থাকো। তাই পরে সোমেন। বউদির মধ্যের আঙুলের আংটি তার কড়ে আঙুলে হয়।

ঘড়ি আংটি দুটোই খুলে পকেটে রাখল সোমেন। দরজা দুটোর লক লাগাতে গিয়ে দেখল, ছিটকিনি ভাঙা। গোটা দুই টিমটিমে আলো জ্বলছে, মাঝে মাঝে উসকে উঠছে আলো, আবার নিবু-নিবু হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক, রহস্যময়, ভৌতিক কামরা। শনিবার রাতের ট্রেন ফাঁকা যায়, বাবা বলেছিলেন। কিন্তু এতটা ফাঁকা, সোমেন ভাবতে পারেনি। আশপাশের কামরাতেও লোক নেই, সোমেন বৈঁচী স্টেশনে গাড়িতে উঠবার সময়ে লক্ষ করেছে, লোক থাকলেও অবশ্য লাভ ছিল না। ডাকাতি ভরাভরতি কামরাতেও হয়। সে সাবধানে কোমরে হাত দিয়ে গেলা জায়গাটা দেখল। বহেরুর দেওয়া টাকা, এক বার ভাবল, পরের স্টেশনে নেমে কামরা পালটে নেবে। কিন্তু বৈঁচীগ্রাম স্টেশনে গাড়ি থামলে দরজা খুলে নামতে গিয়েও সে দমে যায়। এমন ফাঁকা, শূন্য হাহাকার স্টেশন সে কদাচিৎ দেখেছে। দীর্ঘ প্লাটফর্মে জনমানুষের চিহ্নও নেই, শুধু শীতের বাতাস বয়ে যাচ্ছে। অনেক দূরে স্টেশন-ঘরটা ঝিম মেরে আছে আধো অন্ধকারে। কুয়াশায় আবছা। খোলা মাঠে জমে আছে অন্ধকার, ঘুমন্ত, নির্জীব। সোমেন নামবার সময়ও পেল না। ট্রেন ছেড়ে দিল। প্লাটফর্মটা পার হওয়ার সময়ে সে কেবল একজন বুড়ো কুলিগোছের লোককে দেখল রেলের কম্বলে কোট গায়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একা একটা মানুষ, পিছনে প্লাটফর্মের বিশাল নির্জনতা। সোমেন তৃষিতের মতো লোকটাকে দেখল। মানুষ যে মানুষের কত আপন তা ওই একা লোকটাকে দেখে সোমেন বুঝতে পারে হঠাৎ।

একটু কাঁপা বুক আর দুশ্চিন্তা নিয়ে সে দরজা থেকে ফিরে এসে বেঞ্চে বসে। কামরা বদলেও লাভ যখন নেই, লোকভরতি কামরাতেও যখন ডাকাতি হয়, আর তাকে যখন এই ট্রেনে ফিরতেই হবে তখন আর কী করার আছে?

পুরনো আমলের গাড়ি। বয়সের জীর্ণতা দেখা যাচ্ছে চারধারে। রঙের ওপর বিবর্ণ রং দিয়ে কামরাটার ব্রিটিশ আমলের জরার চিহ্ন ঢাকা পড়েনি। চলার সময়ে একটা ক্লান্তির ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছে। অ্যালার্মের শেকল দুলে দুলে টংটঙাস শব্দ তোলে। বাতি নিবু-নিবু হয়ে আসে, আবার জ্বলে। পরের স্টেশনও পার হয়ে গেল গাড়ি। লোকজনের কোনও শব্দ হল না। ফাঁকা ট্রেন একটা বাঁশি দিয়ে আবার ছাড়ল।

সোমেন বসে থাকে। মনে মনে প্রার্থনা করে, পরের স্টেশনে যেন দু'-চারজন লোক ওঠে

কামরায়। এত ফাঁকা সে সহ্য করতে পারে না। ভিড়ের কামরা কত বিরক্তিকর, ফাঁকা কামরাও কী অসহ্য! মানুষ যে কোন অবস্থায় সুখী হয়!

চিনেবাদাম, কমলার খোসা পড়ে আছে। দোমড়ানো ঠোঙা, সিগারেট আর বিড়ির টুকরো, দেশলাইয়ের বাক্স ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ মেঝেটা দেখলে হঠাৎ ভয় করে। কত মানুষ ছিল, তারা কেউ নেই। এ-কথাটা হঠাৎ চমকে ওঠে বুকের মধ্যে। কলকাতার ভিড়ভাট্টায় গা-ঘেঁষা মানুষকে মানুষ কত অপছন্দ করে! আবার কখনও এ-রকম নির্জনতায় মানুষের বুকে মানুষের জন্যই পিপাসা জেগে ওঠে। সোমেন একটা সিগারেট ধরায়। জানালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বাতাস আসে, ছিটকিনিহীন দরজা বাতাসের দমকায় দড়াম করে খুলে আবার ধীরে ধীরে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ভুতুড়ে বাতিগুলো জ্বলে আর নেবে। একটা কালভার্ট বাঁয়ার শব্দের মতো শব্দ তুলে পার হয় গাড়ি। সোমেনের বড্ড শীত করতে থাকে। দাঁতে দাঁতে শব্দ হয়। কোটের কলারটা সে তুলে দেয়, জড়সড় হয়ে বসে থাকে। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য সে সুন্দর কিছু একটা ভাবতে চেষ্টা করে। আর ট্রেনটা অবিরল 'দিনকাল ভাল নয়, দিনকাল ভাল নয়', শব্দ তুলে ছুটতে থাকে।

চোখ বুজে এখন একটা বাক্য ভাবছিল সোমেন—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে। কখন, কোন একাকিত্ব বা অসহায়তার সময়ে বাবা ওই কথাটা তাঁর ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন কে জানে। সোমেনের আর-কিছু মনে পড়ে না, কেবল ওই বাক্য মনে পড়ে। বাবার জন্য একটু কষ্ট হয়। তাঁর অভিমান যে কত কঠিন হয়ে গেছে তা বাবাও জানেন না। আয়ুর সময় আর বেশি দিন নয়, তত দিন উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা করবে বাবা। কেমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে মা'র চিরকুটটুকু পড়ছিল বাবা। হায়, তার মধ্যে বেশি কিছু ছিল না, ছিল 'প্রণতা ননী'। কিন্তু ওই প্রণামটুকু বাবা কি নিয়েছে? নেবে কী করে? চিঠির মধ্যে বড় স্বার্থপর কথা ছিল যে! দশ হাজার টাকা নিজের ছেলেদের বাড়ি করবার জন্য চেয়ে নেওয়া, প্রণামটুকু তার মধ্যেই হারিয়ে গেছে। ওটা শব্দমাত্র, আর কিছু নয়। সোমেন জানে।

সোমেনের বড় ইচ্ছে করে, বাবাকে আবার ফিরিয়ে আনতে। তা হয় না যদিও। ফিরে এলে আবার কাক-শালিক তাড়ানো ঝগড়া হবে। সে ভারী অশান্তি। বাবা বলেছিলেন, সোমেনের আলাদা বাসা হলে আসবেন। আলাদা বাসার কথা সোমেন কল্পনা করতে পারে না। মা আর দাদাকে ছেড়ে আলাদা বাসা করে থাকবে—তা কি হয়?

বাবার কথা ভাবতে ভাবতে তার কলকাতার কথা মনে হয়। কলকাতার ওপর বাবার ভারী রাগ। কলকাতা সম্বন্ধে বাবার মতামত শুনলে হাসি পায় ঠিকই। কিন্তু সোমেনের মাঝে মাঝে মনে হয়, কলকাতার যেন আর কিছু হওয়ার নেই। তার বুকে যতটুকু জায়গা ছিল তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষজন আর ইমারত ঠেসে দিচ্ছে চারপাশ থেকে। এ ভার সে আর বইতে পারছে না। রাস্তায় রাস্তায় আজকাল হোর্ডিং লাগিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়—কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। কিংবা—ক্যালকাটা ইজ ফর এভার, কিপ ক্যালকাটা ক্লিন.. ইত্যাদি। পাশে আঁকা রক্তবর্ণ গোলাপের ছবি। কিন্তু তার মনে হয়, কলকাতার যতটুকু হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন কেবল অপটিমাম প্রেশারে টান টান টেনশনের ওপর রয়েছে কলকাতা। চারধারে কী একটা যেন ছিঁড়বে, ভাঙবে, তখন হুড়মুড় করে নগরপতনের ভয়াবহ শব্দ উঠবে। কলকাতার প্রতিটি লোকই বোধহয় কোনও না কোনও বিহ্বল মুহূর্তে এই কথা ভাবে। কী সেটা তা বোঝা যায় না, অনুভব করা যায়।

আবার একটা নির্জন স্টেশন এল, চলে গেল। শীতের বাতাসে গা-শিরশির করা বাঁশি দিয়ে গাড়িটা নড়ে ওঠে। বুড়ো শরীরের জীর্ণতার শব্দ তুলে চলে। সোমেন সুন্দর কিছু ভাবতে চেষ্টা করে। সুন্দর কিছু মনে পড়ে না। এক হতে পারে বাড়ি গিয়ে সে দেখবে ব্যাঙ্ক অব বরোদার চিঠিটা এসেছে। পরীক্ষা ভাল দিয়েছিল, প্যানেলের উঁচুর দিকেই তার নাম থাকার কথা। চিঠিটা যদি আসে!

ভাবতেই কেমন একটা আনন্দের ধড়ফড়ানি ওঠে বুকে, আর সেই সঙ্গে রিখিয়ার মুখ মনে পড়বেই, পাভলভের থিয়োরিতে কুকুরের ঘটনার মতো, কন্ডিশন রিফ্লেকস। কিন্তু ভেবে দেখলে তার চাকরির সঙ্গে রিখিয়াকে কিছুতেই এক সুতোতে বাঁধা যায় না। এ এক রকমের স্বপ্ন দেখা সোমেনের, তেইশ বছর বয়সে এখনকার ছেলেরা আর এ-রকম স্বপ্ন দেখে না। সোমেন বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে রিখিয়াদের বাড়িটা প্রায় সময়েই মনশ্চক্ষে দেখে। একদম হালফিল কায়দার বাড়ি, যার ডিজাইনটায় অনেকগুলো অসমান কিউবিক প্রকোষ্ঠ। দোতলার বারান্দায় অ্যালুমিনিয়ামের রেলিং। সবুজ খানিকটা জমির ওপর বাড়িটা বিদেশের গন্ধ মেখে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঘরে অদ্ভুত সব গন্ধ।

মাকে বলেছিল, তুমি সঙ্গে চলো। মা রাজি হয়নি। বলেছিল, আমার বড় লজ্জা করে। তুই একা যা। সোমেন তবু চাপাচাপি করেছিল—তোমার ছেলেবেলার সই, তার কাছে লজ্জা কী? মা বিষণ্ণ মুখে বলেছে, সংসারের কী অবস্থা, দেখিস তো? মনের এ-সব অশান্তি নিয়ে কোথাও যেতে ইচ্ছেই করে না। ছেলেবেলার সই, তোর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে বলব কী? কোন কথায় কোন কথা উঠে পড়ে, আমি আবার সাজিয়ে বানিয়ে দুটো মিথ্যে কথা বললে তাল রাখতে পারি না। সব গোলমাল হয়ে যায়, তার ওপর এ-চেহারা শৈলী কি আর চিনবে, দেখে আঁতকে উঠবে হয়তো। কী যে এক ঢল চুল ছিল আমার, রংটাও ছিল ফুটফুটে। চেহারা দেখেই সংসারের অশান্তি বুঝে ফেলবে। তুই একা যা। আমার খুব বন্ধু ছিল শৈলী। তোকে আদর-টাদর করবে। সংসারের কথা যদি জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে তো রেখেঢেকে বলিস।

সেই যাওয়া, পকেটে একটা চিঠি ছিল মায়ের দেওয়া, তাতে লেখা—শৈলী, এই আমার ছোট ছেলে, সোমেন, তোর কাছে পাঠালুম। ওর যাতে একটা চাকরি-বাকরি হয় দেখিস....।

দোতলার ঘরে মা'র সেই শৈলী শুয়ে আছে। পিয়ানোর রিডের মতো চমৎকার সিঁড়ি বেয়ে উঠে দোতলার ঘরটিতে ঢুকে দৃশ্যটা দেখে থমকে গিয়েছিল সোমেন। পড়ন্ত বেলার আলো থেকে বাঁচানোর জন্য শ্যাওলা রঙের শেড টানা ছিল জানালায়, একটা মস্ত নিচু ইংলিশ খাটের ওপর উনি শুয়ে, বুক পর্যন্ত টানা একটা পাতলা লেপ। চেহারাটা রোগজীর্ণ, সাদা, রোগা। উঠে বসতে বসতে বললেন, কোন ননী, বগুড়ার ননী? তুমি তার ছেলে? ওমা!

ঘরটায় তেমন কিছু ছিল না। শেড থেকে একটা সবজে আভা ছড়িয়ে আছে আলোর মতোই। পরিষ্কার সাদা শ্বেতপাথরের মতো মেঝে। শিয়রের কাছে একটা ট্রলি, তাতে ওষুধের শিশি, কাটগ্লাসের জগে স্বচ্ছ জল, ভাঁজ করা ন্যাপকিন। একধারে একটা সাদা রেফ্রিজারেটার, ছোট্ট। একটা ড্রেসিং টেবিল। বালিশের পাশে কয়েকটা বই, একটা মহার্ঘ চশমা। একটা বই খোলা এবং উপুড় করা।

বোসো বাবা। তোমরা কলকাতায় থাকো? কোথায়? বলে উনি ঝুঁকে বসলেন, কোলের ওপর হাত। ঢাকুরিয়া শুনে চোখ বড় বড় করে বললেন, এত কাছে! তবু ননী এক দিনও এল না? সেই খুলনায় থাকতে চিঠি দিত মাঝে মাঝে। কতকাল তাকে দেখি না। খুব বুড়ো হয়ে যায়নি তো ননী? আমি যেমন হয়ে গেছি?

সোমেন অস্বস্তির হাসি হেসেছিল। মা-ও বুড়ো হয়ে গেছে ঠিকই। বয়স তো আছেই, আর আছে সংসারের কত তাপ, ব্যথা বেদনা। সে-সব কে বোঝে?

অত বড়লোক, তবু শৈলীমাসির কোনও দেমাক দেখেনি সোমেন, বরং বললেন, কতকাল ধরে রোগে পড়ে আছি। সারে না। বড় মানুষজন দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এই রোগা-ভোগার কাছে কে এসে বসে থাকবে! ননী এলে কত খুশি হতাম, তবু ননীর বদলে তুমি তো এসেছ! তোমার মুখখানা ননীর মতো, মাতৃমুখী ছেলেরা সুখী হয়।

এ-সময়ে রিখিয়া এল। বোধহয় ইস্কুলের উঁচু বা কলেজের নিচুর দিকে পড়ে। কিশোরী, চঞ্চল,

সদ্য শাড়ি ধরেছে। ইস্কুল বা কলেজ থেকে ফিরল বোধহয়, মুখখানায় রোদ-লাগা লালচে আভা। এলো চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে ঘরে এল, মায়ের বিছানার কাছে এসে অন্যমনে উঠে-আসা আলগা চুল আঙুলে জড়িয়ে চোখের সামনে তুলে ধরে বলে, ইস, রোজ কতটা করে চুল উঠে যাচ্ছে?

শৈলীমাসির মুখখানার রেখাগুলি নরম হয়ে গেল, বললেন, এই আমার একটামাত্র মেয়ে রিখিয়া। আমি ডাকি রিখি, ওর বাপ ডাকে রাখু। তোমার ভাল নাম কী বললে, সোমেন্দ্রনাথ?

সোমেন মাথা নাড়ে।

শৈলীমাসি হেসে বলেন, পুরনো আমলের নাম। আজকাল আর নামের মাঝখানে নাথ-টাথ কেউ লেখে না। সোজা নাম-টাম লেখে। এখন দেখি ডাকনামের মতো সব ছোট ছোট নামের রেওয়াজ। সেদিন এক বারোয়ারি পুজোর স্যুভেনির দিয়ে গেল, মেম্বারদের নামের মধ্যে দেখি কত মিন্টু ঘোষ, পল্টু রায়, বাবলু সান্যাল—বলতে বলতে মুখ তুলে মেয়ের দিকে চেয়ে বলেন, তাই না রিখি?

রিখিয়া উত্তর না দিয়ে মুখ টিপে অর্থপূর্ণ হাসে। হাসতেই থাকে। বোঝা যায় নামের ব্যাপারটা নিয়ে এ-বাড়িতে একটা রসিকতা চালু আছে।

রিখিয়া বলল, রিখিয়া নামটা বিচ্ছিরি।

শৈলীমাসি হাসেন, সোমেনকে বলেন, রিখিয়ার বড় মামার ছিল বিদঘুটে পেটের ব্যামো, কত ডাক্তার-বদ্যি করেও সারে না, সেবার গেল সাঁওতাল পরগনার রিখিয়াতে হাওয়া বদলাতে। সেখানে সারল, ফিরে এসে দেখে ভাগনি হয়েছে, তাই নাম রাখল রিখিয়া, বলল, শৈলী, তোর মেয়ের যা নাম রাখলাম দেখিস, রোগবালাই সব রুখে দিলাম।

বলে সস্নেহে মেয়ের দিকে কয়েক পলক চেয়ে থেকে মুখ সরিয়ে একটা শ্বাস ফেলে বলেন, বলতে নেই, শরীর নিয়ে রিখি আমাকে একটুও জ্বালায়নি, আমি তো কবে থেকে রোগ-বালাই নিয়ে পড়ে আছি, রিখি শিশুবেলায় যদি ভুগত তো ওকে দেখত কে? বড্ড লক্ষ্মী ছিল রিখিয়া সেই বয়স থেকেই। রিখি, সোমেনকে কিছু খেতে দিবি না? ফ্রিজিডেয়ারে সন্দেশ আছে, দে। এ-ঘরে নয়, পাশের ঘরে নিয়ে যাস। রুগির ঘরে খেতে নেই।

সোমেন কয়েক পলকের বেশি রিখিয়াকে তখন দেখেনি। খুব সুন্দরী নয়, তবু হালকা পলকা শরীরে একটা তেলতেলে লাবণ্য পিছলে যাচ্ছে। শ্যামলা রং, মুখখানায় সংসারের টানা-পোড়েনের ছাপ পড়েনি বলে ভারী কমনীয়। একটু দুষ্টু ভাব আছে, আছে বেশি হাসার রোগ। একটু জেদ-এর ভাবও নেই কি! তবু সব মিলিয়ে রিখিয়া বড় জীবন্ত।

শৈলীমাসি বলেন, রিখি আমার চুলের গোছ ধরে বলে, মা, তোমার এখনও কত চুল। আমি তখন ননীর কথা ভাবি। ইস্কুলে ননীর নাম ছিল চুলওলা ননীবালা, দিদিমণিরা পর্যন্ত ওর খোঁপা খুলে চুলের গোছ দেখত। আমরা কত হিংসে করতাম। দড়িদড়া দিয়ে কত বার চুল কত লম্বা তা মেপে দেখেছি, ভারী লক্ষ্মী ছিল ননী, আমরা যত বার ওর চুল মাপতাম তত বার চুপটি করে দাঁড়াত, হাসত, কখনও আপত্তি করত না। দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। রিখি, আমার অ্যালবামটা দে তো—

অ্যালবাম এলে শৈলীমাসি সোমেনকে কাছে ডাকলেন। একটা পাতায় গ্রুপ ছবি। হলদে হয়ে গেছে প্রায়। তিন সারি মেয়ে। দাঁড়িয়ে এক সারি, চেয়ারে বসে এক সারি, মাটিতে এক সারি। কারও হাতে এমব্রয়ডারির ফ্রেম—সেলাই করছে, কারও বা হাতে কুরুশকাঠি, চেয়ারে বসা দু'জন মেয়ের সামনে সেলাই মেশিন। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন মেয়ে ছবিতে রয়েছে।

শৈলীমাসি বলেন, ইস্কুলে হাতের কাজের ক্লাসে তোলা ছবি। এর মধ্যে ননী কে বলো তো?

সোমেন মুখ টিপে হাসল। বাঁ ধারে সেলাই মেশিনের পিছনে মা বসে আছে। রোগা, খুব এক ঢল চুল, নতমুখে, বড় হাতার ব্লাউজ, শাড়ির আঁচল ব্লাউজের কাঁধে পিন করা। এক নজরেই চেনা

যায়। তবু বড় অবাক লাগে। তাদের বাড়িতে মা'র ওই বয়সের কোনও ছবি নেই। কিশোরী মাকে কখনও দেখেনি সোমেন, দেখে অবাক মানে। এই ছিল আমার মা?

শৈলীমাসি মুখের দিকে চেয়ে ছিল সকৌতুকে। সোমেন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, এই তো আমার মা।

ও বাবা! নিজের মাকে চিনতে দেখি একটুও ভুল হয়নি! এখন বলো তো, আমি কোন জন?

ভারী মুশকিলে পড়ে যায় সোমেন। মুহূর্তেই ত্রিশজন মেয়ের ছবি একাকার হয়ে যেতে থাকে। শৈলীমাসির মুখটা কিছুতেই খুঁজে পায় না। তখন টের পায় তার কাঁধে সুগন্ধি এলোচুলের একটা গুছি এসে স্পর্শ করেছে। পরিষ্কার শরীরের সতেজ শ্বাস ফেলে রিখিয়া ঝুঁকে পড়ে কাঁধের ওপর দিয়ে, আঙুল বাড়িয়ে বলে, এই তো আমার মা।

সোমেন দেখে, শৈলীমাসিই তো! নীচের সারিতে এমব্রয়ডারির কাঠের ফ্রেম হাতে বসে। ঢলঢলে শরীর, আহ্লাদী মুখ।

শৈলীমাসি বুক পর্যন্ত লেপটা টেনে আবার আধশোয়া হয়ে বলেন, চিনবে কী করে? তখন তো এমন হইনি। তুই ওকে খাবার দিলি না রিখি? দে, ভুলে যাবি পরে। কত দিন পর ননীর খবর পেলাম। বড় দেখতে ইচ্ছে করে। কে কে আছে তোমাদের সংসারে, বলো তো সব, শুনি। ক' ভাই-বোন তোমরা?

সোমেন সতর্ক হয়ে যায়। বাবাকে নিয়েই তাদের যত ভয়। সংসারের কথা একটু-আধটু বলল সোমেন। তার দাদা রণেন্দ্রনাথ ফুড ইনস্পেকটর, দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, সে ছোট, বাবা রিটায়ার করে জমিজমা দেখছেন।

শৈলীমাসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ননীকে আসতে বোলো। খুব ভাল লাগবে। আমার ছেলেটা কতকাল ধরে বিলেতে পড়ে আছে। আসে না। আসবেও না লিখেছে। ওখানেই বিয়ে করবে। মেয়েটাই সম্বল। কিন্তু মেয়ে তো নিজের না, পরের ঘরে যাবে। আমার মাত্র দুটি। ননীকে বোলো যা দেখে গেলে।

বলব।

রিখি, ওকে খাবার দে। তুমি ওর সঙ্গে যাও সোমেন, যাওয়ার সময় আমাকে বলে যেয়ো। আমি একটু ঘুমোই।

শৈলীমাসি পাশ ফিরে শুলে সোমেন রিখিয়ার পিছু নিয়ে পাশের ঘরটায় আসে। বসার ঘর। গভীর সব গদিওলা সোফা, একধারে বুক-কেস কালো কাঠের। চার রঙের চারটে দেয়ালে তেলতেলে পালিশ। বুক-কেসের ওপর একটা আসাহি পেনটাক্স ক্যামেরা হেলাফেলায় পড়ে আছে।

কোথা থেকে এই সুন্দর বড়লোকি ঘরের কোন কোনা থেকে একটা কুকুর উঠে এল। দিশি কুকুর। তার হাঁটাটুকুর মধ্যে যেন আত্মবিশ্বাস নেই। এই ঘরে একটা দিশি হলদে কুকুর দেখবে, এমনটা আশা করেনি সোমেন। সে এসে রিখিয়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখটা তোলে। রিখিয়া ঝুঁকে একটু আদর করে ওকে। মুখ ফিরিয়ে সোমেনকে বলে, বসুন।

সোমেন খুব অবাক হয়ে কুকুরটাকে দেখছিল। প্রথমে লক্ষ করেনি। এখন দেখল, কুকুরটা অন্ধ। সোমেন এমন দৃশ্য কখনও দেখেনি।

সন্দেশ আনতে রিখিয়ার অনেক সময় লাগল। কুকুরটাকে আদর করল অনেকক্ষণ। তারপর প্লেট ভরতি ঠান্ডা সাদা সন্দেশ সামনের সেন্টার টেবিলে রেখে বলল, আমার ভাল নামটাও বিচ্ছিরি।

কী সেটা?

অপরাজিতা। কিন্তু ওই নামে কেউ ডাকে না।

রিখিয়া বেশ নাম।

ছাই, জায়গার নামে মানুষের নাম বুঝি ভাল?

আমার নামও ভাল নয়। আমার ছোড়দির নাম বুড়ি...

এইভাবে কথা শুরু হয়েছিল। ঠান্ডা, হিম সন্দেশের ডেলা সোমেনের গলা দিয়ে নামছিল না। মেঝের ওপর কার্পেট নেই, সোফার সামনে মস্ত মস্ত লাল-নীল উলের নরম পাপোশ। পা রাখলে ডুবে যায়। তারই একটাতে রিখিয়ার পায়ের কাছে অন্ধ কুকুরটা শুয়ে আছে।

কুকুরটা চোখে দেখে না?

না। অন্ধ।

কী করে হল?

জানি না তো, আমরা ওকে এ-রকমই পেয়েছিলাম। তখন গড়পারের বাড়িতে থাকতাম আমরা। বেশ গরিব ছিলাম। সে-সময়ে এটা কোথা থেকে এসে জুটল। রয়ে গেল। এখন বুড়ো হয়ে গেছে।

ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারে?

একটু একটু অভ্যাস আছে, তবে প্রায়ই এখানে-ওখানে ধাক্কা খায়।

'তুমি' না 'আপনি' কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না সোমেন। অন্ধ কুকুরটা থেকে চোখ তুলে সে আবার বুক-কেসের ওপর আসাহি পেনটাক্স ক্যামেরাটা দেখে। কী চকচকে, ঝকঝকে ক্যামেরাটা। মস্ত লেন্স। নিষ্প্রাণ একটি চোখ মেলে চেয়ে আছে সোমেনের দিকে। ঠিক যেন পাহারা দিচ্ছে। বার বার ওই অন্ধ কুকুর থেকে ক্যামেরার একটিমাত্র নিষ্প্রাণ চোখ পর্যন্ত দেখছিল সোমেন। সন্দেশের ডেলাটা গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। জল খেতে গিয়ে বিষম খেল। ওই হেলাফেলায় পড়ে থাকা দামি ক্যামেরা তার সঙ্গে দিশি কুকুরটা কেমন যেন বেমানান। ঘরের মধ্যে ওই দুটি জিনিসই সবচেয়ে বেশি লক্ষ করছিল সোমেন।

রিখিয়াকেও কি লক্ষ করেনি? করেছে। তবে তার তেমন কোনও দুর্বলতা নেই মেয়েদের সম্পর্কে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ে কত মেয়ের সঙ্গে তার তুই-তোকারি সম্পর্ক ছিল, আড্ডা দিয়েছে লনে বা রেস্টুরেন্টে, ফাঁকা ক্লাসঘরেও। তাই বুক কাঁপছিল না সোমেনের। কিন্তু সেই অপরাহ্নকালে বসবার ঘরে রিখিয়াকে দেখতে তার ভাল লেগেছিল বড়। লাল কার্পেটের ওপর পা রেখে রিখিয়া বসে। একটু ঝুঁকে কুকুরটাকে আদর করছে। বড় মহার্ঘ মনে হয়েছিল তাকে। পাহারা দিচ্ছে অন্ধ কুকুর, ক্যামেরার চোখ। একটু ভয় ভয় করেছিল সোমেনের।

রিখিয়া বলে, আপনি এম-এ পরীক্ষা দেননি?

না।

কেন?

কী হবে পড়ে! চাকরি করা বরং ভাল।

চাকরি? বলে সকৌতুকে রিখিয়া চেয়ে থাকে। ভাবখানা— ইস, এইটুকু ছেলের আবার চাকরি।

পকেটের চিঠিটা পকেটেই রয়ে গেল সোমেনের। দেওয়া হল না শৈলীমাসিকে। মুখে সে পরিচয় দিয়েছিল, আমি ননীবালার ছেলে, আপনার সই ননীবালা। ব্যস ওইটুকুর জোরেই ওরা গ্রহণ করেছিল তাকে। প্রমাণপত্র চায়নি। চিঠিটা হাতে দিতে বড় লজ্জা করেছিল সোমেনের।

যখন শৈলীমাসির কাছে বিদায় নিয়ে আসে তখনও বুকপকেটের চিঠিটার কথা মনে হয়েছিল। শৈলীমাসি বলেন, আবার এসো। ননীকে আসতে বোলো। আমি তো কোথাও যেতে পারি না।

আসব মাসিমা। বলেছিল সোমেন।

চমৎকার সিঁড়িটা বেয়ে নেমে আসার সময়ে হঠাৎ শুনল রিখিয়ার স্বর, আবার আসবেন।

মুখ তুলে দেখে, রিখিয়া রেলিং ধরে ঝুঁকে দোতলা থেকে চেয়ে আছে। তার চলে যাওয়া দেখছে।

সোমেন ঘাড় নাড়ল। আসবে। মনে মনে বলল, তোমার কাছেও আসব রিখিয়া! একা তোমার

কাছেই। এ তো স্পষ্টই বোঝা যায় যে একদিন সুসময়ে তোমার সঙ্গেই আমার ভালবাসা হবে!

সেই অন্ধ কুকুর, সেই আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরা বড় মনে পড়ে সোমেনের। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার চাকরির কথা মনে হলে রিখিয়ার কথা কেন যে মনে পড়বেই!

গাড়িটা চলেছে তো চলেছেই। একটু ঢিমে গতি, নড়বড় করা শরীরের শব্দ। পাঁচটা স্টেশন গেল। কেউ উঠল না, নামল না। সোমেনের কোমরে গোঁজা টাকা, পকেটে আংটি, ঘড়ি, দিনকাল ভাল নয়, দিনকাল ভাল নয়, বলতে বলতে ট্রেনটা ছুটছে।

একটু ঢুলুনি এসেছিল বুঝি। বেঞ্চের ওপর পা তুলে, ছারপোকার কামড় খেতে খেতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল। সেই ফাঁকে ট্রেনটা থেমেছিল কোথাও।

হঠাৎ আবার চলতেই ঝাঁকুনিতে জেগে যায় সোমেন। এবং চমকে দেখতে পায়, সামনে চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে। চারজোড়া চোখ তার মুখের ওপর স্থির।

॥ পাঁচ ॥

যে চারজন সোমেনকে দেখছিল তাদের একজনের নাম মেকো।

চারজনের একজন মেকোকে বলে, মেকো, প্যাসেঞ্জার।

আই বে। মেকোর উত্তর।

ও-ধারটায় বসি চল, হেভি খাওয়া হয়ে গেছে। বাবুর বাবাটা মাইরি এত খচড়া কে জানত।

অন্য একজন বলে, মেকো, মনে দুখ লিস না। তোর কপালটা খারাপ।

মেকো লম্বা, কালো, পরনে নোংরা প্যান্ট, গায়ে একটা মেয়েদের খদ্দরের নকশাদার চাদর। মুখটা সরু, ভাঙা। সোমেনকে এক বার স্থির, ক্রূর দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলল, না গাব্ভু, দুখ কীসের? তোমরা তো চুপকি মেরে ঢুকে খেয়ে এলে, আমার বেলায় হারামি বাবুর বাবা ঠিক আটকে দিল!

চারজন কামরার অন্য দিকে গিয়ে বসে। সোমেনের বয়সিই হবে। জামা-প্যান্ট ময়লা, ফরসা কিংবা কালো, লম্বা কিংবা বেঁটে চারজনকে কিন্তু গড়পড়তা একই রকম দেখায়। মেকো এক ঠোঙা চিনেবাদাম বের করে বেঞ্চে নিজের পাশে রেখে বলে, বাবু বলেছিল বটে ওর বাপটা হারামি আছে।

একজন বলে, বহুত হারামি। বাবু আমাকেও বুধবারে বলেছিল, ওর বোনের বিয়েতে আসতে পারলে একটা সিনেমা দেখাবে। আমি তো যেখানে বিয়েবাড়ি দেখি ঠিক ঢুকে যাই, আর এ তো বন্ধুর বোনের বিয়ে! বাবু তখনই বলল, শুয়োরের বাচ্চা, আমার বাপকে তো চেনো না। বলেছে আমার কোনও বন্ধু ঢুকলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। আমিও বললাম, ঠিক আছে দেখে নেব।

তোকে কী বলল?

কী বলবে! প্যান্ডেলের গেট আটকে দাঁড়িয়ে ছিল, উটকো লোক যদি ঢুকে যায় তো আটকাবে! আমাকে কেবল জিজ্ঞেস করল, তুমি কোত্থেকে আসছ? বুদ্ধি করে বলে দিলাম, ছেলের তরফের। সন্দেহ করেছিল বটে, কিন্তু আটকায়নি।

মেকো বেঁটে একজনকে জিজ্ঞেস করে, তোর তো শালা নেমন্তন্নই ছিল।

যাকে জিজ্ঞেস করা সে হাই তুলে বলে, নেমন্তন্ন মানে! পুরো ফ্যামিলি কার্ড। আমাকেও আটকেছিল, বাবার নাম বলতেই ছেড়ে দিল। প্রেজেন্টেশনের প্যাকেট-ফ্যাকেট হাতে না থাকলে সন্দেহ করবেই। তুইও আবার মেজাজ নিলি।

মেকো ঠ্যাংটা ছড়িয়ে বলল, দূর বে গাব্ভু, মেজাজ নেব না তো কি ওর ইয়ে ধুয়ে জল খাব? খপ করে হাতটা চেপে ধরল যে! বলল, তোমাকে তো চেনা-চেনা লাগছে, তুমি বাবুর বন্ধু না? তখন আমি ডাঁট নিয়ে বললাম, হ্যাঁ বন্ধু তো কী হয়েছে! তখন বলে, কে নেমন্তন্ন করেছে তোমাকে? আমি

তখন গরম খেয়ে বললাম, নেমন্তন্ন আপনি করেননি, বাবু করেছে। হারামিটা তখন বলে, বাবু তার কোনও বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেনি, করলে তার হাড় গুঁড়ো করে দেব। দেখি নেমন্তন্নের কার্ড! সে একটা ফ্যাসাদ মাইরি। আরও গরম খেতে যাচ্ছিলাম, লোকজন জুটিয়ে ঠিক একটা ভণ্ডুল করতাম, সে সময়ে বাবু এসে দূর থেকে চোখ টিপে সরে পড়তে বলল। নইলে—

চতুর্থজন সিগারেট ধরাল। বলল, আমাকে কিছু জিজ্ঞেসই করেনি। বাইরে একটু দাঁড়িয়ে রইলাম। সুট করে ঢুকে গেলাম এক সময়ে।

মেকো বলে, বাবুকে ঝাড়ব একদিন। এত বিয়েবাড়ি 'রেড' করলাম, সন্দেহ করলেও ভদ্রলোকেরা বেশি কিছু বলে না, কিন্তু এ-রকম খচাই পার্টি কখনও দেখিনি।

মেকো দ্রুত চিনেবাদামের খোসা ভাঙে। তিনজন তার দিকে চেয়ে হাসে। মেকো হাসে না।

চতুর্থজন বলে, মেজাজটা না-নিলে ঠিক ছেড়ে দিত তোকে।

মেকো তাকে একটা লাথি মারল। আচমকা। বলল, বেশ করেছি মেজাজ নিয়েছি।

লাথি খেয়ে চতুর্থজন বলে, তাতে লাভ কী হল? ভরপেট হাওয়া।

তিনজন হাসে।

দ্বিতীয়জন বলে, আসল কথাটা কী জানিস মেকো, তোর ড্রেসটা আজ সব মাটি করেছে। বিয়েবাড়ি ভদ্রলোকের জায়গা। আমাদের রাস্তা-ঘাটে দেখে তো বাবুর বাবা, ছোটলোকের মতো দেখতে। তুই যদি একটু মেক-আপ নিয়ে যেতিস—

খচাস না কেলো। ছোট ভাইটাকে বললাম পুলওভারটা রেখে যাস, এক জায়গায় যাব, বিকেলে দেখি সেটা নেই। মেজাজটা সেই থেকে বিলা হয়ে আছে।

তৃতীয়জন হঠাৎ বলে, মেকো, তোকে একটা জিনিস দিতে পারি।

কী? নিস্পৃহ মেকো জিজ্ঞেস করে।

তৃতীয়জন তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা ডেলা বের করে আনে।

কী রে? মেকো চোখ ছোট করে জিজ্ঞেস করে।

ফ্রাই। হাতছিপ্পু করে একটা সরিয়েছিলাম।

কার জন্য?

কার জন্য আবার! এমনি।

মেকো জোর হেসে ওঠে, সুধাকে দিতিস? আলু!

সবাই খ্যা-খ্যা করে হাসতে থাকে।

মেকো আর তার সঙ্গীদের পুরো গল্পটা শোনা হল না। ব্যান্ডেলে ওরা নেমে গেল। সোমেন পকেটে হাত দিয়ে দেখল তার ঘড়ি-আংটি, কোমরে টাকা। কিছু বিশ্বাস নেই। এখনও অনেকটা পথ।

হাওড়ায় যখন গাড়ি ঢুকল তখন স্টেশন ফাঁকা। রেল পুলিশ স্টেশনের চত্বর থেকে ভবঘুরেদের সরিয়ে দিচ্ছে, তবু এমন ভাল শোওয়ার জায়গা পেয়ে কিছু লোক এধার-ওধার পড়ে আছে চাদরমুড়ি দিয়ে শবদেহের মতো। শীতের রাত দশটার পরই ঝিমিয়ে গেছে শহর। কয়েকজন মাত্র লোক নিয়ে স্টিমারের মতো প্রকাণ্ড পাঁচ নম্বর বাসটা ছেড়ে যাচ্ছিল, সোমেন দৌড়ে গিয়ে ধরল। হাওড়ার পোল পেরিয়ে শহর ভেদ করে যেতে যেতে কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না, একটু আগেই সে বহেরুর খামারবাড়িতে ছিল।

রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে এল সোমেন। সবাই তার অপেক্ষায় জেগে বসে আছে। কেউ খায়নি।

খেতে বসলে পর মা জিজ্ঞেস করে, কী বলল রে? দেবে?

কী জানি। স্পষ্ট কথা বলল না।

মা শ্বাস ফেলে বলে, দেবে না। আমি জানতাম।

দাদা বিরক্ত মুখ তুলে বলে, জানতে যদি তবে আগ বাড়িয়ে চেয়ে পাঠালে কেন? আমি তো বারণই করেছিলাম।

বুড়ো হয়েছে, এখন যদি মতিগতি পালটে থাকে—সেই আশায়।

দাদা ভাত মাখতে মাখতে বলে, যে-লোকটার কোনওকালে মন বলে বস্তু ছিল না তার কাছ থেকে কিছু আশা করা বৃথা। তুমি কোন আক্কেলে যে চিঠিটাতে আমার নাম করে চাইলে! তোমার কি ধারণা, আমার নাম করে চাইলে বাবা গলে যাবে!

তোকে তো ভালবাসত খুব। সংসারে একমাত্র তোর দিকেই টান ছিল।

ও-সব বাইরের টান, মায়া। সত্যিকারের ভালবাসা নয়...।

বলতে বলতে দাদা লাল হয়ে ওঠে রাগে, অপমানে।

মা দুঃখ করে বলে, অজিত বলছিল জমিটা আর ধরে রাখা যাবে না, ভাল ভাল দর দিচ্ছে লোক। ওর বন্ধুও তাগাদা দিয়ে গত সপ্তাহে চিঠি দিয়েছে।

বেচে দিক গে। দাদা প্রচণ্ড রাগের গলায় বলে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। দাদার রাগকে এ-বাড়ির সবাই ভয় পায়। দীর্ঘকাল হয় দাদার রোজগারে সংসার চলছে। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে দাদা সংসারের পরিপূর্ণ অভিভাবক।

মা হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে, তুই একটু দেখ না!

দাদা অবাক চোখ তুলে বলে, কী দেখব?

এক বার যা, তোর মুখ দেখলে যদি মায়া হয়।

দাদা স্থির দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চাইল। মাও তক্ষুনি কথাটার ভুল বুঝতে পারে। চোখ সরিয়ে নিয়ে প্রসঙ্গ পালটে বলে, না হলে দেখ যেমন করে পারিস, ধারধোর করেও যদি রাখা যায়। আমার একখানা গয়না থাকলেও আজ খুলে দিতাম। কিন্তু ওই রাক্ষস তো সবই খেয়েছে।

দাদা কোনও উত্তর দেয় না, খাওয়ার শেষে উঠে যায়।

সোমেন আর মা এক ঘরে দুটো চৌকিতে শোয়। মশারি ফেলা হয়ে গেছে, সোমেন শোওয়ার আগে সিগারেট খাচ্ছিল। মা'র সামনেই খায়। মা তার মশারির মধ্যে বসে মশা খুঁজল কিছুক্ষণ। চুলের জট ছাড়াল বসে। তারপর এক সময়ে বলল, কেমন সব দেখে এলি?

কীসের কথা বলছ? বাবার কথা?

হুঁ।

ভালই তো।

বহেরু মোটে চারশো টাকা পাঠাল, ধানের দর কি এবার কম?

বলল তো দর ভালই। যা দিল নিয়ে এলাম।

তুই তো ও-রকমই, বাপের মতো ন্যালাখ্যাপা। হিসেব বুঝে আসতে হয়। বহেরু কি সোজা লোক! তোর বাপের প্রভিডেন্ট ফান্ডের আর হাতের-পাতের যা ছিল তা দিয়ে নাকি জমি-টমি কিনিয়েছে। শেষে সব ও নিজেই ভোগ করবে।

সোমেন একটু বিরক্ত হয়ে বলে, লোকটাকেই যখন ছেড়ে দিয়েছ তখন তার টাকার হিসেব দিয়ে কী হবে!

মা চুপ করে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ নিজেকে সামলাতে পারে না, বলে, আমার দুঃখ তোরা তার কিছু পেলি না। দশভূতে লুটে খাচ্ছে।

খাক গে। আমার ও-সব দরকার নেই।

ঠিক ঠিক কী বললে বল তো?

এক বার তো বললাম।

আবার বল। খতিয়ে দেখি, কথার মধ্যে কোনও ফাঁক রেখেছে কি না।

কলকাতায় আমরা বাড়ি করি তা চান না। গোবিন্দপুরে গেলে বাড়ি করার টাকা দেবে।

চাকরি-বাকরি ছেড়ে যাবে কী করে!

সেটা কে বোঝাবে!

তুই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আসতে পারলি না?

সোমেন নীরব উত্তেজনায় আর-একটা সিগারেট ধরাল।

কীরে? মা জিজ্ঞেস করে আবার।

বাবার বয়স কত মা?

কেন?

বলো না!

সে হিসেব কি জানি? সে-আমলে বয়স-টয়স নিয়ে তো কেউ হিসেব বড় একটা করত না। মনে হয় পঁয়ষট্টি হবে। আমারই তো বোধহয় ষাট-টাট। কী জানি, ঠিক জানি না।

এই বয়সে একটা লোক অত দূরে একা পড়ে আছে। সে কেমন আছে তা এক বারও জিজ্ঞেস করলে না?

মা একটু অবাক হয়ে বলে, জিজ্ঞেস করলাম তো! তুই তো বললি ভালই। কেন, কিছু হয়েছে নাকি?

বলতে বলতে মা উদ্বেগে মশারি তুলে বেরিয়ে আসে। মা'র চুল এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। এলো চুলের ঢলটি এখনও পিছনে কালো প্রপাতের মতো ঝরে পড়ছে। সেই কালোর মধ্যে রোগা সাদা মুখখানা, তাতে বিস্ফারিত চোখ দেখে সোমেনের মায়া হয়।

মাথা নেড়ে বলল, কিছু হয়নি।

তবে ও-সব কী বলছিস। ভাঁড়াস না। ঠিক করে বল।

সোমেন হাসতে চেষ্টা করে। ঠিক ফোটে না হাসিটা। তার মনের মধ্যে একটা কথা বিঁধে আছে, ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে। কোন অসতর্ক মুহূর্তে না কি মৃত্যুচিন্তায় নিজের ওই আর্তস্বর ডায়েরিতে লিখে রেখেছে বাবা!

মা চেয়ে আছে।

সোমেন বলে, ভেবো না, ভালই আছে। টাকার কথাটা বেশি বলতে আমার লজ্জা করেছিল। গত পাঁচ বছব আমরা কেউ বাবার খোঁজ নিতে যাইনি।

মা'র মুখে যেন জল শুকিয়ে যায়। শুকনো মুখে টাকরায় জিভ লাগার শব্দ হয় একটা। মা বলে, গেলে কি খুশি হত নাকি। রণেন যখন যেত-টেত তখন তো উলটে রাগ করেছে! রণেনের অপমান হয় না! ছেলে এখন বড় হয়েছে, ছেলেমেয়ের বাবা, তার সঙ্গে কথা বলতে বাপকেও সাবধান হতে হয়। সে লোকটা কি তেমন বাপ। চিরকাল...

মা হাপরহাটি খুলে বলতে যাচ্ছিল। সোমেন বাধা দিয়ে বলে, থাকগে। ও-সব শুনে শুনে তো মুখস্থ হয়ে গেছে।

মা রাগ করে বলে, আজ হঠাৎ তার দিকে টানছিস কেন? সে তোর জন্য কী করেছে?

কিছু করেননি। সোমেন তা জানে। কেবল দশবাতির আলোয় মুখ তুলে বাবা এক বার তাঁর কনিষ্ঠ ছেলেটির সুকুমার মুখশ্রী বড় ক্ষুধাভরে দেখেছিলেন। কী পিপাসা ছিল সেই চোখে!

সোমেন হঠাৎ হালকা গলায় বলে, তোমরা মিস্টার অ্যান্ড মিসেস এবার একটা ফয়সালা করে নাও না।

কীসের ফয়সালা?

তুমি কি শুভদৃষ্টির সময়ে টেরছা করে চেয়েছিলে বাবার দিকে?

অন্য সময়ে মা হালকাভাবেই নেয় এ-সব কথা। এখন উদাস গলায় বলে, কে কাকে টেরছা চোখে চেয়েছে তা সেই জানে।

মা একটু চুপ করে ভাবে। তারপর বলে, আমি তো সবই করেছি। ঘরদোর আগলে, ছেলেমেয়ে মানুষ করে, কোনওটাতেই তো ফাঁক রাখিনি। এখনও আমিই আছি সংসারে। কিন্তু তাকে বাউন্ডুলে হতে হয়েছে। কর্মফল কার ফলল? সে যদি ভালমানুষই হবে, তবে কেন এই সংসারের ঘরে পা দিতে সাহস পায় না? কেন ছেলেরা মেয়েরা জামাইরা তাকে বিষচক্ষে দেখে?

সোমেন মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলে, তোমার বড় গুমোর হয়েছে ননীবালা!

গুমোর! কীসের গুমোর রে পাজি ছেলে?

ছেলেমেয়েরা তোমাকে ভালবাসে, বাপকে বাসে না, তার গুমোর।

গুমোর থাকলে আছে। মায়েদের তো ওই একটাই অহংকারের জায়গা। তাকে ভাল বলার জন্য বাইরের লোক আছে, আমাকে তো বাইরের লোকে জানে না, তোরা জানিস। আমিও তোদের জানি। সে বলুক তো বুকে হাত দিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য কী করেছে!

সোমেন সিগারেটটা পিষে নিবিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে গিয়ে বলে, বাদ দাও। রাত বারোটা বাজে।

মা তবু গুনগুন করতে থাকে, একদিনে তুই এমন কী চিনে এলি লোকটাকে! আমরা সারা জীবন জ্বলেপুড়ে গেলাম—

আঃ। আলোটা নেবাও তো।

মা আলো নিবিয়ে দেয়, অন্ধকারেও কথা বলে, আমার বাচ্চারা জন্ম থেকে মাকে জানে, বাপ ছিল অতিথিসজ্জনের মতো। আজও তাই আছে। স্বার্থপর বারমুখো, পাগল একটা।

সোমেন ধমকায়, বকবক কোরো না তো। অনেক ধকল গেছে—

মা চুপ করে যায়। গলা এক পরদা নামিয়ে গুনগুন স্বরে বলে, আরজন্মে আর মেয়ে হয়ে জন্মাব ভেবেছিস? মেয়েজন্ম এবারই ঘুচিয়ে গেলাম। আর না। কী পাপ, কী পাপ!

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা একদম মৌনীবাবা হয়ে আছে। চিঠিপত্র কিছু আসছে না। দিন যায়, সোমেন ভাবে চাকরিটা বোধহয় হল না। ওদের অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে ভয়-ভয় করে। ইদানীং যে কয়েকটা পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দিয়েছিল তার মধ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদাই ছিল হট ফেবারিট। যদি না হয় তবে কী যে হবে।

অণিমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটির লনে অনেক বসেছে সোমেন। মেয়েটা বড় বুদ্ধিমতী। অনেক মেয়ের সঙ্গে আড্ডা দিয়েও, অণিমার সঙ্গে আলাদা বসতে ভাল লাগত। চোখা চেহারা, ভারী চশমা চোখে। দাঁত চমৎকার। মুখটা একটু ভাঙা আর লম্বা বটে, কিন্তু ফরসা রঙে, আর প্রচুর পড়াশুনো করার ফলে একরকমের গাম্ভীর্য এসে গিয়েছিল বলে ওর চেহারাটা ভালই লাগে সকলের। সোমেনের ভাল লাগা কিছু বেশি ছিল। অণিমাও তাকে পছন্দ করেছে বরাবর।

সেবার বউদির সঙ্গে মা'র ঝগড়াটা খুব চরমে উঠেছিল। বরাবরই ছিল ঝগড়া। মা'র একটা বিচ্ছিরি স্বভাব আছে, সংসার থেকে জিনিস সরানো। তেমন কোনও কাজে লাগে না, তবু মা একটু চিনি কি আটা, নিজস্ব একটু বাসনপত্র, ছেঁড়া ন্যাকড়াই হল কখনও, যা পাবে সব সরিয়ে লুকিয়ে রাখে। তার ওপর আড়াই ঘরের ফ্ল্যাট বাড়ির যে-ঘরখানায় মা আর সোমেন থাকে, সেটা প্রায় সময়েই তালাবন্ধ করে রাখে মা। এই স্বার্থপরতা বউদি প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারত না। প্রায় সময়েই বলত, ছেলেমেয়েগুলো জায়গা-বাসা পায় না, এমনিতেই জায়গা কম, তার ওপর আবার একখানা ঘর তালাবন্ধ। মা আবার সে-কথার জবাব দিত, আমি বাপু নিজের হাতে ঘর পরিষ্কার করি, ছেলেপুলে নোংরা করলে, তোমরা তো সব পটের বিবি, মুখ ফিরিয়ে থাকবে। সারাদিন

খেটেখুটে রাতে একটু পরিষ্কার বিছানা পাব না, তা হবে না।

এইভাবেই ক্রমে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দুই যুযুৎসব তৈরি হচ্ছিল। কারণটা কিছুই না, তবু ওই ঘরখানার অধিকারবোধ নিয়ে দু'পক্ষের লড়াই। এই ঝগড়ায় বরাবর দাদা এসে মিটমাট করেছে, সোমেন বাড়ি ফিরে মাকে ধমকেছে। আবার পরদিন সব ঠিকও হয়ে গেছে।

কিন্তু সেবার ঝগড়াটা এতই চরমে উঠল যে, মা একটা বাটি ছুড়ে মেরেছিল বউদিকে। বউদির বদলে সেটা তার কোলের বাচ্চার হাঁটুতে লাগে। বউদি বাচ্চা ফেলে তেড়ে এসেছিল মাকে মারতে। ঝি আটকায়।

দাদা সেই প্রথম ঝগড়ার মিটমাট করার চেষ্টা করল না। অফিস থেকে ফিরে আসার পর বউদি পাশের ঘরে দাদার কাছে চেঁচিয়ে কেঁদে মা'র নামে নালিশ করল। অনেক রাত পর্যন্ত অশান্তি। অন্য ঘরে মা তখন ভয় পেয়ে কাঁদছে। সোমেন মাকে ধমকায়নি পর্যন্ত সেদিন। চুপ করে নিজের বিছানায় শুয়ে ছিল। সেই রাতে বউদি বা মা'র কারও ওপর তেমন নয়, কিন্তু দাদার ওপর কেমন একটু অবিশ্বাস এসেছিল তার। ছেলেবেলা থেকে যেমন সে দেখে এসেছে, মা-অন্ত প্রাণ দাদাকে, সেই দাদা যেন-বা আর নেই। দাদার বিয়ের আগে পর্যন্ত তারা কত সুখী ছিল, এই কথা ভেবে সে-রাতেই সোমেন সিদ্ধান্ত নেয় যে আর পড়বে না। চাকরি করে মাকে নিয়ে আলাদা থাকবে। সে-রাতে সে মা'র পক্ষই যে সমর্থন করেছিল তা নয়। সে কেবল ভেবেছিল সংসারটার শান্তি বাঁচাতে ননীবালাকে আলাদা করা দরকার। দাদার রোজগারে যখন সংসার চলে তখন বউদির প্রাপ্য সম্মান তাকে দিতেই হবে। মা পুত্রঅন্ধ, অধিকারবোধ প্রবল, মা জানে রণেন তারই আছে সবটুকু।

কাউকে কিছু না-জানিয়ে সে ইউনিভার্সিটি যাওয়া বন্ধ করে। পড়াশুনো আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়। পড়াশুনোর ক্ষতি হয় বলে দাদা তাকে টিউশনি করতে দেয়নি কখনও। ক্রমে সে টিউশনিও খুঁজতে থাকে।

সে-সময়ে অণিমার সঙ্গে দেখা একদিন। চাকরির অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ক্যারেকটার সার্টিফিকেট আনতে গিয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে, দেখে অণিমা একা জলের ধারে ঘাসে বসে আছে রোদ্দুরে। কোলে খোলা বই। ওকে একা দেখে একটু কষ্ট হল সোমেনের। পাশে তার থাকার কথা এ-সময়ে। কত কথা হত তাদের। চুপ করে থাকাটাও একরকমের পূর্ণই ছিল। সেটা ভালবাসা নয়, বোধহয় বন্ধুত্বই হবে।

তাকে দেখে চমকাল না অণিমা। আন্তরিক মুখখানা তুলে বলল, ভাবছিলাম, তোমার খোঁজ নিতে যাব। অসুখ-বিসুখ করেছিল?

না। পড়া ছেড়ে দিচ্ছি।

অণিমা মৃদু হেসে বলে, ছেড়ে দেওয়াই উচিত। একে কি পড়াশুনো বলে!

আমি ছাড়ছি পেটের ধান্ধায়।

তাই নাকি? চাকরি পেয়েছ?

কোথায় চাকরি! টিউশনিই পাচ্ছি না সুবিধা মতো।

অণিমা আন্তরিক উদ্বেগের সঙ্গে বলে, তোমার খুব দরকার টিউশনির?

খুব।

এত দিন কী করে চালাচ্ছিলে?

দাদা দিত। দিত কেন, এখনও দেয়। আমার নিতে ইচ্ছে করে না। এম-এ পাশের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, খামোখা খরচা। ছ'মাস মাইনে দিইনি।

অণিমা অকপটে জিজ্ঞেস করল, তোমার কেউ বার্ডেন নেই তো?

না, কেন?

ভাবছিলাম, একশো টাকার একটা টিউশনি হলে তোমার চলে কি না।

তোমার হাতে আছে?

আছে। যদি প্রেস্টিজে না লাগে করতে পারো।

প্রেস্টিজের কী ব্যাপার টিউশনিতে?

আমার ভাইকে পড়াবে?

অণিমার ভাইকে সে কেন পড়াতে পারবে না, তার কোনও যুক্তিসিদ্ধ কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। অণিমা তো বন্ধু, একই ক্লাসে পড়ে। ওর ভাইকে পড়ালে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সাম্যভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে—শুধু এইটুকু খারাপ লেগেছিল সোমেনের। কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হেসে সে বলল, পড়াব না কেন?

অণিমা নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, তা হলে কাল থেকেই যেয়ো। ভাইটা সেন্ট লরেন্স-এ পড়ে। ক্লাস সিক্স। ইংরিজিতে বড্ড কাঁচা, ক্লাস ফলো করতে পারে না। স্কুল থেকে চিঠি দিয়েছে, পরের পরীক্ষায় ইংরিজিতে ভাল ফল না-করলে নীচের ক্লাসে নামিয়ে দেবে। আমরা তাই একজন ভাল টিউটর খুঁজছি।

আমি রাজি।

সেই থেকে সোমেন পড়ায় অণিমার ভাইকে। কিন্তু আশ্চর্য, এ ক'মাসের মধ্যে এক দিনও ওদের বাড়িতে অণিমার সঙ্গে দেখা হয়নি। বোধহয় লজ্জায় অণিমাই সামনে আসে না। সোমেনকে ওরা মাইনে দিয়ে রেখেছে, এটা বোধহয় অণিমার কাছে সাধারণ ব্যাপার নয়। সোমেনও খোঁজ করে না। যত দিন টিউশনি না করত তত দিন সহজে দেখা হত বরং। এখন অণিমার বাড়িতে রোজ আসে বলে অণিমা রবিঠাকুরের সেই সোনার হরিণ হয়ে গেল বুঝি! পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়।

কিন্তু টিউশনি করে কিছু লাভ হয়নি। মাকে নিয়ে আলাদা বাসা করার সাময়িক চিন্তা সে ছেড়েও দিয়েছে। সংসারের সবটাই তো কেবল কুরুক্ষেত্র নয়, সেখানে আছে একটা অদৃশ্য নিউক্লিয়াস, অণু-পরমাণু সব মানুষ কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণে একটা টানক্ষেত্র তৈরি করে নেয়। তাই সংসারের প্রতিদিনকার ভাঙচুরগুলো অলক্ষ্যে এক সারাইকর এসে কিছু কিছু মেরামত করে দিয়ে যায়, ঠুকে ঠুকে যেন-বা বাসনপত্রের টোল-পড়া জায়গা তুলে দিয়ে যায়, জোড়া দেয় ফাটা-ভাঙা বাসন। সবটা মেরামত হয় না অবশ্য। নিখুঁতভাবে জোড়া লাগে না। তবুও অদৃশ্য নিউক্লিয়াস টানক্ষেত্রের ধর্ম রক্ষা করে চলে। তাই আবার মা আর বউদি ভাগাভাগি করে সংসারের কাজ করে এখনও। এ ছেলে রাখে তো ও রান্না করে। সোমেন তাই আর আলাদা বাসা করার কথা ভাবে না। কেবল বাবার কথা ভাবলেই সংসারের টানক্ষেত্রটার দুর্বলতা ধরা পড়ে। বাবা যে সত্যিই টানক্ষেত্রটা ছেড়ে গেছে তাও মনে হয় না আবার। সেই কথাটা বিঁধে থাকে সোমেনের মনে—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

টিউশনিটা তাই আর ভাল লাগে না সোমেনের। খামোখা। চাকরিটা পেলে বরং হয়। টিউশনিটা ছাড়লে অণিমাও সহজভাবে কথা বলতে পারে আবার। বড্ড আবেগপ্রবণ মেয়ে। আবার মাসের প্রথমে একশোটা টাকা পাওয়ার অভ্যাসই বা কেমন করে ছাড়ে সোমেন?

সন্ধেবেলা সোমেন গাব্বুকে পড়িয়ে বেরোচ্ছে, হঠাৎ দেখে, অন্যমনে মাথা নিচু করে অণিমা অন্য দরজা দিয়ে বাসা থেকে বেরোচ্ছে। তেমনই আছে অণিমা। ভারী চশমার আড়ালে চোখ, পরনে ছাপা শাড়ি, গায়ে স্টোল, হাতে ব্যাগ, পায়ে চপ্পল। মুখে কোনও প্রসাধন কখনও মাখে না, চুল রুক্ষ।

এই যে বস, কী খবর?

অণিমা চমকাল না। অণিমা কখনও চমকায় না। অণিমা কখনও চমকাবে না। আচমকা বোমা পড়লেও না! ওর ওই স্বভাব। ঠান্ডা গম্ভীর মুখখানা তুলে চমৎকার দাঁতে হাসল, কী খবর! ছাত্র কীরকম পড়ছে?

ভালই। টার্মের পরীক্ষাগুলো তো ভালই দিয়েছে।

দেখেছি।

তা হলে একটা ইনক্রিমেন্ট দেবে নাকি?

ইনক্রিমেন্ট? ভারী অপ্রতিভ গলায় বলে অণিমা।

তেমনি ঠাট্টার স্বরে সোমেন বলে, ইনক্রিমেন্ট না দিলে ঘেরাও করব।

একা কি কাউকে ঘেরাও করা যায়?

চোখ নাচিয়ে সোমেন বলে, যায় না?

কীভাবে শুনি?

সোমেন শব্দহীন হাসি হেসে বলে, যায়। একজনের দুটো হাতে একদিন ঠিকই ঘেরাও হবে তুমি। জানো না?

অণিমা মাথা নেড়ে বলে, না তো! কে সে?

ধরো, যদি বলি....

॥ ছয় ॥

অণিমা মুখ তুলে হাসে। হাসিটা দুষ্টুমিতে ভরা। অণিমা বলল, থাক, বোলো না।

বলব না? সোমেন বিস্ময়ের ভান করে, তা হলে কথাটা কি টের পেয়ে গেছ?

না তো! তবে শুনতে চাইছি না।

সোমেন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, গরিব হওয়ার ওই একটা দোষ। বড়লোকের মেয়েরা পাত্তা দিতে চায় না।

অ্যাই! তোমাকে আমি পাত্তা দিইনি?

দিয়েছ? তা হলে শোনোই না কথাটা। ধরো, যদি বলি—

আঃ। চুপ করো।

চুপ করব? যদি তোমাদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে আজ আমার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয় তা হলে কিন্তু কথাটা না-বলাই থেকে যাবে। সারা জীবন তুমি ভাববে, সোমেন কী একটা বলতে চেয়েছিল—

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আবার হেসে ফেলে অণিমা। বলে, গরিবের ছেলের অনেক দোষ। তার মধ্যে মৃত্যু নিয়ে রোমান্টিসিজম একটা।

অণিমাদের বাগানে চমৎকার ফুল ফুটেছে। বারান্দার ফ্লুরোসেন্ট আলোতে অজস্র ভৌতিক ফুল দেখা যাচ্ছে। আসল রং বোঝা যায় না রাতে, কেমন আলোর তৈরি ফুল সব আধো-অন্ধকার বাগানে নিস্তব্ধ হয়ে ফুটে আছে। সোমেন চলে যাবে বলে বারান্দার দু'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। বলল, চলি। বলা হল না কিন্তু।

না হোক। শোনো, কোথায় যাচ্ছ?

গড়িয়াহাটা।

হাতে কোনও কাজ নেই তো!

কী কাজ থাকবে? সারাদিন নৈকষ্যি বেকার। গড়িয়াহাটায় বুকস্টলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু লিটল ম্যাগাজিন দেখব, তারপর বাসায় ফিরব।

অণিমার বাইরে যাবার সাজ। সোমেনের পিছু পিছু নেমে আসতে আসতে বলল, একটা জায়গায় আমার সঙ্গে যাবে?

সোমেন দাঁড়ায়। হেসে বলে, যেতে পারি, যদি কথাটা শোনো—

অণিমা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, কথাটা আর একদিন বললে হয় না! যেদিন বেশ চাঁদ-টাঁদ উঠবে, ফুল-টুল ফুটবে, দূরে কোথাও যাব আমরা। সেদিন বোলো বাপু!

সময় কিন্তু বয়ে যাচ্ছে।

যাকগে। এখন আমাকে পৌঁছে দাও। একা একা ট্যাক্সি চড়তে ভয় করে।

তাই বলো! নইলে কি আর আমাকে সঙ্গে নিতে!

অণিমা কথা বলে না। ভ্রূকুটি করে।

প্রশস্ত পথটি ধরে ওরা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের দিকে আস্তে আস্তে হাঁটে। সোমেন সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলে, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ একা?

অণিমা বলে, একা তো যাচ্ছি না।

আমাকে না পেলে তো যেতে।

অণিমা হেসে বলে, তাই যদি যাব তবে গাব্বুর পড়ার ঘরের পাশের ঘরটায় বসে ঘণ্টাখানেক মশা তাড়ালাম কেন? বুঝলে মশাই, ঠিক তক্কে তক্কে ছিলাম কখন তোমার পড়ানো শেষ হবে।

সোমেন বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, তাই বুঝি! তবে কি কথাটা তুমিই বলতে চাও অণিমা? তাই অপেক্ষা করে ছিলে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে বলবে? নাকি কোথাও দূরের কোনও মাঠে পৌঁছে গিয়ে বলবে।

অণিমা ভয় পাওয়ার ভান করে বলে, না, না, আজ নয়। আজ অন্য জায়গায় যাচ্ছি।

সোমেন ম্লান মুখে হাঁটতে হাঁটতে বলে, কলকাতার কত লোকের কত জায়গা আছে যাওয়ার!

তোমার নেই বুঝি?

সোমেন মাথা নাড়ে। আস্তে আস্তে আপন মনে বলে, ধরো, পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে নাচ-গান হুল্লোড় হয়, বড় রেস্টুরেন্টে হয় বিউটি কন্টেস্ট, কেনেল ক্লাবে ডগ শো, সাউথ ক্লাবে টেনিস, গোপন আড্ডায় নেশাভাং। সব জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে। একটা শ্বাস ফেলে বলে, এমনকী গঙ্গার ঘাটেও যাই না, জাহাজ দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। কোনও দিন বিদেশে যাব না, এই সত্যি কথাটা বড্ড মনে পড়ে।

আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে ছেলে রে বাবা! আর কী কী ইচ্ছে করে তোমার, একটা লিস্ট করে দিয়ো তো! খেয়াল রাখব।

এই তো ইচ্ছে করছে একটা কথা বলি। ধরো, যদি বলি....

দু'হাতে কান চাপা দিয়ে অণিমা হেসে ওঠে, ওটা থাক।

থাকবে?

বললেই তো ফুরিয়ে গেল। থাক না।

সময় চলে যাচ্ছে।

যাকগে। তুমি ট্যাক্সি ধরো তো। এই রাস্তায় ট্যাক্সি বড় কম।

সন্ধে সাতটাও বাজেনি। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড এর মধ্যেই জনহীন, পরিত্যক্ত। হুড়হুড় করে কেবল কয়েকটা গাড়ি ওয়াশ-এর ছবির মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।

সোমেন রাস্তার দু'ধার দেখে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলে, প্রাইভেট টিউটর হওয়ার কী গেরো রে বাবা।

কী হল?

চাকরি বজায় রাখতে কত ওভার-টাইম খাটতে হচ্ছে।

ইস! কী যে অসহ্য হয়ে যাচ্ছ না দিনকে-দিন!

সেই জন্যই তো বলছিলাম, আরও অসহ্য হয়ে ওঠার আগেই কথাটা বলে ফেলার একটা চান্স

দাও। এমন ফাঁকা রাস্তা, নিঝুম শীতের রাত, লোডশেডিং থাকলে চাঁদও দেখা যেত ঠিক। ধরো, যদি বলি...

ওই যে ট্যাক্সি সোমেন। ধরো, দৌড়ে যাও...

সোমেন দৌড়োল, এবং চটির একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে ট্যাক্সিটা ধরতে পারল। অবশ্য আর কেউ ট্যাক্সি ধরার জন্য ওত পেতে ছিল না। যত দূর দেখা যায় রাস্তাটা অতিশয় নির্জন।

ট্যাক্সিতে সোমেন একটা সিগারেট ধরাল। হাঁফাচ্ছিল একটু। দুঃখিত স্বরে বলে, সব মুচি ঘরে আসে, সব চটি ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন—

কী বলে রে পাগলা? অণিমার হাসি চলকায়।

রাস্তায় এত রাতে মুচি নেই একটাও। তোমার ট্যাক্সি ধরতে গিয়ে চটিটা ছিঁড়েছে মাইরি।

অণিমা শ্বাস ফেলে বলে, কী যে কাণ্ড করো না!

তুমি দৌড়োতে বললে যে! না দৌড়োলে যদি চাকরিটা খাও?

ইচ্ছে করেই তো বললাম, নইলে তুমি বোকার মতো কথাটা বলে ফেলতে যে!

সোমেন সবিস্ময়ে বলে, কোন কথাটা?

যেটা বলতে চাইছিলে!

কী বলতে চাইছিলাম বলো তো!

ওই যে! ধরো, যদি বলি—

সোমেন বিরসমুখে বলে, থাকগে। বোলো না।

বলব না?

অন্য দিন বোলো। সোমেন সিগারেটে টান দিয়ে বলে, যেদিন ফুল-টুল ফুটবে, চাঁদ-টাঁদ উঠবে, লোডশেডিং থাকবে, দূরে কোথাও গিয়ে—

দু'জনেই হেসে গড়ায়। পাঞ্জাবি ট্যাক্সিওয়ালা ঘাড় না-ঘুরিয়েই একটা অস্ফুট শব্দে রাস্তা জানতে চায়। অণিমা হাসি না থামিয়েই বলে, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ।

অণিমা তার খোঁপা ঠিকঠাক করল, গা ঢাকা দিল, গাড়ির কাচটা তুলে দিল ভাল করে। বলল, শোনো, কথাটা একজন বলে ফেলেছে।

কোন কথা? সোমেন উদাসভাবে জিজ্ঞেস করে।

সেই কথাটা।

ও। সোমেন তেমনি নিরাসক্ত। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড পেরিয়ে লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে ছুটছে গাড়ি। ডাইনে মোড় নিল একটা। কী চমৎকার সব মস্ত মস্ত ফ্ল্যাটবাড়ি, নিঝুম, অ্যারিস্টোক্র্যাট আর নরম সব আলোর রঙে রঙিন। মুগ্ধ হয়ে দেখে সোমেন।

সত্যি বলছি। অণিমা বলল।

কে বলেছে কথাটা?

ম্যাক্স।

সোমেন একটু অবাক হয়ে বলে, কে বললে?

ম্যাক্স।

সে কে?

একজন অস্ট্রেলিয়ান সাহেব।

তাকে কোথায় পেলে?

পেয়ে গেলাম। একটা সেমিনারে আলাপ। সেখান থেকেই পিছু নেয় কলকাতার গলিঘুঁজি দেখবে, বাঙাল রান্না খাবে, সেতার আর তবলা শিখবে। কিছুতেই ছাড়ে না। তাই তার গাইড হয়ে

সঙ্গে নিয়ে নিয়ে কিছুদিন ঘুরলাম, নেমন্তন্ন করে খাওয়ালাম, গানের ইস্কুলে নিয়ে গেলাম। সেই থেকে কী যে হয়ে গেল ওর!

সোমেন চোখ মিট মিট করে ট্যাক্সির মধ্যেকার অন্ধকারে আবছা অণিমার মুখের দিকে চায়, বলেছে?

তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। তিন-চারদিন আগে ওর সঙ্গে তারাপীঠ গিয়েছিলাম। মস্ত শ্মশান সেখানে, গাঁজার আড্ডা। ম্যাক্স গাঁজা খেতে গেল, আমি শ্যামলের সঙ্গে এধার-ওধার ঘুরে দেখছিলাম। ম্যাক্স ঘণ্টাখানেক গাঁজা-টাঁজা টেনে এসে সোজা আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল—

কথাটা শেষ না-করে ট্যাক্সির ভিতরকার অন্ধকারে অণিমা ভারী রহস্যময়ী হয়ে বসে থাকে।

সোমেন বিরসমুখে বলে, তারাপীঠ জায়গাটাই খারাপ। আর কখনও যেয়ো না—

অণিমা রেগে বলে, কী কথার কী উত্তর! তুমি না, একটা—

সোমেন মুখ ফিরিয়ে নিবিষ্টমনে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। স্তিমিত গলায় বলল, কলকাতায় কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি অণিমা। আমাদের যদি একটা বাড়ি হয়, আর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার চাকরিটা, তা হলে একদিন চলো তোমার সঙ্গে তারাপীঠে যাই।

ওমা! কেন?

তারাপীঠে না-গেলে তো তুমি শুনবে না কথাটা!

কোন কথা?

সেই যে। ধরো, যদি বলি—

বোলো না, বোলো না—

বলতে বলতে অণিমা হাসতে থাকে। সোমেন তেমনি স্তিমিত গলায় বলে, কত দিন ধরে বলতে চেষ্টা করছি। এক বার তারাপীঠে না গেলে—

চিনে রেস্টুরেন্টটার দিনকাল শেষ হয়ে গেছে। তবু বহুকালের পুরনো নিয়মমাফিক আজও একজন আধবুড়ো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাঞ্জো বা ওই জাতীয় কোনও একটা তারের যন্ত্র বাজায় মিনমিন করে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দ্রুতগামী অটোমোবিলের শব্দে কিছু শোনা যায় না। লোকটা তবু প্রাণপণে বাজায়।

বাঁ ধারে শেষ কেবিনটায় ঢুকে সোমেন অবাক হয়। ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর যাদের কোনও দিনই আর দেখবে না বলে ভেবেছিল তাদের কয়েকজন বসে আছে। একধারে অপালা আর পূর্বা। অন্যধারে অধ্যাপক অনিল রায়, শ্যামল আর একজন নীলচোখো, সোনালি চুলো, গোঁফদাড়িওলা অল্পবয়সি সাহেব। তার পরনে খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবি, তার ওপর কালো জহর কোট। সাহেব কী বলছিল, অপালা আর পূর্বা তার ইংরিজি কিছুমাত্র না বুঝে হেসে কুটিপাটি।

মুখ তুলেই পূর্বা লাফিয়ে ওঠে, সোমেন! কী রোগা হয়ে গেছিস! রোজ তোর কথা ভাবি। মাইরি!

আমিও। সোমেন নিরুত্তাপ গলায় বলে।

অপালা বড় বড় চোখ করে চেয়েই হেসে ফেলে, সোমেন, তুই বেশ মোটাসোটা হয়েছিস তো!

তুইও।

ওরা সরে বসে জায়গা করে দেয়। অণিমা আর সোমেন বসে। বসেই টের পায়, উলটো দিকে তিন-তিনটে আধো মাতাল চেয়ে আছে।

অধ্যাপক অনিল রায় বলেন, আগন্তুকটি কে অণিমা?

সোমেন স্যার।

আমারও তাই মনে হচ্ছিল। মুখটা চেনা-চেনা।

শ্যামল সাহেবের কাঁধের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে সোজা হয়ে বলে, সোমেন, তোর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। রিগার্ডিং—

বলে ভুলে যায়। হাতটা অসহায়ের মতো উলটে দিয়ে বলে, যাকগে।

সাহেব প্রোটোকলের তোয়াক্কা না করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ম্যাক্স।

সোমেন হাতখানা ধরে নিয়ে বলে, সোমেন।

হাতটা নরম, একটু ঘেমো। আটলান্টিক নীল চোখ দুটোয় কিছু ভিতু ভাব, খরগোশের মতো, হাসিটি লাজুক। পেটরোগা বাঙালির মতোই চেহারা, কেবল রংটা ফরসা। সোমেন হাতটা ছেড়ে দিল এবং সাবধানে নিজের হাতের চেটো প্যান্টে মুছে ফেলল।

পূর্বা ফিসফিস করে বলে, যা ভয় করছিল, তখন থেকে তিনটে মাতাল নিয়ে বসে আছি। তোরা কেন দেরি করলি?

সোমেন টের পায় তার পাঁজরে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে অণিমা কী একটা ইঙ্গিত করল। পরমুহূর্তেই অণিমা গলা নামিয়ে পূর্বাকে বলে, দেরি হবে না। বিকেলের মধ্যেই সাক্ষী সাবুদ জোগাড় করে রেজিস্ট্রারের কাছে যেতেই তো বেলা হয়ে গেল। সইটই করে এই দু'জনে আসছি।

পূর্বা ভীষণ অবাক হয়ে বলে, কী বলছিস যা তা!

মাইরি।

সোমেনকে?

আর কাকে?

কী বলছে রে? বলে অপালা তার লাইমজুসের গেলাস সরিয়ে রেখে মুখ এগিয়ে আনে।

পূর্বা অসহায়ের মতো বলে, ওরা রেজিস্ট্রি করে এল, জানিস! কী বদমাশ বল তো?

কে? কারা? ভারী অবাক হয় অপালা।

অণিমা আর সোমেন।

মাইরি? অপালার বড় চোখ বিশালতর হয়।

পূর্বা কাঁদোকাঁদো মুখে বলে, এ মা! শেষ পর্যন্ত সোমেনকে?

অণিমা ভারী চশমায় বেশ গম্ভীর মন-খারাপ গলায় বলে, সেই কবে থেকে জ্বালাচ্ছে। বিয়ে করো, বিয়ে করো, ধৈর্য থাকে? আজ তাই ঝামেলা মিটিয়ে দিলাম।

অপালা বড় বড় চোখ করে, নিশ্বাস চেপে শুনেটুনে হঠাৎ বলে, গুল!! ওদের দেখে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না যে বিয়ে করেছে।

এই নাটকটায় নিজের ভূমিকা বুঝতে একটু সময় নিয়েছিল সোমেন। এবার হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে মুখ নিচু করে অপালার দিকে চেয়ে বলে, তোমার বুঝে কাজ নেই সোনা। তুমি তো পুতুল! পুতুলের সব বুঝতে নেই।

মারব এক থাপ্পড়।

অনিল রায় হঠাৎ ও-পাশ থেকে বললেন, কী হয়েছে মেয়েরা? রাগারাগি কীসের?

পূর্বা তেমনি কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, দেখুন স্যার, ওরা দু'জন বিয়ে করে এল।

কারা?

সোমেন আর অণিমা।

. অ্যাঁ! আমি যেন অন্য রকম শুনেছিলাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও, খুব মাতাল হয়ে গেলাম নাকি!

অপালা গলা তুলে বলে. মোটেই বিয়ে করেনি স্যার। সোমেনকে দেখুন, তিন দিন দাড়ি কামায়নি, চোর-চোর চেহারা, ময়লা জামা-কাপড়, ও মোটেই বিয়ে করেনি অণিমাকে।

অনিল রায় হাত তুলে অপালাকে থামান, গম্ভীর গলায় বলেন, ইজ ইট ফ্যাক্ট অণিমা? তোমার মুখ থেকে শুনি।

অণিমা ভীষণ লাজুক মুখভাব করে সোমেনের দিকে তাকায়, লক্ষ্মীটি, স্যারকে বলে দাও না।

সোমেন তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে মাথাটাথা নিচু করে বলে, তুমিই বলো।

একদিন পূর্বার সঙ্গে উজ্জ্বলায় ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখে ফিরছিল সোমেন। কালীঘাট স্টপে ভিড়ের পাঁচ নম্বরে উঠতে গিয়ে সোমেন উঠল, পূর্বা উঠতে পারেনি। পূর্বার হাতব্যাগের ভিতরে ছোট্ট পয়সা রাখার ব্যাগে পাঁচটা টাকা ছিল, বাসের পাদানিতে সাফ হাতের কেউ সেটা তুলে নিয়েছিল। বাস ছেড়ে দিলে ভিতর থেকে সোমেন শুনেছিল, পূর্বা সর্বনাশের গলায় চেঁচাচ্ছে— সোমেন! সোমেন! ব্যাপারটা কিছুই না, পরের বাসে পূর্বা আসতে পারত, পয়সা না-থাকলেও অসুবিধে ছিল না, কন্ডাকটরকে বললেই হত। কিন্তু পূর্বা ঘাবড়ে-টাবড়ে, দুঃখে কান্নাকাটি শুরু করে, বাস স্টপে কয়েকজন লোকও জুটে গিয়েছিল ওর চারপাশে। সোমেন রাসবিহারী স্টপে নেমে ফিরে এসে দেখে পূর্বাকে ঘিরে ভিড়, ঘুনঘুন করে কাঁদছে পূর্বা, বলছে— আমার বন্ধু চলে গেছে, কী যে হবে! এমা! আমার টাকাও নেই, তুলে নিয়েছে। কী বিচ্ছিরি। বুড়ো একটা লোক ওকে একটা টাকা অফার করতেই পূর্বা ঝেঁঝে ওঠে, আমি কারও কাছে টাকা নেব না। তারপরেই আবার ঠোঁট কাঁপিয়ে চোখভরা জল রুমালে মুছে দিশাহারাভাবে বলতে থাকে, কী যে সব বিচ্ছিরি কাণ্ড না! যা তা! সোমেন যখন ভিড় ঠেলে গিয়ে ওর হাতটা ধরল তখন পূর্বার মুখে-চোখে সে কী আনন্দের রক্তিমাভা, যেন বাচ্চা মেয়ে মেলার ভিড়ে বাবাকে হারিয়ে ফেলেছিল, এইমাত্র ফিরে পেল।

এই হচ্ছে পূর্বা। যেখানে দুশ্চিন্তার কিছু নেই, সেখানেও ওর দুশ্চিন্তা। যেখানে কাঁদবার মতো কিছু ঘটেনি সেখানেও ও কেঁদে ফেলে। আড়চোখে সোমেন দেখে পূর্বার মুখ লাল, ঠোঁট কাঁপছে, চোখের পাতা ফেলছে ঘনঘন, এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। সোমেন ভারী ভয় পেয়ে যায়। পূর্বা ঘনঘন শ্বাস ফেলে বলে, স্যার, বন্ধুকে কেউ বিয়ে করে? সেটা ট্রেচারি নয়? বলেই সোমেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, লজ্জা করে না। কী বিচ্ছিরি সব কাণ্ড করিস না!

সোমেন অবাক হয়ে বলে, কেন, আমি পাত্র খারাপ?

পূর্বা তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে, সে-কথা বলছি নাকি! কিন্তু অণিমা তোকে বর বলে ভাববে কী করে! তুই-ই বা কী করে ভাববি যে—ইস ভাবতেই গা কেমন করে!

অনিল রায় ভারী অবাক হয়ে পূর্বার কাণ্ডকারখানা দেখে বলেন, বন্ধুকে বিয়ে করতে নেই? কেন বলো তো!

সোমেনকে কখনও স্বামী বলে ভাবতে পারবে অণিমা?

কেন পারবে না?

আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার। স্বামী মানে তো বড় বড় মানুষ, যাকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে হয়। সোমেনটা তো সমবয়সি, কেবল ইয়ারকি করে বেড়ায়, ও স্বামী হবে কী করে?

অনিল রায় তাঁর ছাত্রজীবনে মস্ত আধুনিক মানুষ ছিলেন। শোনা যায় প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময়ে রংদার চক্করাবকরা জামা, ষাঁড় খ্যাপানো উৎকট রঙের প্যান্ট পরতেন, হিপ পকেটে থাকত মাউথ-অর্গান, করিডোরে মাউথ-অর্গান বাজিয়ে বিলেতি নাচ নাচতেন। অধ্যাপকরা চটে গিয়েছিলেন। তবু বি-এ আর এম-এ-তে ফার্স্ট হতে আটকায়নি। আমেরিকায় ডক্টরেট করেন। এখনও এই উত্তর-চল্লিশে প্রায় একই রকম আছেন অনিল রায়। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এখনও লনে বসে আড্ডা দেন। সিগারেট বিলোন। গায়ে কাউবয় রঙিন শার্ট, বড় জুলপি, ফাঁপানো চুল, নিম্নাঙ্গে নিশ্চিত বেলবটমও আছে, টেবিলে পা ঢাকা রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। একটা শ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের আমলে ক্লাসমেটকে বিয়ে করাটাই ফ্যাশন ছিল। ইন ফ্যাক্ট আমিও ইনভলভড ছিলাম। তোমাদের আমলটা কি খুব বেশি পালটে গেছে?

না স্যার, মোটেই পালটায়নি। সোমেন হেসে ওঠে, পালটালে আমি আর অণিমা কেমন করে করলাম?

করেছিস? অপালা হাত বাড়িয়ে বলে, দেখি সার্টিফিকেট।

ওর হাতব্যাগে আছে। উদাস গলায় বলে সোমেন। তারপর সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে আত্মগোপন করার চেষ্টা করে। আর তক্ষুনি দেখতে পায়, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে উলটো দিকে একজোড়া নীল ফসফরাস জ্বলছে। ম্যাক্স। এতক্ষণ ম্যাক্সকে হিসেবের মধ্যেই ধরেনি সোমেন। ও কি সত্যিই প্রোপোজ করেছিল অণিমাকে। করে থাকলে অণিমার এ কী রকম ব্যবহার। লাজুক, ভিতু, পেটরোগা চেহারার কোনও সাহেব এর আগে দেখেনি সোমেন। ম্যাক্সকে দেখে তাই কষ্ট হয়। ওর মুখে, কপালে রগ দেখা যাচ্ছে! শুষ্ক নেশার চিহ্ন। গাল বসা, চুল রুখু। শুধু চোখ দু'খানার নীল আগুন জ্বলছে। কিছু বুঝতে পারছে না কিন্তু আন্দাজ করছে। কেবিন ঘরটা হালকা কথায় খিলখিল করছে, বাতাসে ইয়ারকি, তবু সে-সব ছাপিয়ে একটা টানাপোড়েনও কি নেই!

অপালা অণিমার হাতব্যাগ কেড়ে নিয়ে হাঁটকে দেখে বলে, না স্যার, নেই।

অনিল রায় লম্বা চুলে আঙুল চালিয়ে উত্তেজিতভাবে বলেন, ইয়ারকি! ইয়ারকি! মাই গড, তোমরা মোটেই বিয়ে করোনি! এমন ইয়ারকি তোমরা কোথা থেকে শিখলে?

পূর্বা হঠাৎ ভীষণ হাসতে থাকে। সোমেনের দিকে চায়। ভারী আদুরে স্বরে বলে, তুই যা পাজি না সোমেন! এমন চমকে দিয়েছিলি!

অণিমা অসহায় মুখ করে বলে, ছিল স্যার, বোধহয় ট্যাক্সিতে পড়ে-ফড়ে গেছে, ভাড়া দেওয়ার সময়—

ফের? অপালা ধমক দেয়।

অণিমা, তুই আমার জায়গায় বোস, সোমেনের সঙ্গে আমার কথা আছে। এই বলে পূর্বা জায়গা বদল করে নেয়।

বেয়ারা বিয়ারের জগ রেখে গিয়েছিল। সোমেন ফেনাটা ফুঁ দিয়ে চুমুক দিতে যাচ্ছে, পূর্বা কানের কাছে মুখ এনে বলল, বেশি খাস না সোমেন, পায়ে পড়ি।

কেন?

আমি তোর সঙ্গে ফিরব যে। গড়িয়ার দিকে যাওয়ার আর কেউ নেই। মাতালের সঙ্গে ফেরার চেয়ে একা ফেরা ভাল। খাস না।

আচ্ছা। তোর কাছে টাকা আছে?

গোটা চারেক। কেন?

ট্যাক্সি নিস। চটিটা ছিঁড়ে গেছে, হাঁটতে পারছি না।

গড়িয়া পর্যন্ত ট্যাক্সি! কত উঠবে জানিস? তা দিয়ে একজোড়া নতুন চটি হয়।

অপালা চাপা ধমক দিয়ে বলে, তোর সঙ্গে ফিরবে কেন? আজ বিয়ের দিন, সোমেন ওর বউয়ের সঙ্গে ফিরবে।

চিলি-চিকেন আর এক চামচ ফ্রায়েড রাইস মুখে তুলেছিল সোমেন। একটু বিষম খেল। বউ কথাটা তার ভিতরে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো খেলে যায়। অলক্ষ্যে ঝিকিয়ে ওঠে একটা আসাহী পেনট্যাক্স ক্যামেরার নিষ্প্রাণ চোখ। গরর শব্দ করে জেগে ওঠে একটা অন্ধ কুকুর। হঠাৎ এতক্ষণ বাদে একটা নিরুদ্ধ লজ্জায় সোমেনের মুখ লাল হয়ে যায়।

॥ সাত ॥

বিকেলের দিকে হাওড়ায় এসে নামলেন ব্রজগোপাল। ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু তরিতরকারি, একটু খেজুর গুড়, আমসত্ত্ব, কিছু গাছ-গাছড়া, ফকির সাহেবের দেওয়া বাতের ওষুধ। স্টেশনের চত্বরে নেমে ভারী বিশ্রী লাগছে তাঁর। কলকাতার বুকচাপা ভিড়, গরমি ভাব, গাড়িঘোড়া, যত বার আসেন তত বারই আরও বেশি খারাপ লাগে। খেই পান না, দিশাহারা লাগে। এই বিপজ্জনক শহরে এখনও কিছু নির্বোধ বাস করছে, প্রতিদিন কিছু নির্বোধ আসছে বাস করতে। মানুষের নিয়তিই টেনে আনছে তাদের। তাঁর ছেলেরা এই শহরে বাড়ি করবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন ব্রজগোপাল। সংসারে অনেকদিন হয় তিনি বাতিল মানুষ। তাঁর কথা বা মতামতের কোনও মূল্য আর ওদের কাছে পাওয়া যাবে না। তবু ছেলেদের মুখের কাছে বিষের বাটি ধরতেই তিনি এসেছেন। বাড়ির জন্য দশ হাজার টাকা দিয়ে দেবেন। একেবারে পর হয়ে যাওয়ার ক্ষণকাল আগে, মৃত্যুর আগমুহূর্তেও যেন ওরা অন্তত এক বার তাঁর দিকে আকর্ষণ বোধ করে। পুত্র-ক্ষুধা বড় মারাত্মক। সন্তানের বড় মায়া।

বাসে একটা জানালার ধারের সিট পেয়েছিলেন ব্রজগোপাল। খর চোখে চেয়ে কলকাতার দৃশ্যাবলি দেখতে থাকেন। বড়বাজার, ব্রাবোর্ন রোড, ডালহাউসি হয়ে ময়দান। এইটুকু রাস্তা জুড়ে বাণিজ্য আর বাণিজ্য। মানুষের লোভ-লালসার শেষ নেই। ময়দান থেকে বাকি রাস্তাটা চোখ বুজে কেবল ভাবেন আর ভাবেন। স্ত্রী আজ কেমন ব্যবহার করবে কে জানে? বোধহয় ভাল ব্যবহার কিছু আশা করা যায় না। তবে টাকার খাতির সর্বত্র। হয়তো বসিয়ে চা-জলখাবার খাওয়াতেও পারে। ভেবে একটু হাসেন ব্রজগোপাল। কিশোর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁদের। নৌকোয় সে বহু দূরের রাস্তা। কত রোমাঞ্চ কত কল্পনা। আজও ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। সেই কিশোর বয়স ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। যদি পান ব্রজগোপাল, যদি এখনও কিশোর ব্রজগোপালকে কেউ জিজ্ঞেস করে, পৃথিবীর এত মেয়ের মধ্যে কাকে বউ করতে চাও, তবে ব্রজগোপাল এখনও অম্লানবদনে বলবেন, ননীবালা। ননীবালার প্রতি তাঁর ভালবাসার এখনও যেন শেষ নেই। মুখখানার দিকে এখন আর ভাল করে তাকানো হয় না বটে, কিন্তু তাকালে এখনও সেই কিশোরকালের প্রণয়ের চিহ্নগুলি দেখতে পান যেন। আধো-ঢাকা কপাল, পিছনে অন্ধকারের মতো চুলের রাশি, থুতনির খাঁজে ঘামের মুক্তাবিন্দু। স্ত্রী শব্দটাই কী মারাত্মক! এই শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভ্যাস, আশ্রয়, বিশ্রাম, শান্তি। ব্রজগোপাল তা পাননি। তবু এখনও যদি তাঁকে কেউ প্রেমভিক্ষা করতে পাঠায়, তিনি এসে দাঁড়াবেন ননীবালার দরজায়। কেন দাঁড়াবেন তা কেউ জানে না। সংস্কার।

রাস্তা ফুরিয়ে যায়। শীতের বেলাশেষে যোধপুর পার্কের পিছনে সূর্যাস্ত ঘটছে। ঢাকুরিয়ার প্রকাণ্ড জলাভূমিটায় কত কচুরিপানা, ঠিক মাঠের মতো দেখাচ্ছে। যোধপুরের ফাঁকা জমিগুলো ভরতি হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। বাড়ি আর বাড়ি। পায়ের নীচে ভারবাহী কলকাতার নিঃশব্দ আর্তনাদ শোনেন ব্রজগোপাল। ওই জলাভূমিটাও ক্রমে গ্রাস করে নেবে মানুষের সর্বগ্রাসী বসত।

ঢাকুরিয়ার বাড়ির দোতলায় কুণ্ঠিত পায়ে উঠে এসে কড়া নাড়েন তিনি। খুবই সংকোচের সঙ্গে। যেন-বা বেড়াতে এসেছেন, কর্তা বাড়ি নেই শুনলে ফিরে যাবেন। এ বাসার তিনি আর কেউ নন। যত রাতই হোক আজই তাঁকে ফিরে যেতে হবে।

রণেনের বউ দরজা খোলে। ভারী খর ঝগড়াটে চেহারা, তবু সুন্দরী। হাঁটু ধরে একটা ছেলে বায়না করছে। নাতি। সন্ধ্যা হয়েছে, তবু এখনও আলো জ্বালানো হয়নি বলে জায়গাটা অন্ধকার। রণেনের বউ দরজা খুলে বলে, কে?

ব্রজগোপাল গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, আমি ব্রজগোপাল।

বউটি ঘোমটা টানার প্রয়োজন বোধ করে না। বলে, ও।

সুইচ টিপে আলো জ্বালে।

ব্রজগোপাল ঘরে যাবেন কি না স্থির করতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলেন, রণেন বাড়ি নেই?

না, এখনও ফেরেননি।

আর কে আছে?

মা আছেন। আপনি ঘরে আসুন।

থাক, এইখান থেকেই বরং কথা বলে চলে যাই।

বউটি গলায় যথেষ্ট ধার তুলে বলে, আপনি রোজ রোজ দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলে যান, পাঁচজন তাতে কী ভাবে! ঘরে আসুন।

ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ভিতরে সরে যায় বীণা। ব্রজগোপাল নিজের হৃৎস্পন্দন অকস্মাৎ টের পেতে থাকেন। বহুকাল বাদে ওদের ঘরদোরে ঢুকতে ইচ্ছে করে। ওরা কেমন যে আছে!

সামনের ঘরটা ঠিক ঘর নয়। একটুখানি প্যাসেজ। কলঘর রান্নাঘর আর শোওয়ার ঘরের দরজা চারদিকে। মাঝখানে বেতের চেয়ার আর টেবিল পেতে বসার ব্যবস্থা। তারই একধারে খাওয়া-দাওয়া হয়। বউটি ঘরের বাতি জ্বালল। আগে ষাট পাওয়ারের বালব জ্বলত, এখন ফ্লুরেসেন্ট বাতি। ঘরদোরের চেহারাও আগের মতো নেই। বেতের চেয়ারগুলো রং করা হয়েছে, তাতে ডানলোপিলোর কুশন পাতা। একটা ঝকঝকে নতুন সোফা-কাম-বেড। একধারে একটা মস্ত বড় রেডিয়োগ্রাম, তার ওপর ফুলদানি। দেয়ালে কাঠের চৌখুপিতে কেষ্টনগরের পুতুল, বাঁকুড়ার ঘোড়া, রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়ে একটা গ্যাস সিলিন্ডার দেখা যাচ্ছে। নিজের অবস্থাকে প্রাণপণে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে এরা।

রণেন ঘুষটুষ খায় না তো এখন! ফুড ইনস্পেকটরের ঘুষের ক্ষেত্র অঢেল। ইচ্ছে করলেই রণেন অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আকণ্ঠ সৎ মানুষ ব্রজগোপালের রক্তের ধাত খানিকটা আছে বলে রণেন এই সেদিনও ঘুষটুষ খেত না। এখন কি খায়? অবস্থার ফেরে পড়ে, বউ আর মায়ের গঞ্জনায়? বড় অস্বস্তি বোধ করেন ব্রজগোপাল। যদি ঘুষ না খাস তবে কেন নিজের অবস্থার চেয়ে ভাল থাকার চেষ্টা করিস? না কি পাঁচজনকে দেখাতে চাস যে তোরা ঠিক মধ্যবিত্ত নোস।

বীণা ভিতরের ঘর থেকে ঘুরে এসে বলল, বসুন, মা আসছেন।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বীণার কোলের ছেলেটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, কী নাম রেখেছ ওর?

কৌশিক। ডাকনাম টুবাই।

দু' বছর বয়স হল, না?

দু' বছর তিন মাস।

মুখখানা রণোর মতোই।

বউটি ছেলেকে আদর করে ঘাড়ে মুখ ডুবিয়ে বলে, ছোনা একটা।

লজ্জায় ব্রজগোপাল মুখ ফিরিয়ে নেন। মা বাবা শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে নিজের ছেলেকে আদর করা বড় লজ্জার ব্যাপার ছিল একসময়ে। এরা কিছু জানে না, মানেও না।

ব্রজগোপাল হঠাৎ প্রশ্ন করেন. রণেনের কি প্রোমোশন হয়েছে?

না। হওয়ার কথা চলছে, কিন্তু কীসব যেন গণ্ডগোল।

এ-সব কবে হল?

কীসের কথা বলছেন?

এই যে সব জিনিসপত্র?

ও। কিনেছে সব আস্তে আস্তে।

কিস্তিবন্দিতে?

বোধহয়। আমি ঠিক জানি না।

ব্রজগোপাল হাসলেন। জানো না, তা কি হয়? সোফা-কাম-বেড, রেডিয়োগ্রাম কিংবা গ্যাসের উনুন কেনার মানুষ রণেন তো নয়। সে ঢিলাঢালা মানুষ, শখ-শৌখিনতার ধার ধারে না। এ-সব মানুষ কেনে স্ত্রীবুদ্ধিতে, স্ত্রীরই তাগিদে। মেয়েছেলের মতো এমন বিপজ্জনক প্রাণী আর নেই। সাধুকে চোর, সরলকে কুটিল বানানোর হাত তাদের খুব সাফ। সম্ভবত, রণো এখন ঘুষ খাচ্ছে। সংসারটাও বড়, হয়তো সামলাতে পারে না।

বসুন, চা করে আনি। বীণা বলে।

ব্রজগোপাল হাত তুলে বলেন, না, চা আমি খাই না।

ওমা! আগে তো খুব খেতেন।

ছেড়ে দিয়েছি।

খাবারটাবার কিছু দিই?

অভিমান, পুরনো অভিমানটাই বুকে ফেনিয়ে ওঠে আবার। ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বললেন, না। মনে ভাবলেন, এরা জিজ্ঞেস করে কেন? জিজ্ঞেস করলে কেউ কি বলে, খাব?

ব্রজগোপাল বললেন, বরং তোমার শাশুড়িকে ডেকে দাও। ফিরে যাওয়ার গাড়ি আটটায়। দেরি হলে ওরা ভাববে।

বীণা অবাক হয়ে বলে, কারা?

যাদের আশ্রয়ে আছি। আত্মীয়ের অধিক।

কথাটা বলার দরকার ছিল না। তবু বললেন ব্রজগোপাল। বীণা খারাপ ব্যবহার কিছু করছে না, কিন্তু একধরনের ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রাখছে যা তিনি ঠিক সহ্য করতে পারেন না। বোঝাই যাচ্ছে, ননীবালারও এখানে সুখে থাকার কথা নয়।

বীণা মুখটা গম্ভীর করে থাকল।

ব্রজগোপাল সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা ধরতে পারেন। কিন্তু কথাটা ফেরাবেন কী করে! তাই তাড়াতাড়ি নাতির দিকে হাত বাড়িয়ে বলেন, এসো দাদা।

বীণা ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে বলে, দাদুর কাছে যাও।

ছেলেটি দু'পা এগিয়েও আসে। একদম কাছে আসে না। ব্রজগোপাল তবু হাত দুটো বাড়িয়েই থাকেন। বলেন, খুব দুষ্টু হয়েছে?

খুব। সেইজন্যই তো স্কুলে দিয়ে দিলাম।

খুব অবাক হয়ে ব্রজগোপাল বলেন, স্কুলে দিলে! দু' বছর মাত্র বয়স বললে না?

বীণা হেসে বলে, দু' বছর তিন মাস। আজকাল ওর বয়সে সবাই স্কুলে যায়।

বলো কী! আমরা প্রথম স্কুলে যাই সাত-আট বছর বয়সে, তাও খুব কান্নাকাটি করতাম।

এখনকার ছেলেরা তো স্কুলে যাওয়ার জন্য অস্থির।

কীরকম ইস্কুল?

নার্সারি। ইংলিশ মিডিয়াম।

ও। সে তো অনেক পয়সা লাগে।

কুড়ি টাকা মাইনে, বাস পঁচিশ, তার ওপর আজ এটা কাল সেটা লেগেই আছে। মাসে পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা।

ব্রজগোপাল মনে মনে ভারী বিরক্ত হন। কিন্তু মুখে নির্বিকার ভাবটা বজায় রেখে বলেন, বড়জনকেও কি ইংলিশ মিডিয়ামে দিয়েছ? মেয়েটাকেও?

হাঁ একই স্কুলে।

তা হলে সংসারের দেড়শো টাকা মাসে বেরিয়ে যাচ্ছে!

হ্যাঁ। একটু কষ্ট করছি, ছেলেমেয়েগুলো যদি মানুষ হয়।

ব্রজগোপাল দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। রণোর যা বেতন তাতে এত বড় সংসার চালিয়ে কষ্ট করেও বাড়তি দেড়শো টাকা বাচ্চাদের জন্য খরচ করা সম্ভব নয়। তবে কি রণো উপরি নিচ্ছে আজকাল? বুকের মধ্যে ভারী একটা কষ্ট হতে থাকে তাঁর। এ-সংসারে কেউই ব্রজগোপালকে অনুসরণ করল না। তিনি সৎ ছিলেন, এবং সৎ-অসতের ব্যাপারে তাঁর কোনও দ্বন্দ্ব ছিল না। ছেলের ভিতরে অন্তত সেইটুকু থাকলে তাঁর অহংকার থাকত।

তিনি প্রসঙ্গ পালটে বললেন, বড়জন কোথায়?

কে, বুবাই? সে খেলতে গেছে।

পড়াশুনোয় কেমন হয়েছে?

ভাল, ফার্স্ট হয়। মাস্টারমশাইরা আন্টিরা মনোজিৎ বলতে অস্থির।

মনোজিৎ? ভারী অবাক হলেন ব্রজগোপাল। বড় নাতির নাম তিনিই রেখেছিলেন সুপ্রসন্ন। তিনি যখন চলে যান তখনও এ-নামই বহাল ছিল। সদ্য লিখতে শিখেছিল নাতিটি, একসারসাইজ বুক আর বইয়ের ওপরে কাঁচা হাতে অতি কষ্টে লিখত সুপ্রসন্ন লাহিড়ী। ব্রজগোপাল নিস্তেজ গলায় বলেন, নামটা কি বদলানো হয়েছে?

বীণা একটু লজ্জা পায়, বলে, সেকেলে নাম বলে পালটে রাখা হয়েছে। ওর বন্ধুদের সব আধুনিক নাম, ও তাই ভাল নামের জন্য বায়না করত।

ও। একটু চুপ করে থেকে বলেন, মনোজিৎ বেশ নাম। ভাল। মেয়েটারও কি নতুন নাম রেখেছ?

না, ওর সেই পুরনো নামই আছে। তবে ডাকনাম অনেক। কেউ ডাকে শানু, কেউ বেলকুঁড়ি, কেউ বুড়ি।

ভিতরের ঘরে ননীবালা পরনের নোংরা শাড়িটা ছেড়ে ধীরে আস্তে একটা ভাল শাড়ি পরলেন। জরির ধাক্কা দেওয়া লাল পাড়। বেখেয়ালেই পরছিলেন। পরার পর মনে হল লাল পেড়ে শাড়ি বড় পছন্দ ছিল মানুষটার।

শাড়ি পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনিটা হাতে নিলেন। সিঁথিতে সিঁদুরের ঘা। আজকাল সব সিঁদুরেই ভেজাল। বাসি বিয়ের দিন সকালে বাসি বিছানায় ব্রজগোপাল যে সিঁদুরের স্তূপ ঢেলে দিয়েছিলেন সিঁথি ভরে, তার কিছু আজও অবশিষ্ট আছে, গোপন কৌটোয় যত্নে তুলে রেখেছেন ননীবালা। ওই সিঁদুর একটু একটু করে কৃপণের মতো অন্য সিঁদুরের সঙ্গে মিশিয়ে আজও পরেন তিনি। নিয়ম। এখনকার সিঁদুর সে-আমলের মতো নয়, সিঁথি চুলকে ঘা হয়ে যায়, তাই সচরাচর খুব সামান্য একটু সিঁদুর ছোঁয়ান আজকাল। কী ভেবে আজ ডগডগে করে সিঁদুর পরলেন। চুলের জট পছন্দ করতেন না ব্রজগোপাল। মাথার তেলের দাম বড্ড বেড়ে গেছে, ননীবালার একরাশি চুলে তেল দিতে সিকি শিশি তেল শেষ হয়ে যায়। রণেনের মুখ চেয়ে আজকাল তালুতে একটু তেল চেপে ননীবালা স্নান সারেন। তাই তেলহীন চুলে আঠা আর জট। চিরুনি চালাতে গিয়ে একটা শ্বাস ফেললেন। এই বিপুল চুলের রাশি তাঁর বোঝার মতো লাগে।

সাজগোজ কি একটু বেশি হয়ে গেল? বীণা বোধহয় শাশুড়ির এই প্রসাধন দেখে মুচকি হাসবে। মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু। সব লক্ষ করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শ্বশুরবাড়িতেই তিনি শিখেছিলেন যে স্বামী শ্বশুর ভাসুরের সামনে যেতে হলে পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতে হয়। অবশ্য ব্রজগোপালের ব্যবহারে সে-সব শিক্ষা তিনি ভুলেও গিয়েছিলেন। আজ সেই পুরনো নিয়মটা রক্ষা করার জন্য তাঁর আগ্রহ হয়। তিন-চার বছর তিনি স্বামীর মুখশ্রী দেখেননি, তার আগেও বছর দুই এক-আধপলক দেখেছেন। আজ তাঁকে ওই লোকটার সামনে যেতে হবে, মেজাজ ঠিক রাখতে হবে, মিষ্টি কথায় বোঝাতে হবে, টালিগঞ্জের জমিটা কেনা তাদের একান্ত দরকার। ছেলেদের ব্রজগোপাল তো কিছুই দিলেন না, এটুকু অন্তত ছেলেদের জন্য ভিক্ষা করে নিতেই হবে তাঁকে।

শরীর পরিচ্ছন্ন থাকলে মনটাও শান্ত রাখা যাবে। ব্রজগোপালেরও হয়তো তাঁকে দেখামাত্র খ্যাঁক করে উঠতে ইচ্ছে করবে না।

সাজগোজ করতে বেশ একটু বেশি সময় নিলেন ননীবালা। তাঁর হাত-পা যেন বশে নেই। প্রেশারটা বোধহয় ইদানীং বেড়েছে, বুকে ধপ ধপ হাতির পা পড়ছে। মাথায় ঘোমটা সযত্নে টেনে ননীবালা ধীরপায়ে বাইরের ঘরের পরদা সরিয়ে চৌকাঠে দাঁড়ালেন। বাইরের মানুষের মতোই বসে আছেন ব্রজগোপাল। খয়েরি চাদর গায়ে, আধময়লা ধুতি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, ধুলায় ধূসর চেহারা। ননীবালার দিকে চেয়েই মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

ননীবালা আজকাল বীণাকে কোনও কাজের কথা বলতে ভয় পান। সংসার খরচের টাকা আজকাল বীণার কাছেই থাকে। খরচ নিয়ে খিটিমিটি বাঁধত বলে ব্যবস্থাটা ননীবালাই করেছেন। সংসারের কর্তৃত্বও সেই সঙ্গেই চলে গেছে। বীণা এখন ওপরওয়ালা। সচরাচর ননীবালা তাকে কাজের কথা বলেন না। কিন্তু এখন অনুচ্চ কর্তৃত্বের সুরে বললেন, বউমা, চায়ের জল চাপাও। ও-বেলার রুটি করা আছে, একটু ঘিয়ে ভেজে দাও।

বীণা বাধ্য মেয়ের মতো ওঠে। দেখে ননীবালা খুশি হন। ব্রজগোপাল এদের সংসারে ননীবালার অবস্থাটা যেন টের না পান।

বীণা কাছে এসে বলে, উনি কিছু খাবেন না, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ননীবালা সুর নামিয়ে বলেন, ও-সব কি জিজ্ঞেস করতে হয়! সামনে ধরে দেবে। এসো-জন বোসো-জন তো নয়। যাও।

বীণা চলে গেলে নাতি কোলে ননীবালা সোফা-কাম-বেডের একধারটায় বসেন। বলেন, ওদিককার খবর-টবর সব ভাল?

ওই একরকম। ব্রজগোপাল অন্য দিকে চেয়ে বলেন।

ননীবালা বেশি কথাটথা জানেন না, দ্বিতীয় কথাতেই সরাসরি প্রশ্ন করলেন, কী ঠিক করলে?

জমিটা কিনবেই তুমি?

ননীবালা শ্বাস ফেলে বললেন, আমি জমি দিয়ে কী করব? জমি তো আমার জন্য চাইছি না। ওদের জন্য। আমি আর ক'দিন?

ওই হল।

খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। অজিতের বন্ধুর জমি, সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। তাকে ওকালতনামা দেওয়া আছে।

শুনেছি। কিন্তু কথা তো তা নয়। রণো ওরা সব এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেলে গোবিন্দপুরে থাকবে কে?

যেই থাকুক, ওরা থাকবে না। গ্রামে-গঞ্জে থাকার ধাত তো ওদের নয়।

ব্রজগোপাল উত্তর দেন না।

ননীবালা শান্ত গলায় বলেন, আমার ওপর রাগ আছে তো থাক। ছেলেরা তো কোনও দোষ করেনি বাপের কাছে! রণোর একার ওপর এত বড় সংসার, দশ-বিশ হাজার এক ডাকে বের করে দেবার ক্ষমতা নেই। তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো।

ব্রজগোপাল আস্তে করে বললেন, সচ্ছলতার মধ্যেই তোমরা আছ, দেখতে পাচ্ছি। নতুন নতুন সব জিনিসপত্র কেনা হচ্ছে, নিজের অবস্থাকে ডিঙিয়ে পাঁচজনের কাছে সচ্ছলতা দেখানো।

ওমা! গরিবের সংসারেও দিনে দিনে টুকটাক করে কত জিনিস জমে যায় দেখতে দেখতে। গত পাঁচ-সাত বছর ধরে কত কষ্টে এইসব করেছে একে একে। তাও তো তেমন শৌখিন জিনিস না, সংসারের যা লাগে তাই। ছেলেদের সংসারের শ্রী দেখতে ইচ্ছে করে না?

ব্রজগোপাল ভ্রূকুটি করে বললেন, কিন্তু এত টাকা আসছে কোত্থেকে! রণোর যা মাইনে তাতে

তো এ-সব হওয়ার কথা নয়। টাকার দাম কমছে বই বাড়ছে না। ঘুষটুষ খাচ্ছে নাকি!

সে-রকম ছেলে নয়। তবে কেউ হয়তো খাতির-টাতির করে সস্তায় কোনও জিনিস ধরে দেয়। সে তো আর দোষের নয়!

উদাস গলায় ব্রজগোপাল বলেন, তাই হবে। আমার সে-সব না জানলেও চলবে।

ননীবালা মাথা ঠান্ডা রেখে বলেন, একটা বয়সের পর ছেলেদের হাঁড়ির খবর নেওয়া ঠিক নয়। ওরা বড় হয়েছে, দায়িত্ব নিয়েছে, ওদের ভালমন্দ ওদের বুঝতে দাও।

আমি তো সব কিছু থেকেই দূরে আছি, তবে আর আমাকে সাবধান করা কেন! ঘুষটুষ যদি নেয় তো নিক, আমার কী! শুধু সমাজের একজন মানুষ হিসেবে অন্য এক মানুষকে বিচার করছি।

ননীবালা চঞ্চল হয়ে বলেন, রণো হয়তো এক্ষুনি চলে আসবে। এ-সব কথা তার কাছে তুলো না।

ব্রজগোপাল ভ্রূ কুঁচকে সরাসবি স্ত্রীর দিকে তাকান। অল্প কঠিন স্বরে বলেন, ছেলের প্রতি তোমার এত টান, তবু তাকে অত ভয় কেন? তাকে যদি শাসন করা দরকার হয় তবে তা করাই উচিত।

না না, তার দরকার নেই। রণো ও-সব কিছু করে না।

ভাল, জেনে গেলাম।

রণোকে কী বলব জমিটার কথা?

কিনুক।

কিনবে?

হ্যাঁ তো বলছি।

ভাল মনে বলছ, না মনে রাগ রেখে?

তাতে কী দরকার! টাকাটা আমি দেব। কর্তব্য হিসেবে।

রণো বড় অভিমানী ছেলে, এ-রকম কথা শুনলে টাকা নেবে না।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, তবে কীরকম কথাবার্তা বলতে হবে?

বিরক্ত হোয়ো না। ছেলের মুখ চেয়ে খুশি মনে দাও। অনাদর অশ্রদ্ধার দান যে নেয় সে খুশি হয়ে নেয় না।

ব্রজগোপাল চুপ করে থাকেন। চোখে একটু উদাস ভাব। হঠাৎ বলেন, রণো খুব সৎ ছিল। ফুড ইনস্পেকটরের চাকরিতে অনেক উপরি। সে-সব লোভে কখনও পা দেয়নি।

তোমার অত সন্দেহের কী? ঘরে দুটো বাড়তি জিনিস দেখেই কি লোকটাকে বিচার করা যায়?

যায়। আমার বড় দুশ্চিন্তা হয়।

দুশ্চিন্তা কীসের?

যারা ঘুষ নেয় তারা কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধা পায় না, কেবল খাতির পায়।

শ্রদ্ধা ধুয়ে জল খাবে! মা, ভাই, সংসার পালছে পুষছে, সে বড় কম কথা নাকি! আজকাল ক'টা ছেলে এই বয়সে এত দায়িত্ব ঘাড় পেতে নেয়? যার দায়িত্ব নেওয়ার কথা সেই নিল না কোনও দিন। রণোকে কেন অশ্রদ্ধা করবে লোকে?

ব্রজগোপাল ননীবালার দিকে তাকালেন। মধ্য যৌবনে স্ত্রীর প্রতি যে হিংস্র রাগ তাঁর দেখা যেত এখনও সেরকমই এক রাগে বুড়ো বয়সের দীপ্তিহীন চোখও একটু ঝলসে ওঠে। অথচ এ-কথাও ঠিক, স্ত্রী ছাড়া অন্য কারও প্রতি কখনও এমন তীব্র রাগ তিনি অনুভব করেননি। তার অর্থ কি এই যে, স্ত্রীর প্রতিই তিনি সবচেয়ে বেশি অধিকার সচেতন?

বীণা বুদ্ধিমতী। রান্নাঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু ও-পাশে কান পেতে আছে হয়তো। তাই ননীবালা ব্রজগোপালের চোখ দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। যদি লোকটা তেড়েফুঁড়ে কিছু

বলে তো বউমার কাছে অপমান। বললেন, ভয় পেয়ো না। রণো তেমন কিছু করেনি। শত হলেও তোমারই ছেলে তো!

আমার ছেলেই শুধু নয়। তোমার ধাতও তো কিছু তার মধ্যে আছে। তা ছাড়া আছে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, চার দিকের লোভ আর আকর্ষণ। মানুষ খুব মরিয়া না হলে এমন অবস্থায় সৎ থাকতে পারে না।

ননীবালা স্বামীকে চটাতে চাইলেন না। উত্তরে বলতে পারতেন—সৎ হয়ে কী ঘচু হবে। তা না বলে বললেন, তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও। খেয়ে বিশ্রাম করো।

ও-সব দরকার নেই। রণোকে বোলো টাকা আমি দেব। এল-আই-সিতে গিয়ে যেন ও একটু খোঁজখবর করে। দরকার মতো আমাকে খবর দিলেই আমি এসে সইটই করে টাকা তুলে দিয়ে যাব।

সব ব্যবস্থা অজিতই করছে। বসবে না?

না। আটটার কাছাকাছি সময়ে গাড়ি আছে। তাড়াতাড়ি না উঠলে গাড়িটা ধরতে পারব না।

একটু বোসো, জলখাবারটুকু খেয়ে যাও, তা করতে হয়তো রণো এসে পড়বে।

ব্রজগোপাল খাওয়ার জন্য ব্যস্ত নন। কিন্তু এই সংসারের মাঝখানে আর-একটু বসে বিশ্রাম নিতে তাঁর বড় সাধ হচ্ছিল। দূর এক একাকী নির্জন ঘরে ফিরে যেতেই তো হবে! বললেন, সোমেন বাড়িতে নেই?

না। এ-সময়ে কি ডাঁশা ছেলেরা ঘরে থাকে?

ব্রজগোপাল সেটা জানেন। ছোট ছেলেটি যখন বয়ঃসন্ধিতে পা দিয়েছে তখন তিনি বাড়ি ছেড়েছেন। চেহারায় ভাঙচুর হয়ে ছেলেটি এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিমান এবং সুশ্রী মুখখানা আর-এক বার দেখবার জন্য তাঁর বড় সাধ হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলেন, কখন ফেরে?

তার কিছু ঠিক নেই।

কী করেটরে আজকাল? স্বভাবটভাব কেমন?

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, কাজকর্ম না থাকলে কি আর ভাল থাকে। এম-এ পরীক্ষাটা দিল না, ব্যাঙ্কে একটা চাকরি পাওয়ার কথা হচ্ছিল তো তারও চিঠি এসেছে, চাকরি এখন হবে না।

জলখাবারের প্লেট আর চা নিয়ে বীণা আসে। ঘরে ঢোকার আগে গলাখাঁকারি দেয়। ব্রজগোপাল জলখাবারের প্লেটটা ছুঁলেন মাত্র, চায়ে গোটা দুই চুমুক দিলেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলি।

কিছু বলার নেই ননীবালার। কেবল বললেন, শরীরটরীর কেমন?

ভাল, বেশ ভাল।

আর-একটু বসলেই রণো এসে পড়ত।

দেখা করার জন্য তাড়া কী? হবে এখন।

দুর্গা দুর্গা। ননীবালা বলেন।

ব্রজগোপাল দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে প্রশ্ন করলেন বাড়িটা কার নামে হবে?

রণোর ইচ্ছে আমার নামে হোক। আমি বলি দুই ছেলের নামে হলেই ভাল। তুমি কী বলো?

আমি কী বলব? যেটা তোমাদের খুশি।

রাস্তায় এসে ব্রজগোপাল ইতস্তত তাকালেন। আরও শ্রীহীন, নোংরা ধুলোটে হয়ে গেছে কলকাতা। রাস্তায় জঞ্জালের স্তূপ জমে আছে। স্টেশন রোডে এই শীতেও কোথা থেকে জল জমে কাদা হয়ে আছে এখনও। ঘর-ছাড়া ছেলেরা জটলা করছে। যত দূর সতর্ক চোখে সম্ভব দেখলেন ব্রজগোপাল, সোমেনকে দেখা যায় কি না কোথাও। নেই, থাকার কথাও নয়।

কলকাতায় বেড়েছে কেবল দোকান। এত দোকান, কেনে কে, তা ব্রজগোপাল ভেবে পান না।

তবু ঠিকই সওদা বেচা-কেনা চলে। মানুষকে লোভী করে তুলবার কত আয়োজন চারদিকে।

একটা ট্যাক্সি উলটো দিক থেকে এসে তাঁকে পেরিয়ে গেল। থামল। ব্রজগোপাল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, বাসার সামনেই থেমেছে। একটু দাঁড়ালেন। রণো না? রণোই! ঘাড় নিচু করে নেমে এল, হাতে বোধহয় একটা দুধের কৌটো, দু'-একটা প্যাকেট গোছের, একটা ফোলিও ব্যাগ। চশমা নিয়েছে আজকাল। বেশ মোটা হয়ে গেছে। সোয়েটারের ওপর দিয়ে পেটটা বেশ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, গালটাল পুরন্ত। চিনতে তবু অসুবিধে হয় না, ছেলে তো। মোটা হয়ে যাওয়ায় এই বয়সেই বেশ বয়স্ক দেখায়।

কয়েকটা মুহূর্ত তিনি দাঁড়ালেন, ট্যাক্সিতে চড়ার অবস্থা রণোর নয়। তবু কী করে ট্যাক্সি চড়ে ও? দিব্যি নির্লিপ্ত মুখে ভাড়া গুনে দিয়ে খুচরো ফেরত নিচ্ছে। ট্যাক্সির মিটার টুংটাং করে ঘুরে গেল। বোঝা যায় হামেশা ট্যাক্সিতে চড়ার অভ্যাস আছে। নামা থেকে ভাড়া দেওয়া অবধি ঘটনাটুকুর মধ্যে একটা অভ্যস্ত অবহেলার ভাব।

রণো বাড়িতে ঢুকে গেলে ব্রজগোপালের খেয়াল হয়, ছেলে এক্ষুনি শুনবে যে বাবা এসেছিল, এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। ফলে হয়তো বাপের সঙ্গে দেখা করতে তড়িঘড়ি নেমে আসবে। ভেবে ব্রজগোপাল দ্রুত হাঁটতে থাকেন। তাঁর অভ্যাসের পক্ষে খুবই দ্রুত । জোরে হাঁটা তাঁর বারণ।

বড় রাস্তা পর্যন্ত এসেই ব্রজগোপাল বুঝতে পারেন, কাজটা ঠিক হয়নি। বুকে প্রাণপাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে। শ্বাসবায়ু উৎকট রকমের কমে আসছে। এ সময়টায় তাঁর আজকাল হাঁপির টান ওঠে। দু'-চার কদম হেঁটে ব্রজগোপাল ব্রিজের পিলারের কাছে উবু হয়ে বসে পড়েন। ভগবান! এ যাত্রা সামলাতে দাও। এক বিশাল সমুদ্র যেন ক্লান্ত সাঁতারুকে বড় নয়ছয় করে। ব্রজগোপাল বসে নিবিষ্টমনে শ্বাস টানতে চেষ্টা করেন। এক বার এ-সময়ে সোমেনটার মুখখানা যদি দেখে যেতে পারতেন। ওই ছেলেটির প্রতি বড় মায়া। লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে আছে ছেলেটা! এ বয়সে কবে কখন প্রাণপাখি ছেড়ে যায় দেহের খাঁচা। আয় সোমেন আয়।

॥ আট ॥

কলকাতার ময়দানে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছেন। রেডিয়োতে রিলে হচ্ছে।

সন্ধেবেলা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিকতার সুরে বার বার জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আরও ত্যাগ, আরও কষ্ট স্বীকার, আরও ধৈর্যের জন্য জনগণকে প্রস্তুত হতে হবে। ভারতের চতুর্দিকে কয়েকটি দেশ মিত্রভাবাপন্ন নয়। যে-কোনও সময়ে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। বন্ধুগণ, আমরা যুদ্ধ চাই না, কিন্তু যুদ্ধে যদি আমাদের নামানো হয় তবে আমরা আদর্শের জন্য, অস্তিত্বের জন্য, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে চূর্ণ করার জন্য...

অজিত রেডিয়োটা বন্ধ করে দেয়। রেডিয়োর পাশে পোষা বেড়ালের মতো বেতের গোল চেয়ারে পা-গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে শীলা। তার মুখশ্রী চমৎকার, রং একটু চাপা, ইদানীং সুখের কিছু মেদ জমছে গায়ে। তুঁতে রঙের উল দিয়ে একটা সোয়েটার বুনছিল, একটা ঘর গুনতে ভুল হয়েছে, মাথা নিচু করে দেখছিল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। রেডিয়োটা বন্ধ হয়ে যেতেই চমকে উঠে বলে, এই যাঃ, কী হল?

বন্ধ করে দিলাম। তুমি তো শুনছ না। অজিত শান্ত গলায় বলে।

শুনছি না কে বলল? তুমি বন্ধ করে দিলে তাই বলে! প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা! ভারী বিস্ময়ভরে বলে শীলা।

তোমার কি ধারণা, প্রধানমন্ত্রীর গলার স্বরে ঘরদোর পবিত্র হবে? কেউ যখন শুনছি না তখন

খামোখা ব্যাটারি নষ্ট করে লাভ কী। আজকাল ব্যাটারির লনজিভিটি অনেক কমে গেছে, যদি যুদ্ধফুদ্ধ হয় তো নেক্সট বাজেটে দামও বাড়বে।

ভারী বিশ্রী স্বভাব তোমার। ভাল কথা সহ্যই করতে পারো না। কত লোক আজকের মিটিং অ্যাটেন্ড করছে জানো?

খামোখা করছে। ফেরার সময়ে অধিকাংশ লোকই ট্রামে-বাসে উঠতে পারবে না। লম্বা রাস্তা হেঁটে মরবে সবাই, আর তা করতেই ভাল ভাল কথা যা শুনছে সব ভুলে যাবে।

ইউনিয়ন করতে করতে তোমার মনটাই হয়ে গেছে বাঁকা: যেহেতু পি-এম বলছে সেইজন্যই তার সব খারাপ। শুনছিলাম বেশ, দাও আবার রেডিয়োটা।

থাক। তার চেয়ে এসো একটু প্রেমট্রেম করা যাক। যুদ্ধফুদ্ধ লাগলে কবে যে কী হবে! মরেটরে যাওয়ার আগে—

আহা, সারাদিনে যেটুকু সময় দেখা হয় সেটুকু সময়ও তো আমার দিকে তাকাও না। এখন প্রধানমন্ত্রীর ইমপর্ট্যান্ট বক্তৃতার সময়ে প্রেম উথলে উঠল। দাও না রেডিয়োটা, একটা ঘর পড়ে গেছে, তুলতে পারছি না। দাও না গো—

অজিত রেডিয়োটা আস্তে করে ছেড়ে দেয়। রেডিয়োর টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর রনসন গ্যাস-লাইটারটা তুলে নিয়ে বারান্দায় আসে।

টালিগঞ্জের এ-পাড়াটাকে খাটালের পাড়াও বলা যায়। বারান্দায় দাঁড়ালেই গোচোনা, শুকনো গোবর আর গোরুর গায়ের গন্ধ এসে ধাক্কা দেয় নাকে। অভ্যাস হয়ে গেছে এখন। ঝিম এক সন্ধ্যা নেমে আসছে মাঠে ময়দানে। অল্প কুয়াশা, ভৌতিক আলো জ্বলছে অন্ধকারে। কুয়াশার ভিতরে পাখির ডিমের মতো। এখনও এ-দিকটায় ফাঁকা জমি দেখা যায়। অবশ্য ক্রমেই ফাঁকা জায়গা ভরে যাচ্ছে, নিত্য নতুন ভিত পত্তন হয়, বাঁশের ভারা ওঠে, তার সঙ্গে উঠতে থাকে ইটের গাঁথনি। লোহার গ্রিল শীতে চনচনে হয়ে আছে। গ্রিলের সঙ্গেই প্রায় গাল ঠেকিয়ে দাঁড়ায় অজিত। ঘরের ভিতর থেকে প্রধানমন্ত্রীর গলার স্বর আসছে, চারদিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর গলার স্বর আসছে। সব বাড়িতে রেডিয়ো খোলা। কর্তা-গিন্নি, চাকর-বাকর, খাটালওয়ালা সবাই শুনছে, নির্বাচকমণ্ডলী, জনগণ।

কাঁচা রাস্তাটা বাঁ ধারে কিছুদূরে গিয়ে বাঁক নিয়েছে। বাঁকের মুখেই একটা বাতিস্তম্ভ। হলুদ আলো নতমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে। ওই জমিটা লক্ষ্মণের। গতকালও একটা এয়ারোগ্রাম এসেছে লক্ষ্মণের। কানাডা থেকে ওরা স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে বেরিয়েছে স্টেটসে। বড় শীত, খুব ফুর্তি। লক্ষ্মণ আর ফিরবে না। ইমিগ্রান্ট ভিসা পেয়ে গেছে। ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার লক্ষ্মণ কোনও দিনই খাটাল-ভরা এই এলাকায় বাড়ি করতে আসবে না। তার জমিটা বায়না করেছে রণেন। দু'-এক বছরের মধ্যেই ওখানে এক কি দেড়তলা দীন একটি বাড়ি উঠবে। শীলার খুব আনন্দ, বাপের বাড়ি উঠে আসছে কাছে।

রনসন গ্যাস-লাইটারটার আগুন কেমন লেলিহান হয়ে লাফিয়ে ওঠে! চাকা ঘুরিয়ে দিলেই আবার কমে যায়। গ্যাসের সিলিন্ডার শেষ হয়ে এসেছে। লক্ষ্মণ আবার পাঠাবে, লিখেছে। কিন্তু লক্ষ্মণ আর ফিরবে না। বন্ধুর জন্য শখ করে কাছাকাছি জমি কিনেছিল। যখনই কিনেছিল তখনই বোধহয় লক্ষ্মণ জানত যে, সে সুখের পাখি হয়ে উড়ে গেছে। ফিরবে না। তবু অজিতকে খুশি করতেই কিনেছিল বোধহয়। মেরেকেটে পৌনে দু' কাঠা জমি হবে। বেশি দামও নয়। লক্ষ্মণের কিছু যায়-আসে না যদি অজিত খুব কম দামেও জমিটা ছেড়ে দেয়। লক্ষ্মণ বহু টাকা মাইনে পায়। কানাডায় বাড়িও করেছে। খাটালে ভরা, বন্ধুহীন এলাকায় অজিত পড়ে আছে একা। একাই। অজিত বড় একা।

ঘর থেকে প্রধানমন্ত্রীর গলার ওপরে গলা তুলে শীলা ডাকে, শুনছ, ঠান্ডা লাগিয়ো না। বারান্দায় এখন কী? ঘরে এসো।

অজিত উত্তর দিল না। কিং সাইজ ডানহিল সিগারেটের সুন্দর গন্ধটি ফুসফুস ভরে টেনে নিল। পাঁচ প্যাকেট পাঠিয়েছিল লক্ষ্মণ। আর মাত্র আড়াই প্যাকেট আছে। কৃপণের মতো খায় অজিত। একটুও ধোঁয়া নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। ফুরোলে আবার পাঠাবে। কত কী পাঠায় লক্ষ্মণ! কিন্তু সে নিজে ফিরবে না। দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলো কুয়াশায় একটা ধাঁধার মতো জ্বলছে। মাকড়সার জালের মতো সেই ভৌতিক আলোয় লক্ষ্মণের শূন্য জমিটা দেখা যায়। শীতে কিছু ছেলে কোর্ট কেটে ব্যাডমিন্টন খেলে, বর্ষায় আগাছা জন্মায়। কোনওদিন লক্ষ্মণ ফিরবে, বাড়ি-টাড়ি করবে, এই আশায় এতকাল জমিটা ধরে রেখেছিল অজিত। শীলার তাগাদায়, শাশুড়ি আর রণেনের আগ্রহে ছেড়ে দিতে হল। ধরে রেখেও লাভ ছিল না অবিশ্যি। পৃথিবী ঠিক এক পুকুরের মতো, মাছের মতো মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথায় কোথায়। বৃথা ছিপ ফেলে বসে থাকা, কোন দূরে হারিয়ে যাওয়া মাছটিকে ধরে আনবে কাছে, এমন সাধ্য কী!

লক্ষ্মণের পায়ে থাকত একটা বর্ণহীন ধুলোটে চপ্পল, একটু খাটো ধুতি, গায়ে একটা ফুলহাতা শার্ট—যার হাতে বোতাম খসে যাওয়ার পর হাতির কানের মতো লটপট করত। শীত-গ্রীষ্মে ওই ছিল তার মার্কামারা পোশাক। কখনও কারও সঙ্গে ঝগড়া করত না লক্ষ্মণ, তর্কাতর্কিতে যেত না, কাউকে কখনও অবহেলা করেনি। বিশাল এক যৌথ পরিবারে মানুষ, মা-বাবা বর্জিত কাকা-জ্যাঠার সংসারে তার অনাদর ছিল না হয়তো। কিন্তু সে পরিবারের আদর জানাবার সাধ্যই ছিল কম। কাকা পলিটিকস করত—তৎকালীন সি পি আইয়ের নিয়তকর্মী। জ্যাঠা দোকান দিয়েছিল। বাসায় পড়ার ঘর ছিল না। বইপত্র ছিল না, শোওয়ার জায়গারও কিছু ঠিক ছিল না। লক্ষ্মণের বাসায় গিয়ে দৃশ্যটা নিজের চোখে দেখেছে অজিত। লক্ষ্মণের তাই বেশি আপন ছিল ঘরের বাইরের জগৎ। সকলেই ভালবাসত লক্ষ্মণকে। সেবার প্রথম আই এসসি ক্লাসে বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে অজিত বস্তুবিশ্বের অণুময় অস্তিত্বের বিষয়ে জানতে গিয়ে ভারী অবাক হয়। বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি বা অঙ্কের বই খুলে বসে সে এক অবাক বিস্ময়ভরা তত্ত্বজ্ঞানের মুখোমুখি হত। বিশ্বের সব কিছুর অস্তিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ জানতে গিয়ে তার বহুকালের পুরনো সব ধারণা ভেঙে যাচ্ছিল। বহু ছেলেই আই এসসি পড়ে, তাদের কারও এ-সব মনেই হয় না। কিন্তু অজিতের ভিতরে চাপা বিষাদরোগ বীজাণুর মতো ওত পেতে ছিল। বিজ্ঞান পড়তে গিয়েই সেই বীজাণুর আক্রমণ টের পায়। সারাদিন বসে ভাবত, এই যে আমি, আমি কতগুলি অণুর সমষ্টি মাত্র? একদিন ঠাট্টা করে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ক্লাসে বললেন, মানুষকে পুড়িয়ে ফেললে খানিকটা কার্বন পড়ে থাকে, খানিকটা জল হয়ে উড়ে যায়। আমাদের এত আদরের শরীরের ওই হচ্ছে পরিণতি। জল আর কার্বন নিয়ে খুবই ভাবতে শুরু করেছিল অজিত। খেতে পারত না, রাতে ঘুমও কমে যেতে থাকে। মাথা-ভরা ওলট-পালট বিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞান। বস্তুবিশ্বের গঠন, অঙ্কের কাল্পনিক সংখ্যা এবং অসীম চিহ্নের ব্যবহার তাকে মনে মনে ভয়ংকর উত্তেজিত এবং বিষাদগ্রস্ত করে তুলত। ইনফিনিটি শব্দটা নিয়ে ভাবতে বসে সে কেবলই অসীমতার ধারণা করতে গিয়ে মাথা চেপে ধরত ভয়ে। পাগল হয়ে যাব না তো! অবস্থা কাউকে বলাও যায় না। একা সওয়াও যায় না। সব ছেলেরা যখন রসায়নের ক্লাসে বস্তুত মলিকিউলার ভ্যালেন্সি বুঝছে তখন অজিত নিউক্লিয়াস আর তার চারধারে ঘূর্ণমান পরমাণুকণার ধারণা করতে গিয়ে ভারী অন্যমনস্ক হয়ে যেত। বুঝতে পারত অন্যান্য ছেলেদের মতো সে স্বাভাবিক নয়। সে একা, সে আলাদা। তার মতো চিন্তা বা দুশ্চিন্তা অন্য কারও নেই। ঠিক সেই সময়ে একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে লক্ষ্মণকে সঙ্গী পায়। সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ থেকে ওয়েলেসলি হয়ে হেঁটে কালীঘাট ফিরবে লক্ষ্মণ। কারণ তার পয়সা নেই। অজিত বলল, চলো তোমার ট্রামভাড়া আমি দেব। লক্ষ্মণ রাজি হল, তবু বলল, পরে উঠব, ময়দান পর্যন্ত হাঁটি চলো। এ সময়ে ফাঁকা জায়গায় হাঁটতে বেশ লাগে। সেই থেকে বন্ধুত্ব। সারা রাস্তা কত কথা বলে গেল লক্ষ্মণ। অজিত ভাল শ্রোতা পেয়ে মনোহরদাস তড়াগের কাছে ঘাসে মুখোমুখি বসে তার

বিজ্ঞান-বিষয়ক বিপদের কথা ব্যক্ত করলে লক্ষ্মণ তার হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, মাইরি, আমারও ও-রকম হয়। 'আকাশের কথা' নামে একটা বই পড়ে আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। মনে হচ্ছে সেই কথাটাই ঠিক, মানুষ হচ্ছে জন্মান্ধ, তাকে একটা অন্ধকার ঘরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে একটা কালো বেড়ালকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার কাকা এক বার বলেছিলেন, সৃষ্টির আদি রহস্য জানাবার চেষ্টা করা মূঢ়তা। যদি তা কেউ করতে যায় তবে সেই অন্ধকার ঘরে ঢোকার আগে সে যেন তার বোধবুদ্ধি রেখে যায়, নইলে পাগল হয়ে যাবে। তার মতো আর একজনও আছে যে কিনা বিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে মাথা ঘামায়—এই কথা জেনে কী রোমহর্ষময় আনন্দ হয়েছিল অজিতের। আজও গায়ে কাঁটা দেয়।

মজ্জাগত বিষাদরোগ যদিও কোনও দিনই ছাড়েনি অজিতকে, তবু ওই বন্ধুত্ব তার মনে একটা হাওয়া-বাতাসের জানালা খুলে দিল। বড় অকপট, বন্ধুবৎসল ছেলে লক্ষ্মণ। মন-খারাপ হলেই অজিত চলে যেত তার কাছে। লক্ষ্মণ তার চিরাচরিত পোশাকে বেরিয়ে আসত। রাস্তায় হাঁটত দু'জনে, কয়েক পয়সার চিনেবাদাম কিনে নিত। পার্ক বা লেকের ধারে বসত গিয়ে। সেই বয়সের তুলনায় কিছু বেশি পড়াশুনো ছিল লক্ষ্মণের। বিবেকানন্দের বই ইংরিজিতে পড়েছে, নাড়াচাড়া করেছে কিছু রাজনীতির বই, সবচেয়ে বেশি ছিল তার পত্রিকা পড়ার অভ্যাস—পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, কীভাবে ঘটছে, কেন—সে-সব ছিল তার নখদর্পণে। তার কাছে খুব একটা মানসিক আশ্রয় পেয়েছিল অজিত। ওই ভাবেই তারা বড় হয়। আই এসসি থেকে বি এসসি। তারপরও লক্ষ্মণ পড়ল এম টেক । অনার্স ছিল না বলে অজিত লেখাপড়া ছাড়ে। বরাতজোরে এক ছোট্ট জীবনবিমা কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যায়। লক্ষ্মণ এম টেক-এ ভাল রেজাল্ট করে কিছুদিন চাকরি করল এখানে-সেখানে, একটা প্রফেসারিও করল কিছুদিন। বলত, অজিত, এখানে বড় কূপমণ্ডুকের জীবন। পাসপোর্ট করছি, দেখি কী হয়। পাসপোর্ট করেও রিনিউ করাতে হল লক্ষ্মণকে। প্যাসেজ মানির সংকুলান হত না। ভিসা পচে যেত। অজিতের ছোট্ট কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে মাইনে-টাইনে বাড়তে লাগল। কাজ কমল। বউ এল ঘরে। এবং বউয়ের সঙ্গে মা-বাবার বনিবনার অভাব ঘটাতে অজিত ভবানীপুরের বাসা ছেড়ে আলাদা হয়ে উঠে এল টালিগঞ্জের কাছে। একটু বেশি বয়সেই লক্ষ্মণ গেল কানাডায়। বড় একা হয়ে গেল অজিত। ঘরে বউ, তবু একা। মেয়েরা যে পুরুষের গভীরতার বন্ধু নয় সে সত্য অজিতের চেয়ে বেশি কে জানে! আজ যদি আবার সেই বিষাদরোগ ফিরে আসে তবে অজিত জানে, নিঃসঙ্গতার কাছে ছাড়া ঘরে তার কেউ নেই যাকে বলবে তত্ত্বকথা। কত প্রেমের গল্প লেখা হয়, একটা মেয়েকে নিয়ে কত টানাপোড়েন. কত দ্বন্দ্ব, কত আশা-নিরাশা, ব্যর্থতা ও মিলন, হায়, নারীপ্রেম তবু জীবনের কতটুকু মাত্র জুড়ে আছে। মেয়েদের সাধ্য কী স্পর্শ করে ধীমান পুরুষের গভীর নিঃসঙ্গতা! মেয়েমানুষের প্রতি প্রেম তাই ফুরিয়ে যায়, জুড়িয়ে যায়। কিন্তু দূরের লক্ষ্মণের জন্য অজিতের পিপাসা ঠিক জেগে থাকে। বন্ধুর মতো বন্ধু পেলে পৃথিবীর কত বিষণ্ণতার অর্থ হয়ে যায় আনন্দ!

অজিতের ছেলেপুলে হল না। সরকার খেপে খেপে মাইনে বাড়িয়ে গেল। আগে ইউনিয়ন করত, শীলা বকে বকে ছাড়াল ইউনিয়ন। বছরখানেক আগে প্রোমোশন পেয়ে সেকশন ইনচার্জ হয়ে গেল অজিত। শীলাও একটা গার্লস স্কুলে চাকরি করছে। দু'জনের রোজগার । ফলে হাতে টাকা জমে গেল কিছু। লক্ষ্মণকে লিখল কাছাকাছি দুটো প্লটে জমি আছে, লক্ষ্মণের জন্য একটা কিনবে নাকি? দুই বন্ধুতে পাশাপাশি থাকবে সারাজীবন। তত্ত্ব-কথা শুনবে শোনাবে পরস্পরকে। কেটে গেছে বয়ঃসন্ধির দিন। তবু তো নিঃসঙ্গতা কাটেনি, বিষাদ এখনও ঢের কষ্ট দেবে। লক্ষ্মণ ছাড়া তত্ত্বজ্ঞানী সহৃদয় বন্ধু আর কে আছে! চিঠি পেয়েই লক্ষ্মণ টাকা পাঠিয়েছিল জমি কিনবার জন্য।

ল্যাম্পপোস্টের মাকড়সার জালের মতো ভৌতিক আলোটি লক্ষ্মণের জমির ওপর ময়লা জলের মতো পড়ে আছে। ব্যাডমিন্টন কোর্টের আশে-পাশে কাঁটাঝোপ। বর্ষাকালে পাগলা ঢেঁকি, ভাঁট আর

আগাছায় ছেয়ে যায়। লক্ষ্মণ জার্মান এক মহিলাকে বিয়ে করেছে, পেয়েছে ইমিগ্রান্ট ভিসা, জমিটা বেচে দিতে লিখেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিষণ্ণ-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ক্রমে উঁচুগ্রামে উঠছে। সেতারের ঝালার মতো। এবার থামবে। ঘোষক বলবে, এতক্ষণ তিনতালে প্রথমে বিলম্বিত এবং পরে দ্রুত রাগ শোনালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী...ইত্যাদি। অজিতের বিদেশি সিগারেট শেষ হয়ে আসে। ফিল্টারটায় আগুন ধরেছে, পোড়া একটা গন্ধ পাওয়া যায়। সেটা ফেলে দিয়ে আর-একটা ধরায় অজিত। রনসন গ্যাস-লাইটারটার চাকা ঘুরিয়ে হঠাৎ প্রায় আধফুট উঁচু একটা শিখা তৈরি করে। নিবিয়ে দেয়। লক্ষ্মণ কোনও দিনই ফিরবে না।

শীতের নির্জন রাস্তা দিয়ে কুয়াশায় ডুবন্ত একটা ছায়ার মতো মানুষ আসছে। সামনে এসে চিন্তামগ্ন মুখটা তুলল। অন্ধকার বারান্দায় সম্ভবত সিগারেটের আগুন দেখে জিজ্ঞেস করে—অজিত নাকি?

আরে রণেন!

খবর আছে।

কী?

ভিতরে এসো বলছি।

অজিত মন্থর পায়ে ভিতরে আসে। ঘর ভরতি প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর। শীলা বোনা অংশটুকু তুলে আলোয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নকশাটা দেখছে। অজিত দরজা খুলে এক বিপর্যস্ত রণেনকে দেখতে পায়। আজকাল রণেন একটু মোটাসোটা হয়েছে। ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়ায় এবং টাক পড়ছে বলে একটু বয়স্ক দেখায়। তবু আজকাল আগের তুলনায় অনেক বেশি রংদার, বাহারি পোশাক পরে সে। আজও পরনে নেভি ব্লু রঙের একটা সুট, গলায় টাই, কোটের তলায় দুধসাদা জামা। চুল বিন্যস্ত, দাড়িও কামানো। তবু বিপর্যয়ের চিহ্ন ফুটে আছে তার মুখে-চোখে। হা-ক্লান্ত এবং হতাশা মাখানো মুখ।

শীলা মুখ তুলেই হাতের বোনাটা রেখে দিল। বলল, কী রে দাদা?

সেই মুহূর্তেই প্রধানমন্ত্রী বলে উঠলেন, জয় হিন্দ। এবং জনতা তার প্রতিধ্বনি করল। শীলা নিজেই রেডিয়োটা বন্ধ করে দেয় এবার। উৎকণ্ঠায় রণেনের দিকে চেয়ে থাকে।

রণেন চেয়ারে বসে একটু এলিয়ে হাতের ফোলিও ব্যাগটা মেঝেয় রেখে হাতের চেটোয় মুখটা ঘষে নেয়। বলে, একটু চা কর তো।

করছি। কী হয়েছে?

গ্রহের ফের। বলে রণেন অজিতের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, এল আই সি-তে চেকটার খোঁজ নিয়েছিলে?

অজিত তার বিদেশি সিগারেটটার ফিল্টার পুড়িয়ে ফেলেছে আবার। সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে বলে, নিয়েছি। কাল-পরশুই ইস্যু হওয়ার কথা।

কিন্তু বাবা আসতে পারছেন না। বহেরু লিখেছে বাবার শরীর ভাল নেই। কলকাতা থেকে ফিরে গিয়েই অসুস্থ। বাবাকে ছাড়া চেক তো ওরা আর কাউকে দেবে না!

না।

ব্যাপারটা এত দূর ম্যাচিওর করেও ঝুলে গেল!

অজিত ভ্রূ কুঁচকে বলে, শ্বশুরমশাইয়ের কী হয়েছে?

জানি না। বহেরু ভেঙে তো কিছু লেখেনি। লিখেছে, বুকে ব্যথা। তা থেকে কিছু আন্দাজ করা সম্ভব নয়। এদিকে আমি সিমেন্টের পারমিট বের করেছি। লোহালক্কড়ও পেয়ে যাচ্ছি সস্তায়। টাকা অ্যাডভান্স করা হয়েছে। এত দূর এগিয়ে আবার বসে থাকতে হবে। চেক-এর ভ্যালিডিটি কত দিন থাকে? তিন মাস?

ও-রকমই।

শীলার মুখটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বলল, তুই এক বার গিয়ে দেখে আয় না!

রণেন একটু চড়া গলায় বলে, যাব বললেই যাওয়া যায়! তোর বউদির বোধহয় একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেল।

কী?

কনসিভ করেছিল। তিন মাস। কাল থেকে ব্লিডিং—

ইস ! কী করে হল? পড়েটড়ে যায়নি তো!

না। কিছু বলেনি সে-রকম। আজ নার্সিং হোমে ভরতি করে দিতে হল। এক সঙ্গে এত ঝামেলা যে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। জলের মতো কিছু টাকা বেরিয়ে যাবে।

কেউ কথা বলল না। রণেনই আবার বলে, অজিত, জমিটার ব্যাপারে তুমি কি আর সময় দিতে পারো না?

অজিত উত্তর দেয় না। হাতের রনসন লাইটারটার দিকে চেয়ে থাকে। শীলা উৎকণ্ঠিত মুখ তুলে স্বামীকে দেখে।

পারো না? রণেন আবার প্রশ্ন করে।

অজিত ভ্রূ কুঁচকে বিপরীত দেয়ালে কাঠের চৌখুপিতে রাখা হরেক পুতুলগুলো দেখে। প্রধানমন্ত্রী চুপ করেছেন। দূর থেকে সম্ভবত পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কণ্ঠস্বর আসতে থাকে। অজিত একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, মুশকিল হল, লক্ষ্মণের এক পিসেমশাই প্লটটার ব্যাপারে জানেন। লক্ষ্মণও লিখেছিল যেন তার পিসেমশাইকে প্লটটা আমি বিক্রি করে দিই। উনি আট হাজার টাকা অফার দিয়েছিলেন। আমি লক্ষ্মণকে লিখি যে জমি অলরেডি বায়না হয়ে গেছে, কয়েক দিনের মধ্যেই রেজিস্ট্রি হয়ে যাবে। এদিকে সেই পিসেমশাই এখনও খোঁজখবর রাখছেন যদি বাই চান্স পার্টি পিছিয়ে যায়, তবে উনিই কিনবেন। ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখা খুবই দৃষ্টিকটু হবে। লক্ষ্মণ কোনও প্রশ্ন তুলবে না, কিন্তু মনে মনে অবাক হবে। তার খুবই ইচ্ছে ছিল পিসেমশাইকে প্লটটা বিক্রি করি।

শীলা ভ্রূ কুঁচকে বলে, তোমার তো খুব বন্ধু সে। তাকে একটু বুঝিয়ে লিখে দাও না।

বোঝাবার কী আছে! সে তো তাগাদা দেয়নি। তাগাদা যা আমারই। তা ছাড়া ওই পিসেমশাই ভদ্রলোক রিটায়ার করে সামান্য কিছু টাকা পেয়েছেন। কলকাতায় ওই টাকায় জমি পাওয়া যে কী মুশকিল, তাই ভদ্রলোক খুব আশায় আশায় এসেছিলেন লক্ষ্মণের জমিটার জন্য। তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি জমি বিক্রি হয়ে গেছে বলে। লক্ষ্মণকে আমি এখন কী লিখব?

একটু সময় চাও।

অজিত অদ্ভুত চোখে শীলাকে দেখে। বলে, চাইব কেন? সে তো আমায় সময় বেঁধে দেয়নি। জমি বিক্রির টাকারও তার দরকার নেই। টাকাটা তার অ্যাকাউন্টে কলকাতার এক ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। প্রবলেম তো সেখানে নয়।

তা হলে আর প্রবলেম কী? তুমি চুপচাপ থাকো জমির ব্যাপারে। বাবা সুস্থ না হয়ে এলে তো রেজিস্ট্রি হবে না।

রণেন ম্লানমুখে বলে, শোনো অজিত, বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর অসুখকে বিশ্বাস নেই, গুরুতর কিছু হলে—বলে একটু চুপ করে থাকে রণেন। শীলা তার মুখের দিকে চেয়ে আছে, অজিতও। রণেন চোখটা নামায়, বলে, কাজেই তাঁর ভরসায় থাকাটা এবং তোমাকেও অসুবিধেয় ফেলাটা ঠিক নয়। আমি অন্য একটা ব্যাপার ভাবছি।

বলো। অজিত নিস্পৃহ গলায় বলে।

ধরো যদি টাকাটা আমিই জোগাড় করে দিই তা হলে কেমন হয়?

অজিত একটু বিস্মিত হয়ে বলে, তুমি দেবে? তা হলে এত দিন ওল্ডম্যানের ভরসায় ছিলে কেন?

সেটা মা'র আইডিয়া। মা'র ধারণা বাবার টাকা বারোভূতে লুটে খাবে, তাই বাবার কিছু টাকা ছেলেদের জন্য আদায় করে দিতে চেয়েছিল মা। সেটা যখন আপাতত হচ্ছে না তখন জমিটা কেন হাতছাড়া হয়! বীণার সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি, সে তার কিছু গয়না দেবে, আমিও প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে লোন নিচ্ছি, আরও কিছু জোগাড় করেছি। সব মিলিয়ে জমির দামটা হয়ে যাবে।

শীলা তার বড় বড় চোখ পরিপূর্ণ মেলে রণেনকে দেখছিল। হঠাৎ বলল, জমিটা তা হলে কার নামে কেনা হবে?

রণেন তৎক্ষণাৎ চোখ সরিয়ে নেয়। বলে, সেটা এখনও ঠিক করিনি! তবে, মা'র ইচ্ছে, আমার নামে হোক।

তোর কী মত?

রণেন একটু ইতস্তত করে বলে, বীণার গয়নার অংশটাই বড়। মেজর টাকাটা ও-ই দিচ্ছে যখন, প্লটটা তখন ওর নামেই কেনা হোক। নইলে ওর বাপের বাড়ির লোকেদের চোখে ব্যাপারটা ভাল দেখাবে না।

শীলা একটা নিশ্বাস ফেলে উঠে যায়।

রণেন মুখ তোলে।

অজিত!

বলো।

আমি দিন-সাতেকের মধ্যেই পেমেন্ট করব।

ভাল।

তা হলে উঠি!

বোসো। শীলা তোমার চা করতে গেল।

রণেন বসে। কিন্তু তার মুখ-চোখে একটা রক্তাভা ফুটে থাকে। সে যে স্বস্তি বোধ করছে না, তা বোঝা যায়। অজিত চেয়ে থাকে। একসময়ে রণেনও তার বন্ধু ছিল, বেশি বয়সের বন্ধু। সেই সূত্রেই ওর বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অজিতের। কিন্তু লক্ষ্মণ যেমন বন্ধু তেমন বন্ধু রণেন নয়। এখন ওর দিকে চেয়ে একটু মায়া হয় অজিতের।

রাতে শুয়ে শীলা বলল, শুনছ?

কী?

বউদির নামে জমিটা দিয়ো না। আমি অনেক ভাবলাম সারা সন্ধ্যা।

কী ভাবলে?

দাদা নানা ছুতোয় ইচ্ছে করেই বউদির নামে প্লটটা কিনছে।

কিনুক না!

তুমি কিছু বোঝো না। বউদির নামে বাড়ি হলে সেখানে সোমেন বা মা'র দাবি-দাওয়া থাকে না। আমরাও সেখানে বাপের বাড়ি বলে মাথা উঁচু করে যেতে পারব না। তুমি ওকে বেচো না।

অজিত সামান্য উষ্মার সঙ্গে বলে, সেটা রণেন থাকতে-থাকতেই বলতে পারতে। ওকে কথা দিয়ে দিলাম, তা ছাড়া ও বউয়ের গয়নাটয়নাও বেচেছে বলল।

ছাই। বউদি গয়না বেচতে দেওয়ার লোক কিনা! তা ছাড়া সবাই জানে দাদা দু'হাতে পয়সা রোজগার করছে। বিয়ের পর থেকেই ও যথেষ্ট পালটে গেছে। তোল্লা ঘুষ খায়। দশ-বিশ হাজার টাকার জন্য ওকে বউদির গয়না বেচতে হবে না। যদি বেচে তো সে লোক দেখানোর জন্য।

অজিত অন্ধকারে একটু হাসল। বলল, আমার কাছে সবাই সমান। পিসেমশাই কিনুক, কি

রণেনের বউ কিনুক, কি শাশুড়িই কিনুক—আমার কিছু যায়-আসে না।

শীলা ঝংকার দিয়ে বলে, কিন্তু আমার যায়-আসে। তুমি দাদাকে বেচতে পারবে না।

তা হলে কী করব?

আমি কিনব। শীলা বলে।

তুমি ? তুমি কিনে কী করবে?

ফেলে রাখব। যেদিন বাবা টাকা দিতে পারবেন সেদিন ছেড়ে দেব।

তা হয় না।

কেন?

বড্ড দৃষ্টিকটু দেখায়। লক্ষ্মণ কী ভাববে? তা ছাড়া রণেন আর তার বউও চটে যাবে, মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেবে।

শীলা চুপ করে থাকে। ভাবে। বলে, তা হলে লক্ষ্মণবাবুর পিসেমশাইকেই বিক্রি করে দাও।

একটু স্তব্ধ থেকে অজিত বলে, রণেন কি তোমার শত্রু? সে কিনলেও জমিটা তোমার বাপের বাড়ির হাতেই থাকল।

শীলা একটু শ্বাস ফেলে বলে, পুরুষমানুষ তুমি, তোমাদের মন একরকম। মেয়েদের মনই কেবল কু-ডাক ডাকে।

রণেনকে অত অবিশ্বাস কেন? সংসারটা তো এতকাল সে-ই টানছে। টানবেও। ছেলে হিসেবে রণেন তার সব কর্তব্যই করেছে। তোমার বাবা যখন টাকা তুলতে আসতে পারছেন না, অনিশ্চিত অবস্থায় জমিটা হাতছাড়া না-করে রণেন যদি কেনেই তো তাতে দোষ কী! বউয়ের নামে কিনলেও দোষ নেই। নিজের বাড়ি বলে সে যে মা-ভাইকে বের করে দেবে, এমন তো মনে হয় না।

শীলা চুপ করে থাকে। কিছু বলার মতো যুক্তি খুঁজে পায় না বোধহয়। একসময়ে বলে, বাবার যে কেন এ সময়ে অসুখ করল! চলো না একদিন বাবাকে দেখে আসি।

তোমার বাবা আমাকে পছন্দ করেন না, জানোই তো!

কাকেই বা করেন! বাবার ভালবাসা আমরাই পাইনি, যা একটু দাদা পেয়েছে। মা'র জীবনটা যে কীভাবে কাটল!

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকে শীলা। তারপর অজিত টের পায়, শীলা ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ভীষণ অসহায় বোধ করে অজিত। কান্নাকাটি তার সহ্য হয় না। উঠে এক হাতে শীলাকে নিজের দিকে পাশ ফেরাবার চেষ্টা করতে করতে বলে, আচ্ছা বোকা তো! কাঁদো কেন? না হয় যাব শ্বশুরমশাইকে দেখতে, রণেনকেও না হয় প্লটটা না বেচলাম।

শীলা তবু কাঁদে। সাধাসাধি করে করে ক্লান্ত হয়ে গেল অজিত। ঘুমও হবে না। অগত্যা উঠে একটা ডানহিল ধরায়।

সেই শব্দে শীলা হঠাৎ ফোঁপানি বন্ধ করে বলে, তুমি চলে গেলে কেন? ভিতরে এসো।

যাচ্ছি। সিগারেটটা খেয়ে নিই।

না। সিগারেট নেবাও।

আঃ, একটু অপেক্ষা করো না।

না, এক্ষুনি ভিতরে এসো।

অজিত শ্বাস ফেলে বলে, কখন যে কী মনে হয় তোমার! একখানা হাত টেনে নেয় বুকের ওপর। অজিত আন্দাজে বালিশের তোয়ালে তুলে শীলার চোখ-মুখ মুছে দেয়। বলে, কেন কাঁদলে? বাবার জন্য, নাকি রণেন জমি বউয়ের নামে কিনছে বলে?

ও-সব কারণ নয়।

তবে?
শীলা চুপ করে থেকে বলে, আমি একটা জিনিস টের পাই আজকাল।
কী?
তুমি আমাকে ভালবাসো না।

॥ নয় ॥

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল রণেনের। বিছানা আজ ফাঁকা। শুধু বড় ছেলেটা একধারে কেতরে লেপের তলায় শুয়ে আছে। মেয়ে আর ছোট ছেলে তাদের ঠাকুমার কোল কাড়াকাড়ি করে শুয়েছে, ও-ঘরে। বড় ছেলেটার মাথায় একটোকা চুল, মস্ত মাথাটা জেগে আছে লেপের ওপরে, মুখ-নাক ঢাকা। বীণা আজ পাঁচ দিন নার্সিংহোমে।

বুবাইয়ের মুখ থেকে লেপটা সাবধানে সরিয়ে দিল রণেন। ভারী হালকা আর ফুরফুরে আছে মনটা। সকাল থেকেই যে গাম্ভীর্য তাকে চেপে ধরে সেটা ক'দিন হল একদম নেই। বীণা নার্সিং হোমে যাবার পর থেকেই নেই। অন্যদিন লেপ ছেড়ে উঠতে কষ্ট হয়। আজ হল না। শিস দেওয়া তার আসে না। ছেলেবেলা থেকে অনেক চেষ্টা করে দেখেছে, ঠোঁট ছুঁচলো করে নানা কায়দায় বাতাস ছেড়েছে, বড় জোর একটা কুঁই কুঁই আওয়াজ তুলতে পারে। তবু মন খুশি থাকলে রণেন আড়ালে শিস দেয়। অর্থাৎ ওই আওয়াজটা বের করে। আওয়াজটা একটানা হয় না, বাতাসটা বেরিয়ে যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে একটু কুঁই শব্দ তুলে তার মান রেখে যায় মাত্র।

এক কাকভোরে রণেন উঠে গায়ে হাতওলা একটা উলিকটের গেঞ্জি পরল, লুঙ্গিটা ঝেড়ে পরতে পরতে ড্রেসিং-টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজেকে দেখে তার খুব বেশি পছন্দ হল না। পেটটা বেশ বেড়ে গেছে, গলায় চর্বির গোটাকয়েক থাক। গাল দুটোও কি বেশ ভারী নয়? ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজেকে দেখল সে। হাত ভাঁজ করে বাইসেপ টিপে দেখল গেঞ্জির ওপর দিয়েই। না, তেমন শক্ত হয় না আজকাল। অর্থাৎ অপরিহার্য মেদ জমছেই। লোকে বলে তার ব্যক্তিত্ব নেই। ব্যাপারটা সে ঠিক বোঝে না। চিরকালই সে কিছু ঢিলা-ঢালা রশি-আলগা মানুষ, একটু আয়েশি; টিপটপ থাকা তার আসে না। অনেক মানুষ যেমন কল-টেপা পুতুলের মতো ঘুম থেকে উঠে চটজলদি হাতে নিখুঁত দাড়ি কামিয়ে, দাঁত মেজে, স্নান সেরে, এক্সিকিউটিভটি সেজে, ব্রেকফাস্ট টেবিলে গিয়ে বসে—তার সে-রকম হবেও না কোনও দিন। ফুড-ইনস্পেকটরের বেলা এগারোটার পরে বেরোলেও ক্ষতি নেই, অঢেল আউটডোরে ঘোরা আছে তারপর। কিন্তু বীণা সে-রকম পছন্দ করে না। বীণা যে কী চায়!

কিন্তু বীণা আপাতত নার্সিং হোমে। পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল। তা যাক। রণেন সেটা নিয়ে খুব একটা ভাবে না। আপাতত সে ব্যক্তিত্ব কথাটা নিয়ে ভাবছিল। তার ব্যক্তিত্ব নেই এটা একটা চাউর ব্যাপার। আয়নায় সে তার ব্যক্তিত্বটা একটু খুঁটিয়ে দেখাছিল। প্রথমে সে ছোট চোখে চাইল, তারপর বিস্ফারিত চোখে এক বার মুখটা তোল্লা গভীর করল, এক বার ছটাকি একটু হাসির বিজলি খেলিয়ে দেখল। বাঁ ধার এবং ডান ধার থেকে দেখেটেখে অতঃপর সে ছোট হাত-আয়নাটা বড় আয়নার মুখে মুখে ফেলে নিজের সঠিক চেহারাটা লক্ষ করে। আয়নার উলটো ছায়া পড়ে আর-একটা আয়নায় সেই উলটো ছায়াটাকে উলটে নিয়ে নিজের প্রকৃত চেহারাটা দেখা যায়। কিন্তু দেখেটেখে খুব একটা প্রভাবিত হয় না সে। কিংবদন্তির খানিকটা সত্যিই। চর্বিওলা তুম্বো গাল দুটো আর ছোট চোখে কি ব্যক্তিত্ব ফোটানো যায়! কিন্তু চার্চিলের ছিল, বিবেকানন্দের ছিল। দুনিয়ার বিস্তর মোটাসোটা মানুষের এখনও ব্যক্তিত্ব আছে। কিন্তু সে যখন রোগা ছিল তখনও ছিল না, সে যখন মোটা হয়েছে তখনও নেই।

নেই, কিন্তু তাতে ধৈর্য হারায় না সে। নিরিবিলিতে একা একখানা আয়না হাতের কাছে পেলে সে নিজের দিকে চেয়ে বিস্তর খোঁজে। এবং নিজেকে বিরল ধমকধামকও দেয়। কিন্তু লোকের সামনে সে গম্ভীর মানুষ, কথা কম, ভারী দায়িত্বশীল কাজের মানুষ।

সোমেন বা মা কেউ এখনও ওঠেনি। শিস দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টাটা চালাতে চালাতে সে দাঁতটাঁত মেজে নিল, ইসবগুলের ভূষি খানিকটা জলে নেড়ে খেল। মোজা এবং একজোড়া ন্যাকড়ার জুতো পরে বেরিয়ে পড়ল। রোজই সে খানিক সকালে বেড়ায় আজকাল। বীণা তার মেদ কমানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।

দরজা ভেজিয়ে শিস দেওয়ার চেষ্টার অবিরল শ্বাসবায়ুর উদ্ভট শব্দটা করতে করতে সে নীচতলার সদর খুলে রাস্তায় পড়ল। ধারেকাছে পার্ক নেই। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল যোধপুর পার্কে। ঝিলের ধারে অনেকটা ফাঁকা জমি পড়ে আছে। শোনা যাচ্ছে, একদিন এখানে পার্ক হবে। ফাঁকা জায়গায় পড়েই দ্রুতপায়ে চক্কর দিতে থাকে সে। লক্ষ করে, সে আজ বড্ড সকালেই চলে এসেছে। কাছেপিঠে কেউ নেই। শুধু দূরে দু'-চারজন খাটালওলা লোটা হাতে ফাঁকা ঝিলপাড়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক কাজে। সে দ্রুত চার দিক দেখে নিয়ে লুঙ্গিটা কেঁচে নিয়ে ফটাস করে মালকোঁচার মতো এঁটে নিল। প্রকাণ্ড উরুত দুটো বেরিয়ে পড়েছে, উঁচু হয়ে আছে দাবনা। একটু লজ্জার ভাব ঝেড়ে ফেলে পাঁই পাঁই দৌড়োতে লাগল সে। মেদটা ঝরাতেই হবে। শরীর বা মনে একটা গভীর পরিবর্তন দরকার। রণেনের ঠিক রণেন হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ নিজের সব ভেঙেচুরে ফেলে হয়ে যেতে ইচ্ছে করে স্লিম ফিগারের একজন এক্সিকিউটিভ, কিংবা পারসোনালিটিওলা ডাইরেকটর, কিংবা হেভি ফাঁটের একজন ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারি। যাহোক কিছু একটা। শুধু ফুড ইনস্পেকটর রণেন লাহিড়ী বাদে।

দু' চক্কর ঘুরতেই জিব বেরিয়ে গেল। শুকনো টাকরায় লেগে জিবটা টকাস শব্দ করে। দু'-চারজন বুড়োসুড়ো মানুষ রাস্তায় হাঁটছে, চেয়ে দেখছে তাকে, রণেন দাঁড়িয়ে লুঙ্গি নামায়। প্রচণ্ড হাঁফাতে হাঁফাতে বুকে হাত চেপে হৃৎপিণ্ডকে সামাল দেয়—র' বাবা র'।

যত দূর সম্ভব গম্ভীর হয়ে বাসায় ঢুকল সে। বাচ্চাগুলো এখনও ওঠেনি। মা নার্সিং হোমে বলে ঠাকুমার প্রশ্রয় পায় বড্ড বেশি। বীণা থাকলে ঠিক এই শীতভোরে তুলে দিত, ঠকঠকিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে দাঁতটাঁত মেজে সেগুলো পড়তে বসত এতক্ষণে। দেখে ভারী কষ্ট হয় রণেনের। ক'দিন ঘুমিয়ে নিক। বাচ্চাবেলায় শীতভোরের লেপ-ঘুম যে কী আরামের! আহা, ঘুমোক।

সোমেন রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে হাই তুলছে। চা ওর প্রাণ। মা আঁচলে চেপে চায়ের কেটলি নামাল গ্যাস-উনুন থেকে। রণেন সাধারণত নিজের ঘরে বসে চা খায়, একা। রান্নাঘরের দরজায় বসে চা-খাওয়া যে কী মৌজের তা বীণার রাজত্বে সে টেরই পায় না। সংসারের কর্তা সকলের সঙ্গে মেঝেয় বসে হুইহাট চা খাবে, কি গল্প করবে—তাতে ওজন কমে যায়। আজকাল বীণা নেই। সোমেনের পাশেই মেঝের ওপর থপাস করে বসে সে। আরামের একটা শব্দ তোলে—ওঃ ও! মাজাটায় একটা খচাং টের পায়। বুড়ো হাড়ে দৌড়টা ঠিক হজম হয়নি। সোমেন তটস্থ হয়ে সরে জায়গা দেয়। মা কলকা ছাপের খদ্দরের চাদরের মোড়ক থেকে মাথা বের করে তাকে দেখে। সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন একগাল হাসে রণেন। বলে, মেরে দিলাম একটা দৌড়।

সোমেন হাঁ করে তাকায়। মা বলে, কী বলছিস? কাকে মারলি?

রণেন ভারী আমুদে গলায় বলে, যোধপুর পার্কে বেড়াতে যাই তো রোজ, আজ দেখলাম ফাঁকা, কেউ নেই। লুঙ্গিটা কেঁচে নিয়ে মারলাম দৌড়। মাজাটা গেছে। ওঃ।

ইস। ও-সব দৌড়ঝাঁপ কি তোর সয়! মা দুঃখের গলায় বলে, তোর হচ্ছে আদুরে ধাত।

ওই আদর দিয়ে-দিয়েই তো খেয়েছ। এই বয়সে পোয়াতির মতো ভুঁড়ি, নাডুগোপাল নাডুগোপাল চেহারা! চা দাও তো।

মা একটা শ্বাস ফেলে বলে, আদর আর দিতে পারি কই? বউয়ের হাতে দিয়েছি, সে যা দিয়ে যা করে। আমাদের কি আর আদর দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

কী কথার কী উত্তর! তবু গায়ে মাখে না রণেন। প্রায় চোদ্দো বছরের ছোট ভাইটার দিকে চায়। তারই ভাই, তবু চেহারায় প্রায় বিপরীত। লম্বা, রোগাটে, চোখা বুদ্ধিমানের চেহারা। অল্প বয়স, দাড়িফাড়িও ঠিকমতো কামায় না, নইলে ঠিকই বোঝা যায় যে ব্যক্তিত্বের চেহারা।

রণেন হঠাৎ বলে, বসে না থেকে আই এ এসটা দিয়ে দে না!

সোমেন অবাক হয়ে বলে, আই এ এস! আমি?

রণেন মাথা নাড়ে। বলে, আজকাল যেন কোথায় ট্রেনিং দেয়?

ইউনিভার্সিটিতে।

ভরতি হয়ে যা। আমি টাকা দেব। নিশ্চিত গলায় বলে রণেন।

সোমেন সামান্য হাসে, বলে, টাকাফাকার জন্য নয়। আমার ইচ্ছে করে না।

কেন, ইচ্ছে করে না কেন?

ও-সব আমার হবে না। খামোখা চেষ্টা।

দ্যাখ না। লেগে যেতে পারে। বলে খুব ভরসার হাসি হাসে রণেন। বহুকাল এমন সহজভাবে কথাবার্তা হয়নি তিনজনে। বীণা নার্সিং হোমে যাওয়ার পর থেকে হচ্ছে। ভাইয়ের দিকে একটু চেয়ে থাকে রণেন। ওই রকম তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সে তারও কি সোমেনের মতো চেহারা ছিল? অবিকল না হলেও ও-রকমই অনেকটা ছিল সে। বহেরুর খামারবাড়িতে সে যেতটেত তখন। নয়নতারার সঙ্গে তখন তার একটা সম্পর্ক ছিল।

মনে পড়তেই ফুড়ুক ফুড়ুক একটু হেসে ফেলল সে, আপনমনেই। ব্যক্তিত্বের অভাব। হাসিটা চাপা উচিত ছিল। গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, বহেরুর ওখানে কাকে কাকে দেখলি?

সোমেন বলে, কাকে দেখব? হাজারটা লোক, কাউকে আলাদা করে দেখার উপায় কী? তবে গন্ধ বিশ্বেস, দিগম্বর...

বিরক্ত হয়ে রণেন বলে, ওরা নয়।

তবে?

বহেরুর ছেলেপুলেদের কাকে কাকে দেখলি?

চারটে ছেলের সঙ্গে আলাপ হল, আরও সব আছে। একটা মেয়েকে দেখলাম— বিন্দু, ডিভোর্সড।

ডিভোর্সড আবার কী! ওরা ওইরকম, ছেড়ে চলে আসে, আবার বিয়েফিয়েও করে। আইনটাইন মানে না। আমি যখন যেতাম তখন নয়নতারা নামে একজন ছিল, সেও ওইরকম—

সোমেন মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে একজন। আলাপ হয়নি। দূর থেকে আমাকে খুব দেখছিল।

রণেন আপনমনে হাসে। বহুকাল আগের কয়েকটা দিন মনে পড়ে। নয়নতারা খুব জমিয়েছিল তার সঙ্গে। বেশি কিছু নয় অবশ্য। এই একটু জাঁড়য়ে-টাড়িয়ে ধরা। দু'-চারটে চুমু, আনাড়ির কাজ সব। তবু ভোলা যায় না। সে-সবের জন্য সে তার পৈতেয় পাওয়া একটা আংটি খুলে দিয়ে এসেছিল নয়নতারাকে। বাড়ি এসে একটা ছিনতাইয়ের গল্প বলেছিল। মা অনেকদিন আংটিটার কথা দুঃখ করে বলেছে। আংটিটা তার নামের দুটো আদ্য অক্ষর মিনা করা ছিল, আর এল। আংটিটা কি আজও আছে নয়নতারার আঙুলে, বা বাক্সে? ভারী বিহ্বল লাগছিল ভাবতে।

সুখের স্বপ্নটা ভেঙে হঠাৎ চমকে ওঠে রণেন। ভারী ভয়-ভয় করে হঠাৎ। আংটিটা কি এখনও রেখেছে নয়নতারা? সর্বনাশ ওই আংটি দিয়ে যে এখনও অনেক কিছু প্রমাণ করা যায়। রণেন মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে থাকে—অবশ্য, বেশি কিছু নয়, বেশি কিছু নয়। সবই আনাড়ির কাজ, ছেলেমানুষি...ইত্যাদি।

চায়ের সুঘ্রাণ এবং তাদের তিনজনের এই কাছাকাছি বসে থাকা— বেশ ভাল লাগছিল রণেনের। বলল, সোমেন, কাল তুই বরং নার্সিং হোমে যাস, বউদিকে দেখে আসিস। আমি বরং কাল এক বার বাবাকে দেখতে যাই।

সোমেন বলল, তোমার যাওয়ার কী দরকার? আমিই বরং—

না, না। কাল রবিবার আছে। আমিই যাব'খন। অনেককাল যাই না। বাবাকে দেখে আসি, বহেরুটাও গড়বড় করছে—

মা বলে, বউমাকে আর ক'দিন রাখবি ওখানে?

আছে থাক না। রণেন অন্যমনস্কভাবে বলে, বেশ তো আছে। বলেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে কথা উলটে বলে, ডাক্তার ঠিক এখনই ছাড়তে চাইছে না।

মা একটু অনুযোগ করে, তোদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। হুট বলতে ডাক্তার। হুট বলতে নার্সিং হোম। মেয়েরাও কেমনধারা হয়ে গেল, সজ্ঞান অবস্থায় একটা পরপুরুষ ডাক্তার মেয়েদের শরীরে হাত দেবে এ কেমন কথা! পেটে বাচ্চা এলে দশবার চেক-আপ, লজ্জা হায়া কোথায় যে গেল। তুই নিয়ে আয় তো, কিছু হবে না।

সোমেন এ-সব শুনে উঠে পড়ে। রণেন হাসে। বলে, ডাক্তারই ছাড়তে চাইছে না যে!

কেন? স্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, অপারেশনও যখন দরকার নেই, তখন আর গুচ্ছের টাকা গুনবি কেন?

অপারেশন! বলে একটু চোখ বড় করে চায় রণেন। বলে, একটা মাইনর অপারেশন দরকার ছিল বটে।

তা না হয় সেটাই করিয়ে আন।

পাগল হয়েছ? ওখানকার ডাক্তার হচ্ছে সাহা। এমনিতে ডাক্তার ভালই। কিন্তু দিনরাত কেবল খাওয়ার গল্প। অমন ইলিশ-ভক্ত লোক দুটো নেই। আমাকে প্রায়ই বলে, পদ্মার ইলিশ! ও আর উনুনে চড়াতে হয় না, একটু তেল-সরষেবাটা মেখে বগলে চেপে রাখুন, বগলের ভাপেই সেদ্ধ হয়ে যাবে—এত নরম সুখী মাছ! বলতে বলতে বুঝলে মা, ডাক্তারের চোখ দু'খানা স্রেফ কবির চোখ হয়ে গেল। উদাস, অন্যমনস্ক। হাত থেকে স্টেথেসকোপের চাকতিটা পড়ে গেল ঠকাস করে, চশমা খুলে বুঝি চোখের জলও মুছল। সেই থেকে অপারেশনের নামে আমি ভয় পাই। রুগির শরীরে ছুরি বসিয়ে যদি লোকটার হঠাৎ ইলিশের কথা মনে পড়ে, যদি ও-রকম অন্যমনস্ক আর উদাস হয়ে যায়, তা হলে তোমার বউমার কী হবে!

সোমেন যেতে যেতেও শেষটুকু শুনে হেসে ফেলে। মা স্মিতমুখ ফিরিয়ে নেয়।

বেলায় অফিস বেরোনোর সময়ে রণেনের মাজার ব্যথাটা যেমন খচাং করল এক বার জুতোর ফিতে বাঁধার সময়ে, তেমনি তার মনেও একটা খচাং খিঁচ ধবল হঠাৎ। সে যে বউয়ের নামে জমিটা কিনতে চেয়েছে এটা মা জানে না তো! নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে বেরোবার মুখে জিজ্ঞেস করল, ওরা কেউ এসেছিল নাকি মা?

কারা?

শীলা, কিংবা অজিত।

মা বিরক্তির শ্বাস ফেলে বলে, আসবে কী! সেখানেও আদেখলাপনার চূড়ান্ত।

কেন?

মেয়ের নাকি পেটে বাচ্চা এসেছে। ডাক্তার বলেছে পাঁচ মাস পর্যন্ত নড়াচড়া বারণ। জামাই ডানলোপিলোর কুশন কিনে তিন রাত মেয়েকে শুয়ে থাকার কড়া আইন করেছে। পাশের বাড়িতে ফোন করে জামাই জানিয়ে দিয়েছে, মেয়ে এখন আসবে না।

ওঃ। বলে রণেন নিশ্চিন্তমনে বেরোয়। পাঁচ মাসের জন্য নিশ্চিন্ত।

কিন্তু বাসরাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে তার হঠাৎ মনে পড়ে— নিশ্চিন্ত! দূর বোকা! নিশ্চিন্ত কীসের? শীলা না এলে মা'ও তো যেতে পারে ওদের বাড়িতে!

সমস্যাটা ভেবে সে একটু থমকায়। তারপরই আবার দার্শনিক হয়ে যায়। জানবেই তো, একদিন তো জানবেই!

যেমন সুন্দরভাবে দিনটা শুরু হয়েছিল সেভাবে শেষ হল না।

কলকাতায় আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো নার্সিং হোম গজিয়ে উঠেছে। দোকানঘরের ওপরে, কারখানার পাশে, অফিসবাড়িতে সর্বত্রই নার্সিং হোম। ভাল ব্যবসা। বীণাকে যে নার্সিং হোমে ভরতি করেছে রণেন সেটাও একটা এ-রকমই জায়গা। মধ্য কলকাতার জরাজীর্ণ বাড়িতে ঝকঝকে সাইনবোর্ড লাগানো। নীচের তলায় সামনের দিকে কাপড়ের দোকান, পিছনের দিকে এক আমুদে অবাঙালি পরিবারের বাস, দোতলায় নার্সিং হোম, তিনতলায় বোধহয় কোনও পাইকারের গুদাম। নীচের তলায় সবসময়েই হয় রেডিয়ো, নয়তো স্টিরিও কিংবা পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান রেওয়াজের শব্দ হচ্ছে। ওপরতলায় কুলিদের মালপত্র সবানোর শব্দ। সামনের রাস্তাতেও কোনও নৈঃশব্দ্য নেই। ট্রাম এইখানে বাঁক নেয় বলে প্রচণ্ড ক্যাঁচকোচ শব্দ তোলে। লরির হর্ন শোনা যায়। শীতের শুকনো বাতাসে পোড়া ডিজেল, ধুলো আর আবর্জনার গন্ধ আসে অবিরল। তবু নার্সিং হোম।

রক্ত বন্ধ হয়েছে। বীণাকে একটু ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, তবু সামলে উঠেছে অনেকটা। রণেনকে দেখে একটু কর্কশ স্বরে বলল, টুবাইকে আজও আনলে না?

রণেনের মেজাজ ভাল নেই। ভিতরে নানা রকমের অস্থিরতা। তবু মাথা ঠান্ডা রেখে বলল, কেমন করে আনব? আমি সোজা অফিস থেকে আসছি।

অফিস থেকে আসছি, অফিস থেকে আসছি—রোজ এক কথা। বীণা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ট্রাম-বাসের অবস্থা তো জানোই। বাসায় ফিরে টুবাইকে নিয়ে আসতে আসতে ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে যেত।

বীণা ঝেঁঝে ওঠে, ভিজিটিং আওয়ার্স না হাতি! সারাদিন রাজ্যের লোক আসছে-যাচ্ছে! পরশু এক ছুঁড়ি ভরতি হয়েছে, তার কাছে সারাদিনই দু'-তিনটি ছোঁড়া আসছে, ফুল, ক্যাডবেরি, সিনেমার কাগজ দিয়ে যাচ্ছে, গুজগুজ ফুসফুস করছে, তারা আসছে কী করে? আর তোমার অফিসটাই বা কোন জেলখানা? সারাদিন তো টো-টো করে বেড়ানোই তোমার চাকরি! একটু আগে বেরিয়ে টুবাইকে নিয়ে আসতে পারলে না?

এ-রকম ভাষাতেই বীণা আজকাল কথা বলে। রণেন চুপ করে থাকে। আসলে রাগটা তার সোমেন আর মা'র ওপর গিয়ে পড়ে। পরশু থেকেই সোমেনকে বলছে বুবাই, টুবাই আর শানুকে নিয়ে এক বার নার্সিং হোমে তাদের মাকে দেখিয়ে যেতে। ট্যাক্সি ভাড়াও কবুল করা ছিল। সোমেন, তেমন উৎসাহ দেখায়নি। মাও আপত্তি করেছে, মোটে তো তিন দিন হল গেছে, এর মধ্যে ছেলেমেয়েদের জন্য হেদিয়ে পড়ার কী! ওদের তো মায়ের জন্য কিছু আটকাচ্ছে না!

তা ঠিক। বীণাকে ছাড়াও ছেলেমেয়েদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। মা যক্ষীবুড়ির মতো সংসারের সব কিছু আগলে রেখেছে।

রণেন চুপ করে ছিল। বীণা মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে, ডাক্তার কী বলল?

আরও কয়েক দিন এখানে রাখতে বলছে।

আরও কয়েক দিন রাখতে বলার মানে জানো? টাকা মারার ধান্ধা। আমি থাকব না। তুমি ট্যাক্সি ডাকো, আমি আজই চলে যাব।

ডাক্তারের অমতে কি যাওয়া ঠিক হবে?

হবে। আমি ভাল আছি। ছেলেমেয়ে না দেখে আমি থাকতে পারি না। এখানকার অখাদ্য

খাবারও মুখে দিতে পারি না, দু'দিন প্রায় উপোস যাচ্ছে। তুমি ট্যাক্সি ডাকো।

ব্লিডিংটা মোটে কালই বন্ধ হয়েছে, দুটো দিন থেকে যাও।

না। বলে বীণা মাথা নাড়ল। তারপর অভিমানভরে বলল, আমার তো এমন কেউ আপনজন নেই যে বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার দিয়ে যাবে রোজ। এখানে সকলের বাড়ি থেকে ভাত আসে, আমাকেই কেবল এদের হাতের অখাদ্য রান্না খেতে হচ্ছে।

রণেন একটা শ্বাস ফেলে বলে, পরশু নিয়ে যাব। কথা দিচ্ছি।

বীণা অবাক হয়ে বলে, পরশু? মাথা খারাপ! এই নরকে আর এক রাতও নয়। তুমি আমাকে এখানে রেখে কী করে নিশ্চিন্ত আছ? সুস্থ মানুষ এখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি আজই চলে যাব।

রণেন মলিন মুখে ওঠে।

ইলিশের কবি ডাক্তার সাহা গাঁইগুঁই করল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেড়েও দিল।

ট্যাক্সিতে ওঠার পর, বীণার যেটুকু অসুস্থতা ছিল সেটুকুও ঝরে গেল। দিব্যি এলিয়ে বসে বাইরের দিকে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, মুখ না ঘুরিয়েই বলল, অজিতবাবুর সঙ্গে কথা বলেছ?

বলেছি।

কী বলছে?

কী আবার! ও তো রাজিই।

শীলা কী বলল?

কী বলবে?

জমিটা আমার নামে কিনতে চাও শুনে কিছু বলল না?

না। তবে আমি কাল এক বার বাবার কাছে যাব।

বীণা মুখ চকিতে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে. কেন?

বাবার শরীর খারাপ, এক বার দেখে আসি।

ও। বলে মুখ ফিরিয়ে নিল বীণা। তারপর একটু চুপ করে থেকে গলা আর-একটু মৃদু, এবং আর-একটু কঠিন করে বলল, শীলার কথায় হঠাৎ হুট করে বাবার কাছে যাওয়ার কথা বললে কেন?

রণেন এত সাংসারিক বুদ্ধি রাখে না। তর্কও তেমন আসে না তার। একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, বাবা যদি কলকাতায় আসতে পারেন তবে জমিটা বাবার টাকাতেই কেনা হবে, মা'র নামে।

তাই বাবাকে দেখতে যাচ্ছ?

হ্যাঁ।

বীণা তার চোখে চোখ রেখে তেমনি কঠিন গলায় বলে, সেজন্যই আমাকে আরও দু'দিন নার্সিং হোমে ফেলে রাখতে চেয়েছিলে, যাতে আমি জানতে না পারি যে তুমি বাবার কাছে গেছ?

কথাটা ঠিক। বীণার বুদ্ধির প্রশংসাই করতে হয়। তবু রণেন একটু রেগে গেল। বলল, কেন, তোমাকে ভয় করে চলি নাকি! বাবার কাছে যাওয়াটা কি দোষের কিছু?

তা বলিনি।

তবে?

যা খুশি করো, কিন্তু আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন?

রণেন উত্তেজিত হয়। মুখে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু চঞ্চল হাতে একটা সিগারেট ধরায়। বীণা চেয়ে আছে মুখের দিকে, জবাব চাইছে।

রণেন গলা ঝেড়ে বলে, লুকোইনি। জমিটা মা'র নামে কেনা হবে বলে ঠিক হয়েছিল, এখন হঠাৎ তোমার নামে কেনা হলে খারাপ দেখায়।

খারাপ লাগবে কেন? বাবা কলকাতায় আসতে পারছেন না, অজিতবাবুও জমি বিক্রির জন্য সময় দিচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে জমিটা আমি তোমার টাকা দিয়ে কিনে নিতে বলেছি। তাতে দোষের

কী? আর তোমার টাকা দিয়ে যদি কেনা হয় তবে মা'র নামে কেনা হবে কেন? যদি আমার নামে নাও কেনো, তুমি নিজের নামে কিনবে।

তাতে মা খুশি হবে না। মা চেয়েছিল, আমাদের দুই ভাইয়ের নামে কেনা হোক, আমি বলেছিলাম, মা'র নামে কেনা হোক।

সে হত যদি শ্বশুরমশাই টাকা দিতেন। তিনি যদি না দেন তবে অমন সস্তার সুন্দর জমি তো হাতছাড়া করা যায় না!

মা'র ইচ্ছে দুই ভাইয়ের অংশীদারি থাক।

বীণা অত্যন্ত বিদ্যুৎগর্ভ একটু হেসে বলে, তার মানে মা তোমাকে বিশ্বাস করেন না। তাঁর ধারণা, সোমেনকে তুমি আলাদা করে দেবে।

রণেন সেটা জানে। তাই উত্তর দেয় না।

বীণা বলল, একটা কথা বলি। যদি শ্বশুরমশাই শেষ পর্যন্ত টাকা দেন আর জমিটা যদি মা কিংবা তোমাদের দুই ভাইয়ের নামেই কেনা হয়, তা হলেই বা বাড়ি করার টাকা দিচ্ছে কে? ওই দশ হাজারে জমির দাম দিয়ে যা থাকবে তাতে তো ভিতটাও গাঁথা হবে না। যেমন-তেমন বাড়ি করতেও ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার ধাক্কা। জমি যদি মায়ের নামে হয় বাড়িও তাঁর নামেই হবে, ভাগীদার তোমরা দুই ভাই। বাড়ির টাকার অর্ধেক তা হলে হয় মা'র দেওয়া উচিত, নইলে দেওয়া উচিত সোমেনের। তারা কি দেবে?

কোত্থেকে দেবে?

তা হলে তোমাকেই দিতে হয়। তুমি যদি বাড়ি তৈরির পুরো খরচ দাও তা হলেও পুরোটা কোনও দিন ভোগ করতে পারবে না। অর্ধেক দাবি সোমেনের। তা হলে ওই ভাগের জমিতে তুমি বাড়ি করার খরচ দেবে কেন?

রণেন যুক্তিটা বোঝে। কিন্তু মানতে চায় না। তার মাথায়, বোধবুদ্ধিতে কেবলই একটা কথা খেলা করে যে, এই যুক্তিতে একটা মস্ত বড় অন্যায় রয়ে গেছে। কিন্তু সেটা ঠিক ধরতে পারে না রণেন। কিছু বলতেও পারে না। কিন্তু ছটফট করে। বীণা আর কয়েক দিন নার্সিং হোমে থাকলে সে ঠিকই অন্যায়টা বুঝতে পারত।

বাড়িতে ঢুকবার আগে রণেন তার কষ্টকর গাম্ভীর্যের মুখোশটা মুখে এঁটে দিল আবার।

॥ দশ ॥

ট্যাক্সি থেকে নেমে বীণা এক বারও পিছু ফিরে না-চেয়ে বাসার সদরে ঢুকল এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল। একটু থেমে থেমে, রেলিঙে ভর রেখে, খুব ধীরে ধীরে উঠছিল সে। পিছনে রণেন, তার এক হাতে ফোলিও ব্যাগ, অন্য হাতে প্লাস্টিকের ঝোলায় বীণার জিনিসপত্র। দুটো ব্যাগ একহাতে নিয়ে অন্য হাতটা বাড়িয়ে বীণার হাত ধরল সে, সাহায্য করতে চেষ্টা করল। বীণা হাতটা ঝাঁকিয়ে তীব্র স্বরে বলে, আঃ, ছাড়ো! লাগছে!

লাগার মতো জোরে ধরেনি রণেন, তবু অপ্রস্তুত হয়ে ছেড়ে দিয়ে বলে, একা উঠতে পারবে? কষ্ট হচ্ছে তো!

হোক। অনেক উপকার করেছ, আর করতে হবে না। বীণা বলে।

ট্যাক্সিতে শেষ দিকে তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বীণা চুপচাপ বাইরের দিকে চেয়ে বসে ছিল। রণেনকে দরকার মতো উপেক্ষা করার একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে বীণার। মুখটায় একটু দুঃখী ভাব করে ছলছলে চোখে অন্য দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় বুঝি অভিমান। তা নয়! তখন

সেই অভিমান ভাঙতে গেলেই অনর্থ ঘটে। ভঙ্গিটা দেখেই রণেন মনে মনে বিপদের গন্ধ পেয়েছিল তখনই।

থেমে থেমে অনেকক্ষণ ধরে সিঁড়ি ভাঙে বীণা। মাঝে মাঝে কাতর ব্যথা-বেদনার শব্দ করে, উঃ বাবা! রণেন ধৈর্য ধরে পিছনে অপেক্ষা করে। বীণাকে ধরে তুলবে তার উপায় নেই। ছুঁতে গেলেই ও নির্দয় অপমান করবে।

দরজা খুলে ননীবালা অবাক হয়ে বলেন, চলে এলে?

বীণা উত্তর দিল না। দরজার চৌকাঠে হাতের ভর রেখে দাঁড়াল একটু। ননীবালা সরে গিয়ে বলেন, ঘরে এসো।

বাচ্চারা ঠাকুমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। টুবাই মাকে দেখে ভারী খুশি হয়ে 'মা' বলে চিৎকার করে দু'কদম এগিয়ে গিয়েছিল, ননীবালা তাকে টেনে রেখে বলেন, ছুঁস না, অশৌচ। তারপর রণেনের দিকে চেয়ে বলেন, বউমাকে ঘরে নিয়ে আয়। আমি গরম জল করে দিচ্ছি, তুই স্নান করে ফেলিস।

বীণা কোনও কথা না বলে তার ঘরে চলে গেল, আর ঠাস করে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। অপ্রস্তুত অবস্থা। ননীবালা অপমানটা হজম করতে পারছিলেন না। ছেলের দিকে চেয়ে বলেন, কী জানি বাবা, আমরা তো এ-অবস্থায় আঁতুড়-অশৌচ দুই-ই মানি। এতে রাগের কথা কী হল?

রণেন ব্যাগট্যাগ বাইরের ঘরের টেবিলেই রাখে। জামা-কাপড় ছাড়তে পারে না, কারণ ঘরের দরজা বন্ধ। অগত্যা একটা গামছা জড়িয়ে সোফা-কাম-বেডটার ওপর বসে থাকে। ননীবালা চা করতে করতে রান্নাঘর থেকে ডেকে বলেন, বউমাকে জিজ্ঞেস কর তো চা খাবে নাকি!

রণেন অবশ্য সে চেষ্টা করে না। তখন বুবাই উদ্যোগী হয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দেয়, মা, ও মা, চা খাবে? ঠানু জিজ্ঞেস করছে! মা, ও মা, খাবে? খাবে না?

বাচ্চাদের যা স্বভাব, মা দরজা খুলছে না, কাজেই বুবাই ক্রমান্বয়ে দরজা ধাক্কায়, আর ডাকে। তার সঙ্গে জুটে যায় টুবাই আর শানুও। তিনজনে তুলকালাম করাঘাত করে দরজায়। তারস্বরে ডাকে। টুবাই দৌড়ে এসে বাপকে বড় বড় চোখ করে বলে যায়—দরজা খুলছে না, মা অংগান হয়ে গেছে। গত লক্ষ্মীপুজোয় সারাদিন উপোসের পর ভোগটোগ রেঁধে, পিত্ত আর অম্বলে কাহিল হয়ে ননীবালা অজ্ঞান হয়ে যান। সেই অভিজ্ঞতা থেকে টুবাইয়ের ধারণা, কেউ বন্ধ ঘর থেকে সাড়া না দিলে, বা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে সহজে চোখ না মেললে সে নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তিনজনের ওই ধাক্কাধাক্কি আর ডাকাডাকির বাড়াবাড়ি দেখে ননীবালা উঠে এসে ধমকান, ও-রকম করিস না, মেজাজ ভাল নেই, উঠে আবার মারধর করবে।

ঠিক তখনই বীণা দরজা খোলে। ক্লান্ত চেহারা, দরজাটা ধরে দাঁড়িয়ে, ডান হাতে পাখার ডাঁটটা তুলে এলোপাথাড়ি কয়েক ঘা কসায় বাচ্চাগুলোর মাথায়, গায়ে, শ্বাসের সঙ্গে চাপা চিৎকারে বলে, যাঃ যাঃ, আপদ কোথাকার। জন্মে কখনও শুনিনি পাঁচ মাসের আগে বাচ্চা নষ্ট হলে কেউ আঁতুড় বা অশৌচ মানে। আমার বেলা যত নিয়ম! যাঃ যাঃ, ছুঁবি না আমাকে, ধারেকাছেও আসবি না।

বীণার মূর্তি দেখে ননীবালার কথা জোগায় না। রণেন চায়ের কাপে চোখ রেখে বসে থাকে। বীণা দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, তখন ননীবালা বললেন, তা আমি কি জানি ক'মাস! আমাকে কি তোমরা কিছু বলো?

বীণা তীব্র চোখে চেয়ে বলে, পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত হলে আপনি তা জানতে পারতেন না? কচি খুকি তো নন। ঢের বয়স হয়েছে।

রণেন বুঝতে পারে, মা একটা ভুল করেছে কোথাও। এ-সব মেয়েলি ব্যাপার তার মাথায় ঢোকে না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পারে হয় ননীবালা ভুল করে কিংবা ইচ্ছে করেই আঁতুড় আর অশৌচের

কথাটা তুলেছেন। সম্ভবত ননীবালার ধারণা ছিল যে, বীণা একালের মেয়ে, এত সব খুঁটিনাটি সে জানে না। কিন্তু ইচ্ছে না ভুল তার বিচার হবে কী করে? সংসারের কত সত্য কথা কোনও দিনই জানা যায় না।

ননীবালা এক পরদা গলা নামিয়ে বলেন, অশৌচ না মানলেও হাসপাতালের ছোঁয়াটোয়া তো মানবে! না কি তাতেও দোষ?

তীব্র কণ্ঠে বীণা উত্তর দেয়, দোষ কি না তা আপনিই জানেন! আমার বেলায় হাজার দোষ, হাজার নিয়মনিষ্ঠা। কিন্তু কারও দরদ তো দেখি না! নার্সিং হোমে বুবাইয়ের বাপ ছাড়া কেউ একদিন উঁকি দিয়েও দেখে আসেনি, এক বেলা কেউ ঘরের ভাত পৌঁছে দিয়ে আসেনি! আর দুর্বল শরীরে ঘরে পা দিতে না দিতেই আচার-বিচার শুরু হয়ে গেল!

রণেন এইটুকু শুনেছিল। চায়ের কাপ রেখে সে দ্রুত বাথরুমে গিয়ে ঢুকে পড়ে। ননীবালা গরম জল করে দেওয়ার সময় পাননি, কাজেই শীতে হিম হয়ে থাকা জল তুলে রণেন তার উত্তপ্ত মাথায় ঢালতে থাকে। স্নানের দরকার ছিল না। জলের শব্দে ঝগড়ার শব্দটা ডুবিয়ে দিল কেবল।

ননীবালা অবশ্য পিছিয়ে গিয়েছিলেন। ঝগড়াটা তাই বেশি দূর গড়ায়নি। স্নানটান করে এসে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রণেন দেখে, বীণা মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে, বুকের কাছে টুবাই। টুবাই ছোট, তার অপমান জ্ঞান নেই, কিন্তু বড় দু'জন মার খেয়ে ঠাকুমার ঘরে ঢুকে গেছে, সেখান থেকেই তাদের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল।

চুল পাট করতে করতে রণেন তার ব্যক্তিত্বের ঘাটতিওলা মুখখানা দেখছিল। কিছু ব্যক্তিত্ব যদি এই মুখশ্রীতে থাকত তবে এই সংসারটাকে আঙুলের ডগার সঞ্চালনে শাসন করতে পারত সে। বাপের বড় ছেলে বোকা হয়— এটা একটা প্রচলিত কথা। তার নিজের ক্ষেত্রে কথাটার ব্যত্যয় হয়নি। সে বোকাই। এবং বোকা বলেই ব্যক্তিত্বহীন। এ-সবই বুঝতে পারে রণেন। ব্রজগোপালের উপেক্ষিত সংসারটি সে টানছে আজ বহুদিন। বিনা প্রশ্নে এবং বিনা দ্বিধায়। মা-বাপ-ভাই মিলে এ-সংসার তো তারই নিজস্ব সংসার ছিল এতকাল। শুধু সংসার নয়, এ ছিল তার অস্তিত্ব, তার বেঁচে থাকা। মায়ের জন্য মঠ-মন্দির গাড়ি-বাড়ি সবই সে করে দিতে চেয়েছিল মনে মনে, এতকাল। কোনও দ্বিধা ছিল না, সংশয় ছিল না। সকলে বলত—রণেনের মতো এমন মাতৃভক্তি দেখা যায় না। সেই ভক্তিটা এখন আর তেমন টের পায় না রণেন। সংসার টানতে আজকাল তার কষ্ট হয়। কত ব্যয়কে মনে হয় অপব্যয়। বাবার টাকায় মায়ের নামে কেনা জমিতে নিজের টাকায় বাড়ি করা যে কত বড় মূর্খতা তা অনায়াসে বুঝতে পারছে। তাই বীণার পরামর্শে চোরের মতো সে গিয়েছিল অজিতের কাছে, জমিটা বীণার নামে কেনার জন্য। সেই গ্লানিটাও তাকে চেপে ধরে। ব্যক্তিত্বহীনদের এই রকমই সব হয়। ভাল বা মন্দের বোধ নষ্ট হয়ে যায়। কী যে করবে, কী যে করা উচিত তা সে ভেবে পায় না।

অনেকক্ষণ বে-খেয়ালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তার পুরনো স্বভাব। আয়না পেলে প্রায়ই তার বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

বিরক্ত হয়ে বীণা বলল, আলোটা নিবিয়ে দাও, চোখে লাগছে।

অপ্রস্তুত হয়ে সে আলো নেবায়, আর অন্ধকারে বীণার বাঁকা গলার স্বরটা আসে, দিনরাত মুখ দেখা, তাও যদি দেখার মতো মুখ হত।

এ-সবই উপেক্ষা করতে পারে রণেন। তার স্বভাব শান্ত, রেগে গেলেও সহজে প্রকাশ পায় না তার রাগ। কথা কম বলে। সে বীণাকে অন্ধকারে শুয়ে থাকতে দিয়ে বাইরের ঘরের সোফা-কাম-বেডটায় একটু কেতরে বসে থাকে। রেডিয়োটা চালিয়ে দেয়। খবর হচ্ছে। একটা যুদ্ধ-টুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা। চার দিকে টেনশন, কিন্তু দেশের খবর তাকে বিন্দুমাত্র চিন্তান্বিত করে না। সে নিজেকে নিয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে ঘুম-ভাব এসে যায়, রেডিয়োটা চলতেই থাকে।

হঠাৎ চমকে উঠে শোনে পরুষ-হাতে রেডিয়োটা বন্ধ করে দিল বীণা। ঝাঁঝ-গলায় বলে, এই কপাল-কুষ্টিটা খুলে রেখে ঘুমোচ্ছ কেন? ব্যাটারি নষ্ট হয় না!

রণেন চোখ চায়। বীণার ক্লান্তির ভাবটা কি কেটে গেল। ঘরের আসবাবপত্র টেনে টেনে সরাচ্ছে আর আপনমনে বলছে, ক'দিন ছিলাম না, নোংরার হদ্দ হয়ে আছে ঘরদোর। ঝুল-কালি-ধুলো, বিছানাপত্র গু হয়ে আছে...বলতে বলতে আবার ও ঘরে যায়, আলনা হাঁটকে জামা-কাপড় ছুড়ে ফেলে মেঝেয়— আন্ডারওয়্যার, গেঞ্জি কী কালোকুষ্টি হয়ে আছে! আমাকে আবার আচার-বিচার শেখাতে আসে সব। নোংরার হদ্দ, বস্তিবাড়িতে গিয়ে থাকা উচিত।

রণেন বুঝতে পারে, এ-সব কথা শোনানোর জন্যই তাকে জাগিয়ে নিয়েছে বীণা। এখন সে যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। সহজে ছাড়বে না। বিষণ্ণ মনে রণেন বসে শোনে, বীণা ও-ঘরে ছেলেমেয়েদের ডেকে নিয়ে বলছে, কী সব চেহারা হয়েছে এ-ক'দিনে। খাস না নাকি তোরা? হাড় জিরজির করছে! কনুইতে ময়লা, ঘাড়ে ময়লা, চোখে পিচুটি, দাঁতে ছ্যাতলা—কেউ এ-সব দেখে না নাকি! এই শীতে গায়ে গরম জামাও কেউ পরায়নি!

ননীবালা গ্যাসের উনুনের সামনে বসে আছেন নিশ্চুপে। কিন্তু সেটা তাঁর পরাজয়-মেনে-নেওয়া মনে করলে ভুল হবে। মনে মনে তিনিও তৈরি হচ্ছেন, লেগে যাবে। রণেন উঠে বসল এবং বীণার উদ্দেশে একটা দুর্বল ধমক দিয়ে বলল, আঃ কী হচ্ছে! চুপ করে শুয়েটুয়ে থাকো না।

বীণা প্রায় ঝাঁপিয়ে আসে, কেন চুপ করে থাকব? এই ঘর-সংসারে আমি কি ফ্যালনা? আমার বলার কথা কিছু থাকতে পারে না?

এই দুর্বল শরীরে অত চেঁচিয়ো না। ডাক্তার তোমার ওঠা-হাঁটা বেশি বারণ করেছেন।

থাক, অত দরদে কাজ নেই। মুখের দরদ অনেক দেখা আছে।

এইভাবে শুরু হয়েছিল। ননীবালা কেন যেন উত্তর দিচ্ছেন না। চুপচাপ আছেন। বীণা গনগন করে যেতে লাগল একা একা। দু'-চার ঘা বাচ্চাদের মারধরও করল শোওয়ার ঘরে। বোঝা যায়, সে ননীবালাকে উত্তেজিত করে ঝগড়ায় নামাতে চাইছে। একটা হেস্তনেস্ত করাই তার উদ্দেশ্য। ক্রমে ক্রমে তার কথাবার্তায় মরিয়া ভাব ফুটে উঠতে লাগল, রণেন শুনতে পায় শোওয়ার ঘরের ভেজানো দরজার ও-পাশে বীণা চাপা গলায় বলছে, পাগলের গুষ্টি। দ-পড়া কপাল না হলে কারও এ-রকম শ্বশুরবাড়ি হয়।

বহুকাল আগে রণেনের এক বার কড়া ধাতের টাইফয়েড হয়েছিল। তখন টাইফয়েডের চিকিৎসা ছিল না। গ্রামে-গঞ্জে ডাক্তার-কবিরাজও ছিল না সুবিধের। প্রায় বাহান্ন দিনে তার জ্বর কমেছিল বটে, কিন্তু কিছুকাল তার বিকারের অবস্থা হয়েছিল। জ্বরের পরও প্রায় মাস তিনেক সে মস্তিষ্কবিকারে ভুগেছে। লোকে বলে টাইফয়েডের পর ওই পাগলামির সময়ে সে মা-বাপকে চিনতে পারত না, নিজের বাড়ি কোথায় বলতে পারত না। সেই পাগলামি সেরে যাওয়ার পর রণেন খুব ঠান্ডা আর ভালমানুষ হয়ে যায়। কিন্তু সে যে একদা পাগল হয়ে গিয়েছিল এই ঘটনাটা সে কোনও দিনই ভুলতে পারে না। মাঝে মাঝে তার মনে হয় পাগলামিটা ছাই-চাপা হয়ে আছে তার অভ্যন্তরে। সেই কারণেই বোধহয় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে আজও, এই বয়সেও সে নানা অঙ্গভঙ্গি করে, ব্যক্তিত্ব খোঁজে, ফাঁকা মাঠ পেলে ছেলেমানুষের মতো দু' চক্কর দৌড়ে নেয়, কিংবা একাবোকা অবস্থায় সে এ-রকম অনেক কিছুই করে। 'পাগল' কথাটা শুনলেই সে বরাবর একটু চমকে ওঠে। তার বুকের ভিতরে একটা ভয় যেন হনুমানের মতো এ-ডালে ও-ডালে লাফিয়ে বেড়ায়।

সে উঠে শোওয়ার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলল, শোনো, এত অশান্তি কোরো না। যদি বাড়াবাড়ি করো, তা হলে আমি বেরিয়ে যাব।

বীণা টুবাইকে হাত-মুখ ধুইয়ে এনে গরম পোশাক পরাচ্ছিল হাঁটু গেড়ে বসে। মুখ না ফিরিয়েই

বলে, তুমি বেরিয়ে যাবে বলে ভয় দেখাচ্ছ কাকে? তুমি কবে ঘরে থাকো, কতক্ষণই বা থাকো? ঘরের কোনও খবর কি তোমার কানে যায়? যেতে হয় যাও, আমাকে চোখ রাঙাতে এসো না। আমি আর ও-সব গ্রাহ্য করি না।

অগত্যা বেরিয়েই গেল রণেন। শীতের রাস্তায় রাস্তায় খানিক হাঁটল। মাথাটা গরম। মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেল। দু'-চারজন চেনা পাড়ার লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। সোমেন তার আড্ডা সেরে ফিরছিল। রাত হয়েছে। রণেনকে রাস্তায় দেখে সিগারেট লুকিয়ে নতমুখে পেরিয়ে যাচ্ছিল, রণেন তাকে ডাকল। এত রাত করে ফেরে, একটু শাসন করা দরকার। দিনকাল ভাল নয়।

এত রাত করে ফিরিস কেন? লোকের চিন্তা হয় না?

সোমেন তার কমনীয় সুন্দর মুখটি তুলে হাসল। হাসিটি ভুবন-ভোলানো। রণেন শাসন করতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায়। সোমেন বলে, একটা পিকনিকে যাব কাল, তার সব জোগাড়যন্ত্র করছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।

রণেন গলাখাঁকারি দেয়। ভাইটাকে সে কোনও দিনই কড়া কথা বলতে পারে না। বড্ড মায়াবী। আজকালকার এই বয়সের ছেলেদের যেমন ডোন্টপরোয়া ভাব তেমন নয়। তাই রণেন বলে, ও। গায়ে গরম জামা নেই কেন? ওই পাতলা সোয়েটারে কি শীত মানে? একটা পুল-ওভার কিনে নিস।

তেমন শীত কই? আমার তো ঠান্ডা লাগেই না।

পিকনিকে বাইরে যাচ্ছিস তো! সেখানে শীত লাগবে। বরং আমার কোটটা নিয়ে যাস।

তোমারও তো কাল বাইরে যাওয়ার কথা। কোট তোমারও তো লাগবে!

বাইরে যাওয়ার কথা! তাই তো! গোলমালে খেয়াল ছিল না। বাবার কাছে কাল তার এক বার যাওয়া উচিত। ওই অভিশপ্ত জমিটার হাত থেকে তো রেহাই নেই।

রণেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বলল, হুঁ, আচ্ছা যা।

গোলমালটা বাঁধল রাত্রে।

খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা দিয়েছে তারা। রণেন দেখল বীণা কাগজ জ্বেলে ঘরের মেঝেয় একবাটি দুধ গরম করছে।

ও কী করছ? রণেন জিজ্ঞেস করে।

বীণা উত্তর দিল, দেখতেই পাচ্ছ।

ঘরে কাগজ জ্বালছ কেন, রান্নাঘর থাকতে?

রান্নাঘরে আমি যাব না, কারও শুচিবাইয়ে লাগতে পারে।

মাকে বললে মা নিজেই গরম করে দিত। কী করবে দুধ দিয়ে এত রাতে?

বীণা উত্তর দিল না। দুধ গরম করে ঘুমন্ত টুবাইকে টেনে-হিঁচড়ে আনল বিছানা থেকে। টুবাই ঘুমের মধ্যে কাঁদে, হাত-পা ছোড়ে। তাকে গোটাকয় চড়-চাপড় দিয়ে, গলায় আঁচল চেপে ঝিনুকে দুধ খাওয়াতে থাকে বীণা।

একটু অবাক হয় রণেন। একটু আগে টুবাই দুধ-ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছে। এখনই আবার খাওয়ার কথা নয়। বলল, একটু আগেই তো খেল, এখন আবার খাওয়ানোর কী দরকার? কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দেওয়া শুধু শুধু।

বীণা হঠাৎ দু'খানা ঝকঝকে চোখের ছোরা মারে রণেনকে। একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, কেন, টুবাই বেশি খাচ্ছে বলে চোখে লাগছে নাকি? লাগলে অমন চোখ কানা করে রাখো?

রণেন চুপ করে থাকে। বীণা নিজেই বলে, বাচ্চাদের খাওয়াই, এটাতে সকলেরই চোখ কেন যে কটকট করে!

রণেন একটু উত্তপ্ত হয়ে বলে, একে খাওয়ানো বলে না। এ হচ্ছে তোমার বাতিক। অত খাওয়া কি সহ্য হবে?

বীণা খুব অবাক চোখ তুলে বলে, দু'ঝিনুক দুধ বাচ্চারা খাবে না? এ ক'দিন ভাল করে দুধ গেছে নাকি পেটে? তোমরা পাগল না কি! 'অত খাওয়া' বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও?

বলছি, পেটে অত সইবে না।

সে আমি বুঝব। পেটে কী সয় না-সয় তা আমি মা হয়ে জানি না! তুমি জানবে?

তোমার মাথায় ছিট-পড়া।

তা হবে। পাগলদের সঙ্গে থাকলে লোকে পাগলই হয়।

রণেন শ্বাস ফেলে চুপ করে থাকে। কিন্তু বীণার আক্রোশ তাতে কমে না। সে বলে, পাগলের গুষ্টি। যেমন পাগল ছিল বাপ, বাউন্ডুলে হয়ে বেরিয়ে গেছে, তেমনি ছেলে পাগল।

হঠাৎ সেই পুরনো ক্ষতে হাত পড়ে। ঠান্ডা, ভালমানুষ রণেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে ওঠে যেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে, চুপ করো বলছি!

বীণা চমকে ওঠে। টুবাই বিষম খায়। দুধ গড়িয়ে নামে গাল বেয়ে। বীণা তার শান্তস্বভাব, উত্তাপহীন স্বামীটিকে হঠাৎ উত্তেজিত হতে দেখে একটু অবাক হয়। তাকায়। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে যায় সে তার স্বামীর একটি অতিশয় দুর্বলতার স্থান খুঁজে পেয়েছে। এতকাল এই দুর্বলতার কথা তার জানা ছিল না। মানুষ আর-একটা মানুষের কত কিছু জানতে পারে না, কাছাকাছি থেকেও।

মেয়েদের নিষ্ঠুরতার বুঝি শেষ নেই। যে-মুহূর্তে বীণা বুঝতে পারে যে 'পাগল' কথাটাই রণেনকে উত্তেজিত করেছে সেই মুহূর্তেই সে দুর্বল জায়গাটায় প্রবল নাড়া দিতে থাকে। এবং খেলাটা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বীণা বলে, কেন, চুপ করব কেন? তোমাদের মধ্যে পাগলামির বীজ নেই? তোমার বাবাকে লোকে পাগল বলে না? তোমারও ছেলেবেলায় অসুখের পর এক বার পাগলামি দেখা দেয়নি? আমি কি ভুল বলছি? যা সত্যি তা বলব না কেন?

ঠান্ডা এবং শান্ত স্বভাবের রণেনের ভিতরে সেই হনুমানের হাঁচোড় পাঁচোড় তার ভিতরটাকে নয়ছয় করে দেয়, রাগে চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে বীণা তাকে পাগল করে দিতে চাইছে। তার মনে নিভৃতে লুকিয়ে রাখা বড় গোপন ও লজ্জার স্থানটিতে এই প্রথম হানা দেয় মানুষ। সে মাথা চেপে ধরে। সে আর-এক বার চেঁচায়, কিন্তু কোনও কথা ফোটে না, একটা জান্তব আওয়াজ বেরিয়ে আসে। এবং সেই মুহূর্তে তার মনের যাবতীয় মানবিক চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়ে যায়।

বীণা তার দিকে আঙুল তুলে বলে, তুমি পাগল নও? আগে এ-সব জানলে তোমার সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিত? পাগলের বংশে কেউ জেনেশুনে মেয়ে দেয়?

রণেন মশারি সরিয়ে বিছানার ধারে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটটা পড়ে গেল। শূন্য এবং ভয়ার্ত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে রণেন। এখন থেকে এই মেয়েমানুষটার চেয়ে বড় শত্রু তার আর কেউ নেই। ওই ভঙ্গি থেকেই সে হঠাৎ পা বাড়িয়ে লাথিটা কষাল বীণার বুকে। টুবাই ছিটকে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসে। বীণা পড়ে গিয়ে ফের উঠতে যাচ্ছিল। রণেন ঝুঁকে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে তাকে হেঁচড়ে তোলে, অস্ফুট গলায় বলে, হারামজাদি, আমাকে জামাই পেয়ে তোর চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেছে...বলতে বলতে সে তার ডান হাতে গোটাকয় প্রচণ্ড চড় মারে বীণার গালে। দেয়ালের কাছে নিয়ে মাথা ঠুকে দেয়, মুখ ঘষে দেয় দেয়ালে, আর বলে, পাগল! পাগল! বল, বল, পাগল? পাগল...

বন্ধ দরজায় তখন প্রবল ধাক্কা দিয়ে বাইরে থেকে সোমেন চিৎকার করছে, দাদা, দাদা, কী করছ কী! দাদা, দরজা খোলো! মায়ের চিৎকারও কানে আসে রণেনের।

মা বলে, সর্বনাশ করিস না, ওরে সর্বনাশ করিস না!

ছেলেমেয়েরা ঘুম ভেঙে প্রথমটায় চিৎকার করে উঠেছিল। রণেন তার খ্যাপা চোখে তাদের দিকে চাইতেই তারা নিথর হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ বাদে দরজা খুলেছিল রণেন। তখন বীণা মেঝেয় পড়ে আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান হারায়নি। কেবল বড় বড় শ্বাস টানছিল। সোমেন গিয়ে বউদিকে ওঠায়, মা ধরে রণেনকে। রণেন ননীবালার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসে। সিগারেট ধরায়। জীবনে সম্পূর্ণ এক নতুন অভিজ্ঞতায় তার মনটা তখন অস্পষ্ট। আচ্ছন্ন। এই প্রথম সে মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলল।

ঘরে সে আর যায়নি। সোমেন আর মা যা করার করেছিল রাতে। সম্পূর্ণ ভূতগ্রস্তের মতো সোফায় বসে রইল রণেন। ননীবালা এসে এক সময়ে বললেন, ঘরে যা রণো।

রণেন মাথা নাড়ল। সোমেন মাকে টেনে নিয়ে গেল ঘরে।

সারা রাত পরিত্যক্ত এবং আচ্ছন্ন রণেন বসে রইল সোফায়। মশার কামড় খেল, টের পেল না তেমন। সিগারেট খেল অনেক। মাথার ভিতর দিয়ে কত চিন্তার ঘূর্ণি বয়ে গেল।

মা-বাবার কত ঝগড়া হয়েছে, কত আকথা কুকথা মা বলেছে বাবাকে। বাবা কোনও দিন হাত তোলেননি। স্ত্রীলোকের জন্য একটা আলাদা সম্মানবোধ ব্রজগোপালের বরাবর। এখনকার দিনে যখন আর ট্রামে-বাসে পুরুষরা মেয়েদের বসার জায়গা ছেড়ে দেয় না, লেডিস সিটে জায়গা না থাকলে মেয়েরা যখন দাঁড়িয়েই যায় তখনও ব্রজগোপাল নিজের সিটটি ছেড়ে দেন। স্ত্রীলোকরা দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি পুরুষ হয়ে বসে থাকব—বাবার পৌরুষে সেটা আজও লাগে। এখনও অনাত্মীয়া, অপরিচিতা মেয়েছেলের মুখের দিকে ব্রজগোপাল তাকান না, স্পর্শ বাঁচিয়ে চলেন, অধিকাংশ মেয়েকেই সম্বোধন করেন 'মা' বলে।

রণেনের মন তিক্ততা আর আত্মগ্লানিতে ভরে যায়। সারা রাত ধরে সে কত কী ভাবে। ভোরবেলা কেউ জেগে ওঠার আগেই সে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়। গড়ের মাঠের কাছে ট্রাম থেকে নেমে কুয়াশায় আচ্ছন্ন মাঠঘাটের সবুজ সৌন্দর্য দেখে। দেখতে দেখতে এক সময়ে বহেরুর খামারবাড়িটার কথা মনে পড়ে যায়। নির্বাসিত, বৃদ্ধ ব্রজগোপালকে মনশ্চক্ষে সে দেখতে পায়। নাতিদীর্ঘ সচ্চরিত্র একজন বাতিল মানুষ। হঠাৎ বাবার জন্য একটা আকুলতা বোধ করে সে।

খিদে পেয়েছিল। রেস্টুরেন্টে খেয়ে, সেলুনে দাড়ি কামিয়ে নিয়ে একটু বেলায় সে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরে।

॥ এগারো ॥

বর্ধমানের বাজারে বহেরু একজন ভবঘুরে চেহারার লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। ডাল শস্যবীজের পাইকার পরান সাহার চেনা লোক। রোগা, কালো, লিকলিকে চেহারা, গালে আর থুতনিতে খামচা-খামচা কয়েক গাছা লোমের মতো দাড়ি—মাকুন্দই বলা যায়। দুটো গর্ত চোখে ভিতুভাব। এক চালান মাল গস্ত করে পরান সাহা তার দোকানঘরের বাইরে বসে কোঁচা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে—মোটা মানুষ, শীতেও ঘাম হয়। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে, নিয়ে গিয়েই দেখো না। চোর ছ্যাঁচোড় নয়, দোষের মধ্যে কোনও একঠাঁই থাকতে পারে না। চোখে চোখে রেখো। তুমি তাঁতির কথা বলেছিলে, তাই আটকে রেখেছি।

বহেরু মাথা নাড়ল। পরান সাহা তার পুরনো খদ্দের। কাজেই খারাপ লোক দেবে না। কিন্তু

ব্রজকর্তার সঙ্গে পরামর্শ না-করে কথা দেয় কী করে? বলল, রও বাপু, আমি টপ করে ঘুরে আসছি। পালিয়ো না যেন।

লোকটা সঙ্গ ধরে বলল, যদি নেন আপনার কাছে থাকব। বর্ধমানের বাজার ভাল, শানা-মাকু সব এখান থেকেই কিনে নিলে হয়।

রাখো বাপু, আগে কর্তার মতামত দেখি। শানা-মাকু কিনতে হবে না, আমার তাঁতঘর আছে।

ও! লোকটা বিস্ময়ভরে বলে, তা কর্তা কে?

ব্রাহ্মণ। আমার ব্রাহ্মণ। কথাটা অহংকারের সঙ্গে বলে বহেরু।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তবে!

থাকো, বিড়িটিড়ি খাও, আমি এসে যাচ্ছি। লোকটা তখন হঠাৎ আপনমনে বলে, বড় খিদে পেয়েছিল। চাড্ডি মুড়িটুড়ি—সে-কথায় কান না দিয়ে বহেরু বাজারের ভিড় ভেঙে এগোয়। মশলাপট্টি পার হয়ে বড় রাস্তা ধরে খানিক এগোলে ঘড়ির দোকান। ব্রজকর্তা বসে আছে ঠায় একটা পিঠ-উঁচু চেয়ারে।

কর্তা, হল?

ব্রজগোপাল বহেরুর দিকে চেয়ে মাথা নাড়েন। হয়নি। বহেরু একটু হাসল। বলল, ও ঘড়ি তো চোদ্দোবার সারাই হয়েছে, যন্ত্রপাতি আর কি কিছু আছে? ফেলে দ্যান।

ব্রজগোপাল বিমর্ষভাবে বলেন, পুরনো জিনিস, মায়া পড়ে গেছে। বড় ছেলে প্রথম চাকরি পেয়ে দিয়েছিল, তা চোদ্দো-পনেরো বছরের বেশি ছাড়া কম না।

একটু কথা ছিল, আবডালে আসেন।

ব্রজগোপাল নেমে আসেন, কী বলবি?

একটা তাঁতি পেয়েছি। দু'শো সুতোর কাপড় বুনতে পারে।

ব্রজগোপাল অবাক হয়ে বলেন, দু'শো সুতো? সে তো শৌখিন ব্যাপার। তোর সে কাপড় কী দরকার?

বহেরুর বড়সড় শরীরটা একটু ঝুঁকে পড়ে আহ্লাদে, একটু মৌজের হাসি হেসে বলে, দু'শো সুতোর কাপড় বোনা যার-তার কর্ম নয়। ও-কাপড় পরলে টেরই পাওয়া যাবে না যে কিছু পরে আছি। মনে হবে ন্যাংটা আছি।

ব্রজগোপাল বড় চোখে চেয়ে বলেন, ও কাপড় পরে রাজা-জমিদাব, তুই চাষিবাসি মানুষ, ও পরে কি আরাম পাবি?

দেখি কীরকম করে। পাঁচজনকে দেখানোও যাবে। আশেপাশে ঘরে কেউ তো বোনে না। একটা গুণী লোক, আটকে রাখি। কী বলেন?

নিবি তো নে। তবে দেখেশুনে নিস, এক পেট ভাতের জন্য বহু হাঘরে নিষ্কর্মা গুণী সেজে ঘুরে বেড়ায়। ব্রজগোপালের মুখে অবশ্য কোনও উৎসাহ দেখা যায় না।

বহেরু উৎসাহে বলে, তো নিই? পরান সাহাব চেনা লোক।

কত লোক তো আনলি। সেই যে সুন্দরবনের এক রাইচাষা এল আনারসের খেত করতে, তারপর চৌপরদিন পড়ে ঘুমোত—সে-রকম না হয়।

হলে বের করে দেব। একটু দোষ আছে অবিশ্যি, মাঝেমধ্যে পালিয়ে যায়। তবে হাতটান নেই। পরান সাহা তো জামিন রইল। আপনি আসুন না, দেখবেন। যদি মত দেন তো কথা পাকা করে ফেলি।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, দাঁড়া, ঘড়ির মেরামতিটা হোক। চোখের আড়াল হলেই ওরা যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলে। ঘড়ি বলে জিনিস।

বহেরু গুরগুরিয়ে হাসে, পুরনো যন্ত্র, ও নিয়ে কী করবে?

তুই বড় বুঝিস। সব সারাইকর ঘড়ির পার্টস চুরি করে। বহেরু বোঝে বড় কর্তাকে এখন নড়ানো যাবে না। আগাগোড়া মেরামতির সময়টা উনি ঠায় বসে থাকবেন অপলক চেয়ে। বড় সাবধানী লোক।

দোকানদার পুরনো চেনা লোক, ব্রজগোপালের টেবিল-ঘড়িটা না হোক বার ছয়-সাত সারিয়ে দিয়েছে। বুড়োসুড়ো লোক, হাত কাঁপে, মাথা নড়ে, তাই দোকানে বড় একটা খদ্দের হয় না। লোকটা ব্রজগোপালকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলল, ব্রজদা, এ হবে না।

ব্রজগোপাল চমকে দোকানে উঠে যান। ঝুঁকে ঘড়িটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলেন, হবে না?

বুড়ো লোকটা ঝাড়নে হাত মুছতে মুছতে মাথা নাড়ে, না, এর জান শেষ হয়ে গেছে। জং-ফং লেগে একাক্কার। এ-ক'দিন চলল কী করে সেইটাই ভারী বিস্ময়ের কথা।

আর-একটু নেড়েচেড়ে দেখুন না, বহু বছর ধরে সঙ্গে রয়েছে, বাতিল করতে মায়া লাগে।

সারানো যায়। তবে তাতে নতুন কেনার খরচ। তেমন ভাল চলবেও না।

হতাশ হয়ে ব্রজগোপাল ঘড়িটা হাতে নিয়ে বলেন, বড় ছেলে দিয়েছিল।

নতুন একটা কিনে নিন।

দূর। ব্রজগোপাল 'নতুন' শব্দটা সহ্য করতে পারেন না বোধহয়। বলেন, পুরনো আমলের জিনিসের মতো জিনিস হয়!

ব্রজগোপাল চাদরের তলায় ঘড়িটা নিয়ে নেমে আসেন। হাঁটতে হাঁটতে বলেন, লোকটা বুড়ো মেরে গেছে রে বহেরু, ও-পাশে একটা দোকান দেখেছি, চল তো দেখিয়ে যাই। বলে কি না চলবে না!

আবার ঘড়ির দোকানে বসবেন! তবে আর কোকাকে দেখতে যাওয়া হবে না। আমারও মালপত্র কেনার আছে। টাইম ক'টা হল?

হাতে ঘড়ি, তবু টাইম ক'টা হল তা দেখার উপায় নেই। ভারী রেগে গিয়ে ব্রজগোপাল বলেন, কী করে বলি?

টাইম জানতে বহেরু একজন চলতি ভদ্রলোককে দেখে এগিয়ে যায়। পিছিয়ে আবার ব্রজগোপালের পাশটি ধরে বলে, আজ আর হবে না। জেলখানার ফটক বন্ধ হয়ে যাবে যেতে যেতে।

শীতের বেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাজারের ভিড়ে পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে। রাঙা ধুলো। একটা জলহীন শুকনো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে শীতটা টের পাওয়া যাচ্ছে না, ফাঁকায় পড়লে আজ ঠান্ডা কামড়াবে খুব। বুড়ো হাড়ে শীতটা আজকাল লাগে। ব্রজগোপাল ঘড়িটা এক বার ঝাঁকিয়ে কানে লাগান। কোনও শব্দ না পেয়ে বলেন, নষ্ট হবে না! তোর রাজ্যের সব লোকের ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময় জানা চাই, যেন অফিস টাইম সবার। উত্তরের বেড়ার দিকটা ফাঁক করে বাচ্চাকাচ্চারা ঘরে ঢোকে। আমি না থাকলে ঘড়ির অ্যালার্ম বাজিয়ে মজা মারে।

বহেরু গম্ভীরভাবে বলে, হুঁ। ছাওয়াল পাওয়ালগুলান বড় খচ্চর হয়েছে। সবক'টাকে কানে ধরে ওঠাবসা করাব।

গুণী লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পরান সাহার দোকানের সামনে, আকাশমুখো চেয়ে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জির ওপর পড়ে-পাওয়া একটা ছেঁড়া সোয়েটার। পেটটা খাল হয়ে পড়ে আছে, কতকাল বুঝি পেটপুরে খায়নি। পেটের খোঁদলটাকে আরও ভিতরে ঢুকিয়ে শীতে কুঁজো হয়ে লোকটা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। বহেরু সামনে দাঁড়াতেও খানিকক্ষণ যেন চিনতে পারল না, তারপর সংবিৎ পেয়ে শুকনো ঠোঁটে বড় বড় দাঁতগুলো ঢাকার চেষ্টা করল।

কী? লোকটা বলে!

দু'শো সুতোর কাপড়? পরলে মনে হবে কিছু পরি নাই, ন্যাংটা আছি!

লোকটা ঘাড় নাড়ল। বলল, আমাদের বহু পুরুষে বুনে আসছি। ইদানী সব গোলমাল হয়ে গেল। দাদন না পেয়ে আমার বাবা তাঁত বেচে দেয়। সে অনেক ইতিহাস। আমি তো শেষ অবদি বিষ্টুপুর গিয়েলাম রেশমের কাজ শিখতে। ওরা শেখাতে গা করে না। সেই থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। তাঁত আর দাদন পেলে এখনও—

বহেরু বাধা দিয়ে বলে, মালপত্র সব পাবে। এখন কিছুদিন পেটভাতে কাজ করো তো বাপু! তোমার কাজ তো দেখি।

লোকটা রাজি। বহেরু ব্রজগোপালকে দেখিয়ে বলে, ইনি ব্রাহ্মণ। একটা নমো ঠুকে দাও, শুভকাজে ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো—

লোকটা কথাটা ধরতে পারে না, যেন-বা পায়ের ধুলো নেওয়ার অভ্যাস নেই। সে তেমনি খুব আপনমনে বলে, বড্ড খিদে পেয়েছিল। চাড্ডি মুড়িটুড়ি হলে—

ব্রজগোপাল বলেন, থাক থাক। লোকটাকে দেখে তাঁর মনে হয় লোকটার আত্মবিশ্বাস নেই। তবে তাঁতের কথায় তার চোখ দু'খানা যেমন ঝলসে উঠল, তাতে বোঝা যায় ওই একটা ব্যাপার ভালই জানে। বহেরুকে বলেন, যা, ওকে কিছু মিষ্টিটিষ্টি খাইয়ে আন, পেটটা খাল হয়ে আছে।

বহেরু মিষ্টি বা শৌখিন খাবারে বিশ্বাসী নয়। সে ভাতে বিশ্বাসী। চারবেলা সে নিজে ভাত মারে। ভাত ছাড়া সে কিছু ভাবতে পারে না। বহেরু হাসল, মিষ্টির কর্ম নয়। রামহরিদার হোটেল থেকে পেট-চুক্তিতে ভাত খাইয়ে আনি। অতটা রাস্তা যাবে।

তুই যা। আমি পরানের গদিতে আছি। বলে ব্রজগোপাল ঘড়িটা আবার কানে তোলেন।

রামহরি লোকটাকে দেখেই বেগড়বাঁই করতে থাকে। বলে, না বাপু, পেট-চুক্তিতে হবে না।

বহেরু ঝেঁকে বলে, হবে না মানে? তোমার এখানে তো সবাই তাই খায়!

সবাই না। লোক বুঝে আমাদের আলাদা আলাদা চুক্তি।

কেন?

রামহরি লোকটার দিকে আর এক-ঝলক চেয়ে বলে, এ বাপু গাঁ-ঘরের লোক, তার ওপর উপোসী, দেখেই মনে হয়। আমরা লোক চিনি। পাইস সিস্টেমে খেতে পারে, যত ভাত তত পয়সা।

বহেরু রেগে উঠতে গিয়ে হাসে। বলে, বর্ধমানের লোকের মুখে কী কথা! এ জেলা হচ্ছে লক্ষ্মীর বাথান, তুমি এখানের লোক হয়ে দু'মুঠো ভাতের মায়া করলে! তো খাওয়াও তোমার পাইস সিস্টেমে। কুছ পরোয়া নেহি। লোকটা গুণী বুঝলে রামহরিদা, দু'শো সুতোর কাপড় বুনতে পারে।

রামহরি তাতে কৌতূহল দেখায় না। বেল টিপে বেয়ারা ডাকে।

লোকটি কিন্তু খেতে পারল না। মরা পেট, তার ওপর তার খাওয়া নিয়ে এত গবেষণা শুনে লজ্জাও হয়ে থাকবে। লোকটা আঁচাতে উঠে গেল। সে-সময়ে পাণ্ডুয়ার ঘিয়ের কারবারি গন্ধবণিক হরিপদ চা খেতে ঢুকে বলে, বহেরু যে।

দু'-চারটে কথা হয়। হরিপদ বলে, আমাদের হাটে সেদিন এক বামন বীর এসেছিল, একুনে আড়াই ফুট উঁচু হবে। এত ছোট বামন বীর দেখিনি।

সঙ্গে সঙ্গে বহেরু কৌতূহল দেখায়, কতটুকু বললে? আড়াই ফুট! তাতে কতটা উঁচু হয়?

হরিপদ মেঝে থেকে বোধহয় ছ'-ইঞ্চি উঁচু একটা মাপ দেখায় হাত দিয়ে। বহেরু বলে, আরে বাপ্স! লোকটাকে পাওয়া যায়?

দুই হাটবারে এসেছিল। আবারও আসবে। যা ভিড় লেগে গেল দেখতে! দাড়িগোঁফ আছে বিশ্বাস হয় না না-দেখলে। তোমার ঠেঁয়ে নেবে নাকি?

বহেরু মাথা নাড়ল, নিলে হয়। সামনের হাটবারে যাবখন। কিম্ভূত মানুষের বড় শখ আমার। ঠিক মাপ বলছ? বামন বীর আবার একটু লম্বাটে হয়ে গেলে তেমন কিম্ভূত থাকে না।

হরিপদ চোখ বড় করে বলে, ঠিক মাপ মানে। শ্রীমন্তর দরজিঘরে গজফিতে দিয়ে মাপা হয়নি নাকি। তা বামন বীর নিয়ে কি পালবে-পুষবে?

ওই একরকম। বলে বহেরু, একটু হাসে।

তুমি বাপ নিজেই কিম্ভূত আছ।

তাঁতি লোকটা লুঙ্গিতে হাত-মুখ মুছে দাঁড়িয়ে আছে তখন থেকে। বহেরু উঠে পড়ল। খাবারের পয়সা দিতে দিতে মুখ ঘুরিয়ে হরিপদকে আবার মনে করিয়ে দিল, সামনের হাটবারে যাচ্ছি।

রাস্তায় এসে পিছু-পিছু আসা লোকটার দিকে এক বার ফিরে চেয়ে কী ভেবে বহেরু বলে, রাতেরবেলা আবার খেওখন। এ শালারা ব্যবসাদার, লোকের পেট বোঝে না।

লোকটা এতটুকুন হয়ে বলে, আমি বেশি খাই না। ঘুরে ঘুরে বেড়াই, খাওয়ার বেশি বায়নাক্কা থাকলে চলে?

বহেরু একটু শ্বাস ফেলে বলে, কিন্তু দু'শো সুতোর কাপড় বুনতে হবে—মনে থাকে যেন। আমার ইজ্জত রেখো।

পরানের গদিতে ব্রজগোপাল ক্যাশবাক্সের পিছনে বসে নিবিষ্টমনে তখনও ঘড়িটা ঝাঁকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে কানে তুলে শব্দটা শুনবার চেষ্টা করছেন। বহেরুকে দেখতে পেয়ে বললেন, ঘরে থাকতে যাও বা একটু-আধটু চলছিল, এ ব্যাটা খুলেটুলে একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। একটুও টকটক শব্দ শুনছি না। পার্টস-ফার্টস খুলে নিয়েছে নির্ঘাত।

বহেরু হাসে। তার বলতে ইচ্ছে করে, নতুন ঘড়ি আপনাকে একটা কিনে দেব, ওটা ফেলে দ্যান। তা দিতেও পারে বহেরু। এবার ফসলে ভাল টাকা এসেছে। ঘেরপুলিশকে মাঠে কিছু ফসল দিতে হয়েছে। তা হলেও সে আর কতটুকু? ব্রাহ্মণকে একটা ঘড়ি দান করতে আটকায় না। কিন্তু ব্রজগোপালকে সে-কথা বলতে সাহস পায় না বহেরু ডাকাত। ব্রজকর্তা কখনও কারও থেকে কিছু নেন না। ওই নষ্ট ঘড়িটা ধরে বসে থাকবেন, ঝাঁকাবেন, দুঃখ করবেন, কিন্তু অনাত্মীয় কারও কাছ থেকে নতুন একটা ঘড়ি নেবেন না হাত পেতে। এজন্যেই লোকটাকে বড় ভালবাসে বহেরু।

ব্রজগোপাল মুখ তুলে বলেন, সায়ংকালটা পার হয়ে গেল রে! আর কত দেরি করবি? আমার আহ্নিক হল না।

এই আসি। বলে বহেরু বেরিয়ে যায়।

দোকানপাট সেরে গাড়ি ধরবার জন্য স্টেশনে যখন তিনজন পৌঁছাল তখন চারধার অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ি ছাড়তেই দৌড়ঝাঁপ-করা শরীরে যে ঘাম জমেছিল তা শিরশিরিয়ে ওঠে শীতের বাতাসে। বুড়ো হাড়ে শীত বড় লাগে। ব্রজগোপাল কান মুখ ঢেকে বসেন। বহেরু একটু আবডালে গিয়ে পকেট থেকে ছোট কলকে আর গাঁজা বের করে। তাঁতি লোকটা ব্রজগোপালের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ে ভাতঘুমে।

বহেরু গাঁজাটা উপভোগ করে। গাড়িতে লোকজন আছে, দেখছে তাকে গাঁজা খেতে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। বহেরু সেটা জানে। নিজেকে তাই মাঝেমধ্যে রাজা-জমিদারের মতো লাগে তার। সুখ এরেই কয়। কোকা গত তিন বছর জেলে পচছে, আরও বছর-দুই ঘানি টানবে। ছেলেটাকে এক বার চোখের দেখা দেখে আসবে ইচ্ছে ছিল। হল না। মাঝলা সন্তান ভাল হয় না বড় একটা, আর বড় ছেলে হয় বোকা। কোকা তার মেজো ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই খারাপ, গোবিন্দপুর ইস্কুলের মাস্টাররা মেরে মেরে হয়রান। তারপর ধরল ডন-বৈঠক, আখড়ায় যেত। পাহাড় সমান শরীর নিয়ে বজ্জাতি করত। সেবার বেদরকারে খামোখা একটা ছোকরাকে কেটে ফেলল খালধারে। ছোকরাটা পার্টি করতে এসেছিল, একটু-আধটু বিষ ছড়িয়েছিল বটে, কিন্তু সে তেমন কিছু না। গাঁ-ঘরে শহুরে কথা বুঝবার মতো বুঝদার ক'জন? তবু তার সঙ্গে কোকার কী একটা শত্রুতা তৈরি হল। ছোকরাকে পুলিশও ভাল চোখে দেখত না, নইলে কোকাকে

আরও ঝোলাত কঠিন মামলায়। অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছে কোকা। খুনটা ঠিক প্রমাণ হয়নি। শুধু জানা গেছে যে, খুনের দলে ছিল। কিন্তু নিজের ছেলেটাকে ঠিক বুঝতে পারে না বহেরু। ও শালা অনেকটা তার নিজের মতোই। দাপ আছে। কিন্তু হিসেবি-বুদ্ধি নেই। ছেলেটাকে ভালও বাসে বহেরু, আবার একটু ভয়ও পায়। গত মাসে গিয়ে দেখা করেছে। শরীর মজবুত হয়েছে আরও, পাথরটাথর ভাঙে, হাঁতা ঘোরায়, ঘানি টানে। কিছু খারাপ নেই। বহেরুর তাই দুঃখ হয় না। তার আরও ছেলে আছে, এক-আধজন কম থাকলেও কিছু অভাব বোধহয় না।

বৈঁচীতে যখন নামল তারা তখন চারধারে বেশ রাত ঘনিয়ে এসেছে। দু'জন মুনিশ হাজির ছিল স্টেশনে, সঙ্গে বহেরুর দুই ছেলে। তাদের সঙ্গে আর একজন লোকও দাঁড়িয়ে আছে, মোটাসোটা চেহারা, কোটপ্যান্ট পরা। ব্রজগোপাল নামতেই লোকটা এগিয়ে এসে প্রণাম করে।

আলো-আঁধারে ঠিক চিনতে পারেননি ব্রজগোপাল। ঠাহর করে দেখেই চমকে ওঠেন। বুকের ভিতরটা ধক ধক করে। বহেরু ঝুঁকে দেখে বলে, রণেনবাবু না?

ব্রজগোপাল সর্বদাই দুঃসংবাদের অপেক্ষা করেন। বয়সটা ভাল না। ননীবালার বা তাঁর নিজের। গলাটা সাফ করে নিয়ে বলেন, তুমি?

রণেনের গলার স্বরটা ভারী মৃদু, বলে, দুপুরে এসেছি, তখন থেকে বসে আছি।

ও। তা খবর কী? খারাপ খবর নাকি?

না না। আপনার শরীর খারাপ খবর পেয়ে এলাম।

চিঠি দিয়ে আসতে পারতে, তা হলে আর যেতাম না বর্ধমান। আমিও দুপুরের দিকেই গেছি। কিছু বলবে?

কেমন আছেন এখন?

ভাল। একটু বুকে ব্যথা হয়। বোধহয় হার্টটার জন্যই। তা এই বয়সে আধিব্যাধি তো হবেই। চিন্তা কী?

কলকাতা শিগগির যাবেন-টাবেন না?

যাব-যাব তো রোজই করি। হচ্ছিল না। শরীরটার জন্যই। দু'-চারদিনের মধ্যেই যাব।

সেই জমিটার ব্যাপারে—

ব্রজগোপাল থমকে যান। পুরনো অভিমানটা বুকের ব্যথার মতোই ঘনিয়ে ওঠে। এরা কেবল দশটি হাজার টাকা চায়, তার জন্যই এত যাওয়া-আসা, এত খোঁজখবর!

ব্রজগোপাল গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন, জমিটা তোমরা কিনো। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই গিয়ে টাকা দিয়ে আসব।

বড়ছেলের চেহারায় ঘরগৃহস্থালির ছাপ পড়ে গেছে। কচি-ভাবটি আর নেই। বরাবরই ছেলেটা মা-বাপ ন্যাওটা, শান্ত প্রকৃতির, আর একটু বোকাসোকা ছিল। এখনও প্রায় তাই আছে, তবে বোধহয় এখন মা-বাপের জায়গায় বউয়ের ন্যাওটা হয়ে পড়েছে।

বহেরু ওদিকে মালপত্র ভাগাভাগি করে মুনিশদের মাথায় তুলে দিয়েছে। টর্চ আর লম্বা লাঠি হাতে ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে। ব্রজগোপাল আদেশ করলে রওনা হতে পারে সবাই। বহেরু দু'কদম এগিয়ে এসে বলে, ওদের রওনা করে দিই কর্তা। আপনি ছেলের সঙ্গে কথা বলুন, আমি মাস্টারবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলে আসি, তিনি পুরনো তেঁতুল চেয়ে রেখেছিলেন। একসঙ্গে যাব'খন।

ব্রজগোপাল ঘাড় নাড়েন। প্ল্যাটফর্মের ফাঁকা কংক্রিটের বেঞ্চে বসেন দু'জন। শিশির ভিজে সেঁতে আছে সিমেন্ট। হাওয়া দিচ্ছে, খুব শীত। রণেন বলে, আপনি বেশি দেরি করবেন না, ঠান্ডা পড়েছে, রওনা হয়ে পড়ুন।

তুমি একা বসে থাকবে? আর বোধহয় আধ ঘণ্টার মধ্যে গাড়ি নেই।

তাতে কী? ঘোরা-ফেরা করব, তা করতেই সময় কেটে যাবে।

আচ্ছা যাচ্ছি। ছুটির দিনে-টিনে এদিকে চলেও আসতে পারো তো, বহেরুর খামারের দক্ষিণে একটা চমৎকার জায়গা আছে, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এসে চড়ুইভাতি করে যেতে পারো।

রণেন একটু অবাক হয়। বাবা এ-সব কথা এতকাল বলেননি। বরং রণেন এলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। সে চুপ করে থাকে।

ব্রজগোপাল বলেন, কলকাতা শহর আর ইংরেজি স্কুলে কোনও শিক্ষা হয় না। বাচ্চাকাচ্চাদের নানা জায়গায় নিয়ে যেতে হয়, লোকের সঙ্গে মিশতে দিতে হয়, নইলে মাথায় গাদ জমে যায়।

রণেন বলে, সারা সপ্তাহ খেটেখুটে ওই একটা ছুটির দিনে আর বেরোতে ইচ্ছে করে না।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ছাড়েন। একটু চুপ থেকে বলেন, আমার ঘরের বিশ্রামের চেয়ে বাইরের শ্রমটাই ভাল লাগত বরাবর। তোমার মা অবশ্য পছন্দ করতেন না। কিন্তু বাইরেটাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

রণেন মাথা নাড়ে। কথা খুঁজে পায় না।

ব্রজগোপাল বলেন, আমার কথা বাদ দাও। আমার জীবনের দশা দেখে লোকে হাসে হয়তো। তবু বলি, মাঝেমধ্যে সংসার থেকে পালানো ভাল, নইলে সংসারের মাঝখানে সারাক্ষণ থাকলে কেবলই খিটিমিটি বাঁধে, সম্পর্কগুলো বিষ হয়ে যায়, একঘেয়েমি থেকে পরস্পরের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে।

কথাগুলো খুব গভীর থেকে উঠে আসছে মনে হয় রণেনের। এবং বাবার এই অতি সাধারণ কথাগুলো তার ভিতরে যেন ছ্যাঁকার মতো লাগে। আত্মসংবরণ রণেনের আসে না। সে হঠাৎ বলে ওঠে, সংসারে বড় অশান্তি।

ব্রজগোপাল মুখ ফিরিয়ে বলেন, কীরকম?

রণেন নিজেকে সংযত করে নেয়, বলে, ও-সব শুনে আপনার দরকার নেই।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বোঝেন। বলেন, কলকাতা শহরটাকে লক্ষ কোরো। চারদিকে মানুষকে লোভানী দেখাচ্ছে, স্বার্থপর করে তুলছে। ও হয়েছে মানুষ পচানোর জায়গা, সাধুকেও অসৎ করে ফেলে। সেই জন্যই আমি ভেবেছিলাম এদিকটায় বসত গড়ে তুলব—

রণেন গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তার খুব ইচ্ছে করে সংসারের বাতিল এই মানুষটির কাছে থেকে যেতে। কাল রাত থেকে এক প্রবল অস্থিরতা, ভয়ংকর এক পাপবোধ তাকে তাড়া করে ফিরছে। তার বলতে ইচ্ছে করে, তাই হোক বাবা, এইখানেই বসত গড়ে তুলি।

কিন্তু বলে না। বহেরুর বিশাল শরীর চরাচর ঢেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। হেসে সে বলে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার গাড়ি আছে।

রণেন মুখ তুলে বলে, বাবা, আপনি রওনা হয়ে পড়ুন। খুব ঠান্ডা।

ব্রজগোপাল গা করেন না, বলেন, তুমি একা বসে থাকবে। আমিও থাকি. দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা কেটে যাবে।

না, আপনি উঠুন। রণেন জোর করে।

অগত্যা ব্রজগোপাল ওঠেন।

ওরা প্লাটফর্মের গেট পর্যন্ত এগিয়ে যায়। ব্রজগোপাল সেখান থেকে পিছু ফিরে চান। কুয়াশা আর ঝুঁঝকো আঁধারে কিছু দেখতে পান না বোধহয় ভাল করে। তবু অন্ধকারে চেয়ে থাকেন।

বহেরু ডাক দিয়ে বলে, কর্তা, রিশকা নিয়ে নেব নাকি।

ব্রজগোপাল বলেন, না রে, ও-সব বাবুগিরির কী দরকার? চল্। হেঁটে মেরে দিই।

দীর্ঘ রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে বহেরু বলে, কর্তা, এক বামন বীরের খবর পেয়েছি। আর একটা লোক আছে গুসকরায়, তার দু'হাতে চোদ্দোটি আঙুল। ছ'আঙুলে অনেকে আছে, ও সাত আঙুলে।

ছ'নম্বর আঙুল থেকে নাকি আবার একটা আঙুল বেরিয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার। এনে ফেলব দু'জনকে বহেরু গাঁয়ে।

অন্য সময় হলে ব্রজগোপাল তাকে তার বাতিকের জন্য ধমকাতেন, এখন শুধু অন্যমনে একটা 'হুঁ' দিলেন। তিনি বহেরুর কথা শুনতেই পাননি। ছেলেটা হঠাৎ ওই কথা বলল কেন—সংসারে বড় অশান্তি।

এক ফাঁকা প্লাটফর্মের ঠান্ডা বেঞ্চটায় বসে আছে রণেন। সিগারেট খায়। মনটা বড় অস্থির। কারণ রাতে সে বীণাকে মেরেছে খুব। এই প্রথম সে এই কাজ করল। হাত দু'খানা আবছায়ায় চোখের সামনে তুলে ধরে সে। দেখে। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা। মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলেছে! হায়! আত্মগ্লানিতে ভিতরটা ভরে ওঠে। তার বাবা ব্রজগোপাল এত ঝগড়া সত্ত্বেও কোনও দিন মা'র গায়ে হাত দেননি। এখনও ভিড়ের ট্রামে বাসে মেয়েছেলেকে সিট ছেড়ে দেন বাবা। মেয়েমানুষকে এখনও সম্মান করতে বাবা জানেন। সে তবে এ কী করল?

হলদে আলোয় উদ্ভাসিত কুয়াশার ভিতর দিয়ে ট্রেনটা আসছে। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা। রণেন হঠাৎ সম্মোহিতের মতো উঠে দাঁড়ায়, তাই তো! এই গ্লানি থেকে এখনই মুক্তি পাওয়া যেতে পারে! সে উঠে ধীর পায়ে প্লাটফর্মের ধারটায় চলে আসে। ঝুঁকে দাঁড়ায়। গাড়িটা আসছে। সব স্মৃতি ঝেড়ে ফেলে লাইনের ওপর চোখ বুজে লাফিয়ে পড়া।

রণেন ঘোর-লাগা চোখে গাড়িটা দেখে। লাফানোর জন্য পা তোলে।

॥ বারো ॥

প্লাটফর্মের লোকজন দেখতে পায়, রেলগাড়ির আলোয় একটা মোটামতো বোকা লোক লাইনের ওপর ঝুঁকে বোধহয় পানের পিক ফেলতে, কি নাক ঝাড়তে, কি থুথু ফেলতে দাঁড়িয়েছে। তারা চেঁচিয়ে ওঠে, গাড়ি আসছে, গাড়ি আসছে, ও মশাই...

সময় মতোই রণেন পিছিয়ে দাঁড়ায়। ভারী বিরক্ত হয়। পৃথিবীতে এত লোক বেড়ে গেছে যে কারও চোখের আড়ালে কিছু করার উপায় নেই। তার ধারণা হল, লোকগুলো না ডাকলে সে ঠিকই অন্তিম লাফটা দিতে পারত।

গাড়ি এলে রণেন উঠে পড়ে। বেশ ভিড়। সপ্তাহান্তে যারা মফস্‌সলের বাড়িতে গিয়েছিল কিংবা বেড়াতে, তারা সোমবার থেকে ফের কলকাতার জোয়াল ঠেলতে ফিরছে। গাড়ির মেঝেয় থিক থিক করছে আধবুড়ি আর কচিকাঁচা ননএস্টিটি সব ভারতীয়। বোঁচকায়, পোঁটলায়, কোমরে, গেঁজেয় বর্ধমানের সস্তা চাল রয়েছে, কলকাতার দামি বাজারে ছাড়বে। তাদের কাঁউমাউ চিৎকারে কামরা গরম। তিনজন বসতে পারে এমন সিটে একটা ঠেলাঠেলি করে রণেন বসে পড়ে। মোটা শরীর, ঠিক জুত পায় না বসে। কিন্তু তিনজনের জায়গায় চারজনের বসার নিয়ম আছে বলে কেউ আপত্তিও করে না। ঢেউ খেলানো কাঠের সিট। দুটো সিটের জোড়ের অংশটা উঁচু হয়ে আছে, পাছায় ফুটছে। তবু সেই অবস্থাতেও হা-ক্লান্ত রণেন বসে বসে ঢুলতে থাকে। নয়নতারা আজ বড় যত্ন করেছে। কতকাল পরে দেখা। বামুনের পাতে ওরা রেঁধে ভাত দেয় না বটে, কিন্তু কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ানো, দেখাশুনো করা—সে বড় কম নাকি!

নয়নতারা তার মুখ-চোখ দেখে, আর হাবভাব লক্ষ করে প্রথমেই বলে দিয়েছিল—বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন তো!

নয়নতারার সঙ্গে যখন সে-সব হয়েছিল তখন কোথায় ছিল বীণা! বহুকালের কথা সব। বহেরুর

খামারবাড়িতে প্রেমট্রেম বলতে গায়ে-হাত। সে-সব না হলে সরু চালের ভাত যেমন পানসে মতো লাগে চাষার মুখে তেমনি হয়। হয়েওছিল তাই, তা বলে কি নয়নতারা সে-সব স্মৃতি বুকে করে বসে আছে? মোটেই না। ভুলে গেছে কবে। রণেনকে দেখে অবাক, খুশি সবই হয়েছিল, কিন্তু কোনও গুপ্ত স্মৃতির পাপবোধ ছিল না। পুকুরে আজ বেড়া-জাল ফেলেছে বহেরুর লোকজন, মাছগুলো নাড়াচাড়া পড়বে। জাল তুলে হাজার মাছ তুলে আবার জাল ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল, নয়নতারা হাঁটুভর জলে নেমে গিয়ে বাছাই একটা রুই তুলে আনল প্রায় দু' সেরি। উঠে এসে বলল, এর পুরোটা আজ না খাইয়ে ছাড়ব না।

খুব খাইয়েছে। ও-বেলা মুড়োসুদ্ধু বারোখানা টুকরো গেছে পেটে। এ-বেলাও সাঁঝ লাগার পরই আবার গরম ভাত, মাছের ঝাল আর দুধ খেতে হয়েছে। ঘুম তো আসবেই। ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্নও আসে। নয়নতারার। বীণার কাছে যেমন বাঁধা-পড়া জীবন, বহেরুর খামারে নয়নতারার কাছে তেমন নয়। কীরকম হাওয়া-বাতাস, খোলামেলার মতো সম্পর্ক গড়ে তুলতে জেনেছিল নয়নতারা! সেই জন্যই কি ওর স্বামীটা ওকে নিতে পারল না শেষ পর্যন্ত? তা বলে নয়নতারাকে কেউ আবার যেন দুঃখী বলে না ভাবে। ও সব দুঃখ-টুঃখ তার আসে না। আজ দুপুরে মাথার কাছে বসে সুপুরি কাটছিল। জাঁতিটা ভারী শৌখিন। রুপোর মতো। রণেন হাত বাড়িয়ে জাঁতিটা টেনে নিয়ে বলল, কী জিনিস দিয়ে তৈরি বলো তো! এমন দেখিনি।

নয়নতারার একটা হাসি-রোগ আছে। মুখে আঁচল চেপে বলল, এখনও মানুষটার দোষ যায়নি দেখছি?

শোওয়া অবস্থা থেকে ঘাড় তুলে রণেন বলে, কী দোষ দেখলে?

বয়সের।

যাঃ! রণেন বলল।

তবে জাঁতির নাম করে হাত ছুঁলেন যে বড়!

রণেন বলে, ওকে ছোঁয়া বলে না।

খাবলকেও ছোঁয়া বলে না তো বাপু, ছোঁয়ার আবার আলাদা রকম আছে নাকি!

মনে পাপ না থাকলেই হল। রণেন বলে।

নয়নতারা ছেনাল সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে, মনের পাপের কথা বলছেন! সে বড় জটিল কথা!

জটিল কেন হবে?

নয়নতারা মাথা নেড়ে বলে, একটা পুরুষ আর একটা মেয়েমানুষ একঠাঁই হলেই মনে পাপ জাগে। এ প্রকৃতির নিয়ম।

ঘরটা ছিল নয়নতারার। পাকা ঘর, ওপরে টিন। দক্ষিণের জানালা দিয়ে দক্ষিণায়নের সূর্যরশ্মি ঠ্যাং বাড়িয়েছে। কেউ নয়নতারাকে কিছু বলতে সাহস পায় না, তাই তার বিছানাতেই এলিয়ে পড়েছিল রণেন। অবশ্য বাচ্চা একটা ঝিউড়ি মেয়েকে কাছে রেখেছিল সে, নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়ার জন্য। সে মেয়েটা খানিক কড়ি খেলে মেঝেয় পড়ে ঘুমাচ্ছে। বালিশের অড়ে রোদের গন্ধ, নরম। লেপখানা যেন-বা পালকের তৈরি। তার ওপর হাতের কাছে নয়ন নিজে। এমনতরো বিলাস জীবনে কমই ভোগ করেছে রণেন। সেই চিন্তাহীন আরামের মধ্যে হঠাৎ একটা দার্শনিকতা ঢুকিয়ে দিল নয়নতারা। রণেন নাড়া খেয়ে বলে, পাপ জাগে? সে কীরকম?

এতক্ষণ আপনি-আজ্ঞে করছিল, হঠাৎ গলা নামিয়ে নয়নতারা বলে, বলো তো, একটা বয়সের ছেলে আর-একটা বয়সের মেয়ের দিকে যখন তাকায় তখনই সব সময়ে একটা কিছু পাপ ইচ্ছে জাগে কি না? যেখানেই হোক, যখনই হোক, চেনা বা অচেনা যা-ই হোক, হয় কি না ও-রকম? আমার তো মনে হয়, না হয়ে যায় না।

ভারী বিস্ময় বোধ করে রণেন শুয়ে থাকে। ভাবে। এবং আশ্চর্য হয়ে বোধ করে, ঠিক তাই। চোখে চোখে যৌনতার বীজ ছড়ায় বটে। নিজেকে দিয়েই সে বুঝতে পারে। যখন ভিড়ের মধ্যে, যখনই নিঃসঙ্গতায়, যখনই কখনও বয়সের মেয়ের দিকে চেয়েছে তখনই মনে হয়নি কি—ওই ওটা হচ্ছে মেয়েছেলে! হাঁ হাঁ বাবা, মেয়েছেলে। আর মেয়েছেলের মানে কী? মানে তো একটাই—পুরুষের কাছে মেয়েছেলের যা মানে হতে পারে। এই রকমই যৌনতার বীজাণুযুক্ত চোখ বটে আমাদের। এইজন্যই কি রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মাতৃভাব হৃদয়ে না এলে মেয়েদের ছুঁতে নেই। এমনকী মুখ দর্শন না করাই ভাল!

রণেন লজ্জা-টজ্জা পেল না, সে-বয়স পেরিয়ে এসেছে। তা ছাড়া নয়নতারার কাছে লজ্জাই বা কী? বলল, মাইরি, কেবল জাঁতিটার দিকেই চোখ ছিল আমার!

নয়নতারা বিছানায় পড়ে-থাকা জাঁতিটা তুলে তার হাতে ফের ধরিয়ে দিয়ে বলল, তা হলে জাঁতিটাই দেখো। ভাল জিনিস। মুরগিহাটা থেকে বাবা কিনে এনেছিল, স্টেনলেস ইস্টিলের। অনেক দাম।

তখন জাঁতিটা ফেলে নয়নতারার হাত ধরতে কোনও বাধা হল না আর। তখন মনে মনে রণেন বলল, মেয়েছেলে, হাঁ হাঁ বাবা মেয়েছেলে! মেয়েছেলের মানে তো একটাই হয় পুরুষের কাছে।

চোখে চোখ বেখে নয়নতারা বলে, ঠিক বলিনি?

ঠিকই বলেছ। ভেবেটেবে দেখলাম, জীবনের কোনও মানেই হয় না। এক-আধটা যা মানে করা যায় তার একটা হচ্ছে টাকা, অন্যটা মেয়েছেলে।

নয়নতারা ফের আপনি-আজ্ঞেয় ফিরে গেল। বলল, আমি মোটেই সে-কথা বলিনি আপনাকে।

বলোনি?

না, কেন বলব? টাকা আর মেয়েছেলে ছাড়া জীবনে আর-কিছু থাকে না নাকি? সে আবার কীরকম? কত কিছু আছে!

আমি তো খুঁজে পাই না।

নয়নতারা হাসল, বলল, আপনি আচ্ছা একটা লোক। অনেক ভেবেচিন্তে একটা কঠিন কথা বের করেছিলাম মাথা থেকে, সেটা জল করে দিলেন। জটিল কথা অত সহজে বোঝা যায় না।

নয়নতারারও বয়স হল, রণেনের চেয়ে বড়জোর এক-দু'বছরের ছোট হতে পারে। বহেরুর প্রথম পক্ষের মেয়ে। গাঁ-ঘরের তুলনায় ফরসা, মুখটায় সর্বদা একটা হাসি-মাখানো সহৃদয় ভাব, সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, রাগ নেই। সেই ব্যবহারটাই আবার প্রেম-ট্রেম বলে ভুল করে লোকে। চোখ দু'খানা বড়, নাকটাক, ঠোঁটের কায়দা সব মিলিয়ে এক রকম চটক আছে। বুদ্ধি বোধহয় বেশি রাখে না, হাসিখুশি মেয়েদের বুদ্ধি কম হবেই, কিন্তু এক-আধটা কথা বলে বড় মারাত্মক। যেমন এই পাপ-ইচ্ছের কথাটা।

বিকেল পর্যন্ত নয়নতারার হাতখানা মাঝে মাঝে ধরে রইল রণেন। হাতটা ঘেমে গেল, গলে গেল, কিন্তু সহৃদয়া নয়নতারা তা ফেরত নিল না। ভাগ্যিস শীতের বিকেল কিছু তাড়াতাড়ি আসে! অবশ্য রণেন হাতের বেশি এগোবার উৎসাহও পাচ্ছিল না। মেয়েমানুষ কথাটা তার মধ্যে মাঝে মাঝে বজ্রাঘাত করছিল তখন। মেয়েমানুষের গায়ে কাল রাতে জীবনে প্রথম হাত তুলেছিল রণেন। এ পাপ কি স্খালন হওয়ার?

নয়নতারা মুখের ওপর একটু ঝুঁকে বলে, বাবা একটা মানুষের চিড়িয়াখানা বানাচ্ছে, শুনেছেন?

সে কীরকম? বিষণ্ণ রণেন জিজ্ঞেস করে।

সে চিড়িয়াখানায় থাকবে অদ্ভুত সব মানুষ। খুব বেঁটে, খুব লম্বা, খুব সুন্দর, খুব কুচ্ছিত, হিজড়েও থাকবে। আরও থাকবে নানা রকম। সাহেব থেকে সাঁওতাল। যত আজব মানুষ হতে পারে সব এনে জড়ো করবে। যদি বলেন তো বাবাকে আপনার কথা বলে দিই।

কেন?

বাবা ঠিক চিড়িয়াখানায় ভরতি করে নেবে আপনাকে।

হাতটা তখন ছেড়ে দিল রণেন।

নয়নতারা তখন দুঃখের গলায় বলে, আপনি পালটে গেছেন।

একটু মোটা হয়ে গেছি বলে বলছ?

তাই হবে বোধহয়। একটা সময়ে আপনি খুব ভিতু ছিলেন, মেয়েমানুষকে বড় ভয় ছিল আপনার।

রণেন সনিশ্বাসে বলে, এখনও আছে।

নয়নতারা হাসে, বলে, সে মেয়েমানুষের ভয় নয়, এ-বয়সের পুরুষ ডরায় কেবল বউকে, মেয়েমানুষকে নয়।

আবার চমকায় রণেন। ঠিক কথা, হক কথা। বলে, তুমি বেড়ে কথা বলছ আজ।

নয়নতারা জাঁতিটা ফের তুলে নিয়ে বলল, তখন আমাকে বড় ভয় ছিল আপনার, আজ আর নেই।

সেটা ভাল, না খারাপ?

খারাপ।

কেন?

ভয়ডর থাকাই ভাল।

বউ কি মেয়েমানুষ নয়? তাকে তো ডরাই ঠিকই।

দূর! বউ বিয়ের পর আর মেয়েমানুষ থাকে নাকি? পাশবালিশ হয়ে যায়।

কথাটা কত দূর অশ্লীল ও সত্য তা চোখ কপালে তুলে ভাবে রণেন। তারপর বলে, শুধু পাশবালিশ?

সে-কথার উত্তরে নয়নতারা বলে, তা নয় অবশ্য, রাতের পাশবালিশ আর দিনের দারোগা-পুলিশ।

তারপর সে কী হাসি হেসেছিল সে। সারাটা দিনে কাল রাতের পাপবোধ অনেকটাই ধুয়ে মুছে দিয়েছিল। আংটিটা চাইবে বলে ভেবে রেখেছিল রণেন, তা আর চাইতে ভুলে গেল।

নয়নতারা বলে, আমাদেরও একটু একটু ভয় খাওয়া ভাল।

কেন?

স্বামী নেয় না বলে আমাকে সবাই কুমড়োলতা ভাবে, মাচান দিতে চায়। সে-সব লোক আমার ভাল লাগে না। আমি লতানে গাছ নই, লতার মতো দেখতে যে জীব তাই। বিষ-দাঁত আছে।

তোমার মনে পাপ। রণেন চোখ বুজে বলেছিল।

হবে। যাই, ঠাকুরদা ডাকছে।

কে ডাকছে বললে? রণেন চোখ খুলে জিজ্ঞেস করে।

ঠাকুরদা, দিগম্বর। খোল-কপালে লোক।

রণেন অবাক হয়ে বলে, খোল-কপালে লোক কথাটার মানে কী?

নয়নতারা তার বিশুদ্ধ দাঁতে হেসে বলে, কোন যৌবন বয়সে ঠাকুরদার কপালে কেবল জুটেছিল ওই খোলটা, আর কিছু নাই। লোকে বলে গণেশের কলা-বউ যেমন, ঠাকুরদার খোলও তেমনি।

বুঝলাম, তা ডাকল কোথায়, শুনতে পেলাম না তো!

খোলের আওয়াজ হচ্ছে, শুনছেন?

রণেন কান পেতে শোনে। আগেও শুনেছে, দিগম্বরের খোল কথা কয়। এখনও কইছে।

নয়নতারা বলে, খিদের বোল তুলছে ঠাকুরদা। চিঁড়ে আন, চিঁড়ে আন, দে দই, দে দই। আমরা

সব বুঝতে পারি। এই বাজনার জন্যই বাবা তার খুড়োকে আটকে রেখেছে এতকাল।

বহেরু আবার এ-সবেরও সমঝদার নাকি?

তা নয়। মানুষের চিড়িয়াখানার কথা বলছিলাম যে আপনাকে? তাতে সব রকম মানুষ লাগে যে!

নয়নতারা উঠে গেলে ভারী একা লেগেছিল রণেনের। উঠে ঘুরে ঘুরে বহেরুর খামারবাড়ি দেখছিল। দেখে দিগম্বর পুকুরের ঘাটলায় বসে আছে, হাতে বড় কাঁসার গ্লাসে চা, চায়ের ওপর মুড়ির স্তূপ ঢেলে দিয়েছে, আর সেই মুড়ির তলা দিয়ে সুড়ুক সুড়ুক টেনে দিচ্ছে চা। চায়ে সিঁটনো মুড়ি চিবোচ্ছে আরামে। চারদিকের দুনিয়া সম্পর্কে কোনও বোধই নেই।

একা একা ঘুরেছিল রণেন। বহেরুর খামার থেকে কয়েক কদম তফাতে তাদের জন্য বাস্তুজমি কিনে রেখেছিলেন বাবা। সেই জমি খুব সাবধানে ও যত্নে তারকাঁটা দিয়ে ঘিরেছে, জায়গা মতো আম-কাঁঠাল-নিম-নারকোল গাছ লাগিয়ে রেখেছে—এ-সব গাছ বাড়তে সময় নেয়। তাই আগেভাগে লাগিয়ে রেখেছেন বাবা। যখন ছেলেরা বসত করতে আসবে, তখন যেন ফসল দেয়। তারকাঁটার গায়ে গায়ে অমরি গাছ—এ-গাছ জীবাণু মারে। সামনের দিকে শীতের গাঁদা ফুটে আছে। একটা কুয়ো কাটা ছিল। এখনও সেটা মজে যায়নি। রণেন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কুয়োর ধারে দাঁড়াল। বড় কুয়ো। গভীরে কিছু জল আছে। বোধহয় জলটা ব্যবহার হয়, এখনও আবর্জনা পড়েনি। ঝুঁকে দেখতে দেখতে মনে হল, ভিতরের জলে মাছ ফুট কাটছে। শীতের গভীর কুয়োয় রণেনের ছায়া, তার পিছনের ধূসর শীতের আকাশের ছায়া। রণেনের তখন এক বার বজ্রাঘাতের মতো 'মেয়েমানুষ' কথাটা মনে হয়েছিল। আর লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল কুয়োর জলে। বড় শীত, তাই পারেনি।

কিন্তু এ-কথা ঠিক, আজ বার-বারই তার মরতে ইচ্ছে হয়েছে। মেয়েমানুষের সম্মান যে রাখতে জানে না, তার মরাই উচিত। কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে পিছু ফিরে ভূত দেখতে পায়। খুব লম্বা অপ্রাকৃত রকমের একটা লোক বেড়া ডিঙিয়ে জমির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে বাঁশের একটা লাঠি, তাতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে না দাঁড়ালে আরও লম্বা ঠেকত। তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মুখে কথা নেই। তবে চোখের ভাষায় কথা কিছু ছিলই। চমকে উঠেও সামলে গেল রণেন। কারণ, বহেরু যে মানুষের চিড়িয়াখানা বানাচ্ছে এ-কথাটা ভোলেনি সে। এই অস্বাভাবিক লম্বা লোকটা বহেরুর সেই চিড়িয়াখানারই একজন কেউ হবে। পিটুইটারি গ্লান্ডের দোষেই এ-রকমটা হয়ে থাকবে, লম্বায় অন্তত সাত ফুটের কাছাকাছি। চেহারা দেখে মনে হয় সাঁওতাল। তবে ভারী অসুস্থ, জীর্ণ চেহারা, শরীরের দৈর্ঘ্যকে দাঁড় করিয়ে রাখার ক্ষমতা নেই। লোকটা দ্রুত এসেছিল বোধহয়, হাঁফাচ্ছে। রণেন লক্ষ করে, কাঁটাতারের ওপাশে বহেরুর জ্ঞাতিগুষ্টির রাজ্যের ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে ঢিল, চোখে-মুখে শয়তানি মাখানো। লোকটাকে তাড়া করেছিল বোধহয়, রণেনকে দেখে একটু থমকে গেছে:

লোকটা হাত তুলে ডাকে, বাবু।

রণেন একটু এগোতেই লোকটা হাত তুলে ছেলেগুলোকে দেখিয়ে বলে, মারে।

রণেন ছেলেগুলোকে একটু তাড়া করে, যা, যা।

ছেলেগুলো অল্প একটু দূরে সরে যায়। লম্বা লোকটা ঘাসে বসে হাঁফায়। সভয়ে চেয়ে থাকে ছেলেগুলোর দিকে। রণেন কাঁটাতারের বেড়া ফাঁক করে আবার সাবধানে বেরিয়ে আসে। একটু দূরে এসেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পায়, ছেলেগুলো কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ঘেঁষে গিয়ে লোকটার দিকে ঢিল ছুড়ছে। লোকটা কুয়োর আড়ালে সরে গেল। তারপর সেও ঢিল কুড়িয়ে উলটে ছুড়তে থাকে। লোকটাকে ছেলেগুলোর হাত থেকে বাঁচানোর কোনও ইচ্ছেই বোধ করে না সে। পৃথিবীতে যে যার মতো বেঁচে থাকার লড়াই করুক। তার কী?

এখন রেলগাড়ির সিটের জোড়ের ওপর অস্বস্তির সঙ্গে বসে ঢুলতে ঢুলতে পুরো ব্যাপারটাকেই অবাস্তব মনে হতে থাকে তার। দেখে লম্বা লোকটা কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে দীর্ঘ হাতে বিষ মেশাচ্ছে তাদের পানীয় জলে। চিৎকার করে উঠতে গিয়ে সে জেগে যায়। মেশায় যদি বিষ, মেশাগগে। তারা কোনওকালে ওই জল খেতে আসবে না তো। তারা কলকাতাতেই পার্মানেন্ট হয়ে গেল। টালিগঞ্জের বাড়িটা যদি হয়। ভারী ফাঁদে পড়ে গেছে রণেন। সিমেন্ট আর লোহালক্কড়ের জন্য আগাম দিয়েছে। বাড়িটা তাকেই করতে হবে। জমি হবে হয় মা'র নামে, নয়তো দু'ভাইয়ের নামে। বীণার কঠিন মুখখানা মনে পড়ে যায় তৎক্ষণাৎ। বজ্রাঘাত হয় বুকে। কাল রাতে সে বীণাকে মেরেছে। একে মেয়েমানুষ, তার ওপর রোগা শরীর। কী করে বাসায় ফিরে সে বীণার মুখোমুখি হবে। এক বিছানায় শোবেই বা কী করে, ফের কথাটথাই বা বলা যাবে কি কোনও দিন? হয়তো ফিরে গিয়ে দেখবে বীণা তার বনগাঁয়ের বাপের বাড়িতেই চলে গেছে। আর হয়তো আসবে না।...না যদি আসে তবে কি খুব মন্দ হয়? যদি চিরকালের মতো বীণা ছেড়ে চলে যায় তবে কি খুব খারাপ হবে রণেনের? হবে একটু অসুবিধে, বিয়ের পরের অভ্যেসগুলো যাবে কোথায়? তবু বোধহয় মা-ভাই নিয়ে এ-রকম ব্যক্তিত্বহীন আনন্দের জীবনও আবার ফিরে পাবে রণেন। তখন মাঝে মাঝে নয়নতারার কাছে আসবে। আনাড়ি পুরুষের মতো।...লম্বা লোকটার কথা আবার ভাবে রণেন...নয়নতারার কথা...বীণার কথা...বাবার কথা...সব মিলেমিশে একটা তালগোল স্বপ্ন হয়ে যেতে থাকে।

কেষ্টনগরের দিককার দুটো লোক বসেছে সামনের সিটে। ও-দিকের লোক কথার ওস্তাদ। সারাক্ষণ রঙ্গরস করছিল। গাড়িটা হঠাৎ বেমক্কা থেমে যেতে তাদের একজন অন্যজনকে ঠিক বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলার কথা নকল করে বলে, গাড়িটা কোথায় থামা করাল রে?

অন্যজন বলে, এ হচ্ছে হালুয়া ইস্টিশান।

সে কীরকম?

হাওড়াও নয়, লিলুয়াও নয়, মাঝামাঝি। হাওড়ার হা আর লিলুয়ার লুয়া নিলে যা হয়। এ হচ্ছে বাবা কার শেড। রাজধানী এক্সপ্রেসও হাওড়ায় ঢোকার আগে এখানে থামে। হালুয়া ইস্টিশানে।

রণেন চমকে ওঠে। কার শেড! তার মানে হাওড়া এসে গেল প্রায়। একটু পরে সে বাসায় পৌঁছবে।

খুব ভয়ে রণেন বাসায় ঢুকল। ভারী লজ্জা করছিল তার। মা দরজা খুলে সরে যায়।

ছেলেমেয়েরা তাদের ঠাকুমার ঘরে হল্লাচিল্লা করছে। তার ঘর অন্ধকার। বীণা ঘরেই বিছানায় শুয়ে আছে, আন্দাজ করে সে। বাতি না জ্বেলে জামা-কাপড় ছাড়ে নিঃশব্দে। লুঙ্গিটা আলনার অভ্যস্ত জায়গা থেকে টেনে পরে নেয়। খবরের কাগজটা নিয়ে বসে বাইরের ঘরের সোফায়। কাগজ ভরা যুদ্ধ লাগতে পারে, এই আশঙ্কা, দুর্দিনের সংকেত। সে-সব পড়ে না রণেন। চোখ চেয়ে বসে থাকে।

সোমেন ফেরেনি। বলে গেছে, ফিরতে রাত হবে। রাতে খাবে না। বীণার আর বাচ্চাদের খাওয়া হয়ে গেছে। রণেন খেয়ে এসেছে। ননীবালা খাননি। ঘটনাটা কত দূর গুরুতর হয়েছে তা এখনও বুঝতে পারে না রণেন, ছেলেমেয়েরা কাছে ঘেঁষছে না, মা কথাটথা বলছে না। ভারী বিষণ্ণ বোধ করে সে।

বড় ছেলেমেয়ে দুটো ঠাকুমার কাছে শোয় এখনও, তাদের মা হাসপাতালে যাবার পর থেকেই। শুধু টুবাই শোয় বীণার কাছে। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ার পরও রণেন অনেকক্ষণ বসে থাকে বাইরের ঘরে। তারপর এক সময়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় নিয়ে উঠে আসে। বিছানায় মশারি তুলে ভিতরে ঢুকে শুয়ে থাকে চুপচাপ। বীণার গায়ে লেপ, লেপের অর্ধাংশ রণেনের প্রাপ্য। কিন্তু লেপটা টেনে নিতে তার সাহস হয় না। বিনা লেপে শুয়ে থাকে সে। বীণার গা থেকে একটা সুন্দর পাউডার বা সেন্টের গন্ধ আসে।

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে বীণা নড়েচড়ে ওঠে। পাশও ফেরে বুঝি। এবং হঠাৎ লেপটা তুলে তার গা ঢেকে দেয় বীণা। রণেনের বুকখানা মুচড়ে ওঠে হঠাৎ। কান্না আসে চোখ ভরে। বুক ভরে। সে পাশ ফেরে।

বীণা।

উত্তর নেই।

ক্ষমা করো। রণেন বলে।

তারপর আঁকড়ে ধরে বীণাকে। প্রথমটায় শরীর একটু কঠিন করে রাখে বীণা। তারপর কেঁপে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। শরীরটা হঠাৎ নরম হয়ে যায়।

॥ তেরো ॥

সোমেন ভোরের গাড়িটা ধরতে পারেনি। অনেক রাত পর্যন্ত কাল বউদিকে নিয়ে ঝামেলা গেছে। তারপর শুয়ে শুয়ে গভীর রাত অবধি জেগে থেকেছে সে। টের পেয়েছে মা'ও ঘুমোয়নি। বাইরের ঘরে দাদা বসে মশা তাড়াচ্ছে। সে এক অসহনীয় অবস্থা। দাদা যে কেন বউদিকে মারল, কী করেই বা মারতে পারল, তা অনেক রাত অবধি ভেবে ভেবে তার মাথা গরম হয়েছে।

এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে মা এক সময়ে বলল, তোর দাদার কাছে এক বার যা না।

কেন? ক্লান্ত সোমেন জিজ্ঞেস করেছে।

কী করছে দেখে আয়। ঝোঁকের মাথায় কী একটা করে ফেলল, এখন যদি আবার লজ্জায় ঘেন্নায় বেরিয়ে যায়—

যাকগে। সোমেন রেগে উত্তর দিয়েছে, যাওয়াই উচিত। ভদ্রলোকের মতো দেখাবে লোকের কাছে, আর ছোটলোকের মতো সব কাণ্ড করবে।

মা নিশ্বাস ফেলে বলল, মানুষ রেগে গেলে কত অনর্থ করে। তখন কি আর মানুষ মানুষের মতো থাকে। বউমার বড্ড মুখ হয়েছে আজকাল, বিকেলে বাড়িতে পা দেওয়া থেকে ইস্তক কী না বলছে!

সোমেন সিগারেট ধরিয়ে বলল, তোমাদের জ্বালায় আমাকে একদিন বাড়ি ছাড়তে হবে।

মা চুপ করে ছিল। সোমেন বাথরুম যাওয়ার নাম করে উঠে গিয়ে দাদাকে অবশ্য দেখেও এসেছে দু'বার। সোফার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, মাতালের মতো। ডাকেনি সোমেন। থাক পড়ে। মশা কামড়ে খাক। বউদির অবশ্য তেমন কিছু লাগেনি। দুর্বল শরীর বলে আর ঘটনার বিস্ময়করতায় বোধহয় কেমন হয়ে গিয়েছিল। গালে অবশ্য আঙুলের দাগ দগদগে হয়ে ফুটে ছিল, কয়েক গুচ্ছি চুল ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু দাদার ওপর এই প্রথম একটা তীব্র ঘৃণা মেশানো রাগ অনুভবও করে সোমেন। হতে পারে, দাদাকে দিনের পর দিন গোপনে উত্তেজিত ও বিরক্ত করেছে বউদি, তবু দাদা কেন অমানুষ হয়ে যাবে!

এই সব কারণেই সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল। বেরোবার সময়ে দেখে সদর দরজা ভেজানো রয়েছে, দাদা নেই। বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল তার। দাদা বড় ভাবপ্রবণ ছেলে, রাগীও। অনুতাপে লজ্জায় যদি দুম করে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ভালমন্দ কিছু একটা করে ফেলে?

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুরের গাড়ি ছাড়তে তখন আর কুড়ি মিনিট বাকি। ঢাকুরিয়া স্টেশনে এসে তাকে অপেক্ষা করতে হল কিছুক্ষণ শিয়ালদার গাড়ির জন্য। দেরি হয়ে গেল। কথা ছিল ভোরের গাড়িতে হাঁড়ি-কড়াই নিয়ে সে আর শ্যামল গিয়ে গঙ্গার ধারে একটা পিকনিকের জায়গা খুঁজে বের করবে, তারপর স্টেশনে এসে ন'টার গাড়ি দেখবে। পূর্বা, অপালা,

আর সব দূরের বন্ধুরা ওই গাড়িতে আসবে, তাদের নিয়ে যাবে জায়গা মতো। সেটা হল না। শ্যামল নিশ্চয়ই গাল দিচ্ছে সোমেনকে।

কুয়াশা আর শীতের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন তাকে কখন যে ব্যারাকপুরে এনে ফেলল তা অন্যমনস্ক সোমেন টেরও পেল না। নেমে ঘড়ি দেখল, ন'টা বাজতে আর অল্পই দেরি। মন ভাল ছিল না বলে তার খেয়াল হয়নি যে এই গাড়িটাতেই ওরাও আসতে পারে। সে আপন মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে স্টেশনের গেট পেরিয়ে বাইরে পা দিতে যাচ্ছে, তখন পেছন থেকে শুনতে পেল, ও মা! সোমেন, আমাদের নিতে এসে ফিরে যাচ্ছিস যে বড়?

সোমেনের তখন খেয়াল হয়। ফিরে পূর্বাকে দেখে একটু হাসে।

পূর্বা চোখ বড় বড় করে তাকে দেখে, বলে, কোথায় চলে যাচ্ছিলি আমাদের না নিয়ে?

সোমেন বলে, ওরা কোথায়?

ওই তো! দেখিয়ে দেয় পূর্বা। একটু পিছনে অণিমা, অপালা, ম্যাক্স, অনিল রায়—সবাইকেই দেখা যায়। ওরা গেটের কাছে এগিয়ে আসে। অপালা তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলে, যা খিদে পেয়েছে না রে! ব্রেকফাস্ট রেডি আছে তো!

সোমেন সিগারেট ধরাল। মানুষের স্রোত বেরিয়ে আসছে। সে সেই স্রোতের মুখ থেকে একটু সরে দাঁড়ায়! অপেক্ষা করে। অপালা বোধহয় হাতব্যাগে টিকিট খুঁজছে। পাচ্ছে না। ভ্রূ কুঁচকে অধৈর্য হাতে হাঁটকাচ্ছে, তোলপাড় করছে ব্যাগ। পাচ্ছে না। বেড়ার ও-পাশে দলটা একটু সরে দাঁড়িয়েছে লোকজনকে পথ দেওয়ার জন্য। পূর্বার মুখটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে, সে বলল, ভাল লাগে না। কী যে সব কাণ্ড করিস না!

অপালা বলে, আহা, কাণ্ড আবার কী? ব্যাগ খুলে টিকিটগুলো ভিতরে ফেলে দিয়েছিলাম, বেশ মনে আছে।

অনিল রায় পাইপ খাওয়ার অভ্যাস করছেন। সেটা ধরাতে ধরাতে বেশ নিরুদ্বেগ রসিক গলায় বলেন, ভিতরেই ফেলেছিলে তো! না কি ব্যাগটা খুলতে ভুলে গিয়ে টিকিটগুলো বাইরে ফেলে দিয়েছ!

না স্যার, স্পষ্ট মনে আছে। বলে অকারণে হাসে অপালা। অণিমাও। কারও কোনও উদ্বেগ দেখা যায় না।

কেবল পূর্বার চোখ ছলছল করে, ইস্ কী ইনসাল্ট স্যার! কী বিচ্ছিরি কাণ্ড! এই সোমেন চলে যাস না।

সোমেন দু'পা এগিয়ে যায়, বলে, কী হল, টিকিট পাচ্ছিস না?

নারে! অপালার ভ্রূ কুঁচকে আসে, চোখ ছোট আর তীক্ষ্ণ হয়। ব্যাগটা তুলে কাত করে ভিতরে খোঁজে।

সোমেন নিরুদ্বেগ গলায় বলে, কী আর করবি, মামাকে বলে কয়ে চলে আয়।

অপালা চোখ তুলে অবাক হয়ে বলে, মামা! মামা আবার কে?

সোমেন চোখের ইশারায় টিকিট-চেকারকে দেখিয়ে দেয়। অপালা আর অণিমা অমনি ইয়ারকির গন্ধ পেয়ে টিকিট-চেকারের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। অনিল রায় ধমকে দেন—কী হচ্ছে কী?

স্যার, সোমেন বলছে ইনি নাকি আমাদের মামা, ছি—ছি—

এ লাইনে সবাই চেকারকে মামা বলে। কেন বলে খোদায় মালুম। অল্পবয়সি চেকারটি গা ছেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন হঠাৎ সোজা হল। এক বার বিরক্তির একটু দৃষ্টিক্ষেপ করে সোমেনের দিকে। ততক্ষণে পূর্বা রুমালে চোখ মুছছে। অনিল রায় বললেন, কোথাও বোধহয় পড়ে-টড়ে গেছে তা হলে। দেন উই হ্যাভ টু পে দি ফেয়ার। বলতে বলতে হিপ-পকেটের ওয়ালেটে হাত দেন।

তৎক্ষণাৎ টিকিট খুঁজে পায় অপালা। চেঁচিয়ে বলে, পেয়েছি স্যার, ব্যাগের লাইনিঙের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।

ওরা বেরিয়ে আসে। অনিল রায় বলেন, স্পটটা কি খুব দূরে সোমেন?

জানি না স্যার।

জানো না? অবাক হন অনিল রায়।

না স্যার, আমিও এই গাড়িতে এলাম।

অণিমা কাছেই ছিল, বলল, সে কী? তোমার তো শ্যামলের সঙ্গে আসার কথা।

আসিনি।

পূর্বা বলে, এ মা! কী হবে তা হলে?

অপালা রেগে গিয়ে বলে, ঠিক জানি, একটা ভন্ডুল হবেই! এখন গঙ্গার ঘাটময় ট্যাঙস ট্যাঙস করে শ্যামলকে খোঁজো, ততক্ষণে নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে।

অনিল রায় নিরুদ্বেগ গলায় বললেন, তাতে কী! ব্যারাকপুর তো আর নিউইয়র্ক নয়। ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যারাকপুরের গঙ্গার ঘাটে আমি অনেক এসেছি এক সময়ে। চেনা জায়গা।

অপালা বাতাস শুঁকে বলে, স্যার, জিলিপির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সবাই জিলিপির গন্ধ পায়। গন্ধে গন্ধে তারা দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। মুহূর্তেই সকালের শান্ত দোকানঘরটা সচকিত হয়ে ওঠে কলকাতার হাউড়ে ছেলেমেয়ের কলকলানো কথার শব্দে। জিলিপির পাহাড় ধসে পড়তে থাকে।

সকাল ন'টাতেও রোদ ফোটেনি। কুয়াশায় আবছা গঙ্গার ধার বড় নিস্তব্ধ। এ অঞ্চলটায় বাগানঘেরা বাড়ি একের পর এক। লোকজন নেই। পাহাড়ি জায়গার মতো কুয়াশায় হিম হয়ে আছে এক প্রাচীন নিস্তব্ধতা। বাগানের মধ্যে কেবল মাথা উঁচু করে আছে কিছু মানুষের চেহারা। সত্যিকারের মানুষ নয়, পাথরের মূর্তি। কলকাতার রাস্তাঘাটে এক সময়ে যে-সব সাহেবদের স্ট্যাচু ছিল তা তুলে এনে রাখা হয়েছে।

অনিল রায় পাইপের ডাঁটি তুলে ম্যাক্সকে দেখান, ইংরিজিতে বলেন, ওই হচ্ছে সত্যিকারের ব্রিটিশ স্কাল্পচার। আউট্রামের মূর্তিটা এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রেখে দিয়েছে। সে মূর্তি ভোলা যায় না। টুপি পড়ে গেছে, আউট্রাম ঘোড়ার পিঠ থেকে ঘুরে দেখছে, এমন ডাইনামিক স্ট্যাচু খুব কম দেখা যায়। জীবন্ত পাথর। পার্ক স্ট্রিটে ওর পেডেস্টলে এখন গান্ধীর মূর্তি বসানো আছে, সেটাও মন্দ নয়। কিন্তু তার গ্র্যাঞ্জারই আলাদা।

কুয়াশার ভিতরে দেখা যায় আরও কয়েকজন পাথরের মানুষকে। ব্রিটিশ আমলের কলকাতার সব স্মৃতি। অনিল রায়ের বোধহয় সেই সব মূর্তি দেখে যৌবন বয়সের কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি ম্যাক্সের কাঁধে হাত রেখে একটু পিছিয়ে চলতে থাকেন। এবং একটি ব্যর্থ প্রেমের গল্পই বলতে থাকেন বোধহয়।

অন্যমনস্ক সোমেন এগিয়ে হাঁটছিল। পিছনে মেয়েরা। পূর্বা একটু এগিয়ে এসে বলে, কী কাণ্ড করলি বল তো!

কী?

এখন যদি শ্যামলকে খুঁজে না পাই আমরা?

সোমেন কথাটায় কান না দিয়ে বলে, পূর্বা, তোদের বাড়ির ওপরতলায় একটা এক-ঘরের ফ্ল্যাট খালি আছে বলছিলি না?

হ্যাঁ। বাথরুম, কিচেন নিয়ে কমপ্লিট ফ্ল্যাট, বড় ঘর, চারধার খোলা। কেন?

আমাকে থাকতে দিবি?

অণিমা এগিয়ে আসে, কী বলছে রে পাজিটা?

পূর্বা ঘাড় না ঘুরিয়ে বলে, আমাদের বাড়িতে থাকতে চাইছে।

থাকবে মানে? ঘরজামাই হয়ে নাকি? বলে হাসে অণিমা।

পূর্বা ভীষণ লজ্জা পেয়ে বলে, যাঃ। আমাদের তিনতলার ফ্ল্যাটটার কথা বলছে, তোরা যা মুখ পলকা না!

অপালা অণিমার বেণী ধরে টেনে বলে, ঘরজামাই হবে কীরে, ও তোর বর না? সেই যে বিয়ে করে এলি সেদিন, ভুলে গেছিস?

সোমেন 'আঃ' বলে ধমক দেয়। তারপর পূর্বাকে বলে, সত্যিই আমার বড় দরকার। একমাস আমাকে থাকতে দিবি?

অপালা বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস? না কি কোনও পরীক্ষা-ফরিক্ষা দিবি?

সোমেন বলে, তা দিয়ে তোর কী দরকার? আমি তো পূর্বার কাছে ঘরটা ভাড়া চাইছি। মাগনা নয়।

অপালা উত্তর দেয়, তোকে দেবে কেন? পূর্বা ওটা একজন প্রসপেকটিভ ব্যাচেলরকে ভাড়া দেবে, সব ঠিক হয়ে আছে। আই এ এস বা ইঞ্জিনিয়ার। ডাক্তার যদিও আমি দু'চোখে দেখতে পারি না, তবু তাও চলবে। তোকে দেবে কেন? বেকার, এম-এ'র মতো সোজা পরীক্ষাটাও পাশ করিসনি। তোকে দিয়ে পূর্বার ভবিষ্যৎ কী? বরং ধারকর্জ দিতে দিতে ফতুর হতে হবে।

কথাটা পূর্বার লাগে, গম্ভীর মুখখানা ফিরিয়ে বলে, কেন, ব্যাচেলারকে ভাড়া দেব কেন, আমার বুঝি বর জুটছে না?

অপালা ধমক দিয়ে বলে, কোথায় জুটছে? ধুমসি হয়ে যাচ্ছিস!

তোরই বা কোন বর জুটছে শুনি!

সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে, তোদের কারও জুটবে না। এত ইয়ারবাজ হলে কারও বর জোটে! ছেলেপক্ষ যদি দেখতে আসে তো তাদের সঙ্গেও তোরা ইয়ারকি দিবি, পার্টি কেটে যাবে।

মাইরি, মাইরি! অপালা লাফিয়ে উঠে বলে, আমাকে একটা পার্টি দেখতে এসেছিল কিছুদিন আগে, পাত্রের জ্যাঠামশাই আর একজন ভগ্নিপতি। আমি খুব সিরিয়াস হয়ে গিয়ে বসলাম। কিন্তু মাইরি জ্যাঠামশাইটা যা বাঁটিকুল না, দেখেই হাসি এসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে হাসি চেপেচুপে বসে রয়েছি। হঠাৎ শুনি ফঁক-ফঁ ফঁক-ফঁ একটা শব্দ। প্রথমে বুঝতে পারিনি শব্দটা কোথা থেকে আসছে। এদিক-ওদিক চাইছি। পাত্রপক্ষকে খাবার-টাবার দেওয়া হয়েছে, তারা খাচ্ছিল আর আমার দিকে মাঝে মাঝে দেখছিল। হঠাৎ টের পেলাম, শব্দটা জ্যাঠামশাইয়ের নাক থেকে আসছে। যখনই খাবার মুখে দেয় লোকটা তখনই মুখবন্ধ অবস্থায় নাক দিয়ে শব্দটা হয়। নাকে পলিপাস থাকলে ও-রকম হয় অনেকের, মুখ দিয়ে শ্বাস টানে, কিন্তু মুখ বন্ধ করলেই বিপদ। আমি মাইরি, আর চাপতে পারলাম না, ফুড়ুক ফুড়ুক করে হেসে ফেললাম।

অণিমা জোরে হেসে ওঠে, বলে, সত্যি?

মাইরি। কয়েক দিন পর ওরা রিগ্রেট লেটার দিল। বাবার সে কী বকা আমাকে—কিন্তু কী করব বল তো!

গঙ্গার উন্মুক্ত বিস্তারের সামনে এসে পড়তেই কনকন করে ওঠে ঠান্ডা বাতাস। সোমেন বলে, তোদের কারও জুটবে না, আমি বলে দিচ্ছি।

ঠিক বলেছিস। অপালা দুঃখের গলায় বলে, কেবল আমাদের মধ্যে অণিমাটাই যা লাকি। ওর জুটে গেল বোধহয়।

কে? সোমেন অবাক হয়ে বলে।

দু'জন তো দেখতে পাচ্ছি। তুই আর ম্যাক্স। ম্যাক্স তো রোজ প্রোপোজ করছে, একটু আগে গাড়িতেও করছিল। অপালা বলে।

যাঃ। অণিমা লজ্জার ভান করে, আজ করেনি।

এই মিথ্যুক, তোরা যে ও-পাশের সিটে গিয়ে আলাদা হয়ে বসলি, তখন স্পষ্ট দেখলাম ম্যাক্স তোকে কী বলল, আর তুই খুব মিষ্টি হেসে মাথা নিচু করলি!

না, না, সে অন্য কথা।

কী কথা শুনি? অপালা চোখ পাকায়।

বলছিল কলকাতায় কলার দাম নাকি বড্ড বেশি। ও কলা ছাড়া থাকতে পারে না।

যাঃ।

মাইরি। আমি বলেছি, সস্তায় ওকে কলা কিনে দেব।

'মিথ্যুক, মিথ্যুক' বলে অপালা হাসতে থাকে। শীতের নদীর ধারটা বড় নিস্তব্ধ, জলের শব্দ নেই। ওরা ঢালু বেয়ে নামতে নামতেই দেখতে পেল, ডান ধারে একটু গাছপালার জড়াজড়ি, তার ওধারে দু'-চারজন লোক। উনুনের ধোঁয়া উঠছে।

ভারী খুশি হয়ে পূর্বা চেঁচায়, ওই যে!

দূর থেকে তাদের দেখেই শ্যামল রাগারাগি করতে থাকে। কিন্তু কেউ চটে না। কারণ, শ্যামল চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে রেখেছে, রুটি-মাখন, ডিমসেদ্ধ, কলা, চায়ের জল ফুটছে ইটের উনুনে। রান্নার দু'জন লোক এনেছে শ্যামল, আর একজন নিরীহ চেহারার বন্ধু। বলেছিল বটে, একজন বন্ধুকে আনবে, তা হলে এ-ই। সোমেন লক্ষ করে, লোকটার চেহারা নাদুসনুদুস, মুখে ভালমানুষি আর বোকামি, পরনে খুব দামি সুট, হাতে এক ঠোঙা আঙুর।

শ্যামল যথেষ্ট মিহি ও মিষ্টি গলায় পরিচয় করিয়ে দেয়। লোকটার নাম মিহির বোস। শ্যামলের স্কুলফ্রেন্ড, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। বড় ফার্মে চাকরি করে। পরিচয়ের পর হাতজোড় করে রেখেই অপালার দিকে চেয়ে বলে, সবাই বুঝি আপনারা এম-এ দিয়েছেন!

তার চেহারার ভালমানুষি আর বোকা ভাব সবাই লক্ষ করেছে। অপালার মুখে হাসি খেলে গেল বিদ্যুতের মতো। একটু চাপা গলায় বলে, দূর শালা, তা দিয়ে তোর কী হবে! বলেই নিপাট ভালমানুষের মতো গলা তুলে বলে, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন তো।

মিহির বোস পরিষ্কার আগের কথাটা শুনতে পেয়েছে, বুঝতে পেরে সোমেন বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরায়। কিন্তু মিহির বোস শুনলেও রাগ করে না, বলে, ভারী সুন্দর স্পট কিন্তু এটা। সারাদিন এই জায়গাটায় আপনাদের সঙ্গে কাটাতে পারব ভাবতেই ভাল লাগছে।

হরি-হরি! চাপা গলায় অণিমা শ্বাস ফেলে বলে।

কী বললেন? মিহির একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

অণিমা অমায়িক হেসে বলে, কিছু না, হরির নাম...

অপালা হু-হু করে হাসছে। শ্যামল গাছতলায় শতরঞ্চি পাতছে, কী একটু আন্দাজ করে ধমক দিল, এই, কী হচ্ছে? আয় না তোরা, বোস এসে!

অপালা হাসি চাপতে চাপতেই চাপা গলায় বলে, এই মিহির, বোস, বোস। তারপর গলা তুলে বলে, আয় রে সবাই বসি।

থতমত খাওয়া মিহির বোস হাসতে চেষ্টা করে। অপালার দিক থেকে চোখ সরিয়ে অণিমার দিকে চায়। অণিমা সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূ দুটো নাচাতে থাকে। অপ্রস্তুত মিহির বোস চোখ সরিয়ে নেয়। অপালা, অণিমা আর পূর্বা গা টেপাটেপি করে হাসতেই থাকে।

শতরঞ্চিতে বসে অপালা খুব দুঃখের গলায় মিহির বোসকে বলে, বাড়ি ফিরে গিয়ে আজ আপনি

নিশ্চয়ই আমাদের খুব নিন্দে করবেন?

ভালমানুষ মিহির বোস তটস্থ হয়ে বলে, না, না, সে কী।

অপালা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, করবে না রে অণি?

হ্যাঁ করবে রে অপা। জানেন মিহিরবাবু, আমরা না খুব খারাপ। অণিমা মুখখানা চুন করে বলে।

না, না। মিহির বোস ঠিক থই পায় না।

অপালা হাতজোড় করে বলে, আমরা সত্যিই ভীষণ খারাপ। সেইজন্য কেউ আমাদের ভালবাসে না, না রে পূর্বা?

পূর্বা মাথা নাড়ে। আঁচলে হাসি চাপতে গিয়ে কাশতে থাকে।

আমাদের তাই বিয়েও হবে না। অণিমা করুণ স্বরে বলে।

অপালা তাকে একটা ঝাপটা মেরে বলে, না, না জানেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র এই অণিমারই হবে। হত না কিন্তু। ভাগ্যিস লোকটা বাংলা তেমন জানে না। এই যে গঙ্গার ধারে উলোঝুলো সাহেবটা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের স্যারের সঙ্গে—ওর সঙ্গে অণিমার ভাব। সাহেব বলেই করছে, বাঙালি হলে কিছুতেই—

অণিমা উৎকণ্ঠিতভাবে বলে, ও বাংলা শিখে গেছে অনেকটা। তাই আর একদম প্রোপোজ করছে না আজকাল। আপনার হাতে ওটা কীসের ঠোঙা মিহিরবাবু?

মিহির বোস এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়ে বলল, আঙুর। তারপর শ্বাস ফেলে বলে, খাবেন?

অপালা হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিঃসংকোচে নিয়ে নেয়। বলে, পেটুক ভাববেন না তো?

না, না। বলে হঠাৎ মিহির বোস খুব হাসতে থাকে। সবাই তার দিকে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে মিহির বোস বলে, আমার খুব ভাল লাগছে।

বলে চকচকে চোখে সে অপালার দিকে চেয়ে থাকে।

অণিমা শ্বাস ফেলে বলে, তোরও ব্যবস্থা হয়ে গেল অপা।

পাইপ মুখে অনিল রায়, আর চোখে নীলচে ফসফরাস নিয়ে রোগা সাহেব এগিয়ে আসে। অনিল রায় বলেন, কী হচ্ছে?

পূর্বা এতক্ষণে একটা রসিকতা করে, ম্যাট্রিমনি স্যার।

ম্যাটিনি? অনিল রায় অবাক হন।

না স্যার, ম্যাট্রিমনি।

সবাই এত জোরে হাসে, কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

ম্যাক্স কথা বলে খুব কম। ক'দিন দাড়ি কামায়নি, সাদা দাড়িগোঁফে মুখটা আচ্ছন্ন। সবুজ পাঞ্জাবির ওপর জহরকোট, নীচে পায়জামা, উলোঝুলো চুল, ন্যালাখ্যাপার মতো দেখাচ্ছে। সোমেনের পাশে এসে বসে পড়ল।

সোমেন দুঃখ করে বলল, তুমি পুরো ভেতো বনে গেছ সাহেব।

ম্যাক্স হাসল। দীন এবং মলিন একরকম হাসি। বাংলা বোঝে আজকাল। বলল, হুঁ, হুঁ, ঠিক কথা।

এবার গরমকালে তোমাকে বাঁদিপোতার গামছা পরিয়ে আম আর কাঁঠাল খাওয়াব। আমার গ্র্যান্ডফাদার আর ফাদার ওইভাবে খেত। কনুই পর্যন্ত রস গড়াবে, আর চেটে চেটে খাবে।

অপালা হাসতে হাসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, যাঃ! গরমকাল পর্যন্ত ও থাকবে নাকি? সেদিন ফেয়ারওয়েল দেওয়া হল, দেখলি না? ও চলে যাচ্ছে।

যাচ্ছে কোথায়! কবে থেকে তো শুনছি যাবে-যাবে!

যাবে। অণিমা আজও পাকা কথা দেয়নি যে।

অণিমা ফের লজ্জার ভান করে বলে, ও প্রোপোজ করে না আজকাল, মাইরি। বাংলা শিখে যাওয়ার পর থেকে—

॥ চোদ্দো ॥

এদের দঙ্গলে সোমেন বড় একটা আসে না। ভাল লাগে না। একসঙ্গে পড়ত, কিন্তু এখন ওরা এগিয়ে রইল, সোমেন পড়া ছেড়ে দিয়েছে। পিকনিকেও আসত না, কিন্তু কাল গাব্বুর পড়ার ঘরে এসে অণিমা খুব ধরল, আমরা চার-চারটে মেয়ে যাচ্ছি, পুরুষ মোটে তিনজন—ম্যাক্স, অনিল রায় আর শ্যামলের কে এক বন্ধু। তাই ব্যালান্স অফ পাওয়ার থাকছে না। তুমি চলো সোমেন। সোমেন অবাক হয়ে বলেছে, কেন, শ্যামল যাবে না? অণিমা অবাক হয়ে বলে, শ্যামলকে ধরেই তো চারজন মেয়ে! সোমেন হেসে ফেলে বলেছে, তাই বলো।

কথাটা মিথ্যে নয়। মেয়েদের সঙ্গ ছাড়া শ্যামল কখনও থাকতে পারে না। পুরুষবন্ধু শ্যামলের আছে কি নেই। থাকলেও তাদের সঙ্গ ও খুব পছন্দ করে না বোধহয়। আশ্চর্যের বিষয়, মেয়েদের সঙ্গে মিশে মিশে ওর গলার স্বর আজকাল মিহি হয়ে গেছে। মিষ্টি করে হাসে, চোখের চাউনিতে কটাক্ষ দেখা যায়। অণিমা একটা শ্বাস ফেলে বলেছিল, জানো না তো, শ্যামল আজকাল পুরুষ মানুষ দেখলে বুক ঢাকার চেষ্টা করে।

সোমেনের মন ভাল নেই। কাল রাতে দাদার কাণ্ডটা সারাক্ষণ মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে শীতে কেঁপে উঠছে সে। এতকাল সংসারের ভিতরের গণ্ডগোলটা এমনভাবে তাকে স্পর্শ করেনি। দাদা এত নীচে নেমে যায়নি কখনও। বড়দি মাকে ইনল্যান্ডে একটা চিঠি দিয়েছে, দাদা নাকি টালিগঞ্জের জমিটা বউদির নামে কিনবার চেষ্টা করছে। কেনে কিনুক, সোমেনের কিছু যায়-আসে না। কিন্তু সেটা দাদা, মা বা সোমেনকে জানাতে পারত। জানায়নি। এটা নিয়েও হয়তো কথা তুলবে মা। সংসারে আর-একটা অশান্তি লেগে যাবে। পিকনিকে এসে সোমেনের তাই মন ভাল নেই।

একা একা একটু ঘুরবে বলে দঙ্গল ছেড়ে বেরোচ্ছিল, এ সময়ে অণিমা সঙ্গ ধরে বলে, কোথায় যাচ্ছ?

বসে থেকে কী হবে! আমার আজ ইয়ারকি ভাল লাগছে না। তোমরা মিহির বোসকে যা বাঁদরনাচ নাচাচ্ছ!

বা রে, আমাদের দোষটা কী? লোকটা অত বোকা কেন?

সোমেন ক্ষীণ হাসে, বলে, অবশ্য লোকটারও খুব খারাপ লাগছে না। বোধহয় অপালার প্রেমে পড়ে গেছে।

পড়েছেই তো! তোমার মতো হার্টলেস নাকি!

সোমেন একটা ঢিল কুড়িয়ে দূরের একটা ল্যাম্পপোস্টের দিকে ছুড়ল। লাগল না। বলল, অণিমা, তুমি এবার একটা প্রেমে পড়ে যাও, নয়তো বাড়ি থেকে পছন্দ-করা ছেলেকে বিয়ে করে ফেলো।

কেন?

এমন সুন্দর বয়সটা পেরিয়ে যাচ্ছে।

খিলখিল করে ইয়ারকির হাসি হাসে অণিমা, বলে, ভীষণ ফ্রাস্টেটেডরা ওই সব কথা বলে। নিজের হচ্ছে না, তাই অন্যকে উপদেশ দেওয়া।

পুরুষের বয়স আর মেয়েদের বয়স কি এক? বলে আর-এক বার ল্যাম্পপোস্টটা লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ে সে। লাগে না।

অণিমা হাত ধরে হঠাৎ তাকে থামিয়ে বলে, ব্যস, আর এগিয়ো না, এখান থেকেই ল্যাম্পপোস্টটায় লাগাও দেখি, ক'বারে পারো দেখব!

সোমেন দাঁড়ায়। একটু হেসে ঢিল কুড়িয়ে নেয়। ছোড়ে। অনেক দূর দিয়ে সেটা চলে যায়। অণিমা তখন মুখ ফিরিয়ে বলে, সোমেন, তোমার ঢিল ছোড়া দেখেই বোঝা যায় আজ তোমার মন খারাপ।

না না, কে বলল?

ঢিলটা ল্যাম্পপোস্টে লাগাতে বললাম কেন জানো? ওটা একটা সাইকোলজিকাল টেস্ট। খুব গম্ভীর মুখে অণিমা বলে।

সোমেন জানে, এটা ইয়ারকি। তবু বলে, ঠিক আছে, দাঁড়াও লাগাচ্ছি।

একটার পর একটা ঢিল ছুড়ল সোমেন। একটাও লাগল না। অনেক দূর দূর দিয়ে চলে গেল। অণিমা হাসে, বলে, আর ছুড়ে কাজ নেই, আমার যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গেছে। এখন চলো তো, কফি হচ্ছে।

সোমেন একটা সিগারেট ধরায়, চারপাশে চেয়ে দেখে। কুয়াশা এখনও কাটেনি, তবু এই বেলা সাড়ে দশটায় ভোরের সূর্যের মতো এক রক্তিম কুয়াশায় ঢাকা সূর্য গঙ্গার জলে কী অপরূপ আলো ঝরিয়ে দিয়েছে। শ্রীরামপুর এখনও আবছা, তবু এক বিমূর্ত ছবির মতো ফুটে উঠছে নদীর ওপারে। জলে নৌকা, শীতের শান্ত নদীতে চিত্রার্পিত হয়ে আছে। এ-পারে ব্রিটিশ আমলের গন্ধমাখা নির্জনতা, বাংলোবাড়ি, ভাঙা পাড়। শ্রীরামপুরের পশ্চাৎপট নিয়ে অণিমা দাঁড়িয়ে। অণিমার মুখশ্রীর কোথাও কোনও বড় রকমের খুঁত নেই। ভোরের আলোয় তাকে ভালই দেখাচ্ছে। একটু হাসিমুখ, চোখে করুণা। সোমেন মাথা নেড়ে বলে, তুমি ঠিকই ধরেছ, মন ভাল নেই।

কেন সোমেন?

কিছু না। বলে সোমেন ঢিল কুড়িয়ে নেয়। আবার ছোড়ে।

অণিমা বলে, আজ লাগবে না। যতই চেষ্টা করো।

লাগবে।

অত সোজা নয় মশাই।

আচ্ছা দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

তারপর আরও অনেকগুলো ঢিল ছোড়ে সোমেন। এক-আধটা খুব কাছ দিয়ে যায়। কিন্তু লাগে না। অণিমা বলে, ইস, আর-একটু হলে লেগে গিয়েছিল।

লাগবে, দাঁড়াও না।

আবার ছোড়ে সোমেন। যত মনঃসংযোগ করে ততই ল্যাম্পপোস্টটা আরও দূরের বস্তু, অলীক কল্পনা, ছায়াশরীর হয়ে যায়। ঢিল লাগবার বাস্তব টং শব্দটা শোনা যায় না।

অমন ডেসপারেটভাবে ছুড়ো না। অণিমা সাবধান করে দেয়, কার গায়ে লাগবে।

হতাশ হয়ে সোমেন বলে, এক-একদিন এ-রকম হয়। সেদিন যে কাজেই হাত দাও সব পণ্ড হবে। এক-একটা দুষ্টু দিন আসে।

অণিমা হাসে, বলে, তুমি যতক্ষণ ল্যাম্পপোস্টটাকে ভুলে না যাবে ততক্ষণ ঢিল লাগবে না।

লাগবে না? দেখি!

শ্যামল দূর থেকে তাদের নাম ধরে ডাকছে। অণিমা সাড়া দিয়ে সোমেনকে বলে, চলো, চলো, কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে, না, যতক্ষণ না লাগাতে পারি ততক্ষণ যাচ্ছি না।

আচ্ছা পাগল। ছেলেমানুষ একটা।

সোমেন হেসে আরও কয়েকটা ঢিল কুড়িয়ে বাঁ হাতে জড়ো করে।

লক্ষ্যভেদ করে কোন দ্রৌপদীকে পাবে বাবা! ঠান্ডা কফি আমি দু' চোখে দেখতে পারি না—বলে অণিমা চলে যায় রাগ করে।

সোমেন একা নিরর্থক ল্যাম্পপোস্টে ঢিল লাগানোর খেলাটা খেলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যও স্থির থাকে না। কত কথা ভাবে, আর আন্দাজে ক্লান্ত হাতে ঢিল ছোড়ে। অনভ্যাসে হাত ব্যথিয়ে

ওঠে, শীতের বাতাসে নিষ্পলক চোখে জল আসে। তবু আক্রোশে, হতাশায় ঢিল ছুড়তে থাকে সোমেন। ফ্রাস্ট্রেশন? তাই হবে।

টং করে অবশেষে একটা ঢিল লাগল। সোমেন একা একা হাসল। সফলতার একটা ক্ষীণ আনন্দ টের পায় সে, এত তুচ্ছ ব্যাপার থেকেও। পরমুহূর্তেই ভাবে, কত নিরর্থক। হাত ব্যথা করছে, ক্লান্তি লাগছে। তারপর একা সোমেন বহু দূর পর্যন্ত হেঁটে চলে গেল।

একটু দূরে একটা গাছের তলায় অনিল রায় হুইস্কির বোতল খুলে বসেছেন, তাঁর সামনে গেলাস হাতে ম্যাক্স আর মিহির বোস। শ্যামল রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত, তার কোমরে গামছা, পূর্বা তার পেঁয়াজ কুচিয়ে দিচ্ছে। গাছের ডালে একটা খাটো দোলনা বেঁধে দুলছে অপালা। অণিমার হাতে বই, হাঁটু মুড়ে গাছতলায় বসে আছে।

কী করছিলি এতক্ষণ? একটা ধমক দেয় অপালা।

সোমেন বলে, ধুমসি কোথাকার, দোলনা ছিঁড়লে বুঝবি মজা। এখনও বয়স বসে আছে ভেবেছিস?

তোর ঢিল ছুড়বার বয়স থাকলে আমারও দোলনার বয়স আছে।

অণিমা মুখ তুলে গম্ভীর গলায় বলে, শোনো।

কী?

শেষ পর্যন্ত তুমি ল্যাম্পপোস্টটায় ঢিল লাগিয়েছিলে?

হুঁ।

ক'বারে?

খেয়াল করিনি। কেন?

ভাবছিলাম। জানিস অপা, সোমেনের খুব ডিটারমিনেশন, ও দেখিস, উন্নতি করবে।

কীসে বুঝলি? অপালা দোলনা থেকে নেমে কাছে আসতে আসতে বলে।

ঢিল ছোড়া দেখে।

অপালা শ্বাস ছেড়ে বলে, ঠিকই, ও খুব বীর।

অণিমা বিচ্ছুর মতো মুখ করে বলে, না, না, ওকে এতকাল যা ভেবেছিস ও কিন্তু তা নয়। ঢিলটা লাগানো খুব শক্ত ছিল, ও কিন্তু পেরেছে।

সোমেন রেগে গিয়ে বলে, তুমিই তো ঢিলটা লাগাতে বললে।

অণিমা হঠাৎ চোখ বড় করে তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সোমেনের দিকে, তারপর যেন সম্মোহন থেকে জেগে উঠতে উঠতে বলে, তুমি সেজন্যই অত সিরিয়াস হয়ে গেলে? না হয় আমার মুখ থেকে একটা কথা বেরিয়েই গেছে! বলে আবার বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকে অণিমা। আস্তে করে বলে, ভেবেও সুখ যে একজনের কাছে আমার কথার এত দাম। সোমেন! তুমি কি তবে—বলে থেমে চেয়ে থাকে অণিমা।

সোমেন মাথা নাড়ে। বড় বড় চোখে অণিমার দিকে তাকায়। আস্তে করে গাঢ় স্বরে বলে, তবে আজ বলি?

অণিমা মাথা নেড়ে কানে হাত চাপা দেয়, ভয়ার্ত গলায় বলে, না, না, এখন নয়। যেদিন ফুল-টুল ফুটবে, চাঁদ-টাঁদ উঠবে, লোডশেডিং থাকবে, সেদিন দূরে কোথাও গিয়ে—

অপালা ব্যাপারটা দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। এতক্ষণে হঠাৎ শ্বাস ছেড়ে বলল, মাইরি, পারিস তোরা! কিন্তু ও-কথাটা কী। সোমেন কী বলতে চাইছিল, আর তুই-ই বা চাঁদ-ফুল-লোডশেডিং কী বললি ও-সব?

ও একটা গোপন কথা। অণিমা বলে।

আমার সঙ্গে কেউ গোপন কথা বলে না, মাইরি! অপালা দুঃখের গলায় বলল, বলবি না, এই সোমেন? কীরে?

ওটা কেবল আমার আর অণিমার একটা ডায়লগ। তুই বুঝবি না। সিক্রেট।

ইস, সিক্রেট! মারব থাপ্পড়। বল শিগগির!

না।

এই সোমেন!

অপালা রেগে সোমেনের হাত খামচে ধরে। অন্য হাতে একটা থাপ্পড় কষায় পিঠে।

সোমেন বলে, ইস, হাতে কী জোর! একদম ব্যাটাছেলে।

বলবি না?

তোর বিয়ে হবে না, বুঝলি! সোমেন বলে, হলেও বর ফেরত দিয়ে যাবে। এমন ব্যাটাছেলে মার্কা মেয়ে জন্মে দেখিনি।

ছেলেগুলো মেনিমুখো হলে আমাদের ব্যাটাছেলে হতেই হয়।

সোমেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলে, সেজন্যই ছেলে আর মেয়েতে ফ্রি মিক্সিং ভাল নয়। দু'পক্ষেই ভেজাল মিশে যায়।

অণিমা গম্ভীর হয়ে বলে, সেই জন্যই বুঝি তুমি আমাদের সঙ্গে সহজে মিশতে চাও না সোমেন! ছোঁয়াচ বাঁচাচ্ছ?

বটেই তো। আমার বউ হবে একটা আস্ত মেয়েমানুষ, তার মধ্যে ব্যাটাছেলের যেমন ভেজাল চলবে না, তেমনি আমার মধ্যে মেয়েছেলের ভেজাল থাকলে সে-ই বা খুশি হবে কেন?

ইস! অপালা ঠোঁট ওলটায়, বউ! কোন বউ তোর জন্য ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে? তোদের জেনারেশনে বিয়ে হবে ভেবেছিস? বউ! মারব থাপ্পড়।

তুই ঠিক পূর্বার মতো হয়ে যাচ্ছিস। আমার বউয়ের কথা শুনে তোর চটবার কী? সোমেন দু' পা পিছিয়ে গিয়ে বলে, আমার একটা বউ হতে নেই? ভিখিরিরও আর কিছু না হোক একটা বউ হয়।

কিন্তু তোর হবে না। বলে অপালা আঙুল তুলে তেড়ে আসে, তোর কিছুতেই হবে না।

সোমেন তেমনি তটস্থ ভাব দেখিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলে, কিন্তু প্রায় হয়ে গেছে যে!

অপালা থমকে গিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়, বলে, কে?

সোমেন তখন গালগলা চুলকোয়, চোখ-মুখ বিকৃত করে নানা রকম, তারপর হঠাৎ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, দেখছিও তো কবো না, লম্বা ঘুঁষি মারেগা, হা রে মনোপাগলা—

ও কীরে? অপালা চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।

মনোপাগলা নামে একটা পাগল আসত আমাদের বাড়িতে। সে বলত।

অণিমা আর-একটা কপট শ্বাস ফেলে বলে, তুই বুঝিসনি অপা।

কী বুঝিনি?

সোমেন প্রেমে পড়েছে। কিন্তু তার কথা আমাদের কাছে বলবে না। ওই ছড়াটার মধ্যে সেটাই বলে দিল। দেখেছে, বলবে না। না, সোমেন?

মাইরি! অপালা চোখ বড় করে বলে, পড়েছিস?

হুঁ।

কেমন দেখতে রে?

দেখছিও তো কবো না!

আবার?

সোমেন সিগারেট ধরায়, বলে, কী করে বলি কেমন দেখতে! তাকে এখনও ঠিক চোখে দেখিনি, তবে বাঁশি শুনেছি।

বল না! বল না!

সোমেন অণিমার দিকে তাকায়, হঠাৎ গাঢ় স্বরে বলে, এই অনি, বলে দাও না সোনা! আর লুকিয়ে রেখে লাভ কী?

অণিমা ইয়ারকিটা লুফে নেয়। লাজুক নতমুখে বলে, যাঃ, আমার ভারী লজ্জা করে। তুমিই বলো।

বলে অণিমা আঙুল কামড়ায়।

ধুস! অপালা ভারী হতাশ হয়ে বলে, সেই পুরনো ইয়ারকি। যা ফাজিল হয়েছিস না তোরা। সোমেন, বলবি না তো?

দেখছিও তো কবো না—সোমেন সুর দিয়ে বলে, লম্বা ঘুঁষি মারেগা, হা রে মনোপাগলা—

ভেদ হয় না, কিছুতেই রহস্যের ভেদ হয় না বলে অপালা হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এসে সোমেনের সোয়েটারটা বুকের কাছে খিমচে ধরে বলে, বলবি না? বল শিগগির!

সোমেন বলে, ছাড় ছাড়, মোটে একটাই সোয়েটার আমার, বেকার মানুষ।

বল তা হলে!

বলছি, বলছি, পূর্বা।

সোয়েটারটা মুঠো করে মোচড়ায় অপালা, বল শিগগির ঠিক করে।

বলতেই হবে?

ছিঁড়লাম কিন্তু।

তুই।

অপালা একটা ধাক্কা দিয়ে ঘন শ্বাস ফেলে বলে, ইস, সাহস কত!

পিকনিক থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বলে গিয়েছিল, রাতে খাবে না। তার কারণ. এ-বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতে তার অরুচি।

জামা-কাপড় ছেড়ে অনেকটা ঠান্ডা জল খেয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল সে। ননীবালা এসে বলেন, দুটো ভাত খাবি না?

না।

রাতে না খেলে হাতি শুকিয়ে যায়, যা হোক দুটো খা।

সোমেন একটু রেগে গিয়ে বলে, না, খিদে নেই। খাওয়া নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান কোরো না তো, ভাল লাগে না।

ননীবালা হাল ছাড়েন না। মুখে কিছু না-বলে পান আর জরদার কৌটো খুলে বসেন। বলেন, কখন থেকে ভাত তরকারি গরম করে বসে আছি। গরম কি থাকে! শীতকাল, টপ করে জুড়িয়ে যায়।

তুমি খাওনি?

ননীবালা ছেলের চোখের দিকে চেয়ে একটু তাচ্ছিল্যের মতো করে বলেন, খাব। তাড়া কী? তুইও দুটো মুখে দিতিস!

সোমেন একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, সহজে ছাড়বে না, না বুড়ি?

ছেলেরা না খেলে মা যে বড় জব্দ হয়ে যায়।

দাদা ফিরেছে?

হুঁ। কখন শুয়ে পড়েছে। একটু আগে শুনছিলাম ও-ঘরে কথাবার্তা চলছে। ভাব হয়ে গেছে বুঝি।

আবার ওদের দরজায় কান পেতেছিলে? সোমেন মা'র দিকে কটমট করে তাকায়।

ননীবালা বিরসমুখে বলেন, তুই কেবল আমার কান-পাতা দেখিস। কান পাতব কেন? জোরেই বলছিল, শুনেছি।

সোমেন হতাশ হয়ে বলে, তোমাকে নিয়ে পারি না। যত গণ্ডগোলের মূলে তুমি ঠিক থাকবে। ছেলে আর ছেলের বউ ঘরে কী বলে না-বলে তা শুনতে তোমার লজ্জা করে না?

ননীবালা অন্য সময় হলে এ-কথায় রেগে যেতেন। কিন্তু এখন তাঁকে খুবই ভিতু আর হতাশ দেখাচ্ছিল। বললেন, সংসারের সব কি তুই বুঝিস? ছেলেদের ভালমন্দের জন্য মাকে অনেক অন্যায় করতে হয়। লজ্জা-ঘেন্না থাকলে চলে না।

সোমেন স্থির দৃষ্টিতে ননীবালার চোখের দিকে চেয়ে বলে, তার মানে তুমি আড়ি পেতে ওদের কথা শুনেছ।

তুই দুটি খেয়ে আমাকে ছেড়ে দে তো! শীতের রাত, তাও অনেক বেজে গেছে। বলে সোজা পানটা মুখে না দিয়ে রেখে দেন ননীবালা। ছেলের দিকে চেয়ে বলেন, চল।

সোমেন কথা বলে না। কিন্তু খেতে যায়।

কয়েক দিন হল, রান্নাঘরের এক ধারে টেবিল পাতা হয়েছে। টেবিলটা ভালই। শ'চারেক খরচ করে দাদা বানাল। ওপরে কালচে রঙের সানমাইকা লাগানো, পায়ায় পেতলের শু। চেয়ারগুলোও চমৎকার। রান্নাঘরটা বেশ বড়, তবু টেবিল-চেয়ার পাতার পর আর বেশি জায়গা নেই। ননীবালা টেবিলে খান না, তাঁর এঁটো বাতিক। টেবিলে খেলে সর্বস্ব এঁটো হয়। সোমেন টেবিলে খেতে বসলে মা তার পায়ের কাছটিতে একটা ছোট্ট কাঁসার বাটিতে নিজের জন্য একটু ভাত আর মাছের ঝোল নিয়ে বসেন। ভাল করে খেতে পারেন না। অনিচ্ছায় মুখে গ্রাস তুলে অনেকক্ষণ ধরে চিবোন।

সোমেন জিজ্ঞেস করে, আর কোনও হাঙ্গামা হয়নি তো?

না, কী হবে! আমে দুধে মিশে গেছে বাবা। আঁটিটা পড়ে আছে।

সোমেন চাপা ধমক দিয়ে বলে, কেন, তাতে তোমার গা জ্বালা করছে? ওদের মিলমিশ হলে তোমার ক্ষতিটা কী হল?

ক্ষতির কথা বলেছি? মিলমিশ হয়েছে ভালই তো।

তবে বলছ কেন?

ননীবালা চুপচাপ ভাতের গ্রাস চিবোতে থাকেন। হঠাৎ বলেন, তোর চাকরিটা হল না কেন?

হল না, এমনিই। সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে, কেন, আমার চাকরি দিয়ে কী হবে?

মাঝে মাঝে ভাবি, তোর একটা কিছু হলে বরং একটু আলাদা বাসা-টাসা করলে হয়।

সোমেন উঠে পড়ে।

ননীবালা খুব সম্প্রতি পান আর জরদার নেশা ধরেছেন। শোওয়ার আগে পান না হলে আজকাল চলে না। পানের বাটা নিয়ে বসতে যাবেন, জাঁতিটা মেঝেয় পড়ে শব্দ হল।

সোমেন শুয়ে ছিল, বলল, আঃ।

জেগে আছিস?

না ঘুমোচ্ছি। বিরক্ত হয়ে সোমেন বলে।

ননীবালা শ্বাস ফেলেন।

সোমেন পাশ ফিরে বলে, ইচ্ছে করে জাঁতিটার শব্দ করলে না?

না, পড়ে গেল।

ও-সব চালাকি আমি জানি। আমাকে জাগিয়ে এখন ওদের নিন্দেমন্দ করতে বসবে তো।

সংসারে থাকতে হলে অমন উদোর মতো থাকবি কেন? সব জেনেবুঝে থাকতে হয়।

জেনেবুঝে আমার দরকার নেই। আমি ভীষণ টায়ার্ড, শুয়ে পড়ো, বিরক্ত কোরো না।

ননীবালা কথা বলেন না। পান খেয়ে ডাবরে পিক ফেলেন। বাতি নিবিয়ে মশারির মধ্যে ঢুকে যান। কিন্তু নানা রকম শ্বাসের শব্দ আসে। এক বার অস্ফুট কণ্ঠে বলেন, যা মশা! তারপর আবার খানিকক্ষণ চুপ থেকে সোমেন জেগে আছে কি না বুঝবার চেষ্টা করেন। আপন মনেই বলেন, আজ বাচ্চা দুটোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। ওরা যেতে চায়নি। আমার কাছে তো বড় একটা শুতে পায় না।

বেশ করেছে নিয়ে গেছে। সোমেন বালিশে কান চেপে রেখে বলে, ওদের বাচ্চা ওরা নিয়ে যাবে না কেন? তা ছাড়া তুমিই তো বলো যে ওরা তোমার ঘর নোংরা করে, ওদের পায়ের ধুলোবালিতে তোমার বিছানা কিচকিচ করে।

সে তো সত্যি। তোরা চারটে ছেলেমেয়ে বড় হওয়ার পর থেকে বাচ্চাকাচ্চা বড় একটা টানি না তো।

তা হলে আর দুঃখ কীসের?

ননীবালা হঠাৎ একটু চড়া গলায় বলেন, সব না শুনে অত রাগ-রাগ করছিস কেন?

শুনতে চাই না। ঘুমোও।

ননীবালা মিইয়ে গিয়ে বলেন, হুঁ! ঘুম কি আর হুট বলতেই আসে। আজ বায়ুটা চড়ে গেছে। ঘুম আর হবে না।

তা হলে আমাকে ঘুমোতে দাও।

ওখানে কী কী খাওয়াল আজ? ননীবালা প্রসঙ্গ পালটান খুব কৌশলে।

অনেক কিছু। সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় সোমেন।

রণোটা সারাদিন কোথায় কী খেল কে জানে! বহেরুর ওখানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানেই গিয়েছিল কি না বুঝতে পারলাম না। কথা বলতে সাহস পেলাম না। রাতে কিছু খেল না। মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছিল। খায়নি বুঝি সারাদিন।

না খাওয়াই উচিত। যে বউয়ের গায়ে হাত তোলে তার আবার খাওয়া!

সেটা অন্যায় করে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু রণো তো অত রাগ করার ছেলে না। বউমা কিছু একটা অন্যায় বলেছে নিশ্চয়ই। কাল বাড়িতে পা দেওয়ার পর থেকেই তো টিক-টিক করছিল।

সোমেন ঝেঁঝে উঠে বলে, যা খুশি করুক, তা বলে গায়ে হাত তুলবে!

বলছি তো সেটা অন্যায় করে ফেলেছে। মানুষ কি সব সময়ে নিজের বশে থাকে?

দাদার পক্ষ হয়ে একটাও কথা আর বলবে না তুমি।

কেন বলব না? রণোকে আমি এইটুকুবেলা থেকে বড় করেছি, ওর ধাত আমার চেয়ে ভাল কে জানে! ও ঠান্ডা মানুষ, ওকে রাগালে কেমনতর হয়ে যায়। সেই জন্যই ওকে কেউ কখনও শাসন করেনি। তবে দরকারও হত না, ও তেমন কিছু দুষ্টুমি করতই না। ক'দিন হল দেখছি ও যেন কেমনধারা হয়ে যাচ্ছে!

যাচ্ছে যাক। তুমি ওদের মধ্যে বেশি নাক গলিয়ো না।

ননীবালা আবার একটু চুপ থেকে সোমেনের মন বুঝবার চেষ্টা করেন।

তারপর বলেন, শীলার চিঠিটা পড়লি তো! আমি কিছু মাথামুন্ডু বুঝলাম না। কী বলতে চেয়েছে বল তো। একটু বুঝিয়ে দে।

আঃ! বলে ভীষণ বিরক্তিতে সোমেন উঠে বসে। বলে, কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না?

ঘুমোস। সকালবেলা পর্যন্ত ঘুমোস, না হয় ডাকব না। এখন একটু বুঝিয়ে বল তো। বলে ননীবালা মশারি তুলে বাইরে বেরিয়ে বসেন।

ঘর অন্ধকার হলেও বাইরের আলো আবছাভাবে ঘরে আসে। ননীবালার ছায়ামূর্তিটার দিকে আক্রোশভরে একটু চেয়ে থাকে সোমেন। তারপর বলে, তুমি বড়দির চিঠিটা ঠিকই বুঝেছ।

যা বুঝেছি তা কি হতে পারে?

হবে না কেন? বাবা তো টাকা দিতে এলেন না। জমিটা হাতছাড়া হয়ে যাক— তাই চাও?

তাই কি বলেছি? কিন্তু লোকটা এল না কেন, কেমন তার বুকের ব্যথা, এটা তো তোরা দু' ভাইয়ের একজন গিয়ে খোঁজ নিতে পারতিস!

সোমেন বলে, বাবা তোমার কেউ হয় না? বহেরুর চিঠি পেয়ে তুমিও তো চলে যেতে পারতে!

ননীবালা কথা খুঁজে পান না। তারপর অনেকক্ষণ বাদে ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, আমি তো চোখের বিষ। আমাকে দেখলে ব্যথা বেড়েই যাবে হয়তো।

সোমেন বালিশে উত্তপ্ত মাথাটা আবার রাখে। কথা বলে না। ননীবালাও কিছু বলেন না অনেকক্ষণ। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, তাই বলছিলাম, তোর যদি একটা চাকরি-বাকরি হত তা হলে আলাদা একটু বাসা-টাসা করে মায়ে-পোয়ে থাকতাম।

বড় রাগ হয় সোমেনের। সে বলে, দাদার মতো লোকের সঙ্গে থাকতে পারছ না, দাদা কত ভালবাসে তোমাকে!

কী করব। দেখছিস তো! সব দোষ কি আমার?

তোমারই। তোমাকে নিয়ে আমি থাকতে পারব না।

ননীবালা স্তব্ধ হয়ে থাকেন। হাতের ব্রোঞ্জের কয়েকগাছা চুড়ির একটু শব্দ হয়। শ্বাস ফেলেন। খুব বিষণ্ণ ক্ষীণ গলায় বলেন, জবাব দিলি?

॥ পনেরো ॥

বাসে-ট্রামে আজকাল অজিত উঠতে পারে না। বড় কষ্ট হয়। অফিসের পরই তাই তার বাসায় ফেরা বড় একটা হয় না। এক সময়ে যখন ইউনিয়ন করত তখন প্রায়দিনই অফিসের পর ইউনিয়নের কিছু না কিছু কাজ থাকত, নয়তো কো-অপারেটিভের। এখন সে-সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। ওভারটাইম থাকলে অফিসের পর সময়টা একরকম কাটে। নইলে বিকেলটা ফাঁকা এবং শূন্য।

অজিত যখন বেরোয় তার বহু আগেই অফিসের লোকজন চলে যেতে শুরু করে। সরকারি অফিস, তাই কেউ সময়-টময় মানে না। অজিত যায় না, গিয়ে কী হবে! সাড়ে পাঁচটা ছ'টা পর্যন্ত কাজ করে সে সময় কাটায়। তারপরও বাসায় ফেরার নামে গায়ে জ্বর আসে। শীলা বেলা থাকতেই স্কুল থেকে ফেরে, কিন্তু অজিত ফেরে না। কার কাছে ফিরবে? একটা বাচ্চাও যদি থাকত!

মুশকিল হয়েছে এই যে, অফিসে তার বন্ধু-টন্ধু বড় একটা নেই। যখন ইউনিয়ন করত তখন বন্ধু ছিল, সঙ্গীও ছিল। ইউনিয়ন ছেড়ে দিয়েছে বহুকাল, সেকশন ইনচার্জ হওয়ার পর আর কোনও সম্পর্কও রইল না। যাদের সঙ্গে একসাথে কাজ করে তাদের সঙ্গে আজও ঠাট্টা মশকরা বা আড্ডার সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারাও কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে, সংসার-চিন্তায় কিছুটা বা আত্মকেন্দ্রিক। হাসি-ঠাট্টা আজও হয় কিন্তু সেও জলের ওপর ভেসে থাকা বিচ্ছিন্ন কুটোকাটার মতো, তাতে স্রোত নেই, টান নেই, গভীরতা নেই।

কলকাতার ভিড় দিনে দিনে কোন অসম্ভাব্যতার দিকে যাচ্ছে তা ভেবে পায় না অজিত। শহরটার আগাপাশতলা দেখলে মনে হয় না এত মানুষ আঁটার জায়গা এখানে আছে। তবু কী করে যেন ঠিক এঁটেও যায়। ট্রামে-বাসে ঝুলন্ত মানুষ দেখে অজিত, রাস্তাঘাটে মানুষের শরীর আগে-পিছু কেবলই ঠেলে, ধাক্কায়। বিরক্তি, রাগ, ভয় নিয়ে মানুষ চলেছে, ঘুরে মরছে, কোথাও পৌঁছোয় না শেষ পর্যন্ত।

ভিড় একটু কম থাকলেও, এবং অফিসের পর বাসে-ট্রামে ওঠা গেলেও অবশ্য অজিত বাসায় ফিরত না। ফিরে গিয়ে কী হবে? শীলা সন্ধে থেকে রেডিয়ো খুলে রাখে, উল বোনে, সিনেমার

কাগজ দেখে। অজিত তাড়াতাড়ি ফিরলে অবশ্য খুশি হয়। কিন্তু সেটা কেবল বাড়িতে একজন লোক আসার জন্য যেটুকু খুশি তাই। কথা প্রায়ই বলার থাকে না। শীলা ঝির নিন্দে করতে থাকে, আশেপাশের বাড়ির নানা খবরাখবরের কথা বলে, বড়জোর স্কুলের গল্প করে। ওদের স্কুলে নতুন এক ছোকরা মাস্টার এসেছে, সে নাকি বোকা, তাই তাকে নিয়ে অনেক কাণ্ড হয় স্কুলে। সেই সব গল্প বলে শীলা। অজিতের হাই ওঠে।

অফিসের পর একা-একাই কিছুটা হাঁটে অজিত। কিন্তু হাঁটার মতো তেমন জায়গা নেই। ময়দানের অন্ধকারেও দুর্বৃত্তের মতো কিছু মানুষ মুখ লুকিয়ে চুপিসারে ঘোরে, পুলিশ নজর রাখে, ভাড়াটে মেয়েছেলেরা গা ঘেঁষে যায়। রেস্টুরেন্টে খুব বেশিক্ষণ একা বসে থাকা যায় না। আসলে এই চল্লিশের কাছাকাছি বয়সেও তার সেই বয়ঃসন্ধির সময়কার পিপাসা জেগে আছে লক্ষ্মণের জন্য। লক্ষ্মণ আর কোনও দিনই ফিরবে না। একটা কভার ফাইল কিনে তার মধ্যে লক্ষ্মণের সব চিঠি জমিয়ে রাখে অজিত। অবসরমতো সেইসব চিঠি খুলে পড়ে। পিপাসা তাতে বেড়েই যায়।

অবশেষে খুব রাত হওয়ার আগেই অফুরন সময় ফুরিয়ে না পেরে সে বাসার দিকেই ফেরে। মাঝে মাঝে ভবানীপুরে নেমে নিজেদের বাড়িতেও ঢুঁ মারে। কিছুই আগের মতো নেই। ভাইপো-ভাইঝিরা কত বড় সব হয়ে গেল। মা এখন কত বুড়োটে মেরে গেছে। খুব ডেকে, ভালবেসে কথা বলার কেউ নেই। দাদা-বউদি আলগা আলগা কথা বলে, চাকর চা খাবার দিয়ে যায়। ইদানীং অজিত ম্যাজিক দেখায় বলে ভাইপো-ভাইঝিরা ঘিরে ধরে। অন্যমনস্কভাবে কয়েকটা ম্যাজিক দেখায় সে। জমে না।

অজিতকে তাই বাসায় ফিরতেই হয়। নিস্তব্ধ বাড়ি। শিশুর কণ্ঠস্বর নেই। কেবল রেডিয়োটা বাজে। বেজে যায়। কেউ শোনে না।

শীলা দরজা খোলে। কথা বলে না।

অজিত ঘরে ঢোকে। কথা বলে না।

আবার বলেও। খাওয়ার টেবিলে, বিছানায় শুয়ে এক-একদিন কথা হয় অনেক।

ডাক্তার মিত্রকে কম টাকা আজ পর্যন্ত দেয়নি অজিত। কম করেও তিন-চার হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে। এক বার নার্সিং হোমে শীলার একটা অপারেশনও হয়েছে। শীলার কোনও তেমন মারাত্মক খুঁত না পেয়ে ডাক্তার মিত্র অজিতেরও কিছু চিকিৎসা করেছেন। তবু লাভ হয়নি। শীলার পেটে বাচ্চা আসেনি।

কী আর হবে, ছেড়ে দাও। অজিত হতাশ হয়ে বলেছে।

শীলা কেঁদেছে, বলেছে, তোমাকে জীবনের সবচেয়ে বড় জিনিসটাই দিতে পারলাম না।

দূর দূর। অজিত সান্ত্বনা দিয়েছে, বাচ্চাকাচ্চা হলে ঝামেলাও কম নাকি। হল হয়তো, বাঁচল না। তখন বাচ্চা না-হওয়ার চেয়েও বেশি কষ্ট। ছেলেপুলে বড় করা কি সোজা কথা।

এ কোনও সান্ত্বনার কথাই নয়। তবু আশ্চর্য যে শীলা সান্ত্বনা পায়।

মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ হেসে বলে, যা বলেছ! ছেলেপুলে হওয়া মানেই তো সারাদিন দুশ্চিন্তা। বাড়িঘর নোংরা করবে, কাঁদবে, চেঁচাবে। অশান্তি বড় কম নাকি! এই পড়ে গেল, এই ছড়ে গেল, এই এটা ভাঙল, সেটা ছিড়ল!

অজিত মাথা নেড়ে বলে, তবে?

শীলা শ্বাস ছেড়ে আবার তার বোনার কাঁটা তুলে নিয়ে বলে, বাচ্চাকাচ্চা তো নয়, যেন অভিশাপ। না গো?

হুঁ।

এই বেশ আছি। শান্তিতে, নিরিবিলিতে। হুট করে যেখানে খুশি যেতে পারি। দুশ্চিন্তা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই!

অজিত সায় দিয়ে যায়।

এবং এইরকমভাবেই দুটি শিশুর মতো তারা পরস্পরকে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। পারেও।

কিন্তু দু'জনের মাঝখানে একটা পরদা নেমে আসে ধীরে। যবনিকার মতো। তাদের দাম্পত্য জীবন যেন এই মধ্যযৌবনেই শেষ হয়ে আসে।

অজিত প্রথম ম্যাজিক শেখে রাস্তার এক ম্যাজিকওলার কাছে। তিনটে টাকা নিয়ে সে অজিতকে বল অ্যান্ড কাপ, দড়িকাটা আর একটা তাসের খেলা শিখিয়েছিল। সেই তিনটে খেলা দেখিয়ে অজিত চমকে দেয় শীলাকে।

শীলা ভারী অবাক হয়ে বলেছিল, ভারী ভাল খেলা তো! তুমি তো বেশ খেলা দেখাও!

তারপর নানা সূত্রে সে সত্যিকারের ম্যাজিশিয়ানদের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করে। বেশ কয়েকটা স্টেজ ম্যাজিক শিখে যায়, টেবিল ম্যাজিক অনেকগুলো টপাটপ শিখে নেয়। ফলে অফিসে, পাড়ায় ম্যাজিশিয়ান হিসেবে লোক তাকে চিনে গেছে। সে পয়সার খেলা দেখায়, জ্বলন্ত সিগারেট লুকিয়ে ফেলে কোথায়, হাতের আঙুলের ফাঁকে শূন্য থেকে নিয়ে আসে পিংপং বল। একটা দুটো তিনটে। এখন তার ভাণ্ডারে ম্যাজিকের মজুদ বড় কম নয়। ম্যাজিকের দোকান ঘুরে, ম্যাজিশিয়ানদের কাছ থেকেও সে সাজসরঞ্জাম কিনেছিল অনেক। ঘণ্টাখানেক স্টেজে দেখানোর মতো স্টক তার আছে।

মাঝেমধ্যে রাত জেগে সে আয়নার সামনে বসে পামিং আর পাসিং অভ্যাস করে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনে পকেটে হাত দিয়ে কয়েন কনজিওরিং অভ্যাস করে। ভাবে, ম্যাজিকওয়ালা হয়ে গেলে কেমন হয়!

শীলা আজকাল মাঝে মাঝে বলে, তুমি আমাকে ভালবাসো না।

বাসি। নিস্পৃহ উত্তর দেয় অজিত।

ছাই বাসো!

কীসে বুঝলে?

শীলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সবচেয়ে চাওয়ার জিনিসটা তোমার, তা-ই দিতে পারলাম না। নিষ্ফলা গাছকে কে ভালবাসে বলো!

হবে। সময় যায়নি।

কবে আর হবে?

মিত্র বলেছে, হবে। মিত্র এশিয়ার সবচেয়ে বড় গায়নোকলজিস্টদের একজন।

মিত্রর কথা ছাড়ো, ঘোরাচ্ছে আর টাকা বের করে নিচ্ছে। ওর দ্বারা হবে না। আমারই কোথাও দোষ আছে।

না। কিছু দোষ নেই।

ঠিক বলছ?

বলছি।

অবশেষে একদিন ঋতু বন্ধ হয়ে যায় শীলার। বুক ধুকপুক করতে থাকে। একদিন দু'দিন করে দিন যায়। শীলার চোখে-মুখে একটা অপার্থিব আলো কোথা থেকে এসে পড়ে।

শীলা বলে, বড় ভয় করে গো!

কেন?

কী জানি কী হয়। আমার এমনিতেই একটু লেট ছিল।

না, না, এ সে লেট নয়। তুমি শরীরের কোনও পরিবর্তন বুঝছ না?

একটু একটু, কিন্তু সেটা মানসিক ব্যাপারও হতে পারে।

না, না। কাল এক বার ডাক্তারের কাছে যাব।

মিত্র দেখেটেখে পরদিন বলেন, মনে হচ্ছে প্রেগন্যান্সি। তবে ইউটেরাস একটু বাঁকা হয়ে আছে। নড়াচড়া একদম করবেন না। নরম, খুব নরম বিছানায় দিনরাত শুয়ে থাকবেন।

আজকাল তাই থাকে শীলা। অজিত একটা চমৎকার রবারের গদি কিনে এনেছে। অনেক টাকা দাম। স্কুল থেকে ছুটি নিয়েছে শীলা। অজিতও অফিস কামাই করে খুব। বিছানার পাশে চেয়ার টেনে বসে থাকে। চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ।

শীলা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে। নরম গদিতে সুখের শরীর ডুবিয়ে, মুখখানা অজিতের দিকে ফিরিয়ে ড্যাবা-ড্যাবা চোখে চেয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে, বলে, কী গো!

অজিত বলে, কী?

অফিস যাও না যে বড়!

ছুটি জমে গেছে অনেক, নিয়ে নিচ্ছি।

কেন শুনি। কোনও দিন ছুটি নিতে দেখি না। অফিস তো তোমার প্রাণ।

প্রাণ-ট্রাণ নয়। কাজ থাকে।

কাজ কী তা তো জানি।

কী?

ফিস খেলা, আড্ডা আর ম্যাজিক।

না, না, প্রোমোশনের পর থেকে আর ও-সব হয় না।

শীলা স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসায় একরকম সম্মোহিত হাসি হাসে, বলে, বউয়ের গন্ধ শুঁকে এত বাড়িতে বসে থাকার কী?

গন্ধটা বেশ লাগছে আজকাল।

বউয়ের গন্ধ? না কি অন্য কিছু?

বউয়ের গন্ধই।

বুঝি গো, বুঝি!

কী বোঝো?

বউয়ের গন্ধ নয়। অন্য একজনের গন্ধ।

অজিত নিঃশব্দে হাসে। একটু লম্বাটে মুখ অজিতের। গায়ের রং ফরসার দিকে, সামনের দাঁত সামান্য বড়। তবু হাসলে তাকে ভারী ভাল দেখায়। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে শীলা। স্বামীকে এত ভাল বহুকাল লাগেনি।

শীলা একটা শ্বাস ফেলে বলে, বউ তো পরের মেয়ে, তার জন্য কোন মানুষটারই বা দরদ উথলে ওঠে! আসল দরদ তো তোমার নিজের জনের জন্য, নিজের রক্তের জন আসছে। তাই অত ছুটি নিয়ে বসে থাকা। বুঝি না বুঝি?

তোমার জন্য দরদ নেই, এটা বুঝে গেছ? কী বুদ্ধি তোমার!

ও-সব বুঝতে বুদ্ধির দরকার হয় না। হাবাগোবাও ভালবাসাটা বোঝে।

হবে।

শীলা মৃদু হাসতেই থাকে। বালিশে মুখ ঘষে, গদিটায় একটু দোলায় শরীর, ঠ্যাং নাড়ে।

অজিত সতর্ক হয়ে ধমক দেয়, আঃ! অত নড়ো কেন? আচ্ছা চঞ্চল মেয়ে যা হোক।

শীলা গুরগুর করে হাসে, বলে, কী দরদ!

অজিত ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থাকে।

শীলা ফের বলে, কার জন্য গো, এত দরদ? এতদিন তো দেখিনি।

বারবার এক কথা! অজিত বিরক্তির ভান করে। কিন্তু তার ভিতরে একটা টলটলে আনন্দ।

নিঃশব্দে যেমন কলের তলায় চৌবাচ্চা ভরে ওঠে জলে, উপচে পড়ে—ঠিক তেমনি এক অনুভূতি, গলার কাছে একটা আবেগের দলা ঠেলা মেরে ওঠে।

শীলা একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ করে বলে, সে এখন পেটের মধ্যে একটুখানি রক্তের দলা মাত্র, তবু তার কথা মনে করেই দামি গদি এল, কাজের মানুষ ছুটি নিয়ে বসে থাকল, চোয়াড়ে মুখটায় মাঝে মাঝে হাসিও ফুটছে আজকাল গোঁফের ফাঁক দিয়ে। কী ভাগ্যি আমাদের!

একটু চুপ করে থাকবে?

শীলা নিঃশব্দে হাসে, চোখে-মুখে ঝিকরিমিকরি দুষ্টুমি। একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, পরের মেয়ের কপাল খুলল এতদিনে।

শীলাকে প্রায়দিনই স্নান করতে দেয় না অজিত। ওঠা-হাঁটা প্রায় বন্ধ। এক-আধদিন শীলা বায়না করে, আর পারি না, শুয়ে থেকে থেকে কোমর ধরে গেল। স্নান না-করে শরীর জ্বর-জ্বর। একটু স্নান করতে দাও না।

অজিত আপত্তি করে। শেষ অবধি আবার নিজেই সাবধানে ধরে তোলে শীলাকে। বাথরুমে নিয়ে গিয়ে বলে, আমি স্নান করাব।

এ মা! লোকে কী বলবে?

কে দেখতে আসছে?

রেণু রয়েছে না! ঝি হলে কী হয়, সব বোঝে।

ও বাচ্চা মেয়ে, কিছু বুঝবে না।

না গো, বোঝে।

বুঝুকগে, অত মাথা ঘামানোর সময় নেই। একা বাথরুমে তুমি একটা কাণ্ড বাঁধাবে, আমি জানি।

বলে বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেয় অজিত। শীলা আতঙ্কে বলে, না, না, ভারী বিশ্রী দেখায়। বড্ড লজ্জা করে।

অজিতও শোনে না। শীলা তখন অগত্যা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে লজ্জায় হাসে। অজিত তার কাপড় ছাড়িয়ে দেয়। একটু আদর করে। খুব সন্দিগ্ধের মতো শীলার পেটটা স্পর্শ করে বলে, এখনও তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না! একদম ফ্ল্যাট বেলি।

শীলা চোখ বড় বড় করে বলে, ও বাবাঃ, কী তাড়া! এখনই কী? পাঁচ-ছ'মাসের আগে কিছু বুঝি বোঝা যায়।

অজিত বলে, ক'দিন হল যেন?

প্রায় দেড় মাস।

অজিত শ্বাস ফেলে বলে, মাত্র!

শীলা হাসতে থাকে, বলে, তোমার বাচ্চা কি মেলট্রেনে আসবে! সবার যেমন করে আসে তেমনই আসবে। বুঝলে?

অজিত বোঝে। যত্নে স্নান করিয়ে দেয় শীলাকে। ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে শীলার গায়ের জলে নিজেও স্নান করে। ঘরে এনে চুল আঁচড়ে দেয়। বিছানায় বসিয়ে চামচ দিয়ে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দেয়। একই পাতে খায় দু'জনে। শীলা ভাজা বা মাছের টুকরো তুলে দেয় অজিতের মুখে। দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ হাসে। বড় সুখ।

রাতে শীলা ঘুমোয়। অজিতের ঘুম বড় অনিশ্চিত। তার স্নায়ুর একটা গণ্ডগোল আছে, মাঝে মাঝে সহজে ঘুম আসে না। মাথা গরম লাগে।

অন্ধকারেই উঠে টেবিল থেকে হাতড়ে রনসন গ্যাসলাইটারটা তুলে নেয়। সিগারেট ধরায়। দপ করে লাফিয়ে ওঠে চমৎকার নীলচে আগুনের শিখা। অমনি লক্ষ্মণের কথা মনে পড়ে। সেই সহৃদয়

আর বুদ্ধির শ্রী মাখানো সরল মুখ। একটা ছবি পাঠিয়েছে লক্ষ্মণ। একটা প্রকাণ্ড স্ট্রিমলাইনড গাড়ি—খুব হালফ্যাশানের জিনিস, তার সামনে ওরা স্বামী-স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। বউটি ভালই দেখতে, তবে বয়সটা একটু বেশি—লক্ষ্মণেরই কাছাকাছি হবে। আর খুব লম্বা—লক্ষ্মণের সমান। লক্ষ্মণকে চেনাই যায় না ছবিতে। মোটা গোঁফ রেখেছে, বড় জুলপি, চুলও ঘাড়ের কাছে নেমে এসেছে। পরনে চেক প্যান্ট, গায়ে কোট, চোখে রোদ-চশমা। মানাচ্ছে না লক্ষ্মণকে। মুখে খুশির হাসি। লক্ষ্মণকে কি আর চেনা যাবে না? পুরনো লক্ষ্মণ কি হারিয়েই গেল চিরকালের মতো? এরপর লক্ষ্মণের ছেলেমেয়েরা হবে, চাকরি আরও বড় হবে, কানাডায় শিকড় গেড়ে যাবে ওর। দেশে ফেরা হবে না। এবং লক্ষ্মণের পর ওর বংশধররাও হয়ে যাবে কানাডার মানুষ। তারা বাংলায় কথা বলবে না, আচরণ করবে না বাঙালির মতো, তারাও হবে ভিনদেশি। কেবল বহুকাল আগে প্রবাসে ছিটকে আসা লক্ষ্মণের পদবিটুকু স্মৃতিচিহ্নের মতো লেগে থাকবে তাদের নামের সঙ্গে। এ রকম মুছে যাওয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া একটা মানুষের পক্ষে কতখানি দুঃখের তা কি লক্ষ্মণ বোঝে না? কলকাতার লক্ষ্মণ কেন অমন বিশ্বজনীন আর আন্তর্জাতিক হয়ে গেল? কোনও চিহ্ন রেখে গেল না স্বদেশে!

বাজে চিন্তা। মাথা থেকে চিন্তাটা বের করে দেয় অজিত। দরজির আঙুলের মাথায় যে ধাতুর টুপি পরানো থাকে হাত-সেলাই করার সময়ে, তাই দিয়ে নতুন একটা খেলা শিখেছে অজিত। পাশের ঘরে আলো জ্বেলে আয়নার সামনে বসে খেলাটা অভ্যাস করতে থাকে সে। ডান হাতের আঙুল থেকে চোখের পলকে বাঁ হাতের আঙুলে নিয়ে যায়, বিদ্যুৎগতিতে লুকিয়ে ফেলে হাতের তেলোয়। আবার আঙুলে তুলে আনে। আঙুলের ডগায় ডগায় মুহুর্মুহু দেখা দেয় টুপিটা। হারিয়ে যায়, আবার দেখা দেয়। দ্রুত হাতে আঙুলে বিভ্রম সৃষ্টি করে চলে অজিত। বাচ্চাটা বড় হলে হাঁ করে দেখবে বাবার কাণ্ডকারখানা। ভাবতেই চকিত একটা অদ্ভুত হাসি খেলে যায় মুখে। 'বাবা' শব্দটা কী ভয়ংকর! কী সাংঘাতিক! দু' হাতের আঙুলে নৃত্যপর ধাতুর টুপির দ্রুত ও মায়াবী বিভ্রমটি তৈরি করতে করতে সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে থাকে একটু।

শীলা ডাকে, ওগো কোথায় গেলে?

অজিত উঠে ও-ঘরে যায়, কী হল?

কী করছ রাত জেগে? ম্যাজিক?

হুঁ।

পাগলা। ঘুমোবে না?

ঘুম আসছে না। অজিত বলে।

কাছে এসো। তোমাকে ছাড়া ভাল লাগে না। এসো শিগগির, ও-ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে এসো।

অজিত তাই করে।

বিছানায় এসে শীলা ঘন হয়ে লেগে থাকে গায়ের সঙ্গে। লেপের ভিতরে ওম, দু'জনের শরীরের তাপ জমে ওঠে। কিছুক্ষণ ঝিম মেরে থাকে শীলা। আবার আলগা হয়ে উন্মুখ মুখখানা তুলে বলে, অনেক আদর করো।

অজিত আবছায়ায় স্ত্রীর মুখখানা দেখে। তার শ্বাস ঘন হয়ে আসে। দু' হাতে শীলার জলের মতো নরম শরীর চেপে ধরে। বলে, আদরখাকি!

উসস। শীলা শব্দ করে।

আদর খেয়ে শখ আর মেটে না তোর বউ?

শীলা করতলে চেপে ধরে তার মুখ, বলে, কথা নয়। আদর।

মুখটা সরিয়ে নিয়ে অজিত হাসে, বলে, আমি যে হাঁফিয়ে যাই! তুই যে বড় বেশি আদরখাকি।

তুমি বুড়ো।

তুই কচি খুকি।

শীলা আদর খেতে খেতে বলে, না না, আমাদের সবকিছু মাপমতো। বয়স-টয়স সব।

মেড ফর ইচ আদার?

উম্‌ম্‌।

রতিক্রিয়ার পর যখন তারা তৃপ্ত ও ক্লান্ত তখন একটা সিগারেটের জন্য বুকটা বড় ফাঁকা লাগে অজিতের। বেরোতে যাচ্ছিল, শীলা জামা টেনে ধরে, কোথায় যাচ্ছ? সিগারেট?

আগে বাথরুম। তারপর একটা সিগারেট।

উঁহু।

অজিত সিগারেটের পিপাসা নিয়ে বসে থাকে। মেয়েদের এই বড় দোষ। স্বামীর কীসে ভাল হবে তা সময়মতো সঠিক বুঝতে পারে না, নিজের ধারণামতো চালায়। বিরক্তির সৃষ্টি করে। রতিক্রিয়ার পর এখন শীলার আকর্ষণ কিছুক্ষণের জন্য আর নেই। কেবল সিগারেটের জন্য বুকটা শূন্য। পিপাসা।

তবু অজিত মশারির বাইরে গেল না। হাত বাড়িয়ে বিছানার পাশের ছোট টেবিল থেকে জগ এনে জল খায়, শীলাকে খাওয়ায়। এক সময়ে আস্তে করে বলে, মাকে বলে আসব কাঁথাটাঁথা সেলাই করতে।

শীলা আঁতকে উঠে বলে, এখনই কেন?

বুড়ো মানুষ, এখন থেকে শুরু না করলে সময়মতো হবে না।

না, না! শীলা বলে, বাচ্চা হওয়ার আগে ও-সব করতে নেই।

কেন?

ও-সব তুকতাক তুমি বুঝবে না। বেশি সাধ করলে যদি খারাপ কিছু হয়!

দূর, যত সব মেয়েলি সংস্কার।

বাচ্চা হওয়ার আগে বাচ্চার জন্য কিছু করা বারণ। ও-সব করবে না। বেশি আদেখলাপানা ভাল নয়।

অজিত একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, আচ্ছা।

॥ ষোলো ॥

অফিসে ফিশ খেলা হয় রানিং জোকারে। তাস বাঁটার পর যে তাসটা চিত হয় তার পরের নম্বরটা হয় জোকার, টেক্কা পড়লে দুরি, দুরি পড়লে তিন। অজিতের কপাল ভাল। প্রতিবার সে ঠিক দুটো-তিনটে জোকার পেয়ে যায়। প্রচণ্ড জেতে। প্রতি কার্ডে দশ পয়সা হিসেবে এক-একদিন আট-দশ টাকা পর্যন্ত জিতে নেয়।

মাঝখানে খেলত না, আবার ইদানীং খেলে অজিত। মনটা একরকম ফুর্তিতে থাকে আজকাল। মেশিন ডিপার্টমেন্টের কুমুদ বোস বয়স্ক লোক। চেহারাখানা বিশাল, এক সময়ে গোবরবাবুর আখড়ায় বিস্তর মাটি মেখেছে। চুলে কলপ-টলপ দিয়ে ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে রইসবাবুর মতো থাকে সব সময়ে। বুদ্ধি কিছুটা ভোঁতা, কথায় ভরপুর আদিরস। হেরে গিয়ে প্রায় দিনই বলে, ভাদুড়ি, তুমি তো শালা ম্যাজিশিয়ান।

অজিত বলে, তাতে কী?

ম্যাজিশিয়ান মানেই হচ্ছে শাফলার।

অজিত হেসে বলে, একা আমিই তো প্রতিবার শাফল করছি না। সবাই করছে।

তবু তুমি শালা তুকতাক জানো ঠিকই। নইলে রোজ জেতো কী করে?

কপাল। অজিত বলে।

কপাল না কচু। বলে গজগজ করে বোস—মুফত বসে বসে অতগুলো টাকা মাইনে পিটছ, দোহাত্তা জিতছ তাসে, তোমারটা খাবে কে হে? অ্যাঁ। এতদিনে একটা ছেলেপুলে করতে পারলে না!

সেটাও কপাল।

কপাল-টপাল নয়। ও-সব করতে পুরুষকার চাই। তোমার সেটা নেই। কতবার তো বলেছি, যদি নিজে না পারো তো বউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

উলটো দিক থেকে অরুণ দত্ত ধমক দেয়, বোসদা, চুপ!

বোস বলে, ও শালা জিতবে কেন রোজ?

গোপাল মুখার্জি সিগারেটসুদ্ধ ঠোঁটে বলে, ও রোজ সেফটি রেজার দিয়ে কপাল কামায়।

বোস থমথমে মুখ করে বলে, কামায়? তাই হবে। ও শালা সবই কামিয়ে ফেলেছে বোধহয়। পুরুষকার-টুরুষকার সব।

একটা হাসি ওঠে।

অজিত সিগারেটের ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চেয়ে বলে, বোসদা, এবার আপনাদের দেখাব।

দেখাবে মানে?

দেখবেন। সময় হোক।

কিছু বাঁধিয়েছ নাকি এতদিনে?

অজিত উত্তর না দিয়ে হাসে।

বোস শ্বাস ছেড়ে বলে, বুঝেছি। কিন্তু এত দিন লাগল? আমার পাঁচ-ছ'টা নেমে গেছে, গোপালের ক'টা যেন! তিনটে না? ছ'বছরের বিয়েতে ভাল প্রগ্রেস! অরুণ, তোর? তুই তো নিরুদ্ধবাবু, সেই কবে একটা বানিয়ে বসে আছিস, পাঁচ বছরের মধ্যে আর মুখে-ভাতের নেমন্তন্ন পেলুম না! করিস কী তোরা, অ্যাঁ?

সরকারের বারণ আছে। অরুণ দত্ত জবাব দেয়।

কী একটা অশ্লীল কথা বলতে যাচ্ছিল বোস, অজিত সিগারেট ধরিয়ে লাইটারটা বোসের মুখের কাছে ধরে বলল, ফের কোনও খারাপ কথা বেরোলে ছ্যাঁকা দিয়ে দেব। চুপ!

লাইটারটা পট করে কেড়ে নেয় বোস। নেড়েচেড়ে দেখে। বলে, মাইরি কী জিনিস যে বানায় সাহেবরা! আমি সিগারেট খেলে ঠিক এটা মেরে দিতুম।

তাস বাঁটা হয়েছে। সবাই হাতের তাস সাজাচ্ছে। চিতিয়ে পড়েছে টেক্কা, অর্থাৎ রানিং জোকার হচ্ছে দুরি। এবার অজিতের প্রথম টান। সে প্যাকের তাসের দিকে হাত বাড়িয়েছে, ঠোঁটে সিগারেট, চোখ কোঁচকানো, মাথার ভিতরকার যন্ত্র অটোমেশনের মতো হিসেব করে যাচ্ছে।

একটা অচেনা স্বরে কে ডাকল, অজিত!

অজিত উত্তর দিল, উঁ, কিন্তু ফিরে তাকাল না। ডাকটা তার ভিতরে পৌঁছয়নি।

অরুণ দত্ত ঠেলা দিয়ে বলে, কে ডাকছে দ্যাখ।

অজিত বিরক্ত হয়ে ফিরে তাকায়। টিফিনের সময় শেষ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি করলে এখনও আর দুই রাউন্ড খেলা হতে পারে। এর মধ্যে কে আপদ জ্বালাতে এল!

অজিতের ঠোঁটে সিগারেট, তার ধোঁয়ায় চোখে জ্বালা, জল। স্পষ্ট কিছু দেখতে পায় না অজিত। ঘাড়টা ঘুরিয়ে একপলক আগন্তুকের দিকে চায়। নস্যি রঙের র‍্যাপার গায়ে বুড়ো একটা লোক। গ্রাম্য চেহারা। লোকটা তার চোখে একটু বিস্ময়ভরে চেয়ে আছে।

কী চাই? অজিত জিজ্ঞেস করে।

লোকটা তার চোখে চোখ রেখে একটু স্তম্ভিতভাবে চেয়েই থাকে। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, আমার পলিসিটার ব্যাপারে এসেছিলাম। তুমি ব্যস্ত থাকলে...

অজিত হঠাৎ লোকটাকে চিনতে পারে। ব্রজগোপাল লাহিড়ী, তার শ্বশুর। সিগারেটটা টপ করে নামায় সে।

ওঃ! বলে শশব্যস্তে উঠে পড়ে। আশেপাশে চেয়ার টেনে বসে যারা খেলা দেখছিল তাদের একজনের হাতে নিজের তাসটা ধরিয়ে দিয়ে আসর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

শ্বশুরমশাই এই অবস্থায় তাকে দেখে ফেলেছেন বলে অজিতের একটু লজ্জা করে। অফিসে বসে তাসটাস খেলা এ লোক যে ভাল চোখে দেখে না, এ তো জানা কথাই। তার ওপর পয়সার খেলা। ভাগ্যিস নগদ পয়সার খেলা হয় না! খাতায় হিসেব লেখা থাকে, মাসের শেষে পেমেন্ট হয়। তবু অস্বস্তি বোধ করে অজিত। এ লোকটার সামনে সে বরাবর এক অনির্দিষ্ট কারণে অস্বস্তি বোধ করেছে।

বহু দিন পর দেখা, একটা প্রণাম করা উচিত হবে কি না ঠিক বুঝতে পারছিল না অজিত। অফিসের মধ্যে অবশ্য লজ্জাও করে।

দু'ধারে সার বেঁধে আই-বি-এম মেশিনগুলি চলছে। অনুচ্চ মৃদু শব্দ, কিন্তু অনেকগুলো মেশিনের শব্দ একসঙ্গে হচ্ছে বলে ঘর ভরে আছে শব্দে। তাসের মতো কার্ডগুলি রোলারের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে অনায়াসে, পড়ছে বিভিন্ন খোপে। ঠিক তাসের মতোই মেশিনগুলি তাস শাফল করছে, বাঁটছে। টিফিনের সময়ে মেশিন চলে না। কিন্তু এখন কমিশনের সময় বলে চলছে। কিছু লোক কাজ এগিয়ে রাখে। বিস্ময়ভরে ব্রজগোপাল যন্ত্রগুলির দিকে চেয়ে থাকেন একটু। ব্রজগোপালের পিছনে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রণেন। পরনে চমৎকার কাঠকয়লা রঙের সুট, চওড়া মেরুন টাই, গালে পানের ঢিবি। হাবাগঙ্গারাম। শ্বশুরমশাইকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে রণেনই এসে ডেকে নিতে পারত অজিতকে, তা হলে আর অজিতকে ওই অবস্থায় দেখতেন না উনি।

রণেন এগিয়ে এসে বলে, অজিত, চেকটা?

বিরক্তি চেপে অজিত বলে, ডিসচার্জ ফর্মটা জমা দিয়েছ কবে?

এক মাস তো হবেই।

অজিত চিন্তিতভাবে বলে, এতদিনে চেক তো রেজিস্টার্ড পোস্টে চলে যাওয়ার কথা তোমাদের বাড়িতে।

যায়নি।

অজিত একটু হেসে বলে, সরকারের ঘর থেকে টাকা বের করার কিছু পেরাসনী তো আছেই। সাধারণত ফর্ম জমা দেওয়ার মাস দুই-তিন পর চেক যায়। আমি বলে রেখেছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা ছিল।

ব্রজগোপাল আই-বি-এম মেশিনের কার্ড বিলির চমৎকার নিপুণতা লক্ষ করে মেশিন থেকে চোখ তুলে তাঁর বড় জামাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, একটু খোঁজ নিয়ো। কোনও জায়গায় আজকাল আর কাজকর্ম তাড়াতাড়ি হয় না।

আজই খোঁজ নিচ্ছি। হয়তো আজ-কালের মধ্যেই চেক চলে যাবে। আপনি এখন কয়েকদিন কলকাতায় থেকে যান।

ব্রজগোপাল তার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। তাঁর চোখের বিস্ময় ভাবটা এখনও যায়নি। বললেন, আমি তো কলকাতায় থাকতে পারব না। তবে যদি বলো তো আবার কাল-পরশু আসতে পারি।

অত ছোটাছুটির দরকার নেই। অজিত সহানুভূতির সঙ্গে বলে, রেজিস্ট্রি চিঠির খবর পেলে

আপনি পরে এসে রিসিভ করে চেক ব্যাঙ্কে জমা দিলেই চলবে। রেজিস্ট্রি চিঠি পোস্ট অফিসে দিন-সাতেক ধরে রাখবে।

ব্যাপারটা অত সহজ তা যেন বিশ্বাস হতে চায় না ব্রজগোপালের। বলেন, আর কোনও সইসাবুদ বা সাক্ষির দরকার নেই তো?

না, না।

ব্রজগোপাল রণেনের দিকে চেয়ে বললেন, তা হলে তো হয়েই গেল। চিঠি এলে তোমরা আমাকে খবর দিয়ো।

বলে ব্রজগোপাল দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, তোমরা সব ভাল আছ তো?

প্রশ্নটা অজিতকে করা। সে পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে বলে, ভালই। আপনার শরীর খারাপ শুনেছিলাম।

শরীরমুখী চিন্তা কখনও করি না। কাজকর্ম নিয়ে থাকি, ভালই আছি।

কী একটা বুকের ব্যথার কথা শুনেছিলাম।

হয় বটে মাঝেমধ্যে একটা। সেরেও যায়। আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠি খেতখামার করি।

এই বয়সে একটু বিশ্রাম দরকার।

বিশ্রাম মানে তো শুয়ে-বসে থাকা নয়। বিশ্রাম হচ্ছে এক বিশেষ রকমের শ্রম। কোনও কোনও কাজই আছে যা ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়।

অজিত এ-বাবদে আর কথা বলতে ভরসা পায় না।

সিঁড়ি বেয়ে ব্রজগোপাল লবিতে আসেন। রণেন বাধ্য ছেলের মতো ব্রজগোপালের পায়ে পায়ে হাঁটছে। তার মুখে অন্যমনস্কতা, আর বিষাদ, জমিটার ব্যাপারে আর কোনও কথা বলতে আসেনি রণেন। কথা ছিল, ও বউয়ের নামে জমিটা কিনবে। এখন কার নামে যে লক্ষ্মণের জমিটা কেনা হবে তা সঠিক বুঝতে পারছে না অজিত।

ব্রজগোপাল লবি পার হয়ে পেভমেন্টে নেমে দাঁড়ালেন। বললেন, অজিত, তুমি ফিরে যাও বরং! কাজের ক্ষতি হচ্ছে।

কাজ বলতে ব্রজগোপাল কী বোঝাচ্ছেন তা বুঝতে পারে না অজিত। উনি তাকে তাস খেলতে দেখেছেন। বলা যায় না, কুমুদ বোসের দু'-একটা রসিকতাও হয়তো কানে গিয়ে থাকবে। তাস খেলাটাকেই 'কাজ' বলে ঠাট্টা করছেন নাকি? অবশ্য ঠাট্টা করার লোক নন।

অজিত বলে, না, ক্ষতি হবে না। এটুকুতে কী আর ক্ষতি?

তবু তুমি তো ইনচার্জ। তুমি ফাঁকি দিলে কর্মচারীরাও ফাঁকিই শিখবে।

অজিত হেসে বলে, টিফিন শেষ হতে এখনও কিছু বাকি আছে।

ও।

অজিত কবজির ঘড়িটা আড়চোখে দেখে নেয়। টিফিনের টাইমটা হড়কে গেল। শেষ কয়েকটা ডিল খেলা গেল না। খুব জমেছিল আজ। শ্বশুরের দিকে চেয়ে বলল, আমাদের বাসায় তো আসেন না।

দূরে থাকি। সময় পাই না। দুর্বল অজুহাত দেন ব্রজগোপাল।

আপনার মেয়ে আপনার কথা খুব বলে।

হুঁ! বলে ব্রজগোপাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান। ছেলেমেয়েরা তাঁর কথা বলে এটা যেন ঠিক তাঁর বিশ্বাস হতে চায় না।

একদিন যাব গোবিন্দপুরে। অজিত বলল।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ফেলে জামাইয়ের মুখের দিকে তাকান। বিশ্বাস করেন না, তিনি কলকাতার লোকের মুখের কথায় বিশ্বাস করেন না। তবু মাথা নেড়ে বললেন, যেয়ো। জায়গাটা ভালই লাগবে।

একটু অন্যমনস্ক রইলেন ব্রজগোপাল। পেভমেন্টে গা ঘেঁষে অচেনা লোকেরা চলে যাচ্ছে। হাজার লোকের ভিড়ে এক অদ্ভুত অন্যমনস্কতাবশত তিনি বললেন, শীলার মুখটা ভুলেই গেছি। কতকাল দেখি না।

আজই তো যেতে পারেন বাসায়, শীলা ভীষণ খুশি হবে।

ব্রজগোপাল জামাইয়ের মুখে মেয়ের নাম শুনে বোধহয় একটু বিরক্ত হন। অজিত লক্ষ করে। ব্রজগোপাল বললেন, আগে প্রথা ছিল ছেলেপুলে না হলে মেয়ের বাড়িতে তার বাপ-মা যায় না।

অজিত সামান্য হাসে। ছেলেপুলে না হলে— কথা লক্ষ্য করেই হাসা। বলল, ও-সব তো প্রাচীন সংস্কার। না মানলেই হল।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, সংস্কারটা ভাল না মন্দ তা না-জেনে ভাঙতে আমার ইচ্ছে করে না। তার দরকারই বা কী! আমরা বুড়ো হয়েছি, সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব না হতে পারে। তোমরা যেয়ো।

যাব।

রণেন একটু এগিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে ডাকল, বাবা, আসুন।

ব্রজগোপাল বিরক্তির স্বরে বললেন, ট্যাক্সি নিলে নাকি?

হ্যাঁ। রণেন কুণ্ঠিত ভাব দেখায়।

কেন?

এ-সময়টায় বড্ড ভিড়। ট্রামে-বাসে ওঠা যায় না।

ভিড় হলেও তো লোকে যাচ্ছে আসছে! আমাদের বাবুগিরির কী দরকার?

ট্যাক্সিটা ছেড়ে যেতে অজিত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। আজ টিফিন খায়নি। খিদে পেয়েছে।

কিছু খাবে বলে ফুটপাথের হরেক টিফিনওয়ালাদের দিকে কয়েক কদম এগিয়েও গিয়েছিল সে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়, শীলা বলেছিল ভাল চকোলেট নিয়ে যেতে। আর ঝাল আচার। আর চানাচুর। এই প্রথম শীলা এ-সব খেতে চাইছে। তার অর্থ, প্রেগন্যান্সির কোনও গোলমাল নেই।

ছোরার মারের মতো একটা তীক্ষ্ণ ও তীব্র আনন্দ বুক ফুঁড়ে দেয় হঠাৎ। এত তীব্র সেই আনন্দের অনুভূতি যে অজিতের শ্বাসকষ্ট হতে থাকে, হাত-পায়ে রিমঝিম করে একটা ঝিঝি ছাড়ার মতো হতে থাকে।

অজিত অফিসের সিঁড়ি ভেঙে উঠে যায়।

আই-বি-এম মেশিনগুলি সঙ্গমকালীন সুখের শব্দ তুলে চলছে। মেশিনগুলির পাশ দিয়ে হালকা পায়ে চলে যায় অজিত। অফিসার সেনগুপ্তর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

সেনদা!

উঁ। বলে সেনগুপ্ত মুখটা তোলেন। হাসেন।

আজ চলে যাচ্ছি।

কী একটা খবর শুনছি!

কী?

কুমুদ বোস বলে গেল। বউমার নাকি—

অজিত দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলে, একদিন বোসটাকে ঠ্যাঙাব সেনদা।

মুখটা খারাপ, নইলে লোকটা খারাপ না। বলছিল—

কী বলছিল?

বলছিল, ম্যাজিশিয়ানের সব বিফলে যাচ্ছিল, আসল ম্যাজিকটা এত দিন দেখাতে পারছিল না।

বউয়ের পেটে দুনিয়ার সবচেয়ে আশ্চর্য ম্যাজিকটা দেখাতে না পারলে নাকি সব বৃথা। বলে সেনগুপ্ত মোটা শরীরে দুলে দুলে হাসেন, সেটা এত দিনে দেখিয়েছে ম্যাজিশিয়ান।

এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। সেনদা, আজ যাচ্ছি।

যাও। কিন্তু আমার পাড়ার স্কুলে একটা চ্যারিটি শো দিতে হবে, মনে থাকে যেন। বিনা পয়সায়।

আমার তো সব টেবিল-ম্যাজিক। শো দিতে অ্যাপারেটাস লাগে।

ও-সব শুনছি না। আমি কথা দিয়ে রেখেছি। ফান্ডের অভাবে স্কুলটা উঠে যাবে হে। আমি সেক্রেটারি হয়ে বসে বসে দেখব?

আচ্ছা।

অজিত অফিস থেকে বেরোবার আগে আর-এক বার আই-বি-এম মেশিনগুলির সামনে দাঁড়ায়। কতকাল ধরে এই সব মেশিন সে ঘাঁটিছে। একঘেয়ে সব শব্দ। কিন্তু আজ শব্দটা অন্য রকম শোনায়। রতিক্রিয়াকালে শ্বাসবায়ুর মুখের শব্দ, দাঁত ঘষার শব্দ, চুম্বনের শব্দ—সব মিলেমিশে একটা তীব্র কম্পন উঠছে। অজিতের বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে একটা আনন্দ ছোরা মারে আবার। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো শরীর চমকায়।

প্রায় ছুটে বেরিয়ে আসে অজিত। ক্যাডবেরি কেনে, আচার কেনে, চানাচুর কেনে। গ্র্যান্ট স্ট্রিট থেকে কিছু না ভেবে একটা শাড়িও কিনে ফেলে হঠাৎ। টাকা উড়িয়ে দেয়।

এই দুপুরের নির্জনে সে বাড়ি ফিরে কী লিপ্সায়, কী কাতরতায় শীলাকে মিশিয়ে ফেলবে নিজের সঙ্গে। তীব্রতায় সে প্রবেশ করবে শীলার অভ্যন্তরে! শীলা ভীষণ—ভীষণ—ভীষণ—সুখে, লজ্জায়, হাসিতে একাকার হয়ে যাবে তার সঙ্গে!

শীলা হারিয়ে গিয়েছিল। কতকাল অজিতের জীবনে শীলা প্রায় ছিলই না। আবার হঠাৎ কবে শীলা পরিপূর্ণ বউ হয়ে গেল!

ধৈর্যহারা অজিত অস্থির হয়ে ধর্মতলা থেকে ট্যাক্সি ধরল। বলল, জোরে চালান ভাই! জোরে—

॥ সতেরো ॥

ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা। সারাটা দিন যখন শীলা একা, তখনই ভূতে ধরে তাকে। ভূতের ঢিল এসে পড়ে মাথার ভিতরের নিথরতায়। সারাদিন শুয়ে আর বসে সময় কাটে না। দিনটা কেবলই লম্বা হতে থাকে। মাঝে মাঝে অজিত অফিস কামাই করলে তবু এক রকম কেটে যায় সময়। কিন্তু আদর ভালবাসা যখন শেষ হয় রতিক্রিয়ায়, তারপর ক্লান্তি আসে, কথা ফুরোয়, টান করে বাঁধা তার হঠাৎ ঢিলে হয়ে বেসুর বাজতে থাকে। বহু দিন শীলা এমন ভালবাসা পায়নি অজিতের কাছ থেকে। আবার বহুকাল ধরে সে নিজেও ভালবাসেনি এত অজিতকে। তবু দিনটা কাটতে চায় না। একা বা দু'জন।

একা থাকাটা আরও ভয়ংকর। এখন ইস্কুলে পরীক্ষার সময়। এ সময়ে দু'-একটা বেশি ক্লাস নিতে হয়, কোচিং থাকে। মেয়েদের ইস্কুলের নিয়মে বড় কড়াকড়ি। সাড়ে চারটে পর্যন্ত দম ফেলার সময় থাকে না। কিন্তু সেই ব্যস্ততা শীলার বড় ভাল লাগে। নিজেকে ভারী গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বলে মনে হয়। ফাঁকে ফাঁকে টিচার্স রুমের আড্ডাটি! খুব ব্যস্ততার মধ্যে দু'-পাঁচ মিনিটের চুরি করা আড্ডা যা ঝলমলে করে দেয় মনটাকে।

ইস্কুলের জন্য মনটা বড় উন্মুখ হয়ে থাকে শীলার। কলকাতার শীতের দুপুরের মতো এমন সুন্দর সময় আর কি হয়! এমন দুপুরে ঘরে পড়ে থাকার মতো শাস্তি আর কী হতে পারে? নির্জনতা জিনিসটা কোনও দিনই সইতে পারে না সে। তার ভাল লাগে রাস্তাঘাট, মানুষজন, আলো ঝলমলে চারধার।

ভাল লাগে ক্লাসভরতি ছাত্রী, টিচার্স রুমের জমজমাট কথার শব্দ। আর ভাল লাগে কাজ। সংসারের কাজ তার দু'চোখের বিষ। কোনও কোনও মেয়ে থাকে যারা সংসারে ঢুকে, মধুর মধ্যে যেমন মাছি আটকে যায়, তেমনি আটকে থাকে। যেমন মা। ঘরসংসারে অমন আকণ্ঠ ডুবে-থাকা মানুষ কমই দেখেছে শীলা। সারা দুপুর মা জেগে থেকে টুকটাক কাজ করছে তো করছেই। কোনও কাজ না পেলে ঝিয়ের মেজে যাওয়া বাসনে কোন কোণে একটু ছাইয়ের দাগ লেগে আছে ব্লেড দিয়ে ঘষে ঘষে তাই তুলবে, আর আপনমনে বকতে থাকবে— ইস, কী নোংরা কাজ! বাপের জন্মে এমন নোংরা কাজ করতে কাউকে দেখিনি। সারা দুপুর রেশনের গম ঝাড়বে কুলোয়, চাল বাছবে, নইলে ফেরিওলা ডেকে সংসারের জিনিস কিনবে দরদস্তুর করে। ও-রকম জীবনের কথা শীলা ভাবতেও পারে না। তার নিজের সংসারটা পড়ে থাকে বাচ্চা ঝিয়ের হাতে। ছাড়া শাড়িটাও শীলাকে ধুতে হয় না, রান্নাবান্না থেকে যাবতীয় কাজ করে দেয় ঝিটা। রান্নায় কখনও কখনও গোলমাল করে। ঘরদোর খুব পরিষ্কার রাখে না, কাজ ফাঁকি দিয়ে পড়ে ঘুমোয়, কিন্তু তবু সংসারটা চলে ঠিকই। কিছু তেমন অসুবিধে বোধহয় না।

অবশ্য এই ইস্কুল করা বা বাপের বাড়ি মাঝে মাঝে যাওয়া বা একটু দোকান পসার করা—এ ছাড়া শীলাও কি ঘরবন্দি নয়? অজিতের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার ধাতই নেই। বড় ঘরকুনো লোক। প্রচণ্ড আলসে। সারাদিন ঘর আর বারান্দা করে, সিগারেট খেয়ে কাটিয়ে দেবে, ছুটির দিনে রাস্তাঘাটে হাঁটতেও চায় না, বলে, যা ভিড়, আর রাস্তাঘাটের যা বিচ্ছিরি অবস্থা! এই লোকটার সঙ্গে থেকে শীলার বেড়ানোর শখ-আহ্লাদ চুলোয় গেছে।

যে যেমন চায় সে তেমন পায় না কখনও। যেমন তার ছোট বোন ইলা। ঠিক মায়ের স্বভাব পেয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই ঘরের কোণে বসে একমনে বিভোর হয়ে পুতুল খেলত, ছাদে যেত না, সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে খেলতে তেমন ভালবাসত না। বড় হয়ে মা'র সঙ্গে ঘুরঘুর করে ঘরের কাজ করত। বিছানা তোলা বা পাড়া, টুকটাক একটু রান্না নামানো চড়ানো, শুকনো কাপড় গুছিয়ে রাখা, ধোপার হিসেব, সংসারের হিসেব রাখা। বিয়ে হল একটা উজ্জ্বল স্মার্ট ছেলের সঙ্গে। বোম্বাইতে চাকরি করে। হুল্লোড়বাজ ছেলে। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে ভাল লাগে না বলে কলকাতার সরকারি চাকরি ছেড়ে বোম্বাইতে একটা বেসরকারি ফার্মে চাকরি নিয়ে চলে গেল। সেখানে খুব আউটডোরে যায়। দিল্লি মাদ্রাজ করে প্রায়ই। সব সময়ে ঝুঁকি নিতে ভালবাসে। ঘরের জীবনের চেয়ে বাইরের জীবনটা ওর বড় প্রিয়। ইলাকে প্রায়ই ধমকায়, বলে, রোজ রান্নাবান্নার কী দরকার? সপ্তাহে দু'-তিন দিন হোটেলে খেলেই হয়!

অমল আর ইলা বছর তিনেক আগে এক বার এসেছিল। তখনই অমল দুঃখ করে বলেছিল শীলাকে—শীলাদি, আপনার বোনটি একদম ইনডোর গেম।

কেন?

বেরোতেই চায় না মোটে। সারাদিন কেবল ঘর সাজাবে আর গুচ্ছের খাবার-দাবার তৈরি করবে। আমাদের মতো ছেলে-ছোকরার কি ঘরে এসে বসে খুনসুটি ভাল লাগে! বলুন! আমি ওকে প্রায়ই বলি, চলো দু'জনে মিলে হিপি হয়ে যাই। শুনেই ও ভয় খায়।

শীলা দীর্ঘশ্বাস চেপে হেসে বলেছে, আর আমার শিবঠাকুরটি হচ্ছে উলটো। ব্যোম বাবা ভোলানাথ হয়ে ঘরে অধিষ্ঠান করবেন। কলকাতা শহরের বারো আনা জায়গাই এখনও চেনেন না। কেবল অফিসের পরে আড্ডাটি আছে, আর কোনও শখ-আহ্লাদ নেই। আমার যে বাইরে বেরোতে কী ভাল লাগে!

অমল বড় মুখ-পলকা ছেলে, দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে কথা বলে না। ফস করে বলে বসেছিল, ইস শীলাদি, ইলার বদলে আপনার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হত!

শীলা মুখ লুকোতে পথ পায় না। বুকের মধ্যে গুরগুরুনি উঠে গেল তখনই। সবশেষে খুব হেসেছিল।

ইলা ধমক দিয়ে বলল, দিদি গুরুজন না! ও কী রকম কথা!

অমল অবাক হয়ে বলে, তাতে কী হল! সম্পর্ক তো ঠাট্টারই।

কথাটা ঘোরানোর জন্য শীলা বলে, তা তুই-ই বা ওর সঙ্গে বেরোস না কেন?

আমি অত ঘুরতে পারি না। গাড়ি-ঘোড়ায় বেশিক্ষণ কাটাতে বিশ্রী লাগে। হোটেলে আমি বড্ড আনইজি ফিল করি। তা ছাড়া নতুন নতুন জায়গায় নিয়ে যাবে, সেখানে পা দিয়ে বিশ্রামটুকুও করতে দেবে না। চলো, সমুদ্রে স্নান করে আসি। চলো পাহাড়ে উঠি। জায়গাটা দেখে আসি চলো। আমার দমে কুলোয় না।

তোমার লাইফ ফোর্স কম। শীলাদিকে দেখো, চোখে-মুখে আর শরীরে টগবগ করছে জীবনীশক্তি। শুনে শীলা হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। বলেই অমল শীলার দিকে ফিরে বলে, জানেন শীলাদি, ঘুরব বেড়াব ফুর্তি করব বলে বাচ্চাকাচ্চা হতে দিইনি এতকাল। কোম্পানি থেকে ইয়োরোপের মার্কেট যাচাই করতে পাঠাবে বলছে, ভাবছিলাম ইলার ভিসাটাও করিয়ে নেব। কিন্তু এই আলুসেদ্ধ মার্কা মহিলাকে নিয়ে গিয়ে ঝামেলা ছাড়া কিছু হবে না, সাহেবসুবোর জায়গা—আমি চোখের আড়াল হলেই হয়তো ভয়ে কাঁদতে বসবে।

ইলা মুখ ঝামরে বলে, যেতে আমার বয়ে গেছে!

অমল শীলার দিকেই চেয়ে ছিল, দুঃখ করে বলল, ভেবে দেখলাম, বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করতেই ওর জন্ম হয়েছে। তাই ভাবছি এবার বোম্বাই ফিরে গিয়েই বাচ্চার ব্যবস্থা করে ফেলব।

সে কী লজ্জা পেয়েছিল শীলা! অমলের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলার ওই হচ্ছে মুশকিল। গনগনে অ্যাগ্রেসিভ চঞ্চল, প্রাণপ্রাচুর্য ভরা ছেলে। কোনও কথাই বলতে মুখে আটকায় না। কিন্তু ওকে বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। বুক গুর গুর করে। দমকা বাতাসের মতো মনের দরজা-জানালার খিল নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

সংসারে ঠিক এ-রকমই হয়। যা চাওয়া যায় তার উলটোটি বরাতে জোটে।

মনের ভিতরে কত পাপের বাসা। বলতে নেই, শীলার এক-এক সময়ে মনে হয়েছে, অমলের সঙ্গে তার বিয়ে হলে মন্দ হত না। দমকা বাতাসের সঙ্গে খড়কুটোর মতো উড়ে বেড়াতে পারত। কলকাতা ছাড়া আর কোথায়ই বা তেমন গেছে শীলা। অনেক বলেকয়ে এক বার পুরী গিয়েছিল, এক বার দার্জিলিং আর কাছেপিঠে দু'-একটা জায়গায়। ইস্কুলের স্টাফ সবাই মিলে বছরে দু'বছরে এক-আধবার ডায়মন্ডহারবার বা কল্যাণীতে গেছে পিকনিক করতে, এক বার স্টিমার পার্টিতেও গিয়েছিল অজিতের অফিস স্টাফের সঙ্গে। কিন্তু বিশাল ব্যাপ্ত পৃথিবীতে এ তো চৌকাঠ পেরোনোও নয়। আর ইয়োরোপ ওদিকে হাত বাড়িয়ে আছে ইলার দরজায়, ইলা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। গতবার ওর ছেলে হল, কলকাতা থেকে ওর শ্বশুর-শাশুড়ি গিয়ে ইলাকে আগলাচ্ছে। অমল গত সেপ্টেম্বরে চলে গেছে ইয়োরোপে। বড় কষ্ট হয় শীলার! ইলুটা বড্ড বোকা।

ঘরবন্দি থাকা মানে একরকম মরে যাওয়া। সে তাই বিয়ের পরই চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। তার শ্বশুরবাড়ি বড্ড সেকেলে, মেয়ে-বউদের চাকরি কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু ওই বড় সংসারে জবরজং আটকে থাকার হাত থেকে মুক্তি পেতেই শীলা চাকরিটা জোগাড় করেছিল অতি কষ্টে। ওই চাকরিই তার শ্বশুরবাড়ির বদ্ধ সংসারে হাওয়া-বাতাসের কাজ করেছে। নইলে সে মনে মনে মরে থাকত এতদিনে। সেই চাকরি থেকেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। কিন্তু চাকরি ছাড়েনি শীলা। তার জেদ বড় মারাত্মক।

তার চাকরির টাকা জমে জমেই জমির দামটা হয়ে গেল, তার সঙ্গে অজিতের সঞ্চয়, আর কিছু ধারকর্জ করে বাড়িটা উঠে গেল অনায়াসে। অজিতের একার রোজগার হলে হত নাকি এত সহজে? তাই শীলার একটা চাপা অহংকার আছে বাড়িটা নিয়ে। একটা মস্ত অভাব ছিল, সন্তান। তাও বোধহয়... না, বলতে নেই। আগে হোক। কত দুষ্টু লোক নজর দেয়, বাণ মারে, ওষুধ করে।

শরীরের ভিতরে একটা প্রাণ, একটা শরীর। এখনও হয়তো একটা রক্তের দলা মাত্র। সেই দলাটা শীলার শরীর শুষে নেয় ধীরে ধীরে, টেনে নেয়, অস্থি-মজ্জা-মাংস। কে এক রহস্যময় কারিগর তৈরি করে চলেছে এক আশ্চর্য পুতুল তার শরীরের ভিতরে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়, কূলপ্লাবী এক অসহ্য আনন্দের ঢেউ গলা পর্যন্ত উঠে এসে দম বন্ধ করে দেয়। ডাক্তার বার বার সাবধান করে দিয়েছে—নড়াচড়া একদম বারণ, একটু দোষ আছে শরীরে। হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পাঁচ মাস ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। তারপর তার তেমন ভয় নেই।

কিন্তু পাঁচটা মাস কি শীলার কাছে কম? এই সুন্দর শীতের দুপুর বয়ে যায় নিরর্থক। সে ঘরের বাইরে পা দিতে পারে না। উল বুনতে বুনতে চোখ ব্যথা করে, দু'হাতের আঙুল অসাড় হয়ে আসে। সকালের খবরের কাগজটা কতবার যে উলটেপালটে পড়ে সে! মোটা মোটা গল্পের বই শেষ করে। সিনেমার মাসিক কাগজ উলটেপালটে দেখে। তবু সময় ফুরোয় না। বই পড়তে একনাগাড়ে ভালও লাগে না। কিন্তু শরীরের ভিতরে আর-একটা শরীরের কথা ভেবে সয়ে যায়। কী নাম হবে রে তোর, ও দুষ্টু ছেলে? খুব জ্বালাবি মাকে? নাক কামড়ে ধরবি, চুল টেনে ধরবি, মাঝরাতে কেঁদে উঠে খুঁজবি মাকে?...না, না, ভাবতে নেই। আগে হোক। ভালয় ভালয় আগে আসুক কোলজুড়ে।...হতে গিয়ে খুব কষ্ট দিবি না তো মাকে? লক্ষ্মী সোনা ছেলে, কষ্ট হয় হোক আমার, তোর যেন ব্যথাটি না লাগে। কেমন ঝামরে আদর করব! মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকব সারাদিন। নিজের পেটে আলতো হাত দু'খানা রেখে শীলা শুয়ে থাকে। বুক ভরে যায়।

কিন্তু তবু, ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

এই শীতকালে দুপুরেই রোদে একটা ধানি রং ধরে যায়। কোমল ঠান্ডা বাতাস দেয় টেনে। গায়ে একটা স্টোল বা স্কার্ফ জড়িয়ে ধীরে রাস্তা ধরে হেঁটে যেতে এখন বড় ভাল লাগে। শীত তার সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। তার দিনে-রাতে, তার কুয়াশায় ঢাকা মায়াবী আবহে, তার ফুলে ও ফসলে একটা দারিদ্র্য ঘুচে যাওয়া প্রাচুর্যের চেহারা আছে। আর থাকে রহস্য, ওম্। পরীক্ষা শেষ হলে শীতকালে ইস্কুলের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে বসে তারা সবাই খাতা দেখে। কখনও নুন মেখে টোপাকুল খায়, কখনও কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মিষ্টি গন্ধে বুক ভরে ওঠে। খাতা দেখার ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা। মেয়েরা যখন কথা বলে তখন সবাই একসঙ্গে বলে, কেউ কারও কথা শোনে না। একজন তার ঝিয়ের গল্প শুরু করতেই অন্যজনও তার ঝিয়ের গল্প শুরু করে দেয়, একজন নিজের ভাইয়ের বিয়ের গল্প ফেঁদে বসতেই অন্যজন তার কথার মাঝখানেই নিজের ননদের প্রসঙ্গ এনে ফেলে। আর ঠিক কথার মাঝখানে তুচ্ছ কারণে সবাই কেবল হাসতে থাকে। এক-এক সময়ে মেয়েরা নিজেরাও ভাবে—ইস্, আমরা কী সব ছোট্টখাট্ট বিষয় নিয়ে কথা বলি—ঝি, গয়না, শাড়ি, বিয়ে! ভাবে, আবার বলেও, আর কেবলই হাসতে থাকে। তুচ্ছ তুচ্ছ সব কারণে, বহুবার শোনা কথা আবার শুনে, কিংবা পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাসি পায় বলে কেবলই হেসে যায় তারা।

শীতের দুপুরটার জন্য মন বড় ছটফট করে শীলার, ঘরে বসে থেকে থেকে সে কেবলই দেখে, দিন পুড়ে কালো হয়ে অন্ধকার নেমে আসছে। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল কোথায়, ছেলেদের হল্লা কানে আসে। মনটা একটা ছবিহীন শূন্য চৌকো ফ্রেমের মধ্যে আটকে থাকে। সামান্য এই কারণে চোখে জল এসে যায়।

তাই ঠিক দুক্কুরবেলা, ভূতে মারে ঢেলা।

আজকাল অবশ্য অজিত মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। কোনও দিন বা অফিস কামাইও করে। কিন্তু বড্ড নির্জীব পুরুষ। হঠাৎ উত্তেজনাবশত প্রচণ্ড আদর করতে থাকে, হাঁটকে-মাটকে একশা করে শীলাকে। এবং তারপর তারা পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তারপরই অজিত অন্য রকম হয়ে যেতে থাকে। একটু বুঝি দূরের মানুষ হয়ে যায়। কথা বলে, আদরও করে, কিন্তু জোয়ারটা

থাকে না। হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে, সিগারেট ধরিয়ে ছাদে বা বারান্দায় যায়। কিংবা আপনমনে ম্যাজিকের সুটকেস খুলে সরঞ্জাম বের করে আনে। আপনমনে পাসিং আর পাসিং অভ্যেস করে। করে কয়েন কনজিওরিং, কাপস অ্যান্ড বলসের খেলা অভ্যেস করতে থাকে। দু'-চারটে স্কুল শোতেও আজকাল ম্যাজিক দেখায় অজিত। কিন্তু যা-ই করুক, শীলা যে একা, সেই একা। যেদিন অজিত থাকে না সেদিন শীলার বুকের ওপর সময়ের ভার হাতির পায়ের মতো চেপে থাকে। পাঁচ মাস! ওমা গো! ভাবাই যায় না।

কখনও কখনও আবার পেটের ওপর হাত দু'খানা রাখে শীলা। কিছুই টের পাওয়া যায় না ওপর থেকে। তবু শীলার হাত যেন ঠিক সেই রক্তের দলার ভিতরে অশ্রুত হৃৎস্পন্দন শুনতে পায়। সেই রক্তের পিণ্ডের ভিতরে বান ডাকে, অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসে স্পন্দন। শীলা টের পায়। ও ছেলে, কেমন হবে রে তোর মুখখানা? কার মতো?...না, না, থাক, ভাবতে নেই। শীলা ফের হাত সরিয়ে নেয়।

কিন্তু ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

ইস্কুলটা খুব বেশি দূরে নয়। বড় রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে যেতে লাগে, অজিতের সাত মিনিট, শীলার দশ মিনিট। সেখান থেকে উলটোবাগের ট্রাম ধরলে ঠিক দুটো স্টপ। স্টপ থেকে মোটে তিন-চার মিনিটের রাস্তা। তবে গলিঘুঁজি দিয়ে একটা শর্টকাট আছে। সে-রাস্তাটা ভাল নয়, কিন্তু রিকশা যায়। এক-এক দিন শীলার খুব ইচ্ছে করে, অজিত বেরিয়ে গেলে, চুপি চুপি উঠে সামান্য একটু প্রসাধন করে বেরিয়ে পড়ে। রিকশাওলাকে বলবে, ভাই খুব ধীরে ধীরে যাবে। বারো আনা ভাড়ার জায়গায় আমি তোমাকে না হয় একটা টাকা দেব। গর্তটর্ত বাঁচিয়ে যেয়ো, যেন ঝাঁকুনি না লাগে।

আবার তখন একটা ভয়ও করে।

ডাক্তাররা যা বলে তার অবশ্য সব সত্যি হয় না। রুগিকে বেশি ভয় দেখিয়ে অনেক সময়েই ওরা একটা বাড়াবাড়ি চিকিৎসা চালায়। ডাক্তারদের সব কথা শুনতে নেই। অন্য কিছু হলে অবশ্য শুনতও না শীলা। কিন্তু সন্তান বলে কথা। বিয়ের পর এতকাল তারা দু'জনে যার পদধ্বনির জন্য কান পেতে ছিল সেই রাজাধিরাজ আসছে। সোজা লোক তো নয় সে। দুষ্টু ছেলে, মাকে যে কী কষ্টে ফেলেছিস! তোর জন্য দ্যাখ তো কেমন ঘরবন্দি আমি! হোক, তবু তোর যেন কিছু না হয়।

কিন্তু ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারে ঢেলা।

দুপুরবেলায় শীলা তার সেলাই রেখে একটা শ্বাস ফেলে উঠল। আজ এক বার যাবে ইস্কুলে। কিছু হবে না। ডাক্তারদের সবতাতেই বাড়াবাড়ি।

॥ আঠারো ॥

ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতে মারল ঢেলা।

ভূতের ঢেলাগুলোই ঘরে টিকতে দিল না শীলাকে। অতিষ্ঠ। মাথার ভিতরে একটা পুকুরে যেন ঢিলের ঝড় বয়ে যায়। বিছানায় সর্বক্ষণ পেতে রাখা শরীরের খাঁজে খাঁজে কেবলই ধৈর্যহীনতার ভূতের ঢেলা এসে পড়ে টুপটাপ। শরীর এপাশ ফিরিয়ে শোয়, ওপাশ ফিরিয়ে শোয়। ভাল লাগে না, বই তুলে নেয় হাতে। সেখানেও টুপটাপ ভূতের ঢিল এসে যেন পড়তে থাকে, মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। রেকর্ড-প্লেয়ার একটা সম্প্রতি কেনা হয়েছে সময় কাটানোর জন্য। কিছুক্ষণ রেকর্ড শুনল সে, ইস্কুলে যাবে বলে উঠেও এইভাবে কিছুক্ষণ সময় কাটায় শীলা। যাবে না যাবে না করে। কিন্তু জানালার বাইরে ওই যে রোদে ধানি রং ধরে গেল, বাতাস মৃদু শ্বাস ফেলে বয়ে যায় হাহাকারের মতো। বাইরের পৃথিবীটা আলোর ইশারা হয়ে দক্ষিণের খোলা দরজার কাছে চৌকো পাপোশের

মতো পড়ে আছে। ওই রোদে চপ্পল পায়ে গলিয়ে এক বার একটুক্ষণের জন্য ঘুরে আসতে বড় ইচ্ছা করে। কী করবে শীলা! এতকাল, এত দিন ধরে ঘরবন্দি থাকার অভ্যাস তো নেই।

কী রে ছেলে, যেতে দিবি এক বার মাকে? একটুক্ষণের জন্য? সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, আর যে পারি না রে! একটু যাব? লক্ষ্মী সোনা, ভয় দেখাস না। তোর জন্য সারাজীবন কত কষ্ট সহ্য করব দেখিস। একটুও বিরক্ত হব না, রাগ করব না। যেতে দিবি? বাবা আমার, ছেলে আমার...

এ-ঘর গেল, ও-ঘর গেল শীলা, ঘড়িতে মোটে দেড়টা, এখনও লম্বা দুপুর পড়ে আছে। রেকর্ডে গান হচ্ছিল, কী গান তা শোনেওনি সে। রেকর্ড শেষ হয়ে ঘস-স্ আওয়াজ হচ্ছে, সেটা বন্ধ করে দিল। তারপর যেন-বা সম্মোহিতের মতোই বেখেয়ালে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে। সামান্য একটু পাউডার, একটু লিপস্টিক ছুঁইয়ে নেয়। আলমারি থেকে শাড়ি বের করে দ্রুত হাতে পরতে থাকে, মনে মনে সময়ের হিসেবটা কষতে থাকে ঝড়ের মতো। যদি চারটেতেও ফেরে অজিত তা হলেও আড়াই ঘণ্টা সময় হাতে থাকে। রিকশায় বড় জোর শর্টকাট করে গেলে পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগবে। যাতায়াতে চল্লিশ মিনিট বাদ দিলেও প্রায় দেড় পৌনে দুই ঘণ্টা সে ইস্কুলে থাকতে পারে। কাজকর্ম করবে না কিছু। কেবল একটু অভ্যাস বজায় রেখে আসবে। একটু কথা, একটু হাসি, একটু চেনা মুখ দেখা, চেনা ইস্কুলবাড়িটার একটা ধুলোটে মৃদু গন্ধ আছে, সেই গন্ধটা একটু বুক ভরে নেওয়া। অজিত টের পেলে ভয়ংকর রাগ করবে, বকবে ভীষণ, সেই ভয়ে বুকটা একটু কেঁপে কেঁপে ওঠে। পুরুষমানুষের সন্তানক্ষুধা বড় প্রবল। সন্তান মানে পুরুষের নিজেরই পুনর্জন্ম। অজিতের নির্বিরোধী জীবনে ওই একটি প্রবল তীব্র ব্যাপার আছে। শীলা তা টের পায় ভীষণ, তার শরীরের এই বিপজ্জনক অবস্থায় সে যদিও বা দু'-একটা বেচাল বেভুল কাজ করে ফেলে, হয়তো একটু জোরে ওঠে বা পাশ ফেরে, কিংবা হয়তো রান্নাঘরে যায় তরকারি পাড়তে কিন্তু অজিতের চোখে পড়লে আর রক্ষা থাকে না। জোর করে আবার শুইয়ে দেবে, পাহারা দিয়ে বসে থাকবে। অজিতকে তাই বড় ভয়।

দ্রুত একটা একবেণি বেঁধে নেয় শীলা, ঝি মেয়েটাকে ঘুম থেকে ডেকে বলে, ঘরদোর দেখে রাখিস।

তুমি বেরোবে বউদি? তোমার না বারণ!

এক্ষুনি আসব।

দাদাবাবু যদি চলে আসে!

বলিস, পাশের বাড়িতে একটু গেছি। একটা রিকশা ডেকে নিয়ে আয় তো।

রিকশায় ওঠার সময়ে যেন অনেকদিন বাদে আকাশ আর পৃথিবীর খোলামেলা কোলটিতে এসে যায় শীলা। কী ভীষণ ভাল লাগে তার।

ভাই রিকশাওলা, আস্তে যেয়ো, খুব আস্তে।

হ্যাঁ।

রিকশা আস্তেই যায়। কখনও একটু জোর হলে শীলা সাবধান করে দেয়। রাস্তাটা খারাপ, এখানে-সেখানে গর্ত। একটু একটু টাল খায়। ওরে ছেলে, ভুল করলাম না তো! সর্বনাশ করিস না, তোর পায়ে পড়ি। না না, ছি ছি, তোর পাপ হবে, পায়ের কথা কেন বলতে গেলাম! চুপ করে থাকিস ছেলে, মাকে ধরে চুপ থাকিস।

দু'হাতে দু'পাশের হাতল ধরে শক্ত হয়ে বসে থাকে সে। শরীরকে যত দূর সম্ভব আলগা করে রাখে সিট থেকে। শরীরের মধ্যে যে রাজার শরীর সে যেন থাকে ভগবান। শরীরের মধ্যে যে দেবতা সে যেন ছেড়ে না যায়।

শরীরের কোনও আবল্যি টের পায় না শীলা। রিকশাটা একটু দুলে দুলে, ধীরে ধীরে রাস্তা পার হয়ে যায়। দূর থেকে ইস্কুলের বাড়িটা দেখতে পায় শীলা, ইস্কুলের ছাদে শীতের সূর্য আটকে আছে।

স্টাফ-রুমটা ভাগ্যিস একতলায়। শীলা দু'ধাপ সিঁড়ি, বারান্দা পার হয়ে স্টাফ-রুমে আসতেই একটা চাপা আনন্দ আর অভ্যর্থনা ছুটে আসে।

কী খবর!

আরে, শীলা!

শুনেছি, শুনেছি, মিষ্টি-টিস্টি খাওয়াও বাবা।

বেশ সুন্দর হয়েছেন শীলাদি।

কংগ্র্যাচুলেশনস।

এইরকম সব কথা। বহুকাল পরে স্টাফ-রুমে পা দিয়ে একটা গভীর তৃপ্তি তাকে ধরে থাকে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে ওঠে, চোখ ঝলমল করে। দাঁতে ঠোঁট চেপে একরকম হাসতে থাকে সে। লজ্জার হাসি। সে আর চিরকালের সেই একা শীলাটি নেই। তার শরীরের মধ্যে এখন অন্য এক শরীর। হয়তো এক রাজার, হয়তো এক দেবতার। অহংকার পাখির মতো তার দু' কান ভরে ডাকে।

সে ঘুরে ঘুরে হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করে, ক্লার্কদের সঙ্গে কথা বলে, ছাত্রীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটায়, স্টাফ-রুমে বসে আড্ডা দেয়। কী ভাল যে লাগে তার! বারবার ঘড়ি দেখে। চারটের এখনও ঢের দেরি আছে।

মীনাক্ষী বলে, শীলা, সুভদ্রর মন খারাপ। দেখছিস না, কথা বলছে না।

সুভদ্র মেয়েদের থেকে দূরে আলাদা চেয়ারে বসে ছিল, এ স্কুলে ছেলে স্টাফ খুব অল্প। পণ্ডিতমশাই ছাড়া একজন পুরনো আমলের বি-এসসি আছে কেবল। সুভদ্র ঢুকেছিল কমিটির প্রেসিডেন্টের সুপারিশে, একজনের লিভ ভেকান্সিতে। খুবই সুন্দর দেখতে সুভদ্র। ফরসা টকটকে রং, লম্বা, একটু রোগা হলেও মুখশ্রী মায়াবী কিশোরের মতো। অল্প দাড়ি রাখে সে, মোটা গোঁফ, গায়ে খুব কমদামি কিন্তু সুন্দর রঙিন খদ্দরের শার্ট পরে সে, টেরিকটের গাঢ় রঙের প্যান্ট পরে। সুভদ্র একটু বোকা। কিন্তু আবার এও হতে পারে যে, বোকামির ভান করে। কারণ তার ধারালো মুখে, বা চোখের তীক্ষ্ণ চাউনিতে বোকামির লেশমাত্র নেই। তবু স্কুলের চটুল স্বভাবের শিক্ষিকাদের মধ্যে সুভদ্রর বোকামির গল্প চাউর আছে। সেটা সুভদ্র জানে, কিন্তু রাগ করে না। বরং হাসে।

শীলার সঙ্গে সুভদ্রর পরিচয় কিছু গাঢ়। বলতে নেই, স্কুলে শীলার মতো সুন্দরী কমই আছে। একটু সুখের মেদ জমেছে সম্প্রতি, নইলে শীলার আর কোনও খুঁত নজরে পড়ে না, দিঘল চোখ দু'খানায় এখনও অনেক কথার, ইঙ্গিতের রহস্যের খেলা দেখায় শীলা, সিঁথেয় সিঁদুর যাদের আছে তারা ছেলেদের সঙ্গে সহজেই প্রথম আলাপের সংকোচটা কাটিয়ে উঠতে পারে। এই সুন্দর কিশোরপ্রতিম চেহারার যুবকটির সঙ্গে আড্ডা দিতে বরাবরই ভাল লেগেছে শীলার। সে মায়া বোধ করে।

শীলা সুভদ্রকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, সুভদ্র, কী হয়েছে? মন খারাপ কেন?

কে বলে মন খারাপ! সুভদ্র নিরুত্তাপ গলায় বলে।

মীনাক্ষী চাপা গলায় বলে, শোভনাদি ফিরে আসছে, তাই সুভদ্রর চাকরি থাকছে না।

শীলা অবাক হয়ে বলে, শোভনাদি ফিরে আসছে! সে কী! উনি তো বরের সঙ্গে মাদ্রাজ গেলেন এই সেদিন। চাকরি বলে করবেন না?

সেইটেই তো গোলমাল হল। ওঁর বর আরও প্রমোশন পেয়ে কোম্পানির ডাইরেক্টর হয়ে কলকাতায় ফিরছেন। শোভনাদি জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে জয়েন করবেন বলে চিঠি দিয়েছেন।

শীলার মন খারাপ হয়ে যায়।

মীনাক্ষী বলে, অবশ্য শুধু সে-কারণেই যে সুভদ্রর মন খারাপ, তা নয়।

আর কী কারণ? শীলা জিজ্ঞেস করে।

সে তো তুই জানিসই বাবা।

কী জানব?

আহা, তুই যে ছুটি নিয়ে ঘরে বসে রইলি, সুভদ্র বেচারা এখন কোন আকর্ষণে স্কুলে আসবে?

শীলার কানটান একটু লাল হয়ে ওঠে। আবার মুখে সে হাসেও। সুভদ্র দূর থেকে এক বার এদিকে তাকিয়েই উঠে বারান্দায় চলে যায়।

বয়স্কা মাধুরীদি ধমক দিয়ে বলেন, তোর ইতর রসিকতাগুলো একটু বন্ধ করবি মিনু?

আহা! কে না দেখতে পাচ্ছে বাবা, শীলা ছুটি নেওয়ার পর থেকেই সুভদ্র কেমন মন খারাপ করে ঘুরছে!

মাধুরী হাসেন। অবিবাহিতা এবং বয়স্কা অচলা মুখখানা গাঢ় গাম্ভীর্যে মেখে রাখেন। মেয়েদের প্রেগন্যান্সি তাঁর সহ্য হয় না। গর্ভবতী মেয়েদের দেখলে রাগ করেন। তবু শীলার পক্ষ হয়ে বললেন, মীনাক্ষী, সব ধোঁয়াই কিন্তু আগুনের ইঙ্গিত করে না।

ঠাট্টা। কিন্তু শীলা একটু অস্বস্তি বোধ করে। সুভদ্র আর ঘরে আসে না।

স্কুল চারটের অনেক আগেই ছুটি হয়ে গেল আজ। পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্য মেয়েরা ছুটি চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেছিল। শুধু উঁচু ক্লাসগুলোর কয়েকটায় ক্লাস চলছে।

তিনটে নাগাদ শীলা বেরিয়ে আসে ফেবার জন্য। বেয়ারাকে রিকশা ডাকতে পাঠিয়েছিল। দীর্ঘ বারান্দার থামের আড়াল থেকে সুভদ্র বেরিয়ে এসে ডাকে—শীলাদি!

কী খবর? পালিয়ে এলেন যে! কথাটা বলতে বলতেই শীলা হঠাৎ টের পায় তার বুকের মধ্যে কী একটা নড়ে গেল। একটা শ্বাস অর্ধেক কেটে গেল। সঙ্গে একটা শ্বাসকষ্ট। শরীরটা ভার লাগে। ভাল লাগছে না।

মীনাক্ষীটা বড্ড স্ট্রেট।

আপনার মন খারাপ কেন?

সুভদ্র একটা শ্বাস ফেলে বলে, শীলাদি, একটা কথার জবাব দেবেন?

কী?

আপনি চাকরি করেন কেন?

কেন করব না?

দরকার থাকলে নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু আপনার কি চাকরি করা খুব দরকার?

শীলা ক্ষীণ হেসে বলে, না হলে করব কেন?

সুভদ্র মাথা নেড়ে বলে, আমি জানি আপনার হাজব্যান্ড হাজার টাকার ওপর মাইনে পান, কলকাতায় আপনাদের নিজেদের বাড়ি, ফ্যামিলি মেম্বার মোটে দু'জন। তবু কেন চাকরি করা দরকার বলুন তো!

শীলা একটু শ্বাস ফেলে কপট গাম্ভীর্য এনে বলে, দরকার যার যার নিজের কাছে। কারও খাওয়া-পরার প্রবলেম, কারও সময়ের প্রবলেম. ধরুন যদি বলি, আমার সময় কাটে না বলে চাকরি করি!

সুভদ্র তার বোকামির মুখোশটা পরে নিয়ে একটু বোকা হাসি হাসে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলে, শীলাদি, আপনি সত্যিই সত্যবাদী।

কেন?

ঢাকবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু আপনার মতো একজন ভাল চাকুরের বউ বা শোভনাদির মতো একজন ডাইরেক্টরের স্ত্রীর কেবলমাত্র সময়ের প্রবলেমের জন্য কি চাকরি করা উচিত? অঢেল সময় যদি থাকে তো আপনারা মহিলা সমিতি করুন, গান শিখুন বা সিনেমা-থিয়েটার দেখুন। চাকরি কেন?

কষ্ট করে লেখাপড়া শিখব, কিন্তু সেটা কাজে লাগাতে গেলেই কেন দোষ হবে?

তাতে যে আমার মতো বেকাররা মারা পড়ি! শোভনাদি কলকাতায় ফিরে আসছেন বলেই চাকরিটা আবার নেবেন, নইলে তার দরকার ছিল না। অথচ তিনি জয়েন না করলে একজন অভাবী লোকের উপকার হয়। এ-কথাটা আপনারা বোঝেন না কেন!

কথাটা সত্যি হতে পারে, কিন্তু ওর যুক্তি নেই সুভদ্র।

সুভদ্র মাথা নেড়ে বলে, আছে শীলাদি। যার স্বামী ভাল রোজগার করে সে চাকরি করলে সমাজে ইকনমির ব্যালান্স থাকে না। নকশালাইটরা যে কয়েকটি ভাল কাজ করতে চেয়েছিল তার মধ্যে একটি হল স্বামী-স্ত্রীর দ্বৈত রোজগার বন্ধ করা।

শীলা হাসল। বলল, সুভদ্র, আমার একটু দুঃখ হচ্ছে শোভনাদি ফিরে আসছে বলে।

সুভদ্র ম্লান হেসে বলে, আমি চলে যাচ্ছি বলে নয়?

শীলার অকারণেই আবার কান-মুখ লাল হয়ে ওঠে। বলে, সেজন্যও।

ইস্কুল বাড়ি প্রায় ফাঁকা। দু'জন হাঁটতে হাঁটতে মাঠটুকু পার হয়ে গেট পেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। সুভদ্র একটা সস্তা সিগারেট ধরিয়ে বলে, আমার চাকরিটা খুব দরকার ছিল।

শীলা একটা শ্বাস ফেলে বলে, পেয়ে যাবেন। একটু খুঁজুন।

সুভদ্রর সাহস আছে। হঠাৎ মুখখানা উদাস করে বলে, চাকরি হয়তো পেতেও পারি, কিন্তু সেখানে আপনার মতো বুদ্ধিমতী সহকর্মী কি পাওয়া যাবে?

শীলা চারধারে চেয়ে দেখে একটু। কেউ নেই, কেউ তাদের লক্ষ করছে না। করলেও দোষের কিছু নেই। সুভদ্র ইস্কুলে ঢোকার পর থেকে দিনের পর দিন শীলা আর সুভদ্র ইস্কুল থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে গল্প করতে করতে গিয়ে ট্রাম ধরেছে। ছাড়াছাড়ি হয়েছে শীলার নির্দিষ্ট স্টপে। আবার কখনও সুভদ্র নেমে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়েও দিয়ে গেছে। আবার শীলা কখনও বা স্টপে না-নেমে কেনাকেটা করার জন্য চলে গেছে সুভদ্রর সঙ্গেই এসপ্লানেড বা গড়িয়াহাটা। কিন্তু শরীরে অন্য এক রাজাধিরাজের আগমনবার্তা পাওয়ার পর থেকেই শীলা একটু অন্য রকম হয়ে গেছে। কারও কথাই বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না, কেবল শরীরের ভিতরকার সেই শরীর মনে পড়ে। সুভদ্রকে তাই তেমন করে ভেবেছে কি সে এ-কয়দিন?

শীলা মুচকি হেসে বলে, শুধু বুদ্ধিমতী?

সুন্দরীও। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় সুভদ্র।

শীলা মৃদু হাসে। এই স্তাবকতাটুকুর লোভ সে ছাড়ে কী করে?

আজ আর হাঁটে না শীলা। রিকশা আসবে তাই দাঁড়িয়ে থাকে। সুভদ্র পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে বলে, সত্যি আপনাদের ছেড়ে চলে যেতে খুব কষ্ট হবে। চাকরি পাওয়া সোজা নয়।

শীলা চুপ করে থাকে।

সুভদ্র নিজেই বলে আবার, আমি কোনওকালে পলিটিক্স করতাম না। কিন্তু এখন দেখছি পলিটিক্স করলেই আখেরে লাভ হয়।

কীরকম?

চাকরি জোটে, বা ব্যবসার লাইসেন্স পাওয়া যায়। ভাবছি, পলিটিক্সে নেমে যাব কি না।

শীলা পাশ থেকে সুভদ্রর মুখখানা দেখে। কী সুন্দর চেহারা! চাকরি দেওয়ার হাত থাকলে শীলা শুধুমাত্র ওর চেহারা দেখেই একটা চাকরি দিয়ে দিত।

এই মুগ্ধতাটুকু পিনের আগার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে লাগে শীলার বুকে। সুভদ্র চলে গেলে স্কুলটা অনেক বিবর্ণ হয়ে যাবে তার কাছে। সে তবু একটু ঠাট্টা করে বলে, বরং সিনেমায় নেমে পড়ুন।

অ্যাঁ।

আপনাকে লুফে নেবে।

সুভদ্র হাসল, বলে, অত সোজা নয়। তবে যা পাই তাই করব। কিছুতেই আর আপত্তি নেই।

আপনারা যখন আমাদের রাস্তা আটকে রাখবেনই, তখন আমাদের রাস্তা তৈরি করে নিতে হবে।

শুনুন, শোভনাদির সঙ্গে আমার তুলনা চলে না। আমার চাকরির টাকা সংসারে অনেক হেলপ করে। শোভনাদির তা নয়, ওঁরটা নিতান্তই শখ।

সুভদ্র হেসে বলে, আমার কিন্তু কারও ওপরেই রাগ নেই। যা আছে তা কেবলমাত্র অনুরাগ।

খুব মুখ হয়েছে দেখছি। বলে শীলা গাঢ় শ্বাস ফেলে মায়াবী যুবকটির মুখখানা দেখে।

আপনার ঠিকানা জানি। কোনও দিন হুট করে চলে যাব। আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে আলাপও করে আসব।

নিশ্চয়ই।

এলআইসির একটা এজেন্সি নিয়ে রাখি।

আমি বলে রাখব। কবে আসবেন?

আসব যে-কোনও দিন।

রিকশা এল। শীলা খুব সুন্দর একটু হেসে উঠে বসল। সুভদ্র নিঃসংকোচে তার মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। চোখ সরাল না শীলা। রিকশা কয়েক পা এগোলে শীলা মুখ ঘুরিয়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল। গোপনে এই রকম তারা মাঝে মাঝেই চেয়ে থেকেছে পরস্পরের দিকে। যখনই তারা দু'জন একা হয়েছে তখনই।

পাপ? কে জানে? কিন্তু ওই একরকম শিহরন, গোপনতা, রহস্য—যা না থাকলে বেঁচে আছি বলে মনে হয় না। শীলা যে কত ঝুঁকি নিয়ে আজ ইস্কুলে এসেছে তা কি অনেকটাই সুভদ্রর জন্য নয়? মনের ভিতরে কত কী থাকে, ভাগ্যিস তা অন্যে জানতে পারে না!

সুভদ্রর কথা ভাবতে ভাবতে রিকশাওয়ালাকে আস্তে চালানোর কথা বলতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। রিকশাটা পর পর দুটি ঝাঁকুনি খেল। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে শীলা—আস্তে।

তেমন কিছু টের পেল না শীলা। কেবল বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামার সময়ে হেঁট হতে তলপেটে একটা চিনচিনে ব্যথা টের পেল।

॥ উনিশ ॥

বাসের দোতলায় তিন-চারটে মার্কামারা ছেলে উঠেছে। হাতে বইখাতা, পরনে কারও কলারঅলা গেঞ্জি, কারও রংচঙা সস্তা শার্ট। এই শীতেও গায়ে গরম জামা নেই। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স। দু'জনের সিটে তিনজন ঠেসে বসেছে। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় গরিব ঘরের ছেলে, বাজে ইস্কুলে পড়ে, যে-ইস্কুলে ইউনিফর্ম পরার বালাই নেই। কলকাতার বিস্তৃত বস্তি অঞ্চল থেকে এ-রকম চেহারার বহু ছেলে সস্তা বাজে ইস্কুলে লেখাপড়া শিখতে যায়।

একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলে, কিস, কিস, এই টুবু, একটা কিস দিবি?

বলতে বলতে ছেলেটা তার পাশের ছেলেটার গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করে।

ছেলেটা মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, যাঃ। পাবলিক রয়েছে।

তোর পাবলিকের 'ইয়ে' করি।

ছ'নম্বর বাসের দোতলায় প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে পিছনে দাঁড়িয়ে সোমেন দৃশ্যটা দেখে। সাদা আর ঘন নীল ইউনিফর্ম পরা তিন-চারজন মেয়ে বসে আছে ডান দিকের দু'-তিনটে সিটে, ফরসা ফরসা, গোলগাল অবাঙালি মেয়ে ক'জন, হাতে ছোট সুটকেস, কাঁধে প্লাস্টিকের জলের বোতল ঝুলছে। সম্ভবত ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ে, ছেলেগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে ওই সব করে যাচ্ছে। ইংরেজি শব্দগুলো ওই কারণেই বলা।

রাগে হাত-পা রি-রি করে সোমেনের। বাসসুদ্ধ লোকের এক জনও রুখে উঠলে পুরো দৃশ্যটা পালটে যায়। কিন্তু কেউ কোনও 'রা' কাড়ে না। বরং না শুনবার ভান করে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

মেয়েগুলোর ফরসা মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। বাচ্চা একটা মেয়ে হঠাৎ মুখ ফেরাতে সোমেন দেখল, মেয়েটার চোখে স্পষ্ট কান্নার চিহ্ন।

হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? অন্য দিকে চেয়ে একটা ছেলে জিজ্ঞেস করে।

বন্ধুদের একজন বলে, মাই নেম ইজ—বলে বোম্বাইয়ের একজন ফিল্মস্টারের নাম করে। তাকে ধমক দেয় প্রথম ছেলেটা, খিস্তি করে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করতে থাকে, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? হোয়াট ইজ ইয়োর নেম?

মেয়েগুলো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

সোমেনের পিছন থেকে একজন ফিসফিস করে বলে, কী সব ছেলে!

ব্যস। আর কোনও প্রতিবাদ হয় না। সোমেনের সামনে দু'-চারজন দাঁড়িয়ে আছে। বাসের ঝাঁকুনিতে দোতলায় দাঁড়িয়ে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করছে। বাস ব্রেক কষে, আবার চলে। এ-ওর গায়ে ধাক্কা খায় আগে পিছে। টলে টলে পড়ে যেতে যেতে আবার দাঁড়ায়।

বাসটা কোথায় এসেছে বোঝা যাচ্ছিল না ভিড়ের জন্য। ছেলেদের একজন চেঁচিয়ে ওঠে, ওই যে, নিরোধের বিজ্ঞাপন। নিরোধ ব্যবহার করুন, পনেরো পয়সায় তিনটে...

কোথায় এসেছে তা না-বুঝেও সোমেন ভিড় ঠেলে নামতে থাকে। বেশিক্ষণ তার এ-সব সহ্য হয় না। হয়তো মাথা গরম হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু করা যাবে না। কেবল নিজের ভিতরে এক অন্ধ রাগ বেড়ে বেড়ে ফুঁসে উঠে নিজেকেই ছুবলে মারবে। সেই বিষও আবার হজম করতে হবে নিজেকেই। ক্লান্তি আসবে। আসবে ব্যর্থতার বোধ। কলকাতার নির্বিকার জনগণ সকলেই এই ক্লান্তিতে ও ব্যর্থতায় ভুগে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না কি?

নেমে সোমেন দেখে, সে খুব বেশি দূরে নামেনি। এখান থেকে বড়দির বাড়ি আর মোটে দুটো স্টপ। খোলা আলো-হাওয়ায় এটুকু হেঁটে যেতে ভালই লাগবে। সে সিগারেট কিনে ধরায়। পৃথিবীর কোথাও কোনও শান্তি নেই। না ঘরে, না বাইরে। সোমেনের মাঝে মাঝে বড্ড মরে যেতে ইচ্ছে করে। কিংবা পালাতে ইচ্ছে করে বিদেশে। কিন্তু জানে, শেষ পর্যন্ত কোথাও যাওয়া হবে না। এই নোংরা শহরে কিংবা এই নিস্তেজ, ভাবলেশহীন দেশে তার জীবন শেষ হয়ে যাবে একদিন।

অন্যমনস্কভাবে সোমেন হাঁটছিল। একটা ট্যাক্সি পাশ দিয়ে যেতে যেতে এগিয়েই থামল। মুখ বাড়িয়ে কে যেন ডাকল, শালাবাবু!

জামাইবাবু! সোমেন তাড়াতাড়ি সিগারেট ফেলে দেয়।

এগিয়ে গিয়ে বলে, আপনাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।

উঠে পড়ো। বলে দরজা খুলে ধরে অজিত।

সোমেন উঠলে অজিত সরে বসে বলে, এতকাল পরে আমাদের মনে পড়ল।

সোমেন একটু লাজুক হাসি হেসে বলে, কেন, আসি না নাকি?

আসো? সে বোধহয় সূক্ষ্ম শরীরে, আমাদের সাদামাটা চোখে দেখতে পাই না।

সময় পাই না।

সময়? তোমার আবার সময়ের টানাটানি কবে থেকে? একটা তো মোটে টিউশনি করো শুনেছি। আর কী করো? প্রেম নয়তো? তা হলে অবশ্য সময়ের অভাব হওয়ারই কথা।

না, না। প্রেম-ট্রেম কোথায়?

লাস্ট বোধহয় ভাইফোঁটায় এসেছিলে। তারপর টিকিটি দেখিনি।

এবার খুব বেশি দেখবেন।

সে দেখব যখন নিজেদের বাড়ি করে উঠে আসবে। তার এখনও ঢের দেরি, শ্বশুরমশাই একটু আগে অফিসে এসেছিলেন চেকটার খোঁজ করতে।

বাবা এসেছেন?

এসেছেন মানে? এতক্ষণে হয়তো চলেও গেছেন হাওড়ায়। বাসায় যাননি বোধহয়?

কী জানি! আমি তো বাসায় ছিলাম না।

অজিত একটা শ্বাস ফেলে বলে, তুমি ওঁর কাছে যাওটাও না?

খুব কম।

যেয়ো। সন্তানের টান বড় টান। আমার তো এখনও কিছু হয়নি, কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা দেখেই মনটা উসখুস করে।

কোটের বাঁ দিকের পকেট থেকে ডানহিলের সুন্দর প্যাকেটটা বের করে অজিত, আর রনসন লাইটারটা।

কী সিগারেট জামাইবাবু? সোমেন জিজ্ঞেস করে, বেশ প্যাকেটটা তো!

বিলিতি। একটা চলবে না কি?

না, না। লজ্জার হাসি হাসে সোমেন।

লজ্জার কী! ধরিয়ে ফেলো একটা। খাও তো।

আপনার সামনে নয়।

এই যে ভাই, সামনের বাঁ দিকের রাস্তা। বলে ট্যাক্সিওলাকে নির্দেশ দেয় অজিত। ডানহিলের প্যাকেটটা সোমেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, শালাবাবুরা সামনে সিগারেট না খেলে ভগ্নিপতিদের বড় অসুবিধে। দরকার হলে শালাদের ঘাড় ভেঙে সিগারেট খেতে পারে না।

আমি আপনাকে আর কী খাওয়াব বলুন। বেকার শালার সাধ্য কী? একটা চাকরি-বাকরি দিতেন যদি!

তোমার এক্ষুনি চাকরির কী হল? এম এ-টা দাও না।

ও হবে না।

একটা প্রফেসরি হয়তো জুটে যেত। নাও, ধরিয়ে ফেলো।

সোমেন লম্বা সিগারেট একটা টেনে নেয়। ধরায়। খুব লজ্জা করে তার।

অজিত বলে, আরে জামাইবাবু আবার গুরুজন নাকি! ঠাট্টার সম্পর্ক, লজ্জার কিছু নেই।

বাসার সামনে ট্যাক্সি থেকে নামে দু'জনে।

কড়া নাড়তে বাচ্চা ঝিটা এসে ঘুমচোখে দরজা খোলে।

শীলা, দেখো কে এসেছে! বলে হাঁক ছাড়ে অজিত।

বাচ্চা ঝিটা ভয়ার্ত মুখে বলে, বউদি নেই।

অজিত যেন বুঝতে পারে না কথাটা। একটু অবাক হয়ে বলে, কী বলছিস?

বউদি বেরিয়ে গেল একটু আগে। রিকশায়।

কোথায় গেছে?

পাশের বাড়িতে।

পাশের বাড়িতে রিকশা করে। ভারী অবাক হয়ে বলে অজিত, কোন বাসায়?

ঝি-মেয়েটা কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, ওই দিকের রাস্তা দিয়ে গেল। কোথায় তা জানি না। বলে গেছে পাশের বাড়িতে।

অজিত একটুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। মুখ-চোখ লাল হয়ে ওঠে রাগে, উত্তেজনায়। তারপর জুতোমোজা ছাড়ে, কোট হ্যাঙারে টাঙায়।

রহস্যটা ধরতে না পেরে সোমেন জিজ্ঞেস করে, কী হল জামাইবাবু?

অজিত গম্ভীর স্বরে বলে, কিছু না।

ঝিকে ডেকে চা করতে বলে অজিত। কিছুক্ষণ মুখখানা দু'হাতের পাতায় ঢেকে বসে থাকে। সামলে নেয় নিজেকে। মুখ তুলে বলে, তোমার দিদি আজকাল আমাকে লুকিয়ে পালাতে শিখেছে।

সোমেন হাসে, পালায়?

ওর একটি প্রেমিক আছে যে!

কে?

ওর ইস্কুল। ইস্কুলটাই ওর সর্বস্ব। আমরা কিছু না। বুঝলে শালাবাবু, তোমার দিদি এবার একটা সর্বনাশ ঘটাবে। রিকশা করে গেছে, ঝাঁকুনিতে না পেটের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায়!

এ-সব কথায় সোমেনের একটু লজ্জা করে। ডানহিলটা ঠোঁটে চেপে সে চমৎকার ধোঁয়াটা টানে। রিকশার ঝাঁকুনিতে পেটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে—ব্যাপারটা তার বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়।

সোমেন একটুক্ষণ বসে থেকে তারপর হঠাৎ বলে, জামাইবাবু।

উঁ। অন্যমনস্ক অজিত উত্তর দেয়।

আমার একটা উপকার করবেন?

উপকার! নিশ্চয়ই।

আমাকে কিছুদিন আপনার বাড়িতে থাকতে দিন।

অজিত একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। বলে, থাকবে? সে তো আমার সৌভাগ্য। কিন্তু কেন?

এমনিই।

বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া করোনি তো?

না, সে-সব কিছু নয়।

অজিত একটু উদাস হয়ে বলে, ক'দিন আগে শাশুড়িঠাকরুন এসেছিলেন। তিনি তোমার বড়দিকে বলে গেছেন, তোমাদের বাসায় কী-সব অশান্তি চলছে।

সোমেন মাথা নাড়ে।

অজিত একটু হেসে বলে, তুমি বড় সেন্টিমেন্টাল হে শালাবাবু, সংসারে একটু-আধটু খটাখটি তো থাকবেই। আমি নিজে মা-বাপ-অন্ত-প্রাণ ছেলে ছিলাম, সেই আমাকেই আলাদা হয়ে চলে আসতে হল! এখন তো তবু সংসারের কিছুই টের পাওনি, যখন বিয়ে করবে তখন বউ এসে রাত জেগে তোমাকে দু'দিনে সংসারের সার সত্য সব শেখাতে থাকবে। তখন দেখবে মা-বাপ সম্পর্কে তোমার আজন্মের ধারণা পালটে যাচ্ছে, ভাই-দাদা, ভাইপো-ভাইঝি সকলেরই গুপ্ত খবর পেয়ে যাবে। বিয়ে করো, বুঝবে।

বিয়ে! বলে একটু ঠাট্টার হাসি হাসে সোমেন।

কেন, বিয়ে নয় কেন?

আমাদের জেনারেশনে বিয়েটিয়ে বোধহয় উঠে যাবে।

ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো, বাঁধো, বাঁধো বুক। বিয়েটাকে টারগেট করে যা করার করে যাও। তুমি যদি সংসার ছাড়ো তবে তোমার মা দাদার কী অবস্থা হবে জানো?

কী হবে! আমার জন্য কিছু ঠেকে থাকবে না।

থাকবে। তবে কিছুদিনের জন্য যদি আমার বাড়িতে এসে থাকো তো ভালই হয়। তোমার দিদিটিকে একটু পাহারা দিতে পারবে। চোখে চোখে না-রাখলে ও ঠিক চুপি চুপি প্রায়ই পালিয়ে যাবে ওর প্রেমিকটির কাছে। ডাক্তারের কড়া নিষেধ। তবু ও শোনে না। আমি অবশ্য অন্য কোনও দিন ধরতে পারিনি। আজই হঠাৎ তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি বলে বুঝতে পারছি।

চা শেষ করে আর-একটা ডানহিল অজিতের প্যাকেট থেকে নিয়ে ধরায় সোমেন। বাইরে একটা রিকশা থামে। শব্দ হয়।

অজিত মুখখানা গম্ভীর করে বসে থাকে।

সদর দরজা খোলাই ছিল। শীলা ঘরে এসে একটু থতমত খেয়ে দাঁড়ায়। বলে, ওমা! কখন এলে? সোমেন, হঠাৎ যে দিদিকে মনে পড়ল?

সোমেন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে। হাসে। উত্তর দেয় না কেউ।

শীলা ভ্রূ কুঁচকে সোমেনের দিকে চেয়ে বলে, খুব যে উন্নতি দেখছি! গুরুজনদের সামনে সিগারেট খাওয়া!

জামাইবাবু জোর করে খাওয়ালেন, কী করব!

কত জামাইবাবুর বাধ্য শালা! আবার ধোঁয়া ছাড়ার কায়দা হচ্ছে!

অজিত ভ্রূ কুঁচকে নিজের হাতের দিকে চেয়ে ছিল।

শীলা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলে, একটা জরুরি কাজ ছিল, বুঝলে! রাগ করেছ নাকি!

অজিত শ্বাস ফেলে মাত্র। উত্তর দেয় না।

দাঁড়িয়ে থাকতে শীলার বোধহয় কষ্ট হয়। মুখখানা সামান্য বিকৃত করে বলে, যা রাস্তাঘাট! এত হাঁফিয়ে পড়েছি!

বলে সোফায় বসে শীলা। হাতের ব্যাগ মেঝেয় ফেলে রেখে ঝি-মেয়েটাকে ডেকে চা করতে বলে দেয়। কপাল থেকে চুলের কুচি সরাতে সরাতে বলে, সোমেন, রাতে খেয়ে তবে যাবি। আজ ফ্রায়েড রাইস করব, আর মুরগি।

সোমেন হেসে বলে, আগে বাড়ির আবহাওয়াটা স্বাভাবিক হোক, তবে বলতে পারি খাব কি না। এখন তো বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখছি।

আহা! এ-রকম আমাদের রোজ হয়! জামাইবাবুটিকে তো চেনো না। রাগের হোলসেলার।

অজিত তীক্ষ্ণ চোখে শীলাকে একটু দেখে নেয়।

কী দেখছ? শীলা জিজ্ঞেস করে।

অজিত নিস্পৃহ গলায় বলে, তোমার মুখ সাদা দেখাচ্ছে।

ও কিছু না। রোদে এলাম তো।

রোদে মুখ লাল হওয়ার কথা, সাদা হবে কেন?

তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি।

শীলা, আমাকে লুকিয়ে লাভ নেই। তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে শরীরে।

শীলা হাসতে চেষ্টা করল। বিবর্ণ হাসি। চোখ দুটো একটু ঘোলাটে, মুখ সাদা, ঠোঁট দুটোর মধ্যে ফড়িঙের পাখনার মতো কী একটু কেঁপে গেল। বলল, না, কিছু নয়।

অজিত একটু শ্বাস ফেলে বলে, না হলেই ভাল। তবু বলি, সামান্য ধৈর্য রাখতে পারলে ভাল করতে। একটা পেরেকের জন্য না একটা সাম্রাজ্য চলে যায়।

শীলা একটুক্ষণ বসে থাকে। তারপর ক্ষীণ গলায় বলে, তোমরা বোসো, আমি ও-ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে থাকি।

শীলা ধীরে ধীরে উঠে ও-ঘরে চলে গেল। অজিত আর-একটু ধৈর্য ধরে বসে থাকল সোমেনের মুখোমুখি। তারপর বলল, বোসো শালাবাবু, আমাদের দু'জনের ভাগ্যটা কেমন তা দেখে আসি। এ-যাত্রাটা যদি রক্ষা হয়।

অজিত ও-ঘরে গেল। সোমেন বসে থাকে একা। শুনতে পায় ভেজানো দরজার ও-পাশ থেকে

বড়দির ফোঁপানোর আওয়াজ আসছে। চাপা, আবেগপূর্ণ কথার শব্দ ভেসে আসে। একটা অস্ফুট চুম্বনের শব্দ আসে।

গায়ে কাঁটা দেয় সোমেনের। অনেকদিন বাদে হঠাৎ আবার তার মনের মধ্যে ঝিকিয়ে ওঠে একটা আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরার ঢাকনা-খোলা ঝকঝকে চোখ, গর্-র শব্দে ডেকে ওঠে একটা অন্ধ কুকুর।

॥ কুড়ি ॥

সোমেন বসে ছিল চুপচাপ বাইরের ঘরে। দু' আঙুলের ফাঁকে পুড়ে যাচ্ছে সিগারেট। শীতের শুকনো বাতাসে সিগারেট তাড়াতাড়ি পোড়ে। উৎকর্ণ হয়ে সোমেন বড়দির কান্নার কারণটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। কান্না সে একদম সইতে পারে না। মন খারাপ হয়ে যায়, মনে হয় কী জানি সর্বনাশ ঘটে গেল।

কান্না থেমে গেছে, অনুচ্চ স্বরে জামাইবাবু কী বোঝাচ্ছে দিদিকে। সোমেনের ভাল লাগছে না, রোদ মরে শীতের বিষণ্ণ সন্ধ্যা ঘুমিয়ে আসে। শীতকাল সোমেনের একরকম ভালই লাগে, কিন্তু এই ঋতুটা বড় গুরুভার, মন্থর, রহস্যময়। ও-ঘর থেকে আদরের নির্লজ্জ শব্দগুলো আসে ভেজানো দরজা ভেদ করে। লজ্জা করে সোমেনের। উঠে চলে যাবে, তাও হয় না। মনে মনে সে এ-বাড়িতে বসবাস করার পরিকল্পনা ত্যাগ করে।

কী বিশাল এই কলকাতা শহর, তবু কোথাও নিরুপদ্রবে বাস করার একটু জায়গা নেই তার জন্য। পূর্বা বলেছে, তাদের তিনতলার এক-ঘরের ফ্ল্যাটটা সোমেনকে দেওয়া যায় কি না তা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করবে। হয়তো রাজিও করাবে পূর্বা। কিন্তু নেওয়া কি সম্ভব হবে? মাসে মাসে একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া আসবে কোত্থেকে! চাকরিটা সম্বন্ধে এত নিশ্চিত ছিল সে যে, রেলের ক্লার্কশিপের পরীক্ষাটা পর্যন্ত দেয়নি। দিলেই ভাল করত। রেলের চাকরি হলে ভালই হত। বদলির চাকরি, কলকাতা ছেড়ে দূরে দূরে থাকতে পারত।

ব্যাঙ্কের চাকরিটা কেন যে হল না! ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা ব্যথার মতো যন্ত্রণা হয়। অলক্ষ্যে একটা কুকুর গর্-র শব্দ করে, একটা আসাহি পেনট্যাক্স ক্যামেরার ঢাকনা-খোলা মস্ত লেন্স ঝিকিয়ে ওঠে। রিখিয়া বলেছিল, আবার আসবেন।

সোমেন কথা দিয়েছিল, আসব। মনে মনে ভেবেছিল, একদিন সুসময়ে তার সঙ্গে রিখিয়ার ভালবাসা হবে। কথা রাখেনি সোমেন। রিখিয়া তাকে ভুলে গেছে এতদিনে। কত চালাক-চতুর ছেলেরা চার দিকে রয়েছে, একজন বিষণ্ণ যুবককে ভুলে যেতে বেশিক্ষণ লাগে কি? মাঝে মাঝে সোমেনও ভাবে, ভুলে যাবে। কিন্তু ভোলে না। কত মেয়ের সঙ্গেই তো মিশেছে সোমেন, তবে কেন রিখিয়ার প্রতি এই অভিভূতি! ইচ্ছে করলেই অভিভূতি বা অবসেশনটা কাটিয়ে উঠতে পারে সে। কিছু শক্ত নয়। কিন্তু কাটিয়ে দিতে মায়া লাগে। মাঝে মাঝে মনে পড়ুক, ক্ষতি কী!

ভেজানো দরজা খুলে অজিত এসে সোফাটায় বসে। সিগারেট আর লাইটার তুলে নেয়। তার মুখ চিন্তান্বিত, ঠোঁটে রক্তহীন ফ্যাকাসে ভাব। সোমেন চেয়ে থাকে।

চোখে চোখ পড়তেই অজিত বলে, মেয়েরা কখনও কথা শোনে না। বুঝলে শালাবাবু?

কী হয়েছে?

এখনও কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একটা পেইন হচ্ছে। বলে অজিত এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে চুলের ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে ধৈর্যহীন অস্থিরতার সঙ্গে বসে থাকে।

ডাক্তার ডাকুন না! সোমেন বলে।

কী লাভ? ডাক্তারের কোনও কথা কি শোনে! শুনলে এ-রকমটা হত না। লিভ ইট, এসো অন্য বিষয়ে কথা বলি।

অজিতের মুখে-চোখে একটা আশা ত্যাগের ভাব। তার সঙ্গে চাপা রাগ।

সোমেন উঠে বলল, দাঁড়ান, দেখে আসি।

সোমেন শোওয়ার ঘরে ঢুকতেই একটা হাহাকারে ভরা শ্বাস ফেলে বিছানায় পাশ ফিরল শীলা।

বড়দি!

শীলা তার মস্ত চোখ দু'খানা খুলে চেয়ে বলে, যাবি না সোমেন। রাতে খেয়ে যাবি।

তোর শরীর কেমন লাগছে?

শীলার ঠোঁট দুটো কেঁপে যায়। সামলে বলে, এখন ভাল। বোস।

সোমেন বিছানায় বসে। শীলার শ্বাসে একটা মৃদু অ্যালকোহলের গন্ধ ছড়ায়। বোধহয় একটু ব্রান্ডি খাইয়েছে অজিত।

জামাইবাবু খুব আপসেট। সোমেন বলে।

শীলা উত্তর দিল না। ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে বলে, সারাদিন ঘরবন্দি থাকা যে কী অসহ্য!

কোথায় গিয়েছিলি?

স্কুলে। কী যে হল তারপর। বলেই বোধহয় ভাইকে লজ্জা পায় শীলা। বলে, ও-সব কিছু না। কিছু হয়নি। তুই নাকি তোর জামাইবাবুকে বলেছিস যে আমাদের বাসায় ক'দিন থাকবি!

সোমেন মাথা নাড়ে।

শীলার মুখখানা অন্তর্নিহিত যন্ত্রণায় সামান্য বিকৃত হয়ে গেল। চোখ বুজে একটু গভীর করে শ্বাস নেয় সে। তারপর বলে, বাসায় ঝগড়া করেছিস!

না।

বউদির সঙ্গে, না?

না।

তবে?

ঝগড়া হয়নি। বাসায় আমার ভাল লাগছে না।

শীলা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, লাগার কথাও নয়।

শীলা আবার চোখ বুজে যন্ত্রণাটা সহ্য করে, বলে, শোন, তোর ইচ্ছে করলে এসে থাক, যত দিন খুশি। সারাটা দিন যা একা লাগে আমার! আর কত দিন যে ঘর থেকে বেরোনো হবে না! থাকবি সোমেন? থাক না! মাকে কতবার বলেছি আমার কাছে এসে ক'দিন থাকার জন্য। কিছুতেই রাজি হল না। ও সংসারে কী যে মধু! উঠতে-বসতে বউদি খোঁটা দেবে, কথা শোনাবে, তবু পড়ে থাকবে ওখানে।

মা'রও দোষ আছে।

শীলা ধমক দিয়ে বলে, আহা! দোষ আবার কী। মুখে একটু-আধটু হয়তো বলে, কিন্তু মা'র মন সাদা। অমন শাশুড়ির সঙ্গে যে ব'নে খেতে পারে না...বলতে বলতে শীলা চোখ বোজে। যন্ত্রণা সহ্য করে।

মেয়েরা মায়ের দোষ কমই দেখে ভাজের ব্যাপারে। সোমেন তা জানে। সোমেন উঠতে উঠতে বলে, শোন বড়দি, আজ আমার নেমন্তন্নটা ক্যানসেল কর। তোব শরীর ভাল না। শুয়ে থাক চুপচাপ।

শীলা করুণ মুখ করে বলে, থাক না আর-একটু।

সোমেন ঘড়ি দেখে বলে, টিউশনিটায় যেতে হবে। পরীক্ষার সময়।

শীলা চোখ বুজে বলে, যাকে পড়াস তার দিদি তোর সঙ্গে পড়ত না।

হ্যাঁ।

বেশি মিশবি-টিশবি না, বুঝলি!

সোমেন হাসে। বলে, মিশি না।

খুব নাকি মেয়েদের সঙ্গে ঘুরিস আর আড্ডা দিস!

কে বলল?

পাশের বাড়ির মাধবী তোকে বঙ্গ-সংস্কৃতিতে দেখেছে।

দেখেছে তাতে কী? ঘুরলে দোষ কী?

শীলা বড় চোখে চেয়ে বলে, তুই তো হাঁদা ছেলে! কোন খেঁদি-পেঁচির পাল্লায় পড়ে যাবি।

দূর! ওরা সব বড় ঘরের মেয়ে, পাত্তাই দেয় না বেকারকে।

বেকার কি চিরকাল থাকবি নাকি! তোর মতো স্মার্ট আর চটপটে ছেলে ক'জন? দুম করে একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাবি।

সোমেন হেসে ফেলে। বলে, এই যে বললি হাঁদা!

হাঁদাই তো! মেয়েদের ব্যাপারে হাঁদা। বলে শীলা ভাইয়ের দিকে স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে হাসে। বলে, তোর বিয়ে আমি নিজে পছন্দ করে দেব। আমাদের সংসারে একটা লক্ষ্মী বউ দরকার।

দিস। বলে সোমেন বাইরের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

শোন। ওই আলমারির পাল্লাটা খুলে দেখ, মাঝখানের তাকে একটা প্যান্টের কাপড় আছে না?

কেন?

শীলা ধমক দিয়ে বলে, খোল না!

সোমেন আলগা পাল্লাটা টেনে খোলে। বাদামির ওপর হালকা ছাইরঙা চেক দেওয়া সুন্দর টেরিউলের প্যান্ট লেংথ। দামি জিনিস।

এখানে নিয়ে আয়। শীলা বলে।

সোমেন কাপড়টা নিয়ে কাছে আসে। শীলা ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে, পছন্দ হয়?

হলেই বা।

তোর জামাইবাবুকে তার বন্ধু পাঠিয়েছে আমেরিকা থেকে। ওটা তোর জন্য রেখে দিয়েছে। নিয়ে যা।

যাঃ! ভারী লজ্জা পায় সোমেন।

পাকামি করবি না। আজকেই করাতে দিবি, দরজির খরচ আমি দিয়ে দেব।

জামাইবাবুকে পাঠিয়েছে, আমি কেন নেব ?

তোর জামাইবাবু কত পরবে? প্রতি মাসেই এটা-ওটা রাজ্যের জিনিস পাঠাচ্ছে, প্যান্ট শার্ট সিগারেট ঘড়ি ক্যামেরা কলম। আমার জন্য শাড়ির মাপে কাপড় পাঠিয়েছে এ-পর্যন্ত গোটা দশেক। এত দিয়ে কী হবে! তুই নিয়ে যা। ভাল দরজিকে দিয়ে করাস। খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে যা। আর ও-ঘর থেকে তোর জামাইবাবুকে একটু পাঠিয়ে দিস।

আচ্ছা, বলে সোমেন বেরিয়ে আসে। হাতে ধরা মোলায়েম ঈষদুষ্ণ কাপড়টা একটা আরামদায়ক আনন্দের মতো তার হাত ছুঁয়ে আছে। কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে পেলে মনটা কেমন ভাল হয়ে যায়।

বাইরের ঘরে আলো-আঁধারির মধ্যে সিগারেট জ্বলছে। অজিত মৃদু গলায় বলে, কাপড়টা পছন্দ হয়েছে তো শালাবাবু?

খুব। এমন সুন্দর জিনিসটা আমাকে দিয়ে দিলেন?

তোমার জন্যই রেখেছিলাম। বলে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, কয়েকটা সিগারেটও নিয়ে যাও।

না, না।

নাও হে নাও, ফ্রায়েড রাইস আর মুরগির মাংস খাওয়াতে পারলাম না, একটু কমপেনসেট করে দিই। পুরো প্যাকেটটাই নিয়ে যাও, গোটা আষ্টেক আছে।

সোমেন প্যাকেটটা পকেটে পোরে। বলে, আজ দারুণ বাণিজ্য হল।

আবছায়ায় অজিত একটু হাসে। আলো-আঁধারিতে ওর মুখটা তরল হয়ে মিশে হারিয়ে যাচ্ছে। মুখখানা অস্পষ্ট একটা চিহ্নের মতো। সিগারেটের একবিন্দু লাল আগুনের পাশে ওর হাসিটা ভৌতিক দেখায়। মুখে স্বেদ ঝিকিয়ে ওঠে। ভ্রূর ছায়ায় চোখ দুটো অন্ধকার। লম্বা নাকটা তর্জনীর মতো উঁচু হয়ে আছে।

শীলা পাশের ঘর থেকে ক্ষীণ গলায় ডাকে, ওগো!

যাচ্ছি। উত্তর দেয় অজিত, কিন্তু নড়ে না। সিগারেটটা ধীরে টান দেয়।

জামাইবাবু, যাই।

অজিত মাথা নাড়ে। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলে, দি ওয়ার ইজ লস্ট ফর এ নেইল।

কী বলছেন?

কত তুচ্ছ কারণে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল শালাবাবু!

সোমেন উত্তর খুঁজে পায় না।

অজিত বলে, আমার বয়স চল্লিশ, তোমার দিদিরও ত্রিশ-বত্রিশ। কত ধৈর্য, কত অপেক্ষা, কত কষ্টের পর এই ভরাডুবি। শালাবাবু, আজ বিকেল থেকে গোটা জীবনের রংটাই বোধহয় ফিকে হয়ে গেল।

সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে ছ্যাঁক করে ওঠে। অজিত মুখ তুলে দাঁড়িয়ে-থাকা সোমেনের দিকে তাকায়। আলো-আঁধারিতে মুখখানা ব্রোঞ্জের স্ট্যাচুর মুখের মতো দেখায়। সন্তানের জন্য সমস্ত মুখখানায় কী বুভুক্ষা আর পিপাসা কাতরতা ফুটে আছে।

সোমেন বিষণ্ণ গলায় বলে, ডাক্তার ডাকবেন না?

ডাকব। তবু দি ওয়ার ইজ লস্ট। মানুষের ক্ষমতা বড় সীমাবদ্ধ। এই অবস্থা থেকে কে আমাদের বাঁচাতে পারে! ডাক্তার যা করার তা করেছে। এখন আর কী করার আছে তার! আমি আজকাল নিয়তি মানি। ভাগ্যে নেই।

এ-সব বোগাস। আপনি উঠুন তো, দিদির কাছে যান। ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি।

যাচ্ছি। বলে অজিত অন্ধকারে বসে রইল। উঠল না। কেবল হাত বাড়িয়ে হাতড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজল। পেল না। সোমেন নিঃশব্দে প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে টেবিলে রেখে দিয়ে বেরিয়ে আসে। অজিত লক্ষ করল না।

সন্তানের জন্য বুভুক্ষা কেমনতর তা পুরোপুরি বোঝে না সোমেন। কিন্তু একটু একটু টের পায়। গোবিন্দপুরে সে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অমনি এক তীব্র অসহায় ক্ষুধাকে প্রত্যক্ষ করেছে ব্রজগোপালের মুখে। সেই থেকে বাবার জন্য ক্ষীণ সুতোর টান সে টের পায়। যে ঘুড়িটা কেটে গিয়েছিল বলে ধরে নিয়েছে সে, আসলে তা কাটেনি। রক্তে রক্তে বুঝি টরেটক্কা বেজে যায় ঠিকই। টান তেমন প্রবল নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে মন বড় কেমন করে, মনে হয়—আহা রে, লোকটা! বড় একা হয়ে হা-ভাতের মতো চেয়ে আছে ছেলেদের দিকে। মায়া হয়।

সিগারেটের দোকান থেকে একটা সস্তা সিগারেট কিনে দড়ির আগুনে ধরিয়ে নেয় সোমেন। ট্রামরাস্তার দিকে হাঁটতে থাকে। ভাবে, অণিমাদের বাড়ি থেকে রিখিয়াদের বাড়ি বেশি দূর নয় তো। তবে কেন সে এক বারও শৈলীমাসি আর রিখিয়ার কাছে যায়নি এত দিন! আজ এক বার গেলে হয়। প্যান্টের কাপড়টা অপ্রত্যাশিত পেয়ে গিয়ে মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গিয়েছিল, জামাইবাবুর শেষ কথাগুলোয় আবার মন খারাপ হয়ে গেছে। গাব্বুদের বাড়িতে যাওয়ার পথে এক বার ও-বাড়ি হয়ে যাবে।

আনোয়ার শা রোড দিয়ে আজকাল বাস যায় ঢাকুরিয়া পর্যন্ত। সেই আশায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সোমেন হাঁটতে থাকে। প্যান্টের কাপড়টা বাড়িতে রেখে, হাত-মুখ ধুয়ে, একটু ফরসা জামাকাপড় পরে বেরোবে।

মা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে, শৈলী চাকরির কথা কী বলল?

সোমেন ঝেঁঝেঁ বলে, চাকরি কি ছেলের হাতের মোয়া!

আসলে সে মাকে বোঝাবে কী করে, যে-বাড়িতে সে বর হয়ে যাবে সে-বাড়ির দেওয়া চাকরি সে তো নিতে পারে না! এক বার উমেদার হয়ে গেলে আর কি রহস্য থাকে মানুষের?

রিখিয়া কেন যে আজ মাথাটা দখল করে আছে, কে জানে! মাঝে-মধ্যে আপন মনে মৃদু হাসল সোমেন। মনে মনে বলল, আসব রিখিয়া। আসছি।

হাঁটতেই হাঁটতেই বাড়ি পৌঁছে গেল সে। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ঘরে ঢুকেই একটু অবাক হল। সোফার ওপর ব্রজগোপাল বসে আছেন। পাশে একটা চেয়ারে দাদা, মা মোড়ায় বসে। বউদি এঁটো চায়ের কাপ নিয়ে যাচ্ছে। একটি অপরূপ অসহনীয় সুন্দর সংসারের দৃশ্য।

॥ একুশ ॥

ঘরে ঢুকতেই তার দিকে তাকালেন ব্রজগোপাল। একটু বুঝি নড়ে উঠলেন। মুখখানায় কী একটা টান-বাঁধা উদ্বেগ ছিল সেটা সহজ হয়ে গেল। তাকিয়ে উৎসাহভরে বললেন, এসো।

এ ঘর বাবার নয়। তবু যেন নিজের ঘরে ছেলেকে ডাকছেন, এমনই শোনাল গলা। সোমেনের সঙ্গে মাঝখানে অনেকদিন দেখা হয়নি। সে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। বলল, বড়জামাইবাবুর কাছে শুনলাম, আপনি এসেছেন, আবার চলেও গেছেন।

ব্রজগোপাল সরে বসে জায়গা করে দিলেন সোমেনের জন্য। সোমেন একটু সংকোচের সঙ্গে বাবার পাশে বসে। ব্রজগোপাল বলেন, যাওয়ার কথাই ছিল। বহেরুর যে-ছেলেটা জেলে ছিল সে মেয়াদের আগেই হঠাৎ ছাড়া পেয়েছে! দামাল ছেলে। বহেরু তাকে ভয় পায়। আজ তাই বাড়িতে আমার থাকার কথা। আমাকে কিছু মানে-গোনে, তাই বহেরুর ইচ্ছে ছিল এ সময়টায় থাকি। চলেই যাচ্ছিলাম, রণেন ধরে নিয়ে এল। এসে পড়ে ভাবলাম, একটু বসে যাই। তোমার সঙ্গে দেখা-টেখা হয় না, তো এই সুযোগে যদি এসে পড়ো।

এ বাড়িতে বেশিক্ষণ বসে থাকার জন্য যেন ব্রজগোপাল বড় লজ্জা পেয়েছেন, এমনভাবে কৈফিয়ত দেন। ঘরে ঢুকবার মুহূর্তে যে সুখী সংসারের ছবিটা দেখতে পেয়েছিল সোমেন তা কত ভঙ্গুর! নিকটতম আত্মীয় মানুষেরা নক্ষত্রের মতো পরস্পর থেকে বহু দূরে বসবাস করছে।

সোমেন হাসিমুখে বলে, আপনার শরীর কেমন আছে?

মন্দ কী! মাটির সঙ্গে যোগ রেখে চলি, ভালই থাকি। তোমার চাকরিটা হল না।

না।

ব্রজগোপাল যেন খুশি হন শুনে। বলেন, পরের গোলামি যে করতেই হবে তারও কিছু মানে নেই। চাকরির উদ্দেশ্য তো ভাত-কাপড়, না কি! তা সেটার বন্দোবস্ত করতে পারলে কোন আহাম্মক চাকরি-বাকরিতে যায়! এই মোদ্দা কথাটা তোমরা বোঝো না কেন?

সোমেন অবাক হয়ে বলে, কীভাবে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হবে?

ব্রজগোপাল এক বার ননীবালার দিকে চেয়ে নিলেন। ননীবালা একটু গম্ভীর, টুবাইটা কোলে আধশোয়া হয়ে কী একটা বায়না করছে। বিরক্ত হয়ে বললেন, বউমা, নিয়ে যাও তো একটু! কথা শুনতে দিচ্ছে না।

ব্রজগোপাল গলাখাঁকারি দেন। বলেন, দেশের অবস্থা তো দেখছই। চাকরির ভরসায় থাকাটা আর ঠিক নয়। এমন দিন আসতে পারে, যখন টাকার ক্রয়ক্ষমতা কিছু থাকবে না। তাই বলি, মাটির কাছে থাকো। ফসল ফলানোর আনন্দও পাবে, ঘরে ভাতের জোর থাকবে। মরবে না।

সোমেন একটু হাসে। সেই পুরনো কথা। এর কোনও উত্তর হয় না। মৃদু স্বরে বলে, চাকরির সিকিউরিটি বেশি, ঝামেলা কম। চাষবাস বড় অনিশ্চিত।

ব্রজগোপাল রণেনের দিকে চেয়ে হেসে তাকে সাক্ষী মেনে বললেন, কথা শোনো। সবাই আজকাল বেশি সিকিউরিটি আর কম ঝামেলা খোঁজে। পাগল! চাকরির ঝামেলা কি কম! চাকরগিরি মানে তো মনিবকে খুশি করা। না কি?

রণেন আর সোমেনের চোখাচোখি হয়।

ব্রজগোপাল বলেন, চাকরিরও একটা মর‍্যাল আছে। সেটা মেনে যদি চাকরি করতে যাও, তা হলে ঝামেলা কমে না। অন্নদাতা মনিবের দায় যদি ঘাড়ে করে না নিলে, যদি সৎভাবে তাকে খুশি না করলে তো তুমি খারাপ চাকর। তোমার বাড়িতে যে ঠিকে-ঝি কাজ করে যায় সে যদি ফাঁকিবাজ বা আলসে হয়, যদি চোর হয়, যদি মুখে-মুখে কথার জবাব করে তো তুমি কি তাকে ভাল বলো? তেমনি যদি চাকরগিরিই করো তো ষোলো আনা ভাল চাকর হতে হবে। ফাঁকিজুকি, চুরি-চামারি এ-সব চলে না।

এই বলে ব্রজগোপাল রণেনের দিকে তাকান। রণেন যদিও তেমন বুদ্ধিমান নয়, তবু এই কথার ভিতরে ইঙ্গিতের ইশারাটি সে বোধহয় বুঝতে পারে। চোখের পাতা ফেলে নীচের দিকে তাকায়।

বউমার হাতে টুবাইকে তুলে দিয়ে ননীবালা একটা শ্বাস ফেললেন। বললেন, ঝি-চাকরের সঙ্গে কি ভদ্রলোকদের তুলনা হয়? ছোটলোকদের ধাত আলাদা। ওরা লেখাপড়া শিখেছে।

লেখাপড়ার কথা না বলাই ভাল। এত শিখেও বিচি দেখে ফল চিনতে পারে না।

ননীবালার হঠাৎ সন্তানের প্রতি আদিম জৈব অধিকারবোধ বোধহয় প্রবল হল। ঝংকার দিয়ে বললেন, ওদের চিনতে হবে না।

ব্রজগোপাল একটু উদাস গলায় বলেন, সব চাকরেরই একরকম ধাত। আমি কিছু তফাত দেখি না। যারা যারা চাকর তারা দেশময় কাজে ফাঁকি দিচ্ছে, চুরি করছে, ফাঁকতালে মাইনে বাড়ানোর ধান্দা করছে, কাজ বন্ধ করে বসে থাকছে। মনিবরা ধরা পড়েছে চোর-দায়ে। এটা কেমন কথা? জমিদারের সেরেস্তায় আমার বাপ চাকরি করতেন, মনিবকে খুশি রাখতে তাঁর কালঘাম ছুটে যেত। আমি করতাম সরকারি চাকরি, তাও বুড়ো বয়সে। সেখানে দেখতাম মনিব বলে যে কেউ আছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। তবু প্রাণপাত করেছি। কোথাও না কোথাও একজন মনিব তো আছেই। কোথাও হয়তো ব্যক্তিবিশেষ, কোথাও প্রতিষ্ঠান, কোথাও বা দেশের মানুষ। খোরপোশের টাকা তো কারও না কারও তহবিল থেকে আসছেই। সেটা খেটে শোধ না দিয়ে ভাত খাই কী করে? লজ্জা নেই?

ননীবালা অসন্তোষের গলায় বলেন, ও-সব ভাবতে গেলে গন্ধমাদন। সবাই যেমনভাবে চাকরি করে ওরাও তাই করবে।

ব্রজগোপালের আজকাল রাগ-টাগ কমে গেছে। হাসলেন। বললেন, জানি। ময়না এমনিতে কত কথা বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলেই সেই ট্যাঁ-ট্যাঁ। সংসার রগড়ালে কত বাবাজি ভেক ছেড়ে 'জন' খাটতে যায়। তোমার ছেলেরাও তাই হবে। তবু বলি, আমার ওই এক দোষ।

বলে একটু শ্বাস ছেড়ে সোমেনের দিকে তাকান ব্রজগোপাল। বলেন, আমার সঙ্গে কোনও কিছুর বনে না। বুঝলে? আমি যা বুঝি তাই বুঝি। বুড়ো হয়েছি বাবা, বেশি কথা বলে ফেলি।

বাবার গলায় চোরা-অভিমানটা খুব গোপনে, কিন্তু তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে সোমেনকে। চোখের দৃষ্টিতে একটা অসহায় ভাব। দুনিয়াজোড়া সবাই তাঁর প্রতিপক্ষ বুঝি। বনল না। দান ওলটাবে না, লড়াই ছেড়ে সরে যাওয়ার জন্যই বুঝি প্রস্তুত তিনি। বানপ্রস্থও শুরু হয়েছে।

সোমেন তাড়াতাড়ি বলে, না বাবা। আপনার কথাগুলো তো ভালই।

ব্রজগোপাল ক্ষণেক নীরব রইলেন। আস্তে করে বললেন, হবে। আমি মনিব কথাটা বড় মানি। চাষবাস করতে গিয়ে দেখেছি অমন খেয়ালি মনিব আর হয় না। মাটির পিছনে যত খাটবে, যত তাকে পুষ্টি দেবে, সেবা দেবে, তত ফসল ঘরে আসবে। সেখানে দাবি আদায় নেই, চুরি-জোচ্চুরি চলে না, ধর্মঘট না। সেখানে সার্ভিস মানে চাকরি নয়, সেবা। মানুষের এই বুঝটা সহজে হয় না। যে দেশের যত উন্নতি হয়েছে সে দেশের লোক তত মনিবকে মানে। সে চাকরিতেই হোক, আর স্বাধীন বৃত্তিতেই হোক। বেশি সিকিউরিটি আর কম ঝামেলা বলে কিছু নেই। দেশ কথাটাই এসেছে আদেশ থেকে। যে বৃত্তিতে থাকো তার আদেশ মানতেই হয়। যত ঝামেলাই আসুক। ডিউটিফুল ইজ বিউটিফুল।

ননীবালা চুপ করে ছিলেন এতক্ষণ। এখন বললেন, ও-সব কথা ওদের বলছ কেন? তোমার ছেলেরা কি খারাপ?

ব্রজগোপাল সন্ত্রস্ত হয়ে ছেলেদের মুখের দিকে এক বার চেয়ে দেখলেন। তারপর খুব কুণ্ঠার সঙ্গে প্রসঙ্গ পালটে বললেন, তা বলিনি। চাকরি পাওয়াও সোজা নয়। আর চাকরি পেলেই বা কী! বাঁধা মাইনে, গণ্ডিবদ্ধ জীবন, মানুষ ছোট হতে থাকে।

ননীবালা বাতাস শুঁকে কী একটা বিপদের গন্ধ পান। হঠাৎ ছোবল তুলে বলেন, তো তুমি ওকে কী করতে বলো?

ব্রজগোপাল যেন আক্রমণটা আশঙ্কা করছিলেন। একটু মিইয়ে যায় তাঁর গলা। বলেন, পেলে তো চাকরি করবেই। আমি তো ঠেকাতে পারব না। যত দিন না পাচ্ছে তত দিন আমার কাছে গিয়ে থাকতে পারে। যা আছে সব বুঝেসুঝে আসুক।

ননীবালা কুটিল সন্দেহে চেয়ে থাকেন স্বামীর দিকে। গলায় সামান্য ধার এসে যায়। বলেন, ও সেখানে যাবে কেন চাষাভুষোর সঙ্গ করতে? বহেরুরা লোকও ভাল না। চাষার ধাতও ওর নয় যে, জলে কাদায় জেবড়ে চাষ করতে শিখবে। ও-সব বলে লাভ নেই।

ননীবালার কথার ধরনেই একটা রুখে ওঠার ভাব। যেন বা তাঁর সন্তানকে কেড়ে নিতে এসেছেন ব্রজগোপাল। তিনি পাখা ঝাপটে আড়াল দিচ্ছেন পক্ষিণীর মতো।

ব্রজগোপাল রণেনের দিকে চেয়ে বলেন, তুমিও কি তা-ই বলো?

রণেন মুখটা তুলে বলে, আমার কথায় কী হবে? সোমেনের ইচ্ছে হলে যাবে। আমার আপত্তি নেই।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। কিন্তু সোমেনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন না। ননীবালার দিকে চেয়ে বললেন, আমি বললেই কি আর ও যাবে? তোমার ভয় নেই। সংসারটা যেভাবে ভাগ হয়ে গেছে সেভাবটাই থেকে যাবে। এক দিকে আমি একা, অন্য দিকে তোমরা।

ননীবালা কথাটার উত্তর দিলেন না।

সোমেনের একটা কিছু করা দরকার। হাতে খবরের কাগজে মোড়া প্যান্টের কাপড়টা তখনও ধরা আছে। ঘরের ভারী আবহাওয়াটা হালকা করার জন্যই সে মোড়কটা খুলে মা'র দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, প্যান্টের কাপড়টা বড়দি দিল। লক্ষ্মণদা পাঠিয়েছে কানাডা থেকে।

ওমা! বলে হাত বাড়িয়ে ননীবালা কাপড়টা নিলেন, বা! কী সুন্দর রং-টা রে! তোকে বড় ভাল মানাবে। রণেন, দ্যাখ!

রণেন আগ্রহে এগিয়ে ঝুঁকে দেখে। টুবাইকে ঘরে শুইয়ে রেখে বউদি ঘরে পা দিয়েই এগিয়ে এসে বলে, বাঃ, ফাইন! ইংরিজিটা বলেই শ্বশুরের কথা মনে পড়ায় একটু লজ্জা পায়।

এই অন্যমনস্কতার ফাঁকে ব্রজগোপাল ধীরে ধীরে উঠলেন। একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ সোফার কোণ থেকে তুলে নিয়ে বললেন, চলি।

প্যান্টের কাপড়টা বউমার হাতে দিয়ে ননীবালা কষ্টে উঠে বললেন, যাবে?

যাই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

ননীবালা সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন, তুইও বেরোবি?

টিউশনিতে যাব।

তা হলে সঙ্গে যা। বাসে তুলে দিয়ে যাবি। দুর্গা দুর্গা।

রাস্তায় ব্রজগোপাল দু'কদম আগে হাঁটছেন। অন্যমনস্ক, ভারাক্রান্ত। পিছনে সোমেন। বাবার সঙ্গে বহুকাল হাঁটেনি সোমেন। এই স্টেশন রোডেই ছেলেবেলায় সে সকালে খালিপেটে বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রাতঃভ্রমণে যেত। ফেরার সময় খিদে পেত খুব। ব্রজগোপাল তাকে ফেরার পথে মুড়ি আর বাতাসা কিনে দিতেন। আবছা মনে পড়ে। বাবার সঙ্গ সে খুব বেশি পায়নি।

লন্ড্রির সামনে কয়েকজন ছেলেছোকরা জটলা করছিল। তাদের পেরিয়ে যাওয়ার সময়ে একজন আর একজনকে একটা খিস্তি করল। একটু চমকে উঠল সোমেন। রাস্তাঘাটে আজকাল অনর্গল খিস্তি কানে আসে। বাপ-দাদার সঙ্গে বেরোতে তাই লজ্জা করে। একা থাকলে এ-সব কানে লাগে না।

সে বাবাকে লক্ষ করল। শুনতে পাননি তো! না। ব্রজগোপাল আজ একটু অন্যমনস্ক। সোমেন বলে, বাবা, ব্যাগটা আমার হাতে দিন।

উঁ! বলে ব্রজগোপাল মুখটা ঘুরিয়ে হাসলেন। বললেন, না, না, এ ভারী কিছু নয়।

দিন না!

একটু লাজুকভাবে সংকুচিত ব্রজগোপাল বললেন, ক্যাম্বিসের ব্যাগ, এ তোমাব নিতে লজ্জা করবে। মানায়ও না।

সোমেন একটু হেসে ব্যাগটা প্রায় কেড়েই নেয়। ব্রজগোপাল খালি হাতটা র‍্যাপারের মধ্যে টেনে নেন। সোমেন টের পায়, বুড়োর মনটা ভাল নেই। ভরভরতি সংসারটা দুটো চোখে দেখে ফিরে যেতে হচ্ছে। সোমেনের মনটা কেমন করে। বলতে কী এই প্রথম বয়সকালে সে বাবাকে একটু একটু চিনছে।

ব্রজগোপাল দু' কদম পিছিয়ে তার পাশ ধরে বললেন, আমি আজ তোমার জন্যই বসে ছিলাম। ভাবলাম দেখাটা করে যাই। নইলে সন্ধের গাড়িটা ধরতে পারতাম।

সোমেন একটু বিস্মিত হয়ে বলে, কোনও দরকার ছিল বাবা?

না, না। তেমন কিছু নয়। এমনিই। ভাবলাম বসে-টসেই তো আছ, অথচ ওদিকে এক-আধবার যাও-টাও না।

হাতে একটা টিউশনি আছে।

সে তো সন্ধেবেলা একটুখানি। বাদবাকি দিনটা তো ফাঁকা। ছুটিছাটার দিনও আছে।

সোমেন উত্তর দেয় না।

ব্রজগোপাল বলেন, টিউশনিটা করছ করো। কিন্তু বাড়ি বাড়ি ঘুরে পড়ানো অনেকটা ফিরিওলার কাজ। ওটা অভ্যাসগত করে ফেলো না।

পেয়েছি তাই করছি। বসেই তো থাকি।

খারাপ বলছি না, ব্রজগোপাল নিজেকে সামলে নেন। বলেন, কিন্তু তোমরা মাঝেমধ্যে ওদিকে গেলে জমিজমার একটা বুঝ-সমঝ হয়। ব্রজগোপাল আবার আস্তে করে বলেন, অবশ্য আমি তোমাদের টেনে নিতে চাইছি না। তোমার মায়ের সেটা বড় ভয়ের ব্যাপার। আমি বলছিলাম, বসেই যখন আছ তখন—

কথাটা শেষ করতে পারেন না ব্রজগোপাল। গলায় কী একটু আটকায় বোধহয়।

সোমেন বলে, একা আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে ওখানে।

না, না। একা বেশ আছি। বহুকালের অভ্যাস। কাউকেই দরকার হয় না তেমন। কিন্তু তোমার মায়ের সন্দেহ, আমি ছেলেদের কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। পাগল! তাই কি হয়!

হাঁটতে হাঁটতে তারা ব্রিজের তলার কাছে চলে আসে। একটা ট্রেন সাঁ করে বেরিয়ে গেল। ব্রিজের ওপরে মহাভার নিয়ে চলে যাচ্ছে ডবলডেকার, বিমগুলো কাঁপে। ব্রজগোপাল এক বার ওপরের ছুটন্ত বাড়িঘরের মতো বাসের দিকে তাকিয়ে দেখলেন । থেমে র‍্যাপারটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন গায়ে। বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করাটাই দরকার ছিল। ভাবছিলাম, হয়তো আজও দেখা হবে না। হয়ে গেল।

সোমেন বলল, কিছু দরকার থাকলে বলুন।

দরকার! বলে ব্রজগোপাল সামান্য হাসেন, তেমন কিছু নয়। ছেলেকে যে বাপের কেন দরকার হয় তা বাবা না হলে কি বোঝা যায়।

ব্রজগোপাল একটু শ্বাস ফেললেন। সোমেন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। ফাঁকা থেকে ক্রমে ভিড় আর আলোর মধ্যে এসে পড়ে। বাসস্টপ আর দূরে নয়। ব্রজগোপাল খুব আস্তে হাঁটেন। সামান্য রাস্তাটুকু যেন দীর্ঘ করে নেওয়ার জন্যই। বলেন, রণো ক'দিন আগে হঠাৎ গিয়ে হাজির। স্টেশনে দেখা হল, ও তখন ফিরছে। নানা কথার মধ্যে হঠাৎ বলে ফেলল, বাবা, সংসারে বড় অশান্তি। ভেঙে কিছু বলল না। সেই থেকে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। চাপা ছেলে, সহজে কিছু বলে না। কীসের অশান্তি তা তো আর আমার বুঝবার কথা নয়। আমি বাইরের মানুষ। কিন্তু শুনলে পরে মন ভাল লাগে না।

সোমেন সতর্ক হয়ে গিয়ে বলে, ও-সব কিছু নয়। একটু বোধহয় মন কষাকষি হয়েছিল, মিটে গেছে।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন। বললেন, তাই হবে। তোমার মা কী কথায় যেন আজই বলছিলেন, তুমি নাকি আলাদা বাসা খুঁজছ!

মা'র মুখ বড় পলকা। কিছু চেপে-ঢেকে রাখতে পারে না। মনে মনে বড় রাগ হল সোমেনের। মুখে বলল. ও-বাড়িতে জায়গা কম, লেখাপড়ার একটা ঘর দরকার। তাই ভাবছিলাম।

ব্রজগোপাল বুঝদারের মতো বললেন, ও।

কিন্তু কথাটা যে বিশ্বাস করলেন না তাঁর নিস্পৃহতা থেকে বোঝা গেল। একটা শ্বাস ফেললেন। এবং শ্বাসের সঙ্গে বললেন, মানুষের সওয়া-বওয়া বড় কমে গেছে।

বাবা, আপনি ষোলো নম্বর বাসে উঠে পড়ুন।

তাই ভাল।

স্ট্যান্ডে বাস দাঁড়িয়ে আছে। বসার জায়গা নেই। ব্রজগোপাল বাসে উঠে রড ধরে দাঁড়ালেন। একা ব্রজগোপালই দাঁড়িয়ে আছেন, আর সবাই বসে। বাসের দরজা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে সোমেন। একা দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বলল, বাবা, আপনি নেমে আসুন। পরের বাসে যাবেন।

থাকগে, দেরি হয়ে যাবে।

দাঁড়িয়ে যেতে আপনার কষ্ট হবে।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বললেন, না, কষ্ট কী! পারব।

সোমেন ছাড়ল না, উঠে গিয়ে বাবার হাতের ব্যাগটা নিয়ে বলে, আসুন।

ব্রজগোপাল এই আদরটুকু বোধহয় উপভোগ করে একটু হাসলেন। এই ছেলেটা তাঁর বড় মায়াবী হয়েছে। নেমে এলেন। পরের ষোলো নম্বর বাসটা ফাঁকা দাঁড়িয়ে আছে। স্টার্টারকে জিজ্ঞেস করে নিয়ে সোমেন বাবাকে ফাঁকা অন্ধকার বাসটায় তুলে দেয়। অবশ্য একেবারে ফাঁকা নয়। অন্ধকারে দুটো-একটা বিড়ি বা সিগারেটের আগুন শিসিয়ে ওঠে। ব্রজগোপাল বসলেন। বললেন, আজকাল সব জায়গায় বড় ভিড়।

হ্যাঁ।

তবু মানুষ কত কম।

কথাটার মধ্যে একটা নিহিত অর্থ আছে। সোমেন বুঝল। কিছু বলল না। ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাবে?

সোমেনের একটু বিপদ ঘটে। সে যাবে বালিগঞ্জ সাঁরকুলার রোডে। গাব্বুকে পড়াতে। সেখানে এই বাসেও যাওয়া যায়। কিন্তু বাবার সঙ্গে আর বেশিক্ষণ থাকতে তার এক রকম অনভ্যাসজনিত অনিচ্ছা হতে থাকে। একটা সিগারেটও খাওয়া দরকার। সে বলল, এই কাছেই যাব।

তা হলে রওনা হয়ে পড়ো। আমার জন্য দেরি করার দরকার নেই।

যাচ্ছি। বলে একটু ইতস্তত করে বলে, আমাকে কোনও দরকার হলে—

ব্রজগোপাল অন্ধকারে একটু অবাক গলায় বললেন, দরকার! সে তেমন কিছু নয়।

সোমেন প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে লাজুক গলায় বললেন, তুমি ভেবো না। দরকারটা বাপ ছাড়া কেউ বোঝে না।

কী দরকার বাবা?

তোমার গায়ের গন্ধটুকু আমার দরকার ছিল। আর কিছু নয়।

॥ বাইশ ॥

ভাগচাষির কোর্ট থেকে বেরিয়ে ফেরার পথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল বহেরু। রাস্তার ধার ঘেঁষে মাঠমতো জায়গায় খেলা জমেছে। রাজ্যের লোক ভিড় করে ঘিরে আছে, লাউডস্পিকার বাজছে। দু'ধারে দুটো মস্ত গাছে বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচুতে টানা দড়ি বাঁধা, দড়ির মাঝ বরাবর একটা মেটে হাঁড়ি ঝুলছে। হাঁড়ির গায়ে সুতোয় গাঁথা দশ টাকার নোট হাওয়ায় উড়ে উড়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে মানুষজনকে। কম নয়, এই দুর্দিনের বাজারে একশোটা টাকা। লাউডস্পিকারে হিন্দি গান থামিয়ে ঘোষণা হচ্ছে, বন্ধুগণ, এ হচ্ছে বুড়ির হাঁড়ি। হাঁড়ির গায়ে একশো টাকা গাঁথা আছে, যে ছুঁতে পারে তার। কিছু শক্ত নয়, খুব সোজা খেলা। দেখুন, এবার আসছেন সিমলেগড়ের যুবক সংঘ।

আবার হিন্দি গান শুরু হয়।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, দাঁড়ালি যে!

বহেরু একটু হেসে লাজুকভাবে বলে, র'ন। একটু দেখে যাই।

তোর আর বয়স হল না।

বহেরু গায়ের চাদরখানা খুলে ঝেড়ে ভাঁজ করে। কাঁধে ফেলে বলে, দুনিয়ায় হাজারো মজা। দেখে-টেখে যাই সব।

তো তুই দাঁড়া। আমি এগুতে থাকি, তুই চোটে হেঁটে আসিস।

বহেরু তখন মজা দেখছে। এক বার মাথা নাড়ল কেবল। দশজনের দল, চারজন গোল হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল, তাদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠল তিনজন। নীচের চারজন টলোমলো। তাদের মাঝখানের ফোকর দিয়ে সাবধানে আর দু'জন উঠছে। কাঁধে পা রাখতেই নীচের চারজন ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয়।

লাউডস্পিকারে গান থামিয়ে এদের উৎসাহ দেওয়া হতে থাকে— আপনারা পারবেন। চেষ্টা করুন, শক্ত হয়ে দাঁড়ান। বুড়ির হাঁড়ি আপনাদের নাগালের মধ্যেই এসে গেছে প্রায়। শক্ত হয়ে দাঁড়ান, ভরসা হারাবেন না...

কিন্তু মানুষের স্তম্ভটা ভেঙেই গেল। হুড়মুড় করে ওপরের ছোকরারা পড়ে গেল এ ওর ঘাড়ে। চারধারে একটা হাসির চিৎকার উঠল।

যাঃ, পারল না! ব্রজগোপাল বললেন।

বহেরু মুগ্ধ হয়ে খেলাটা দেখছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে ব্রজগোপালকে দেখে বলল, যাননি?

মজাটা মন্দ নয়, তাই দাঁড়িয়ে গেলাম।

ভারী মজা। র'ন, একটু দেখে যাই।

লাউডস্পিকারে ঘোষণা হয়— এবার বুড়ির হাঁড়ি কারা ছোঁবেন চলে আসুন। কোনও প্রবেশমূল্য নেই, দশজনের যে-কোনও দল চলে আসুন। বুড়ির হাঁড়ি আপনাদের চোখের সামনে ঝুলছে, হাতের নাগালের মধ্যেই। পুরস্কার নগদ একশো টাকা...নগদ একশো টাকা।

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি হতে থাকে। রোগা-রোগা কালো-কালো চাষিবাসি গোছের কয়েকজন মাঠের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায়। উপোসি চেহারা, গায়ে জোর বল নেই।

লাউডস্পিকার বলতে থাকে— এবার আসছেন বেলদার চাষিভাইরা। মনে হয়, এ-বছর এঁরাই বুড়ির হাঁড়ি জিতে নেবেন। এঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন, আপনারাও এঁদের উৎসাহ দিতে প্রস্তুত থাকুন।

আবার হিন্দি গান বাজে।

ব্রজগোপাল বলেন, এরা কি পারবে?

বহেরু একটু হাসে, তাই পারে! শরীলে আছে কী? ভাল করে দম নিতে পারে না।

ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে বলেন, টাকা দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। লোক হাসাতে নেমে গেছে।

সেইটেই তো মজা।

রোগা, আধবুড়ো, মরকুটে চেহারার লোকগুলো হাঁড়ির নীচে দাঁড়াতেই চার দিকে হুল্লোড় পড়ে গেল। লোকগুলোও অপ্রতিভভাবে হাসে চার দিকে চেয়ে। তারা যে মজার পাত্র তা বুঝে গেছে। তবু চারটে লোক কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়, তিনজন আঁকুপাঁকু করতে করতে কাঁধের ওপর দাঁড়ায়। ভারী বেসামাল অবস্থা, চারজনের পিঠে তিনজন দাঁড়াতেই নীচের চারজনের পিঠ বেঁকে যাচ্ছে। মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে মাথা। তবু ঠেলাঠেলি করে তারা সামাল দেয়। এখনও বুড়ির হাঁড়ি অনেক উঁচুতে। মাঝখানে অনেকটা শূন্যতা। বাতাসে ফুরফুর করে ওড়ে সুতোয় বাঁধা দশখানা নোট। বুড়ির হাঁড়ি দোল খাচ্ছে। চারজনের পিঠে তিনজন দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ দম নেয়। তারপর আর দু'জন উঠতে থাকে চারজনের মাজায় পা রেখে, পিঠ বেয়ে। ভারী কষ্টকর কসরত। তবু ধীরে ধীরে দু'ধার দিয়ে দু'জন শেষ পর্যন্ত ওপরের তিনজনের কাঁধের ওপর গিয়ে খাড়া হয়। প্রবল চিৎকার ওঠে চারদিকে। লাউডস্পিকার বলতে থাকে— পেরেছেন, আপনারা পেরেছেন! আর মোটে একজন উঠে দাঁড়াতে পারলেই বুড়ির হাঁড়ি জিতে যাবেন। সাহস করুন, শক্ত হয়ে দাঁড়ান।

রোগা, জীর্ণ মানুষের তৈরি স্তম্ভটা অবিশ্বাস্যভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। পিঠগুলো বেঁকে যাচ্ছে, শ্বাস পড়ছে হপর হপর। টলছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ির হাঁড়ি আর মাত্র এক-মানুষ উঁচুতে। সর্বশেষ লোকটা হালকা-পলকা, অল্পবয়সি। জিব দিয়ে ঠোঁটটা এক বার চেটে আস্তে পা তুলল, নীচের চারজনের একজনের মাজায় ভর রেখে উঠল। হাত বাড়াল দ্বিতীয় স্তবটায় ওঠার জন্য। প্রচণ্ড হাততালি দিয়ে উঠল লোকজন, চেঁচাল, বাহবা! সাবাস! লাউডস্পিকারে ঘোষক বলতে থাকে পারবেন। নিশ্চয়ই পারবেন। উঠে পড়ুন।

এত উৎসাহে আর চিৎকারেই বোধহয় দিশাহারা হয়ে স্তম্ভটা হঠাৎ ভেঙে পড়ল। বুড়ির হাঁড়ির নীচে কালো, জীর্ণ মানুষের শরীর দলা পাকিয়ে গেল।

ব্রজগোপাল শ্বাস ছেড়ে বললেন, দূর! আগেই ভেবেছিলাম। বহেরু, এবার চল।

বহেরুর যেতে অনিচ্ছা। বলল, দেখে যাই। কেউ না কেউ তো পারবেই।

পারলে পারবে। তা বলে কতক্ষণ দাঁড়াবি?

বহেরু আস্তে করে বলে, আমার দল থাকলে এক বার দেখতাম কর্তা। হাঁড়িটা বড্ড উঁচুতে বেঁধেছে, কিন্তু পারা যায়। গা গতর থাকলে কিছু শক্ত কাজ নয়।

ব্রজগোপাল বললেন, জেদ করলে সব পারা যায়, লোভ করলেই কিছু হয় না।

বহেরু বলে, এ তামশাটা আমাদের ওখানে এক বার দিলে হয়।

পরের দলটাও তিন থাক তৈরি করেছিল। শেষ লোকটাই পারল না। লোকজন চেঁচাচ্ছে। লাউডস্পিকার আশ্বাস দিয়ে বলছে— কেউ না কেউ পারবেনই। এগিয়ে আসুন। হতাশ হবেন না।

এ খেলাটার মধ্যে ব্রজগোপাল লোভ দেখতে পান। বহেরু দেখে লড়াই। বুড়ির হাঁড়ির গায়ে মালার মতো পরানো নোটগুলোয় বাতাস এসে লাগে। মাটি থেকে হাঁড়ি, মাঝখানে নিশূন্য ফাঁকা জায়গাটা। সেটুকু জায়গার মাঝখানে কত কী খেলা করছে। খেলা, লোভ, লড়াই।

গোটা ছয়েক দল পর পর চেষ্টা করল। পারল না। বহেরু উত্তেজিত হয়ে বলে, কেউ পারল না! অ্যাঁ। একটা দলে ঢুকে পড়ব নাকি কর্তা? এ বুড়ো কাঁধে এখনও যা জোর আছে তা এদের কারও নেই।

দূর! শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা! চল। পিরামিডের খেলা অভ্যাস করতে হয়। শুধু ভার বইতে পারলেই হল না, ভারসাম্য রাখা চাই। সে বড় শক্ত।

বহেরু চমৎকার দাঁত দেখিয়ে হেসে বলে, কথার কথা বলছিলাম আর কী! সব হা-ঘরে কোত্থেকে এসে জুটেছে টাকার গন্ধে। এদের কম্ম নয়। তবে বড় ভাল খেলা, গোবিন্দপুরে এক বার খেলাটা দেব। দু'শো টাকা বেঁধে দেব, কে লড়বি লড়ে যা। সে যা মজা হবে!

এই সময়ে ডাকাবুকো হোঁতকা চেহারার একটা দল এসে নীরবে হাঁড়ির নীচে দাঁড়াল। তাদের সর্দার যে ছোকরা তার শরীর বিশাল। যেমন মাথায় উঁচু, তেমনি চওড়া কাঁধ। সে মাথা তুলে হাঁড়িটা এক বার দেখে নিল। লাউডস্পিকারে ঘোষণা হতে থাকে— এবার বুড়ির হাঁড়ির দিকে হাত বাড়াবেন গোবিন্দপুরের কোঁড়ারপাড়া মিলন সমিতি ব্যায়ামাগারের যুবকবৃন্দ। এবার আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে মিলন সমিতি বুড়ির হাঁড়ি প্রতিযোগিতা থেকে খালি হাতে ফিরে যাবেন না।

বহেরু হাঁ হয়ে সর্দারকে দেখছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, কর্তা, ওই কোকার দল এসে গেছে।

কই?

ওই দেখুন।

বহেরুর মাঝের ছেলে, সদ্য জেল-ফেরত কোকা এখন কোমরে হাত দিয়ে চারধারে চেয়ে দেখছিল। তার শরীরটা অঢেল। ভগবান ঢেলে দিয়েছে অস্থি-মজ্জা-মাংস। চোখ দু'খানা ভয়ংকর। ব্রজগোপাল বহেরুকে বললেন, ডাকিস না। কী করে দেখি।

বহেরু নীরবে মাথা নাড়ল। চার দিকে প্রচণ্ড হাততালি। চেহারা দেখেই মানুষ বুঝে গেছে, এরা পারনেওয়ালা লোক।

কোকা দাঁড়াল নীচের থাকে। সেখানে চারজন সবচেয়ে মজবুত চেহারার ছোকরা। তাদের কাঁধে অনায়াসে নৈপুণ্যে উঠে গেল তিনজন। পা কাঁপল না, টলল না কেউ। মুহূর্ত পরে আর দু'জন উঠে গেল তিনজনের কাঁধে। সর্বশেষ একজন বানরের মতো চটুল হাত-পায়ে উঠে গেল ওপরে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুড়ির হাঁড়িটা দুলিয়ে দিল হাত দিয়ে। হাততালিতে তখন ফেটে পড়ছে চার দিক, চেঁচানিতে কান পাতা দায়। ভিড় এতক্ষণ গোল হয়ে ঘিরে ছিল জায়গাটা, এখন হাঁড়ি-ছোঁওয়া হয়ে গেলে মাঠময় ছেলেপুলে লোকজন হুটোপাটি লাগিয়েছে।

এত সহজে, অনায়াসে ওরা হাঁড়িটা ছুঁল যে বিশ্বাসই হতে চায় না। ওদের হাঁড়ি-ছোঁওয়া দেখে মনে হয় যে-কেউ পারে।

বহেরু বলে, ধুস্! এ তো দেখছি ফঙ্গবেনে খেলা। আনাড়িগুলোই নাজেহাল হচ্ছিল এতক্ষণ।

ব্রজগোপাল হেসে বলেন, দূর বোকা! সহজ মনে হয় বলে কি সহজ! দক্ষতা জিনিসটা এমনি, শক্ত কাজটাও এমনভাবে করে যেন গা লাগাচ্ছে না বলে মনে হয়।

বহেরু ভারী খুশি। বুড়ির হাঁড়িটা তার ছেলের দল ছুঁয়েছে। ভিড়ের দিকে খোঁটা-ওপড়ানো গোরুর মতো বেগে ধেয়ে যেতে যেতে বহেরু বলে, দাঁড়ান, এক বার কোকাকে দেখে আসি।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে একটা ধমক দেন, তোর দেখা করার কী? ছেলেছোকরারা এ-সময়ে নানা রকম ফুর্তিফার্তা করবে, এ-সময়ে সেখানে বাপ-দাদা হাজির হলে কি খুশি হয়? চলে আয়।

বহেরু থমকে যায়। কথাটা বড় ঠিক। এইসব পরামর্শ ঠিক সময়মতো দেন বলেই ব্রজকর্তাকে তার এত প্রয়োজন।

পিছিয়ে এসে বহেরু বলে, যাব না?

কেন যাবি?

তা হলে চলুন বরং। বলে হাঁটতে হাঁটতে একটা শ্বাস ফেলে সে। তারপর গলাটা নামিয়ে বলে, ছাওয়ালটাকে কেমন বোঝেন?

কেমন আর! হাঁকডাকের মানুষ হবে, তোর মতোই।

বহেরু দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ে। বলে, তাই কি হয়? আমি বরাবর মানী লোকের মান দিই। ও দেয় না। দিনেকালে ও সবকিছু দখলে নেবে। দেখবেন।

ব্রজগোপাল আস্তে করে বলেন, দেখার জন্য আমরা কেউ থাকব না। নেয় তো নেবে আমাদের কী রে? আমাদের ডংকা বেজে গেছে। সংসার নিয়ে অত ভাবিস না।

ভাবা ঠিকও নয়। বুঝি। তবু মনটা মানে না। কোকাটা এই বয়সেই খুন-খারাপি করে ফেলল।

খুন-খারাপির কি বয়স আছে নাকি! আজকাল কতটুকু কতটুকু সব ছেলে মানুষ মেরে বেড়ায়।

বহেরুর মুখে একটু উদ্বেগ দেখা যায়। বলে, আমিও তো কাটলাম ক'টা। সে-সব কর্মের দোষেই কি ছেলেটাও অমন হল! ওই একটাই একটু বেগোছ রকমের, অন্য ক'টা তো দেখছেন, ভালই।

ব্রজগোপাল অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়েন। মনের মধ্যে হঠাৎ একটা নিঃসঙ্গতা ঘনিয়ে আসে, মেঘলা দিনের মতো। ছোট ছেলেটাকে মনে পড়ে। মায়ের শ্রীই পেয়েছে ছেলেটা। লম্বা রোগাটে বুদ্ধিমান মুখশ্রী। সংসারের গাদ এখনও মনের মধ্যে কোনও তলানি ফেলেনি। ছেলেদের কাছে কিছুই চাওয়ার নেই ব্রজগোপালের। তবু বুক জুড়ে একটা দুর্ভিক্ষের চাওয়া রয়েছে। ভুলেই গিয়েছিলেন, কেন যে দেখলেন মুখখানা!

ব্রজগোপাল অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে বলেন, ভাবিস না। যত মায়া করবি তত দুঃখ।

বহেরু তত্ত্বকথা বোঝে না। তবু সায় দিল। বলল, জেলখানার মেয়াদটা বড় টপ করে ফুরিয়ে গেল। আরও কিছুদিন ঘানি টানলে রস মজত।

ব্রজগোপাল অবাক হয়ে বলেন, কেন রে! কোকা তোর কোন পাকা ধানে মই দিল! দিব্যি ঘুরছে-টুরছে, ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে, তোকে ও পায় কীসে!

বহেরু একটু লজ্জা পায়। অপ্রস্তুত চোখ দু'খানা ব্রজকর্তার চোখ থেকে সরিয়ে নিয়ে বলে, পায় না অবশ্য। কিন্তু ওর বড় দাপ্। কখন কী করে ফেলে বুঝে পাই না। ভয় লাগে।

ছেলেদের ভয় পেতে শুরু করেছিস, তার মানে তোর বয়েসে পেয়েছে।

চিন্তিতভাবে বহেরু আস্তে করে বলে, ওর মতলব ভাল নয়। আপনার ছাওয়ালরা যদি জমিটমি বুঝে না-নেয় তো আমরা চোখ বুজলে ও সব হাতিয়ে নেবে। ভাবি, সৎ ব্রাহ্মণের সম্পত্তি খেয়ে শেষমেশ নির্বংশ হয়ে যাবে না তো! আপনাকে ও খুব মানে, কিন্তু বড় লোভ ছেলেটার।

ব্রজগোপাল উদাস গলায় বলেন, হাতানোর দরকার কী! তেমন বুঝলে আমি ওর নামে সব লেখাপড়া করে দেব।

তাই কি হয়!

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, আমার ছেলেরা আসবে না কখনও। ওদের কলকাতায় পেয়েছে।

বহেরু একটু আগ্রহভরে বলে, তার চেয়ে কেন বেচে দেন না কর্তা! আমি কিনে নেব।

বেচব! বলিস কী? মাটি হল মা'টি। রামকৃষ্ণদেবের কথা। মা কি বেচবার জিনিস! একসময়ে আমার ঠাকুর বলেছিলেন, বড় দুর্দিন আসছে, সব সোনা মাটি করে ফেল। সেই তখন হাতের পাতের যা ছিল, আর সোনাদানা বেচে মাটি কিনতে লাগলাম। সে-মাটি বেচব কী বলে? ছেলেরা যদি না বোঝে না বুঝুক।

বহেরু একটা শ্বাস ফেলল মাত্র। তার প্রকাণ্ড শরীরটার কোথায় একটা দুর্বলতা আর ভয়ের পচন শুরু হয়েছে।

॥ তেইশ ॥

এখানে দিন শুরু হয় সূর্য উঠবার অনেক আগে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, চারদিকে ফ্যাকাসে কুয়াশার ভূত। কালো পাহাড়ের মতো শীত জমে থাকে। শিশিরে মাটি ভিজে থাকে এমন, যেন বৃষ্টি হয়েছে। দিগম্বরের খোলের প্রথম বোলটি ফোটে, ব্রজগোপালের বউলঅলা খড়মের শব্দটি পাওয়া যায়, আর তখনই বহেরুর বড় জামাই কালীপদর গান শোনা যায়—জাইগতে হবে, উইঠতে হবে, লাইগতে হবে কাজে...।

ঘড়ির অ্যালার্ম আর বাজে না। তবু উঠতে কোনও অসুবিধে হয় না। ঘুম বড় একটা আসে না তো। এপাশ-ওপাশ করে রাত কাটে। হারিকেনের পলতে কমানো থাকে, ঘরে একটা পোড়া কেরোসিনের গন্ধ জমে। টিনের চালের ওপর টুপটাপ শিশির খসে পড়ার শব্দ হয়। আশেপাশে শেয়াল ডাকে, হাঁসের ঘর থেকে ডানা ঝাপটানোর শব্দ আসে, ঘুমের মধ্যে মুরগি ভুল করে ডেকে ওঠে হঠাৎ। নিশুতি রাতে দূরের শব্দ সব শোনা যায়। গন্ধ বিশ্বেসের বহুমূত্র রোগ। অন্ধ-প্রায় মানুষ বলে ঘরে মেটে-হাঁড়ি রাখা থাকে। ঘুম-চোখে ঠাহর না পেয়ে মাঝেমধ্যে হাঁড়ি উলটে ফেলে ঘর ভাসায়। সেই পেচ্ছাপ কাচতে গিয়ে বিন্দুর মা বেহান বেলাটায় বাপ-মা ভুলে বকাঝকা করে বলে গন্ধ হাঁড়ি উলটে ফেলেই আর্তনাদ করে বেড়ালের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে চেঁচায়—হঃই শালা মেকুর, হঃই...অ্যা-অ্যা-অ্যা...। এভাবে সে সাক্ষী রাখার চেষ্টা করে। গোটা চারেক সড়াল কুকুর সারা রাত চেঁচিয়ে পাহারা দেয়। নমস্য শুদ্র বৃন্দাবন লাঠি ঠুকে চৌকি দিয়ে ফেরে। ব্রজগোপাল প্রায় সারা রাত এ-সব শব্দ শোনেন। শরীরের তাপে বিছানাটা তেতে ওঠে। পাশ ফিরলেই একটা শীতভাব টের পান। আরাম লাগে। এ বয়সে শীতটা বেশ লাগার কথা। কিন্তু লাগে না। বোধহয় রক্তের চাপ বেড়েছে। তাঁতি লোকটা এ ঘরে ঘুমোয়। ব্যবস্থাটা বহেরুর। সে বলে, বুড়ো মানুষ একা থাকেন, কখন কী হয়ে পড়ে, একটা লোক ঘরে থাকা ভাল। ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, তোর বয়সটা কি কম নাকি! বহেরু হাঁ হাঁ করে বলে, ভদ্রলোকের জান আর ছোটলোকের জান কি এক! তা ছাড়া আমার জন আছে, আপনারে দেখে কেডা?

কথাটা আজকাল লাগে। একটু ভয়ও হয়। মৃত্যুভয় নয়, এ অন্য রকমের এক ভয়। এখান থেকে কলকাতার দূরত্বটা হিসেব করে দেখেন, খবর পেলে মুখাগ্নি করতে সময়মতো ছেলেরা কেউ এসে পড়তে পারবে তো!

তাঁতি লোকটার মশারি নেই। চটের ভিতরে খড় ভরে একটা গদি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটার ওপর সটান মাটিতে পড়ে থাকে। মাথা পর্যন্ত কাঁথায় ঢাকা, তবু ফাঁক-ফোকর দিয়ে মশা ঢুকে কামড়ায়। ঘুমের মধ্যেই চটাস চটাস মারে। প্রায় রাতেই শোওয়ার সময় হারিকেনের টিপ খুলে

কেরোসিন আধ কোষ তেলোয় ঢেলে সরষেতেলের মতো গায়ে-মুখে মেখে নেয়। তবু ঠিক কামড়ায়। ক্রিমি আছে বোধহয় ঘুমের মধ্যে দাঁত কড়মড় করে, স্বপ্নের মধ্যে কথা বলে। ব্রজগোপাল বিরক্ত হন! পাকা ঘুম তাঁতির, ডাকলে সহজে ওঠে না। আর এক চিন্তা ব্রজগোপালের, চৌকির তলায় সুটকেস আছে, টেবিলে ঘড়ি, দড়িতে কিছু জামা-কাপড়, দামি একটা দশবাতির ল্যাম্প—একটা কিছু তুলে নিয়ে মাঝরাতে তাঁতি সটকায় যদি? এমন কিছু মহামূল্যবান দ্রব্য নয়, চোরের লাভ হবে না, কিন্তু গেরস্তর তো ক্ষতি! তাই সতর্ক থাকেন ব্রজগোপাল। কোথাকার সব উটকো লোকজন ধরে আনে বহেরু। এ-সব লোককে বিশ্বাস কী? এ-সব মিলেঝুলে আজকাল ঘুম কমে গেছে। বুড়ো বয়সে অবশ্য ঘুম কমে যায়। এ বয়সে শরীরের কল বড় আনমনা, নিজের ক্ষয়ক্ষতি আর পূরণ করে নিতে চায় না।

নিশুত রাতে পৃথিবীটা মস্ত বড় হয়ে ওঠে। ব্রজগোপাল শুলেই টের পান, চারধারে ঘুম, নিস্তব্ধতার ভিতরে মনটা নানা কথা কয়ে ওঠে। সে-সব কথা ঢেউ-ঢেউ হয়ে চলতে চলতে কোথায় পৌঁছে যায়। আর ঠিক ও-রকম সব ঢেউ যেন চারধার থেকে দূর-দূরান্ত পার হয়ে তাঁর দিকেও আসতে থাকে। যেমন নক্ষত্রের আলো, যেমন দূরদেশ থেকে আসা বাতাস, যেমন খঞ্জনা পাখি।

মনের বড় শত্রু নেই। এমনিতে বেশ থাকে, হঠাৎ কু-ডাক ডাকতে শুরু করে। কাজকর্মের মধ্যে থাকলে মনটা বেশ থাকে, কিন্তু একা হলেই মানুষ বোকা। রাতবিরেতে আজকাল ঘুম না হলে একটা ধন্দ ভাব চেপে ধরে ব্রজগোপালকে। বিষয়চিন্তা তাঁর অভ্যাস নয়। কিন্তু বহেরুর মাঝলা ছেলে কোকা জেল থেকে খালাস হওয়ার পর বিষয়-আশয়ের জন্য একটু উদ্বেগ হয়। ছেলেটা এই সেদিনও ছোট্টটি ছিল, পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করে বেড়াত, ফাইফরমাশ খাটত। ব্রজগোপালের ঠাকুর পুজোর প্রসাদ একটু বাতাসার কণা কচি হাতখানা পেতে ভক্তিভরে নিত। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত কিছু বোঝা যায়নি। তারপরই তেড়া বাঁশের মতো নিজের ইচ্ছেয় বাড়তে লাগল। এখনও তেইশ-চব্বিশ বয়স, তবু চোখে ইতরামি এসে গেছে। কাউকে বড় একটা মানে-গোনে না। মাঝেমধ্যে ব্রজগোপালের ঘরে এসে 'বামুনজ্যাঠা' বলে ডাক দিয়ে মেঝেয় বসে। কথাবার্তা কয়। কিন্তু ব্রজগোপাল বুঝতে পারেন, ছেলেটার মধ্যে জন্মসূত্রেই কোনও দোষ আছে। এ ছেলে যেখানে থাকবে সেখানেই একটা সামাল সামাল পড়ে যাবে। হাতের পাতের টাকা দিয়ে নিজের নামে কিছু জমি কিনেছেন ব্রজগোপাল, স্ত্রীর নামে আছে ছ'বিঘে, আর আছে বাস্তুজমি। ছেলেরা আসবে না এ-সব দেখতে। তাই কোকার দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বেগ বোধ করেন। এই বয়সেই খুন-খারাপি করে ফেলেছে এবং সেজন্য কোনও পাপবোধও নেই। জেলখানা থেকে হাতি হয়ে ফিরেছে। কোকা যে-ছোকরাকে কেটেছিল তাকে চিনতেন ব্রজগোপাল। সোমেনের মতোই বয়স, তেজি চেহারা। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে এসে গোবিন্দপুরে এক আত্মীয়-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিছু স্যাঙাত জুটিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াত। তার রাগ ছিল জোতদারদের ওপরে। কিন্তু এমন কিছু করেনি যে পালটি নিতে হবে। তবু কোকা তাকে কেটে ফেলেছিল। মশা-মাছি মারলেও জীবহত্যা হয়, মানুষ মারলেও তাই। তবু মানুষ যখন মানুষ মারে তখন বোধহয় তার নিজের রক্তেই একটা বিরুদ্ধ ভাব ওঠে। তার নিজের আদলে গড়া আর-একটা জীবকে মারলে কি তার ভিতরে একটা আত্মীয়বধের অনুতাপ কাজ করে? নাকি সে, ফাঁসির দড়ি যাবজ্জীবনের মেয়াদ—এ-সব ভেবে দিশেহারা হয়? ঠিক জানেন না ব্রজগোপাল। তবে মনে আছে, সেদিন রাতে ফিরে কোকা পুকুরে ঝাঁপ খেয়ে দাপাদাপি করেছিল অনেকক্ষণ। যখন তাকে তুলে আনা হয় তখন দু'চোখ ঘোলাটে লাল, বেভুল সব বকছে। রাতে গা-গরম হয়ে জ্বর এল। বহেরু লক্ষণ দেখেই চিনেছিল, ব্রজগোপালকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, শুয়োরটা নিশ্চয়ই মানুষ খেয়েছে কর্তা। রক্তেরই দোষ। রাত না পোয়াতে বিড়াল পার করতে হবে।

ভোররাতে কোকাকে প্রথম ট্রেনে কলকাতায় রওনা করে দিয়ে আসতে গিয়েছিল বহেরু।

কলকাতা মানুষের জঙ্গল, পালিয়ে থাকার এমন ভাল জায়গা আর নেই। কিন্তু কোকা স্টেশনেই ধরা পড়ে। ধরা পড়বার পর ব্রজগোপাল গিয়েছিলেন দেখা করতে, উকিল সঙ্গে নিয়ে। ছেলেটাকে তখন দেখেছেন, শিবনেত্র হয়ে লাতন বেচারার মতো বসে আছে। ঘন ঘন মাথা ধোয়, চুল তখনও সপসপে ভেজা, মুখটা পাঁশুটে কেমনধারা যেন। অনেককাল রোগভোগের পর মানুষের এমন চেহারা হয়। ছেলেটা সোমেনের বয়সি একটা তাজা ছেলেকে কেটে ফেলেছে, ভাবলে ওর ওপর রাগ ঘেন্না হওয়ার কথা। কিন্তু মুখ দেখলে তখন মায়া হত। ব্রজগোপাল একটু মায়াভরে বলতেন, কেন কাজটা করতে গেলি রে নিব্বংশার পো?

কোকা তখন দিশেহারার মতো চার দিকে চেয়ে গলা নামিয়ে বলত, বাঁধের ওপর দাঁড়িয়েছিল একা। স্যাঙাত জুটিয়ে আমাদের ওপর মাতব্বরি করত খুব। পেছুতে লাগত, তাই রাগ ছিল। সেদিন একা দেখে মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। এখন তো সবাই মানুষ-টানুষ মারে, কেউ কিছু বলে না। তাই ভাবলাম, এক বার মেরেই দেখি না কী হয়। পালান, নেতাই ওরাও সব বললে, দে শালাকে চুপিয়ে। দিনকাল খারাপ বলে অস্তর সঙ্গে থাকত। হাতে অস্তর, মানুষটাও একা, মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। হাঁকাড় ছেড়ে দৌড়ে যেয়ে চুপিয়ে দিলাম।

ব্রজগোপাল আতঙ্কিত হয়ে বলেছেন, ওরে চুপ চুপ। ও-সব কথা কোস না আর ভুলে যা। উকিলবাবু যা শেখাবেন সেই মতো বলবি।

সন্দেহ ছিল, জেরার সময়ে মাথা ঠিক রাখতে পারবে কি না। কারণ, দেখা করতে গেলেই খুব আগ্রহের সঙ্গে ঘটনাটার বিশদ বিবরণ দিতে শুরু করত কোকা। চোখ দু'খানা বড় বড় হয়ে যেত, দম ফেলত ঘন ঘন। বলত, মাইরি, মানুষ যে এমনভাবে মরে কে জানত! আঁ-আঁ করে একটা চিৎকার ছেড়ে ছেলেটা যখন পড়ে যায় তখন রক্তটা এসে গায়ে লাগল। কী গরম রক্ত রে বাবা! পড়ে হি-হি করে কাঁপছিল ছেলেটা। সে কী ভয়ংকর দৃশ্য! কোকাকে তখন চুপ করানো ভারী মুশকিল ছিল।

প্রথম ক'দিন ঝিম হয়ে পড়ে থাকত। কোর্টে জেরার সময়ে নানা উলটোপালটা জবাব দিয়েছিল। সুবিধে ছিল এই যে, যাকে মেরেছিল তার নামে পুলিশের হুলিয়া ছিল। সে নাকি ভারী ডাকাবুকো ছেলে, কলকাতায় পুলিশ মেরে এসেছে। ফলে, কোকা আর তার দলবলের বিরুদ্ধে পুলিশ কেসটা খুব সাজায়নি। উকিলও সুযোগ পেয়ে 'আত্মরক্ষার জন্য হত্যা' প্রমাণ করার চেষ্টা পায়। মোকদ্দমা ফেঁসে যাওয়ার মতো অবস্থা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য চারজনের মেয়াদ হয়েছিল। তিনজন আগেই খালাস পেয়ে যায়। সবশেষে খালাস হল কোকা, মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই।

এই মামলায় রাজসাক্ষী ছিল গোবিন্দপুরের মেঘু ডাক্তার। সে মাতাল-চাতাল মানুষ। বেলদা-র শুঁড়িখানা থেকে বাঁধ ধরে ফিরছিল। সে ঘটনাটা চোখের সামনে দেখতে পায়। সে অবশ্য লোকজনদের ঠিক চিনতে পারেনি। উলটোপালটা সেও বলেছিল সাক্ষী দিতে গিয়ে। তবু সবচেয়ে জোরদার সাক্ষী ছিল সে-ই।

এ তল্লাটে মেঘুর মতো ডাক্তার নেই। পুরনো আমলের এল এম এফ। সে রুগির মুখে ওষুধ বলে জল ঢেলে দিলেও রুগি চাঙ্গা হয়ে যেত—মানুষের এমন বিশ্বাস ছিল তার ওপর। বউ মরে গিয়ে ইস্তক সে ঘোর মাতাল। বালবিধবা এক বোন তার সংসার সামলায়, মেঘু সকাল থেকেই ঢুকু ঢুকু শুরু করে দেয়। রোজগারপাতি বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়, সংসার চলে না, রুগি দেখে যে পয়সা পায় তা শুঁড়িকে দিয়ে আসে। ইদানীং পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল। এক মুসলমান বৃষ্টির সন্ধেবেলা এসে হাজির, সান্নিপাতিকে তার তখন যা-দশা! মেঘুর আলমারিতে ওষুধের নামগন্ধও ছিল না তখন। রুগি হাতছাড়া হয় দেখে ইঞ্জেকশনের দাম নিয়ে উঠে ভিতর-বাড়িতে গিয়ে গোয়ালঘরের খোড়ো চালের লালচে জল সিরিঞ্জে ভরে এনে ঠেলে দিয়েছিল রুগির শরীরে। এ ঘটনা দেখে ভয় পেয়ে বালবিধবা বোন চেঁচামেচি শুরু করাতে মেঘু গাঁ ছেড়ে পালাল ক'দিনের জন্য। তার তখন

ধর্মভয় নেই, লোকলজ্জাও না, কেবল ছিল জীবজন্তুর মতো মারধরের ভয়। ফেরার অবস্থায় সে ভারী মজা করেছিল। বর্ধমানের এক বিখ্যাত তান্ত্রিকের নাম করে বহেরুকে চিঠি দিল একদিন। চিঠির ওপর সিঁদুরের ছাপ, লাল কালি দিয়ে ত্রিশূল আঁকা। তাতে লেখা—ক্ষীরোগ্রাম শ্মশানেশ্বরী শ্রীশ্রী১০৮ কালীমাতার আদেশক্রমে লিখি, বৎস বহেরু, গোবিন্দপুরের শ্রীমান মেঘনাদ ভট্টাচার্য আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অতি অল্প দিনেই সর্বসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতঃপর সে মেঘুতান্ত্রিক নামে লোকপ্রসিদ্ধ হইবে। তাহার আধার অতি উচ্চ। ক্ষীরোগ্রাম শ্মশানে মায়ের স্বপ্নাদেশক্রমে একটি মন্দির নির্মাণকল্পে সে অর্থ সংগ্রহে তোমার নিকট যাইতেছে। তাহাকে সাহায্য করিলে শ্মশানেশ্বরী মাতার সিদ্ধ বর লাভ করিবে। বিমুখ করিলে শ্রীশ্রীমাতার কোপে পড়িবে ইত্যাদি। হাতের লেখা মেঘু ডাক্তারের নিজেরই, চিনতে কারও অসুবিধে হয় না। চিঠির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রক্তাম্বর রুদ্রাক্ষে সিঁদুর ত্রিশূলে সেজে মেঘুতান্ত্রিক এসে হাজির। লোকে হেসে বাঁচে না। বহু লোককেই ও-রকম চিঠি দিয়েছিল মেঘুতান্ত্রিক। বাল-বিধবারা খর-ঝগড়ুটে হয়। মেঘুর বোন আরও এক ডিগ্রি বেশি। সে মেঘুর মালা রক্তাম্বর ছিঁড়েকুটে একশা করল। সেই থেকে মেঘু আবার ঘরবাসী, এমন ডাক্তারকে লোকের ভয় পাওয়ার কথা। কিন্তু তবু আশপাশের পুরনো লোকেরা এখনও মেঘু ডাক্তারের কাছে যায়। ভাল মেজাজে থাকলে মেঘুর মাথা বড় সাফ, সাহসীও বটে। গায়ে একরকম ঘা নিয়ে শেওড়াফুলি থেকে একজন লোক এসেছিল, বহু চিকিৎসায় সারেনি। মেঘু তার ডান হাত থেকে রক্ত সিরিঞ্জে টেনে নিয়ে বাঁ হাতে ভরে দিয়েছিল। লোকটা আশ্চর্যের বিষয়, ভাল হয়ে গিয়েছিল তাতে।

গোবিন্দপুরের যে ক'জন লোককে বহেরু পছন্দ করে তার মধ্যে মেঘু একজন। খামারবাড়িতে কারও অসুখ হলে মেঘুই এসেছে বরাবর। ব্রজগোপালের সঙ্গে তার ভাবসাব ছিল খুব। প্রায় বলত, ব্রজঠাকুর, দু'বেলা খাওয়ার পর চ্যাটকানো প্লেটে মধু খাবেন দু'চামচ। মধুটা ছড়িয়ে নেবেন, আস্তে ধীরে খাবেন। যত স্যালিভা মিশবে মধুর সঙ্গে, তত ভাল।

কথামতো খেয়ে দেখেছেন ব্রজগোপাল, উপকার হয়।

একদিন বলেছিল, ব্রজঠাকুর, একটা মুষ্টিযোগ দিয়ে রাখি। পাতিলেবুতে মেয়াদ বাড়ে। আর নিরামিষে।

মেয়াদটা কী বস্তু? ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেছেন।

দুনিয়ার গারদের মেয়াদ। লনজিভিটি।

পুদিনা, সুল্‌পো আর ধনেপাতা আমলকী দিয়ে বেটে খেলে আর অন্য ভিটামিন দরকার হয় না। খ্যাপাটে ডাক্তারটা এ-রকম হঠাৎ হঠাৎ বলত। অব্যর্থ সব কথা। কিছু কিছু ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন ব্রজগোপাল। ইচ্ছে ছিল ডাক্তারের পুরো জীবনটাই লিখবেন। কিন্তু মোদো-মাতালের কাণ্ডে তা হয়ে ওঠেনি। পয়সাকড়ি ফুরোলে ডাক্তারটা পাগলের মতো হন্যে হয়ে যেত। কুমোরপাড়ার হরিচরণ এক সময়ে তাড়ি বানাত। পুলিশের রগড়ানিতে ছেড়ে দিয়ে একখানা ওষুধের দোকান দিল। গাঁ-ঘরের দোকান, তাতে কবরেজি, হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপাথি সবই কিছু কিছু জোগাড় করে রেখেছিল সে। মেঘু ডাক্তার একদিন মৌতাতের সময়ে বিছুটি-লাগা মানুষের মতো সেখানে হাজির। তাড়ির কারবার যে আর নেই তা খেয়ালই করল না। চারপাশটা খ্যাপা চোখে দেখে নিয়ে 'শিশিতে তাড়ি বেচিস?' এই বলে তাক থেকে এলোপাতাড়ি গোটা দুই বোতল তুলে নিয়ে ঢকাঢক মেরে দিতে লাগল। হরিচরণ হাঁ-হাঁ করে এসে ধরতে না ধরতে আধবোতল অ্যালক্যালাইন মিকশ্চার সাফ। অন্য বোতলটা ছিল ফিনাইলের, সেটা হরিচরণ সময়মতো কেড়ে না-নিলে মুশকিল ছিল। পয়সা না পেলে এমন সব কাণ্ড করত মেঘু।

এই মেঘু যখন রাজসাক্ষী হয় তখন ব্রজগোপাল বহেরুকে বলেছিলেন, ওকে হাতে রাখ।

হাতে রাখা সোজা। মেঘুকে মদের পয়সাটা দিয়ে গেলেই চমৎকার। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই। কিন্তু

বহেরু কেমন একধারা চোখে ব্রজকর্তার দিকে চেয়ে বলেছিল, দেখি।

দেখাদেখির কী? ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, এ-সময়টা আর তেসিয়ে নষ্ট করিস না। আগে থেকে টুইয়ে রাখ।

কিন্তু কেমন যেন গা করেনি বহেরু। আলগা দিয়ে বলল, মাতাল চাতাল মানুষ, হাত করলেও কী বলতে কী বলে ফেলবে!

কথাটা ঠিক, তবু বহেরুর হাবভাব খুব ভাল লাগেনি ব্রজগোপালের। সে ছেলের ব্যাপারে একটু গা-আলগা দিয়েছিল যেন। মেঘুকে হাত করার কোনও চেষ্টা করেনি। ব্রজগোপাল নিজেই গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এসেছিলেন মেঘুকে। পাঁচটা টাকা দিয়েছিলেন, যদিও মেঘুকে টাকা দেওয়া মানে পরোক্ষে শুঁড়িখানার ব্যবসাকে মদত দেওয়া। স্বভাববিরুদ্ধ কাজটা তবু করেছিলেন ব্রজগোপাল।

মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কোকা বেরিয়ে এসেছে। এতে বাপ হয়ে বহেরুর খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু তার মুখে-চোখে একটা নিরানন্দ ভাব। আর, তার চেয়েও বড় একটা ব্যাপার দেখতে পান ব্রজগোপাল। বহেরুকে জীবনে ভয় পেতে দেখেননি তিনি। এখন মনে হয় বহেরুর চোখে একটু ভয় যেন সাপের মাথার মতো উঁকি মারছে।

ভাবতে ভাবতে এপাশ থেকে ওপাশ হন তিনি। কাঁথাটা গায়ে জড়ান। তাঁতি লোকটা কী একটু কথা বলে ঘুমের মধ্যে হাসে। ব্রজগোপাল অন্ধকারে চেয়ে থাকেন। হারিকেনের পলতেয় একবিন্দু নীলচে হলুদ আলো জ্বলছে। ব্রজগোপাল চেয়ে থাকেন।

গতকাল মেঘু ডাক্তার মারা গেছে। কোকা খালাস হয়েছে মোটে ক'দিন। মেঘুটা আবার রাজসাক্ষী ছিল।

॥ চব্বিশ ॥

সেদিন ভাগচাষির কোর্ট থেকে ফেরার পথে মেঘু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। বেলদা-র বাজারে দাঁড়িয়ে মাতলামি করছে। লোকজন ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। বেঁটেখাটো কালোপানা বুড়ো মানুষ, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, গালে বিজবিজে সাদা দাড়ি, কষে ফেনা, দু'চোখে জলের ধারা। হাপুস কাঁদে মেঘু ডাক্তার। মাতালের যা স্বভাব, কোথাও কিছু না, হঠাৎ একটা পুরনো অনাত্মীয় দুঃখকে খুঁচিয়ে তোলে। মেঘু কাঁদছে তার বালবিধবা বোনের কথা মনে করে, আমার জনমদুখিনী বোনটা, আহা-হা, আমার বিধবা বোনটার যে কী দুঃখ! আমি তার দাদা...হাঁ আলবত তার মায়ের পেটের দাদা! বলে হঠাৎ কান্না ভুলে বড় বড় ঠিকরানো চোখে চার দিকে চেয়ে দেখে মেঘু ডাক্তার। পরমুহূর্তে ক্যাঁ করে কেঁদে ফেলে ভাঙা গলায় বলতে থাকে—মায়ের পেটের দাদা! মরার খবর হলে বোনাই কাছে ডেকে বলেছিল হাত ধরে—দাদাগো, ব্যবস্থা তো কিছু করে যেতে পারলাম না, ওর কী হবে! সেই বোনটা আমার বাসন মেজে খায়, আর আমি শালা মাতাল...শালা মাতাল...জুতো মার, জুতো মার আমাকে...বলতে বলতে মেঘু এর-ওর-তার পায়ের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে তেড়ে যায় জুতো ধরতে।

সাঁত সাঁত করে সবাই পা টেনে নিয়ে পালাতে থাকে। কেবল ধরা পড়ে যায় রেলের রাতকানা কুলি হরশঙ্কর। তার হাতে শিশিতে একটু কেরোসিন, দোকান থেকে ফিরছিল, মজা দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার একখানা ঠ্যাং সাপটে ধরেছে মেঘু, হাঁটু গেড়ে বসে মুখ তুলে বলে, দে শালা জুতো আমার মুখে। দে! দিবি না? পয়সা জুটলে হরশঙ্কর নিজেও টানে, তাই খুব সমবেদনার সঙ্গে কী যেন বোঝাতে থাকে ডাক্তারকে।

গোবিন্দপুরের যে ক'জনকে একটু-আধটু পছন্দ করে বহেরু, তার মধ্যে মেঘু ডাক্তার একজন। কাণ্ড দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, খেয়েই ডাক্তারটা যাবে।

ব্রজগোপাল বলেন, দেখবি নাকি!

ও আর দেখার কী! চলে চলুন।

ব্রজগোপাল একটু ইতস্তত করে বলেন, কোথায় পড়েফড়ে থাকবে! হিম লেগে না রোগ বাধায়।

বহেরু বলে, পেটে ও থাকলে আর ঠান্ডা লাগে না।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ফেলেন। বলেন, গুণ ছিল রে!

বহেরু থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ কী মনে পড়তেই বলে, ডাক্তারটা বামুন হয়ে ছোটলোকের পা ধরছে!

ব্রজগোপাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, মাতালের আবার বামুন।

বহেরু সে-কথায় কান না দিয়ে বলে, আপনি এগোন কর্তা, আমি দেখেই যাই।

ব্রজগোপাল হাসলেন। বহেরুর ওই এক দুর্বলতা। বামুন দেখলে সে অন্য রকম হয়ে যায়। ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, দ্যাখ! একটা রিকশায় তুলে দিস বরং।

লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে বহেরু হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলে ডাক্তারকে, বলে, চলো ডাক্তার।

মেঘু কিছু বুঝতে পারে না কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, মারছিস? মার। বলে মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদে। মুখের লালা, নাকের জল মিশিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বলে, মার আমাকে।

তোমার ইজ্জত নেই। বামুন হয়ে দোসাদের পা চেপে ধরলে কোন আক্কেলে? চলো তোমাকে গোচোনা গেলাব আজ।

মেঘু সঙ্গে সঙ্গে কান্না ভুলে ফোঁস করে ওঠে, কেন শালা? আমাকে পেয়েছ কী? অ্যাঁ!

ফের মাতলামি করবে না বলে দিচ্ছি। তোমাদের গাঁ হয়েছে এক নেশাখোরদের আড্ডা।

আমি মাতাল! ভারী অবাক হয় মেঘু—আমি! অ্যাঁ?

তুমি আজ বিস্তর গিলেছ। এত খাও কী করে হে! এই বলে বহেরু তাকে টানতে টানতে বটতলাব রিকশার আড্ডায় নিয়ে যেতে থাকে। মেঘু চেঁচাতে থাকে—শালা, গোরু দেখেছিস? দেখেছিস গোরু সারাদিন খালি খায় আর খায়? সকালে জাবনা, বিকেলে জাবনা, তার ওপর দিনমানভর ঘাস ছিঁড়ছে আর খাচ্ছে! রাতেও শালা উগরে তুলে চিবোয়। গোরুর কখনও পেট ভরে, দেখেছিস? আমি হলুম মদের গোরু...

লোকজন খ্যাল খ্যাল করে হাসছে। ছোকরা একটা রিকশাওলা ঘণ্টি মারে। রিকশাটা এগিয়ে আসতেই মেঘু তেড়িয়া হয়ে দাঁড়ায়, রিকশায় যাব কেন, আমি কি মাতাল শালা? বহু কাপ্তান দেখেছি শুঁড়ির গায়ের ঘাম চাটলে শালাদের নেশা হয়ে যায়। আমি কি তেমন মাতাল নাকি। আমি হচ্ছি মদের গোরু, সারাদিন খাইয়ে যা, পেট ভরবে না। মেঘনাদ ভটচাযকে কেউ কখনও মাতাল দেখেনি। হটাও রিকশা...

বলে মেঘু রুখে দাঁড়ায়। তারপর বহেরু কিছু টানাটানি করতেই সটান শুয়ে পড়ে ধুলোয়। সে-অবস্থা থেকে তাকে তোলা বড় সহজ হয় না।

ব্রজগোপাল সেই শেষবার দেখেছিলেন মেঘু ডাক্তারকে বাজারের বটতলায় ধুলোমুঠো ধরে পড়ে আছে। মাতাল মানুষ। ইদানীং বোধবুদ্ধি খুব কমে যাচ্ছিল। কেমন ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো চোখের নজর, দুটো ঠোঁট সবসময়ে ক্যাবলার মতো ফাঁক হয়ে থাকত। চোখের নীচে গদির মতো মাংস উঁচু হয়ে থাকত। চোখে আলো নিবে গেছে। ভিতরে ভিতরে বাঁচার ইচ্ছেটাও মরে গিয়েছিল বোধহয়।

পরশু বুঝি পয়সার টান পড়ে। গোটা চারেক টাকার জোগাড় ছিল। দুপুরের দিকে বালবিধবা বোন তিনটে টাকা কেড়ে নেয়। না-নিয়েও উপায় ছিল না, দু'-চারদিন কুত্থি-কলাই সেদ্ধ অথবা গমের খিচুড়ি খেয়ে বাচ্চাদের পেট ছেড়েছে। কিছু ভদ্রলোকি খাবার না জোটালেই নয়। মেঘু

ডাক্তার বোনকে মুখোমুখি বড় ডরায়। টাকাটা হাপিস হয়ে গেল দেখে নাকি সুস্থ মাথায় সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করেছিল, আমার মালের দাম ভেঙে গেল, একটা টাকায় শুঁড়ির মুখখানাও দেখা যায় না। এখন আমার শরীরটা যদি পড়ে যায় তো তোদের দেখবে কে শুনি?

দায়িত্বশীল গেরস্তের মতো কথাবার্তা। মালের দামটা ভেঙে গেছে বলে যে আবার টপ করে জোগাড় করে নেবে সে-সাধ্য মেঘুর ছিল না। তার গুডউইল নষ্ট হয়ে গেছে। এখন মেঘু মাতাল আর মেঘু ডাক্তার দুটো মানুষ। মাতাল মেঘুর জন্য ডাক্তার মেঘু নষ্ট হয়ে গেছে। মাতাল অবস্থায় কী করেছে না করেছে ভেবে মেঘু ইদানীং বড় বিনয়ী হয়ে গিয়েছিল। যখন-তখন লোকের পা ধরত। তাতে শ্রদ্ধা আরও কমে যায়। ধারকর্জ দিয়ে দিয়ে লোকে হয়রান। দুপুর গড়িয়ে গেলেই ডাক্তারকে নিশি ডাকে। বাহ্যজ্ঞান থাকে না, পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দর বোধ লুপ্ত হয়ে যায়। ধূর্তামিতে পায় তখন। সে-সময়ে চেনা লোক তাকে দেখলেই গা-ঢাকা দেয়।

পরশু বিকেলে মেঘুকে যখন নিশিতে পেয়েছে, মালের দাম ভেঙে গিয়ে চূড়ান্ত দুঃখে মেঘুর চোখে জল, সে-সময়ে গুটি গুটি একটি পাঁঠা নিজে হেঁটে এল হাঁড়িকাঠে গলা দিতে। সে একটু বোকাসোকা চাষি মানুষ, এক-আধবার মেঘুর চিকিৎসা করিয়ে থাকবে। 'কল' দিতে এসেছিল। গোবিন্দপুর থেকে আরও মাইলখানেক উত্তরে তাদের গাঁয়ে। মেঘু তক্ষুনি রাজি। রুগি দেখার পর নাকি পয়সা না দিয়ে চাষি-বউ গুচ্ছের ধান, কলাই, দুটো বিচে-কলার মোচা, এ-সব দিয়েছিল। কিন্তু মেঘুর তখন হন্যে অবস্থা, ধান-কলাই-মোচা দেখে আরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। চাষির ঘরে ঢুকে শিশিবোতল হাঁটকায়, ছিপি খুলে গন্ধ শোঁকে, আর বলে, তোরা মাল খাস না? অ্যা! মাল খাস না তো চাষবাস করার তাগদ পাস কীসে? মাল না খেলে শরীরে রক্ত হয় তোদের কী করে, অ্যাঁ! নগদা তিন-চারটে টাকা থাকে না তোদের কাছে কেমন গেরস্থালি করিস তোরা! নাম ডোবালি।

ঠিক কী হয়েছিল তা বলা মুশকিল। তবে মেঘু ডাক্তার চলে আসার পর নাকি চাষা দেখতে পায় তার ঘরের একটা জিনিস খোয়া গেছে। তার বড় ছেলে বর্ধমানের কলেজে পড়ে, একটা সস্তার হাতঘড়ি শখ করে কিনেছিল। দেয়ালে পেরেকে ঝোলানো ছিল। নেই। মেঘু চারশো বিশ ছিল বটে, কিন্তু কখনও লোকের ঘরে ঢুকে কিছু সরায়নি এ-যাবৎ। বেলদার সেই ঘড়ি দশ টাকায় বেচে কোকার এক স্যাঙাতের কাছে, তারপর তাদের সঙ্গে বসেই একনম্বর টেনেছে। কাল সকালে বহেরুর ধানখেতে তাকে পাওয়া যায়। শরীরটা ঠান্ডা কাঠ হয়ে আছে। লাশ এখন পুলিশের হেফাজতে। তারা কোকার স্যাঙাতদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোকার খোঁজেও এসেছিল। কিন্তু দলে ছিল না বলে ধরে নিয়ে যায়নি। পালান চোরাই ঘড়িটা কিনেছিল, সেটা বাড়িতে ফেলে রেখে বোকার মতো ফেরার হয়েছে। পুলিশ চোরাই ঘড়ির জন্য খুঁজছে, নাকি খুন সন্দেহ করছে, কিছু বলা যায় না। ঘড়িটড়ি সস্তা ব্যাপার নিয়ে তারা এত মাথা ঘামায় না। তবে কি খুন?

ব্রজগোপাল ভেবে পান না। মোদোমাতাল অপদার্থটাকে মেরে লাভটা কী? বহেরু তবু কাল বিকেলের দিকে ব্রজগোপালের কাছে এসে বলেছে, ডাক্তারটা রাজসাক্ষী ছিল বলে খুন হল না তো কর্তা!

ব্রজগোপাল অবাক হয়ে বলেন, খুন বুঝলি কীসে? এমনিতেই শরীরটা ঝাঁঝরা হয়ে ছিল, পট করে মরে যেত যে-কোনও সময়ে।

বহেরু ধন্দভাবে মাথা নেড়ে বলে, গ্যাঁজ উঠছিল যে মুখ দিয়ে।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, ও-সব খেলে তো ও-রকম হবেই।

বহেরু হেসে বলেছিল, পুলিশ কিছু একটা গন্ধ পেয়েছে। কেলো শুঁড়ির দোকানে কাল নাকি মেঘুকে পালান ওরা সবাই শাসিয়েছে— তুমি রাজসাক্ষী দিয়ে আমাদের ঘানি ঘুরিয়েছ, তোমার গর্দান যাবে।

ব্রজগোপালের তবু বিশ্বাস হয় না। শুঁড়িখানায় বসে কত মশামাছির মতো মানুষ রাজা-উজির

মারে। তিনি বললেন, লাশ তো তুই দেখেছিস। কিছু টের পেলি?

বহেরু মাথা নেড়ে বলল, না, শরীর দেখে কিছু বোঝা যায় না। তবে ডাক্তারটা মদের নেশায় মাথার ঠিক রাখতে পারত না। কেউ যদি সে-সময়ে পোকামারার বিষ এগিয়ে দেয় তো তাই ঢকাঢক ঢেলে দেবে গলায়। এই বলে একটা শ্বাস ফেলে বহেরু বলল, কোকাটার জন্য ভারী চিন্তা হয় কর্তা।

ব্রজগোপাল চিন্তিত হয়ে বললেন, চিন্তা করিস না। ও তো দলে ছিল না। মাঠেঘাটে লাশ পাওয়া গেলে পুলিশ একটু নড়াচড়া করে। কাটাকুটি করে দেখবে। ও-সব কিছু না।

তা পালান পালিয়েছে কেন? সেটাও তো দেখতে হবে!

দূর বোকা। ও পালিয়েছে ভয়ে। ঘরপোড়া গোরু, এক বার পুলিশ ছুঁলে আঠারো ঘা। তার ওপর চোরাই ঘড়িটা কিনেছে, ভয় থাকবে না?

বহেরু বুঝল। তবু একটু সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, খুন যদি নাও হয়ে থাকে মেঘু, তবু কিন্তু মনে লয় কোকার স্যাঙাতরা সব খালাস হয়ে এসেছে, শাসাচ্ছে-টাসাচ্ছে দেখে ডাক্তারটা ভয় খেয়ে মরে গেল না তো। তেমন তেমন ভয়-ডরের বাতাস লাগলে মানুষ সিঁটিয়ে মরে যায়।

সেটাও ব্রজগোপালের বিশ্বাস হয় না। মেঘু বাস্তব জগৎ সম্পর্কে খুব খেয়াল করত না ইদানীং। এক-একটা বোধহীনতা মানুষকে পেয়ে বসে, যখন বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়ার মধ্যে তফাত করতে পারে না। বউ মরে যাওয়ার পর থেকে পরশু ইস্তক মেঘু ডাক্তারের আত্মবোধ ছিল বলে মনে হয় না। 'আমি আছি' এমনতর হুঁশ থাকলে তবে তো ভয়ডর? কেবল নেশায় বাধা দিত বলে বালবিধবা বোনটাকে সমঝে চলত। আর সুস্থ অবস্থায় মেঘু ডাক্তার ভয় খেত মাতাল মেঘুকে। কতবার মেঘু এসে ব্রজগোপালের পা চেপে ধরে বলেছে, দাদা, কাল সাঁঝের ঘোরে শীতলাতলায় আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, অবিহিত কিছু বলে ফেলেছি হয়তো, সম্মান রাখতে পারিনি। মাতাল-চাতাল মানুষ, ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন। মেঘুর তাই সমস্যা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, নিজের মধ্যে দুটো মানুষকে সামাল দেওয়া। একটার সঙ্গে অন্যটার দেখা হয় না। একটা জাগলে অন্যটা ঘুমোয়। একটা ঘুমোয় তো অন্যটা জাগে। কতদিন মেঘু তার বোনের পা চেপে ধরে চেঁচিয়েছে—বেঁধে রাখ, বেঁধে রাখ আমাকে গোশালে। ঢেঁকিতে লটকে রেখে দে। তখন অন্য মেঘুটা অশরীরী হয়ে এসে এই মেঘুটাকে ইশারা-ইঙ্গিত করত ভূতের মতো। ছাইগাদায় দাঁড়িয়ে, ঘের-পাঁচিলের ওপর উঠে, মাদার গাছের ডালে বসে দাঁত কেলিয়ে হাসত মেঘুর কাণ্ড দেখে। নিঃশব্দে মেঘুর কানে কানে বলত, দূর বাবু, রসের বানে দুনিয়া ভেসে যাচ্ছে, তুমি কেন গা শুকনো সন্নিসি হয়ি থাকবে? কোন কচুপোড়া হবে তাতে? এই দুনিয়া তোমার জন্য কোন সুখ-শান্তির বন্দোবস্ত রেখেছে শুনি! তাই যদি ভেবে থাকো তো থাকো বোনের পায়ে লটকে, কিন্তু কিছু হওয়ার নয়। দুনিয়া এখন তোমার কাছে বাওয়া ডিম বাবা, এ থেকে আর কিছু বেরোবে না। তখন মেঘু উঠে চোর-চোখে চার দিকে চাইত। বোন সে চাউনি চিনত। ঘরের বাসন-কোসন বা দামি জিনিস সব তালাচাবি বন্ধ, পয়সা-কড়ি লুকোনো। নিজেকে গালমন্দ করতে করতে মেঘু তখন খারাপ হওয়ার জন্য অন্য মেঘুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ত।

তাই ব্রজগোপাল ভাবেন মেঘুর কাছে দুনিয়ার ঘটনাবলির কোনও অর্থ ছিল না। দু'-দুটো মেঘুর টানা-হ্যাঁচড়ায় সে তখন নিজের ঘায়ে কুকুর-পাগল। সে যে রাজসাক্ষী হয়েছিল, এ হুঁশই ছিল না।

তবু নানা চিন্তা এসে চেপে ধরে। পাপের এক হাওয়া-বাতাস এসে গেছে দুনিয়ায়। কিছু বিচিত্র নয়। কোকা সেই ছোকরাকে খুন করার পর যেমন বলেছিল, আজকাল তো সবাই মানুষ মারে, কারও কিছু হয় না। কোকা কেবলমাত্র সেই কারণেই ছোকরাকে মেরে দেখেছিল কেমন লাগে। এমন তুচ্ছ কৌতূহলে যদি মানুষ মারা যায় তা হলে বলতেই হয়, সবার ঘাড়ে ভূত চেপেছে।

আবার এও মনে হয় মেঘুটা এমনিতেই মরল। মরার সময় হয়েছিল, দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হয়েছে। এখন শুদ্ধ-মুক্ত হয়ে বউয়ের পাশটিতে বসেছে কলজে ঠান্ডা করে, একটা বউয়ের জন্য

যে একটা মানুষ এমন শোক-পাগল হতে পারে তা আর দেখেননি ব্রজগোপাল।

গভীর রাতে তিনি একটা শ্বাস ফেলে পাশ ফিরলেন। গায়ের কাঁথাটা সরে গেল। ঠান্ডা ঢুকছে। হারিকেনের একবিন্দু নীল আগুন স্থির হয়ে আছে। নীলের ওপর একটু হলদে চুড়ো। ঘরময় কেরোসিনের গন্ধ। তাঁতি লোকটা ঘুমের মধ্যে এক বার বলল, ডাঁড়াও না...অ্ তারপর চুপ করে ঘুমোতে থাকে। ঘড়িটা বন্ধ, সময়টা ঠিক বুঝতে পারেন না ব্রজগোপাল।

এমনি সময়ে গন্ধ বিশ্বেস হা-হা করে চেঁচিয়ে উঠল। আজও মুতের হাঁড়ি উলটে ফেলেছে। বহেরুর বড়জামাইয়ের গলার স্বর আসে। গলায় সুরের নামগন্ধ নেই, তবু একরকম একঘেয়ে পাঁচালির মতো আবেগে গাইতে থাকে—জাইগতে হবে, উইঠতে হবে, লাইগতে হবে কাজে...

তারপর হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী চমকে উঠে চুপ করে যায়। দিগম্বরের খোলে প্রথম চাঁটিটি পড়ে গুম করে। তোপের আওয়াজের মতো ওই একটি ধ্বনিই সবাইকে জানিয়ে দেয়, শব্দে ভগবান আছেন। শব্দ নমস্য।

নিঃশব্দে ব্রজগোপাল ওঠেন। বাইরে এখনও নিশুত রাতের মতো অন্ধকার। কুয়াশায় আবছা হিম। বৃষ্টির মতো শিশিরে ভিজে আছে চারধার। তবু ভোরের অনেক আগেই এখানে দিন শুরু হয়। দিগম্বরের আনন্দিত খোল শব্দে মাতাল হয়ে লহরায় ভাসিয়ে নিচ্ছে জগৎসংসার।

হারিকেন হাতে, খড়মের শব্দ না করে ব্রজগোপাল পুকুরের ঘাটে পা দিয়ে একটু চমকে ওঠেন। পৈঠায় কে যেন বসে আছে, অন্ধকারে একা। এটা ব্রজগোপালের নিজস্ব ঘাট। ব্রাহ্মণের ঘাটে কারও কোনও কাজ করার নিয়ম নেই। ব্রজগোপাল হারিকেনটা তুলে বললেন, কে?

॥ পঁচিশ ॥

গার্ড সাহেবের মতো লণ্ঠন উঁচুতে তুলে ধরে ব্রজগোপাল ঠাহর করে দেখলেন। খেজুর গাছ চেঁছে, খোঁটা পুঁতে মজবুত ঘাট তৈরি করে দিয়েছে বহেরু। সবাই বলে, বামুনকর্তার ঘাট, এ ঘাটে আর কেউ ধোয়া পাখলা করে না। অন্য মানুষ তাঁর ঘাটে বসে আছে দেখে ব্রজগোপাল অসন্তুষ্ট হন। আচার-বিচার সহবত সব কমে আসছে নাকি!

কুয়াশা আর লণ্ঠনের হলুদ আলোয় রহস্যের মাখামাখি। লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল, বামুনজ্যাঠা।

ব্রজগোপালের চোখ আজকাল কমজোরি। লণ্ঠনের আলো থেকে চোখ আড়াল করে ঠাহর পেলেন, কোকা। তার কান-মাথা ঢেকে একটা কমফর্টার জড়ানো, গায়ে চাদর। আলিসান চেহারা নিয়ে বসে ছিল, ব্রজগোপালকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। গালে একটা দাঁতনকাঠি গোঁজা।

ব্রজগোপাল একটু অবাক হয়ে বলেন, কী রে!

কোকা নিঃশব্দে একটু হাসল। বলল, রাতে একদম ঘুম হল না। তাই উঠে ঠান্ডায় একটু বসে আছি।

ব্রজগোপাল খড়ম ছেড়ে লণ্ঠন হাতে জলের কাছে নামলেন। জল হিম হয়ে আছে। চবাক করে বড় মাছ ঘাই দেয়। ব্রজগোপাল কানে-গোঁজা দাঁতনটা ধুয়ে নিয়ে বলেন, কাঁচা বয়সে ঘুম আসবে না কেন? সারাদিন দত্যিপানা করে বেড়াস, ঢলে ঘুমোনোর কথা।

মাথাটা গরম লাগে।

কেন রে?

মেঘুখুড়ো ঝাঁৎ করে মরে গেল, পুলিশ ডাক খোঁজ করতে লেগেছে। আবার না পেছুতে লাগে।

ছেলেটা যে খুব স্বাভাবিক নেই, তা ব্রজগোপাল বাতাস শুঁকে বুঝতে পারলেন। অসম্ভব নয় যে

ছোকরা সারা রাত ঘরে ছিল না। বোধহয় ভোর ভোর শুঁড়িখানা থেকে ফিরেছে। তবে একেবারে বেহেড নয়।

ব্রজগোপাল বললেন, বৃত্তান্তটা কী, কিছু খবর পেয়েছিস?

কে জানে! তবে বাবা কাল রাতে ডেকে বলল, তুই পালিয়ে যা।

বহেরু বলেছে? ব্রজগোপাল অবাক হন।

হ্যাঁ। তাই ভাবছি, পালাব কোথায়।

পালাবি কেন! পালালে আরও লোকের সন্দেহ বাড়ে।

পালান পালিয়েছে, আরও সব গা ঢাকা দিয়ে আছে। আমার ও-রকম ভাল লাগে না। এই তো অ্যাদ্দিন মেয়াদ খেটে এলাম। ঘরের ভাত পেটে পড়তে না পড়তেই আবার সবাই হুড়ো দিতে লেগেছে। বেড়াল কুকুর হয়ে গেলাম নাকি!

ব্রজগোপাল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেন না। তাঁর ছোট ছেলেটারও এই বয়স। এই বয়সে অভিজ্ঞতার বা বোধবুদ্ধির পাকা রং লাগে না। দাঁতনটার তিতকুটে স্বাদ মুখে ছড়িয়ে যেতে থাকে। একটু ভেবে ব্রজগোপাল বলেন, পুলিশের পাকা খাতায় নাম উঠিয়ে ফেললি। এখন তো একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হবেই।

কোকা একটু অভিমানভরে বলে, যা করেছি তার তো সাজা হয়েই গেল। লাথি-গুঁতো কিছু কম দিয়েছে নাকি! আমার বড়সড় শরীলটা দেখে ওদের আরও যেন মারধরের রোখ চাপত। তার ওপর বেগার দিয়ে তো পাপের শোধ করেছি। কিন্তু তবু এখন এলাকায় কিছু ভালমন্দ হলেই যদি পুলিশ পেছুতে লাগে তো বড় ঝঞ্ঝাটের কথা!

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বুঝেছেন। একটু তেতো হাসি হাসলেন, বললেন, পাপের শোধ কি মেয়াদ খেটে হয়! কত চোর-জোচ্চোর-খুনে জেল খাটছে, তারা সব জেলখানায় থেকে ভাল হয়ে যাচ্ছে নাকি! লাথি-গুঁতো দেয়, আটকে রাখে, আর ভাবে যে খুব সাজা হচ্ছে। মানুষ ওতে আরও খ্যাপাটে হয়ে যায়। কর্তারা সব সাজা দিয়ে খালাস, মানুষ শোধরানোর দায় নেবে কে? নিজেকে নিয়েই ভেবে দ্যাখ, জেলখানায় তোর কোনও শিক্ষা হয়েছে? শোধরানোর চেষ্টা করেছে তোকে?

মাথাটা নেড়ে গুম হয়ে থাকে কোকা। বোধহয় জেলখানার স্মৃতি মনে আসে। মুখটায় একটু কঠিন ভাব ফোটে। বলে, তো প্রাশ্চিত্তির হয় কীসে? আর কী করা লাগবে?

ব্রজগোপাল বলেন, প্রায়শ্চিত্ত হল চিত্তে গমন। অত শক্ত কথা তুই বুঝবি না।

কোকা ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে দাঁতনটা অন্যমনস্কভাবে চিবোয়। তারপর হঠাৎ বলে, আমি সেই ছেলেটার গায়ে হাত না দিলেও কিন্তু পুলিশ ওকে পেলে মেরে দিত। কাজটা তো একই।

ব্রজগোপাল ম্লান হাসলেন। পুলিশ যে আইনসঙ্গত খুনি, এ সত্য কে না জানে। বললেন, তোর সে-সব কথায় দরকার কী? তুই নিজের কথা মনে রাখলেই হল। একটা পাতক করে ফেলেছিস, এখন হাত ধুয়ে ফ্যাল। আর কখনও ও-সব দিকে মন দিস না। বেঁচে থাকাটা সকলেরই দরকার।

দিগম্বরের খোল তার বোল পালটেছে। বুড়ো হাতে খোলের চামড়ায় এক অলৌকিককে ডেকে আনছে সে। ধ্বনি ওঠে, প্রতিধ্বনি হয়ে ফেরে, যত দূর যায় তত দূব বধির করে দেয় সব কিছুকে। কথার মাঝখানে ব্রজগোপাল উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। তাঁর আজ্ঞাচক্রের জপ, তাঁর গোপন বীজধ্বনি যেন ওই শব্দের তালে তালে ধ্বনিত হয়।

কোকা বলে, বামুনজ্যাঠা।

অন্যমনস্ক ব্রজগোপাল একটা 'হুঁ' দেন কেবল।

আপনাকে একটা কথা কয়ে রাখি।

কী কথা!

আমি যদি এখান থেকে না পালাই তো বাবা ফের আমাকে ধরিয়ে দেবে।

ব্রজগোপাল কথাটা বুঝতে পারলেন না। বললেন, কোথায় ধরিয়ে দেবে?

পুলিশে।

কোকা মুখখানা এমনধারা করল যেন কাউকে ভ্যাঙাচ্ছে। বলল, বাবাই তো ধরিয়ে দিয়েছিল সেবার, যখন খুনটা হয়ে গেল হাত দিয়ে...বলে কোকা তার দু'খানা অপরাধী হাত চাদরের তলা থেকে বের করে সামনে বাড়িয়ে দেখাল।

বহেরু ধরাবে কেন? তোর যত বিদ্‌ঘুটে কথা!

তবে আর ক'লাম কী! খুনটা হয়ে যেতে মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল। সে রাতে জ্বরও এসেছিল খুব। বিকারের অবস্থা। চার দিকের কিছু ঠাহর পাচ্ছিলাম না। যেন ভূতে ধরেছে। ভোর রাতে বাবা ঠেলে তুলে দিল, একটা কম্বল চাপা দিয়ে বলল, চল। তখন কিছু বুঝতে পারছিলাম না। ভাবলাম, বাবা লাঠেল লোক আছে, ঠিক বাঁচিয়ে দেবে। কেবল 'বাবা বাবা' করছি। বাবা যেমন ভগবান। বাবা আর বড় বোনাই সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে গেল, গাড়িতে তুলে দেবে। স্টেশনঘর থেকে দূরে গাছতলায় বেঞ্চের ওপর বসিয়ে রেখে দিল, গাড়ির তখন দেরি আছে। বড়বোনাই আমার হাতখানা ধরে রেখে ঠাকুর দেবতার নাম করছে, বাবা গেল গাড়ির খোঁজখবর করতে কি টিকিট কাটতে কে জানে। স্টেশন একদম হা-হা শূন্য, জনমানুষ নেই। আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে ভয়ে ডরে আর জ্বরের ঘোরে কাঁপছি। সময়ের জ্ঞান ছিল না। কতক্ষণ পরে হঠাৎ আঁধার ফুঁড়ে দুটো পুলিশ এসে সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বড়বোনাই তখন ভিরমি খায় আর কী! আমিও কোনও কথা মনে করতে পারি না। পুলিশ নাম জিজ্ঞেস করল, নিজের নামটা পর্যন্ত তখন মনে আনতে পারছি না।

বহেরু কোথায় ছিল?

কোকা তাচ্ছিল্যের ঠোঁট উলটে বলে, কে জানে? কিন্তু পুলিশের একটু পরেই বাবা হাজির হয়ে গেল। কী কথাবার্তা বলল পুলিশের সঙ্গে কিচ্ছু বুঝতে পারলাম না। আমাকে ধরে নিয়ে গেল। পরে বড়বোনাই আমাকে ইশারায় বলেছে, পুলিশ বাবাই ডাকিয়েছিল। ওই রাতে স্টেশনে আমি কে, বা কী বৃত্তান্ত তা পুলিশ টের পায় কী করে? তখন অবশ্য কিছু টের পাইনি। পুলিশ যখন টেনে নিচ্ছে তখনও বাবাকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছিলাম—ও বাবা, বাবা গো...

ব্রজগোপাল দাঁতনটা ফেলে দিলেন। বুকের মধ্যে একটা ভাব খামচে ধরে। চিরকালের একটা বাপের বাস বুকের মধ্যে। সেখানে একটা কাঁটা পট করে বিঁধে যায়।

মুখে ব্রজগোপাল বললেন, তখন কি আর তোর হুঁশ ছিল! জ্বরের ঘোরে, আর ভয়ে ডরে কী দেখতে কী দেখেছিস, ভুলভাল ভেবেছিস। কালীপদ কি আর মানুষের মতো মানুষ নাকি! আবোলতাবোল বুঝিয়েছে।

কোকার মুখে হাসি নেই। গম্ভীর মুখেই সে বলে, বাবা আমাকে দু'চোখে বিষ দেখে।

দূর!

পাখিরা এ-ওকে ডাকে। ক্রমে বড় গোলমাল বাধিয়ে তোলে চারদিকে। পুবের আকাশে ফ্যাকাসে রং লাগে। চারদিকে মানুষের, পাখির, জন্তুজানোয়ারের জেগে ওঠার শব্দ হয়। আর তখন দিগম্বরের খোল মিহি শব্দের গুঁড়ো ছড়ায়।

ব্রজগোপাল জলের কাছে উবু হয়ে গাড়ু ভরতে থাকেন। জল ভরার গুব গুব শব্দ হতে থাকে। পিছনে পৈঠায় কোকা দাঁড়িয়ে থাকে পাহাড়ের মতো নিশ্চল। কানে পৈতে জড়িয়ে ব্রজগোপাল ঘাট ছেড়ে উঠে আসেন। এক বার তাকান কোকার দিকে।

কোকা হারিকেনটা তুলে কল ঘুরিয়ে নিবিয়ে দিয়ে বলে, আপনি মাঠের দিকে যান, আমি হারিকেন ঘরে রেখে আসছি।

ব্রজগোপাল বললেন, মনটাই মানুষের শত্রু। কাজকর্ম নিয়ে লেগে থাকবি মনটা বেশ থাকবে।

ব্রজগোপাল মাঠের দিকে হাঁটতে থাকেন। কোকা সঙ্গে সঙ্গে আসতে আসতে বলে, খুনখারাপি বাবাও কিছু কম করেনি। তবে আমাকে ভয় পায় কেন?

ও-সব তোর মাথাগরমের কথা।

কোকা একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ একটু হতাশার সুরে বলে, বামুনজ্যাঠা, আমাকে কিছু মন্ত্রতন্ত্র দেন।

কেন?

কিছু নিয়ে লেগে পড়ে থাকি। বলে কোকা হাসে।

তখন আবার হঠাৎ ভুরভুরে মদের গন্ধ আসে ওব শ্বাস থেকে। ছেলেটা স্বাভাবিক নেই। ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে বললেন, মনকে যা ত্রাণ করে তাই মন্ত্র। কিন্তু তোরা কি ত্রাণ পেতে চাস?

তাঁতিটা তাঁতঘরে বসে সারা দিন শানা মাকু নিয়ে খুটখাট করছে। সুতো ছিঁড়ে রাশ করেছে। পেটের খোঁদলটা এখনও টোপো হয়ে ফুলে ওঠেনি বটে, তবে বহেরুর ভাতের গুণে শরীর সেরেছে একটু। দেঁতো মুখে একটু অপ্রতিভ হাসি। বহেরু তাঁতঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বাঘের মতো গুল্লু গুল্লু চোখে কাণ্ডটা চেয়ে দেখে। বাঘের মতোই হাঁক ছাড়ে মাঝে মাঝে, হচ্ছে তো তাঁতির পো?

তাঁতি তার দশ আঙুলে জড়ানো ছেঁড়া সুতো গোলা পাকাতে পাকাতে বলে, হয়ে যাবে।

দু'শো সুতোর কাপড় শুনে সবাই হাসে। বহেরু হাল ছাড়ে না। লেগে থাকে। এখনও চন্দ্র-সূর্য ওঠে, সংসারের আনাচে-কানাচে ভগবান বাতাসে ভর করে ঘুরে বেড়ান, মানুষ তাই এখনও পুরোটা অপদার্থ ফেরেব্বাজ হয়ে যায়নি। লোকটা যদি দু'শো সুতোর কাপড় বুনে দেখাতে পারে তবে বহেরুর এই বিশ্বাসটা পাকা হয়। তাঁতির এলেমে আর কেউ বিশ্বাস করে না, বহেরু করে। তাই সে মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে বলে, পারবে, তাঁতিটা পারবে।

আজকাল প্রায় সারা দিনই বহেরু নানা কথা বিড় বিড় করে বকে। তে-ঠেঙে লম্বা সাঁওতালটা ক'দিন পড়ে পড়ে ধুঁকছে। অতখানি লম্বা বলেই তাকে আদর করে ঠাঁই দিয়েছিল বহেরু, দেখার মতো জিনিস। কিন্তু রুগণ্-রোগা লোকটা তার শরীরের ভার আর বইতে পারে না। লক্ষণ ভাল নয়। মেঘু ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছিল, কাজ হয়নি। লোকটা ঘোরের মধ্যে পড়ে আছে, খেতে চায় না, ওঠে না, হাঁটে না। চিড়িয়াখানার ধার ঘেঁষে একখানা ঘর তুলে দিয়েছিল বহেরু। মস্ত লম্বা মাচান করে দিয়েছে। সেইখানে শুয়ে আছে লোকটা। দরজায় দাঁড়িয়ে বহেরু তাকে দেখে। বুঝতে পারে লোকটার কাল হয়ে এল। শরীরের লম্বা কাঠামোখানা কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে। চোয়াল আর খুলির হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ক্রমে। এত বড় শরীরটা কোনও কাজে লাগাতে পারল না হতভাগা। প্রায় ভাগাড় থেকেই লোকটাকে টেনে এনেছিল সে। নলহাটি স্টেশনে বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠে পড়েছিল। পেটে খাবার নেই, গাড়ির কামরায় পড়ে ধুঁকছিল। সেই অবস্থায় বর্ধমানে তাকে রেলের বাবুরা ফেলে দিয়ে যায়। বহেরু সেখান থেকে নিয়ে আসে। তিন মাসও টিকল না।

বহেরু একটা শ্বাস ফেলে। কী একটু বিড় বিড় করে। তার চিড়িয়াখানার বাঁদরটা চুপ করে বসে ঠিক মনিষ্যির মতো পেট চুলকোয়। বহেরুকে দেখে একটা কুক ছেড়ে ঝাঁপ খেয়ে আসে। দরজাটা তার দিয়ে বাঁধা। বহেরু তার খুলে বাঁদরটাকে কাঁধে নেয়। মানুষজন আর জীবজন্তুর প্রতি ইদানীং একটা মায়া এসে যাচ্ছে। বাঁদরটা বহেরুর মাথা দু'হাতে ধরে কাঁধে ঠ্যাং ঝুলিয়ে শিশুর মতো বসে থাকে। মাঝে মাঝে নিজের থেকেই কাঁধ বদল করে অন্য কাঁধে চলে যায়। ভারী একটা আদুরে ভাব। বহেরু বাঁদরটাকে খানিক আদর করে। গালে গাল ঘষে দেয়। একটা চিমসে গন্ধ হয়েছে গায়ে। বহেরু বাঁদরটার লোম উলটে পোকাটোকা খুঁজে দেখল গায়ে। নেই। চোখ পিট পিট করে

জানোয়ারটা আদর খায়। মুখখানা উল্লুকের মতো হলে কী হয়, কোথায় যেন একটু বাঁদুরে হাসি লুকিয়ে আছে ভ্যাংচানো মুখে। 'খচ্চর' বলে গাল দেয় বহেরু।

জাড়ের সময় প্রায় শেষ হয়ে এল। উত্তরে কাঁটাঝোপের জঙ্গলে একটিও পাতা নেই। গাছের কঙ্কাল কাঁটা আর ডালপালা মেলে সুভুঙ্গে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকটায় শ্মশান দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে, তাই চাষ দেয়নি। সাপখোপ আর শেয়ালের আড্ডা হয়ে আছে। বহেরুগাঁয়ে এ-পর্যন্ত মরেনি কেউ। তাই শ্মশানটা কাজে লাগেনি। কাকে দিয়ে বউনি হবে তা বহেরু ভেবে পায়নি। আজ এক বার উদাস চোখে চেয়ে দেখল জঙ্গলটার দিকে। সাঁওতাল লোকটা আর ক'দিনের মধ্যেই যাবে।

সন্ধের মুখে পশ্চিম দিকের আকাশে এক পোঁচড়া সাদাটে কুয়াশা আলোটাকে ভন্ডুল করে দিয়েছে। দুনিয়াটা কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। শুকনো মাঠঘাট থেকে একটা ধুলোটে হাওয়া উঠে চারপাশের রং মেরে দিল। আর সেই ফ্যাকাসে আলোয় কাঁটাঝোপের মধ্যিখানে একটা মেয়েছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বহেরু। প্রথমে ভাবল কাঠকুটো কুড়োতে এসেছে কেউ। কত আসে! পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে, মস্ত চুলের রাশি এলো করে দাঁড়িয়ে আছে কে এক এলোকেশী! পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানো। কয়েক কদম এগিয়ে বহেরু ভারী চমকে যায়। মেয়েছেলেটা ল্যাংটা। বুক পর্যন্ত গাছপালায় আড়াল থাকায় এতক্ষণ ঠাহর হয়নি। অচেনা মানুষ নয়, তা হলে কুকুরগুলো খ্যাঁকাত।

কোন শালি রে! বলে দাঁত কড়মড় করে বহেরু। বাঁদরটাকে নিঃশব্দে ছেড়ে দিয়ে গায়ের চাদরটা কোমরে পেঁচিয়ে নেয় সে। সত্তর বছরের ঋজু শরীরটায় রাগ যেন যৌবনকাল এনে দেয়। মড় মড়াৎ করে আগাছা ভেঙে বহেরু চোটেপটে এগোয়। একটা হাতের থাবা চুলের মুঠিটা ধরার জন্য উদ্যত হয়ে আছে।

সাড়া পেয়ে মেয়েটা হেলাভরে ফিরে তাকায়। আর তৎক্ষণাৎ ভেড়া হয়ে যায় বহেরু। এ যে তার মেয়ে, নয়নতারা!

ঘোলাটে দু'খানা চক্ষু। তাতে আঁজি আঁজি সোনালি আভা। কপালে মস্ত তেল-সিঁদুরের টিপ। মোটা দু'খানা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। মানুষখেকো পেতনির মতো খোনাসুরে বলল, খঁবর্দার, কাঁছে আঁসবি না। আমি বামুন জাঁনিস।

বহেরু স্থির দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখে। ওপরে ঘোলা ময়লা একটা আকাশ, চারধারে কুয়াশার আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে। আলো, রং-মরা এক বিটকেল বেলা। কাঁটাঝোপের ফাঁকে আঁকাবাঁকা অন্ধকার। নয়নতারা ভিন-জগতের জিনপরির মতো দাঁড়িয়ে।

বহেরু জিজ্ঞেস করে, কে তুই? নয়নতারা?

নয়নতারাকে খাঁব! আমি মেঘু ডাঁক্তার।

রাগে মাথাটা হঠাৎ বাজপড়া তালগাছের ডগার মতো জ্বলে ওঠে। দুই লাফ দিয়ে এগিয়ে যায় বহেরু, হারামজাদি, দুই চটকানে তোর ভূত যদি না ভাগাই তো...

খঁবর্দার! বলে একটা বুকফাটা চিৎকার দেয় নয়নতারা। তারপর হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। যম-নখের মতো কাঁটা ওঁত পেতে আছে চারধারে। কাঁটায় যেমন কাপড় ফেঁসে যায় ফ্যাঁস করে, তেমন ছিঁড়ে-ফেঁসে যাচ্ছে গায়ের চামড়া। বুক ছিঁড়ে হাপর হাপর শ্বাস। নয়নতারা তবু লঘু পায়ে দৌড়োয়, চেঁচিয়ে বলে, ধরবি তো মেয়েটাকে শেষ করে ফেলব!

বহেরু কাঁটাগাছ চেনে। তার গায়ে পিরান, কোমরে চাদর, পরনে ধুতি। কাঁটায় কাঁটায় সব লন্ডভন্ড হয়ে যেতে থাকে। কাঁটা খিমচে নিচ্ছে চামড়া, মাংস। বহেরু দৃকপাত করে না। দাঁতের ভিতর দিয়ে কেবল একটা রাগী সাপের শিসানির শব্দ তুলে সে এগোয়।

মাঝখানে কয়েকটা বুড়ো খেজুর গাছ। তার চারপাশে একটু খোলা জমি। ভাঙা ইট, পাথর আর

সাপের খোলস পড়ে আছে। একটা মজা ডোবা, তার গায়ে শেয়ালের গর্ত। মেঠো ছুঁচো কয়েকটা দৌড়ে গেল। জায়গাটা গহিন, বাইরের কিছু নজরে আসে না। নয়নতারা সেখানে পৌঁছে গেল প্রথমে।

বহেরু গাছগাছালি ভেঙে সেখানটায় পা দিতে না দিতেই নয়নতারা আধখানা ইট তুলে ছুড়ে মারে বহেরুর দিকে। চেঁচিয়ে বলে, তোঁকে নির্বংশ করব হারামজাদা।

ইট লাগে না। কিন্তু তেজে উড়ে বেরিয়ে যায়। নয়নতারার গায়ে আলাদা শক্তি ভর করেছে। বহেরু থমকে ঠাকুর-দেবতার নাম নেয়। তারপরই বেড়ালের মতো পায়ে কোলকুঁজো হয়ে, তীব্র চোখে চেয়ে এগোতে থাকে।

গু খা, গু খা, গু খা, মড়া খা, মড়া খা...চিৎকার করতে থাকে নয়নতারা। দু'হাতে মাটি খামচে তুলে বুকে মাখে, থুথু ছিটোয় চার দিকে—থুঃ...থুঃ...থুঃ...

হারামজাদি দণ্ডী কাটছে! এই বলে বহেরু একখানা ইট তুলে নেয়। বিশাল হাতে আস্ত ইটটা উঁচু করে লক্ষ্য স্থির করে।

॥ ছাব্বিশ ॥

নয়নতারা চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। শেষ বেলার রক্ত-আলো কুয়াশা আর মেঘ ছিঁড়ে তিরের মতো এসে বিঁধেছে ওর মুখে। দুটো পদ্মপাপড়ির মতো চোখ এখন ঝলসাচ্ছে টাঙ্গির ফলার মতো। ন্যাংটো, ভয়ংকরী চামুণ্ডা এলোচুল কালসাপের মতো ফণা তুলে আছে ওর পিছনে।

নয়নতারা রক্তমাখা থুথু ছিটোয়। বলে, থুঃ থুঃ...মর, মর সব মরে যা...

ইট ধরা ডানহাতখানা তুলে ধরে তাকিয়ে আছে বহেরু। মারবে! কিন্তু সে নিজেই টের পায়, তার ভিতরে আগুনটা সেঁতিয়ে গেছে। সামনে ওই ন্যাংটা উদোম যুবতী, তার তেজি মেয়েটা, ও যেন-বা বহেরুর কেউ নয়। দুনিয়াভর মানুষের পাপ বেনো বর্ষার জলের মতো কূল ছাপিয়ে উঠেছে। এই কালসন্ধ্যায় বহেরুর মেয়ের শরীরে নেমে এসেছে কলকি-অবতার। নাকি মেঘু? ঠিক বুঝতে পারে না বহেরু। তবে তার শরীর কেটে ইঁদুরের মতো একটা ভয় ভিতরে ঢুকে গেছে ইদানীং। সেই ভয়ের ইঁদুরটা নড়াচড়া করে ভিতরে।

নয়নতারা মুঠো করে ধুলো তুলে চার দিকে ছিটিয়ে দিতে থাকে। বলে, থুঃ, থুঃ...সব অন্ধকার হয়ে যা, সব শ্মশান হয়ে যা...

অবাক ভাবটা আর নেই। তার বদলে শরীরে একটা থরথরানি উঠে আসে বহেরুর। শীতটা জোর লাগে। সে এক বার তার বাঘা গলায় ডাক ছাড়ে, তারা! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!

শুনে খলখল করে হেসে ওঠে নয়নতারা, বলে, শ্মশান হয়ে যাবে, বুঝলি! সব বসে যাবে মাটির নীচে। রক্তবৃষ্টি হবে।

ফ্যাকাসে বেলাটা যাই-যাই করেও দাঁড়িয়ে আছে। চারধারে পাতাঝরা গাছের কঙ্কাল দুর্ভিক্ষের মানুষের মতো রোগা হাত-পা ছড়িয়ে ঘিরে আছে। রং নেই, সৌন্দর্য নেই। একটা দাঁড়কাক ডাকছে খা-খা করে।

বহেরু চোখের জল মুছে নিল। জীবনে তার চোখ বেয়ে জল নেমেছে বলে মনে পড়ে না। এই বোধহয় প্রথম। পাথর থেকে জল বেরিয়ে এল। চারধারে বড় অলক্ষণ। বহেরু ধরা গলায় ডাকল, মা! মাগো!

নয়নতারা আকাশের দিকে দু'হাত তুলে কাকে যেন ডাকতে থাকে, আয়! আয়!

শরীর শিউরে ওঠে বহেরুর। কোন পিশাচ, ভূতপ্রেত, কোন ভবিতব্যকে ডাকে মেয়েটা! নাকি মরণ ডাকছে প্রাণভরে!

বহেরু আর ভাবল না। ইটটা তুলল ফের। তার প্রকাণ্ড হাত, হাতে অসুরের জোর। দু'পা এগিয়ে 'মা' বলে একটা হাঁক ছেড়ে ইটটা সই করে দিল সে।

লাগল বাঁ-ধারে স্তনের ওপরে। পাখি যেমন জোরালো গুড়ুল খেয়ে গুড়ুলের গতির সঙ্গে ছিটকে যায়, তেমনি নয়নতারাকে নিয়ে ইটটা ছিটকে গেল। ব্যথা-বেদনার কোনও চিৎকার দিল না নয়নতারা। কেবল মাটিতে পড়ে খিঁচুতে থাকে। তার হাত-পায়ের ঘষটানিতে ধুলো ওড়ে!

একটু দূরে দাঁড়িয়ে হতবাক হয়ে বহেরু দৃশ্যটা দেখতে থাকে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে একটা হলদে শেয়াল দৌড়ে গেল চোর-পায়ে। পিছনের শিমুল গাছে একটা বড় পাখি নামল ঝুপ করে। কিছুক্ষণ নড়েচড়ে নয়নতারা স্থির হয়ে পড়ে থাকে। চারধারে বেঁটে বেঁটে আগাছা, ন্যাড়া জমি।

এইখানে শান্তিরামের ভিটে ছিল একসময়ে। বংশটা মরে হেজে গেছে। জমিটার দক্ষিণ অংশটা বহুকাল দখল করে আছে বহেরু। বাকিটা পড়ে আছে, দাবিদার নেই। সন্ধ্যা ঘুলিয়ে উঠছে চারধারে। প্রেতছায়া ঘনিয়ে আসে। কঙ্কালসার গাছের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে শেয়ালের চোখ। মগডাল থেকে নজর দিচ্ছে বড় কালো পাখি। শান্তিরামের পোড়ো ভিটেয় অশরীরীরা হাওয়া বাতাসে ফিসফাস করে।

বহেরু নয়নতারার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখে, মেয়েটা গলাটানা দিয়ে পড়ে আছে। গোরুর ঝিমুনিরোগ হলে এ-রকম পড়ে থাকে। শিবনেত্র, মুখে গ্যাঁজলা। শ্বাস বইছে, তবে কাঁপা-কাঁপা দীর্ঘশ্বাসের মতো, ফোঁপানির মতো, হিক্কার মতো। ডানকাত হয়ে আছে। বহেরু তাকে আস্তে উলটে চিত করে শোয়াল। নিজের যুবতী মেয়ের নগ্ন শরীরটা এতক্ষণ মানুষের মতো চেয়ে দেখেনি বহেরু। রাগে অন্ধ হয়ে ছিল। এইবার দৃশ্যটা দেখে লজ্জায় চোখ বুজে জিভ কাটল। কোমর থেকে চাদরটা খুলে ঢাকা দিল শরীর। কপাল থেকে চুল সরিয়ে দিল যত্নে। আগেই মেয়েটা পড়ে গিয়েছিল কোথাও, ঠোঁটটা কেটে ফুলে আছে। রক্ত গড়াচ্ছে। চোখের জল মুছে, মুখের লালা জড়ানো ঠোঁটে এক বার অস্ফুট ডাকল, মা! মাগো!

তারপর পাঁজাকোলে শরীরটা তুলে নিল সে।

চারধারে বড় অলক্ষণ দেখা যাচ্ছে আজকাল। কলির শেষ হয়ে এল নাকি!

পরের দিন। মেঘুর মড়া পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। তার শরীরে বিষক্রিয়া পাওয়া যায়নি, চোট একটু-আধটু যা ছিল তা আলের ওপর থেকে পড়ে গিয়েও হতে পারে। অতিরিক্ত কড়া মদেই কমজোরি কলজেটা গেছে। পেটে বিদঘুটে আলসার ছিল। হার্টের রোগ ছিল, কিডনি ভাল ছিল না। সব মিলেজুলে গ্রহদোষে খণ্ডে গেছে। শুদ্ধ মুক্ত মেঘু কি এখন অন্তরীক্ষে তার বউয়ের পাশটিতে গিয়ে বসেছে! কলজেটা কি এবার ঠান্ডা হয়েছে তার? বউ মরার শোকেই না অমন পাগল হয়েছিল মেঘু! মরার পর খ্যাপা লোকটার সব শান্তি হয়েছে কি!

ব্রজগোপাল মেঘুর উঠোনের মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে এ-সব ভাবেন। পাশে কালীপদ উবু হয়ে বসে হাতের পাতার আড়াল দিয়ে বিড়ি টানছে। গাঁয়ের ছেলেরা গেছে মেঘুর মড়া আনতে। যখন-তখন এসে পড়বে।

বারান্দায় ঠেসান দিয়ে মেঘুর বালবিধবা বোনটা বসে আছে। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পাড়া-প্রতিবেশীরা কিছু এসেছিল। আজ মড়া আসবে শুনে দু'-চারজন এসেছে। একটা কুপি জ্বলছে দাউ দাউ করে, তার আগুনে দু'-একজন ভুতুড়ে চেহারার সাদাটে বিধবাকে দেখা যায়। ছেলেপুলেরা কেউ তেমন কচিটি নয় মেঘুর, সবচেয়ে ছোট ছেলেটার বয়সই হবে সাত-আট বছর। বড়জনের বছর বারো বয়স। গোবিন্দপুরের হাটে তাকে বখে-যাওয়া ছেলেদের সঙ্গে বিড়ি খেতে ব্রজগোপাল নিজের চোখে দেখেছেন। কাপড় জড়িয়ে সেই ছেলেদুটো এখন শীতে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে ছাঁচতলায় দাঁড়িয়ে। দুটি মেয়ে মেঘুর। অভাব দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাদের বাড় বিস্ময়কর।

আট-দশ বছরের মধ্যেই দু'জনের বয়স হবে। মাথায় বেশ লম্বা, শরীরও কিছু খারাপ না। ঘরের মধ্যে মাদুরে শুয়ে দু'জন কাঁদছিল। এক-একবার উঠে এসে উঠোনের দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে দেখে আসছে।

সবচেয়ে বেশি শোকটা লেগেছে বালবিধবা বোনটারই। ছেলেমেয়েগুলোর বয়স কম, এ-বয়সের শোক গভীর হয় না, জলের দাগের মতো, বিস্মৃতির ভাপ এসে মুছে দেয়। কিন্তু বোনটার আলো নিবে গেছে। পৃথিবীটা এখন বিশাল, দিকহারা, অনিশ্চয়। ক'দিন এত কেঁদেছে যে আর কাঁদার মতো দম নেই। চুপ করে বসে আছে। ব্রজগোপাল কুড়িটা টাকা দিয়েছিলেন হাতে। দুটো দশ টাকার নোট এখনও দুমড়ে পড়ে আছে পাশে। আঁচলে বাঁধার কথাও খেয়াল হয়নি।

একজন বিধবা দাওয়ায় একটা ছোট্ট মাদুরের আসন পেতে কাছে এসে বলল, ঠাকুরমশাই, আপনি বসুন গিয়ে।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বসবেন না।

বিধবাটি বলে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন! ওদের আসতে দেরি আছে।

শোকের বাড়িতে একটা অদ্ভুত হবিষ্যির ঘি ঘি গন্ধ ছড়িয়ে থাকে। এটা বহুবার লক্ষ করেছেন ব্রজগোপাল। আর বাতাসে একটা মৃদু সূক্ষ্ম জীবাণু সংক্রমণের মতো অশুচিতার স্পর্শ।

মেঘুর ছেলেরা পিসির পাশে গিয়ে বসল খানিক। বড়জনকে ব্রজগোপাল বলতে শুনলেন, ও পিসি, শ্মশানে আমাকে দিয়ে কী করবে? বাবার মুখে আমি আগুন দিতে পারব না।

পিসি উত্তর দেয় না। মেয়ে দু'জন হুড়মুড় করে উঠে আসে বাইরে। অস্ফুট রামনাম করে। শ্মশান আর বাবার কথা শুনে ভয় পেয়েছে। বেঁচে থাকতে মানুষ আপন, মরে গেলেই ভূতকে ভয়।

ব্রজগোপাল জরিপ করে দেখেন। মেঘু এই ছেলেপুলে, বিধবা বোন, দুটো তক্তপোশ, ভাঙা বাড়ি, গোটা দুই অকেজো আলমারি এইসবই রেখে গেছে। এই দুর্দিনে মেঘু ডঙ্কা মেরে চলে গেল। গেছে খারাপ না। ভোগেনি, কাউকে ভোগায়নি। পড়েছে, আর মরেছে। কিন্তু এ দৃশ্যটা মেঘু যদি দেখত! দাউ দাউ কুপির আগুন আবছায়া তার রক্তের সন্তান, তার শোকাতাপা বোনটা কেমন শীতবাতাসে, সামনের দীর্ঘ অভাবগ্রস্ত ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে ভয়ে-ভাবনায় মোয়া বেঁধে বসে আছে মানুষের পিণ্ডের মতো! মেঘুটার আক্কেল ছিল না। এতক'টা প্রাণীকে সে কখনও গ্রাহ্য করেনি। ভালবাসার বউ মরে গিয়ে ভগবান ভবিতব্য সব কিছুর ওপর খেপে গিয়ে একটা পরিবার লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেল।

অবশ্য মানুষ তার সন্তান-সন্ততির জন্য কীই বা রেখে যেতে পারে! ব্রজগোপাল তাঁর মামাবাড়ির কথা মনে করেন। দাদামশাই তাঁর এগারোটি সন্তানের জন্য যথেষ্ট রেখে গিয়েছিলেন। ঢাকা শহরে বাড়ি, বঙ্গলক্ষ্মীর শেয়ার, আটাচাক্কি, বগুড়ার লোনব্যাঙ্কে টাকা, নগদ আর সোনাদানায় আরও লাখ দেড়-দুই; সে আমলের টাকার দামে এখনকার আরও বেশি। বড় দুই মামা কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো সম্পত্তিটা ফুঁকে দিল। বাপ মরার পর তাদের বড়লোকি চালচলন বেড়ে গিয়েছিল হাজার গুণ। মেজোজন রেলের চাকরি ছেড়ে বাপের টাকায় ব্যবসা দিল। ব্যবসার বারফাট্টাই ছিল খুব, পিছনে না ছিল নিষ্ঠা, না পরিশ্রম। অন্য মামা-মাসিরা তখন নাবালক! বড় হয়ে তারা দেখে, চার দিকে দুঃখের সংসার। সেই যে ভাইয়ে ভাইয়ে বখেরা লেগে গেল তা শেষজীবনতক মেটেনি।

ব্রজগোপাল ভাবেন, মানুষ কী রেখে যেতে পারে সন্তানের জন্য? এমনকী আছে যা নষ্ট পায় না, ঠকবাজে ঠকিয়ে নিতে পারে না, যা স্থায়ী হয় এবং বর্মের মতো ঘিরে রক্ষা করে মানুষের সন্তানকে?

কালীপদ লুকিয়ে বিড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। একটু কেশে বলে, ঠাকুরমশাই, এখন মেলা করবেন নাকি?

ব্রজগোপাল চিন্তিত মুখে বলেন, দেরি যখন হচ্ছে তখন আর কতক্ষণ দাঁড়াব! চল।

এই বলে টর্চটা একটু জ্বালেন ব্রজগোপাল। অন্ধকারের মধ্যে চারপাশটা একটু দেখে নেন।

পৃথিবীটা ঘোর অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমে। ছেলেপুলের কথা বড্ড মনে পড়ে। ছোট মেয়েটাকে বহুকাল দেখেন না। মেয়েটা বড় বাপভক্ত ছিল।

এ-সব কথা মনে হলে পৃথিবীটা অন্ধকার লাগে। টর্চবাতিটা জ্বেলে অন্ধকারটা তাড়ানোর চেষ্টা করেন ব্রজগোপাল। কেশে নিয়ে কমফর্টারটা খুলে আবার গলায় জড়িয়ে নেন। মেঘুর বোন উঠে আসে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে মুখটা ঘোমটায় আড়াল করে কী যেন বলে। ওর গলা ভেঙে বসে গেছে, আওয়াজ হচ্ছে না। ব্রজগোপাল দু'পা এগিয়ে বলেন, কিছু বলছ মা?

মেঘুর বোন মাথা নেড়ে কষ্টে স্বর বের করে বলে, দাদা বড় পাপী ছিল। আপনাকে কেবল দেবতার মতো দেখত। শ্রাদ্ধটা আপনি করবেন।

শ্রাদ্ধ! ব্রজগোপাল অবাক হন। ইতস্তত করে বলেন, ও-সব তো আমি করিই না মা। আচ্ছা, দেখব। শরীর গতিক যদি ভাল বুঝি তো...

দাদার খুব ইচ্ছে ছিল কোনও সৎ ব্রাহ্মণ যাতে শ্রাদ্ধ করে। বউদি সতীলক্ষ্মী ছিল। তার কাছে পৌঁছুতে হলে পুণ্যি লাগে। দাদা বড় পাপী ছিল।

পাপী ছিল। ছিল বইকী। ঠাকুরের একটা কথা আছে, রক্ষা থেকে যা পাতিত করে তাই পাপ। জীবনধর্মের বিরুদ্ধে চলা যদি পাপ হয় তো মেঘু পাপী নিশ্চয়ই। সঠিক ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকাটা ধর্ম বলো ধর্ম, পুণ্য বলো পুণ্য। ব্রজগোপাল এই শোকের বাড়িতে দাঁড়িয়েও মনে মনে হাসেন। সৎ বিপ্রের হাতে কি চাবিকাঠি আছে যে এ-পার থেকে কল টিপে ও-পারের আত্মাদের একের সঙ্গে অন্যকে মিলিয়ে দেবে? একটু দীর্ঘশ্বাসও ফেলেন ব্রজগোপাল। মেঘুটা তার বউকে সত্যি ভালবাসত। সবাই চায়, মরার পর মেঘু তার বউয়ের সঙ্গে মিলেজুলে থাক।

ব্রজগোপাল আর কালীপদ গোবিন্দপুর ছেড়ে বরাবর খামারবাড়ির দিকে হাঁটা দেওয়ার পর মাঝ রাস্তায় হরিধ্বনি কানে আসে। উলটো দিক থেকে হারিকেন আসছে। সামনে মাচানের ওপর মেঘুর শরীরটা। ব্রজগোপাল রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ান। চোখের সামনে দিয়ে ভাসতে ভাসতে মেঘু চলে যায়। কালীপদ জোড়হাত কপালে ঠেকায়। হারিকেন কোকার হাতে। সে একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে লণ্ঠন তুলে বলে, বামুনজ্যাঠা!

হুঁ।

আমি শ্মশানে যাচ্ছি।

যা।

ভক করে মদের গন্ধ ভেসে আসে। ব্রজগোপাল উদ্বিগ্ন বোধ করেন।

আবার হাঁটতে হাঁটতে কালীপদ পিছন থেকে হঠাৎ বলে, ঠাকুরমশাই, মেঘু ডাক্তারের গতিমুক্তি হল না তা হলে?

কেন?

এই যে নয়নতারার ওপর ভর করল! গাঁ-গঞ্জে সবাই বলাবলি করছে।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হন। উত্তর দেন না। কালীপদটা কিছু বোকা। বোকা না হলে কেউ ঘরজামাই থাকে। জামাই হয়েও বহেরুর বন্ধু লোক, একসঙ্গে বসে গাঁজাটাজা খায়। এইখানেই গেঁথে গেছে।

কালীপদ আবার বলে, চুরির দায়টা ঘাড়ে নিয়ে গেল, তার ওপর অপঘাত!

ব্রজগোপাল একটা গম্ভীর 'হুঁ' দিয়ে হাঁটতে থাকেন।

কালীপদ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে। তারপর হঠাৎ গুন গুন করে গান ধরে—কে হে বট, বাঁশের দোলাতে চইড়ে যাইচ্ছ চইলে শ্মশান ঘাটে! তোমার পোটলাপাটলি রইল পইড়ে, জুড়ি গাড়ি কে হাঁকাবে...

তুলসী-গঙ্গাজলের ছিটে গায়ে দিয়ে ব্রজগোপাল ঘরে এসে ল্যাম্পটা জ্বালেন। জামা-কাপড় ছেড়ে

শুয়ে পড়বেন। রাতে খই আর দুধ খান, আজ সেটাও খেতে ইচ্ছে করছে না। বাচ্চাকাচ্চা কাউকে ডেকে দুধটা দিয়ে দেবেন বলে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আঁধার ফুঁড়ে বহেরু এসে দরজায় দাঁড়াল। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। বলল, কর্তা!

কী রে?

বহেরু মেঝের ওপর বসে মুখ তুলে বলে, কলিকালের কি শেষ হয়ে আসছে?

ব্রজগোপাল বহেরুর দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকেন।

বহেরু বলে, যদি রক্তবৃষ্টি হয়! যদি পৃথিবী ডেবে যায় মাটির ভিতরে!

॥ সাতাশ ॥

অবশেষে একদিন দুপুরে কড়া নড়ে উঠল।

বীণা ভিতরের ঘরে এ সময়টায় দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়। ননীবালা খুটুর-খাটুর করে কাজকর্ম করেন। একটু শুয়ে চোখ বুজবেন তার উপায় নেই, ঝিম হয়ে পড়ে থাকলেই নানা অঘটনের চিন্তা আসে মাথায়। ঘুম যদি আসে তো সেই সঙ্গে দুঃস্বপ্ন দেখা দেয়।

ক'দিন হল শরীরটা ভাল না। মাঝে মাঝে মাথাটা পাক দেয়। প্রেশারটা বেড়েছে বোধহয়। পাড়ার চেনা ডাক্তারের কাছে সময়মতো গেলেই প্রেশার দেখে দেয়। আলিস্যিতে যাওয়া হয় না, এ বয়সে ভালমন্দ যদি কিছু হয়ে যায় তো হোক। তাতে তাঁর আক্ষেপ নেই। বেঁচে থাকা একরকমের শেষ হয়েছে। দেখতে না দেখতেই একটা জীবন কেমন শেষ হয়ে গেল। তেমন করে কিছু বুঝতেই পারলেন না ননীবালা। এই তো সেদিনও শিশুটি ছিলেন, বগুড়ায় রেলস্টেশনের ধারে তাঁদের পাড়ার রাস্তায়-ঘাটে খেলে বেড়িয়েছেন, ধারে-কাছের কথা তেমন মনে পড়ে না, কিন্তু শিশু বয়সের কথা মনে পড়ে ঠিকই। স্পষ্ট, যেন বায়স্কোপের ছবি। বিন্দি, কাতু, শৈলী—সব মিলেমিশে সে এক পরির রাজ্য। বৃষ্টি পড়ত, শীতের কুয়াশা ঘিরে থাকত, রোদ উঠত, সবই কেমন অদ্ভুত গন্ধমাখা, নতুন বুক-কেমন-করা। সে-আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার চাপ ছিল না। কেবল সারাদিন শিশু ভাই বা বোন টানতে হত। সে তেমন খারাপ লাগত না। নাজিরের বারান্দায় থুবা করে বসিয়ে রেখে চুলে আলগা হাতে বড় খোঁপা বেঁধে এক্কা-দোক্কার কোর্টে ঝাঁপিয়ে পড়া তারপর কিছু মনে থাকত না। ঘামে ভিজে যেত অঙ্গ, গায়ে ধুলোবালি লাগত, নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠত দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে, তবু খেলার কী যে নেশা ছিল! একদিন দেড় বছরের বোকা ভাইটা বারান্দা থেকে গড়িয়ে পড়ে কপাল ফাটাল, মা মেরেছিল খুব চিরুনি দিয়ে। এখনও যেন কনুইয়ের হাড়ে ব্যথাটা চিনচিন করে। মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা সব। শৈলী নাকি বুড়ো হয়ে গেছে! হায়রে! কতটুকু ছিল শৈলী। ঢলঢলে চেহারা, ফরসা ঠোঁটদুটো একটু বোকাটে ভাবে ফাঁক হয়ে থাকত সব সময়ে, সামনের দাঁতে একটু ফাঁক ছিল মাঝখানটিতে। সাহেবি সব নাম ছিল ওদের। চার বোন ছিল মাইথলী, মেয়রা, পিকলি আর বিউটি, দুই ভাই ছিল শচীন আর বুয়া। শৈলীর ইস্কুলের নাম ছিল বিউটি। বিলিতি ফ্রক পরত, বিলিতি সাবান মাখত, বিলিতি বিস্কুট খেত, ওদের বাড়িতে আসত সব সাহেব মেম। জজের বাড়ি, না হবেই বা কেন! যে-কোনও মেয়ের সঙ্গে শৈলীরা মিশত না। কেবল ননীবালার চুল দেখে ইস্কুলে সেধে ভাব করেছিল শৈলী। সেই ভাব থেকে সই। এ-সব কি গতজন্মের কথা! নৌকোর মতো দেখতে ঝকঝকে পালিশওয়ালা একটা ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে শৈলী আর পিকলি তাঁদের বাড়িতে এসে কতবার একটা বেলাই কাটিয়ে গেছে হয়তো। আবার ননীবালাও গেছেন। ভারী চুপচাপ বাড়িটা ছিল ওদের, সে-বাড়িতে কুকুর পর্যন্ত গম্ভীর। জজ নাকি হাসে না। তা হবে। শৈলীর বাবাকে কখনও হাসতে দেখেননি ননীবালা। কিন্তু সেই জজসাহেবও

এক বার ননীবালার খোলা চুল দেখে বলেছিলেন, বাঃ, এ তো অরণ্য! মনে আছে। সব স্পষ্ট মনে আছে, গলার স্বরটা পর্যন্ত কানে বাজে এখনও। সেই স্বপ্নের ছেলেবেলা থেকে এক হ্যাঁচকা টানে কোন অচেনা, অকূল পাথারে রওনা হলেন একদিন। তখনও তাঁর শরীরটুকু ঘিরে শিশুরই গন্ধ, ভাল করে ভাবতে শেখেননি, বুঝতে শেখেননি। খুলনা থেকে বর এল, টোপর পরে। সে কী ভয়াবহ হুলুধ্বনি, শঙ্খনাদ! বুকের ভিতরে ভূমিকম্প, ভেঙে পড়ছে পুতুলের ঘর, ফাটল ধরে গেল এক্কা-দোক্কার কোর্টে, ছিঁড়ে গেল জন্মাবধি মা-বাপের ভাই-বোনের শক্ত বাঁধন। যেন রশি ছিঁড়ে স্টিমার পড়ল দরিয়ায়। অচেনা একদল লোক লুটেরার মতো ঘিরে নিয়ে চলল তাঁকে, আঁচল বাঁধা একটা অচেনা লোকের আঁচলে, কত কান্নাই কেঁদেছিলেন ননীবালা! সে-কান্না যেন ফুরোবার নয়। হিক্কার মতো উঠতে লাগল অবশেষে। ব্রজগোপাল চোরের মতো অপরাধী চোখে চেয়ে দেখছিলেন তাঁকে গোপনে। অবশেষে ননীবালা ভারী অবাক হয়ে দেখেছিলেন, তাঁর অচেনা স্বামীটি উড়ুনির প্রান্ত দিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মুছছে। সেই দেখে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছিলেন ননীবালা, যা হোক একেবারে পাষণ্ডের হাতে পড়েননি। মনটা নরম-সরম আছে। ফুলশয্যার রাতে কথাটা উঠতে ব্রজগোপাল প্রথমে স্বীকার করেননি, পরে অনেক ঝুলোঝুলি করলে লাজুক মুখে বলেছিলেন, কী জানো, কান্না দেখলে আমার কান্না পায়। কথাটা ঠিক নয়। ননীবালা জানেন, ব্রজগোপাল কান্না দেখে কাঁদেননি। ননীবালার জন্যই কেঁদেছিলেন। এ-সব কি বহুদিনের কথা!

আজকাল বড় ভুল হয়ে যায়। নাতি-নাতনির নাম ঠিকঠাক মনে থাকে না। সোমেনকে শতবার রণো বলে ডাকেন, চাবির গোছা কোথায় রেখেছেন মনে থাকে না। তবু শিশুবেলার কথা কেন স্পষ্ট মনে থাকে!

একেই কি বুড়োবয়েস বলে!

আজকাল একা থাকলে এই বুড়োবয়সটাই জ্বালায়। তাই দুপুরে ঘুমোন না বড় একটা। শরীর খারাপ থাকলে পড়ে থাকেন বটে, কিন্তু বড় শাস্তি। ক্ষণে ক্ষণে উঠে জল খান, পান মুখে দেন, বেলা ঠাহর করেন জানালায় দাঁড়িয়ে। ছেলেপুলেরা ইস্কুল থেকে ফেরে দুপুরে। বীণার কড়া নিয়ম, বেলায় খেয়ে বাচ্চারা ঘুমোবে, যাতে সন্ধেবেলায় পড়ার সময়ে কারও ঢুলুনি না পায়। সবাই ঘুমোয় বলে নিঃঝুম বাড়িটা ফাঁকা আর বড় হয়ে যায়।

এমনি এক দুপুরে কড়া নড়ল। কত কেউ আসতে পারে। ননীবালা ঝিমুনি ভেঙে উঠে বসতেই পেটে অম্বলের চাকা নড়ে উঠল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করে।

কে? বলে উঠে এলেন কষ্টে।

বাইরে থেকে সাড়া এল—পিয়ন। রেজিস্ট্রি চিঠি আছে।

ব্রজগোপালের টাকা এল বোধহয়। বুকটা খামচে ওঠে হঠাৎ। আনন্দে না দুঃখে ঠিক বুঝতে পারেন না তিনি। দরজা খুলে অল্পবয়সি পিয়নকে বললেন, কার চিঠি?

ব্রজগোপাল লাহিড়ি।

উনি তো নেই এখানে, দূরে থাকেন। আমি সই করে নিলে হবে? উনি আমার স্বামী।

পিয়ন একটু ভাবে। তারপর একরকম অনিচ্ছের সঙ্গে বলে, নিন।

উত্তেজনায় কলম খুঁজতে ঘরে ঢুকে খুঁজে পান না ননীবালা। ভীতকণ্ঠে বলেন, দাঁড়াও বাবা, কলম-টলম খুঁজে পাচ্ছি না, একটু দাঁড়াও।

পিয়ন হেসে বলে, কলম নিন না, আমার কাছেই রয়েছে।

পিয়ন ছেলেটা সই করার জায়গা দেখিয়ে দেয়, ননীবালা গোটা গোটা বাংলা হরফে দস্তখত করার চেষ্টা করেন। অক্ষরগুলো কেঁপে যাচ্ছে, জ্যাবড়া হয়ে যাচ্ছে। এই প্রথম একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা এল হাতে। ব্রজগোপালের টাকা। বিশ্বাস হতে চায় না।

পিয়ন ছেলেটা চিঠি দিয়ে ক্ষণকাল বোধহয় বখশিশের জন্য অপেক্ষা করে। তারপর চলে যায়।

ননীবালা দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে আসেন। শরীরটা বড় খারাপ করেছে আজ। বুকটা বশ মানছে না। বুকের ধুকধুকুনিটা যেন হঠাৎ একটু থেমে আবার হঠাৎ আছড়ে পড়ছে বুকের ভিতর।

অনেক টাকা। অনেক। খামটা খুলে চেকটার দিকে চেয়ে থাকেন। টানা হাতের লেখাটা বুঝতে পারেন না। একটা খোপের মধ্যে সংখ্যাটা লেখা। দশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি। একটা বাড়ি উঠে যাবে না এতে? খুশি হবে না সবাই?

বোধহয় হবে। তবু বুকের ভিতরটা কী একরকম যেন লাগে। এতকাল এই টাকা ক'টার পথ চেয়ে বসে ছিলেন ননীবালা। টাকা তুলে ব্রজগোপাল তাঁর হাতে দেবেন, তিনি দেবেন ছেলেদের হাতে। জমিটা রেজিস্ট্রি হবে। ছেলেদের আর ছেলের বউযের কাছে ননীবালার মুখরক্ষা হবে। এই সংসারে তিনি আর-একটু জোরের সঙ্গে ভারের সঙ্গে থাকতে পারবেন।

কিন্তু তাই কি হয়! হয় না। বীণা খুশি হবে না, রণোটাও কি খুশি হবে!

ননীবালা চেকটা পিকদানির নীচে চাপা রেখে শুলেন একটু। শরীর ভাল না, মন ভাল না। চোখে হঠাৎ জল আসে কেন যে! মনে হয়, সংসারে কেউই আসলে কারও নয়, এই যে একা দুপুরে মন-খারাপ হয়ে পড়ে থাকা, দিনের পর দিন, কাছের কেউ থাকলে এ দশা হবে কেন তাঁর। কেন এমন ভার লাগে দিন! সময়ের চাকা ঘোরেই না যেন।

একেই কি বুড়োবয়েস বলে!

চেকটা আর এক বারও হাতে নিলেন না তিনি। পিকদানির নীচে সেটা চাপা রইল। জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে, তাতে ফরফর করে পাখা নেড়ে চেকটা জানান দিতে লাগল সে আছে। ননীবালা একটু বেশি সময় ধরে কাঁদলেন আজ। ঘুম হল না। ঠিকে ঝি কড়া নাড়তে চোখ মুছে উঠলেন।

সন্ধেবেলা রণেন এলে তাকে ডেকে চেকটা হাতে দিলেন ননীবালা, কেবল বললেন, দুপুরে এসেছে।

রণেন খুশি হবে না, এমনটাই আশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু রণেন খুশি হল, চেকটা টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে, জুতো মোজা খুলতে খুলতে সত্যিকারের খুশি হয়ে বলে, এসেছে! যাক, বাঁচা গেল। কালই অজিতকে খবর দেব। লক্ষ্মণের কোন পিসেমশাই খুব ঘুরঘুর করছেন জমির জন্য।

ননীবালা কথা বললেন না, শরীরটা বশ নেই। এ বেলা বীণা রান্নাঘর সামলাচ্ছে, তিনি ছুটি নিয়েছেন। বীণা কৌতূহল দেখাল না। রান্নাঘরেই বসে রইল। তার ওই চুপ করে থাকা, ওই গা-আলগা ভাব দেখে মনে মনে বড় কাহিল লাগে ননীবালার। শ্বশুরের টাকায় তার কোনও আগ্রহ নেই। গ্রাহ্যও করে না।

গা ঘেঁষে ক্ষুদে নাতিটা দাঁড়িয়ে আছে। বলল, ঠানু, মশা কামড়াচ্ছে। কোলে নাও।

তাকে কোলে নিলেন ননীবালা। আঁচলে পা ঢেকে শিশু-শরীরটায় গায়ের ওম্ দিতে দিতে মনটা হালকা হল। সংসারে এই বিচ্ছুগুলোকে ভগবান পাঠিয়ে দেন মানুষের মনের ধুলোময়লা ভাসিয়ে নিতেই বোধহয়।

সোমেন আজকাল অনেক রাতে ফেরে। কোলের ছেলেটা ধাঁ করে ভিন্‌মানুষ হয়ে উঠেছে আজকাল। কথা বলেই না। কারও সঙ্গেই না। কেবল ভাইপো-ভাইঝির সঙ্গে একটু-আধটু। ননীবালা জানেন, ও অন্য জায়গায় বাসা খুঁজছে। শীলার বাড়িতে গিয়ে একদিন জানতে পেরেছেন। কাউকে বলেননি কিছু। কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, তাঁর আঁচলে বাঁধা ছেলেটা এ সংসার থেকে বার হতে চাইছে।

সেদিন ব্রজগোপাল এসেছিলেন, যাওয়ার সময়ে সোমেন গেল সঙ্গে। টিউশানি সেরে রাতে ফিরে এসে সে কী চোটপাট ননীবালাকে, তুমি কেন বাবাকে বলেছ যে আমি আলাদা বাসা খুঁজছি। তুমি জানলে কোত্থেকে?

ননীবালা ভয় পেয়ে বলেন, আমাকে শীলা বলেছে তুই নাকি ওদের বাসায় ক'দিন থাকতে চেয়েছিস!

তার মানে কি বাসা খোঁজা। দিদির বাড়িতে ভাই গিয়ে থাকলে ভিন্ন বাসা হয় নাকি।

না হয় ভুল বুঝেছি, রাগিস কেন?

রাগব না! বাবাকে সংসারের সব কেলেঙ্কারি জানানোর দরকার কী? বাবার না-জানলেও চলত।

ননীবালা একটু কঠিন হওয়ার চেষ্টা করে বলেন, তাকে জানাব না কেন? সে কি তোদের পর?

রাগী ছেলেটা ফুঁসে উঠে বলে তখন, পর কি না সে-কথা জিজ্ঞেস করতে তোমার লজ্জা হয় না?

এ-কথার উত্তরে কিছু বলার নেই, ছেলেরা বড় হলে আলাদা বোধ বুদ্ধি হয়। মায়ের শেখানো কথা তোতাপাখির মতো বলেছে এক সময়ে এই ছেলেই। এখন সংসারের নানা দাঁড়ে বসে নানা কথা শিখেছে। বোধহয়, বাপের ওই দূরে দূরে থাকা ছেলেটার ভাল লাগে না। বোধহয় ছেলেটা বাপের জন্য খোঁড়ে মনে মনে আর সেজন্য দায়ী করে রেখেছে ননীবালা আর রণেনকে।

তবু সেজন্য ছেলেটার ওপর রাগ হয় না ননীবালার। বরং আলাদা একটা গভীর মায়া জন্মায়। সে লোকটাকে ভালবাসার কেউ তো নেই আর। ছেলেমেয়েরা পর, বউ চোখের বিষ। যদি এই ছেলেটার টান থাকে তবে ব্রজগোপালের ওইটুকুই আছে। ছেলের ভিতর দিয়ে তার বাপের প্রতি একরকম আবছা কী যেন ভাব টের পান ননীবালা। বোধহয় বুড়োবয়সের জন্যই।

একেই কি বুড়োবয়েস বলে!

আজ ননীবালা রাতে শোওয়ার সময়ে একটু সেধে কথা বলেন ছেলেটার সঙ্গে। বলেন, হ্যাঁরে, চাকরির কিছু হল না?

কী হবে!

শৈলীর কাছে আর-এক বার গেলি না! মুখচোরা ছেলে, নিজে না পারিস আমাকে একদিন নিয়ে যাস। কতকাল দেখি না।

গিয়েছিলাম আর একদিন। সোমেন নরম গলায় বলে।

গিয়েছিলি? কী বলল?

সোমেন বড্ড সিগারেট খায় আজকাল। একটার আগুন থেকে আর-একটা ধরিয়ে নিয়ে বলল, বলার অবস্থা নয়।

কেন?

ওরা খুব ব্যস্ত।

কীসে ব্যস্ত? শৈলীর শরীর খারাপ নাকি!

না, শুনলাম মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক হচ্ছে। তাই নিয়ে ব্যস্ত। বলে সিগারেটটা পুরো না খেয়ে ফেলে দেয় সোমেন।

॥ আটাশ ॥

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন, ও মা! সে তো গুয়ের গ্যাংলা মেয়ে শুনেছি! ওইটুকু মেয়ের বিয়ে দেবে!

কেমন নিরাসক্ত গলায় সোমেন বলে, ওইটুকু আবার কী! তোমার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল?

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন, সে তখন জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি। কিন্তু আমাদের আমলে যা হত তা কি আজকাল হয়? তার ওপর বড়লোকের মেয়ে, আদুরে, এত তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করবে কেন শৈলী।

সে তোমার শৈলীই জানে!

এই বলে সোমেন আবার সিগারেটের জন্য হাত বাড়ায়।

ননীবালা বলেন, এক্ষুনি তো খেলি? বুকটা শেষ করবি নাকি! ও-সব বেশি খেলে কী যেন সব রোগ বালাই হয়, লোকে বলে।

কিছু হবে না। এই বলে অস্থির হাতে আবার দেশলাই জ্বালে সোমেন।

আর তখনই ননীবালা ছেলের মধ্যে একটু গোলমালের গন্ধ পান। কী যেন হিসেবে মিলছে না।

সময়ের একটু ফাঁক রাখেন ননীবালা, তারপর আস্তে করে জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁ রে, শৈলীর মেয়ে দেখতে-শুনতে কেমন?

কেন?

এমনিই জিজ্ঞেস করছি, শৈলী দেখতে বেশ ছিল, একটু হাবা মতন ছিল অবিশ্যি। মেয়েটা কেমন?

কালো।

চোখ-মুখ?

ভালই। আলগা চটক আছে।

তোর সঙ্গে কথাটথা বলল না?

বলবে না কেন? এ কি তোমাদের আমলের মেয়ে-পুরুষের সম্পর্ক নাকি?

ননীবালা বললেন, তা নয়। বলছিলাম, বড়লোকের মেয়ে বলে দেমাক নেই তো!

থাকলেই বা, কে পরোয়া করে!

এটা উত্তর নয়। রাগ। ননীবালা বুঝলেন। একটু ছায়া মনের মধ্যে খেলা করে গেল। বুড়ো বয়সে সব মনে পড়ে। ছেলেবেলায় তিনি কতবার শৈলীর পুতুলের সঙ্গে নিজের পুতুলের বিয়ে দিয়েছেন। এখন যদি বুড়োবয়সে পুতুল খেলার ইচ্ছে হয়? ভাবতেই একটু শ্বাস বেরিয়ে যায় বুক থেকে। তাই কি হয়! শৈলীরা কত বড়লোক। জজের বাড়িতে জন্মেছে, বিয়েও হয়েছে আর-এক মস্ত বড় ঘরে। সুখ ছাড়া আর কিছু কি ওরা জানে! ননীবালার ঘরে কী আছে? ওই তো ছেলে, চেহারাটি কেমন রোগার মধ্যে তিরতিরে সুন্দর। বলতে নেই। থুঃ থুঃ! অমন সুন্দর ছেলেটা তাঁর, সারাদিন ছন্নছাড়ার মতো ঘোরে। কোন বাড়িতে বুঝি একটু পড়ায়। ব্যস। এ ছাড়া কোনও কাজ নেই। এই ছেলে কবে দাঁড়াবে, কবে তার বিয়ের কথা ভাববেন তা বুঝতে পারেন না তিনি। বড় রাগী আর অভিমানী ছেলে। শৈলীর মেয়ে ওকে আবার তেমন কিছু বলেনি তো!

ননীবালা হঠাৎ একটু আদুরে গলায় বলেন, ওরে ছেলে, আমাকে এক বার শৈলীর বাড়ি নিয়ে যাবি? সে যে খুব দেখতে চেয়েছিল আমাকে!

বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর যেয়ো। এখন ওই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে লাভ কী? কথাবার্তা বলতে পারবে না, সবাই ব্যস্ত।

বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে?

সোমেন একটু ঝাঁঝ দিয়ে ওঠে, অত জানি না।

রাগ দেখে ননীবালা দমেন না, সুর খুব নরম করে বলেন, ধমকাস না বাবা। মরে যদি তোর ঘরে জন্মাই ফের, তবে তো শাসনের চোটে দম বের করে দিবি। মা হয়ে বকা খাচ্ছি, মেয়ে হয়ে তো খাবই।

সোমেন হাসে হঠাৎ। বলে, মরতে বলেছে কে?

বলতে হয় না, হঠাৎ কার কখন মেয়াদ শেষ হয়। তা শৈলী তোকে বিয়ের কথা কী বলল?

বলবে আবার কী! বাবাকে বাসে তুলে দিয়ে সেদিন হাতে সময় ছিল। গিয়েছিলাম। দেখি, বাড়িতে বেশ কিছু লোকজন। সবাই ব্যস্ত। শৈলীমাসির ঘরেও কয়েকজন বসে আছে। আমাকে

দেখে খুব আদর করে বসাল, অনেক মিষ্টি খাওয়াল। বলল, বাবা, রিখির বিয়ে দিচ্ছি। ফাল্গুনে, নয়তো বৈশাখে। তোমাকে বলা রইল কিন্তু।

আর কিছু বলল না?

হুঁ। ছেলে বিলেতে মেম বিয়ে করেছে, আর আসবে না, সেজন্য খুব দুঃখ করল। বলল, ছেলে তো আপন হল না, এখন দেখি জামাই যদি আপন হয়। ছেলে লিখেছে, ভারতবর্ষ ভিখিরির দেশ, ওখানে মানুষ থাকতে পারে না। লন্ডনে ষাট হাজার পাউন্ডে বাড়ি কিনেছে। গাড়িটাড়ি তো কিনেছেই।

ও আবার কেমন ছেলে! ননীবালা দুঃখ পেয়ে বলেন।

মিটমিটে হেসে সোমেন বলে, আমি যেমন!

তোর সঙ্গে কীসের তুলনা? ননীবালা অবাক হয়ে বলেন, তুই আমার কোলপোঁছা ছেলে। এখনও বিপাকে পড়লে কেমন মা-মা করিস!

সে সবাই করে। আবার সুযোগ পেলে কেটেও পড়ে। আমিও তো বাসা ছাড়ার প্ল্যান করছি, তুমি তো জানোই। একই ব্যাপার।

ননীবালা অবহেলা ভরে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, হুঁ! তুই আবার যাবি!

যাবই তো। সোমেন তেমনি হাসিমুখে বলে, শুধু যে বাসা ছাড়ব তা নয়, দেশও ছাড়তে পারি।

তার মানে?

আমার এক বন্ধু জার্মানিতে চাকরি করে। সে লিখেছে, আমাকে ওখানে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

গিয়ে কী করবি?

সোমেন আধশোয়া হয়ে বলে, চাকরি করব আর তোমাকে টাকা পাঠাব।

অমন টাকায় আমার দরকার নেই। ননীবালা বলেন, আগে শুনতাম লোকে পড়াশুনো করতে বিলেত-টিলেত যায়। আজকাল দেখি সবাই যায় চাকরি করতে।

সোমেন চিত হয়ে শুয়ে ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে বলে, তো এদেশে চাকরি না পেলে কী করবে?

ননীবালা বেশি কথা বলেন না। কেবল গলায় একটা ক্ষীণ নিরুদ্বেগের ভাব ফুটিয়ে বলেন, বেশ, যাবি তো যা না! বিদেশে গেলে ছেড়ে তো দিতেই হবে। যত দিন এদিকে আছিস তত দিন বাইরে কোথাও না থাকলেই হয়।

সোমেন উত্তর দিল না। সিগারেট টানতে টানতে কী যেন ভাবে।

ছেলেটাকে ভয় পান ননীবালা। দুই ছেলের মধ্যে, বলতে নেই, এই ছেলেটার প্রতিই ননীবালার পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি। কোলের ছেলে, একটু বেশি বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খেয়েছে, সংসারে আছে একটু কম জোরে। দেওয়া-থোওয়া করতে পারে না তো। সংসারে দেওয়া-থোওয়া করতে না পারলে আদর হয় না। সেই জন্যই অসহায় ছেলেটার দিকে তাঁর টান বেশি। কিন্তু এ ছেলেটাই তাঁকে একদম পাত্তা দেয় না। ডাকখোঁজ করে বটে, কিন্তু দড়ি-আলগা ভাব। জাহাজ যেন জেটিতে ঠিকমতো বাঁধা নেই। জলের ঢেউয়ে নড়েচড়ে দোল খায়। বুঝিবা যে-কোনও সময়ে ভেসে চলে যাবে। ওর মনটা কি একটু শক্ত? মায়াদয়া একটু কি কম! চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে ননীবালা ভাবেন। সংসারে কেউ তো কারও নয়। বুড়ো বয়সে এইসব টের পাওয়া যায়।

আজকাল চলে-যাওয়ার একটা বাতাস এসেছে দুনিয়ায়। হুটহাট শুনতে পান, তরতাজা ছেলেরা সব বিলেত বিদেশে চলে যাচ্ছে। ছেলেধরা যেমন খেলনা বা লজেঞ্চুস দেখিয়ে ছেলে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, এও তেমনি। গুণী ছেলেদের টেনে নেয় সাহেবরা। বড়জামাই অজিতের বন্ধু লক্ষ্মণকেও টেনে নিয়েছে ওইরকম। সে আর আসবে না। জমিটা তাই সস্তায় পাওয়া গেল। কিন্তু জমির কথা আর ভাবেন না ননীবালা। মাথার মধ্যে শৈলী. শৈলীর মেয়ে, বিলেত বিদেশ, সোমেন, সব জট পাকিয়ে যায়। আর মনে হয়, পৃথিবীটা মস্ত বড়, কূলহারা অথৈ, ছেলেবেলায় মনে হত যত দূর দেখা যাচ্ছে তত

দূর পর্যন্ত পৃথিবীটা সত্যিকারের। তার পরের পৃথিবীটা ভূতপ্রেত দত্যি-দানোর রাজত্ব। বুড়ো বয়সে সেটাই আবার মনে হয়। চেনাজানার বাইরে পৃথিবীটা জিনপরি দত্যি-দানোর হাতে। ঘরের ছেলেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডেকে নিয়ে যাবে।

ননীবালা শ্বাস ছাড়েন, থাক সবাই নিজেদের মনে সুখে থাক। যেখানে খুশি থাক।

বাতি নেবাব মা? সোমেন জিজ্ঞেস করে।

হুঁ। বলে ননীবালা শুয়ে পড়েন। শরীরটা আজ বড্ড খারাপ। রক্তের চাপ খুব বেড়েছে। সকালে এক বার ডাক্তারের কাছে যাবেন কাল।

কলকাতার শৌখিন শীত শেষ হয়ে এল। বাতাসে চোরা গরম টের পাওয়া যায়। খবরের কাগজে মহামারীর কথা লেখে। খুব ধুলো ওড়ে চার দিকে। এ শহরে কেন যে তেমন শীত পড়ে না ননীবালা বোঝেন না। মানুষ বেশি বলে সকলের গায়ের ভাপে শীত কমে যায় না কি! কিংবা সেই যে অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছিল, তাইতেই শীত পালিয়ে গেছে। কথাটা একদিন সোমেনকে বলেছিলেন, সোমেন ধমকেছিল। ছেলেটা বড্ড বকে তাঁকে। শীতের জন্য একরকম দুঃখ হয়। শ্বশুরবাড়িতে সেই কোন ভোরে উঠে কাঠের জ্বালে রোগা ছেলের জন্য কালোজিরে চালের ভাত বসাতেন। চারধারে পৃথিবীটা কী হিম, কী কনকনে ঠান্ডা! নাকে-চোখে জল আসত, হাড়ের ভিতরে ব্যথিয়ে উঠত শীত। বাগানে কপির পরতে, পালঙের পাতায় কুয়াশা জমে থাকত। জলের ফোঁটা গড়িয়ে নামত টিনের চাল থেকে। বাচ্চাদের গায়ে গরম জামাটামা জুটত না, খাটো খাটো মোটা সুতির চাদর জড়িয়ে ঘাড়ের পিছনে গিঁট বেঁধে দেওয়া হত, দেখতে হত ছোট ছোট পা-ওলা পাশবালিশের মতো, সারা উঠোন দৌড়ে বেড়াত। রোদ যতক্ষণ না উঠত ততক্ষণ সিঁটিয়ে থাকত হাত-পা, আঙুল অবশ হয়ে বেঁকে যেতে চাইত। গরমে গরম হবে, বর্ষায় বৃষ্টি, শীতে শীত এই জেনে এসেছেন এতকাল । কিন্তু কলকাতার ধারা আলাদা। এখানে সারা বছরই কেমন একরকমের ভ্যাপসা গরমি ভাব। মানুষের গায়ের তাপ, কিংবা অ্যাটম বোমা কিছু একটা কারণ আছেই। ছেলেরা বোঝে না । বহুকাল হয়ে গেল এ শহরে, তবু ঠিক আপন করতে পারলেন না জায়গাটাকে। মায়া জন্মাল না। কেবলই মনে হয়, আমার দেশ আছে দূরে, এখানে প্রবাসে আছি। অথচ তা তো নয়। কলকাতাতেই সবচেয়ে বেশি সময়টা কাটল জীবনের, ভগবান করলে এখানেই বাড়িঘর হবে, এখানেই গঙ্গা পেয়ে যাবেন। তবু কেন যে এটাকে নিজের জায়গা বলে ভাবতে পারেন না!

একদিন সকালে বড়জামাই এসে হাজির। বলল, মা, আমাদের বাড়িতে চলুন।

বুকটা কেঁপে ওঠে, হাত-পা ঝিম ঝিম করে। কষ্টে ননীবালা বললেন, কেন বাবা, কী হয়েছে?

অজিত মুখটা গম্ভীর রেখেই বলে, চলুন নিজেই দেখবেন।

গলা আটকে আসে ননীবালার। শীলুর চোট লেগেছিল পেটে, কোনও অঘটন হয়নি তো! কষ্টে জিজ্ঞেস করেন, শীলুর কিছু হয়েছে?

জামাই লজ্জা পায়। চোখ নামিয়ে বলে, আপনার এক বার যাওয়া দরকার। আপনার মেয়ে আপনার জন্য অস্থির।

বীণা ননদাইকে চা করে খাওয়ায়, খাবার দেয়, দু'-একটা ঠাট্টার কথাও বলে। ওদের কারও দুশ্চিন্তা নেই। কেবল ননীবালারই হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে আসে। কতকাল ধরে সন্তানের জন্য অপেক্ষা করেছে ওরা। প্রায় বুড়ো বয়সেই হতে চলেছে সন্তান, যদি কিছু ঘটে তো মেয়েটা জামাইটা শয্যা নেবে। সংসারের সুখ নিবে যাবে।

ননীবালা কথা বাড়ান না। সোমেনের একটা কিটব্যাগে কাপড়চোপড় গোছাতে থাকেন। ছেলেরা কেউ বাড়ি নেই। কাউকে বলে যাওয়া হল না। জামাই তাড়া দিচ্ছে, ঘরদোর কিছু সিজিল-মিছিল করে যাবেন তার উপায় নেই। ননীবালা বাড়ির বার হলেই বীণা ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র হাঁটকে দেখে। কী এক শত্রুতা তৈরি হয়েছে বউটার সঙ্গে! তার ওপর চেক ভাঙিয়ে টাকা তুলতে যে-কোনও দিন

গোবিন্দপুর থেকে শনিঠাকুরটি আসবেন। আর এক শত্রু। কিন্তু শত্রু হোক আর যাই হোক, তার একটা মর্যাদা আছে। ননীবালা মানুষটাকে যতই মুখ করুন, এ সংসারের আর কেউ তাকে অমর্যাদা করলে ননীবালার বড় লাগে। ননীবালা থাকবেন না, তখন যদি আসে তো ছেলের বউ হয়তো বসতেও বলবে না, আদর-আপ্যায়ন করবে না, দাঁড়ানোর ওপর বিদায় দেবে। সে লোকও বড় অভিমানী, একটু অনাদর দেখলে নিজেকে সে জায়গা থেকে সরিয়ে নেয়। আর সোমেনের চিন্তা তো আছেই। বাপের মতোই স্বভাব, একটুতে রেগে যায়। মুখ ফুটে কারও কাছে এক গ্লাস জল পর্যন্ত চায় না। ননীবালার কাছেই যত আবদার। বয়স্ক খোকা একটি।

এইসব দুশ্চিন্তা করেন ননীবালা, আর ব্যাগ গুছিয়ে নেন। সংসারে শত দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা জীবন। কত মায়া, কত চিন্তা, কত নিজেকে দরকারি মানুষ বলে ভাবা! তবু তো সব ছেড়ে একদিন রওনা হতে হয়! কিছু আটকে থাকে না। এ-সব বুড়ো বয়সের চিন্তা। আঁচলটায় চোখ মুছে নেন তিনি।

এই যে শীলু আর জামাই ছেলে-ছেলে করে পাগল, তার তো কোনও মানে নেই। হচ্ছে না, সে একরকম। কিন্তু হলেই কি সুখ নাকি? মুখখানা দেখলেই মায়া এসে গেল তো গেলই। আর একটা জীবন ছাড়ান-কাটান নেই। মুখ দেখে সুখ যেমন, আবার জীবনভর দুঃখও কম নাকি! পেটের শত্রুর চেয়ে শত্রু নেই, লোকে বলে, সে মিছে কথা নয়। বাপ-মা যত ভালবাসে ছেলেমেয়েকে, ছেলেমেয়ে কোনওকালে উলটে ভালবাসে না তত। নিজেকে দিয়েই জানেন। রণেন, শীলু হওয়ার পর জগৎসংসার যেন ওদের মধ্যেই বাসা বাঁধল, ভালবাসা নিঙড়ে নিল। আবার এখন রণেনকে দেখেন, ছেলেপুলে নিয়ে কত চিন্তা, কত ভালবাসা!

ননীবালা বীণাকে ডেকে বললেন, যাই।

আসুন। বলে বীণা প্রণাম করল।

বড় ভাল লাগল ননীবালার। পিঠে হাত রেখে গভীর মনে আশীর্বাদ করলেন। এরা ভালবাসা নিতে জানে না, জানলে, ননীবালা যে কত ভালবাসতে পারেন তা দেখতে পেত।

॥ উনত্রিশ ॥

ননী, ছেলেকে পাঠিয়েছিলি, কিন্তু নিজে তো কই একদিনও এলি না। বগুড়ার কথা বলব এমন মানুষ পাই না। সেই আমাদের বগুড়ার ছেলেবেলার সাক্ষী কেই বা আছে! একা পড়ে আছি কতকাল। তোকে পেলে কত কথা যে বলব! তোর ছেলেটা বড় লাজুক, আজকাল আসে না তো! ওকে সঙ্গে নিয়ে আসবি। কবে মরে যাই কে জানে? সকলের জন্য বড় মায়া হয় আজকাল। আসিস...

মা'র চৌকিটা ন্যাড়া হয়ে পড়ে আছে। বিছানাটা গোটানো, তার ওপরে শতবন্ধির বেড়। চৌকির ওপর ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। তোশকের নীচে গুঁজে রাখা অনেক টুকিটাকি কাগজ, লন্ড্রির বিল, পুরনো চিঠি তার মধ্যে শৈলীমাসির দেওয়া চিঠিটাও পড়ে আছে। মা এখনও বড়দির বাড়ি থেকে আসেনি। দু'দিন ধরে পড়ে আছে চিঠিটা, মা'র কাছে পৌঁছে দিয়ে আসা হয়নি। থাকগে। এমন কিছু জরুরি চিঠি নয়।

কেমন একটা বিষণ্ণ ঋতু এসেছে এখন। শীতের টান শেষ হয়ে বাতাস ভেপে উঠেছে ক্রমে। সাঁঝ সকালে অন্ধ কুয়াশা আর ধুলো ঢেকে রাখে চারধার। কলকাতার পচনের ভ্যাপসা গন্ধ চাপ হয়ে বসে থাকে শহরের বুকে। মন বড় আনমনা। ভাল লাগে না। কিছু ভাল লাগে না।

গতকালও অণিমার সঙ্গে দেখা, মুক্ত অঙ্গনে ওরা নাটক করবে। মিহির বোস নাটক লিখেছে, পরিচালনাও তার। নাটকের দল তৈরি হয়ে গেছে, দলের নাম হইচই। সোমেনকে একটা পার্ট

নেওয়ানোর জন্য ঝুলোঝুলি। সবশেষে বলল, বড্ড অহংকারী তুমি। অহংকার সবাইকে মানায় না সোমেন।

একটু কি রেগে গিয়েছিল অণিমা! কিন্তু সোমেনের ও-সব ছেলেমানুষি আর ভাল লাগে না। বয়স বাড়ছে। গেস্টকিন উইলিয়ামসে ঢুকে গেল চিত্তপ্রিয়। আই সি আইতে ডি গ্রেড কেরানির চাকরি পেয়ে গেছে হেমন্ত। সত্যেন তার বাড়িতে টিউটোরিয়াল খুলে পয়সা করছে। সোমেনেরও একটা কিছু করা দরকার। কিছু করার জন্য হাত-পা নিশপিশ করে। কিন্তু শূন্য কাজে বেলা কেটে যায়।

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে নতুন প্যান্টটা পরে বেরোতে যাচ্ছিল সোমেন, বউদি ডেকে বলল, চা করছি, খেয়ে যাবে নাকি!

বউদির সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা হয় না আজকাল। সোমেন কথা বলতে আলসেমি বোধ করে। চুপচাপ থাকতেই ভাল লাগে। যেন বা হঠাৎ তার অভিজ্ঞতা বেড়েছে, বয়স হয়েছে, ধীর-স্থির বিবেচক গম্ভীর মানুষ একজন।

চায়ের কথায় বেরোতে গিয়েও ঘুরে এসে সোফায় বসে বলল, দাও।

গ্যাস উনুন থেকে কেটলি নামিয়ে, চা ভিজতে দিয়ে বউদি উঠে এসে বলল, এই প্যান্ট করালে?

হুঁ।

বেলবটম করালে না কেন?

সোমেন একটু হাসে। দাদাকে আজকাল বউদি খুব আধুনিক পোশাক পরায়। দাদা স্টাইল বোঝে না। মোটাসোটা মানুষ বলে মানায়ও না কিছু। তবু নির্বিকার মানুষের মতো বউদি যা পরায় তাই পরে।

সোমেন বলল, বেলবটম আমার ভাল লাগে না। পায়ের গোড়ালির কাছে একগোছ বাড়তি কাপড় হাতির কানের মতো লটরপটর করবে, সে ভারী বিশ্রী। বোকা-বোকা।

বউদি বলে, দাঁড়াও তো, দেখি।

সোমেন দাঁড়ায়। বউদি চারধারে ঘুরে প্যান্টের ফিটিং দেখে মুখ টিপে হেসে বলে, খারাপ হয়নি। তা অমন সুন্দর বিলিতি কাপড়ের প্যান্টের সঙ্গে কি ওই অখদ্দে তিলেপড়া নীল শার্টটা পরে বেরোবে নাকি?

সোমেন পা নাচাতে নাচাতে বলে, এইটাই আমার সবচেয়ে ভাল শার্ট।

উদো একটা। টাকা দিচ্ছি, আজই একটা সাদা রঙের ইজিপশিয়ান বা টেরিকটন শার্ট করতে দেবে...

সোমেন বাধা দেওয়ার আগেই বউদি ভিতরের ঘরে তোশকের তলা থেকে মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চাশটা টাকা এনে প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিয়ে বলে, রেডিমেড ভাল পেলে তাও কিনতে পারো।

সোমেন একটু চুপ করে থাকে। বউদি চা এনে দেয়। চুমুক দিতে দিতে বলে, তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে...

বউদি হেসে ফেলে, বলে, তার মানে?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সোমেন বলে, দয়া ছাড়া গতি কী বলো?

দয়া নয় ঠাকুরদাদা, তুমি তো বড্ড বেশি বোঝো?

দয়া নয়? তবে কী! জয় তোমার করুণা...

আজ তোমার জন্মদিন।

সোমেন একটু অবাক হয়। বলে, আজ দোসরা ফাল্গুন নাকি?

হ্যাঁ। কিছুই তো খেয়াল রাখো না। রাতে তোমার দাদা মাংস আনবে, আর ফ্রায়েড রাইস করব। তোমার নিজের এ-সব খেয়াল না থাকলেও আমাদের থাকে মশাই।

কত বয়স হল বলো তো?

পঁচিশে পা দিলে। চব্বিশ পূর্ণ হয়ে গেল।

পঁচিশ! বলে হঠাৎ বিড়বিড়িয়ে ওঠে সোমেন, কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলে, পঁচিশ! তা হলে তো একদম সময় নেই।

বউদি অবাক হয়ে বলে, কীসের সময় নেই?

সোমেন বউদির মুখের দিকে চেয়ে বলে, খুব তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা দরকার বুঝেছ! বয়স বাড়ছে।

বউদি বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, বুঝেছি। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে সেলুন থেকে দাড়িটা কেটে নেওয়ার যেন সময় হয়। ওই প্যান্টটার সঙ্গে তোমার একদম ম্যাচিং হচ্ছে না। লোকে দেখলে ভাববে কার প্যান্ট চুরি করে এনে পরেছ।

সোমেন গাল চুলকোয়, থুতনিতে হাত দিয়ে হাসে। ঘরে ঘুমন্ত বাচ্চাদের মধ্যে কে যেন কেঁদে উঠল। বউদি ও-ঘরে যাওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, ফের যেন শোকতাপ পাওয়া বুড়ো ঠাকুরদার মতো চেহারায় না দেখি। মা এসে দেখলে ভাববে তার ছেলেকে খেতে দিইনি ক'দিন।

সেলুনে দাড়ি কামিয়ে নিল সোমেন। গড়িয়াহাটার ভাল দোকান থেকে দুধসাদা একটা টেরিকটনের শার্ট কিনে নিল। দোকানের ট্রায়াল রুমে ঢুকে পরে নিল শার্টটা। ট্রায়াল রুমটা অদ্ভুত। অন্ধকার ছিল, ভিতরে পা দিতেই পায়ের তলায় চৌকো পাটাতন দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাখা ঘুরতে থাকে মাথার ওপর। আলো জ্বলে ওঠে। সবই অটোমেটিক। এই সব কায়দার জন্যই বোধহয় বড় দোকানটায় শার্টটার দাম টাকা দশেক বেশি পড়ল। ফুটপাত থেকে কিনলেই হত।

নিজেকে আয়নায় দেখে খুশি হচ্ছিল না সোমেন। পঁচিশ বছর বয়সের ছাপ পড়ল নাকি মুখে! কোন বয়সের পর যেন মানুষ আর বাড়ে না। কোন বয়স থেকে যেন ক্ষয় শুরু হয়! একটা আবছা ভয় হঠাৎ বুক শুকিয়ে দেয়। যৌবন বয়স তো চিরকাল থাকে না। কিন্তু কত দিন থাকে?

অণিমাদের বাড়িতে গাব্বুর পড়ার ঘরে ঢুকে একটু অবাক হয় সোমেন। সবাই হাজির। অপালা, পূর্বা, অণিমা, শ্যামল, মিহির বোস ছাড়াও ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছেলেমেয়ে, দু'-চারজন অচেনাও রয়েছে। একটা চেয়ারের ওপর এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মিহির বোস, হাতে নাটকের পাণ্ডুলিপি, মুখ-চোখ খুব সিরিয়াস। যেমন বোকা বোকা লেগেছিল তাকে প্রথম দিন, এখন আর তেমন লাগছে না! আত্মবিশ্বাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন একজন চালাক-চতুর লোকের মতোই দেখাচ্ছিল। অপালা তার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে।

সে ঘরের দরজার পরদা সরিয়ে দাঁড়ায়। পূর্বা অণিমাকে ঠেলা দিয়ে অবহেলার সঙ্গে বলে, তোদের প্রাইভেট টিউটারটা এসেছে, দ্যাখ, অণি!

অণিমা মুখ ফিরিয়ে হাসল। বলল, প্রাইভেট টিউটার ছাড়া আর কী! ওর কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।

অপালা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল।

মিহির বোস একটু নীরস গলায় বলল, আসুন সোমেনবাবু।

সোমেন বুঝতে পারে সবাই তার ওপর রেগে আছে। সোমেনের মৃদু একটু বোকা-হাসি আছে, যা দেখে সবাই ওকে ক্ষমা করে। সেই হাসিটা সে হাসল এখন। ঘরে ঢুকে অণিমার পাশে সোফায় বসে বলে, গাব্বু পড়বে না?

কী জানি! ও ওদিককার একটা ঘরে শিফট করেছে। এ ঘরটা আপাতত হইচই দলের। এখানে তোমার ভাল না লাগলে গাব্বুর ঘরে যেতে পারো।

সোমেন উত্তর দিল না. বসে রইল। মিহির বোস তার প্রতীক নাটকের থিম বোঝাচ্ছিল। একটু থেমে আবার শুরু করল এখন।

পূর্বা চেয়ারে বসে ছিল। উঠে এসে সোমেনের পাশে সোফায় বসে ফিসফিস করে বলল,

নাটকটা কিছু বুঝতে পারছি না মাইরি। একটা লোক একদিন মাথা ধরার ট্যাবলেট মনে করে নাকি চাঁদটাকে গিলে ফেলেছিল। সেই থেকে প্রবলেম শুরু তারপর থেকে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ইউ এন ও সবাই লোকটার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠায়। লোকটার প্রেমিকা আত্মহত্যা করতে চাইছে, আর লোকটা তাকে বিরাট বিরাট বক্তৃতা দিয়ে কী যেন বোঝাচ্ছে। সবাই বলছে, দারুণ নাটক। আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

সোমেন সমবেদনার স্বরে বলে, তোর মাথাটা নিয়ে আমারও চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না।

যাঃ। বলে পূর্বা হেসে ওঠে।

মিহির বোস নাটকের থিম বোঝাতে বোঝাতে ব্যথিত চোখে তাকায়। পরদা সরিয়ে অনিল রায় উঁকি দেন, আসতে পারি?

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, আসুন স্যার।

অনিল রায়ের হাঁটা দেখেই বোঝা যায়, পেটে ঈষৎ মদ আছে। চোখ দুটো চকচকে লাল; মুখে বেসামাল একটা হাসি। তাঁর সঙ্গে ম্যাক্স! সেও টেনে এসেছে তবে অনেক স্টেডি, আর কিছু গম্ভীর। অনিল রায় সোমেনের কাছে এলে সোমেন উঠে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলে, বসুন স্যার।

সোমেন না?

হ্যাঁ স্যার। আপনি আমাকে কেবল ভুলে যান।

অনিল রায় বসে হাসলেন। বললেন, বয়সে পেয়েছে, বুঝলে! সেদিন নিজের ছেলেটার সঙ্গে দেখা এক বিয়েবাড়িতে, প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল আচমকা, চিনতেই পারলাম না। অবশ্য আমাদের ডিভোর্সের সময়ে ওর বয়স কম ছিল। এখন বেশ লম্বা-চওড়া হয়েছে। সাত বছর সময় তো কম নয়! তবু চেনা উচিত ছিল। আফটার অল নিজেরই তো ছেলে। শেষে অদিতিই এগিয়ে এসে বলল, অনিল, বান্টিকে চিনতে পারছ না! অনিল রায় হাসলেন, কী কাণ্ড বলো!

পূর্বা হিহি করে হাসছিল। অনিল রায় ধমকালেন, কী হল? ও ছুঁড়ি হাসছে কেন? মিহিরের নাটকটা কি খুব হিউমারাস?

অণিমা বলে, না স্যার, হাসিই ওর রোগ। হাসতে হাসতে একদম বেহেড হয়ে যায়।

না না, ও আমার ছেলের কথা শুনে হাসছে। আজকাল প্যাথেটিক কথাতেও লোকে হাসে। সোমেন, একটা সিগারেট দাও তো।

নেই স্যার, এনে দিচ্ছি। বলে সোমেন উঠতে যাচ্ছিল। মিহির বোস নিজের সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে আসে।

আমার কাছে আছে, নিন।

পূর্বা মুখ তুলে বলে, আজ সারা বিকেল ধরে হাসিটা চেপেছিলাম। এতক্ষণে বেরিয়ে গেল।

অনিল রায় অবাক হয়ে বলেন, কেন?

নাটকটা স্যার কিছু বুঝতে পারছি না। কেবল হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু অপালা যা গম্ভীর হয়ে ছিল, হাসতে সাহস হয়নি।

অপালা তার প্রতিমার মতো বড় বড় চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে বলল, মারব থাপ্পড়। বাথরুমে যাওয়ার নাম করে অন্তত বার দশেক হাসবার জন্য উঠে গেছিস, আমি বুঝি টের পাইনি?

আবার হিহি করে হেসে ওঠে পূর্বা। তার হাসি দেখে সবাই হাসে। অপ্রস্তুত মিহির বোসও হাসতে থাকে সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অকপটে। পূর্বা বলে, তোর হাসি পায়নি অপা?

পেলেই যেখানে-সেখানে হাসতে হবে নাকি? হাসলে মিহিরবাবু বুঝি আর ফিরে তাকাতেন আমাদের দিকে? নিজের ভবিষ্যৎ কেউ হেসে নষ্ট করে, বলুন স্যার?

সোমেন চাপা স্বরে বলে, জঘন্য।

অণিমা শুনতে পেয়ে বড় বড় চোখে তার দিকে চেয়ে বলে, কী জঘন্য সোমেন?

তোমরা?

ওমা! কেন?

তোমরা জীবনেও কাউকে ভালবাসতে পারবে না। কেবল ইয়ারকি। ঘরে ঢুকে অপালার ভাবসাব দেখে মনে হয়েছিল, মিহির বোসের প্রেমে পড়েছে বুঝি। এ তো দেখছি, এখনও বাঁদরনাচ নাচাচ্ছে।

একটু পা নাচিয়ে অণিমা বলে, ভালবাসার লোক নিয়ে বুঝি ইয়ারকি করতে নেই! তোমাকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করি না?

ফের? বলে তাকায় সোমেন।

আচ্ছা বাবা, ঠাট্টা করব না আর। কান ধরছি। সত্যিই অণিমা কান ধরে।

ও কী রে? চেঁচিয়ে ওঠে অপালা।

অণিমা ম্লান মুখে বলে, ও ধরতে বলল যে।

কে?

ও। বলে ভারী লাজুক ভঙ্গিতে সোমেনকে দেখিয়ে দিয়েই মাথা নত করে অণিমা।

সকলে উচ্চকিত হয়ে হাসতে থাকে। সোমেনের কান-মুখ গরম হয়ে যায়। পূর্বা দাঁতে ঠোঁট টিপে বলে, তোর বাড়ির টিউটরটার তো ভারী সাহস অণি!

তুমি আর কেলিও না। বলে পূর্বাকে ধমক দেয় সোমেন।

পূর্বা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, দেখেছেন স্যার! ওকে আমি সবচেয়ে বেশি ফেবার করি, আর ও সব সময়ে আমাকে ইনসাল্ট করে।

গোলমালটা একটু থিতিয়ে আসে। মিহির বোস আবার তার কভার ফাইল খুলে নাটকের পাণ্ডুলিপি বের করে।

সোমেন উঠে বলে, আমি গাব্বুর ঘরে যাচ্ছি।

কেউ তার দিকে মনোযোগ দিল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে সোমেন প্যাসেজে পা দিল। নীচের তলায় অনেকগুলো ঘর। কেউ থাকে না। ফাঁকা নিঝুম। পায়ে পায়ে এ ঘর-ও ঘর ঘুরে দেখছিল সোমেন। গাব্বু কোনও ঘরেই নেই।

ভিতর দিকে একটা ঢাকা বারান্দার মতো। আলো নেই। প্যাসেজের আলোর ক্ষীণ আভা আসছে। পিছন দিকেও ওদের বাগান আছে। মৃদু গোলাপের গন্ধ আসছে, আর গাছগাছালির বুনো গন্ধ। সোমেন ডাকল, গাব্বু।

কেউ সাড়া দিল না।

পিছন ফিরতেই চমকে গেল সোমেন। পিছনে মৃদু আলো, আবছায়ায় ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে অণিমা। সোমেন হেসে ফেলে বলে, চমকে গিয়েছিলাম। শব্দ করোনি তো।

অণিমা উত্তর দিল না। নড়লও না। কেবল তাকিয়ে থাকল।

সোমেনের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। অজানা একটা ভয়। একটা অনিশ্চয়তা। সে সহজ হওয়ার জন্য বলল, গাব্বু কোথায় বললে?

এসো। বলে হাত বাড়াল অণিমা। সোমেনের হাতখানা ধরল। বলল, এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি।

সোমেন এত ভয় কখনও পায়নি। অণিমা হাত ধরেছে বলে নয়, অণিমা কাছ ঘেঁষে রয়েছে বলেও নয়। সোমেন লক্ষ করেছে, ওর গলার স্বর বসা, আবেগরুদ্ধ। এ-সব সময়ে মানুষ গলার স্বর লুকোতে পারে না।

অন্ধকার একটা ঘরে এনে তার হাত ছাড়ল অণিমা। আলো জ্বালল না। বাগানের দিকে একটা মস্ত খোলা জানালা। জানালার ও-পাশে হয়তো জ্যোৎস্না, কিংবা ফ্লুরোসেন্ট আলো। সেই আলোয় ছায়ামূর্তির মতো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অণিমা ডাকল, সোমেন।

কী?

এখন সেই কথাটা বলো।

সোমেন কেঁপে ওঠে। বোঝে যে অণিমা ঠাট্টা করছে না।

॥ ত্রিশ ॥

অণিমার সান্নিধ্য কোনও দিনই খারাপ লাগেনি সোমেনের। ওকে ভয় পাওয়ারও কিছু ছিল না। খুব ঠান্ডা মাথার মেয়ে অণিমা। সব সময়ে মুখখানা সিরিয়াস করে বিচ্ছুর মতো ইয়ারকি দেয়।

কিন্তু এ অণিমা যেন সে নয়।

অণিমা ফিরে তাকাল। আবছা অন্ধকারে ওর মুখ-চোখ দেখা যায় না। কিন্তু শ্বাসের শব্দ আসে। অণিমা খুব নার্ভাস আজ! যেন-বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, এমনভাবে নাক টানল। বলল, বললে না?

সোমেনের গলার স্বর অন্য রকম হয়ে গেল। সে প্রায় ধরা গলায় বলে, কোন কথাটা? অণিমা জানালার দিকে পিছন ফিরে জানালার গ্রিল-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত দুটো তুলে পিছনে মুড়ে জানালার গ্রিল ধরে আছে। ভঙ্গিটা শিথিল, কেমন যেন। বলল, সেই কথাটা। যেদিন চাঁদ উঠবে, ফুল ফুটবে, লোডশেডিং থাকবে, সেদিন আমরা দু'জন দূরে কোথাও গিয়ে—

ও। বলে হাসল সোমেন। প্রাণহীন হাসি।

কথাটা কিন্তু কোনও দিনই বলোনি।

আজ কি বলব অণিমা?

বলো।

কেন, শুনে কী হবে?

শুনতে ইচ্ছে করছে। কেউ তো কোনও দিন বলেনি।

যাঃ! তোমাকে অনেকে বলেছে।

অণিমা একটু হাসল, বলল, বললেই বা। তুমি তো বলোনি।

ভয় পেতাম অণিমা। যা মেয়ে তুমি, শুনেই হেসে উঠবে হয়তো।

নইলে সিরিয়াসলি বলতে?

সোমেন উত্তর দিল না।

একটা ফোঁপানির মতো কাঁপা শ্বাস ফেলে অণিমা বলে, আমি খুব ইয়ারকি করি, না?

আর তৎক্ষণাৎ ঘটনাটা ঘটল বজ্রপাতের মতো। সোমেন জানত না, এতটা হবে।

ঘরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে ছিল সোমেন, প্রতিরোধহীন। জানালার চৌকো আলোর পরদায় ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অণিমা। হঠাৎ অণিমার ছায়া খসে পড়ল। নিঃশব্দ, নরম পায়ে অণিমা ছুটে এসে হঠাৎ দুটো জোরালো হাতে সোমেনের দু'কাঁধ খামচে ধরল আশ্লেষে, টেনে আনল নিজের দিকে। অন্ধকারে একটু বুঝি সময় লাগল অণিমার। সোমেনের ঠোঁট দু'খানা খুঁজতে। তারপরই সোমেন দু'খানা তুলোর চেয়েও নরম, উত্তপ্ত, আঠালো ঠোঁটের স্বাদ পেল নিজের ঠোঁটে।

বিশ্বাস হয় না। তবু ঘটনাটা ঘটছে। এমন নয় যে, সোমেন কাউকে কখনও চুমু খায়নি। কিন্তু অণিমা এত অন্য রকম। কী করে হয়! ভেবে কাঠের মতো হয়ে গেল সোমেন। শরীরে থরথরানি, কিন্তু মন আড়ষ্ট, ভীত। কী গভীর ঝড়ের মতো শ্বাস ফেলল অণিমা তার মুখে। সেই শ্বাসের বাতাস এত গরম যেন চামড়া পুড়ে যায় সোমেনের। অণিমার শরীরের ভিতরে বুঝি জ্বর? ভয়ংকর এক জ্বর! দুই হাতে সোমেন অণিমাকে ধরতে যাচ্ছিল বুঝি। অণিমা তখন সরে গেল আচমকা।

জানালায় ঠিক আগের মতো হয়ে দাঁড়াল। সোমেনের দিকে পিঠ। আস্তে করে বলল, এটা কিন্তু ইয়ারকি নয়।

অণিমার গলাটা ধরা-ধরা। প্রবল শ্বাস। হাঁফাচ্ছে। সোমেন হাতের পিঠে ঠোঁট মুছে নেয়। কিছু বলার নেই। জীবনে এ-রকম কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যার কোনও অর্থ হয় না। আর কি কোনও দিন সোমেন ইয়ারকি করতে পারবে অণিমাকে নিয়ে? কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল সোমেনের। বলল, তুমি পাগল আছো, মাইরি!

অন্ধকারেই অণিমা এক বার ফিরে তাকাল তার দিকে। এক বার নাক টানল। তারপর খুব সহজ হয়ে এক বার বলল, ও-ঘরে যাও সোমেন। গাব্বু আজ পড়বে না।

করিডোরটা পার হয়ে সামনের ঘরে আসবার পথটুকুতে সোমেন তার শরীরে অণিমার গন্ধ পাচ্ছিল। অণিমার গায়ে কোনও দামি সুগন্ধী ছিল, মুখে ছিল রূপটান। এ-সব অণিমা বড় একটা মাখে না। আজ কেন মেখেছিল কে বলবে? সবচেয়ে বেশি সজাগ হয়ে আছে সোমেনের ঠোঁটে অণিমার মুখের স্বাদ। সেই সঙ্গে একটা অনিচ্ছুক, কিন্তু তীব্র কামবোধ। শরীর তো মনের বশ নয়। সোমেনের বুকের মধ্যে একটা ধুকধুকুনি উঠেছে, চোখে-মুখে রক্তোচ্ছ্বাস। বাইরের ঘরের আলো আর অনেক চোখের চাউনির মধ্যে এসে দাঁড়াতেই তার বড্ড লজ্জা হতে লাগল।

ঘরের মাঝখানে ম্যাক্স দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা চোথা কাগজ। চোখ দুটোয় নীল আগুন। ওই আগুনের রহস্য আজও ভেদ হয়নি সোমেনের কাছে। ওই নিরীহ রোগা সাহেব লোকটার চোখ ও-রকম জ্বলে কেন? কাগজ হাতে ম্যাক্স দাঁড়িয়ে চারধারটা ওই আগুনে-চোখে দেখে নিচ্ছিল।

ঘরের কোণে একটা প্রকাণ্ড গোল টেবিলের ওপর বসে ছিল অপালা। ঝুটো হারের লকেটটা মুখে পুরে চুষছে। সোমেনকে বড় বড় চোখের দৃষ্টিতে প্রায় ছ্যাঁদা করে দিল। ঝামরে বলল, কোথায় গিয়েছিলি?

পূর্বা সোফায় অনিল রায়ের পাশে বসে আছে। মুখ ফিরিয়ে বলল, ও তো প্রাইভেট টিউটর এ-বাড়ির, জানিস না?

সে-কথার কোনও উত্তর দিল না অপালা। বড় স্থির চোখের চাউনিতে তাকিয়ে থেকে বলল, এখানে এসে চুপ করে বোস। ম্যাক্স একটা কবিতা পড়বে।

অনিল রায় হাত তুলে বললেন, চুপ। হাশ্ সায়লেন্স।

গোল টেবিলের ওপর অপালার পাশে উঠে বসে সোমেন। ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করে, ম্যাক্স কবিতা লেখে? জানতাম না তো।

অপালা মাথা নেড়ে বলে, লেখে। আরও কত কী করে!

বাঙালির চেয়ে কয়েক পরদা গম্ভীর বাজ ডাকার মতো গুরগুরে গলায় ম্যাক্স কবিতা পড়তে শুরু করে। কবিতার নাম—গ্র্যান্ড রেস্টুরেন্ট। ইংরিজি কবিতাটার অর্থ এ-রকম—আমি একদিন গ্র্যান্ড রেস্টুরেন্টে যাই। তখন সকালবেলা। রেস্টুরেন্টে লোকজন ছিল না। কী চমৎকার সেই দোকানঘর! দেয়ালে দেয়ালে সুরেলা রং। কাচের তৈরি সব জানালা দরজা। মেঝেতে পুরু কার্পেট। একধারে নাচের জায়গা। টেবিল-চেয়ারগুলি কী চমৎকার। সেই সকালেও ব্যান্ড বাজছে রেস্টুরেন্টে। সেই সুর শুনে মনে হয়, পৃথিবীর সব দুঃখ বুঝি ঘুচে গেছে। আমি সেখানে বসে রইলাম অনেকক্ষণ, মনটা বড় ভাল হয়ে যাচ্ছিল। তারপর আমার এক বার ল্যাভেটারিতে যাওয়ার দরকার হলে আমি বেয়ারাকে ডেকে বললাম, তোমাদের ল্যাভেটারি কোন দিকে? লোকটা খুব বিনীতভাবে আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল ল্যাভেটারিটা, দূর থেকে। আমি ল্যাভেটারির দরজা খুলে ঢুকেই কিন্তু শিউরে উঠলাম। এ কী নরক চারদিকে! মেঝের ওপর পড়ে আছে শেষ রাতের মাতালের বমি, বেসিনের গায়ে ফাটা আর ময়লার দাগ। মেঝেয় জল জমে আছে। আয়নাটা নোংরা। তেমনি নোংরা ওদের কমোড। আমি দৌড়ে ফিরে এলাম, সোজা গিয়ে ম্যানেজারের

সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম, কেন তোমার সামনের দোকানটা এত ঝকমকে? আর কেনই বা তোমার ল্যাভেটারি এত নোংরা? কেন তোমার ল্যাভেটারিটাও নয় তোমার রেস্টুরেন্টের মতোই পরিষ্কার? আমি এই কথা চিৎকার করে যত বলি, লোকটা তত অসহায়ের মতো বলে, আমি কী করব, আমার কী করার আছে?

কয়েকজন ক্ষীণ হাততালি দিল। বোঝা গেল যে, কেউ কিছু বোঝেনি।

অপালা সোমেনের কানে কানে বলে, কী-সব পড়ল রে? বাথরুমটা নোংরা বলে ওর অত রাগ কেন?

সোমেন খানিকটা স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে বলল, ওটা আসলে বাথরুম নয়।

তবে কী?

সভ্যতার অভ্যন্তর। সভ্যতার বাইরের দিকটাই চকচকে, ভিতরটায় নোংরা জমে যাচ্ছে।

অপালা চোখ বড় বড় করে বলে, বাঃ, তুই তো বেশ কবিতা বুঝিস।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে, আমি বেশি বুঝি না, তবে তোরা কিছু কম বুঝিস।

আমরাও কিছু কম বুঝি না। বলে অপালা বড় বড় চোখে এক বার সোমেনের দিকে দেখে নিয়ে মুখটা ফিরিয়ে বলে, মেয়েদের কাছে তোর এখনও ঢের শেখার আছে।

কবিতার মাঝখানে কখন যেন অণিমা ঘরে এসেছে। একটু ঘুরল এদিক-ওদিক। ম্যাক্স যে মোড়ায় বসে আছে তারই পাশে মেঝের ওপর বসল দীনদরিদ্রের মতো। মুখখানা এখনও বুঝি একটু লাল। আর কিছুটা অন্যমনস্ক। সোমেনের চোখে চোখ পড়ল এক বার। একটু ক্ষীণ হাসল। চোখ সরিয়ে নিল আস্তে আস্তে! কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই ওর কি কিছু পরিবর্তন ঘটে গেল? লজ্জা করছিল সোমেনের।

চায়ের আর বিস্কুটের ট্রে নিয়ে চাকর এল ঘরে। সবাই চা নিচ্ছে, ঘরের মাঝখানে একটু হুড়োহুড়ি। কেবল সোমেন চা নিতে উঠল না, অণিমাও নয়। সোমেন ভাবে—আমরা অন্য রকম হয়ে গেলাম। এ-রকমই কি হওয়া উচিত ছিল? এটা কি স্বাভাবিক! ভাবতে গেলে অস্বাভাবিকও কিছু নয়। বয়সের ছেলেমেয়ে, হলে দোষ কী? কিন্তু মনটা কখনও প্রস্তুত ছিল না তো সোমেনের! প্রেম নিয়ে কত ঠাট্টা করেছে তারা। বিপজ্জনক সব ঠাট্টা। মনে কিছু থাকলে কি ও-রকম ঠাট্টা করা যায়!

চায়ের পর রিহার্সাল শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু হুল্লোড়ে তা আর হল না। এখন নিছক আড্ডা চলবে। সোমেনের কিছুক্ষণ একা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। সকলের অন্যমনস্কতায় সে টুপ করে উঠে পড়ল একসময়। দরজার কাছ বরাবর গিয়ে এক বার চোর-চোখে ফিরে তাকাল। দেখল আর কেউ নয়, কিন্তু অণিমা ঠিক অপলক চোখে চেয়ে আছে।

সোমেন মুখটা ফিরিয়ে নিল। বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই অণিমার ডাক শুনতে পেল, শোনো।

সোমেন দাঁড়ায়, কী?

গাব্বুকে এরপর পড়াবে তো?

সোমেন যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলে, পড়াব না কেন?

অণিমা একটু হেসে বলল, ভয় ছিল, তুমি—তোমার খুব রাগ হয়নি তো!

সোমেন মাথা নেড়ে বলে, না তো! তবে কেমন অন্য রকম লাগল অণিমা।

বোকা, অন্য রকম আবার কী! তুমি ভারী উলটোপালটা মনের ছেলে।

এতকাল টের পাইনি তো কিছু।

সে তোমার বোঝার দোষ। কিছু ভুল হয়নি সোমেন। আমি তোমাকে জানাতে চাইছিলাম। হয়তো কাজটা একটু নির্লজ্জ হয়েছে।

সোমেন মুখ তুলে অণিমাকে দেখল। বেশ সুন্দরীই অণিমা। বয়স সোমেনেরই মতো। তাদের ভালবাসা হতে কিছু আটকায় না। তবু কেন যে সোমেনের মনটা দোমড়ানো কাগজের মতো হয়ে আছে! তাতে অনেক ভাঁজ, অনেক আলো-অন্ধকারের ইকড়ি-মিকড়ি। কোথায় যেন আটকাচ্ছে।

চলি। সোমেন বলল।

অণিমা বুঝি কিছু আকুলতাভরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে বলে, শোনো, আর একটা কথা।

কী?

তোমার কোনও ভয় নেই। আমি ভূতের মতো তোমার ঘাড়ে ভর করব না।

বুঝলাম না অণিমা।

বলছি। আজ যা করেছি তা একটা স্মৃতিচিহ্নের মতো রইল।

সোমেন অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

অণিমা হাসল। আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে। সেই জ্যোৎস্নায় বড় ম্লান দেখাল হাসিটি। বলল, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বৈশাখে। কাউকে এখনও জানাইনি। তোমাকে জানালাম প্রথম।

সোমেনের শরীরে একটা বিদ্যুৎ স্পর্শ করল হঠাৎ। বাতুলের মতো চেয়ে থেকে সে বলে, কী বলছ অণিমা?

সত্যি সোমেন। গাড়ি-বাড়িওলা এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে।

সোমেনের বুকটা হঠাৎ বায়ুশূন্য হয়ে যায়। দম নিতে কষ্ট হয় তার। বড় আশ্চর্য ব্যাপার। একটু আগে অণিমা যখন চুমু খেয়েছিল তখন থেকে এই সময়টুকুর মধ্যে তার মনে মনে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। তার ভিতরে যেন সর্বদাই বাস করে অন্য এক সোমেন যার সঙ্গে এই সোমেনের ইচ্ছের মিল নেই। সেই অন্য সোমেন বুঝি এই ক্ষণেক সময়টুকুতেই অণিমাকে নিজের বলে চিহ্নিত করে রেখে দিয়েছিল। ভিতরের সেই সোমেনটাই এখন মার খেয়ে মুষড়ে ওঠে।

তা হলে আজকের ব্যাপারটা কেন করলে অণিমা?

অণিমা ঘন গভীর শ্বাস ফেলে একটা। বলে, তোমাকে জানিয়ে দিলাম যে, জীবনে আমি কত অসুখী হব। ও-রকম না করলে তুমি বুঝতে না সোমেন। এখন বুঝবে। মনে রাখবে।

হঠাৎ সোমেন তার ভুবনজয়ী হাসিটা হাসে। বলে, ধ্যাৎ। তুমি ভারী ইমোশনাল, এমন তো ছিলে না?

অণিমাও হাসে। হঠাৎ ডান হাতখানা বাড়িয়ে পাকা জুয়াড়ির মতো গলায় বলে, কুইটস।

সোমেন হাতটা ধরে। বলে, শোধবোধ।

অণিমা হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে, এসো সোমেন। গাব্বুকে পড়িয়ো। লজ্জার কিছু নেই।

সোমেন মাথা নাড়ল।

নির্জন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোমেন ভাবে—অণিমার হাতটা কেন অত ঠান্ডা?

সোমেন বড় অস্থির বোধ করে। অনেক দূর রাস্তা আপনমনে হাঁটতে থাকে। মাথাটা গরম হয়। এক বার নিজের থেকেই হেসে উঠল সে। এক বার মাথা নেড়ে বলল, আহা রে। এবং প্রথম বুঝতে পারল, অণিমার বিয়ে হয়ে গেলে তার মন খুব খারাপ লাগবে। বড্ড একা লাগবে তার।

কয়েক দিন ধরে মনটা খারাপ রইল সোমেনের। একটি মুহূর্তের ঘটনাটুকুকে কিছুতেই ব্যাখ্যা করা গেল না। বার বার ম্লান জ্যোৎস্নায় অণিমার প্রেত হাসিটুকু মনে পড়ে। বুকটা বায়ুশূন্য হয়ে যায়।

কয়েক দিন গাব্বুকে পড়াতে গেল না সোমেন। খুব আড্ডা দিয়ে বেড়াল এদিক-ওদিক। কিন্তু

মনের মধ্যে কেবলই বুকচাপা দম আটকানো কষ্ট হয়। এই বয়সের মধ্যে সোমেন কখনও এমন গভীর কষ্ট ভোগ করেনি। বার বার ভাবে, একটা সিদ্ধান্তে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু হয় না। কষ্টটা থেকে যায়। ঘুমের মধ্যেও ছটফট করে সোমেন। যখন জেগে থাকে তখন বড় আনমনা হয়ে থাকে। অণিমা সবই স্পষ্ট করে বলেছে তাকে। তবু সোমেনের বড় ঝাপসা লাগে। মাঝে মাঝে তার পাগলামি করতে ইচ্ছে করে।

আবার একদিন গাব্বুকে পড়াতে গেল সোমেন। যতক্ষণ পড়াল ততক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে রইল, বারবার ফিরে তাকাল দরজার দিকে। অণিমার দেখা পাওয়া গেল না। গাব্বুকে অণিমার কথা জিজ্ঞেস করতে তার ভয় হচ্ছিল, যদি গাব্বু কিছু টের পেয়ে যায়!

দু'-চারদিন পড়ানোর পর একদিন ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞেস করে ফেলল সোমেন, তোমার দিদিভাই কোথায়?

মোটাসোটা ফরসা আর খুব স্মার্ট ছেলে গাব্বু। চোখে কথা খেলাতে পারে। মিচকি হেসে বলে, আপনি জানেন না! দিল্লি গেছে পিসির বাড়ি বেড়াতে।

সোমেনের আর কিছু বলার থাকে না। সে কেবল ক্রমে একজন দুঃখী যুবকের রূপ ধরতে থাকে। একটা চুমু কী ভীষণ ট্র্যাজিক হতে পারে!

এই দুঃখের দিনে আচমকা একটা ঘটনা ঘটে গেল একদিন।

॥ একত্রিশ ॥

আজকাল কেমন বিকেলবেলার মতো বিষণ্ণ হয়ে থাকে সোমেনের মন। মনের মধ্যে যেন এক বাসাবদল চলছে। নিজের ঠাঁই ছেড়ে মন চলল কোথায়! চৈত্রের বুক-শুকনো করা গরম বাতাস বয় এখন। সারা গায়ে ধুলো মেখে পিঙ্গল হয়ে থাকে কলকাতা। গাছপালাহীন শান বাঁধানো শহরের আবহে জ্বরো রুগির গায়ের তাপ। দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল আসছে। ঋতুর এই পরিবর্তন তেমন লক্ষ করে না সোমেন। অন্যমনস্কতাই তার সঙ্গী আজকাল। একটি চুম্বনে তাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে গেছে অণিমা।

মাঝে মাঝে শীত করার মতো শিউরে ওঠে গা। মাঝে মাঝে তাকে চাবুক মারে স্মৃতি। মনে পড়ে সেই পাগল চুমু-খাওয়া। কোনও মানে হয় না। এও কি অণিমার কোনও ইয়ারকি! এক-এক বার ইয়ারকি বলে মনে হয়। তখন বুকে এক রকমের কষ্ট টের পায়। যখন ভাবে, ইয়ারকি নয়, তখন এক রকমের রহস্যের ঘন গন্ধে ভরে ওঠে বুক।

মানুষের ভিতরে এক অনন্ত জগৎ রয়েছে। নিজের ভিতরে ডুবুরির মতো নেমে যেতে পারলে দেখা যায়, এক খ্যাপা সেখানে আজব শহর-বন্দর তৈরি করে রেখেছে। অকল্পনীয় সব রঙের বুরুশ ঘষে চার দিক রঙিন করে রেখেছে সে। সেখানে অদ্ভুত সব মানুষের আনাগোনা—যাদের আর কোনও দিন পাওয়া যাবে না। সেখানে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে, নাটকের মতো, বায়স্কোপের মতো। একটা চুমু-খাওয়া তেমন কিছু আণবিক বিস্ফোরণ নয়, তবু বজ্রপাতের মতো মাঝে মাঝে গর্জে ওঠে সেই চুম্বনের স্মৃতি। মাথার মধ্যে ঝলসে ওঠে নীল ফসফরাস। অণিমা কি তাকে ভালবাসত? না কি ইয়ারকি করে গেল? তার চব্বিশ পূর্ণ হওয়ার জন্মদিনে ও কীরকম উপহার অণিমার, ক্ষতচিহ্নের মতো চিরস্থায়ী? মনের সেই অলীক খ্যাপা জগতে অণিমার উষ্ণ শ্বাস কুসুমগন্ধের মতো ছড়িয়ে থাকে। নাড়া-খাওয়া গাছের মতো কেঁপে ওঠে সোমেন। শীত করে ওঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে এই চৈত্রেও।

অণিমাকে ভালবাসার কথা কখনও তেমন ভাবেনি সোমেন ইদানীং। এখন নাগালের বাইরে গিয়েই কি শতগুণে ফিরে এল অণিমা!

গাব্বুকে পড়াতে যায় ঠিকই। মাস-মাইনে হাত পেতে নেয়, অবিকল টিউটরের মতো। অণিমা থাকলে এই হীনম্মন্যতাটুকু আসত না। মাসে একশো টাকা না-পেলেও চলে যাচ্ছিল একদিন। এখন ওই একশো টাকার একটা বাজেট তৈরি হয়ে গেছে মাসে। মায়ের এক পো দুধের দাম, নিজের সিগারেট-দেশলাই, লন্ড্রি কিংবা রেস্টুরেন্ট, কিছু পত্র-পত্রিকা। এই দুর্দিনে একশো টাকার টিউশানি ভাবাই যায় না। স্কুল-কলেজ ছেড়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। কৃষিবিপ্লবের জন্য গ্রামীণ ভারতে ডাক দেওয়া হচ্ছে ছেলেদের। কলকাতার ছেলেরাও দেয়ালে দেয়ালে সেইসব কথা লিখল ঠিকই। কিন্তু স্কুল-কলেজ ছাড়ল না। পরীক্ষাটাকেই আরও সহজ করে নিল তারা। আগুন, বোমা, গুলি আর ছুরি ঝলসে ওঠে চার দিকে। স্কুল-কলেজে ছাত্ররা বই খুলে পরীক্ষায় বসে। এ অবস্থায় প্রাইভেট পড়বে কে, কোন দুঃখে! পাস করা অনেক সহজ হয়ে গেছে এখন। অণিমার দেওয়া টিউশানিটা তাই বড় দুর্লভ বলে মনে হয়।

অন্যমনস্কতার মধ্যেই সেদিন গাব্বুকে পড়িয়ে ফিরছিল সোমেন। এই সব ভাল পাড়ার ভিতরে আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। খুব নির্জন। গাছপালার ছায়ায় ঘনায়মান রহস্য। একলা হাঁটতে একটু ভয় করে। কখন নিরালা ফুঁড়ে প্রেতের মতো কয়েকজন এসে ঘিরে ধরবে চার দিক থেকে, ওরা চলে গেলে পড়ে থাকবে সোমেনের লাশ। চার দিক দেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে সোমেন আবার মনের মধ্যে ডুবে হাঁটছিল। মনের মধ্যে এক খ্যাপার তৈরি জগৎ। দুঃখের বা পিপাসার কোনও রং নেই। কিন্তু মনের মধ্যে সেইসব অলীক রঙের আভা ঠিকই ধরা পড়ে। কত কথা ভাবে সোমেন! বুড়োমানুষদের এ-রকম হয়, আর কিছুই ঘটবে না, তাই তারা অতীতের স্মৃতি নিয়ে থাকে। সোমেনেরও সেই দশা আজকাল। যেন-বা, যা ঘটার ঘটে গেছে জীবনে। এখন আছে শুধু তার স্মৃতি। সোমেন আজকাল বড় ভাবে।

সামনেই রাস্তার আলোর স্তম্ভ। তার নীচে গাছের ঘন এবড়ো-খেবড়ো ছেঁড়া ছায়া। সেই ছায়ায় একটা মস্ত লম্বা গাড়ি এসে ধীর হয়ে থামল। পিছনের দরজা খুলে কে যেন নামছে। লক্ষ করার মতোই দামি বিদেশি গাড়ি, অঢেল কালো টাকায় কেনা। সোমেন অবহেলাভরে এক বার মুখ তুলে দেখল। গাড়ির পিছনে দামি জড়োয়া গয়নার মতো লাল আলোর অলংকার এক বার উজ্জ্বল হয়ে নিবল।

আধো অন্ধকারে সোমেন পেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা। যে-মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমেছে সে ঝুঁকে গাড়ির সিট থেকে তার ব্যাগ কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হতেই সোমেনের মুখোমুখি দেখা। এত আবছায়ায় চিনবার কথা নয়। তবু বলল, আরে! আপনি!

রিখিয়া! সচেতন হয়ে সোমেন চেয়ে দেখল, এই তো রিখিয়াদের বাড়ি। সে অন্যমনস্কতায় পেরিয়ে যাচ্ছিল। কোনও ভুল নেই। রাস্তার আলো পড়েছে রিখিয়াদের ঘের-দেয়ালের গায়ে। তাতে আলকাতরা দিয়ে লেখা—প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। এই কথাটা রিখিয়াদের দেয়ালে সে তো দেখেছে।

চুমকি বসানো কী একরকম শাড়ি পরেছে রিখিয়া, অন্ধকারেও চমকাচ্ছিল।

ভারী অপ্রস্তুত লাগছিল সোমেনের। সে ক'দিন দাড়ি কামায়নি। পরনে যদিও সেই বড়দির দেওয়া দামি প্যান্ট, আর বউদির দেওয়া শার্ট, তবু দুটোই চৈত্রের ধুলোয় বড় ময়লা হয়ে গেছে। বুকটায় পাখি ঝাপটাল। গলার স্বর হয়ে গেল অন্য রকম। বলল, যাচ্ছিলাম।

এটা কোনও জবাব হল না। রিখিয়া অন্য রকম বুঝল। বলল, কোথায় যাচ্ছিলেন? আমাদের বাড়ি?

যদি সোমেন 'হ্যাঁ' বলে এখন তবে হয়তো ভাববে—হ্যাংলা সেধে সেধে বাড়ি আসে। আর যদি 'না' বলে, তবে হয়তো ভাববে—ইস্, আমাদের জন্য একটুও ভাবে না তো!

সুসময়ে তো আসতই সোমেন। কিন্তু সুসময় তো আসে না।

সোমেন উত্তর না দিয়ে হাসল। তার সেই বিখ্যাত ভুবনজয়ী হাসিটি। দাড়ির জন্য চিন্তিত ছিল সোমেন। কিন্তু এও জানে, অল্প দাড়ি থাকলে তাকে যুবা বয়সের রবীন্দ্রনাথের মতো দেখায়।

রিখিয়ার কথা বলার সময়ে একটু মাথা নাড়ার রোগ আছে। তাতে ওকে খারাপ লাগে না। এখন মাথা নাড়ল, কানের ঝুটা ঝুমকো ঝিকিয়ে ওঠে। বলে, যাচ্ছিলেন না আর কিছু। আপনি প্রায় সময়েই তো এদিক দিয়ে হেঁটে যান। আসেন না।

তুমি দেখেছ?

না দেখলে বললাম কী করে?

ডাকোনি তো!

আমি ডাকব কেন? যার আসবার আসবে।

এমন অভিমানের গলায় বলল! ছেলেমানুষ। নইলে অমনভাবে বলে? বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে যে!

সোমেন কবজির ঘড়ি দেখে বলল, সাড়ে সাতটা বাজে। আর একদিন আসব।

মায়ের খুব অসুখ।

কী হয়েছে?

রিখিয়া কিন্তু হাসল। বলল, খুব কিছু নয়। মা'র তো নানা রকম। এখন শ্বাসকষ্ট হয়। আর চোখে নাকি ভাল দেখছে না। ডাক্তার বলেছে, রেটিনাল হেমারেজ। সব্বাইকে দেখার জন্য পাগল। আপনার মাকে নিয়ে আসার কথা ছিল না? প্রায় সময়েই ননীবালার চুলের গল্প শুনি।

সোমেনের গলার স্বর তীব্র শ্বাসবায়ুর প্রভাবে কেঁপে গেল। বলল, আর একদিন—

রিখিয়া মাথা নাড়ে, বলে, তা কেন? এই তো দু'পা। মা এখনও ঘুমোয়নি।

সোমেনের চোখে পড়ল আবার সেই লেখাটা। কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। দারোয়ান গেটটা খুলে দিল। গাড়িটা আলো জ্বেলে বাঁক নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে গ্যারেজে। একটা কুকুর ডেকে উঠল দোতলায়। সোমেন সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল, চলো। শৈলীমাসির কথা আমিও খুব ভাবি।

শান-বাঁধানো বাগানের একটুখানি রাস্তায় আগে হেঁটে যেতে যেতে রিখিয়া বলল, আহা! ভেবে ভেবে ঘুম হয় না বেচারির!

শৈলীমাসির ঘরে তেমনি কোমল অন্ধকার। সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা বাতিদান। ওষুধের গন্ধ, অডিকোলনের গন্ধ। খুব মৃদু শব্দ করে চলেছে এয়ারকুলার। সামান্য ঠান্ডা ঘর। নাইলনের সাদা মশারি ফেলা। বিছানার পাশে আজ একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার দেখা যাচ্ছে। সিলিন্ডারের পাশে একটু মোটামতো, লম্বা লোক গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসে আছে।

ঘরে ঢুকে তাকে ডেকে রিখিয়া বলে, বাপি, এই হচ্ছে ননীমাসির ছেলে।

ভদ্রলোক এক বার সোমেনের দিকে চাইলেন। চেনার কথা নয়। তার ওপর উনি উদ্বিগ্ন। বললেন, রাখু, উনি কিন্তু ট্র্যাংকুইলাইজারটা খেলেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন।

সোমেন প্রণাম করবার জন্য উপুড় হয়ে ভদ্রলোকের পা খুঁজে পাচ্ছিল না মেঝের অন্ধকারে। একটা পা পেল, অন্যটা না পেয়ে চেয়ারের পায়ায় হাত ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাল। উনি গ্রাহ্য করলেন না। স্ত্রীর জন্য বোধহয় খুবই উদ্বিগ্ন। এক বার তাকিয়ে বললেন, কে বললি?

রিখিয়া বোধহয় বাপকে তেমন আমল দেয় না। আদুরে মেয়েরা এ-রকমই হয়। হঠাৎ একটা ঝাঁঝের গলায় বলল, বললাম তো। ননীমাসির ছেলে। চুলওলা ননীবালার গল্প শোনোনি!

ও। বলে উনি খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ সোমেনের দিকে চেয়ে নালিশ করার মতো বললেন, অক্সিজেন নেওয়াটা ওর এক বাতিক। নাকে নল নিয়ে নিয়ে ঘায়ের মতো হয়ে গেছে—

সোমেন কী বলবে। চুপ করে রইল। যখন প্রণাম করছিল তখন ভদ্রলোক পা দুটো এগিয়ে দেননি। সেই রাগটা সোমেনকে খানিকটা উত্তপ্ত রেখেছে।

উনি রিখিয়াকে বললেন, রাতের খাওয়াটা আজ ঠিকই খেয়েছেন। অন্য দিনের মতো গোলমাল করেননি।

রিখিয়া তার বাবার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল কেবল। বলল, এখানে বসে অত কথা বোলো না। ডিস্টার্ব হয়।

উনি কিন্তু বসে রইলেন। কেমন একটু ঘোর-লাগা ভাব। পরনে একটা গোলাপি পায়জামা, একই রঙের ঢিলা কোটের মতো জামা গায়ে। দেখে মনে হয় না যে লোকটার রুচি বা বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। অথচ কত টাকা করেছে। সোমেনের ভারী হিংসে হয়। বোধবুদ্ধিহীন এ-রকম কত মানুষ লাখ লাখ টাকা কামিয়ে নিচ্ছে বাতাস থেকে। ভদ্রলোকের কোনও ব্যক্তিত্বও নেই। মেয়ে তার সঙ্গে কেমন ঝাঁঝিয়ে কথা বলে! হয়তো বা ভদ্রলোক কিছুটা স্ত্রৈণও। অন্ধ কুকুরের মতো বসে আছে বশংবদ। মনে মনে নিজের বাবার সঙ্গে তুলনা করে দেখে সোমেন। বাবাকে অনেক মহৎ মানুষ বলে মনে হয়। সৎ, চরিত্রবান, শুভ্র মানুষ। মায়ের দেওয়া ছোট্ট চিরকুটটা যখন ব্যগ্রভাবে খুঁজে দেখছিলেন সেদিন তখনই সোমেন টের পেয়েছিল, মায়ের প্রতি বাবার মমতা এখনও কী গভীর। তবু ব্রজগোপালের চরিত্রে একটুও স্ত্রৈণতা নেই। অসফল মানুষ, তবু সোজা গনগনে মানুষ। শরীরে শক্ত হাড়গোড় আছে।

সামান্য অ্যালকোহলের একঝলক গন্ধ আজও পেল সোমেন। অন্ধ কুকুরটা টলতে টলতে এল ঘরে। মুখ তুলে চাইল রিখিয়ার দিকে। না, চাইবে কী করে! ও তো দেখে না। কেবল শ্রবণ উৎকর্ণ করে বাতাস শুঁকছে। রিখিয়ার বাবা হাত বাড়ালেন কুকুরটার দিকে। মৃদু গলায় বললেন, আয়।

কুকুরটা মাথা নামিয়ে লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। সামনের দুটো পা নুলোর মতো বুকের ওপর জড়ো করে, পিছনের পা দুটো ছড়িয়ে অদ্ভুত আদরখেকো ভঙ্গিতে পড়ে আছে। রিখিয়ার বাবা চটিসুদ্ধ পা তুলে ওর গলার কাছটা রগড়াতে রগড়াতে বললেন, আজও খুব রিণ্টুর কথা বলছিলেন। সে আসছে না কেন। দোষটা যেন আমার। সে যদি তার মা-বাবার কথা না ভাবে—

বলে উনি চাইলেন রিখিয়ার দিকে। রিখিয়া বুঝি চোখ দিয়ে একটু শাসন করল। বাইরের লোকের সামনে ঘরের কথা বলা ঠিক নয়। উনি তাই কথাটা শেষ করলেন না।

রিখিয়া সোমেনের দিকে চেয়ে বলল, মা তো ঘুমিয়েছে। আপনি এ-ঘরে এসে বসুন।

কুকুরের ওপরে আদুরে পা রেখে ভদ্রলোক বসে থাকলেন অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাশে। ফিরেও দেখলেন না, সোমেন আর রিখিয়া কোথায় গেল। কিন্তু এই প্রথম সোমেনের কষ্ট হল লোকটার জন্য। মনে হল, সংসার থেকে লোকটা খুব বেশি কিছু পায়নি। ছেলে বিলেতে, স্ত্রী শয্যাশায়ী, মেয়ে আমল দেয় না। টাকা ছাড়া ওই লোকটার আছে কী? টাকা আর একা। আর বোধহয় আদর করার জন্য একটা অন্ধ কুকুর।

রিখিয়ার বসবার ঘরে উজ্জ্বল আলো। টক টক করছে লাল উলের মস্ত পাপোশ। উজ্জ্বল আলোয় এসেই সোমেনের লজ্জা করছিল। বলল, আমি আজ যাই—

ও মা! কেন?

রাত হয়ে গেছে।

ইস্। কী লক্ষ্মী ছেলে! রাত আটটায় রোজ বাড়ি ফেরা হয় বুঝি!

তা নয়। তোমাদেরও অসুবিধে।

সেটা আমরা বুঝব। বসুন।

আসলে সোমেনের কেমন এক রকম হচ্ছে। এ মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাবে, আজ বাদে কাল যে-

কোনও দিন। প্রথমদিন যেমন এক রকমের ভালবাসা বোধ করেছিল, আজ তেমনি একটা হতাশা মাখানো হিংসে হচ্ছে কেবল। মন বলছে, কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড।

আজও একই জায়গায় পড়ে আছে অবহেলাভরে সেই পেনট্যাক্স ক্যামেরা। আজ শুধু লেনসের ওপর ঠুলি পরানো।

রিখিয়া হঠাৎ বলে, বাবা একটু ওইরকম।

সোমেন অবাক হয়ে বলে, কীরকম?

সন্ধের পর—বলে কথাটা শেষ করল না রিখিয়া। আবার বলল, দাদার জন্যই।

মুখোমুখি বসল রিখিয়া। চুমকির শাড়ি আলো পেয়ে এখন আগুন হয়ে ঝলসাচ্ছে। মুখে আজ কিছু প্রসাধন। খোঁপাটা দোকানে বাঁধা, দেখলেই বোঝা যায়। চওড়া ব্যান্ডে বাঁধা বড় ঘড়ি বাঁ হাতে। হাতের তেলোয় একটু বুঝি মেহেদির রং। কী জীবন্ত চোখ। সোমেন চোখ সরিয়ে নেয়। মেয়েদের চোখের দিকে সে এখনও তেমন করে চাইতে শেখেনি।

যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ ওই কুকুরটাকে নিয়ে থাকে।

সোমেন বুঝতে না পেরে বলে, কে? বলেই বুঝতে পারে, রিখিয়া তার বাবার কথা বলছে। মুখটা কিছু ভারাক্রান্ত রিখিয়ার।

সোমেন টপ করে বলে, তুমি কী নিয়ে থাকো সারাদিন? ক্যামেরা?

রিখিয়া বিষণ্ণতা থেকে নিজেকে তুলে আনে। একটু হেসে বলে, হ্যাঁ। খুব ছবি তুলি।

পারো?

ও মা! পারব না কেন?

ও-সব ক্যামেরায় তো অনেক গ্যাজেট থাকে।

খুব সোজা। বলে রিখিয়া লাফিয়ে উঠে বলে, দাঁড়ান, আপনার একটা তুলে রাখি। ফ্ল্যাশটা চার্জ করতে দিয়েছি প্লাগে। আনছি।

রিখিয়া চলে যেতে ফাঁকা ঘরে এতক্ষণে যেন একটু হাঁফ ছাড়ে সোমেন। বুকটা কাঁপছিল ভীষণ। শ্বাস টানতেই একটা সুগন্ধ পেল। রিখিয়া ফেলে গেছে তার গায়ের ঘ্রাণ। এই গন্ধটুকু কি চিরকাল থেকে যাবে সোমেনের জীবনে, যেমন থেকে যাবে অণিমার সেই চুম্বনের স্মৃতি?

॥ বত্রিশ ॥

একা ঘরে সোমেন বসে আছে। এ ঘরে এয়ারকুলার নেই, মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। বাতাসে শিস টানার শব্দ। ওই শব্দটুকু ছাড়া সারা বাড়িটা নিস্তব্ধতায় ডুবে আছে। কেবল ঘুরে যাচ্ছে পাখা। অক্লান্ত যান্ত্রিক।

শৈলীমাসির ঘরের দরজাটা আটকানো। দরজা খোলা থাকলে ঠান্ডাভাব বেরিয়ে যাবে বলে দরজায় যন্ত্র লাগানো আছে। আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। ওই ঠান্ডা ঘরে শুয়ে আছে শৈলীমাসি, পাশে বশংবদ স্বামী। এই সময়টায় লোকটা একটু নেশা করে নিশ্চয়ই, মুখে কেমন ভ্যাবলা ভাব, রিখিয়ার বাবা বা শৈলীমাসির স্বামী বলে মোটেই মনে হয় না। এদের চেয়ে অনেক ভোঁতা চেহারা। লোকটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না সোমেন। এত টাকার ওপরে বসে আছে, তবু কেমন লক্ষ্মীছাড়া চেহারা। শোকাতাপা, সংসারে যেন কেউ নেই। অভিমানী কি! তার বাবা ব্রজগোপালও অভিমানী।

বন্ধ দরজাটায় নখের আঁচড় আর কুঁই কুঁই একটা শব্দ আসছে। পাল্লাটা খুব হালকা নয়। সোমেন তাকিয়ে থাকে। দরজাটা দুলছে অল্প। নখে আঁচড়াচ্ছে কুকুরটা। দরজাটা ঠেলে আসবার চেষ্টা

করছে। দরজাটা খুলে কুকুরটাকে আসতে দেবে কি না ভাবছিল সোমেন। তার দরকার হল না। কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে দরজাটার দুলুনি বাড়িয়ে পাল্লার একটু ফাঁক দিয়ে ঘষটে কুকুরটা এ ঘরে এল। একটু ধীর গতি, সাবধানী। ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। কান দুটো খাড়া হয়ে আছে, ঘ্রাণ সজাগ, মুখ ওপর দিকে তুলে কিছু বুঝবার চেষ্টা করছে। কী যেন টের পেয়েছে! চেনা ঘরে অচেনা মানুষের গন্ধ। সোমেন একটু ভয় খায়। কামড়াবে না তো! অন্ধ মানুষেরা বড় ভাল লোক হয়। আজ পর্যন্ত কোনও অন্ধ মানুষকে খারাপ লোক হতে দেখেনি সোমেন। যত অন্ধকে সে দেখেছে তারা সবাই ভদ্র, বিনয়ী, নরম ও সহনশীল মানুষ। চোখ থাকলে তারা কে কীরকম হত, বলা শক্ত। কিন্তু অন্ধ হলে মানুষের মধ্যে ওই গুণগুলো জন্ম নেয় বোধহয়। এই অন্ধ কুকুরটার মধ্যে সেই নিয়ম অনুসারেই হয়তো হিংস্রতা নেই।

জীবনে আর কোনও অন্ধ কুকুর দেখেনি সোমেন। দুটি চোখে গভীর ক্ষতচিহ্ন। চোখে জল গড়িয়ে পড়বার দাগ। যখন ছোট ছিল তখন কোনও নিষ্ঠুর ছেলে ওর চোখ দুটো গেলে দিয়েছে বোধহয়। তাই হবে, নইলে কুকুর কখনও অন্ধ হয় না তো!

সোমেন সাবধানে ডাকে, আ—তু—

বনগাঁর ক্যাম্পে তারা কিছুকাল ছিল। বাবা তখনও চাকরি পাননি। সে-সময়ে সংসারে নির্মম অভাব ছিল, কিন্তু ছেলেবেলাটা এমন যে কিছুই গায়ে লাগে না। নতুন পৃথিবীর শব্দ গন্ধ বর্ণ সব দুঃখ ভুলিয়ে রাখে। কষ্টে ভাত জুটত তখন। তবু সেই ভাতের শেষ গ্রাসটা কখনও খায়নি সোমেন। মুঠ করে নিয়ে দৌড়ে ঘাটলার দিকে যেতে যেতে হাঁক পাড়ত, আ—তু—। কোথাও কিছু নেই, সেই ডাকের জাদুতে ঠিক আঁদাড়-পাঁদাড় ভেঙে কচুবন মাড়িয়ে ভাঙা বেড়ার ফোকর দিয়ে দুটো দিশি কুকুর ছুটে আসত। খাড়া কান, ল্যাজ নড়ছে, চোখে নিবিড় লোভ।

এ কুকুরটা তেমন নয়। লোভ নেই। কিন্তু ডাক শুনে ল্যাজ নাড়ল প্রবলভাবে। এক পা দু'পা করে কাছে আসতে থাকে। আসে ঠিক, ভুল দিকে যায় না। মাটি শুঁকে শুঁকে এসে মুখ তোলে কোলের কাছে। খুব আদরখেকো কুকুর। তেজ-টেজ নেই। সোমেন ওর মাথায় হাত রাখতেই 'কুঁ কুঁ' একটা শব্দ গলায় তুলে আদুরে ভাবে ভেজা নাকটা সোমেনের হাতে ঘষে দেয়, পায়ের কাছে বসে মুখটা তুলে রাখে ওপরে। সোমেন আর-এক বার মাথায় হাত দিতেই কুকুরটা চিত হয়ে শুয়ে পিছনের ঠ্যাং ছড়িয়ে দেয়, সামনের পা দুটো বুকের ওপর নুলো করে রেখে ঘাড় কাত করে শরীর ছেড়ে দেয়। এই হল ওর আদর খাওয়ার ভঙ্গি। সবই ঠিক আছে, কেবল চোখ দুটো নেই। তবু সবই বুঝি টের পায়। সোমেন নিচু হয়ে ওর গলার কোমল কম্বলে আঙুল দিয়ে খানিক আদর করল, তারপর বলল, যাঃ।

কুকুরটা গেল না। পায়ের ওপরে মাথা ঘষছে। বিরক্তি। সোমেন উঠে অন্য চেয়ারে গিয়ে বসে। কুকুরটা টের পায় ঠিক। গন্ধে গন্ধে কাছে আসে ফের। আদুরে শব্দ করে ভিখিরির মতো মুখ তুলে থাকে। সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে, জানিস না তো, আমি এ বাড়ির কেউ নই, হতে পারতাম—

আচমকা কথা ফাঁকা ঘরে বলে ফেলেই চার দিকে চায় সোমেন। কেউ নেই। সোমেন কুকুরটার কাছ থেকে সরে বসে। ফের কাছে আসে কুকুরটা। জ্বালাতন।

বাইরের দিকে একটা ঝুলবারান্দা, অন্ধকার মতো। সোমেন সেখানে এসে দাঁড়ায়। হাতের নাগালে একটা নিবিড় আমগাছ। বৌলে ছেয়ে আছে। মাতলা গন্ধ। গাছ থেকে আধোঘুমে পাখিপক্ষীর ডানার শব্দ আসে। বাতাস বয়ে যাচ্ছে সাপের মতো হিলহিল করে। তার পায়ে নাক ঠেকিয়ে প্রণাম করে কুকুরটা উর্ধ্বমুখে প্রত্যাশায় লেজ নাড়ে।

সোমেন শ্বাস ছাড়ে। বলে, পেয়ে বসলি যে!

অন্ধদের নিয়ে তোলা একটা ডকুমেন্টারি ছবিতে সে দেখেছিল, অন্ধ মানুষকে রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে চলেছে পোষা কুকুর। ট্রাফিকের আলো দেখে থামছে, গাড়িঘোড়ার ব্যস্ত রাস্তা পার করে দিচ্ছে সাবধানে। আর এ কুকুরটা নিজেই অন্ধ।

হঠাৎ সোমেন নিচু হয়ে ওর গলার বকলশটা ধরল। তারপর চোখ বুজে থেকে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, দেখি কেমন পারিস! চল।

কুকুরটা কী বুঝল কে জানে। কিন্তু হঠাৎ শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠল। লেজ নাড়ছে, প্রবল কুঁই কুঁই শব্দ করছে। কিন্তু আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগল সোমেনকে। সোমেন চোখ খুলল না, কুঁজো হয়ে কুকুরটার টানে টানে হাঁটতে লাগল। যে-ঘরে সোমেন বসে ছিল সে-ঘরে নয়, করিডোর দিয়ে অন্য কোনও ঘরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কোথায়। রিখিয়ার ঘরে?

অচেনা বাড়ি। খেলাটা বিপজ্জনক। তবু চোখ খোলে না সোমেন। দেখা যাক না!

ও কী! বলে চেঁচিয়ে উঠল রিখিয়া। আর সেই মুহূর্তেই ঝলসে উঠল ফ্ল্যাশগান-এর আলো।

চমকে সোমেন চোখ খোলে। রিখিয়ার ঘরের দরজায় সে দাঁড়িয়ে। অপ্রস্তুত অবস্থা। ভিতরে রিখিয়া, ঘরের ঠিক মাঝখানে। অবাক চোখ, হাতে ক্যামেরা।

সোমেন বলে, কুকুরটার কাছে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম।

রিখিয়া ভ্রূ কুঁচকে বলে, কেন? ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখ তো রয়েছে।

এমনি।

এমনি না। মাথায় ছিট। যা চমকে গিয়েছিলাম না! বলে রিখিয়া হাসে। স্নিগ্ধ এক রকমের রাগহীন হাসি। বলে, কম্পোজিশনটা কিন্তু দারুণ হয়েছিল। প্রিন্ট করি, দেখবেন।

ছবি তুললে?

হুঁ। দাঁড়ান, আর-একটা তুলি।

এ ঘরে?

হুঁ। বলে অন্যমনস্ক রিখিয়া তার ক্যামেরায় মুখ নিচু করে কী-সব কলকব্জা নাড়াচাড়া করে।

তখন সোমেন মনে মনে বলে, তোমার শোওয়ার ঘরে আমার ছবি উঠবে? তা কি ভাল হয় রিখিয়া? ছবি তো দলিল হয়ে থাকবে। চিরকালের জন্য। সে ভাল নয়। আমি তো আসিনি তোমার ঘরে, কুকুরটা নিয়ে এসেছে। কেন, কে জানে!

ক্যামেরা ঠিক করতে করতে রিখিয়া বলে, বোকা লোকেরা ক্যামেরা দেখলেই কেমন ক্যাবলা হয়ে যায়। অমন চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন দরজায়? ওই বুককেসটার উপর হাতের ভর রেখে দাঁড়ান। পিছনে পরদা, পাশে ফুলদানি, ফ্রেমটা দারুণ হবে।

সম্পূর্ণ ক্যামেরামগ্ন চোখে চেয়ে রিখিয়া কপালের ওপর থেকে চুলের ঘুরলি সরিয়ে ভিউফাইন্ডারে চোখ রাখে।

আমার ছবি দিয়ে কী হবে? সোমেন তখন বলে। মনে মনে বলে, আমার ছবি রাখবে কেন? আমি কে?

কী আবার হবে! ছবি ভেজে খাব। রিখিয়া ঝাঁঝ দিয়ে বলে। আদুরে মেয়েদের এ-রকম রাগী স্বভাব হয় বটে। পরক্ষণেই রিখিয়া হেসে ফেলে বলে, আমি ভীষণ ছবি তুলি, সব জিনিসের। দাঁড়ান না!

ছেলেমানুষি এক রকমের অভিমান বুকে মেঘলা ঘনিয়ে তুলল সোমেনের। সে মাথা নেড়ে বলে, না। ছবি নয়।

কেন?

আমার ছবি ভাল ওঠে না।

আচ্ছা দেখবেন, আমি কীরকম ভাল তুলে দিই!

সোমেন মাথা নাড়ল। আমি কি শুধু ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখবার! আমি কি কেবলই ছবি! শুধু পটে লিখা। আর কিছু নই! রিখিয়া! সোমেন মুখ ফিরিয়ে নিল।

সেই মুখ-ফেরানো অভিমানী মুখের ভঙ্গিমা দেখে রিখিয়ার ক্যামেরাটা আর-এক বার চমকায়। একটু হাসে রিখিয়া। বলে, রাগী বোকা মুখ তুলে রাখলাম।

সোমেন রাগে মুখ ফিরিয়ে বলে, তুমি বড় পাকা মেয়ে।

রিখিয়া রাগে না। ক্যামেরাটা তার বিছানায় ছুড়ে ফেলে দেয়। অবশ্য ক্যামেরাটা চোট পায় না। ফোম রবারের গদির বিছানায় নিঃশব্দে লাফিয়ে উঠে কাত হয়ে থাকে। মস্ত একটা নিথর চোখ চেয়ে থাকে সোমেনের দিকে।

রিখিয়া মৃদু হেসে বলে, পাকাই তো। সবাই বলে।

সোমেন কী করবে বুঝতে পারে না।

রিখিয়া তখন বলে, বসুন। চা আসছে।

এ ঘরে?

রিখিয়া অবাক হয়ে বলে, বারবার এ ঘরে এ ঘরে করছেন কেন? এ-ঘরটা আমার, অন্য কারও নয়। বসুন। বিছানাতেই বসুন।

এটা রিখিয়ার শোওয়ার ঘর। এ কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারে না সোমেন।

শোওয়ার ঘরে কেউ বাইরের উটকো লোককে বসতে বলে! আপনজন হলে অন্য কথা। সোমেন মুখ-ফেরানো অবস্থাতেই বলে। বুকে অকারণ অভিমান।

রিখিয়া অধৈর্যের গলায় বলে, বাব্বাঃ, আমার অত শুচিবায়ু নেই।

থাকা ভাল। সোমেন জ্যাঠামশাইয়ের মতো মাতব্বরি গলায় বলে, বিয়ে হচ্ছে, এখন বালিকাবুদ্ধি থাকা ভাল নয়।

কার বিয়ে হচ্ছে? বলে রিখিয়া ভ্রূ কোঁচকায়।

করিডোর দিয়ে বসার ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে সোমেন। তার পায়ের শব্দ শুনে আসে কুকুরটা, পিছনে রিখিয়া।

সোমেন মুখ না-ফিরিয়ে বলে, সব শুনেছি।

কী? রিখিয়ার প্রশ্ন আসে।

বিয়ে ঠিক হওয়ার কথা।

ও! বলে রিখিয়া চুপ করে যায়।

সোমেন ফিরে তাকিয়ে বলে, খুব ভাল খবর।

রিখিয়ার মুখটা ঝুলে পড়ছে। কিছু রাগে, কিছু বুঝি অপমানে।

বসবার ঘরে এসে বলল, বসুন। চা আসছে।

ক্যামেরাটা কুড়িয়ে এনেছে। রাগ দেখানোর জন্যই শব্দ করে বুককেসের ওপর রাখল। মুখোমুখি বসল। গলায় হারের লকেটটা তুলে দুই ঠোঁট চেপে ধরল। অন্যমনস্ক।

কিছু বলার নেই। সোমেন ভাবল, বিয়ের কথা শুনে খুশি হয়নি রিখিয়া। কথাটা ঘোরানোর জন্য সোমেন বলে, আমার ছবি সত্যিই ভাল ওঠে না, বুঝলে রিখিয়া!

ওঠে না-ই তো।

রাগের কথা। সোমেন হাসল। কিছু বলার নেই, তাই বলল, ভাল ক্যামেরায় ছবি তোলা খুব শক্ত। তুমি তোলো কী করে?

এক চটকায় উত্তর দিল না। অন্যমনস্ক মুখটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল। আচমকা একটু হাসল সে। বোঝা গেল, ক্যামেরা ওর ভীষণ প্রিয়। বলল, ডেভেলপ আর প্রিন্ট করা আরও শক্ত। আমি সব নিজে করি। আমাদের ডার্করুম আছে।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে কখন যেন চুমকি বসানো শাড়িটা ছেড়ে একটা গাঢ় কালচে লাল শাড়ি পরেছে সে। শাড়ি পালটানোর সময়ে ভাগ্যিস গিয়ে হাজির হয়নি সোমেন। ব্যাপারটা ভাবতেই লজ্জা করছিল তার। লাল শাড়িটাতেও কেমন মানিয়েছে! একদম বালিকা বয়স, অহংকারে ডগোমগো মুখ, হাঁসের মতো গলা উঁচু করে বসে আছে কিশোরী-দেমাকে। তাকিয়ে থাকতে

ইচ্ছে করে, বুকের ভিতরে মায়া জন্মায়।

সোমেন অবাক হওয়ার ভান করে বলে, তাই নাকি! এইটুকু বয়সে!

রিখিয়া লকেটটা দাঁতে চেপে রেখেছিল। ছেড়ে দিয়ে বলল, বয়স কী কম! লকেটটা গড়িয়ে পড়ল ওর বুকের ওপর, ঢাকা দুটি কোমল স্তনের মাঝখানে।

সোমেন চোখ তুলে নেয়। বলে, এ-রকম আর কী কী জানো তুমি? গাড়ি চালাতে?

ওমা! সোজা। অবশ্য লাইসেন্স নেই। ময়দানে গিয়ে চালাই। স্কুটারও পারি। বলে হাসল।

সোমেন সিগারেট ধরাল। কত কী জানো তুমি! আমি কিচ্ছু পারি না। ভারী লজ্জার কথা। তুমি এত জানো কেন? প্রিসিসন ক্যামেরায় অঙ্ক কষে ছবি তোলো, বড় গাড়ি চালাও, স্কুটার জানো। বড় পাকা মেয়ে। দূর, তোমার সঙ্গে আমাকে মানাত না।

কে বলেছে শুনি! রিখিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

সোমেন চমকে ওঠে। মনে মনে বলা কথা সব শুনতে পেল নাকি ও?

কে কী বলেছে? বোকার মতো জিজ্ঞেস করে সোমেন।

ওই কথাটা! রিখিয়া নিজের হাতের পাতার দিকে চেয়ে বলে।

সোমেন একটু হাসে। বলে, বিয়ের কথা তো?

তাই তো বলছিলেন।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে, বাজে লোক বলেনি। শৈলীমাসি।

রিখিয়া কথা বলল না।

ফরসা কাপড়পরা চাকর ট্রে রেখে যায়। অনেক খাবার। ভারী ভাল চায়ের গন্ধ। খেতে ইচ্ছে করছিল না সোমেনের। তার ভিতর অনেক রকম ভাবনা-চিন্তার চোরাস্রোত। খিদে মরে গেছে।

সোমেন চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বলে, তোমার বিয়ের দিন এসে খাবার খাব। আজ নয়।

রিখিয়া এক বকম ধমক-চোখে তাকায়। পরমুহূর্তে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, খুব খারাপ হচ্ছে কিন্তু।

হঠাৎ কী একটা আশা আকাঙ্ক্ষা মায়া ভালবাসা অন্ধের মতো নড়ে ওঠে সোমেনের মধ্যে। আবহাওয়ার বার্তায় যেমন বলে, বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ, ঝড় উঠবে।

সোমেনের চা চলকে যায়, একটুখানি, নামিয়ে রাখে কাপ।

বলে, আচ্ছা খাচ্ছি।

॥ তেত্রিশ ॥

কেমন এক অভিমানী মুখ নিয়ে বসে ছিল রিখিয়া। পায়ের কাছে কুকুর, আর বুককেসের ওপর সেই ঝকঝকে আসাহি পেন্টাক্স ক্যামেরা, কখন আবার কুড়িয়ে এনে রেখেছে। দৃশ্যটা ছবি হয়ে আছে। ওই অভিমানী ভঙ্গিতে এক ভিন্ন রকমের সৌন্দর্য ছিল। যেন ওই নতমুখ তুলে জলভারে আক্রান্ত তীব্র চোখে সোমেনকে দায়ী করে বলবে, কে বলল অন্য কোথাও আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে! তা কি হয়! তুমি বলো!

তা অবশ্য বলেনি রিখিয়া। কেন বলবে? সোমেনের ছেলেমানুষি মন কত কী ভেবে নেয়। এমনকী সোমেন বেশিক্ষণ তাকিয়েও থাকতে পারেনি ওই অভিমানী সুন্দর ভঙ্গির দিকে। মেয়েদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে তার ভয় করে। সেই অবশ্যম্ভাবী ভিটামিনের অভাব তার মধ্যে আজও। রাস্তায়-ঘাটে অনেক পুরুষকে দেখেছে সোমেন, যারা মেয়েছেলে দেখলেই আত্মহারা হয়ে যায়। চোখের পলক না ফেলে, চার দিককে ভুলে গিয়ে হাঁ করে দেখে। দেখতে দেখতে আত্মজ্ঞান,

চক্ষুলজ্জা, লোকভয় লুপ্ত হয়। তখন চিমটি কাটলেও টের পাবে না, অপমান করলেও গায়ে মাখবে না। মেয়েটা কী ভাবছে তাও ভেবে দেখে না। সোমেনের বন্ধু হেমন্তর সেবার চোখ খারাপ হল, তো অ্যাট্রোফিন চোখে দিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়ার সময়ে সোমেনকে সঙ্গে নিয়েছিল, পাছে আবছাচোখে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু দুর্ঘটনা একটা ছোট রকমের ঘটল ডাক্তারের চেম্বারেই। একটি অবাঙালি বিবাহিতা সুন্দরী তেজি মহিলা বসেছিলেন সেখানে। হেমন্তর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। অ্যাট্রোফিন দেওয়া চোখে এমন ডেলা পাকিয়ে চেয়ে রইল যে মহিলার ভারী অস্বস্তি। বাঙালি মেয়েরা সাধারণত এমন অবস্থায় ভ্রূ কোঁচকায়, বিরক্তির ভাব করে। কিন্তু সরাসরি কিছু করে না। কিন্তু এ মহিলার ধাত অন্য রকম। কিছুক্ষণ হেমন্তর তাকানোটা লক্ষ করে হঠাৎ উঠে তেড়ে এল—আপনি ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? লজ্জা নেই, বেশরম? ঘর-ভরতি লোকের সামনে কী যে বে-ইজ্জতি তা বলার নয়, হেমন্ত অবশ্য খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, আমার চোখে অ্যাট্রোফিন, কিছু দেখছি না। এ-কথা শুনে দু'-চারজন হাসতে থাকে, মহিলাও একটু থমকে যান। সেই ফাঁকে দুঃসাহসী হেমন্ত গলা একটু নিচু করে জোরালো শ্বাসধ্বনির শব্দে বলল, আপনি ভীষণ সুন্দর।

এ-সবই হচ্ছে ভিটামিনের কাজ। মেয়েদের দিকে তাকানো, চালাক-চতুর কথাবার্তা, সংকোচহীন মেলামেশা। সেখানে সোমেনের কিছু খাঁকতি আছে। নইলে কিশোরী রিখিয়ার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা যেত, প্রশ্ন করা যেত—তোমার বিয়ে কি সত্যিই ঠিক হয়ে নেই?

সে-প্রশ্ন করা হল না। রহস্য রয়ে গেল। বিয়ের কথায় কেন রেগে গিয়েছিল রিখিয়া? কেন ওই অভিমান? হয়তো তা টের পেয়েছিল অন্ধ কুকুরটা, দু' পায়ে কোলের ওপর শরীর তুলে মুখটা বাড়িয়ে শুনছিল রিখিয়ার কম্পিত শ্বাসের শব্দ। অস্পষ্ট সান্ত্বনার আওয়াজ করেছিল। অবোলা জীব, হয়তো বলতে চেয়েছিল— দুঃখ কোরো না রিখিয়ার মনের মতো বর আসবে। বুককেসের ওপর থেকে করুণ একটি চোখ মেলে ক্যামেরাটা দেখেছিল রিখিয়াকে। বলেছিল— কেঁদো না রিখিয়া, সব ছবি আমার তোলা রয়েছে। কোথায় পালাবে তোমার প্রেমিক। তাকে বন্দি করে এনে দেব তোমার কাছে।

তাই আবার অন্ধ কুকুরটার কথা মনে পড়ে সোমেনের। মনে পড়ে, আসাহি পেন্টাক্স ক্যামেরার একটিমাত্র চোখ। সে-ঘরে আর একটু বসে থাকতে পারত সোমেন, হাতে কোনও কাজ ছিল না, রিখিয়াদের বাড়ির কেউ কিছু মনে করত না, তেমন রাতও হয়ে যায়নি। তবু সোমেনের মনে হতে লাগল, সে বড় বেশিক্ষণ আছে এদের বাড়িতে। দৃষ্টিকটু হচ্ছে কিশোরী রিখিয়ার সঙ্গে এতক্ষণ বসে থাকা। এবার তার চলে যাওয়া উচিত। সে এমনও ভাবল—এরা বড়লোক, এদের বাড়িতে থাকা ভাল নয় বেশিক্ষণ।

শুকনো সন্দেশ জল দিয়ে গিলে ফেলে সোমেন, সন্দেশের তেমন কোনও স্বাদ পায় না সে। দামি চায়ে চুমুক দিয়ে তার মনে হল, ভারী বিস্বাদ। খাবার খাওয়ার শাস্তিটুকু ভোগ করে সে খুব ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে উঠে পড়ল। যেন খুব তাড়া আছে এমনভাবে বলে, চলি।

রিখিয়া নতমুখে চেয়ে একখানা আদবের হাত রেখেছে কুকুরটার মাথায়। অন্য হাতে মাথার একগুছি চুল টেনে এনে আঙুলে ঘুরলি পাকাচ্ছে। ভঙ্গিতে একটা আভিজাত্য ফুটে আছে। একটু অহংকারও। সোমেনের গলা শুনে চোখ তুলল।

সেই তাকানোতে কী ছিল কে জানে! কিন্তু সোমেন কত কী ভেবে নিল। ভাবল, বুঝি রিখিয়ার চোখে বিতৃষ্ণা, বিরক্তি। রিখিয়া তাকে বুঝি পছন্দ করে না।

রিখিয়া তার কিশোরীসুলভ উঁচু স্বরে বলল, সবাই জেনে গেছে, না?

কী?

বিয়ের কথা?

জানবে না কেন? ভাল খবর।

রিখিয়া আবার মাথা নত করে রইল। আর সোমেনের মনে হল, রিখিয়ার ভঙ্গিতে অবহেলা। উপেক্ষা। একটু দূরের মানুষ হয়ে যাওয়া।

সোমেন আবার বলল, চলি।

রিখিয়া মাথা নেড়ে বলে, আচ্ছা।

বলল না আবার আসবেন। একটু হতাশ হল সোমেন। ওটুকু অন্তত না বললে সোমেন আসে কী করে! যদি রিখিয়া ডাকত, তবে আসত কোনও দিন। না ডাকলে কি বড়লোকদের বাড়িতে আসা যায় ঘন ঘন?

ব্যস্ততার ভান করে নেমে এল সোমেন। আলোছায়াময় রাস্তায় পা দিয়ে দেখে, গ্রীষ্মের বিকেলে কলকাতার সুন্দর হাওয়াটি বয়ে যাচ্ছে। কী নিবিড় ঝিরঝির স্রোতস্বিনীর মতো শব্দ উঠেছে গাছে গাছে। অবিরল বয়ে চলেছে সেই ঘুমপাড়ানি শব্দ। দূর থেকে রিখিয়ার কুকুরটা এক বার ডাকল। পিয়ানোর মতো হর্নের শব্দ করে বিশাল এক গাড়ি সোমেনকে সতর্ক করে দিয়ে পাশ ঘেঁষে চলে যায়। চলন্ত গাড়ি থেকে রেডিয়োর গানের শব্দ এল। গাড়ির আলোয় দেয়ালের লিখনটি স্পষ্ট হল এক বার। তারপর মিলিয়ে গেল। প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড।

রাস্তায় এসে সোমেনের যেন আর সময় কাটে না। রাস্তা ফুরোয় না। রিখিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিলে যেন আর কোথাও যাওয়ার থাকে না।

বহুদিন বাদে অণিমাকে আবার দেখল সোমেন, নাটকের দিন, মুক্ত অঙ্গনে। অবশ্য দূর থেকে দেখা। একটা দৃশ্যে অল্পক্ষণের জন্য মঞ্চে এল অণিমা। বয়স্কা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় তার অল্পক্ষণের অভিনয়। এই দৃশ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করার জন্য মঞ্চে খুব মৃদু আলো। ঘোর সবুজ সেই ম্লান আলোয় অণিমাকে চেনাই যাচ্ছিল না। শুধু দেখা গেল সে একটা সাদা-খোলের শাড়ি পরেছে আর ডান দিকের মাথার চুলে একগুছি পাকা চুল। যে লোকটা চাঁদ গিলে ফেলেছিল তার কাছে কৈফিয়ত চাইছেন প্রধানমন্ত্রী, বিধিভঙ্গের দায়ে দায়ী করছেন।

মঞ্চে সেই আবছায়া মূর্তির দিকে চেয়ে নিথর হয়ে থাকে সোমেন। বুকের মধ্যে একটা কেমন কষ্ট হয়। প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে আবির্ভাবমাত্র দর্শকরা হাততালি দিচ্ছিল। যদিও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নন, তাঁর ভূমিকায় অন্যজন। তবু জনগণ খুশি, এটা বোঝা গেল। সোমেন প্রধানমন্ত্রীকে দেখছিল না। দেখছিল অণিমাকে।

পাশে বসে ম্যাক্স দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলে, সোমেন, কোনও দেশেই প্রধানমন্ত্রীরা এত ইম্পর্ট্যান্ট নন।

সোমেন ঘাড়টা নাড়ল কেবল।

ম্যাক্স ভারী হতাশ গলায় মৃদুস্বরে স্বগতোক্তির মতো বলে, নিউজপেপার খুলেই হেডিং দেখি, প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী এ রকম উপদেশ দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়েছেন বা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রেডিয়ো খুলেই নিউজ-এ শুনি, দি প্রাইমমিনিস্টার হ্যাজ স্টেটেড দ্যাট...। তোমরা এত প্রধানমন্ত্রীর ভক্ত কেন?

সোমেন কী উত্তর দেবে? এক বার আবছায়ায় ম্যাক্সের মুখটা দেখল। মুখে একটু কৌতুক। সোমেন বলল, আমরা ওইরকম।

ম্যাক্স মাথা নেড়ে বলল, আইডোল্যাট্রি! আমি তোমাদের দুর্গাপুজো, কালীপুজো, গণেশপুজো সব দেখেছি। কিন্তু তোমাদের গ্রেটেস্ট গড হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী। অল অ্যালং তোমরা তোমাদের সব প্রধানমন্ত্রীকে সবচেয়ে বেশি পুজো করে এসেছ। বাচ্চারা যেমন মা-বাবা ছাড়া কিছু বোঝে না, তোমরা সে-রকম প্রধানমন্ত্রী বোঝো। হোয়াই?

পিছন থেকে কে যেন বলল, আস্তে।

ম্যাক্স চুপ করে আবার নখ খুঁটতে থাকে দাঁতে। তাঁর মুখে ভ্রূকুটি চোখে নীলচে ফসফরাস জ্বলছে।

সোমেনের ডান পাশে কয়েকজন অচেনা লোক, তার ও-পাশে পূর্বা বসেছিল আর দুটি মেয়ের সঙ্গে। সারাক্ষণ নিচু স্বরে বক বক করছিল আর হাসছিল। ওদের আশপাশের লোক বিরক্ত। নাটকের মাঝামাঝি হঠাৎ উঠে এসে সোমেনের পাশের লোকটাকে কী বলল। লোকটা উঠে গেল পূর্বার জায়গায়। পূর্বা সোমেনের পাশে বসেই হাসতে থাকে, বুঝতে পারছিস?

সোমেন মুখটায় বিরক্তভাব করে বলে, জ্বালাতে এলি।

আহা, আমি বুঝি সব সময়ে জ্বালাই।

জ্বালাস না? সেবার লাইটহাউস থেকে তোর জন্য উঠে আসতে হয়েছিল মাঝপথে, মনে নেই?

আহা। সে তো ড্রাকুলার ছবি দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করেছিলাম বলে!

ব্যাপারটা একই। হয় ভয় পাবি, নয়তো হাসবি, না হলে কেবল বক বক করবি। চুপ করে থাকতে পারিস না কেন?

পেট ফুলে ওঠে যে! দু'-তিন ঘণ্টা চুপ করে থাকা সোজা কথা?

পিছন থেকে কে আবার বলে, আস্তে। একটু আস্তে হোক।

সোমেন পূর্বার দিকে চেয়ে বলে, ওই শোন।

পূর্বা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসতে থাকে। সোমেন চাপা স্বরে বলে, পেট ফুলে উঠলে অ্যান্টাসিড খাস।

পূর্বা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মঞ্চের এক দিকে অন্ধকার, অন্য দিকে আলো। আলোতে নায়িকার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে অপালা। অন্ধকারে আবছা দেখা যাচ্ছে মিহির বোসকে, সে নায়ক। নায়িকা দায়ী করছে নায়ককে, পৃথিবী থেকে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস জ্যোৎস্নাকে হরণ করার জন্য। বলছে, সে নাকি আত্মহত্যা করবে। কারণ জ্যোৎস্নার অভাবে তার ভিতরকার ভালবাসা মরে যাচ্ছে।

পূর্বা হঠাৎ চাপা স্বরে বলল, পিছনের লোকটা কী বলছিল রে? আস্তে, একটু আস্তে হোক। কী হওয়ার কথা বলছিল?

জিজ্ঞেস করে আসব?

ধ্যুৎ। তুই বুঝি জানিস না?

অন্ধকারেই সোমেন পূর্বার দিকে একটু তাকায়। বলে, খুব পেকেছ খুকি!

মঞ্চে হঠাৎ ম্যাকবেথ নাটকের একটা সংলাপের অনুকরণে হাহাকার করে ওঠে অপালার তীব্র গলা—তুমি চাঁদকে হত্যা করেছ, তাই তুমি কোনও দিন কারও ভালবাসা পাবে না।

অন্ধকারে মঞ্চের অন্য ধারে মিহির বোস এ-কথা শুনে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, ভালবাসা! ভালবাসা নিয়ে কী হবে। আমার গলায় মহামূল্য চাঁদ। কে ভালবাসা চায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী-সমস্যা ম্যাক্সের এখনও মেটেনি। সে আবার তার নীল ফসফরাস জ্বালা চোখে চেয়ে বলল, অল অফ ইউ আর ইটিং আউট অফ পি-এম'স হ্যান্ড, ইজনট ইট? ভারতে যদি পি-এম না থাকে কোনও দিন, তা হলে তোমাদের কী হবে সোমেন?

ডান কানে ঝুঁকে পূর্বা তখন বলল, পেকেছিই তো। বড়দের দেখে ছোটরা শেখে। তোমাদের সব ব্যাপার-স্যাপার জানি মশাই।

গুল। পূর্বা কিছু জানে না। জানলে কেঁদে ভাসাত। তবু একটু চমকে ওঠে সোমেন, মঞ্চে নায়িকার ভালবাসার সংকট, বাঁ পাশে ম্যাক্সের প্রধানমন্ত্রী-ধাঁধা থেকে সরে এসে সে পূর্বার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, কী জানিস?

পূর্বা ঠ্যাং নাচিয়ে নিরুদ্বেগ মুখে বলে, এভরিথিং।

সোমেনের বিশ্বাস হয় না। অণিমা যেদিন তাকে চুমু খায় সেদিন ঘরটা অন্ধকার ছিল এবং কেউ তাদের অনুসরণ করেনি। তবু বুকটা কেঁপে ওঠে। দরজাটা বন্ধ করেনি অণিমা, সে কি ইচ্ছে করে?

সোমেন প্রসঙ্গটা পাশে সরিয়ে হঠাৎ বলল, আমরা বুঝি তোর চেয়ে বয়সে বড়! আর তোমার বুঝি এখনও দাঁত ওঠেনি!

পূর্বার ঠ্যাং নাচানো বন্ধ হয়, চোখ ফিরিয়ে সোমেনের দিকে চেয়ে বলে, কে বলেছে আমি ছোট?

এই যে বললি বড়দের দেখে ছোটরা শেখে! তুই কি ছোট?

পূর্বা সঙ্গে সঙ্গে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, কখন বললাম! এ মা! যাঃ!

বলেছিস।

একটা হাত কাঁধে এসে পড়ে পিছন থেকে, একটা স্বর বলে, দাদা, কাইন্ডলি একটু আস্তে।

একটা চিনেবাদামের খোলা ভাঙার শব্দ হয়, কাছেই। আর তখনই হঠাৎ অপালা মঞ্চ থেকে চেঁচিয়ে বলে, হায় চাঁদ! হায় প্রেম!

মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারে টানাটানি করে কারা পরবর্তী দৃশ্যের দৃশ্যপট সাজাচ্ছে।

পূর্বা হঠাৎ মনে-পড়ায় ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, বলেছি তো, কিন্তু সে তুই আমাকে খুকি বলেছিস বলে।

ও। সোমেন উদাস গলায় বলে।

রাগ করলি? পূর্বা অন্ধকারেই চেয়ে থাকে তার দিকে।

না।

করেছিস। মাইরি, রাগ করিস না। জানিস তো, কেউ আমার ওপর রাগ করলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়।

করিনি।

তৃতীয় দৃশ্যের মাঝ বরাবর সোমেন বেরিয়ে এল।

গ্রিনরুমের গলিতে ঢুকেই চমকে ওঠে সোমেন। অণিমা দাঁড়িয়ে আছে। চুলে এখনও সাদা মেক-আপ লেগে আছে। সাদা খোলের শাড়িটাও পরনে। দিল্লির জলহাওয়ায় শরীরে একটা ঢল এসেছে। এত শ্রী ওর আগে কখনও দেখেনি সোমেন। রং-ও বোধহয় ফরসা হয়েছে, মেক-আপের জন্য ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

চোখে চোখ পড়তেই মুখটা কেমন অপরাধী লজ্জায় মাখা হয়ে গেল অণিমার। চোখটা নামিয়ে নিয়ে আবার তুলল। ভারী চশমার ভিতরে ওর চোখ বরাবরই ছোট দেখাত। সে-চোখদুটির দিকে অনেকবার অলস মন নিয়ে তাকিয়ে দেখেছে সোমেন। আজকের দেখার মধ্যে একটু অনুসন্ধিৎসা ছিল। ছিল রহস্যমোচন।

ভারী মিষ্টি একটা লাজুক হাসি হাসল অণিমা। অণিমার সর্বাঙ্গে আর কোথাও এতটুকু ইয়ারকির ভাব নেই। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, চলে যাচ্ছ?

সোমেন থমকে বলল, তুমিও যাবে নাকি!

অণিমা তার চোখে চোখ না-রেখে একটু অপ্রস্তুত হেসে বলল, কী করে যাই! এই দৃশ্যেও পার্ট রয়েছে। শেষটা দেখে যাবে না?

সোমেন একটু হেসে বলে, তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছি। গাব্বুর টার্মিনাল, এক বার যাব বলেছিলাম। আর বেশি দেরি করলে রাত হয়ে যাবে।

ও! ভারী নরম বিস্ময় প্রকাশ করে অণিমা।

কবে ফিরেছ?

এই তো ক'দিন।

খুব বেড়ালে?

উঁ! বলে একটু চুপ করে থাকে অণিমা, তারপর আস্তে দু'দিকে মাথা নেড়ে বলে, না। বেড়াইনি

খুব একটা। ভাল লাগত না। ঘরে বসে থাকতাম। রেকর্ড শুনতাম।

তবে গেলে কেন?

অণিমা তেমনি সুন্দর হেসে মৃদু গলায় বলল, বিয়ের আগে শরীর সারাতে।

সোমেন সিগারেট ধরিয়ে বলে, তোমার শরীর সেরেছে অণিমা।

অণিমা লজ্জা পেল। মুখ নামিয়ে নিল।

তারপর বলল, কিন্তু তুমি রোগা হয়ে গেছ সোমেন। কেন?

কী জানি! সোমেন উত্তর দিল।

ভিতর থেকে কে এসে ডাকল, অণিমা!

যাচ্ছি। অণিমা তাকে বলল। তারপর সোমেনের দিকে চেয়ে বলল, যাই সোমেন।

আচ্ছা। বলে হাসে সোমেন, দেখা হবে, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী!

অণিমা মৃদু হাসল। কী লাজুক, সুন্দর হাসি। সেই ইয়ারবাজ মেয়েটার চিহ্নও আর নেই ওর কোথাও।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা শেষ করল সোমেন। হাঁটতে হাঁটতে আজও যেন আবার সোমেনের রাস্তা ফুরোয় না। সময় কাটে না।

একটা লাইন আজকাল প্রায়ই অকারণে মনে পড়ে সোমেনের। প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড।

রিখিয়াদের দেয়ালে কে এই লাইনটা লিখেছিল কে জানে! যে লিখেছিল সে কি বেঁচে আছে! না কি মুক্তি সংগ্রামের হাওয়ায় ছেঁড়া পোস্টারের কাগজের মতো উড়ে গেছে দুনিয়া ছেড়ে! ওই স্লোগান এখন কেউ আর লক্ষও করে না দেয়ালটায়। কিন্তু লাইনটা বড় আশ্চর্যভাবে বেঁচে থাকে সোমেনের মধ্যে। অকারণে মনে পড়ে। চার দিকে গতিময়, ক্ষিপ্র কলকাতা বয়ে যায়। কর্মহীন সোমেনের অলসভাবে চলতে-ফিরতে হঠাৎ ওই লাইনটা মনে পড়ে যায়।

জীবনের সুখী সুন্দর দিনগুলি বুঝি শেষ হয়ে এল!

॥ চৌত্রিশ ॥

ব্যাঙ্কের লকারের জন্য বহুদিন আগে দরখাস্ত করে রেখেছিল রণেন। তিন-চারটে ব্যাঙ্কে। আজ ব্র্যাবোর্ন রোডের একটা ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানল, বীণা লাহিড়ীর নামে একটা লকার পাওয়া যাবে সামনের মাসে। লকার নিয়ে আজকাল বড় কাড়াকাড়ি। সকলেরই কিছু না কিছু লুকোনো টাকা, সোনাদানা বা গয়নাগাটি আছে।

আজ শনিবার। অফিসে কাজ ছিল না। একটা ইনস্পেকশন রিপোর্ট দিয়ে আসবার সময়ে বুড়ো রামসদয় ঘোষকে খবরটা দিল। ফাঁকা অফিস। সবাই চলে গেছে। কেবল ঘোষ বসে বসে একটা আন-অফিশিয়াল অঙ্ক কষছিল। মুখ তুলে বলল, ছেলেটা কাল রাতে টেস্টপেপার থেকে অঙ্কটা কষতে গিয়ে পারেনি। তাই আমি অফিসে নিয়ে এসেছি। কেউ পারল না, সবাইকে দেখিয়েছি। আমি সারাদিন ধরে বার দশেক করলাম।

ঘোষকে প্রায়ই এ-রকম অফিসে বসে অঙ্ক কষতে দেখেছে রণেন। ওটা ঘোষের নেশা। রণেন হেসে বলে, তাই বলুন। আমি ভাবছিলাম অফিসের কাজকর্ম।

নাঃ। অফিস আবার কী! এ বছরই রিটায়ারমেন্ট, ডিসেম্বরে। ত্রিশ বছর ঢের কাজ করেছি। এবার ছোট ছেলেটাকে দাঁড় করাতে পারলে নিজের কাজ হবে।

টেরিলিনের জামা-কাপড় পরলে বড় ঘাম হয়। এ গরমে সবচেয়ে আরামের হল ধুতি পাঞ্জাবি,

নয়তো সুতির জামা-কাপড়। বীণা সে-সব পাট চুকিয়ে দিয়েছে। টেরিলিনের জন্যই পাখার তলায় বসেও রণেন ঘামে। একটা পাতলা ফাইল তুলে হাওয়া খেতে খেতে বলল, লকারটা পেয়ে গেছি।

লকার? ব্যাঙ্কের নাকি? বলে অঙ্কমনস্ক ঘোষ মাথা নাড়ে, সে তো বড়লোকি ব্যাপার।

মনে মনে রণেন বলে, তাই তো, সেটা বুঝতে দেরি হয় কেন রে শালা? মুখে বলল, না না। আজকাল যা চুরি-ছিনতাই গেরস্থরাও লকার রাখে। সেফ।

সেফ আবার কী! একটা চাবি তো ম্যানেজারের কাছে থাকে শুনেছি।

তা থাকে। তাও সেফ।

মাথা নেড়ে ঘোষ বলে, ধরুন, লকারে গিয়ে যদি একদিন দেখেন যে, টাকাপয়সা সোনাদানা সব হাওয়া, তখন কী হবে? ব্যাঙ্ক ক্ষতিপূরণ দেবে?

না, তেমন নিয়ম নেই।

তবে! সেফ আবার কী! চাবি যখন ওদের কাছে থাকে তখন একটা ডুপ্লিকেট করে রাখলে আটকাচ্ছে কে! দাবি-দাওয়া যখন চলবে না তখন সিকিউরিটি কী থাকল! তার ওপর পুলিশ এসে জোর করে খোলে আজকাল, সেও ফ্যাসাদ।

রণেন একটু দ্বিধায় পড়ে।

ঘোষ অঙ্কটা কষতে কষতে না-তাকিয়েই বলে, সবচেয়ে ভাল হল লোহার সিন্দুক। লকার কি বউমার নামে নিলেন নাকি?

হুঁ।

ভাল। স্ত্রী কৈবল্যদায়িনী। এ যুগটা বউদেরই যুগ। সবাই বউয়ের নামে সব করে। আমার বউটা বেঁচে থাকলে আমিও তার নামে কিছু না কিছু করতাম।

রণেন অবাক হয়ে বলে, কিছু করেননি?

কী করব? তিলজলায় খানিকটা জমি কিনেছিলাম বউয়ের তাগিদে, যেদিন ভিত পুজো সেদিনই সুট করে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেল। অলক্ষণ দেখে জমি বেচে দিই, আর কিছু করিনি।

রিটায়ারমেন্টের পর?

ছেলেরা আছে। তবে বল-ভরসা কেউ নয়। বড় দু'জন বিয়ে-শাদি করে বউ চিনেছে। ভরসা ছোটটা, তা এও বড় হয়ে হাতে হারিকেন ধরিয়ে দেবে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা তাই মুঠো করে বসে থাকব, সেই টাকার জোরে যা সেবাযত্ন পাই পাব। বুড়ো বয়েসে বউ না থাকলে ভারী মুশকিল। জোর খাটানো, রাগ দেখানোর মানুষ থাকে না। অথচ কেরানি-টেরানির তো এই বুড়ো বয়সটাই খিটকেল মেজাজের বয়স। তখন মনের মধ্যে নতুন রাগ-অভিমানের দাঁত গজায়, কিন্তু বউ না-থাকলে কামড়ানোর কিছু থাকে না। ভারী মুশকিল।

লকার পাওয়ার যে আনন্দটা ছিল তা যেন হঠাৎ নিবে গেল রণেনের। মানুষের মুশকিল, মানুষ মরণশীল। দূর ভবিষ্যতের একটা অচেনা, অজানা, একাকিত্বের ছবি ভেবে কেন যে শিউরে উঠল রণেন! হঠাৎ মনে হল, লকার-টকার এ-সব মিথ্যে প্রয়োজন। সিকিউরিটি কোথাও নেই।

উঠতে যাচ্ছিল, ঘোষ অঙ্কটা কষতে কষতেই বলল, বউয়ের নামে সর্বস্ব উচ্ছুগ্যু করবেন না, তাতে মাগিদের বড় তেল হয়। এদিক-ওদিক নিজের নামেও কিছু রাখবেন।

নিজের নামে? কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স...

ঘোষ মুখ না তুলেই বলে, ইনকাম ট্যাক্স, অ্যান্টি-করাপশান, আর বউ, এ তিনের মধ্যে বউ সবচেয়ে ডেঞ্জারাস। পুরুষমানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

রণেনের ঘেমো শরীরে গরম ফুঁড়ে একটা শীত এসে লাগে। কথাটা মনের মতো। সে বলল, আমার বউ...

ঘোষ কথাটা শেষ করতে দিল না, তেমনি ছোট ছেলের আঁক কষতে কষতে বলল, ও জানি।

সব্বার বউয়ের গল্পই একরকম। নারীরাই এখন লড়ছে ভাল। পুরুষসিংহের বড় অভাব।

রণেন উঠতে উঠতে বলে, কিন্তু লকারের ব্যাপারে একটা ভাবনায় ফেলে দিলেন ঘোষদা। এখন মনে হচ্ছে, লকার তেমন সেফ নয়।

ঘোষ হাসল। এই বয়সেও ভাল চেহারা, লম্বা—ফরসা। একহারা। চোখে-মুখে ভাল বংশ এবং বুদ্ধির ছাপ আছে। সেই সঙ্গে একটু ক্লান্তিও। লাল ঠোঁট চিরে একটু হাসল, বলল, মানুষকে ভয় দেখানোটা আমার হবি, যেমন হবি হচ্ছে ছেলের অঙ্ক কষা। ও-সব কিছু নয়। সবাই রাখছে, আপনিও রাখবেন। বউয়ের নামে যে এককাঁড়ি নিন্দেমন্দ করলাম সেও কি সব সত্যি? ভড়কে দেওয়ার জন্য বলি। এই যে অফিস ছুটির পর বসে অঙ্ক কষছি, বউ থাকলে পারতাম? বুড়োথুড়ো, কালো-কুচ্ছিত যাই হোক, বউ বেঁচে থাকলে ঠিকই সংসারের দিকে, বাসার দিকে একটা টান থাকত। ওই টানটুকুর জন্যই সংসারী, নইলে সব ব্যাটা সন্ন্যাসী।

ঘোষ আবার কিছুক্ষণ নীরবে অঙ্ক কষে। বিরক্তিকর। রণেন বুকের বোতাম খুলে গেঞ্জি ফাঁক করে ভিতরে হাওয়া ঢোকানোর চেষ্টা করে। বড্ড গরম।

ঘোষ বলে, কিন্তু মেয়েছেলেদের উলটো। বউ মরলে পুরুষে যেমন একাবোকা হয়ে যায় আমার মতো, মেয়েদের তা হয় না। বুক চাপড়ে কাঁদেটাঁদে প্রথমটায় ঠিকই, তারপর আবার হামলে সংসার করে, ছেলেপুলে, নাতি-নাতনি টানে। ভুলে-টুলে যায় তাড়াতাড়ি।

আজ উঠি।

বাজে বকছি, না? টাকা-পয়সা কেমন করেছেন?

দূর! কই? বলে রণেন লাজুক হাসে।

ঘোষ একপলক তাকিয়ে দেখে নেয়। মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলে, খবরটবর সব পাই। করুন না দোষের কিছু তো নয়। লোকের হাতে আজকাল অঢেল টাকা। বাজারে কোনও জিনিস পড়ে থাকে না, তা সে যত দামই হোক। দোকান-পসারও কত বেড়ে গেছে দেখেছেন? কত বাহারি শোকেস? লুকোনো টাকা ধরার ফাঁদ। তবু কেন যে লোকে দেশের দুরবস্থার কথা বলে! ওপর ওপর কিছু ফালতু লোক না খেয়ে মরছে, কিন্তু মোটের ওপর মানুষ সুখেই আছে। নাকি! বলে ফের অঙ্কটা একটু করেই বলে ওঠে, ওই যাঃ!

কী হল?

ঘোষ খুব হতাশার সুরে বলে, অঙ্কটা মিলে গেল।

ভালই তো।

ঘোষ খুব বিমর্ষভাবে মাথা নেড়ে বলে, হুঁ।

তার ভ্রূ কোঁচকানো মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঘোষ খুশি হয়নি। অঙ্কটার সঙ্গে আর কিছুক্ষণ লড়ালড়ির ইচ্ছে ছিল বোধহয়। টেবিলের টানা খুলে একটা ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো টেস্ট পেপার বের করে পাতা উলটে আবার অঙ্ক খোঁজে ঘোষ।

রণেন বলে, আপনি তো এখন অঙ্ক কষবেন। আমি উঠি।

আরে কেবল উঠি-উঠি করছেন কেন? বসুন না। ঘোষ বলে।

একটু খোলা হাওয়ায় যাই, এখানে বড় গরম। বলে রণেন মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটার দিকে চেয়ে বলে, আজকাল যে কেন ফ্যানগুলোর হাওয়া হয় না!

ফ্যানের দোষ নেই, ওটা টাকার গরম। বলে ঘোষ হাসল।

ঠাট্টা বিদ্রূপ করলেও এই ঘোষ লোকটাই বরাবর রণেনকে বুদ্ধিটুদ্ধি দেয়। ভারী ঠান্ডা মাথা। রিটায়ারমেন্টের কাছাকাছি এসে এখন একটু নিস্পৃহ হয়ে গেছে। মনের মতো একটা অঙ্ক বুঝি খুঁজে পেল ঘোষ। কাগজে সেটা টুকতে টুকতে বলল, জমি জায়গা করেছেন?

রণেন বিমর্ষভাবে বলে, এখনও নয়। তবে টালিগঞ্জে খানিকটা জমি মায়ের নামে।

ঘোষ সবিস্ময়ে চোখ তুলে বলে, মায়ের নামে! আপনি তো দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! আজকাল কেউ মায়ের নামে জমি করে?

রণেন বাধা দিয়ে বলে, না না। বাবা টাকা দিচ্ছেন।

বাবা বেঁচে আছেন এখনও? বলে লাল ঠোঁট চিরে এক রকম গা-জ্বালানো হাসি হেসে ঘোষ বলে, ভারী অন্যায়।

ঘোষ ব্রজগোপালকে চেনে। এক ডিপার্টমেন্টে কিছুকাল একসঙ্গে কাজ করেছে। ব্রজগোপালকে যারা চেনে তাদের সামনে রণেন একটু অস্বস্তি বোধ করে।

ঘোষ অঙ্কের দিকে চেয়েই বলে, উনি টাকা পেলেন কোথায়?

পলিসির টাকা।

ঘোষ একটা নিশ্চিন্ত হওয়ার শ্বাস ছেড়ে বলে, তাই বলুন। হঠাৎ ব্রজগোপালদার টাকার কথা শুনে চমকে গিয়েছিলাম। ও-রকম মানুষের তো বাড়তি টাকা থাকার কথা নয়। সারাজীবন অন্যের ফাইফরমাশ খাটতেন, এটা-ওটা কিনে এনে দিতেন কলিগদের, কিন্তু কখনও কারও টাকা নিজের বা অন্য কারও টাকার সঙ্গে মেশাতেন না, সব আলাদা রাখতেন। বলতেন মেশালে সূক্ষ্মভাবে গো-বিটউইন হয়। মনে নাকি একটা দ্বন্দ্বীবৃত্তি আসে। বলে ঘোষ নিশ্বাস ফেলে হাসল—এ টোটাল মিসফিট। তবু ও-রকম দু'-চারজন লোক বেঁচে আছেন বলেই এখনও চন্দ্রসূর্য ওঠে।

রণেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একটু অস্বস্তি হতে থাকে। একটা ঘুমন্ত আবেগ হঠাৎ বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে জেগে উঠতে চায়। যার বাবা সৎ সে কত ভাগ্যবান। ভাবতেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে উঠে দাঁড়ায়।

চললেন? ঘোষ জিজ্ঞেস করে।

চলি। আপনি যাবেন না?

ঘোষ উদাসভাবে বলে, কোথায় যাব? বসে বসে অঙ্কটা কষি। একটু বাদে দারোয়ানরা বন্ধ করতে আসবে, তখন উঠে পড়ব।

ঘোষ আবার অঙ্কের মধ্যে ডুবে যায়।

বড় ঘরটা পার হয়ে দরজার কাছ বরাবর এসে একটু তাকিয়ে দেখে রণেন। সারি সারি খালি টেবিল। ফাঁকা ঘরে একা ঘোষ বসে আছে এতটুকুন হয়ে। অঙ্ক কষছে। হঠাৎ ভিতরটায় একটু চমকা ভয় জেগে ওঠে। মনে পড়ে বুড়োবয়েস, একাকিত্ব। মনে পড়ে, মৃত্যু। মাথাটা একটা টাল খায়। ভারী ব্যাগটা এক হাতে ধরে রেখেই কষ্টে একটা সিগারেট জ্বালে রণেন। ঘোষের সামনে খায় না, বাবার কলিগ ছিল। সিগারেটের ধোঁয়া ভিতরে যেতেই একটু অন্য রকম লাগে।

ছ'টা বাজে। বাইরে এখনও বেশ রোদ। বাইরে এসে বুক ভরে শ্বাস নেয় রণেন, কিন্তু তবু একটা শ্বাসরোধকারী কী যেন কাজ করছে ভিতরে! ভয়? নিরাপত্তার অভাব? মৃত্যু?

মনটা ভারী খারাপ লাগতে থাকে। শরীরটাকে কয়েকবার ঝাঁকি দেয় রণেন, হাতের ব্যাগটা দোলায়। মনটাকে হালকা করে দেওয়ার জন্য মুখ ছুঁচলো করে শিস্ দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। উৎকট শ্বাসবায়ুর শব্দ বের হয়। লম্বা লম্বা সব বাড়ির ছায়ায় হাঁটে। ধুলোটে গরম হাওয়া দিচ্ছে, নাকে ধুলোর গন্ধ। উদ্ভিদহীন, শান বাঁধানো কলকাতা নির্মম তাপ বিকিরণ করছে। একটা পাম্পসেটের দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়াল রণেন। কাচে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখল। গায়ে কলকা ছাপ, টেরিকটনের বুশ শার্ট, পরনে চেক প্যান্ট, পায়ে দামি জুতো। তবু চেহারাটা লোকাল ট্রেনের ফেরিওলার মতো কেন যে লাগে!

মনটা খারাপ। মনটা বড্ড খারাপ। কেবলই মনে পড়ে, মলিন অফিসঘরে ছুটির পর নিরালায় বসে ঘোষ আঁক কষছে। একটা সময় আসে যখন আয়ুটাকে ফালতু সময় বলে মনে হয়। না? আর আসে একাকিত্ব! মৃত্যু!

অনেকে আছে, মন খারাপ থাকলে একা থাকতে ভালবাসে। নিরালায় ছাদে-টাদে গিয়ে চুপচাপ থাকে। রণেন সে-রকম নয়। তার উলটো। মন খারাপ থাকলে তার খুব ইচ্ছে করে কোনও আপনার জনের কাছে গিয়ে বসে, আদর খায়, ভরভর করে অনেক কথা বলে।

সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরে এল রণেন। মা নেই। গত তিন মাসে মা এই নিয়ে বারচারেক শীলার বাড়িতে গিয়ে থাকছে। এই সময়টায় সোমেন থাকে না। বড় ছেলেমেয়ে দু'জন বাইরের ঘরে ছোকরা মাস্টারের কাছে পড়ছে। নতুন রাখা হয়েছে টিউটরটিকে, ফালতু পঞ্চাশ টাকা চলে যাচ্ছে মাসে মাসে। সোমেনই পড়াতে পারে, পড়ায় না। সংসারের সবাই বড় উদাসীন রণেনের প্রতি, এমন মনে হয়।

টুবাই সন্ধেয় ঘুমোয়। শোওয়ার ঘরে মশারি ফেলা। রণেন ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালতেই নাইলেক্সের মশারির ভিতর থেকে বীণা ঘুম চোখে আলো লাগাতে চোখ পিট পিট করে বলে, আঃ নেবাও না। ছেলেটা এইমাত্র ঘুমিয়েছে, উঠে পড়বে।

ভারী অপমান বোধ করে রণেন। বড় সহজেই বীণা আজকাল তাকে ধমকায়। মনটা ভাল নেই বলে অভিমানটা যেন আরও গাঢ় হয়ে মেঘলা করে দিল মনটা। রণেন সবুজ রঙের ঘুম-আলোটা জ্বেলে বড় আলো নিবিয়ে দিল। লুঙ্গি পরতে পরতেই অভিমানটা খসে গেল খানিক। ডাকল, বীণা।

উঁ।

শুয়ে কেন? বেরিয়ে এসো।

চা চাই নাকি!

সে পরে হবে। এখন তোমাকে চাই।

হঠাৎ এত প্রেম?

এটাও অপমান। রণেন ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে বসে আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে একটা সিগারেট ধরাল। এই কায়দায় অশোককুমার সিগারেট ধরাত একসময়ে। বিছানায় বীণার শাড়ির আর গয়নার শব্দ উঠল। বসে খোঁপাটা বেঁধে নিল। অনেকখানি আঁচল বিছানায় রেখে বেরিয়ে এল, তারপর শ্লথ হাতে অফুরান আঁচলটা টেনে আনতে থাকল বিছানা থেকে।

রণেন বাইরের ঘরের দিককার দরজাটা বন্ধ করে দিল উঠে।

বীণা বলল, ও কী! বাইরের লোক রয়েছে, কী ভাববে?

কাম নয়, একটা তীব্র সঙ্গলিপ্সায় আকুল রণেন দু' হাতে জাপটে ধরল বীণাকে, প্রথম প্রেমিকের মতো কাঁপা গলায় পুরনো বউকে ডাকল, বীণা!

ইস্! কী যে করো না! বীণা রোগাটে হলেও গায়ে জোর কম নয়। দু'হাতে ঝটাপটি করে ছাড়িয়ে নিল।

তোমাকে আমার ভীষণ দরকার। রণেন হাঁফসানো গলায় বলে।

রাতে হবে। বীণা নিস্পৃহ গলায় বলে।

সে-সব নয়। এমনি এসো, কাছাকাছি জড়াজড়ি করে বসে থাকি। কথা বলি।

বিরক্ত হয়ে বীণা বলে, কিছু খেয়েছ নাকি!

বলে কাছে এসে মুখটুখ শুঁকে বলে, না তো! তবে হল কী?

আকুল দু'হাতে আবার ভালুকের মতো তাকে চেপে ধরে রণেন, শোনো। আমার কোনও কথা তুমি আজকাল শুনতে চাও না। বড় সংসারী হয়ে গেছ বীণা। আজ একটু বোসো।

বীণা বলে, ধ্যেৎ। বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। বলে, দরজাটা খুলে দাও। খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে। ছেলেটা কি না জানি ভাবছে! তুমি একটা কী বলো তো!

বীণা দরজাটা খুলে দেয়। বাইরের ঘরের স্টিক লাইটের আলো পরদার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়ল। বীণা গেল রান্নাঘরে। আয়নার সামনে বসে রইল রণেন। অ্যাশট্রের ওপর রেখে দেওয়া

সিগারেটটার কথা ভুলে গিয়ে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। অন্য সিগারেটটা ধূপকাঠির মতো জ্বলতে থাকল একা-একা।

ঘোর সবুজ আলোয় ঘরটা কেমন ভৌতিক দেখাচ্ছে এখন। প্রাচীন অরণ্যের অন্ধকারে একটা ধ্বংসস্তূপ। পাখার হাওয়ায় মশারি কাঁপছে। ঢেউ দিচ্ছে। আয়নায় তার আবছা প্রতিবিম্ব। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে সব কিছু। কেমন যেন রোজকার মতো নয়। বুকটা ফাঁকা। গায়ে ঘাম। সিগারেটের ধোঁয়ার কর্কশ গন্ধ। রণেনের মাথার ভিতরটা ক্রমে পাগল-পাগল হয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি উঠে বড় আলোটা জ্বালল রণেন। জানালার কাছে দৌড়ে গিয়ে বাইরের বাতাস টানল। অস্থিরতা। তার নিজস্ব মানুষ যেন কেউ নেই পৃথিবীতে। এমন কেন লাগছে। উজ্জ্বল আলোয় নিজের হোঁতকা শরীরের প্রতিবিম্বের দিকে আয়নায় চেয়ে থাকে রণেন। তীব্র একটা ঘেন্না হয় লোকটাকে।

একটা সেফটিপিন পড়ে আছে টেবিলের ওপর। কিছু না ভেবে সেটা তুলে নিল রণেন। এবং দাঁতে দাঁত ঘষে আচমকা খোলা সেফটিপিনটা বসিয়ে দিল বাঁ হাতের কবজির ওপর। ক্যাঁচ করে ঢুকে গেল সেটা। প্রথম একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা, তারপর হাতটার একটা অবশ ভাব। গাঁথা সেফটিপিনটা তুলল না রণেন। একটু পরে দুই বিন্দু রক্ত উপচে এল। চেয়ে রইল সে, একা ফাঁকা অফিসঘরে ঘোষ বসে আঁক কষছে, ছুটির পর কিছু করার নেই...কোথাও যাওয়ার নেই! মানুষ এ-রকম অবস্থা সহ্য করে কী করে? মাথাটা ঘুলিয়ে ওঠে আবার। মৃত্যু! একা! কেউ নেই।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

চুপ করে জেগে শুয়ে ছিল রণেন। পাশে বউ বীণা। ও-পাশে বাচ্চারা। পাঁচ বাই সাত খাটে জায়গা হয় না বলে দেয়ালের দিকে একটা বেঞ্চ খাটের সঙ্গে জোড়া হয়েছে। বেঞ্চটার পায়ায় দোষ আছে। বাচ্চাদের কে একজন ঘুমের মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করছে। কৃমি। পাশ ফিরতেই বেঞ্চটায় মচাং শব্দ হল। রাস্তায় ঘেয়ো কুকুররা ঝগড়া করছে। সোমেনের ঘরে পুরনো পাখার একটা খটাং খটাং শব্দ হয়। এ-সব রণেন একা শোনে। বিশ্বসংসার ঘুমোয়।

রণেনের ঘুম এমনিতে ভালই। স্বপ্ন খুব কম দেখে। নেশারুর মতো ঘুম তার। আজ মনটা বড় খারাপ। সে এক বার ঘুমন্ত বীণার গায়ে হাত রাখল। এই মেয়েমানুষটা তার। নিজস্ব। ঘাঁটাঘাঁটি খুব কম হয়নি, তবু কি সবটা চেনা হয়েছে! প্রতিদিন শ্বাসে শ্বাস মিলে যায়, উভয়ের মিলেমিশে তৈরি করা ওই সব সন্তান, তবু দু'জনের মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান।

ঘুমন্ত বীণার শরীরের সর্বত্র তৃষিতের মতো হাত রাখে রণেন। ঘুমের মধ্যেই বিরক্তির শব্দ করে বীণা হাত সরিয়ে দেয়। এক বার অস্ফুট স্বরে বলে, বড় গরম, উঃ!

অপ্রতিভ রণেন বলে, ঘুমোলে?

উত্তর পায় না। বাঁ হাতের কবজির কাছটায় বড় যন্ত্রণা। ফুলে আছে, টাটাচ্ছে। একটু ডেটল বা কিছু লাগালে হত। পিনটা বের করার পর রক্ত পড়েছে অনেকটা। পেকে ফুলেটুলে ওঠে যদি! আঙুলগুলো কয়েকবার মুঠো করে রণেন। কবজি ঘোরায়, ব্যথা।

বীণা ঘুমন্ত অবস্থায় এক বার পাশ ফেরে। তার একটা হাত এসে বুকের ওপর দিয়ে জড়িয়ে ধরে, একটা পা উঠে আসে তলপেটের ওপর। এই ঘুমন্ত আলিঙ্গনটা এখন বড় অস্বস্তিকর। রণেন চায়, এখন তার সঙ্গে কেউ জেগে থাকে। জেগে থেকে আদরে, ভালবাসায় তাকে ঘুম পাড়াক।

বাঁ হাতের কবজির ওপরেই বীণার শরীরের ভার। হাতটা অবশ হয়ে আসছে। সরার জায়গা নেই। বীণা জেটির দড়ির মতো বেঁধে রেখেছে। ঘরে সবজে রঙের ঘুম-আলোটা জ্বালা আছে।

সেই আলোয় এক বার বীণার মুখটা দেখে রণেন। শরীর জুড়োলেই কি মেয়েমানুষের প্রয়োজন ফুরোয় পুরুষের কাছে! আর কী চাওয়ার আছে মেয়েমানুষের কাছে? বেশ দেখতে বীণা। মেয়েমানুষের যা যা থাকা দরকার সবই আছে। তবু যেন বেশি কিছু নেই।

রণেন এক বার দুঃসাহসে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, এই।

বীণা বলে, উঃ!

সরে শোও।

বীণা পাশ ফিরে সরে যায়।

চার দিক থেকে রাতের শব্দ আসে। খাপছাড়া, হঠাৎ শব্দ সব। ইঁদুরের দৌড়-পায়ের আওয়াজ, ইঞ্জিনের ভোঁ, একটা ডায়নামোর আওয়াজ, কাশি, রাস্তায় পায়ের শব্দ, রিকশার ঘণ্টি, রাতচরা মোটর চলে যাচ্ছে, বহুদূরে কোথাও লাউডস্পিকারে গান হচ্ছে। ঘুম হবে না।

রণেন উঠে মশারি থেকে বেরিয়ে আসে। বাইরের ঘরে এসে শোওয়ার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয় সাবধানে। আলো জ্বেলে রেডিয়োগ্রামের খোপে নিবিষ্ট হয়ে খুঁজতে থাকে একটা রেকর্ড। গতবারে খামখেয়ালে কিনেছিল, আছে কি না কে জানে!

আছে। রবিঠাকুরের নিজের গলায় গাওয়া গানের রেকর্ডটা চাপিয়ে দিয়ে আস্তে ছেড়ে দিল রেডিয়ো। একটু খোনাসুরে, রিক্ত বার্ধক্যের গলায় বৃদ্ধ কবির গান হতে থাকে—অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ...

দুর্বল গলা, সুরের ওপর স্থায়ী হতে পারছে না, দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। শ্বাসবায়ুর শব্দ আসছে। তবু হাহাকার ভরা কেমন মরুভূমি ফুটে উঠছে চোখের সামনে। উদ্ভিদহীন এক রুক্ষ ধূসর পৃথিবীর ওপর হাঁটু গেড়ে বসেছে বয়সের ভারে ন্যুব্জ, শোকে তাপে জর্জরিত অপমানিত, অসহায় মানুষ। তার পোশাক ধুলোয় লুটোচ্ছে। ক্ষীণদৃষ্টি সে-মানুষ অস্পষ্ট আকাশের দিকে চেয়ে দু'হাত তুলে বলছে—অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে...

রেকর্ডটা আবার ফিরিয়ে দেয় রণেন। চোখের জল মুছে নেয়। মানুষ যা ছিল তাই আছে। অন্ধ ও মৃত। আকাশের দিকে নিরন্তর বাড়ানো আছে তার দুই হাত। রবিঠাকুর গাও। রবীন্দ্রনাথ গাইতে থাকেন, কাঁপা কাঁপা, বুড়োটে গলায়, অশ্রুহীন শুষ্ক ক্রন্দনের মতো—অন্ধজনে দেহ আলো...

আর সেই শব্দে মুচড়ে ওঠে বুক। ঝলকে ঝলকে নিঙড়ানো বুক থেকে উঠে আসে চোখের জল। টাগরা ব্যথা করে, কান্নার দলা ঠেলে ধরে টনসিলকে। বয়স ভুলে, সংসার ভুলে, হঠাৎ সব ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে ধুলোয় লুটোনো শিশুর মতো অসহায়ভাবে 'মা' বলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে। কেন কাঁদবে তা তো জানে না রণেন। কেন কাঁদবে? কোনও কারণ নেই। কিংবা হয়তো খুবই তুচ্ছ সেই কারণ। কেবল কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে।

কয়েকবার রেকর্ডটা শুনল রণেন। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। রাস্তায় কুকুরেরা ডাকছে। তাতে যেন আরও নির্জন লাগে কলকাতাকে। আরও ভয়াবহ। বৃশ্চিক রাশির শেষ জীবনটা নাকি ভাল কাটে না। কোষ্ঠীতে রণেনের রাশি বৃশ্চিক নয়, কিন্তু ইংরিজি একটা বইতে সে পড়েছিল, সায়ন মতে জন্মতারিখ অনুযায়ী তার রাশি বৃশ্চিক। শেষ জীবনে সে হয় পাগল হয়ে যাবে, নয়তো অপঘাতে মারা যাবে। শেষ জীবনের এখনও অনেক দেরি। তবু কেন যে মনে পড়ে!

রাতে ভাল ঘুম হল না, রবিবার সকালটা বাজার করে এসে রণেন তার চার জোড়া জুতোয় কালি লাগাল। বাথরুম ঘষল। গেঞ্জি, আন্ডারওয়্যার, টেরিলিন কাচল কয়েকটা। বাচ্চাদের সবক'টাকে ধরে ধরে সাবান ঘষে স্নান করাল। কাজকর্মের মধ্যে মন-খারাপটাকে যদি ডুবিয়ে মারা যায়।

পাগল হয়ে যাব না তো! এই কথাটা সারাদিন ধরে মাঝে মাঝে মনে হয়। মরে যাব একদিন। ভেবে চমকে ওঠে সে। স্নানের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে রণেন। উৎকট শিস দেওয়ার চেষ্টা

করে। গান গায়— অন্ধজনে দেহ আলো...সুরটা লাগে না। মেঠো সুরহীন গলায় রামপ্রসাদী গানের মতো হয়ে যায় রবীন্দ্রসংগীত।

স্নান করতে করতেই জলের শব্দের মধ্যেই শুনল, কে যেন এসেছে। বাইরের লোকই হবে। কড়া নাড়ার শব্দ। সোমেন ফিরল বোধহয় আড্ডা সেরে। না, সোমেন নয়। সোমেন হলে চেঁচাত। বীণা উঁচু বিরক্তির গলায় জিজ্ঞেস করল— কে? না জিজ্ঞেস করে বীণা দরজা খোলে না। দিনকাল ভাল নয়। ছোট ছেলেটাকে বোধহয় খাওয়াতে বসেছে। ছুটির দিনে আত্মীয়স্বজনরা আসে। বাদুড়বাগানের সম্বন্ধী, কিংবা গড়িয়ার পিসি। তাদেরই কেউ হবে। ছিটকিনি খোলার শব্দ পেল রণেন। নীরস গলায় বীণা আগন্তুককে বলল, ঘরে এসে বসুন! তারপর বাথরুমের দরজার কাছে এসে বলল, শুনছ, বাবা এসেছেন।

বাবা! বাবার কথা ভারী ভুল হয়ে যায় আজকাল। মনেই থাকে না যে বাবা আছেন। কাল এক বার মনে হয়েছিল, ঘোষের কথায়। তাড়াতাড়ি জল ঢেলে স্নানটা সম্পূর্ণ করে রণেন। বুকের ভিতরে একটা আকুলি-বিকুলি। মনটা কেবলই বায়নাদার বাচ্চার মতো আপনজনের গন্ধ খুঁজছে। কোথায় আছে মায়ের কোল, বাপের গন্ধ, বউয়ের শরীর। কেউ যেন নেই। বাবা এসেছে শুনে বুকটা তাই কেমন করে উঠল।

গামছা-পরা অবস্থায় বেরিয়েই খানিকক্ষণ বাবার দিকে চেয়ে দেখল রণেন। গায়ে হাফ-হাতা সাদা ফতুয়া, একটু উঁচুতে তোলা ধুতি। শরীরটা বেশ রোগা। বেতের চেয়ারে বসে ধুতির খুঁটে মুখটা মুছছেন। রুমাল রাখেন না। চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর রাখা সেই ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

মুখ মুছে তাকালেন একটু। কথা বললেন না।

রণেন বলল, এই রোদে বেরিয়েছেন?

ব্রজগোপাল হাসলেন একটু। বললেন, আর সব কোথায়?

রণেন বুঝল, মা'র কথা বলছেন। বলল, মা তো শীলার কাছেই আছেন। ওর বাচ্চা হবে, কাছে থাকেন।

ও। আর সোমেন?

বেরিয়েছে। বসুন, এই সময়ে আসে।

বীণা রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করল, চা খাবেন তো!

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, বরং একটু জল দিয়ো। হাতের কাজ সেরে নিয়ে।

রণেনের কান-মুখ গরম হয়ে ওঠে। রাগে, লজ্জায়। অতিথি তো নয়, বাবা। ভরদুপুরে তাঁকে কেউ চায়ের কথা বলে। বলা উচিত—ভাত খেয়ে যাবেন। কিংবা বলারও দরকার নেই। ভাত বেড়ে ডাকতে হয়।

লুঙ্গি পরে, চুল আঁচড়ে এসে বসে রণেন। বাবার কাছাকাছি বসতেই যেন একটা শস্য, ফুল আর যজ্ঞমাটির গন্ধ পাওয়া গেল। বীণা পাখাটা খুলে দিয়ে যেতে ভুলে গেছে, রণেন পাখা খুলল। বলল, অনেকদিন বাদে এলেন। শরীরটরীর ভাল তো!

শরীর ভাল। তবে ওদিককার খবর ভাল না।

কেন, কী হয়েছে?

ব্রজগোপাল স্পষ্ট কিছু বললেন না। কেবল বললেন, কী আর হবে! বহেরুর বয়স হচ্ছে। আমারও। বুড়োরা এবার পা বাড়িয়ে রয়েছি। এই বেলা সব বুঝে না নিলে...

সেই পুরনো কথা। রণেন চুপ করে থাকে।

বীণা হাত ধুয়ে এক গ্লাস জল রেখে যায় টেবিলের ওপর। ব্রজগোপাল জলটার দিকে চেয়ে থাকেন। বলেন, সে যাকগে। আমার অ্যাকাউন্টে এল আই সি'র চেকটা ক্যাশ হয়ে এসেছে নাকি?

সে তো কবে।

তা হলে টাকাটা দিয়ে যাই। সেজন্যেই এসেছি। তোমাদেরও জমিটার ব্যাপারে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে খুঁজে খুঁজে হাতড়ে দোমড়ানো চেক বইটা বের করলেন বাবা। বুকপকেট থেকে ট্রেনের ফিরিওলার কাছ থেকে কেনা সস্তা কলম বের করে বললেন, উনি দশ হাজার চেয়েছিলেন, না কি পলিসির পুরো টাকাটাই, তুমি জানো?

রণেন বিপদে পড়ে মাথা নেড়ে বলল, না।

কার নামে লিখলে ভাল হয়?

মা'র তো অ্যাকাউন্ট নেই।

নেই? বলে একটু দ্বিধায় পড়লেন ব্রজগোপাল।

আমার আছে।

তোমার নামে লিখব? বলে ব্রজগোপাল রণেনের দিকে তাকালেন। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন সংশয় ভরা। যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না।

ভারী অভিমান হল রণেনের। চুপ করে রইল।

ব্রজগোপাল কলম রেখে জলটা খেলেন। কোঁচার খুঁটে মুখ মুছে বললেন, তোমার তো ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা আছে। বরং তোমার মায়ের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নাও। বলে একটু চুপ থেকে বললেন, তোমার মাকেই টাকাটা দেওয়ার কথা আমার। তোমার নামে লিখলে কথা রাখা হল না। কাজের সুবিধে হলেও সেটা উচিত হবে না।

তবে মা'র নামেই লিখুন।

ব্রজগোপাল তাই লিখলেন। সাবধানে চেকটা ক্রস করে অ্যাকাউন্ট পেয়ি করে দিলেন। রণেন দেখল, ব্রজগোপাল পলিসির পুরো টাকাটাই লিখে দিয়েছেন।

চেকটা হাতে দিয়ে বললেন, তোমার মায়ের হাতে দিতে পারলেই ভাল হত।

রণেন বলল, শীলার বাড়ি তো দূর নয়। খাওয়া-দাওয়া করে নিন, তারপর, একটা ট্যাক্সি করে চলে গেলেই হবে।

ব্রজগোপাল ভারী লাজুক একটু হেসে বলেন, ওখানে যাওয়ার কী দরকার? তুমি ওঁর নামে ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দিয়ো।

ব্রজগোপালের কাজ ফুরিয়েছে, এক্ষুনি বুঝি চলে যাবেন। ফলে রাতের সেই কান্নার দলাটা আজও ঠেলা দিয়ে উঠল রণেনের টনসিলের কাছে। বাবা চলে গেলেই বড় একা লাগবে। রণেন তাই তাড়াতাড়ি বলল, চলুন না। শীলা অজিতদেরও বহুদিন দেখেননি।

ব্রজগোপাল কী ভেবে চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বললেন, তা হলে তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমি বসছি।

আপনি খাবেন না?

আমি! ব্রজগোপাল ভারী অবাক হয়ে বললেন। মাথা নেড়ে বলেন, আমি তো স্বপাক খাই। নিরামিষ। খেয়েই এসেছি।

বীণা ভিতরের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তাকে ঘিরে ছানাপোনা। সবাই অবাক হয়ে ব্রজগোপালকে দেখছে। বীণা বলল, কিছুই খাবেন না?

সংকোচের সঙ্গে ব্রজগোপাল বললেন, খাওয়ার দরকার নেই। ওই ডান দিকেরটি বুঝি সুপ্রসন্ন? না, কী যেন ওর নাম রেখেছ?

বীণা লজ্জা পেয়ে বলে, মনোজিৎ, ছেলেকে একটু ঠেলা দিয়ে বলে, যাও, দাদুর কাছে যাও।

এসো দাদা। বলে হাত বাড়ান ব্রজগোপাল। তাঁর দুই গর্তে ঢোকা চোখে কী একটা অন্তর্নিহিত পিপাসা ঝিকিয়ে ওঠে। আপনজন! রক্তের মানুষ! উত্তরাধিকার!

ভয়ে ভয়ে বুবাই এক পা দু' পা করে এগিয়ে আসতে থাকে। এই বুড়ো মানুষটা তার দাদু, সে জানে। কিন্তু পরিচয়হীনতার দূরত্বটুকু পার হতে সময় লাগে তার।

ব্রজগোপাল নিচু হয়ে ক্যাম্বিসের ব্যাগ তোলপাড় করে কাগজে মোড়া এক ডেলা আমসত্ত্ব বের করে আনেন, একটা ঠোঙায় কিছু শুকনো কুল, আমসি, প্লাস্টিকের ঠোঙায় কিছু ক্ষোয়া ক্ষীর। নাতির হাতে দিয়ে বলেন, সবাই খেয়ো।

নাতির পিঠে এক বার হাত রাখলেন। কোলে নিলেন না। অভ্যাস ভাল নয়। ফিরে গিয়ে মনটা আবার গর্ত খুঁড়বে। পিঠে হাতটা রেখে বললেন, যাও, মায়ের কাছে যাও।

খেয়ে নিতে একটুও সময় নষ্ট করল না রণেন। ঘরের মধ্যে তার হাঁপ ধরে আসছে। একটা ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে বলল, চলুন।

চেকটা টেবিলের ওপব পড়ে ছিল। ব্রজগোপাল সেটা সযত্নে ভাঁজ করে ভিতরেব পকেটে রাখলেন। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললেন, তোমাদের জমিটাও ওইখানেই?

হ্যাঁ, জমিটাও দেখা হয়ে যাবে আপনার। রণেন বলে।

আমি দেখে কী করব! তোমরা থাকবে, তোমাদের পছন্দ হলেই হল।

রণেন উত্তর দিল না।

বেরোবার মুখে দরজার কাছ বরাবর একটু দাঁড়ালেন ব্রজগোপাল। ইতস্তত করে বললেন, সোমেন এল না এখনও? রোজ এ-রকম বেলা করে নাকি!

বীণা হেসে বলে, কিছু ঠিক নেই।

ভাল কথা নয়। অনিয়ম করে এ বয়সে শরীর ভাঙলে খুব বিপদ। চাকরিবাকরি কিছু হয়নি?

না। বীণা উত্তর দেয়।

ট্যাক্সিতে বসে রণেন বলে, বাবা।

ব্রজগোপাল অন্যমনস্ক ছিলেন। উত্তর দিলেন না । কিন্তু হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে বললেন, ট্যাক্সিতে চড়ে পয়সা নষ্ট করো কেন? এ বয়সে আয়েশি হলে শরীর বসে যায়, মনটাও আলসে হয়।

বাসে-ট্রামে চড়া যায় না। বড় ভিড়।

তোমরাই ভিড় বাড়াচ্ছ। ভিড় তো তোমাদেরই। বলে আবার মুখটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে বলেন, কলকাতায় যারা থাকে তারা ক্রমে মানুষকে ঘেন্না করতে শেখে। এ বড় পাপ।

রণেন আবার ডাকল, বাবা।

উঁ! বলে ব্রজগোপাল মুখ ফেরালেন।

রণেনের তখন বড় লজ্জা করল। কী বলবে? বাবাকে তার কিছু বলার নেই। মুখে পান ছিল। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, বাড়িটা যদি হয় তো আমাদের কাছেই এসে থাকুন।

ব্রজগোপালের ভিতর যে অভিমানী কঠিন মানুষটির বাস সেই মানুষটিই যেন ঈষৎ উষ্মাভরে জবাব দেন, কেন?

ঠিকই তো। কেন? বাবা কেন থাকবেন তাদের সঙ্গে!

ব্রজগোপাল আরও কিছুক্ষণ আলগা চোখে বাইরের দিকে কলকাতার অপসৃয়মাণ বাড়িঘর দেখলেন। গাড়ি আনোয়ার শা রোড ধরে শীলাদের বাড়ির গলির কাছাকাছি এসে পড়ল। ট্যাক্সি থামলে ব্রজগোপাল হঠাৎ চমকে উঠে বললেন, এসে গেলাম নাকি!

হুঁ। রণেন নেমে ভাড়া দিতে দিতে বলে। এবং টের পায়, বাবা এখনও মায়ের সাহচর্যে আসতে কত লাজুক ও অপ্রতিভ হয়ে যান। বাবা ও মা'র মধ্যে তবে কি ভালবাসা আছে আজও?

॥ ছত্রিশ ॥

অজিত দরজা খুলে ভারী অবাক হয়। শ্বশুরমশাইকে তার বাড়িতে সে একদম প্রত্যাশা করেনি। তার ওপর দুপুরের কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছে, ভারী থতমত খেয়ে গেল। এ সময়টায়, বিশেষত ছুটির দুপুরে সবাই ঘুমোয়।

ব্রজগোপালের মুখে-চোখে একটু অপ্রসন্নতার ছাপ। বললেন, আছে সবাই?

আসুন। বলে দরজার পাল্লা হাট করে দিয়ে বলে অজিত, ঘুমোচ্ছে। ডাকছি।

ব্রজগোপাল ঘরে এসে বসলেন। চার দিকে চেয়েটেয়ে বললেন, ভালই।

অজিত সেন্টার টেবিল থেকে সন্তর্পণে তার সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার সরিয়ে নিচ্ছিল। ব্রজগোপাল সেটা নিশ্চয়ই চোখে দেখলেন। অজিত তাঁকে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, কী ভাল? বাড়ি?

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বললেন, ঘরদোর তো বেশ বড় বড় দেখছি। ক'খানা?

দুটো বেডরুম আছে দু'দিকে। একটা প্যাসেজ, আর যা যা সব থাকে। বলে হাই তুলল।

রণেন একটু দূরে বসেছে। এতক্ষণে কথা খুঁজে পেয়ে বলল, ওরা দোতলা করে নীচের তলাটা ভাড়া দেবে।

ব্রজগোপাল উদাস গলায় বলেন, লাভ কী?

বাড়ির কস্টটা খানিকটা উঠে আসে।

ভাড়াটেদের সঙ্গে থাকা সঙ্গত নয়। ব্রজগোপাল তেমনি নিশ্চিত স্বরে বলেন, বাড়ির বড় মায়া। পর মানুষ দেয়ালে পেরেক ঠুকলেও বুকে লাগে।

আমিও ভাবছিলাম, বাড়িটা যদি হয় তো তিনতলার ভিত গেঁথে করব। একতলাটা ভাড়াটে, দোতলা আর তিনতলায় আমরা।

ব্রজগোপাল এক বার ছেলের মুখ নিরীক্ষণ করলেন। তারপর মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, তোমরাই থাকবে, তোমাদের যা ইচ্ছে।

অজিত ভিতরের ঘরে এসে দেখে শীলা এক কাত হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এ সময়টায় চেহারা রুক্ষ হয়ে যায়, মুখে মেচেতার মতো দাগ পড়ে। চোখ বসা, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। কিছু পেটে রাখতে পারে না, সব উলটে বের করে দেয়। তা হোক। তবু পেটের বাচ্চাটিকে ধরে রাখতে পেরেছে। নষ্ট হয়নি শেষ পর্যন্ত। ঘুমন্ত শীলাকে ডাকতে বড় মায়া হয়। পাশেই শাশুড়ি ঠাকরুন গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছেন। ঘুমের মধ্যেও মাথায় ঘোমটা।

অজিত গলাখাঁকারি দিল। শাশুড়িকে মা বা শ্বশুরকে বাবা বলে ডাকার অভ্যাসটা তার এখনও হয়নি? শীলা সেজন্য রাগ করে। বলে, তোমার মা-বাবাকে আমি মা-বাবা ডাকতে পারি, আর তুমি আমার মা-বাবাকে পারো না? অজিত অবশ্য ঝগড়া করে না, কিন্তু ডাকেও না।

অজিত গলাখাঁকারি দিতেই অবশ্য ননীবালা মুখখানা সন্তর্পণে তুলে বললেন, কে এসেছে? বাইরের ঘরে আওয়াজ পাচ্ছি।

অজিত ইতস্তত করে বলে, উনি।

ননীবালাকে আর বলতে হল না। বুঝলেন। যেন উনি বলতে বিশ্বসংসারে একজনই আছে। শীলাকে একটু ঠেলা দিয়ে বললেন, ওঠ্।

শীলা আদুরে ঘুম-গলায় বলে, উঁ।

উনি এসেছেন। উঠতে হয়। তোর বাড়িতে প্রথম এলেন।

ঘুম থেকে উঠলেই একটা সিগারেটের তেষ্টা পায়। অজিত তাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট টেনে নিতে থাকে দ্রুতবেগে। পরশুদিন একটু বৃষ্টি হয়েছিল। সামান্য বৃষ্টিতেই সামনের

রাস্তার ধুলো ধুয়ে পাঁজর বেরিয়ে পড়েছে। খাটালের জমানো গোবরের টাল থেকে পচাটে গন্ধ আসে। ওপরে ধুলোটে আকাশ। ফরসা রোদ। শুকনো গরম হাওয়া দিচ্ছে। বহু ওপরে আকাশের গায়ে দাগের মতো বড় পাখি চিল বা শকুন উড়ছে। ভারী নিরালা দুপুর। আকাশে ছড়ানো ডানামেলা পাখি, রোদ, বিস্তার দেখে অজিতের মনটাও নিরালা হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজন আজকাল তার ভাল লাগে না। আগেও লাগত না। মা-বাবা ভবানীপুরের সংসার ছেড়ে এসে আরও নিষ্ঠুর হয়ে গেছে সে। বাড়িতে আত্মীয় এলে তার অকারণ উৎপাত মনে হয়। কথা বলতে হবে, সামনে গিয়ে বসে থাকতে হবে, সিগারেট লুকোতে হবে। কিংবা আবার ভদ্রতা রক্ষার জন্য কখনও-সখনও যেতে হবে তাদের বাড়িতেও। ভাবতেই ক্লান্তি লাগে। নিজের মতো নিরালা জীবন পাওয়াটাই সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার কাছে।

তাড়াতাড়ি জোরে টান দেওয়ায় সিগারেটটা তেতে গেছে, ধোঁয়া আসছে না। সেটা ফেলে দিয়ে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিল সে। যতক্ষণ সময় কাটানো যায়। জলের ঝাপটা চোখে-মুখে দিতে গিয়ে এক কোষ জল নাকে ঢুকে দম আটকে দিল। অস্বস্তি। জলের গন্ধে কী যেন একরকম লাগে। বুকচাপা নিঃসঙ্গতা। অজিত জানে, পৃথিবীতে তার কেউ নেই। একদম কেউ না। ছিল লক্ষ্মণ। তাকে একা করার জন্যই ভগবান বুঝি তাকে দূরে নিয়ে গেলেন। অবশ্য ভগবান মানে না অজিত, ভাগ্যও না। তবু ওইরকম মাঝে মাঝে মনে হয়। কার অদৃশ্য হাত তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুটিকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাকে একাকিত্বে রেখে দেখার জন্যই বুঝি!

বাথরুমের দরজাটা ভেজানো ছিল। সেটা ধাক্কা দিয়ে অধৈর্য হাতে খুলে শীলা ঢুকল। বলল, ইস্, বাথরুমে এত দেরি কেন, মেয়েদের মতো? বাইরে যাও।

ধীরেসুস্থে অজিত তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে, তাড়া কীসের?

ভীষণ পেয়েছে! তুমি যাও তো, বাবা বসে আছেন। মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে প্রথম এলেন, জামাইয়ের পাত্তা নেই। শীলার গলায় যথেষ্ট রাগ।

ডাক্তারের মত নিয়ে শীলা আজকাল ইস্কুলে যায়। রিকশায় করে। এক বার বাইরের স্বাদ পেলে মেয়েরা আর ঘরবন্দি থাকতে চায় না। হাঁপিয়ে ওঠে। ক'দিন আগে সন্ধেবেলা বাসায় ফিরে অজিত একটু অবাক হয়ে দেখে, বাইরের ঘরে একটা অপরিচিত ছেলে বসে আছে। ভারী সুন্দর চেহারা, আর ভীষণ স্মার্ট। শীলা পরিচয় করিয়ে দিল। তার নাম সুভদ্র। বলল, শোভনাদির লিভ ভ্যাকেন্সিতে চাকরি করছিল আমাদের স্কুলে। শোভনাদি ফিরে এসে জয়েন করেছেন, বেচারির চাকরি গেছে। এখন তোমার কাছে এসেছে, যদি তুমি ওকে এল আই সি'র একটা এজেন্সি পাইয়ে দাও।

একটু অবাক হয়েছিল অজিত। এল আই সি'র এজেন্সি পাওয়া কোনও শক্ত ব্যাপার নয়। ধরা-করার দরকার হয় না। তা হলে তার কাছে আসা কেন। সে-রহস্যের ভেদ হল না বটে কিন্তু ছেলেটাকে বেশ ভাল লেগে গেল। এ ছেলেটা খুব সুন্দর বটে কিন্তু নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন নয়। গালে দাড়ি আছে, লালচে রকম গোঁফ আছে একটু। পোশাক-আসাকে সাধারণ। চমৎকার কথা বলে। ভীষণ হাসায়। টকটকে ফরসা রং, লম্বা এবং রোগাটে চেহারার মধ্যে আবার একটু বাচ্চাদের মতো লাজুকতাও আছে।

যতক্ষণ সুভদ্র ছিল ততক্ষণ শীলার চেহারাই অন্য রকম। চোখে-মুখে একটা উত্তেজিত চকচকে ভাব। ঠোঁটে হাসি, মুখে অনর্গল কথা। বারোটা মিষ্টি সব যত্ন করে সাজিয়ে দিল। লম্বা সোফাটায় সুভদ্র বসে ছিল, অন্য ধারে বসল শীলা। নিঃসংকোচে। কোনও হাসির কথা উঠলে ঝুঁকে সুভদ্রকে ঠেলা দিয়ে বলছিল, এই সুভদ্র, বলুন না সেই নক্সালাইটরা ইস্কুলে বোমা ফেললে অচলাদি আর দীপ্তিদি কেমন করে পায়খানায় ঢুকে গিয়েছিলেন, আর ঢুকেই দেখেন সেখানে পণ্ডিতমশাই...হি...হি...

রাত ন'টা পর্যন্ত সুভদ্র ছিল। ততক্ষণ শীলাকে মনে হচ্ছিল একটি কুমারী মেয়ে। শরীরে কোনও অস্বস্তি নেই। কোনও সম্পর্ক নেই অজিতের সঙ্গে।

সুভদ্র চলে গেলে এ বাড়ির ভূতটা নেমে এল। তখন শাশুড়ি ঠাকরুন ছিলেন না। শুধু অজিত আর শীলা থাকলে এ বাড়িতে ভূত নামে। সে ভূতটার নাম গাম্ভীর্য। কথার শব্দ নেই, হাসির শব্দ নেই, ফাঁকা নিঃসঙ্গতা শুধু। শীলার শরীর তখন খারাপ লাগতে লাগল বলে গিয়ে শুয়ে রইল ঘর অন্ধকার করে। পাশের ঘরে অজিত নতুন কেনা একটা ফাঁকা কাচের টিউব থেকে অন্তহীন রুমাল বের করতে থাকল। দর্শকহীন ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাজিকের প্যাটার মুখস্থ বলে যেতে যেতে একটা জাম্বো কার্ডের খেলা দেখাতে লাগল নিজেকে। ম্যাজিক মানেই হাত, চোখ, মুখ, ভঙ্গি আর কথার কৌশল। জীবন মানেও কি তাই নয়? কিন্তু সেইসব কৌশল অজিতের জানা নেই। তাই বাড়িতে ভূত নামে। অনেকক্ষণ ম্যাজিক করে ক্লান্ত অজিত সিগারেট ধরিয়ে একা বাইরের ঘরে এসে বসে থাকল। ঘরে আলো জ্বালেনি, পাশের ঘর থেকে আবছা আলো আসছে। বসে থেকে থেকে সে টের পেল, এ বাড়ির ভূতটা সে নিজেই। ভূত মানে, যে ছিল, এবং এখন আর নেই। অজিত তো তা-ই। সে ছিল, সে এখন আর নেই। নইলে ওই যে সুন্দর চেহারার ছেলেটা, সুভদ্র, ওর কারণে একটু হিংসে হতে পারত তার। একটু সন্দেহ। কিন্তু কিছু হচ্ছে না। বরং অজিত ভাবছিল, শীলা অন্য কাউকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে বড় ভাল হয়। সে নিজে আর-একটু আলগা হতে পারে, আর একটু একা। একা হওয়া কী ভীষণ ভাল। আহা, শীলা ওই ছেলেটার সঙ্গে হালকা একটু প্রেম করুক না। ক্ষতি কী?

জীবন মানেও একরকম কৌশল। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা দু'জনেই ভারী নিস্তেজ, পরস্পর সম্পর্কে কৌতূহলহীন। তাই মাঝে মাঝে নিজেকে একটু উসকে নেয় অজিত, শীলাকেও উসকে নেয়। এইভাবে অনুভব করার চেষ্টা করে যে, তারা সম্পর্কিত, তারা আছে।

বাথরুমের বাইরে যাওয়ার জন্য শীলা তাড়া দিচ্ছিল, অজিত র‍্যাকে তোয়ালেটা রেখে বেসিনের ওপর ছোট আয়নার দিকে চেয়ে আঙুলে চুল পাট করতে করতে বলল, লজ্জা কী, বসে পড়ো না। আমি দেখছি না।

সে খালি বাড়িতে। এখন দেয়ালা কোরো না। বাইরে যাও তো শিগগির। কেউ এসে পড়লে...ছি ছি...

অজিত গম্ভীরভাবে বলল, শোনো, একটা কথা।

পরে হবে। উঃ। বাবা বসে আছেন, দাদা মা...তুমি একটা কী বলো তো!

কী?

এখন যাও না।

আমার কানে কয়েকটা উড়ো কথা এসেছে শীলা।

পরে শুনব।

না, এখনই। সুভদ্রর সম্পর্কে...

শীলা হঠাৎ যেন থমকে গেল। গলার স্বরটা হয়ে গেল অন্য রকম। বলল, কী কথা? কী শুনেছ?

তোমার সঙ্গে সুভদ্রর রিলেশনটা...

কীরকম?

লোকে বলে।

কে লোক?

আছে। তুমি চিনবে না।

বাথরুমের ঝুঁঝকো আলোয় শীলা কেমন ছাইরঙা হয়ে গেল। অবাক বড় চোখ, ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে আছে, ক্ষতচিহ্নের মতো।

তারা কী বলেছে? শীলা নরম গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে।

শীলার চেহারা দেখে অজিত ভয় পেয়ে গেল। ঠাট্টার এমন প্রতিক্রিয়া হবে, এতটা পালটে যাবে শীলা তা সে ভাবেনি। হাত বাড়িয়ে বলল, কী হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে নাকি!

তুমি ও-কথা বললে? শীলার গলায় মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। কাঁদবে।

কিছু না। কেউ কিছু বলেনি। বলল অজিত। কিন্তু গলায় কোনও আন্তরিকতা ফোটাতে পারল না। মাঝে মাঝে মানুষের বড় ভুল হয়ে যায়। গলাখাঁকারি দিয়ে অজিত বলে, ঠাট্টা করছিলাম। আমি যাচ্ছি।

ম্লান মনে বেরিয়ে এল অজিত। হঠাৎ বুঝতে পারল, সে যে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে তা শীলাকে কোনও দিন বিশ্বাস করানো কঠিন হবে। কিন্তু ঠাট্টাই কি? অজিতের মনেও কি কিছু ছিল না!

সম্পূর্ণ আনমনা অজিত বাইরের ঘরে এসে দেখল তার শ্বশুর ব্রজগোপাল লাহিড়ী তার শাশুড়ি ননীবালা লাহিড়ীর হাতে একটা মোটা টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন। দৃশ্যটা অনেকটা খবরের কাগজের ছবির মতো, কোনও সংস্থার পক্ষ থেকে কেউ যখন বন্যাত্রাণ বা ওইরকম কিছুর জন্য রাজ্যপাল বা প্রধানমন্ত্রীর হাতে চেক তুলে দেয়, স্রেফ পাবলিসিটির জন্য। বিজ্ঞাপন দেওয়ার চেয়ে সংবাদে নাম তোলা অনেক বড় বিজ্ঞাপন। আজকাল সবাই সংবাদ হতে চায়। পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্রজগোপালও এখন সংবাদ। শেষ পর্যন্ত টাকা তিনি দেবেন এমন বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। কিন্তু এই মুহূর্তে চেকটা দেওয়ার সময়ে তাঁর ভাবমূর্তিটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠল। ননীবালা বাঁ হাতে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, রণোর নামে দিলেই তো পারতে!

ব্রজগোপাল রক্তাভ লাজুক মুখে বললেন, তোমাকেই দেওয়ার কথা ছিল।

শ্বশুরকে বহুকাল বাদে একটু মন দিয়ে দেখল অজিত। খ্যাপাটে, বাতিকগ্রস্ত বুড়ো। তবু মুখের ওই রক্তাভায় যে লাজুকভাব, যে চাপা অস্থিরতা, তার মধ্যে একটা গভীর মমতাময় হৃদয়ের চিহ্ন আছে। বুড়ো মানুষরা চিঠির শেষে পাঠ লেখে ইতি নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী অমুক। সেটা কথার কথা। কিন্তু এই লোকটার শরীরের মধ্যে যেন সেই কথাটা গোপনে ভোগবতীর মতো বয়ে যাচ্ছে— নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী।

ননীবালার চোখে বুঝি জল এল আবার। প্রায় রুদ্ধ গলায় বললেন, বাড়িটা যদি হয়, তা হলে...

বলে একরকম প্রত্যাশায় তাকালেন স্বামীর দিকে। ঘোমটাটা আর-একটু টেনে মুখখানা প্রায় ঢেকে বললেন, রণো বলছিল, বাড়ি করলে বাবার জন্য একটা আলাদা ঘর করব।

কথাটায় ইঙ্গিত ছিল। নিরুদ্দিষ্টের প্রতি আহ্বান।

ব্রজগোপাল একটু চেয়ে রইলেন ননীবালার দিকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, কলকাতায় আর না। তোমরা থাকো। গোবিন্দপুর ছেড়ে আসা হবে না। তা হলে সব দেখবে কে?

ননীবালা উত্তর দিলেন না। রণেন চুপ করে বসে আছে। কিংবা ঠিক চুপ করেও নেই। তার ঠোঁট নড়ছে নিঃশব্দে। আপনমনে কথা বলছে নাকি?

অজিত সকলের কাছ থেকে দূরে। ঘরের কোণে একটা গদি-আঁটা শান্তিনিকেতনি মোড়ায় বসে রইল। ব্রজগোপালের দিকে চোখ। এ লোকটাকে তার বড় হিংসে হয়। সব থেকেও কেমন একা, আলগা। হৃদয়হীন বলে মনে হয়। মনে হয়, বুঝি সন্ন্যাসী। সে যা-ই হোক, লোকটা সংসারকে লাথি মারতে পেরেছে। বুকের পাটা আছে এ বয়সেও।

উৎকর্ণ হয়ে বসে ছিল অজিত। বাথরুমে শীলা অনেকক্ষণ সময় নিচ্ছে। বড় ভয় হয়। পাঁচ মাসের পেট নিয়ে, যদি পড়ে-টড়ে যায়। ঠাট্টাটা করা ঠিক হয়নি।

আবার অজিত ভাবে, ঠাট্টা! ঠাট্টাই কি! আর কিছু নয়? উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এ বাড়ির নিঃসঙ্গতার ভূতটা কখন যে কার ঘাড়ে ভর করে কী অনর্থ ঘটায়! সেই নিঃসঙ্গতা ভাগিয়ে দেওয়ার

জন্য একজন আসছে। উগ্র আগ্রহে অপেক্ষা করছে অজিত। শীলা, পড়ে-টড়ে যেয়ো না, সাবধান! মন খারাপ কোরো না, ওটা একটা ভুতুড়ে ইয়ারকি।

ব্রজগোপাল চেক-দান অনুষ্ঠানের ভাবগম্ভীরতা থেকে হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে চার দিকে চেয়ে বললেন, শীলুকে দেখছি না!

ননীবালা ডাকলেন, অ শীলা।

বাথরুমে। জবাব দিল অজিত।

ও। ব্রজগোপাল খানিক চুপ করে থেকে বললেন, শীলুর বাড়িতে এলাম, অথচ ওর জন্য হাতে করে কিছু আনিনি।

কী আনবে! ননীবালা বলেন।

বাচ্চাদের কাছে আসতে বাপের কিছু হাতে করে আনতে হয়। ব্রজগোপাল বলেন।

ওরা কি বাচ্চা! ত্রিশের কাছে বয়স হল। বলেন ননীবালা। একটু হাসলেনও বুঝি।

বড় হয়েছে! বলে ভ্রূকুটি করেন ব্রজগোপাল। যেন-বা তাঁর বাচ্চারা যে বড় হয়েছে এটা তাঁর বিশ্বাস হয় না। তিনি জানেন, ওরা এখনও ভুলে ভরা, বায়নাদার, অবুঝ শিশু তাঁর। বড় হয়নি, একদম বড় হয়নি।

বাচ্চা ঝিটা বাইরে থেকে মিষ্টি নিয়ে ঘরে এল। রান্নাঘর থেকে চায়ের জলের শিস শোনা যাচ্ছে। শীলার এবার বাথরুম থেকে বেরোনো উচিত।

ব্রজগোপাল জামার ভিতরের পকেট থেকে দশটা টাকা বের করে অজিতের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা মিষ্টি খেয়ো।

অজিত হাসল, বলল, না, না। সে কী!

রণেন দৃশ্যটা দেখে হাসল। ননীবালাও হেসে বললেন, ওরা কি আর সেই ছোটটি আছে যে বাপ মিষ্টি খেতে টাকা দেবে!

ব্রজগোপাল নিপাট গম্ভীর চোখে চেয়ে বললেন, নাও।

হাতটা বাড়িয়ে রইলেন। অজিত বাচ্চা ছেলের মতো লাজুক ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে হাত বাড়িয়ে নিল। কিছু বলার নেই।

উঠি। ব্রজগোপাল বলেন।

বসুন! চা হচ্ছে। অজিত বলল।

পর মানুষের মতো কেবল উঠি-উঠি ভাব কেন? শীলা আসুক। ননীবালা এই বলে মুখের পানের ছিবড়ে ফেলে এলেন জানালা দিয়ে।

অজিত উৎকর্ণ হয়ে আছে। শীলার কোনও শব্দ নেই। বড় দেরি করছে শীলা। এত দেরি হওয়ার কথা নয়।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

ব্রজগোপাল আর ননীবালা কথা বলছেন। সেই ফাঁকে নিঃশব্দে উঠে গেল অজিত। নিঃশব্দ পায়ে বাথরুমের দরজার কাছে চলে এল। ভিতরে কলের জল বয়ে যাওয়ার শব্দ। খুব মৃদু দুটো টোকা দিল অজিত। সাড়া নেই। আর-একটু জোরে টোকা দিতেই আটকানো কপাটের পাল্লা নরমভাবে একটু খুলে গেল। ভিতরে অন্ধকার। অজিত কাছেপিঠে কেউ নেই দেখে ঢুকে গেল ভিতরে।

শীলা বেসিনের ওপর উপুড় হয়ে আছে। বাড়ানো হাতে দেয়ালে ভর। হিক্কার মতো শব্দ করছে। গলায় আঙুল দিয়ে একঝলক বমি করল। পিছন থেকে অজিত পিঠে হাত রাখে। অন্য হাতে মাথাটা

ধরে শীলার। বমির সময় কেউ মাথা চেপে ধরে রাখলে কষ্ট কম হয়।

কিন্তু বমি আর এল না। শীলা জলের ছাঁটে চোখ-মুখ ভিজিয়ে নিতে থাকে। অজিত মৃদু গলায় বলে, শ্বশুরমশাই বসে আছেন। তাড়াতাড়ি করো।

জলে-ভেজা মুখটা ফেরাল শীলা। তীব্র, সজল, বড় বড় চোখ। একপলক তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, আমি যাব না।

অজিত বুঝল, রেগেছে খুব। বলে, বিশ্রী দেখাচ্ছে কিন্তু। চলো। ওঁরা অপেক্ষা করছেন।

একটু ক্লান্তির স্বরে শীলা বলে, তুমি যাও।

অজিত বলে, যাচ্ছি। দেরি কোরো না, প্লিজ।

বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, ঠিক এ সময়ে শীলা নাটুকে ভঙ্গিতে হাতটা বাড়াল। বলল, ওগো!

অনেকটা আর্তস্বরের মতো ডাক। অজিত একটা শ্বাস ছাড়ল মাত্র। এটা দেয়ালা। নইলে ও এমন কিছু অসুস্থ নয় যে, হেঁটে ঘরে যেতে পারবে না। এ অবস্থায় বমি কে না করে! গত চার মাস ধরে শীলাও করছে।

অজিত একটু কুণ্ঠিতভাবে বলে, কী?

ধরো। পারছি না। শীলা হাত বাড়িয়ে চেয়ে আছে। অভিমান ঘনিয়ে আসছে চোখে।

অজিত বিরক্তি চেপে বলে, বাইরের ঘরে শ্বশুরমশাই। দেখতে পাবেন।

শীলা সেটা শুনল না। জীবনের শেষতম প্রশ্নের মতো গভীর গলায় বলে, ধরবে না?

আর-একটা অসহায় শ্বাস ছেড়ে অজিত হাত বাড়িয়ে শীলার কোমর ধরল। শীলার ভেজা হাত বেষ্টন করে তার কাঁধ, খুবই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি। এইভাবেই তারা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। পুরো নাটক। শীলা হঠাৎ মুখটা তুলে কাঁধে মুখ ঘষে কান্নায় ধরা গলায় বলে, তুমি কী নিষ্ঠুর!

সব স্ত্রীই স্বামীকে এই কথা বলে। কারণে, অকারণে। তবু শীলার এই কথাটা যত আলগাভাবে বলা ততটা মিথ্যে নয়। অজিত তো জানে, সে কত নিস্পৃহ! কত উদাস! এ বোধহয় অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি! ডিমিনিশিং ইউটিলিটি। না কি, তারা কেবলমাত্র যৌন অংশীদার? না-কি পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য একটা প্রাইভেট লিমিটেড? বিবাহ শব্দটির মধ্যে একটি বহ্ ধাতু আছে। তার মানে কি বহন করা? বহন করাই যদি হয়, তবে সে বড় কষ্টের। বহন কেন করবে? একদিন অফিস যাওয়ার আগে পোশাক পরছিল অজিত। হঠাৎ মাথার মধ্যে চিড়বিড়িয়ে উঠল একটা রগ। বিদ্যুৎ খেলে গেল মাথায়। সেরিব্রাল থ্রম্বসিস এভাবেই হঠাৎ হয়, জানা ছিল। সেই স্মৃতিই বোধহয় আচমকা এসেছিল মাথায়। দু' হাতে মাথা চেপে ধরে 'এ কী। এ কী' বলে বসে পড়েছিল অজিত। শীলার সায়া-ব্লাউজ পরা হয়ে গেছে, শাড়িটা ফেরতা দিয়েছিল মাত্র, অজিতের কাণ্ড দেখে শাড়িটা দু' হাতে খামচে খুলে পক্ষিণীর মতো জাপটে ধরল তাকে, দু'হাতে মাথা বুকে নিয়ে 'ঠাকুর! ঠাকুর! এ কী সর্বনাশ'। বলে চেঁচিয়ে উঠল। সেও জানে এইভাবে আজকাল আচমকা থ্রম্বসিস হয়, মানুষ চলে যায় বিনা নোটিশে। কিছুক্ষণ বসে থেকে সামলে নিল অজিত। কিছু না। তবু শীলা অফিস যেতে দিল না, নিজেও গেল না স্কুলে। সারা দিন আগলে বসে পাহারা দিল অজিতকে। কয়েক দিন চোখে চোখে রাখল। বিবর্ণতার মধ্যে সে ছিল উজ্জ্বল কয়েকটা দিন। প্রেমে পূর্ণ, নির্ভরতায় গদগদ। তবু অজিত ভাবে, কেন ওই পক্ষিণীর মতো ছুটে আসা, কেন আগলে ধরা! সে কি ভালবাসা! না কি নিরাপত্তার জন্য? সে কি নান্দনিক! না কি অর্থনৈতিক। তবে কি দুটোই? ভেবে পায় না অজিত। শুধু বোঝে, মৃত্যুই মানুষকে কখনও কখনও মূল্যবান করে তোলে, নিতান্ত অপদার্থও হয়ে ওঠে নয়নের মণি। মৃত্যু নামে এক ভাবাবেগহীন, অবশ্যম্ভাবী শীতল ঘটনা মানুষের সব সময়ে মনে থাকে না, যখন মনে পড়ে, যখন মৃত্যুর কাছাকাছি এসে যায় কেউ, তখনই জাতিস্মরের মতো তার ভালবাসার কথা মনে আসে, বিরহ মনে পড়ে। জীবন বুঝি মৃত্যুর বিরুদ্ধে এক নিরন্তর লড়াই। নানাভাবে ভেবেছে অজিত। সিগারেট পুড়েছে কত! কোনও সিদ্ধান্তে আসেনি আজও।

বাইরের ঘরের পরদাটা উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। স্পষ্ট ব্রজগোপালকে দেখা যাচ্ছে। উনিও চেয়ে আছেন হয়তো। দেখছেন। তবু শীলাকে ওইরকম ঘনিষ্ঠভাবে ধরে বিছানা পর্যন্ত নিয়ে আসে অজিত। বহন করা যাকে বলে।

শীলা বিছানায় বসে। সময়োচিত কয়েকটা ব্যথা-বেদনার শব্দ করে। মেয়েরা বোঝে না পুরুষ কখন তাদের সম্পর্কে বিরক্ত বোধ করে। যেমন এখন। অজিত জানে শীলার কিছু হয়নি। তবু বড় বড় চোখে চেয়ে শ্বাস টানছে শীলা, মুখে যথোচিত বেদনার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। সুভদ্রর প্রসঙ্গটার ওপর ওইভাবেই সে কি জয়ী হতে চায়? বড় বোকা। ও জানেও না সুভদ্রর প্রতি কোনও হিংসা বিন্দুমাত্র বোধ করে না অজিত। বরং মাঝে মাঝে ভাবে, ওইরকম করে যদি সময়টা ভালই কাটে শীলার, কাটুক। তবু কথাটা বেরিয়ে গেছে অজিতের মুখ থেকে। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত।

এখন কেমন? অজিত খুব আন্তরিকতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে গলায়।

শীলা বোধহয় বুঝতে পারে। যতই চেষ্টা করুক অজিত, আন্তরিকতা বোধহয় ফোটে না। অজিতের ভাঙা, মেদহীন মুখে কয়েকটা অবশ্যম্ভাবী রাগ, বিরক্তি, হতাশার রেখা আছে, যা ফুটে ওঠে। সে লুকোতে পারে না। শীলা বোধহয় সেটা টের পায়। অভিমানে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, ভাল। তুমি যাও।

অজিত এসে আবার বাইরের ঘরে মোড়ায় বসে। একটু অন্যমনস্কভাবে শ্বশুরের দিকে তাকায়। একটা সিগারেট খেতে বড় ইচ্ছে করছে। পায়জামার পকেটে এক বার বে-খেয়ালে সিগারেটের প্যাকেটটার জন্য হাত ভরেছিল। মনে পড়ল শ্বশুর বসে আছে সামনে।

অবশ্য ব্রজগোপাল অজিতকে লক্ষ করছিলেন না। ওদিকের চেয়ারে রণেন এতক্ষণ নিঃশব্দে কথা বলছিল। ঠোঁট নড়ছে, হাতের আঙুল নাড়ছে। একটা মূক অভিনয় যেন। ব্রজগোপাল অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে ছিলেন। রণেন খেয়াল করেনি। হঠাৎ ব্রজগোপালের চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল। খুব বিনীতভাবে বসে রইল, মাথা নামিয়ে দু'হাত কোলের ওপর জড়ো করে।

পুরো ব্যাপারটা নজরে এল অজিতের। ও কী করছিল রণেন? অদ্ভুত তো! মাঝে মাঝে রাস্তায়-ঘাটে অজিত দেখেছে বটে একটু খ্যাপাটে ধরনের এক-আধজন লোক এ-রকম একা-একা কথা বলতে বলতে যায়। হয়তো পাগল নয়, কিন্তু ওরকমই। রণেনের সে-রকম কিছু হয় নাকি আজকাল!

ব্রজগোপাল থমথমে মুখটা ফিরিয়ে অজিতকে বলেন, শীলুটা! কী করছে? শরীর খারাপ নাকি?

একটু চমকে অজিত বলে, না। এই আসছে।

ব্রজগোপাল একটু গলা পরিষ্কার করলেন। বললেন, তোমার এ বাড়ি ক'দিনের?

বিনীতভাবে অজিত বলে, কয়েক বছর হয়ে গেল। আপনি তো দেখেননি?

না। বলে একটু চুপ করে থাকেন ব্রজগোপাল, বলেন, আসতে ইচ্ছে হলেও কি আসা সোজা! কলকাতার রাস্তাঘাট আজকাল একটুও চিনতে পারি না। নতুন নতুন বাড়ি উঠে সব অচেনা হয়ে যাচ্ছে। এত ভিড়ে ঠিক দিশেও পাই না।

কলকাতার ওপর ব্রজগোপালের একটা জাতক্রোধ আছে, অজিত তা জানে। তাই একটু উদাস গলায় বলল, পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, কলকাতায় তো বাড়বেই।

ব্রজগোপাল উত্তরটা আশা করেননি। এক বার তাকালেন। মাথা নাড়লেন। বললেন, সবাই তাই বলে। জনসংখ্যা। আজকাল জন-টাকে কেউ পাত্তা দেয় না, সংখ্যাটা নিয়ে মাথা ঘামায়। মানুষকে কেবল সমষ্টিগত করে দেখা ভাল না।

অজিত এককালে বিস্তর পলিটিক্স করেছে। পথ-সভা, বিতর্ক, দাবি আদায়ের বৈঠক। তর্কের গন্ধ পেলে আজও চনমনে হয়ে ওঠে। এই স্থবির বিশ্বাসের মানুষটাকে যদিও কিছু বোঝানো যাবে না, তবু একটু ধাক্কা দেওয়ার জন্য সে বলে, সমষ্টিই তো আমাদের কাছে সব। সমষ্টিই শক্তির উৎস।

তাকে নিয়ে তাই মাথা ঘামানোর দরকার। প্রতি জনকে নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব নয়।

ব্রজগোপাল বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর আস্তে করে বললেন, কোনও মানুষই নিজেকে ভিড়ের একজন বলে ভাবতে ভালবাসে না বাপু। এ হচ্ছে মিথ্যা কথা। বুকের মধ্যে সব মানুষই টের পায়, সে একজন আলাদা মানুষ, সবার মতো নয়। তিনশো কোটি মানুষের মধ্যে আমি একজনা বেনম্বরি মানুষ, গোবিন্দপুরের হেলে চাষাটাও এমন ভাবতে ভালবাসে না। বাসে, বলো?

না বাসলেও কথাটা তো সত্যি।

সত্যি কি না কে জানে। তবে আজকাল যাকে রাষ্ট্র বলো, সেই রাষ্ট্র তোমাকে আমাকে মানুষের সমুদ্রে সত্তাহীন এক ফোঁটা জল যেমন, তেমনি মনে করে। রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে মানুষ পিণ্ডাকার একটা সমষ্টিসত্তা। কোথায় কোন মানুষ মরল, কোন মানুষ বেঁচে রইল, কে ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকল, কে পাগল হয়ে গেল তাতে তার কিছু যায়-আসে না। রাষ্ট্র তা টেরও পায় না, পৃথিবীর ভারও তাতে কমেও না বাড়েও না। মানুষ যখন এটা টের পেতে শুরু করে, তখনই তার মধ্যে হতাশা, ক্লান্তি আর নানা রকম বিকৃতি আসতে থাকে। দু'-চারজন যারা বড়টড় হয়, তাদের কথা ছেড়ে দাও। যারা গোলা মানুষ, অল্পবুদ্ধি, বা যারা তেমন বড়টড় হতে পারেনি, তারা নিজেদের নিয়ে পড়ে যায় বড় মুশকিলে। এই বিপুল রাষ্ট্রে তাদের স্থান কোথায়, কাজ কী, কেন তাকে পৃথিবীর দরকার, এ-সব বুঝতে না পেরে সে ক্রমে নিজেকে ফালতু লোক বলে ভাবতে শুরু করে। ক'টা লোক ভাবতে সাহস পায় যে, তাকে ছাড়া পৃথিবী চলবে না? শহরে, গাঁয়ে-গঞ্জে, জনে জনে জিজ্ঞেস করে দেখো তো বাপু, এ রাষ্ট্রের তারা কে, পৃথিবীর তারা কে, এটা টের পায় কি না?

ব্রজগোপাল একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান বুঝি। চোখটায় একটা ঘোর লাগা ভাব, মাথা নেড়ে বলেন, বেঁচে থাকার একটা জৈব তাগিদ আছে। মরতে কেউ চায় না। কেবল সেই তাগিদে যে যার মতো পৃথিবীর সঙ্গে সেঁটে আছে প্রাণপণে। নইলে সবাই জানে সে মরলে বা পড়লে পৃথিবীর কাঁচাকলা। এই কথা সার বুঝে গেছে বলেই আজ আর কেউ রাষ্ট্র বলো, দুনিয়া বলো, জনগণ বলো, কারও কাছে কোনও দায় আছে বলে মনে করে না। বুঝে গেছে, সার হচ্ছে নিজের দায়িত্বে বেঁচে থাকা। সে কেন, কোন দুঃখে রাষ্ট্র-ফাষ্ট্র, দুনিয়া-টুনিয়া, ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবে! সে তো জনগণ, জনসংখ্যা, ভিড়ের একজন।

অজিত শ্বশুরের দিকে চেয়ে থাকে। একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। বলে, কোনও মানুষই তো বিচ্ছিন্ন নয়। আলাদা ব্যষ্টি হয়ে যেমন, তেমনি আবার সে সমষ্টিরও একজন। কোনওটাই মিথ্যে নয়।

মিথ্যে হওয়া উচিতও নয়। ঠিকই তো। মানুষ যেমন আলাদা আবার তারা গোষ্ঠীবদ্ধও। কে না স্বীকার করবে? কিন্তু এখনকার রীতিই হচ্ছে আগে সমষ্টিকে দেখা. ব্যক্তির কথা তারপরে। আগে সংখ্যা, তারপর জন। কিন্তু আবার তোমার বিজ্ঞানই বলছে, পৃথিবীর কোনও দুটো জিনিসই হুবহু একরকমের নয়। পৃথিবীর প্রতিটি বালুকণা, প্রতি গাছ, প্রতি ফল, প্রতিটিই আলাদা রকমের। সে-হিসেবে পৃথিবীতে ঠিক একরকমের জিনিস একাধিক নেই। তাই কারও সঙ্গে কাউকে যোগ করে এক-এ এক-এ দুই করাই যায় না। কারণ প্রতিটি একই আলাদা এক। তার কোনও দ্বিতীয় নেই। এটা আগে সবাই তোমরা বোঝো তার পর সমষ্টির কথা ভেবো। জনগণ বা জনসংখ্যা এ-কথাগুলো অস্পষ্ট। প্রতিটি মানুষকে আগে বুঝতে দাও যে সে সমাজ-সংসারের অপরিহার্য একজন। তাকে না হলে চলে না! নইলে মানুষ কেবলমাত্র সংখ্যাতত্ত্ব হয়ে যাবে, মানুষের ভিড় দেখে মানুষেরই ক্লান্তি আসবে। ভবিষ্যৎ বচনেরও দরকার নেই, এসে গেছে।

এই সব তত্ত্বকথা শুনেই বোধহয় ননীবালা উঠে পড়লেন। বললেন, যাই দেখিগে।

ব্রজগোপাল নড়েচড়ে বললেন, আমিও উঠে পড়ি।

ননীবালা মাথা নেড়ে বললেন, উঠবে কী! বোসো। আসছি।

ননীবালা চলে গেলেন। রান্নাঘরের দিকেই বোধহয়। সেদিক থেকে তাঁর গলা পাওয়া গেল, বাচ্চা

ঝিটাকে বকছেন—তুই খাবার বেড়ে নিয়ে যাচ্ছিস কিরে! সবাইকে কি আর ঝি-চাকরে খাবার দিতে আছে! এ কি যে সে লোক। রাখ, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

অজিত চুরি করে একটু হাসল। শ্বশুরমশাইয়ের দেওয়া অনেক হাজার টাকার চেক আঁচলে বেঁধে শাশুড়ি ঠাকরুনের ভালবাসাটাসা সম্মানবোধ সব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বিয়ের সম্পর্কটা কি তবে অর্থনৈতিক? ভালবাসার জাল কি টাকা আর নিরাপত্তার ভিতরে বীজাকারে নিহিত রয়েছে! সংসার থেকে প্রায় বহিষ্কৃত ব্রজগোপালের তো এত সম্মান প্রাপ্য নয়! সংসারের কারও ব্রজগোপালের প্রতি কোনও দরদ আছে বলে অজিত জানে না। সবাই বলে, এ লোক হচ্ছে একগুঁয়ে জেদি মানুষ, কারও সঙ্গে বনে না। কথাটা ঠিক। তবু অজিত মনে মনে এ লোকটাকে হিংসে করে। এ লোককে দিনে দশবার বউয়ের অকারণ রাগ অভিমান ভাঙাতে হয় না, এ লোক বিবাহের বহন করার কষ্টকর কাজ থেকে কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নিতে পেরেছে। এ-সব তো বটেই। তার ওপর অজিত দেখেছে, এ লোকটার ভিতরে এখনও ভালবাসা মরে যায়নি। নইলে কেউ বয়স্ক জামাইয়ের হাতে মিষ্টি খাওয়ার টাকা দিতে পারে। অজিত হলে পারত না।

একটা চমৎকার মিঠে কমলা রঙের শাড়ি সদ্য পরে ঘর আলো করে শীলা ঘরে এল। চুলটুল আঁচড়ে এসেছে। চোখে এখনও কান্নার ফোলাভাব। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দগদগে। মুখে একটু পাউডারের ছোঁয়া। এ-সবই মুখের ভাব, কান্নার চিহ্ন ঢাকার ছদ্মবেশ। কোনও কথা না বলে প্রণাম করল বাপকে। ব্রজগোপাল মাথায় হাত রাখলেন। একটু বেশিক্ষণ রাখলেন যেন। চোখটা বুজলেন। ইষ্ট স্মরণ করলেন বোধহয়।

শীলা বাপের পাশ ঘেঁষে বসল। আঁচলটা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে চাপা দিল একটু, বলল, কেমন আছ বাবা?

ব্রজগোপাল উদাস স্বরে বললেন, আছি। আমাদের আর বিশেষ কী। তোরা কেমন?

শীলা মাথা নেড়ে বলে, ভাল।

ব্রজগোপাল একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন, সংসারের কাজটাজ সব করিস নিজের হাতে?

শীলা হাসল একটু। বিবাহিতা বয়স্কা মেয়ের উপযুক্ত প্রশ্ন নয়; তবু বলল, করি।

করিস! বলে ব্রজগোপাল হাসলেন, কখন করিস? তুই তো চাকরি করছিস, শুনেছি।

দুটোই করি।

চাকরি করিস কেন? অজিতের আয়ে তোদের চলে না? ওর তো রোজগার ভালই।

আজকাল সব মেয়েই করে।

তাই করিস? নিজের ইচ্ছেয় নয়? প্রয়োজনও নেই?

শীলা একটু অপ্রস্তুত হয়। অনেক দিন পর বাপের সঙ্গে দেখা, তাই বোধহয় মানুষটাকে ঠিক বুঝতে পারে না। একপলক বাবাকে দেখে নিয়ে বলে, টাকার দরকার তো আছেই। সময় কাটে না। লেখাপড়া শিখেছি, সেটাও তো কাজে লাগানো উচিত।

ও। বলে ব্রজগোপাল বুড়োটে মুখে দুষ্টুমির হাসি হাসেন। যেন তাঁর এ মেয়েটা নাবালিকা এবং তিনি তার সঙ্গে খুনসুটি করছেন। বলেন. মেয়েরা যেন এত টাকার ফিকির খোঁজে রে? পুরুষ যদি খাওয়াতে-পরাতে না পারে তখন না হয় কিছু করলি। এমনি খামোখা চাকরি করবি কেন? এককাঁড়ি টাকার মধ্যে কী সুখ? বেশি বহির্মুখী হলে মেয়েদের মধ্যে ব্যাটাছেলের ভাব এসে যায়। সংসারেও বিরক্তি আসে। স্বামীর সঙ্গে পাল্লা টানে। ও ভাল নয়।

শীলা মাথা নিচু করে চুপ করে আছে। তর্ক করে লাভ কী!

ব্রজগোপাল তেমনি দুষ্টুমির হাসি হাসেন। আচমকা বলেন, ট্রামে-বাসে পুরুষের বগলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে রোজ যাতায়াত। সেও বিশ্রী। পুরুষেরাও তো ভাল নয়। কত লোকের মনে কত বিকৃতি আছে। তার চেয়ে বরং হামলে সংসার করবি। নিজের হাতে রেঁধেবেড়ে দিবি। স্বামীর সেবা

নিজের হাতে করলে ভালবাসা আসে। এ তো আর অংশীদারি কারবার নয় যে, যে-যার ভাগের টাকা ঢেলে সংসার চালালি।

ব্রজগোপাল ডান হাতে মেয়ের দীর্ঘ এলো চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, বাচ্চাকাচ্চা যখন হবে তখন দেখবি। মা-বাপ ছাড়া বাড়িতে কেমন অনাথ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ননীবালা খাবারের প্লেট আর চা হাতে এলেন।

ব্রজগোপাল একটু তাকালেন মাত্র সেদিকে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ও নিয়ে যাও।

মেয়ের বাড়িতে এসেছ, একটু মুখে দিতে হয়।

যখন-তখন খাই না আজকাল । অভ্যেসও নেই। ওদের সব দাও।

বলে ছেলের দিকে তাকালেন। অজিত লক্ষ করে, রণেনের ঠোঁট আবার নড়ছে। আঙুলে বাতাসে একটু শূন্য আঁকল রণেন। কাকে যেন উদ্দেশ করে নিঃশব্দে কী বলে যাচ্ছে।

॥ আটত্রিশ ॥

এই ছেলেটার বরাবরই বড় ঘাম হয়। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবু গলা বগল ভিজে গেছে। ননীবালা উঠে ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, তুই অত ঘামিস কেন?

রণেন দু'হাতে মাথা চেপে বসে ছিল। মুখ তুলে কেমন একরকম ভাবে তাকায়। পাঁজর কাঁপিয়ে একটা শ্বাস ছাড়ে। হঠাৎ চোখের ডিম উলটে শিবনেত্র হয়ে বলে, মা! মাগো!

গর্ভধারিণীকে নয়, যেন জগজ্জননীকে ডাকছে। ডাকটা বেখাপ্পা শোনাল। এ ছেলেটা ননীবালার তেমন সুখী নয়। বউটা তেমন হয়নি, বড্ড খোঁড়ে। ছেলেটা বউয়ের তাল রাখতে পারে না। বোধহয় ঝগড়াটগড়া হয়েছে আবার। এখন তো বাসায় ননীবালা নেই, রক্তারক্তি হলে চেঁচাবে কে, আটকাবে কে! ননীবালার বুকটা তাই কেঁপে ওঠে। কী করার আছে! বুড়ো হলে মানুষের আর সংসারে বিশেষ কিছু করার থাকে না। এখন তো আর কোলের সেই ন্যাংলা রণো নয়, এখন পুরোদস্তুর স্বামী-বাপ সংসারের ভিত। এই ছেলেকে ননীবালা আগলে রাখেন কী করে! তবু মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা ছায়া ফেলে। বড় বেশি দিন মেয়ের বাড়িতে থাকা হল। এবার একবার ওদিককার সংসারে গা ফেলবেন।

বলেন, কবে নিয়ে যাবি আমাকে?

রণেন চোখ বুজে ছিল। বলল, যবে খুশি।

আজই চল। বুবাই-টুবাই ঠাকুমা ছাড়া কেমন করে সব? মা তো জো পেয়ে খুব ঠ্যাঙায়। ঠ্যাঙাড়ে বাড়ির মেয়ে।

খাবারটাবার সব পড়ে আছে। কেউই ছোঁয়নি এখনও। শীলা বলল, বাবা, খাও।

ব্রজগোপাল প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোরা খা। এ বয়সে যখন-তখন খাওয়া বড় অপয্যি। যত কম খাই, তত ভাল থাকি।

একটু শরবত দিই বাবা?

ব্রজগোপাল একটু ঘাড় নাড়লেন। মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন। বললেন, সেটা বরং সহজে গলা দিয়ে নামবে। নিজের হাতে করে আনিস যদি।

আনছি। বলে শীলা উঠে গেল।

ব্রজগোপাল চার দিকে এক বার তাকালেন। কিন্তু কিছুই দেখলেন না। দৃষ্টিটা এসে স্থির হল ননীবালার চোখে। ননীবালাও চেয়ে আছেন। একদৃষ্টে। তাঁদের ভালবাসা ছিল। সে-আমল এখনকার মতো নয়। সারা দিন কেউ কারও দেখা পেতেন না। রাতে দেখা হত, কিন্তু কথা হত ফিসফিসিয়ে,

যেন গহিন রাতের চোরেও না শুনতে পায়। এই যে এখন যেমন, মা-বাপের সামনে মেয়ে আর জামাই বসে থাকে, কিংবা ছেলে আর ছেলের বউ, এ রকমটা ভাবা যেত না। নিজের বাবার সঙ্গে কখনও বসে কথা বলেননি ব্রজগোপাল, সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকতেন। ননীবালার সঙ্গে যৌবন বয়সে বেড়াতে বেরিয়েছেন জোড়ে, এমন মনে পড়ে না। বউ ছিল শুধু রাতটুকুর জন্য, বেহানেই সে হয়ে যেত সংসারের একজন, স্বামীর কেউ নয়। তবু ভালবাসা তো কিছু কম ছিল না। আর এখন স্বামী-স্ত্রী বড় বেশি পায় পরস্পরকে। এদের বিরহ কম। এদের বিবাহের পুরোহিত হচ্ছে কামস্পৃহা। মনে মনে তাই বড় তাড়াতাড়ি দূরের হয়ে যায়। কাছে কাছে থেকেও। কামটুকু ফুরোলেই আর থাকে কী! অবশ্য ব্রজগোপাল আর প্রমাণ করতে পারেন না যে, তাঁর এবং ননীবালার মধ্যে ভালবাসা ছিল। প্রমাণের দরকারই বা কী? মনে মনে তিনি তো জানেন, তাঁর হৃদয় ননীবালার নিরন্তর মঙ্গল প্রার্থনা করে। স্থির জানেন, পরজন্মেও তাঁর বউ হবে এই ননীবালাই। ছাড়ান কাটান নেই, এই এক সম্পর্ক। এ-সব কি প্রমাণ করা যায়।

ননীবালার চোখে চোখ আটকে গেল। ননীবালাই সামলালেন আগে। ঘোমটা ডান কানের পাশে দিয়ে একটু টেনে দিয়ে বলেন, বুকের ব্যথাটা কি আর হয়?

না।

শরীর-টরীর খারাপ হলেও তো খবরবার্তা কেউ দেয় না যে গিয়ে পড়ব।

ব্রজগোপাল মুখটা ফিরিয়ে নেন। বলেন, ব্যস্ত হওয়ার মতো ব্যাপার কী! মেঘু ডাক্তার আমলকী আর মধু খেতে বলেছিল। সেই খেয়ে এখন ভালই আছি।

রাতে বোবায়-টোবায় ধরলে কে ডেকে দেয়! বুড়ো বয়সে একা শোওয়া ভাল নয়, রাতটা ভয়ের।

ব্রজগোপাল তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলেন, শোয় একজন। উটকো লোক, পেল্লায় ঘুম তার। আর বোবায় ধরবে কাকে, ঘুমই নেই।

ননীবালা বলেন, মাটির ভিতের ঘর। এই গ্রীষ্মকালটায় সাপখোপ সব ঘরেদোরে চলে আসে। বহেরু যেন ঘরের গর্তটর্ত সব বুজিয়ে দেয়।

ব্রজগোপাল উত্তর করলেন না। তবু ননীবালার এই উদ্বেগটুকু বহুকাল বাদে তাঁর বেশ লাগছিল। এটা টাকায় কেনা জিনিস নয়, স্বার্থত্যাগ মানুষকে কখনও-সখনও একটু-বা মহৎ করে। ব্রজগোপালের ছাইচাপা মূর্তিটা বোধহয় ননীবালার বুকের মধ্যে ঘষা-মাজা খেয়ে একটু স্পষ্ট হল।

কিন্তু মেয়েমানুষের দোষ হল, সে বেশিক্ষণ আলগা ভালবাসার কথা বলতে পারে না। তার মধ্যে হঠাৎ বিষয় সম্পর্কিত কিংবা সংসারের আর পাঁচটা কথা এনে ফেলে। বেসুর বাজতে থাকে।

যেমন ননীবালা এ-সব কথার পর হঠাৎ বলেন, এবারও বহেরু ধানের দাম কম দিল।

ব্রজগোপাল মাথা নাড়লেন। বললেন, বহেরুর হাতে তো সব নয়। ছেলেরাই এখন সব করছে।

কেন, বহেরুর কী হয়েছে?

ব্রজগোপাল হাসলেন। বললেন, কী আর হবে। বুড়ো হয়েছে। সে যত দিন দেখত তত দিন বুঝেসুঝে দিত। ছেলেরা দেবে কেন? তারা বর্গা আইন ভাল জানে। যা দেবে, তাই নিতে হবে।

তুমি তো আছো, তুমি দেখতে পারো।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, ছড়ানো জমি, অত কি একটা মানুষ দেখতে পারে! তার ওপর মাঝেমধ্যে তো মানুষের মন বিষয় থেকে উঠে যায়। আমার ও-সব আর ভাল লাগে না। নিজের হাতে গাছপালা যে এখনও করি সে ফলপাকুড় খাব কি টাকা হবে বলে নয়। গাছ জন্মায়, ফল দেয়, ফুল ফোটে, সেটা চোখে দেখার একটা মায়া আছে, তাই।

ননীবালা রাগ করেন না, তবু অনুযোগের সুরে বলেন, সেটা কি কোনও কাজের কথা! ছেলেরা যেতে পারে না বলে তুমি রাগ করো। কিন্তু তারা কি তোমার মতো বিষয়বুদ্ধি রাখে! তুমি না দেখলে তো হবে না।

ব্রজগোপাল একটু চুপ করে থেকে বলেন, তারা না গেল, তা বলে আমাকে যক্ষবুড়ো হয়ে থাকতে হবে কেন? তোমার তো মোটে পাঁচ কি ছ' বিঘে, আমার তার চেয়ে ঢের বেশি। যা ফসল হয় তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রাখি, বাকি চার ভাগ খয়রাতিতে যায়।

সে কেন?

ওটা আমার একটা ব্রত।

দেবত্র করলে নাকি?

ও রকমই।

ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে ননীবালা প্রশ্ন করেন, সে কেন?

ব্রজগোপাল ননীবালার উদ্বেগটা টের পেয়ে হেসে মাথা নেড়ে বললেন, ভয়ের কিছু না। ঠাকুর দেবতার নামে লিখে দিইনি, আমার নামেই আছে, আমার ওয়ারিশ যারা তারাই পাবে। কিন্তু পেলেও আমার ব্রতটা যেন তারা না ভাঙে। ফসলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ নেবে, বাকি থেকে যা আয় হবে তা দিয়ে সম্পত্তি বাড়াবে। আর মানুষকে দেবে-থোবে, অনাহারীকে খাওয়াবে, গরিব-গুরবোদের দেখবে, কাঙাল ফকিরকে সাহায্য করবে।

সে তো ভূতভোজন হল। তবে ওরা খাবে কী?

ওদের খেতে বারণ নেই। খেয়ে পরেও অনেকের খানিকটা থাকে। দেয় না।

সে যাদের অনেক আছে তারা দিকগে। আমাদের তো জমিদারি নেই। বছরে সামান্য ক'টা টাকা। সেও ভূতভোজনে গেলে জমি লোকে করে কেন?

নিজের জন্যেই করে। জমি, সম্পত্তি, চাকরি সবই নিজের জন্য। সে একশোবার। আবার গরিব-গুরর্বো, শিয়াল-কুকুর, কাক-শালিখকেও ভাত দেয়, কাপড় দেয়, সেও নিজের স্বার্থেই দেয়। জগৎ-সংসারে থাকতে হলে প্রতিকূলভাবে না থেকে অনুকূলভাবেই থাকা ভাল। আমি তৃপ্ত হই, আমার চার দিক তৃপ্ত হোক।

ও-সব ভাল কথার দিন কি আর আছে! শখের গয়না বেচে জমি কিনেছিলে, আমারটা খয়রাতি হতে দেব কেন?

ব্রজগোপাল ননীবালার দিকে একটু চেয়ে থাকেন। সামান্য বুঝি অভিমানভরে বলেন, তোমার দুঃখ কী! সংসারে আটকা আছো, বুঝতে পারো না মানুষজন কীভাবে বেঁচে আছে। চার দিকে মানুষজন যত উপোসী থাকবে, যত অতৃপ্ত অশান্ত হবে তত তোমার সংসারে তাদের হাত এসে পড়বে। ছেলেদের ভালই যদি চাও তো তারা যে সমাজ-সংসারে আছে তার আগে ভাল করো। শুধু আলাদা করে রণেন-সোমেনের ভাল চাইলেই কি ভাল হয়?

ননীবালা ধৈর্য রাখতে পারেন না। আঁচলে বাঁধা চেকটার কথা ভুলে গিয়েই বুঝি তেড়ে ওঠেন, ও-সব আমি বুঝি না। ব্রত-ট্রত ওরা মানতে পারবে না। পুরো ফসলের হিসেব যদি না পাই তো জমি বেচে দেব।

অজিত এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। একটু বিষণ্ণ, একটু অনুতপ্ত, শীলার জন্যই। এখন হঠাৎ বলল, উনি বোধহয় ওইভাবে একটা ব্যালান্স অফ ইকনমির চেষ্টা করছেন।

ননীবালা জামাইয়ের দিকে একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। জামাইটা বড় ট্যাটন। লঘুজন-গুরুজন মানে না, পট পট কথা বলে। একটু আগে বুড়ো শ্বশুরের মুখে মুখে জবাব করছিল। বললেন, কী বললে?

অজিত হেসে বলে, গরিবকে দিয়ে-থুয়ে খুশি রাখলে বড়লোকদের এক রকম সুবিধেই হয়। ধর্মও হয়, শোষণেরও সুবিধে হয়।

ননীবালা কথাটা বুঝলেন না। মানলেনও না। গম্ভীরভাবে বললেন, বড়লোকরা যা খুশি করুক। আমরা করতে যাব কেন?

শীলা চমৎকার কাচের গ্লাসে ঠান্ডা শরবত এনে রাখল টেবিলে। মুখখানা একটু ভার, একটু নত। বাপের কাছে বসে মুখ তুলে মাকে বলল, চুপ করো তো মা। বাবার জমি যা খুশি করুক, তোমার কী!

আহা, বড় বাপসোহাগী হলেন! ননীবালা এই ঢঙে কথা বলে রাগের মাঝখানেও হেসে ফেললেন একটু। পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে বললেন, ওঁর জমি মানে ছেলেদেরও। ছেলেরা তো আকাশ থেকে পড়েনি, ওঁরই জন। পর নয়।

ব্রজগোপাল মলিন একটু হাসলেন। বললেন, ছেলেরা বাপের পর হবে কেন, তারা শ্রাদ্ধের অধিকারী।

কথাটার মধ্যে একটু ব্যঙ্গ ছিল, আর বুঝি নিজের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা। ননীবালা দমলেন না, বললেন, শ্রাদ্ধের কথা ওঠে কেন? বেঁচে থাকতে কি অধিকার থাকে না নাকি?

মাথাটা দু' হাতে কঠিনভাবে চেপে ধরে বসে ছিল রণেন। হঠাৎ উত্তেজিত মুখ তুলে বলে, মা!

এবার জগজ্জননীকে নয়, নিজের মাকেই বলা। বরাবর এ ছেলেটা বাপের পক্ষ হয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। শেষমেষ বাপের উপরেও বিরক্তি এসেছিল। তবু বুঝি এখনও কিছু পক্ষপাত রয়ে গেছে। ননীবালা ঝাঁকি দিয়ে বললেন, কী, বলবি কী? বাপের সম্পত্তিতে তোর দরকার নেই, এই তো! তোর না থাক, সোমেনের আছে। আমি ছাড়ব না।

ব্রজগোপাল খানিকটা হতভম্বের মতো চেয়ে থাকলেন। শীলা শরবতের গ্লাসটা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বলে, বাবা খেয়ে নাও তো। ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে এনেছি, আবার গরম হয়ে যাবে।

ব্রজগোপাল গ্লাসটা ধরলেন না। ননীবালার দিকে চেয়ে বললেন, বরাবর দেখে আসছি তুমি সংসারের দুটো পক্ষ তৈরি করে নিয়েছ। আমি এক দিকে, ছেলেরা আর তুমি অন্য দিকে।

শীলা মাকে একটু চোখ টিপে বলে, মা, তুমি একটু রান্নাঘরে যাও তো। ঝি মেয়েটাকে দুধ জ্বাল দিতে বলে এসেছি, ও গ্যাসের উনুন নেবাতে পারে না। যাও।

ননীবালা নড়লেন না। এর একটা বিহিত করতে হবে বলে বসে রইলেন। বললেন, ওঁর কথাটা শুনিছিস। আমি দু'পক্ষকে পর করেছি। ঝগড়া লাগিয়েছি।

তা নয়। ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বললেন, তা নয়। দু'পক্ষকে বুঝতে দিলে না তাদের সম্পর্ক কী। কথাটা বোঝানো শক্ত। তর্ক করে বোঝানো যাবে না। তবু তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে বলি, আমিও ছেলেদের ভাল চাই।

ভাল চাইলে আর দেবত্র করে দেবে কেন?

অজিত আবার আস্তে করে বলে, ব্যালান্স অফ ইকনমি।

ঠাট্টা! ব্রজগোপাল জামাইয়ের দিকে তাকালেন। তারপর নিজের ক্যাম্বিসের ব্যাগটার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, না বাবা, ব্যালান্স অফ ইকনমি আমি বুঝি না। আমি বড় স্বার্থপর। সার বুঝি, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে, সেইজন্যই ভয় খাই। আমার সন্তানের দুধ-ভাত একদিন নিরন্ন, বর্বর মানুষ যদি কেড়ে নেয়! তাই এই ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ। তবে একজন অ্যাকচুয়ারির সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। বিজ্ঞ লোক। সে ওই ব্রতর কথা শুনে বলেছিল, এ ভারী আশ্চর্য জিনিস ব্রজদা, ঘরে ঘরে সবাই এমন করলে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দুর্দিন, অভাব কষ্ট সব লোপাট হয়ে যাবে। আমি তো অত বুঝি না। বুড়ো বামুন যেমন বলে গেছে তেমন করি। আমার বুঝটা বড় সাদামাটা।

কেউ কোনও কথা বলার আগেই ব্রজগোপাল উঠে দাঁড়ালেন। ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। শীলা উদ্বিগ্ন মুখে বলে, শরবতটা খেলে না বাবা!

ব্রজগোপাল সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, ভূতভোজনের কথা বলছ, ভয় বোধহয় হ্যাঙালি

ক্যাঙালিরা এসে রোজ ভাগাড়ের শকুনের মতো পড়বে। কিন্তু এ কাঙালি ভোজনের ব্যবস্থা নয়, দরিদ্রনারায়ণ সেবাও নয়। বসিয়ে খাওয়ালে মানুষের গতরে মরচে পড়ে যায়, আর নড়ে না। এ কে না জানে! অযোগ্য অপাত্রে দান, দাতা গ্রহীতা দুই-ই ম্লান। কিন্তু সেবাবুদ্ধি থাকলে মানুষের ঠিক অভাবের জায়গায় হাত বাড়ানো যায়। কত বড়মানুষেরও কত অভাব আছে। আমি যেমন বলছি তেমন করলে নিজের মধ্যেও সেবাবুদ্ধি জাগে, পাঁচজনেও দেখে শেখে। তা এ-সব কথা তো তোমাদের কাছে অবান্তর।

ননীবালা কী বলতে যাচ্ছিলেন, রণেন আবার বলল, মা!

ননীবালা ছেলের দিকে চেয়ে সামলে গেলেন। রণেনের মুখ লাল। চোখ দুটো বড় ঘোলাটে লাগল। ননীবালা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে বললেন, উঠলে নাকি?

উঠি। অনেক দূর যেতে হবে।

ননীবালা বাধা দিলেন না। বললেন, দুর্গা, দুর্গা। জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে শীলার দিকে চেয়ে বলেন, আজ আমি এক বার ও-বাড়ি যাব। ছাদ থেকে আমার জামা-কাপড়গুলো আনতে বল তো!

রণেন রয়ে গেল, মাকে নিয়ে বাসায় ফিরবে। ব্রজগোপাল একাই বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় পা দিয়ে হঠাৎ টের পেলেন, তিনি বড় বেশি একা। ভয়ংকর একা। বুকের ভিতরটা যেন এক চৈত্রের ফুটি-ফাটা মাঠ, সেখানে এক ন্যাড়া গাছে বসে দাঁড়কাক ডাকছে, খা, খা।

উত্তেজনায় বীজমন্ত্রের খেই হারিয়ে গিয়েছিল। ছেঁড়া সুতোটা মনের মধ্যে কাটা ঘুড়ির সুতোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। সেটা ধরে ফেললেন তিনি। বীজনাম অতিদ্রুত স্পন্দিত হতে থাকল শরীরে, রক্তে, হৃৎস্পন্দনে। নির্ঝরের মতো। অবগাহন হতে থাকে। তবু মনটা ভাল না। ছেলেটা ভাল নেই, মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে একটা কেমনতর ভাব! আর ননীবালা! এখনও এই আয়ুর সাঁঝবেলায় দু' হাতে ছেলেদের স্বার্থ আগলাচ্ছেন। ব্রজগোপাল তাই এই মস্ত জগৎসংসারে বড় একা।

নির্জন পাড়াটা পার হয়ে বড়রাস্তায় লোকজনের মাঝখানে চলে এলেন ব্রজগোপাল। তখনও মনটা ওইরকম খাঁ-খাঁ করছে। আপন মনে বলেন, দূর বেটা, তুই যে নেংটে সেই নেংটে। একা আবার কী? একটা শ্বাস ছেড়ে ব্রজগোপাল বাস-স্টপে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। চার দিকে ফুলিয়ে ওঠা কলকাতার ভিড়, ট্রামে-বাসে লাদাই ভিড়, ধুলোটে আকাশ। তারই মাঝখানে হঠাৎ যেন বহু দূরের এক চিত্র ভেসে ওঠে। যজ্ঞস্থলীতে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। যজ্ঞধূমের গন্ধ ভেসে আসে। কী পবিত্র পৃথিবী! কী পরিষ্কার এর বাতাস! ব্রজগোপাল তাঁর পরিবারের কথা ভুলে গেলেন। বুড়ো বামুনের মুখটা ভেসে ভেসে ওঠে নাসামূলের আজ্ঞাচক্রে।

ননীবালা যখন ঢাকুরিয়ার বাড়িতে পা দিলেন তখন সন্ধে হয়ে গেছে। নাতি-নাতনিরা মাস্টারের কাছে পড়ছিল, ঠাকুমাকে দেখে দৌড়ে এসে সাপটে ধরল। ঠাকুমা, ঠাকুমা ডাকে অস্থির। বাচ্চাকাচ্চা না থাকলে আর বাড়ি কী! শীলার বাড়িতে এ ক'দিন যেন হানাবাড়িতে কেটেছে। হাঁফ ধরে গিয়েছিল।

ছোট নাতিকে ট্যাঁকে গুঁজে নিজের ঘরের তক্তপোশে এসে বসলেন। ভারী একটা নিশ্চিন্তভাব। বীণা এক বার উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করে গেল, চা খাবেন তো! হচ্ছে।

দিয়ো, বললেন ননীবালা। নাতিটা ধামসাচ্ছে। বললেন, বড় ডাকাত হয়েছিস দাদা।

চার দিকে চেয়ে দেখলেন। সোমেনের টেবিলে ছাইদানিটা উপচে পড়ছে পোড়া সিগারেট, দেশলাই কাঠি আর ছাইতে। বিছানার চাদর নোংরার হদ্দ। মশারিটা আগে খুলে ভাঁজ করে রাখা হত, এখন চালি করে রাখা, তাতে ময়লা হয়েছে। বিছানায় ছাড়া জামা-কাপড় পড়ে আছে।

এ-সব সারতে থাকেন ননীবালা, আর আপনমনে বক বক করেন। পরোক্ষে বউকেই শোনানো।

ঘরদোর সেরে পরনের কাপড়টা পালটে নিলেন। ভাঁজ করে তুলে রাখতে যাবেন এমন সময়ে আঁচলের গেরোটা চোখে পড়ল। সাবধানে পেট আঁচলে বেঁধে এনেছেন। সেই চেকটা। খুলে শত ভাঁজের দাগ ধরা চেকটা আলোয় দেখলেন একটু। চোখে জল এল। অনেকগুলো টাকা। এত টাকা ও-মানুষ জন্মে কখনও দেননি ননীবালাকে। এতকাল গরিবেরই ঘর করেছেন ননীবালা, টাকার মুখ বড় একটা দেখেননি। লোকটা যে শেষ পর্যন্ত দেবে এমন বিশ্বাস ছিল না। তবু দিল তো!

ননীবালা চেক হাতে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখে জল। বুকে বৃষ্টিপাত। নাতিটা অন্যধারে বসে চিঁড়ের মোয়া খায় টুক-টুক করে। ননীবালার মনটা উদাস হয়ে যায়। লোকটা অনেক টাকা এককথায় দিয়ে দিল। বিষয়-সম্পত্তিও সব দেবত্র না কী যেন মাথামুন্ডু করছে। হল কী মানুষটার! চিরকালই ঘর-জ্বলানি, পর-ভুলানি ছিল বটে, কিন্তু এখনকার রকমসকম বুঝি কিছু আলাদা। সংসারের ওপর থেকে মায়া তুলে নিচ্ছে না তো! দুম করে একদিন ননীবালাকে রেখে চলে যাবে না তো! বুকটা কেঁপে ওঠে। গভীর শ্বাস পড়ে।

ও-ঘরে বীণার খর গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কী যেন হল। একটু কান পাতলেন ননীবালা। কিছু বুঝতে পারলেন না।

বীণা এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বলে, মা, এক বার ও-ঘরে আসুন।

কী হল?

আপনার ছেলে কেমন করছে।

বীণার মুখটা থমথমে। ননীবালা উঠলেন। বললেন, ওকে সবাই বড় জ্বালায়।

শোওয়ার ঘরে রণেন বসে আছে চেয়ারে। কপালে একটা জায়গায় থেঁতলে যাওয়ার ক্ষতচিহ্ন, রক্ত।

ননীবালা গিয়ে ছেলেকে ধরলেন, কী হল?

বীণা বাইরের ঘরের দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে, ওকে আমি বলেছিলাম হাতমুখ ধুয়ে এসে চা খাও। গেলও না। তারপর আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসে দেখি ড্রেসিং টেবিলের কোনায় মাথা ঠুকছে।

সে কী? ননীবালা রণেনের দু' কাঁধ ধরে মুখ নিচু করে বড় ছেলের মুখ দেখলেন, ঠিক যেমন করে মা শিশু-ছেলের মুখ দেখে, কী হয়েছে তোর, ও রণো! মাথা খুঁড়ছিলি কেন?

রণেন তার তীব্র ঘোলাটে চোখ তুলে এক বার অদ্ভুতভাবে তাকাল। গভীর শ্বাসের মতো শব্দ করে বলল, মা!

৷৷ উনচল্লিশ ৷৷

মানুষ কত অসুখী! এরা জানেই না কী করে জীবনযাপন করতে হয়। ব্রজগোপালের মন বড় কু-ডাক ডাকে। সবাইকে ছেড়ে আলগা আছেন তবু সমস্ত মনপ্রাণটা ওদের দিকে চেয়ে বসে থাকে। ঠাকুর ওদের সুখে রাখো।

হাওড়ায় এসে ট্রেন ধরলেন ব্রজগোপাল। অফিস-ভাঙা-ভিড়। আজকাল বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে পা-দুটো রসস্থ হয়। ওপরে ঝোলানো হাতল ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল, তাই হাতটাও ভেরে আসে। ক্যাম্বিসের ব্যাগটা ধরে রাখতে কষ্ট হয়। চারধারে মানুষের শরীরের ভাপ, গরম, ঘাম, দুর্গন্ধ। মাথার ওপর পাখা নেই। হাওয়ার জন্য দরজার হাতলে বিপজ্জনকভাবে মানুষ ঝুলছে। বদ্ধ, চাপা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে ব্রজগোপালের মাথাটা দু'বার চক্কর খেল। মাথাঘোরার রোগটা তাঁর যৌবন বয়স থেকেই। তালুতে তিল তেল চেপে ঠান্ডা জলে মাথা ধুলে একটু আরাম লাগে। দাঁড়িয়ে

ব্রজগোপাল বারবার বীজমন্ত্র জপ করার চেষ্টা করেন, বারবার সুতো ছিঁড়ে যায়। কাটা ঘুড়ির মতো মনটা ভেসে বেড়াচ্ছে। এক বার রণেনের মুখটা মনে পড়ে, এক বার ননীবালার, মেয়ে-জামাই, ছেলে-বউ, নাতি-নাতনি সকলের কথাই ভাবেন। বীজমন্ত্র ধরে রাখতে পারেন না। শরীরটা আজ বড় বেগোছ। এই দমচাপা অবস্থায় কারা ভিতরের দিকে ফুটবলের ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করছে। সেই গোলমালটা অসহ্য লাগে, আর সিগারেটের ধোঁয়া।

পরপর কয়েকটা স্টেশন পার হতেই ভিড় পাতলা হয়ে গেল। উত্তরপাড়া পার হয়ে বসার জায়গা পেলেন ব্রজগোপাল। ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে বসলেন। হালকা জিনিসপত্র কখনও বাঙ্কের ওপর রাখেন না তিনি। যদি চুরি যায়! চুরি যাওয়া ভাল নয়। যার চুরি যায় তার চরিত্রের মধ্যে কোথাও ঢিলেমি আছে, অসংলগ্নতা আছে। যত সামান্য জিনিস হোক, ব্রজগোপাল সদাসতর্ক থেকে পাহারা দেন!

একটা মোটামতো পশ্চিমা লোক সরে বসে ব্রজগোপালকে জায়গা করে দিয়েছিল, লোকটার গায়ে খয়েরি রঙের একটা পাঞ্জাবি, পরনে পরিষ্কার ধুতি, মাথায় একটু টিকি আছে, হাতে খোলা একটা ছোট বই। খুব মন দিয়ে বইটা পড়ছে। ব্রজগোপাল একটু উঁকি দিয়ে দেখেন, বইটার পাতা জুড়ে দেবনাগরী অক্ষরে কেবল একটা কথাই ছাপা আছে, সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলেন না তিনি। পশ্চিমা লোকটা পাতা ওলটাল। আবার দেখেন, ওই একই কথা লেখা সারা পাতায়, সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম। বুঝলেন, সারা বই জুড়ে ওই একটি কথাই আছে। গল্প না, প্রবন্ধ না, ধর্মকথা না।

ব্রজগোপাল একটু ঝুঁকে বললেন, এটা কীসের বই ভাই?

লোকটা মুখ তুলে একটু হাসল। পাকানো মোচের নীচে বেশ ঝকঝকে হাসি। মাঝবয়সি মানুষ। দেখে মনে হয় কোথাও বেশ ভাল বেতনের দায়োরান-টারোয়ানের চাকরি করে। বলল, রামসীতার নাম আছে বুড়াবাবা, আর কুছু নাই।

সে তো মনে মনে জপ করলেও হয়।

এ ভি জপ আছে। পড়তে পড়তে জপ হয়ে যায়।

তাই তো! ব্রজগোপাল ভারী মুগ্ধ হয়ে যান। এই হচ্ছে এৎফাঁকি বুদ্ধি। দুনিয়ার টানাপোড়েন, গণ্ডগোলে অস্থির মন যখন জপ ধরে রাখতে পারে না তখন এইভাবে নিজেকে জপে বদ্ধ করা যায় বটে। লোকটার ওপর ভারী শ্রদ্ধা হয় ব্রজগোপালের। কেমন নিবিষ্ট মনে নিজেকে রামসীতার নামের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে! লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করে তাঁর। কিন্তু ইষ্টনাম জপে বাধা হবে বলে বলেন না। কিন্তু মানুষের মধ্যে আন্তরিক ভক্তিভাব দেখলে তাঁর চোখে জল আসে।

গ্রীষ্মকালে হাওড়া স্টেশনে বেশ সস্তায় নাগপুর না কানপুর কোথাকার যেন কমলালেবু বিক্রি হয়। কদমার মতো ছোট ছোট লেবু, ভারী মিষ্টি। বোঁটার কাছে কিছু পচা-পচা ভাব থাকে, সেটুকু চেঁছে ফেলে বেশ খাওয়া যায়। হাওড়া স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার আগে এক বুড়ো মানুষকে লেবু কিনতে দেখেছিলেন। সঙ্গে পোঁটলা-পুঁটলি আছে, বৃদ্ধা স্ত্রীও আছেন সঙ্গে। এই ভিড়ে 'আমি বুড়ো মানুষ বাবা, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে বাবা' এইসব বলতে বলতে *ঠেলেঠুলে* গাড়িতে উঠে পড়তেও দেখেছিলেন। এখন ভিড় পাতলা হওয়াতে দেখা গেল, সেই বুড়ো মানুষটি বেশ গুছিয়ে বসেছেন উলটো দিকের দূরের জানালার ধারে। জানালার ধারের জায়গা দখল করা এই গরমকালে বেশ মুশকিল। কিন্তু ঘোড়েল গোছের লোকটা দিব্যি জায়গাটা বন্দোবস্ত করেছেন। এও এৎফাঁকি বুদ্ধি। বুড়োর উলটো দিকে কয়েকটা চ্যাংড়া ছেলে বসেছে, ইয়ারবাজ। তাদের সঙ্গে জমিয়ে তুলেছেন বেশ। পাশে আধ-ঘোমটায় গিন্নি মানুষটির মুখ বেশ প্রসন্ন। দেখলেই বোঝা যায়, এরা বেশ সুখী লোক। বিষয়-সম্পত্তি আছে, ছেলেরা প্রতিষ্ঠিত, তেমন কোনও দুশ্চিন্তা নেই। চপাচপ লেবু খাচ্ছেন, মুখে হাসি।

চ্যাংড়াদের একজন বলে, জায়গাটা যে ছেড়ে দিলাম দাদু, তার বদলে কী দেবেন?

কী দেব বাবা, বুড়ো মানুষ আমরা, পরের ভরসায় রাস্তায় বেরোই। তোমরা জায়গা ছাড়বে না তো কে ছাড়বে! ইয়ং ম্যান সব, স্পিরিটেড।

ও-সব গ্যাস ছাড়ুন। বর্ধমানে কিন্তু মিহিদানা খাওয়াতে হবে।

আর মিহিদানা! সে কি আর আছে। এখন কেবল বেসম আর চিনির রস। ও আমরা খাই না। আবার লেবু মুখে দিয়ে কোয়ার ফ্যাঁকড়া মুখ থেকে টেনে বের করতে করতে বলেন, তোমাদের বয়সে বুড়ো মানুষ আর মেয়েছেলে দেখলেই আমরা জায়গা ছেড়ে দিতুম।

আমরাও তো দিলাম। আর একজন চ্যাংড়া বলে, আরও কিছু করতে হবে নাকি বলুন না। আমরা খুব পরোপকারী। বয়সের নাতনি-টাতনি থাকলে বলুন, দায় উদ্ধার করে দেব।

লোকটা খুব ঘোড়েল। একটুও ঘাবড়ায় না। হাতের আধখানা লেবু গিন্নির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ধরো! গিন্নি মুখটা ফিরিয়ে নেন, হাতের একটা ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দেন হাত। বুড়ো লেবুটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, না ভাই, নাতনি-টাতনি নেই। দুই ছেলে। ছোটটির জন্যই মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম কলকাতায়।

একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে, পছন্দ হল?

না বাবা। বড্ড রোগা। মুখখানা আছে এক রকম, কিন্তু হাওয়ায় হেলে পড়া চেহারা। ও আমার পছন্দ নয়।

তা ওখানে খ্যাঁটটা কেমন হল দাদু?

বুড়ো হাসে। মাথা নেড়ে বলে, খাইয়েছে ভাল। এই দুর্দিনে বেশ বড় বড় রাজভোগ, পায়েস, ফলটল।

বছরে ক'বার মেয়ে দেখেন দাদু? দু'-তিনবার করে হলে তো বেশ ভালই ম্যানেজ হয়, কী বলেন? আচ্ছা ম্যানেজার বাবা!

অন্য একটা চ্যাংড়া বলে, বুড়ো ভাম।

বুড়ো সবই শোনে। একটু হাসিমুখে লেবু খায়, আর বলে, তা ছেলের বিয়ে দিতে হলে মেয়ে তো দেখতেই হবে।

তা ছেলেকে মেয়ে দেখতে পাঠালেই হয়।

হুঁ! ওদের চোখকে বিশ্বাস কী? বয়সের ছেলে, কটা চামড়া কি ভাসা ভাসা চোখ, কি একটু পাতলা হাসি দেখে মাথা ঘুরে যাবে। আমাদের চোখ অন্য রকম।

কী রকম চোখ দাদু? ছুঁচে সুতো পরাতে পারেন?

বুড়ো হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে, চোখ দু'খানা এখনও আছে, বুঝলে! ঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা হয়। রোজ সকালে নিজের হাতে মালা গেঁথে পরাই। লক্ষ্মীনারায়ণকে বলে রেখেছি, যেদিন চোখের দোষ হবে সেদিন থেকেই মালা বন্ধ।

বলে ঘোড়েল মানুষটা মাথা নেড়ে হেসে বলে, বুঝলে তো! চোখে আজও পষ্ট দেখি। লক্ষ্মীনারায়ণের প্রাণে ভয় আছে না, মালা বন্ধ হয়ে যাবে যে!

ব্রজগোপাল মুখটা ফিরিয়ে নেন। পশ্চিমা লোকটা সীতারামের নাম পড়ে যাচ্ছে নীরবে। জপ হচ্ছে। অন্তরের গভীরতম প্রার্থনা সংসার থেকে সুতো বেয়ে চলে যাচ্ছে কি তাঁর কাছে! ব্রজগোপাল চোখ বুজে একটা গভীর শ্বাস ফেলেন। রণেনের কথা কেন যে এত বার মনে হচ্ছে! ভাবতে ভাবতে একটু শিউরে ওঠেন বুঝি! ছেলেটা শীলার বাসায় বসে একা-একা কথা বলছিল। সংসারে বোধহয় ন্যাজে-গোবরে হচ্ছে একটু অল্প বুদ্ধির ছেলেটা। ছেলেবেলায় টাইফয়েডের পর মাথার দোষ হয়েছিল। মাথাটা কমজোরি। তেমন ভাবনা-চিন্তার চাপ পড়লে কী হয় না হয়। সংসারের আত্মীয়রা বড় স্বার্থপর, মন বুঝে, অবস্থা বুঝে চলে না। রণেনের মনে ব্যথা দিয়ে কারও কিছু করা উচিত নয়।

কিন্তু সে কি ওর বউ বোঝে। না কি ননীবালাই বোঝেন? না কি বাচ্চাকাচ্চা বা ভাই-ই বোঝে! সংসার এত মন বুঝে চললে তো স্বর্গ হয়ে যেত। রণেনের জন্য ব্রজগোপালের মনটা তাই ভাল লাগে না। ওকে বোধহয় সবাই অতিষ্ঠ করে, অপমান করে। কিছুকাল আগে এক বার দৌড়ে গিয়েছিল গোবিন্দপুরে। স্টেশনে দেখা হতে বলেছিল, সংসারে যত অশান্তি। আজকেও এক বার ট্যাক্সিতে হঠাৎ 'বাবা' বলে ডেকেছিল, কিন্তু কিছু বলেনি। কিছু যেন বলার ছিল। লজ্জায় পারেনি।

ব্রজগোপাল চোখ বুজে চাপ ধরা বুকের ভারটা আর-একটা দীর্ঘশ্বাসে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। মনের মধ্যে বলে রাখলেন—সব ভাল রেখো। ওদের সুখে রেখো।

সংসারে ওই যে লেবু খাচ্ছে ঘোড়েল লোকটা, মান অপমান জ্ঞান কিছু কম, লোভী ওই সব মানুষেরা এক রকম সুখেই আছে। ঠাকুরদেবতার সঙ্গে পর্যন্ত চুক্তি করে কাজ করে। ব্রজগোপাল আবার একটা শ্বাস ছাড়লেন। পাশের লোকটা আপনমনে সীতারামের নাম পড়ে যাচ্ছে। ওটা বুঝি বুড়ো বামুনেরই ইঙ্গিত। ব্রজগোপাল ছিঁড়ে-যাওয়া জপের সুতোটা আবার চেপে ধরলেন। জপ চলতে থাকল।

স্টেশনে যখন নামলেন তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। এদিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। প্লাটফর্মের মোরম ভেজা। বাতাসে ভেজা মাটির আঁশটে গন্ধ। গাছপালার হাওয়া-বাতাসের পাগল শব্দ। আকাশে হালকা মেঘ রেলগাড়ির মতো চলে যাচ্ছে, অন্ধকারেও বোঝা যায়। প্লাটফর্মে নেমে দাঁড়াতেই ওই বাতাস, ওই গাছ-মাটির গন্ধ, পৃথিবী-জোড়া অন্ধকার ব্রজগোপালের মন থেকে ধুলোবালি ঝরিয়ে দিল। মন-খারাপটা ভুল পড়ল একটু।

প্লাটফর্মের গাছতলায় কাঠের বেঞ্চে একজন লোক গা-মাথা একটা গামছায় ঢেকে বসে আছে। বেঞ্চের নীচে, পায়ের কাছে হারিকেন। আলোটা বাতাসে দাপাচ্ছে। নিববে। লোকটার পাশে রাখা একটা ছাতা, খোলেনি, প্রকাণ্ড অন্ধকার চেহারাটা দেখেই চিনতে পারেন ব্রজগোপাল।

একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন, বহেরু।

লোকটা নড়েচড়ে উঠে বসে, বলে, আলেন?

হুঁ।

ভয় লাগতে ছিল, ভাবলাম বুঝি আজ আর আলেন না। ঠাকরোন আর ছানা-পোনারা সব ভাল?

হুঁ, তুই কখন থেকে বসে আছিস?

অনেকক্ষণ। তখন বেলা ছিল।

বহেরু উঠে দাঁড়ায়। বলে, আজকাল আপনি না-থাকলি ভাল লাগে না।

ব্রজগোপাল চুপ করে থাকেন। একটু কষ্ট হয়। বহেরুটা এবার বুড়ো হল এই সত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সে। বলেন, তা তুই কেন বসে আছিস দুপুর থেকে, আমার তো রাতেই ফেরার কথা, তখন না হয় কালীপদ বা কোকা আসতে পারত!

তাদের বড় গরজ! বামুনকর্তার মহিমা তারা কী বুঝবে!

তা না হয় আমি একাই যেতাম। অভ্যেস তো আছে। দুপুর-দুপুর এসে বসে আছিস, বাদলায় ভিজেছিস নাকি!

স্টেশনের বেড়া পার হয়ে রাস্তায় পড়ে বহেরু ডান ধার বাঁ ধার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বলে, না। স্টেশনের ঘরে গিয়ে বসলাম তখন। বাদলা তেমন হয়ওনি। ছিটেফোঁটা। হারিকেনটা তুলে এক বার দেখল বহেরু। আগুনটা দাপাচ্ছে। বলল, এটা নিবে গেলেই চিত্তির।

টর্চ তো ছিল।

সে কোন বাবু নিয়ে বেরিয়েছে কি হারিয়ে এসেছে কে তার খোঁজ রাখে। রাবণের গুষ্টি। বলে বহেরু খুব বিরক্তির গলায় বলে, বেরুনোর সময়ে খুঁজে পেলাম না। আপনারও তো একটা ছিল।

ব্রজগোপাল থেমে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতড়ে ছোট্ট টর্চবাতি বের করে দেখেন। বোতাম টিপতে

একটা অত্যন্ত মলিন লাল আলো ধীরে জ্বলে উঠল। ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, এটারও ব্যাটারি ফুরিয়েছে। আজ আনব বলে ঠিক করেছিলাম, তাড়াহুড়োয় ভুলে গেলাম।

নলিনীর দোকানে পাওয়া যায়।

দূর! ও ব্যাটা চোর। তিন আনার জিনিস আট আনা হাঁকে। কলকাতায় কিছু সস্তা হয়। গায়ে গায়ে সব দোকান গজিয়েছে, রেষারেষি করে বিক্রি করে। তাই সস্তা।

বহেরু বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল। বলল, ভারী শহর। বহুকাল যাই না। বহেরু একটু থেমে গিয়ে ব্রজগোপালের হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলে, আপনি একটু আগু হোন। আলো পেছনে থাকলিই ভাল।

ব্রজগোপাল এগোন। বহেরু পিছনে বোধহয় ফস করে বিড়ি ধরাল। আলোতে সামনে ছায়াটা লম্বা হয়ে দিগন্তের অন্ধকারে মিশে গেছে। ব্রজগোপাল ঠাহর করে হাঁটেন। বহেরু বলে, সেই দুপুর থেকে বসে বসে মাছি মশা তাড়াচ্ছি। কত ট্রেন গেল।

ব্রজগোপাল শুধু বিরক্তিসূচকভাবে বললেন, হুঁ।

বাসায় বসে দিন কাটে না।

তোর তো কত কাজ। ব্রজগোপাল বলেন।

একঝলক বিড়ির গন্ধ আসে পিছন থেকে। বহেরু নিরাসক্ত গলায় বলে, করতে গেলে কাজ ফুরোয় না, সে ঠিক। কিন্তু এখন মনে করি, আর কাজ কী কাজে! কাজ করে মেলা কাজি হয়েছি। সংসার বেশি দেখতে গেলে কাজিয়া লেগে যায়। ছেলেগুলো সব হারামি, জানেন তো।

ব্রজগোপাল একটু ভেবেচিন্তে বলেন, তোরই রক্তের ধাত তো। পাজি তুই কি কিছু কম ছিলি?

বহেরু একটু হাসল। বলল, বুড়োও তো হলাম।

বুড়ো মনে করলেই বুড়ো। মনে যদি বয়স না ধরিস তো বুড়ো আবার কী! বুড়োটে ভাবটাই ভাল না।

বহেরু একটু চুপ করে থাকে। বলে, এক পাঞ্জাবি জ্যোতিষকে ধরে এনেছিলাম পরশুদিন। বললাম থাকার জায়গা দেব, ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করব, থাকো। রাজি হল না। তা সে হাতটাত দেখে বলল, আমার কপাল নাকি খুব ভাল। তীর্থে মরব।

ব্রজগোপাল মরার কথা সহ্য করতে পারেন না। একটু এঁটেল মতো পিছল জায়গা পার হচ্ছিলেন সাবধানে। একটু ঝাঁকি মেরে বললেন, তীর্থে মরলে কি আর দুটো করে হাত-পা গজাবে নাকি! যত ইল্লুতে কথা! বেঁচে থেকে কী কী করতে পারবি তাই ভাব।

আর কী করব! আপনি কথা কবেন, পায়ের কাছে বসে শুনব। পাপ-তাপ কেটে যাবে। কত কুকর্ম করেছি।

কর্মের পাপ কর্ম দিয়ে কাটাতে হয়। তত্ত্ব শুনলে কাটে না।

আপনার কেবল ওই কথা। কাজ তো অনেক হল।

তবে কি তোর পছন্দমতো কথা বলতে হবে নাকি! কাজকে তোর এত ভয় কীসের?

বহেরু একটু চুপ করে থাকে। বিড়ির ধোঁয়া বুকে চেপে রাখতে গিয়ে দু' দমক কাশি আসে। বলে, কাজকে ভয় নেই। ছেলেগুলো বড় ব্যাদড়া। সামলাতে পারি না। এই সেদিনও রক্তের দলা ছিল সব, এখন ডাকাত হয়ে উঠেছে।

হলই বা। বিশ্বসংসারে কাজ বলতে কি কেবল নিজের সংসারের কলকাঠি নাড়া? অন্য কিছু নেই?

কিছুতে মন লাগে না। মেঘু ডাক্তারের ভূত নয়নতারাকে ভর করে রাতবিরেতে কত কথা বলে!

কী বলে? ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বলেন।

পুরনো একটা সাঁকো পার হয়ে ব্রজগোপাল বড় রাস্তা ছেড়ে আল ধরার জন্য নেমে পড়লেন।

বহেরু রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল, লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরে বলল, দুর্যোগে ফুলতলার রাস্তা দিয়ে যাবেন নাকি!

ভারী তো দুর্যোগ! ক'ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে, সেইজন্য আধ মাইল ঘুরপথে যাব নাকি!

বহেরু ইতস্তত করে বলে, রাস্তাটা ভাল নয়। রাম রাম।

ব্রজগোপালের মায়া হয়। বহেরুর কোনওকালে ভয়ডর বলে বস্তু ছিল না। এখন কেমন কোলঘেঁষা ছেলের মতো ভয় পায়। ব্রজগোপাল নীচে থেকে রাস্তার ওপর ওর বিশাল ছায়াটা দেখলেন। হারিকেনের খুব নিবন্ত আলোয় চোখ-মুখ অসুরের মতো দেখায়। এখন লোকে ওকে দেখলে ভয় খেয়ে যাবে। কিন্তু আদতে বহেরু ডাকাতের নিজের প্রাণেই এখন নানা ভয়ভীতির বাসা। ব্রজগোপাল বললেন, ভয়টা কীসের? বলে আবার রাস্তায় উঠে এলেন, যেখানে জেদি কুকুরের মতো পা জড়িয়ে আছে বহেরু। এখন ওকে টেনেও নেওয়া যাবে না।

আবার আগে আগে হাঁটেন ব্রজগোপাল, পিছনে বহেরু। বহেরু পিছনে গলাখাঁকারি দেয়। বলে, ঘরে বসেই সব শুনতে পাই। রাতবিরেতে নয়নতারা কাঁদে। ঘুমোয় না মেয়েটা। কেবল খোনাসুরে বলে, রক্ত বৃষ্টি হবে, মাটির তলায় বসে যাবে গ্রামগঞ্জ। আর আমার নাম ধরে ডেকে বলে, তুই মরবি শেয়াল কুকুরের মতো, ধাঙড়ে পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়ে আসবে ভাগাড়ে। গতিমুক্তি হবে না, অন্ধকারে হাতড়ে মরবি চিরকাল, জন্ম হবে না। এই সব বলে।

ছাতাটা একটু মাটিতে ঠুকল বহেরু। গলাখাঁকারি দিল। আলোটা তুলে কল ঘুরিয়ে তেজি-কমি করল। ব্রজগোপাল ফিরে তাকালেন একটু। মুখের কাছে আলোটা তুলেছে তাই মুখটা দেখতে পেলেন। আর কিছু নয়, কেবল মুখে একটা আলগা বুড়োটে ছাপ পড়েছে। ব্রজগোপাল একটু চিন্তিতভাবে হাঁটেন। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ একটু ফুর্তির সুরে বলেন, দূর ব্যাটা! দলমাদল কামান দাগায়ে দে, সব ভয়ভীতি খসে পড়বে।

বহেরু পিছন থেকে তাড়াতাড়ি দু' কদম এগিয়ে আসে, কী বলেন কর্তা?

বলি কী! জয়গুরু জগন্নাথ। তুই ছিলি কাজের কাজি, এখন হয়েছিস ভাবন কাজি। এত ভাবিস ক্যান? চাষাভুষো মানুষকে কি ভাবনাচিন্তা সয়? মনের মুখে নাড়া জ্বেলে দে। দুনিয়া কি তোর? এত ভাবনা কেন?

তত্ত্বকথার গন্ধ পেয়ে বহেরু কান খাড়া করে। ব্রজগোপালের ঘাড়ে শ্বাস ফেলে পিছু পিছু হাঁটে গৃহপালিতের মতো। বলে, ঠাকুর থাকবেন তো আমার কাছে? ছাড়ে যাবেন না তো!

দূর ব্যাটা।

বহেরু একটা শ্বাস ফেলে। বিড়বিড় করে বলে, ঠাকুর, থাকেন। থাকেন।

॥ চল্লিশ ॥

মাথায় ধপধপে সাদা পাগড়ি বাঁধা, ছোটখাটো কালোকোলো, গোপাল-গোপাল চেহারার একটি বছর তেইশ-চব্বিশের ছোকরা সেদিন সকালে এ গাঁয়ের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন লোক। সঙ্গীরা সব বয়সে বড়, কিন্তু হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল ওই ছোকরাই ওদের সর্দার, সঙ্গে সাপের ঝাঁপি।

রাতটা ভাল কাটেনি বহেরুর। গন্ধ বিশ্বেস এখনও বেঁচে আছে; আশি কি নব্বুই পার হয়ে গেল বুঝি। এই সব বয়সে সে-মানুষ বড় জ্বালাতন করে। বোধ-বুদ্ধি সব জল হয়ে যায়। গন্ধ বিশ্বেস তার ওপর আবার চোখে দেখে না। দিনরাত লোকজনকে হাঁকডাক পাড়ে। সবচেয়ে বেশি জ্বালায় খাওয়া আর হাগা-মোতা নিয়ে। তার ওপর আছে মিথ্যে কথা। খেয়ে বলে খাইনি। বিছানায় হেগে-মুতে

ফেললে বেড়াল-কুকুরের ঘাড়ে দোষ চাপায়। নিপাট ভালমানুষের মতো এইসব করে। কাছেপিঠে ছেলেপুলেদের হাতে মোয়াটা-নাড়ুটা আছে টের পেলে কেড়ে খেয়ে ফেলে। অশ্রাব্য গালাগাল দেয় আজকাল রেগে গেলে। ভয় পায় বহেরুকে।

বহেরু আজকাল কেমন চুপসে গেছে। এই গরমকালটায় উঠোনে কি দাওয়ায় তাড়ির ওপর এক ছিলিম গাঁজা চড়িয়ে গামছার ওপর পড়ে থাকত। বড়জোর একটা খাটিয়ায় একটু শক্ত একটা বালিশ। তাতেই খুব বড়মানুষি। খুবই অথৈ ঘুম তার। তবু একটু-আধটু শব্দ হলেই কুকুরের মতো উঠে বসে। নেশা-টেশা ঘুম-টুম কোথায় কেটে যায়। হাঁক ছেড়ে বৃন্দাবনকে ডাকে। বৃন্দাবন এক সময়ে দোস্তো-মানুষ ছিল বহেরুর। জাতে নমস্য শূদ্র। এখন সে বহেরুকে মনিব বলে মানে। বহেরু গাঁ রাত-বিরেতে পাহারা দেয়। হাঁক ছাড়তেই দুটো চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই এসে যায় বৃন্দাবন। গহিন রাতে আর চাকর-মনিবের সম্পর্ক থাকে না বটে, তবু লাঠিগাছটা আর লালটেম নামিয়ে রেখে একটু দূরে বসে সে। গাঁজা সাজে। প্রথমটায় বহেরু টানে, পরে বৃন্দাবন। বিষয়ী কথাবার্তা হয় দু'-চারটে। বৃন্দাবন কম কথার মানুষ। এই রাতবিরেতেই যা তার পেট থেকে কিছু কথা বেরোয়। বহেরুর গোটা দুই খুনের সে জলজ্যান্ত সাক্ষী আছে। কিন্তু 'রা' কাড়ে না কখনও। এমনকী কখনও বহেরুর চোখে চোখও রাখে না। ওই এক ধারার মানুষ। বিশ্বাসী, কর্মঠ, কিন্তু একটু আবছামতো। দুনিয়ায় সে কী জন্য আছে, কী তার ভবিষ্যৎ, কার জন্য করছে কম্মাচ্ছে তা বোঝাই যায় না। মুখে টিকিট আঁটা আছে। সারাদিন তার দেখা পায় না বহেরু। শুধু এই রাতে দু'-এক বার। দু'-এক বারই ওঠে বহেরু। আবার ঘুমোয়। ভোরবেলা, আলো ফোটার অনেক আগে প্রথম জাগে খুড়োমশাইয়ের পবিত্র খোল। কালীপদর প্রভাতী শোনা যায়—জাইগতে হবে, উইঠতে হবে, লাইগতে হবে কাজে...। পেছুতে তিনটে লাথি কষাতে হয় জামাই শালার। কোনওকালে বহেরুর কোনও কম্মে লাগেনি। মাগ-ছেলের টানে পড়ে আছে। তিনটে লাথি ওর বহুকাল ধরে পাওনা হয়ে আছে, দিনক্ষণ দেখে একদিন সেই তিনটে ঝাড়বে বহেরু, বিদেয় করে দেবে বহেরু গাঁ থেকে। কালীপদর পর বা আগে ওঠেন ব্রজকর্তা। ততক্ষণে ভোরের জানান পড়ে যায়।

এইরকমই ছিল নিয়ম। কিন্তু বহেরুর ঘুমটাকে পেঁচোয় পেয়েছে আজকাল। তাড়ি-গাঁজার চাপান সত্ত্বেও পয়লা প্রহরটায় শেয়ালের হুড়ড়া শুনে কাটে। তারপর ঝিমুনি আসে। কিন্তু সে কতক্ষণ? হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে ধড়াধ্বড় ধাক্কা খেয়ে উঠে বসে। চার দিকে কোনও রাতে জ্যোৎস্নার দুধ চলকে ভেসে যায়। কোনও রাতে বা শ্যামামায়ের এলোকেশ। বহেরু সেই নিশুত রাতের মধ্যে জেগে উঠেই কেমন একা-বোকা বোধ করে। ভয় হয় হঠাৎ সব মরে-টরে গেল নাকি! এত নিঝুম কেন চার দিক! নাকি আমিই মরে এলাম পরকালের রাজ্যে! হাঁক পাড়লে বৃন্দাবন আসে ঠিকই, গাঁজার চাপানও হয়। কিন্তু গা বড় ছমছম করে আজকাল। গুণিন এসে খুব কষে ঝাঁটাপেটা করে গেছে নয়নতারার ভূতকে। আজকাল, নয়ন খুব নিঃসাড়ে পড়ে থাকে সারাদিন। কথাবার্তা কয় না, খেতে চায় না, উঠতে চায় না, চুল বাঁধে না। মেঘুর ভূত যদি ছেড়েও থাকে তবু অন্য কোন্ ভূত আবার চেপে বসেছে কে জানে! ছলছলে চোখে চেয়ে থাকে, কাঁদে মাঝে মাঝে। বিপদ বুঝে জামাইয়ের সন্ধানে একদিন গিয়েছিল বহেরু। আগের দিনে পেয়াদারা বাবু হত না কোনও দিন। আজকাল হয়। রিষড়ের এক কেমিকাল কোম্পানিতে লোকটা পিয়ন ছিল, এখন কেরানি। কী ভেবে সে শ্বশুরকে তুমি-তুমি করে বলতে লাগল। মেয়েকে ফিরে নেওয়ার কথা বলতেই খুব রাগ, বলে, ওকে ঠান্ডা করা আমার কর্ম নয় বাপু। তোমাদের ঘরের ধাত আলাদা। আমাদের সঙ্গে মেলে না।

সুমুন্দির পো। নিল না। ফিরে বিয়ে করেছে, নেওয়ার জো-ও নেই। তবু নয়নতারা যে কাঁদে তা বোধহয় সেই লোকটার কথা ভেবেই। যৌবন বয়সে অনেক ছটফটানি ছিল। এখন সে-সব মরে টান এসেছে বুঝি। রাতে ঘুম ভেঙে সেই কান্নার গোঙানি মাঝেমধ্যে শোনে বহেরু। দুঃখ বড় একটা হয় না, কেবল নিশুতরাতে ওই কান্না শুনে কেমন একটা ধন্ধভরা ভয় লাগে।

ক'দিন হল আর একা শোয় না সে। দোকা লাগে। কিন্তু দোকা পাওয়াই মুশকিল। বড় বউ ছেলেপুলে নাতিপুতি নিয়ে শোয়, বয়সের মানুষ, তার কথা ওঠে না। বিন্দুর মাও লজ্জা পায় বোধহয়। রাজি হয় না। লোকলজ্জা বলে কথা আছে। ব্রজ বামুন থাকেন গাঁয়ে। বলবেন কী! অগত্যা বড়ছেলে কপিল বাপের কাছে-পিঠে বিছানা ফেলে শোয়। এরা বাবু মানুষ। গদি ছাড়া ঘুম হয় না। তোশক বালিশ কত কী লাগে, বউ এসে মশারি গুঁজে দিয়ে যায়। তার ওপর রাতবিরেতে উঠে উঁকি মেরে দেখো, বাবু হাওয়া। কখন গিয়ে বউয়ের পাশবালিশ হয়ে পড়ে আছে। এখন এই দোকা পাওয়াটাই একটা সমস্যা। নিশুত রাতটা বড় নটখটে জিনিস। চাষার দুর্বল মাথায় কত আকাশ-পাতাল ঢুকিয়ে দেয়! হাঁক পাড়লে বৃন্দাবন আসে ঠিকই, কিন্তু সে তো ওই রকম বিটকেল মানুষ। রসকষ নেই। তা ছাড়া আপনজনা কেউ তো নয়। দূরের মানুষ দূর হয়ে বসে থাকে। বহেরুর বড় দোকা হতে ইচ্ছে করে আজকাল। মাঝলা ছেলে কোকাকে বললে সে এসে শোয়। কিন্তু বড় ভয় বহেরুর, গায়ে খুনের রক্ত, বাপকেও ভাল চোখে দেখে না। টুঁটি টিপে ধরে যদি ঘুমের মধ্যে। যদি কৈফিয়ত চায়?

রাতে উঠে তাই আজকাল বহেরু ছমছম করা চারধারের মধ্যে বসে বসে ভাবে। কাল রাতেও ভাবছিল, দোকা ছাড়া পৃথিবীতে বাঁচা যায় না। এই যে এত জমি-জোত, ধান-পান, কার জন্য। দশভূতে খাচ্ছে। সে খাক, একা খাওয়ারও তো মানে হয় না, সে খাওয়ার আনন্দ নেই। কিন্তু কেবলই মনে হয়, একজন বুকের কাছের আপনজন হলে তার জন্য সবকিছুর একটা আলাদা আনন্দ থাকত। কত ফিসফিসানো কথা জমে আছে বুকের মধ্যে! বলত। সে থাকলে এই রাতের ভয় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে মনিষ্যিটা কে! মেয়েমানুষ কোনও? না কি ছেলেপুলে? না কি নাতিপুতি? কে? কার জন্য এত সব করেও কিছুই নেই বলে তিন প্রহর রাতে উঠে বসে থাকে বহেরু? বুকের ফাঁকা জায়গা থেকে শ্বাসবায়ু বেরিয়ে গেলে মনে হয় ফের বুঝি বাতাস টানতে পারবে না। গেল দম ফুরিয়ে কলের পুতুলের। নয়নতারার ঘাড়ে ভর করে মেঘু যে শাপশাপান্ত করেছিল তা কি ফলে গেল নাকি! এত ফাঁকা ফাঁকা তো লাগত না কখনও!

পাঁচ রবিবারে এবারের বোশেখ মাস গেছে। ঝড়া কিংবা খরায় যাবে। ঝড়ার লক্ষণ নেই। খরায় ধরেছে বছরকে। সে-সবও ভাবে বহেরু। জোত-জমি ধান-পান, গোরু-ছাগল ছেলেপুলে, বউ-নাতি। সব ভেবেও একটা জায়গায় এসে থেমে যায়। জীবনের একটু বৃত্তান্ত জানা হল না। কার জন্য? কে সেই আপনজনা!

কাল রাতে ঘুমটা এসেছিল সময়মতো। একটু আফিং দিয়েছিল বৃন্দাবন। সেইটে খাওয়াতে ঠিক যেমন চেনা লোক মজা করতে পিছন থেকে এসে চোখ টিপে ধরে, বিন্দুর মায়ের সঙ্গে যখন দেওর-বউঠান সম্পর্ক ছিল তখন বিন্দুর মাও এসে ও-রকম ধরত পিছন থেকে, ঠিক তেমনি ঘুমটা এসে পিছন থেকে চোখ টিপে ধরল। মাইরি-ঘুম একেবারে। সেই সময়ে একঝাঁক শিয়াল চেঁচিয়ে উঠেছিল, আর সেই সঙ্গে গন্ধ বিশ্বেস। কোথাও কিছু না, 'চোর, চোর' বলে চেঁচাল খানিক। লাঠি ঠুকে ঠুকে কেশে বুকের গয়ের তুলে ফেলল ঘরের মেঝেয়। পেচ্ছাপের হাঁড়ি ওলটাল একটু বাদে। বেড়াল-কুকুরদের শ্রাদ্ধ করতে লাগল। হাঁড়িটা যে বেড়ালে উলটিয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্যই বোধহয় লাঠি দিয়ে ঘা-কতক বসাল ওদিকে। বেড়ালে, কুকুরে, গন্ধ বিশ্বেসে সে এক তুলকালাম কাণ্ড। বেড়ালরাই বা ছাড়বে কেন, কার লেজ মাড়িয়েছে, সেও ফ্যাঁস করে দিয়েছে আঁচড়ে, মাঝরাতে গন্ধর তখন হাপুস নয়নে কান্না। বহেরু তখন উঠে গিয়ে ইঞ্জিনের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে গন্ধর ঘরের ঝাঁপের দড়ি খুলে ঢুকেছে। গন্ধ চোখে দেখে না বলে হারিকেনের রেওয়াজ নেই। অন্ধকারে মাটির ভিটেয় তরল পদার্থ গড়িয়ে পিছল, তার মধ্যে পা হড়কাল বহেরুর। দাঁতে দাঁত কড়মড় করে বহেরু গিয়ে গন্ধ বিশ্বেসকে টেনে তুলল মেঝে থেকে। বসাতে যাচ্ছিল ঘা কতক। প্রথম থাবড়াটা মেরেই খেয়াল গেল, আরে, এ লোকটাও যে একা! সারাদিন খাই-খাই করে,

হাগে-মোতে, কাঁদে, যাই করে, সেও তো দোকা নয় বলেই। গন্ধ তখন ভয়ে কাঁপছে, আর ধরা গলায় বলে, আমি কিছু জানি না বাবা, আমি কিছু জানি না বাবা...

বুড়ো বয়সে বাপ-ভাইয়ের তফাত গুলিয়ে ফেলেছে ভয়ে। গন্ধকে তাই মায়াবশে ছেড়ে দিল বহেরু। বেড়ালগুলোকে অন্ধকারেই সাঁত সাঁত করে কয়েকটা লাথি কষাল। বড় রাগ। চারধারে পৃথিবীটার ওপরেই বড় রাগ তখন বহেরুর। দুর্গন্ধের চোটে গন্ধর ঘরে টেকা যায় না, তবু অন্ধকারে খানিক দাঁড়াল বহেরু। গন্ধর বুড়ো হাতটা এসে তার হাত ধরল। নাকের জলে চোখের জলে ফঁত ফঁত শব্দ করতে করতে গন্ধ বলে, তুমি মা-বাপ বাবা, মেরো না গো। কাঁকালের হাড়টায় মটাং করে বড় লেগেছে।

বহেরু হাতটা ধরে বিছানায় তুলে দিল। বলল, ফের চেঁচাবে না। পড়ে থাকো মটকা মেরে।

তারপর বৃন্দাবনকে ডেকে গাঁজা টেনে আবার পড়ে থেকেছে বহেরু। ঘুম আসেনি। দাদার গায়ে হাত তোলাটা ঠিক হল না। ভাবল। আবার ভাবে, ওই রকমভাবে সেও বেঁচে থাকবে নাকি! পাগল! বয়সে যখন ভাঁটি বুঝবে তখনই পোকামারা বিষ তাড়ির সঙ্গে গুলে খেয়ে রাখবে একদিন। ব্রহ্মময়ী, মরণটা যেন সুন্দর হয়।

কথাটা ছ্যাঁৎ করে নিজেকেই লাগে। মরণ! ও-কথাটা এতকাল ভাবার ফুরসত হয়নি তো!

রাতটা ভাল গেল না। হিজিবিজি হয়ে কেটে গেল। সকাল ইস্তক দাওয়া গরম করে উঠে পড়ল বহেরু। সাঁওতালটা ক'দিন ধরে শ্বাস টেনে যাচ্ছে। মরেনি। ক'মাস ধরেই পড়ে আছে। যাই-যাচ্ছি করে এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে অন্তিমকাল। সময় মাপা আছে, সেটা ফুরনোর ওয়াস্তা। ইচ্ছে করলেই তো মরা যায় না। তার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে বহেরু। বিড়বিড় করে বলে, বেঁচে থাকো বাপু, টিঁকে থাকো। একটা বেঁটে বক্কেশ্বরকে আনাচ্ছি, দু'জনে মিলে বাহার হয়ে ঘুরবে।

আলো ফুটতে না ফুটতেই ছোকরাটাকে দেখা গেল, বহেরুর খামারবাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। ঝোপঝাড়ে উঁকিঝুঁকি মারছে, গোয়ালঘরের পেছুতে গিয়ে কী খুঁজছে। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেছে, বাচ্চাকাচ্চারাও মুখের এড়ানি, চোখের পিচুটি ধোয়ার সময় পায়নি, মজা দেখে জুটে গেছে।

গোয়ালঘরের সামনেটায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল বহেরু, লোকটা সে সময়ে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে একটু সম্মান দেখাল। বললে, এ হচ্ছে নাগভিটে। বাস্তু আমরা ধরি না। অন্য সাপ থাকলে ধরব?

বহেরু লোকটার দিকে চেয়েই বুঝতে পারে, গুণী লোক। তার চোখ চকচক করে। বলে, ধরো। দেখি।

এক গ্লাস জল আর একটা তুলসীপাতা চেয়ে নিল লোকটা। পোঁটলা থেকে একটা এতটুকুন মা কামরূপ কামাখ্যার ছবি বের করে ধরল গ্লাসটার ওপর। রেলগাড়ির মতো মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। স্যাঙাতরা সব ঘিরে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কামাখ্যার ছবির দর্পণে কী দেখে চেঁচিয়ে বলল, গোয়ালের পিছনে, খড়ের গাদায়। যাঃ।

স্যাঙাতদের হাতে একটা শুকনো শিকড়। তারই টুকরো-টাকরা ভেঙে গোয়াল ঘরের চারধারে ছিটোতে থাকে। ছানাপোনারা ভিড় করে সঙ্গে সঙ্গে এগোয়। বহেরু হাঁক ছাড়ে, তফাত যা।

ওদের ক'জনা গোয়ালের ভিতরে ঢুকে যায়। একজন গোয়ালঘরের পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ায়। ভিতরে খড়ের গাদায় একটা সর-সর শব্দ ওঠে, ফোঁসানি শোনা যায়। গায়ে কাঁটা দেয় বহেরুর। আজকাল বড় একটা ভয় ভয় ভাব ধরেছে তাকে। গোয়ালে খড়ের গাদায় সাপখোপ, বিছে তো থাকবেই। জানা কথা। না ঘাঁটালে ওরা ওদের মতো থাকে। তবু এখন কেমন ভয় খায় সে। নিত্যি তিরিশ দিন দোবেলা গোয়াল ঘাঁটে সে, যদি কোনও দিন দিত ঠুকে! ভাবতেই গা হিম।

পিছনের বেড়ায় একটা টিন আলগা লাগানো। বাইরে দাঁড়ানো লোকটা সটান সেই টিনটা টেনে

খুলে ফেলল মড়াত করে। সাঁত করে হাত ঢুকিয়ে দিল ফোকর দিয়ে। একটা হ্যাঁচকা টানে হাতটা বের করে আনতেই সবাই দেখে, মাঝারি লম্বা একটা গোখরো। লেজের দিকটা ধরে আছে, মাথাটা শূন্যে ঝুলছে, একটু একটু তোলার চেষ্টা করছে মাত্র। ঝাঁপি নিয়ে একজন এগিয়ে আসে। পাগড়ি বাঁধা লোকটা সাপের গায়ে মন্ত্র পড়ে হাত বুলিয়ে দেয়। সাপটা ঝাঁপিতে পড়ে থাকে।

বহেরুর গা কাঁটা দেয়। মাগো! সাক্ষাৎ যমদূত।

আবার তুলসীপাতা আর জলের ওপর কামরূপ কামাখ্যার ছবি রেখে লোকটা কী যেন দেখতে পায়। দক্ষিণের কলাবাগানের দিকে হাত তুলে বলে, এই মোটা, মস্ত একটা ওখানে রয়েছে। কতগুলো ডাঁড়াশ সাপ আছে, আশেপাশে, তাড়িয়ে দিস। বড়টাকে ধরবি।

লোকগুলো ঠিক জায়গায় চলে যায়। ঘিরে ধরে শিকড় ছিটিয়ে ছিটিয়ে এগোতে থাকে। বহেরু দেখে, ঠিকই কতগুলো ডাঁড়াশ সাপ পালাচ্ছে। তারপরই ফোঁসানি শোনা যায়। মাটি ফুঁড়ে মাথা তোলা দেয় এক গোক্ষুরো। মা গো! কী তার চেহারা। তেল-পিছল গায়ে বাদামি আলো ঠিকরোচ্ছে। ধাঁই করে বেরিয়ে পালাচ্ছে, বেঁটে মতো কালো একটা লোক লেজটা নিচু হয়ে ধরে তুলে ফেলল। হাত উঁচু করে ধরেছে, তবু মাথাটা মাটি ছুঁই-ছুঁই। বাচ্চাগুলো, মানুষজন সব ঘিরে ধরেছে লোকটাকে। বড্ড কাছাকাছি চলে গেছে। বহেরু হাঁক ছেড়ে সবাইকে সতর্ক করে দেয়, তফাত যা, তফাত যা।

পাগড়ি মাথায় ওস্তাদ ছেলেটা হেসে বলে, ভয় নাই, ভয় নাই বাবু, আমি তো আছি। সুনীল নাগা জুহুরি আজ্ঞে, সাতপুরুষের পেশা।

বহেরু ধাতস্থ হয়ে তাকে ডেকে দাওয়ায় বসাল। বিড়ি দিলে লোকটা হাত তুলে বলল, এখন নয়।

সাপ খেলাও নাকি? বহেরু জিজ্ঞেস করে।

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, না। চাষবাস আছে। এ পৈতৃক পেশা। বছরে এক-দু'বার বেরোই। আসাম পর্যন্ত চলে যাই আমরা সাপ ধরতে। খেলাই না।

ধরে করো কী?

বেচে দিই। সরকার কেনে। এক ভরি বিষ তিনশো আশি টাকা। ষোলোটা সাপে এক ভরি হয়।

লোকটার বয়স ভারী কম বলে মনে হয়। গোঁফদাড়ি এখনও ওঠেনি তেমন। লাউয়ের গায়ের রোঁয়ার মতো নরম কিছু রোঁয়া উঠেছে গালে। গোঁফের কাছে আবছা রেখা দেখা যায়। সেখানে ঘাম জমেছে। মুখের ডৌলটুকু বড় মিঠে। বহেরু তার কাছ ঘেঁষে বসে, বলে, বাড়ি কোথা?

বহরমপুর। এই বলে লোকটা উঠে যায়। তার স্যাঙাতরা চারধারে ঘুরছে। এখান-সেখান থেকে মাটি খুঁটে হাতে নিয়ে শুঁকছে। সতর্ক চোখ।

বহেরু উঠে গিয়ে নাগা জহুরির সঙ্গ ধরল, বলল, শোঁকো কী?

নাগা জহুরির মুখে হাজির হাসি। বলে, এ হচ্ছে নাগভিটে। বাস্তু সাপ-টাপ থাকতে পারে। তাই দেখছে সব।

শুঁকে কী বোঝে সব?

বাস্তু সাপ যেখানে থাকে সেখানকার মাটিতে সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। যে-সে অবশ্য বোঝে না। গুণিন ঠিক পায়। আর এমনি বিষের সাপ যেখানে থাকে সেখানে পচাটে গন্ধ।

বাস্তু সাপ আছে নাকি? দেখিনি তো কখনও।

নাগা জহুরি মাথা নাড়ল। একটু বিমর্ষভাব দেখিয়ে বলল, ছিল। বড় পবিত্র প্রাণী। একটা জোড়া ছিল। কখনও এঁটো জলটল কিছু ছিটে লেগেছিল বোধহয়, তাই জোড়া ভেঙে চলে গেছে।

বহেরু চেয়ে থাকে। বড় একটা শ্বাস ফেলে বলে, কবে গেল?

তুলসীর জলের ওপর কামাখ্যার কালীর ছবি ধরে থেকে নাগা জহুরি বলে, বছরখানেক হবে।

গেলে হয়টা কী?

সংসারে নানা অশান্তি লাগে।

বহেরু নীরবে মাথা নাড়ল। বুঝেছে। একটা শ্বাস ফেলে বলল, তোমরা সব দুপুরে এখানেই খেয়োখন। বুঝলে! এখন চা খাও।

বলে বিন্দুকে ডাকাডাকি করতে থাকে বহেরু। হেলেদুলে বিন্দু আসে, মুখে একটু হাসির আভা ছড়ানো! টস্ টস্ করছে লোভী ঠোঁট। একটা চোখ হানল নাগা জহুরিকে! বহেরু এক বার চোর-চোখে দেখে নিল, নাগা জহুরির কলজেটা কেমন। দেখল, খুব মজবুত নয়। বাচ্চা ছেলে, রোঁয়া ওঠেনি। একটু ভ্যাবলা বনে গেছে মেয়েটাকে দেখে। বহেরু এ-সব খুব উপভোগ করে। মেয়েটা তারই ঔরসের। তেজি আছে। বহেরু অন্য দিকে চেয়ে বলে, চা করে নিয়ে আয়।

বিন্দু মাথা নেড়ে চলে গেল। সেই দিক পানেই চেয়ে আছে নাগা জহুরি। বহেরু সুযোগটা ছাড়ল না। বলল, এখানে থাকবে নাকি?

নাগা জহুরি মুখ ফিরিয়ে বলে, থাকবে মানে?

জমিটমি দেব। ঘর করে দেব। বলে একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, বিয়েশাদিও করতে পারো, এখানেই। বলে আবছা ইঙ্গিতটা হজম করতে দিল জহুরিকে। বিড়ি ধরিয়ে মিটমিট করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল জহুরির মুখে কেমন ভাব খেলা করে।

তা অনেক ভাব খেলল। বিন্দু হারামজাদি জানে বটে রঙ্গরস। একেবারে কাম্‌নী ডোম। বহেরুর মনটা হে-হে করে হাসছিল। পাণ্ডুয়ার বামনবীরটা আসতে চাইছে না। চিড়িয়াখানাটা জমছে না তেমন। সাঁওতালটাও টেঁসে যাবেই। এ লোকটা যদি থাকতে রাজি হয় তো বেশ হবে। কিন্তু বেশি ঝোলাঝুলি করলে টানের সুতো ছিঁড়ে যায়। তাই প্রস্তাবটা দিয়েই বহেরু কিছুক্ষণ পরে অন্য কথা পাড়ে। লোকটার বাঁ হাতের তেলোয় এক ডেলা শিকড়। সেটা দেখিয়ে বলে, ওটা কী বস্তু?

জহুরি অদূরে উবু হয়ে বসে পড়ে। পরনের ফেরতা দেওয়া কাপড়ের কোনাটা তুলে মুখ মুছে নেয়। বলে, এ হচ্ছে বিদ্যাসুন্দর গাছের শিকড়। দুর্লভ বস্তু কিছু নয়। জঙ্গল-পঙ্গলে একটু খুঁজলেই পাওয়া যায়।

দেখি। বলে হাত বাড়াল বহেরু।

লোকটা নির্দ্বিধায় দিয়ে দিল, বলল, শুঁকে দেখুন।

দেখল বহেরু। ভারী মিষ্টি ধূপের গন্ধের মতো মৃদু গন্ধ।

জহুরি বলে, বেশ গন্ধটা না। কিন্তু সাপ ও-গন্ধ সইতে পারে না। গন্ধ পেলেই গর্ত থেকে বেরিয়ে পালায়। তখন আমরা ধরি।

তা হলে এ জিনিস সঙ্গে থাকলে সাপে ঠুকবে না বলো।

জহুরি মাথা নেড়ে বলে, তার ঠিক নেই। কথায় বলে সাপের লেখা বাঘের দেখা। শিকড় ছিটোলে পালায় জানি। তা বলে সঙ্গে রাখলে কামড়াবে না তা নয়। তবে ও বস্তুর আরও গুণ আছে। গায়ে রাখলে বাত, অম্বল আর হাঁফানির বড় উপকার।

বহেরু একটা শ্বাস ফেলে বলে, এ দিয়ে কী হবে! তুমি থাকলে বরং বল-ভরসার কথা।

লোকটা উত্তর দিল না। চেয়ে রইল।

সারাদিন কেরামতি দেখাল অনেক। বুড়ো আঙুলের নখে কখনও সিঁদুর কখনও কালি লাগিয়ে নখদর্পণ দেখাল। ফণা তোলা দাঁতাল সাপের মুখের কাছে মুঠো করে হাত এগিয়ে দিয়ে দেখাল সাপটি কেমন মিইয়ে যায়। একটা পয়সাও নিল না। তার স্যাঙাতরা অবশ্য গোটা কুড়ি সাপ ধরে নিয়ে গেল। এইটুকু জায়গায় এত সাপ ছিল কে জানত!

ব্রজগোপাল সবটাই লক্ষ করেছেন। রাতের বেলা বসে সাপ ধরার বৃত্তান্তটা লিখে রাখছিলেন ডায়েরিতে। লিখতে লিখতে একটা শ্বাস পড়ল। কার জন্য লিখছেন? কাকে দিয়ে যাবেন এইসব

কুড়িয়ে পাওয়া মণিমুক্তা? ছেলেরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করে। এ-সব দেখলে হাসবে।

এ সময়ে বহেরু এসে বসল পায়ের কাছে, মাটিতে। মুখখানা তুলে দুঃখের স্বরে বলে, জহুরি চলে গেল কর্তা। রাখা গেল না।

ব্রজগোপাল বললেন, হুঁ।

রাখতে পারলে হত। বুকটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

ফের ব্রজগোপাল বলেন, হুঁ।

বহেরু বুক কাঁপিয়ে একটা শ্বাস ছেড়ে বলে, মানুষজন সব যেন দূরে দূরে হেঁটে চলে যাচ্ছে বহেরু গাঁ থেকে। কবে আসবে সব! কাতারে কাতারে!

॥ একচল্লিশ ॥

আকাশে ছমছম করছে মেঘ। গম্ভীর মেঘধ্বনি। ঘন কালো ছায়ায় দুপুরেই ডুবে গেল কলকাতা। যেন-বা প্রলয় হবে। ঠান্ডা একটা বাতাস এল, তাতে ভেজা মাটির গন্ধ।

রাস্তা পার হবে বলে রণেন দাঁড়িয়ে ছিল ফুটপাথে। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সরু ফুটপাথ, দাঁড়ানোর পক্ষে সুবিধের নয়। ক্রমান্বয়ে চলমান মানুষ গা ঘেঁষে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। রাস্তায় গায়ে গায়ে গাড়ি, ট্রাম, ঠেলা সব দাঁড়িয়ে। জ্যাম। চিনেদের জুতোর দোকান থেকে চামড়ার কটু গন্ধ আসছে। একঝলক হাওয়া রাস্তার ধুলো কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়ে মারল মুখে-চোখে। জীবাণুতে ভরতি কলকাতার বিষাক্ত ধুলো।

রণেন আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখল। বাড়ির চূড়ায় চূড়ায় বিঁধে আছে সরু একফালি আকাশ। কিংবা আকাশের গলি। তার মধ্যে মুশ্‌কো কালো শরীর বাড়িয়ে দিয়েছে প্রলয়ংকর মেঘখানা। রণেন ঘাম মুছল রুমালে। হাতের ভারী ব্যাগটা হাত-বদল করল এক বার। শরীরটা ভাল নেই। মেঘ করলে মাথার মধ্যে কেমন যেন করে।

নীল একটা ঝলক চাবুকের মতো খেলে গেল চারধারে। তারপরই কানের কাছ বরাবর সর্বনাশের শব্দ হয়। রণেনের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে হৃদ্‌যন্ত্র নড়ে ওঠে। শরীর অবশ লাগে। ঘাম হয়। প্রেশারটা বেড়েছে। ক'দিন আগে ডাক্তার ডেকেছিল বীণা। ডাক্তার প্রেশার দেখল, বুক দেখল, পেচ্ছাব পরীক্ষা করাল। ক'টা দিন বাড়িতে আটকে রেখেছিল বীণা। সে এক অসহ্য যন্ত্রণা। ঘরের মধ্যে আজকাল রণেন থাকতেই পারে না। রাতে যখন সদর দরজা বন্ধ হয়, তখনই রণেন ভারী ভয় পেয়ে যায়। কেবলই মনে হয়, রাতে ঘুমোলে যদি ভূমিকম্প হয় কি আগুন লাগে, তা হলে বেরোব কী করে তাড়াতাড়ি? বীণা যখন শোওয়ার ঘরের দরজা দেয় রাত্তিরে, তখনও একটা বোবা ভয় তাকে ভালুকের মতো এসে ধরে। ঘরের ভিতর থেকে যেন-বা সে আর কোনও দিন বেরোতে পারবে না। ভিতরকার চৌখুপির বাতাস বড় কম। বুক ভরে ক'বার দম নিলেই তা ফুরিয়ে যায়। তারপর আসবে দমবন্ধ করা এক অস্বস্তি, শ্বাসকষ্ট। মৃত্যু? হ্যাঁ। তা-ই।

সে ককিয়ে উঠে বলে, দরজা খুলে দাও।

বীণা দাঁতে ঠোঁট চেপে বলে, কেন?

আমার অস্থির লাগে। দরজা-জানালা সব খুলে দাও।

বীণার একটু ঠান্ডার বাই আছে। এই ঘোর গ্রীষ্মেও নাকি শেষ রাত্রে হিম পড়ে। বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগে যদি! বীণার নিজেরও ইসিনোফেলিয়া শতকরা নয় ভাগ। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস। বীণা দরজা খুলে দেয়, কিন্তু জানালা সব খুলতে রাজি হয় না। কেবল ড্রেসিং টেবিলের ধারের জানালার একটা পাট খুলে রাখে। বিছানার ধারের জানালা খোলে না। ঘরে সবজে একটা ঘুম-আলো জ্বলে। সেই ঘোর

সবুজ রঙের মধ্যে শুয়ে থেকে রণেন সেই এক-পাট খোলা জানালার দিকে চেয়ে থাকে। ওই একটু এক চিলতে ফাঁক—ওইটুকুই যেন তার প্রাণ, তার পরমায়ু, তার শ্বাসের বাতাস। রাতে ঘুম হয় না। প্রেশারের বড়ি আর ট্রাংকুলাইজার খায়। তাতে হয়তো প্রেশার কমে, টেনশনও কমতে পারে। কিন্তু শরীরটা বড় দুর্বল লাগে। সারাদিন অবসাদ। মা এসে বুকে হাত বুলিয়ে দেয়, মাথার তালুতে তেল চাপড়ে দেয়। দিতে দিতে চোখের জল ফেলে বলে, আজকাল কচি বয়সেই এ-সব তোদের কী রোগ হয় রে?

কচি বয়স? মায়ের কাছে অবশ্য ছেলের বয়স বাড়ে না। কিন্তু বয়স কথাটা আজকাল বড় ধাক্কা দেয় রণেনকে। তার বোধহয় আটত্রিশ পেরিয়ে উনচল্লিশ চলছে। আর একটা বছর ত্রিশের কোঠায়। তারপরই চল্লিশ। মধ্যবয়স, প্রৌঢ়ত্ব। সে ধাপটা পেরোলেই বুড়ো। বড় সাংঘাতিক। বয়স যত ঘনায় তত একে একে প্রিয়জন খসে পড়তে থাকে। বাবা যাবে, মা যাবে, বয়স্করা যাবে। একদিন তারও যাওয়ার সময় এসে পড়বে।

কেমন হবে সেই দিনটা? মেঘলা? না কি রৌদ্রোজ্জ্বল? শীত? না কি গ্রীষ্মকাল? বর্ষা হবে না তো। দিন, না রাত্রি? ভাবতে ভাবতে বিছানায় উঠে বসে রণেন। খুব কাছে কে যেন বলে ওঠে—সব মরে যাবে। চমকে ওঠে রণেন। কে বলল ও-কথা? পরমুহূর্তেই বুঝতে পারে যে, সে নিজেই বলেছে। তার ঠোঁট নড়ে উঠল এইমাত্র। আবার বলল, উঃ, মা গো!

নিজের ঠোঁটে হাত রাখে রণেন। সে এই একা-একা কথা বলাকে বড় ভয় পায়। সন্দেহ করে। কিন্তু ঠেকাতেও পারে না। আজকাল মাঝে মাঝে সে টের পায়, তার ঠোঁট নড়ে, জিব নড়ে, কথা উঠে আসে বুক থেকে। আপনিই চমকে ওঠে রণেন। ঠোঁট চাপা দেয়। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করে। আর তখনই আবার বলে ওঠে—ক্যাডাভ্যারাস, ক্যাডাভ্যারাস, ইউ...ইউ...ইউ...

কথাগুলোর অর্থ কী! তবু বুক থেকে, মাথা থেকে ওইরকম সব অর্থহীন শব্দ উঠে আসছে আজকাল। কী হয়েছে তার? খুব শক্ত অসুখ? ঘোর সবুজ আবছা আলোয় সে আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচায়। হাসে। ওই মৃদু আলোতেও বুঝতে পারে, তার চোখে না-ঘুমোনোর ক্লান্তি। একটু ঝুঁকে গেছে মোটা শরীর। ঘুম ভেঙে কখনও বীণা উঠে ধমক দেয়, কী হচ্ছে কী পাগলামি? বিছানায় এসো। ঘুমোও।

রণেন বিছানায় যায়। শুয়ে থাকে। ঘুমোয় না। বিড়বিড় করে বলে, ক্যাডাভ্যারাস, ক্যাডাভ্যারাস, ইউ...ইউ...ইউ...

ক'দিন ঘরবন্দি রেখেছিল বীণা আর মা। এখন আবার বেরোয় রণেন। জোর করেই বেরোয়। শরীর খারাপ বলে আজকাল আর তাকে বাইরে ঘুরতে হয় না। অফিসেরই একটা সেকশনে বসে থাকে চুপচাপ। কিন্তু অফিসের লোকজন আজকাল তাকে বড় বেশি লক্ষ করে। হঠাৎ হঠাৎ কথা বলে ওঠে রণেন। সবাই তার দিকে ফিরে তাকায়। এও এক জ্বালাতন। তাই আবার আজকাল বাইরে বেরোয় সে। শরীর খারাপ লাগলেও মনটা একরকম থাকে।

একদিন অফিসে ঘোষের কাছে গিয়ে হা-ক্লান্ত রণেন বলেছিল, ঘোষদা, একটা কথা বলতে পারেন?

ঘোষ অফিসের ফাইলপত্র আজকাল প্রায় ছোঁয় না। ডিসেম্বরে রিটায়ারমেন্ট, কাজ করে হবে কী? বসে বসে পুরনো টেস্ট পেপার থেকে খুঁজে-পেতে অঙ্ক কষছিল অফিসের কাগজে। অঙ্কটা কষতে কষতেই বলল, কী?

মানুষ মরার পর কী হয় বলুন তো, আত্মা-টাত্মা বলে কিছু আছে নাকি সত্যিই?

ঘোষ চোখ তুলে তাকে এক বার দেখে নিয়ে মিচকে হাসে। বলে, বাঃ। বেড়ে প্রশ্ন। আজকাল এ-সব নিয়ে কেউ ভাবে নাকি আপনার বয়সে?

ঘোষ জানে অনেক। ভারী স্থির বুদ্ধি। তবে কথাবার্তায় সবসময়ে একটু বাঁকাভাব থাকে।

রণেন বলেছিল, বলুন না ঘোষদা।

ঘোষ কাগজপত্র সরিয়ে রেখে চেয়ারে পা তুলে বসল, বলল, মশাই, আপনি যে আছেন, এটা কি সত্যি?

রণেন মাথা নাড়ে, সে তো আছিই।

ঘোষ তখন মৃদু হেসে বলে, আপনার থাকাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে আপনি যে ছিলেন, এও সত্যি। আর, আপনি যে থাকবেন, তাও সত্যি। এটা লজিক্যালি প্রুভড। আপনি ছিলেন না, আপনি থাকবেন না, অথচ আপনি আছেন—তা হয় কী করে? যুক্তিতে আসে না। সুতরাং জন্মের আগেও আপনি ছিলেন, মৃত্যুর পরেও আপনি থাকবেন। এটা থিয়োরেটিকালি প্রমাণ করা যায়।

রণেন কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে বলে, কিন্তু কীভাবে থাকব, কীভাবে ছিলাম।

ঘোষ অন্যমনস্ক ও গম্ভীরভাবে বলে, বলা মুশকিল। তবে শুনেছি, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মা একটা ভাবভূমিতে অবস্থান করে। তার অঙ্গও থাকে, বোধও থাকে তবে সে মর্ত্যের মতো নয়। অন্য রকম।

রণেন একটু কেঁপে উঠে বলেছিল, সে-জায়গা কেমন?

ঘোষ একটু হেসে বলে, কী করে বলি? না মরলে তো জানতে পারা যাবে না। তবে শুনেছি, সেখানে আলো-অন্ধকার নেই, শীত-গ্রীষ্ম নেই।

তবে সে কি অনন্ত গোধূলির দেশ? চিরবসন্ত? ঠিক বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। পরমুহূর্তেই ঘোষের দিকে চেয়ে থেকে তার আবার সেই একাকিত্বের কথা মনে পড়ে। লোকটার বউ নেই, ছেলেরা আত্মসর্বস্ব। এ লোকটা চাকরি শেষ হওয়ার পর একদম একা হয়ে যাবে। প্রাণের কথা বলার মানুষ না থাকলে মানুষ বড় কষ্ট পায়। তার গভীর মনের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীটার কোনও সম্পর্ক থাকে না। ঘোষের দিকে চেয়ে তাই একরকম ভয় পায় রণেন। বলে, ঘোষদা, রিটায়ার করে কী করবেন?

ঘোষ প্রশ্ন শুনে হাসল। চেয়ার থেকে ঠ্যাং নামিয়ে ঝুঁকে অঙ্ক কষার কাগজপত্র টেনে নিল আবার। বলল, বসে থাকব, যত দিন না মরি।

কথাটা বড় ন্যাংটো, বড় কঠিন সত্য। বসে থাকব, যত দিন না মরি। রণেন বড় অস্থির বোধ করেছিল। উঠে আসছিল, ঘোষ পিছন থেকে ডেকে বলল, ব্রজদা আছেন কেমন?

খেত খামার নিয়ে থাকেন। ভালই আছেন।

ঘোষ বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল। হঠাৎ বলল, মাঝেমধ্যে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকবেন। দেখবেন তাতে মৃত্যু সম্পর্কে জড়তা কেটে যায়। আমি এখনও সময় পেলে নিমতলার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসে থাকি। সন্ধেবেলাটায় বেশ লাগে।

তাও গিয়েছিল রণেন। কেওড়াতলাটা কাছে হয়। দুপুর-দুপুর একদিন চলে গেল। দেয়াল ঘেরা বদ্ধ জায়গা, রোদের তাপ, চিতার আগুন, সব মিলিয়ে বীভৎস গরম। ছাই, ধোঁয়া চার দিক অন্ধকার করে রেখেছে। পোড়া ঘিয়ের কটু গন্ধ। মানুষের পোড়া-আধপোড়া-না পোড়া শরীর চারধারে। মাথার মধ্যে একটা ভয়-ভাবনা ঘুলিয়ে উঠল। একধারে একটা টিনের টুকরো চাপা গাদির মড়া পড়ে আছে। টিনের তলা থেকে সিঁটোনো দু'জোড়া সাদা পা বেরিয়ে আছে। ঠিক তার পাশেই সাদা পাকানো গোঁফঅলা একটা পশ্চিমা লোকের মাথা। সবগুলো রাতে এক চিতায় দাহ হবে। রণেন পালিয়ে এল। সে-রাতে জেগে থেকে অনেক রকম শব্দ করেছিল সে। মনে হচ্ছিল, ও-রকম আগুনে পুড়ে যেতে সে কোনও দিন পারবে না।

রাতের বেলাটা একা ভয় করে জেগে থাকতে। কিন্তু সঙ্গে জেগে থাকার কেউ তো নেই। বীণা মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে উঠে ধমক দেয়, শুয়ে পড়তে বলে। কখনও-কখনও একটু আদরও করে কাছে ডেকে। তারপরই বীণার কাজ ফুরোয়। পুরনো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কীই বা কথাবার্তা থাকবে। রণেন জানে, তার কেউ নেই।

রাস্তাটা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে রণেন। পার হতে পারছে না। দু'দিকের দু'মুখো গাড়ির আঁটো জ্যাম। আকাশে মুখ তুলে দেখে, বৃষ্টি এল বলে। কালো মেঘ নিচু হয়ে চলে যাচ্ছে রেলগাড়ির মতো। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ। খড়কুটো, ধুলোবালি উড়ে ঝাপটা মারছে। ফুটপাথের দোকানিরা দ্রুত মালপত্র তুলে নিচ্ছে। গাড়ি ঘোড়ার ফাঁক-ফোকর দিয়ে অনেকে রাস্তা পেরোচ্ছে। কিন্তু রণেনের সাহস হয় না। কলকাতার ড্রাইভারদের মনুষ্যত্ববোধ কিছু কম। রাস্তা ফাঁকা পেলে মানুষজন মানে না। রণেন রাস্তা পার হওয়ার সময়ে যদি সামনের গাড়ি দু'হাত এগোয় তবে পিছনের গাড়িও হয়তো রণেনকে উপেক্ষা করে দু'হাত এগোবে। ড্রাইভারদের ঠিক বিশ্বাস করে না রণেন। এমনিতে তারা হয়তো লোক সবাই খারাপ না। কিন্তু কলকাতার জ্যাম, লক্ষ গাড়ি আর কোটি মানুষের ভিড়ে ভরা সরু অকল্পনীয় রাস্তা, পদে পদে থেমে থাকা—এ-সব থেকে মানুষ খ্যাপাটে হয়ে যায়—আসে রাগ বিরক্তি, অধৈর্য ক্লান্তি। তখন আর ণত্ব-ষত্ব জ্ঞান থাকে না। শুধু ড্রাইভার কেন, কলকাতার সব মানুষই কি তাই নয়? বিরক্ত, রাগী, উদাসীন ও নিষ্ঠুর। রণেনের চার দিকটা তাই ভয়ে ভরা।

রাস্তা পার হতে না পেরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রণেন। মেঘ ডাকছে সিংহের মতো। জোর বাড়ছে হাওয়ার। টপাস করে একটা ফোঁটা এসে ফাটল রণেনের ডান গালে। কী ঠান্ডা ফোঁটা! রণেন ব্যাগটা হাতবদল করে নিয়ে ফুটপাথ ধরে আস্তে আস্তে হাঁটে। যত দূর যায় তত দূর পর্যন্ত রাস্তা আটকে সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অথচ রাস্তাটা পার হওয়া দরকার।

পান খাওয়া ডাক্তার বারণ করে গেছে। রণেন তবু খায়। কালাপাতি, পিলাপাতি আর মোহিনী দেওয়া কড়া পান। প্রথম প্রথম মুখ জ্বলে যেত, গলায় ধক্‌ লেগে মাথা ঘুরত। আজকাল সয়ে গেছে। সকাল থেকে আজ পান খায়নি। চড়বড় করে বৃষ্টির ফোঁটা হেঁটে যাচ্ছে চারধারে। এখনও মুষলধারে নামেনি। কিন্তু প্যারেডের সৈন্যর মতো তারা এগিয়ে আসছে। আরও ক'বার নীল চাবুক ঝলসে গেল চারধারে। মেঘলা আর বৃষ্টির দিনে রণেনের মাথা বড় ভার হয়। বুকের ভিতরটা অন্ধকার লাগে।

পানের দোকানের অল্প একটু ছাউনির ভিতরে মাথাটা গুঁজে রণেন দেখল, বিশুষ্ক সব দেয়ালে বৃষ্টির প্রথম কয়েকটি ফোঁটা অনেকগুলো তেরচা দাগ টেনেছে। ভেজা দেয়ালের চুন-চুন এক রকম গন্ধ। পানের প্রথম ঢোকটা গিলে ফেলল রণেন। কড়া জর্দার পান। মাথাটা এক বার পাক খেল। সামলে গেল। পিক ফেলে দিয়ে গলাটা ঝাড়ল একটু। প্রেশারটা বেড়েছে, রক্তে চিনি আছে, হার্টও ভাল না। কী হবে? মাথাটা নাড়ল রণেন। বলল, দূর ফোসকা পড়বে। বলেই চমকে উঠল। এখনও সে চিতার আগুনের কথা ভাবছে।

থেমে-থাকা ট্রাম থেকে অধৈর্য কয়েকজন মানুষ নেমে পড়ল। তাদের মধ্যে একটি কিশোরী মেয়ে। কিশোরী? না, ঠিক কিশোরী নয়, তবে রোগা বলে ওইরকম দেখাল বোধহয়। বাঁ হাতে খাতা উঁচু করে মুখ আড়াল দিয়ে নামল। সামনেই বাটার রিডাকশান সেল-এর দোকান। এক দৌড়ে উঠে গেল দোকানে, যেখানে মাথা বাঁচাতে ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছে কিছু লোক।

হেঁটে আসছে বৃষ্টি। দেয়ালে দ্রুত ফোঁটার দাগ মিলিয়ে যাচ্ছে। ভিজে যাচ্ছে ময়লা দেয়াল। বিবর্ণতা। পানের দোকান থেকে রণেন সরে আসে। বাটার দোকানে উঠে দাঁড়ায়। বৃষ্টি দেখে। কী গভীর বৃষ্টিপাত!

মেয়েটা হাতের খাতা বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে। খুব দূরে নয়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। লম্বা, রোগাটে চেহারা। কিন্তু চামড়ায় কচি বয়সের চিকণতা। বয়সের দাগধরা, ছোপধরা নয়। মুখখানায় বয়সের অহংকার। পাতলা নাক, একটু মোটা ঠোঁট, দু'খানা চোখ চঞ্চল, মাথায় তেলহীন নরম চুল, তাতে এখনও কয়েক ফোঁটা জল লেগে আছে। ডানধারে ঠোঁটের ওপরে একটা আঁচিল। ফরসা মুখে আঁচিল পাগল করে দেয় না, যদি জায়গা মতো হয়?

রণেনের দোষ সে যখন কোনও মেয়েকে দেখে তখন আর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, ভদ্রতাবোধ লোপ পায়। তাই চেয়ে ছিল রণেন। সময়ের জ্ঞান ছিল না। ওই রকম লাগাতার চেয়ে থাকার জন্যই বোধহয় মেয়েটা তার দিকে তাকাল। এক বার স্বাভাবিক কৌতূহলে, পরেরবার ভ্রূ কুঁচকে। গহিন চুলের মধ্যে পথরেখার মতো সিঁথি ডুবে গেছে। মুখখানা লম্বাটে, থুতনির খাঁজ গভীর। কাপড় বা শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে অনেকটা এ-রকম মুখের ছবি ছাপা হয়। বাঙালি মুখ, তবু যেন বিদেশি কাটছাঁটে তৈরি।

রণেনকে পছন্দ হয়নি মেয়েটির। ভ্রূ কোঁচকানো মুখ ফিরিয়ে নিল ঝামরে। তাতে অবশ্য রণেনের কিছু যায় আসে না। মেয়েদের মনের মতো চেহারা তার নয়, সে জানে না কি! তবু একটা শ্বাস ফেলে রণেন। এখনকার দিনকাল বড় ভাল। সোমেনের কথা এক বার মনে এল। কেমন শ্রীমান চেহারা ভাইটার! ওদের সময়টাও ভাল, মেয়েদের সঙ্গে হুল্লোড় করে বেড়ায়, বকবক করে। রণেনের কলেজ জীবন কেটেছে নন কো-এডুকেশনে, ইউনিভার্সিটিতে যায়নি। বরাবরই তার চরিত্রের খ্যাতি ছিল। সে নাকি মেয়েদের দিকে তাকায় না। সারা যৌবনকালটা সেই খ্যাতি রক্ষা করে গেছে রণেন। মেয়েদের উপেক্ষা করেছে। তাকায়নি। কেবল বহেরুর খামারবাড়িতে এক-আধবার নয়নতারার সঙ্গে...। কিন্তু সেও কিছু নয়। যৌবন বয়সের ভাল ছেলে রণেন আজও একরকম বাঁধা আছে নিয়তির কাছে। বয়স ফুরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবী জুড়ে এখনও নেমে আসছে সুন্দর, কচি, হৃদয়বতী মেয়েরা।

রণেন দু'পা পিছিয়ে গেল। ছাঁট আসছে। চশমা ভিজে গেছে। রুমালে কাচ দুটো মুছে নিয়ে ভাল করে তাকাল। মেয়েটা ঘাড় ঈষৎ সামনের দিকে বাঁকিয়ে বড় বড় অন্যমনস্ক চোখে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক উত্তেজক।

নিজের শ্বাসের ঝোড়ো শব্দে চমকে ওঠে রণেন। ভিতরে ভিতরে এক তীব্র কামবোধ আনন্দস্পৃহা জেগে ওঠে। চামড়ার তলায় শরীরের ভিতরকার অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ করে লুকোনো বীজ। মাথার সব চিন্তা লোপাট হয়ে যায়। চোখের পাতা নড়ে না। ভিতরে ভিতরে ভাল ছেলে রণেন কি নারীধর্ষণকারী নয়? যেদিন বীণাকে মেরেছিল সেদিন সোমেন আর মা না চেঁচালে বীণা খুন হয়ে যেত তার হাতে। তা হলে, ভিতরে ভিতরে সে কি খুনিও?

রণেন নিজের মনে মাথা নাড়ল। হ্যাঁ, সে যেমন খুন করতে পারে, তেমনি নারীধর্ষণ করতে পারে। আরও পারে বহু কিছু। মানুষের অস্পৃশ্য অনেক পাপ। ভয়ে বা লজ্জায় বা অনভ্যাসে করে না। কিন্তু পারে।

মেয়েটা তাকাচ্ছে না, কিন্তু লক্ষ করেছে ঠিকই যে একজন মধ্যবয়সি মোটা লোক তাকে নজর দিচ্ছে। কচি বয়স, এ বয়সে যে-কোনও পুরুষেরই চোখে নিজেকে জরিপ করে নিতে ইচ্ছে যায়। মেয়েটা তাই রণেনের উদ্দেশেই বোধহয় আঁচল টেনে টান করে দিল কিছুটা। স্পষ্ট ফুটে ওঠে বুকের ডৌল। নাভির নীচে কাপড়, খাটো ব্লাউজ। পেটের অনেকখানি দেখা যায়। নীলচে একটা জাপানি জর্জেটের শাড়ি পরনে। ভাবা যায়?

বৃথা গেল বয়স। বৃথা গেল সময়, মাথা খুঁড়লেও ফিরে আসবে না।

রণেন তাই নিজের মনের কাছে বলে রাখল, আমি কিছুই পাইনি জীবনে।

মেয়েটি বৃষ্টির দিকে চেয়ে ছিল। চুল নড়ছে হাওয়ায়। মোটা বেণী। নীরবে সেই যেন উত্তর দিয়ে দিল রণেনকে—আহা।

আমি মোটা মানুষ, ব্যক্তিত্বহীন, হাবা।

একটু বয়সের পুরুষই ভাল। তারা হৃদয়বান হয়, চঞ্চলতা থাকে না। তুমি ভাল।

রণেন মাথা নাড়ে, বলে, সবাই তাই বলে। কিন্তু আমি আর ভাল থাকতে চাই না। ভাল থাকা বড় একঘেয়ে ক্লান্তিকর। একটু খারাপ হয়ে দেখি না! আমাকে খারাপ করবে? প্লিজ!

মেয়েটা মৃদু হাসল। সৌরভময় শ্বাস ফেলে বলে, মোটা তো কী! কেমন ফরসা তোমার রং, কেমন ঠান্ডা মাথা। চাকরিও ভাল।

কেমন লাগছে আমাকে? ভাল?

মেয়েটা চোখ তুলে তাকাল, শুভদৃষ্টির সময়কার মতো চোখ। কী লজ্জা ও শিহরনে ভরা বিদ্যুৎ! কথা বলল না।

রণেন বলে, আমি আর-একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করব।

তার মানে কি দুটো জীবন?

রণেন মাথা নাড়ল, শুধু বউ হলে আনতাম। কিন্তু বাচ্চাগুলো রয়েছে যে। বড় মায়া।

মেয়েটি বুঝেছে। মাথা নাড়ল। তৎক্ষণাৎ একটা নাম দিল রণেন—লীনা। এই নামের একটা মেয়েকে বালকবয়সে ভালবেসেছিল রণেন, যার সঙ্গে কোনও দিন কথাবার্তা হয়নি। লীনা করুণ চোখে চেয়ে মাথা নোয়াল। বলল, তাই হবে।

হবে! বাঃ! চমৎকার! সব সমস্যার কেমন সমাধান হয়ে গেল। সবাই থাকবে। বাচ্চারা, বীণা, আলাদা ফ্ল্যাটে লীনাও! বাঃ।

ভারী খুশি হয়ে ওঠে রণেন।

দু'ঘণ্টার বৃষ্টি কলকাতাকে লন্ডভন্ড করে গিয়ে গেল। ট্রাম বন্ধ, বাসে লাদাই ভিড়, ট্যাক্সির মিটার সব লাল কাপড়ে ঢাকা। বৃষ্টির পর কলকাতা থেমে যায়, কিংবা খুব আস্তে চলে। রথের মেলার মতো মানুষ জমে আছে সর্বত্র। থিকথিক করছে জীবাণুর মতো মানুষ।

রণেন অফিসের হলঘরে তার ভেজা জামা আর গেঞ্জি ফ্যানের তলায় চেয়ারের পিঠে মেলে দিয়েছে। বসে আছে চুপচাপ। অফিসে এখনও কিছু লোকজন আছে। জনা ছয়েক লোক একধারে ফিশ খেলছে। অন্যধারে ব্রিজের আড্ডা বসেছে। শুধু মুখোমুখি ঘোষ বসে নীরবে অঙ্ক কষছে। রণেন চোখ বুজে ছিল। ভাবছিল সবাইকে ডেকে বলে দেবে, মরবার পর যেন তাকে না পুড়িয়ে কবর দেওয়া হয়; পোড়ানোটা বড় বীভৎস ব্যাপার। আবার পরক্ষণেই মনে হল, কবর! ওরেব্বাস, সেও তো মাটি চাপা হয়ে দমবন্ধ হবে। হাঁসফাঁস করতে হবে কেবলই।

ভেবেই সে হঠাৎ জোরে বলল, না না।

বলেই চমকে ওঠে। ঘোষ এক বার মুখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিল। কিছু জিজ্ঞেস করল না। রণেন লজ্জা পেল বটে, কিন্তু ঘোষ বড় বিবেচক মানুষ বলে লজ্জাটাকে সামলে গেল।

সাতটা বেজে গেছে। ফিশের আড্ডা থেকে দু'জন বেরিয়ে গেল। একজন চেঁচিয়ে বলল, ঘোষদা, এই বৃষ্টিতে কী ভাল জমে বলুন তো?

ঘোষ উত্তর দিল না। ব্রিজের আড্ডা থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, ভূতের গল্প, খিচুড়ি আর মেয়েছেলে।

দূর। ঘোষদাকে বলতে দিন।

ঘোষ উত্তর দিল না। একটু হাসল কেবল, অঙ্ক কষতে লাগল।

আর একজন বলে, ইলিশ।

কত করে কেজি জানিস? ওই লাহিড়ী জানে, জিজ্ঞেস কর।

কে একজন চেঁচিয়ে ডাকে, লাহিড়ী, ও লাহিড়ী।

রণেন তাকাল। অ্যাকাউন্টসের বিপুল সেন। ভ্রু কুঁচকে রণেন বলে, কী?

ইলিশ মাছ কত করে যাচ্ছে?

কী জানি!

আমাদের মধ্যে তো এক আপনাকেই দেখছি যিনি ইলিশ-টিলিশ খান। আমরা তো আঁশটাও চোখে দেখি না। ইন্সপেক্টর না হলে সুখ কী!

রণেন মুখটা ফিরিয়ে নেয়। ব্যক্তিত্ব না থাকলে এ-রকম হয়। যে-সে যা খুশি বলে সারতে পারে।

কে একজন বলল, ইলিশ খেয়ে পয়সা নষ্ট করবে কেন! লাহিড়ী লকারে রাখছে। টালিগঞ্জে বাড়ি হাঁকড়াচ্ছে, সব খবর রাখি।

হলঘরের দরজাটা খোলা। কে একজন ছাতা মুড়ে, গা থেকে বর্ষাতি খুলতে খুলতে দরজা দিয়ে ঢুকে এল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে চারধারে চাইছে।

রণেন চিনতে পারল। সোমেন। বুকটা কেঁপে উঠল হঠাৎ। সোমেন অফিসে কেন? কোনও খারাপ খবর নেই তো! বাবা, মা, বীণা, বুবাই, টুবাই, খুকি, শীলা, অজিত—কত প্রিয়জনের নাম ঘাই মারে বুকের মধ্যে।

রণেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

সোমেন তাকে দেখে এগিয়ে আসে।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

মা আর বউদি দু'জনে ঠেলে পাঠিয়েছে সোমেনকে দাদার ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন তা দেখে আসতে। বৃষ্টি-বাদলায় মানুষের দেরি হয়, কিন্তু কে বুঝবে সে-কথা। সোমেন তাই খুব বিরক্তির সঙ্গে এসেছে।

মনটা ভাল নেই। গতকাল অণিমা এসেছিল বাসায়। সাদাখোলের শাড়ি পরা, চেহারাটা অনেক ভাল হয়েছে আজকাল। অনেক ধীরস্থির আগের চেয়ে। একটা চমৎকার হ্যান্ডমেড কাগজের কার্ডে ছাপা বিয়ের চিঠি দিয়ে বলল, যেয়ো না সোমেন। সব নিমন্ত্রণে যেতে নেই।

এ-রকম কথা কখনও শোনেনি সোমেন। কেউ নেমন্তন্ন করতে এসে বারণ করে যায় নাকি!

ঘরে বসে কথা বলার সুবিধে নেই। তাই অণিমার সঙ্গে বেরিয়ে এল সোমেন। কোনও দিন নিজেদের গাড়িতে চড়ে কোথাও অণিমাকে যেতে দেখেনি সোমেন। অণিমার রুচিবোধ বড় প্রবল। গাড়ি আছে—এটা কাউকে দেখাতে চায়নি কখনও। কাল কিন্তু গাড়ি করে এসেছিল। সাদা অ্যামবাসাডার। অণিমার সঙ্গে পিছনের সিটে উঠে বসল। সামনে ড্রাইভার।

কথা হচ্ছিল না। একটা লালরঙা নাইলনের খাপে-ভরা নিমন্ত্রণের চিঠিগুলি সোমেন আর অণিমার মাঝখানে পড়ে ছিল। অণিমা দরজার কাছে অনেকটা সরে বসেছে। আলগা দূরের মানুষ, প্রায় পরস্ত্রী। সোমেন বলে, আমাকে গড়িয়াহাটায় নামিয়ে দিয়ো অণিমা।

অণিমা উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ বাদে বলল, পরীক্ষাটা দেবে না?

সোমেন হাসল, বলল, তুমি বড় বেরসিক। পরীক্ষাটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। দিলেও যা, না দিলেও তাই। একজন গ্র্যাজুয়েট বেকার আছি, তখন না হয় এম-এ পাস বেকার হব।

তা কেন? প্রফেসারির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে।

সোমেন হাসল। গড়িয়াহাটা ব্রিজের ঢালু বেয়ে গাড়িটা গড়িয়ে নামছে তখন। অণিমা বাইরের দিকেই চেয়ে ছিল। যেন অন্যমনস্ক। আসলে তা নয়। চেহারা ভাল হলেও অণিমার মুখে একটা খড়ি-ওঠা বিষণ্ণতার গুঁড়ো মাখানো। সোমেনের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড নেচে ওঠে। একই সঙ্গে একটা জয়ের আনন্দ ও হারানোর দুঃখ তাকে মুহূর্তের জন্য পাগল করে দেয়। একটু ঝুঁকে সে প্রশ্ন করে, বিয়ের পর কোথায় অণিমা?

অণিমা ভারী চশমার ভিতরে তার ছোট হয়ে আসা চোখে তাকাল সোমেনের দিকে। বলল, সিন্ধ্রি।

অনেক দূর।

দূর! বলে একটু ভাবে অণিমা। পরে হেসে বলে, তেমন দূর নয়। তবে দূরত্বটা রাখাই ভাল।

ব্যগ্র, লোভী সোমেন বলল, কেন অণিমা?

গড়িয়াহাটা এসে গেল, সোমেন নামবে না?

আর-একটু যাই।

অণিমা শ্বাস ফেলে বলে, চলো।

গাড়ি চলে। খুব মৃদু ইন্টিমেট সুগন্ধীর একটা বাসি গন্ধ গাড়ির ভিতরে। স্নো-পাউডার কখনও মাখত না অণিমা। এখন কি মাখে? মৃদু সুবাস তার চার দিকে। মহীয়সীর মতো দেখাচ্ছে সাদা খোলের শাড়িতে। চওড়া পেটা জরির পাড়। এত দুর্লভ কখনও অণিমাকে দেখাত না। ঠাট্টা-ইয়ারকি একদম কি ভুলে গেল অণিমা?

অণিমা, তোমার কাছে টাকা আছে?

অণিমা অবাক হয়ে বলে, কেন?

ধার দেবে? একটা জিনিস কিনব?

সোমেন কোনও দিন ধার চায় না। অণিমা ব্যাগ খুলে দেখেটেখে বলে, কত বলো তো!

জানি না। জিনিসটা শো-কেসে দেখলাম একটা দোকানে, ফেলে এসেছি পিছনে। গাড়িটা ঘোরাতে বলো।

গাড়ি ঘুরল। গড়িয়াহাটার দিকে ফিরে আসতে একটা দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল সোমেন। শো-কেসে একটা চওড়া লালপেড়ে বিষ্ণুপুরী শাড়ি। সোমেন নেমে গিয়ে দাম জিজ্ঞেস করল। দেড়শো টাকা।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে বলল, দেড়শো টাকা। দেবে?

কী একটা সন্দেহ করল অণিমা। একটু ইতস্তত করে টাকা বের করে দিয়ে বলল, মাঝে মাঝে পাগলামির ভূত চাপে, না?

সোমেন তার ভুবনজয়ী মিষ্টি হাসি হেসে বলল, পাগলই তো।

শাড়িটা কিনে এনে প্যাকেটটা গাড়ির সিটে রেখে উঠে বসল গাড়িতে। বলল, তোমাকে সাদা খোলের শাড়িতে বড় মহীয়সী মনে হয়।

তাই নাকি?

বিয়ের দিন ওই কারণেই তোমাকে না দেখা ভাল। ওইদিন তো তোমাকে রঙিন বেনারসি পরাবে, ফুলের সাজ, চন্দন—এ-সব তোমাকে মানায় না।

অণিমা সত্যিকারের হাসি হাসল একটু। বলল, সেটা দৃষ্টিভঙ্গির তফাত বলে। তোমার সঙ্গে যদি হত তা হলে কী করতে? শুভদৃষ্টির সময়ে তাকাতে না সোমেন?

এ কথাটায় ঠাট্টা ছিল হয়তো। তারা হাসলও। কিন্তু হাসি কারও ঠোঁটের গভীরে গেল না।

দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সোমেন নেমে গেল। অণিমা পিছন থেকে বলল, এই শাড়ির বাক্স পড়ে রইল যে!

সোমেন দরজাটা দড়াম করে ঠেলে দিয়ে বলল, তোমার জন্য। বিয়েতে তো যাওয়া বারণ, তাই আজ দিয়ে রাখলাম।

যাঃ। এই সোমেন, শোনো, শোনো...

সোমেন শোনেনি। চলে এসেছে।

কাল থেকে সারাক্ষণ মনটা তাই খারাপ। কেমন যেন। পিপাসা পায়, বুক খালি-খালি লাগে। আবার একটা ভুতুড়ে আনন্দে রক্তে আগুন ধরে যায়। মনের এই অবস্থায় একা বসে ভাবতে ভাল লাগে, আর কিছু ভাল লাগে না। কালকেও বিকেলে পড়াতে গিয়েছিল গাব্বুকে। অণিমা বাড়িতে ছিল না। গাব্বুর কাছে একটা সাঁটা খাম রেখে গেছে। বাড়িতে ফিরে সেটা খুলে দেখেছে সোমেন।

প্যাডের একটা কাগজের ঠিক মাঝখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—নিলাম। মনে থাকবে। ভুলে· যেয়ো। অ।

বাড়িতে একটা টেনশন চলছে আজকাল। সারাদিন সোমেন থাকে না। দুপুরে একটু থাকে, আর রাতে। প্রায় রাতেই মা আজকাল ঘুমোনোর আগে দাদার কথা বলে। দাদার শরীর ভাল নেই। বউদির সঙ্গে গোলমাল হয়ে থাকবে, মনটাও তাই বোধহয় ভাল থাকে না। বউদি মানুষটা খারাপ নয়, দাদা তো ভালই। কিন্তু দু'জন ভালর জাত আলাদা। মা কিন্তু ববাবর দাদার পক্ষে। সোমেনকে রাত জাগিয়ে রেখে মা এক কাঁড়ি কথার হাঁড়ি খুলে বসে। সোমেন বিরক্ত হয়। সংসারের এত সব কথার মধ্যে বরাবর ডুবে মরে মন। তখন মনে হয়, অণিমা কিংবা রিখিয়ার কথা কত অবাস্তব! সংসারটা এত রোমাঞ্চহীন!

আজ বিকেল থেকে আকাশ ফুঁসছে। বৃষ্টি এল। সোমেন বেরোতে পারেনি। সন্ধেবেলা প্রথমে মা, তারপর বউদি এসে ধরল। দাদা কেন ফিরছে না! সোমেন একটা কবিতার খসড়া তৈরি করছিল, এ সময়ে এই ঝামেলা। অত বড় লোকটা, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, সে যাবে কোথায়, তার হবেটাই বা কী! কিন্তু কেউ বুঝল না। বৃষ্টির ধারটা কমতেই তাই সোমেনকে বেরোতে হয়েছে। বউদি ট্যাক্সির ভাড়া দিয়েছিল। কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া যায়নি। গড়িয়াহাটা থেকে ট্রাম ধরে এসেছে। মনে বিরক্তি রাগ।

কিন্তু এখন অফিসের দরজা পার হয়ে যখন দাদাকে দেখতে পেল সোমেন তখনই বড় চমকে উঠল। খালি গায়ে দাদা দাঁড়িয়ে, পরনে শুধু আধভেজা ফুলপ্যান্ট, আড়াআড়ি বুকের ওপর ময়লা পৈতে। মোটা গোল গণেশ মুখ। ভুঁড়িটা ঠেলে বেরিয়ে আছে। শরীরটা ঢিলেঢালা, চামড়ায় ভাঁজ। মুখেচোখে একটা ভ্যাবলা বোবা ভাব। বড় বড় চোখে সোমেনের দিকে চেয়ে আছে। চাউনিতে একটা নির্বোধ ভয়। দাদার এমন চেহারা কখনও দেখেনি সোমেন। সোমেন কাছে যেতেই বলল, কী হয়েছে? অ্যাঁ! কী হয়েছে?

সোমেন ভ্রূ তুলে বলে, কী হবে!

কার অসুখ? না কি অ্যাকসিডেন্ট?

সোমেন বুঝতে পারল না দাদা কী বলতে চাইছে। একটু অবাক হল। বলল, কী বলছ দাদা! আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

নিয়ে যাবি?

মা বউদি সব ভাবছে দেরি দেখে।

এতক্ষণে যেন-বা একটু স্বাভাবিক হল চোখ। দু'-পা ফাঁক করে গম্বুজের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ অবসন্নের মতো বসে পড়ে বলল, ও।

চলো। প্রায় আটটা বাজে।

রণেন মাথা নাড়ল। তারপর ভেজা জামা গেঞ্জি তুলে পরতে লাগল। হাত অল্প অল্প কাঁপছে। দৃশ্যটা দেখে সোমেনের সমস্ত হৃদয় বহুকাল বাদে দাদার দিকে ধাবিত হল এক বার। কী হয়েছে দাদার? বহু দিন হয় এই লোকটাকে সে লক্ষই করেনি। লক্ষ করেনি, তার কারণ, রণেন কখনও লক্ষ করায়নি। বরাবর দাদা একটু গম্ভীর মানুষ, একটু চুপচাপ। নীরবে সে সংসারের দায়িত্ব বহন করে। সোমেন একটু বড় হওয়ার পর থেকেই দেখেছে, এই লোকটা সংসারের অভিভাবক। দু' ভাইতে কথা হয় খুব কম। কিন্তু আজও নিজের কোটটা প্যান্টটা, সাধ-আহ্লাদের নানা জিনিস সোমেনকে নিঃশব্দে দিয়ে দেয়। দাদা কখনও কাউকে খারাপ জিনিস দেয় না। বাজার থেকে কখনও সস্তা জিনিস আনে না। সোমেনের ফিরতে রাত হলে চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই দাদা। শান্ত, উদার, স্নেহশীল। দাদাকে কেন এতকাল লক্ষ করেনি সোমেন? দাদার কী হয়েছে?

হাওয়াই শার্টের বোতাম এঁটে রণেন ব্যাগটা তুলে নিল। বলল, ঘোষদা, যাই।

ঘোষ মুখ তুলে বলে, এটি কে? ভাই?

হ্যাঁ।

ঘোষ মাথা নাড়ল। বলল, যান। বাড়ির সবাই ভাবছে। বলে একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসল যেন। আবার মাথা নেড়ে বলে, আমাদেরই ভাবাভাবির কেউ নেই। বাঁচা গেছে।

বৃষ্টির কলকাতায় জীবাণুর মতো থিকথিক করছে মানুষ, এখনও এই রাত আটটায়। বৃষ্টি কমে গেছে, তবু ঝিরঝির চলছে এখনও। গাড়ি-বারান্দার তলায় তলায় ভিড় জমে আছে। মানুষের পিণ্ড।

রণেন চার দিকে চেয়ে বলে, কী করে যাবি?

দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি যদি ধরতে পারি।

রণেন মাথা নেড়ে বলল, পাবি না।

তা হলে? মা আর বউদি ভাববে।

রণেন উদাস গলায় বলে, ভাবুক। আয় কিছু খাই। খিদে পেয়েছে।

খাবে?

দাদার সঙ্গে রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়ার কোনও অভিজ্ঞতা সোমেনের নেই। তার বড় লজ্জা করছিল। রণেনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। গদাই লশকরের মতো হেঁটে বৃষ্টির ছাঁট উপেক্ষা করে সে ঢুকে গেল একটা রেস্টুরেন্টে। পিছু পিছু সোমেন। কিন্তু সেখানেও ভিড়। টেবিল খালি নেই। চার দিকে হতাশভাবে চেয়ে রণেন সোমেনের দিকে চেয়ে যেন নালিশ করল, খিদে পেয়েছে।

বাড়িতে গিয়ে খেয়ো।

অধৈর্যের সঙ্গে রণেন বলে, সে তো অনেক দেরি। বলে সোমেনের দিকে রাগ আর নালিশভরা একরকম চোখে চেয়ে থাকে।

এ ক'দিনেই দাদার ভিতরে একটা ওলটপালট হয়ে গেছে। সেটা সোমেন এই টের পেল। স্বাভাবিক রণেন এভাবে কথা বলে না, তাকায় না। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে সোমেন বলে, শেয়ারের ট্যাক্সি মেট্রোর উলটো দিকে দাঁড়ায়। চলো, যদি পেয়ে যাই।

রণেন কিছু বলল না। কিন্তু সোমেনের সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

দু'দিন বৃষ্টির পর কলকাতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এখানে-সেখানে কিছু জল দাঁড়িয়ে আছে। তবু রোদ উঠেছে। আকাশ গভীর নীল। দু'দিন সাংঘাতিক বৃষ্টি হয়ে গেল। সবাই ঘরবন্দি। এই দু'দিন সোমেন কেবলই শুনেছে দাদার ঘর থেকে দাদা মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে বলছে, দরজা খুলে দাও। জানালা খোলা রাখো।

বৃষ্টির ছাঁটে ঘর ভিজে যাচ্ছে। বউদি রাগ করে বলে।

দাদা তখন ভীষণ হতাশভাবে বলে, ওঃ হোঃ হোঃ। ইস্ কী অন্ধকার। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মা প্রায় সারাক্ষণ ওই ঘরে। এ-ঘরে একা সোমেন। বুকের মধ্যে দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দাদার কী হয়েছে? মাঝে মাঝে ও-ঘরে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসে। দাদা নির্জীব হয়ে শুয়ে আছে কিংবা মাথা হাঁটুর ফাঁকে বেখে বসে। ছেলে-মেয়েদের মুখ করুণ, শুষ্ক। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে বাবার কাণ্ড দেখে হেসে ফেলে। বেশির ভাগ সময়েই বাইরের ঘরে খেলা করে। বউদি ভাল করে খায় না। রাতেও বোধহয় ঘুম নেই। শরীর এ ক'দিনেই শুকিয়ে গেছে। একটা বিপদের আশঙ্কায় থমথম করে ঘরের আবহাওয়া। ঘরে তাই সোমেনের মন টেকে না।

সোমেন এ কয়দিন খুব সিগারেট খেল। ভাবল। কেমন যেন মনে হয় এবার সংসারে একটা পরিবর্তন আসবে, ছক পালটাবে। সেই আগের মতো নিশ্চিন্ত জীবন আর থাকবে না।

গভীর রাতে একদিন ঘুম ভেঙে শুনল কলের গান বাজছে। খুব আস্তে বাজছে, আর সেই সঙ্গে বাইরের ঘরে কার যেন নড়াচড়ার শব্দ, গভীর শ্বাস আর 'আঃ উঃ শব্দ'।

দরজা খুলে সোমেন অবাক হয়ে দেখে, অদ্ভুত দৃশ্য। আলো জ্বালা হয়নি, তবু জানালা সব খোলা বলে বাইরের আলো এসে পড়েছে। রেডিয়োগ্রামের চৌকো ব্যান্ডে আলো জ্বলছে, স্থির হয়ে আছে সবুজ ম্যাজিক আই। আর রেডিয়োর সেই আলোর চৌখুপির কাছে একটা মাথা অনড় হয়ে আছে। প্রথমটায় আবছায়ায় বুঝতে পারেনি সোমেন। তারপর দেখে, দাদা একটা আন্ডারওয়্যার মাত্র পরে মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে। রেডিয়োর স্পিকারটা নিচুতে। স্পিকারের সঙ্গে কান লাগিয়ে শুনছে রবিঠাকুরের গলায় গাওয়া গানের রেকর্ড—'অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ...'

সোমেন আস্তে করে ডাকল, দাদা!

রণেন মুখটা ঘুরিয়ে তাকে দেখল, তর্জনী ঠোঁটের কাছে তুলে বলল, চুপ।

আবার গান শুনতে লাগল। রেকর্ড ফুরিয়ে গেলে আবার ফিরে চালিয়ে দিল। সোমেনের দিকে ফিরেও তাকাল না। বোধহয় ভুলে গেল যে কেউ তাকে দেখছে। দীর্ঘকাল সে যেন গান শোনেনি। আকণ্ঠ পান করে নিচ্ছে, যেমন চৈত্রের মাঠ শুষে নেয় বৈশাখের বৃষ্টি। এখন ওর আর কেউ নেই, ওই গানটুকু, ওই কাঁপা কাঁপা রিক্ত কণ্ঠস্বর ছাড়া।

বহুকাল কাঁদে না সোমেন। কোনওকালে তার চোখে জল আসে না সহজে। এখন হঠাৎ হাতের পিঠে চোখ মুছল। গলা, কণ্ঠা অবরোধ করে কান্না উঠে আসে। সোমেন ঘরে এসে অন্ধকার হাতড়ে সিগারেট ধরায়। বসে থাকে। ঘুম হয় না।

দু'দিন বৃষ্টির পর রোদ উঠতেই সে বেরিয়ে পড়ল সকালে। খাওয়ার জায়গা অনেক আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় যে যেতে ইচ্ছে করছে তা বুঝতে পারছিল না। বুকের মধ্যে টনটন করে গুপ্ত ব্যথা। একা থাকতে ইচ্ছে করে। মেঘভাঙা রোদে ভ্যাপসা গরম। বাতাস নেই। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ হেঁটে সোমেন যখন আবার বাড়ির রাস্তায় ঢুকতে যাচ্ছিল তখনই দেখে পূর্বা আগে আগে যাচ্ছে।

সোমেন ডাকল, এই।

পূর্বা চমকে ফিরে তাকিয়েই হেসে ফেলল, ইস, এমন ভয় পাইয়ে দিস না!

ভয়ের কী?

রাস্তায় কেউ আচমকা ডাকলে ভয় করে না? তোর কাছেই যাচ্ছিলাম।

সে বুঝেছি, নইলে এ পাড়ায় তোর আর কে লাভার আছে!

গাঁট্টা খাবি। ছ্যাবলা কোথাকার!

সংবাদ কী শুনি বৃন্দেদূতী।

পূর্বা মুখ ভ্যাঙাল। বলল, জানি না। অনিল রায় তোকে ডেকেছেন।

কেন?

বললেন, সোমেনের নাকি চাকরি দরকার! আমার ডিপার্টমেন্টে একটা পোস্ট খালি আছে, ওকে দেখা করতে বোলো।

সোমেন ভ্রূ কুঁচকে বলে, আমার চাকরি দরকার সে-কথা ওকে বলল কে?

পূর্বা উদাস গলায় বলে, কে জানে! তোমার তো হিতৈষী আর হিতৈষিণীর অভাব নেই। আমাদের জন্যই কেউ ভাবে না।

সোমেন খুব নাক-উঁচু গলায় বলে, কী চাকরি জানিস?

না। তবে প্রফেসারি নয় এটুকু বলতে পারি।

এম এ পরীক্ষা দিইনি বলে ঠেস দেওয়া হচ্ছে?

আহা, কী এমন বালিশটা যে ঠেস দেব?

সোমেন হাসল। বলল, চা খাবি?

তোর বাসায়? না বাবা, রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়ে ভাল হল। একদিন তোর বাড়ি গিয়েছিলাম,

অনেক দিন আগে, তুই ছিলি না। তোর মা সেদিন আমার জাত-গোত্র জিজ্ঞেস করে অস্থির করে তুলেছিল। পালিয়ে বাঁচি। আজও ভয়ে ভয়ে যাচ্ছিলাম, নেহাত চাকরির খবর না দিলে নয়।

আমার চাকরির খবরে তোর অত ইন্টারেস্ট কেন? সোমেন মিচকে হেসে বলে।

আহা! বেকার বসে আছিস না!

থাকলেই কী?

হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে বাসস্টপে চলে এল। রবিবার। বাস ফাঁকা যাচ্ছে। সোমেন একটা আটের বি থামতে দেখে বলল, ওঠ!

অবাক হয়ে পূর্বা বলে, কোথায় যাবি?

হাওড়া। তারপর ট্রেন ধরব।

ওমা। কেন?

তোকে নিয়ে আজ পালিয়ে যাচ্ছি।

॥ তেতাল্লিশ ॥

আটের বি বাসটা ছেড়ে গেল। পূর্বা উঠল না। একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, পালাব কেন? বাড়িতে বলেকয়ে এলেই তো হয়। কেউ আটকাবে না।

সোমেন ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকায় পূর্বার দিকে। গম্ভীর হয়ে বলে, চান্সটা মিস করলি।

বয়ে গেল।

দু'জনে আস্তে আস্তে হেঁটে ব্রিজের ওপর উঠতে থাকে। কোথায় যাওয়া নয়, কেবলমাত্র হাঁটা। বৃষ্টির পর রোদ বড় তেজি। ভ্যাপসা গরম। ব্রিজের ঢালু বেয়ে ওপরে উঠতে একটু হাওয়া লাগল। রেলিঙের ধার ঘেঁষে দু'জনে দাঁড়ায়। সোমেন বলে, লোকে আমাদের কী ভাবছে বল তো!

যা খুশি ভাবুক গে। কত হাজার হাজার জোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে কলকাতায়, লোকের ভাবতে বয়ে গেছে।

তোর বাবা যদি এখন বাসে যেতে যেতে আমাদের দেখে ফেলে? সোমেন একটু কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে।

পূর্বা চোখ বড় বড় করে বলে, দেখেনি নাকি? কতবার কত ছেলের সঙ্গে দেখেছে। প্রথম প্রথম মা'র ওপর রাগারাগি করত। এখন ভাবেই না।

একটা ইলেকট্রিক ট্রেন তলা দিয়ে চলে গেল শিস টেনে। রেল লাইনের ধারে বস্তি। আপ-লাইনের ওপর কাঁথা কাপড় শুকোচ্ছে রোদে, বাচ্চাকাচ্চারা খেলছে, রোগা রোগা কালো চেহারার ক'জন মেয়েছেলে বসে আছে লাইনের ওপর, খুব নিশ্চিন্ত। ট্রেন এলে একটু সরে বসবে, ট্রেন চলে গেলে আবার লাইনের ওপর হামা টানবে দুধের শিশু, কাঁথা কাপড় শুকোবে।

দৃশ্যটা দেখিয়ে পূর্বা বলে, দেখেছিস, কী সাহস! আমার হাত-পা শিরশির করছে।

ওদের কিছু হয় না। রেল লাইন ওদের উঠোন।

পূর্বা চুপ করে দৃশ্যটা দেখে একটু। ঠিক মুখের ওপর রোদ পড়ছে। হাতের মুঠোয় এক কণা রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বলল, অণিমার বিয়েতে কী দেওয়া যায় বল তো। আমরা সবাই একসঙ্গে দেব, শ্যামল বলেছে পারহেড কুড়ি টাকা। বড্ড বেশি না?

সোমেনের বুকের মধ্যে সেই কাঁপুনিটা ওঠে। একটা ব্যথা, একটা আনন্দ। মুখটা পূর্বার চোখের আড়াল করার জন্যই ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, বেশি আর কী?

পূর্বা রাগের গলায় বলে, বেশ বেশি।

কথাটা কাউকে বলার নয়। চিরকাল এক বুক অন্ধকারে চাপা থাকবে অণিমার ভালবাসার কথা। সোমেন আর অণিমা ছাড়া আর-কেউ জানবে না। কিন্তু সেটা সহ্য করা যায় কি? অণিমা যে তাকে ভালবাসত এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে তার নিজের জয়। কাউকে না বলে থাকে কী করে সোমেন? বুকের ভার একা বওয়া যায় না। বলবে না বলে বার বার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল সোমেন। তবু মনটা তরল হয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, অণিমাটা না একটা পাগল, জানিস?

পূর্বা মুখ তুলে বলল, কেন?

'বোলো না, বোলো না, পূর্বা সবাইকে বলে দেবে।' এই বলে নিজেকে মনে মনে ধমকাল সোমেন। কিন্তু সামলাতে পারল না। ভাবল, অণিমা তো বলতে বারণ করেনি!

মুখে সে পূর্বাকে বলল, কাউকে বলবি না? গা ছুঁয়ে বল।

পূর্বা তার হাত ছুঁয়ে বলল, প্রমিস।

একদিন না...

বলে ফেলল সোমেন। অনর্গল বুক থেকে কথা বেরিয়ে গেল। আটকানো গেল না। পূর্বা অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। কিন্তু পূর্বাকে নয়, গোটা পৃথিবীকেই যেন জানানোর দরকার ছিল।

বলে ফেলেই হঠাৎ যেন নিবে গেল সোমেন। গভীর এক ক্লান্তি মনের ভিতরে। বলা উচিত হল না, বলা উচিত হল না। সবাই জেনে যাবে। অণিমার কানেও উঠবে কোনওদিন। ভাববে, সোমেন কেমন পুরুষ? হায় ঈশ্বর, ওকে আমি কেন ভালবেসে ছিলাম!

সোমেনের বড় ভয় করল! অণিমার বিয়ে হয়ে যাক, ভিন্ন পুরুষের ঘর করুক, তবু চিরকাল মনে মনে সোমেনকে ভালবাসুক—এই কি চায় না সোমেন? যদি সে কোনও দিন জানতে পারে যে অণিমার সেই গোপন ভালবাসা ফুরিয়েছে, তা হলে কি গভীরভাবে হতাশ হবে সোমেন?

পূর্বাকে বাসে তুলে দিয়ে ফিরে এল সোমেন। সারাটা দুপুর কেবল ভাবল। সে এত দুর্বল কেন? কেন বলে দিল পূর্বাকে? নিজেকে বড্ড ছোট মানুষ বলে মনে হয়।

নিজের ওপর বিরক্তিটাই ইদানীং বড় প্রবল। বড় রেগে থাকে সোমেন। বাড়ির লোকেরা কথা বলতে সাহসই পায় না। বউদি এসে একদিন বলল, টুবাইটার ট্রিপল অ্যান্টিজেন-এর শেষ ডোজটা বাকি আছে, চারু ডাক্তারের দোকান থেকে দিইয়ে আনবে সোমেন?

পারব না। বলে রেগে উঠে গেল সোমেন। একটু বাদে ফিরে এসে দেখল বউদি রান্নাঘরে উবু হয়ে বসে আছে, দু'হাঁটুর ভিতরে গোঁজা মাথা, চোখের জল মুছছে। বড় মায়া হল। নিঃশব্দে টুবাইকে কোলে নিয়ে চারু ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে গেল সোমেন।

এই রকম হয়েছে তার আজকাল। হঠাৎ রাগ উঠে পড়ে, হঠাৎ বড় মায়া হয়। বাসায় সবসময়ে এক শোকের মতো স্তব্ধতা। দাদা অফিসে যায় না। বড় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখে ওষুধ দিয়েছে। চেঁচামেচিটা একটু কম করে। কিন্তু ভ্যাবলা ভাবটা যায়নি এখনও। তেমন গুরুতর কিছু নয় বোধহয়। কিন্তু মা আর বউদি অনেকটা রোগা হয়ে গেছে। সারাদিন তাদের মুখ শুকনো। এই গুমোট, কথাশূন্য, মন-খারাপ বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। এখনও রোগ, শোক, দুঃখ-টুঃখ ঠিক নিতে পারে না সোমেন। পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যাওয়ার তেমন কোনও জায়গা নেই। বন্ধুরা অধিকাংশই চাকরি করে। আড্ডা দেয় সন্ধের পর। কিন্তু সারাদিনটা সোমেন করে কী! এক-আধদিন বন্ধুদের অফিসে গিয়ে হানা দেয়। বেশি যেতে লজ্জা করে। অহংকারে লাগে।

ম্যাক্স এখনও কলকাতায় আছে। মাসখানেকের মধ্যে দেশে ফিরে যাবে। কয়েকদিন বেনারসে কাটিয়ে এল। মুখ-চোখ খুব উদাস। আরও একটু রোগা হয়ে গেছে। পেটে ফাঙ্গাস হয়েছে। সোমেনকে একদিন বুঝিয়ে বলল, আই হ্যাভ এ গার্ডেন ইন মাই স্টমাক। পেটের মধ্যে শ্যাওলা

পড়েছে। লাল রিংওলা দুটো সিগারেট দিল একদিন, বলল, পিওর টোবাকো নয়। একটু গাঁজা আছে

সোমেনের তাতে কিছু যায় আসে না। গাঁজা খেলেই কী! দুটো সিগারেট এক ঘণ্টায় শেষ করে দিল সোমেন। দেখে একটু হাসল ম্যাক্স। কিছু বলল না। অনেকক্ষণ হালকা ওজনশূন্য শরীর আর ভাসন্ত মাথার এক অদ্ভুত নেশা রইল সোমেনের। মনটা টল টল করে। আরও দুটো সিগারেট চেয়ে রেখে দিল সোমেন, বদলে পাঁচ প্যাকেট দিশি সিগারেট কিনে দিল ম্যাক্সকে। গঙ্গার ধার ধরে দু'জনে বিস্তর হাঁটল।

ম্যাক্স।

উঁ।

তুমি অণিমাকে ভালবাসো?

ম্যাক্সের মাথায় পাখির বাসার মতো চুলের ঝোপড়া। গঙ্গার দিক থেকে মুখ ফেরাল ম্যাক্স। অমনি দুরন্ত বাতাসের ঝাপটায় চুলের রাশি এসে পড়ল গালে। কপালে। একটু পিঙ্গল দাড়ি-গোঁফের ভিতরে আচ্ছন্ন মুখ। চোখের ফসফরাস আজও জ্বলে ওঠে। কিন্তু ওকে বিপজ্জনক মানুষ বলে মনে হয় না।

ম্যাক্স একটু হাসল, বলল, বাঙালি মেয়েরা বিদেশিকে ভয় পায়।

তুমি প্রোপোজ করেছিলে?

ম্যাক্স মাথা নাড়ল। বলল, হুঁ—হুঁ। কিন্তু ও রাজি হয়নি, আমিও সেজন্য দুঃখিত নই। অণিমা ভাল মেয়ে, কিন্তু বড় মরালিস্ট।

তোমার ওকে ভাল লাগে না?

লাগে। সো হোআট? বলে আবার একটু হাসে ম্যাক্স, বলে, আই হ্যাভ স্লেপ্ট উইথ ওভার টু হ্যান্ড্রেড গার্লস। নো অ্যাটাচমেন্ট। আই অ্যাম অলমোস্ট এ সেইন্ট।

এই রোগা সাহেবটা দু'শো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে? ভারী অবাক হয়ে তাকায় সোমেন, বলে, লায়ার!

ওঃ নো। বলে ম্যাক্স হাসে, বলে, আমার একটা নোটবই আছে। প্রত্যেকটা মেয়ের নাম আর ডেট তাতে লিখে রেখেছি। ইট ওয়াজ এ হবি। অবশ্য এ-সব বেশিরভাগই ঘটেছিল অস্ট্রেলিয়ায়।

ফুচকাওলার সামনে দাঁড়িয়ে গেল তারা। গঙ্গার বাতাসে জলের ছলাৎছল ভেজা শব্দ আসে। বাজে জাহাজের ভোঁ, ডাক দিয়ে যায় দশদিকে ছড়ানো মহাবিশ্বের অপার বিস্তারে। গাঁজার নেশা আর ফুচকার ঝাল-টক স্বাদ ভেদ করে মর্মমূলে একটা গুপ্ত পেরেকের যন্ত্রণা নড়েচড়ে ওঠে।

আর, ইন্ডিয়ায়? সোমেন প্রশ্ন করে।

এ ফিউ। বেশির ভাগই প্রস্টিটিউটস। মেয়ে মাত্র কয়েকজন।

হঠাৎ বিষম খায় সোমেন! কয়েকজন! কে সেই কয়েকজন? বুকটা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ম্যাক্সের একটা হাত ধরে বলে, কারা? আমাদের চেনা মেয়ে?

ম্যাক্স শালপাতার ঠোঙা উলটে ফুচকার জল খাচ্ছিল। প্রচণ্ড ঝাল। নীলচে চোখ ভরে জল এসেছে, ঝালের চোটে কাশল খানিক। মুখ ছুঁচলো করে শিসাতে শিসাতে বলে, ওঃ লিভ দ্যাট। মেয়েছেলের ব্যাপারে আমি খুব ক্লান্ত। এখন একটু মজা পাই নেশায়, অন্য কিছুতে নয়। গার্লস উইল বি, গার্লস। দে অলওয়েজ টিজ ইউ।

ম্যাক্সের হাতটা আরও শক্ত করে ধরল সোমেন। বলল, বলো ম্যাক্স। আমি জানতে চাই।

কেন?

সোমেন হাসল, বলল, মেয়েগুলোকে চিনে রাখব?

কেন?

চিনে রাখা ভাল, যদি ওদের কারও সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায়।

ম্যাক্স সোমেনের হাতটা ছাড়িয়ে দিল। মুখটা কিছু গম্ভীর, বিষণ্ণ। বলল, তুমি বড় অর্থডক্স সোমেন।

এই বলে ম্যাক্স আবার ফুচকা নেয়। দ্রুত খেতে থাকে। ঝালের জন্য জিভে রাখতে পারে না, গিলে ফেলে কোঁত করে। বলে, তোমাকে বলি, আমি এখন রক্ষণশীল মানুষদেরই বেশি পছন্দ করি।

সোমেন হাতের শালপাতা ফেলে দিয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলে, পূর্বা নয়তো!

ওঃ নো।

অপালা?

গুডনেস, নো।

একটু ইতস্তত করে সোমেন। বড় ভয় করে। বুক কাঁপে। অবশেষে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, অণিমা?

আকাশের দিকে মুখ তুলে ম্যাক্স ফুচকাটা মুখের মধ্যে ফেলে দেয়। গলা ঝাড়ে। উত্তর দেয় না। সোমেন চেয়ে থাকে। নেশাটা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। হাতে-পায়ে ঝিমঝিমিনি ভাব। একটু দুর্বল লাগে।

ম্যাক্স তার দিকে তাকায়। গম্ভীর চোখে। সোমেন সেই চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর আস্তে আস্তে, দুর্বলভাবে ঘাসের ওপর বসে পড়ে সোমেন, ফুচকাওলার পায়ের কাছে। এবং বসে বসে যেন রসাতলে নেমে যাচ্ছিল সে।

গঙ্গার ধার ঘেঁষে ঘাসজমির ওপর চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে রইল দু'জন। নেশা কাটছে।

অনেকক্ষণ বাদে সোমেন মাথা তুলে বলে, ও আমাকে ভালবাসত।

ম্যাক্স পাশ ফিরে একটু দেখল সোমেনকে। চোখে কৌতুক ঝিলিক দেয়, বলল, তাই নাকি? তারপর আবার উদাসী চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, তুমি ভাগ্যবান।

তুমি ওকে কী করেছ সাহেব?

ম্যাক্স চিত হয়ে শুয়ে আছে, মাথার নীচে দুই হাতের তেলো, আকাশে চোখ। উদাস গলায় বলে, নাথিং।

লায়ার।

ম্যাক্স হাসল। মিষ্টি, বিষণ্ণ হাসি। বলল, তোমার খুব নেশা হয়েছে।

আলবত হবে! বলে উঠে বসে সোমেন। আর-একটা লাল রিংঅলা সিগারেট বের করে ধরাতে যাচ্ছিল, ম্যাক্স হাত বাড়িয়ে ঠোঁট থেকে কেড়ে নিল, বলল, আর নয়। তা হলে মুশকিলে পড়বে।

সোমেন হামাগুড়ি দিয়ে সাহেবের কাছে আসে। বলে, সত্যি কথা বলো।

ম্যাক্স একটু অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বলল, আমার লুকোনোর কিছু নেই সোমেন। আমি নক্সালাইটদের সঙ্গে দু'-তিনমাস আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম অ্যান্ড আই হ্যাড ট্রাবল উইথ দি পলিস। কিছু দিন আমাকে জেলেও রাখা হয়েছিল। আমার সময় ছিল না যে কিছু করি।

তবু সোমেনের মনে হচ্ছিল, ম্যাক্স মিথ্যে কথা বলছে। বললেই বা কী! অণিমার জন্য সোমেনের আর কী আসে-যায়! সে তো ভালবাসত না অণিমাকে? এই তো ক'দিন পরে অণিমা এক সম্পূর্ণ অচেনা মানুষের সঙ্গে বাস করবে, তখনই বা কী করার থাকবে সোমেনের?

তবু সোমেন ম্যাক্সের গলার কাছে জামাটা আলগা হাতে মুঠো করে ধরে বলে, সত্যি কথা বলো ম্যাক্স। আমি জানতে চাই।

ম্যাক্স জিভ দিয়ে চুক চুক একটা শব্দ করল। মাথা নেড়ে বলল, ইউ আর এ চাইল্ড। আমি বিদেশি বলেই তুমি আমাকে সন্দেহ করো সোমেন। তুমি ভাবো, যৌনতার ব্যাপারে আমাদের কোনও বাছবিচার নেই। সেটা সত্যিও বটে।

বলতে বলতে উঠে কনুইয়ের ওপর ভর রেখে একটু কাত হয়ে সোমেনের মুখের দিকে তাকায় ম্যাক্স। বলে, এর আগের বার বেনারসে স্যানস্‌ক্রিট শেখার জন্য আমি এক পণ্ডিতের কাছে যেতাম। সে লোকটা বুড়ো, কিন্তু খুব স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। সে লোকটা আমাকে একটা শ্লোক শিখিয়েছিল। তোমাদের যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে, স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের আগে স্বামী স্ত্রীর নাভিতে হাত রেখে বলবে, প্রসীদ জগজ্জননী। হে জগতের মা, তুমি প্রসন্ন হও। আমাকে তোমার ভিতরে গ্রহণ করো। আমি যেন তোমার ভিতর দিয়ে পুত্ররূপে আবার জীবন লাভ করি। ওইভাবে আমার সত্তা অনন্ত ও অখণ্ড হোক। ওই হচ্ছে গর্ভধারণের মন্ত্র, প্রসীদ জগজ্জননী। তুমি জানো?

সোমেন মাথা নাড়ল। জানে না।

ম্যাক্স আবার তেমনি চিত হয়ে শোয়। উদাস হয়ে যায় বুঝি বা। গঙ্গার বানডাকা বাতাস বয়ে যায় বুকের ওপর দিয়ে। অনন্ত আকাশ ঝুঁকে আছে মুখের ওপরে উদাসীন ভরে। সেখানে ফিরোজা রং ধীরে মুছে দিচ্ছে গোধূলির বেলা। নক্ষত্রের জগৎ ভেসে উঠতে থাকে। ম্যাক্স বলে, আমরা সৃষ্টিকর্তা নই সোমেন। আমাদের ভিতর দিয়ে যে পুত্র-কন্যারা আসে আমরা তাদের সৃষ্টি করি না। আমরা কেবল প্রজননের উপলক্ষ। যৌনতা আমাদের যে আনন্দ দেয় তা একটা প্রলোভন মাত্র, ওই প্রলোভনে আমরা নারীর সঙ্গে মিলিত হই, কিন্তু আসলে ওই ভাবে প্রলুব্ধ করে প্রকৃতি আমাদের দিয়ে তার কাজ করিয়ে নেয়। উই রিপ্রোডিউস। এ হচ্ছে বায়োলজি। আমি বায়োলজি জানি। কিন্তু যৌনতার কোনও দর্শন আমার ছিল না। দু'শো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছি, কিন্তু তারা আমাকে শেখায়নি। একটা ছোট্ট শ্লোকে আমি তা শিখে গেছি।

সোমেন অধৈর্যের সঙ্গে বলে, তুমি এত জানো কেন ম্যাক্স?

ম্যাক্স তেমনি উদাসীনভাবে শুয়ে রইল। চোখ বোজা। বলল, তোমাদের জানবার জন্য আমি মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়িয়েছি, গ্রামে-গঞ্জে হাটে-বাজারে পড়ে থেকেছি, ভিখিরিদের সঙ্গে থেকেছি। খুঁজেছি, যতভাবে খোঁজা যায়। বেনারসে এক বার একটা রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি। দুপুরবেলা। আমার টেবিলে একটা ছেলে আর মেয়ে এসে বসল। হিপি টাইপ। ছেলেটির চুল-দাড়ি আছে, বিশাল চেহারা। মেয়েটার ভারী কম বয়স। একটু রোগা, সারা গায়ে ময়লা। সে একটা লম্বা ঝুলের ফ্রক পরে ছিল। তার ফ্রকের নীচে কাঁচুলি ছিল না, স্তনের বোঁটা ফুটে আছে জামার ওপর। আমেরিকান। তারা ব্যাগ থেকে জ্যামের কৌটো বের করে রুটিতে মাখিয়ে খাচ্ছিল। আমার সঙ্গে কয়েকটা কলা ছিল, আমি তাদের দিলাম। তারা আমার রুটিতে তাদের জ্যাম মাখিয়ে দিল। ওইভাবে পরিচয়। আমাদের কোনও পিছুটান নেই, তাই তক্ষুনি দল বেঁধে ফেললাম। সেই রাতে আমি আমার ধর্মশালা ছেড়ে ওদের ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। একটু বেশি রাতে মেয়েটা আমার বিছানায় চলে এল। আমি তখন খুব উত্তেজিত ছিলাম, কারণ ওই মন্ত্র তখন আমার ভিতরে ঘুরছে। একটি মেয়ের ওপর ওই মন্ত্রটার প্রভাব লক্ষ করা আমার দরকার ছিল। তখন নিশুতিরাত। মেয়েটি নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে, আমি বসে তার নাভিতে হাত রেখে বললাম, প্রসীদ জগজ্জননী। সে জিজ্ঞেস করল এর অর্থ কী! বুঝিয়ে বললাম। মেয়েটা অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। যৌন মিলনের আগে এ-রকম ভারী কথা শুনে সে কেমন হয়ে গেল। নিশুত রাত, এক বিছানায় আমরা দুটি নরনারী, ন্যাংটো। তবু আমরা মিলিত হতে পারছিলাম না। আমি বার বার জিজ্ঞেস করছিলাম, ডু ইউ ফিল লাইক জগজ্জননী? তুমি কি প্রসন্ন হয়েছ? সে বার বার মাথা নেড়ে বলে, ওঃ নো। আই ফিল রেস্টলেস। অবশেষে আমি তাকে বললাম, তা হলে তোমার সঙ্গীর কাছে যাও। ও তোমাকে তৃপ্ত করুক। মেয়েটা আমাকে আঁকড়ে ধরে বলল, ও লোকটা ইম্পোটেন্ট। আমি ওর কাছে যাব না। অবাক হয়ে বলি, ইম্পোটেন্ট হয়ে থাকলে ওর কাছে আছ কেন? আমেরিকানরা সহজে কাঁদে না। মেয়েটাও কাঁদল না, কিন্তু ওর গলার স্বরে শুকনো কান্না ছিল। বলল, হোয়েন আই ফিল লো অ্যান্ড ডাউন, যখন আমি ভয়ংকর ভাবে ভেঙে পড়ি, তখন ও আমাকে একটা ট্যাবলেট দিয়ে বলে,

সোয়ালো ওয়ান, অ্যান্ড ইউ ফিল ডিভাইন। সেই ট্যাবলেট খেলে আমি সত্যিই স্বর্গে পৌঁছে যাই। বুঝলাম, ও ড্রাগ খায়। এল-এস-ডি, কোকেইন বা ওইরকম কিছু। আইওয়া ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিল, একদিন হঠাৎ ওর মনে হয়েছিল, বেঁচে থাকাটা বড় একঘেয়ে। মাত্র আঠারো কি উনিশ বছর বয়সে সব রকম যৌন মিলনের আনন্দ সে পেয়েছে, ভাল পোশাক, ভাল গাড়ি, গান, শিল্প, সাহিত্য—সবরকমের আনন্দ উপভোগ করেছে। নেচেছে, সাঁতার কেটেছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছে, দেশভ্রমণ করেছে। মৃত্যুশোক পায়নি, প্রেমে ব্যর্থ হয়নি, তবু জীবনটা বড় একঘেয়ে। একদিন মনে হল, জীবনে কিছু নেই। মাথার ওপর পুরনো আকাশ, নদীর ওপর শীতের একঘেয়ে কুয়াশা জমে থাকে, তুষারপাতে ঢেকে যায় সবকিছু, আবার বসন্ত আসে, আসে গ্রীষ্মকাল। একই রকম ভাবে। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি চলে অবিরল, স্থির হয়ে থাকে মাথা উঁচু বাড়ি-ঘর। নিত্য নতুন সঙ্গী জোটে, কিন্তু সেই একই রকম লাগে। কিছুতেই বুঝতে পারে না পৃথিবীতে সে জন্মগ্রহণ করেছে কেন! রাত জেগে কখনও-সখনও পুঁথির পাতায় খুঁজে হাজারও জবাব পেয়েছে, গেছে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। অবশেষে একদিন এই ছেলেটির কাছ থেকে পেয়ে গেল জবাব। একটা সাদা ইনোসেন্ট ট্যাবলেট। খাও, স্বর্গে পৌঁছে যাবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, এক বার ট্যাবলেটের স্বর্গে পৌঁছলে আর পৃথিবীকে কিছুতেই অন্য অবস্থায় সহ্য করা যায় না। যেই নেশা কেটে যায় তখনই মনে হয়, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনও সুখ নেই; সে বড় দুঃখী। ফালতু মানুষ। নানা দুঃখের হাওয়া এসে বুকে ধাক্কা দেয়। মনে হয় জীবন এক এমন নৌকো যা মৃত্যুনদী ভেদ করে চলেছে। চার দিকে মৃত্যুর বাতাস, মৃত্যুর গন্ধ। বেঁচে থাকা এক প্রগল্ভতা মাত্র। তাই আবার ট্যাবলেট খাও, পৌঁছে যাও তুরীয় আনন্দে, বুঁদ হয়ে থাকো। সিগারেট, কফি বা মদ কোনও নেশাই এর ধারে কাছে আসতে পারে না। এ নেশা যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ। নেশা কেটে গেলেই দিন দিন পৃথিবী আরও বীভৎস হতে থাকে। মেয়েটা তাই ওর সঙ্গীকে ছাড়তে পারে না। তারা মৃত্যুর চুক্তিতে আবদ্ধ। পৃথিবী জুড়ে মানুষ নানাভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার অস্তিত্ব, তার প্রয়োজনীয়তা, তার জন্মের কারণ। সে চার্চে যায়, শুঁড়িখানায় যায়, মেয়েমানুষের কাছে যায়, সে পৃথিবী লোপাট করে টাকা কুড়িয়ে আনে। সে অসুরের মতো খাটে, নাচে, সাঁতার কাটে। বিপ্লব করে, যুদ্ধে যায়, চাঁদের মাটি কুড়িয়ে আনে। তবু তার নিজের ভিতরে অনড় হয়ে থাকে কুয়াশায় ঢাকা একটু রহস্য—সে কে? সে কেন? এই রাতে ছোট্ট কম্বলের বিছানায় আমরা দুই অনাবৃত নারী-পুরুষ বসে রইলাম। আমাদের মাঝখানে ওই কুয়াশা, ওই রহস্য। আমি তাকে বার বার জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি বুঝতে পারছ তোমার মধ্যেই সৃষ্টির নিহিত রহস্য? তোমার ভিতর দিয়েই আসে প্রাণ? তুমি জগতের জননী? সে মাথা নেড়ে তত বার বলে, না, আই ডোন্ট ফিল লাইক মাদার মেরি। আই ফিল রেস্টলেস। আমি হতাশ হয়ে অবশেষে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি মেয়েমানুষ, এটা অনুভব করো কি? ওইভাবেই রাত কেটে গেল। একটা রাত, হয়তো-বা একটা যৌন-ব্যর্থতার রাত। পরদিন আমি মেয়েটাকে নিয়ে ধর্মশালা থেকে চলে এলাম, ওর সঙ্গী বাধা দিল না। তাকিয়ে একটু দেখল কেবল। আর একটা বিশ্রী গালাগাল দিল। মেয়েটাকে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ধর্মশালায়, হোটেলে, রাস্তায়। আমাদের যৌন মিলন হয়নি যে তা নয়। না হলে মেয়েটাকে নিয়ে আমার এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব হত না। বড় রেস্টলেস ছিল মেয়েটি। বেনারসে থাকবার সময়ে সে প্রায়ই আমাকে ফাঁকি দিয়ে তার পুরুষ সঙ্গীর কাছে চলে যেত, ট্যাবলেট খেয়ে আসত। কিন্তু থাকত আমার সঙ্গেই। প্রতি রাতেই আমি তার নাভিতে হাত রেখে বলতাম, প্রসীদ জগজ্জননী। সে মাথা নাড়ত। না। সে কিছু অনুভব করছে না। ড্রাগের নেশাড়ুদের যে-সব দোষ থাকে সবই তার ছিল। মাঝে মাঝে সে আমাকে প্রচণ্ড গালাগাল করত, চিৎকার করত। আবার ট্যাবলেট খেলে তার মুখে-চোখে অদ্ভুত তৃপ্তি আর আনন্দ ফুটে উঠত। সে আমাকে প্রায়ই বলত, ম্যাক্স, তুমিও খাবে ট্যাবলেট? খাও, ইউ ফিল ডিভাইন। সে আমাকে ট্যাবলেট দিত।

ম্যাক্স উঠে বসে কেতরে প্যান্টের পকেট থেকে একটা নাইলনের ফোল্ডার বের করে আনে। হাতের তেলোয় ঢালে কয়েকটা ট্যাবলেট। আতঙ্কিত সোমেন চেয়ে থাকে।

ম্যাক্স আবার ফোল্ডার রেখে দিয়ে বলে, বয়ে বেড়াচ্ছি। স্মৃতিচিহ্ন। মেয়েটাকে শেষবার দিল্লির হাউজ খাস-এ একটা বাড়িতে গাড়ি-বারান্দার তলায় ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে চলে আসছিলাম। এক বার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ভোরের আবছা আলোয় কম্বল জড়িয়ে শুয়ে আছে। উওম্যান, মেয়েছেলে। সমস্ত অবয়বে কোনও ঘাটতি নেই। মেয়েমানুষের সব অঙ্গই অটুট। তবু ও ঠিক মেয়েমানুষ নয়। যুদ্ধের সময়ে সোলজারদের একরকম রবারের পুতুল দেওয়া হয়, উইথ ফেমিনিন অর্গানস। ও অনেকটা সে-রকম। তবু ও পুতুলও নয়। ও চেঁচায়, গাল দেয়, ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাই পুরুষেরা ওকে ওই রকমভাবে ফেলে ফেলে যায়। অন্য কেউ এসে ফের তুলে নেয়। কেবল সেই পুরুষ সঙ্গীটি, যে ইম্পোটেন্ট, তার সঙ্গেই ও বাঁধা আছে। মৃত্যুচুক্তি। সুইসাইডাল প্যাক্ট। যেখানেই থাকুক, ঠিক তার কাছে ছুটে যায়। কোথায় তার মধ্যে জগজ্জননী! কোথায় প্রসন্নতা! এরপরও অনেকবার অনেক বেশ্যাকে ওই মন্ত্র বলেছি, দু'-একজন ভারতীয় মহিলাকেও। তারা হেসেছে। না, তারাও জানে না ওই মন্ত্র। কখনও শোনেনি। বরং আমি ভারতবর্ষে ঘুরে দেখেছি উইমেনস লিবারেশন আন্দোলন চলছে। ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ায় মেয়েছেলে বলতে আর কেউই প্রায় নেই, যারা আছে অল আর মেন উইথ ফিমেল অর্গানস। মহিলার অঙ্গলক্ষণযুক্ত পুরুষ, তাদের লিবারেশন ঘটে গেছে। তাই পুরুষেরা আর মেয়েছেলে খুঁজে পায় না। পায় যৌন অঙ্গ, আর পার্টনার। সেই হাওয়া আসছে এ-দেশেও। পৃথিবী থেকে মেয়েমানুষ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সোমেন। একদিন একটা বাঙালি মেয়েকে টেনিস খেলতে দেখে আমি সোজা গিয়ে তাকে বললাম, তুমি টেনিস খেল কেন? এ তো তোমাদের খেলা নয়। মেয়েটা অবাক। বলে, কী করে বুঝলে যে এ আমাদের খেলা নয়! আমি তাকে বোঝাতে পারলাম না। কিন্তু আমার কেবলই মনে হয়, কোথায় যেন ভুল হচ্ছে। ভীষণ ভুল হচ্ছে। মেয়েরা দুনিয়া জুড়ে কী একটা ভুল করছে, তাই এই অবস্থা। একদিন অণিমা বলেছিল, ম্যাক্স, তুমি সমাজপতিদের মতো কথা বলো কেন? মেয়েদের লিবারেশন তোমার ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু জেনো মেয়েরা যে বেহায়া হয়ে উঠছে তা পুরুষেরা তাদের ওইরকম চায় বলেই। এখনও মেয়েরা পুরুষদেরই ক্রীতদাসী। তারা যেমন চায় তেমনিই হয়ে ওঠে মেয়েরা। তোমরা যদি জগজ্জননী চাও তো মেয়েরা একদিন তা-ই হবে। এ-কথা শুনে আমি অণিমার প্রেমে পড়েছিলাম। ও যে আমাকে রিফিউজ করেছে তাতেও আমি খুশি। শি ওয়াজ অর্থডক্স। আর, রক্ষণশীল মানুষ আমি খুব পছন্দ করি সোমেন।

সোমেন তর্ক করল না। কেবল শুনল। মাথাটা টালমাটাল। হাওয়ায় শুয়ে থাকতে বড় ভাল লাগছিল। ঠান্ডা বাতাসে একটু জলীয় গন্ধ। বয়ার গায়ে জলের শব্দ। মাঝগাঙ থেকে মাল্লাদের সুর ভেসে আসে কখনও। দেয়ালের মতো উঁচু একটা জাহাজ দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে যায়।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

কাল অণিমার বিয়ে। শাড়ির দামটা এখনও অণিমাকে দেওয়া হয়নি। ভাবলেই লজ্জা করে সোমেনের। পাগলামিটা না করলেও চলত। দেড়শোটা টাকা হুট করে খরচ করা কি তার উচিত? হাতে টাকা নেই বহু দিন। মাসের প্রথমে অণিমাদেরই বাসা থেকে খামে করা একশো টাকা পেয়ে যায় সে, তারপর সারা মাস অনাবৃষ্টি। কী ভীষণ খরচ করতে ইচ্ছে করে সোমেনের, হাত-পা নিশপিশ করে খরচ করার জন্য। টাকা থাকলে কত কী করত সে। দাদা, বউদি, মা আর

ভাইপো-ভাইঝিদের জন্য রাজ্যের জিনিস কিনত। দিত বাবাকেও, এক-আধ প্যাকেট গোল্ডফ্লেক কিনতে ইচ্ছে করে, কিছু বই, মাঝে মাঝে ট্রাম-বাসের ভিড় ছেড়ে ট্যাক্সি করতে। সামান্য ইচ্ছে। কত লোকের কত বেশি টাকা আছে। কিনে শেষ করতে পারে না। কালো টাকা। যাদের নেই তারা আক্রোশে আক্ষেপে গভর্নমেন্টকে গালাগাল দেয় ট্রামে বাসে আড্ডায়। প্রতি বছর বাজেটের খবর বেরোলে হতাশায় দেখে, আবার সিগারেটের দাম বাড়ল, জামা-কাপড় মহার্ঘ হয়ে গেল, সিলিং ফ্যান আর কেনা যাবে না। পূর্ব এসপ্লানেডে অবরোধ জোরদার হয়, মিছিল বাড়ে, ছায়াময়ী হতাশার মেঘ গুমোট করে রাখে সারা দেশকে। লাথি মারতে ইচ্ছে করে সোমেনের। লাথিতে লাথিতে ভেঙে ফ্যালে কলকাতা, বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ।

বউদির খোঁজে এক বার দাদার ঘরে উঁকি দিল সোমেন। বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। খেয়াল ছিল না, এ সময়ে বউদি টুবাইকে ইস্কুল-বাস থেকে নামিয়ে আনবার জন্য রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বড় দু'জন আরও পরে ফেরে। ফাঁকা ঘরে একা দাদা বসে আছে বিছানায়। উঁকি দিতেই চোখে চোখ পড়ে গেল। দাদার চোখ দুটো কিছু অস্বাভাবিক, ঘোলা এবং উজ্জ্বল লালচে আভাযুক্ত। তাকিয়ে বলল, কে রে? সোমেন?

সোমেন পরদা সরিয়ে একটু হেসে বলে, কেমন আছ দাদা?

রণেন যেন অবাক হয় প্রশ্ন শুনে। বলে, কেমন থাকব! ভালই আছি। আমার হয়েছেটো কী যে, জিজ্ঞেস করছিস কেমন আছি?

ভুলটা বুঝতে পারে সোমেন। প্রশ্নটা করা উচিত হয়নি। বলল, শরীর খারাপ শুনেছিলাম।

রণেন মাথা নেড়ে বলে, না। বেশ আছি। এরা সব কোথায় গেল? আমাকে এখনও সকালের চা দেয়নি।

সোমেন অবাক হয়ে বলে, তুমি এই ঘুম থেকে উঠলে নাকি?

রণেন ভ্রূ কুঁচকে বলে, হ্যাঁ। কেন, খুব বেলা হয়ে গেছে নাকি! বলে টেবিলের ওপর ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলে, তাই তো! কেউ ডেকে দেয়নি, অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওরা কোথায় গেল?

বউদি বাচ্চাদের আনতে গেছে। মা পুজো করছে।

রণেন একটু বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে থাকে সোমেনের দিকে। তারপর মুখটা বিকৃত করে বলে, বাচ্চাদের ইস্কুলে পাঠাতে বারণ করেছি, তবু পাঠিয়েছে?

সোমেন ঠিক বুঝতে না-পেরে বলে, বারণ করেছিলে কেন?

রণেন একটু উত্তেজিতভাবে বলে, রাস্তাঘাটে আজকাল বাচ্চাদের বেরোতে আছে! কলকাতায় কীরকম অ্যাকসিডেন্ট দেখিস না। বলে রণেন পাশে পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বলে, দ্যাখ, সব দাগিয়ে রেখেছি। কাছে আয়।

সোমেন কাছে গিয়ে দেখে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় দুর্ঘটনার খবরগুলিতে লাল পেনসিলের দাগ।

রণেন মুখ তুলে বলে, দেখেছিস?

সোমেন মাথা নাড়ল।

রণেন উত্তেজিতভাবে বলে, কীরকম ভাবে মানুষ মরে যাচ্ছে! আর তোর বউদি কোন সাহসে বাচ্চাদের ঘরের বার করে? যদি কিছু হয়?

সোমেন মৃদু স্বরে বলে, কিছু হবে না। ওরা তো বাসে যায়।

রণেন মাথা নেড়ে সেই ঈষৎ উঁচু গলায় বলে, বাস অ্যাকসিডেন্ট করে না? কে গ্যারান্টি দিয়েছে? বলতে বলতে উঠে ঘরময় পায়চারি করে রণেন। বিড়বিড় করে বলে, আমি ঘুমোচ্ছিলাম, সেই ফাঁকে বাচ্চাদের বের করেছে। কোনদিন সর্বনাশ ঘটে যাবে। একটাও ফিরবে না।

বলতে বলতে যেন দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখে একটা ঝাঁকি খায় রণেন। দাঁড়িয়ে পড়ে। আবার পায়চারি করে।

সোমেন বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর চায়ের কথা মনে পড়তেই বলে, দাঁড়াও, মাকে তোমার চায়ের কথা বলে আসি।

জপের সময় কথা বলেন না ননীবালা। সোমেন পিছনে থেকে বার দুই ডাকল, ননীবালা হাতের ইশারায় ডাকতে বারণ করলেন।

সোমেন একটু ইতস্তত করে। দাদার জন্য সে বহুকাল কিছু করেনি। দাদাকে সে লক্ষই করে না আজকাল। আজ তাই একটু কিছু করতে ইচ্ছে হল।

চা চিনি দুধের ঠিকানা জানে না সোমেন। কেটলিটা রান্নাঘরের ট্যাপ-এর কাছে খুঁজে পেল। গ্যাস উনুন কখনও জ্বালেনি। একটু ভয়-ভয় করছিল, তবু কল ঘুরিয়ে গ্যাস ছেড়ে দেশলাই জ্বেলে দিল।

কেটলি বসিয়ে অনেক কৌটোটৌটো নেড়ে চা-পাতা আর চিনি খুঁজে পেল, দুধের ডেকচিটা মিটসেফ থেকে বের করছিল, এ সময়ে রণেন এসে দাঁড়ায়, বলে, কী করছিস?

একটু চমকে উঠেছিল সোমেন, হেসে বলল, তুমি ঘরে গিয়ে বসো, আমি চা করে আনছি।

তুই করবি! রণেন অবাক হয়ে বলে, গ্যাস ফেটে কত লোক মরে যায় জানিস? বলে মুখ ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে আপনমনে বলল, সিকিউরিটি! সিকিউরিটি! মানুষ তার বেশি আর কিছু চায় না।

এই বলে ঘরে চলে গেল রণেন। ঘরে বসে ভাববে। একা একা কত কথা আর বলবে।

চা-পাতা বেশি পড়ে গেছে, লিকারটা হয়েছে ঘন ক্বাথের মতো। ননীবালা উঠে এসে দেখে বললেন, এই কি পুরুষমানুষের কাজ! বউমা তো চৌপর দিন চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরসংসার ভেসে যায় তো যাক।

চা নিয়ে রণেনের ঘরে ঢুকে সোমেন দেখে দাদা ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে। খুব সজাগ ভাব, যেন দূরের কোনও শব্দ শুনবার চেষ্টা করছে কিংবা অস্পষ্ট কোনও গন্ধ শুঁকছে বাতাসে।

চা দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, ইচ্ছে করছে না। নিয়ে যা।

সোমেন হেসে বলে, তোমার জন্য কত কষ্ট করে করে আনলাম, নাও।

ভ্রূ কুঁচকে আবার রণেন সোমেনের দিকে চায়, বলে, বাসায় কেউ নেই?

কাকে চাইছ?

মা।

এমনভাবে মা কথাটা উচ্চারণ করল যেমনভাবে টুবাই ঘুম থেকে উঠে করে। রান্নাঘর থেকে ননীবালার স্বর শোনা যাচ্ছিল, একা-একা বউমাকে বকছিল। সেই স্বরটাই বোধহয় উৎকর্ণ হয়ে শুনল রণেন। প্রাণে জল এসেছে এমন হঠাৎ-পাওয়ার মতো বলল, ওই তো মা!

মাকে পাঠিয়ে দেব? সোমেন জিজ্ঞেস করে।

রণেন চায়ের কাপ তুলে চুমুক দেয়। ভ্রূ কোঁচকানো। বলে, মা'র কত বয়স হয়ে গেল! আর কতদিন বাঁচবে? অ্যাঁ! যদি মরে যায় তা হলে থাকব কী করে মা ছাড়া!

সোমেন বিছানার ওপর বসে দাদার দিকে চেয়ে থাকে। দাদাকে এক প্রকাণ্ড শিশুর মতো লাগে। বলে, ও-সব ভাবো কেন?

ভাবব না? বলিস কী! চা খেয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, সবাই থাকবে আমি চলে যাব, সেটাই ভাল। কারও মরা আমি সহ্য করতে পারব না সোমেন।

দাদা।

যদি মা'র মরার সময় হয় তো তার আগে মরে যাব।

দাদা একটা সিগারেট ধরায়। নিজের হাতের তালুর দিকে নিবিষ্টভাবে চেয়ে থেকে বলে, মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়।

শ্লোকটা সোমেন বাবার কাছে কতবার শুনেছে। মেরো না, মোরো না, পারো তো মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। পরের দুর্দশা দেখে, মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা ও মৃত্যুর কথা মানুষের মনে পড়ে। সেটাই দুর্বলতা। যার হৃদয় সবল সে তা ভাবে না, বরং ওই সব অবস্থায় যেন আর কেউ বিক্ষিপ্ত না হয়, তারই উপায় চিন্তা করে। ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত, বুদ্ধদেবের যেমন হয়েছিল। বাবা বলতেন। বাবার কথা আজকাল সোমেনেরও বড় মনে হয়। সেদিন যখন ম্যাক্স তার জগজ্জননীর গল্প বলছিল তখনও অস্পষ্টভাবে কেবলই বাবার কথা ভেবেছিল সোমেন। ওই সব মন্ত্র-তন্ত্র ওই সব প্রাচীন ভারতীয় মনোভাবের সঙ্গে যেন বাবার নাড়ির যোগ। বংশধারা বেয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যধারা যেন-বা ব্রজগোপাল পর্যন্ত আসতে পেরেছিল বহু কষ্টে। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ আর নেই। যে-দেশটা পড়ে আছে সে-দেশকে লাথি মেরে রসাতলে পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছে করে কেবল। মনে হয়, লক্ষ্মণদা আমেরিকায় কত মজায় আছে। এ-রকম পালিয়ে যেতে পারলে বেশ হত। কে চায় ভিখিরি ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব, কে চায় এ দেশের আজন্মমৃত্যু বন্দিদশা?

বউদি ফিরতেই সোমেন আড়ালে ডেকে টাকাটা চাইল। ক্ষণকাল বউদি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ রোদে দাঁড়িয়েছিল বীণা। মুখটায় তাই তামাটে রক্তাভা, কপালে ঘাম, ঠোঁটে বিশুষ্ক ভাব। একটু অস্বস্তির সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, হঠাৎ এত টাকার আবার কী দরকার পড়ল?

একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। খুব আটকে গেছি। দেবে?

বউদি মুখটা নত করে বলে, তোমার দাদা যদি নর্মাল থাকত তবে কি ভাবতাম ভাই? ও বেরোলেই টাকা। মাইনের টাকা আর ক'দিন! কিন্তু সে-সব তো বন্ধ। আমার লুকোনো-চুরনো কিছু থাকতে পারে, কিন্তু বেশি নেই আর, খরচ তো হচ্ছে। দেখি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল আবার।

সোমেন একটু ভেবে বলল, আচ্ছা থাক। দেখি, যদি অন্য কোথাও পাই।

বউদি ঘরে চলে যেতে যেতেই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, মা'র কাছে চাও না। মা'র তো ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে টাকা পড়ে আছে।

তাই তো! মনে পড়ে গেল সোমেনের। জমির টাকাটা পড়ে আছে এখনও। দাদার অসুখের জন্য পিছিয়ে যাচ্ছে তারিখ। এ ক'টা টাকা মাও দিয়ে দিতে পারে। মায়ের ঘরের দিকে ফিরেও থেমে গেল সোমেন। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা বাধা। চাইলেই যে মা দেবে তা নয়, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করবে, সন্দেহজনক সব প্রশ্ন করবে। তারপর সোমেন রেগে গেলে লক্ষ্মী মেয়ের মতো সুড়সুড় করে চেক কেটে দেবে সেটা সোমেন জানে। কিন্তু বাধা অন্য জায়গায়। টাকাটার ইতিহাস মনে করলে আর চাইতে ইচ্ছে করে না। বাবার কত কষ্টের টাকা। কত বছরের অপেক্ষার পর পাওয়া। টালিগঞ্জের জমিটুকু ঘিরে কত সুখের স্বপ্ন মায়ের।

সোমেন টাকা চাইল না। বেরিয়ে পড়ল সন্ধেবেলায়। দেড়শো টাকার সমস্যাটা তেমন কঠিন হওয়া উচিত নয়। টাকাটা বাইরে কোথাও থেকে ঠিক পেয়ে যাবে সোমেন।

অনিল রায় স্খলিত গলায় গান গাইছিলেন। অথবা গান গাওয়া এ নয়। গলা সাধাই হবে হয়তো। চাকর দরজা খুলে দিতেই শব্দটা কানে এল। শ্লেষ্মা কিংবা কান্নায় আবিষ্ট গলা, সঙ্গে তানপুরার আওয়াজ, সুর মিলছে না। তিনশো টাকা ভাড়ার চমৎকার সরকারি ফ্ল্যাট, প্রচুর জায়গা। খোলামেলা। প্রথম ঘরটায় একটা গোদরেজের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর ডাঁই করা বই, আলমারি ঠাসা কেবল বই। দ্বিতীয় ঘরটা শোওয়ার। সেখানে একটা বেতের চৌকিতে তুচ্ছ বিছানা।

মেঝেয় কার্পেটের ওপর তানপুরা হাতে বসে আছেন অনিল রায়, পিঠে-কাঁধে প্রচুর লোম, কানের লম্বা লোমগুলো ছেঁটে ফেলেন অনিল রায়। পাশে মদের বোতল, গেলাস, সোডা, কিছু চিজ লাগানো নোনতা বিস্কুট।

সোমেনকে দেখে তানপুরা শোয়ালেন, গেলাস তুলে নিয়ে বললেন, খাও, ঢেলে নিয়ে খাও। ষষ্ঠী, আর-একটা গেলাস দিয়ে যা।

না স্যার, মা টের পেলে বকাবকি করবে।

অনিল রায় উত্তর দিলেন না। ষষ্ঠী বিনা শব্দে এসে গেলাস রেখে গেল। বাড়িটা অসম্ভব স্তব্ধ। কানে তালা লেগে যায়। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ পাওয়া যায়।

অনিল রায় বসে বসেই টলছিলেন। বললেন, তা হলে কফি?

তা একটু খেতে পারি।

কিন্তু কফির কথা ষষ্ঠীকে বলতে ভুলে গেলেন অনিল রায়। কার্পেটের ওপর এক ধারে একটা পাশবালিশ পড়ে আছে, সেইটাতে ঠেসান দিয়ে বসে বললেন, গান কাকে বলে জানো? অ্যাটমসফেরিক ডান্স অব দি ভয়েস, বুঝলে?

না স্যার।

বাংলায় কী বলে! বাংলা নিয়ে আমার বড্ড মুশকিল। ও-ভাষাটা বড্ড আদুরে বাবুভাষা। এক্সপ্রেশন হয় না। বলা যায়, কণ্ঠস্বরের আবহনৃত্য। সুরের পাখিরা বেরিয়ে এসে চার দিকে নেচে নেচে বেড়ায়।

সোমেন একটু হাসল।

অনিল রায় হাতের পিঠে ঠোঁট মুছে নিয়ে বলেন, একটু নেশা করে গাইতে বসলে ঠিক টের পাই, পাখিগুলো চার দিকে উড়ে উড়ে নাচছে, নামছে, আনন্দে চিৎকার করছে। তারপর পাখিগুলো ঠোকরাতে শুরু করে। ঠুকরে ঠুকরে খায়। আমাকে খায়। খেয়েটেয়ে কিছুক্ষণ পরে বোধহয় ভাল লাগে না, আধ-খাওয়া করে ফেলে রেখে যায়। তখন ভারী মুশকিল। আধ-খাওয়া হয়ে পড়ে থাকি, বড় ভয় করে তখন। ষষ্ঠীচরণ ঘুমোয়, আর বাড়িটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে। নিজেকে মনে হয় কেবলমাত্র মাতাল, বলে অনিল রায় গেলাস শেষ করেন। আবার সোডার আর মদের মিশ্রণ তৈরি করে নিয়ে বলেন, শালা মাতাল। বাস্টার্ড।

টাকার কথাটা আর তোলা যাবে না, সোমেন বুঝল। মাতালদের একটা অন্য চোখে দেখে সোমেন। যেমন সবাই দেখে। মাতাল অবস্থায় কারও কাছ থেকে কিছু চাইতে বা নিতে সংকোচ হয়। মনে হয়, লোকটাকে ঠকাচ্ছি, ওর তো মনে থাকবে না।

অনিল রায় একটু ঝুঁকে বললেন, দেরি করে এলে। চাকরিটায় অন্য লোক নেওয়া হয়ে গেছে। অবশ্য তেমন কিছু নয়, একটা ক্ল্যারিকাল জব।

সংবাদ শুনে সোমেন দুঃখিত হল না। ছোটখাটো চাকরির জন্য তার মাথাব্যথা নেই। সে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে চায়, অনেক বেশি খরচ করতে চায়। এ চাকরি না হলেই কী? বলল, ঠিক আছে।

অনিল রায় গেলাস তুলে চোখের সামনে ধরে আছেন। গেলাসের স্বচ্ছ কাচে একটু হলুদ মদ। তার ভিতর দিয়ে সোমেনকে দেখলেন একটু। বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমার প্রোফাইলটা তো অদ্ভুত। বায়রনের মতো। দাঁড়াও, তোমার একটা ছবি তুলে রাখি।

বলে টলতে টলতে উঠলেন অনিল রায়। বিছানার বালিশের খাঁজ থেকে একটা চামড়ার খাপ টেনে বের করলেন। সোমেন চমকে উঠে বলে, স্যার, ওটা রিভলবার।

অনিল রায় স্তম্ভিত হয়ে হাতের খাপসুদ্ধ রিভলভারটার দিকে চেয়ে থাকেন একটু। একটু ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলেন, তাই তো। দাঁড়াও, ক্যামেরাটাও এখানেই আছে। এ অবস্থায় ণত্বষত্ব জ্ঞান থাকে না, বুঝলে।

খুঁজে পেতে খাপসুদ্ধ ক্যামেরাটা বার করেন অনিল রায়। দুর্ধর্ষ জাপানি মিনোল্টা ক্যামেরা। ঝকঝক করছে। ফ্ল্যাশগান লাগানো, ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে অনিল রায় তাক করছেন। হাত টলছে, শরীর টলছে।

সোমেনেরও বুক টলে হঠাৎ। শেষ বেলায় সবুজ খেতের ওপর দিয়ে সূর্যাস্তের রং মেখে একটা একা পাখি যেন বহু দূর পাড়ি দিয়ে ফিরে যাচ্ছে ঘরে। আধো অন্ধকার জমে ওঠা খড়কুটোর বাসা। ওম্, নিরাপত্তা, বিশ্রাম। পাখি ফেরে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা আসাহি পেন্টাক্স ক্যামেরার নিষ্প্রাণ চোখ। অলক্ষ্যে ডেকে ওঠে একটা অন্ধ কুকুর।

অনিল রায় স্খলিত গলায় বলেন, তোমার মুখটা কোথায়? অ্যাঁ! খুঁজে পাচ্ছি না।

সোমেন ম্লান একটু হাসে।

অনিল রায় বলেন, ওঃ, এই তো।...তোমার দুটো মুখ, অ্যাঁ! দুটো!...ডাবল ফেসেড বাস্টার্ড! না না, তোমাকে নয়। নিজেকেই বলছি। এ ডাবল ফেসেড বাস্টার্ড।

দুঃখিত চিত্তে সোমেন ওঠে, অনিল রায় ঝুঁকে পড়ে যেতে যেতে সামলে নেন। ক্যামেরায় চোখ। বলেন, হ্যাঁ। ঠিক আছে। বাঃ!

সোমেন ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। বড় সদর দরজাটা খোলা। চৌকাঠে পা দিয়ে শুনতে পেল, একা ফাঁকা ঘরে অনিল রায়ের গলার স্বর—হ্যাঁ, তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুমি ফাঁকা, তুমি শূন্য, এ বায়রনিক ভ্যাকুয়াম। ঘাড় ঘুরিয়ো না। ঠিক আছে।

একটা অস্পষ্ট আলোর ঝিলিক ঘরের মধ্যে চমকে উঠল। টের পেল সোমেন। ফাঁকা ঘরে অনিল রায় তার ছবি তুললেন। সোমেন সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এল। রাত হয়ে যাচ্ছে। সময় নেই। মুহুর্মুহু ডাকে এক অন্ধ কুকুর। আসাহি পেন্টাক্স ক্যামেরার একটিমাত্র চোখ চেয়ে আছে প্রতীক্ষায়।

সোমেন যাবে।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

খুব ভোরবেলা। এখনও আকাশে ঝিলমিল করছে নক্ষত্র। পুবের দিকে আকাশটা একটু ফিকে ফিরোজা। ভুতুড়ে সব গাছের ছায়া। ভোর ভোর বেলায় এখন একটু জুড়িয়ে যাওয়া মিঠে ভাব চার দিকে। বহেরুর খামার ছেড়ে ব্রজগোপাল টর্চের আলো ফেললেন আলের ওপর। এ রাস্তাটা ভাল নয়, তবু অনেক তাড়াতাড়ি হয় ইস্টিশন। কলকাতামুখো প্রথম গাড়িটা এতক্ষণে বর্ধমান ছেড়েছে। ঘুরপথে বড় রাস্তায় গেলে ধরা যাবে না।

পিছনে বহেরু দাঁড়িয়ে। উঁচু বাঁধের মতো ঢিবি, খামারের শেষ সীমানা। তার ওপর আলিসান ছায়ামূর্তি। আজকাল বড় সন্দেহের বাতিক। কাল থেকে ব্রজগোপালকে পাখি পড়া করে বলছে, চলে যাবেন না ঠাকুর, আসবেন কিন্তু।

চলে যাওয়ার কী তা ব্রজগোপাল বোঝেন না। চলে তিনি যাবেন কোথায়? কিন্তু বহেরুর ওই এক ভয় ঢুকেছে আজকাল। কর্তা বুঝি বউ-ছেলে, সংসারের টানে এতটা ভাঁটেন, আবার উজিয়ে যান। পাগুলে কথা সব। গেলেই কি আটকাতে পারে বহেরু? পারে না, তবু কাঙাল ভিখিরির মতো কেবলই হাত কচলে ওই কথা পাড়ে। ব্রজগোপাল বিরক্ত হন। তোর সঙ্গে আমার গূঢ় সম্পর্কটা কী, না কি দাসখত লিখে দেওয়া আছে! আবার ফেলতেও পারেন না বহেরুকে। ক'দিন আগেই এ-সংসারে ও ছিল কর্তাব্যক্তি, হাঁকডাকে চার দিক কাঁপত। কিন্তু বয়সে পায় মানুষকে, ভাগ্যে পায়, গাছগাছালির পোকামাকড়ের মতো কর্মফলেরা এসে কুট কুট করে খায়। সেই ক্ষয়ে ধরেছে বহেরুকে। আমান মানুষটা তখনও খাড়া হয়ে দাঁড়ালে দশাসই, কিন্তু তার আগুনটা নিভে গেছে।

ছেলেরা শকুনের মতো নজর রাখছে। ক'দিন বাদে গন্ধ বিশ্বেসে বহেরুতে তফাত থাকবে না।

টর্চবাতিটা এক বার ঘুরিয়ে ফেললেন ব্রজগোপাল। বহেরু এখনও দাঁড়িয়ে। একা। একটু কী যেন বুকে বেঁধে। ওবেলাই ফিরে আসবেন তবু মনে হয় এই যে যাচ্ছেন, আর হয়তো ফিরবেন না।

পরশু চিঠিটা এসেছে। জমি রেজিস্ট্রি হয়ে গেল। ভিতপুজোও সারা। তবু কাজ আটকে আছে। ননীবালা লিখেছেন, তুমি এক বার এসো। রণোর বড় শরীর খারাপ। মাথাটার একটু গণ্ডগোল হয়েছে বুঝি। আমার মন ভাল নেই।

এমন কিছু একটা আন্দাজ করেই এসেছিলেন ব্রজগোপাল সেবার। মাঝখানে বহুকাল যাওয়া হয়নি। জোর একটা বর্ষা গেল। চারধারে চাষের উৎসব লেগে গিয়েছিল। সে-উৎসব ছেড়ে কোথায় যাবেন?

ফ্যাকাসে আয়নার মতো জল-জমা খেত পড়ে আছে চিত হয়ে। তাতে চিকচিকে অঙ্কুর। পায়ের নীচে আঠালো জমি, কাদা, জল। দুর্গম রাস্তা। ব্রজগোপাল টর্চের আলো ফেলে হাঁটেন। উঁচুতে তোলা কাপড়, পায়ে রবারের জুতো, বগলে ছাতা। চার দিকে ঘাস, ফসল জমির একটা নিবিড় উপস্থিতি। কাছেই হাতের নাগালে তারাভরা আকাশ। অন্ধকারে বাতাসের স্পর্শ মায়ের হাতখানার মতো। গভীর মায়া মাখানো এই বিশালতা। মনের মধ্যে একটা প্রণাম তৈরি হয়ে যায় আপনা থেকেই। বুড়ো বামুনের গায়ের গন্ধ যেন চার দিকে ছড়ানো। আয়ুর বেলা ফুরিয়ে এল। টের পান, অলক্ষ্যে বৈতরণীর কুলুকুলু শব্দ ক্রমে কাছে এগিয়ে আসছে। যত এগিয়ে আসে শব্দ তত মায়া বাড়ে। তবু সেই আবছায়া নদীর শব্দ আসে, আসে। আর ততই মনে হয়, লতানে গাছ যেমন আঁকুশি দিয়ে যা পারে আঁকড়ে ধরে, তেমনি এই শরীর পৃথিবীর মাটি বাতাসে আবহের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে আঁকুশি। বাপ-পিতামোর কাছ থেকে পাওয়া প্রাণ, এই ব্যক্ত জীবন, এ ছেড়ে কার যেতে ইচ্ছে করে?

হাঁটতে হাঁটতে পুবের আকাশ ফরসা হয়ে এল। নিবে যাচ্ছে নক্ষত্রেরা। বেলদার বাজারের কাছে ব্রজগোপাল টিউবওয়েলে জুতোজোড়া আর কাদা মাখা পা দু'খানা ধুয়ে নেন। চায়ের দোকানের ঝাঁপ খুলেছে ভোরেই, দিনমজুর আর কামিনরা বসে ধোঁয়াটে চা খাচ্ছে, সঙ্গে সস্তা বিস্কুট। আসাম-চায়ের কড়া লিকারের গন্ধে জায়গাটা ম ম করে। মানুষজনের দিকে একটু চেয়ে থাকেন ব্রজগোপাল। বুকের মধ্যে বড় মায়া। মানুষেরা সব বেঁচে থাক।

অফিসের ভিড় শুরু হওয়ার আগেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন। বাসটাও ফাঁকা রাস্তায় চল্লিশ মিনিটে ঢাকুরিয়ায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সংকুচিত ব্রজগোপাল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন। একটু সকাল-সকালই এসেছেন ইচ্ছে করে। বেলায় এলে দুই ছেলেকে পাওয়া যায় না।

দরজা খুলল বীণা। দেখে খুশি হল, না বিরক্ত হল তা বোঝা গেল না। চেহারাটা কিছু রোগা হয়ে গেছে, হনুর হাড় উঁচু হয়ে আছে শ্রীহীনভাবে। মুখে হাসি ছিল না। একটু তাকিয়ে রইল, যেন চিনতে পারছে না। তারপর সরে গিয়ে বলল, আসুন।

ঘরে ঢুকতেই এক বন্ধ চাপা ভ্যাপসা ভাব। বাসি ঘরদোরের গন্ধ। পরিষ্কার দেখতে পান পরদার ফাঁক দিয়ে এখনও বিছানায় মশারি ফেলা। সবাই ঘুম থেকে ওঠেনি। ঠিকে ঝিয়ের বাসনমাজার শব্দ আসছে। বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় সব। খারাপ অভ্যাস।

সোফার ওপর একটু হেলান দিয়ে বসলেন। কলকাতার এইসব বাক্স-বাড়িতে এরা দিনের পর দিন কী করে থাকে তা আজকাল ভাবতে বড় অবাক লাগে। এ শহরে যারা আছে, ব্যাপারি-ফড়ে-দালাল তারা চিবিয়ে চিবিয়ে রস নিংড়ে নিচ্ছে অহরহ। পড়ে আছে একটা ছিবড়ে শহর। কলকাতার প্রতি মানুষের মোহ আছে, মায়া নেই। মায়া জন্মায় বড় অদ্ভুতভাবে। যেখানে জনপদে মানুষ চাষ করে, গাছ লাগায়, গৃহপালিত পশু-পাখিকে ভুক্তাবশিষ্ট দেয়, যেখানে মাটির সঙ্গে সহজ যোগ, মায়া সেখানে জন্মায়।

ব্রজগোপাল বললেন, কেউ ওঠেনি এখনও?

বীণা বলে, মা উঠেছেন। জপ করতে বসলেন এইমাত্র। আর কেউ ওঠেনি, মোটে তো সাতট' বাজে।

গোবিন্দপুরে সকাল সাতটা মানে অনেক বেলা। ব্রজগোপাল গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলেন, রণো?

ওঠেনি। ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়। নিজে থেকে না উঠলে ডাক্তার ডাকতে বারণ করেছে।

হয়েছে কী?

বীণার ভিতরের রাগ আর ক্ষোভ চাপা ছিল। হঠাৎ যেন এই প্রশ্নে সেটা আগুনের মতো উসকে উঠল। একটু চাপা গলায় বলে, হবে আর কী! বংশের রোগ।

ব্রজগোপাল একটু অবাক হন। মেয়েটা বলে কী? বংশের রোগ? তাঁদের বংশে কারও কোনও মানসিক রোগ ছিল বলে তিনি জানেন না। রণোরই প্রথম মানসিক ভারসাম্যের অভাব দেখা দিয়েছিল সেই ছেলেবেলায়, টাইফয়েডের পর। বীণার দিকে চেয়ে অন্যমনস্ক ব্রজগোপাল বললেন, বংশের রোগ। সে কীরকম?

বীণা উত্তর দিল না। বাথরুমের দরজায় গিয়ে ঝিকে ধমক দিল, কতদিন বলেছি সকালবেলাটায় বাথরুম বেশিক্ষণ আটকে রাখবে না!

ব্রজগোপাল অসহায়ভাবে একা বসে থাকেন। সবাই ঘুমোচ্ছে, কেবল ছোট নাতিটা বোধহয় এইমাত্র উঠে 'মা' বলে কাঁদছে। বীণা পলকে দৌড়ে গেল। ব্রজগোপাল শুনলেন গুমুর গুমুর দুটো-তিনটে কিল ছেলের পিঠে বসিয়ে বীণা বলল, কতদিন বলেছি সকালে ঘুম থেকে উঠে কাঁদবে না। কোন মা মরা ছেলে যে কাঁদতে বসেছ? বাবা ঘুমোচ্ছে দেখছ না! ছেলেটা ভয়ে চুপ করে গেল।

ব্রজগোপাল শুনলেন। কিছু করার বা বলার নেই। চুপচাপ বসে থাকা। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে তা বোঝা যাচ্ছে না। বোধহয় ওদের সময়ের অনুসারে একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন। এতটা সকালে না এলেই হত। বংশের রোগ। কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারেন না তিনি। বউটা এ-কথা বলল কেন? তাঁদের বংশে কার ওই রোগ ছিল?

বসে বসে ভাবছিলেন ব্রজগোপাল। বড় ছেলের ঘর থেকে একটা কোঁকানির শব্দ এল। বিকট 'উফ' করে কে যেন পাশ ফেরে। বোধহয় রণোই। বীণা চাপা স্বরে বলে, উঠছ কেন? শুয়ে থাকো!

রণোর গলার স্বর পাওয়া গেল, উঠব না! ক'টা বাজে?

গলার স্বরটাই অন্য রকম। কেমন অবাকভাব, শিশুর মতো। ব্রজগোপাল নিবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন।

বীণা বলে, বেশি বাজেনি। আর একটু ঘুমোও।

রণো বলল, ঘুম হবে না। বাথরুমে যাব।

বীণা ধমক দিয়ে বলে, আঃ। এখন উঠবে না!

আবার একটা ককিয়ে ওঠার শব্দ পান ব্রজগোপাল, তখন ব্রজগোপাল একটু কাশলেন। ইঙ্গিতবহ কাশি। রণো যদি শুনতে পায়, ঠিক বুঝবে যে বাবা এসেছে।

রণেন শুনল। জিজ্ঞেস করল, বাইরের ঘরে কে?

বীণা চাপা স্বরে কী যেন বলে।

রণোর স্বর শোনা যায়, বলোনি কেন এতক্ষণ?

একটা বড় শরীর বিছানা থেকে উঠল, শব্দ পেলেন ব্রজগোপাল। পরমুহূর্তেই নীল লুঙ্গিপরা খালি-গা রণো পরদা সরিয়ে চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়াল।

বাবা!

ব্রজগোপালের এ বয়সে বোধহয় একটু ভুলভ্রান্তি স্বাভাবিক। হঠাৎ যেন-বা আত্মবিস্মৃত ব্রজগোপাল চোখ তুলে তাঁর সেই ছোট রণোকে দেখতে পান। যেভাবে শিশুপুত্রের দিকে হাত

বাড়ায় বাপ তেমনি হাত বাড়িয়ে বললেন, আয়।

রণেন দৌড়ে এল না। কিন্তু এক-পা দু'-পা করে কাছটিতে এসে পাশে বসল। ব্রজগোপালের মুখের দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে প্রবল উৎকণ্ঠাভরে বলল, কেমন আছ?

এটা নিছকমাত্র কুশল প্রশ্ন নয়, এর মধ্যে যেন-বা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। ব্রজগোপাল রণেনের মাথায় আলতো হাত রেখে বললেন, বাপকু সোনা, কেমন আছ বাবা?

বাপকু সোনা বলে সেই রণোর ছেলেবেলায় ডাকতেন তিনি। বহুকাল অব্যবহারে নামটা ভুলে গিয়েছিলেন। এক্ষুনি মনে পড়ল।

রণেনের ঠোঁট দু'খানা একটু কাঁপে। পরমুহূর্তেই দু'হাতের পাতায় মুখ ঢেকে মাথা নাড়ে প্রবলভাবে। অর্থাৎ ভাল নেই।

ব্রজগোপাল অন্য দিকে তাকিয়ে আস্তে করে বলেন, তুমি বড় ভাল ছেলে বাবা, সংসার তোমার কাঁধে ফেলে রেখে আমি চলে গেছি, তুমি সব টেনেছ। বড় অপরাধী আছি তোমার কাছে বাবা।

রণেন নিস্তব্ধভাবে বসে ছিল হাতের পাতায় মুখ ঢেকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ সে একটু ফুঁপিয়ে ওঠে। ধরা গলায় বলে, এরা আমাকে আটকে রেখেছে।

ব্রজগোপাল ছেলের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিলেন, বললেন, তোমারই সংসার। আটকে কেন রাখবে? ও-সব ভাবো কেন? কেউ আটকে রাখেনি।

বীণা ছেলে কোলে করে এ ঘরে এল। দৃশ্যটা একপলক তাকিয়ে দেখে বলল, বাথরুম খালি হয়ে গেছে। যাও।

রণেন মুখ তুলে বীণার দিকে তাকাল, চোখে ভয়। বলল, যাই।

যাও। ব্রজগোপাল বললেন, হাত ধরে তুলে দিলেন ছেলেকে। বাথরুমের দিকে যতক্ষণ গেল ততক্ষণ চেয়ে রইলেন। রণেন খুব ধীরে ধীরে থপ থপ করে হেঁটে যাচ্ছিল, গায়ে যেন জোরবল নেই। প্রকাণ্ড শরীরের ভার যেন টানতে পারছে না।

কাল রাতে সোমেন যখন এল তখন তার সঙ্গে চুলদাড়িওলা রাঙা এক সাহেব। বগুড়ায় ছেলেবেলায় অনেক সাহেব দেখেছেন ননীবালা, কী সুন্দর সাজপোশাক কেমন ঝলমলে চেহারা। কিন্তু এ কী একটা সাহেবকে ধরে এনেছে সোমেন? রোগা, পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, সারা গায়ে ধুলোময়লা, চোখে মুখে ভিতু-ভিতু ভাব।

এসেই বলল, মা, আজ রাত্রে ম্যাক্স আমার কাছে থাকবে।

শুনে কপালে চোখ তুলেছেন ননীবালা। সাহেব মানুষরা বাংলাটাংলা বোঝে না, তাই তার সামনেই ননীবালা বলে ফেলেছিলেন, ও মা! সে কীরে, ওরা খ্রিস্টান...

সোমেন গলা নামিয়ে বলে, ও কিন্তু বাংলা জানে।

ননীবালা সামলে গেছেন। কিন্তু ছেলের আক্কেল দেখে অবাক। হিন্দু বাড়ির অন্দরমহলে কেউ সাহেবসুবো ধরে আনে? আচার-বিচারের কথা না হয় ছেড়েই দিলেন, ঘরদোরে জায়গাও নেই তেমন, রণোর অসুখের পর খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন তেমন নেই, দু' বেলা দুটো ডালভাত কি একটু মাছের ঝোল মাত্র রান্না হয়। এ দিয়ে কি অতিথিকে খাওয়াতে আছে! বীণাও খুশি হয়নি সাহেব দেখে। কেবল নাতি-নাতনিরা খুব ঘুরেফিরে সাহেব দেখছিল।

সাহেব হলেও ছেলেটা ভালই। এ বাড়ির কেউ যে তাকে দেখে খুশি হয়নি তা বুঝতে পেরেই বোধহয় বাইরের ঘরে জড়সড় হয়ে বসে ছিল। চোখে-মুখে ভারী ভালমানুষি আর ভয় মাখানো। মা-বাবা ছেড়ে কত দূরে পড়তে এসেছে। দেখেশুনে বুকের ভিতরটা 'আহা' করে উঠল ননীবালার।

রান্নাঘরে তাকে আর ঢোকাননি ননীবালা, বাইরের ঘরেই সোমেনের পাশে ঠাঁই করে খেতে দিলেন। আসনপিঁড়ি হয়ে বসে বেশ খেল। ঝিঙেপোস্ত, মুগের ডাল আর ট্যাংরার ঝাল। কোনও

আপত্তি করল না। মাঝে মাঝে নীল রঙের চোখটা যখন তুলে তাকাচ্ছিল তখনই টের পাওয়া যাচ্ছিল যে বাঙালি ঘরের ছেলে নয়, নইলে ভাবভঙ্গি সব বাঙালির মতো। এতক্ষণ কথা বলেনি, বোবার মতো চুপ করে ছিল। খেতে বসে প্রথম কথা বলল, মা, ঝিঙেপোস্ত খুব ভাল হয়েছে।

মা! ননীবালা বড় অবাক। সাহেব ছেলেটা তাঁকে মা বলে ডাকছে! ননীবালা বিস্ময়টা সামলে নিয়ে বলেন, মা বলে ডাকছ বাবা? কার কাছে শিখলে—

ছেলেটা হেসে বলল, এখানে সবাই ডাকে। মেয়ে মাত্রই মা। আমার দেশে এ-রকম ডাকে না। আমি এ দেশে শিখেছি।

ননীবালা নিবিষ্টভাবে রোগা ছেলেটার দিকে চেয়ে থাকেন। ছেলেটা চেহারার যত্ন করে না, চুলদাড়িতে কেমন জঙ্গল হয়ে আছে মুখ। একটু যত্ন করলে গৌরাঙ্গের মতো চেহারাখানা চোখ জুড়িয়ে দিত।

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন, মা বলে ডেকো না বাবা, তা হলে ছেড়ে দিতে কষ্ট হবে। বলে একটু চুপ করে থেকে বলেন, মা হওয়ার জ্বালাই কী কম! সামনের জন্মে ছেলে হয়ে জন্মাব, তা হলে আর মা হতে হবে না।

ছেলেটা চোখ তুলে বলে, আবার জন্ম হবে? ঠিক জানেন?

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন, জন্মাব না? কর্মফল যত দিন না কাটে—

ম্যাক্স দুঃখিতভাবে বলে, আমরা খ্রিস্টানরা জন্মাই না, আমরা মাটির নীচে শুয়ে থাকি। টিল দ্য ডে অব জাজমেন্ট।

ননীবালা ফাঁপরে পড়ে বললেন, সাহেবরা জন্মায় না! তা হলে এত সাহেব জন্মাচ্ছে কোথা থেকে বাবা?

সোমেন বেদম হাসতে গিয়ে বিষম খেল। সঙ্গে বীণাও। ননীবালা বিরক্ত হয়ে বলেন, ওতে হাসার কী! সাহেবরা হয়তো জন্মায় না, কিন্তু আমরা হিন্দুরা ঠিক জন্মাই।

এইভাবে ছেলেটার সঙ্গে দিব্বি আলাপ-সালাপ হয়ে গেল। সাহেব হলেও নেইআঁকড়ে ভাব। দু'চোখে সব সময় কী যেন খুঁজছে, কী যেন দেখছে। সোমেন রণেন যেমন অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাওয়া সবজান্তা ভাব, চোখের আলো নিবে যাওয়া রকম, ও তেমন নয়। ওর মনের কোনও আলিস্যি নেই।

ননীবালা নিজের বিছানায় সোমেনকে শুতে দিলেন, সোমেনের বিছানায় ম্যাক্স। ওরা নাকি রাত জেগে গল্প করবে। ননীবালা তাই বাইরের ঘরের সোফা-কাম-বেডে বিছানা পেতে নিলেন। সোফা-কাম-বেডে বড় অস্বস্তি, মাঝখানের দাঁড়াটা বড় পিঠে লাগে। এক কাতে শুয়েছিলেন, হঠাৎ মাঝরাতে দেখেন, আধো অন্ধকারে রণেন আন্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় রেডিয়োর সামনে বসে। আস্তে রেডিয়ো ছেড়ে গান শুনছে, এ-রকমই সব করে আজকাল। উঠে বসে ছেলেকে ডাকলেন। সাড়া দিল না। থাক শুনুক। কিন্তু ননীবালার আর ঘুম হল না।

ননীবালার জপ সারতে একটু সময় লাগে। জপ করতে করতেই সংসারের নানান শব্দের দিকে কান রাখেন। রাখতে হয়। আজও শব্দ পেলেন। মানুষটা এসেছে। জপ তাই জমল না। সময়টা প'র করে দিয়ে উঠেই প্রথমে ছোট ছেলেটাকে ঠেলে তুলে দিলেন, ওঠ, ওঠ, তোদের বাপ এসেছে।

সোমেন উঠল। বসে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই আর অ্যাশট্রে সরিয়ে চৌকির তলায় ঠেলে দিতে দিতে বলল, এ ঘরে উঁকি দেননি তো?

ননীবালা লক্ষ করে বললেন, দিলেই কী! বয়সের ছেলে, বিড়িটা সিগারেটটা তো খাবেই। ওতে লজ্জার কী! বাসি বিছানাটা বরং তুলে ফেল তাড়াতাড়ি, বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো উনি পছন্দ করেন না।

এইটুকু বলে ননীবালা এ ঘরে এলেন। মুখটুখ ধুয়ে রণেন এসে আবার বাপের কাছে বসেছে। খুবই ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি। ব্রজগোপালের চোখ-মুখের ভাব কিছু দৃঢ়, কঠিন। একটু চাপা, তীব্র স্বরে বলছেন,

বলো, আমি অক্রোধী, আমি অমানী, আমি নিরলস, কাম-লোভ-জিৎ বশী, আমি ইষ্টপ্রাণ, সেবাপটু, অতি-বৃদ্ধি-যাজন-জৈত্র পরমানন্দ, উদ্দীপ্ত শক্তি-সংবৃদ্ধ, তোমারই সন্তান, প্রেমপুষ্ট, চিরচেতন, অজর, অমর, আমায় গ্রহণ করো, আমার প্রণাম লও।

রণেন বলল। ব্রজগোপাল আবার বলালেন। আবার রণেন বলল। ব্রজগোপাল ছেলের দিকে তীব্র চোখে চেয়ে বলেন, কথাগুলো মনের মধ্যে গেঁথে নাও। রোজ সকালে নিজেকেই নিজে বলবে। সারাদিন বলবে। বলতে বলতে ওর একটা পলি পড়ে যাবে মনের ওপর। বুঝেছ?

রণেন মাথা নাড়ল। বুঝেছে।

ননীবালা স্বামীর দিকে চেয়ে ছিলেন। সেই পাগল। চোখে চোখ পড়তেই বললেন, ওটা শেখাচ্ছ ওকে?

ব্রজগোপাল স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু যেন সামলে গেলেন। দীপ্তিটা চোখ থেকে নিবে গেল। বললেন, ও হচ্ছে অটো সাজেশান। স্বতঃ অনুজ্ঞা। যখন মানুষের কেউ থাকে না তখন এই অনুজ্ঞা থাকে। এই চালিয়ে নেয় মানুষকে।

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন, ওর কে নেই? আমরা ওকে বুক বুক করে রাখি।

ব্রজগোপাল এক লহমায় উত্তর দিলেন না। একটু ভেবেচিন্তে বললেন, আছে। সবাই আছে।

তবে?

তবু কেউ নেই।

কথাটা ঠিক বুঝলেন না ননীবালা। তবু ইঙ্গিতটা ধরে নিলেন। এই সকালে ঝগড়া করতে ইচ্ছে যায় না। নইলে ক'টা কথা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে এখন, বলা যেত। বলা যে যায় না তার আরও কারণ আছে। জমিটা কিনেও অনেক টাকা বেঁচে গেছে ননীবালার। বাড়ির ভিতটা উঠে যাবে। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে ননীবালা অবাক হয়ে দেখেন, সাড়াশব্দে কখন নিঃশব্দে উঠে এসেছে সাহেব ছেলেটা। কোনও সংকোচ নেই, বেশ ব্রজগোপালের পাশটিতে বসেছে। ব্রজগোপাল তাকে অটো সাজেশান শেখাচ্ছেন।

বীণার সঙ্গে ননীবালার একটা জায়গায় বড় মিল। ননীবালা জানেন যে এ হচ্ছে পাগলের বংশ। বংশের ধাত অনুযায়ী কম-বেশি পাগলামি এদের সবার। স্বামীর দিকে চেয়ে থেকে তাঁর এই কথাটা আজ আবার মনে হল।

মাঝরাতেই ঠিক পলকা ঘুম ভেঙে যায় ব্রজগোপালের। ঝিঁঝি ডাকছে। চোরের পায়ের মতো হালকা পায়ে কে হেঁটে যায়, ব্রজগোপাল জানেন, শেয়াল। ঘুম ভাঙলেই মনের বিষণ্ণতা টের পান। ঘুমের মধ্যে কার একটা শ্বাস যেন মুখে এসে লেগেছিল। কেউ নয়। ঘুমের মধ্যে কত কী মনে হয়।

তাঁতি লোকটা আজকাল তাঁতঘরে জায়গা নিয়েছে। এখন এ ঘরে বহেরু শোয়। ঘরে শোয়া কোনওকালে অভ্যাস নেই বহেরুর। শীতকালটা ছাড়া। বড় ভয়ে ধরেছে আজকাল ওকে। কেবলই বলে, কত পাপ করেছি, কতজনার কত সর্বনাশ! কে এসে ঘুমের মধ্যে কুপিয়ে রেখে যায়, কি নলিটা কুচ করে কেটে দেয়, কে জানে!

মেঝের উপর পোয়ালের গাদিভরা চটের গদি, তার ওপর শতরঞ্চি, বালিশ-টালিশ নেই। পড়ে আছে। ছেলেরা বড় হয়েছে, কোকা ছাড়া পেয়ে এসে জুটেছে। বহেরু আর শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। কেবল এই ঘরে এসে ঘুমোয়। তার ভাবখানা—বামুনকর্তা তো সারারাত জেগেই থাকেন। চোখে চোখে রাখবেনখন।

তা ঠিক। ব্রজগোপাল জেগেই থাকেন আজকাল। বড় ঘুমের সময় আসছে। একটা আবছায়া নদী, তার পারাপার দেখা যায় না, ঘোর কুয়াশায় ঢাকা। সেই নদীর শব্দ পান। উঠে বসেন নিঝুম মাঝরাতে। মশারির বাইরে মশাদের বিপুল কীর্তন। শিরদাঁড়াটা সোজা করে বসেন। বীজমন্ত্রের

ধারা নেমে উঠে সারা শরীর আর সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে। নাসামূলে ইঞ্চিটাক গভীরে তেসরা তিল। সেখানে দয়াল দেশ। বুড়ো বামুনের মাভৈঃ মুখ।

ধ্যানের মধ্যেই ব্রজগোপাল হাসেন। হারিয়ে যান।

তবু হারিয়ে যাওয়াও যায় না। সে তো ধর্ম নয়।

॥ ছেচল্লিশ ॥

ম্যাক্সের পুরনো জুতোজোড়া ছিঁড়ে গেছে। পোঁটলা-পুঁটলিও ওর বেশি কিছু নেই। আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে যখন থাকত তখনও ওর কিছু শৌখিন জিনিস ছিল। ক্যামেরা, একটা টেপ রেকর্ডার, দামি কিছু সুট, ঘড়ি। তার বেশিরভাগই চুরি হয়ে গেছে। রাস্তায়-ঘাটে পড়ে থাকত ছেলেটা কিংবা ধর্মশালায়, শ্মশানে। সেই সময়েই গেছে। বাকি যা ছিল তা বিলিয়ে দিয়েছে কাঙালদের। এখন ওর যা-কিছু সম্পত্তি তা একটা শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগে এঁটে যায়।

সোমেনের বাড়িতে দু'রাত্তির কাটিয়ে সকালবেলায় ব্যাগটা গুছিয়ে নিল ম্যাক্স। সোমেন তাকিয়ে দেখছিল। একটা দাঁত মাজার ব্রাশ, একটা বাড়তি পায়জামা, একটা বাঁকুড়ার গামছা, একটা গেঞ্জি, একটা পাঞ্জাবি, দুটো ডায়েরি, আর তিনটে কি চারটে ডটপেন। বুকপকেটে পাশপোর্ট থাকে একটা প্লাস্টিকের ফোল্ডারে, তাতেই গোঁজা আছে কিছু টাকা, গায়ের পাঞ্জাবির পকেটে একটা রুমাল, কিছু খুচরো পয়সা, দেশলাই আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট, এক প্যাকেট সস্তা চুয়িংগাম। ব্যস। এত অল্পে একটা লোকের চলে কী করে! ম্যাক্স এত উঞ্ছবৃত্তি শিখল কোথায়?

মাকে বলল, মা, চললাম। বউদিকে বলল, বউদি, আসি। দাদার কাছ থেকেও বিদায় নিল। বাচ্চাদের কাছ থেকেও।

সোমেন ওকে খানিক দূরে এগিয়ে দেবে বলে সঙ্গে চলল। রাস্তায় নেমেই ম্যাক্স ছেঁড়া স্যামসন জুতোজোড়া পা থেকে খুলে সোমেনকে দেখিয়ে বলল, হোপলেস। বলে ফুটপাথে ছুড়ে ফেলে দিল।

সোমেন বলল, আমার বাড়তি একজোড়া আছে, পরে যাও।

ম্যাক্স মাথা নাড়ল, নো। এই ভাল, ভারতবর্ষের সঙ্গে এই শেষ ক'টা দিন আর্থ কন্ট্যাক্টে থাকি। ইয়োরস ইজ এ গুড কান্ট্রি।

সোমেন ভারতবর্ষ কী তা জানে না। শুনেছে, এ এক মহান দেশ, সে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার উত্তরাধিকারী। কিন্তু সোমেনের কোনও ধারণা নেই, সে কিছু বোধ করে না। তবু ম্যাক্স যখন ওই কথা বলল তখন তার বুকের মধ্যে এক ঘুমিয়ে-থাকা দেশপ্রেম যেন আধো জেগে উঠে একটু অস্পষ্ট কথা বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সোমেন বলল, কোথায় যাবে?

খালি পায়ে বেলা দশটার তড়পানো রোদে পিচের ওপর হাঁটতে হাঁটতে ম্যাক্স একটু অন্যমনস্কভাবে বলে, কলকাতায় যখন প্রথম এলাম সোমেন, তখন এখানে ভিখিরি আর অভাগাদের দেখে আমি পাগল হয়ে যাই। প্রথম কয়েক মাস আমি লেখাপড়া করতে পারিনি; আমি খুব অবাক হয়ে যাই দেখে যে, এইরকম জঘন্য যেখানকার সামাজিক অবস্থা, সেখানে যুবক-যুবতীরা প্রেম করে বেড়ায়, সিনেমা দেখে, সাজপোশাক করে। বড়লোকেরা নির্বিকারভাবে বিদেশি গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়। আর কেউ কেউ দেশের অবস্থায় দুঃখিত হয়ে চায়ের দোকানে বসে মাথা গরম করা তর্ক করে। ওই অবস্থায় আমি পাগলের মতো খুঁজে বেড়াতাম, একজনও ভারতীয় আছে কি না যে সক্রিয়ভাবে দেশের জন্য কিছু ভাবছে বা করছে। অনেক খুঁজে আমি একজনকে পেয়েছিলাম।

সত্যিকারের একজন ভারতীয় এবং দেশপ্রেমিক। মাদার টেরেসা। আমি আজকাল তোমাদের জন্মান্তরে বিশ্বাস করি সোমেন। আমার মনে হয় মাদার টেরেসাই হচ্ছেন মেরি ম্যাকডেলিন, আর আমরা যত হতভাগা আছি সবাই তাঁর খ্রিস্ট। আমি তক্ষুনি তাঁর দলে ভিড়ে যাই। সে সময়ে আমি তাঁর জন্য কিছু টাকা তুলেছিলাম, আর কিছু নিজের স্কলারশিপ থেকে জমিয়েছিলাম। মাদারের সঙ্গে কাজ করতে করতে আমার কিছুদিন পরে মনে হয়েছিল, সমস্যার উৎসমুখ খুলে রাখা আছে। তুমি যতই করো, অভাব বা দারিদ্র্য ঘুচবার নয়। তখন সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবতাম। আই জয়েনড নক্সালাইটস। টাকাগুলো আর মাদারের হাতে দেওয়া হয়নি। আজকের দিনটা তাই মাদার টেরেসার জন্য টাকা তুলব।

কীভাবে?

ম্যাক্স মৃদু হেসে বলে, ভিক্ষে করব। আমার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া খারাপও লাগে না। আমি যত বার ভিক্ষে করেছি সব সময়েই নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভারতবর্ষে ভিক্ষে করায় বাধা নেই। মস্ত সুবিধা। যখন তোমার কিছু থাকে না, ইউ মে অলওয়েজ বেগ। ভিক্ষের কোনও শেষ নেই এখানে। তা ছাড়া মাদার টেরেসাকে আমি ঠকাতে চাই না। তাঁকে দেখলেই মহত্ত্বের কথা মনে হয়, চোখে জল আসে। আর মানুষ নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে মহৎ কিছুর জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে।

ব্রিজের গোড়া পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিল সোমেন। ম্যাক্স বাসে উঠল না। খালি পায়ে ব্রিজের চড়াই ভাঙতে ভাঙতে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে বলল, আজ বড় ভাল দিন। না?

রেলিঙের ধার ঘেঁষে উঠে যাচ্ছিল ম্যাক্স। নীল আকাশের গায়ে ওর মাথা। সোনালি বড় বড় চুল হাওয়ায় উড়ছে। সোমেন সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটুক্ষণ। হঠাৎ আবেগে চোখে জল আসে, গলা রুদ্ধ হয়ে যায়। সে নিজে ভারতবর্ষের জন্য কিছু করেনি।

রিখিয়ার জন্য 'রেড'টা পকেটের মুখে রেখে দিল সোমেন। ফেলল না। স্ট্রাইকার ভুল জায়গায় লেগে ঘুরে চলে গেল অন্য দিকে।

রিখিয়া নিবিষ্ট মনোযোগে চেয়ে ছিল গুটিটার দিকে। সোমেন পারল না দেখে মুখ তুলে বলল, ইস্, পারলেন না! বলে একটু হাসল।

সোমেন মাথা নাড়ল দুঃখিতভাবে। স্ট্রাইকার এগিয়ে দিয়ে দেখল রিখিয়ার মুখখানা। ও কি এখনও বালিকা! লাল গুটিটার জন্য কী শিশুর মতো লোভ ওর! বয়সকালের আগুনগুলি এখনও জ্বলে ওঠেনি ওর ভিতরে! শৈশবের তুষ ঢেকে রেখেছে সেই তাপে। বড় ছেলেমানুষ। পকেটের মুখে আলগা হয়ে বসে আছে গুটিটা, রিখিয়ার দিকে চেয়ে হাসছে, টোকা লাগলেই পড়ে যাবে।

রিখিয়া স্ট্রাইকার বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য স্থির করে।

সোমেন গম্ভীরভাবে বলল, দেখো, ডবল ফাইন কোরো না।

রিখিয়া টোকা দেওয়ার মুহূর্তে থেমে মুখ তুলল। ভ্রূ কোঁচকাল। স্ট্রাইকারটা সরিয়ে দিয়ে বলল, খেলব না আপনার সঙ্গে।

কেন, কী হল?

ডবল ফাইনের কথা বললেন কেন? এখন ঠিক আমার ডবল ফাইন হবে।

এই বলে গম্ভীর রিখিয়া নিজের হাতের নখ দেখতে লাগল। মুখখানা কান্নার আগেকার গাম্ভীর্যে মাখা।

সোমেন খুব শান্ত গলায় বলে, হলেই বা কী! যখনই হোক রেডটা তুমি ঠিক ফেলতে পারবে।

রিখিয়া সতেজ গলায় বলে, আমার জন্য 'রেড' বসে থাকবে, না? আর-একটা চান্স পেলেই তো আপনি ফেলে দেবেন।

সোমেন মাথা নেড়ে বলল, কোনও দিন পারিনি। আমার রেড অ্যালার্জি আছে, নার্ভাস হয়ে পড়ি।

লম্বা সোফার ওপর একটা মেয়ে শুয়ে এতক্ষণ জুনিয়র স্টেটসম্যান, ফেমিনা, ফিল্ম ফেয়ার আর ইলাস্ট্রেটেড উইকলি একগাদা নিয়ে ডুবে ছিল। সে সোমেনকে ফিরেও দেখেনি এতক্ষণ। বোঝা যায়, ও বড় ঘরের মেয়ে। ফরসা আদুরি-আদুরি চেহারা, চোখে বিশাল ফ্রেমের চশমা, পরনে বেলবটম আর কামিজ, রিখিয়ারই বয়সি। ওর বন্ধুটন্ধু কেউ হবে। এবার সে মুখের সামনে থেকে পত্রিকাটা সরিয়ে বলল, অবজেকশনেবল। রেড অ্যালার্জি কথাটা ভীষণ অবজেকশনেবল।

অবাক হয়ে সোমেন বলে, কেন?

মেয়েটা তার গোলপানা মুখটায় বিরক্তি-ঘেন্নার ভাব ফুটিয়ে যেন বাতাসের গন্ধ শুঁকে বলল, ইট স্টিংকস উইথ ব্যাড পলিটিকস। আপনি রি-অ্যাকশনারি।

সোমেন অবাক হয়ে মেয়েটাকে দেখছিল। উত্তর দেবে কি দেবে না, তা ঠিক করতে পারছিল না। অতটুকু মেয়ে!

রিখিয়া তার ডান হাতটা ঝাড়ছিল, আঙুলগুলো টেনে ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল রেড ফেলার আগে। সোমেনের দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, মধুমিতা না ভীষণ লেফটিস্ট, জানেন! ও কিছুদিন আন্ডারগ্রাউন্ডেও ছিল। অ্যাকশনও করেছে।

সোমেন মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, ওঃ! আজকাল সবাই দেখছি পলিটিক্স করলেই আন্ডারগ্রাউন্ডে যায়। আন্ডারগ্রাউন্ডে কী আছে?

মেয়েটা হাতের ম্যাগাজিনটা সপাট করে টেবিলে রেখে স্প্রিংয়ের গদিতে উঠে বসে। শরীরটা উত্তেজনায় দোল খায়! বুকের ওপর থেকে বেণিটা পিঠের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলে, মোটেই আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম না, অপরাজিতা। সবাই জানে সে সময়ে আমি বাপির সঙ্গে জয়পুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইটস এ স্টিংকিং লাই।

সোমেন বুঝল, মেয়েটা স্টিংক কথাটা ব্যবহার করতে ভালবাসে। ও বোধহয় ওর চার দিকে একটা পচা পৃথিবীর দুর্গন্ধ পায় সব সময়ে। এতক্ষণ মেয়েটার গোলপানা মুখ আর আদুরি চেহারার মধ্যে তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু এখন হঠাৎ তার ফরসা মুখে রাগের একটা আগুনে রং যখন ফুটে উঠে, দুটো ভ্রূ যখন দুটি নিক্ষিপ্ত তিরের মতো মুখোমুখি পরস্পরকে চুম্বন করে আছে, কপালের মাঝখানে যখন রাজটিকার মতো একটি শিরা জেগে উঠেছে তখনই তার অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যটা ফুটে উঠল। মেয়েটা যে ঠিক ওর চেহারার মতোই নয়, তা চেহারা পালটে ফেলে বুঝতে দিল। সোমেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক পলক বেশি চেয়ে রইল সে।

তখন রিখিয়া হঠাৎ গম্ভীর মুখে স্ট্রাইকারটা বোর্ডে রেখে বলে ওঠে, 'রেড' ফেলছি কিন্তু।

সোমেন চোখ সরিয়ে এনে বলে, ওঃ হ্যাঁ!

রিখিয়া গম্ভীর মুখেই বলে, ডবল ফাইন হলে কী হবে?

সোমেন বলে, দুটো সাদা গুটি উঠবে, আর রেড।

ফের স্ট্রাইকার থেকে হাত সরিয়ে রিখিয়া বলে, মোটেই না।

তবে?

একটা সাদা গুটি, আর রেড।

সোমেন মাথা নাড়ে, উঁহু, দুটো সাদা আর রেড।

রিখিয়া কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ইস্‌, বললেই হল! এই মধুমিতা, তুই বল তো! রেড আর স্ট্রাইকার পড়লে....

মধুমিতা আবার শুয়ে পড়েছে, একটা হাঁটুর ওপর অন্য পা নির্লজ্জভাবে তোলা, মাথার নীচে একটা হাত, অন্য হাতে ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনের আড়াল থেকেই বলল, জানি না। ক্যারম নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

ঘরে আর কেউ নেই। রিখিয়া আর কার কাছে নালিশ করবে! নীচের ঠোঁট দাঁতে চেপে সে

অসহায়ভাবে সোমেনের দিকেই তাকাল। সোমেন মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা আচ্ছা। একটা সাদা, আর রেড।

রিখিয়া হাসল না, খুশিও হল না। থমথমে মুখ। স্ট্রাইকারটা ফের সরিয়ে দিয়ে বলে, আগে কেন বললেন না!

বলেই হঠাৎ মধুমিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, তুই বুঝি অ্যাকশন করিসনি! স্কুলের ক্লাসরুমে মাও সে-তুঙের টেনসিলের ছাপ দিয়েছিল কে?

মধুমিতা এক বার অবহেলাভরে তাকিয়ে বলে, তাতে কী! ওটা বুঝি অ্যাকশন! তা হলে ক্যারম খেলাটাও অ্যাকশন। ফুঃ!

রিখিয়া চুপ করে থাকে একটুক্ষণ। সোমেন অপেক্ষা করে। রিখিয়া কী ভেবে হঠাৎ নিচু হয়ে স্ট্রাইকার বসিয়ে পাকা ফলের মতো পকেটের মুখে ঝুলে থাকা রেডকে ফেলার জন্য টোকা দিল। সোমেন অবাক হয়ে দেখল, রিখিয়া ঠিক ডবল ফাইন করেছে। পটপট করে রেড আর স্ট্রাইকার চলে গেল পকেটে।

দুঃখিত সোমেন রিখিয়ার দিকে তাকাল না। রেড আর সাদা গুটি তুলে চমৎকার একটা চাপ সাজিয়ে দিল রিখিয়াকে। স্ট্রাইকার এগিয়ে দেওয়ার সময়ে সন্তর্পণে চেয়ে দেখল, রিখিয়া হাতের পিঠে চোখের জল মুছছে।

এই, কী হল?

আমি খেলব না। রিখিয়া মাথা নেড়ে বলে।

কেন?

রিখিয়া রাগ আর ফোঁপানির গলায় বলে, আপনি ডবল ফাইনের কথা বললেন কেন?

বলে রিখিয়া স্ট্রাইকার ছুড়ে ফেলে দিল।

সোমেন মাথা নাড়ল আপনমনে। খেলা নয়, এ তো খেলা নয়। হেরে গেছ? কে বলে ও-কথা? বিজয়িনী, তুমি বিজয়িনী। এখনও তোমার বয়স কম। ছোট্ট খুকি, নইলে এক্ষুনি আমি কী যে করতাম!

ছোট্ট সোফায় গিয়ে বসল রিখিয়া। ক্যারম খেলার আগে যে অ্যালবাম থেকে সোমেনকে ছবি দেখিয়েছিল সেইটা আবার খুলে বসল গম্ভীরভাবে।

পকেট থেকে গুটিগুলো তুলে টুকটাক করে সাজাচ্ছিল সোমেন। আড়চোখে রিখিয়া এক বার চেয়ে দেখল। পৃথিবী থেকে মেয়েমানুষ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, দুঃখ করে বলেছিল ম্যাক্স। কই? এই তো শতকরা একশো ভাগ একটা মেয়ে। ভীষণ মেয়ে। মেয়েমানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। ভাবতে ভাবতে সোমেন একটু হাসে।

রিখিয়া ছবি দেখছে। সোমেনের ছবি। একটা অন্ধ কুকুরের পিছনে চোখ বুজে হাঁটছে সোমেন, যুধিষ্ঠিরের মতো। কিংবা রাগী মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবিগুলো দেখতে দেখতে রিখিয়া একটু হাসল। মুখ তুলে বলল, বোকা।

ছবিগুলো একটু আবছা হয়ে গেছে। ঠিকমতো ফোকাস করার সময় পায়নি। এর আগের দিন যখন এসেছিল তখনই আবার পটাপট কয়েকটা ছবি তুলে রেখেছিল। সেদিনই ক্যারমে উনত্রিশ-কুড়ি পয়েন্টে গেম খেয়েছিল সোমেন। প্রথমবার হারতে হয়।

ম্যাগাজিনটা ফেলে উঠে বসল মধুমিতা। চশমাটা বেঁকে গিয়েছিল, সোজা করে বসাল নাকে। আধুনিক ফ্যাশনের চশমা, চোখে এঁটে থাকে না, একটু নেমে আসে নাকের ওপর। শেয়াল-পণ্ডিতের মতো দেখায়। ঢিলা কামিজের তলায় বিদ্রোহী দুটি কিশোরী স্তন, কামিজটা টান হওয়ার পর ফুটে উঠল। কপালের চুল সরিয়ে মধুমিতা গম্ভীর মুখে একটু চাইল সোমেনের দিকে। দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য। একটা হাই তুলে বলল, অপরাজিতা, ম্যাগাজিনগুলো আমি নিয়ে যাচ্ছি।

যা।

ক'টা বাজল, সাতটা? আটটায় আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কবজির ঘড়িটা কানে তুলে একটু শব্দ শুনল মধুমিতা। আবার তাকাল সোমেনের দিকে। এবার চোখটা অন্য রকম। একটু যেন মেপে দেখল সোমেনকে। চোখে কোনও মায়া-মোহ বা রহস্য নেই। কেমন যেন পুরুষমানুষের মতো তাকায় মেয়েটা। বেশ লম্বা, অথচ নরম-সরম চেহারা। মুখে তেলতেলে একরকমের পেইন্ট, কপালে টিপ নেই, কানে দুল বা গলায় হার নেই, দু'হাতে শুধু দু'গাছা গালার চুড়ি. ডান হাতে ঘড়িটা। সব মিলিয়ে মেয়েটা নিজের অস্তিত্বকে চারধারে ছড়িয়ে দিয়েছে। রিখিয়াকে ওর পাশে অনেক লাজুক, ম্লান আর ছোট্ট লাগে।

মেয়েটা আর-একটা হাই বাঁ হাতের তিনটে আঙুলে চাপা দিল। চমৎকার আঙুল। নখগুলোর পালিশ ঝিকিয়ে উঠল। হাইটা চেপে দিয়ে বলল, আপনি কোথায় থাকেন?

সোমেন খানিকটা অবহেলার ভাব করে বলে, ঢাকুরিয়া।

মধুমিতা বলল, আমি যোধপুরে, আপনাকে একটা লিফট দিতে পারি। যাবেন?

সোমেন জবাব খুঁজবার জন্য রিখিয়ার দিকে তাকাল। সেখানে জবাব নেই। রিখিয়া ভ্রূ কুঁচকে অ্যালবামের দিকে চেয়ে আছে, সেখানে সোমেনের আবছা ছবি।

মধুমিতা উঠে বলল, আপনার রেড অ্যালার্জিটা সারানো দরকার।

সোমেন হেসে বলল, আমার অ্যালার্জিটা পলিটিকাল নয়।

নয়? বলে একটু অবাক হওয়ার ভাব করল মধুমিতা। তারপরই হাসল। এই প্রথম ওর হাসি দেখল সোমেন। কী পরিষ্কার দাঁত, কেমন ভরপুর হাসি। তবু হাসিটাও ঠিক মেয়েমানুষের মতো নয়। পুরুষ-ঘেঁষা। বলল, আপনার কালার কী?

সোমেন চোখটা সরিয়ে নিয়ে তার নিজস্ব ভুবনজয়ী হাসিটা হেসে বলল, হোয়াইট, এ কালার অফ সারেন্ডার।

॥ সাতচল্লিশ ॥

সারেন্ডার! শুনে চোখ দু'খানা ফের গোল করে এক বার রিখিয়ার দিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল আবার সোমেনের মুখে। যেন কিছু একটা টের পেল এই মাত্র, সোমেন আর রিখিয়ার মধ্যবর্তী শূন্যতায়।

বোগেনভেলিয়ার লালচে পাপড়িগুলি অবিরল ঝরে পড়ছে নীচের চাতালে, একটা ইউক্যালিপটাসের চারাগাছ উঁকি মারছে জানালা দিয়ে, সারা গায়ের বাকল খসছে। রিখিয়াদের ছোট্ট বাগানের এই সব দৃশ্য একটু দেখল সোমেন।

মধুমিতা ম্যাগাজিনের একটা গোছা হাতে তুলে নিয়ে বলল, আপনি খুব সহজেই সারেন্ডার করেন, না?

সোমেন মুখ ফেরাল। রিখিয়া সেই রকমভাবেই মাথা নত করে বসে। কোলে খোলা অ্যালবাম। সোমেন মুখ টিপে হেসে বলল, করি।

মধুমিতা অখুশি হল বোধহয় কথাটা শুনে। বলল, মোটেই ভাল নয় ও-রকম। চলুন।

সোমেন রিখিয়ার নতমুখের দিকে চেয়ে একটু হালকা গলায় বলে, হবে নাকি আর-এক গেম?

রিখিয়া মুখ না-তুলেই মাথা নাড়ল। খেলবে না।

একটু ইতস্তত করে সোমেন। এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার জন্য সে আসেনি। কিন্তু রিখিয়া থাকতে না-বললে থাকে কী করে?

মধুমিতা ঘাড়টা এক বার তুলেই ছেড়ে দিয়ে বলল, ক্যারম আবার একটা খেলা! খুটখাট গুটি ফেলা দু'চক্ষে দেখতে পারি না। খেলা হল বাস্কেট।

একটা চাপা ঝগড়া পাকিয়ে উঠছে, সোমেন বাতাসে বারুদের গন্ধ পায়।

রিখিয়া মুখ তুলল। চোখে তীব্র চাউনি। বলল, আহা, ক্যারম খেলা নয়, না! তোর তো সব ছেলেদের খেলা ভাল লাগে।

লাগেই তো! অ্যাটাক, কাউন্টার অ্যাটাক আর অ্যাগ্রেসিভনেস না থাকলে আবার খেলা কী! আই লাইক ম্যাসকুলিন গেমস।

রিখিয়া রেগে গিয়েছিল, কিন্তু তেমন স্মার্ট কথাবার্তা বোধহয় ওর আসে না, রিফ্লেক্স কিছু কম, কেবল বলল, হ্যাঁ, তোকে বলেছে!

মধুমিতা তার পাম্প-শু-র মতো দেখতে জুতোর একপাটি খুলে বোধহয় একটা কাঁকর ঝেড়ে ফেলল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সোমেনবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি। ফর কম্প্যানি।

এটা জিজ্ঞাসা নয়, সিদ্ধান্ত। সোমেন অসহায়ভাবে এক বার রিখিয়ার দিকে তাকাল। ও কি এক বারও মুখ ফুটে সোমেনকে আর-একটু থাকতে বলবে না! না বললে, সোমেন তেমন নির্লজ্জ নয় যে থাকবে।

মধুমিতা তার গোল গোল চশমার ভিতর দিয়ে গোল চোখ করে চেয়ে আছে। মুখখানাও গোল। সোমেন টেনশন টের পেল। তাকে নিয়ে একটু দড়ি টানাটানি চলছে। দড়িটা টেনেই নিয়েছে মধুমিতা। সোমেন ঘাড় নেড়ে বলে, চলুন।

বলে রিখিয়ার দিকে একপলক চাইল সোমেন, চাপা গলায় বলল, আজ তা হলে যাই রিখিয়া।

রিখিয়া উত্তর দিল না।

মধুমিতা বলল, অপরাজিতা ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। একটুতেই ওর গাল ভারী হয়। ইস্কুলে সবাই ওকে তাই খ্যাপাই।

বলে হাসল মধুমিতা। চোখ ঠারল সোমেনকে। অর্থাৎ ইচ্ছে করে রিখিয়াকে রাগাতে চায়। চোখ ঠেরে সোমেনের সঙ্গে একটা সন্ধি করে নিল।

সোমেন একটু হাসল বটে, কিন্তু এ খেলায় সে নেই। ওই নতমুখী, একটু আনস্মার্ট মেয়েটিকে কেউ খ্যাপায় এটা সে চায় না। ইস্কুলে ওর বন্ধুরা ওকে খ্যাপায় জেনে মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। কেন, ওরা রিখিয়াকে খ্যাপাবে কেন?

মধুমিতা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলল, একটুতেই কেঁদে ফেলে অপরাজিতা। গতবার ডিবেটে ওর উলটো দিকের ডিবেটারদের মধ্যে কে যেন বলেছিল অপরাজিতা একটা ভুল কোটেশন দিয়েছে। সেটাকে ও পারসোনাল অ্যাটাক মনে করে...বলে মধুমিতা কোমরে হাত দিয়ে মুখ ছাদের দিকে তুলে ঠিক পুরুষ ছেলের মতো হাসল, তারপর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, কেঁদে ভাসিয়েছিল।

বিপদের গন্ধ পাচ্ছিল সোমেন। মধুমিতা নিশ্চয়ই খুব শক্ত প্রতিপক্ষ, বোধহয় ভাল ডিবেট করে, রিখিয়াকে ইচ্ছে করলেই ও নাস্তানাবুদ করতে পারে। রিখিয়া পলকা মেয়ে। যদি রেগে যায় তা হলে হয়তো এখন এমন কিছু বলে ফেলবে যা মেয়েমানুষি রাগে ভরা। হয়তো নিতান্তই ছেলেমানুষি কিছু বলে ফেলতে পারে। তা হলে মধুমিতা ওকে আরও অপমান করবে। তাই মনে মনে সোমেন টেলিপ্যাথি পাঠাতে লাগল রিখিয়াকে—রেগো না রিখিয়া, মাথা স্থির রাখো। দোহাই প্লিজ, আমার সামনে যেন ও তোমাকে অপমান না করতে পারে। ওকে সুযোগ দিয়ো না।

আশ্চর্য এই রিখিয়াকে সেই তরঙ্গ স্পর্শ করল বোধহয়। টেলিপ্যাথির বার্তা পৌঁছল নাকি!

রিখিয়া মধুমিতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তার অভিমানী মুখখানা তুলে সোমেনকে বলল, মাকে দেখে গেলেন না তো? মা কত আপনার কথা বলে!

এই তো! এ-রকমই কিছু শুনতে চাইছিল সোমেন। মধুমিতার কাছ থেকে তাকে কেড়ে রেখে

দিক রিখিয়া। মধুমিতার হাতের দড়ি ঢিলে হয়ে গেল, রিখিয়া টানছে।

সোমেন গম্ভীর মুখে বলল, ওঃ তাই তো। একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

বলে একটু অসহায় মুখ করে তাকাল মধুমিতার দিকে।

মধুমিতা তার কবজির ঘড়িটা দেখল, মুখটায় সামান্য বিরক্তির ভাব করে বলল, আই ক্যান গিভ ইউ টেন মিনিটস।

রিখিয়া হঠাৎ ঝামরে উঠে বলে, তোর তাড়া থাকলে তুই যা না। ও পরে যাবে।

ও! সোমেনের হঠাৎ আন্তরিকভাবে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, 'ও' সর্বনামটি বোধহয় সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। বিদ্যুৎবাহী।

মধুমিতা আর-এক বার কাঁধ ঝাঁকাল। সোফায় আবার ধপ করে বসে পড়ে বলল, না, আমি সোমেনবাবুর জন্য ওয়েট করব। বলে সোমেনের দিকে চেয়ে আর-এক বার চোখ ঠারল, মধুমিতা চাপা হাসি হেসে বলল, ডোন্ট মেক মি ওয়েট ফর এভার, দেখা করে আসুন। একসঙ্গে যাব।

শৈলীমাসির ঘরের পরদাটা পার হয়েই রিখিয়া চাপা রাগের গলায় বলল, ভীষণ পুরুষ-চাটা মেয়ে। একদম পাত্তা দেবেন না।

সোমেনের হৃদয়ের স্তব্ধতার ভিতরে যেন এইমাত্র বোঁটা খসে একটা ফুল এসে পড়ল। সোমেন তার হৃদয়ের মধ্যেই কুড়িয়ে নিল সেই ফুল, সুঘ্রাণে ভরে গেল ভিতরটা।

বলল, পাত্তা! না, না, তাই কি হয়........

আসলে কথা হারিয়ে যাচ্ছিল সোমেনের। কত মেয়ের সঙ্গে কত অনায়াসে মিশেছে সোমেন, তবু এই একটা মেয়ের কাছে এখন কথা হারিয়ে যাচ্ছিল।

শৈলীমাসি বই রেখে আধশোয়া হলেন। পিঠের নীচে বালিশের ঠেকনো দিয়ে দিল রিখিয়া। তারপর খাটের মাথার দিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু করুণ চোখে চেয়ে রইল সোমেনের দিকে। ভারী অন্য রকম লাগছিল ওকে। বড়লোকের মেয়ে দামি ক্যামেরায় ছবি তোলে, গাড়ি চালায়, কত কী করে, তবু যেন ও সে নয়। যেন-বা দুর্বল, সহানুভূতি পেতে ও ভালবাসে, কেউ ওকে দেখে 'আহা' বললে বুঝি খুশি হয়।

শৈলীমাসি উঠে বসে বললেন, ও ঘরে ক্যারম খেলা হচ্ছিল। খবর পেয়েছি। তখন থেকে অপেক্ষা করে আছি ননীর ছেলে কখন এ ঘরে আসবে, দুটো কথা বলে বাঁচব। এতক্ষণে এলে?

সোমেনের বড় লজ্জা করছিল, আর-একটু হলেই সে চলে যাচ্ছিল মধুমিতার সঙ্গে। শৈলীমাসির অপেক্ষা শেষ হত না।

চওড়া জানালাগুলো আজ খোলা রয়েছে। এয়ারকুলার বন্ধ। শৈলীমাসি বাইরের আবছা অন্ধকারে একটা গুলঞ্চ গাছের ডালপালার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, মানুষের সঙ্গে যে কত কথা বলতে ইচ্ছে করে! যেতে তো পারি না, তাই যে দু'-চারজন আসে তাদের সঙ্গে সাধ মিটিয়ে বলে নিই, তুমি কিন্তু বড্ড মুখচোরা ছেলে, একটুও কথা বলো না। তোমাদের কত কথা জানতে ইচ্ছে করে।

সোমেন তার স্বভাবসিদ্ধ সুন্দর হাসিটা হাসে। উত্তর দেয় না। শৈলীমাসির মাথার পিছনে রিখিয়া দাঁড়িয়া আছে। দেখছে।

শৈলীমাসি মুখ না ফিরিয়েই বোধহয় টের পেলেন যে রিখিয়া তাঁর মাথার পিছনে দাঁড়িয়ে। তাই মাথাটা পিছনে একটু হেলিয়ে হাতটা এক বার পিছনপানে বাড়িয়ে বললেন, এই মেয়েটা আমার, এও কথা বলার সময় পায় না আজকাল।

রিখিয়া বলল, উঃ, রোজ কত কথা বলি।

শৈলীমাসি স্নিগ্ধ হেসে মুখ ফিরিয়ে মেয়েকে দেখলেন। সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন, আগে ওর যত কথা ছিল আমার সঙ্গে। কোনও কথা গোপন করত না। সব বলত, বন্ধুবান্ধবদের কথা,

স্কুলের কথা, পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের কথাও। সব বলে দিত।

এখন বুঝি বলি না। রিখিয়া চাপা গলায় বলে।

কম বলিস। বলে শৈলীমাসি গেলাস তুলে একঢোক জল খেলেন। সোমেনকে বললেন, তোমার সম্বন্ধে কী বলেছে জানো?

রিখিয়া হঠাৎ বিড়বিড়িয়ে উঠে বলে, উঃ মাঃ বোলো না, বোলো না। তুমি ভীষণ খারাপ।

বলেই পিছন থেকে হাত চাপা দিল মায়ের মুখে। শৈলীমাসি হাতটা আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে স্মিতমুখে বলেন, বলব না। সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি বাবা, শুনতে চেয়ো না। ও লজ্জা পায়।

সোমেন তটস্থ হয়ে বলে, নিন্দে নয় তো!

রিখিয়া বলে, নিন্দে তো নিন্দে।

না, নিন্দে নয়। শৈলীমাসি বলেন, ওকে খেতে দিয়েছিস রিখি?

না।

দে।

সোমেন আপত্তি করে বলে, না, কিছু খাব না। রোজই খেতে হবে নাকি!

একটু খাও। বলেন শৈলীমাসি। বড় সুন্দর শান্তস্বরে বলেন। স্বরটা মিনতিতে ভরা। আবার বলেন, তুমি খাওয়ার ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে, না?

সোমেন হেসে বলে, একটু।

তাই শরীরটা সারেনি। খাওয়ায় খুঁতখুঁতে হলে শরীর ভাল হয় না। আমার ছেলেটারও ও-রকম ছিল। কালো মাছ খাবে না, আঁশ ছাড়া মাছ খাবে না, সবজি খাবে না, খাসির মাংস খাবে না, নেমন্তন্ন বাড়িতে গেলে ভারী মুশকিল ছিল ওকে নিয়ে। রোগা, রাগী আর অহংকারী ছিল খুব। তা এখন শুনি বিদেশে সব খায়।

বলতে বলতে একটা কান্নার মেঘ করে এল বুঝি ভিতরে। সেটা চাপা দেওয়ার জন্যই বললেন, বগুড়া স্টেশনের কাছে মুটে-মজুররা কদমগাছের তলায় বসে ছাতু মেখে খেত। একটা প্রকাণ্ড ছাতুর দলা পেতলের কানা-উঁচু থালায়, শালপাতায় একটু চাটনি, ঘটিভর জল। কী তৃপ্তি করে যে খেত কাঁচালঙ্কার কামড় দিয়ে। সেই সস্তাগণ্ডার দিনেও ওই সব খেত, আমরা দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখতুম। সেই খাওয়া দেখার মধ্যেই একটা ভীষণ সুখ ছিল। এক বার একটা সাঁওতালকে দেখেছিলুম জুতোর বাক্সের ঢাকনায় একটা মাঝারি বড় আলুসেদ্ধ তেল ছাড়া কেবল নুন আর মরিচ দিয়ে খুব যত্ন করে মাখছে, পাশে জুতোর বাক্সে একবাক্স ভাত। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম সেই সাঁওতালটা ওই অনেক ভাত একটুখানি আলুসেদ্ধর টাকনা দিয়ে টাউ টাউ করে খেয়ে নিল। ঠান্ডা জল খেল পুকুর থেকে। ব্যস তৃপ্তি। ফের কাজে লেগে গেল। কী স্বাস্থ্য! আমরা গরিবের দুঃখের কথা ভেবে কত চেঁচামেচি করি বাবা, কিন্তু সে-সব বুঝি মনগড়া কথা! ও-খাওয়া দেখলেই বোঝা যায় কী সতেজ সুখী মানুষ সব। নিজেদের দুঃখের ধারণা ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে দুঃখী ভাবলে কী হবে, আমাদের চেয়ে ঢের সুখী ওরা। বলে আবার একটু চুপ করে থাকেন শৈলীমাসি, ফের বলেন, আমি চাকর-দারোয়ানদের মাঝে মাঝে সামনে বসে খেতে বলি, দেখব। তা তারা সব আমার সামনে লজ্জা পায়, ভাল করে খায় না। খুব ইচ্ছে করে রাস্তায়-ঘাটে, স্টেশনে ঘুরে ঘুরে ওই সব মুটে-মজুরদের খাওয়া দেখি। কত তুচ্ছ জিনিস কী যত্ন করে খায়। ফেলে না, ছড়ায় না, শেষ দানাটি পর্যন্ত খুঁটে খায়। কিন্তু যেতে তো পারি না। জেলখানায় আটকে আছি।

সোমেনের কিছু করুণার উদ্রেক হয়েছিল। বলল, কী অসুখ শৈলীমাসি?

সে বলার নয়। মেয়েমানুষ হচ্ছে রোগের আধার। যখন বিয়ের সময় হবে তখন খুব দেখে বুঝে বিয়ে কোরো। বাঙালি মেয়েরা বড্ড রোগা রোগা। বলে নিজের ঠাট্টায় একটু হাসলেন। বললেন,

অসুখ কখন হয় জানো। যখন মনের মধ্যে অসুখের ভাবটা আসে তখনই শরীরে অসুখ ভর করে। মনটা পরিষ্কার থাকলে, অসুখের ভাবনা না ভাবলে বড় একটা অসুখ হয় না। আমি সারাদিন রোগের ভাবনা ভেবে রোগ ডেকে এনেছি। এই শরীরটুকুর ওপর পাঁচবার ছুরি কাঁচি চালিয়েছে। কতক রোগ ধরা পড়েছে, কতক পড়েনি। আমি ভুগি সেই সব আনট্রেইসেবল ডিজিজে। রোগবন্দি। মেয়েমানুষ খাড়া না-থাকলে সংসার ভেসে যায়। আমারটাও গেছে।

সোমেন কথা খুঁজে পায় না। উৎসারিত ওই বেদনা তাকে স্পর্শ করে না ঠিকই, কিন্তু অপ্রতিভ করে দেয়। হয়তো দু'-চারটে সান্ত্বনার কথা আছে যা খুঁজে পায় না সে। নিস্তব্ধ ঘরে সে যেন অস্পষ্ট টের পায় শৈলীমাসির অস্তিত্ব থেকে বায়ুবাহী বিষণ্ণতার জীবাণুরা তার দিকে এগিয়ে আসছে। ছেঁকে ধরেছে তাকে। একটা শ্বাসরোধকারী প্রতিক্রিয়া হতে থাকে তার মধ্যে। এইরকম অবিরল বিছানায় পড়ে থাকা কী ভয়ংকর, কী মারাত্মক, যখন বাইরে অসীম আকাশের প্রসার, শহর-বন্দর-মাঠ-ঘাটে বিস্তৃত জীবন, তখন এ কেমন কয়েদ? শৈলীমাসির অস্তিত্ব যেন তাকে অস্থির করে তোলে।

উনি বললেন, ছেলেটার রাশ ধরতে পারলাম না, রোগা মাকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। রোগের বাড়িতে আর ফিরে আসবে না। আর মেয়েটা এ লোনলি চাইল্ড, ছেলেবেলা থেকে সঙ্গীসাথী নেই, মা রোগে পড়ে থাকে, বাবা ব্যস্ত। বড় একা। আপনমনে বড় হয়েছে মেয়েটা। কাঁদত না, কাঁদলে কে থামাবে। হাসতও না তেমন, হাসবার মতো কিছু তো দেখত না। তাই মেলাঙ্কলিক, অভিমানী। একটু বড় হয়ে যখন স্কুলে যায় তখনও ওর একাচোরা স্বভাব। তাই কারও সঙ্গে সহজে মিশতে পারত না। আজও ওর তেমন কোনও বন্ধু নেই। তাই আপনমনে ক্যামেরায় ছবি তোলে, গান গায়, গাড়ি চালানো শেখে, কিন্তু লোনলি, অসম্ভব একা। আমি তো মা, তাই বুঝি!

সোমেন মাথা নাড়ল। হঠাৎ বলল, আপনার ইংরিজি উচ্চারণগুলি কী সুন্দর। কোথায় শিখলেন?

মুখের বিষণ্ণতা, লেবুর রস ফেললে যেমন গরম দুধ ছানা কেটে যায়, তেমনি কেটে গেল। হাসলেন, বললেন, বগুড়ায় ইংরিজি মিডিয়ামে বাড়িতে পড়তাম। বাড়িতে মেমসাহেব রেখে শিখিয়েছিলেন বাবা। তার কাছে শিখেছি। এখনকার সব ইংলিশ মিডিয়ামে যেমন নামকোবাস্তে ইংরিজি শেখায় তখন তেমন ছিল না। খাঁটি সাহেব মেমসাহেবরা খাঁটি ইংরিজি শেখাত।

শৈলীমাসির এই তৃপ্তিটুকু থাকতে থাকতেই সোমেন বেরিয়ে আসতে পারল সেদিন। রিখিয়া এসে ডাকল। পাশের আর-একটা ঘরে রিখিয়ার মুখোমুখি বসে অনেক খেল সোমেন। রিখিয়া একটু গম্ভীর। সোমেনও তেমন কথা বলতে পারল না। যখন উঠল তখন মনে এক হর্ষ ও বিষাদ।

পরদার ওপাশে মধুমিতা বসে আছে এখনও। ও-ঘরে পা দেওয়ার আগে রিখিয়া বলল, আবার আসবেন।

ঘরে পা দিতেই হাতের পত্রিকাটা ফেলে উঠে দাঁড়াল মূর্তিমতী উইমেনস লিব। মধুমিতা ঘড়ি দেখে বলল, দ্যাট ওয়াজ ওয়েটিং ফর গোডো।

॥ আটচল্লিশ ॥

বাইরে মেঘধ্বনি। পরদাটা ওড়ে হঠাৎ হাওয়ায়। উড়ে আসে খড়কুটো, ধুলো, গাছের পাতা, বোগেনভেলিয়ার পাপড়ি, বাতাসে ঠান্ডা জলগন্ধ। বৃষ্টির প্রথম একটি-দুটি ফোঁটা গাছের পাতায় পড়ে। একটা আহত নীল বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে মাটিতে, তীব্র গর্জনে কেঁপে ওঠে ঘরের মেঝে।

নীল আলোটা ঝলসাতেই কানে আঙুল দিয়েছিল রিখিয়া। চোখে ভয়।

মধুমিতার ভয় নেই। ব্যাগ খুলে সে মাথা ধরার বড়ির স্ট্রিপ থেকে একটা বড়ি ছিঁড়ে নিল।

শুকনো বড়িটা মুখে ফেলে গিলে ফেলল। জল ছাড়াই। ভ্রূটা একটু কোঁচকানো।

বৃষ্টি এল। রিখিয়া কান থেকে হাত নামিয়ে বলে। মুখে একটু হাসি। সোমেনের দিকেই চেয়ে ছিল, বলল, যাওয়া হবে না।

মধুমিতার নিশ্চয়ই মাথা ধরার রোগ আছে। ডান হাতের বুড়ো আর মাঝের আঙুলে কপালের দু'ধার টিপে ধরে থেকে বলল, বৃষ্টি তো কী?

কেমন ঝোড়ো বাতাস! রিখিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলে।

জানালা দরজা তাড়াতাড়ি বন্ধ করছে চাকরেরা। দুর্যোগের আভাস পেয়ে কোথা থেকে কুকুরটা এক বার ডাকল, সঙ্গে শেকলের ঠুন ঠুন শব্দ। আজ কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছে। খর বৃষ্টির শব্দ উঠল চারধারে, ভাষাহীন কোলাহল। হামাল বাতাস বন্ধ কপাট নাড়া দিচ্ছে মুহুর্মুহু। আকাশের নীল বাঘেরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে মাটিতে।

মধুমিতা ঠোঁটটা একটু রাগের ভঙ্গিতে টিপে বলল, ব্রিজের নীচে ঠিক জল জমে যাবে। গাড়ি আটকে গেলে মুশকিল।

বলে সোমেনের দিকে তাকাল, কোমরে হাত রেখে একটু তেরছা চেয়ে বলল, আপনার জন্যই তো। যা দেরি করালেন!

সোমেন সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, তোমার খুব মাথা ধরে?

মধুমিতা একটু অসহায়ের মতো বলল, খুব। যখন শুরু হয় তখন পাগল পাগল হয়ে যাই ব্যথায়। মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খেতে হয়।

তাই দেখছি। জল ছাড়া ট্যাবলেট খাও কী করে?

সব সময়ে খাই তো, অভ্যেস হয়ে গেছে। রাস্তায়-ঘাটে হরঘড়ি জল তো পাওয়া যায় না।

এত ট্যাবলেট খাওয়া ভাল নয়।

মধুমিতা ধৈর্যহীন গলায় বলে, সবাই ও-কথা বলে। কিন্তু ট্যাবলেট ছাড়া ব্যথা কী করে সারে তা কেউ বলতে পারে না। ডাক্তাররাও বলে, ট্যাবলেট খেয়ো না।

বলে যেন এক অসহায় তীব্র রাগে সোমেনের দিকে চেয়ে রইল। দাঁতে ঠোঁট টিপে বলল, কতবার মাথা এক্সরে করেছে ডাক্তাররা, রোগ পরীক্ষা করেছে। রোগ ধরতে পারে না। সামনের মাসে ভেলোরে যাচ্ছি।

কেন?

তেমনি এক অসহায় রাগে, এবং বুঝি একটু অভিমানে বলল, ডাক্তাররা সন্দেহ করছে, ব্রেনে টিউমার, অপারেশন হবে। ভেলোরে ছাড়া ও-সব অপারেশন হয় না।

বলে একটু হাসল। বড় করুণ হাসিটি। ওই গোল চশমা, ছটফটে ভাব, স্মার্ট পোশাক সব ভেদ করে একটা ব্যথা-বেদনা ফুটে উঠল। বলল, শক্ত অপারেশন। বাঁচে না। আজকাল মা আর বাপি আমাকে খুব আদর করে জানেন! বাঁচব না তো!

সোমেনের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এক পরদা মেঘ ঢেকে দিল মনটাকে। বলল, কে বলল বাঁচবে না? এটা বিজ্ঞানের যুগ, অত সহজে লোকে মরে না।

সান্ত্বনাটুকুর কোনও দরকার মধুমিতার নেই, এ ওর দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এ বয়সে মৃত্যুর ভয় বড় একটা থাকে না, 'মরে যাব' এ-কথা ভাবতে একরকমের রোমহর্ষময় রহস্য জেগে ওঠে। সকলের করুণা, চোখের জল, শোক—এই সব পেতে ইচ্ছে করে, চার দিকের ওপর ঘনিয়ে ওঠে অভিমান। সোমেন জানে।

এখন কে বেশি সেন্টিমেন্টাল শুনি। বলে রিখিয়া সোমেনের দিকে তাকায়, সব বোগাস, জানেন। আমারও কত মাথা ধরে।

মধুমিতা কারও কথারই উত্তর দিল না। গোল চশমার ভিতর দিয়ে চেয়ে রইল ক্যারমবোর্ডে

সাজানো ঘুটিগুলোর দিকে। ঠোঁটে থমকানো হাসি লেগে আছে।

হঠাৎ সংবিৎ পেয়ে রিখিয়ার দিকে চেয়ে বলল, অপরাজিতা, আমি বাড়িতে একটা ফোন করব। আয়।

এক মিনিট। আসছি। বলে একটা চাউনি সোমেনের দিকে ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল মধুমিতা।

আরও জোর বাতাস এল। চারধারে রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, লোহার বিম, কাচের শার্শি সব ভেঙে পড়ছে বৃষ্টিতে, কলকাতার সাজগোজ ধুয়ে গেল। অজ পাড়াগাঁর মতো অসহায়ভাবে কলকাতা ভিজছে।

একাকী সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে রিখিয়া। দেখছে, মধুমিতা নিয়ে গেল সোমেনকে।

মধুমিতা সোমেনকে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এইভাবেই কি দৃশ্যটা দেখল রিখিয়া? সোমেন তা জানে না। তবু আর-এক বার টেলিপ্যাথি পাঠাল— আমি তো নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছি না, তুমি তো জানো।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে এক বার ঘাড় ঘোরাল সোমেন। রিখিয়া তাকিয়ে আছে। কী করুণ চোখ! অন্ধ কুকুরটা ওর গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে, মুখটা ওপরে তোলা, কী যেন গভীরভাবে বুঝবার চেষ্টা করছে, একটা গোঙানির শব্দ করল।

দেখে পা ফেলেনি সোমেন। শেষ ধাপে পা'টা ঘুরে পড়ল। আচমকা একটা ঝাঁকুনি খেল সোমেন।

তক্ষুনি হেসে ফেলল রিখিয়া, বলল, বেশ হয়েছে।

সোমেন ঠোঁট উলটে একটা অগ্রাহ্যের ভঙ্গি করে। একটু হাসে।

রিখিয়া রেলিং থেকে ঝুঁকে বলে, আপনার ফটোগুলো নিয়ে গেলেন না?

সোমেন ফটোগুলো ইচ্ছে করে নেয়নি, সব শোধবোধ হয়ে যাওয়া কি ভাল? কিছু থাক। তাই হেসে বলল, আর-একদিন নিয়ে যাব।

ফটোগুলো ভাল হয়নি, না? তাই নিলেন না। রিখিয়ার যে কত রকম কমপ্লেকস, মুখখানায় ফের অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

সোমেন সিঁড়ির গোড়া থেকে মুখ তুলে বলে, ভাল হয়নি, কে বলল? আমি যেমন, ঠিক তেমনি হয়েছে। আবার আসব তো, তখন নিয়ে যাব।

রিখিয়া একটু হাসল, অন্ধকার মুখে সেই হাসিটুকু জোনাকির মতো একটু আলো ছড়িয়ে দিল।

ওই হাসিটুকু বুকের মধ্যে পদ্মপত্রে জলবৎ টলটল করছিল।

খোলা গেট দিয়ে মধুমিতার ছোট্ট গাড়িখানা ব্যাক করে এল গাড়ি-বারান্দার তলায়। বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়ে গেছে গাড়িটা। হেডলাইটের আলোয় অজস্র কাচের নলের মতো বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে দেখা যায়, পিছনের দরজাটা ভিতর থেকেই খুলে দিল ড্রাইভার। একদৌড়ে মধুমিতা ঢুকে গেল, পিছনে সোমেন।

মধুমিতা তার চশমার কাচ কামিজের কোনা দিয়ে মুছতে মুছতে বলল, এ গাড়িটা বাপি আমাকে অলমোস্ট দিয়ে দিয়েছে। যেখানে খুশি যাই, কেউ কিছু বলে না। কেন জানেন? ওই অসুখটার জন্য। অসুখবিসুখ হলে খুব ইম্পর্ট্যান্স পাওয়া যায়।

বলে হাসল, কয়েকটা গোল চাকতির মতো, আর গোটা দুই ছোট পাশবালিশের মতো গদি পড়ে ছিল সিটের ওপর। তার দুটো সোমেনের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে মধুমিতা বলল, রিল্যাক্স প্লিজ। সিগারেটও খেতে পারেন।

মধুমিতা দুটো বালিশ তলপেটে চেপে ধরে কুঁজো হয়ে বসল। মুখখানা হাতের তেলোয় রেখে পাশ ফিরিয়ে চেয়ে রইল সোমেনের মুখের দিকে। গাড়ির ভিতরে অন্ধকার, কাচ বন্ধ বলে ভ্যাপসা

গরম। কাচের গায়ে ভাপ লেগে আবছা। সেই আবছা কাচ দিয়ে বাইরে একটা ভুতুড়ে শহরের অস্পষ্ট আলো-আঁধার দেখা যায়।

সোমেন বালিশ দুটো ফেলে রেখে কনুইয়ের ভর দিয়ে বসল। যথেষ্ট আরামপ্রদ গাড়ি, গভীর বসবার গদি। তবু আবার বালিশের কী দরকার তা বোঝা মুশকিল। বড়লোকদের কত বায়নাক্কা থাকে। গাড়ির পিছনের আর সামনের কাচে ছোট ছোট পুতুল সুতোয় বাঁধা হয়ে ঝুলছে। টেডিবিয়ার, মিকিমাউস, জাপানি মহিলা, ব্যালেরিনা।

এইমাত্র বাপিকে ফোন করলাম তো! মধুমিতা বলল, বাপি একটুও রাগ করল না, খুব অ্যাংশাস। অসুখ না হলে কিন্তু দেরি হওয়ার জন্য রাগ করত।

তোমার অসুখ কবে থেকে?

এক বছর, আগে অল্প অল্প মাথা ধরত। পরে সেটা খুব বেড়ে গেল।

ব্রেন টিউমার, ঠিক বলছ?

কী জানি! ও-সব থাক। আপনি আমাকে মাঝে মাঝে ফোন করবেন?

সোমেন অবাক হয়ে বলে, কেন, কোনও দরকার আছে?

মধুমিতা মাথা নেড়ে বলে, না, লোকজনের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে ইচ্ছে করে। আমার অনেক পেন-ফ্রেন্ড আছে, আবার অনেক টেলিফোন ফ্রেন্ডও আছে। টেলিফোন গাইড খুঁজে যে-নামটা ভাল লাগে তাকে ফোন করি। এভাবে আমার অনেক বন্ধু জুটে গেছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই বয়সে আমার অনেক বড়। কিন্তু তারা ঠিক ফ্রেন্ডশিপ রাখে। মাঝে মাঝে ফোন করে। অনেকে বাড়িতে আসে, প্রেজেন্টেশন বা বোকে দিয়ে যায়।

তোমার তো এমনিতেই অনেক বন্ধু।

আমি আরও বন্ধু চাই। অনেক বন্ধু। করবেন তো ফোন?

বলে হাসল মধুমিতা।

করব।

মধুমিতা খুব খুশি হল। হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে সোমেনের পড়ে-থাকা হাতটা চেপে ধরে বলল, কমরেড।

হাতটা ছাড়ল না। নিবিড় আঙুলগুলি জড়িয়ে ধরে রইল। সামনের ড্রাইভার নিবিষ্ট হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। কেউ দেখছে না। তবু একটু শিউরে উঠল সোমেন।

মধুমিতা যুবতী নয়। এখন কৈশোরকাল। শরীরের চেতনাগুলি এখনও লাজুক থাকে। মনে থাকে ভয় ও কুণ্ঠা। এখনকার মেয়েরা কিছু বেশি প্রগল্‌ভ। তবু প্রথম চেনায় এতটা করে না। মধুমিতার যে ভয় বা লজ্জা নেই তা বুঝি ওই অসুখের জন্য। এখন ওর লজ্জা করার মতো সময় নেই। এখন ওকে তাড়াতাড়ি সম্পর্ক তৈরি করে নিতে হয়। কিংবা এও হতে পারে যে, ওর স্বভাব পুরুষের মতো, মেয়েদের স্বাভাবিক লজ্জাবোধ ওর নেই।

আঙুলগুলি, হাতের উষ্ণ প্রসারটি সোমেন টের পেল না। তার মনে হল, হাতটা বড় শীতল। মৃত্যুর হিম লেগে আছে। সেই শীতলতা গ্রাস করে নিচ্ছে শরীর। শৈলীমাসির ঘরে যেমনটা হয়েছিল এখনও সে-রকমটা হচ্ছিল তার। যেন মধুমিতার শরীর থেকে মৃত্যুর জীবাণু সংক্রামিত হচ্ছে তার শ্বাসের বাতাসে। এগিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। অধিকার করে নিচ্ছে তাকে। সে একটা অস্ফুট শ্বাসকষ্টজনিত শব্দ করল। বলল, জানালাটা খুলে দিই?

মধুমিতা বলল, ওমা! বৃষ্টি আসবে না!

তাই তো! অঝোর বৃষ্টি, সামনের উইন্ডস্ক্রিনে ক্রমান্বয়ে পাক খেয়ে খেয়ে জলস্রোত মুছে ফেলতে পারছে না ওয়াইপার। কাচের ভিতর দিয়ে এক ভঙ্গুর, বিমূর্ত শিল্পের মতো শহরকে দেখা যায়। তবু জানালাটা খোলা দরকার। কিছু পরিষ্কার বাতাসের একটু শ্বাস বড় প্রয়োজন সোমেনের।

আপনি খুব ঘামছেন। এই বলে মধুমিতা খুট করে সুইচ টিপতেই একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের খেলনা ফ্যান বোঁ বোঁ করে ঘুরে বাতাস দিতে লাগল। ও মুখখানা আবার সোমেনের দিকে ঘুরিয়ে চেয়ে থেকে বলল, অপরাজিতা বড্ড গুডি-গুডি। পৃথিবীর কোনও খবর রাখে না।

সোমেন একটু হাসে। উত্তর দেয় না।

মধুমিতা ফের বলে, আমি কিন্তু ও-রকম নই। আই লিভ আপ টু দি টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি। অপরাজিতার সঙ্গে আমার মেলে না। খুব ঝগড়া হয়। আবার ভাবও হয়ে যায়।

সেই পুরুষালি স্বভাবের ডাঁটিয়াল মেয়েটি আর নেই। গাড়ির সিটে পা তুলে বসেছে এখন। তেলচোখে খুঁটে খুঁটে দেখছে সোমেনকে। আবছা আলোয় এই প্রথম ওর চোখে একটু মেয়েমানুষি কটাক্ষ দেখতে পেল সোমেন। তার অস্বস্তি হচ্ছিল।

মধুমিতা হাতটা সরিয়ে নিল হঠাৎ। হাঁটু দুটো দু'হাতে জড়িয়ে ধরল বুকের সঙ্গে। ওই ভাবেই একটু দোল খেল।

সামনের দিকে চেয়ে বলল, আপনি কি এনগেজড?

সোমেন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। বলল, কী বলছ?

আপনার কি কেউ আছে?

সোমেন এই প্রশ্নে হাসল। ভয়ও পেল। তার বয়স মাত্র চব্বিশ পূর্ণ হয়েছে। পঁচিশে পা। সদ্য যুবাপুরুষ। তবু মনে হয় তাদের যৌবনকালকে নস্যাৎ করে পরবর্তী যুবক-যুবতীরা দ্রুত জমি দখল করে নিয়েছে। মাঝখানে একটা যোগাযোগহীন শূন্যতা, জেনারেশন গ্যাপ। তারা কখনও এত অল্প পরিচয়ে কাউকে এই প্রশ্ন এত অকপটে করতে পারেনি।

সোমেন মিথ্যে করে বলল, ন্‌নাঃ, কেন?

একটা কথা বলব? রাগ করবেন না?

কী কথা?

প্লিজ, রাগ করবেন না।

না।

হাতটা আবার নরম বিসর্পিল আঙুলে চেপে ধরল মধুমিতা। নিবিড় উষ্ণ আঙুল, হাতের তেলোয় জ্বরাক্রান্তের তাপ। মৃত্যুর হিম আর নেই।

বলল, আই লাভ ইউ!

॥ উনপঞ্চাশ ॥

সেদিন শীলাকে সাধ দিলেন ননীবালা। সাধটুকু দিতেই কত না কষ্ট হল।

এখন এ সংসারে আর তেমন সচ্ছলতা নেই। রণেনের মনটা বড় ভাল, কোনও উদ্যোগ আয়োজন হলেই রাশিকৃত টাকা খরচ করে বাজার আনবে, জিনিস আনবে, হইচই করে হাট বাঁধিয়ে ফেলবে বাসায়। রান্নাঘরের চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসে সবকিছু চাখবে। পালেপার্বণে বা নেমন্তন্নে যেদিন বাসায় ভালমন্দ হয় সেদিন ননীবালাকেই তাগাদা দেবে রণেন, ও মা, আজ তুমি হাতা-খুন্তি ধরো। তুমি হাতা ছুঁলেই রান্নার স্বাদ পালটে যায়।

রাঁধতে ননীবালার তেমন কষ্ট হয় না। প্রেশারটা বাড়লে একটু অসুবিধে হয়। ট্যাবলেট আর ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে রাঁধতে বসেন গিয়ে। কিন্তু আজকাল সে সুখও গেছে। রণেনের অসুখটা হওয়ার পর থেকেই নেমন্তন্নের পাট গেল উঠে। রণেন আর মাকে রাঁধতে বলে না, কারণ রণেনও আর খাবারের স্বাদ পায় না। কোথায় যে ওর মনটা পড়ে দাপাচ্ছে তা কে জানে! ননীবালা জানেন না।

তবে এ নেমন্তন্নটা করতেই হয়। ছোট মেয়ে ইলারও ছেলে হল কিছুকাল আগে। ওরা বোম্বেতে থাকে বলে সাধ দিতে পারেননি, কেবল শতখানেক টাকা পাঠিয়েছিলেন একটা শাড়ি কেনার জন্য। বড় মেয়ের তো হবেই না ধরে নিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত হচ্ছে। ভেবেছিলেন, খুব ঘটা করে সাধ দেবেন। রণোর এ-রকম না হলে দিতেনও।

ভয়ে ভয়ে কথা পেড়েছিলেন বীণার কাছে, বউমা, শীলুর একটা সাধ না দিলে কেমন দেখাবে?

দিন। বীণা সংক্ষেপে উত্তর দিল।

ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে খুব ভাল সাধ দিয়েছে শুনলাম। সাদা খোলের কেটের শাড়ি দিয়েছে, অনেক সধবা খাইয়েছে।

বীণা এ-কথার উত্তর দিল না।

কিন্তু ননীবালা বুঝলেন। তিনি তো অবুঝ নন। ছেলের উপরি বন্ধ, সংসারটা মাইনের ক'টা টাকায় কেবলমাত্র চলে যায়। তার ওপর চিকিৎসার খরচও বড় কম নয়। বাড়তি খরচ কোথা থেকে আসবে! তবু মনটা খুঁতখুঁত করে। শীলাকে ভালরকম একটা সাধই দেওয়ার কথা। এতকাল পরে সন্তান হচ্ছে, সেও বটে। আবার অন্য দিকটাও দেখার আছে। লুকিয়ে-চুরিয়ে শীলা ননীবালাকে টাকা-কে-টাকা, গুচ্ছের শাড়ি, একজোড়া সোনার বালা, ভাল চটি কত কী দিয়েছে! জামাই বোধহয় এ-সব খুব একটা পছন্দ করে না, কিন্তু শীলা ঠিক চুপেচাপে নানা জিনিস পাঠিয়ে দেয়। বাড়িতে ভাল ঘি এল কি কোনও খাবার হল, কি বড় মাছের টুকরো এল, সঙ্গে সঙ্গে পাঠায়। এ-সবের পালটি দিতে হয়, সে দেওয়ার ক্ষমতা তো ননীবালার নেই, তাই সাধের সময় ভাল একটা কিছু দেবেন, ভেবেছিলেন।

হল না।

রণেনের কাছে এ-সব কথা তুলতে চান না ননীবালা। ওর বোধহয় কষ্ট হবে। কাউকে নেমন্তন্ন করে ভাল আয়োজন না করতে পারলে ও বড্ড খুঁতখুঁত করে। তাই বললে হয়তো দাপাবে মনে মনে। মনের কষ্ট বেড়ে যাবে। অথচ সাধের আগের দিনও বীণা তেমন গা করছিল না। জামাই-মেয়েকে নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে, অথচ উদ্যোগ আয়োজন নেই। মনে মনে ভয় পেলেন ননীবালা।

দুপুরে সোমেন বাড়িতে খেতে এল। খাওয়ার পর যখন সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসল, তখন ননীবালা তার কাছেই নালিশটা করলেন, কী করি বল তো, কাল ওরা সব আসবে, অথচ কোনও উদ্যোগ আয়োজন নেই।

ছেলেটা বড্ড রাগী। কোনও কাজ নেই, তাই প্রায় সময়েই সব আবোলতাবোল কী যেন ভাবতে বসে। সে সময়ে কেউ ডেকে কথা বললে বড্ড রেগে যায়। তেমনি রাগের ঝাঁঝ দিয়ে বলল, নেমন্তন্ন করতে গেলে কেন? যত সব সেকেলে সংস্কার। সাধ! সাধ আবার কী? ও-সব উঠে গেছে।

ননীবালাও রেগে গিয়ে বলেন, কী বলছিস যা-তা? এতকাল পর মেয়ে পোয়াতি হল, সাধ দেব না?

দেবে তো দাও। আমাদের যা রান্না হবে তাই খেয়ে যাবে। সংসারের অবস্থা তো ওরাও জানে।

ননীবালা আহাম্মক ছেলেটির কথা শুনে গায়ের জ্বালা টের পেলেন। বলেন, সংসারের কোনও ব্যাপারেই থাকিস না, এ ভাল নয়। একটা শাড়ি-টাড়ি কিছু না দিলে কেমন দেখায়?

সোমেন বলল, দাদা পারবে না।

তবে?

সোমেন তখন ননীবালার দিকে চেয়ে খুব ঠান্ডা কিন্তু কঠিন গলায় বলল, তোমার টাকা তো ব্যাঙ্কে পচছে। চেক কেটে দাও, তুলে এনে দিই।

ননীবালা সঙ্গে সঙ্গে মিইয়ে যান। জমি কেনার পরও হাজার সাতেক টাকা পড়ে আছে ব্যাঙ্কে। সকলেরই নজর ওইদিকে। অথচ জমির ভিত পত্তনের জন্য যে-টাকা দরকার তার জোগাড় নেই। ওইটুকুই ভরসা।

ননীবালা অসহায়ের মতো বললেন, ও-টাকা ভেঙে ফেললে তোদের বাড়ি কোনও দিন উঠবে?

ও-টাকাতেও বাড়ি উঠবে না। কেন বাজে কথা বলছ মা? আমাদের বাড়ি-টাড়ি হবে না।-বরং বেশি দামে জমিটা বেচে দিয়ো। আর টাকাটা যক্ষী বুড়ির মতো আগলে বসে থেকো।

কী কথা ছেলের! ননীবালার দু' চোখে জল এল। সংসারে এ-রকম শান্তি পেটের শত্রু ছাড়া কে দিতে পারে? কার ওপর রাগ-অভিমান করবেন, কার কাছেই বা নিজের নানা সুখ-দুঃখ সাধ-আহ্লাদের কথা জানাবেন? শেষ পর্যন্ত বুঝি একটা মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে মেয়েদের আর কেউ থাকে না! কিন্তু ননীবালার সেই মানুষটা যদি মানুষের মতো হত।

অসহায়ের মতো ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন। কী সুন্দর মুখখানা ছেলের। কাটা কাটা নাক-মুখ, দিঘল চোখ, এক ঢল চুল, রোগার ওপর ভারী লক্ষ্মীমন্ত চেহারা। তবু ওর মনটা এত নির্দয় কেন? তবু তো এখনও বিয়ে করিসনি ছেলে, বিয়ে করলে আরও কত পর হয়ে যাবি!

অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, হাতের পাতের দুটো টাকা। মানুষের কত বিপদ-আপদ আসে। দুর্দিনের জন্য রাখতে হয় না? হুট করে টাকা তুলে আনলেই হল?

সোমেন বিরক্তির সঙ্গে বলে, আর কত বিপদ আসবে? এটাই তো বিপদ। আসলে তুমি এ সংসারের জন্য নিজের টাকা খরচ করতে চাও না। তুমি ভীষণ সেলফিশ।

এই বলে সোমেন জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে গেল গনগন করতে করতে। ভয়ে ননীবালা আর উত্তর করলেন না। কিন্তু ছেলেটা বেরিয়ে গেলে একা ঘরে কত কান্না যে কাঁদলেন! ভগবানকে কখনও দেখেননি, তবু ভগবানকে ডেকে কত কথা বললেন মনে মনে। এক সময়ে দেখেন ভগবানের বদলে সেই ব্রজগোপাল বলে মানুষটার মুখ মনের মধ্যে ভাসছে। সঙ্গে সঙ্গে মনটায় যেন রাগ-অভিমানের ঝড় এল। বললেন, তুমি যদি আমার মাথার ওপর থাকতে তা হলে ওরা আমাকে এত কথা বলার সাহস পায়? দেখো, আমাকে কী আঁস্তাকুড়ের বেড়ালছানার মতো ফেলে গেছ তুমি। পুরুষমানুষ হয়ে তোমার লজ্জা করে না?

এমনি সব কথা। কথার পর কথা। গভীর মেঘের স্তর যেমন বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে আর শেষ হতে চায় না, তেমনি, এত বছর ধরে শুধু রাগ আর অভিমান মনের মধ্যে স্তরের পর স্তর জমে থেকেছে। তাই অনেক সময় লাগল ননীবালার সামলাতে।

কালকে সাধ। একটা কিছু করতেই হয়। নইলে ছেলেদের কী, জামাই-মেয়ের সামনে তিনিই লজ্জায় বেরোতে পারবেন না। আবার শুধু সাধই তো নয়, প্রথম বাচ্চা হওয়ার সময়ে মেয়েদের বাপের বাড়ি থাকার কথা। খরচপত্রও বাপের বাড়ির কিন্তু সে-কথা কার কাছে তুলবেন ননীবালা?

বীণা ছেলেমানুষ নয়, তিন ছেলেমেয়ের মা। কানে যখন কথাটা তুলেছে তখন বীণা একটা শাড়ি-টাড়ি কিনে আনবে ঠিকই। কিন্তু তাতেও ভয় পান ননীবালা। তেমন ভাল দেখনসই শাড়ি কি কিনবে? শীলুর কত দামি দামি শাড়ি, নিজে রোজগার করে কেনে, বরও ঢেকে দেয় শাড়িতে। কত দামি শাড়ি ঝিয়েদের বিলিয়ে দেয়। আজেবাজে শাড়ি দিলে পরবেই না হয়তো। জামাইও কী ভাববে?

এই সব চিন্তায় পাগল-পাগল হয়ে গেলেন তিনি। এ-সব আর কেউ ভাববে না। দায়দায়িত্ব সবই যেন তাঁর একার।

তখনও দুপুর যায়নি। গরমের দুপুর তো, অনেকটা বেলা পর্যন্ত তার আঁচ থাকে। বীণা একটু ঘর-বার করে কী ভেবে একটু বেরোল। সাজগোজ করেনি বেশিদুর যাবে না। যাওয়ার সময়ে আজকাল সব সময়ে বলে যায় না। কখনও খেয়াল হলে, মেজাজ ভাল থাকলে বলে, মা একটু অমুক জায়গা থেকে ঘুরে আসছি। আজ বলল না। বোধহয় শিলুর সাধ নিয়ে মনে মনে একটু আড় হয়ে আছে।

বীণা বেরিয়ে গেলে ফাঁক পেয়ে ননীবালা রণেনের ঘরে এলেন। আর, ঘরে ঢুকেই বড় করুণ

দৃশ্যটা দেখলেন। মস্ত বিছানায় বাচ্চাগুলো যে যার মতো ছড়িয়ে শুয়ে আছে। অঘোর ঘুম। তাদেরই মাঝখানে শুয়ে আছে রণেন। গরমে গায়ে কাপড় রাখতে পারে না, তাই আন্ডারপ্যান্ট পরে শোয়। ননীবালা দেখলেন, আন্ডারপ্যান্ট পরা রণেনকে ঠিক তার ছেলেদের মতোই দেখাচ্ছে। ও-রকমই শিশু যেন। শুধু চেহারাটাই যা একটু বড়। একটা হাত ভাঁজ করে তার ওপর মাথা রেখে শুয়েছে। পা দুটো ভাঁজ করা গুটিসুটি। পাখার তলাতেও ওর কপালে, থুতনিতে, পিঠে টোপা টোপা ঘামের ফোঁটা ফুটে আছে।

ননীবালা শুনলেন ঘুমের মধ্যেই রণেন একটা বড় কষ্টের, বড় কাতরতার শব্দ করল। যেন শ্বাস টানতে পারছে না। শরীরটা এক বার কেঁপে উঠল। ননীবালা তাড়াতাড়ি গিয়ে আঁচলে ছেলেটার পিঠের ঘাম মুছতে লাগলেন। স্নেহভরে ডাকলেন, রণো! ও রণো!

রণেন দেখছিল একটা বাগান। কী সুন্দর বাগান। চার দিকে হিম কুয়াশায় ভেজা গাছপালা। কী নিস্তব্ধ! এ-রকম গাছপালা আর কখনও দেখেনি রণেন। মোচার মতো বড় বড় ফুল ফুটে আছে গাছে। একটা নিমগাছের মতো কিন্তু নিমের চেয়েও অনেক সরল ও সুন্দর গাছ দেখল রণেন। বড় বড় ঘাস হাঁটু পর্যন্ত উঠে এসেছে। চার দিকে একটা গভীর সুঘ্রাণ। বেশ লাগছিল রণেনের। এমন বাগান সে জীবনে দেখেনি। মনটা জুড়িয়ে গেল। হাঁটু সমান ঘাস ভেদ করে আস্তে আস্তে ঘুরছিল সে ইতস্তত। হঠাৎ এক বার আকাশের দিকে চোখ তুলে সে স্থির হয়ে গেল। ওইখানে, ওই আকাশে এতক্ষণ তার জন্যই একটা ষড়যন্ত্র তৈরি হয়ে ছিল। রণেন দেখে, আকাশের অনেকখানি জুড়ে এক মহা চাঁদ স্থির হয়ে আছে। এমন বিশাল অতিকায় চাঁদ সে আর কখনও দেখেনি। সেই চাঁদ তার দিকে গম্ভীর, নিস্তব্ধতাময় এক স্থির চাউনিতে চেয়ে আছে। কেবলমাত্র তার দিকেই, কারণ এ বাগানে বা আর কোথাও কেউ নেই। ভীষণ চমকে উঠল রণেন এবং হঠাৎ বুঝতে পারল, আকাশের ওই চাঁদটা চাঁদ নয়। ওই মহাকায় গোলকটিই পৃথিবী। মাধ্যাকর্ষণের কোন ফাঁকে সে পৃথিবী থেকে গলে পড়ে গেছে বহু দূরবর্তী এই বাগানে। যেখানে চেনা গাছ, চেনা ফুল, চেনা গন্ধ, কিংবা চেনা মানুষ কেউ নেই। আচমকা ভয় খেয়ে এক ভাষাহীন চিৎকার করে 'আঁ—আঁ' বলে ছুটতে লাগল রণেন। কিন্তু হাঁটু-সমান উঁচু ঘাসগুলির ভিতরে ডুবে যায় পা, কিছুতেই সে নড়তে পারে না। আবার দৌড়োতে গিয়েই স্বপ্নটা পালটে যায়। দেখতে পায়, খুব নির্জন একটা মেঠো স্টেশন থেকে একটা ছোট্ট কালো রেলগাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে। রেলগাড়ির জানালায় ব্রজগোপালের হাসিমুখ দেখা যাচ্ছে। রণেন মাঠের ভিতর দিয়ে প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে গাড়িটার উদ্দেশে। পারছে না। কেমন যেন খিল ধরে আসছে হাতে-পায়ে। যত জোরে দৌড়োয় তত আস্তে হয়ে যায় গতি। প্রাণপণে হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে বলে, থামাও, থামাও, গাড়ি থামাও। বাবার সঙ্গে আমার কথা আছে। কিন্তু গলায় চিৎকার ফোটে না। এক অসহায় ফিসফিসানির শব্দ হয় কেবল। জরুরি কথাটা যে কী তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। জনমানবহীন স্টেশনে কোন প্রেত ঢং ঢং করে গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছে। ইঞ্জিনের শিস কানে আসে। দৌড়োতে দৌড়োতে দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে রণেনের। সে প্রচণ্ড কাঁদে, ছোটে। অন্তহীন মাঠটা আর পার হতে পারে না। ব্রজগোপাল আগ্রহভরে চেয়ে আছেন জানালা দিয়ে। জানতে চাইছেন, রণেন কী বলতে চায়। কিন্তু অত দূর! এত দূর থেকে কী করে বলবে রণেন? কথাগুলিও মনে পড়ে না। কেবল মনে হয়, বড় জরুরি কথা। বড় ভীষণ জরুরি কথা। এ স্বপ্ন থেকে পাশ ফিরতেই সে বড় ভয়াবহ আর-একটা দেখল। কী সাংঘাতিক স্পষ্ট, কী বাস্তব দৃশ্য! ব্রজগোপালের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে শববাহকদের সঙ্গে সেও। নদীর পাড়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে নামাল। চুল্লি সাজানো। শববাহকদের মধ্যে একজন বুড়ো লোক একটা নুড়ো জ্বেলে তার হাতে দিয়ে বলল, কেঁদে আর কী হবে বাবা! বৃষ্টি আসছে। মুখাগ্নিটা করে ফেলো। এবং রণেন মুখাগ্নি করল। চিতা ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল তলা থেকে। আগুনের শিখাগুলি উঠে আসছে ওপরে। হলুদ সাপের মতো। কী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। কোথাও এতটুকু অস্পষ্টতা বা রহস্য নেই।

ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন ভেঙে উঠে বসেই সে সামনে মাকে দেখতে পায়। দেখে অবাক হয়। এখনও কেন মায়ের হাতে শাঁখা, কেন চওড়া পাড়ের শাড়ি, কেন সিঁদুর? সে হাত বাড়িয়ে মা'র হাতটা ধরে বলে, মা, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডিটা দিয়ে আসতে হবে। ভেবো না। বলে আবার মায়ের দিকে চায়। বড় বেভুল লাগে। স্পষ্টই একটু আগে চিতাটা জ্বলছিল। কোনও ভুল নেই।

ননীবালা বললেন, কার পিণ্ডি দিবি? কী বলছিস, ও রণো?

জাগ্রত রণেন তখন মা'র দিকে চেয়ে থেকে ভুলটা বুঝতে পারল। স্বপ্ন! অত স্পষ্ট স্বপ্ন কেউ দেখে? অত নিখুঁত? সে চারধারে চেয়ে দেখল, না এ তো স্বপ্ন নয়। এই তো সে জেগে আছে!

হঠাৎ দু' হাতে মুখ চাপা দিল রণেন। ননীবালা উঠে গিয়ে পাখাটা আরও বাড়িয়ে দিলেন।

রণেন জিজ্ঞেস করল, বাবা কেমন আছে মা?

কেমন আছে কী করে বলি! কতকাল তো আসে না।

চিঠিপত্র পাওনি ইদানীং?

কই! সে চিঠিপত্র দেওয়ার মানুষ কিনা।

রণেন বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে বলল, আমি বাবার কাছে যাব।

এমনভাবে বলল যেমন দু' বছরের ছেলে বায়না করে বলে।

যাবি কি! আসবেখন সে নিজেই।

না। মাথা নাড়ল রণেন। ঠোঁট দুটো কেঁপে গেল থরথর করে। কান্নায় বিকৃত গলায় বলল, বাবা মরে গেছে মা। আমি এই মাত্র স্বপ্ন দেখলাম।

ননীবালা বড় চমকে গেলেন। স্বপ্ন! স্বপ্ন কি ফ্যালনা নাকি! কত কী হয়! ব্যগ্র হয়ে বললেন, কী দেখলি?

ওঃ! বলে প্রকাণ্ড আন্ডারপ্যান্ট পরা চেহারাটা নিয়ে সামনে দাঁড়াল রণেন। দু'হাতে কচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমি বাবার কাছে যাব। আমার সঙ্গে চলো মা।

সেই থেকে বুক কাঁপছে ননীবালার। সংসারে আর কত অশান্তি বাকি আছে, তার খেই পান না। জন্মাবার পর থেকেই বুঝি তাঁর হেন মেয়েমানুষের তপ্ত কড়াইতে বাস করা শুরু হয়। এ-ধারে পাশ ফিরলেও ছ্যাঁক, ও-ধারে পাশ ফিরলেও ছ্যাঁক।

বলেকয়ে রণেনকে শান্ত করলেন বটে। রাতটা কাটল ভয়ে-ভাবনায়, দুশ্চিন্তায়। পরদিন সাধের রান্না রাঁধতে রাঁধতে অন্তত তিনবার উঠে গিয়ে ট্রাংকুইলাইজার খেলেন। সঙ্গে একখানা অ্যাডোলফেন বড়ি। প্রেশারটা বেড়েছে বোধহয়।

রণেনও সারাদিন অস্থির। কেবলই দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'ওঃ হোঃ হোঃ' বলে চিৎকার করে। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে বলে 'বাবা'! এক বার ননীবালা শুনলেন রণেন ঘরে বসে 'মধুবাতা ঋতায়তে...' মন্ত্র বলছে। এত চমকে গিয়েছিলেন ননীবালা যে সেই সময়েই তাঁর স্ট্রোক হয়ে যেতে পারত! মাথাটা ঘুরে, বুক অস্থির করে, পেটে একটা গোঁতলান দিয়ে শরীরটা যেন হাতের বাইরে চলে গেল। একটু সময় দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামলে গেলেন।

রণেন ঘুরে ঘুরে রান্নাঘরের দরজায় এসে মাকে দেখে যায়। চোখ দুটো করুণ ছলছলে।

শীলা ওরাও ব্যাপারটা আঁচ করছিল বোধ হয়। শীলা এক বার চুপি চুপি এসে জিজ্ঞেস করল, দাদা আজ ও-রকম করছে কেন মা?

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন, ও-রকমই করে তো।

আজ যেন বেশি অস্থির।

সব কথা পেটের মেয়েকেই কি বলা যায়? বিয়ের পর ও তো একটু পর হয়ে গেছে। কত কথাই চেপে রাখতে হয় ননীবালাকে। এই কথা চেপে চেপেই বুঝি একদিন দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন।

বললেন, শাড়িটা দেখেছিস?

দেখলাম। বেশ হয়েছে। কত নিল মা?

বউমা এনেছে। দাম-টাম জিজ্ঞেস করিনি। দেখাল, এক বার দেখলাম।

শীলা একটু হেসে বলে, তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওই শাড়ির কিন্তু অনেক দাম। বউদি কম দামি জিনিস আনেনি। গড়িয়াহাটায় সেদিন একটা দাম করেছিলাম, একশো কুড়ি টাকা চাইল।

মনটা হঠাৎ তখন ঠান্ডা হল ননীবালার। মেয়েটার মুখের দিকে চাইলেন, উঁচু পেটটা হাঁটুতে একটু চেপে বসেছে। মুখটায় শ্রীহীন কর্কশ ভাব, কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে আছে। ঠোঁট শুকনো। ননীবালা নিরীক্ষণ করে বললেন, তোর তো ছেলে হবে।

বলছ?

বলছি। ও আমরা বুঝতে পারি।

ভালমন্দে সাধের দিনটা কেটে যেতেই রাতে তিনি বীণাকে ডেকে বললেন, বউমা, রণেনটা বড় অস্থির।

শুনেছি। কেবল বাবার কথা বলছে।

কী করবে? ননীবালা জিজ্ঞেস করলেন।

আমি তো যেতে পারব না, বাচ্চাদের ইস্কুল। বরং আপনি ওকে নিয়ে যান, বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসুন। বেড়ানোও হবে। আর ওখানে এক ফকির সাহেব আছেন শুনেছি, ওষুধ দেন।

সেই ঠিক হল। তারপরই মায়ে-পোয়ে চলে এসেছেন।

এসে ফাঁকা ঘর দেখে বুকটা সেই থেকে হু-হু খরার বাতাসে জ্বলে যাচ্ছে যেন।

ঘরের কী শ্রী! মাচানের বিছানাটা দেখলেই তো কান্না পায়। গুটিয়ে রাখা তোশকটা ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে তুলোর চাপড়া বেরিয়ে আছে। মশারিটা কয়েক জায়গায় সেফটিপিন আটকানো, ননীবালার চোখ ছল ছল করে।

রামভক্ত হনুমানের মতো জোড়হাতে সামনে দাঁড়িয়ে বহেরু কেবল—মাঠান, মাঠান, করে যাচ্ছে। তার দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে ননীবালা এক বার বললেন, বহেরু, তুই বড় পাপী। বামুন মানুষটাকে এইভাবে রেখেছিস!

বহুকাল পরে যেন ননীবালার বুকের মধ্যে মায়া-মমতা মাথা-তোলা দিল।

বহেরু মাটিতে বসে পড়ে দুর্বল গলায় বলে, ওনারে আমি রাখব! কী বলেন। কারও কড়ি ধারেন নাকি! বরং উনিই আমাদের রেখেছেন।

থাকবেন, না ফিরে যাবেন তাই নিয়ে মুশকিলে পড়েছিলেন ননীবালা। কিন্তু বুকের মধ্যে কু-পাখি ডাকছে। তাই দোনামোনা করে থেকে গেলেন। বহেরুর লোকজন সব ভেঙে এল সেবা-যত্ন করতে। ঘরদোর সাফ করা হল নতুন করে, একটু সাজানো হল। তার ফাঁকে ফাঁকে বহেরু বলছিল, কাউকে ঘরে ঢুকতে দেন না। জিনিসপত্র কেউ ধরলে ভারী চটে যান।

ননীবালা শোনেন। মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে অবোলা ভয় শ্বাসযন্ত্রকে চেপে ধরে—লোকটা বেঁচে আছে তো! ফিরবে তো!

এই করেই কেটেছে অসহ্য দিনটা। কাটতে কি চায়! মনে মনে কত মানত, কত ঠাকুরদেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন ননীবালা।

॥ পঞ্চাশ ॥

মাটির উঠানে সাদা রোদ পড়ে আছে। ধান সেদ্ধ করার জোড়া উনুন, বড় মেটে হাঁড়ি কয়েকটা। ঝিঙে মাচানে ফুলের যুদ্ধ লেগে গেছে। ভিতরের ঝুঁঝকো আঁধারে উঁকি দিলে দেখা যায় সুঠাম শিশুরা ফুল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

মাটির দোতলা বাড়ি। ওপরে খোড়ো চাল। উঠানে পা দিতেই মণ্ডলরা তিন ভাই খবর পেয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে ছেলেপুলে। সব উপুড় হয়ে পড়ল পায়ে। মুখে ভক্তি মেশানো হাসি।

ব্রজগোপাল হাতজোড় করে বলেন, সব ভাল তো?

আপনার যজমান, ভাল রাখবেন তো আপনি। মেজোভাই এ-কথা বলল। বি-এ পাস ছেলে, ইস্কুলে পড়ায়।

কথাটা শুনে ব্রজগোপাল খুশি হন। বাড়ির মায়েরা সব আসে। বড় বড় ঘোমটা, দূর থেকে না-ছুঁয়ে প্রণাম করে। বাড়িতে একটা চাপা আনন্দের বিদ্যুৎ খেলা করছে।

বড় ভাইয়ের গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়ানো। গোটা কয় শশা তুলে আনল পটাপট বাগান থেকে। মুখখানা হাসিতে ভিজে আছে। কপালে কণ্ঠায় ঘাম। মমতার চোখে চেয়ে থাকেন ব্রজগোপাল। এইসব তাঁর মানুষ। তাঁর সম্পদ। বুড়ো বামুনের নাম দিয়ে বেড়ান তিনি। বদলে এঁদের পান। আর কিছু নেই।

দোতলায় মাদুর পেতে দেওয়া হয়েছে বারান্দায়। ব্রজগোপাল কাঠের মই বেয়ে উঠে এলেন। পোঁটলাটা পাশে রাখলেন। বাচ্চা একটা ছেলে পাড় লাগানো হাতপাখা টানতে লাগল বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য হাতে ঢিলে পেন্টুল সামলাচ্ছে।

পুরনো তেঁতুল চেয়েছিলি সেবার। মনে করে আনলাম। বলে ব্রজগোপাল পোঁটলার মুখ খুলে শালপাতায় জড়ানো আফিঙের মতো কালো পুরনো তেঁতুল বের করে দেন। শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, মুখে দিলে টক লাগে না, মিষ্টি।

বড় মণ্ডল অবাক হয়ে বলে, মনে রেখেছেন! আমিই তো ভুলে গেছি।

তোদের ভুলো মন, কাজেকম্মে থাকিস। আমার তো ভুললে চলে না, তোদের নিয়ে কারবার। তোর খুকির একটা সম্বন্ধও এনেছি। বাশুলী গাঁয়ে।

বড় মণ্ডল একটু ইতস্তত করে বলে, এখানেও একটা ছিল। গয়লা ঘোষ। নিজেরা প্রস্তাব পাঠিয়েছে।

ব্রজগোপাল এক বার তাকান। বড় মণ্ডল চুপ করে যায়। ব্রজগোপাল ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন, ও-সবে মাথা দিবি না। বিয়ে দেওয়ার মালিক তুইও না, আমিও না। বর্ণাশ্রম ভাঙবি কেন? যোগেযাগে এই ঘুরে বেড়াচ্ছি দেশ-দেশান্তর, কত বিয়ে ঘটাচ্ছি, এ বড় পুণ্যকর্ম, ঠিক ঠিক বিয়ে ঘটালে দেশের কাজ হয়। ঘটকরা একসময়ে ভাল বামুনই ছিল। বর্ণে, গোত্রে, শিক্ষায়, চরিত্রে ঠিক বিয়েটি ঘটিয়ে দিত। সেইসবের জন্যই জাতটা এতদিন টিকে গেল। ঘটকালিতে পয়সা ঢুকে সর্বনাশ। বাশুলী গাঁয়ের পাত্রও ভাল, তোদেরই স্বঘর মাহিষ্য।

লোকটা তর্কটর্ক, কি প্রতিবাদ জানে না। একগাল হাসল, বলল, আজ্ঞে।

ওই হাসিটুকু দেখে ব্রজগোপাল ভরসা পান। দু' মাস তিন-মাস ফাঁক দিয়ে এলে দেখেন ব্যাটারা রাজ্যের অনাচারী কর্ম করে বসে আছে। সব ঠিকঠাক করে মেরামত করে দিয়ে যান। মানুষ যন্ত্রটাই সবচেয়ে গোলমেলে। বিগড়োলে, ভুল কাজ করে যেতে থাকে। তাই বার বার আসতে হয়। ঘুরে ঘুরে আসেন, ঘড়ির কাঁটার মতো। তবে গেঁয়ো লোক, বিশ্বাসটা বড় সরল। খুব বেশি খাটতে হয় না পিছনে। ধর্মভয়ে কথা মেনে চলে।

হাত-পা ধুয়ে দু' টুকরো শশা মুখে দিয়ে বিশ্রাম করছেন। উনুনে আগুন দিয়ে দুটো ফুটিয়ে

নেবেন একটু বাদে। দোলনায় একটা বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। অন্য একটা মেয়ে দোলাচ্ছে দোলনাটা। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ আসে। বীজমন্ত্র জপে একটু বাধা হয়। তারপর বীজমন্ত্রের স্পন্দনটা আপনিই দোলনার শব্দের সঙ্গে মিলে গেল। চার অক্ষরী বীজমন্ত্রটা আর দোলনার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ, এই দুইয়ে যেন একটু লড়াই চলল খানিক। তারপর দোলনার শব্দটা মিলিয়ে গেল। কলকাতার স্বামীচরণ মুখুজ্জে তার হাওড়ার লোহার কারখানায় একটা লোককে কুড়ি টাকা বেশি মাইনে দেয়। কারণ নাকি, লোকটা যখন হাতুড়ি পেটায় তখন সেই শব্দের মধ্যে স্বামীচরণ বীজমন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পান। ব্যাপারটা এখন বুঝলেন ব্রজগোপাল।

সেজো মণ্ডল এক আণ্ডিল ডাব কেটে নিয়ে এল। ডাব কেটে কেটে এগিয়ে দেয়। ব্রজগোপাল দুটো ডাব খেয়ে বলেন, ও নিয়ে যা।

এ ক'টা খাবেন না?

পাগল নাকি! দশটা ডাব খেলে পেটে সহ্য হবে না।

আগে কিন্তু খেতেটেতে পারতেন। বলে মেজো মণ্ডল দুঃখিত চিত্তে নিজে গোটা চারেক খেল, একটু ফিরে বসে।

আকাশের দিকে মুখ করে যোজন জুড়ে পড়ে আছে চিতেন ঠাকুর। চিত হয়ে পড়ে থাকে বলেই ব্রজগোপাল ওই নাম দিয়েছেন। লোকে বলে মা-বসুন্ধরা, ব্রজগোপাল বলেন চিতেন ঠাকুর। শনির মতো বদমেজাজি দেবতা। বুক চিতিয়ে পড়ে থাকে বটে ভালমানুষের মতো, কিন্তু বুকখানার মধ্যে নানা রসিকতার বাসা। ফুক করে শ্বাস ছাড়লেন তো বীজ ছাই হয়ে গেল, আবার চোখের ইশারায় মেঘ তাড়িয়ে আনলেন ভেড়ার পালের মতো, ভাসালেন সেবার।

মণ্ডলদের বুড়ো বাপ এখনও বেঁচে। খবর পেয়ে মই বেয়ে উঠে এল। রোগা মানুষ, বয়সের যেন গাছপাথর নেই। উবু হয়ে সামনে বসে পড়ল। আজকাল একটু ভীমরতি হয়েছে। বলল, ছেলেরা বোরো চাষ দিয়েছে। মানা শুনল না। মাঠ দেখে এসেছেন? সব লাল হয়ে গেল। বীজধানটাই নষ্ট।

ব্রজগোপাল ব্যাপারটা জানেন। খরায় তিনটে-চারটে বড় পুকুর যখন মজে এসেছে তখন তাইতে বোরো লাগিয়েছিল মণ্ডল ভাইরা। বোরো চাষে জল লাগে। তাই খুব বুদ্ধি খাটিয়ে মজা পুকুরে চাষ দিয়েছিল। তলানি জলটুকু চোঁ করে টেনে নিয়েছে চারাগাছ। তারপর এখন শুকনো টনটনে হয়ে খরখর শব্দ তুলছে হাওয়ায়। বহেরুর মতো বড় চাষি এরা নয় যে পাম্পসেট কিনবে, কি ডিপ টিউবওয়েল বসাবে। আগের বার ব্রজগোপাল দেখে গেছেন তিন পো পথ দূর দিয়ে খাল গেছে। সেখান থেকে খাত কেটে আনা যায়। বড় মণ্ডল বলল, তা অন্যের জমির ওপর দিয়ে নালা কাটতে দেবে কেন?

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, জমির মালিকদের বলেকয়ে দেখেছিস? সবার সঙ্গেই কি তোদের ঝগড়া নাকি?

বড় মণ্ডল মাথা চুলকে বলেছিল, তা বলিনি বটে। কিন্তু লোকের মন বুঝি তো, জমি ছাড়বে না।

ব্রজগোপাল বলেছিলেন, ছাড়বে। ছাড়াতে জানতে হয়। তোরা ব্যাটা কেবল স্বার্থের সময়ে লোকের খোঁজ করিস, এমনিতে খবর বার্তা নিস না। নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত। পরের জন্য তোর যদি কিছু করা থাকে তো তোর দরকারেও পরেই এসে বেগার দিয়ে যাবে। পাঁচহাত জমি ছাড়া তো কোনও ত্যাগই না। যা গিয়ে লোককে বোঝাগে, জল আনলে তাদেরও জমি সরেস হয়। আর বছর সীতাশাল ধান করা চাই।

কিন্তু কোথায় নালা! কোথায় কী? বোরো গেছে, বৃষ্টি না হলে বড় চাষও যাবে। চিতেন ঠাকুরের মতলব এবার ভাল না। টেরা চোখে চায় যদি! পরিবেশটা অনুকূল করে নিলে মানুষের কষ্ট থাকে না। প্রকৃতির সব দেওয়া আছে, মানুষে মানুষে আড় হয়ে সব নষ্ট করে। এইটে কতবার বুঝিয়েছেন, ওরা ভুলে যায়। লোককে সেবা দিয়ে, সাহায্য দিয়ে নিজের মানুষ করে নিতে হয়। পরিবেশের

রসকষ টেনে বেঁচে আছিস, পরিবেশটাকে রসস্থ রাখতে হবে না? নইলে ছিবড়ে হয়ে গেলে পরিবেশ তো রস ওগরাবে না, বাঁচবি কাকে নিয়ে?

বুড়ো মণ্ডল কপালে হাত চেপে কোঁকানির শব্দ করতে করতে বলে, আপনার চিতেন ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে দেখা দেয়। বলে, মাটির সতীত্ব নাশ করেছিস হারামজাদা, ফসলে বিষ দিলি, নিজেরাই খেয়ে আস্তে আস্তে মরবি। তা বাবামশাই, পোকাও লাগে বটে। জন্মে এত পোকা দেখিনি।

ব্রজগোপাল বিরক্তির শব্দ করেন। চিতেন ঠাকুরের আর কাজ নেই, বুড়ো মণ্ডলকে স্বপ্নে পেয়ে গুহ্যকথা সব বলতে গেছেন। তবু ওর মধ্যে একটু সত্যি কথা আছে।

বুড়ো মণ্ডল বলে, ভয়ানক স্বপ্ন বাবা। শশা কাটছি তাতে পোকা বিজবিজ, আলু কাটছি তো পোকা বিজবিজ, রসাল চেহারার ঝিঙে কাটলুম তো ভিতর থেকে ঝুরঝুরিয়ে পোকা বেরিয়ে গেল হাসতে হাসতে। এই স্বপ্ন। তারপর দৌড়ে এসে দোলনার খোকাটাকে তুলতে গিয়ে দেখি তারও চোখে কানে নাকে মুখে পোকা থিকথিক করে ধরেছে। কী ভয়ানক বলুন দিকি। ওই যে সব কেমিকেলি সার দেয়, কলের লাঙল দিয়ে চাষ, বিষ ছড়ায়, ও হচ্ছে চিতেন ঠাকুরের বুকে হাঁটু দিয়ে ফসল আদায়। ওইতেই ঠাকুর খেপে যান। পচানো সার, বৃষ্টির কি খালের জল, কাঠের লাঙলে হেলেবলদ—এই হল গে লক্ষ্মীমন্ত চাষ। জোর করে ফসল ফলালে মাটি রক্ত উগরে দেয়। ভাল হয় না তাতে। না কি বলেন?

ব্রজগোপাল হাসেন। পুরনো দিনের লোক বুড়ো মণ্ডল। সেই হেলেবলদে চাষ ভুলতে পারে না। তবে পোকার উপদ্রব বাড়ছে বটে। কেমিকাল সারের জন্যই।

জলের ব্যবস্থা একটা করে দিয়ে যেতে হয় এবার। বড় ভাইকে ডেকে বলেন, জলের কী করলি?

উরেব্বাস, জল নিয়ে মারামারি। খাল থেকে জল চুরি যাচ্ছে। সেই নিয়ে মারদাঙ্গা। আমরা সে-সবে গেলাম না এবার। বোরোটা ক্ষতি হল।

জলের কথাটা সারাদিন বসে ভাবেন ব্রজগোপাল। এই বুদ্ধিহীন যজমানগুলি ভেসে না যায় দুর্দিনে। গ্রাম ঘুরে কথা-টথা বলেন লোকজনের সঙ্গে। লোকের তেমন গা নেই। যে যার ধান্ধায় আছে।

পরের দিন বড় আর ছোট দু'ভাই ব্রজগোপালকে তুলে দিতে এল বাসরাস্তায়। বাসের দেরি আছে, ব্রজগোপাল দু'ভাইকে দু'দিকে নিয়ে বসেন গাছতলায়। বলেন, চাষবাস যা হোক গে, মানুষকে বুকে ঠেসে ধর, মানুষগুলোকে যদি অর্জন করতে পারিস তো তোদের ভাত উপচে পড়বে, এই বেলা মেখে ফ্যাল বাবা, একটু মিষ্টি কথা, একটু হাসি, একটু দরদ সিঁচে সিঁচে দিয়ে মেখে ফ্যাল মানুষগুলোকে। খুব আকাল যখন আসবে তখন পাশে দাঁড়ানোর মতো জন পাবি।

আকাল কি আসবেই?

আসবেই।

ইদানীং কী হয়েছে বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। বাস গোবিন্দপুরমুখো চলেছে। কিন্তু কেবলই সেই খুপরিতে গিয়ে উঠতে একটা অনিচ্ছা হতে থাকে। মাঝরাস্তায় শিবপুরে নেমে পড়েন। এখানেও যজমানদের বাড়ি। দিন সম্পূর্ণ হয়ে সন্ধে লাগছে। তবু কিছু চিন্তা হয় না। পৃথিবীটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠছে আজকাল। মাধ্যাকর্ষণ কি বেড়ে গেল এক লহমায়? মাঝে মাঝে ভাবেন, শেষ দিনটা আসার আর বুঝি দেরি নেই। তাই এত মায়া। ভাবতে এখন আনন্দই হয়। মরে যেতে তেমন কষ্ট হবে না। তবে কাজ ঢের বাকি রয়ে যাবে না কি?

একটা ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়ান তিনি। বেশ জায়গাটা। বাঁ ধারে একটা বাঁশবন। অবিকল পুজোর ঘণ্টার শব্দ করে একটা ঘণ্টানাড়া পাখি ডেকে চলেছে। তপ্ত দিনের শেষে ঝিল থেকে ভাপ উঠে

আসছে। তাতে জোলো গন্ধ। নিথর জলে একটা ডিঙি দাঁড়িয়ে আছে। তাতে একটা কালো মানুষ পিঁপড়ের মতো দাঁড়িয়ে, তার পিছনেই গলিত সোনার ঝোরা গলে গলে জলে মিশে যাচ্ছে। কী অপরূপ সন্ধ্যা! ব্রজগোপাল দাঁড়িয়ে থাকেন। তারা ফোটা দেখেন। ওই যে মেঘখণ্ডের ওপর তারা, ব্রাহ্মীমানুষেরা ওইরকম।

দু' দিনের নাম করে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এলেন সাত দিন পরে।

বাড়ির হাতায় পা দিতে না দিতেই বহেরুর নাতি এসে হাঁটু পেঁচিয়ে ধরল, ও দাদু, একটা ধাপানী লাট্টু কিনে দেবে?

বাচ্চাটা সবে বেড়ে উঠেছে। ব্রজগোপালকে পেলে আর ছাড়তে চায় না। গায়ে গায়ে পুলটিশের মতো লেগে থাকে। কোথা থেকে সব আসে, কোন শূন্য থেকে শরীর ধারণ করে। জন্মে এক লহমায় পৃথিবীতে চার দিকে মায়ার আঠা মাখিয়ে দেয়। এই সেদিনও এটা ছিল না, আর আজকে কী গভীরভাবে আছে!

ব্রজগোপাল ছাড়িয়ে দিতে দিতে বলেন, দেব রে দাদা।

মুকুন্দর দোকানে পাওয়া যায়।

দেবখন। হাত-মুখ ধুই, কাপড়-টাপড় ছাড়ি, কী লাট্টু বললি?

ওই যে সুতো বাঁধা চাকতি, ছুড়ে দিলে ফের হাতে চলে আসে পালটি খেয়ে।

বটে! তাজ্জব জিনিস তো!

ছেলেটা করুণ মুখ করে বলে, কিনে দেবে?

তুই আমাকে কী দিবি তার বদলে?

পুজোর ফুল তুলে দেব সকালে। সাদা ফুল।

যে ছড়াগুলো শিখিয়েছিলাম, বল তো! মনে আছে?

ছেলেটা একগাল হেসে মাথা নাড়ে। গম্ভীর হয়ে দাঁড়ায়। একটু দোল খেয়ে বলে, মানুষ আপন, টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর। ধর্মে সবাই বাঁচে বাড়ে, সম্প্রদায়টা ধর্ম না রে। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলেই হয় কৃতী তত। মুখে জানে, ব্যবহারে নাই, সেই শিক্ষার মুখে ছাই। বাঁচা বাড়ার উলটো চলে, ম্লেচ্ছ জানিস তাদের বলে।

আরও চলত। ব্রজগোপাল থামালেন। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় দোরগোড়ায় এসে পড়েছেন, ছেলেটা বলল, দাদু, তোমার মা বড় রাগী।

কে রাগী? ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেন।

তোমার মা। কাল এসেছে তো! তোমার ঘরে আমার সব খেলনাপত্র রেখেছি, যতবার নিতে যাই বকে দেয়। আর একটা মোটা মানুষ এসেছে, সেও ভারী রাগী। হাসে না।

ব্রজগোপাল বুঝতে পারলেন না কে এসেছে। মা? মা সেই কবে চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে।

কপাট ভিতর থেকে বন্ধ। শেকল নাড়া দিলেন ব্রজগোপাল। বুকের মধ্যে কেমন একটা উলটো রক্তস্রোত বইছে। কে এল! কে এল!

কে? একটু গম্ভীর বয়স্কা নারীকণ্ঠ সাড়া নেয়।

ও স্বর ভুলবার নয়। কতকাল বাদে এত দূর আসতে পারল মানুষটা। কোনও দিন আসবে না, ভেবেছিলেন ব্রজগোপাল।

আমি। বলতেই গলার স্বর একটু কেঁপে গেল। প্রদীপের শিখা যেমন দোল খায়।

ননীবালা দরজা খুলে সামনে থেকে সরে গেলেন। ঘোমটা টেনে কপাল ঢেকে বললেন, এই এলে?

হুঁ।

আমি আর রণো কাল থেকে বসে দুর্ভাবনায় মরে যাচ্ছি। দু' দিনের নাম করে সাত দিন! এ-

রকমই চলছে বুঝি আজকাল? দেখার কেউ নেই।

ব্রজগোপাল ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর বিছানায় রণেন ঘুমোচ্ছে। এক বার তাকালেন সেদিকে। তারপর ননীবালার দিকে ফিরে বললেন, কে থাকবে?

ননীবালা মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

॥ একান্ন ॥

ঠিক দুপুরবেলাতেই সুভদ্র আসে আজকাল। দুপুরটাই নিরাপদ সময়।

শীলার ইস্কুলের গ্রীষ্মের বন্ধ শেষ হয়ে এল। দুপুরে সে ঘুমোয় না ঠিক। শুয়ে থাকে। ঘুমোবে কী? পেটের মধ্যে ছেলেটা ফুটবল খেলছে সব সময়ে। কলকল করে জল নড়ে। ছেলেটা মায়ের শরীরের মধ্যে সাঁতরায়। ছেলেটা কি খেলোয়াড়ই হবে, না কি সাঁতারু। এই ছেলে জন্মাবে, বড় হবে, বিয়ে করে বউ আনবে। ভাবা যায়? শীলা নিজের মুখ চেপে ধরে। মনটাই অলুক্ষুণে, উঠে পড়ে। ঘরদোরে ঘুরে ঘুরে জিনিস নাড়ে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে, একটু হাঁটাচলা করে। আর ক'টা দিন। তারপর ইস্কুল খুললে দুপুরটা আর একা লাগবে না।

লাগেও না। সুভদ্র প্রায়ই আসে। কড়া নাড়ে না। বাইরে থেকে একরকম শিসের শব্দ করে। দোর খুলে প্রায়ই শীলা বিরক্ত ভাব করে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়। বলে, ও কী অসভ্যতা? শিস দিয়ে ডাকে কেউ? পাঁচজনে কী মনে করবে?

পাঁচজনের মনে করাকরি নিয়ে ভাবতে বয়ে গেছে সুভদ্রর। সে এ-কথা শুনে কেবল হাসে। দাড়িটাড়ি বড় একটা কামায় না, মাঝেমধ্যে গালে ঝোপঝাড় গজায়, চুল বেড়ে হিপি হয়ে যায়। ইচ্ছে ক'রে করে না এ-সব, আলসেমি ক'রে করে। সাজুক বা না সাজুক, দাড়ি থাক বা নাই থাক, ও জানে সব অবস্থাতেই ওকে দারুণ সুন্দর দেখায়। গার্লস স্কুলে ওকে চাকরি দেওয়াটা খুব বিপজ্জনক কাজ হয়েছিল।

শীলা ওকে বাইরের ঘরে বসিয়ে শোওয়ার ঘরে চলে আসে। আয়নায় মুখখানা দেখে। কী শ্রী হয়েছে! চেনা যায় না। পেতনি একটা। চুলটা ফেরায়, মুখটা মুছে নেয়, পাউডারের পাফটা একটু বুলিয়ে নেয়, ব্লাউজটা পালটায় কখনও-সখনও। এটুকু করতেই হয়। মনে পাপ নেই। তবু।

ধৈর্যশীল সুভদ্র ততক্ষণ বসে থাকে। শীলা ফের ঘরে আসতেই বলে. কেস্ পাচ্ছি না। এজেন্সিটা চলে যাবে।

খাটতে হয়।

খাটি না নাকি! সারাদিন ঘুরছি। গোটা কয়েক বড় কনসার্নে স্যালারি সেভিংস ধরতে পারলে খুব কাজ হত। কিন্তু কোনও জায়গাতেই চান্স পাচ্ছি না। সব জায়গায় আগে গিয়ে কে যেন কাজটা অলরেডি করে ফেলেছে। আমি লেট লতিফ।

শীলা মৃদু হেসে বলে, দুপুরে রোজ তো এখানে এসে আড্ডা হয়। ঘোরেন কখন?

সুভদ্র বলে, ইস্, রোজ নাকি? তা হলে আর বরং আসব না। উঠি।

শীলা পা নাচায়। নিশ্চিন্ত মনে বলে, রোজ না হোক, প্রায়ই।

ঠিক আছে, আর আসব না।

আসতে কে বারণ করেছে? এসে কাজের কথা তুলে গুচ্ছের মিছে কথা না বললেই হয়। আসলে এজেন্ট মানে তো দালাল, ও-সব করতে আপনার ভাল না-লাগবারই কথা।

সুভদ্র হাসে, বলে, ভাল লাগে না কে বলল! ঘুরতে ঘুরতে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়! বেশ লাগে।

তবে হচ্ছে না কেন?

হবে কী করে! যাদের পলিসি করার তারা সব তিন-চারটে করে পলিসি করে ফেলেছে। যারা করেনি তারা অন প্রিন্সিপল করবে না। তার ওপর এখন ব্যাঙ্কে রেকারিং ডিপোজিট-টিট করে এল আই সি-র পপুলারিটি কমিয়ে ফেলেছে। বললাম না, আমি সব জায়গায় লেট লতিফ।

শীলা হারের লকেটটা মুখে তুলে বলে, তা হলে কী করবেন?

ভাবছেন কেন? কিছু একটা হয়ে যাবে।

এই রকমই সব কথা হয়। নির্দোষ কথা। কেউ সাক্ষী থাকে না অবিশ্যি। ঝি-মেয়েটা ঘুমোয়, পড়শিরা কেউ কান পাতে না। চার দিকে তবু কী যেন একটা ওত পেতে থাকে। লাফ দেবে, ছিঁড়ে খাবে। ঘরসংসার ভেঙে ফেলবে। বাতাসে তড়িৎক্ষেত্র রচিত হয়।

ভাল নয়। ভাল নয়। তবু কী ভীষণ ভাল!

ক'দিন আগে শীলার স্কুলে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা হয়ে গেল। গার্ড দেওয়ার লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল, আজকাল মেয়েরা পরীক্ষা দিতে যখন আসে তখন তাদের সঙ্গে আসে ছেলে-বন্ধু, প্রেমিক বা পাড়ার দাদারা। বাইরে থেকে তারা হামলা করে, শাসায়, স্কুলের ঘরে ঘরে এসে অনায়াসে ঢুকে যায়। বড় দিদিমণি যদিও খুব কড়া লোক, তবু এ অবস্থায় তেমন কিছু করতে পারেন না আজকাল। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে, তার মধ্যেই বাইরের ছেলেরা ঢুকছে স্কুলে, বাইরে থেকে নকল পাচার করছে ভিতরে।

সুভদ্রর তেমন কোনও কাজ নেই, তাই শীলা বড় দিদিমণিকে গিয়ে বলল, সুভদ্রকে গার্ড দেওয়ার জন্য ডাকুন না। ও তো বেকার বসে আছে। এক-আধজন পুরুষমানুষ থাকলে আমাদের সুবিধে হয়।

বড় দিদিমণি রাজি হলেন, এবং সুভদ্র গার্ড দিতে এল।

পরীক্ষার গার্ড দেওয়া বড় একঘেয়ে কাজ। কেবল ঘুরে বেড়ানো, কাগজ দেওয়া, স্টিচ করা, আর মাঝে মাঝে মৃদু ধমক দেওয়া। সময় কাটে না। কিন্তু সুভদ্র এল বলে চমৎকার কাটছিল সময়টা। যে তিনটে স্কুলে সিট পড়েছিল তার মধ্যে দুটো স্কুলই সুভদ্রর পাড়ার। প্রায় সবক'টি মেয়ে ওকে চেনে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার তিন দিনের দিন সুভদ্র স্কুলে পা দিতেই চার দিকের মেয়েদের মধ্যে চাপা বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারপরই ডাকাডাকি—মিন্টুদা, এদিকে আসুন। মিন্টুদা, কোশ্চেন বুঝতে পারছি না। মিন্টুদা জল খাব। এমনকী বাইরে যে-সব ইতর টাইপের ছেলে রোজ এসে জড়ো হয় তারাও হকে-নকে এসে সুভদ্রকে ডাকাডাকি করে, গোপনে কথা বলে, খাতির জমানোর চেষ্টা করে। সুভদ্র তাদের তাড়া দিলে চলে যায়।

পাড়ায় যে সুভদ্রর যথেষ্ট প্রতিপত্তি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। মেয়েরা পরীক্ষা দিতে দিতেও অনেকে মুখ তুলে সুভদ্রর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতের হাসি হাসে, ছলে ছলে তাকে ডাকে, অকারণে কথা বলে। শীলার ভিতরটা জ্বালা করে ধিঙ্গি মেয়েদের কাণ্ড দেখে। কী নির্লজ্জ বাবা! কোমরে আঁচলের আড়ালে, ব্লাউজের ফাঁকে সব বইয়ের পাতা, চোথা কাগজ নিয়ে বসেছে। তবু সিকিভাগ মেয়ে লিখতেই পারছে না। কিছুই পড়েনি, কোথা থেকে টুকতে হবে তাও জানে না। কলম কামড়ে বসে থাকে, তখনই তাদের কারও কারও সুভদ্রকে বড্ড বেশি দরকার হচ্ছে। মিন্টুদা, ও মিন্টুদা।

অবশেষে শীলা একদিন ঠাট্টা করে বলল, মিন্টুদা, আপনি হল-এর বাইরে থাকুন। নইলে বড্ড মিস-ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে।

সুভদ্র গাঢ় চোখে তাকিয়ে বলে, দোহাই, ওদের একটু লিখতে-টিখতে দিন। ওদের অনেকের একমাত্র ভরসা হায়ার সেকেন্ডারির সার্টিফিকেটখানা। আপনারা কড়া হলে ওদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

শীলার এটা সহ্য হয় না। ডিসিপ্লিন জিনিসটাকে সে বুক দিয়ে ভালবাসে। স্কুলে তারা ভীষণ

ডিসিপ্লিন মেনে চলে। ক্লাস ফুরিয়ে গেলেও সবাই সাড়ে চারটে পর্যন্ত স্কুলে থাকে, আগে বেরোয় না। অ্যানুয়েল পরীক্ষার পর যখন ক্লাস থাকে না, তখনও তারা স্কুলে বসে এগারোটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত উল বোনে, গল্প করে, তবু আগে আগে চলে যায় না। মেয়েদের ব্যাপারেও তাই। ইউনিফর্ম ঠিক না থাকলে, ক্লাস-ওয়ার্কের খাতা না আনলে, কিংবা এ-রকম সামান্য কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

সুভদ্রর উদার নীতি দেখে তাই শীলা রেগে গিয়ে বলে, আপনাকে ডেকে আনাই ভুল হয়েছিল সুভদ্র।

সেই রাগ থেকেই শীলা একদিন একটা মেয়ের খাতা কেড়ে নিল। বের করে দিল ঘর থেকে। মেয়েটা প্রথমে শীলার সঙ্গে তর্ক করল, তারপর মিন্টুদার খোঁজ করল। সুভদ্র ছিল নীচের তলার ঘরে, তাই তাকে ডেকে না-পেয়ে সোজা গিয়ে বাইরের ছেলেদের কাছে নালিশ করল। তারপরই ইস্কুলে ঢিল পড়তে শুরু করে, সেই সঙ্গে শাসানি। মেয়েটার গার্জিয়ান পরিচয় দিয়ে এক বয়স্কা মহিলা দু'জন ছোকরাকে নিয়ে এসে শীলাকে ঘিরে কী তম্বি! সেই হাঁকডাক শুনে হেডমিস্ট্রেস উঠে এলেন, অন্য দিদিমণিরাও। কিন্তু মিটমাট করতে পারছেন না। এমন সময় সুভদ্র উঠে এল। শীলাকে সরিয়ে নিজে দাঁড়াল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি। দু'মিনিটে মিটিয়ে দিল ব্যাপারটা। মেয়েটি ফের এসে বসল পরীক্ষা দিতে।

ইস্কুলে একটা ছোট্ট ঘর আছে তিনতলার ল্যাবরেটরির পাশে। তাতে মেয়েদের গান বাজনা শেখার বাদ্যযন্ত্র থাকে, প্রাইমারি সেকশনের অফিস হয় সকালে। সেই ঘরে এসে শীলা টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছিল। কী অঝোর কান্না! সেই মেয়েটা বা তার গার্জিয়ানের ওপর ততটা নয়, যতটা রাগ বা অভিমান তার সুভদ্রর ওপর। ও কেন এসে মাঝখানে পড়ল? ওর জন্যই তো নষ্ট হচ্ছে পরীক্ষা, আবহাওয়া দূষিত হয়ে যাচ্ছে।

একা ঘরে কাঁদতে কাঁদতেই টের পেল সুভদ্র এসেছে। ওর লজ্জা-সংকোচ কিছু কম, সাহস বড্ড বেশি। পিঠে অনায়াসে হাত রাখল সে, বলল, এ মা, ছি ছি! কাঁদছেন কেন?

শীলা এক ঝাপটায় হাত সরিয়ে দিয়ে ফণা তুলে বলল, আপনি যান। আর ভালমানুষ সাজতে হবে না।

সুভদ্র গেল না। উলটো দিকের চেয়ারে বসল মুখোমুখি। শীলা কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। অভিমানের বান ডেকেছে বুকে। কান্না কি ফুরোয়? টেবিলের ওপর তার পড়ে-থাকা একখানা হাত দু'হাতে ধরে সুভদ্র গাঢ় স্বরে বলল, ক্ষমা চাইছি, লক্ষ্মী মেয়ে। কাঁদে না। আপনি বরং আমাকে একটা চড় মারুন, বা যা খুশি করুন। তবু প্লিজ শান্ত হন। আপনি কেন বুঝতে পারছেন না যে দিনকাল পালটে গেছে! যে-কোনও স্কুলে গিয়ে দেখে আসুন, সকলের চোখের সামনে আনফেয়ার মিনসে চলছে। আপনি আমি ঠেকাব কী করে!

শীলা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। মুখ তুলে বলল, আপনি ঠেকাচ্ছেন না কেন? আপনাকে তো ওরা চেনে, মানে।

সুভদ্র চুপ করে চেয়ে রইল একটু। তারপর চমৎকার দীনতার হাসি হেসে বলে, ওটা আপনার ভুল ধারণা। ওপর ওপর খাতির দেখাচ্ছে ঠিকই! কিন্তু যদি আমি কড়া হওয়ার চেষ্টা করি সঙ্গে সঙ্গে মস্তানদের ছুরি বেরোবে, বোমা ফাটবে। আপনি তাই চান?

না, শীলা তা চায় না। তবু চুপ করে অভিমানভরে বসে রইল। উত্তর দিল না।

সুভদ্র ফের বলে, তা ছাড়া, আমি ওদের প্রতি সিমপ্যাথেটিক। জানি তো আমাদের এডুকেশনটা একটা ফার্স। সেই প্রহসনের স্বরূপটা এবার লোকে ভাল করে জেনে যাক। দেশ-বিদেশে রটে যাক, এ দেশে শিক্ষার নামে কী চলছে। আপনি বাধা দেবেন না।

শীলা আর বাধা দেয়নি। বরং গার্ড দেওয়ার ছলে ঘুরতে ঘুরতে সুভদ্রর সঙ্গে আড্ডা মেরেছে

করিডোরে, বারান্দায়, তেতলার নির্জন ঘরে। মেয়েরা সুভদ্রকে ডাকলে খুব বিরক্ত হয়েছে। কী এত কথা ওদের সুভদ্রর সঙ্গে! কেবল মিন্টুদা, আর মিন্টুদা!

বলেছে, মেয়েরা আপনাকে অত খোঁজে কেন?

সুভদ্র হাসে, বলে, হিংসে হচ্ছে?

কী অকপট কথা! হিংসে! হিংসেই তো। শীলা তাই লজ্জায় লাল হয়।

সুভদ্র তখন বলে, পাড়ায় সবাই চেনে, তাই ডাকে। জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে নেয় আর কী, পড়াশুনো তো করে না।

বড্ড বেশি উদার আপনি।

ভীষণ অসভ্য হয়ে গেছে সুভদ্র আজকাল। সাহসও বেড়েছে। প্রশ্রয় পায় তো। তাই দিব্যি চোখ হেনে বলল, কারও উদারতা বাড়ছে, কারও উদর।

শুনে শীলা লুকোবার পথ পায় না। হাতে একটা সাবমিট করা খাতা ছিল, পাকিয়ে হাতে নিয়ে ঘুরছিল, সেইটি দিয়ে ঠাস ঠাস মারল সুভদ্রকে। আর তখন একটা তাৎক্ষণিক আবেগে সুভদ্র একটা কাণ্ড করে ফেলেছিল, স্কুলের মধ্যে। চার দিকে লোকজন। তিনতলার নির্জনতা খুবই ক্ষণভঙ্গুর তখন, যে-কোনও সময়ে লোকজন চলে আসতে পারে। তবু দুরন্ত পুরুষটি দু' হাতে খামচে ধরল কাঁধ, বুকের মধ্যে টেনে নিল। শীলা ঢেউয়ের মতো পড়ে গেল বুকের মধ্যে। তারপর তীব্র বিস্ময়, অসহ্য একটা ধাঁধার মধ্যে সুভদ্রর জ্বরতপ্ত শুকনো ঠোঁট একপলকের জন্য স্পর্শ করেছিল তার গাল। শীলা পালিয়ে এসেছিল।

পরে দেখা হতে বলেছিল, আপনার সঙ্গে আর মিশব না।

সুভদ্র যথেষ্ট লজ্জিত, ভীত। চোখে আনত দৃষ্টি। খুব ভয় পেয়েছে। শীলা মনে মনে খুশি হল। কিন্তু ওর অত ভয়ের কী? 'মিশব না' কথাটা মুখের কথা মাত্র, তা কি ও বোঝে না? শীলার মুখে যে প্রশ্রয়ের হাসি, চোখে যে উজ্জ্বল দৃষ্টি তা কি অন্য কথা বলে না!

সুভদ্র আসে ঠিক দুপুরবেলায়। প্রচণ্ড গরমের দুপুর। বসে থাকে দরজা-জানালা বন্ধ-করা শীলাদের ঠান্ডা বৈঠকখানায়। শীলা মুখোমুখি। রাজ্যের আজেবাজে কথা হয় দু'জনের। যা বলে না তা বুঝে নিতে কারও অসুবিধে হয় না।

শীলা জানে, শীলা ওকে ভালবাসে। ভীষণ ভালবাসে। বলে না। দরকার হয় না। সুভদ্র জানে সুভদ্র ওকে ভালবাসে। বলে না। দরকার কী?

অজিত আজকাল বড্ড ব্যস্ত। অফিসে তেমন কাজকর্ম নেই। আজকাল খুব ম্যাজিকের শো করার ডাক পায়। ইংরিজি, হিন্দি আর বাংলায় আজকাল অনর্গল ম্যাজিকের প্যাটার বলে যেতে পারে। 'শো' করে স্কুল-কলেজে, ক্লাবে, পাড়ায়। বার দুই খবরের কাগজে ছোট্ট করে তার ম্যাজিকের খবর বেরিয়েছে। সবাই বলে, এবার নিউ এম্পায়ার বা আকাডেমি হল ভাড়া করে নিজের শো করতে। তাতে বড় করে খবর বেরোবে, জাতে উঠে যাবে। অজিতের ইচ্ছে করে না।

ম্যাজিক দেখানোর খবরটা কোন চিঠিতে যেন লক্ষ্মণকে লিখেছিল অজিত। লক্ষ্মণ জাহাজে এক প্যাকিং বাক্স ভরতি ম্যাজিকের জিনিস পাঠিয়েছে। নানা রকমের তাস, জাম্বো কার্ড, হরেক অ্যাপারেটাস। সেইসঙ্গে কালো একটা ম্যাজিশিয়ানের সুট, টুপি সমেত। কাস্টমস থেকে বাক্সটা ছাড়িয়ে এনে গলদঘর্ম হয়ে ক'দিন জিনিসগুলো নিয়ে ম্যাজিক অভ্যাস করল সে। কিন্তু বড্ড ক্লান্তি লাগে। তার ভাগ্য কেন তাকে ম্যাজিশিয়ান হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কেন? জনতার সামনে দাঁড়িয়ে অবিরল মুখস্থ প্যাটার বলে যেতে যেতে, চোখ-মুখের নানা মেধাবী ভঙ্গি করে অবিরল ম্যাজিক দেখাতে তার ইচ্ছে করে না। তবু দেখাতে হয়। আজকাল সে ম্যাজিক দেখালে টাকা পায়। গত বছর পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাট টাকা পেত একটা 'শো'য়ে। এ বছর দু'শো-তিনশো টাকা না চাইতেই অগ্রিম দিয়ে যায় লোক। এও একটা ঝামেলা। টাকা দিলে ফেরানো যায় না। নিতে

হয়। টাকার প্রয়োজন তো ফুরোয় না কখনও। কিন্তু ওই টাকাটাই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে ম্যাজিকের সঙ্গে। কিন্তু জীবনের কোথাও কোনও ম্যাজিক নেই, রহস্য নেই। সব রহস্য যেন তার জানা হয়ে গেছে। তাই বিস্বাদ।

॥ বাহান্ন ॥

কুমুদ বোস একদিন বলেছিল, ম্যাজিশিয়ান, তুমি শালা কী আর ম্যাজিক জানো? কুমারস্বামীর কাছে নিয়ে যাব তোমাকে একদিন, ব্যোমকে যাবে। তার হাতের পাঁচ আঙুলে গ্রহ-তারা নড়েচড়ে।

অজিত আগ্রহ বোধ করে না। কুমারস্বামীর কথা সে আগেও শুনেছে। অফিসের অনেকেই তার কাছে যায়। সেনদা এম এসসি পাশ, সায়েন্স কলেজে রিসার্চ করত, সেও একদিন এসে বলেছিল, ও-রকম সিদ্ধপুরুষ দেখিনি। মিনিস্টার, বড় বড় মার্চেন্ট, ফিলমের লোকজন সব মাছির মতো জমে আছে। আমি ঘরে ঢুকতেই নাম ধরে ডেকে বলল, এতদিনে আসার সময় পেলি?

অজিত হেসেছে। ভারতবর্ষে সিদ্ধপুরুষদের সংখ্যা ইদানীং খুব বেড়ে গেছে। তাদের গ্ল্যামার এখন সবচেয়ে বেশি। তাদের কেউ ভোটে যদি দাঁড়ায় তো পি-এম পর্যন্ত হেরে যাবে। অবশ্য ভোটে দাঁড়ানোর দরকার হয় না, ভোটে জিতলে যা পাওয়া যায় তারা তার একশো গুণ পেয়ে যাচ্ছে ভক্তদের কাছ থেকে। টাকা, যশ, ভক্তি। এদের রবরবা যত বাড়ছে তত বোঝা যাচ্ছে যে জাতটার মেরুদণ্ড কত নমনীয়, ভঙ্গুর। জনসাধারণের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন চোর, একজন ফাঁকিবাজ, তৃতীয়জন মস্তান। শতকরা হিসেব করলে পুরো একজনকেও পাওয়া যাবে না যে সৎ এবং চরিত্রবান। এই সব লোভী, স্বার্থপর, হৃদয়হীন মানুষদের সব সময়ে বিবেক পরিষ্কার রাখার জন্য সিদ্ধপুরুষরূপী একটা খুঁটির দরকার হয়। সেইখানে নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে ইচ্ছেমতো চরে বেড়ায়। যে যত বড় ম্যাজিকওয়ালা সে তত বড় মহাপুরুষ। ম্যাজিক না দেখালে লোকের ভক্তি টসকে যায়।

এইসব কথা অজিত যখন বলে তখন কুমুদ বোস ভারী চটে যায়। সে একসময়ে গোবরবাবুর কাছে নাড়া বেঁধে কুস্তি শিখেছিল। হাতের গুলি দেখানোর জন্য হাফহাতা জামার হাতাও অনেকখানি গুটিয়ে তুলে রাখে। প্রকাণ্ড স্তম্ভের মতো হাত দু'খানা টেবিলের ওপর প্রদর্শনীর জন্য রেখে বলে, পাপকথা মুখে আনবে তো ঝাপড় মারব। পি সি সরকারেরও একজন ধর্মীয় গুরু ছিলেন, সেটা জানো?

অজিত মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলে, বোসদা, ক'টা কথা খুব ধীরস্থির ভাবে জেনে রাখুন। এক নম্বর, ভগবান বলে কোথাও কিছু নেই। দু' নম্বর, এক বার মরলে আর কেউ জন্মায় না। তিন নম্বর, ধর্ম হচ্ছে ব্ল্যাক-মার্কেটিং, ভেজাল, ঘুষ এ-সবের মতোই আর-একটা জোচ্চুরি।

আর, তুমি যে পলিটিক্স করতে সেটা জোচ্চুরি নয়? তুমি যে ম্যাজিক করো, সেটা জোচ্চুরি নয়?

অজিত একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলে, বটেই তো, পলিটিক্স যে জোচ্চুরি তা সবাই জানে। তবু করতাম কেন জানেন? জোচ্চোরদের সঙ্গে লড়বার জন্য ওটাই সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্র। আর আপনারা জানেনই না যে জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে যাচ্ছেন। তফাতটা এখানেই। আমি যে ম্যাজিক করি, সেটাও একরকম লোক-ঠকানো জোচ্চুরিই। লোকে জেনেশুনেও পয়সা খরচ করে দেখতে আসে। সে তবু ভাল। আমি তো ম্যাজিক দেখানোর সময়ে বলেই দিই যে ম্যাজিকে মন্ত্র-টন্ত্র কিছু নেই, সবই হাত-সাফাই। আপনার কুমারস্বামীর সে-কথা বলার সাহস আছে?

কুমুদ বোসের চেহারাটা যেমন, বুদ্ধিটা তেমন নয়। তর্কে ঠিক জুত করতে পারে না সে। মাথা গরম করে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। তখন সবাই বলে, অজিতের সঙ্গে তুমি পারবে কেন বোসদা?

ইউনিয়ন করে করে ও তর্কে পাকা হয়ে গেছে। তার ওপর বারেন্দ্র। ওদের মহা কূটবুদ্ধি।

অজিত টের পাচ্ছিল সে যত তর্কই করুক, ইদানীং কুমারস্বামীর একটা হাওয়া বইছে অফিসে। দু'জন-চারজন করে কুমারস্বামীর ভক্ত বাড়ছে। যারা সাতদিন আগেও ঠোঁট বেঁকিয়েছে তারা আজ গুজগুজ ফুসফুস করে কুমারস্বামীর মিরাকলের গল্প করছে। দু'-চারজন তাকেও এসে ভজাবার চেষ্টা করে। খুবই ঠান্ডা চোখে তাকায় অজিত, ঠান্ডা গলায় কথা বলে। তারা সরে পড়ে।

শীলার বন্ধু সুভদ্র নামে সেই ছেলেটা দু'-চারবার অফিসে এসে দেখা করে গেছে। বার দুই এসেছিল কমিশনের জন্য। তারপর একদিন এসে বলে, অজিতদা, আপনার তো অনেক জানাশুনো। আমাকে একটা অফিস বা স্কুল-কলেজ যা হোক স্যালারি সেভিংস ধরিয়ে দিন। সিঙ্গল পলিসি করিয়ে লাভ হয় না।

ছেলেটার চেহারাটা এত সুন্দর যে চট করে মায়া বসে যায়। অজিত তাই ছেলেটাকে এড়িয়ে যায়নি। সেনদা একটা স্কুলের সেক্রেটারি, তাকে ধরে স্যালারি সেভিংস করিয়েও দিয়েছে। ওই সূত্রেই ছেলেটার সঙ্গে কিছু ঘনিষ্ঠতা। সুভদ্র কার্ল মার্কস-এর ভক্ত, অজিতও তাই। খানিকটা প্রশ্রয় অজিত তাকে দেয়। অফিস থেকে ফিরে কখনও-সখনও দেখে সুভদ্র বাইরের ঘরে বসে আছে। খুশি হয়েছে অজিত। ছেলেটাকে তার ভাল লাগে।

আবার এও ঠিক তার মনের মধ্যে একটা কাঁটা মাঝেমধ্যে খচ করে বেঁধে। ছেলেটাকে বড্ড বেশি পছন্দ করে শীলা। নইলে সুভদ্র যেদিন আসে সেদিন শীলার একটু সাজগোজ কেন? খুব বেশি কিছু নয়, তবু অজিত ঠিকই লক্ষ করে, শীলার মুখে হালকা ফাউন্ডেশন মেক-আপ লাগানো, ঠোঁটে লিপস্টিকের বিলীনপ্রায় রং, পরনে একটু বেশি নির্লজ্জ ব্লাউজ, শাড়িটা সাধারণ হলেও পাটভাঙা, চুল এলোখোঁপায় বাঁধা, চোখে কাজল। সুভদ্রর সামনে ও একটু বেশি বড় বড় করে তাকায়, একটু বেশি ধীরে চলাফেরা করে, একটু বেশি সুরেলা গলায় কথা বলে। এগুলো টের পাওয়া যায়। শীলা ওই সময়টায় আটপৌরে থাকে না।

সন্দেহটা প্রথমে মাঝেমধ্যে উঁকি মারত, তারপর নানা ভাবনাচিন্তা, কাজকর্ম আর ম্যাজিকের দমকা হাওয়ায় উড়ে যেত মন থেকে। কিন্তু ওই একফোঁটা বিষ—ও কখনও ফিকে হয় না। দিনে দিনে ঘনীভূত গাঢ় হয়ে ওঠে, ছড়ায়। একদিন নয়, বেশ কয়েকবারই অজিত অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে। কিছু তেমন দেখতে পায়নি। প্রতিদিনই যে সুভদ্র ছিল, তাও নয়। দু'দিন ছিল, কিন্তু ওরা দু'জন দু'দিকে বসে গল্প করছিল মাত্র। বেশ কয়েকবার অফিস কামাই করেও লক্ষ করেছে অজিত। মাঝে মাঝে আসে সুভদ্র। রোজ নয়।

একদিন শীলাকে বলল, ও এসে ও-রকম শিস দেয় কেন বাইরে থেকে?

শীলাও বিরক্ত হয়ে বলেছে, দেখ না। ওইরকমই স্বভাব। কতবার বারণ করেছি, শোনে না।

শিস দিয়ে ডাকে। খুব সরলভাবে হাসে। চমৎকার কথা বলে। আর ওই সুন্দর চেহারা, যা দেখলে পুরুষেরও বুকে মায়া জন্মায়! ভাবতেই গায়ে একটা শিরশিরানি ওঠে অজিতের। বুকে ভয়। আর-একটা কূট তীব্র সন্দেহ মাঝে মাঝে সাপের দাঁতের মতো ঝিকিয়ে ওঠে বিষভরা। শীলার পেটে যে বাচ্চাটা.....!

একদিন বলল, সেনদা, আপনি তো বায়োলজিকাল সায়েন্স পড়েছিলেন, না?

সেনদা মাথা নেড়ে বলেন, পড়েছিলাম। সে-সব কিছু মনে নেই।

হেরিডিটি ব্যাপারটা কী বলুন তো!

সেনদা হেসে বলেন, তোমার কার্ল মার্কস কী বলেন? হেরিডিটি কি তোমরা তেমন মানো?

অজিত চিন্তান্বিত মুখে বলে, মার্কস অবৈজ্ঞানিক ছিলেন না। যা মানা যুক্তিসঙ্গত তা মানতেন।

কুমারস্বামীর ব্যাপার থেকে সেনদা অজিতের ওপর একটু চটা। মাঝে মাঝে মার্কসকে খুঁচিয়ে কথা বলেন। কিন্তু অফিসের অন্য সকলের মতোই সেনদাও মার্কস-বিষয়ে কিছুই জানেন না, কথা

বললেই বোঝা যায়। শুনে শুনে সবাই মার্কসিজম বা কমিউনিজিম সম্পর্কে এক-একটা মনগড়া ধারণা সৃষ্টি করে নিয়েছে। সেই ধারণা থেকেই তর্ক করতে আসে, আর হেরে যায়।

সেনদা একটু বুদ্ধি রাখেন, তর্কে না-গিয়ে বললেন, তুমি কী জানতে চাও?

ছেলে বাপের কাছ থেকে কী কী পায়। রক্ত? স্বভাব? সংস্কার?

সেনদা হেসে বলেন, সেই হেরিডিটি আর এনভিরনমেন্টের প্রশ্ন তুলবে নাকি? তা হলে একটা কথা বলে নিই। সেদিন রিডার্স ডাইজেস্টে একটা হিউমার পড়ছিলাম, একজন বলছে, হেরিডিটি আর এনভিরনমেন্ট বিচার করা খুব সোজা। তোমার সন্তানের মুখে যদি তোমার আদল থাকে তবে সেটা হল হেরিডিটি, আর যদি তোমার সন্তানের মুখে তোমার প্রতিবেশীদের কারও আদল থাকে তবে তা হল এনভিরনমেন্ট।

কথাটা শুনেই অজিত কেমনধারা হয়ে গেল। হাসির কথা, তবু সে হাসলও না তেমন। খুব অন্যমনস্ক আর অস্থির লাগছিল তার। সেনদা কিছু জেনে বলেনি, তবু তার মনের কোন গুপ্ত গভীরে ঠিক এইরকমই একটা প্রশ্ন ছিল। শীলার পেটের বাচ্চাটা...।

কোনওকালে কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে যায় না অজিত। হঠাৎ এক রবিবারে একা বেরিয়ে পড়ল। বহুদূর পর্যন্ত একা একা ঘুরল সাবারবান ট্রেনে উঠে, বাসে, হেঁটে। মনটা বড় অস্থির। ঘুরে ঘুরে সে অনেক ভাবল। আর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ টের পেল, পৃথিবীতে লক্ষ্মণ ছাড়া তার আর-একটাও আপনার জন নেই। এমন একটা লোক নেই তার নিজস্ব যার কাছে মনের সব দুঃখ-বেদনার কথা, সব সন্দেহ ক্ষোভ আর হতাশার বীভৎস চেহারাটা খুলে দেখানো যায়। এই চল্লিশ বছর ধরে প্রতিদিন সে কত মানুষের সঙ্গে মিশেছে, কত ঝগড়া ভালবাসা হয়েছে, তবু কেউ লক্ষ্মণের মতো আপন হল না, ওই যে শীলা, যার দেহের আনাচকানাচ পর্যন্ত তার মুখস্থ হয়ে গেছে, যার আলজিবের স্বাদটি পর্যন্ত তার জানা, তাকেও কত কথা গোপন করে চলতে হয়। পৃথিবীতে এখন এমন একজন মানুষকে তার চাই যে তার হৃদয় থেকে ওই সব বিষ হরণ করে নেবে। তাকে শুদ্ধ করবে। লক্ষ্মণ ছাড়া আর কে আছে? কিন্তু লক্ষ্মণ কত দূরে! কত ভীষণ দূরে। সে যেন মৃত্যুনদীর পরপার এক বিদেশ। কবে আসবি লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণের শেষ চিঠিটা এসেছে নিউইয়র্ক থেকে। খুব বেশি কিছু লেখা নেই। তবু একটা খুব জরুরি খবর লুকিয়ে আছে চিঠিটায়। লক্ষ্মণ নিউইয়র্কে একটা পেল্লায় ভাল চাকরি পেয়েছে, কানাডায় আর ফিরবে না। কিন্তু ওর বউ কানাডায় ফিরে গেছে, সে নাকি নিউইয়র্ক সহ্য করতে পারেনি। এটাই সবচেয়ে জরুরি খবর। এমন নয় যে ওর বউ ছেড়ে গেছে চিরদিনের মতো, কিংবা বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। তবু অজিতের প্রাণে একটা সুবাতাস লাগে। যদি তাই হয় তবে কি আবার দেশে ফেরার কথা মনে পড়বে লক্ষ্মণের? অজিতের কথা মনে পড়বে?

চিঠিটা সারাদিনে কত বার পড়ল অজিত: ছোট চিঠিটায় কত রহস্যময় সংকেত রয়েছে যেন। দুর্গ্রহগুলো সরে যাচ্ছে আকাশ থেকে, শুভগ্রহেরা সন্নিবেশিত হচ্ছে অজিতের ভাগ্যে। লক্ষ্মণ কি আসবে? চমকে ওঠে অজিত। সে তো ভাগ্য মানে না। তবু কি মানুষের সুসময়, দুঃসময় বলে কিছু নেই!

লক্ষ্মণের কথা ভাবতে ভাবতে শীলা আর সুভদ্রর কথা প্রায় ভুলেই গেল সে। কয়েকটা দিন লক্ষ্মণই রইল মন জুড়ে। খুব সুন্দর দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল সে লক্ষ্মণকে। লিখল...মেয়েমানুষদের কাছ থেকে আমরা কী চাই বল তো! কিছু ঠিক পাই না। আমরা ভাবি, বউ বুঝি আমার নিজস্ব মেয়েমানুষ। কিন্তু তাই কি কখনও হয়? আমি এক খণ্ডিত মানুষ, ও-ও এক খণ্ডিত মেয়ে। আমাদের ভাঙা অংশগুলো যদি ঠিক ঠিক জোড় না মেলে তবে? আমি ওকে সব দিতে পারি না, ও-ও পারে না। কী করে তবে এক হই বল তো!

গুছিয়ে লিখতে পারল না। কিন্তু খুব আবেগ দিয়ে লিখল। অনেকটা। লিখে একরকমের স্বস্তি পেল।

তবু একধরনের অবিশ্বস্ততার ওপরে তার গড়া সংসার এখন দাঁড়িয়ে আছে। যে সন্তান আসছে মায়ের কোল জুড়ে—সেই বা কে? এই কঠিন ক্রূর প্রশ্নের কোনও দিন সঠিক উত্তর হয় না। তাই অজিত বড় অস্থির। কেবলই সিগারেট খায়। ঘুরে বেড়ায়। অফিসের পর অনেকক্ষণ বসে তাস খেলে, কাজ করে, রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। খাওয়া কমে গেছে। ঘুম কমে গেছে। যতটুকু সময় বাড়িতে থাকে ততক্ষণ অবিরল ম্যাজিকের পর ম্যাজিক দেখায় একা-একা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বলে, সোরসারার ওঃ সোরসারার ইউ আর নট গড। তারপর মাথা নেড়ে বলে, আমার ওপর নেই ভুবনের ভার...। এক প্যাকেট তাস খুলে সে নিজেকে দেখায়, বাহান্নখানা তাস রয়েছে, পলকে সেই তাসটাই আবার উলটোবাগে মেলে ধরে দেখায় বাহান্নখানা তাসই এক, হরতনের বিবি। বিদেশি ম্যাজিক কার্ড। লক্ষ্মণ পাঠিয়েছে।

অজিতকে আজকাল বড় ভয় পায় শীলা। খুব নরম গলায় কথা বলে, খুব ভদ্র ব্যবহার করে। যেন অতিথি-সজ্জন কেউ। মাঝে মাঝে বলে, তোমার কী হয়েছে বলো তো!

কী হবে! অফিসে বড্ড কাজের চাপ।

শরীর ভাল আছে তো?

ভালই।

শীলা আর বেশি কথা বাড়ায় না। তাদের সম্পর্ক এইরকমই। কখনও আদরে সোহাগে উজ্জ্বল, উচ্ছল। কখনও-বা তারা পরস্পর প্রায় অপরিচিত। নিস্পৃহ।

ম্যাজিশিয়ান, চলো এক বার কুমারস্বামীর কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। কুমুদ বোস একদিন বলল।

অজিত খুব অন্যমনস্ক মুখ তুলে হঠাৎ হেসে বলল, যাব। আজই চলুন। বলেই উঠে পড়ল।

॥ তিপ্পান্ন ॥

ঘর-সংসারের যে-ছবিটা হারিয়ে গিয়েছিল সেটাই কি ফিরে পেলেন ব্রজগোপাল!

গেঁয়ো ছুতোরের তৈরি দুটো ভারী চৌকি ঘরে এনে ফেলেছে বহেরু। তোশক, মশারি, চাদর, বালিশ, সবই জোগাড় করে এনেছে। ফাঁকা ঘরটা সংসারের সামগ্রীতে ঠাসাঠাসি। ব্রজগোপাল দেখেন।

ননীবালা বলেন, একটা-দুটো দিনের জন্য এত ঝামেলা করছিস কেন বহেরু? মাটিতে খড়ের গদি পেতে দিব্যি শোওয়া যায়।

বহেরু চোখ কপালে তুলে বলে, একটা-দুটো দিন কী বলেন মা! তেরাত্তির কম সে কম থেকে যেতে হবে। কর্তামশাই একাবোকা পড়ে থাকেন, ওইভাবে জীবনটা কেটে গেল। এসে যখন পড়েছেন মা দুর্গা, একটু সব সিজিল মিছিল করে দিয়ে যান। ওঁর দেখবার কেউ নেই, আমাদের ছোঁয়া জলটুকু পর্যন্ত খান না। রোগেভোগে বড় মুশকিল।

ননীবালা উত্তর করেন না। এ লোককে কে দেখবে! কার দেখার তোয়াক্কা করেছে লোকটা?

হা-ক্লান্ত ব্রজগোপাল পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আহ্নিক সেরে নিয়েছেন। শুদ্ধবস্ত্রটা ছাড়ছেন এমন সময় মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে ননীবালা পাথরের বাটিতে কাটা পেঁপে সাজিয়ে আনলেন।

খাও।

এই কি খাওয়ার সময়!

তবে কখন খাবে?

এ সময়ে খাই না, একেবারে রাতে খই-দুধ খাব।

ননীবালা একটা শ্বাস ফেললেন, বহুকাল ঘর করেননি, তাই লোকটার অভ্যাস-টভ্যাসগুলো জানা নেই। বললেন, না খেয়ে-খেয়ে শরীরটা যাচ্ছে।

খেয়েই যায়। একটা বয়সের পর খাওয়ার সংযম ভাল।

আমার হাতে রান্না খাবে তো! না কি ছোঁয়া বারণ আছে?

উদাসভাবে ব্রজগোপাল বলেন, খাওয়া যায়।

রণেন ঘুম থেকে উঠল সন্ধে পার করে। এখানে ফ্যান নেই, ঘরটাতেও বেশ গুমোট, তবু বহুকাল বাদে রণেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। বড় এক শিশুর মতো ঘুম-চোখে উঠে বাবার দিকে চেয়ে রইল একটু। চোখ কচলে ফের দেখে একগাল হেসে বলল, বাবা!

ব্রজগোপাল উঠে এলেন কাছে। পিঠে হাতখানা রেখে বললেন, শরীরটা কেমন লাগে বাবা? ভাল?

রণেন মাথা নেড়ে বলে, ভাল।

তুমি বড় ভাল ছেলে বাবা। সংসার তোমাকে নষ্ট করছে।

রণেন চেয়ে থাকে বাবার দিকে। চোখে এখনও অবোধ ভাব। বলে, বাবা, এবার আমাদের কাছে চলুন।

ব্রজগোপাল একটু বিষণ্ণ হেসে বললেন, কেন, তোমরা কি সেখানে খুব সুখে আছ?

রণেন কথাটা হয়তো বুঝতে পারে না। হয়তো পারে। বলে, আপনাকে কে দেখবে এখানে?

ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে বলেন, বাপকুসোনা, আমাকে দেখার জন্য তো লোকের দরকার নেই, বরং তোমাদেরই দেখাশোনা করার মানুষ চাই।

অনেকদিন বাদে রণেন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কথা বলতে পারল। বলল, সেইজন্যই তো আপনি যাবেন। আপনি না দেখলে কে দেখবে আমাদের?

ব্রজগোপাল একটু হাসলেন, বললেন, আমার ভালমন্দের বুঝ কি তোমাদের বুঝের সঙ্গে মেলে? দু'দিন পর যখন মিলবে না, তখন আবার সম্পর্ক নষ্ট হবে। এই বেশ আছি। আমাকে বাবা ডাকার লোক আছে, এইটুকু জেনেই সন্তুষ্ট আছি।

যাবেন না? করুণস্বরে রণেন জিজ্ঞেস করে।

দূরে তো থাকি না। একদৌড়ের রাস্তা। যখনই মুশকিলে পড়বে তখনই চলে আসবে আমার কাছে। আমিও তো যাই মাঝে মাঝে।

দুঃখিত চিত্তে রণেন ঝুম হয়ে বসে রইল। ননীবালা বাইরে গেছেন। রণেন হঠাৎ জলভরা চোখ তুলে বলে, বাবা, সংসারে শান্তি নেই।

ব্রজগোপাল কথাটা আগেও শুনেছেন। একটু দৃঢ়স্বরে বললেন, শোনো। যেমন একটা সিঁড়ি, তা বেয়ে ওঠাও যায়, নামাও যায়, সংসারও তেমনি। তোমার বউ খারাপ, তুমি ভাল, এ-কথা আমার মনে হয় না। আসলে তোমরা দু'জনেই ভালমন্দের মানুষ। জোড়টা ঠিক মেলেনি, তাই অশান্তি। হিসেব করলে আমিও সংসারকে শান্তি দিতে পারিনি, তাই পালিয়ে আছি। লোকে হাসে। তোমারও সংসার টানতে কত কষ্ট হয়েছে। অশান্তি আছে তো আছে, তুমি মনটা অন্য দিকে ফেলে রাখো।

একদিন গায়ে হাত তুলেছিলাম বাবা।

ব্রজগোপাল তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধস্বরে বলেন, ও আর কোরো না। বলে গলাটা একটু নামিয়ে ব্রজগোপাল বলেন, আজকালকার মেয়েরা স্বামীকে পুরোপুরি একলা-একলি চায়, বুঝলে। স্বামীটা যে সংসার বা সমাজের একজন তা হিসেব করে না। কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। স্বার্থপরতার যুগ তো, নিজের বুঝ বুঝে নিতে চায়। তুমি ও-রকম ভাবটা হোয়ো না বাপকু। বউয়ের গালে ঠোনা মেরে আদর দেখাবে, তলে তলে নিজের কাজ সারবে। হাত-পা চালালেই কি পুরুষসিংহ হওয়া যায় বাবা! বরং ওতে মেয়েমানুষ আরও বেহাত হয়ে যায়।

খানিক চুপ করে থেকে বলেন, বাবা যেতেন বিদেশে। সারাটা বছরই প্রায় বাইরে বাইরে কাটত। মা শতখানটা হয়ে সংসার চালাতেন। এখনকার মতো সব খুদে সংসার তো নয়। বিশ-ত্রিশ পাত পড়ত এক-এক বেলায়। বলতেন, বিয়ে হয়ে এসে যেন সংসার-সমুদ্রে পড়ে গেলাম। পরের ঘরের মেয়ে, তাকে তো কেউ ছেড়ে কথা কইবে না। মা দেখলেন, বেশ প্রতিকূল অবস্থা। কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্রী ছিলেন না। কোমর বেঁধে সবাইকে খুশি করতে লেগে গেলেন। শ্বশুর কেমন রান্না ভালবাসে, ভাসুরের কোনটা পছন্দ, দেওরদের কোন দিকে ঝোঁক। এই করতে করতে নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। ঝগড়া করে নয়, লোকের প্রীতি অর্জন করে করে বছর খানেকের মধ্যে দেখা গেল সেজ-বউ না হলে কারও চলে না। তিন দিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে পারেন না, শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক গিয়ে হাজির হয়। নিজেও পারতেন না থাকতে। এইভাবেই দু'বছরের মাথায় শাশুড়িকে পর্যন্ত বশ করে ফেললেন। বড় জায়েদের টপকে সংসারের কর্ত্রী হয়ে গেলেন। তখন বাবা বিদেশে থাকতে মা'র দেখেছি সব সময়ে সেই মানুষের চিন্তা। আমরা মায়ের মুখেই বাবার কথা শুনে শুনে মানুষটাকে চিনেছিলাম। তাঁর স্বভাব, চরিত্র, পরোপকারিতা সব। বাবা রাগী মানুষ ছিলেন, রাগটাগ করতেন বটে কিন্তু মা রা কাটতেন না। বাবাকে ঘিরে তিনি সম্মোহিত থাকতেন বেশ। সেই বাবাও মায়ের প্রশংসা করে বেড়াতেন পাঁচজনের কাছে। আমাদের শরীর স্বাস্থ্য এ-সবের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি কখনও। মা কতগুলো নিয়ম আমাদের মন-সই করে দিয়েছিলেন। নাকে, মুখে হাত দিলে হাত ধোয়া, হাত-পা না ধুয়ে ঘরে না-ঢোকা, পরিষ্কার থাকা—এমনি অনেক। আজও মেনে চলি। অসুখবিসুখ হলে মা গিয়ে পাতাটাতা বেটে ওষুধ করে দিতেন। ছেলেপুলেদের জন্য সজাগ থেকে থেকে তাঁর স্বাভাবিক জ্ঞান অনেক বেড়ে যায়। পরে দেখেছি, তাঁর কাছে ওষুধ নিতে পাড়ার বউ-ঝিরা এসে ভিড় করে। এত কাজ করতেন সারাদিন, তবু কখনও তাঁকে অপরিচ্ছন্ন দেখিনি, মাথার ঘোমটাটি পর্যন্ত খসত না। আর কী করে যে একা হাতে অত কাজ করতেন সে এক রহস্য। আর সব কিছুর মধ্যেও তাঁর ছিল বাবার চিন্তা। একটা দোলন-চাঁপা গাছ বাবা রুয়ে গিয়েছিলেন, সারা বছর সেটাতে জল দিতেন মা, আর প্রতিদিন তাতে জল দিতে গিয়ে তাঁর একটা ফুস করে শ্বাস বেরিয়ে পড়ত। বুঝলে বাবা, সেই মাকে দেখে আমি মেয়েমানুষ চিনেছি। তাই আমার সহজে মন ভরে না। কিন্তু মেয়েমানুষ দেখলে আজও মাথাটা নুয়ে পড়ে। মনটা 'মা' বলে ডেকে ওঠে। মায়ের কথা শুরু করলে আর থামতে ইচ্ছে করে না। রেলগাড়ির মতো কেবল কথা বেরিয়ে আসতে থাকে গলার নল বেয়ে।

ব্রজগোপাল সামনের দিকে চেয়ে ছিলেন, সেখানে একটা তাজমহলের ছবিওলা বাংলা ক্যালেন্ডার। কিন্তু সেই ক্যালেন্ডার ভেদ করে বহু দূরে মগ্ন হয়ে আছে চোখ। বললেন, বাবা, পৃথিবীজোড়া ভিড় দেখছ, কিন্তু লক্ষ করে দেখো মানুষ কত কমে গেছে। কাজের মানুষ, চরিত্রবান মানুষ, ব্রাহ্মী মানুষ আর চোখে পড়ে না। স্ত্রীর ভিতর দিয়ে স্বামীই প্রসূত হয়, তাই স্ত্রীকে বলে জায়া। স্ত্রী সন্তানকে মেপে দেয়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর টান ও গুণগ্রহণমুখরতা যতটা এবং যেমন, ততটুকু ও তেমনই সে পারে সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত করতে। এটাই হচ্ছে পরিমাপ। তেমন বিয়েও হয় না, তেমন ভালবাসাও দেখি না। তাই 'শ্রদ্ধাহীন' প্রবৃত্তিপরায়ণ, ক্ষীণ মস্তিষ্ক আর প্রতিভাহীন মানুষে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে।

ননীবালা চা করে নিয়ে এলেন। রণেনকে দিলেন, ব্রজগোপালকেও।

ব্রজগোপাল একটু ইতস্তত করছিলেন দেখে ননীবালা বলেন, চা খাও না?

ব্রজগোপাল হঠাৎ উদার হাসি হেসে বলেন, দাও, করেছ যখন।

দরজার কাছে কোকা এসে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, দাদাবাবু, বেড়াতে যাবেন না?

রণেন মাথা নাড়ল,যাব।

চলেন। খালপাড় থেকে ঘুরে আসি।

কোকার সঙ্গে রণেন বেরিয়ে গেলে ব্রজগোপাল আর ননীবালা একা হলেন। বহুকাল এ রকম একা ঘরে দু'জনের দেখা হয়নি।

বাতিটা একটু কমিয়ে ননীবালা চৌকির একধারে বসে আছেন। ব্রজগোপাল এখনও অন্যমনস্কভাবে চেয়ে আছেন সুমুখে। বেড়াল ঢুকে রণেনের এঁটো কাপটা চেটে পায়ের ধাক্কায় টং করে ফেলে দিয়ে গেল। শব্দটা কেউ খেয়াল করলেন না।

ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ সব আসা হল কেন? জমিজমা সব বিক্রি করে দিতে নাকি! না ধানের দায় বুঝতে!

তোমার তো ও-সবই মনে হবে। আমি স্বার্থ ছাড়া আর-কিছু বুঝি না নাকি!

ব্রজগোপাল ক্ষণেক চুপ করে থেকে বলেন, সেও খারাপ কথা নয়। কেউ যদি তোমরা না-ই আসতে পারো তো বরং বিক্রি করে দেওয়া ভাল। আমি আর ক'দিন। বিক্রি করতে চাইলে বহেরুই কিনে নেবে।

ননীবালা ঘোমটাটা তুলে দিয়ে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বলেন, সে-সব ভাবনা ছিল না। রণো তোমার জন্য হঠাৎ অস্থির হল। কী সব কুস্বপ্ন দেখেছিল, মুখে আনা যায় না। এক বার চোখের দেখা দেখতে আসা।

ভাল। ব্রজগোপাল বললেন।

শরীর তো ভাল দেখছি না।

শরীর তো পুষে রাখার জিনিস নয়। কাজে লাগাতে হয়। সব সময়ে তেল চুকচুকে কি রাখা যায়?

কাজ তো জানি। পরের গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে বেড়ানো।

সেইটেই আসল কাজ। নিজের গোয়াল যদি না থাকে, ধোঁয়া তো দিতে হবে।

ননীবালা এই চুরি-ছিনতাইয়ের দিনেও মোটা বালা পরেন, ছ'গাছা করে চুড়ি রয়েছে হাতে, গলায় একটা বিছে হার। গয়নাগাটির একটু শব্দ হল, শাড়ির মাড় খস খস করল, শ্বাসপ্রশ্বাসের একটু টান শোনা গেল। অর্থাৎ ননীবালা আছেন। এই অস্তিত্বটুকু কতকাল টের পাননি ব্রজগোপাল।

অন্ধকারে এক বার ঠাহর করে ননীবালাকে দেখে ব্রজগোপাল বললেন, ছেলেরা সব কে কেমন?

তোমারই ছেলে।

বনিবনা করে থাকতে পারবে?

কে! আমি, না ছেলেরা?

সকলের কথাই জিজ্ঞেস করি।

আমার আর থাকার কী! বাড়িটা তুলতে যদি পারি তো দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে যাব, দুই ছেলে থাকবে।

ভাগাভাগির কথা আগেভাগেই ভেবে রেখেছ?

সেইটাই তো বুদ্ধির কাজ। বলে ননীবালা উঠে পিক ফেলে এলেন বাইরে। বললেন, আগে থেকেই ভাগাভাগি করে দেওয়া ভাল।

ব্রজগোপাল বললেন, তার মানে, তোমার ছেলেরা মানুষ হয়নি।

ননীবালা পুত্রগতপ্রাণ। এ-কথার একটা কড়া উত্তর দিতেন। কিন্তু এমন সময়ে নয়নতারা বাইরে দরজার কাছে এসে ডাকল। ভারী মিষ্টি ডাকটি—মা!

কী রে? ননীবালা উঠলেন।

বাবা মাছ পাঠিয়ে দিল। রান্নাঘরে রেখে যাব?

দেখি। ননীবালা বাতিটা তুলে নিয়ে গিয়ে দেখেন, ওমা! এ কত মাছ রে! এত খাবে কে?

এই তো ক'খানা।

তোদের বাপু বড্ড গেঁয়ো ভাব। বলেন ননীবালা। তবু খুশি ঝরে পড়ে গলায়। কলকাতার বাড়িতে আজকাল আর বড় মাছের টুকরো আসে না। রণেনটা বড় মাছ ভালবাসে। কিন্তু সোমেন নয়। সে কেবল মুরগি মুরগি করে পাগল। বললেন, রান্নাঘরে রাখ। আসছি।

ননীবালা ঘরে আলোটা রেখে চলে গেলেন রান্নাঘরে। রান্নাঘরই আজকাল ভাল লাগে তাঁর। সেখানে বসে নয়নতারাকে ডেকে বললেন, তুইও বসে থাক না, কথা বলি। তোর স্বামীটা নাকি আবার বিয়ে করেছে শুনলাম!......

ঘরে বসে ব্রজগোপাল সেই কথার শব্দ শোনেন। অদ্ভুত লাগে। ননীবালা পাশের রান্নাঘরে বসে কথা বলছেন, এ যেন ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। এ কি সম্ভব? এ কি হয়?

রাত্রিবেলা শোওয়ার সময় ননীবালা বললেন, ও-বাড়িতে কী হচ্ছে কে জানে! একা বীণার হাতে সংসার।

কী করবে? ব্রজগোপাল মাচানের বিছানায় শুয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেন।

কালই চলে যাব।

যেয়ো, ব্রজগোপাল বলেন। একটা শ্বাস চেপে রাখেন কষ্টে।

॥ চুয়ান্ন ॥

তিন বিঘের ওপর বহেরু একখানা বাগান করেছে। চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা ইটের দেওয়াল ঘেরা। ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন ননীবালা। কাঁঠালের কী ফলন। আগাপাশতলা ছেয়ে আছে ফলে। গাছের গোড়ায় খেজুর কাঁটার বেড়।

বহেরু বলল, শেয়ালের জন্য নয় মাঠান, কাঁটা দিলে ফলন ভাল হয়। গাছ শিউরে ওঠে তো।

জামরুল দেখে অবাক মানেন ননীবালা। আমগাছে যত পাতা তত ফল বলে ভ্রম হয়। বললেন, তোর হাতে মন্ত্র আছে বহেরু। কী ফলন! চোখ জুড়িয়ে যায়। বহেরু হাসে। বলে, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ।

গাছে ফল ফলে, এ বহুকাল দু'চোখে দেখেননি ননীবালা। কলকাতায় সবই মেলে, কিন্তু সে শুধু ফলটুকু। গাছের ফল গাছে দেখার আনন্দই আলাদা। কলকাতায় আসার আগে পর্যন্ত গাছগাছালির সঙ্গে যাহোক সম্পর্ক ছিল। এখন পায়ের নীচে কদাচিৎ মাটির স্পর্শ পান।

ঘুরে ঘুরে ঘেমে গেছেন। মুখ-চোখ লাল। কোথা থেকে একটা ছাতা নিয়ে এসে নয়নতারা পাশে পাশে চলতে থাকে, ননীবালার মাথায় ছাতাখানা ধরে। ভারী লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটা। মুখখানায় কী লাবণ্যের ঢল! বহেরুর ঘরে সবই বেশ ফলে।

হাঁটতে হাঁটতে ননীবালা বলেন, তুই কেন হুট করে বুড়ো হয়ে গেলি বহেরু? চেহারাটা কেমন দুলদুল করে।

বহেরু গম্ভীরভাবে বলে, সময় হল। খোলস পালটাবে।

বহেরু নিয়ে গিয়ে বাস্তুজমিটা দেখাল। বলল, এইখানে কর্তা বাড়ি করবেন বলে ঠিক ছিল।

বলে খুব প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল ননীবালার মুখের দিকে।

ননীবালা ফস করে বললেন, এখানে জমির দাম কী?

বহেরু শ্বাস ফেলে বলে, গাঁ-গঞ্জ জায়গা, দাম আর কী হবে!

তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় রোদ পড়েছে। একটা পাতকুয়া। কয়েকটা গাছ। ননীবালার চোখে বালি পড়ল বোধহয়। চোখটা করকর করে ওঠে। মনটাকে শক্ত করে বললেন, জমির দাম তো সব জায়গায় বাড়ছে।

বহেরু একটু ভয়-ভয় চোখে তাকায় ননীবালার দিকে। তারপর গলাখাঁকারি দিয়ে বলে, কর্তামশাইয়ের জমি, তিনি তো বেচবেন না। দাম যা-ই হোক।

ননীবালা বে-খেয়ালে বলে ফেললেন, চিরকাল কি সে-ই থাকবে। জমিটা ভোগ করবে কে?

বলেই ননীবালা অন্তরে শিউরে ওঠেন। কী কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। মনটা কত বড় পাপী। সামলে নিয়ে বললেন, আমিও থাকব না, তুইও থাকবি না। তাই এখন ছেলেপুলেদের সুখ-সুবিধে বুঝে এ-সব জমি-জোত করতে হয়। দেখাশোনার কেউ না থাকলে, বাড়িঘর না হলে এ জমি ধুয়ে জলটা খাবে কে? বেচবে না বলে গোঁ ধরলে কি হয়?

বহেরু শুনে হঠাৎ তার বুড়ো মুখে যুবকের হাসি হেসে মাথা নাড়ল। বলল, কর্তারে বোঝায় কে?

তুই বোঝাবি।

উরে বাস রে। এ-সব বললে খেয়ে ফেলতে আসেন।

পাশ থেকে নয়নতারা হঠাৎ তার নরম গলায় বলে, মা, জমিটা ব্রজকর্তা ষষ্ঠীপদর নামে লিখে দিয়েছেন।

ঠিক বুঝতে পারেন না ননীবালা। হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, কে? কার নামে লিখে দিয়েছে বললি?

ষষ্ঠীপদ। নিবারণী দিদির ছেলে। ওই যে যেটা সবসময়ে ব্রজকর্তার কাছে ঘুরঘুর করে আর ছড়া কাটে।

ও। বলে স্তম্ভিত হয়ে থাকেন ননীবালা। বহুকষ্টে ভিতরের জ্বলুনিটা সামলে নিয়ে বলেন, কেন?

বহেরু একটা ধমক দিল নয়নকে। বলল, তোর এ-সব খোলসা করে বলার দরকার কী?

ননীবালা একটু কঠিন চোখে বহেরুর দিকে চেয়ে বলে, আমার কাছে লুকিয়ে কী হবে? লুকোস না। আর কী কী লিখে দিয়েছে বল।

উত্তরটা নয়নতারাই দিল, আর কিছু নয়। ষষ্ঠীপদর বাপ তো এখানেই ঘরজামাই থাকে। তার কিছু নেই। কপিলদাদা কোকাভাই সব ঠিক করেছে ওদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। তাড়িয়ে দিলে আর যাবে কোথা, জায়গা তো নেই, পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবে। ব্রজকর্তা বড় ভালবাসে ষষ্ঠীকে। তাই মায়া হল, লিখে দিলেন।

খোল বগলে দিগম্বর চলেছে। বাদামতলা থেকে ছেলেপুলেরা পিছু নিয়েছে, হাততালি দিয়ে খ্যাপাচ্ছে—খোল হরিবোল, খোল হরিবোল.....

দিগম্বর গালমন্দ পাড়ে না। ভারী অসহায় বোধ করে, আর ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে আর এমন নির্জন জায়গা খুঁজে পায় না দিগম্বর যেখানে নিরিবিলিতে খোলখানা নিয়ে বসবে। আজকাল খোল নিয়ে বসলে গুরুর ছায়া এসে পড়ে খোলে। আশ্চর্য সব শব্দ ফোটে। হরি-হরি বলে খোল কাঁদে, খোল আহ্লাদে আটখানা হয়। কোন মহাজগৎ থেকে সব অজানা বোল ভেসে এসে খোলের শব্দের মধ্যে ফুটে ওঠে। দিগম্বরের বাহ্যজ্ঞান থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসলীলা করেছিলেন, কুঞ্জবনে গোপিনীদের সঙ্গে খেলা করতে করতে কোথায় হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন ঠাকুর। চার দিকে তখন কেবল আলো, আর স্বর্গীয় এক শব্দ। হা-কৃষ্ণ কোথা-কৃষ্ণ বলে পাগল গোপিনীরা কৃষ্ণকে খোঁজে, পায় না। পাবে কী করে! কৃষ্ণ যে তখন শব্দব্রহ্মে মিলিয়ে আছেন। তাঁর অস্তিত্বের নাদ শুধু শব্দ হয়ে ঘিরে আছে তাদের। ব্রজবামুন বলেন, রাসলীলা মানে হল শব্দলীলা। দিগম্বর সেটা আগে বুঝত না, এখন বোঝে শব্দ কখন ভগবান হয়ে ওঠে, শব্দ কখন যে দুনিয়াছাড়া করে দেয় দিগম্বরকে। বাবা রে, কোথা থেকে যে সব শব্দ এসে ভর করে খোলে। দিগম্বর তাই আজকাল মাঝে মাঝে খোলখানা জড়িয়ে ধরে, তার গায়ে মাথা ঘষে, কাঁদে আর বলে, আরবার যেন শব্দ হয়ে জন্মাই হরি হে।

ট্যাটন ছেলেগুলো পিছুতে লাগে। কোথাও বসতে দেয় না। যেখানেই গিয়ে খোল নিয়ে বসে

দিগম্বর সেখানেই গিয়ে হাততালি দিয়ে নেচে নেচে চেঁচায়—খোল হরিবোল, খোল হরিবোল...। শব্দের যোগ ছিঁড়ে গেলে বড় যন্ত্রণা হয়। চারধারে একটা ময়লা পৃথিবী, তার মধ্যে যেন মুখ থুবড়ে ভাঙা হাঁড়ির মতো পড়ে আছে, এমন মনে হয়।

কতবার বহেরুকে ডেকে বলেছে, ভাইয়ের পো, তোর গাঁয়ে এত লোক আলো কমনে? আগে তো দেখতাম না এতসব কাচ্চা-বাচ্চা। বড় ঝঞ্ঝাট করে। আমারে শব্দ শুনতে দেয় না।

বহেরু বলে, গুষ্টি তো বাড়েই খুড়ামশাই, কবো কী? দেবোনে আপনারে একটা টংগী ঘর করে। মাচানের উপর বসে বাজাবেন, কেউ নাগাল পাবে না।

সেই ঘরটা আর করে দেওয়া হয়নি।

পিছনে কাচ্চা-বাচ্চা লেগেছে, দিগম্বব খোল-বগলে ছুটে আসছিল বাদামতলা থেকে। ননীবালার মুখোমুখি পড়ে হকচকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি রাস্তা থেকে নেমে দাঁড়াল পাশে। হাত দু'খানা জোড় করে মহা অপরাধীর মতো বোকা মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠোঁট দু'খানা কাঁপছে। দুনিয়াতে এই যে আছে দিগম্বর, এই যে শ্বাস টানে ছাড়ে, রাস্তায় পা ফেলে হাঁটে এ-সবই তার নিজের কাছে মহা মহা আস্পদ্দার কাজ।

বাচ্চা-কাচ্চাগুলো একটু পিছনে আসছিল, হাততালি দিয়ে মহানন্দে খোল হরিবোল বলতে বলতে। বহেরুরই নাতিপুতি জ্ঞাতিগুষ্টি সব। তবু বহেরু হঠাৎ হাঁকাড় ছেড়ে দৌড়ে যায়। বড় বড় মাটির ঢেলা আর চাঙড় তুলে দুই হাতে বাচ্চাগুলোর দিকে ছুড়তে থাকে। বাচ্চাগুলো ভয়ে আর্তনাদ করতে করতে দৌড়য়। দুটো-একটা পড়ে যায়। একটার ন্যাড়ামাথায় বহেরুর ঢেলা গিয়ে লেগে ভেঙে পড়ে। সেটা মাথায় হাত-চাপা দিয়ে 'বাপরে' বলে ইঞ্জিনের মতো বেগে ছোটে। চারধারেই নানাজনের ঘর-গেরস্তালি, গাছগাছালি, সে-সবের মধ্যে পলকে মিলিয়ে যায় সব। দুটো-একটা নেহাত পুঁটে পুঁটে শিশু পালাতে পারেনি, গুট গুট করে দৌড়োচ্ছে। বহেরু তাদের ধাওয়া দিয়ে চেঁচায়, সুমুন্দির পো, খুন করে ফেলব। সেই হাঁক শুনে তারা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

বহেরু হাত ঝেড়ে ফিরে আসে, গামছায় মুখ মুছে দিগম্বরের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে বলে, যান খুড়োমশাই, বাগানের মধ্যে চলে যান, জামতলায় বেশ ছায়া আছে। বসে বাজান। সুমুন্দির পোয়েরা আপনার খোলের দাম কী বুঝবে। ওদের কানে গু-মুত ঢুকবে। আপনি যান।

আহা রে! ননীবালা বলেন, বাচ্চাগুলোকে অমন ধাওয়া দিলি। তুই বড় পাষণ্ড বহেরু।

ওগুলান মানুষের বাচ্চা নাকি মাঠান? সব কাউয়া। পাপীর বংশ তো। গুণী মানুষের মর্যাদা জানে না।

তোর সব বাড়াবাড়ি। বাচ্চা মানুষ, ওরা কি ও-সব বোঝে!

বড় হলেও বুঝবে না। আমার ছেলেগুলান তো সব পাকাপোক্ত মানুষ এখন, তারাই কি বোঝে! আমি চোখ বুজলে খুড়োমশাইকে তাড়াবে, বামুনকর্তারে উচ্ছেদ করবে, যত সব আশ্রয় নিয়ে আছে তাদের হাঁকিয়ে দেবে। তারপর নিজেরা সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই করবে এখানে। আমার দাপে এখনও কিছু করতে পারে না।

ননীবালা হেসে বলেন, তোর এত জ্ঞাতিগুষ্টি, অতিথি-টতিথি, জোটে কোত্থেকে? সবাইকে খাওয়াস-ই বা কী করে?

আমার গরজেই জোটে সব। মানুষের বড় শখ আমার। ব্রজকর্তাও কন—বহুপালক হও, বহুপোষক হও। তাই করি। গুণী মানুষ পাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়। কলের যুগ তো, গুণীরা সব মরে হেজে শেষ হয়ে যাচ্ছে। খুড়োমশাই বা ব্রজকর্তা গেলে আর তেমন মানুষ পাওয়া যাবে না। এই সেদিনও উজিরপুরের এক কামারকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছিলাম। ওদের পূর্বপুরুষ নাকি

এমন পোলাদ দিতে পারত যে বিলিতি ইস্পাতও হার মানে। এমন কামান বন্দুক তৈরি করত যে শ' শ' বছরে জং ধরত না। বংশগত বৃত্তি, ব্যাটা কাজও জানে, কিন্তু সে এখন হাওড়ার ফ্যাক্টরিতে বাঁধা মাইনে পায়, এল না।

বলে বহেরু দুঃখমাখা মুখে তাকায়। ননীবালা বোঝেন, এ-সবই ব্রজগোপালের মাথার পোকা, এর মাথায় ভর করেছে।

বাস্তুজমিটা ষষ্ঠীচরণের নামে লিখে দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবেন, ননীবালার এমন ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ব্রজগোপাল ঘরে ছিলেন না। দুপুরে ফিরলেন। স্নান করে খেতে বসলেন বাপ-ব্যাটায় পাশাপাশি। সে এক সুন্দর ছবি। বহুকাল মানুষটাকে নিজের হাতে খাওয়াননি ননীবালা। কথাটা বুকে ঠেলাঠেলি করছিল, অম্বলের ঢেকুরের মতো উঠে আসত জিভে, ননীবালা কষ্টে ঠেকিয়ে রাখলেন। ব্রাহ্মণ মানুষের দুপুরের খাওয়াটা নষ্ট হয় যদি।

খেয়ে উঠতে না উঠতেই এলেন ফকির সাহেব। মধ্যবয়সি, বেশ ভাল চেহারা, গালে ছাঁটা দাড়ি, চোখে সুরমা, মাথায় ফেজ, পরনে সাদা লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি। রণেনকে দেখতে এসেছেন।

কিন্তু রণেনকে দেখার ধার দিয়েই গেলেন না, ব্রজগোপালের দেখা পেয়েই গম্ভীর হয়ে বললেন, মোস্তাফা চরিত আর কোরাণে যে নূর আর আওয়াজের কথা আছে সে-সম্বন্ধে আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আর ইমান মোফাচ্ছেলে আছে—আল্লাহ, তাঁহার ফেরেস্তাগণ, কেতাবসকল, প্রেরিত রসুলগণ, কেয়ামত তকদীর এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন লাভ—এ সকলের ওপর আমি ইমান আনলাম। বিশ্বাস করলাম। কলেমায় একেশ্বরবাদের কথা বলা হচ্ছে। আর্যরাও তাই। 'এরিয়া' কথাটার মানে খুঁজে দেখলাম একেশ্বরবাদ। একেশ্বরবাদীরাই এরিয়ান। আল্লাহ নির্গুণ ঈশ্বর। রসুল ঈশ্বরের মূর্ত অভিব্যক্তি। আর্য হিন্দুদের পুরুষোত্তম। ইসলামে কলেমা তৈয়ব রসুল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন। রসুল ভিন্ন আল্লাহ অব্যক্ত। গীতায় অব্যক্তের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি কলেমারই মর্মবাণী ঈশ্বরের ও ঈশ্বরের প্রেবিত পুরুষ রসুলের প্রতি পূর্ণ আত্মনিবেদন, আর এই আত্মনিবেদনই ইসলাম। ইসলামের সঙ্গে আর্যধর্মের খুব মিল। আপনি বলছিলেন ইসলামই আর্যধর্ম—যা বেদে ও কোরাণে, বব্বুর, তৌরাৎ, ইঞ্জিল এইসব ঐশী কেতাবেও প্রচারিত হয়েছে।

ব্রজগোপাল মুখোমুখি বসে খুব নিবিষ্টভাবে শুনছিলেন। একটা শ্বাস ফেলে বললেন, ইমান মোফাচ্ছেলে পুনর্জীবন লাভের কথা আছে না?

ফকিরসাহেব বলেন, প্রেরিত পরম্পরা আছে, ধর্মগ্রন্থ, অদৃষ্ট ফেরেস্তা, আর দেবদূতদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, এই হল ইমান মোফাচ্ছেল। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ হতে পারে কি! আর যদি রোজ কেয়ামতের কথা তোলেন—

এইভাবে নিবিষ্ট আলোচনা চলতে লাগল। ননীবালা পান খেলেন, রণেন বাইরে গিয়ে দু'বার সিগারেট খেয়ে এল। আলোচনা তবু শেষ হয় না। দু'জনেই একটা জায়গায় আটকে গেছেন, মিল হচ্ছে না। কিন্তু দু'জনেই মিল বের করার জন্য নানা আলোচনা করছেন। পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান এক কি না, পোলশেরাৎ আর বৈতরণী কি অভিন্ন, এইসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। সেইসব কথার মাঝখানে ননীবালা বাধা দিয়ে বললেন, ফকির বাবা, আমার ছেলেটাকে দেখবেন না? আমরা সন্ধের ট্রেনে চলে যাব।

ফকিরসাহেব এই প্রথম হাসলেন। চমৎকার হাসিটি। বললেন, হ্যাঁ মা, দেখব। এই বামুনবাবার সঙ্গে আমার খুব জমে। দুই ফকির তো।

রণেনকে একঝলক দেখলেন ফকির সাহেব। মুখখানা গম্ভীর করে ফেলেছেন ফের। একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, কী হল বাবা?

ননীবালা আগ বাড়িয়ে বলেন, ওর মাথার অসুখ।

বটে! বলে হাসলেন ফকিরসাহেব। বলেন, মা, ও কি পাগলামি করে?

ননীবালা উত্তর দিতে পারেন না। কারণ রণেন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। কী করে বলেন যে ও পাগল! রণেন তা হলে ভীষণ ঘাবড়ে যাবে।

তাঁকে সে-দায় থেকে উদ্ধার করে ফকিরসাহেব বলেন, কেউ কেউ পাগল সাজে মা।

না বাবা, ও তা নয়।

ফকিরসাহেব হাত তুলে বলেন, সেও আমি জানি।

বলে কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে চুপ করে রইলেন ফকিরসাহেব।

ননীবালা হাতপাখা নেড়ে তাঁকে বাতাস দিচ্ছিলেন। ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বললেন, কোনও কোনও মানুষের মধ্যে পাগল হওয়ার একটা ইচ্ছে থাকে। অবশ্য ঘুমন্ত ইচ্ছে। সে নিজেও হয়তো জানে না যে, মনের গভীরে ও-রকম একটা ছোট্ট চাওয়া আছে। কখনও কখনও সেই ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দেখবেন মা, দুর্বল মনের লোকেরা অনেক সময়ে সংকটে পড়লে পাগল হয়ে যায়। ওটা ঠিক রোগ নয়, গা-ঢাকা দেওয়ার উপায়। কিন্তু যখন পাগল হয় তখন খাঁটি পাগলই হয়। আমারও এক বার হয়েছিল—

বলে ব্রজগোপালের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, রঘুনাথপুরে এক পাগল ছিল। লোকে বলত সে নাকি গুপ্ত সন্ন্যাসী। যা বলে তা হয়। মাথায় একটা হাঁড়ি নিয়ে ঘুরত, লোকে সেই হাঁড়িতে চাল ডাল তরকারি মিষ্টি সব দিত। দিনের শেষে হাঁড়ির সব জিনিস একসঙ্গে সেদ্ধ করে খেত। তার পিছু পিছু খুব ঘুরলাম ক'দিন বিভূতি দেখব বলে, কিছু দেখি না। একদিন নদীর ধারে বসে আছি একা, মনটা খুব উদাস, কী ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে ডেকে উঠল একটা ইচ্ছে—আচ্ছা, পাগল হলে কেমন লাগে। যদি পাগল হই তো কেমন হয়! সেই যে মাথায় ভূত চাপল তো চাপলই, ইচ্ছে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে উঠল, চারিদিকটা কেমন ওলটপালট দেখতে লাগলাম। সবই অবাস্তব মনে হতে লাগল। আল্লা-রসুল ডাকতে ডাকতে মাথা চেপে ধরলাম। কিন্তু সে ইচ্ছে বান্দার বাচ্চার মতো মাথায় ভর করে আছে। তখন কেবল চিৎকার করে বলছি—না আমি পাগল হতে চাই না। চাই না। সে বিকেলটা বেঁচে গেলাম, কিন্তু ইচ্ছেটাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিয়েছি, তাই সহজে সে আমাকে আর ছাড়ে না। ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ স্বপ্ন দেখি, পাগল হয়ে যা-তা করে বেড়াচ্ছি। অমনি উঠে বসে ভয়ের কালঘাম ছাড়ি, জেগেও বুঝতে পারি মনের মধ্যে পাগলামির পোকা কিলবিল করছে। এইরকম ভাবখানা কিছুদিন চেপে থাকতে থাকতে একদিন আর পারলাম না, সকালে উঠে একদিন বেমক্কা পাগলামি শুরু করে দিলাম। বহু ওষুধপত্রে মাসখানেক বাদে সেটা সারে।

ননীবালা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওর টাইফয়েডের পর ছেলেবেলায় এক বার সত্যিকারের হয়েছিল।

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বলেন, এটা সে-রোগ নয়। ভাববেন না, ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেরে যাবে।

বলে রণেনের দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসলেন, হাসিটা যেন রণেনের সঙ্গে একটা গোপন বোঝাবুঝির হাসি। কী একটা অভিনয়, ষড়যন্ত্র, কী একটা যোগসাজশ হয়ে গেল কে জানে। রণেনও একটু হাসল। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

যাওয়ার সময়ে ফকিরসাহেব ব্রজগোপালকে বললেন, আবার দেখব, রোজ কেয়ামতের মধ্যে পুনর্জন্মের একটা গন্ধ পাচ্ছি বটে।

কোরাণেও আছে। ব্রজগোপাল সোৎসাহে বলেন, একটু দেখবেন।

ফকিরসাহেব ঘাড় নেড়ে চলে গেলেন।

এতকিছুর পরও ননীবালার বুকের মধ্যে কথাটা কাঁটার মতো কুটকুট করে। বাস্তুজমির কথা ভোলেননি। কিন্তু রণেনের সামনে তুলতে ইচ্ছে করে না। বড় নরম মন ছেলেটার। মা-বাপের

ঝগড়ায় ফের যদি মনটা বিগড়োয়। তার ওপর আজই চলে যাবেন। যাওয়ার আগে তেতো করে যেতে ইচ্ছে হয় না।

বুকে এই চাপ দুশ্চিন্তাটা নিয়েই দুপুরে একটু গড়িয়ে নিলেন ননীবালা।

দুপুরে গড়িয়ে উঠেই টের পেলেন রোদের মুখে কালো ঠুলি পড়েছে। বাইরে এসে দেখেন, স্তরের পর স্তর কালো মেঘ জমেছে আকাশে। গুমোট ভেঙে একটা দমকা হাওয়া দিল। কুটোকাটা আর ধুলোবালি উড়ছে। প্রকাণ্ড মাঠের ওপর প্রকাণ্ড আকাশ। কত দূর পর্যন্ত কালি ঢালা ঘুটঘুটে মেঘের ছায়া পড়েছে। এতদূর পর্যন্ত, এত ব্যাপ্ত মেঘ বহুকাল দেখেননি। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন। নয়নতারা দৌড়ে এসে বাইরে মেলা জামা-কাপড় তুলে দিয়ে গেল ঘরে। কাছে এসে হাসিমুখে বলল, আজ যাওয়া হবে না মা।

ননীবালা মুখ ফিরিয়ে নয়নের মুখে তাকিয়ে বললেন, না হোক গে। জলে পড়েছি নাকি?

থেকে যান।

থাকব।

বলে হাসলেন ননীবালা। 'থাকব' কথাটায় যেন তাঁর বুক হঠাৎ আজ হালকা হয়ে গেল।

॥ পঞ্চান্ন ॥

যেদিন প্রথম কুমারস্বামীর কাছে গিয়েছিল অজিত সেদিন ঘরে ঢুকেই সে এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখতে পায়।

গর্চার সেকেন্ড বাই লেনে দোতলায় এক ব্যবসাদার শিষ্যের ফ্ল্যাটে তখন ছিল কুমারস্বামী, ঘরে ঢুকবার আগে খুব সতর্ক গলায় কুমুদ বোস বলল, ভিতরে ঢুকে কোনও রকম বদমায়েশি করবে না বলে দিচ্ছি। টিটকিরি-ফিটকিরি দিয়েছ কি ঘাড় ভেঙে ফেলব।

জুতো খুলতে খুলতে অজিত হাসল। আর তখন টের পেল বহুকালের অবিশ্বাস ভেদ করে বুকেব ভিতরে একটা ভয় ধুকপুক করে নড়ছে। ভক্তি নয়, বিশ্বাসও নয়, কেবলমাত্র একটা ভয়। এইসব ভয় থেকেই ভক্তির জন্ম, অজিত জানে।

বন্ধ দরজায় মৃদু শব্দ করতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে একটা একতরফা প্রবল স্বর শোনা যাচ্ছে। চৌকাঠে পা দিয়েই অবাক হয়ে গেল অজিত।

একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে চিত করে ফেলে বুকে হাঁটু দিয়ে বসে আছে কুমারস্বামী। চাপা প্রবল গলায় অলৌকিক চিৎকার করে বলছে, পাপী! পাপী! মহাপাপী। অবিশ্বাসী পাষণ্ড!

পড়ে থাকা লোকটা হাত-জোড় করে ভয়ে নীল হয়ে বলছে, বাবা, রক্ষা করো, রক্ষা করো।

এই দৃশ্য। একটু পরে জানতে পেরেছিল অজিত যে, ওই ম্যাজিস্ট্রেট সেদিনই প্রথম এসেছিল কুমারস্বামীর কাছে। লোকটা ঘরে ঢুকতেই কুমারস্বামী আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এসে দক্ষ কুস্তিগিরের মতো তাকে ধরে চিতপটাং করে ফেলেছিল।

তারা ঢুকতেই কুমারস্বামী লোকটাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটু আগের প্রবল রাগ আর ঘৃণা ধুয়ে-মুছে গেছে মুখ থেকে। কী স্নিগ্ধ হাসি হাসল! কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল, তাতে জটা। পরনে হালকা গেরুয়া বহির্বাস আর জামা। গালে যিশুর দাড়ির মতো দাড়ি। বয়স পঞ্চাশ হতে পারে। খুব ফরসা, লম্বা চেহারা। চোখ দুটি দিঘল। অর্থাৎ চেহারাতেই শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কাজ বাগিয়ে বসে আছে। দু'হাত বাড়িয়ে বলল, আয়! আয়!

এক বুকে কুমুদ বোস, অন্য বুকে অজিতকে জড়িয়ে ধরল অনায়াসে। তখন কুমারস্বামীর গা থেকে এত তীব্র চন্দনের গন্ধ প্রায় শ্বাসরোধ করে দিল অজিতের। তার গালে দাড়িটা ঘষে দিয়ে

কুমারস্বামী বলল, তোর বুকটা বড় ফাঁকা। না রে?

প্রথম রাউন্ডে কুমারস্বামীই জিতে গেল। ওই যে কথাটা! তোর বুকটা বড় ফাঁকা, না রে? ওই কথাটাই অজিতের ভিত ভেঙে ফেলে আর কী।

ম্যাজিস্ট্রেট লোকটা উঠে বসে চার দিকে ভ্যাবলার মতো চাইছে। একটা কষ্টের শব্দ করে হঠাৎ কাতরভাবে বলল, বাবা, আমাকে আশ্রয় দিন।

তখন অজিত আর কুমুদ বোসকে ছেড়ে কুমারস্বামী তার দিকে হাত বাড়িয়ে তুলে আনল তাকে। কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, হাত মুঠো কর।

লোকটা তাই করে। কুমারস্বামী তার মুঠোর ওপর এক বার বুড়ো আঙুল বুলিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলে, এবার মুঠো খুলে হাতটা শোঁক তো।

লোকটা শুঁকেই চেঁচিয়ে বলে, এ তো গোলাপের গন্ধ! আঃ, কী সুন্দর গোলাপের গন্ধ!

বহু লোক ঘরে বসে আছে। প্রায় সবাই জোড়হাত, আর তাদের চোখ অর্ধেক বোজা। মুখে লোভলালসার ভাবের ওপর একটা ভয়-ভক্তির সাময়িক প্রলেপ পড়েছে। সবই লক্ষ করল অজিত। ম্যাজিস্ট্রেট লোকটা বসে বসে হাঁফাচ্ছে, আর হাত শুঁকছে। আর যারা বসে আছে তারাও কোন না কোন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে। বাইরে বিস্তর পার্ক করা গাড়ি দেখে এসেছে অজিত। এটা গরিবগুরবো জায়গা নয়। দু'-চারজন ঝুঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতের গোলাপের গন্ধ শুঁকল। কুমুদ বোস সেই হাতটা টেনে এনে অজিতের নাকে ধরে বলল, শোঁকো শালা। স্বর্গের গন্ধ।

একধারে তক্তপোশের ওপর বাঘের গায়ের মতো কালো-হলুদ ডোরা কাটা চাদর পাতা, তার ওপর তাকিয়া। সেখানে কুমারস্বামী বসে, আর ভক্তদের জন্য মেঝেয় ঢালাও কার্পেট পাতা। কুমারস্বামী তক্তপোশে গিয়ে বসেছে, মুখে হাসি। ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর চড়াও হওয়াতে ঘরের আবহাওয়ায় ভক্তিভাবের ইলেকট্রিসিটি বয়ে যাচ্ছে। সবাই বেশ চাঙ্গা।

একজন অচেনা লোক অজিতকে চাপা স্বরে বলল, এখানে বসে কুকথা ভাববেন না, অবিশ্বাসী হবেন না। বাবা সব ভাইব্রেশন টের পান।

তাতে বুকে ভয়ের পাখিটা ফের নড়েচড়ে ওঠে। অফিসে সে অনেক ঠাট্টা-ইয়ারকি করে, কিন্তু এখানে আসার পরই কী যেন ঘটছে তার ভিতর। বড় দুর্বল লাগছে নিজেকে, অসহায় লাগছে। সে একটা মন দিয়ে বুঝতে পারছে যে এই ঘরের পরিবেশ, ফুল ও চন্দনের গন্ধে, কুমারস্বামীর রাগ হাসি, বুকে-টেনে-নেওয়া এই সব কিছুর মধ্যেই একটা অত্যন্ত নিপুণ কৌশল আছে, অন্য একটা মন আবার এই সব কিছুকেই বিশ্বাস করতে চাইছে। অন্য মনটা বলছে এই যে সব সমাজের উঁচুতলার লোক, এরা কি সবাই বোকা? অশিক্ষিত? কোনও চালাকি থাকলে এরা নিশ্চয়ই টের পেত।

তাকে প্রচণ্ড চমকে দিয়ে এই সময়ে কুমারস্বামী বলল, অজিত এসো।

বলে হাত বাড়ায় কুমারস্বামী। অজিত মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাছে এগিয়ে যায়। মেঝেয় চৌকির নীচে বসে মুখ তুলে তাকায়। কুমারস্বামী সহাস্য মুখে বলে, তুমি ম্যাজিক জানো?

অজিত মাথা নেড়ে বলে, একটু।

কুমারস্বামী তার শূন্য ডান হাতখানা অজিতের দিকে বাড়িয়ে বলল, পামিং আর পাসিং জানো?

অজিত মাথা নাড়ে।

কুমারস্বামী হাতটা অজিতের চোখের সামনে একটা কূট মুদ্রায় ঘুরিয়ে দেখায়, বলে, ম্যাজিশিয়ান দ্যাখো।

অজিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বিন্দুমাত্র কৌশল, সামান্য মাত্র পেশির সংকোচন বা প্রসারণ সে টের পাবেই।

দেখছ? কুমারস্বামী বলে।

দেখছে অজিত। হাতে কিছু নেই।

কোনও কৌশল নয়, কুমারস্বামী খুব স্বাভাবিক ভাবে যেন এক অদৃশ্য বাগান থেকে একটা সদ্য ফোটা স্থলপদ্ম চয়ন করে নেয়, অজিতের চোখের সামনে।

নাও এটা কাছে রাখো। ঝুঁকে কুমারস্বামী তার হাতে ফুলটা দেয়। আর খুব আলতো হাতে তার বুকে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ঘষে দেয় এক বার। অমনি ম ম করে উঠল চারধারে চন্দনগন্ধের ঢেউ। কী গন্ধ! কী গন্ধ! এমন তীব্র, অসম্ভব চন্দনগন্ধ জীবনে কখনও পায়নি অজিত। শ্বাস রোধ হয়ে আসে। গন্ধ সম্মোহিত করে রাখে তাকে।

সেই গন্ধ আর সম্মোহন নিয়েই প্রথমদিন ফিরেছে অজিত। এমনই তার বুকের সেই গন্ধের তীব্রতা যে, যখন সে কুমারস্বামীর কাছ থেকে ফেরার পথে বাসে উঠেছে তখন সবাই চনমনে হয়ে চারিদিকে চেয়েছে। দু'-একজন বলে ফেলল, কী দারুণ গন্ধ! কোত্থেকে আসছে?

শীলাও অবাক। বার বার তার বুক শুঁকে বলল, উঃ! কী গন্ধ মেখে এসেছ! কে মাখালে?

অজিত কুমারস্বামীর কথা চেপে গেল। বলল, কেউ একজন হবে।

কে গো?

গোপন প্রেমিকা। অজিত তীব্র একটু হেসে বলে।

শীলা পায়জামা এগিয়ে দিতে হাত বাড়িয়ে বলল, আহা। প্রেমিকা যদি অত সস্তা হত।

অজিতের কী হল, হঠাৎ বলে ফেলল, কেন অন্যের প্রেমিক থাকতে পারে, আর আমার প্রেমিকাতেই দোষ?

শীলা থমকে গিয়ে বলে, কী বলছ?

শুনলেই তো। অজিত নিস্পৃহ মুখে বলে।

শুনলাম। কিন্তু আমাকে বলছ কি?

তবে আর কাকে?

শীলা স্তম্ভিত ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে খুব মৃদুস্বরে বলে, আমার প্রেমিক কে?

অজিত এ-কথার উত্তর না দিয়ে বাথরুমে চলে গেল। কিন্তু শীলা তাতে ক্ষান্ত হয়নি।

রাতে যখন শুতে গেছে শীলা অজিত তখন তার একা ম্যাজিকের ঘরে চুপ করে বসে আছে সিগারেট জ্বেলে। এই একা, বিষণ্নমনে জেগে থাকা, তার বড় প্রিয়। সামান্য একটু ইনসমনিয়ার মতো আছে অজিতের। রাত করে শোয়, বেলা করে ওঠে। রাতে যেটুকু সময় জেগে থাকে সে সময়টুকুই তার নিজস্ব। সারাদিনের খানিকটা অফিসের, খানিকটা শীলার, কিছুটা দাড়ি কামানো, স্নান করা, খাওয়ার মতো বাজে কাজের। শুধু এই সময়টুকু তার। এ সময়ে শীলা তাকে শুতে ডাকলে সে ভারী বিরক্ত হয়। গভীর রাত পর্যন্ত সে শুধু জেগে বসে থাকে। নিবিড় একাকী লাগে নিজেকে। তখন টের পায়, তার চারধারে এক অনন্ত অন্ধকার মহাজগৎ।

সেদিনও বসে ছিল। ছোট্ট একটা নাইট ল্যাম্প জ্বলছে দেয়ালে। সে-সময়ে হঠাৎ মহিমময়ীর মতো শীলা ঘরে এসে দাঁড়াল। মহিমময়ী, কারণ কান্নার জলে তার চোখ ঝলসাচ্ছে, ওঠা-পড়া করছে প্রবল বুক, মুখে তীব্র অভিমান থমথম করছে। রাগলে শীলা আর আটপৌরে থাকে না।

তুমি ও-কথা কেন বললে? শীলা রুদ্ধ গলায় বলে, আর-এক দিনও ইঙ্গিত করেছিলে। তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো?

করি।

কেন? শীলা হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে মুখ তুলে বলল।

অজিত একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, তার কারণ, আমার বয়স প্রায় চল্লিশ, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। অনেকদিন একসঙ্গে ঘর করার পর তোমার কাছে আমার চার্মও আর নেই। তা ছাড়া আমি সঙ্গ দিতে পারি না, স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা নেই। আমাকে যে তুমি আর পছন্দ করবে না, এটাই স্বাভাবিক।

শীলা উন্মুখ হয়ে বলে, কে বলল পছন্দ করি না! তুমি কি আমার মনের কথা জানো?

না। অজিত মাথা নাড়ল, বলল, না জানাই ভাল। মনে কত পাপ থাকে। আমরা দুর্বল মানুষ, সব পাপকে ক্ষমা করতে পারি না।

শীলা আস্তে মাথা নেড়ে বলে, আমার মনে কোনও পাপ নেই। বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ।

এইসব কথার পর শীলা তার হাঁটুতে মুখ গুঁজে কেঁদেছিল। তারা কেউ সেদিন সুভদ্রর নাম উচ্চারণ করেনি। ওই নামটা উচ্চারণ করায় কোথায় যেন একটা লজ্জা ছিল, সংকোচ ছিল, আর ছিল ভয়।

শীলার সঙ্গে সেই রাতে শুয়ে তাকে অনেক আদর করেছিল অজিত। অনেক আবেগ দিয়ে ভালবেসেছিল। আর তাদের আদরে, আবেশে, রতিক্রিয়ায় সারাক্ষণ আবহের মতো কাজ করেছিল সেই চন্দনের পাগল-করা গন্ধ।

তিন দিন পরও সেই গন্ধ রইল অজিতের বুকে। অফিসের অনেকেই এসে অজিতের বুক শুঁকে দেখে যেতে লাগল। সেনদা বললেন, অজিত, তুমি বড় ভাগ্যবান। কুমুদ বোস সারা অফিসে তড়পাতে লাগল— বলেছিলুম কিনা শালা যে কুমারস্বামীই হচ্ছে আসল লোক! ম্যাজিক হলে আমাদের ম্যাজিশিয়ান ধরে ফেলত না? ও-সব যোগের ক্রিয়াকর্ম বাবা, দৈব শক্তি, ইয়ারকির কথা নয়।

শীলার সময় কীভাবে কাটে তা জানে না অজিত। সারাদিনের মধ্যে শীলার সঙ্গে দেখা হয় কতক্ষণ?

আজ কয়েক দিন হল ইস্কুল খুলেছে। শীলা বন্ধের পর ইস্কুলে গিয়েই শুনেছে, মনীষা দিদিমণি রিটায়ার করার আগে দু'মাস ছুটি নিয়েছেন। ছুটির শেষে জয়েন করেই রিটায়ার করবেন। তাঁর জায়গায় ফের সুভদ্রকে নেওয়া হবে।

সুভদ্রকে নেওয়া হবে কেন? কারণ, সুভদ্র হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সময়ে খুব ভাল ম্যানেজ করেছিল সব কিছু।

খবরটা পেয়েই শীলার শরীরের ভিতরে অন্ধকারে আলো জ্বলে উঠল। রঙিন সব আলো। একটা অসহনীয় সুখবোধ। মেয়েদের অনেক কথা স্বামীকে বলতে নেই, কাউকে বলতে নেই। সে-সব কথা তাদের মনের মধ্যে চন্দনের হাতবাক্সে লুকোনো থাকে।

খুবই উদাসীন সেজে সুভদ্র এল ইস্কুলে একদিন। সেদিন শীলা অখণ্ড মনোযোগে খবরের কাগজ পড়েছে, অবসর সময়ে। তাকায়নি। তাকাতে ভীষণ লজ্জা করছে। সুভদ্রও এড়ানোর ভাব করছে। যেন চেনেই না।

কেবল ছুটির পর ঠিক বড়রাস্তায় এসে সঙ্গ ধরল শীলার। বলল, কী খবর গরবিনী?

শীলা মুখ লাল করে উত্তর দিল, কীসের গর্ব আবার। কথা খুঁজে পান না নাকি? কেবল বাজে কথা।

সুভদ্র উদাস গলায় বলে, কত অহংকার থাকে মানুষের! কারও বা রূপে আছে, কারও বা স্বামী বড় চাকরি করে, কেউ বা টাকার মালিক। এ-রকম কত রকম।

সুভদ্র, মারব থাপ্পড়!

এইরকম ভাবে তাদের ফের ভাব হয়ে গেল। ইস্কুলে রোজ দেখা হয়। ঠারেঠোরে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়। ভালমানুষের মতো কথা বলে। একটা পিপাসার নিবারণ হয় তাতে। আবার তৃষ্ণা বাড়েও। ইস্কুলের শেষে প্রায়দিনই তারা একসঙ্গে বেরোয়।

তারপর দু'জনে ট্রামে বা রিকশায় ওঠে। ভারী পেটটা নিয়ে শীলার একটু হাসফাঁস লাগে, সুভদ্রর সামনে লজ্জাও করে। তবু বেরোতে খুব রোমাঞ্চকর আনন্দ হয়।

একদিন সুভদ্র বলে, এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোনও দিন যদি অজিতদা দেখে ফেলেন, কী ভাববেন?

শীলা একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী ভাববে আবার!

অনেক ভাবার আছে।

কী ভাববে?

হয়তো ভাববেন, আপনি আমার সঙ্গে প্রেম করছেন।

শীলা মুখটা ফিরিয়ে বলেছে, ফাজিল!

সেটা মুখের কথা। কিন্তু তাদের ভিতরে ভিতরে এই সব কথাই গুপ্তঘাতকের মতো, চোরের মতো ঘোরে। তাই রিকশায় বসলেই পরদা ফেলে দেয় শীলা, ট্রামে-বাসে উঠলে পাশাপাশি বসতে চায় না। বলে, গা-ঘেঁষা পুরুষ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।

এক-একদিন সুভদ্র বলে, এবার চাকরিটা তো পাকাই হয়ে গেল আমার। এজেন্সির কমিশনও শতখানেক করে আসছে। এবার ভাবছি একটা বিয়ে করলে কেমন হয়!

শীলা বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলে, ও মা, করুন না। খুব ভাল হয়। পাত্রী দেখব?

সুভদ্র ভয়ংকর অসভ্যের মতো হেসে বলে, বুকে সইবে তো?

শীলা লাল হয়, তেড়ে মারতে আসে। আবার কখনও গভীর রাতে বা নির্জনে ভেবে দেখলে বুঝতে পারে, সুভদ্র মিথ্যে বলেনি। বুকে সইবে না। একদিন সুভদ্র মাইনে পেয়ে বলল, চলুন, একটা শার্ট কিনব। পুরনোগুলোতে আর চলছে না। শীলা রাজি। সুভদ্র ফুটপাথ থেকে কিনবে, শীলা রাজি নয়। সে বলে, না, বড় দোকানে চলুন। গড়িয়াহাটায়। গিয়েছিল তারা। অনেক রঙের, স্ট্রাইপের, চেক-এর শার্ট-এর মধ্যে পছন্দ করতে হিমসিম খাচ্ছিল তারা। ক্লান্ত দোকানদার একটা শার্ট তুলে দেখিয়ে শীলাকে বলল, আপনার হাজব্যান্ডকে এইটে পরিয়ে দেখুন, খুব মানাবে। যান না, ট্রায়াল রুমে চলে যান দু'জনে, পরিয়ে আনুন।

খুব লজ্জা পেয়েছিল শীলা। সুভদ্র অবশ্য দোকানদাবের ওপর এক ডিগ্রি যায়। গলা বাড়িয়ে বলল, আমার ওয়াইফ স্ট্রাইপ পছন্দ করেন। এটা চেক, এটা ওঁর পছন্দ নয়।

এ সব কি খেলা! কেমন খেলা? খুব বিপজ্জনক? সে যাই হোক, দোকানদারের ভুল আর ভাঙেনি তারা। ওইরকমই রয়ে গেল তাদের সম্পর্ক, ওই দোকানে। হয়তো চিরকালের মতো।

অজিত কিছুই জানে না। কিন্তু এক বার সে গোপনে ডাক্তার মিত্রের কাছে গিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করিয়েছে। তার ঘোর সন্দেহ ছিল, তার নিজের হয়তো সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। ডাক্তার মিত্র তাকে পরীক্ষা করেছে। রিপোর্ট দেওয়ার সময়ে বলেছে, ডিফেক্টটা মাইনর। এতে আটকানোর কথা নয়। তবু কয়েকটা ওষুধ দিচ্ছি।

সেই কূট সন্দেহটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শীলার পেটের বাচ্চাটা...।

অজিত আজকাল প্রায় দিনই কুমারস্বামীর কাছে যায়। অনেকক্ষণ থেকে রাত করে ফেরে। তার মুখে-চোখে একটা অদ্ভুত তদ্গত ভাব। বিরলে শ্বাস ফেলে সে। গভীর শ্বাস। চোখ বুজে আবেগভরে বলে, বাবা।

চার দিকে মাইল মাইল জুড়ে মেঘের ঘুটঘুটে ছায়া। বহেরুর খামারবাড়ির ধারে দাঁড়ালে কত দূর যে চোখ চলে যায়। ননীবালা দেখলেন, সেই অফুরান ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে একটা ধুলোর পরদা উড়ে আসছে। বাতাসে ভ্যাপসা গরম ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ সেই বাতাসে একটা ভেজাল ঢুকে গেল। উত্তুরে বাতাসের মতো ঠান্ডা আর জলগন্ধী হাওয়া এল কোত্থেকে। মুঠো মুঠো ধুলো কাঁকর এসে পড়ছে চোখে-মুখে। ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতানাতা, পাখির বাসার খড়কুটো উড়ছে চারধারে। বড় গাছগুলো যেন ধনুষ্টঙ্কারে বেঁকে যাচ্ছে এক-এক বার। প্রবল বাতাস ঠেলে দিচ্ছে তাঁকে, ননীবালা জোর পায়ে ঘরে এসে হুড়কো দিলেন। বাতাসের এত চাপ যে কপাটের পাল্লা দুটো ঠেসে দিতে পারছিলেন না।

ব্রজগোপাল উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখছিলেন। এক বার বললেন, ঝড় আসছে। এখন আলো-টালো জ্বেলো না।

ননীবালা দেখেন ঘরময় ধুলোবালি পড়েছে পুরু হয়ে, বিছানায় রাজ্যের কাঠিকুটো নোংরা এনে ফেলেছে বাতাস। বিছানা দু'হাতে ঝাড়তে ঝাড়তে শুনতে পেলেন, বাইরে বাতাস গোঙাচ্ছে। বেড়ার ওপর সপাট করে এসে পড়ছে বাতাস, ঠিক যেন চোর-ডাকাত ভেঙে ফেলছে ঘর। টিনের চালে এক রকমের গুমগুম শব্দ। ঘরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। কলকাতার পাকা বাড়িতে ঝড়বৃষ্টি তেমন টের পান না। এখানে এই কাঁচাঘরে, খোলা মাঠের মধ্যে এমন প্রবল ঝড়ের আভাস দেখে বুকটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। বাইরে কারা চেঁচামেচি দৌড়োদৌড়ি করছে। সামাল সামাল ভাব। এক বার বহেরু এসে দরজায় কিল দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, মাঠান, ঘরে আছেন তো সব?

তখনই ননীবালার খেয়াল হল, রণো তো ঘরে নেই! গেল কোথায় ছেলেটা?

আতঙ্কিত ননীবালা ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে বলেন, রণো কোথায় গেল?

ব্রজগোপাল ঘরের আবছায়ায় মুখটা ফিরিয়ে ননীবালার দিকে চেয়ে বললেন, দেখছি।

দেখবে! কোথায় দেখবে? এই ঝড়ে বেরোবে নাকি?

এই সময়ে প্রচণ্ড শব্দে টিনের চালের ওপর নারকোল পড়ল। বাজের শব্দ হল উত্তরের মাঠে। আর তার আগুনের ঝলক হলুদ আলোয় বিপদের গন্ধ ছড়িয়ে গেল ঘরে।

ব্রজগোপাল হুড়কো খুলতে খুলতে বললেন, দেখি সব কে কী করছে। রণোকেও খুঁজে আনি।

ননীবালা এসে হাত চেপে ধরে বললেন, বয়সটা ভুলে যাও কেন? অন্য ক্ষতি না হলেও এই বাতাসে ঠান্ডা লাগিয়ে আসবে। আমিই বরং দেখছি।

ব্রজগোপাল ঠান্ডা গলাতেই বললেন, তুমি তো খামারটা ভাল চেনো না, অন্ধিসন্ধি আমি জানি। আমার ঠান্ডা লাগবে না, অভ্যাস আছে। ছেলেটার মন স্থির নেই, কোথায় চলে যায়।

সে-কথাও ঠিক। উদ্বেগ বুকে নিয়ে ননীবালা সরে দাঁড়ালেন। ব্রজগোপাল হুড়কো খুলতেই ঝড়ের ধাক্কায় পাল্লা দুটো পাখনার মতো উড়ে খুলে গিয়ে কাঁপতে থাকে। বাইরে চার দিকে ধুলোটে অন্ধকার। খোলা দরজা দিয়ে রাশি রাশি ধুলো এসে অন্ধ করে দেয় ননীবালাকে। ঠাহর করে তিনি পাল্লা দুটো বন্ধ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ডাকাতে ঝড় তাঁকে সুদ্ধু ঠেলে ফেলে দেয়, দামাল হয়ে ঘর লুটপাট করতে ঢুকে পড়েছে। ব্রজগোপাল বাইরে থেকে পাল্লা দুটো টেনে ধরেন, তাই অতি কষ্টে ননীবালা দরজা বন্ধ করতে পারলেন। জানালার ঝাঁপগুলো দড়ি দিয়ে বেঁধে গেছেন ব্রজগোপাল, তবু সেগুলো বাঁধন ছেঁড়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। হা-হা শব্দে আকাশ পাতাল জুড়ে প্রলয় চলে আসছে। আবার আগুনের আভা, তারপরই কামানের শব্দ করে বাজ ডাকল। শিউরে ওঠে ঘর। কোথায় পড়ল বাজটা। কার সর্বনাশ করল কে জানে! এত কাছে পড়ল। পুবের জানালার ঝাঁপ ফাঁক করে ননীবালা কষ্টে দেখলেন, ভূতপ্রেতের মতো মানুষ দৌড়োচ্ছে চারধারে।

বেড়াল কোলে করে উঠোনে বসে আছে গন্ধ বিশ্বেস। মাজায় জোর নেই যে নিজে থেকে উঠবে। বাতাসে উলটে যাচ্ছে বেড়ালের লোম। তিন-তিনটে ঘেয়ো কুকুর ছুটে গিয়ে ঝড়-বাতাসকে ঘেউ ঘেউ করে দিয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ফিরে আসছে গন্ধের কাছে। থুপ থুপ বসে থাকা একপাল বেড়াল আলিস্যি ভেঙে উঠে ঘরদোরের ভিতর চলে গেল। কুকুরদের যাওয়া বারণ, একমাত্র গন্ধ বিশ্বেসের ঘর ছাড়া। কিন্তু ঝাঁপ বন্ধ বলে যেতে পারছে না।

গন্ধ চেঁচিয়ে বাতাসের শব্দের ওপর গলা তুলবার চেষ্টা করে, আমারে একটু ঘবে দিয়ে আয় শালার পুতেরা! হে-ই কেডা যায় রে?

নয়নতারা হাঁস তাড়িয়ে এনে বাক্সবন্দি করতে করতে চেঁচিয়ে বলল, ও জ্যাঠা, ঘরে যাও। বাতাস দিল।

গন্ধ খেঁকিয়ে ওঠে, আমারে নিবি তো!

নিই। বলে নয়নতারা এসে হ্যাঁচকা টানে তুলে ফেলে গন্ধকে। গন্ধ উঃ উঃ করে ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠে। সেদিকে কান না-দিয়ে নয়নতারা তাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গিয়ে হাঁসের মতোই ঘরে পুরে দেয়। বন্ধ দরজার বাইরে কুকুরগুলো আকাশমুখো চেয়ে চিল্লাতে থাকে। ঝড় দুর্যোগকে ধমক মারে। দাওয়ায় উঠলে গেরস্ত দূর দূর করে। তারা যাবে কোথায়!

নয়নতারা ধুলোর ভিতরে ডুবন্ত মানুষের মতো আবছায়া হয়ে ছুটে আসে চিড়িয়াখানার কাছে। ঘেরা পরদা কিছু নেই। জাল দেওয়া খাঁচার মধ্যে ময়ূরটা কর্কশ স্বরে চেঁচাচ্ছে। একটু আগে পেখম ধরেছিল, এখন বুজিয়ে ফেলে একধারটায় বসে আছে ভয় খেয়ে। পাখিগুলো চেঁচাচ্ছে। হনুমান আর বাঁদর কুক কুক ডাক ছেড়ে লাভ দিচ্ছে এধার থেকে ওধার। বিন্দু কয়েকটা চট জালের গায়ে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পারছে না। বাতাসে চট উড়ে যায়।

হেসে ফেলে বিন্দু বলে, ও দিদি, এ মুখপোড়াগুলোর কী হবে?

খাঁচা খুলে দে, পালিয়ে যাক। নয়নতারা নির্দ্বিধায় বলে।

বিন্দু চোখ গোল করে বলে, জঙ্গুলে জীব, ওরা কত ঝড়বৃষ্টি দেখেছে। ঠিক গাছে-টাছে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকবে। নইলে বন্ধ জায়গায় আঁকুপাঁকু হয়ে মরবে।

নয়নতারাকে দরজা খুলতে হয় না। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে একটা ঝাপটা আসে। একমুখ ধুলো খেয়ে দুই বোন বেসামাল। খাঁচার পলকা পাল্লা খুলে যায় মড়াৎ করে। আর এ সময়ে ধুলোর ঝড় ভেদ করে দৈববাণীর মতো ব্রজকর্তার গলার স্বর শুনতে পায় নয়নতারা। ব্রজগোপাল চেঁচিয়ে বলছেন, কোথাও কেউ আগুন জ্বালিস না। বাতিটাতি সব নিবিয়ে ফেল।

বেজিটা নিরিক থিরিক দৌড়োচ্ছে। বহেরুর পোষা বেজি, কিন্তু ও ঠিক পোষ মানে না কখনও। সুযোগ হলে, মন করলে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। বিন্দু চেঁচিয়ে বলে, ও দিদি, বেজিটাকে ধর।

পরপুরুষের মতো দামাল বাতাস এসে আঁচল উড়িয়ে দেয় গা থেকে। নিশেনের মতো শূন্যে আঁচল উড়িয়ে হাসে হা-হা করে। নয়নতারা আঁচল কোমরে বাঁধে আর তা করতে বেজির পিছু পিছু বিন্দু ধুলোর আস্তরণে কোথায় ঢেকে যায়। একা নয়নতারা এক বার দৌড়ে যায় ব্রজগোপালের ঘরের দিকে। চেঁচিয়ে ডাকে, ও মা, ঘরে আছ তো?

ননীবালা ভয়ের গলায় চেঁচিয়ে বলেন, আমি আছি, কিন্তু ছেলে আর বাপ কোথা গেল দ্যাখ।

নয়নতারা হাসে। কে কাকে দেখে, দুর্যোগে আর বিপদে সবাই একা। এই ধুলোটে ঝড় আর মেঘ-বাদলে আজ যেন আবার এক প্রেত তাকে ডাকে। সংসারে পোঁতা তার খুঁটো আজ উপড়ে দিয়েছে ঝড়। নয়নতারা ধুলোর মধ্যে ডুব দেয়, বাতাসে ভাসে। খোঁপা খুলে এলোচুল মুঠো করে ধরেছে দুরন্ত পুরুষের মতো ঝড়। নয়নতারা দৌড়ে যায় এধার-সেধারে। অবিরল হাসে। আগুনের একটা ধমক নেমে আসে আকাশ থেকে। মাটি কেঁপে ওঠে। উত্তরের মাঠে একটা নীলচে বাজ পড়ল, স্পষ্ট দেখতে পেল নয়নতারা। একটু পরে শব্দটা হবে। সে কান চেপে ধরে। আর হি হি করে হাসে।

দমকে দমকে বাতাস বেড়ে গেল। উড়িয়ে আনছে গভীর ঘন গহিন মেঘ। কী বিপুল আকাশ জুড়ে আসছে প্রলয়। এইবার পৃথিবীর সর্বশেষ মহাপ্রলয়টি আসছে। কোনও নোয়া আর নৌকো তৈরি করেনি। টুবাই বুবাই আর মেয়েটাকে শেষবারের মতো চোখের দেখা হল না। বীণার সঙ্গে ফের ভালবাসার সম্পর্কে ফিরে যাওয়ার সময় হল না মহাপ্রলয় আসছে।

এক মহাভয়ে রণেন জামরুলতলায় দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ঝড়ের চেহারাটা দেখছিল। চোখ দুটো বড় বড়, ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। বিড় বিড় করে এক বার শিশুর মতো ডাকল, বাবা!

জামরুলের পাতায় পাতায় প্রবল শব্দ। পাখির বাসা ভেঙে পড়েছে পায়ের কাছে। প্রথমে লক্ষ করেনি রণেন, হঠাৎ চোখে পড়ল। ভাঙা ডিম ছড়িয়ে ছত্রখান। নিচু হয়ে দেখল ডিমের খোলা থেকে তলতলে তরল পদার্থ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, আর তার মধ্যে না-হওয়া বকের ছানা গলা টানা দিয়ে মরছে। হায় ঈশ্বর! চমকা ভয়ে রণেনের বুক আঁকুপাঁকু করে ওঠে। ব্যাকুল হাত বাড়িয়ে সে বকের ছানার দলদলে শরীরটা তুলে নেয় হাতে। ন্যাতানো রোমহীন, লাল একটা অদ্ভুত জেলির মতো। হাতের তেলোর দিকে সভয়ে ঘেন্নায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সে। তার দীর্ঘ চুলগুলিকে আঁচড়ে, বিলি কেটে চলে যাচ্ছে বাতাস, ফের মুঠোভর ধরে ছুড়ে মারছে কপালে। চুলের চিকের ভিতর দিয়ে নিজের হাতের তেলোর বীভৎস দৃশ্যটা দেখে হঠাৎ আবার হাতঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল রণেন।

জামরুলতলা থেকে কয়েক পা হাঁটলে পুকুর। হাত ধুতে এসে অবাক হয়ে রণেন দেখে, কী গহিন গভীর কালো জল। মেঘের নিবিড় ছায়া বুকে ধরে কখন পাতাল-গভীর হয়ে গেছে জল। আর জলের ওপর একটা থিরথিরে কাঁপন। ক্রমে ঢেউ দুলে দুলে ওঠে। ছপাৎ করে জল উঠে জলে পড়ে যাচ্ছে। রণেন সেই অতল জলের কাছে এসে হাত ধুতে গিয়েও থমকে থাকে। পুকুরটা এক রহস্যময় পাতালের সুড়ঙ্গের মতো তাকে ডাকছে, টানছে, জল ছুঁলেই চুম্বকের মতো টেনে নেবে তাকে। গভীর গভীর এক তলহীন অসীম পাতালে নিয়ে যাবে।

তীব্র ভয়ে উঠে এল রণেন। আর্তস্বরে ডাকল, মা।

ধুলোর ঝড়ের প্রথম দমকটা এল। চোখে হাত চেপে বসে পড়ে রণেন। দুরন্ত বাতাস আসে মহাপ্রলয়ের অগ্রদূত হয়ে। এরপর সমুদ্রের আকাশপ্রমাণ জলরাশি আসবে। একশো তালবৃক্ষের উচ্চতা নিয়ে সমস্ত পৃথিবী ডুবিয়ে দিয়ে যাবে। কেউ থাকবে না। কেবল খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর যারা আছে তারা বেঁচে থাকবে। বড় আফসোস হল রণেনের। আগে জানা থাকলে সে এ সময়ে ঠিক দার্জিলিঙে গিয়ে বসে থাকত সবাইকে নিয়ে।

চার দিকে ধূসরতার এক প্রবল রহস্য। তার মধ্যে সব কিছুই ছায়ার মতো অলীক হয়ে যাচ্ছে! গোঙানির শব্দ করে রণেন সাবধানে হাতের পাতার আড়াল করে চোখ খোলে। নাক দিয়ে হুড় হুড় করে তেজি বাতাস ঢুকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে তুলছে ফুসফুস। শ্বাস টানতে হচ্ছে না, আপনা থেকেই বাতাস ঢুকে যাচ্ছে বুকের মধ্যে। তীব্র দমবন্ধ করা এক অনুভূতি হয়। ফুসফুসটা একটা পলকা লাল বেলুনের মতোই না ফটাস করে ফেটে যায়।

এখানে বহেরুর খড়ের গাদা। হামাগুড়ি দিয়ে সেই গাদায় উঠে আসে রণেন। মাচাটা মচমচ শব্দ করে। আর গাদার মাচার তলায় কয়েকটা ঘেয়ো কুকুর আর্তস্বরে চিৎকার করতে থাকে। রণেন খড়ের মধ্যে একটা গভীর খাঁজ দেখতে পেয়ে উঠে বসে। চার দিকে প্রচণ্ড এক শব্দ হচ্ছে, খড় উলটে যাচ্ছে বাতাসে, উড়ে যাচ্ছে। একটা গুলঞ্চ গাছের ডাল মড়াৎ করে ভেঙে পড়ল। গাছে গাছে হাহাকার বেজে যাচ্ছে অবিরল।

অবোধ চোখে খানিকক্ষণ দেখল রণেন। ডানহাতের চেটোয় এখনও সেই ডিম-ভাঙা তরল পদার্থের চটচটে ভাব। খড়ের গায়ে হাতটা ঘষে নিয়েও চটচটে ভাবটা যায় না। বড় ঘেন্না। বড় ভয়! কত পাখির বাসা ভাঙছে, ডিম ভাঙছে। কত বাড়ি-ঘর ভেসে যাবে। কেউ বাঁচবে না। আকাশ প্রমাণ

প্রকাণ্ড জলস্তম্ভ ধেয়ে আসছে। অবিকল জলের অতিকায় ঢেউয়ের মতোই একটা মেঘ দিগন্তে উঠে আসছে। রণেন তীব্র একটা চিৎকার দিয়ে চোখ বুজল। ফের খুলল। ফের বুজল।

আপন মনে নিজেকে বলল, ওই আসছে।

এই সেই ভয়ংকর শেষ দিন। মহাপ্রলয়ের ঢেউ কি ওই? বোজা চোখ ফের খুলে ফেলল রণেন। দেখল, পর্বতপ্রমাণ একটা ঢেউ আকাশে মাথা তুলেছে। তার কলকল ঘোর নিনাদ শুনতে পায় রণেন। বিশাল প্রবাহের মতো জলরাশি এসে গেল প্রায়।

এ সময়ে কে যেন চিৎকার করে ছুটে ছুটে বলছে, তোরা সব ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়া, ঘরে থাকিস না, গাছগাছালির কাছে যাস না।

বাবার গলা না! হ্যাঁ, বাবার গলাই। উৎকর্ণ হয়ে শোনে রণেন। চিৎকার করে ডাকে—বাবা!

কেউ উত্তর দেয় না। কিন্তু বাতাসের শব্দ ছুড়ে একটা অদ্ভুত শব্দ রণেনের কানে আসে। কে যেন এই দুর্যোগে খোল বাজাতে বসেছে। কী তীব্র বোল! রণেন শোনে খোল বলছে, ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই...

কী বলছে! বলছে, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল...আয় ব্যাটা, আয় ব্যাটা, আয় ব্যাটা... হরিবোল...

রণেন লাফ দিয়ে নামল। একটা শেষ সাহস তার বুকের মধ্যে জ্বলে উঠেছে মশালের মতো। মরবই যখন, ভয় কী? আয়, জল, আয় ঝড়, আয়...

মুহুর্মুহু আগুনে আগুনে রং ছড়িয়ে বাজ পড়ছে চারধারে। কী প্রবল শব্দ! মহাপ্রলয়ের তীব্র ক্রোধ চারধারে আগুনের রং ধরিয়ে দিল। কে যেন 'ভগবান' বলে চেঁচিয়ে উঠে মূক হয়ে গেল। গভীর ধুলোর স্তরের মধ্যে আবছা হয়ে যায় সব কিছু।

রণেন পরনের কাপড়টায় কাছা মেরে নেয়। তারপর গুটি গুটি খোলা মাঠের মধ্যে এগিয়ে যেতে থাকে। তার সামনে দিয়ে এক বিশাল পেখমের বোঝা টেনে দৌড়ে যায় ময়ূর। কর্কশ একটা ডাক দেয়। আর বাতাসের তুমুল হট্টগোলের মধ্যে কাদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এক বার কে যেন বুকফাটা চিৎকার দিয়ে ডাকল, রণো।

সে-ডাক শোনার সময় রণেনের নেই। মহাপ্রলয় তাকে ডাকে যে। ওই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে এক বার মুখোমুখি মৃত্যুর প্রকৃত স্বাদ জেনে নেবে। মাঠের মাঝখানটির দিকে বাতাস ভেদ করে রণেন দৌড়োয়।

টিনের চালে টুং টাং করে প্রথম কয়েকটা শিল পড়ল। তারপরেই হুড়মুড় করে পাথরের টুকরোর মতো বড় বড় খাঁজকাটা, হিংস্র শিল পড়তেই লাগল। কয়েক পলকে সাদা হয়ে যাচ্ছিল মাঠ-ঘাট খামারবাড়ি। ভূতের ঢিলের মতো শিল এসে পড়ছে অন্তরীক্ষ থেকে, গড়িয়ে যাচ্ছে মাটির ওপর, লাফাচ্ছে। বরফের ঘর খুলে কে যেন উপুড় করে দিয়েছে।

শিলের প্রথম চোটটা গেল বহেরুর ওপর দিয়ে। কেলে গোরুর বোকা বাছুরটা গোয়ালে যায়নি। সেটাকে টেনে আনতে গিয়ে আধলা ইটের মতো একটা শিল তার বাঁ হাতের কবজি থেঁতলে দিয়ে গেল। আর গোটা দুই পড়ল মাথায় বাঁধা গামছা ভেদ করে ঘিলুতে। দাঁতে দাঁত চেপে বহেরু প্রথমটা সামলে নিল। গোয়ালে ঢুকে বিড় বিড় করে গাল দিল দুর্যোগকে।

কপাল থেকে রক্তের ধারা নেমে ভাসিয়ে দিচ্ছিল নয়নতারার মুখ। রক্তের নোনা স্বাদ জিভে ঠেকতেই তার সংবিৎ ফিরে আসে। ভূতটা ছেড়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে আচম্বিতে একটা বন্ধ দরজায় ধাক্কা দেয়। কার দরজা ঠিক ঠাহর হয় না।

ননীবালা দরজা খুলে চেঁচিয়ে বলেন, ও মাগো! কী হল তোর?

কিছু নয় মা, শিল পড়েছে।

ননীবালা তাকে ঘরে টেনে নিয়ে দরজাটা ফের বন্ধ করে বলেন, ছেলে আর ছেলের ব পর জন্য বুক শুকিয়ে যাচ্ছে মা। কোথায় যে গেল।

ফেরেনি?

ঘটির জলে কপালটা ধুয়ে নিল নয়নতারা। ননীবালা দেখে বললেন, অনেকটা কেটে গেছে। খুব ফুলেছে। একটু ডেটল দে।

নয়নতারা হেসে মাথা নেড়ে বলল, ওতে কিছু হবে না। যাতে চোপাট, তাতেই লোপাট।

এই বলে ঘোমটা দিয়ে বাইরে থেকে একটা শিল কুড়িয়ে আনল। সেইটে কপালের কাটা জায়গায় চেপে ধরে বলল, ব্রজকর্তার জন্য চিন্তা নেই মা, তবে রণেনবাবু...।

শিল পড়ার শব্দ শেষ হয়নি তখনও, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দামাল বাতাস পৃথিবীর সব মেঘ উড়িয়ে আনছে আজ আকাশে। কলের জলের মতো মোটা ধারায় জল নেমে আসছে। অবিরাম, অবিশ্রাম। চার দিক গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যায়। আর তখন ব্রজগোপাল রণেনকে মাঠ থেকে তুলে আনছেন। তার কানের কাছে বলছেন, না বাবা, তোমার খুব চোট হয়নি। শিলটা জোর পড়েছিল। বাবলা গাছটার জন্য বেঁচে গেছ!

বাবা, মহাপ্রলয় হবে। রণেন বলে। তার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে। একটা চোখ ফুলে আছে। ব্রজগোপালের কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটছে।

ব্রজগোপাল অজস্র বৃষ্টির ধারায় ভিজে যাচ্ছেন রণেনের সঙ্গে। তবু হেসে বললেন, হলে হবে। ভয় কী?

বড় ভয় বাবা। সব মরে যাবে।

ব্রজগোপাল তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, বিশ্বাস বাবা, বিশ্বাসই সব সার কথা। যতক্ষণ না মরণ আসছে ততক্ষণ তো তাঁর দয়ায় বেঁচে আছি। আর যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ কিছুতেই মৃত্যু নেই।

বৃষ্টি থেমে যায়নি তখনও। পড়ছে। তবে এখন একটানা, একঘেয়ে জলের শব্দ। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে হারিকেনের আলো উসকে উঠছে সেই বাতাসে।

রণেন শুয়ে আছে বিছানায়, তার পাশে পা ঝুলিয়ে বসে ননীবালা। মেঝেয় বসে এক বাটি দুধ স্টোভে গরম করছে নয়নতারা। এখনও তার কপাল আব হয়ে ফুলে আছে। বলল, মা, রান্নাঘর তো ভেসে গেছে! এ ঘরেই আজ তোলা উনুন জ্বেলে দিই?

ননীবালা পানের পিক ফেলে এসে বললেন, দে। বহেরুকে বলব কালই রান্নাঘরটা মেরামত করতে।

রণেন চোখ বুজে শুয়ে হিজিবিজি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভাবল—নয়নতারা কেন তার মাকে মা ডাকে। অ্যাঁ! ভাবতে ভাবতে খুবই উত্তেজনা বোধ করল সে। পাশ ফিরে নয়নতারার দিকে তাকাল।

ব্রজগোপাল ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে এলেন। ছাতা মুড়ে রাখলেন দরজার পাশে।

ননীবালা এক বার চেয়ে দেখে বললেন, নিউমোনিয়াটি না বাঁধালে আর চলছে না? এই বয়সে অত ভেজা কি সইবে? কে শোনে কার কথা!

ব্রজগোপাল গায়ের পিরানটি খুলে ফেললেন। বললেন, প্রতিবারই ঝড়জলে নানা ক্ষয়ক্ষতি হয়। কাল সকালে সব বোঝা যাবে। বলে ননীবালার দিকে চেয়ে কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আজ তো আর যেতে পারলে না। কলকাতার বাসার জন্য খুব চিন্তা করছিলে!

যাওয়া আর হল কই?

ব্রজগোপাল শুকনো কাপড় পরতে পরতে বললেন, তা হলে কাল যাবে? কখন যাওয়া জানিয়ে রাখলে রিকশা বলে রাখবে বহেরু।

ননীবালা উত্তর দিলেন না। নয়নতারাকে বললেন, কী এক রসকষ ছাড়া পান সেজেছিস বল তো! আর-একটা ভাল করে সাজ।

নয়নতারা দুধের বাটির জ্বাল রেখে পান সাজতে বসে।

ব্রজগোপাল ফের বলেন, কাল কখন যাওয়া?

ননীবালা হঠাৎ ঝেঁঝে উঠে বলেন, না গেলে তাড়িয়ে দেবে নাকি? কেবল যাওয়া যাওয়া করছ কেন?

॥ সাতান্ন ॥

বীণা বিরক্ত হয়ে এসে বলে, একটু আগে কে একটা মেয়ে তোমার কাছে এসেছিল বলো তো!

সোমেন ছুটকো কাগজে কিছু লিখবার চেষ্টা করছে, হচ্ছে না। সিগারেটের ধোঁয়ায় চার দিক আবছা। বুকে বালিশ চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল সোমেন, বীণার দিকে এক বার অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে বলল, চা খাওয়াবে নাকি এক কাপ?

বীণা বলে, বেলা এগারোটায় চা? এটা কি রেস্টুরেন্ট! যাও, চান করে এসো, ভাত খাবে। এখন আমার অনেক কাজ।

সোমেনের অন্যমনস্কতাটা কেটে গেল, হেসে বলল, মা আর দাদা আউট হওয়ার পর থেকেই তো তোমার সামার ভ্যাকেশন চলছে। অত কাজ দেখিয়ো না।

ইস, সামার ভ্যাকেশন! তিনটে বাচ্চা আর তুমি একটা বুড়ো খোকা, মোট চারটের ঝামেলা কি কম নাকি! টুবাইটা মা'র খুব ন্যাওটা, ওটাকে আমি সামলাতেই পারি না। ঠাকুমা গল্প বলে খাওয়ালে বেশ খেত, যেই ঠাকুমা চলে গেছে অমনি ওকে অরুচিতে ধরেছে। আমিও গল্প বলি, কিন্তু সে গল্প ওর পছন্দ নয়। সারাদিন ওকে খাওয়ানোর জন্য আমার হাড় কালি হয়ে গেল। ওঁরা যে কবে আসবেন!...তিনদিনের নাম করে গেলেন, পাঁচদিন হয়ে ছ'দিন চলছে।

চায়ের কথাটা দিব্যি ম্যানেজ করে চাপা দিলে কিন্তু।

বীণা স্নিগ্ধ চোখে দেওরটির দিকে চেয়ে একটু হাসে। এই ছেলেটির প্রতি তার একরকম মা-ভাব আছে। বুবাই টুবাইয়ের মতোই যেন আর-একজন।

বীণা ননীবালার চৌকিটায় বসে বলে, আর তুমি যে ওই মেয়েটার কথা চেপে যাচ্ছ! কে মেয়েটা? খুব গাড়ি হাঁকড়ে আসে।

সোমেন কাগজে হিজিবিজি লিখতে লিখতেই বলল, খুব বড়লোকের মেয়ে, বুঝলে! প্রসপেকটিভ!

সে হোকগে। মেয়েটার কিন্তু মাথায় ছিট আছে।

কেন? সোমেন হেসে জিজ্ঞেস করে।

বীণা মুখটা গোমড়া করে বলে, বাসায় আসে তো প্রায়ই, এক দিনও আমার সঙ্গে কথা বলল না। এমনকী বাচ্চাগুলো কাছে গেলে একটু আদর করা কি কথা বলা দূরে থাক, এক বার ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত। এ বাড়িতে ও কেবল তোমাকে দেখে, কেন আমরা কি নেই? পুরো ছিটিয়াল।

ছিট আছে কি না কে জানে, তবে মাথায় টিউমার আছে। বলে সোমেন বউদির দিকে চেয়ে একটু হাসে, পরমুহূর্তেই হাসিটা মিলিয়ে একটু বিষণ্ণতার মেঘের ছায়া পড়ে মুখে। বলল, ব্রেন টিউমার। বোধহয় বাঁচবে না।

যাঃ। বীণা বিশ্বাস করতে চায় না।

সত্যি।

বীণা চোখ দু'খানা বড় করে বলে আমি ভাবলাম বুঝি এই মেয়েটাই একদিন আমার জা হয়ে আসবে। তাই আনসোশ্যাল দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সোমেন খুব হাসল, বলল, মেয়েদের সঙ্গে একটু মিশলেই প্রেম হয়, আর প্রেম হলেই বিয়ে হয়, না? তুমি একদম সরল-অঙ্ক।

আহা, দোষ কী! ভাব হলে বিয়ে হওয়াই তো ভাল। মেয়েটা তোমাকে খুব পছন্দ করে। তোমাকে ছাড়া কাউকে চেনেই না। বিয়ে হলে বেশ হত। আমি তো গরিব ঘরের মেয়ে, তোমার বউ অন্তত বড়ঘরের মেয়ে হলে ব্যালান্স হয়ে যেত। সত্যি বলছ ব্রেন টিউমার?

সত্যি। না হলে কি আমাকে পাত্তা দিত নাকি? অসুখ হয়েছে বলেই মনটা নরম। সবাইকেই পছন্দ করে ফেলে। যাও, অনেক বকিয়েছ, চা দাও তার বদলে।

বীণা উঠে গেল।

বিকেলে গাব্বুকে পড়াতে গেছে সোমেন। পড়ার ঘরে ঢুকেই চমক খেল। গাব্বু যে চেয়ারে বসে সেখানে খুব সুন্দর মতো একটি মেয়ে বসে আছে। পরনে চমৎকার একটা লালপেড়ে সাদা খোলের বিষ্ণুপুরী শাড়ি। মেয়েটি টেবিলের ওপর ঝুঁকে কী যেন পড়ছে। তার এলোচুলের ঢল নেমে এ-পাশে মুখটাকে আড়াল করেছে। সোমেন ঘরে ঢুকতে মেয়েটা মুখ ফেরাল না।

তারপর সেই নিবিড় নরম এলোচুলে ঢেউ দিয়ে মুখটা নড়ে উঠে সোমেনের দিকে চকিতে ফিরল। তখনই ভারী পাওয়ারের চশমাটা চিনতে পারে সোমেন।

অণিমা হেসে বলে, এসো সোমেন।

অণিমাকে চেনাই যায় না। ইউনিভার্সিটিতে থাকতে একটু রুক্ষ ছিল, বিয়ের আগে দিল্লি ঘুরে এসে একটু ভাল হয়েছিল চেহারা। কিন্তু এখন কে যেন ওকে নতুন করে গড়েছে। শরীরে মাংস বা চর্বি লাগলেই মানুষ সুন্দর হয় না। সুন্দর হওয়া এক রহস্যময় অ্যালকেমি। সৌন্দর্যের সবটুকু শরীরে থাকে না বুঝি। অণিমার শরীরকে ঘিরে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের আবহ। তার চারধারের বাতাসটুকু, আলোটুকু-গন্ধটুকু সবই যেন সুন্দর হয়ে আছে। বড় বেশি দূরের আর বড় বেশি অভিজাত হয়ে গেছে অণিমা।

সোমেন হাঁ করে চেয়ে ছিল। একটা ঢোঁক গিলে বলল, কবে এলে?

কাল।

সোমেন মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল, সিন্ধ্রির জলবায়ু তো বেশ ভালই অণিমা।

অণিমা খুব শান্ত ও সুখী একরকম হাসি হাসল। এবং সোমেন খুব দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারল, অণিমার মনে আর কোনও দুঃখ নেই। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ও সোমেনের ঘটনাটা থেকে মুক্ত হয়েছে।

অণিমা বলল, হাওয়া বদল করতে সিন্ধ্রিতে যেয়ো এক বার।

সোমেন খুব বিষণ্ণ বোধ করছিল হঠাৎ, তবু যথেষ্ট চতুর হওয়ার চেষ্টা করে বলে, ভাল আছ তো দেখতেই পাচ্ছি। তবু জিজ্ঞেস করি অণিমা, কেমন আছ?

অণিমা ভ্রূ কুঁচকে বলে, ও আবার কী রকম প্যাঁচালো কথা সোমেন?

সোমেন স্থির চোখে চেয়ে বলে, অণিমা, কেমন আছ?

অণিমা খুব হাসল, তারপর হাসি থামিয়ে একটু স্মিতভাবে বলল, ভাল আছি বলতে ভয় করে সোমেন। বললে যদি আর ভাল না থাকি।

সোমেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অণিমা, পৃথিবীতে মেয়েদের মতো এত সুখী কেউ নেই।

ওমা! কী বলে রে ছেলেটা!

সত্যি। যদি মেয়ে হতাম তবে চাকরির চিন্তা থাকত না। এই বয়সে একটা বিয়ে হয়ে যেত। আর

বিয়ের আগেকার সব কিছু ভুলে গিয়ে সুখী হতে সময় লাগত না।

অ্যাই! বলে ধমক দিল অণিমা, বিয়ের আগে তোমার আবার কী ছিল, যন্ত্রণা যা ছিল তা তো আমার ছিল।

সোমেন সেটা জানে, তবু দুঃখও তো কত রকমের হয়। আজ যেমন মনে হচ্ছে সে অণিমাকেই ভালবাসত। ভালবাসাটা আজ যেন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এক তীব্র টান আজ কূল ভাঙছে, পায়ের নীচের মাটি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বলল, সে তুমি বুঝবে না।

মিথ্যে কথা বোলো না সোমেন।

বলে অণিমা চেয়ে রইল সোমেনের দিকে। চোখে বুঝি একটু অনুযোগ, একটু স্নেহ।

সোমেন বলল, অণিমা, এখনও চাঁদ-টাঁদ ওঠে, ফুল-টুল ফোটে, লোডশেডিং হয়...

অণিমা দুটি গায়ে-হলুদের সময়কার মতো সুন্দর লালচে-হলুদ রঙের হাতের পাতায় লজ্জায় মুখ ঢাকল। বলল, অ্যাই।

সোমেন ঝুঁকে বলে, কথাটা এখনও বলা হয়নি স্পষ্ট করে। তবু জিজ্ঞেস করি—অণিমা, এখনও কি আমাকে...

অণিমা মাথা নেড়ে বলে, না অমরনাথ, লোকে পাখি পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনও হইবে না। বলে একটু দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলল, বলো তো কোথা থেকে বললাম।

সোমেন মৃদু হেসে বলে, রজনী। তারপর গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলে, এই বুঝি মনের কথা?

নয় কেন? বলে অণিমা উঠল। টেবিলে ভর রেখে ঝুঁকে বলল, তুমি আমার কে জানিতে চাও? এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

কেউই তেমন হাসতে পারল না। চেষ্টা করল অবশ্য।

অণিমা বলল, দাঁড়াও গাব্বুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলে চলে গেল অণিমা। আর তখন অপসৃয়মাণ অণিমার পরনের শাড়িটা লক্ষ করে কী যেন মনে পড়ি-পড়ি করছিল সোমেনের। ভ্রূ কুঁচকে একটু ভাবল সে। তারপর হঠাৎ মাথার ভিতরে বজ্রাঘাতের মতো মনে পড়ল, এ শাড়িটা সে অণিমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে কিনে দিয়েছিল অণিমাকেই। সেই দেড়শো টাকা আজও শোধ দেওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সোমেন। ওই শাড়িটা কি ইচ্ছে করেই পরে বসে ছিল অণিমা, সোমেনকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য? ছি ছি, তা নয়। অণিমা ছোট মনের মানুষ ছিল না কোনও দিনই।

গাব্বু আসতেই সোমেন দাঁড়িয়ে বলল, আজ পড়াব না গাব্বু। শরীরটা ভাল নেই।

হতাশা, ব্যর্থতা আর বিস্বাদে ভরা ভিতরটাকে নিয়ে সোমেন বেরিয়ে পড়ল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগল। দেড়শোটা টাকা এমন কিছু নয়। যখন দেওয়ার কথা মনে করেছে তখন হাতে টাকা ছিল না, যখন টাকা ছিল তখন দিতে ভুলে গেছে। এইসব তুচ্ছ কর্তব্যের অবহেলা কী ভয়ংকর! নিজেকে দেউলিয়ার মতো লাগে। অপমান করতে আর চাবকাতে ইচ্ছে করে নিজেকে। একটু আগে অণিমার সঙ্গে যে চমৎকার সাংকেতিক সংলাপ হচ্ছিল তার সেইটুকুর রেশ গেল কেটে। নিজেকে বড় ছোট লাগছে তার। সোমেন খুব উত্তেজিতভাবে মনে মনে বলল, আই মাস্ট পে হার ব্যাক। আই মাস্ট...

এতই স্তিমিত ছিল সোমেন যে রাতে ঘুমই হল না। নিজেকে অসহ্য বলে মনে হচ্ছে। মানুষের মুশকিল এই যে, দরকার পড়লে সে সব মানুষকে এড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কিছুতেই নিজেকে এড়াতে পারে না। অহরহ সোমেনকে একটা অপদার্থ, ছোটলোক সোমেনের সঙ্গ করতেই হবে, মৃত্যু পর্যন্ত।

নির্ঘুম রাতের শেষে সকালের দিকে একটু বুঝি ঘুমিয়েছিল, বউদি এসে তুলে দিয়ে বলল, বাজারে যাও।

চোখ খুলেই সোমেন বলল, দেড়শোটা টাকা দেবে বউদি?

বীণা অবাক চোখে চেয়ে বলল, আগেও এক বার চেয়েছিলে। কী ব্যাপার, প্রায়ই দেড়শো করে টাকার দরকার হচ্ছে কেন?

সেই দরকারটাই। টাকাটা তখন কারও কাছে পেলাম না। দেবে?

বীণা হাসল। যদিও হাসিটা বড় কষ্টের। বলল, খুব দরকার থাকলে দেব।

খুব দরকার, খুব। না হলে সুইসাইড করব।

আচ্ছা আচ্ছা, তোমার দাম দেড়শো টাকার ঢের বেশি। ওঠো।

সোমেন ঘুমচোখে শুয়ে থেকেই সিগারেট ধরাল। বলল, যাঃ। দেড়শো টাকার দাম আমার চেয়ে অনেক বেশি বউদি, আমি একটা ফ্রড।

তার মানে?

অচল পয়সা। তুমি ইংরিজি জানো না কেন বলো তো! সব কথার মানে বলতে গেলে মুড নষ্ট হয়ে যায়।

যাওয়াই ভাল। আজ তোমার মুড খুব খারাপ। কালও বিকেলে দেখেছি একদম মৌনীবাবা হয়ে আছ। কী হয়েছে?

আমার মৃত্যু হয়েছে বউদি। আই অ্যাম ডেড।

সকালবেলাটায় আকথা বলছ? বাজারে যাও তো।

দেড়শো টাকা দিতে তোমার খুব কষ্ট হবে?

বীণা আবার হাসল। বলল, ও-সব তোমাকে ভাবতে হবে না। দেব বলেছি যখন ঠিক দেব। আর দিয়ে মরে যাব না।

বাজার করে যখন ফিরছিল সোমেন তখন হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। বাড়ির দরজায় যখন প্রায় পৌঁছে গেছে, তখন দেখল, বড়রাস্তার দিক থেকে মা আর দাদা হেঁটে হেঁটে আসছে। মা'র হাতে একটা পুঁটুলি, দাদার হাতে চামড়ার ব্যাগ। দু'জনেরই পোশাক কেমন আধময়লা। উদ্বাস্তুর মতো ভিখিরির মতো আসছে। সম্ভবত বাসে এসে নেমেছে, তারপর এই রাস্তাটুকু হেঁটে আসছে। অথচ একসময়ে দাদা ট্যাক্সি ছাড়া আর কিছু চোখে দেখত না।

সোমেন সিগারেটটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে দাদার হাত থেকে ব্যাগটা নিল। মা তাকে দেখে বলল, ইস্ অফিস টাইমে সব বাসে কী ভিড় কী ভিড়! ট্রেনেও থিকথিক করছে লোক। বাব্বাঃ!

খুব একটা খুশি হল না সোমেন। যেন অচেনা লোকজন এল বাড়িতে। এ কয়দিন নিরিবিলিতে বেশ ছিল। এবার উৎপাত হবে।

মাকে কিছু গম্ভীর ও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ঘরে এসেই তিনি ছোট নাতিকে কোল-সই করে নিয়ে পানের বাটা খুলে বসলেন। রণেনের মুখে কিছু কাটা দাগ, ক্লান্তির চিহ্ন। সোমেন সবই দেখল, কোনও প্রশ্ন করল না। মনটা শুধু আর-এক পোঁচ কালো হয়ে গেল।

ভাইঝিটার নাম আদর করে রেখেছিল বেলকুঁড়ি। বেলকুঁড়ি একটু হইচই ভালবাসে। রেডিয়োগ্রাম ছেড়ে গলা মিলিয়ে গান গায়, নাচে, বাড়িতে লোকজন এলে খুব খুশি হয়। ঠাকুমা আসাতে সে সারা বাড়ি নেচে বেড়াচ্ছে। এক বার দৌড়ে এসে ঠাকুমার বুকের মধ্যে হাত পুরে মুনু ধরে গেছে, এখন হাততালি দিয়ে সুর করে গাইছে—'ঠানু এসেছে, বাবু এসেছে, ঠানু এসেছে, বাবু এসেছে ..'

সোমেন তাকে একটা কর্কশ ধমক দিয়ে বলে, যা তো এখন।

ননীবালা পানের রসে রসস্থ মুখটা ঊর্ধ্বপানে তুলে পানের পিক যাতে বের না হয় এ-রকম সতর্ক হয়ে বলেন, যাবে কোথায়! কলকাতার বাড়িঘরে থাকে, যা বললেই তো আর হুট করে বেরিয়ে যেতে পারে না। কোন মাঠঘাট ময়দানটা আছে এখানে যে যা বলতেই যাবে।

সোমেন গম্ভীরভাবে জামা পরতে পরতে বলে, তা হলে আমিই যাই।
ননীবালা বড় চোখে তাকিয়ে বলেন, কোথায় যাবি?
তাতে তোমার কী দরকার! যাব কোথাও।
ননীবালা পিক ফেলে এসে বললেন, বাড়িতে এখনও ভাল করে পা দিইনি, অমনি সব বিষ হয়ে গেল!
সোমেন বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল ফের।
কিন্তু জায়গা নেই। কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

অনেক ভেবেচিন্তে মধুমিতাকে একটা ফোন করল সোমেন।
ফোনের কাছেই সারাদিন বসে থাকে মধুমিতা। হয় ওকে কেউ ডাকে, অনেকক্ষণ কেউ না ডাকলে ও-ই কাউকে ডাকে।
মধুমিতার উৎসুক গলা, বলল, কে?
আমি সোমেন। এক বার আসব? আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে।
এক্ষুনি। উঃ, কতক্ষণ একা বসে আছি।
কী চমৎকার বাড়ি মধুমিতাদের! সোমেনদের পচা ভাড়াটে বাড়ি থেকে মাত্র সাত মিনিট হাঁটলেই এই স্বর্গের বাড়ি। রিখিয়াদের চেয়েও এরা অনেক বড়লোক।
মধুমিতা তার ঘরে নিয়ে গেল। চাকরকে ঠান্ডা কিছু দিতে বলে মুখোমুখি বসল সোফায়। ওর প্রিয় ভঙ্গি পা তুলে হাঁটু দু'হাতে জড়িয়ে বসা। বসে বলল, ডেট ঠিক হয়ে গেছে।
কীসের?
ইমপ্রিজনমেন্ট টিল ডেথ। কাল ভেলোরে চলে যাচ্ছি। সব ঠিক হয়ে গেছে।
ওঃ। বলে চুপ করে থাকল সোমেন।
মধুমিতাকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল না। ওর গোল মুখখানায় একটা চাপা হাসির আলো খেলা করছে। হঠাৎ খুব জোর একটা শ্বাস ফেলে বলল, রিলিফ। একটা একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি।
সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো। সোমেন সান্ত্বনা দিয়ে বলে।
মধুমিতা তার বড় চোখে চেয়ে বলল, শোনো, তুমি কিন্তু বড্ড মেয়েদের সঙ্গে মেশো।
কে বলল?
আমি জানি। তোমার অনেক মেয়ে বন্ধু।
সোমেন এই পুঁচকে মেয়েটার মুখে জ্যাঠা কথা শুনে একটু উত্তপ্ত হয়ে বলে, তাতে কী?
পুরুষমানুষ মেয়েদের সঙ্গে বেশি মিশলে খারাপ দেখায়। অপরাজিতার সঙ্গে যেদিন তুমি ক্যারম খেলছিলে, আমার খুব খারাপ লাগছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা মেয়ের সঙ্গে একটা পুরুষ খুটখাট ক্যারম খেলছে, এই কি পুরুষের মতো কাজ?
সোমেন আর রাগে না। হাসে। বলে, শোনো মধু, তুমি বড় পাকা। আমার বয়স কত জানো?
মধুমিতা মাথা নেড়ে বলে, সে যাই হোক, আমি জানতে চাই না। আমার ওয়েলউইশারদের সকলের ভাল হোক, মরবার আগে আমি সেটুকু চাই।
সোমেন হতাশভাবে চেয়ে থেকে বলে, আমার জন্য কী চাইলে তুমি।
মেয়েদের সঙ্গে মিশো না। যখন একা লাগবে তখন একাই থেকো। আর একা বসে চিন্তা কোরো যে, তোমার চার দিকে একটা বিশাল দেশ। সে দেশটা কাঙাল আর ভিখিরিতে ভরা। থিংক সামথিং গুড ফর দেম।
সোমেন হেসে বলে, তুমি বড় পাকা মধু।
মধুমিতা মাথা নাড়ল। চাকর ট্রেতে করে ঠান্ডা আমের শরবত দিয়ে গেল। গেলাসটা সোমেনের

হাতে তুলে দিয়ে মধুমিতা বলে, সব সভ্য দেশেই আমার বয়সি ছেলেমেয়েরা আরও অনেক বেশি কনশাস। একে পাকা বলে না, জাস্ট ওয়েল-ইনফর্মড। সোমেনদা, তোমার কোনও আইডিয়াল নেই কেন? আইডিয়াল না থাকলে মানুষের স্ট্রং ওপিনিয়ন তৈরি হয় না। ব্যক্তিত্বও থাকে না।

সোমেন ঠান্ডা শরবত খেতে খেতে আবার উত্তপ্ত হল। কান আগুনের মতো গরম। বলল, তাই বুঝি?

মধুমিতা মৃদু একটু হেসে চুলগুলো সরিয়ে দিল পিছনে। কোলের বালিশটা এক বার ছুড়ে ফেলে ফের কুড়িয়ে নিল। বলল, তুমি টের পাও না যে তুমি কত ডিটাচড? তোমার চার দিকের সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্কই তৈরি হয়নি। কোনও ব্যাপারেই তোমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। কেবল মাঝে মাঝে চাকরির কথা বলো। চাকরিই কি সব? কত ছেলে জেলখানায় পচছে তা জানো? ওরা কিছু করতে চেয়েছিল। ইউ মাস্ট বি কনশাস অ্যাবাউট ইয়োর এনভিরনমেন্ট।

মধু, আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে।

মধুমিতা উঠে এল সোমেনের পাশে। অনায়াসে পুরুষ-বন্ধুর মতো কাঁধে হাত রেখে বলল, শোনো সোমেনদা। উই আর কমরেডস। নই কি? অ্যান্ড কমরেডস আর অলওয়েজ লাভারস। আমি সব সময়ে চাই, আমি যাদের ভালবাসি তারা সবাই আরও লাভেবল হোক। তুমি রাগ কোরো না।

সোমেন মুখ ফিরিয়ে মধুমিতার মুখ দেখল। খুব কাছেই ওর মুখ। গোলপানা, সুন্দর। এত কাছে বসে আছে বলে ওর গা থেকে মেয়েদের শরীরের অবধারিত রূপটান এবং সুগন্ধীর গন্ধ আসছে। আর সে-গন্ধ ভেদ করে আরও একটা মাদক গন্ধ আসে। কিশোরীর শরীরের স্বেদগন্ধ। কিন্তু তবু ওর প্রতি কদাচিৎ শরীরের আকর্ষণ বোধ করেছে সোমেন। কোথাও যেন ওর মেয়েমানুষির মধ্যে পুরুষালির একটু ভেজাল ঢুকে আছে। প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই মনে হয়। মধুমিতার হাঁ-মুখ থেকে মৃদু শ্বাসবায়ু এসে স্পর্শ করল সোমেনের মুখ। সোমেন মাথা নেড়ে বলল, ঠিক মধু। তুমি ভুল বলোনি। আই হেট মাইসেলফ। নিজের ওপর আমার মাঝে মাঝে বড় ঘেন্না হয়। কিন্তু নিজের সঙ্গ কী করে ছাড়ি বলো তো।

মধুমিতা তার চুল নেড়ে দিয়ে বলে, তুমি একটু 'নাটি' সোমেনদা। সেইজন্যই তোমাকে ভালবাসতাম।

বাসতে! এখন বাসো না?

মধুমিতা হেসে বলে, বাসি। এখন আমি কত লোককে যে ভালবাসতে পারি। মরে যাব তো, তাই এখন বড্ড সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

মধুমিতার মুখখানা আর-এক বার ভাল করে দেখে নিল সোমেন। দেয়ালের গায়ে টেলিফোন বাজছে। মধুমিতা চমকে উঠে দাঁড়াল, বলল, কে ডাকছে!

বলে ছুটে গেল। কী গভীর আগ্রহে তুলে নিল টেলিফোন, বলল, জয়! ওঃ জয়! কমরেড, কাল চলে যাচ্ছি। আই লাভ ইউ ডারলিং, ইউ নো...

ঠান্ডা স্রোত নেমে যাচ্ছে কণ্ঠনালি বেয়ে। তবু ভিতরের জ্বর উপশম হচ্ছে না সোমেনের।

সোমেন উঠে দাঁড়াল। টেলিফোন রেখে চলে এল মধুমিতা, অবাক হয়ে বলল, চলে যাচ্ছ! আড্ডা মারবে বললে যে!

না, যাই। বেলা হল, মা বসে থাকবে।

মধুমিতার চোখ একটু ছলছলে হয়ে এল, কিন্তু হাসিটা অনাবিল রইল মুখে। হঠাৎ ডান পাশের গালটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কিস মি গুডবাই।

সোমেন ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল না, হাত দিয়ে ছুঁল ওর গাল, বলল, ভাল হবে। তোমার ভাল হবে।

মধুমিতা তার হাতটা দু'হাতে চেপে নিজের গালে ঘষল খানিক। আবেগে, ভালবাসায়। বলল, আর কখনও দেখা হবে না। মধুমিতাকে মনে রেখো।

কোনও দিন কাঁদে না সোমেন। আজ রাতে একা শুয়ে চোখের জলে বালিশ ভেজাল। নিজের মনে নিজেকে ডেকে বলল, কিল ইয়োরসেলফ, কিল ইয়োরসেলফ রাসকেল।

॥ আটান্ন ॥

কুমারস্বামী সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন, কী খাবি তোরা? অ্যাঁ! আম খাবি, নাকি রসগোল্লা? অজিত, তুই?

অজিত আজকাল একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। জলে ডুব দিলে যেমন চার দিক আবছায়া দেখায়, তেমনি তার বাস্তববোধ আজকাল বড় আবছা। সে অপলকে কুমারস্বামীর দিকে চেয়ে ছিল। প্রশ্ন শুনে একটু নড়ে উঠে গভীর শ্বাস ছেড়ে বলে, আপনি যা দেবেন।

ভক্তবৃন্দ অপলকে চেয়ে আছে কুমারস্বামীর দিকে। সবাই জানে, এবার বাবা বিভূতি দেখাবেন। কারও শ্বাস পড়ে না। কুমারস্বামী খুব সপ্রতিভ হেসে হাতটা শূন্যে তুলে এত দ্রুত আঙুলের একটা ঘূর্ণায়মান মুদ্রা তোলেন যে আঙুলগুলো যেন অদৃশ্য হয়ে যায় বাতাসে। পরমুহূর্তেই দেখা যায় তাঁর হাতে একটা ভ্যাকুয়াম-প্যাকড রসগোল্লার টিন।

জয় বাবা! জয় বাবা! ধ্বনি করে ওঠে ভক্তেরা। সেই প্রথম দিন এসে অজিত যে ম্যাজিস্ট্রেটকে চিত হওয়া অবস্থায় দেখেছিল আজ সে পাশেই বসেছে। সে লোকটা অজিতের উরু খামচে ধরে বলে উঠল, দেখেছেন! ইনিই হচ্ছেন দি গড। দি গড!

এই বলে লোকটা সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গিয়ে কুমারস্বামীর পা ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু তাঁর সব সময়ের জন্য যাঁরা সেবায় নিযুক্ত আছেন এমন অন্তরঙ্গ শিষ্যদের একদল ধমক দিয়ে বলল, ছোঁবেন না! ছোঁবেন না!

লোকটা ফিরে এসে অজিতের পাশে বসে বলল, মনে ছিল না, হাইপারসেনসিটিভ অবস্থায় ওঁকে ছুঁতে নেই।

কুমারস্বামী আবার হাত বাড়িয়ে একই মুদ্রায় দ্রুত কয়েকটা আম পেড়ে আনলেন শূন্য থেকে। ডাকলেন, অজিত!

অজিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল। পামিং নেই পাসিং নেই, কোটের ভিতর থেকে কোনও গুপ্ত ইলাস্টিকের ব্যান্ড দিয়েও আনা হচ্ছে না, তবু কোথা থেকে আম আসছে। রসগোল্লার টিন আসছে! এই কি তা হলে বহুশ্রুত অলৌকিক? এই কি সিদ্ধপুরুষ!

আজ্ঞে। অজিত নিলডাউনের ভঙ্গিতে বসে বলল।

কী খুঁজছিস? পামিং আর পাসিং? বলে চমৎকার ভরাট প্রাণময় হাসি হাসেন কুমারস্বামী। মাথা নেড়ে বলেন, ও-সব নয় রে!

বলে কুমারস্বামী খুব অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলেন। যিশুর মতো সুন্দর মুখশ্রী কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল! তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যরা কৌটো খুলে রসগোল্লা বিতরণ করছে সবাইকে, আম ভাগ করে দিচ্ছে। মহাপ্রসাদ বলে সবাই কাড়াকাড়ি করে। ঠিক এই সময়ে কুমারস্বামী খুব নিচু, অদ্ভুত কান্নায় ভরা মাদক গলায় গাইতে থাকলেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...। কোথা থেকে একটা ছোট্ট খঞ্জনির শব্দ হতে লাগল। ঘরের আলোটা পালটে সবুজ হয়ে গেল। কী সুর! কী সুর! বুক নিঙড়ে যেন কান্না আর ভালবাসা তুলে আনা হচ্ছে।

অজিত চোখ মুছল। তার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে একটা উতরোল ঢেউ। সব ময়লা আবর্জনা ধুয়ে গেছে, একাকিত্ব মুছে গেছে! আর সংসারে ফিরতে ইচ্ছে করে না অজিতের। কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

গান শেষ হল। কুমারস্বামী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। রাত হয়েছে, একে একে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে সবাই। অজিত একটু এগিয়ে বসে বলল, বাবা, আমার যেতে ইচ্ছে করে না। আর কোথাও এমন শান্তি নেই।

কুমারস্বামী হাসলেন। বললেন, থাকবি? বলে অন্তরঙ্গ একজন শিষ্যের দিকে চেয়ে বললেন, অজিত আজ থাকবে। ব্যবস্থা করে দিস।

অজিত একটা শ্বাস ফেলল। শীলা ভাববে, সে-কথাটাও খোঁচা দিচ্ছে মনে। কুমারস্বামী সেটা টের পেয়েই যেন যারা চলে যাচ্ছিল তাদের একজনকে ডেকে বললেন, অরুণ, তুই তো টালিগঞ্জের দিকেই থাকিস, অজিতের বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাস। ও আজ আমার কাছেই থাকবে।

বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমারস্বামী বিদায়ী মানুষজনের দিকে চেয়ে বললেন, কারও বাড়িতে আমি বেশি দিন থাকতে পারি না। পচা সংসারের নষ্ট গন্ধ পাই। অন্তরাত্মা ঘুলিয়ে ওঠে। তাই ভাবছি এবার চলে যাব।

ম্যাজিস্ট্রেট সুদ্ধু সব লোকজন ফিরে দাঁড়ায়। চলে যাবেন? কুমারস্বামী চলে যাবেন?

অরুণ ঘোষাল ফিরে এসে প্রায় আছড়ে পড়ে সামনে, কেন বাবা? আমরা কার কাছে যাব তা হলে?

কুমারস্বামী মিষ্টি করে হেসে বলেন, কলকাতায় একটা আশ্রম তৈরি করে দে। থাকব।

দেব। কথা দিলাম। দেব। ম্যাজিস্ট্রেট বলল।

পেটের মধ্যে বাচ্চাটা নড়েচড়ে। মাঝখানে বর্ষাকালটা। শরতের গোড়ার দিকেই ছেলে হওয়ার কথা। বর্ষাটাও এবার জোর নেমেছে। কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধের কিছু পর একটা লোক গাড়ি করে এসে খবর দিয়ে গেল অজিত আজ ফিরবে না। কুমারস্বামীর কাছে থাকবে।

রাতে শীলার ভাল ঘুম হয়নি। দুশ্চিন্তা। কুমারস্বামীর কথা সে আজকাল খুব শোনে অজিতের মুখে। অজিত বলে, এতদিনে একটা যথার্থ মানুষ দেখলাম, যার ক্ষমতা আছে।

শীলা দেখেনি। কিন্তু মনের ভিতর কেমন একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দেয়। সে শুনেছে এই ধরনের মানুষেরা সম্মোহন জানে, গুপ্তবিদ্যা জানে। মারণ উচাটন কত কী করতে পারে। তাই একটা অনির্দিষ্ট ভয় আর সন্দেহ হয়। অজিত আজকাল সন্ধের পর ওইখানেই থাকে, অনেক রাতে ফেরে। কাল ফিরল না। তার মানে এখন প্রায় রাতেই এ-রকম হবে। মাঝে মাঝে ফিরবে না। কালক্রমে একেবারেই ফিরবে না হয়তো। কে জানে!

আজ সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ করেছে। অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শীলা অনেক বেলায় উঠল। পেটের মধ্যে সারারাত দস্যি ছেলে ফুটবল খেলে আজকাল। পরিষ্কার টের পাওয়া যায়, ছেলেটা এক বার পেটের এপাশে ঠেলে উঠছে, একটু বাদেই আবার ওপাশে মাথা চাড়া দেয়। ওর কি গরম লাগে পেটের ভিতর? ওর কি খিদে পায়? ও কি মাকে দেখার জন্য খুব অস্থির?

পরদিন রবিবার। সারা সকাল অজিত এল না। দুপুরও গড়িয়ে গেল। শীলা অল্প একটু খেয়ে এসে শুয়ে রইল। খাওয়ার ইচ্ছেই ছিল না, কিন্তু সে না-খেলে ছেলেটাও পেটের মধ্যে উপোসি থাকবে সেই ভয়ে খেল। প্রাণটা বড় আনচান করে আজ। বিয়ের পর কখনও এমন হয়নি যে তারা প্রায় বিনা কারণে পরস্পরকে ছেড়ে থেকেছে। খুব ভেবে দেখল শীলা, না তারা একদিনও কেউ কাউকে ছেড়ে থাকেনি। কাল রাতেই প্রথম।

ঠিক দুপুর গড়িয়ে সদরের কড়া নড়ে উঠল। একটু ঝিমুনি এসেছিল শীলার, তবু ঝাঁকি খেয়ে

উঠল। এতই ত্রস্ত পায়ে ছুটে এল যে আঁচলটা পর্যন্ত কুড়োনোর সময় হয়নি। দীর্ঘ আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছিল। আগ্রহে ব্যগ্রতায় সে তাড়াতাড়ি ছিটকিনি খুলে খুব হতাশ হল। অজিত নয়। সুভদ্র।

সুভদ্র একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে। অথচ শীলা তখন হাঁ করে তাকিয়ে। যেন-বা তার বিশ্বাস হচ্ছে না যে, অজিত আসেনি। শীলার মুখের দিকে চেয়েই সুভদ্রর হাসি মিলিয়ে গেল। বলল, কী হয়েছে?

শীলা সচেতন হয়ে তার আঁচল কুড়িয়ে নিল। কোনও কথা না বলে পিছু ফিরে চলে এল ভিতরে। পিছনে সুভদ্র। এক বার অস্ফুট গলায় সুভদ্রকে 'বসুন' বলে শীলা বাথরুমে চলে গেল সোজা। দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল। দুপুরে যা খেয়েছে সব অম্বল হয়ে উঠে আসছে গলায়। বুকে চাপ ব্যথা। গলায় আঙুল দিয়ে টক জল বমি করল শীলা। ঠান্ডা জলে মুখ-চোখ ঘাড় গলা ভিজিয়ে নিল।

অনেকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলল, সুভদ্র, আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন?

কেন বলুন তো! সুভদ্র খুব উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে আপনার?

এতক্ষণ কেবল দুশ্চিন্তা ছিল। শুকনো গলা শুকনো মুখ নিয়ে সময় কাটিয়েছে শীলা। সুভদ্রর প্রশ্ন শুনে হঠাৎ বুকের মধ্যে কান্নার বিদ্যুৎ চমকায়। বৃষ্টি আসে।

কান্নাটা কিছুতেই চাপতে পারে না শীলা। ঠোঁট কেঁপে ওঠে, চোখ ভরে নির্লজ্জ জল জমে উঠে গাল ভাসিয়ে নামে। আঁচলে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ থম ধরে থাকে সে, তারপর বলে, বাপের বাড়ি যাব।

কেন?

ও কাল রাতে ফেরেনি। বলে শীলা শূন্যের দিকে একটু চেয়ে থাকে। সুভদ্র 'ফেরেনি?' বলে যে বিস্ময় প্রকাশ করে তার কোনও উত্তর দেয় না শীলা। অন্যমনস্কভাবে বলে, আমার ছোট ভাইকে পাঠাব একটু খোঁজ নিতে।

অজিতদা কোথায় গেছেন আপনি জানেন?

জানি। কুমারস্বামী নামে একজন সিদ্ধপুরুষের কাছে।

সুভদ্র ভারী অবাক হয়ে বলে, কুমারস্বামী? গর্চা লেনের কুমারস্বামী নাকি? ডাক্তার হেমেন বিশ্বাসের বাড়িতে যে থাকে!

শীলা বড় বড় চোখ তুলে বলে, আপনি জানেন?

মুখটা বিকৃত করে সুভদ্র বলে, জানব না কেন? একটা ফ্রড। আমার বাবাও ওর পাল্লায় পড়েছিল। অনেক কষ্টে ছাড়িয়েছি।

শীলা আগ্রহের সঙ্গে বলে, ফ্রড?

সুভদ্র হঠাৎ অদ্ভুত হেসে বলে, অজিতদা ওর পাল্লায় পড়লেন কী করে? উনি তো পলিটিক্স করা লোক, এল আই সিতে ট্রেড ইউনিয়ন করেছেন, পাক্কা মার্কসিস্ট মানুষ, উনি ধাপ্পায় ভুলবার লোক তো নন!

শীলা একটু অসন্তুষ্ট হয়। বলে, সুভদ্র, অত কথা বলছেন কেন? এখন কথার সময় নেই। দেরি হলে আমি গিয়ে সোমেনকে পাব না। ও বেরিয়ে যাবে।

সুভদ্র সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলে, আপনার ভাইকে পাঠানোর দরকার কী? প্রয়োজন হলে আমিই যেতে পারি, আপনিও সঙ্গে চলুন, সোজা কুমারস্বামীর ডেরায় গিয়ে কেলো করে দিয়ে অজিতদাকে ধরে আনব। ইয়ারকি নাকি! কার্ল মার্কসের ভক্তকে একটা ফ্রড হামবাগ হিপনোটাইজ করে রেখে দেবে? দরকার হলে...

শীলা ধমক দিয়ে বলল, খুব হয়েছে। এটা কার্ল মার্কস ভারসাস কুমারস্বামীর লড়াই নয় সুভদ্র। এটা আমার খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি আমার স্বামীকে চিনি, ও ঝট করে কাউকে শ্রদ্ধাভক্তি করে

না। হইচই করে ওকে ফেরানো যাবে না।

সুভদ্র বিরক্তির শব্দ করে বলে, সে না হয় হইচই না করলাম, কিন্তু অজিতদা তো খুব লজিকাল লোক, ওঁকে তো ব্যাপারটা বোঝাতে পারি। যে লোকটা রিজন মানে তাকে বোঝানো সহজ।

শীলা মাথা নেড়ে বলে, না সুভদ্র, ও-সবে দরকার নেই। আমি কুমারস্বামীকেও চটাতে চাই না। বহুকাল বাদে আমাদের সন্তান হতে যাচ্ছে, আমরা খুব ভয়ে ভয়ে আছি। এ সময়ে কারও অভিসম্পাত আমাদের পক্ষে ভাল হবে না।

সুভদ্র দাঁড়িয়ে ছিল। হতাশভাবে বসে পড়ে বলল, আপনিও এ-রকম? অভিসম্পাত বলে কিছু আছে, কিংবা তাতে কারও কোনও ক্ষতি হয় এটা কি আজকাল কেউ মানে?

শীলা বিরক্ত হয়ে বলে, আমি তর্ক করতে চাই না। এটা তর্কের সময় নয়। বিয়ের পর এই প্রথম আমরা একসঙ্গে থাকিনি। প্রবলেমটা আপনি বুঝবেন না। একটা ট্যাক্সি ডেকে আনুন, আমি গিয়ে সোমেনকে পাঠাব।

যাচ্ছি। বলে সুভদ্র উঠল। দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে বলল, আপনি নিজে যাবেন না?

শীলা মাথা নেড়ে বলল, না।

কেন? আপনার কিন্তু যাওয়া উচিত।

না সুভদ্র, আমার এ অবস্থায় ও-সব লোকের কাছে যাওয়া উচিত নয়। ওরা কত কী করতে পারে! হয়তো রেগে গিয়ে আমার সন্তান নষ্ট করে দেবে। আমি যাব না।

সুভদ্র একটু হাসল, বলল, কিন্তু অজিতদা আপনি গিয়ে দাঁড়ালেই চেঞ্জ হয়ে যাবেন।

শীলা বড় বড় চোখে সুভদ্রর দিকে চেয়ে ছিল। কিন্তু সে সুভদ্রকে দেখছিল না। সে চেয়ে থেকে বহু দূর পর্যন্ত নিজের বিবাহিত জীবনটাকেই দেখতে পাচ্ছিল। ক্রমান্বয়ে একসঙ্গে এক বিছানায় থেকেও এই দীর্ঘকালে তারা যেন কিছুতেই স্বামী-স্ত্রী হয়ে উঠতে পারেনি। কোথাও একটা তার আলগা হয়ে আছে। একটা স্ক্রু ঢিলে, তারা পরস্পরের প্রতি গভীর বিশ্বস্ত নয়।

শীলার ঠোঁট কাঁপল, মাথাটা নড়ে উঠল। অস্ফুট গলায় বলল, ও আমাকে ভালবাসে না সুভদ্র। নইলে কেন কাল রাতে ও ফেরেনি? কেন ফেরেনি...

বলতে বলতে শীলা উঠে দৌড়ে চলে গেল শোওয়ার ঘরে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুতে গিয়েই ভুল করল শীলা। আবেগে খেয়াল ছিল না। মস্ত বড় হয়েছে পেট, তার মধ্যে ছেলে। উপুড় হতে গিয়ে বিছানার কানায় একটু ব্যথা পেল শীলা। ব্যথাটা খেয়াল করল না। কাঁদতে লাগল।

একটু বাদে ট্যাক্সির ভেঁপু বাজতে উঠে শাড়ি পালটাতে লাগল। তখনও পেটে একটা ফিক ব্যথা লেগে আছে। ব্যথার অস্ফুট শব্দ করল শীলা। সাড়ে আটমাস চলছে। আয়নায় দেখল, তার ঠোঁট দু'খানা সাদা, মুখটাও কেমন যেন। ক্লিষ্ট একটু হেসে আপন মনে বলল, ও ছেলে, তোর বাপটা এমন পাগল কেন রে? আমাকে কেন একটুও ভালবাসে না বল তো! আমি কি হ্যাক ছিঃ?

ট্যাক্সির এক কোণে সুভদ্র, অন্য কোণে শীলা। মাঝখানে অনেকটা দূরত্ব। শীলার চোখ দুটো এখনও চাপা কান্নায় লাল হয়ে আছে। মাঝেমধ্যে আঁচলে চোখ মুছছে। এ সময়ে কান্না লুকোনো যায় না। কাল রাতে বাসায় না-ফিরে অজিত যেন শীলার পায়ের তলার মাটি ভয়ংকর ভূমিকম্পে কাঁপিয়ে দিয়েছে। ও কেন অমন করল কাল? ও কি জানে না শীলা ওকে কত ভালবাসে?

কুমারস্বামী সম্বন্ধে আপনি কী জানেন সুভদ্র? শীলা খুব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

সুভদ্র সস্তা সিগারেট খায়। আজকাল কোনও কোনও গন্ধ শীলার সহ্য হয় না। ছেলেটা পেটে আসার পর থেকেই সে যেমন ভাতের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, সেন্টের গন্ধ, সিগারেটের গন্ধ, দেশলাইয়ের গায়ের গন্ধ পেলেই বমি পায়। সুভদ্র সিগারেট ধরিয়েছে, শীলা নাকে রুমাল চাপল। এক বার ওয়াক করল। সামলে গেল। সুভদ্র তাকিয়ে আছে। শীলা দ্রুত নিচু গলায় বলল, সিগারেট ফেলে দিন, প্লিজ।

সুভদ্র সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ফেলে দেয়। বলে, শরীর খারাপ নয় তো শীলাদি।

বহুকাল শীলাকে দিদি বলে ডাকে না সুভদ্র। আজ ডাকল। শীলা এক বার তাকিয়ে ফের কাঁপা ঠোঁটে বলল, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না, জানেন? এই বাচ্চাটার জন্ম দিতেই আমার সব ভাইটালিটি শেষ হয়ে যাবে।

কী সব আবোলতাবোল বলছেন!

শীলা বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে বলে, মরে গেলে খুব ভাল হবে। ও বুঝবে আমি ওর কে ছিলাম। সারা জীবন বুক চাপড়াবে। এ-কথা বলেই শীলা আবার ভ্রূ কোঁচকায়। মাথা নাড়ে। আপন মনেই বলে, অবশ্য তা হয় না। পুরুষমানুষদের তো চিনি। মাসখানেক কান্নাকাটি করবে, হা-হুতাশ করবে, তারপর ফের টোপর মাথায় ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াবে। তত দিন যদি বাচ্চাটা থাকে তো সেটা গিয়ে পড়বে সৎমায়ের হাতে। মাগো! ভাবতে পারি না।

সুভদ্র খুব হাসল, বলল, কত ভাবনা ভেবে রেখেছেন! মরেই যদি যাবেন তো অত ভাবনা কেন? মরার পর যা খুশি হোক, আপনি তো দেখতে আসছেন না।

শীলা ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলে, কে বলল দেখতে আসব না! ঠিক আসব। দরকার হলে ভূত হয়ে এসে সতীনের ঘাড় মটকাব।

সুভদ্র বেসামাল হেসে বলে, একেই বলে উইল পাওয়ার।

শীলা গম্ভীর হয়ে বলে, কুমারস্বামী সম্বন্ধে আপনি কী জানেন বললেন না!

সি এম ডি এ আনোয়ার শা রোড খুঁড়ে ফেলেছে, চওড়া হচ্ছে রাস্তা। তাই ট্যাক্সি রসা রোড ধরে অনেক ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

সুভদ্র মৃদু হেসে বলে, লোক ঠকানোর জন্য যা যা দরকার এ লোকটার সব আছে। সুন্দর চেহারা, চমৎকার কথাবার্তা, খুব ভাল কীর্তন করে। এক বার ওর কীর্তন শুনে আমার মতো পাষণ্ডের চোখেও জল এসেছিল।

বলেন কী! কীর্তন শুনে! তা হলে আপনারও ও-সব দুর্বলতা আছে!

সুভদ্র মাথা নেড়ে বলল, না। কিছুমাত্র ধর্মীয় দুর্বলতা আমার নেই। একজন বাঙালি হিন্দু পরিবারের ছেলের পক্ষে যতখানি অবিশ্বাসী হওয়া সম্ভব আমি ততখানি অবিশ্বাসী। তবে কী জানেন শীলাদি, ওই কীর্তন-টির্তন যারা বানিয়েছে তারা ছিল মস্ত সাইকোলজিস্ট। মানুষের প্রবণতা এবং সেন্টিমেন্টের জায়গায় ঘা দেওয়ার মতো করেই তারা ওইসব গান তৈরি করে গেছে। তেমন তেমন কীর্তন শুনলে ঘোর নাস্তিকেরও চোখে জল আসবে। তার কারণ ধর্মভাব নয়, কতগুলি মানবিক ভাবপ্রবণতা। আর আমিও তো পাষণ্ড নই। বলে হাসল সুভদ্র, হঠাৎ চমৎকার সুরেলা গলায় একটা লাইন গাইল শীলাকে চমকে দিয়ে—রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই, ধূয়াঁর ছলনা করি কাঁদি. .গেয়ে উঠেই বলল, এ গান শুনলে কার না হৃদয় কোমল হয়।

শীলা মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি।

সুভদ্র বেখেয়ালে আবার সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, শীলার চোখে চোখ পড়ায় 'সরি' বলে আবার প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখল সিগারেট। বললে, ওই লোকটা, ওই কুমারস্বামীর এ-রকম কিছু গুণ আছে। খুব স্মার্টও বটে। এক বার শুনেছি কালকা মেলে কোথাও যাওয়ার জন্য হাওড়ায় গেছে। টিকিট-ফিকিট নেই। করল কী, গার্ডের ব্রেকের সামনে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল। পরনে গেরুয়া পোশাক. গেরুয়া পাগড়ি, ভাল চেহারা। গার্ড সাহেব বোধহয় গাড়ি ছাড়বার আগে কাগজপত্র দেখছিলেন। গার্ডকে জানালা দিয়ে ভাল করে স্টাডি করে নিল লোকটা। মানুষকে স্টাডি করার ক্ষমতা এদের অসাধারণ। বুঝল গার্ড লোকটা দুঃখী, চিন্তাগ্রস্ত। কী একটু অনুমান করে নিয়ে হঠাৎ গার্ডের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, ভাবছিস কেন, সেরে যাবে। শুনে গার্ড তো অবাক। একেবারে মনের মতো কথা। গার্ডের বউ দীর্ঘদিন সূতিকায় ভুগছে, সংসার অচল। এই কথা শুনে

আর অমন গেরুয়াপরা চমৎকার চেহারা দেখে গার্ড আত্মহারা হয়ে এসে চেপে ধরল কুমারস্বামীকে—বাবা, তুমি কে? আমাকে বাঁচাও বাবা। কুমারস্বামী তখন ভারী মজার হাসি হেসে বললেন, তোর টানে আটকা পড়েই এখানে ঘোরাফেরা করছিলাম। আমি সাউথ ইস্টার্নের গাড়ি ধরতে যাব, কিন্তু কিছুতেই তোর কামরা আর ছাড়তে পারি না। এই শুনে গার্ড কি আর ছাড়ে! জোর করে নিজের ব্রেকভ্যানে তুলে নিল কুমারস্বামীকে। বলল, বাবা, ও-সব হবে না। আমি তোমাকে মাথায় করে রাখব। আমার সব সমস্যার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। কুমারস্বামী তখন কেবলই কাতরভাবে বলে, ওরে, এগারো নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমার শিষ্যরা সব দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে, আমাকে আজ রাতেই জগন্নাথধাম রওনা হতে হবে যে! কে শোনে কার কথা! গার্ড সাহেব কুমারস্বামীকে ব্রেকভ্যানে তুলে নিয়ে গেল। পরে শুনেছি, সেই গার্ডের বউ ভাল হয়েছে, গার্ডেরও প্রমোশন হয়েছে। কাকতালীয় ব্যাপার। কিন্তু তাতে কুমারস্বামীর নাম যা ফেটেছিল!

শীলা খুব মৃদু একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে গেল। খুব চাপা কিন্তু দৃঢ়স্বরে বলল, সুভদ্র, আপনাদের অজিতদা কিন্তু গার্ড সাহেব নন। ওঁকে ঠকানো অত সোজা নয়।

সুভদ্র ঈষৎ গম্ভীর হয়ে ঘাড় হেলিয়ে বসে বলল, বুঝলাম, আপনি পতিগর্বে গরবিনী। অজিতদাকে আমিও খুব শ্রদ্ধা করি ওঁর পলিটিকাল আইডিয়ালের জন্য। তাই খুব অবাক হয়েছি। কিন্তু আমি জানি শীলাদি, কুমারস্বামী ইজ এ ফ্রড।

ট্যাক্সি ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হতেই শীলা বলে, সুভদ্র, আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন আমার বাপের বাড়িতে?

সুভদ্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, যেতে পারি।

শীলা কিন্তু অস্বস্তি বোধ করছিল। তার বাড়িতে কেউ সুভদ্রকে চেনে না। মা, বউদি এরা সবাই একটু সেকেলে। হুটহাট ছেলেছোকরাদের সঙ্গে ওঠা-বসা ভাল চোখে দেখে না। কে কী মনে করবে কে জানে! সুভদ্রই বা ও-রকম বেহায়া কেন? ও কি বুঝতে পারছে না যে, এখন শীলা ওর সঙ্গ চাইছে না? পুরুষেরা চিরকালই কি একটু ভোঁতা, কম সেনসিটিভ? না। শীলা ভেবে দেখল তা নয়। তার স্বামী অজিত খুব আত্মসচেতন। কখনও মেয়েদের সঙ্গে গায়ে পড়ে মেশে না। মরে গেলেও কোনও মেয়ের সঙ্গে কখনও যেচে আলাপ করেনি অজিত। শীলার মনে পড়ল, বিয়ের পর দীর্ঘকাল অজিত শীলার কাছে শরীরের দাবিই করেনি। তারা এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আদরে সোহাগে গল্প করত। অজিত শরীর চাইত না। সেটা শীলার খুব ভাল লেগেছিল। প্রথম কত সংকোচ থাকে মেয়েদের। সেটা কেটে গেলে একদিন শীলাই অজিতের বুকে মুখ রেখে আধোস্বরে বলেছিল, এবার পাথরটা ভাঙুক। তুমি নাও আমাকে।

মনে পড়ার পরই শীলা আপনমনে একটু হাসল। বড় সুখের স্মৃতি। পরমুহূর্তেই মনে পড়ল, কাল রাত থেকে অজিত ফেরেনি। ঠোঁট কেঁপে উঠল শীলার। পোড়া চোখ গলে যায় বুঝি কাঁদতে কাঁদতে। এত কান্না শীলা কখনও কাঁদেনি। পেটের দু'ধার থেকে চিন চিন ব্যথা উঠছে।

॥ ঊনষাট ॥

তিন দিন যেন এই সামান্য পৃথিবীর কেউ ছিল না অজিতের। তার জীবনের সাধারণত্ব থেকে ওই তিন দিন সে বিদায় নিয়েছিল। রবিবারে অজিত ফেরেনি। সোমবারেও না। ফিরতে ফিরতে বুধ হয়ে গেল। সোমবার থেকেই সে কীর্তনের দল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সুখচরে আশ্রমের জন্য জমি দেখা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটই খবর এনেছে। হাজার দশেকের মতো জমির দাম পড়বে, আশ্রমের জন্য আরও না হোক ষাট-সত্তর হাজার টাকা। কুমারস্বামী হেসে বললেন, ও-সব তোমরা বোঝো

গিয়ে। টাকার হিসেব আমি জানি না। শুধু বলি, আমার বড় ইচ্ছে তোমাদের কাছে থাকি। তোমরা কীভাবে রাখবে তা তোমরা জানো।

পরের সকালেই অজিত পাঁচ হাজার টাকার চেক কেটে দিল। যখন চেক সই করছিল তখন হঠাৎ একটু দুর্বলতা এল বুঝি! এত টাকা, রক্ত জল করা টাকা চলে যাচ্ছে! কুমারস্বামী তার দিকেই চেয়ে ছিলেন। তীব্র কিন্তু বরদা, শঙ্কাহরণ দৃষ্টি। অজিত সই করে দিল। আরও অনেকেই দিয়েছিল। দুই দিনে জমির দাম উঠেও হাজার দশেক টাকা বাড়তি হল। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই জমি কিনতে চলে গেলেন। সবাই বলাবলি করছিল, শুভকাজ আটকে থাকা ঠিক নয়, জমি কিনলেই ভিতপত্তন করতে হবে। বাকি টাকা আসবে কোত্থেকে? একজন মেজো-মধ্যম ফিল্ম স্টার আসেন রোজই। বয়স্ক লোক। তাঁর বাজার পড়তির দিকে। তিনি বললেন, এ আর বেশি কথা কী? বাবার জন্য না হয় রাস্তায় নেমে পড়ব। আমি একসময়ে স্ট্রিট সিংগার ছিলাম, সেই অবস্থা থেকে উঠেছি। আমার কোনও সংকোচ নেই। যদি সবাই রাজি থাকে তো কীর্তনের দল নিয়ে ভিক্ষেয় বেরিয়ে পড়ি।

তো তাই হল। অজিত গানবাজনা প্রায় জানেই না। তবু এক ভক্তের কাছ থেকে ধুতি চেয়ে নিয়ে পরল, খালি গায়ে খুঁটটা জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল দলের সঙ্গে। সে কী উল্লাস! কী আনন্দ! দু'ধারে গৃহস্থ মানুষেরা দোকান পসারে ঘুরছে, সওদা করছে, বিষয়কর্মে রত রয়েছে, আর সে এক সুমহান উদ্দেশ্যে পথের ধুলায় নেমে মহানন্দে ভিক্ষা করতে করতে চলেছে। নিজেকে এই প্রথম বড় মহৎ লাগল অজিতের। কীর্তনের সঙ্গে গলা মেলানোর কষ্ট নেই। সেই উদ্দণ্ড কীর্তনে গলা ছাড়লেই মিলে যায়। চোখে জল আসে। গায়ের কাপড় খসে খসে পড়ে। আর মনে হয়, আমিই তো নিমাই। ঘরে শচীমাতা কাঁদছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ছিতা, তবু নিমাই চলেছে প্রেম বিতরণে। নদিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নদের নিমাই।

সেই যে ভাব এল অজিতের ,তিন দিন সে আর স্বাভাবিক অজিত ছিল না। অফিস থেকে এসে কুমুদ বোস আর সেনদাও দেখে বলে গেছে, তাজ্জব! অজিতের মধ্যে যে এত বড় ভক্ত লুকিয়ে ছিল কে জানত! তুমি বড় ভাগ্যবান হে অজিত, আমরাই পিছটান ছিঁড়ে আসতে পারলাম না। এই বলে কুমুদ বোস কেঁদেও ফেলেছিল।

তিন দিন অফিস করেনি অজিত। বাড়িতে আসেনি। তিন দিন বাদে বিকেলের দিকে সে ট্যাক্সিতে ফিরছিল টালিগঞ্জে। বুকটা অল্প কাঁপছে। যদিও নিশ্চয়ই শীলাকে কেউ না কেউ খবর পাঠিয়েছে, তবু মনটা বড় অশান্ত লাগে। শীলাকে ছেড়ে সে কখনও থাকেনি। একা বাড়িতে শীলা ভয় পায়নি তো! পা পিছলে পড়েটড়ে যায়নি তো! শীলা কি ভাল আছে? বুকটা কাঁপে, একটা শ্বাসকষ্ট হয়। আবার কুমারস্বামীকে দেওয়া পাঁচ হাজার টাকার কথা ভাবে। এ টাকাটার কথা শীলার কাছে গোপন করতে হবে। শীলা টের পেলে...।

বাড়িতে এসে অজিত অবাক। বাচ্চা ঝিটা দরজা খুলেই সরে গেল। অজিত ঢুকে দেখে ঘরদোর খাঁ খাঁ করছে। অজিত বলল, কী রে? তোর বউদি কোথায়?

মেয়েটা খুব বিপন্ন মুখ করে বলে, বউদি নেই।

কোথায় গেছে?

হাসপাতালে।

অজিত স্তম্ভিত হয়ে থাকে। কিছু জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হয় না।

মেয়েটা নিজে থেকেই বলে, সোমবার সেই যে দাদাবাবু আসে, তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে চলে গেল। আর আসেনি। বউদির ছোট ভাই রাতে এসে খবর দিল— বউদি হাসপাতালে। বউদির ভাই এসে রাতে থাকে, আর সারাদিন আমি একা।

অজিত ধপ করে বসে চোখ বুজে বলল, কী হয়েছে জানিস?

না। বউদির ভাই শুধু বলে, খুব খারাপ অবস্থা।

অজিতের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে আতঙ্কের। এক বার তড়িৎ গতিতে উঠে বসল ও। যাবে! এক্ষুনি যাবে! পরমুহূর্তেই বুঝল, তার হাত-পা কাঁপছে, অবশ লাগছে। তিন দিনের সুগভীর ক্লান্তি কাকের কালো ডানার মতো শরীর আর মনের সব শক্তিকে ঢেকে রেখেছে। সে এক বার ককিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। চুপ করে বসে রইল। ঘড়িতে সময় দেখল, কিন্তু ক'টা বেজেছে তা বুঝতেও পারল না। ঢক ঢক করে অনেক জল খেয়ে গেল, তবু বুকটা যেমন শুকনো ছিল তেমনই রইল। শীলা কি বেঁচে আছে এখনও?

টেবিলের ওপর কয়েকটা চিঠি পড়ে আছে। তার মধ্যে একটা লক্ষ্মণের এয়ারোগ্রাম। সেটা খুলে অজিত আরও অবাক। প্রথমেই লিখেছে— বুধবার সকালে দমদমে পৌঁছচ্ছি। এয়ারপোর্টে থাকিস।

ফের লাফিয়ে উঠল অজিত। বুধবার! বুধবারটা কবে?

তারপরই হতাশ হয়ে বসে পড়ল ফের। সময় নেই। আজই বুধবার। লক্ষ্মণ আগে এসে গেছে।

তিন দিন ধরে রোজ ননীবালা তিন বেলা খাবার সাজিয়ে টিফিনের বাক্সে ভরে দেন। তিনবেলা খাবার বয়ে নিয়ে হাসপাতালে আসছে সোমেন। কিন্তু খাবে কে? শীলার ভাল করে চেতনা আসছে না। যতক্ষণ ভাল থাকে ততক্ষণ যন্ত্রণায় চিৎকার করে। দম ফুরিয়ে গেলে গোঙায়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়। বিকেলের ভিজিটিং আওয়ারসে ননীবালা এসে বসে থাকেন মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে। জ্ঞান থাকলে শীলা মায়ের হাঁটু চেপে ধরে ফুঁপিয়ে উঠে বলে, মাগো, আমাকে বিষ এনে দাও। নয়তো ডাক্তারকে বলো বাচ্চাটাকে নষ্ট করে দিক। এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

ননীবালা পাঁচ বার মা হয়েছেন, তার মধ্যে একটা সন্তান বাঁচেনি। সেই রণো হওয়ার সময়ে এ-রকমই চার-পাঁচদিন ধরে ব্যথায় কষ্ট পেয়েছেন তিনি। আঁতুড়ঘরের চারধারে সে এক গেঁয়ো বর্ষা নেমেছিল সেবার। অকালের বর্ষা, সৃষ্টি রসাতলে যায় যায়। ব্রজগোপাল বাউণ্ডুলেপনা করতে কোন মুলুকে উধাও হয়েছেন, সাত দিন ধরে পাত্তা নেই, শ্বশুর-ভাসুরদের উঁকি দেওয়া বারণ, এক জগদ্ধাত্রীর মতো শাশুড়িই তখন আগলে রেখেছিলেন ননীবালাকে। একজন হোমিওপ্যাথ ওষুধ দিত। আর ধাই ছিল মোতায়েন, কিন্তু হুট বলতেই পেট কেটে ছেলে বের করে দেবার যে রেওয়াজ এখন চালু হয়েছে সে-সব তখন কারও মাথাতেও আসেনি গাঁয়েগঞ্জে, ছেলে হতে গিয়ে কত মা মরেছে। চার দিন ধরে নাগাড়ে ব্যথা সহ্য করার পর পাঁচদিনের দিন চাঁদমুখ দেখে সব জ্বালা জুড়িয়ে গেল। কোলজোড়া শান্তশিষ্ট ছেলে। শাশুড়িকে এটুকুই দেখাতে পেরেছিলেন ননীবালা। সেই অকালের বর্ষা থামল, আর শাশুড়িও চলে গেলেন। যেন রণোকে নিজের আত্মা দান করে গেলেন।

ননীবালা মেয়ের মাথায় জপ করে দিতে দিতে বলেন, ও-সব বলিস না। হলে দেখবি, বাচ্চার কত মায়া। চাঁদমুখ দেখলে সব ব্যথার কথা ভুল পড়বে।

শীলা ব্যথায় নীল হয়ে মা'র গায়ে কিল মেরে বলে, উঃ মা, ও-সব বোলো না, বোলো না, এ ব্যথা যেন শত্রুরও না হয়। আমি বাচ্চা চাই না, আমার ব্যথা সারাতে বলো ডাক্তারদের। আবার ওই ব্যথার মধ্যেও অনুযোগ দেয় শীলা, আমাকে কেন নার্সিংহোমে রাখোনি তোমরা? হাসপাতালে কেউ থাকতে পারে? আমি ঠিক মরে যাব। তোমাদের জামাইকে খবর দাও, সে ঠিক এসে ভাল নার্সিংহোমে নিয়ে যাবে আমাকে, সে কখ্খনও এভাবে হাসপাতালে ফেলে রাখত না আমাকে? কেন তোমরা ওকে খবর দিচ্ছ না? নিশ্চয়ই ওর কিছু হয়েছে। বলতে বলতে ফের জ্ঞান হারায় শীলা। আবার যখন চেতনা আসে তখন পূর্বাপর কিছু ভাবতে পারে না, যন্ত্রণার কথা বলে, আবার যখন মনে পড়ে তখন অজিতের কথা বলে কেঁদে ওঠে— ওর ঠিক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমার এ সময়ে নাহলে ও আসছে না কেন? ওর এত সাধের সন্তান, ও আসছে না কেন?

ননীবালা এ-সবের কী উত্তর দেবেন? অজিতকে কতবার খুঁজতে গিয়ে ফিরে এসেছে সোমেন আর সুভদ্র। গর্চার কোন গলিতে সে সাধু থাকে। সেখানে অজিত আছে বটে কিন্তু কেউ তার হদিশ

দেয় না। ওরা থানা-পুলিশের ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে, উলটে ওদের ভয় দেখিয়েছে এক ম্যাজিস্ট্রেট যে বাড়াবাড়ি করলে মানহানির মামলা করবে। অজিতের মতো ছেলে সাধু-সন্নিসির পাল্লায় কী করে যে গিয়ে পড়ল তা কে জানে? হয়তো অজিতকে গুণ করে রেখে দিয়েছে সাধু, আর আসতে দেবে না। অজিত যে পলিটিক্স করত সেটা ননীবালা পছন্দ করতেন না বটে, কিন্তু এর চেয়ে সেটা বরং শতগুণে ভাল ছিল। মেয়েকে নার্সিংহোমে রাখার কথা, কিন্তু সে সাধ্য এখন আর নেই। রণো যখন এ-রকমটা হয়ে যায়নি তখন হলে কলকাতার ভাল নার্সিংহোমেবই ব্যবস্থা হত। কিন্তু এখন তা পারেন না ননীবালা, অনেক লজ্জার মাথা খেয়ে মেয়েকে হাসপাতালেই পাঠাতে হয়েছে। সে-বিকেলটাও বড় ভয়াবহ। বাইরে ট্যাক্সি থামবার আওয়াজ হল, তারপরই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। দরজায় কড়া নড়তে বীণা গিয়ে খুলল। শীলা ঘরে এসে দাঁড়াল, পিছনে, একটা সুন্দরপানা ছেলে। শীলার মুখ খানিকটা গম্ভীর, বলল, সোমেন কই বলো তো মা! ওকে আমার ভীষণ দরকার। বলতে বলতেই হঠাৎ দু'পা এগিয়ে এসে ননীবালাকে আঁকড়ে ধরল দু'হাতে, তীব্র ফিসফিসানির স্বরে কানে কানে বলল, মা, ব্যথা উঠেছে, আর পারছি না, বলতে বলতে ঢলে পড়ল গায়ে। ব্যথা ওঠার কথা নয়। এখনও সময় তো হয়নি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার এসে দেখল, বলল, হাসপাতালে পাঠান। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ডেলিভারি হবে।

তাই পাঠালেন ননীবালা। সুভদ্র সোমেন ট্যাক্সি করে নিয়ে এল, সঙ্গে ননীবালাও। সুভদ্রর জোরেই পি জি হাসপাতালে জায়গা পাওয়া গেল। ছেলেটা খুব দাপুটে, চেনাজানাও অনেক। একে ধমকে, তাকে হাত করে চোখের পলকে সব ব্যবস্থা করে ফেলল। একটা দিন অবশ্য মেঝেতে থাকতে হয়েছে শীলাকে। সকালেই ভাল বেড পাওয়া গেছে। কিন্তু তিন দিন ধরে ছটফট করছে মেয়েটা। দু'বেলা ডাক্তার দেখে বলে যাচ্ছে— এ ব্যথা ডেলিভারির পেইন নয়। তা ছাড়া ম্যাচুরিটিরও খানিকটা বাকি ছিল, অন্তত আরও চার-পাঁচ সপ্তাহ। নার্সদের ডেকে বলে গেছে— ওয়াচ করবেন। মেমব্রেন যদি বার্স্ট করে আর ডেলিভারি পেইন যদি না হয় তা হলে সিজারিয়ান করতে হতে পারে।

ননীবালা পাঁচ সন্তানের মা হয়েছেন। ডাক্তারদের কথায় বড় একটা ঘাবড়ান না। ওরা কত অলক্ষুণে কথা বলে। রাস্তায় পড়ে গিয়ে বাচ্চা বুড়ো কারও হাত-পা ছড়ে কেটে গেলে ধনুষ্টঙ্কারের ইঞ্জেকশন দেয়। জ্বরজারি হলেই পেনিসিলিন ঠাসে, হুট বলতেই টিকা নিতে বলে। ও-সব বড় বাড়াবাড়ি। ননীবালা ছেলে হওয়া নিয়ে ভাবেন না। তিনি মেয়ে-জামাইয়ের সম্পর্কটা নিয়ে ভাবেন। অজিত কেন সাধুর কাছে গিয়ে পড়ে আছে, মেয়ের যখন এখন-তখন অবস্থা! তবে কি ওদের সম্পর্ক এখন ভাল নয়? ঠিক বটে, তিনি নিজেও এক বাউণ্ডুলের সংসার করছেন চিরকাল। তবু সে লোক কিন্তু এ-রকম ছিল না। নিজের সংসারের দিকে না তাকালেও পরের সংসারের জন্য করেছে অনেক। কোমর বেঁধে মানুষের দায়ে দফায় খাটত। না ডাকলেও গিয়ে হাজির হত। সংসারে থেকেই সে ছিল সন্ন্যাসী। কিন্তু তার বুকে ভালবাসা বড় কম ছিল না। আর আজকাল হুট বলতেই ডিভোর্স, না কী যেন ছাই মাটি হয়। স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যায়। ভাবতে পারেন না ননীবালা। বুকটা বড় কাঁপে। অজিত কেন এ-বয়সে সাধু-সন্নিসির পিছনে ঘুরে মরছে। এর মধ্যেই কবে যেন টুকাই তার ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বাস থেকে দেখেছে যে পিসেমশাই গড়িয়াহাটা দিয়ে কীর্তন করতে করতে একটা দলের সঙ্গে যাচ্ছে। টুকাই ছেলেমানুষ, দেখার ভুল হতে পারে, কিন্তু যদি সত্যি হয় তো ভাবনার কথা। অমন চালাক চতুর চৌখস ছেলে, সে কেন কীর্তন গাইবে রাস্তায়? এ-সব ভাবেন ননীবালা, আর কেবলই মনে হয়—আর না এবার সংসারের ভাবনা সংসারকে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন। আর না। যা হয় হোক গে। তিনি দেখতে আসবেন না।

ভিজিটিং আওয়ারস শেষ হলে ননীবালা ফিরে আসেন বাড়িতে। আসতে বড় কষ্ট হয়। বাসে তখন অফিসের ভিড়। তবু নিজের চিন্তায় এত বিভোর থাকেন যে শরীরের কষ্ট টের পান না। তিন

দিন ধরে এসে ফিরে যাচ্ছেন। মেয়েটা কাটা পাঁঠার মতো দাপাচ্ছে। এ সময়ে জামাই এসে শিয়রে দাঁড়ালেও মেয়েটা ভরসা পেত। জামাইয়ের কথা ভাবতেই ফের বুকটা মোচড় দেয়। আজকাল তাই ননীবালা বড় গম্ভীর। বাসায় ফিরে কথাটথা বলেন না। জপ সেরে ছোট নাতিকে কোলে করে বসে থাকেন।

সুভদ্রর সঙ্গে এই তিন দিনে খুব ভাব হয়ে গেছে সোমেনের। বয়সে সুভদ্র কিছু বড়, কিন্তু তাতে বন্ধুত্ব আটকায় না। তিনবেলা সোমেন আসে। শুধু দুপুরটা বাদ দিলে, দু'বেলাই সে সুভদ্রকে দেখতে পায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। কার্ডফার্ড ছাড়াই ও ওয়ার্ডে ঢুকে যেতে পারে, যখন-তখন ডাক্তার ডেকে আনতে পারে। সিস্টারদের সঙ্গে ও দু' মিনিটে ভাব জমিয়ে ফেলে। কখনও সুভদ্র অপ্রস্তুত হয় না। চেহারাটা চমৎকার বলেও বোধহয় ওর সুবিধে আরও বেশি। সোমেন জানে যে, সে নিজেও সুন্দর। কিন্তু তার চেহারায় বা সৌন্দর্যে কোথাও একটা মেয়েলিপনা আছে, একটু দুর্বলতা বা লজ্জা-সংকোচের ভেজাল আছে। সুভদ্রর তা নেই। ও শতকরা একশো ভাগ পুরুষ। টান জোরালো চেহারা, মারকুট্টা ভাবভঙ্গি, গলা বজ্রগম্ভীর। যে-কোনও পরিস্থিতিতে চেঁচামেচি করে লোক জমিয়ে ফেলতে ওর সংকোচ নেই। প্রথম দিন শীলাকে ভরতি করতে এসে ও এমার্জেন্সিতে তাণ্ডব করে ফেলে। এমার্জেন্সির কাউন্টার চাপড়ে আলটিমেটাম দিয়ে বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার রুগি ভরতি না হলে হেলথ মিনিস্টারকে এখানে আসতে হবে। তাতে এমার্জেন্সির লোকেরা আপত্তি করায় তাদের ফোন তুলে নিয়ে সুভদ্র বাস্তবিক ফোন করেছিল মিনিস্টারকে। তারপর পুলিশ কমিশনারকে, এক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককেও। কাউকেই পায়নি, অবশেষে ওর এক রিপোর্টার বন্ধু এসে হাজির হল, আর-একজন ডাক্তারও বেরিয়ে পড়ল চেনা। তাতেই কাজ হয়ে গেল। কিন্তু তাতে না হলেও সুভদ্রর ওই রুদ্রমূর্তি দেখেই হাসপাতালে একটা শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। বিস্তর রবাহুত লোকজন কোত্থেকে এসে জড়ো হয়ে সুভদ্রর পক্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তখন শীলার মাথা কোলে নিয়ে অসহায়ভাবে বসে আছেন ননীবালা, আর সোমেন ভেবে পাচ্ছে না কী করবে। তাদের কিছু করতে হয়নি। সুভদ্র, অনাত্মীয় এবং অচেনা সুভদ্রই সব করে দিয়েছিল। তাই সুভদ্রর সামনে সোমেনের একটা কমপ্লেকস কাজ করে। নিজেকে সুভদ্রর চেয়ে ছোট বলে মনে হয়।

কুমারস্বামীর ডেরায় গিয়েও সুভদ্র একটা কেলো করেছিল। কিন্তু সেটা কাজে লাগেনি। সোমবার শীলাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিল, অজিতের খোঁজ করার সময় হয়নি। কিন্তু হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পর থেকেই শীলা ওই ব্যথা-যন্ত্রণার মধ্যেও কেবলই বলেছে, ওরে, তোরা ওকে খবর দে। ও না এলে আমি বাঁচব না।

মঙ্গলবার শীলার বেড পাওয়া গেল। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুভদ্র বলল, চলুন সোমেনবাবু, আজ কুমারস্বামীর ডেরায় হুটোপাটি করে আসি। জোর কেলো করে আসব। বাস্তুঘুঘুদের সব ক'টা বাসা ভেঙে দেওয়া দরকার।

সোমেন দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভয় পায়। খুব সাহসের কাজ সে কিছু করেনি কখনও। তা ছাড়া কুমারস্বামীর কিছুই সে জানে না যাতে লোকটার ওপর রাগ করা যায়। তবু বিকেলের দিকে সে সুভদ্রর সঙ্গে গর্চার গলিতে এক বড়লোকের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। সুভদ্রর প্রথম চালটাই ছিল ভুল। দোতলায় উঠে সে বন্ধ দরজায় প্রচণ্ড শব্দ করে চেঁচাতে লাগল, কে আছেন, দরজা খুলুন।

দরজা খুলল। একটি বিস্মিত বিরক্ত মুখ উঁকি দিয়ে বলল, আস্তে। বাবা বিশ্রাম করছেন, ব্যাঘাত হবে। কাকে চাইছেন?

সুভদ্র অনায়াসে বলল, আমরা এই বাড়ি সার্চ করতে এসেছি। এখানে আমাদের একজন লোককে আটকে রাখা হয়েছে।

লোকটা ভীষণ অবাক হয়ে বলে, এখানে কাউকে আটকে রাখা হয়নি।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! সুভদ্র তখন গলা তুলে চেঁচাচ্ছে, আলবাত আটকে রাখা হয়েছে। এখানে বহু লোককে হিপনোটাইজ করে আটকে রাখা হয়, সব আমরা জানি। আমাদের দেখতে দিন, নইলে পুলিশে খবর দেব।

হুজ্জত করার ইচ্ছে সোমেনের ছিল না। সে ভেবেছিল বড়দির অসুখের খবর দিয়ে জামাইবাবুকে নিয়ে যাবে। কিন্তু অসুখের খবরটাই দেওয়া হল না। সুভদ্র ব্যাপারটাকে এত বেশি বাড়িয়ে তুলেছিল যে সেখানেও লোকজন জুটে গেল। অবশেষে এক বেঁটে মতো ভদ্রলোক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে বলল, আমি হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট। বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে ধরিয়ে দেব, মানহানির মামলাতেও পড়ে যাবেন।

এত গোলমালেও কুমারস্বামী বেরিয়ে আসেনি। সোমেন ম্যাজিস্ট্রেট দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সুভদ্র অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আরও কিছু বিতর্ক করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট আঙুল তুলে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলল, ক্লিয়ার আউট ক্লিয়ার আউট। এটা গুণ্ডামির জায়গা নয়।

আশ্চর্যের বিষয়, দু'জন কনস্টেবলও কোত্থেকে এসে গেল সে সময়ে। তাড়া খেয়ে সোমেন আর সুভদ্র নেমে এল। সুভদ্র অপমান-টান গায়ে মাখে না, একটু হেসে বলল, লোকটা জেনুইন ম্যাজিস্ট্রেট। আমি ওকে চিনি। এক বার ওর এজলাসে যেতে হয়েছিল। খুব কড়া লোক। বলে একটু চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বলল, কুমারস্বামীর ক্ষমতা দেখলেন। সব রকম সেফগার্ড রেখে দিয়েছে!

সোমেন হতাশ হয়ে বলে, কিন্তু অজিতদা? দিদির অসুখের কথা বলে অজিতদাকে আনা উচিত ছিল।

সুভদ্র ঠোঁটে প্রচণ্ড তেতো বিরক্তির ভঙ্গি করে বলে, অসুখের কথা-টথা বলে নিচু হয়ে ভিক্ষে চাইতে হবে নাকি! দাঁড়ান না, এবার অন্য রকম কেলো করব।

সুভদ্রর এই মনোভঙ্গি সোমেনের পছন্দ ছিল না। কিন্তু সুভদ্র ওই রকম।

কখন কী হয়, তাই সোমেন প্রায় সারাদিনই হাসপাতালে থাকল বুধবারে। সকালেই শীলার আয়া জানাল—জল ভাঙছে। কথাটার মানে সোমেন জানে না, তাই ভয় পেয়ে নার্সকে গিয়ে ধরল। নার্স গা করল না, বলল, ও তো হবেই।

শীলা অসহনীয় যন্ত্রণায় বার বার বেঁকে যাচ্ছে। সোমেনকে দেখেও যেন চিনতে পারল না, শুধু বলল, আমাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যা। কিছু করছে না, আমি মরে যাব।

অবস্থা দেখে মরে যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল সোমেনের। কিন্তু এ অবস্থায় কী করা উচিত তা ঠিক করতে না-পেরে সে কেবলই নার্স আর ডাক্তারদের কাছে ছোটাছুটি করল।

কাল রাতেও অজিতদা ফেরেনি। অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে সোমেন। আজ ক'দিন সোমেন ওদের বাসায় রাতে গিয়ে শোয়।

একটু বেলায় সুভদ্র এল। সোমেন সব কথা বলতে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় সুভদ্র ডাক্তার ডেকে আনল কোথা থেকে। ডাক্তার দেখে-টেখে বলে, মেমব্রেনটা বার্স্ট করেছে, কিন্তু ডেলিভারির পেইন শুরু হয়নি। আমি এটাকেই ভয় পাচ্ছিলাম। একটা ইঞ্জেকশন লিখে দিচ্ছি, এনে দিন। যদি তাতে না হয় তবে কাল সকালে সিজারিয়ান হবে। এঁর হাজব্যান্ডকে দরকার, বন্ডে সই করতে হবে।

এই বলে গম্ভীর ডাক্তার চলে গেলেন। কিন্তু চলে যাওয়ার সময়ে তাঁর গম্ভীর মুখশ্রী থেকে সোমেনের ভিতরে একটা ভয় জন্ম নেয়। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে ডাক্তার উদ্বিগ্ন, চিন্তিত। কোথাও একটা অস্বাভাবিকতা লক্ষ করছেন উনি। সোমেন বুঝল, বড়দির অবস্থা ভাল নয়।

বুঝতে পেরেই তার হাত-পায়ে একটা শিউরানি খেলে গেল। বারান্দায় তখনও দাঁড়িয়ে

সিগারেট খাচ্ছিল সুভদ্র। তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সোমেন সিগারেট ধরিয়ে বলল, সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং।

সুভদ্র এক বার চোখ কুঁচকে তাকাল মাত্র। তারপর মাথা নেড়ে বলল, ভাববেন না। প্রেসক্রিপশনটা দিন, ওষুধ এনে দিচ্ছি। বলে প্রেসক্রিপশন নিয়ে চলে গেল।

সোমেন চুপ করে রইল। সামনে একটু লন, তারপর লাল রঙের হাসপাতালের বাড়ি। কয়েকটা গাছগাছালি। খুব বৃষ্টি গেছে কাল, আজ গাছপালা ঘন সবুজ। ছেঁড়া বাদলমেঘের ফাঁকে ফাঁকে গভীর নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সবকিছুই একটা বিষণ্ণতায় মাখানো। এই বিপুল পৃথিবীতে সোমেন বড় একা ও অসহায় বোধ করে। আজ সে বড় বেশি নিজের অপদার্থতা বুঝতে পারছে। কিছু শেখেনি সে। যদি অন্তত ডাক্তারিটা পড়বার চেষ্টা করত তবে আজ এত অসহায় লাগত না। অচেনা এক সমবেদনাহীন যান্ত্রিক ডাক্তারের হাতে দিদির আয়ু—ভাবতেই কেমন লাগে! যদি কোনও ভুল করে ডাক্তার? যদি ঠিকমতো ব্যথার কারণটা ধরতে না পারে? যদি নার্সরা সময় মতো ডাক্তারকে খবর না দেয়? সমস্ত হাসপাতালের ব্যবস্থার মধ্যেই একটা রুক্ষ উদাসীন এবং বিরক্তির ভাব রয়েছে। যেন এরা রুগি কিংবা রোগ পছন্দ করে না। যেন এদের সবাইকে জোর করে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে যে বড়দিকে সে চেনে যাকে নানা সুখে-দুঃখে, রাগে-অভিমানে আপনার লোক বলে জেনেছে, তাকে এরা তো সেভাবে চেনে না। এদের কাছে বড়দি এক অচেনা রুগি মাত্র, যার বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়ায় খুব একটা তফাত হয় না। বড়দির যে বড় বেশি বেঁচে থাকা দরকার, তা বুঝবে কী করে? রাগে অসহায়তায় সোমেনের হাত-পা নিশপিশ করে। দারোয়ান গোছের কিছু লোক বাইরের লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছে। সোমেন তাই নীচে নেমে এল। সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো। তার কিছু করার নেই। সে ডাক্তারির কিছুই জানে না, এই ভেবে তার চোখে জল এল হঠাৎ।

দুপুরের আগেই সুভদ্র চলে গেল, ইস্কুল আছে। সোমেন কোথাও গেল না। খোলা মাঠের মধ্যে বসে ভাবতে লাগল, বড়দিকে সে বরাবর খুব অবহেলা করেছে। কত ডাকত বড়দি, কতবার বলেছে, একা থাকি, আমাদের কাছে এসে ক'দিন থাক না সোমেন! কতবার বড়দি তাকে দামি জামা-প্যান্ট দিয়েছে, নগদ টাকাও দিয়েছে অনেক। সেই বড়দি কোথায় কোন বিপুল অলক্ষ্যে মিশে মিলিয়ে যাবে! আর কখনও, কোনও দিন দেখা হবে না।

দুপুরে শীলার খাবার নিতে এক বার বাসায় ফিরল সোমেন। খাবার নেওয়া বৃথা। বড়দি তো খায় না, আয়াই খেয়ে নেয়। তবু খাবার নিতে বাসায় না-গেলে ননীবালা চিন্তা করবেন। বাসায় এসে কোনওক্রমে কাকস্নান সেরে দু' গ্রাস অনিচ্ছের ভাত খেয়ে নিল সোমেন। ননীবালা উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছে রে?

ভেঙে বলল না সোমেন। কেবল বলল, ওইরকমই।

টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ফের হাসপাতালে এসে ওয়ার্ডে ঢুকে ভয়ংকর চমকে গেল সোমেন। বড়দির বিছানার পাশে স্ট্যান্ডে সেই স্যালাইন বা গ্লুকোজের ওলটানো শিশি, রবারের নল ঝুলছে। লাল কম্বলে দিদিকে চেপে ধরে আছে বুড়ি আয়া। আর বড়দির প্রচণ্ড একটা কাঁপুনি উঠেছে। মুখ সাদা, ঠোঁট মরা মানুষের মতো ফ্যাকাসে, দুটো চোখে দৃষ্টি নেই। কেবল মুখে একটা অবিরল 'হু—হু—হু—হু' শব্দ করছে। আয়া বলল, শিরায় ছুঁচ ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে রিগার উঠেছে। তাই ছুঁচ খুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু একটু বাদেই আবার দেবে। ইঞ্জেকশনটা ওই শিশির তরল পদার্থের সঙ্গে মেশানো আছে।

সোমেন দৃশ্যটা দেখতে পারল না। খাবার রেখে বেরিয়ে এল। কী অমানুষিক কষ্ট পাচ্ছে বড়দি, ভেবে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোমেন ফের চোখের জল মুছল।

বিকেলের দিকে ওয়ার্ড ভরে গেল লোকে। রণেন, ননীবালা, সুভদ্র, আর সুভদ্রর সঙ্গে শীলার

স্কুলের আরও পাঁচ-ছ'জন দিদিমণি। এত লোককে ঢুকতে দেয় না। কিন্তু সুভদ্র কী করে ম্যানেজ করেছে। শীলার জ্ঞান প্রায় নেই। মুখে গ্যাঁজলা উঠছে। আর গভীর বেদনার দীর্ঘ ধ্বনি বুক থেকে উঠে আসছে কখনও।

এক বার সেই অবস্থাতেই বড় বড় চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজল চার দিকে। পেল না। ব্যথায় প্রচণ্ড মুখ বিকৃত করে চোখ বুজল। দুটো হাতের মুঠো মাঝে মাঝে ভীষণ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। বালিশের ওয়াড় খিমচে ধরে টানছে এক-এক বার। ফের নরম হয়ে যাচ্ছে শরীর। আবার ব্যথার ঢেউ আসছে।

ননীবালা শীলার হাতের আঙুল টেনে দিচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে মেয়ের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলছেন, ও শীলা, ব্যথাটা কি একটু অন্য রকম টের পাস? ঝলকে ঝলকে ব্যথা আসছে কি?

শীলা সে-কথা শুনতে পায় কি না কে জানে! এক-এক বার ককিয়ে ওঠে। শুধু ননীবালার হাতটা খিমচে ধরে বলল, ও কোথায় মা? ও কেন আসছে না? যার জন্য আমার এত কষ্ট সে এক বার এসে দেখে যাক যে আমি মরে যাচ্ছি। ও কি রাগ করেছে মা? অ্যাঁ!

বলেই ফের ব্যথায় ডুবে গেল শীলা। প্রবল ককিয়ে উঠল।

সোমেন পালিয়ে এল। পিছন থেকে সুভদ্র এসে ধরল তাকে। সামনের লনে দাঁড়িয়ে দু'জনে সিগারেট ধরায়।

॥ ষাট ॥

সরকার একটা খেলা দেখাতেন। বার্ডস ফ্রম নোহোয়্যার। চমৎকার খেলা। একেবারে শূন্য থেকে অজস্র সজীব ডানা-ঝাপটানো পাখি ধরে আনতেন। নিস্তব্ধ মঞ্চ হঠাৎ ভরে যেত ডানার শব্দে, কাকলিতে। কী চমৎকার খেলা! তার কৌশলটা আজও অধিকাংশ ম্যাজিশিয়ানের কাছে অজানা।

অনেকবার চেষ্টা করেছে অজিত। পারেনি।

কয়েকটা পাখি কিনে রেখেছে সে। বারান্দায় খাঁচায় ঝোলানো আছে। ঝি-মেয়েটা তাদের দানাপানি দেয়। অজিত সন্ধেবেলা চুপ করে সেই খাঁচাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে পাখিরা ডানা ঝাপটাল কয়েকবার। ভয়ের শব্দ করল। এখন ঝিমোচ্ছে। অজিত চেয়ে থাকে। সে পাখি দেখছে না, সে ম্যাজিকের কথা ভাবছে না। তার কেবল মনে হচ্ছে শীলাকে সে বড় অন্যায় সন্দেহ করেছিল। শীলা যদি না বাঁচে তবে তাকে অন্তত এ-কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, অজিত বড় অন্যায় করেছিল তার প্রতি। পাখিদের দেখে কেন কথাটা মনে হল, কে জানে।

ঘরে এসে সে ঝিকে চা দিতে বলল। এই নিয়ে বোধহয় পাঁচবার চা হল। আর সিগারেট? না, তার কোনও হিসেব নেই। বিকেল থেকে সে অবিরল সিগারেট টানছে। এখন আর ধোঁয়ার কোনও স্বাদ নেই। আলোতে এক বার দুটো হাত চোখের সামনে তুলে ধরল। দেখল, আঙুল স্থির নেই। হাত কাঁপছে। একটু বাদেই কেউ আসবে। বলবে— শীলা নেই। সেই অমোঘ ক্ষণটির জন্য অপেক্ষা করছে সে। কী করবে? কিছু করার নেই। যা হওয়ার হোক।

মনে পড়ে, এ বাড়িটা শীলার তাগাদাতেই করেছিল সে। কত প্ল্যান করে, কত শখের নকশায় তৈরি করা বাড়ি! শীলা নিজের গয়না দিয়েছে, কষ্টের রোজগারও ঢেলেছে কম নয়। বুকের পাঁজরের মতো আগলে থেকেছে। মানুষ কী ভীষণ মরণশীল : কেমন হুট বলতেই সব রেখে চলে যেতে হয়!

গরম চায়ে জিব পুড়ে গেল অজিতের। গ্রাহ্য করল না। তিন-চার চুমুক খেয়েই উঠে হঠাৎ ফুলপ্যান্ট পরতে লাগল। না, যাই গিয়ে এক বার দেখে আসি। ফুলপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে জামাটা

গায়ে দিতে গিয়েই ফের মনে হয়— থাকগে। ও-দৃশ্য আমি দেখতে পারব না।

ফের চায়ের কাপ নিয়ে বসে অজিত। চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবার ঝিকে ডেকে চা দিতে বলে। সিগারেট ধরায়। হাত দুটো দেখে। আর বিড়বিড় করে বলে, তোমার ওপর নেই ভুবনের ভার...

হঠাৎ বিদ্যুৎ স্পর্শে চমকে ওঠে অজিত। তাই তো! আজ লক্ষ্মণ এসেছে। বহুকাল পরে, বহু যুগ পরে। সম্ভবত জন্মান্তর থেকে এসেছে লক্ষ্মণ। তার কাছেই কি চলে যাবে অজিত। লক্ষ্মণের কাছে গেলে মাঝখানের এই ক'টা বছর মুছে যাবে। সেই কলেজের ছোকরা হয়ে যাবে অজিত। লক্ষ্মণের কাছে গেলে আর চিন্তা নেই, বয়স নেই। দু'জনে চিনেবাদাম ভাঙতে ভাঙতে আজ ময়দানে হাঁটবে। আর লক্ষ্মণ তাকে আকাশতত্ত্ব বোঝাবে। বলবে অসীম শূন্যতা আর নিরবধি সময়ের কথা। সংসারের স্মৃতি থাকবে না, মৃত্যুর ভয় থাকবে না, শীলার কথা মনে পড়বে না! অজিত উঠে জামা পরল। ঝিকে ডেকে বলল, আমি বেরোচ্ছি। সদর বন্ধ করে দে।

ও মা! চা করতে বললে যে!

করতে হবে না।

বলে অজিত বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়েই তার মনে হল, সে বড় অপরাধ করেছে শীলার প্রতি। সে চার দিন বাড়ি ফেরেনি। চারটে দিন সে উপেক্ষা করেছে, অবহেলা করেছে। শীলা তো তেমন কিছু অন্যায় করেনি। বড় ভাল মেয়ে শীলা। ভাবতে বুকের মধ্যে এক চৈত্রের ফাঁকা মাঠে হু হু করে যেন শুকনো খড়-নাড়া তৃণের জঙ্গলে আগুন লেগে গেল। বড় দহন। বড় জ্বালা। চার দিন সে কী করে আসন্নপ্রসবা শীলাকে ভুলে ছিল?

এ সময়ে বাস-টাস চোখেই পড়ে না অজিতের। বড়রাস্তা থেকে ট্যাক্সি নিল। কোথায় যাবে তা হঠাৎ এখন আবার ঠিক করতে পারছিল না অজিত। শীলা কোন হাসপাতালে আছে তা জানে না। জানলেও লাভ নেই। ভিজিটিং আওয়ার সব হাসপাতালেই শেষ হয়ে গেছে। ভাবল, কালীঘাটে লক্ষ্মণের বাসায় যায়। পরক্ষণেই মনে হয়, শীলার একটা খোঁজ পেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তারপর লক্ষ্মণের কাছে যেতে ভাল লাগবে।

দু'-তিনবার মত পালটে অবশেষে ঢাকুরিয়ার শ্বশুরবাড়ির কাছেই চলে আসে অজিত। ভিতরে ঢুকতে সাহস হয় না। ট্যাক্সিটা দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে নামে। ওপর দিকে তাকিয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকে। কোনও কান্নার শব্দ আসছে নাকি? প্রথমটায় বুঝতে পারে না। তারপর মনে হয়, একটা মেয়ে-গলার কান্নার আওয়াজ খুব ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। মনটা নিভে গেল। তা হলে শীলা...! ওপরে আলো জ্বলছে, জানালায় পরদা, বাইরে থেকে স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কিন্তু কান্নার শব্দটাই জানান দিচ্ছে, এ বাড়ির কেউ...।

মাথাটা গরম। ফের ট্যাক্সিতে বসে সে বলল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। কালীঘাট যাব। একটু তাড়াতাড়ি।

ট্যাক্সি চলে। অজিত চুপ করে বসে থাকে। তার চারধারে কলকাতার কোলাহল নেই, আলোর অস্তিত্ব নেই, বর্তমান নেই। এক নিস্তব্ধ, সময়হীন অনন্ত পরিসরের ভিতরে কেবল তাকে গতিময় রেখেছে বেঁচে থাকাটুকু। নিস্তব্ধতায় ভাসমান শব্দহীন একটা স্পেসক্রাফটে বসে আছে সে। সে বেঁচে আছে, কিন্তু কিছু বোধ করছে না।

লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ ঠিক ফিরেছে তো! নাকি গিয়ে দেখবে যে লক্ষ্মণ গিয়েছিল তার নির্মোক পরে অন্য একজন সুখী মোটা সাহেবি মানুষ এসেছে! লক্ষ্মণকে নিয়ে তার বড় ভয়।

ট্যাক্সি ঠিক জায়গায় থামল। অজিত ভাড়া মিটিয়ে নামল। কিন্তু রাস্তার নির্দেশ দেওয়া থেকে ভাড়া মেটানো, বা দরজা খুলে নামা, এ-সবই সে করেছে এক অবচেতন অবস্থায়। সে টের পাচ্ছে না যে সে কী করছে।

লক্ষ্মণদের দরজা খোলাই রয়েছে। খুব আলো জ্বলছে আর অনেক লোকের ভিড়। অজিত দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকাতেই একদম সোজা লক্ষ্মণের চোখে চোখ পড়ল। খালি গা, একটা ধুতি পেঁচিয়ে বসে আছে। তাকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, এলি? এসকেপিস্ট কোথাকার! এয়ারপোর্টে তোকে কত খুঁজেছি।

একলাফে এসে লক্ষ্মণ তাকে জড়িয়ে ধরল। কানের কাছে মুখ, বলল, চলে এলাম। বুঝলি?

অজিত চোখের জল কষ্টে সামলায়। হেসে বলে, চলে এলি মানে? পার্মানেন্টলি?

লক্ষ্মণ মাথা নাড়ল, না, আর-এক বার যাব। তারপর ফিরে আসব।

অজিত নিবে গিয়ে বলে, তোকে বিশ্বাস নেই। গেলে যদি আর না আসিস!

ঠিক বটে, লক্ষ্মণ কিছু মোটা হয়েছে, একটু ফরসাও। কিন্তু মুখ-চোখের সেই দীনভাব আজও যায়নি। ওর ঠোঁটের গঠনে লুকোনো আছে একটা চাষির সরলতা, চোখ এখনও স্বচ্ছ ও অকুটিল। সেই লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ বলল, আমি ভাবছিলাম, তুই তো এসকেপিস্ট, বরাবর ঘটনা এড়িয়ে চলিস। তাই বুঝি এয়ারপোর্টে ভিড়ের মধ্যে পাছে দেখা হলে একটা সিন হয় সেই ভয়ে যাসনি।

অজিত মাথা নেড়ে বলে, না রে। আমি আজ বিকেলে ফিরেছি। তখন চিঠি পেলাম।

লক্ষ্মণ চার দিকে চেয়ে বলল, এখানে বড্ড ভিড়। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। এখানে তো কথা হবে না।

অজিত খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, শোন লক্ষ্মণ, শীলা হাসপাতালে। অবস্থা খুব খারাপ। হয়তো এতক্ষণ বেঁচেও নেই—বলতে বলতে অজিতের গলা বন্ধ হয়ে গেল।

লক্ষ্মণ চরকির মতো ঘুরে দাঁড়াল, বলিস কী? তুই এই অবস্থায় শীলাকে ফেলে এসেছিস?

এলাম। বলতে গিয়ে চোখ ভেসে গেল অনিচ্ছাকৃত অশ্রুতে। ঠোঁট কাঁপল, তবু হাসবার চেষ্টা করে অজিত বলে, এলাম। তোর কাছে। তোকে দেখতে। আজ চলি। পরে দেখা হবে।

অজিত বেরিয়ে এল। এখন বয়স হয়ে গেছে। এখন কি আর সেই বয়ঃসন্ধির কালের মতো বন্ধুর আশ্রয় ভিক্ষে করতে হয়! এই বয়সে নিজের আশ্রয় হতে হয় নিজেকেই।

বেরিয়ে আসছিল, পিছন থেকে লক্ষ্মণ চেঁচিয়ে বলল, দাঁড়া। এক মিনিট।

অজিত দাঁড়াল। লক্ষ্মণ তার সেই লুঙ্গি করে পরা ধুতির ওপর একটা পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে এল, পিছন ফিরে কাকে যেন বলল, আমি অজিতের সঙ্গে যাচ্ছি। আজ হয়তো ফিরব না।

বলে অপেক্ষা করল না। চলে এল।

সেই লক্ষ্মণ। ডাকলে বরাবর বেরিয়ে আসত।

অজিত এইটুকুই চায়। আর কিছু নয়। আর কেউ না হলেও খুব ক্ষতি নেই। কেবল লক্ষ্মণ হলেই চলে যায়। ডাকামাত্র সে আসে। যাকে বলতে হয় না হৃদয়ের দুঃখ বিষাদের কথা। বুঝে নেয়।

ট্যাক্সিতে লক্ষ্মণের পাশে বসে, নিজের হাতের আঙুলে কপাল ছুঁইয়ে অজিত তার কান্নার বাঁধ ভেঙে দিচ্ছিল। নিঃশব্দ কান্না। কেবল লক্ষ্মণ টের পায়। চুপ করে থাকে। অজিতের ভিতরটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। চৈত্রের সেই আগুন লাগা খেতের ওপর ঘন মেঘ। ধারাজলে নিভে যাচ্ছে আগুন।

॥ একষট্টি ॥

এইখানে এক পিরের কবর। তার চার ধারে বাঁশঝাড়, আর শিমুল আর শিরীষ গাছের জড়াজড়ি। একটা ভাঙা বাড়ির ইটের স্তূপের ওপর সবুজ শ্যাওলা জমেছে। তার ভিতর দিয়েই মেটো রাস্তা। ভাঙা বাড়িটার ভিতরবাগে এখনও গোটা দুই নোনা-ধরা ঘর খাড়া আছে। ছাদ ধসে পড়ে গেছে, তাই ওপরে টিনের ছাউনি। মেঝেতে অজস্র ফাটল, অশ্বত্থের শিকড় দেখা যায় দেয়ালের ফাটলে। দিনে-দুপুরে ঘরের চারপাশে পায়রা ডাকে, রাতে চামচিকে আর বাদুড়। হাতখানেক লম্বা পাকা তেঁতুলের রঙের তেঁতুলবিছে লসলস করে হেঁটে যায় এক ফাটল থেকে অন্য ফাটলে। বর্ষায় উঁচু হুল বাগিয়ে তুরতুর করে তেড়ে যায় কাঁকড়া বিছে। আর ইটের স্তূপে ইঁদুরের গর্তে, ভিতের ফাটলে বাস্তুসাপের প্রকাণ্ড সংসার। মুহুর্মুহু দেখা যায় ধূসর রঙের গোখরো দাওয়া পেরিয়ে যাচ্ছে, বর্ষার রোদ উঠলে অজস্র জাতসাপের বাচ্চা ফাঁকায় বেরিয়ে কিলবিল করে, মাটির ওপর ঢেউ খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে চলে যায় চন্দ্রবোড়া।

এইখানে থাকেন ফকিরসাহেব, হাজি শেখ গোলাম মহম্মদ ওস্তাগার। ব্রজগোপাল ছাড়া এ নাম আর কেউ জানে না। সবাই জানে ফকিরসাহেব বলে। এই ভাঙা বাড়ি তাঁর নয়। এক ভক্ত মুসলমান মরবার আগে সমস্ত সম্পত্তি দিনদুনিয়ার মালিক আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে দিয়ে যায়। সম্পত্তি বলতে অবশ্য ভাঙা বাড়িটাই—যা একসময়ে প্রকাণ্ড ছিল, জাঁকজমকও ছিল হয়তো। এখন দাবিদার কেউ নেই। সেই ভক্তজনই ফকিরসাহেবকে এখানে বসিয়ে দিয়ে যায়। ফকির থাকেন। প্রতি পদক্ষেপে সাপের দাঁত, বিছের হুল, পাখি-পক্ষীর পুরীষ। ফকিরসাহেব গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধেয় আজ প্রকাণ্ড পূর্ণিমার চাঁদ উঠল। ফকিরসাহেব মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে বললেন. চলুন, দাওয়ায় গিয়ে আল্লার আলোতেই বসি, সেই ভাল।

ব্রজগোপাল গম্ভীর ভাবে বললেন, হুঁ।

দু'জনে বাইরের খোলা চাতালে এসে বসলেন। ফকিরসাহেব জ্যোৎস্নার আভায় ব্রজগোপালের মুখখানা দেখে নিয়ে বলেন, কীরকম আওয়াজ শোনেন ধ্যানের সময়ে?

ব্রজগোপাল বলেন, সে বড় ভীষণ আওয়াজ। সহস্র ঘণ্টার ধ্বনি, সহস্র শাঁখের আওয়াজ। পাগল করে দেয়। আর একটা নীল আলোর পিণ্ড হঠাৎ ফেটে গিয়ে চারধারে আলোর ফুলঝুরি ছড়াতে থাকে। তখন বড় ভয় করে, আবার আনন্দও হয়।

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বলেন, গুরুর কৃপা।

ফিসফিস করে ব্রজগোপাল বলেন, যত দিন যাচ্ছে তত স্পষ্ট হচ্ছে। কান বন্ধ করলে একরকমের শব্দ শোনা যায়, ছেলেবেলায় শুনতাম সে নাকি রাবণের চিতার শব্দ। বলে হাসলেন ব্রজগোপাল। ফকিরসাহেব মাথা নাড়লেন। ব্রজগোপাল বলেন, আসলে তা তো নয়। আমাদের দেহযন্ত্রের মধ্যে যে অবিরল বেঁচে থাকার কারখানা চলছে ও হচ্ছে তারই শব্দ। আমাদের বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলি তা ধরতে পারে না। তেমনি ধ্যানে বসে মনটা কূটস্থে ফেলে দিলে সৃষ্টির মূল শব্দ পাওয়া যায়। আপনি বিশ্বাস করেন না?

ফকিরসাহেব মৃদু হাসলেন, বললেন, ব্রজঠাকুর, পথ একই, বিশ্বাস করব না কেন? আমি কি অবিশ্বাসী বিধর্মী? শব্দ শব্দেই তাঁর লীলা টের পাই।

বলে একটা শ্বাস ফেললেন ফকিরসাহেব। মুখে পান ছিল। সেটা আবার চিবোতে চিবোতে এক টিপ দোক্তা ফেললেন মুখে। জ্যোৎস্নায় একটা মোরগ ভুল করে ডেকে উঠল। হাত কয়েক দূরে জ্যোৎস্নায় একটা সাপকে দেখা গেল খোলা হাওয়ায় বেড়াচ্ছে। ফকিরসাহেব একটা হেঁচকি তুলে বললেন, যা যা...

সাপটা আস্তে ধীরে ইটের পাঁজার ওপর উঠে গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে থেকে

ফকিরসাহেব নিমীলিত নেত্রে বললেন, ব্রজঠাকুর, শব্দের কথা মানুষকে বলবেন না। ওরা বিশ্বাস করবে না, ভাববে বুজরুকি।

বুজরুকেরও অভাব নেই। ব্রজগোপাল উদাস গলায় বলেন, এখন শুনি অনেক ম্যাজিকওয়ালা সব গুরুঠাকুর সেজে বসেছে। আহাম্মকেরা তাদের কাছে ভগবান বলে ধেয়ে যায়। বুদ্ধিমান লোকে তাই বুজরুকি বলে পুরো ধর্মকেই অগ্রাহ্য করে। এ বড় ভীষণ অবস্থা।

জ্যোৎস্নাতে কাক ডেকে উঠছে। নিঃশব্দ বাদুড় ঝুলে পড়ল শূন্যে, চাঁদের চারধারে পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল। ভারী নিঃঝুম চার দিক। কেবল মাঝে মাঝে রাতের শব্দ হয়। পাখির অস্পষ্ট ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ, ঝিঁঝি ডাকছে অবিরল, গাছে গাছে ফিসফিস কথা, আর কখনও টিকটিকি ডাকে, কখনও তক্ষক। চারধারে গাছগাছালির ছায়া নিবিড় হয়ে পড়ে আছে। পাতানাতা মাড়িয়ে একটা শেয়াল দৌড়ে গেল, পিছনে দূরে কোনও গেরস্তর কুকুর তাড়া করে এল খানিক দূর।

দু'জনেই আসনপিঁড়ি হয়ে মুখোমুখি বসে আছেন। চারধারে মানুষের সাড়া নেই কোথাও। কিন্তু পৃথিবীর গভীর ও রহস্যময় প্রাণস্পন্দনে সজীব আবহ। আকাশে বৃক্ষে ও মাটিতে কত কোটি কোটি প্রাণ বেঁচে আছে। টের পাওয়া যাবে।

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বলেন, ইটিন্ডাঘাটে এক বুজরুক ছিল, ঘরে বসে সে নাকি কলকাতার নামী দোকানের রসগোল্লা কিংবা অসময়ের ল্যাংড়া আম খাওয়াত। লোকে বলত, তার পোষা ভূত আছে, সে-ই সব এনে দেয়। খবর পেয়ে দেখতে গেলাম লোকটাকে, কিন্তু আমার ফকিরি চেহারা দেখেই লোকটা ঘেবড়ে গেল। কিছুতেই আর রসগোল্লা বা আম আনারস আনতে রাজি হয় না। লোকজনের বিস্তর ঝোলাঝুলি সত্ত্বেও বলে আজ আমার শরীর ভাল না। পরে আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, আপনি তো সবই জানেন, ভাঙবেন না। বলে ফকিরসাহেব হাসলেন, বললেন, ব্রজঠাকুর, আদতে কিন্তু আমি কিছুই জানি না। আমি লোকটার ঐশী শক্তি দেখতেই গিয়েছিলাম, ভাল হাতসাফাই হলে ধরতেও পারতাম না। কিন্তু লোকটা ভয় খেয়ে সব স্বীকার করে ফেলল।

ব্রজগোপাল বলেন, আমার বড় জামাইও কার পাল্লায় পড়েছে শুনছি। ছোকরার ধর্মকর্মের ওপর খুব রাগ ছিল, এখন নাকি পথে পথে কেত্তন করে চাঁদা তোলে, কোথায় আশ্রম করবে। ঘরে পোয়াতি বউ পড়ে থাকে, আর সে 'বাবা বাবা' বলে গুরুর নামে চোখের জল ফেলে নামগান করে। তা গুরুর নামে চোখের জল আসে সে ভালই, কিন্তু এ-সব তপ্ত আবেগ তো বেশিক্ষণ টেকে না। একদিন চটকা ভাঙলেই ছিটকে যাবে। তখন হয় ধর্মকর্মের ওপর মহা খাপ্পা হয়ে উঠবে, নয়তো সাত গুরু ধরে বেড়াবে। এও বড় ভয়ংকর অবস্থা। তার চেয়ে নাস্তিক ছিল, সে ঢের ভাল ছিল। নিষ্ঠাবান নাস্তিকেরও উদ্ধার আছে, দুর্বলচিত্তরাই উদ্ধার পায় না।

ফকিরসাহেব নিমীলিত চোখে চেয়ে রইলেন।

পিরের কবর অনেক দূর। গাছগাছালির আড়াল পড়েছে। সেই দূর থেকে কে যেন হাঁক পাড়ে—ব্রজকর্তা, ও ব্রজকর্তা!

কোকা কিংবা কালীপদ হবে। আজকাল একটুক্ষণ বাইরে থাকলে বহেরু চারধারে লোকজন পাঠাতে থাকে। তা সেই লোকজনেরা কেউ এত দূর আসতে সাহস পায়নি। গাঁ গঞ্জের মানুষ সব, এমনিতে সাহসের অভাব নেই। কিন্তু ফকিরসাহেবের আস্তানায় সন্ধের পর ঢুকতে চায় না কেউ। পায়ে পায়ে সাপ ঘোরে। তার ওপর লোকে জানে, এ সময়টায় ফকিরসাহেব ভূত আর পরি নামান। অনেকে দেখেছে ক্ষুদে ক্ষুদে পরি গাছের পাতায় পাতায় দোল খায়। জিন ঘুরে বেড়ায়, ভূত এসে ফকিরসাহেবের পা দাবায়, পাকা চুল বেছে দেয়। সেইসব ভয়ে কেউ ঢোকে না। ভূতের গায়ের গন্ধ অনেকটা বুড়ো পাঁঠার গায়ের গন্ধের মতো, সেই বিদঘুটে গন্ধে নাকি তখন জায়গাটা ম ম করে। মরার পর মেঘু ডাক্তারও নাকি এখানে থানা গেড়েছে। তাই কেউ আসে না।

একমাত্র ব্রজগোপাল আসেন। সঙ্গে একটা টর্চবাতি থাকে, আর-একটা মজবুত লাঠি।

ফকিরসাহেব বললেন, ওই আপনার শমন এসেছে।

হ্যাঁ। যাই।

ফকিরসাহেব হেসে বলেন, আমরা দুই ফকির এক ঠাঁই থাকতে পারতাম তো বেশ হত। তাঁর দয়ায় কথা বলতে বলতে একটু কাঁদতাম দু'জনে। কী বলেন?

ব্রজগোপাল একটা শিহরিত আনন্দের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওই হচ্ছে কথা। তাঁর কথাই হচ্ছে কথা।

টর্চবাতি আর লাঠি নিয়ে উঠলেন। টর্চ ফেলতেই একটা শিয়াল দৌড় দিল। চাতালের ঠিক নীচেই মাথা তোলা দিল বাদামি রঙের গোখরো। টর্চ আর লাঠি দু' বগলে চেপে নিয়ে হাততালি দিলেন ব্রজগোপাল। সাপটা ধীরেসুস্থে উত্তরবাগে সরে গেল। ব্রজগোপাল মুখ ঘুরিয়ে বললেন, এ জায়গায় বড় মধু। পরমপিতা খোদার ভক্ত থাকেন তো, ইতরজীবও তাই টের পায় এ জায়গায় ভালবাসার তাপ রয়েছে।

আল্লা মালিক। ফকিরসাহেব বললেন।

ব্রজগোপাল হাঁটতে থাকেন।

ঘরে এসে একটা পোস্টকার্ড পেলেন তিনি। লণ্ঠনের আলোটা উসকে পড়তে লাগলেন। বুধবার রাত বারোটা কুড়ি মিনিটে শীলার একটি ছেলে হয়েছে। প্রসবে খুব কষ্ট পেয়েছে শীলা, রক্ত দিতে হয়েছে। শীলার কষ্টের কথা আরও অনেকখানি লিখেছেন ননীবালা। জামাই বাড়ি ছিল না। ছেলে হওয়ার পর সে খবর পেয়েছে। তারপর জামাইয়ের সাম্প্রতিক স্বভাবের ওপরেও অনেকটা লেখা, ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর পড়তে গিয়ে চোখে জল চলে আসে। আরও লিখেছেন, ছেলেরা আজকাল তাঁর খোঁজখবর করে না। বীণার ব্যবহার ভাল নয়। ইত্যাদি।

ব্রজগোপাল চিঠি রেখে পঞ্জিকা খুলে বসলেন। কাগজ-কলম নিয়ে নিবিষ্টমনে কোষ্ঠীর ছক তৈরি করতে লাগলেন নাতির। মনটায় বেশ একটা ফুর্তির হাওয়া খেলছে। নাতি হয়েছে। আরও তো ক'টা নাতি-নাতনি আছে তাঁর, তবু এই যে একটা রক্তের সম্পর্কিত মানুষছানা জন্মাল, এই খবরটাই কেমন একটা মায়া সৃষ্টি করে বুকের মধ্যে।

একটা লোক এনেছে বহেরু যে মাটি ছাড়াই গাছ গজিয়ে দিতে পারে। সেই শুনে বহেরু তাকে হাওড়া না কোত্থেকে ধরে এনে ক'দিন জামাই-আদরে রেখেছে। একটা বেশ বড়সড় জায়গা বাঁশ-বাঁখারি দিয়ে ঘিরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কী সব কাণ্ড-মাণ্ড হচ্ছে। এই রাতেও সেখানে দু'-দুটো ডে-লাইট ঝুলছে জাম আর সজনে গাছের সঙ্গে। মেলা লোকজন তামাশা দেখতে ভিড় করেছে। এখন সেখানে মাটি কেটে কেটে সিমেন্ট জমিয়ে চৌখুপি করা হচ্ছে, সেইখানেই চাষ হবে।

ব্রজগোপাল বাইরে এসে দূর থেকে ভিড়টা দেখলেন। সেই ভিড়ে একমাথা উঁচু বহেরু কোমরে হাত দিয়ে জমিদার-টমিদারের মতো দাঁড়িয়ে।

ব্রজগোপাল ডাকতেই বহেরু ছুটে আসে।

কর্তা ডাকলেন নাকি?

তুইও ছেলেমানুষ হলি নাকি?

বহেরু হাসে, বলে, না, কায়দাটা দেখে রাখছি, কী ক'রে করে। দরকার হলে নিজেরাই করতে পারব।

তোর মাটি ছাড়া চাষের দরকার কী? তোর কি মাটির অভাব?

বহেরু ঝুপ করে সুমুখে বসে পড়ে। লাজুক হেসে বলে, তা হতেও পারে একদিন। শুনি, এই সেদিন তারাদাস মাস্টারমশাই কচ্ছিলেন যে, এত মানুষ জন্মাবে পৃথিবীতে যে সব গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। শোওয়া-বসার জায়গাটুকুও থাকবে না। তা তখন পৃথিবীর জমিতে তো টান পড়বেই। শিখে রাখা ভাল।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন, তুই যে সেই মোড়লটার মতো কথা বলিস। আমার সেই যজমান মোড়লকে একদিন বলেছিলাম—বাপু হে, মাছ মাংস খেলে শরীরে টকসিন হয়, রোগবালাই হলে সহজে ছাড়তে চায় না, ও-সব আর খেয়ো না। সে তখন হাতজোড় করে বলে, দাদা, মাছমাংস খাওয়া সবই ছেড়ে দিলে যে নদী পুকুর সমুদ্দুর সব মাছে মাছে মাছময় হয়ে যাবে, ঘটি ডুববে না জাহাজ চলবে না। আর ডাঙায় পাঁটা ছাগল মোরগে সব ভরে যাবে, দিনরাত চারধারে ভ্যা-ভ্যা ম্যা-ম্যা কোঁকর কোঁ আওয়াজে কান ঝালপালা। যেন-বা সেই ভয়েই ব্যাটা মাছমাংস খাওয়া ছাড়তে পারে না।

বহেরু হেসে বলে, তা হলে তত্ত্বটা কী কর্তা?

তুই তো কেবল চিরকাল তত্ত্ব শুনতে চাস। মাথায় তো কিছুই সেঁধোয় না। তবে জেনে রাখিস এই দুনিয়াটা যার সে সব দিক নিয়ে ভেবে রেখেছে! তোর আমার ওপর দুনিয়াটা পুরো ছেড়ে দেয়নি। গায়ে গায়ে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবে, শোওয়া-বসার জায়গা থাকবে না—তাই হয় নাকি রে হারামজাদা? তার অনেক আগেই মানুষে মানুষের মাংস খেতে শুরু করবে।

বহেরু বুঝল। ব্রজঠাকুরের কথা শুনলেই তার বুকের মধ্যে একটা বলভরসা এসে যায়।

ব্রজগোপাল তার হাতে কুড়িটা টাকা দিয়ে বললেন, একটু মিষ্টিটিষ্টি কিনে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াস। আমার নাতি হয়েছে একটা, বড়মেয়ের ঘরে।

বামনবীরটাকে এনে ফেলেছে বহেরু। তার খুব ইচ্ছে ছিল লম্বা সাঁওতাল আর বেঁটে বামনকে জোড় মিলিয়ে বহেরু-গাঁয়ে ছেড়ে দেবে। তারা যেখানে যাবে হাঁ করে দেখবে সবাই। কিন্তু সেটা হচ্ছে না। সাঁওতালটা শয্যাশায়ী রয়েছে ক'মাস, এখনও মরেনি বটে কিন্তু গোবিন্দপুর আর বৈঁচী থেকে ডাক্তার এসে দেখে বলে গেছে যে, এ আর খাড়া হবে না। যে ক'দিন বাঁচে বিছানাতেই বাঁচবে। তাই বামনবীর লোকটা একা-একাই ঘোরে। তার ধারণা, লোক হাসানোই তার একমাত্র কাজ। রংচঙে জামা কাগজের টুপি পরে সে নানা কসরত করে লোক হাসায়। ব্রজগোপাল তাকে ভাল চোখে দেখেন না। লোক হাসানোর তাগিদে সে এক বার ব্রজগোপালের কাছা টেনে আলগা করে দিয়ে দৌড়েছিল। বহেরু তাকে মারতে গেলে ব্রজগোপালই ঠেকিয়েছিলেন। কিন্তু লোকটাকে এড়িয়েই চলেন তিনি। নিজের শরীরের খুঁত বাজিয়ে ব্যবসা করে যে লোক তাকে তাঁর পছন্দ নয়।

ব্রজগোপাল ঘরমুখো হতেই কোত্থেকে একটা শিশুর মতো বামনটা ছুটে এল। সামনে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট ঠুকল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একধরনের অদ্ভুত সরু মেয়েলি গলায় বলল, ব্রজকর্তা, আপনাকে একটা কথা বলব।

ব্রজগোপাল একটু অবাক হয়ে বলেন, কী?

ঘরে এসে লোকটা টিনের চেয়ারে হামা দিয়ে উঠে বসল। বলল, আমার বয়স কত বলুন তো!

ব্রজগোপাল অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলেন। কোনও আন্দাজ করতে পারলেন না। বললেন, কত আর হবে। বেশি নয়।

॥ বাষট্টি ॥

বামনবীরের পেটটি নাদা। দু' হাতে ঢোলের মতো চাটি মেরে পেট বাজিয়ে খি-খি করে হেসে বলে, বেশি নয়? অ্যাঁ! বেশি নয়? বেঁটে বলে সবাই ভাবে মতিরামের বয়স বুঝি বারো তেরো। তা নয় গো!

বলে বামনবীর মতিরাম খুব হাসে।

ব্রজগোপাল কিছু বিরক্ত হন। মুখে কিছু বলেন না।

মতিরাম হাসতে হাসতে চোখের জল মুছে বলল, তা ব্রজকর্তা, তোমার বয়স কত শুনি!

একটু আগে আপনি আজ্ঞে করছিল, এখন স্রেফ তুমি বলছে। তাতে ব্রজগোপাল অসন্তুষ্ট হন না। সাধারণ মানুষেরা ও-রকমই, বেশিক্ষণ আপনি আজ্ঞে চালাতে পারে না, মানী মানুষ দেখলে কিছুক্ষণ প্রাণপণে আপনি আজ্ঞে করে, তারপরই তুমি বেরিয়ে পড়ে।

ব্রজগোপাল বলেন, তা পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি হবে।

মতিরাম হেসেটেসে চোখ কুঁচকে, ছোট দু'খানা হাতে ব্রজগোপালকে বক দেখিয়ে বলে, দুয়ো! হেরে গেলে।

ব্রজগোপাল অসহায় ভাবে চেয়ে থাকেন।

মতিরাম মাথা নেড়ে বলে, পাল্লে না তো!

ব্রজগোপাল শান্ত গলায় বলেন কীসে পারলাম না?

বয়সে। বলে মতিরাম আবার বিকট মুখভঙ্গি করে বলে, আমারও পঁয়ষট্টিই।

কথাটা ব্রজগোপাল বিশ্বাস করলেন না। কিন্তু কিছু বললেনও না।

মতিরাম চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে এক পা তুলে দু'খানা হাত নুলোর মতো পেটের দু'দিকে ভাঁজ করে, দাঁত বের করে চোখ পিটপিট করল কিছুক্ষণ। তারপর হুপ করে মেঝেয় লাফিয়ে নেমে বিচিত্র কায়দায় হাতের ওপর ভর করে পা দুটো পিছন দিকে ঘুরিয়ে নিজের কাঁধের ওপর তুলে দিয়ে ব্যাঙের মতো লাফাল খানিক। মুখে অবিরল ব্যাঙ ডাকার শব্দ। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাতটাত ঝেড়ে বলল, দেখলে, মতিরামের বয়স হলে কী হয়। এখনও অনেক খেলা দেখাতে পারে।

দেখলাম। ব্রজগোপাল উদাস উত্তর দেন।

মতিরাম আবার হামাগুড়ি দিয়ে চেয়ারে উঠে বসে ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে খুব বিরক্তির সঙ্গে বলে, তুমি হাসো না কেন বলো তো! সার্কাসে আমি বিশ বচ্ছর জোকার ছিলাম, কত লোককে হাসিয়েছি। এখনও গাঁয়ে-গঞ্জে সব জায়গায় আমাকে দেখলেই লোকে হাসে। আর যখন মজা-টজা বা খেলা-টেলা করি তখন তো কথাই নেই। হাসতে হাসতে গর্ভবতীর প্রসব হয়ে যায়, মানুষ পুত্রশোক ভুলে যায়, মরা মানুষ পর্যন্ত শ্মশানে যাওয়ার পথে ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে ফেলে। তুমি হাসো না কেন বাবু? ব্যারাম-ট্যারাম নেই তো?

ব্রজগোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বাপু, তোমাকে দেখে আমার হাসি পায় না।

মতিরাম ভারী অবাক হয়ে বলে, পায় না? অ্যাঁ! পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এইটুকুন একটা মানুষ, বামনবীর—বলে নিজের লম্বার মাপ হাত দিয়ে দেখিয়ে মতিরাম বলে, এ দেখেও হাসি পায় না।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, বেঁটে লম্বা কত রকম মানুষ আছে, মানুষের শরীরের খুঁত দেখে হাসি পাবে কেন? আমার পায় না।

এই যে এত কেরদানি দেখালাম তাও হাসি পেল না?

না।

তোমার বাপু ব্যারাম আছে।

ব্রজগোপাল সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলেন, লোক হাসানোর অত দরকার কী তোমার?

মতিরাম একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ অভিমানভরে বলে, সার্কাসে এক জন্ম এই তো করেছি। কাজ-বাজ কেউ তো আর দেয়নি। লোক না-হাসালে পেট চলে কেমন করে? সার্কাসটা উঠে গেলে হাটে-বাজারে এইসব করে ভিক্ষে-সিক্ষে জুটত।

আর কিছু করোনি?

করেছি। মতিরাম পা দোলাতে দোলাতে বলে, পদ্য-টদ্য লিখতে পারতাম, বুঝলে ব্রজকর্তা? উদ্বাস্তু আর নেতাজি নিয়ে পদ্য ছাপিয়ে ট্রেনে বিক্রি করতাম। লোকে আমাকে দেখে হাসত, পদ্য কিনত না। দুই বাড়িতে দু'বার চাকরের কাজও করেছি। সে-সব পোষায় না। তারপর পাণ্ডুয়ার

বাজার থেকে বহেরু ধরে নিয়ে এল, খোরাকি দেবে আর হাত-খরচা। তো ভাবলাম বুড়োবয়সে আর যাই কোথা! মরার আগে কিছু জিরেন নিয়ে হাঁফ ছাড়ি বাবা। সকাল থেকে আর পেটের চিন্তা করতে হবে না। এইটুকুন তো মোটে পেট, একমুঠো ভাত দিলে ভরে যায়। তা এইটুকুনের জোগাড় করতেও কত নাচনকোঁদন লাগে বাবা।

ব্রজগোপাল বললেন, তা থাকো, এইখানেই থেকে যাও।

মতিরাম অভ্যাসবশত ফের চোখ নাচায় মুখ বিকৃত করে। বলে. তা হলে আর ভাবনা কী ছিল? এ বেশ জায়গা, কাজকর্ম নেই, ঘোরো-ফেরো, লোক হাসাও, খাও দাও বগল বাজাও। বহেরু বিশ্বেস মানুষের চিড়িয়াখানা খুলেছে, নতুন রকমের গ্রামপত্তন করবে—এ সবাই জানে। কিন্তু ছেলেরা বড় হারামজাদা। যেখানে যাই কপিল শালা আর ওই কোকা খুনে হুড়ো দেয়। ওরাও তোমার মতো, হাসে না। কেবল বলে, যা যা, নিষ্কর্মা গতরখাস। বহেরু পটল তুললে এরা ঠেঙিয়ে তাড়াবে। পারলে এখনই তাড়ায়। কাক শালিক, শেয়াল কুকুরেও গেরস্তর ভাত খেয়ে যায় বাবা, তেমনি কাঙাল ফকির অভাগাও খায়। এদের সহ্য হয় না। বড্ড ছোট মানুষ। আমার চেয়েও। বলে হাসে মতিরাম।

ব্রজগোপাল উত্তর দেন না। ব্যাপারটা তিনি জানেন।

মতিরাম বলে, তো তাই ভাবি বসে বসে। আমার বয়স সত্যিই পঁয়ষট্টি। লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি আর তেমন পারি না। চোখেও ছানি পড়ছে। দেখবে? দেখো না!

বলে মতিরাম লাফ দিয়ে নেমে কাছে এসে আঙুল দিয়ে চোখের পাতা তুলে দেখায়। ব্রজগোপাল দেখেন, সত্যিই বাঁ চোখের মণির মাঝখানে সাদাটে ছানি। ডান চোখেও আসছে, তবে অতটা নয়।

মতিরাম ফের চেয়ারে গিয়ে উঠে বসে বলে, আন্দাজে আন্দাজে চলাফেরা করি, কেরদানি দেখাই। কোনদিন হুট করে পড়েটড়ে গেলে বুড়ো বয়সে শয্যা নিতে হবে। মাগ-ছেলে নেই যে দেখবে।

বলে ফের দুঃখের কথাতেও খি-খি করে হাসে। বোধহয় মাগ-ছেলের কথাতেই হাসিটা আসে।

ব্রজগোপাল কোনও প্রশ্ন করেন না। মতিরাম হাসতে হাসতে নিজে থেকেই বলে, বিয়ে করতে গিয়েছিলাম দু'বার। সার্কাসে থাকতে পয়সাকড়ি পেতাম কিছু, এক গরিব মেয়ের বাপকে রাজি করাই পয়সাকড়ি দিয়ে। কিন্তু বিয়ে করতে যেই গেছি গাঁয়ের ছেলেছোকরা একজোট হয়ে খুব ঠ্যাঙালে আমাকে। টাকাটাও গেল। আর-এক বার বছর দশ আগে সিমলাগড়ের একটা পশ্চিমা ঘুঁটেউলি বিয়ে বসল। তার আগের পক্ষের বড় বড় ছেলেপুলে ছিল। তো সেই মেয়েছেলেটা আমার পয়সা হাতাত, খেতেটেতে দিতে চাইত না। শেষপর তার ছেলেরা আর সে মিলে খুব মারধর করত আমাকে। মারের চোটে পালিয়ে বাঁচি। সে কী মার বাবা!

ফের খুব হাসতে থাকে মতিরাম।

ব্রজগোপাল আস্তে করে বলেন, কেউ নেই?

মতিরাম বলে, আমিই আছি আর কাকে দরকার বাবা! একাই চলতে পারি না তো আর কেউ! বুঝলে ব্রজকর্তা, দরজির কাজ খানিকটা জানি। জামা-পায়জামা বানাতে পারি, লোক হাসাতে পারি। দেখো তো একটু! কেউ রাখলে থাকব।

বলে মতিরাম উঠে দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট করে। তারপর লেফট রাইট করতে করতে বেরিয়ে যায়। পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ছানিপড়া চোখ নিয়ে দিব্যি আছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই ভারী ন্যাওটা হয়ে গেল মতিরাম। এমনিতে ভাঁড়ামি করে বেড়ায়। কিন্তু ফাঁক পেলেই ব্রজগোপালের কাছে এসে বসে থাকে। পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করে বেড়ায়। যেমন ষষ্ঠীপদ তেমনি মতিরাম। দু'জনেই সারাক্ষণ ব্রজগোপালের গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাঁর শরীরের ছায়ায়

ছায়ায় ঘোরে। ব্রজগোপাল তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসেন। প্রায় সমান মাপের দু'জন। একজনের বয়স পঁয়ষট্টি, অন্যজন নেহাত শিশু। দু'জনে ঝগড়াও লেগে যায় মাঝে মাঝে।

ষষ্ঠীপদ বলে, আমার দাদুকে যন্ত্রণা করবে না বলে দিচ্ছি।

মতিরাম মুখ ভেঙিয়ে বলে, ইঃ দাদু। বাপের সম্পত্তি নাকি রে ব্যাটা!

বড় মায়া জন্মায়। বুকের মধ্যে প্রাণপাখি ডানা ঝাপটায়। কবে খাঁচা ছেড়ে যায়। তবু কেন যে অবোধ মায়া!

শরীরটা কিছুদিন যাবৎ ভাল নেই ব্রজগোপালের। বেলপুকুরে যজমানবাড়ি ঘুরে যাজন সেরে এসে বুকে ব্যথাটা টের পেলেন ফের। ফকিরসাহেব খবর পেয়ে এসে বিছানার ধারে বসে বলেন, ওষুধ কি দেব ব্রজঠাকুর? অনুমতি পেলে দিই।

ব্রজগোপাল হেসে বলেন, পরমপিতা খোদার নাম করুন।

ফকিরসাহেব দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, শিব স্বয়ম্ভু।

এক রাতে শীলাকে স্বপ্ন দেখলেন। ঘুম বড় একটা হয় না। তবু ভোরবেলার তন্দ্রায় এক আলো-আঁধারিতে শীলা যেন সামনে এসে দাঁড়াল। কোলে একটা বাচ্চা। বাচ্চাটার মুখ হুবহু শীলার মতো। শীলা বলল, বাবা আমার ছেলের নাম বাখবে না?

ব্রজগোপাল কষ্টের সঙ্গে বললেন, আমি নাম রাখলে কি তোদের পছন্দ হবে? পুরনো দিনের মানুষ আমরা। রণোর বড় ছেলের নাম রেখেছিলাম, তা সে ওরা পালটে দিয়েছে।

শীলা বলল, না বাবা, এ ছেলের নাম তুমিই রাখো। তুমি তো ভগবানের লোক বাবা, তুমি নাম রাখলে ও বাঁচবে।

ব্রজগোপাল বললেন, তবে নাম রাখো ঋতম্ভর।

মানে কী বাবা?

সত্যপালক। বিষ্ণু।

এই দেখে ঘুমের চটকা ভাঙল, উঠে বসলেন। ভোরের স্বপ্ন। ভাবলেন, নামটা আজই লিখে পাঠাবেন শীলাকে। আবার ভাবলেন, নাতির মুখশ্রী এক বার দেখে আসবেন গিয়ে। হয়তো শেষ দেখা। শরীরটা এখনও পড়ে যায়নি। এইবেলা না দেখে এলে আর হয়তো দেখাই হবে না। ওরা তো আর আসবে না বুড়ো বাপের কাছে।

॥ তেষট্টি ॥

দিন দুই আগে সোমেন ডাকে একটা খাম পেয়েছিল। তাকে ঠিক চিঠি বলা যায় না। খামের মুখ ছিঁড়তে একটা কেবলমাত্র রঙিন সিনেমার টিকিট বেরিয়ে এল। দু' দিন পরের তারিখ। সঙ্গে একটা চিরকুটও নেই যে বোঝা যাবে টিকিটটা কে পাঠিয়েছে।

পঁচিশ বছরে পা দিয়ে সোমেন আজকাল টের পায় তার জীবনে খুব একটা রহস্য বা চমকে ওঠার মতো কিছু নেই। এই তো সেদিন সে মোটে তার শৈশব পেরিয়ে এল। শীতের সকালে মা একটা ছোট্ট ছেঁড়া আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে পিঠের দিকে গিঁট বেঁধে দিত, আর সোমেন একটা বড় টিনের কৌটো আর খুচরো পয়সা মুঠো করে নিয়ে মুদির দোকান থেকে মুড়ি আনতে যেত। ঢাকুরিয়ার রেল লাইনের ওপর ওভারব্রিজটা তখনও হয়নি। যোধপুরের দিকে ফাঁকা জমি পড়ে আছে। শীতের সকালে কুয়াশামাখা ঝিলের মলিন জল ছুঁয়ে কনকনে বাতাস আসত। সেই দূরটুকু কুয়াশায় হারিয়ে যাওয়া দিগন্তটা আর রেল ইঞ্জিনের কুহুধ্বনি সবই গায়ে কাঁটা-দেওয়া রহস্য জাগিয়ে দিয়ে যেত। লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে বাস থেমে আছে, গেট বন্ধ, আর ঠিন ঠিন করে

দূরের দমকলের মতো ঘণ্টি বাজছে। সেই ঘণ্টির শব্দ কী একটা অজানা আনন্দের সংবাদ নিয়ে আসত মনের মধ্যে। মুদির দোকানে একটা কেমন মশলাপাতির ঝাঁঝালো গন্ধ উঠত। বুড়ো মুদি চরণ সাহা একটা রঙিন খদ্দরের চাদরে মাথা মুখ ঢেকে জিনিস ওজন করে দিত। চরণ সাহা কখনও ফাউ দিত না, বরং মাপা জিনিস থেকে এক চিমটে তুলে রাখত বরাবর। তার ওপর একটা রাগ ছিল সোমেনের। কিন্তু খুব বেশি দোকান তখনও ওদিকে ছিল না। রাস্তাঘাট অনেক ফাঁকা ছিল, এত বাড়ি-ঘর হয়নি। স্টিম-ইঞ্জিন ঝিক ঝিক করে কাঠের গাড়ি টেনে নিয়ে গেছে লাইন দিয়ে। সন্ধেবেলা কত দিন রেলগাড়ির শব্দ দূরে মিলিয়ে যেতে মন উদাস হয়ে গেছে সোমেনের। তখন মনে হত পৃথিবী কী ভীষণ গভীর গহিন। এর মধ্যে না জানি কত অজানা অচেনা রহস্য লুকিয়ে আছে। শীতে কত পাখি আসত, বর্ষার ব্যাঙ ডাকত। এখন আর সে-সব দেখে না, শোনে না সোমেন। আজকের যারা শিশু তারা হয়তো এই আবরণহীন, যান্ত্রিক পৃথিবীর কিছু রহস্য টের পায় এখনও। সোমেন পায় না।

টিকিটটা অনেকবার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করল সোমেন। কোনও হদিশ করতে পারল না। কিন্তু রহস্যটা বেশ ভাল লাগছিল তার কাছে। যে-ই পাঠাক সে অন্তত দু' দিন সোমেনকে মনে মনে উদ্‌গ্রীব রাখছে।

আজ সকালে উঠেই টিকিটটা বের করে দেখল সোমেন। আজই ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট মেট্রোয়। টিকিটের ওপর মেট্রো কথাটা দেখে ফের শিশুবেলার কথা মনে পড়ে সোমেনের। মেট্রো হল-এর নাম তখন মা-মাসির মুখেও শোনা যেত। সে নাকি এক আশ্চর্য মায়াপুরী। মেট্রো হল-এর চূড়ায় যে খাঁজকাটা প্যাটার্ন আছে তারই অনুকরণে তখনও মেট্রো প্যাটার্নের নেকলেস বা গলার হার গড়াত বাঙালি মেয়েরা। আজ মেট্রোর সেই কারুকাজ কেউ চোখ তুলেও দেখে না। ওই হল-এর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো অনেক হল হয়েছে কলকাতায়। তবু তখনও সোমেনের কাছে ওই নামটার একটা চমক আছে।

আজকাল সোমেনের বড় পুরনো কথা মনে পড়ে। একদিন অনিল রায় তাকে বলেছিলেন, দেখো সোমেন, যখনই দেখবে তোমার খুব বেশি পুরনো কথা মনে পড়ছে তখনই বুঝবে যে তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ। নস্টালজিয়া বলো, শৈশবের স্মৃতি বলো—ওর খুব বেশি ভাল নয়। ও মানুষকে শেখায় বর্তমানকে উপেক্ষা করতে, ভবিষ্যতের প্রচেষ্টা থেকে নিশ্চেষ্ট রাখতে। বাঙালি মাত্রই বড় বেশি নস্টালজিয়ায় ভোগে। আসলে যারা নিজের চারপাশকে উপভোগ করতে পারে না, যারা নিজেদের জীবনকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিস্তৃত করতে পারে না, যারা ঘরকুনো তারাই দেখো, বর্তমানকে উপেক্ষা করে অতীত নিয়ে থাকে।

সোমেনের আজকাল তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, পঁচিশেই বুঝি-বা তার যৌবন ফুরোল। আর কিছু হওয়ার নেই। কিছু করার নেই। দাদার এই দুঃসময়ে সে সংসারের কোনও কাজে আসে না। একটা পয়সাও দিতে পারে না সংসার-খরচ। তাই সোমেন দু'বেলা বড় লজ্জার ভাত খায়। রাতে গোপনে কখনও-বা চোখের জল ফেলে।

সকাল থেকেই টিকিটটা ঘিরে তার একটা পিপাসা জেগেছিল। মনে হচ্ছিল গিয়ে যদি দেখে চেনা কেউ নয়, একজন অচেনা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায়! কিংবা যদি এমন হয় যে, এই টিকিটের সূত্রেই তার জীবনের মস্ত পরিবর্তন আসছে?

ভাবতে গিয়ে আপন মনেই হেসে ফেলল সোমেন। তাই কি হয়? চেনা মানুষই পাঠিয়েছে টিকিট। একটু শুধু রহস্য জড়িয়ে দিয়েছে টিকিটের গায়ে। তাই শৈশবের সব হারিয়ে যাওয়া রহস্যের গন্ধ আজ মেট্রোর তুচ্ছ টিকিটটার গা থেকে শুঁকে নিচ্ছিল সোমেন।

ননীবালা এসে বললেন, পাগল ছেলে, একা-একা হাসছিস কেন?

সোমেন গম্ভীর হয়ে বলল, ও কিছু না।

ননীবালা বললেন, এক বার শীলার বাড়ি যা। ছেলে হওয়ার পর থেকেই মেয়ের বড় খিদে হয়েছে। ঝি-ছুঁড়িটা কী ছাইমাটি রেঁধে দেয়, ও দিয়ে কি আর পোষ্টাই হয়! এখন হুড় হুড় করে বুকের দুধ নামাতে হলে বাটি বাটি দুধ-সাগু খাওয়াতে হয়, ফলি মাছের ঝোল, লাউ। তা সে-সব আর কে করছে! কয়েকটা গোকুল পিঠে করে রেখেছি, বউমা কই-মাছ করছে, টিফিন ক্যারিয়ারে করে দিয়ে আয় গে।

সোমেন মুখটা বিকৃত করে বলে, দিদির শাশুড়ি আর কে যেন এসে ওখানে আছে শুনলাম। তারা থাকতে দিদির জন্য আমাদের ভাববার কী?

ননীবালা একটা তাচ্ছিল্যের 'হুঁঃ' দিয়ে বললেন, সে যেই হোক, পেটে তো আর আমার মতো ধরেনি মেয়েটাকে। তারা সব অতিথির মতো এসে আছে। আলগোছে ক'দিন থেকে চলে যাবে।

সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে, তুমি খাবার পাঠালে তারা বিরক্ত হতে পারে। প্রায়ই তো পাঠাচ্ছ শুনি।

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন, ও মা! বিরক্ত হবে কেন? বরং না পাঠালে খোঁজ না নিলে উলটে বলত। এমনিতেই নার্সিংহোমে রাখা হয়নি, হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে বলে জামাই সুদ্ধু সকলেরই গাল ফুলে আছে। বিপদের সময়ে সব কোথায় হাওয়া হয়েছিল, তাই ভাবি। কাজ উদ্ধার হয়ে যাওয়ার পর খুঁত ধরতে সবাই পারে।

সোমেন বেশি কথা বলতে চায় না। টিকিটের রহস্যচিন্তা ছিঁড়ে যেতে চায়। বলল, উঃ বড্ড বেশি কথা বলো তুমি। খাবার দিয়ে আসতে হবে, দিয়ে আসব। অত কথায় কাজ কী?

ননীবালা আজকাল এই ছেলেটাকে বড় ভয় পান। রণোর মতো শান্ত নয়, বড্ড রাগী। অবশ্য চাকরি-বাকরি পায় না বলেই বোধহয় মেজাজটা খিঁচড়ে থাকে। বয়সকালে স্থিতু হতে না পারলে পুরুষমানুষের ও-রকম হয়ই, মেয়েদের হয় বয়সকালে বিয়ে না হলে। শীলার কিছু দেরিতে বিয়ে হয়েছিল, শেষ দিকটায় বড্ড মুখ করত।

ননীবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমরা বাবা সব ভি আই পি, কথা বলতে গেলেই ভয় পাই।

সোমেন মা'র মুখের দিকে চেয়ে হেসে ফেলে। বলে, ওঃ বাবা, আজকাল যে ইংরিজি বলছ! ভি আই পি-টা কোত্থেকে শিখলে?

ননীবালা উদার গলায় বলেন, শুনে শুনেই শেখা।

সোমেন বহুকাল পর হঠাৎ উঠে ননীবালাকে দু' হাতে জড়িয়ে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শূন্যে একটা পাক খাওয়াল। ননীবালা 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে' বলে চেঁচালেন, হাসলেনও। সোমেন বলল, খুব আপ-টু-ডেট হয়ে যাচ্ছ, বুড়ি, অ্যাঁ?

যখন শীলার বাড়ি যাবে বলে বেরোতে যাচ্ছে সোমেন তখন বীণা টিফিন ক্যারিয়ার দিতে এসে বলল, হই-হুজ্জুতে মনে পড়েনি সোমেন, সেই যে টাকাটা চেয়ে রেখেছিলে সেটা নাওনি এখনও। লাগবে নাকি?

বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে সোমেনের। অণিমার সেই শাড়ির দাম।

বলল, লাগবে বউদি। দেবে? নইলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

দেব না কেন? বহুদিন ধরেই খামে ভরে রেখে দিয়েছি। এক মিনিট দাঁড়াও এনে দিই।

তোমার কষ্ট হবে না তো বউদি?

বীণা একরকম অদ্ভুত ঠাট্টা আর বিষণ্ণতা মাখানো হাসি হেসে বলল, প্রেস্টিজটা তো এখন রাখি। আর কষ্ট? সে তো আছেই। দেড়শো টাকায় তার কিছু সুরাহা হবে না।

ননীবালা কথাবার্তা শুনে এগিয়ে এসেছিলেন, কী কথাবার্তা হচ্ছে রে সোমেন? ও বউমা, টাকার কথা কী বলছ?

ও কিছু নয়। বীণা বলল। এক ঝটকায় কোত্থেকে একটা পুরনো চিঠির খামে ভরা দশটাকার নোটের গোছা এনে সোমেনের প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিল।

অণিমা এখনও কলকাতায় আছে কি না সোমেন জানে না। কয়েক দিন গাব্বুকে পড়াতে যায়নি।

অজিত ক'দিন ছুটি নিয়ে আজকাল বাড়িতেই থাকে। একটা ইজিচেয়ার টেনে শীলার বিছানার পাশেই বসে থাকে। আঁতুড়-টাঁতুর বড় একটা মানে না। নিজের মা আর এক বুড়ি বিধবা খুড়িমা এসে আছে ক'দিনের জন্য, তাদের সামনেই লজ্জাহীনের মতো বসে থাকে বউয়ের কাছে।

আজও ছিল। জানালার ধারে একটা চেয়ারে লক্ষ্মণ বসে আছে।

শীলার বাচ্চাটা দিব্যি মোটাসোটা হয়েছে, ফরসা রং, নাক মুখ এখনও ফোলা-ফোলা, তাই আদল বোঝা যায় না। বাচ্চাটা কাঁদে না, কেবল ঘুমোয়; আর পাঁচ-সাত মিনিট অন্তর অন্তর কাঁথা ভেজায়।

শীলা কিছু কষ্টে নেই। হাসপাতাল থেকে ডাক্তাররা এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে চায়নি। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই অজিত প্রায় জোর করে নিয়ে এসেছে। বত্রিশ টাকা ভিজিটের গায়নোকোলজিস্ট প্রতিদিন এসে দেখে যাচ্ছে, হামেহাল পাশ-করা নার্স বহাল আছে। ফ্রিজ ভরতি ফলটল কিনে রেখেছে অজিত, রাশি রাশি ওষুধ, ভিটামিন, কৌটোভরতি গুঁড়ো প্রোটিন আর পুষ্টিকর সব ফুড আসছে রোজ। প্রতিদিন বিকেলের দিকে কিছু ঘরে-করা খাবার নিয়ে ননীবালা, বীণা বা রণেন দেখতে আসে।

সোমেন এ-সব লক্ষ করে ননীবালার কথা ভেবে মনে মনে রাগ করে। বড়দি কিছুমাত্র অযত্নে তো নেই-ই, উপরন্তু খুব বেশি যত্নে আছে, তবু ননীবালা খুঁত বের করবেনই।

সোমেন ঘরে ঢুকতেই শীলা তাকিয়ে হাসল, আয়।

সোমেন বলল, তোর জন্য মা খাবার পাঠিয়েছে, রান্নাঘরে দিয়ে এসেছি।

কত খাব রে? শীলা হেসে লক্ষ্মণের দিকে চেয়ে বলল, একে চেনেন? আমার ভাই।

চিনি, ছোট দেখে গেছি। সেদিনও আবার পরিচয় হল। বড় হয়ে গেছে। লক্ষ্মণ বলে।

লক্ষ্মণদার গলার স্বরটা অদ্ভুত সুন্দর লাগে সোমেনের। এত ভদ্র, আন্তরিক আর ভরাট গলা যে, শুনলেই মানুষটার দিকে আকর্ষণ জন্মায়। চেহারাটা খুব লম্বা চওড়া, কিন্তু কোথাও কোনও কর্কশতা নেই। মুখে সরল একটা হাসি। সেদিনও দেখেছে সোমেন, শীলার খবর পাওয়া মাত্র কেমন চটপট সব খবরাখবর নিল, ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলল, চেহারা এবং কথাবার্তায় সকলের সম্ভ্রম এবং মনোযোগ আকর্ষণ করার নিহিত একটা গুণ আছে লক্ষ্মণদার। শরীরে একবিন্দু আলস্য নেই, বরং খুব কেজো লোকের লঘু গতি আছে।

লক্ষ্মণ তাকে কাছে ডেকে বসাল। বলল, কী করছ?

সোমেন তার উত্তরে বলে, আমাকে আমেরিকা থেকে একটা জব ভাউচার পাঠাবেন লক্ষ্মণদা?

শুনে লক্ষ্মণ চমৎকার করে হেসে বলে, পালাতে চাও? বলে দু'হাতে মুখটা একটু ঘষে নিয়ে বলে, সবাই পালাতে চাইছে কেন বলো তো!

এখানে থেকে কী করব? কিছু হচ্ছে না।

লক্ষ্মণ ফের হাসে। বলে, ওখানে গিয়েই বা কী হবে? ক'দিন একটু ভাল খাওয়াপরা জুটবে। গুড লিভিং। তারপর দেশে ফিরে এলে বড্ড মুশকিল হয়। বড়লোকের দেশ থেকে এসে নিজের গরিব দেশকে আর ভাল লাগতে চায় না। সেটা ভাল নয়। ও এক ধরনের ব্যাঙ্করাপসি। তার চেয়ে নিজের দেশটাকে বড় করার চেষ্টাই ভাল।

সোমেন কথাটার উত্তর দেয় না।

লক্ষ্মণ তার কাঁধে হাত রেখে বলে, আমিও চলে আসছি।

কবে?

এবার গিয়েই চলে আসব।

সোমেন কিছু উৎসুক হয়ে বলল, অত বড় চাকরি ছেড়ে আসবেন?

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলে, আসব। আসতেই হবে।

বউদিকে নিয়ে আসবেন?

লক্ষ্মণ একটু থমকাল। ফের সেই অকপট হাসি হেসে বলল, না। সে আসবে না। ও ঠিক আমাকে বোঝে না, আমি ওকে বুঝি না। আমাদের বিয়েটা ভেঙে গেছে সোমেন।

॥ চৌষট্টি ॥

সোমেন যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল, অজিত মুখ তুলে বলল, শালাবাবু, ভাগ্নেটিকে কেমন দেখছ? তোমার মতো সুন্দর হবে?

সোমেন লজ্জা পেয়ে বলে, আমি আবার সুন্দর নাকি? ও আরও বেশি সুন্দর হবে।

অজিত খুব একটা তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, তা হলে বলছ বয়সকালে আমার ছেলের পিছনে বিস্তর মেয়ে লাইন দেবে?

শীলা ভ্রূ কুঁচকে বলে, অত আদেখলাপনা কোরো না তো! লোকে হাসবে।

অজিত উঠে নতুন কেনা একটা দামি নাইলনের মশারি খাটের স্ট্যান্ডে টাঙাতে শুরু করলে শীলা বলল, বাব্বাঃ, পারোও তুমি। এখন মশারি টাঙালে দমবন্ধ লাগবে না?

লাগুক। এখানে দিনের বেলাতেই মশা বেশি লাগে। আজ বেরিয়ে ওর জন্য একটা ক্ষুদে ফোল্ডিং মশারি কিনে আনব।

শীলা বাহ্যত রাগ কিন্তু অন্তর্লীন প্রশ্রয়ের গলায় বলে, আর কী কী কিনবে লিস্ট করে নিয়ে যেয়ো। ছেলে যেন আর কারও হয় না।

লক্ষ্মণ উঠে বলল, চলো সোমেন, আমিও যাই।

তুই যাবি? বোস না! অজিত বলে।

না রে, কাজ আছে। মোটে তো মাসখানেক সময়, কত লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বাকি আছে, বউঠান, আজ বিদায় হই। সময় পেলে কাল আসব।

আসবেন। শীলা পাশ ফিরে বলে, আপনার বিরহে আপনার বন্ধু এতকাল শুকিয়ে যাচ্ছিল।

লক্ষ্মণ ম্লান একটু হেসে বলে, আমরা খুব বন্ধু বউঠান। জীবনে একজন-দু'জনের বেশি বন্ধু কারওই বড় একটা জোটে না। আমরা সেই রকম বন্ধু। তবে দুঃখ করবেন না, এখন তো অজিতের ছেলে হল, এবার আর বন্ধুর জন্য তেমন উতলা হবে না। মানুষ যার মধ্যে নিজেকে পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে। এককালে অজিত আমার মধ্যে নিজেকে পেত, এবার ছেলের মধ্যে আরও বেশি সেটা পাবে। সন্তান মানে তো নিজেরই পুনর্জন্ম।

শীলা হেসে বলে, বাবাঃ, আপনার কথা ভীষণ শক্ত। বুঝতে পারি না।

লক্ষ্মণ বলে, অজিত বোঝে, না রে অজিত?

অজিত খাটের চারধারে ঘুরে ঘুরে খুব যত্নের সঙ্গে মশারি গুঁজছিল। মুখ না তুলেই বলল, সোমেন না-থাকলে তোকে এমন একটা গাল দিতাম না।

লক্ষ্মণ সভয়ে বলে, ওর মুখটা বড় খারাপ বউঠান, সামলে রাখবেন।

অজিত মশারির আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলে, তুমি শালা খুব সবজান্তা হয়েছ। ছেলে কি বন্ধুর জায়গা নিতে পারে? ছেলে এক রকম, বন্ধু অন্য রকম। কাল আসিস কিন্তু।

দেখি।

বলে লক্ষ্মণ বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সোমেন।

যে মানুষ বিদেশে থাকে তার দিকে বরাবরই আকর্ষণ সোমেনের। লক্ষ্মণের গায়ে সেই অদ্ভুত সুদূরের গন্ধ, যে রহস্যময় দূর বরাবর মানুষের রক্তে জীবাণুর মতো নিহিত থাকে। দূরত্বই রহস্য, দূরত্বই আকর্ষণ। যে মানুষ পৃথিবীর সব দূরত্ব অতিক্রম করেছে সেও আকাশের দিকে তাকালে বুঝি ফের দূরত্বের রহস্য টের পায়। আমেরিকা, ইয়োরোপ, এই শব্দগুলো শুনলেই সোমেনের বুকে অদৃশ্য ঢেউয়ের ধাক্কা এসে লাগে, তীরভূমি ভেসে যায়।

লক্ষ্মণ একটা ট্যাক্সি নিল। বলল, চলো, তোমাকে একটা লিফট দিই। কোথায় যাবে?

আমি যাব বালিগঞ্জ সারকুলার রোড। আপনি আমাকে কালীঘাটে নামিয়ে দেবেন। ওখান থেকে চলে যাব। ট্যাক্সিতে উঠে বসে সোমেন খুব লজ্জার সঙ্গে বলল, আমরা ভেবেছিলাম আপনি আর ফিরবেন না লক্ষ্মণদা, ওখানেই থেকে যাবেন।

লক্ষ্মণ অবাক হয়ে বলে, কেন? ফিরব না কেন?

সোমেন বলে, শুনলাম ওখানে বিয়ে করেছেন, বাড়ি করেছেন। আপনার এখানকার জমিটাও তো বিক্রি করে দিলেন।

লক্ষ্মণ মাথা নেড়ে বলল, না। ফিরতাম। আমি খুব বেশিমাত্রায় ভারতীয়। কখনও পুরোপুরি বিদেশি হতে পারলাম না। অবশ্য হতে পারলেই সুখী হওয়া যেত। প্রথম গিয়ে আমি তো ঠিকই করেছিলাম হয় কানাডা কিংবা স্টেটসে সেটল করব। হুইমসিক্যালি বিয়েও করে ফেললাম। কিন্তু তারপরই কতকগুলো ভুল ধরা পড়তে লাগল। প্রগ্রেসিভ দেশগুলোতে মেয়েরা বড্ড বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। বলে লক্ষ্মণ হঠাৎ পাশে মুখ ঘুরিয়ে সোমেনের দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা সোমেন, বলো তো স্বাধীনতার সন্ধিবিচ্ছেদ কী হবে!

সোমেন হেসে ফেলে, বলে, স্ব প্লাস অধীন।

হল না। লক্ষ্মণ মাথা নাড়ে। নিজের অধীন হওয়া মানে যথেচ্ছাচারের অধীন হওয়া। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হল সু-এর অধীন। স্বাধীনতা তাই শুভ বা মঙ্গলের অধীনতা। সে যাকগে। যেখানে মেয়েরা স্বাধীন, তারা সমাজে পুরুষের সমান সব অধিকার ভোগ করে, পুরুষের সঙ্গী হয়, বন্ধু হয়, পার্টনার হয়। তাদের ভাবপ্রবণতা খুব কম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান-অভিমান জিনিসটা প্রায়ই দেখা যায় না। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে বাবা কিংবা কাকিমার সঙ্গে ঝগড়া করে কাকা ভাতের ওপর রাগ করেছে, খায়নি। আর মা কাকিমা কত সাধ্যসাধনা করে খাইয়েছে, ওদেশে এটা ভাবাই যায় না। অভিমান করে থাকলে লোকে অবাক হয়, রাগ ভাঙানোর সময় কারও নেই। বিয়ে করলেই বউ আপন হয়ে গেল, এই আমরা জানি। আমার তা হয়নি। সোমেন, তুমি তো ষোলো বছর বয়স পার হয়ে এসেছ, তোমাকে বলতে আপত্তি কী যে ও দেশে সবাই বড্ড বেশি অ্যাডাল্ট। আদর ভালবাসার ক্ষেত্রেও কেউ খুব ছেলেমানুষ বা ইললজিকাল হয়ে যায় না। আমার স্ত্রী চাকরি করত, ক্লাবে যেত, তার আলাদা পুরুষ আর মেয়ে বন্ধু ছিল, আলাদা একটা জীবনও ছিল যেখানে আমি ঢুকতে পারতাম না। অর্থাৎ স্বামীর অধিকারও সীমাবদ্ধ ছিল। হয়তো এ-রকমই হওয়া উচিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। কিন্তু আমি তো ওদের মতো করে ছোট থেকে বড় হইনি, তাই আমার পদে পদে নিজের ভুল চোখে পড়ত। আমার দাবি-দাওয়া ছিল বেশি। আর-একটা কথা, আমাদের দেশে যেমন সাধারণত বিয়ের পরই ছেলেমেয়েদের প্রথম সেক্সের অভিজ্ঞতা হয় ওখানে তো তা নয়। অল্পবিস্তর যৌন অভিজ্ঞতা ওখানে প্রায় সকলেরই বয়ঃসন্ধিতে ঘটে যায়। অন্তত যৌনতার কারণে বিয়ে সেখানে আবশ্যিক নয়। বিয়ে হচ্ছে কমপ্যানিয়নশিপ, সঙ্গ, বন্ধুত্ব—যা বলো। সবই আবার পারস্পরিক সম্মান ও অধিকার বজায় রেখে। সে ভারী জ্বালা হয়েছিল আমার। তাকে ভালও বাসতাম খুব, সেও বাসত, কিন্তু পরস্পরের গভীরে যাওয়ার কোথায় যেন বাধা

হচ্ছিল। উই হ্যাড রিলেশন, বাট উই ওয়্যার নট রিলেটিভস। তুমি ঠিক বুঝবে না। সোজা কথা, আমার ভিতরকার একটা ভারতীয় মনোভাবই সব ভণ্ডুল করছিল। আর সেই মনোভাবটাই আমাকে ওখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে দেয় না। কেবলই বলে, মন, চলো নিজ নিকেতনে।

রাস্তাটুকু ফুরিয়ে গেল চট করে। লক্ষ্মণ গলিতে ঢুকবে, তার আগে সোমেনকে বড় রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে বলল, অনেক কথা বলে ফেললাম, এ-সব মনে রেখো না।

সোমেন হেসে বলল, সে যা-ই বলুন, আমার কিন্তু আপনার মতো হবে না। আমি আমেরিকায় গেলে ঠিক ওদের মতো হয়ে যাব।

বটে! বলে লক্ষ্মণ হাসে খুব।

সোমেন বলে, আমাকে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করুন, জব ভাউচার দিন, দেখবেন আমি কীরকম ওই লাইফ অ্যাডপ্ট করে নিই।

তা হলে তো তোমাকে কিছুতেই যেতে দেওয়া যায় না। লক্ষ্মণ ট্যাক্সির দরজাটা বন্ধ করবার আগে বলল, খুব যদি যেতে ইচ্ছে করে তা হলে একটু সিরিয়াসলি ভেবে আমাকে বোলো, চেষ্টা করব।

এই বলে লক্ষ্মণ দরজা বন্ধ করে দিল। ট্যাক্সি মোড় নিল। সোমেন রাস্তাটা পার হতে হতে বুকের মধ্যে বহু দূর ছুঁয়ে আসা সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে টের পেল। তার চেতনার বেলাভূমি ভেসে যাচ্ছে। যাওয়া হবে কি? বড় বেশি অল্পের মধ্যে আটকে আছে সোমেন। জীবনটা বড় ছোটর মধ্যে ছবির ফ্রেমে আটকানো। ফ্রেমটা ভাঙা দরকার। লক্ষ্মণদার মনে থাকবে তো?

আজকাল বর্ষার মেঘ কেটে গেলেই কেমন আচমকা চারধারে একটা শরৎকালের আভা এসে পড়ে। চার দিকে একটা পুজোর আয়োজন। এ সময়ে গ্রাম-গঞ্জে নদীর ধারে কাশফুল আসছে, শিউলি ফুটি-ফুটি করছে। কলকাতাতেও বাতাস বৃষ্টির পর পরিষ্কার। আকাশের ময়লা ধুয়ে গভীর নীল দেখা যায়। মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে যায়।

বাস থেকে নেমে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সোমেন সিগারেট ধরাল। আর তক্ষুনি মনে পড়ল, মা বলেছিল খাবার দিয়ে বড়দির বাসা থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটা ফেরত আনতে। বাসায় একটা বই দুটো টিফিন ক্যারিয়ার নেই। কাল ফের খাবার দেওয়ার দরকার হলে কে তখন টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে যেতে আসবে? মা খুব রাগ করবে হয়তো।

কিন্তু এই চব্বিশ পূর্ণ পঁচিশে-পা জীবনে বেশিক্ষণ টিফিন ক্যারিয়ারের চিন্তা মাথায় থাকতে চায় না। কত আনন্দে শিউরে ওঠার মতো আচমকা চিন্তা মাথা ভাসিয়ে দিয়ে যায়। অনিল রায়ের বাড়িতে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় দেখা হাজার হাজার সুন্দর দৃশ্যের ছবি চোখের সামনে বৃষ্টিপাতের মতো ঝরে পড়ছে! চার দিকে শরৎকালের মতো আলো। একটা রহস্যময় সিনেমার টিকিট। সব মিলিয়ে বড় অদ্ভুত আজকের দিনটা। এক-একটা দিন আসে এ-রকম। খুব ভাল দিন।

মেট্রোতে আজ কার সঙ্গে দেখা হবে?

অন্যমনস্ক সোমেন পিছনে একটা মোটরের হর্ন শুনে ফুটপাথে উঠে এল। গাড়িটাও তার পাশাপাশি ধীরে ধীরে হাঁটছে। সোমেন ভেবেছিল, গাড়িটা থামবে বুঝি। থামল না, চলছিল।

সোমেন সংবিৎ পেয়ে তাকিয়ে দেখল, গাড়ির জানালায় অণিমা তার দিকে তাকিয়ে খুব হাসছে।

কার কথা ভাবছ সোমেন? উঠে এসো।

গাড়িতে একা অণিমাই, সামনে শুধু ড্রাইভার।

ওঃ, তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। বলে সোমেন উঠে বসল অণিমার পাশে।

রাজ্যের মার্কেটিং করেছে অণিমা, স্তূপাকার সব জিনিস পড়ে আছে সিটে, সিটের পিছনের উঁচু থাকটায়, সামনের সিটেও।

বাব্বাঃ, কতক্ষণ ধরে হর্ন দিচ্ছি, শুনতেই পাচ্ছিলে না? কার কথা ভাবছিলে সোমেন?

তোমার কথা।

বাজে বোকো না, কোনও দিন ভাবোনি।

সত্যি বলছি। তোমাকে ছুঁয়ে—

বলেই চমকে গেল সোমেন।

অণিমা অমনি তার একখানা অপরূপ রঙিন, সুন্দর ডৌলের হাত বাড়িয়ে বলল, ছোঁও। ছুঁলে কিছু হয় না। জাত যায় না।

দূর! আমি ও-সব ভাবিনি। আমার মনে হল, তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে লাভ কী? তুমি আমার কে?

অণিমা মুখ টিপে হেসে বলে, এ জন্মে তুমি আমার কেহ নও অমরনাথ, কিন্তু যদি পরজন্ম থাকে—

সোমেন মুখ তুলে অণিমার চোখে চোখ রেখে বলল, কিন্তু যদি পরজন্ম না থাকে অণিমা? এ জন্মেই যদি শোধবোধ হয়ে যায়?

বোলো না সোমেন, বোলো না।

সোমেন ভ্রূ কুঁচকে বলে, বলা হল না অণিমা। এখনও চাঁদটাঁদ ওঠে, ফুলটুল ফোটে, লোডশেডিংও হয় মাঝে মাঝে...

অণিমা হাসল।

সোমেন হঠাৎ বলল, আমি আমেরিকা চলে যাচ্ছি অণিমা।

ওমা! কেন?

দুঃখে, এদেশে কেউ পাত্তাই দিল না। নিজের ভ্যালুয়েশনটাই বুঝতে পারলাম না।

অণিমা চোখ বড় বড় করে বলে, কেউ দেয়নি?

সোমেন হেসে ফেলে, বলে, তুমি একটু দিয়েছিলে, তারপর সুট করে কেটে পড়েছ, সেটাই তো দুঃখ।

ইয়ারকি হচ্ছে?

সোমেন প্যান্টের পকেট থেকে খামটা বের করে হাতে রেখে বলে, অণিমা, বাড়িতে ক'দিন ধরে একটা ক্রাইসিস চলছিল বলে আসতে পারিনি, ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি চলে গেছ।

অণিমা পা নাচিয়ে পা-তোড়ার একটা ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তুলে বলল, বিয়ের প্রথম বছরে শ্বশুরবাড়িতে শ্রাবণের জল মাড়াতে নেই। তাই শ্রাবণ মাসটা কাটিয়ে যাচ্ছি।

সোমেন অবাক হয়ে বলে, এটা কি শ্রাবণ মাস অণিমা, আশ্বিন নয়?

অণিমা সেই ইউনিভার্সিটির সময়কার মতো হেসে বলে, তুমি আমেরিকা যাওয়ার আগেই আমেরিকান হয়ে গেছ। বাংলা মাস জানে না! আজ পয়লা ভাদ্র, আমি কাল চলে যাচ্ছি।

সোমেন বলল, খুব লাকি অণিমা। তুমি চলে গেলে একটা ঋণ শোধ হতে আবার দেরি হত।

কীসের ঋণ?

সে তুমি বুঝবে না। বলে খামটা অণিমার কোলে ফেলে দিয়ে বলল, এটা আমার আড়ালে খুলো, আর আমাকে এখানে নামিয়ে দাও।

অণিমা খামটা খুলল না, কেবল হাতে ছুঁয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আমি জানি সোমেন এতে কী আছে!

সোমেন একটু লাল হল। এখন তার হঠাৎ খুব লজ্জা করছিল। বলল, গাড়িটা থামাতে বলো।

ঋণটা না হয় থাকত সোমেন, সব ঋণ শোধ করে ফেললে আমেরিকা গিয়ে তুমি সব ভুলে যাবে।

ভুলব না অণিমা। সোমেনের গলাটা ধরে বসে গেল। কতকটা ফিসফিসানির মতো করে বলল,

টাকা-পয়সার প্রসঙ্গটা বড্ড বাজে, তবু বলি, ওই ঋণটা আমাকে বড় জ্বালাতন করত। কিছু মনে কোরো না।

অণিমা একটা গভীর শ্বাস ফেলে বলল, তুমি ভীষণ বাজে হয়ে গেছ। এমন জানলে কক্ষনও ভাবই করতাম না তোমার সঙ্গে।

বলে অণিমা চোখে চোখ রেখে ম্লান হাসল। সোমেনের হাসতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু হাসল। বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

কেন?

খুব বেশি প্রশ্ন করোনি বলে। ঋণ শোধ করতে দিয়েছ বলে। আর, সারাজীবন ধরে ভাববার জন্য আমাকে একটা অদ্ভুত আচমকা জিনিস দিয়েছিলে বলে!

অণিমার বাড়ির দরজার কাছে নেমে চলে এল সোমেন। মনটা বড় খারাপ লাগছে।

॥ পঁয়ষট্টি ॥

অনেক দিন এমন এক সুন্দর দিন আসেনি। বাদল-মেঘ ছিঁড়ে মাঝে মাঝে শরৎকালের মতো আকাশ দেখা যাচ্ছে। শরৎকালই তো! ভাদ্র পড়ে গেল। বরাবরই শরৎকাল সোমেনের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু। শরতের আবহাওয়া তো আছেই, তা ছাড়া বহুদিনকার লজ্জাকর ধারটা শোধ দেওয়া গেল। ফের অবশ্য ধার হয়েছে বউদির কাছে। তো সোমেনের জীবনটা বোধহয় এইভাবেই যাবে। একজনের কাছে ধার নিয়ে অন্যজনকে শোধ করবে। তবু দিনটা আজ ভালই। যদি লক্ষ্মণদা চেষ্টা করে, যদি হয়ে যায় আমেরিকায় একটা চাকরি!

দাড়িটা কামানো দরকার। আজ সেই ভুতুড়ে সিনেমার টিকিটের দিন। মনে পড়লেই বুকটা লাফিয়ে ওঠে রহস্যের গন্ধে।

পাড়ার সেলুনে আজ বড্ড ভিড়। চেনা নাপিত ফুলেশ্বর দুঃখ করে বলল, সারা সকাল দোকান খালি গেল বাবু, তখন তো এলেন না! এখন ভরদুপুরে যত ভিড়। বাবুদের সব সময় হয়েছে।

অগত্যা বাসায় ফিরে দাদার রেজারে কামিয়ে নেবে বলে রণেনের ঘরে ঢুকেছিল সোমেন। দাদা একটা ঝকঝকে নতুন জিলেট-এর ওয়ান পিস সেট কিনেছে। পুরনো সেটটা দিয়েছিল সোমেনকে। কিন্তু সেটার প্যাঁচফ্যাঁচ কেটে গেছে। পড়ে ছিল, বুবাই টুকাই খেলতে নিয়ে কোথায় ফেলেছে কে জানে! নতুন সেটটায় কামিয়ে আরাম, দারুণ সব উইলকিনসন ব্লেডও আছে দাদার।

রণেন বিছানার একপাশে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। খালি গা, পরনে দারুণ একটা বাটিকের কাজ-করা ছেলেমানুষি লুঙ্গি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা এঁটে বই পড়ছে। আজকাল রণেন একদম কথা বলে না। সে যে বাড়িতে আছে তা টের পাওয়াই ভার। বরাবরই সে শান্ত ছিল, কিন্তু এখনকার নীরবতা প্রায় নিশ্ছিদ্র।

সোমেনের খেয়াল হল, গত প্রায় দিন দশেক সে দাদার সঙ্গে কোনও কথা বলেনি। আজ বলল। দাদা, তোমার শেভিং সেটটা নেব?

রণেন এক বার তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

এধাব-ওধার কোথাও খুঁজে পাচ্ছিল না সোমেন। ড্রেসিং টেবিলের টানায় সাধারণত থাকে।

হাতের মোটা বইটা খুব জোর শব্দ করে বন্ধ করে দিল রণেন। বিরক্ত হয়ে বলল, কী খুঁজছিস? জমির দলিল? সে তো মা'র কাছে।

জমির দলিল! একটু অবাক হয়ে সোমেন বলে, না তো। বললাম যে শেভিং সেটটা!

ও! বলে রণেন উদাস হয়ে বলল, আমার কাছে নেই। তোর বউদিকে জিজ্ঞেস করিস।

না হলেও চলবে। বলে এক বার গালে হাত বোলায় সোমেন, বলে, না হয় বেরোনোর সময়ে সেলুনে কামিয়ে নেব।

তুই কী করিস আজকাল? রণেন যেন খানিকটা জবাবদিহি চাইবার মতো করে বলে, শুধু ঘুরে বেড়াস?

সোমেন দাদার দিকে তাকিয়ে থাকে। দুপুরে রোদে ঘোরা শরীরটা তেতে আছে। মাথাও গরম। একটু চুপ করে থেকে বলল, কিছুই করি না। কী করব বলো?

খুব বিরক্তির সঙ্গে রণেন বলে, এতগুলো ইন্টারভিউ আর রিটন টেস্ট দিলি, কিছু হয় না কেন? সকলের হয়, তোর হয় না?

সকলের হয় না, কারও কারও হয়। এ সত্য রণেনও জানে। তবু তার মুখে এ-কথা শুনে বিস্মিত সোমেন বলে, না হলে কী করব?

কিছু তো করতেই হবে। বসে থাকা কি ভাল? নানা রকম বদ দোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তোকে যে আই এ এস দিতে বলেছিলাম।

বদ দোষ কথাটা কানে খট করে লাগল। তবু মাথাটা স্থির রেখে সোমেন বলে, সে-সব আমার দ্বারা হবে না। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা কি সকলের দ্বারা হয়? তা ছাড়া বয়সও বোধহয় নেই।

রণেন চশমাটা খুলে তার দিকে গম্ভীর চোখে চেয়ে বলে, তোর বয়স কত হল যেন?

পঁচিশ-টচিশ হবে। ভাসা ভাসা উত্তর দেয় সোমেন। সঠিক উত্তর দিলে যদি আই এ এস পরীক্ষাটা আবার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় দাদা!

পঁচিশ! বলে রণেন ভাবনায় পড়ে—তোরও পঁচিশ হয়ে গেল? অনেক বয়স হল তো তোর। সেদিনও ছোট্ট ছিলি। আমার তা হলে কত হল? মাকে এক বার জিজ্ঞেস করে আয় তো।

জিজ্ঞেস করার দরকার কী? তুমি আমার চেয়ে কত বছরের বড় সেটা হিসেব করলেই তো হয়।

তোর কি সার্টিফিকেটে বয়স বাড়ানো আছে?

না তো! বরঞ্চ কিছু কমানো আছে বোধহয়।

রণেন অবাক হয়ে বলে, তাই বা হয় কী করে! সার্টিফিকেটেও তো বয়স বেশি বা কম থাকবার কথা নয়। বাবা নিজে ইস্কুলে ভরতি করে দিয়ে এসেছিলেন। বাবা তো আর বয়স ভাঁড়ানোর লোক নয়। তোর সার্টিফিকেটটা একটু দেখিস তো, ওইটেতেই ঠিক বয়স আছে। আচ্ছা দাঁড়া—

বলে রণেন উঠে খাটের তলা থেকে একটা পুরনো কবজাভাঙা তোরঙ্গ টেনে আনল। তার ভিতরে গুচ্ছের পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে কয়েকটা পাকানো কোষ্ঠীপত্র বের করে আনল। খুলে খুলে দেখতে লাগল।

মাথা নেড়ে বলল, তোরটা নেই। আমারটাও দেখছি না। মাকে একটু জিজ্ঞেস করিস তো কোথাও রেখেছে কি না।

করব।

এত বয়স হওয়ার কথা তো তোর নয়। পঁচিশ। বলিস কী? তা হলে আমি কি চল্লিশ পার হলাম নাকি? তোরঙ্গটা খাটের তলায় ঠেলে দিয়ে রণেন খাটে উঠে বসে বলল, এখানে বোস।

সোমেন বসে। কিন্তু রণেন কিছু বলে না। কেবল অন্যমনস্কভাবে কী ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণমুখে আঙুল মটকাতে থাকে।

এ সময়ে স্নান করে বউদি ঘরে আসে। শায়া-ব্লাউজের ওপর শাড়িটা ভাল করে পরা হয়নি, স্তূপ করে ধরে রেখেছে। চুলে গামছা জড়ানো। সেটা খুলতে খুলতে বলল, যাও তো, বাথরুম খালি আছে এখন, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসো। আমি ঠাকুরকে ফুলজল দিই।

রণেন সে-কথায় কান না দিয়ে খুব অসহায়ভাবে বীণাকে বলে, সোমেন বলছে ওর বয়স নাকি পঁচিশ!

বীণা একটা ভ্রূ ভঙ্গি করে বলে, পঁচিশ! যাঃ। বলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে কোল্ড ক্রিম মাখতে মাখতে বলে, বাইশ-তেইশ হবে বড়জোর।

সোমেন বলল, বাঃ রে, তুমিই তো সেদিন হিসেব করে বললে আমার চব্বিশ পূর্ণ হয়ে পঁচিশ—

আয়নার ভিতর দিয়ে বীণা তাকে চোখ টিপে একটা ইশারা করল।

রণেন খুব টালুমালু চোখে এদিক-ওদিক চাইছিল। বলল, পঁচিশ হলে আমারও তো অনেক হয়ে গেল। ওর চেয়ে আমি বয়সে—

বীণা ধমক দিয়ে বলল, স্নান করতে যাবে না কি! তোমার আদুরে মেয়ে বাথরুমে ঢুকলে কিন্তু একটি ঘণ্টা। সে আজকাল খুব সাজুনি হয়েছে। যাও।

যাচ্ছি। রণেন বলে, তুই যেন কী খুঁজছিলি সোমেন?

তোমার রেজারটা।

আমার রেজারটা ওকে দাও তো। বলে কী যেন বিড়বিড় করতে করতে রণেন উঠে যায়।

বউদি ড্রেসিং টেবিলের আয়নার পিছন দিক থেকে শেভিং সেটটা বের করে দিয়ে বলে, ওর সামনে বয়স-টয়সের কথা কখনও তুলো না। বয়স হওয়াকে ও ভীষণ ভয় পায়। কেবল মৃত্যুচিন্তা করে তো, তাই বয়সকে ভয়।

সোমেন আলটপকা কিছু না-ভেবেই বলে ফেলল, দাদাকে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও না। বাবা মন্ত্র-টন্ত্র দিলে ভাল হয়ে যেতে পারে।

বীণা এক বার মুখটা ফেরাল। ভ্রূ কুঁচকে একটু তাকে দেখে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, সোমেন, শ্বশুরমশাই তাঁর গুরুর মন্ত্র বিলিয়ে বেড়ান। অনেকে তাঁকে বিশ্বাসও করে। এ-সব আমি জানি। কিন্তু তুমি কি তাঁর মন্ত্রে বিশ্বাস করো? কিংবা তাঁর আদর্শে? ঠিক করে বলো তো!

সোমেন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, ঠিক ভেবে দেখিনি। তবে থাকতেও পারে কিছু।

আয়নাতেও বীণার কোঁচকানো ভ্রূ দেখা যাচ্ছিল, বলল, তা হলে ও-রকম বললে কেন? আজকাল সবাই না ভেবে না চিন্তে বড্ড আলটপকা কথা বলে। বলে হোমিওপ্যাথি করাও, কেউ বলে জ্যোতিষের কাছে যাও, কিংবা দীক্ষা দাও। আমি জানতে চাই, কোনটা ঠিক রাস্তা! কোন চিকিৎসাটা ঠিক চিকিৎসা। যে যা বলছে করছি, কিছু তো হল না। এখন ঘরের মানুষ তুমিও ও-রকম সব উপদেশ দেবে নাকি?

সোমেন বড় অপ্রতিভ হয়ে বলে, দাদার অসুখটা তো আমি জানি না বউদি।

বীণা খুব ব্যথাতুর মুখে বলে, জানো না কেন? এক ছাদের তলায় থাকো, এক রক্তের সম্পর্ক, তবু কেন জানো না? তোমরা যদি একটু জানবার চেষ্টা করতে তা হলে আমাকে এত ভেবে মরতে হত না। একা আমিই ভাবছি, ছোটাছুটি করছি, আর সবাই বাইরে থেকে কেবল 'এটা করো সেটা করো' বলে। আমার মাথার ঠিক থাকে না। শ্বশুরমশাইয়ের কাছে মন্ত্র নিলেই যদি ভাল হত তো উনি সেটা দিয়ে দিলেই পারতেন। আমার অনুমতির দরকার ছিল না। তোমরা যদি ওর এত পর হয়ে যাও তো কী করে হবে?

সোমেন কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে উঠে এল।

ঝকঝকে শেভারটা নিয়ে যখন নিজের ঘরে দাড়ি কামাতে বসেছে, তখন কী জানি কেন তার দু'চোখ ভরে জল এল। উঁচু-নিচু, অসমান হয়ে গেল তার প্রতিবিম্ব। আবছায়ায় কাঁপতে লাগল। ভাবল, দাড়িটা কামাবে না আজ। থাক। সিনেমায় যাবে না।

এক গালে সাবান লাগানো হয়ে গিয়েছিল। সেটা গামছায় মুছে ফেলল সোমেন। শেভারটা দাদার ঘরে রেখে এল। সিগারেট খেতে লাগল শুয়ে শুয়ে। আর ঠ্যাং নাচাল। বাস্তবিক সে না ভেবেচিন্তে বলেছে ও-কথাটা। সত্যিই তো দাদার অসুখের জন্য তার তেমন মাথাব্যথা নেই। সে কেমন দিব্যি আছে, খাচ্ছেদাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন দাদার সব দায় বউদিরই। আর কারও নয়।

মাঝে মাঝে দাদার কথা মনে করে কষ্ট হয় বটে। কিন্তু যৌবনের নানা দিকের ডাক এসে সব ভুলিয়ে দেয়। এবার এখন থেকে সে দাদার কথা একটু বেশি ভাববে।

খাওয়ার পর দুপুরে শুতে গিয়ে সোমেন মা'র সঙ্গে ঝগড়া করল। বলল, বউদি ঠিকই বলে। আমরা কেউ দাদার জন্য কিছু করছি না। দাদার জন্য আমাদের একটুও সিমপ্যাথি নেই। একা বউদি কত দিক সামলাবে?

শুনে ননীবালা অবাক। বলেন, বলিস কী! কে ভাবছে না? দিনরাত ঠাকুরের কাছে মাথা কুটছি। এই সেদিন গোবিন্দপুর নিয়ে গেলাম। ফকিরবাবার ওধুধ খাইয়ে আনলাম। তোর বাবা কোষ্ঠী বিচার করল ভাল করে। ওর এ সময়টা ভাল নয়, বলে দিল। ভাবছি না বললেই হল!

সোমেন খুশি হল না। বলল, আমি তো শুনি কেবল বাড়ি-বাড়ি আর টাকা-টাকা করছ দিনরাত। দাদার কথা ভাবলে কখন?

ননীবালা বলেন, তা বাড়ি বা টাকাই কি ফ্যালনা নাকি! সংসারে থাকতে গেলে নিজের একটা কুঁড়েঘর হলেও লাগে। সে হল সংসারের স্থিতু। লক্ষ্মীর থান। আর টাকার জোরেই মানুষ চলে, বড় হয়।

তত্ত্বকথা রাখো তো মা। সংসারের সবকিছুই মানুষের জন্য। মানুষটাই যদি কষ্ট পায় তো ও-সব দিয়ে কী হবে!

তো কষ্ট পাওয়ার থাকলে আমাদের কী করার আছে। ডাক্তার ফকির সবাই ওষুধ দিচ্ছে। আমরা ভগবানের ভরসা করতে পারি।

ছাই ভগবান। বলে উঠে পড়ল সোমেন। প্রায় আড়াইটা বাজে। ঘরে থাকলে আরও মাথা গরম হবে। পোশাক পরতে পরতে বলল, আমার আর এ-সব ভাল লাগে না। সংসারের কথা শুনলেই মাথা গরম হয়ে যায়।

ননীবালা একটু নরম হয়ে বলেন, তো করবি কী? সংসারে থাকতে গেলেই একটু ভালমন্দ শুনতে হয়।

আমার শুনতে বয়ে গেছে। আমি পালাচ্ছি শিগগিরই। আমেরিকায় গিয়ে আর খোঁজও নেব না, দেখো।

ননীবালার হতবাক ভাবটা তখনও যায়নি, সোমেন আর ভেঙে কিছু বলল না। বেরিয়ে গেল।

সিনেমায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু রাস্তায় বেরোনোর পর গরম মাথাটা টপ করে ঠান্ডা হয়ে গেল। আর তখন ভূতগ্রস্তের মতো তাকে সিনেমার টিকিটটা টানতে লাগল।

মেট্রোর তলায় যখন পৌঁছল সোমেন তখন তিনটে বাজতে মিনিট পাঁচেকও নেই। লবিতে বহু লোক দাঁড়িয়ে। একটাও চেনামুখ দেখা গেল না। তবু যে টিকিট পাঠিয়েছে তার জন্য একটু দাঁড়ায় সোমেন। হয়তো এখনও আসেনি। নিউজরিলের পরে ঢুকলেও ক্ষতি নেই।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও যখন কেউ এল না তখন হলে ঢুকল সোমেন। অন্ধকারে টর্চ বাতি এসে পড়ল তার গায়ে। অচেনা হাত এসে টিকিট নিল। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল রো-এর কাছে। প্রথম সিটটাই তার। পরদার প্রতিফলিত আলোয় সে পাশে-বসা মেয়েটাকে দেখবার চেষ্টা করল। বাইরের আলো থেকে অন্ধকারে এসে চোখ ধাঁধিয়ে আছে। ঠিক দেখতে পেল না।

বসবার পর হঠাৎ নরম, আলতো একটা হাত এসে তার হাতের ওপর চাপ দিল। মেয়েলি হাত।

নরম হাতটা তার হাত ওইভাবে স্পর্শ করেই সরে গেল। সোমেন একটু অবাক হয়ে তাকায় পাশের মহিলার দিকে। আর তখনই পাশাপাশি সিটে বসা পাঁচ-ছ'জনের মধ্যে একটা চাপা হাসি খেলে যায়।

ও-পাশের কে একজন বলে, আহা বেচারা! কত কী ভেবে এসেছিল!

আবছায়ায় পাশে-বসা অপালাকে তখন চিনতে পারে সোমেন। ভীষণ সেজেছে তাই চিনতে পারছিল না এতক্ষণ। তার ওপাশে পূর্বা, অণিমা, একটা অচেনা মেয়ে, তারপর অনিল রায়। তার ও-পাশে শ্যামল আর মিহির বোস।

জানতাম তোরাই। সোমেন নিস্পৃহ গলায় বলে।

আহা জানতিস! বলে অপালা একটা চিমটি দিল সোমেনের উরুতে। পূর্বার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ও নাকি জানত! শুনলি!

গাঁট্টা মার না। বলে পূর্বা।

অণিমা কিছু বলল না। এক বার কেবল আবছায়ায় মুখ ফিরিয়ে দেখল। অণিমার পাশেই অচেনা মেয়েটি। সেইখানেই একটু রহস্য থেকে গেল। কে মেয়েটা?

সিনেমাটা ভালই। দেখতে দেখতে সোমেন রহস্য ভুলে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কেবল অপালার চিমটি টের পাচ্ছিল। এক বার চাপা গলায় বলল, বড্ড জ্বালাচ্ছিস তো। যা ও-পাশে গিয়ে পূর্বাকে আমার পাশে দে।

ইল্লি। তোমাকে প্ল্যান করেই এখানে বসানো হয়েছে বাবু। আমার পাশেই থাকতে হবে।

সোমেন চাপা গলায় বলে, ভাগ্যিস চিরকাল পাশে থাকতে হবে না।

হবে না কে বলল? হতেও তো পারে!

মিহির বোস তা হলে আমাকে আস্ত রাখবে?

পূর্বা খুক করে হেসে ফেলল। আশপাশের লোকেরা বিরক্ত হচ্ছে। অনিল রায় ও-পাশ থেকে এক বার বললেন, চুপ।

মেয়েটা কে রে? সোমেন খানিক বাদে জিজ্ঞেস করে।

হবে কেউ। তোর দরকার কী তাতে?

কৌতূহল।

ইঃ। যদি একদিন পার্ক স্ট্রিটে খাওয়াস তা হলে বলব।

খাওয়াব।

বলে যদি না খাওয়াস?

ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। সোমেন বলে।

অপালা একটা শ্বাস ফেলে বলল, বটে! এত কৌতূহল? হ্যাংলাও বটে তুই! আমরা এতগুলো মেয়ে পাশে থাকতেও ওই একজনের কথা জানতেই হবে!

তোরা মেয়ে নাকি? শাড়িপরা পুরুষ।

মারব। বলে অপালা ফের চিমটি দেয়।

সোমেন 'উঃ' করে ওঠে।

ছবির পরদায় তখন এক সাহেব এক মেমসাহেবকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। হলসুদ্ধ লোক শ্বাস বন্ধ করে আছে। চুমুর পর মেমসাহেব হঠাৎ রেগে গিয়ে সাহেবের গালে একটা চড় মারল।

ওইরকম একটা থাপ্পড় তোর গালে দিতে পারলে—অপালা বলে।

থাপ্পড়ের আগেরটা কী হবে?

কী বলছে রে? পূর্বা মুখ এগিয়ে জিজ্ঞেস করে।
ওই একটু আগে যা হল তাই চাইছে। অপালা বলে।
থাপ্পড় দে না।
দেব, ছবিটা শেষ হোক।
ছবিটা টপ করেই শেষ হয়ে গেল। বাইরের লবিতে বেরিয়ে এসে অনিল রায় পাইপ ধরালেন। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে অ্যালকোহলের গন্ধ পাওয়া গেল। বললেন, ওঃ সোমেন, তোমার কাছে একটা ক্ষমাপ্রার্থনা বাকি আছে।
কেন স্যার?
একদিন তুমি আমার বাড়ি গিয়েছিলে। আমি তোমার সঙ্গে রিয়্যাল খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আই ওয়াজ ড্রাঙ্ক।
ও কিছু না স্যার। আমি ভুলেও গেছি।
না, না। আমি সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। ইদানীং মাত্রাটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছিল। একা-একা বড্ড ফাঁকা লাগত তো! আমার আবার খানিকটা ভূতেরও ভয়ও আছে।
বলেন কী? বলে সোমেন অবাক।
সত্যি স্যার? বলে চেঁচিয়ে ওঠে পূর্বা। অপালাও চেঁচায়।
আস্তে। অনিল রায় বলেন, সবাই শুনতে পাবে। আমার ভূতের ভয়ের ব্যাপারটার বেশি পাবলিসিটি দিয়ো না। চলো রেস্টুরেন্টে বসে বলছি।
দঙ্গলটা পার্ক স্ট্রিটের দিকেই এগোয়। আগে আগে শ্যামল আর মিহির বোস। বোধহয় আগামী নাটকের ব্যাপার নিয়ে ওরা খুব উদ্বিগ্ন আর মগ্ন হয়ে কথা বলতে বলতে দলছুট হয়ে হাঁটছে। একটু পিছনে অনিল রায়ের দু'পাশে সোমেন আর অপালা, পিছনে ম্লানমুখ অণিমা, সেই অচেনা মেয়েটি, পূর্বা। মেয়েটাকে লক্ষ করল সোমেন। সুন্দরী নয়। রোগা বেঁটে। তবে বয়স খুব অল্প। কুড়ি-বাইশের মধ্যেই। মুখখানায় খুব একটা হাসিখুশি আনন্দের ভাব। গেঁয়ো বলে মনে হয়।
অনিল রায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, বাই দি ওয়ে। অপালা সোমেনকে কি আর রহস্যের মধ্যে রাখা ঠিক হচ্ছে? ও হয়তো এ দলে একটি নবাগতাকে দেখে খানিকটা বিমূঢ় না কী যেন বলে হয়ে আছে। না?
না স্যার, ওকে বলবেন না। চেঁচিয়ে ওঠে অপালা, ওর কাছ থেকে আগে খাওয়া আদায় করি তারপর বলব।
অনিল রায় স্মিত হেসে বললেন, খুব তো খাওয়া খাওয়া করো, কিন্তু খাওয়ার সময়ে তো দেখি সব পাখির আহার। তোমাদের তো আবার ডায়েট কন্ট্রোল না কী ছাই যেন আছে, তবে অত খাওয়ার আওয়াজ কেন?
সোমেনটা হাড় কিপটে স্যার, খরচ করে না। অপালা বলে।
থাকলে তো করব। সোমেন মৃদু হাসি হেসে বলে, দেখছিস তো চাকরি নেই।
চাকরি হলেই বুঝি খাওয়াবি?
সোমেন চাপা গলায় বলে, আমারটা তো তুই-ই সারাজীবন খাবি বাবা!
ইস, কী অসভ্য স্যার, দেখুন সোমেন আমাকে অসভ্য কথা বলছে! অপালা কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে।
বলেছ সোমেন? অনিল রায় স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করেন।
না স্যার, যা বলেছি তা ওর বাপের জন্মে ওকে কেউ বলেনি। অসভ্য কথা! এঃ। বলে সোমেন মুখ ভেঙিয়ে বলল, কেউ বলবে না. ওই মিহির বোসও না। এই শর্মাই বলল। যখন কেউ জুটবে না তখন এসে আমার দোরগোড়ায় বসে কাঁদবি।

বয়ে গেছে। কাকের ঠোঁটে কমলালেবু! শখ কত!

আমি কাক? তুই কমলালেবু? শুনুন স্যার, কত বড় আস্পর্দা!

অনিল রায় হাত তুলে দু'জনকে থামান। বলেন, তুমি কি অপালাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলে সোমেন?

সোমেন মাথা চুলকে বলে, ঠিক তা নয় স্যার।

এর আগেও যেন কয়েকবার তুমি কাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছ বলে শুনেছি। ওটাই কি তোমার 'হবি' নাকি?

সোমেন ম্লান মুখ করে বলল, কেউ রাজি হয় না স্যার, তাই সবাইকে বাজিয়ে দেখছি। যদি কেউ রাজি হয়ে যায়! বান্ধবীরা সব একে একে খসে পড়ছে। এরপর আর কে থাকবে?

অনিল রায় অন্যমনস্ক হয়ে বলেন, তাও বটে। আমিও অনেককে দিয়েছিলাম প্রস্তাব। কিন্তু আমি বড় ফান্টুস টাইপের ছেলে ছিলাম বলে কেউ রাজি হত না। তোমার অবশ্য অন্য প্রবলেম, কাউকেই বোধহয় কনভিন্সড করাতে পারছ না যে তোমারও ভবিষ্যৎ আছে!

ঠিক স্যার।

অনিল রায় উদার কণ্ঠে বললেন, অপালা, বি জেনেরাস। ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও। যদি বোঝো ও সত্যিই অপদার্থ তা হলে বরং পরে একটা ডিভোর্স করে নিয়ো।

অপালা গম্ভীর মুখ করে বলে, শুভদৃষ্টির সময়ে ওকে দেখলেই যে আমার হাসি পাবে!

হেসো। তবু রাজি হয়ে যাও।

ভেবে দেখি স্যার। অপালা গম্ভীর মুখে বলে, না হয় একটা জীবন আত্মত্যাগ করেই কাটবে।

সোমেন চোখ পাকিয়ে বলে, এঃ, আত্মত্যাগ!

অপালা চোখ গোল করে বলল, তার চেয়েও বেশি। প্রাণত্যাগও করতে হতে পারে। তোকে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত সুইসাইড না করতে হয়।

পূর্বা পিছন থেকে করুণ স্বরে ডাকছিল, স্যার, স্যার, আপনারা কোথায়? এঃ মা, আমি কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না।

এসপ্লানেডের অফিস-ভাঙা ভিড়ের শব্দের মধ্যে ডাকটা খুব ক্ষীণ হয়ে সকলের কানে পৌঁছোয়। ফুটপাথে নাচুনি পুতুল দেখে কিনতে বসে গিয়েছিল পূর্বা। পিছিয়ে পড়েছে।

সোমেন গিয়ে তাকে ধরে আনতে আনতে অনিল রায়কে বলে, এদের সব সময়ে একজন করে গাইড দরকার। তবু ছাড়া-গোরুর মতো ঘুরবে, কাউকে অ্যাকসেপ্ট করবে না।

পার্ক স্ট্রিটের দারুণ একটা রেস্তোরাঁয় সবাই এসে বসে হাঁপাচ্ছিল। অনেক দূর হাঁটা হয়েছে।

অচেনা মেয়েটি আর অনিল রায় পাশাপাশি।

অনিল রায় জিজ্ঞেস করেন, কেউ ড্রিঙ্কস নেবে?

সোমেন মাথা নাড়ল। নেবে না। শ্যামল আর মিহির প্রায় একসঙ্গে বলল, জিন।

সেই রহস্যময়ী মেয়েটি বলল, আবার খাচ্ছ কেন?

অনিল রায় বললেন, খাচ্ছি কোথায়? এ ঠিক মদ্যপান নয়। জাস্ট অ্যাপেটাইজার।

মেয়েটা মুখটা একটু বিকৃত করে বলে, বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। রাতে তো বাসায় খাবার খেতেই পারো না।

সোমেন হঠাৎ হেসে বলল, স্যার, আমি কিন্তু বলতে পারি উনি কে!

কে বলো তো!

নতুন মিসেস রায়।

অপালা বলল, আহা! কী বুদ্ধি তোর!

কী ভীষণ বোকা রে বাবা! বুঝতে এত সময় লাগল? পূর্বা বলে।

ঠিক বলেছি স্যার? সোমেন একটু বোকা-হাসি হেসে জিজ্ঞেস করে।

অনিল রায় একটু ভেবে বলেন, ঠিক! হ্যাঁ সেন্ট পারসেন্ট। এ হচ্ছে আমার স্ত্রী মিলু রায়। আর এই হচ্ছে সোমেন লাহিড়ী।

সোমেনের মনে হল অনিল রায় একটা অদ্ভুত বিয়ে করেছেন, বয়সে মেয়েটি প্রায় অর্ধেক, দেখতেও তেমন কিছু নয়। তবে একটা জিনিস লক্ষ করার মতো। মেয়েটি বেশি সাজেনি। নতুন বউরা যেমন সাজে মোটেই সে-রকম নয়। একটা হালকা ক্রিমরঙা শাড়ি পরেছে, মুখে প্রসাধন নেই, একটা এলোখোঁপায় চুল বাঁধা, বেশি সাজলে তাকে ভাল দেখাত না। একটু অহংকারী মেয়েটি। নমস্কার করে একটু হাসল মাত্র। কথা বলল না।

অনিল রায় বললেন, তুমি কিছু নিলে না সোমেন? একটু জিনও নয়!

বড্ড মাথা ধরে স্যার।

একটু বেশি করে খাও, সেরে যাবে। না হলে বরং হুইস্কি নিতে পারো।

সোমেন একটু দ্বিধা করে বলল, আচ্ছা, একটু খাই।

সোমেনের ডান ধারে ম্লানমুখী অণিমা বসেছে। আজ বিকেলে সে প্রায় কথাই বলছে না। অনেকক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ করছে সোমেন। বুকটা মাঝে মাঝে শূন্য লাগছে।

হঠাৎ অণিমা সোমেনকে কনুই দিয়ে অল্প একটু ধাক্কা দিল।

সোমেন প্রথমে বুঝতে পারেনি। তাই একটু সরে বসে। তারপর নির্ভুল টেবিলের তলায় অণিমার হাত সোমেনের হাঁটু স্পর্শ করে। অণিমা প্রায় শ্বাসবায়ুর শব্দে সোমেনের দিকে না ফিরে বলে, খেয়ো না।

সোমেন ফের দ্বিধায় পড়ে। মদ খেতে বারণ করছে নাকি অণিমা? এক বার মুখ ফিরিয়ে নতমুখী ও লাজুক মুখখানা দেখে নেয় সোমেন। অণিমা খুব গম্ভীর, মুখে ভ্রূকুটি।

সোমেনও আস্তে করে বলে, খাব না?

না।

কেন?

কেন আবার! আমি বলছি তাই খাবে না।

সোমেন সামান্য হাসল। বুকের মধ্যে, মনের মধ্যে আজও কেন যে একটা থেমে-যাওয়া ঝড় জেগে ওঠে!

সোমেন বলে, আচ্ছা।

বেয়ারা সোমেনের সামনে হুইস্কির গেলাস রেখে গেল। সোমেন সেটা হাতে নিল, দেখল। রেখে দিল আবার। বলল, স্যার। সেই ভূতের গল্পটা বলবেন না?

ও! হ্যাঁ! বলে হাসলেন অনিল রায়। বললেন, কে বিশ্বাস করবে বলো যে আমার ভীষণ ভূতের ভয় আছে! খুব ছেলেবেলা থেকেই ছিল অবশ্য, কিন্তু ইদানীং সেটা খুব বেড়েছিল। কাউকে বোলো না।

না স্যার।

সেদিন রাতে শুয়েছি, বেশ নেশা ছিল, তবু কেন যেন ঘুম আসছিল না। যত বার ঘুমোই তত বার চটকা ভেঙে যায়। কে যেন জাগিয়ে দিচ্ছে। চাকরটার বাড়িতে অসুখ বলে একবেলার ছুটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেও রাতে ফেরেনি। বার বার জেগে উঠে কান পেতে শুনছি যদি চাকরটা রাতের শেষ গাড়িতেও আসে বারুইপুর থেকে। একদম একা একটা ফ্ল্যাটে আমি, এটা ভাবতেই ভারী গা ছমছম করে। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরে, বেশ ভুতুড়ে দেখাচ্ছে সবকিছু। খুব নিস্তব্ধও চারিদিক। এক-এক বার চোখ খুলে ঘরটার আলোছায়া দেখি। ফের চোখ বুজে ফেলি ভয়ে। পাছে কিছু দেখা দেয়! এ-রকম কয়েকবার হল। বালিশের কাছেই রিভলভার থাকে, সেটা

হাতে নিয়ে শুয়ে রইলাম। আবার ভয়ও করছে, যদি ওটা হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি তো ঘুমের মধ্যে ট্রিগারে চাপ দিলে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। কিন্তু কী করি! জেগে চোখ বুজে রিভলভার হাতে শুয়ে আছি। এমন সময়ে ঠিক একটা টরেটক্কার মতো শব্দ পেলাম। না, শব্দটা বাইরে কোথাও নয়, আমার মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যেই কোথাও হচ্ছিল। সে খুব নিস্তব্ধ শব্দ। যেন আমাকে চোখ খুলতে বলছে। এক বার চোখ চাইলাম। ফাঁকা ঘর। কিন্তু মনে হল, কে যেন এসেছে। সে এসে বসল আমার বিছানার একটা ধারেই। আমি রিভলভারটা তুললাম। ফের সেই টরেটক্কার ভাষা শুনলাম, অস্ত্র নামাও। নামালাম। যে এসেছে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না। ঘরে শুধু ভুতুড়ে চাঁদের আবছা আলো। খুব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কে? ফের সেই টরেটক্কা বলল, তোমার একাকিত্ব। আজ রাতে সেই একাকিত্বের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে।

সবাই হেসে ওঠে।

অনিল রায় হাসলেন না। হাত তুলে বললেন, শোনোই না। খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

॥ সাতষট্টি ॥

অনিল রায় বড় চট করে মাতাল হয়ে যান।

টপাটপ চার-পাঁচ পেগ খেয়ে আজও গেলেন। গেলাস রেখে বললেন, কী যেন বলছিলাম! একটা ভূতের কথা না!

হ্যাঁ স্যার। সোমেন বলে।

অনিল রায় সামান্য ভ্রূ কুঁচকে ভেবে নিয়ে বলেন, খুব অদ্ভুত। পরিষ্কার সেই ভূতটাকে টের পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না। ভয়ে পাগল হয়ে যাই আর কী! ভীষণ ভূতের ভয় আমার। তো ভূতটাকে টের পেয়েই আমি ভর-ভরতি রিভলভার থেকে গুলি ছুড়তে থাকি। চেম্বার খালি হয়ে গেল, সটাক সটাক বুলেট বেরিয়ে আমার ক্যাবিনেট ফুটো করছে, দেয়ালের ছবি ভাঙছে। শার্শি চৌচির করছে, চুনবালি খসাচ্ছে—সব টের পাচ্ছি। আর নিস্তব্ধতার মধ্যেই এক নিঃশব্দ হা-হা হাসি টের পাচ্ছি। আমার পিস্তলের গুলিতে তার কোনও রি-অ্যাকশনই হল না। কলকাতায় সব সময়ে বোমা বন্দুকের শব্দ হয় বলে লোকে গা করে না, তাই প্রতিবেশীরাও কেউ দৌড়ে আসেনি। সে যে কী ভয়ংকর অবস্থা! আমার একটা খাওয়ার টেবিল আছে, পুরনো। এক সাহেবের কাছ থেকে সেটা কিনেছিলাম। আসল মেহগিনি। সেই টেবিলটাকে আমার বরাবর কিছু ভয় ছিল। সন্দেহ হয়, সেই টেবিলটার সঙ্গে এক মেমসাহেবের আত্মার কিছু যোগাযোগ আছে। সোমেন, তুমি মুখ লুকিয়ে হাসলে নাকি?

না স্যার।

অপালা বলে, হ্যাঁ স্যার, হাসল!

অনিল রায় গম্ভীর হয়ে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে যে আমি মাতাল হয়ে গেছি?

একটু হয়েছ, আর খেয়ো না।

সবাই হাসছে নাকি? আমি খুব ভাল লক্ষ করতে পারছি না, তুমি একটু দেখো তো!

না তো, কেউ হাসছে না।

অনিল রায় মাথা উঁচু করে সবাইকে বললেন, হেসো না। এটা সিরিয়াস ব্যাপার।

সেই টেবিলটা স্যার! সোমেন বলে।

কোন টেবিলটা? বলে ভ্রূ কোঁচকালেন অনিল রায়। পরমুহূর্তেই মাথা নেড়ে বললেন, ইয়েস।

সেই মেহগিনি টেবিলটা। আমি অনেক দিন টের পেয়েছি, নিশুত রাতে কে যেন আসে। মেয়েলি হাইহিল জুতার শব্দ। এসে ঘুরে ঘুরে টেবিলটার চারধারে পাক খায়। সে টেবিলটার একপাশে চেয়ার টেনে বসে। তারপর টেবিলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদে।

মাগো! বলে অপালা মিহির বোসের হাত খামচে দেয়।

সত্যি স্যার? পূর্বা উত্তেজিত হয়ে বলে।

অনিল রায় মাথা নাড়লেন। বললেন, সত্যি। অনেক দিন ধরেই আমি তার আনাগোনা টের পাচ্ছি। বান্টির মা যখন ছিল, তখনও। তখন ওকে কতবার ডেকে বলেছি সে-কথা। কিন্তু বড় বেশি মডার্ন ছিল বলে গা করত না। আমাকে মাতাল ভাবত।

ও-সব কথা থাক না, দ্বিতীয়পক্ষ আস্তে করে বলে।

বিরক্ত হয়ে অনিল রায় বললেন, ওরা সব জানে। লজ্জার কিছু নেই। বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, তো টের পেলাম সেই রাতেও আমার রিভলভারের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ার পর একটা হাইহিলের শব্দ পাশের ঘরে আস্তে জেগে উঠল। কী পরিষ্কার টনটনে শব্দ। পরদা সরালেই যেন দেখতে পাব। ঘুরল, বসল চেয়ার টেনে। তারপর কাঁদতে লাগল। আমি পাগলের মতো সেই ঘরের দিকে রিভলভার তাক করে গুলি ছুড়বার চেষ্টা করি, আর কেবলই নিষ্ফলা ট্রিগারের ক্লিক ক্লিক শব্দ হয়! কীভাবে রাতটা কেটেছিল কে জানে! তবে আমি অনেকবার চিৎকার করতে চেষ্টা করেছি, দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, পারিনি।

তারপর স্যার? পূর্বা শ্বাস বন্ধ করে শুনছে।

অনিল রায় আরও একটা নিট হুইস্কি খেয়ে নিলেন। মুখটা ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মতো হাতের পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে বললেন, তো সকালে এই মেয়েটি এসে হাজির। তোমাদের জুনিয়ার, এ বছরই পরীক্ষা দিচ্ছে। হাতে বইখাতা, একটু ডিসকাস করতে এসেছে। আমি ওকে দেখে ধড়ে প্রাণ পেলাম। সোজা সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললাম—তুমি যেয়ো না, থাকো। তোমার পায়ে পড়ি।

বলে অনিল রায় মিলুর দিকে তাকালেন, বললেন, ঠিক বলিনি?

মিলু মাথা নেড়ে বলল, ঠিক।

অনিল রায় আর-একটু মাতাল হয়ে বললেন, ও আমার চেহারা আর অ্যাটিচুড দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু আমারও তো উপায় নেই। সারাদিন কেবল চাকরটাই থাকে। তো সেও আসেনি। একটা ভুতুড়ে রাত্রির পর আমার ইমিডিয়েটলি একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী দরকার—যে থাকবে, ছেড়ে যাবে না। আমি ওকে দেখেই বুঝতে পারলাম, ও ঈশ্বরপ্রেরিত, ও আমার জন্যই নির্দিষ্ট, মেড ফর ইচ আদার। ও ভয় খেয়ে বলল, থাকব কী করে, আমি যুবতী মেয়ে, লোকে বলবে কী? আমি তখন বিনা দ্বিধায় বললাম, বিয়ে করো আমাকে। বিয়ে করো, বিয়ে করো। বলেই ফের মিলুর দিকে তাকিয়ে বলেন, ক'বার কথাটা বলেছিলাম যেন মিলু?

অনেকবার, মিলু বলল।

হ্যাঁ অনেকবার, বলতে বলতে ও রাজি হয়ে গেল। আর সেইদিনই আমরা মিলুর অভিভাবকের অনুমতি নিই, রেজিস্ট্রি করি আর একসঙ্গে থাকতেও শুরু করি। বিশ্বাস করো সোমেন, তুমি বড্ড বেশি হাসছ।

এ যে ভাবা যায় না স্যার।

উদারভাবে অনিল রায় বললেন, আমিও ভাবতে পারি না। দেয়ার ওয়াজ নো লাভ, নো থট, নো অ্যাট্রাকশন। ওনলি ওয়ান অর টু ঘোস্টস মেড আস হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। না মিলু?

মিলু মাথা নত করে বসে ছিল। সোমেন আচমকা লক্ষ করে যে মিলু কাঁদছে। বড় বড় ফোঁটা দু'-একটা ঝরে পড়ল টেবিলে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল সোমেন, অণিমার নির্ভুল হাতটি তার হাঁটুতে চাপ দিল।

চুপ করে গেল সোমেন।

বহুকাল সে-দৃশ্যটা ভুলতে পারেনি। আর হাঁটুর ওপর অণিমার ওই মৃদু স্পর্শ, কী বলতে চেয়েছিল অণিমা! সোমেন, ওকে কাঁদতে দাও। বোকা, মেয়েমানুষের বুকে কত কান্না জমা থাকে জানো না তো।

অণিমার সেই চপলতা নেই, ইয়ারকি নেই। কেমন বিষণ্ণ গম্ভীর আর সুন্দর মহিলা হয়ে গেছে। বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার মধ্যেও একটা আলগা ভাব। কেবল অপালা আর পূর্বার সঙ্গে যা একটু ফিসফাস করে।

বিকেলটা খুব অন্য রকমভাবে কেটে গেল সেদিন। পরদিন অণিমা চলে গেল।

ঠিক যেমন একটা সিনেমার টিকিট ডাকে এসে চমকে দিয়েছিল সোমেনকে, তেমনি হঠাৎ এসে চমকে দিল মধুমিতার চিঠি। লিখেছে, ডার্লিং, এখানে আসার পর বেশ লাগছে। হাসপাতালে অনেক চেক-আপ করাতে হচ্ছে। আমি বাপির সঙ্গে এর মধ্যেই কন্যাকুমারিকা ঘুরে এসেছি, কী ভাল যে লাগল! একদিন ব্যাঙ্গালোরে ছিলাম। খুব বেড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় কী বলো! আজ ক'দিন হাসপাতালে শুয়ে আছি। পরশু অপারেশন হবে, শুনছি। বাপি রোজ প্রায় সারাদিন আমার কাছাকাছি থাকে। বাপি খুব শক্ত মানুষ। এত শক্ত মানুষ আমি আর-একটাও দেখিনি। ধরো, আমাকে যে এত ভালবাসে বাপি তা কিন্তু কখনও বাইরের আদর দিয়ে বুঝতে দেয় না। ছেলেবেলায় পর্যন্ত আমি বাপির কোলে উঠবার সুযোগ পাইনি। বাপি কোলে নিত না, হামলে আদর করত না, এমনকী সারাদিনে হয়তো মাত্র এক-আধবার দেখা হলে এক-আধ পলক তাকিয়ে দেখত মাত্র। কিন্তু তাইতেই বুঝতে পারতাম, পৃথিবীতে এই মানুষটাই আমাকে সবচেয়ে ভালবাসে। কী করে বুঝতাম বলো তো! এই ভালবাসার ব্যাপারগুলো ভারী অদ্ভুত, ঠিক বোঝা যায়, বলতে হয় না। এই যে এখন বাপি আমার কাছে কাছে আছে, এখনও মুখে কোনও আদর নেই। কিন্তু দেখতে পাই, বাপি খুব অস্থির, চিন্তিত। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছে, আলোচনা করছে, ফাঁকে ফাঁকে আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেছে। তেমন বেশি কথা বলে না বাপি, মাঝে মাঝে কেবল সকালে উঠে গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করে শোনায়। হাসপাতালে বেড নেওয়ার আগে কয়েক দিন হোটেলে ছিলাম! মস্ত হোটেল। পুরো একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে আমরা ছিলাম। একদিন মাঝরাতে মাথার যন্ত্রণা হতেই জেগে বাপিকে ডাকতে গিয়েই অবাক হয়ে দেখি, বাপি আমার মাথার কাছে চুপ করে বসে আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। এই বোধহয় প্রথম বাপির মধ্যে একটা স্পষ্ট আবেগ বা দুঃখবোধ যা হোক দেখলাম। কোনও দিন কাঁদি-টাঁদি না, বুঝলে? কান্না-টান্না আমার আসেই না, কী করে কাঁদে লোক তাও জানি না। সেই রাতে হঠাৎ বাপির সেই চেয়ে-থাকা দেখে আমার গলা-ব্যথা, চোখ জ্বালা করে কী একটা অদ্ভুত ব্যাপার হতে লাগল, বুকটা ধড়ফড় করছে। তারপর হঠাৎ ঠোঁটটোট কেঁপে, ফুঁপিয়ে একাকার কাণ্ড। কোনওদিন কাঁদি না তো, তাই সেই আচমকা কান্নাটা আমাকে একেবারে ভাসিয়ে নিল। ডার্লিং, বিশ্বাস করো, নিজের জন্য একটুও দুঃখ নয়, কেবল মনে হচ্ছিল—আমি মরে গেলে বাপি বড় দুঃখ পাবে। শুধু বাপির সেই শোকের কথা ভেবে ভয়ংকর ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু সে মাত্র ওই এক বার। এখন আবার হেইল অ্যান্ড হার্টি আছি। বাপি যতক্ষণ কাছে থাকে, সারাক্ষণ নানা মজার গল্প বলে আমাকে খুশি রাখছে। আমি খুশিও হই। হব না কেন বলো? পৃথিবীটা কি কারও জন্য থেমে থাকে? কারও মৃত্যুশোক পালন করতে সে কি এক সেকেন্ডও তার আহ্নিক গতি বন্ধ করে? পৃথিবীতে কেউ অপরিত্যাজ্য নয়। এমন কেউ নেই যাকে ছাড়া পৃথিবী চলে না। আমরা নিজেদের যত ইম্পর্ট্যান্ট ভাবি মোটেই তা নই আমরা। তোমাকে একটা ছেলের কথা বলি। ভীষণ ভাল ছেলে, একাস্ট্রিমিস্ট। অপরাজিতাদের বাইরের

দেওয়ালে যে লেখাটা আছে, দেখেছ? প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ। কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। ওই কথাটা সে লিখেছিল। সেই ছেলেটাকে আমার ভীষণ ভাল লাগত। একদিন থাকতে না-পেরে আমি তাকে বলে বসলাম, জিতু, আমি তোমাকে চাই, বিয়ে করব। সে ভারী অবাক হয়ে বলল, বিয়ে করবে? কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত আমি তো বাঁচব না। আমি বললাম—কেন বাঁচবে না? সে কেবল হাসে আর বলে, আমার তো বাঁচার কথা নয়। আমি যত তাকে বলি—তোমাকে বাঁচতেই হবে। সেও তত বলে, বাঁচতে তো খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু মরবার দরকার হলে মরব নাই বা কেন?

ডার্লিং, সে কিন্তু মরেনি। জীবনে প্রথম যে খুনটা ও করে সেইটের শক্ ও সামলাতে পারেনি। যারা ওকে খুন করতে উত্তেজিত করে তোলে তারা জানত না যে, ওর প্রকৃতি খুব দুর্বল, নার্ভ ভীষণ সেনসিটিভ। শুনেছি তিলজলার কাছে ও একটা ছেলেকে খুন করে তখন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, চিৎকার করে নাচ গান করতে থাকে। তারপরও ও ছেলেটার হাত দুটো কেটে নিয়ে সেই কাটা হাত থেকে রক্ত মাংস চিবিয়ে খেতে খেতে চিৎকার করে বলতে থাকে— এই দ্যাখ, আমি শ্রেণীশত্রুর রক্ত খাচ্ছি, মাংস খাচ্ছি।

সেই থেকে ও উন্মাদ পাগল। এখনও ওকে সিআইটি রোডের কাছে দেখা যায়। আধ-ন্যাংটো, গায়ে ভীষণ ময়লা পড়েছে, মস্ত চুল-দাড়ি, সারাদিন বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়ায়। ওর উপর কেউ প্রতিশোধ নেয়নি। হয় পাগল বলে ছেড়ে দিয়েছে নয়তো প্রতিশোধ নেবে যারা তারাও কেউ নেই।

ডার্লিং, জিতুর কথা কেন বললাম বলো তো! ওই যে ও একটা কথা বলেছিল, মরবার দরকার হলে মরব নাই বা কেন? তার মানে মরে যাওয়াটাই ও ধরে নিয়েছিল, একমাত্র সত্য বলে। কেউ ওর মাথায় সেই বিশ্বাসটাই সেট করে দেয়। আমার মাথাতেও সেই রকম একটা বিশ্বাস সেট হয়ে গেছে। তাই আর তেমন দুঃখ হয় না। কেবল একটা কথা ভেবে মন খুব খারাপ লাগে ডার্লিং। আমাকে তোমরা ভুলে যাবে না তো! মধুমিতা যাদের ভালবেসেছিল তারা তাকে ভুলে যাবে না তো? প্লিজ, ভুলো না। যদি ভোলো তবে ধূপকাঠি নিবে যাওয়ার পর যে একটু গন্ধের রেশ থাকে, আমার সেটুকুও থাকবে না।

বাপি আমাকে সুন্দর সুন্দর লেখার প্যাড, আর হ্যান্ডমেড কাগজের খাম এনে দিয়েছে চিঠি লেখার জন্য। সবাইকে চিঠি লিখছি, ভুলো না, ভুলো না, মধুমিতাকে ভুলো না।

পরশু আমার অপারেশন হবে বোধহয়। তারপরে কী হবে ডার্লিং। ব্রেন অপারেশন বড্ড শক্ত। কয়েকজন অচেনা, অনাত্মীয় ডাক্তারের হাতে আমার জীবন। ডাক্তারদের মধ্যে একজনের মুখে অনেকটা বাপির মুখের আদল দেখতে পাই। খুব ইচ্ছে হয়, ওই লোকটাই আমার অপারেশন করুক। ভুলো না।

তোমারই মধুমিতা।

বিকেলের আলোয় চিঠিটা পড়ছিল সোমেন। দীর্ঘ সন্ধ্যাটা তারপর যেন কাটতে চায় না। জীবন ভরে এক আলো-আঁধারি নেমে এল বুঝি।

চিঠি পাওয়ার কয়েক দিন পর একদিন উত্তরটা লিখতে বসল সোমেন। পুরো একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর দিকে লিখল— প্রিয় মধুমিতা,

তারপরই খেয়াল হল, কাকে লিখছে। এতদিনে মধুমিতার অপারেশন হয়ে গেছে। কী হয়েছে? যাই হোক, মধুমিতা এ চিঠি পড়তে পারবে না নিশ্চয়ই। তাই আর লিখল না সোমেন। একটা সাদা কাগজের ওপর দিকে কেবল ছোট্ট করে লেখা রইল— প্রিয় মধুমিতা, ব্যস আর কিছু নেই। বাকি সাদা কাগজটা ধু-ধু মরুভূমি।

যত্ন করে কাগজটা ভাঁজ করে সঞ্চয়িতার মধ্যে রেখে দিল সোমেন। দিনের আলোতেও এক

অদ্ভুত আঁধার পৃথিবীতে নেমে এসেছে, সোমেন টের পায়। ফুসফুস ভরে বাতাস টেনেও যেন শ্বাসের তৃপ্তি হয় না। হাঁফধরা হয়ে থাকে বুক। সোমেন তাই ছটফট করে।

না, এ-দেশে আর থাকবে না সোমেন। এই যে এত প্রিয়জন চার দিকে, এদের মধ্যে বেশি দিন থাকা ভাল নয়। কে কবে বুক ঝাঁঝরা করে দিয়ে চলে যাবে! বাবা-মা বুড়ো হয়েছে, দাদার শরীর ভাল নয়। তা ছাড়া কার কখন নিয়তি কে জানে। মৃত্যু তার টিকিটঘর খুলে বসে আছে, ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে মানুষের মুখ। যখন যার মুখ পছন্দ হয় তখনই তাকে ধরিয়ে দেয় টিকিট। তাই প্রিয়জনদের কাছে বেশি দিন থাকা ভাল নয়।

॥ আটষট্টি ॥

এদিককার জমিতে ভাল আখ হয় না। যৌবনকালে ব্রজগোপালের খুব প্রিয় ছিল আখ। বলতেন, মিষ্টি লাঠি। কেষ্টঠাকুরের মতো ধুতিটা কোমরে বেঁধে, খালি গায়ে এক গাঁ থেকে অন্য গাঁ চলে যেতে যেতে যৌবন বয়সে কতবার খেত থেকে আখ ভেঙে নিয়েছেন। চিবোতে চিবোতে লম্বা পথ ফুরিয়ে গেছে। এখন দাঁত নেই বলে চিবোনোর প্রশ্নই ওঠে না। তবু রান্নাঘরের মুখোমুখি একটু জমিতে কয়েকটা আখ গাছ লাগিয়েছিলেন। ভাতের ফেন, তরকারির খোসা এই সব দিয়ে বেশ ফনফনে হয়ে উঠেছে গাছগুলি। গোড়াগুলো বাঁশের মতো মোটা। ষষ্ঠীচরণ বুক দিয়ে দাদুর আখগাছ পাহারা দেয়, সেও আবার নিজের বিবেচনা মতো পচা গোবর, খোল যা পারে এনে আখের গোড়ায় দেয়। জমি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা করেছেন ব্রজগোপাল। আপেল ন্যাসপাতি লাগিয়ে দেখেছেন, ডালিম লাগিয়েছেন, কমলালেবুও। ষষ্ঠীচরণ সে-সবও আগলে আগলে বেড়ায়। তার ধারণা, দাদুর সব গাছেই ফল ফলবে। সে খাবে। পেয়ারাগাছটায় এবার ঝেঁপে ফল ধরেছে, দিনরাত পাখি-পক্ষীর অত্যাচার, দু'-চারটে হনুমান আছে, তারাও এসে হামলা করে। ষষ্ঠীচরণ লগি হাতে দিন রাত পাহারা দেয়। বহেরুর অন্য সব নাতিপুতির সঙ্গে সেই কারণেই তার ঝগড়া হয় রোজ। দৌড়ে এসে দাদুকে নালিশ করে, ও দাদু, অমুক আমাকে এই বলল, কি সেই বলল।

ব্রজগোপালের আর তেমন মায়া হয় না ফলপাকুড়ের প্রতি। তিনি বলেন, তা পেয়ারাগুলো যত দিন কষটা ছিল তত দিন পাহারা দিয়েছিস, এবার সব পেকে উঠেছে, এখন সবাইকে দিবি। দেখিস, যেন গাছ না ভাঙে।

ষষ্ঠীচরণের সে-কথা পছন্দ নয়। সে বলে, ও তো তোমার গাছ, ওরা খাবে কেন?

ব্রজগোপাল বলেন, তুই বড় কৃপণ মানুষ হবি তো! যা ব্যাটা, গিয়ে পেয়ারা পেড়ে ওদের সব হাতে হাতে দে। নিজে গাছে উঠবি না। বরং কালীপদকে বল, পেড়ে দেবে। কয়েকটা পাকা পেলে আমাকে এনে দিয়ে যাস, কলকাতায় যাব আজ, ওদের জন্য নিয়ে যাব।

এই বলে ব্রজগোপাল দা হাতে বেরিয়ে গোটা দুই মস্ত আখ কেটে আনেন। আগার পাতাটাতাগুলো ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নেন। রসে টসটস করছে মিষ্টি লাঠি। তা শহুরে ছেলেরা-মেয়েরা এ-সব তেমন পছন্দ করবে কি আজকাল? আখটাখ তারা বড় একটা খায় না। শীলা বরাবর ফলটল দেখলে নাক সিঁটকোয়, সোমেন রণেন ওদেরও দেখেছেন এ-সব পছন্দ করে না বেশি। অথচ ব্রজগোপালের যৌবন বয়সে এ-সবই ছিল প্রিয়। খেত থেকে কাঁচা ছোলা গাছ থেকে এক ঝাড় তুলে খোসা খুলে মুখে ফেলতে ফেলতে মাইল মাইল পার হয়ে গেছেন। এমনকী দণ্ডকলস গাছের ফুলের মধুটুকুও চুষে খেতে কত ভালবাসতেন। দেশ-মাটির সঙ্গে ওইরকমভাবে বাঁধা পড়ে যেতেন গভীর মায়ায়। কলকাতায় বড় হওয়া তাঁর ছেলেপুলেরা জীবনের এ-সব মজা কখনও উপভোগ করেনি, কিছুটা করেছিল কেবল রণেন। গাছের ফুটি কিংবা মাদারফল, পানিফল

কতবার দিয়ে এসেছেন কলকাতার বাসায়। কেউ খায়নি, পচে ফেলা গেছে। এই সবস আখের স্বাদও ওরা বুঝবে কি?

না বুঝুক, তবু নিজের হাতে করা এই সব ফলপাকুড় প্রিয়জনদের কাছে পৌঁছে না দিয়েও পারেন না তিনি। দেওয়া নিয়ে কথা। ওরা যদি ফেলে দেয় তো দেবে।

ষষ্ঠীচরণ আর তার বাপ বিশাল ধামা ভরতি রাজ্যের পেয়ারা নিয়ে আসতেই ব্রজগোপাল রেগে উঠে বলেন, গাছসুদ্ধ পেড়ে নিয়ে এলি নাকি বোকারা?

তাই তো বলেছেন শুনলাম। কালীপদ মাথা চুলকে বলে।

দূর ব্যাটা! পাখিপক্ষীর জন্যও তো কিছু রাখতে হয় গাছে. না কি! তোরা বড় স্বার্থপর হয়েছিস, সব কেবল নিজে দখলাতে চাস। এ-রকম কৃপণ হলে তোদের সব বাড়িঘরে আর পাখিটাখিও আসতে চাইবে না, ভূতের বাড়ি হবে সব। যা, সবাইকে বিলি করে দে। আমি এত নিয়ে কী করব, গুটি দশেক বেছেগুছে রেখে যা। যাদের জন্য নিয়ে যাই তারা এ-সব আদর করে খাবে কি না কে জানে!

ব্রজগোপাল পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে তৈরি হচ্ছিলেন। সেদ্ধ ভাত খেয়ে নিয়েছেন এক চিমটি। হাতে কাচা পরিষ্কার ধুতি পরেছেন, ফতুয়ার ওপর পাঞ্জাবিটা চাপাবেন কেবল, এই সময়ে বহেরু এসে রাগারাগি শুরু করল, কর্তা, এই শরীর নিয়ে বেরোচ্ছেন, ভালমন্দ কিছু হলে তখন সবাই বলবে, বহেরু কর্তাকে দেখেনি। এই তো সেদিনও বুকের ব্যথাটা উঠল আপনার।

সত্য বটে, ক'দিন আগেও ব্যথাটা উঠেছিল। সেদিনও শীলার ছেলের নামটা দিয়ে আসবেন বলে একটা পরিষ্কার কাগজের ওপরে ঠাকুরের নাম লিখে, নাতির নামটা গোটা গোটা অক্ষরে মাঝখানে লিখেছিলেন। কোষ্ঠীর ছকটাও করেছিলেন সেই সঙ্গে। কোষ্ঠীপত্র তৈরি করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। ছকটা বিচার করেও একটু ভাবনায় পড়েছিলেন। নাতিটার ভবিষ্যৎ খারাপ নয়, কিন্তু ছ'বছর বয়স থেকে কেতুর দশা পড়বে, তখন ভোগাবে। এ-সব বিষয়ে আগে থেকেই শীলাকে সতর্ক করে আসাও দরকার।

সেদিনও এ-রকম তৈরি হয়ে বেরোবার মুখে হঠাৎ যেন একখানা ভারী দৈত্যের হাত এসে বুকটাকে চেপে ধরল। সে কী শ্বাসকষ্ট, ব্যথা। সেই হাতটাই তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল বিছানায়। দিন চারেক উঠতে দেয়নি। যাদের কাছে কলকাতায় যাচ্ছেন, তারা জানেও না। জানার চেষ্টাও নেই।

ব্রজগোপাল একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, শুয়ে মরার চেয়ে হেঁটে মরা ভাল। যা তো এখন, দিক করিস না। আমার কোনওখানে যাওয়ার নাম হলেই তোর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

বহেরু খুব কূট চক্ষে চেয়ে আছে। মনে মনে নানা রকম প্যাঁচ কষছে, যাতে ব্রজঠাকুরকে আটকানো যায়, এটা ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারেন ব্রজগোপাল। তবে চাষাড়ে মাথায় বেশি বুদ্ধি খেলে না। তাই কিছুক্ষণ ভেবে হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, তবে যান, আমাদের ওপর তো আপনার মায়া নাই। মানুষ নাকি আমরা!

ব্রজগোপাল মৃদু হাসেন। বহেরু অভিমান করে চলে যায়। অত বড় মানুষটার অভিমানী মুখ দেখলে মজা লাগে।

গাড়ির এখনও ঢের দেরি আছে। ক'দিন হল বহেরু একটা ঝকঝকে রিকশা কিনেছে। খুব বাহারি রিকশা। তার হুডে নানা রকম রঙিন কাপড়ের ফ্রিল লাগানো। বেলদার সাইনবোর্ড লিখিয়ে অম্বিকাচরণ নানা রঙের আঁকিবুকি নকশা করে দিয়েছে গায়ে। রিকশার পিছনে একটা আকাশের গায়ে বক উড়ে যাওয়ার ছবি এঁকে তলায় লিখে দিয়েছে, পথবান্ধব, বহেরু গ্রাম। সেই রিকশাটা এনে দরকারমতো ব্যবহার করে এখানকার লোকেরা, কে চালায় তার ঠিক নেই। কখনও কোকা বা কপিল, কখনও কোনও মুনিশ কিংবা কালীপদ। আজকাল ওই রিকশাতেই স্টেশনে বেশ যাওয়া চলে। অবশ্য ব্রজগোপাল হাঁটতেই ভালবাসেন। কিন্তু বহেরু হাঁটতে দেয় না। ডাক্তারের বারণ।

কিছুক্ষণ বাদে রিকশাটা এসে দরজার সামনে ঘণ্টি মারে। মুনিশটা সিট থেকে নেমে এসে জানান দিয়ে যায় যে, রিকশা তৈরি আছে। ব্যাগ আর একটা পোঁটলা নিয়ে গিয়ে রিকশায় তুলে রাখে।

ঠাকুরের ছবির কাছে একটি সর্বাঙ্গীণ প্রণাম করলেন ব্রজগোপাল। প্রণাম রোজই করেন, কিন্তু প্রণাম কি আর রোজ হয়? মাথা নিচু হয় বটে, কিন্তু মনটা তার সর্বস্ব নিয়ে ওই পায়ে ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়ে না তো! দেহ প্রণাম করে তো মনটা আলগা আনমনা হয়ে সরে বসে থাকে। সংসারী মানুষের এ বড় বাধা। যদিও সংসার বলতে কিছুই নেই তাঁর। তবু মনের মধ্যে কেবলই এক সংসারের ছায়া ঢুকে বাস করে। কত কী চিন্তা আসে, কত উদ্বেগ, কত দখলস্বত্ব, কত অভিমান ও ক্ষোভ আজও মনের মধ্যে ইঁদুরের গর্তের মতো রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়ে গেছে। সবাইকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করে নেওয়া হল না আজও। এখনও কত পাওনাগণ্ডা যেন আদায় হয়নি, কত প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি, কত ঋণ শোধ করেনি লোকে। এই সবই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পিছুটান প্রণামকে প্রণাম হতে দেয় না। আজ বহুকাল বাদে একটা সুন্দর প্রণাম হল। যখন মাথা নিচু করলেন তখন যেন তাঁর সঙ্গে পূর্ণ জগৎটাও ঝুঁকে পড়ল ঠাকুরের পায়ের ওপর। ঢেউ উঠে ভিজিয়ে দিল তাঁর পা।

যখন উঠলেন তখন দুই চোখে জল, মুখটা তৃপ্ত, মনটা বড় শান্ত ও উদাস। তুমি আজ প্রণাম নিয়েছ, সে তোমারই দয়া। ঠাকুর, আর কিছু না, রোজ যেন এক বার আমার প্রণাম প্রণামের মতো হয়।

কপালের আড়াল থেকে ছোট্ট একটা মাথা সাবধানে উঁকি দিচ্ছে।

উদার আনন্দে ব্রজগোপাল ডাকলেন, কে রে, ষষ্ঠী? আয়।

না। আমি মতিরাম।

এই বলে বামন মতিরাম ঘরে ঢোকে। মুখটা বিষণ্ণ। ওকে ঠিক এ-রকম গম্ভীর মুখে মানায় না। সব সময়ে ফষ্টিনষ্টি ইয়ারকি করে, তাই ওটাই ওর স্বাভাবিক ব্যাপার।

কী গো মতিরাম? বলো।

আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবেন ব্রজকর্তা? আমি পালাব।

সে কী?

বড় মারে এরা। কালও কপিল লাথি মেরেছে। তাদের কেবল ওই কথা, চলে যা, বসে খেতে পারবি না। আমি খাই কতটুকু ব্রজকর্তা? পেটটা দেখুন না, কতটুকু!

তাই পালাবি? বহেরুকে বলগে যা না।

ও বাবা, সে বড় কড়া মনিব। তার ওপর ছেলেদের ভয় খায়। আপনি রিকশায় যান, আমি বেলদার বাজার পর্যন্ত ছুটে চলে যাব, সেখানে আমাকে রিকশায় তুলে নেবেন। কলকাতার রাস্তায় ছেড়ে দেবেন। ঠিক পেট চালিয়ে নেব। কলকাতার লোকে মজা দেখতে ভালবাসে।

বহেরু শুনলে রাগ করবে!

করুক রাগ। তখন তো আমাকে খুঁজে পাবে না।

ব্রজগোপালের মনটা খারাপ হয়ে যায়। ডাকাত বহেরুরও একটা গৃহস্থ মন ছিল। সে কাউকে ফেলত না। তার সময় শেষ হয়ে গেছে। এখন যারা তার জায়গায় দখল নিচ্ছে তারা লম্বায়-চওড়ায় কম নয়, কিন্তু মনুষ্যত্বে ওই মতিরামের মতোই বামন।

ব্রজগোপাল বললেন, যাবি তো চল।

একগাল হেসে মতিরাম চলে যায়।

ব্রজগোপাল ঘড়ি দেখে রিকশায় উঠতে গিয়ে দেখেন বহেরু সাজগোজ করে এসেছে। গায়ে পিরান, পরনে পরিষ্কার ধুতি, পায়ে একটা দেশি মুচির তৈরি চটিও। ব্রজগোপাল উঠতেই সেও উঠে রিকশার পা রাখার জায়গায় ব্রজগোপালের পা ঘেঁষে বসে পড়ে বলল, চলুন আমিও যাচ্ছি। একা আপনাকে ছাড়ব না।

॥ উনসত্তর ॥

একটা দানোর মতো বিশাল বহেরু উবু হয়ে পায়ের কাছে বসে আছে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় রিকশাটা জোর ঝাঁকুনি দিচ্ছে মাঝে মাঝে, বহেরু গাড়োয়ান যেমন তার গোরুর গাড়ির গোরুকে ধমকায়, ঠিক তেমনই ধমক মারে রিকশাঅলাকে—র', র', হেই!

মুনিশটা রিকশা চালাচ্ছে, সে তেমন পাকা লোক নয়। রাস্তাটাও খারাপ। বর্ষার পর রাস্তার খানাখন্দ সব বেরিয়ে পড়েছে। কবে যে কে এ রাস্তা মেরামত করবে তার ঠিক নেই।

বহেরু মুখটা তুলে ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে বলে, বহুকাল কলকাতায় যাই না।

ব্রজগোপাল ভ্রূকুটি করে বলেন, যাওয়ার দরকারটা কী ছিল?

সেখানকার মচ্ছবটা দেখে আসি একটু। কালীমায়ের মন্দিরেও যাব। মাথাটা ঠুকে দিয়ে আসি। বহুকাল যাই না।

ব্রজগোপালের অবশ্য অন্য চিন্তা। মতিরাম বলেছিল বেলদার বাজারের কাছে এসে রিকশায় উঠবে। একটু কষ্ট হল ব্রজগোপালের। বহেরুকে দেখলে ভড়কে যাবে মতিরাম। বেঁটে মানুষ বলে তাকে কেউ পাত্তা দেয় না, ছেলেছোকরারা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে গাঁট্টা মারে, খামোখা চড়-চাপড় দেয়। ও-সবই মজা। কিন্তু মতিরামের জীবনটা এইসব মজায় তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। এখন আবার দোটানায় পড়ে বেচারার প্রায় যায়। বহেরু তাকে রাখে তো ছেলেরা তাড়াতে চায়। তা আজ বোধহয় মতিরামের পালানো হল না।

ওই সামনে বেলদার বাজারের বড় বটগাছটা দেখা যাচ্ছে।

ব্রজগোপাল বলেন, গাড়ির দেরি আছে নাকি রে?

বহেরু বলে, অনেক দেরি।

বটগাছের কাছে মুনিশটা রিকশা থামিয়ে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায়। রিকশা চালিয়ে অভ্যাস নেই, হেদিয়ে গেছে। বলে, একটু চা মেরে আসি। গাড়ির দেরি আছে। বসেন।

বহেরু নেমে পড়েছে। ময়লা ধুতির ওপর ফরসা পিরানে তার চেহারায় গেঁয়ো ভাবটা ফুটে উঠেছে। বলল, এই ঝ্যাকোর-ম্যাকোর করে রিকশায় আসতে মাজাটা ধরে গেল। হাঁটা চলা না করলে জুত পাচ্ছি না।

গাঁ-গঞ্জের লোকের স্বভাবই এই, কোথাও যাওয়ার তাড়া থাকে না, রাস্তায়-ঘাটে দশবার জিরোয়, দশবার চেনা লোকের খবর করে।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, মুনিশটাকে তাড়া দে। নইলে ঠিক গাড়ি ফেল করাবে। তারপর ঘণ্টাভর বসে থাকো পরের গাড়ির জন্য।

বহেরু হুমহাম করতে করতে মুনিশকে তাড়া দিতে গেল। ব্রজগোপাল জানেন, বহেরু এখন বাজারের বিস্তর লোকের খবর করবে, বিষয়কর্মের ধান্ধা মেটাবে, তারপর আসবে।

ব্রজগোপালও রিকশা থেকে নেমে পড়েন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী বুড়ো রাম কবিরাজ বলেছিল গোলমরিচ দিয়ে একটা পেটের অসুখের ওষুধ তৈরি করে দেবে। বাজারের পশ্চিম ধারে তার একটা টিমটিমে দোকানঘর আছে।

একটা গোরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সামনেই। গোরু দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধা। গাড়িটা পেরিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রজগোপাল। হঠাৎ শুনলেন মতিরামের গলা— ব্রজকর্তা!

ব্রজগোপাল একটু চমকে চার দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন না। বেঁটে মানুষ, কোথায় কোন আড়ালে পড়ে গেছে?

বললেন, সামনে এসো, অত ভয়ের কী?

গোরুর গাড়ির চাকার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল মতিরাম, ডাক শুনে বেরিয়ে এল। তার মুখ ঘামে

জবজবে। একটু কেমনধারা কষ্টের হাসি হাসছে।

বলল, রিকশায় বহেরুকে দেখে ঘাবড়ে লুকিয়ে পড়লাম।

ব্রজগোপাল বললেন, বরং ফিরে যাও মতিরাম। মাথা ঠান্ডা করে ভাবো গে যাও। পরে না হয় বলেকয়ে যেয়ো। পালিয়ে গেলে লোকে নানা সন্দেহ করে। তার ওপর ধরো যদি কোনও জিনিসপত্র বা টাকা-পয়সা এধার-ওধার হয় তো তোমাকে চোর বলে সন্দেহ করবে। তার চেয়ে আমিই বরং বহেরুকে বলবখন, সে তোমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে।

মতিরাম কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকে অসহায়ভাবে। তারপর উবু হয়ে বসে পায়ের একটা ফাটা আঙুলের ক্ষতটা নিবিষ্টভাবে দেখার চেষ্টা করে বলে, দৌড়ে এসেছি। কোথায় যে হোঁচট খেয়ে চোটটা লাগল, বুঝতে পারলাম না। এখন ব্যথা করছে বড়।

এই বলে রাস্তার ধুলো তুলে ক্ষতে চাপা দিচ্ছিল।

ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বললেন, ওটা কী করছ। বিষিয়ে যাবে যে!

ধ্যুৎ! ব্রজকর্তা কিছু জানেন না। ধুলোর মতো ওষুধ নেই। যখনই কাটবে একটু ধুলো চাপান দিয়ে দেখবেন, একদম ফরসা।

ব্রজগোপাল আর কিছু বলেন না। যার যেমন বিশ্রাম।

মতিরাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কয়েক পা হেঁটে দেখল। বলল, একটা রিকশা হলে চলে যেতে পারতাম। এ পা নিয়ে কি হাঁটা যায়!

রিকশা তো আছেই, ফিরতি পথে তোমাকে নিয়ে যাবেখন, আমি বলে দেব।

মতিরাম হাসে, ব্রজকর্তার যেমন কথা। নিয়ে যাবে কি! বললে এমনিতে না করবে না। কিন্তু মুনিশ ব্যাটাদের আমাকে দেখলেই নানা রকম মজা চিড়বিড়িয়ে ওঠে। ঠিক মাঝপথে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে। নয়তো এই বেলদার বাজারেই লোক জড়ো করে আমাকে বাঁদর নাচ নাচাবে। তার ওপর বহেরু যদি টের পায় যে পালিয়ে এসেছি তো বড্ড রেগে যাবে। রিকশায় কাজ নেই ব্রজকর্তা, হেঁটেই মেরে দেব।

এই বলে মতিরাম কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল সট করে। ব্রজগোপাল দেখলেন, বহেরু আটাচাক্কির দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে। মুনিশটাও রিকশার ভেঁপু বাজাচ্ছে প্যাঁ প্যাঁ করে। বহেরু বলল, কর্তা, সময় গড়িয়ে গেছে, গাড়ি এল বলে।

ভিড়ের গাড়ি। অফিসের লোক ঠেসেঠুসে উঠেছে। তার মধ্যেই বহেরু একটা চেনা লোক পেয়ে হেঁকে বলল, ওঠো তো কালাচাঁদ, উঠে এই বুড়ো মানুষকে বসতে দাও। ব্রাহ্মণ মানুষ দাঁড়িয়ে যাবেন নাকি!

কালাচাঁদ নামে লোকটি তাড়াতাড়ি উঠে ব্রজগোপালকে সত্যিই জায়গা ছেড়ে দেয়।

ব্রজগোপাল লজ্জা পান, বিরক্তও হন, বলেন, তোর যত গা-জোয়ারি ব্যাপার বহেরু। লোকটাকে ওঠালি, দরকারটা কী ছিল?

না না, ও দাঁড়িয়ে যাবেখন আমার সঙ্গে গল্পগাছা করতে করতে। আপনি বুড়ো মানুষ।

ব্রজগোপাল হেসে ফেলেন। বলেন, বয়েস কি তোরই কম নাকি!

চাষার আবার বয়েস! বলে বহেরু মাথা চুলকোয়।

সারাক্ষণ দরজার কাছে বসে ব্রজগোপালের চোখের আড়ালে ওরা গাঁজা টানল দু'জনে। ব্রজগোপাল স্পষ্টই টের পেলেন। হাওড়ায় নেমে দেখেন, বহেরুর চোখ দুটো ভারী ঝলমল করছে, মুখখানা টসটসে। তার অর্থ, বেশ নেশা হয়েছে।

কোন দিকে যাবি? ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেন।

কালীমায়ের থানটাই আগে দেখে আসি।

বাইরে বেরিয়ে এসে বহেরু অবাক মানে।

বলে, কর্তা, এ শহর যে থিক থিক করছে লোকে!

হুঁ।

ই বাবা, কতদিন, কতদিন পরে এলাম! তা এত পালটে গেছে বুঝব কী করে! সবই অন্য রকম লাগছে।

বাসে উঠবার হুড়োহুড়ি চলছে। একটা বাস চলে গেল। আর নেই। লোকজন হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছে।

এত গুঁতোগুঁতি আপনার সইবে না কর্তা, চলুন হেঁটে মেরে দিই। কত দূর আর হবে!

ডালহৌসি পর্যন্ত হেঁটেই এলেন ব্রজগোপাল বহেরুর সঙ্গে। সেখান থেকে বাসে উঠে কালীঘাট পর্যন্ত একসঙ্গে। বহেরু নেমে যাওয়ার আগে বলল, ছ'টা পাঁচের ট্রেনে থাকব কিন্তু কর্তা।

ব্রজগোপাল স্নিগ্ধস্বরে বলেন, আচ্ছা। দুপুরে কোথাও দুটি খেয়ে নিস।

বেশ লাগছে। শরৎকালটা বেশ সুন্দর। গোবিন্দপুরের তুলনায় কলকাতায় একটু গরম বেশি। তা হোক, তবু এই বর্ষার পরে ভারী চমৎকার লাগে চার দিক। মনটাও ভাল, কারণ এখন আর কারও কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই।

ঢাকুরিয়ার বাড়িতে পা দিয়েই কিন্তু বড় থতমত খেয়ে গেলেন ব্রজগোপাল। দরজা খুললেন ননীবালা নিজেই। খুলে বিষণ্ণ অদ্ভুত একটা মুখ বের করে খুব অবাক হয়ে দেখলেন ব্রজগোপালকে। চিরকালের সেই বড় বড় টানা চোখ ননীবালার, এই চোখই পেয়েছে সোমেন। এই বুড়ো বয়সেও ননীবালার চোখ দেখলে মন জুড়িয়ে যায়।

কিন্তু সেই বড় বড় চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে টসটস করছিল। ননীবালা আঁচলে আড়াল করলেন মুখ। কথা বলতে পারলেন না। এক বার কেবল ফুঁপিয়ে উঠলেন।

বুক কাঁপছিল। তবু ব্রজগোপাল গলা ঝেড়ে বলেন, কী হল?

॥ সত্তর ॥

এ ঠিক একমুহূর্তের কান্না নয়। ননীবালা বহুকাল আগে তাঁর ছেলেবেলায় হাজারিবাগের ওদিকে বেড়াতে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা কুণ্ড দেখেছিলেন, পাথরের ভিতরে গর্তমতো, নানা ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে জল বয়ে এসে সেইখানে জমছে নিরন্তর। ননীবালারও তাই। সংসারের কত ফাটা ভাঙা গুপ্তপথ দিয়ে কান্না চুঁইয়ে এসে বুক ভরে রাখে। ব্রজগোপালের হঠাৎ দেখা পেয়ে সেই কান্নাটাই বেরিয়ে এল।

আজ কেউ বাড়িতে নেই। সকালেই ছেলেমেয়ে নিয়ে রণেন আর বীণা গেছে দক্ষিণেশ্বরে। সোমেনও এ সময়ে বাড়ি থাকে না। ননীবালা একা। সেই একা থাকার মধ্যে হঠাৎ পর মানুষটা এল। বুকটা ভার হয়েই ছিল, ব্রজগোপালকে দেখে সেই ভারটা নড়ে উঠল, ফুলিয়ে তুলল বুক।

দরজা ছেড়ে ভিতরে পিছিয়ে এসে ননীবালা বললেন, এসো।

ব্রজগোপাল ইতস্তত করেন। বুকটা বেসামাল লাগে। ননীবালা কাঁদছে কেন? কোনও খারাপ খবর নেই তো? রণেন, সোমেন, শীলা, ইলা নাতি-নাতনিরা সব ভাল আছে তো?

গলাখাঁকারি দিয়ে ব্রজগোপাল বলেন, খবর-টবর কী?

এসো, বলছি।

ব্রজগোপাল ঘরে এলে ননীবালা দরজা বন্ধ করে দেন।

ব্রজগোপাল শূন্য বাসার নির্জনতা আর স্তব্ধতা টের পান। ভয় লাগে। সবাই ঠিকঠাক আছে তো!

সংসারী মানুষের বুকে মায়ার পাথার দিয়ে রেখেছেন ঠাকুর। এত যে ছেড়ে থাকেন তবু ভুল পড়ে না। বিশ্বসংসারকে আপন করতে পারা সোজা নয়, তেমনি শক্ত নিজের জনকে পর করা। এ বড় ধন্দ।

খারাপ খবর নেই তো!

ননীবালা হঠাৎ উষ্মাভরে বলেন, খারাপ নয় তো কী? ভাল খবর আসবে কোত্থেকে?

ব্রজগোপাল ধুতির খুঁটে মুখের ঘাম মুছে হাতের বোঝা নামিয়ে বলেন, ভাল আর কী হবে? ভাল চাই না, খারাপ কিছু না হলেই হল। সংসারী মানুষের তো ওই সারাক্ষণ ভয়, ভাল না হোক খারাপও যেন কিছু না হয়।

ননীবালা বলেন, তুমি আবার সংসারী নাকি!

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, ভেক বোঝা যায় না। কিন্তু আমিও যেমন জানি তুমিও তেমনি জানো, আমার মায়াদয়া ঠাকুর কম দেননি। তোমাদের শান্তির অভাব হবে বুঝেই আমি বেড়াল-পার হয়েছি। এ-সব তো কেউ বুঝবে না।

ব্রজগোপাল বাইরের ঘরের সোফাটায় বসতে যাচ্ছিলেন, ননীবালা বললেন, ওখানে বসছ কেন? ঘরে এসো। আমার ঘরে।

এই তো বেশ। দুটো কথা বলে চলে যাব।

ননীবালা ঝংকার দিয়ে বলেন, কেন, বাইরের লোক নাকি যে বাইরের ঘরে বসে দুটো কথা বলে চলে যাবে! কোনও দিন তো অন্দরমহলে ঢোকো না। বাইরে থেকে বুঝে যাও যে আমরা খুব ভাল আছি।

তা ভাবি না। স্মিত হেসে ব্রজগোপাল বলেন, দেশকালের যা অবস্থা তাতে ভাল কে-ই বা আছে। সবাই বাইরেটা চকচকে রাখার চেষ্টা করে, তবু ঢাকতে পারে না। তুমিও পারোনি।

ননীবালা অবাক হয়ে বলেন, কী পারিনি?

ননীবউ, তুমি ছেলেদের কাছে বড় আদরে সম্মানে আছ, এটাই আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলে বরাবর। কিন্তু আমি বরাবরই টের পেয়েছি, তুমি নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছ। তাই কি হয়! মা-বাপকে ছেলেমেয়েরা কবে আর বুঝতে শিখল! মা-বাপের মনের মধ্যে কত মান-অভিমান জমা থাকে, ওরা কি তা বোঝে! স্নেহ নিম্নগামী, বড় সত্য কথা। তুমি ওদের জন্য যতই করো ওরা তোমাকে কোনও দিন বুঝতে পারবে না। অভিমান করে লাভ নেই।

ননীবালা কী উত্তর দেবেন! সত্য কথার কী উত্তরই বা হয়! তিনি আবার হঠাৎ চোখে-আসা জল আঁচল চেপে সামলান। বলেন, দোষ কার বলো তো! কে আমাকে ছেলেদের সংসারে যুতে দিয়ে সরে গেল?

সে কি আমি ননীবউ?

তুমি ছাড়া কে?

ব্রজগোপাল বললেন, আমাকে এত বড় মানুষের সম্মান তো তুমি কোনও দিন দাওনি। আমি যে তোমার কেউ তা তো শেষ দিকটায় বুঝতেই পারতাম না। তুমি ছেলেপুলে, নাতি-নাতনি নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত ছিলে, সংসারে বুক দিয়ে পড়ে জমি তৈরি করছ, আমার দিকে মনোযোগ ছিল না। উপরন্তু ছেলেমেয়েদের কাছে আমার কত দোষের কথা বলে মন বিষিয়ে দিতে। মনে পড়ে?

ননীবালা স্তব্ধ হয়ে থাকেন। যেন ব্রজগোপাল যে সে-সব কথা কখনও তুলবেন এটা তাঁর বিশ্বাস ছিল না।

ব্রজগোপাল বললেন, ভালই করেছ। আমার ক্ষোভ নেই। কিন্তু আমি বাড়ি-ছাড়া হয়ে যেমন বনবাসী, তুমি ঘরে থেকেও তেমনি বনবাসী। ছেলেরা বড় হলে মা-বাপ অপ্রয়োজন হয়, আর সেই বুঝে মা-বাপেরও অপ্রয়োজন হয়ে সরে আসা উচিত।

ননীবালা উষ্মাভরে বলেন, আমার ছেলেরা সে-রকম নয়।

না, ছেলেরা বোধহয় ভালই। ব্রজগোপাল বলেন, তবু বলি, বুড়ো বয়সের মা-বাপকে যদি ছেলেরা নিজের ছেলেমেয়ের মতো না দেখে তবে সংসারও বনবাস। ভাত-কাপড়টাই কি বড় কথা, মর্ম না বুঝলে ভাত-কাপড় দিয়ে কী হবে!

ননীবালা শ্বাস ফেলে বলেন, ভিতরের ঘরে এসে বোসো। ওভাবে বাইরের ঘর থেকে চলে যাও, ও আমার ভাল লাগে না।

ব্রজগোপাল উঠলেন।

ননীবালা ঘরে এসে নিজের বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে বসালেন ব্রজগোপালকে। বললেন, শরীরটা তো ভাল নেই দেখছি।

না। ব্রজগোপাল বলেন, গত সপ্তাহেও ব্যথাটা উঠেছিল। নইলে তখন আসবার কথা।

বুকের ব্যথাটা নাকি?

হ্যাঁ।

প্রায়ই হচ্ছে, চিন্তার কথা।

ব্রজগোপাল শান্তস্বরে বলেন, ওটা ছাড়া আর কোনও উপসর্গ নেই।

নেই কেন? এবার তো নিজের চোখে দেখে এলাম, খাওয়া অর্ধেকেরও কম হয়ে গেছে। অত কম খেলে চলে নাকি?

ওতেই বেশ থাকি।

দুধ-টুধও তো পেটে পড়ে না। বহেরুর কত গোরু!

ব্রজগোপাল হাসলেন, ওর মধ্যে আমারও আছে দুটো। হরিয়ানার দুটো গাই কিনেছিলাম দু'হাজার টাকায়। দেখোনি, না?

না! বলোনি তো!

ভুলে গেছি হয়তো! বুড়ো বয়সে সব মনে থাকে না।

তা সে গোরুর দুধ খায় কে?

বহেরু বেচে দেয়, কিছু আমাকেও দিয়ে যায়।

ননীবালা আবার একটা শ্বাস ফেলে বলেন, সবই তো করলে, কিন্তু ভোগ-দখল যে কে করবে!

কে আর করবে! যেই করুক, ভাবব যে আমার আপনজনই করছে। দুনিয়ার কেউ পর নয়।

ননীবালা মেঝেয় বসে চৌকির তলা থেকে সুটকেস টেনে বের করে সযত্নে ধুলোটুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুছছিলেন। ব্রজগোপাল বসে আছেন চৌকির ওপর। আড়চোখে দেখলেন।

ননীবালা ডালা খুলে টুকিটাকি জিনিসপত্র বের করে রাখলেন। ট্রাঙ্ক খুলে শাড়ি-সেমিজ বের করে থাক করতে থাকেন বিছানায়। কাজকর্ম করতে করতেই বললেন, আর মন টিকছে না।

কোথায়?

এখানে।

কেন? সবিস্ময়ে ব্রজগোপাল বলেন।

বুঝতেই তো পারো। এতকাল গতর পাত করে দিলাম যাদের জন্য তারা মা বলে ভাল করে ডাকে না পর্যন্ত। বউমা এমন কথাও বলে, রণো যে পাগল হল সে নাকি আমার জন্যই। ছোট ছেলেও কত কথা শোনায়! এখন শুনছি, সে নাকি আমেরিকা না কোথায় চলে যাবে।

ব্রজগোপাল চমকে উঠে বলেন, তাই নাকি?

বলছে তো। ভাল করে জিজ্ঞেস করিনি কেন যাবে। করলে হয়তো বলবে, আমার জন্যই সংসারে অশান্তি, তাই পালাতে চাইছে।

ব্রজগোপাল করুণাভরে বলেন, এখন তবে কী করবে?

তোমার মতো বেড়াল-পার হব।

তার মানে?

ননীবালা একটা গভীর শ্বাস ছেড়ে বলেন, শেষ পর্যন্ত মেয়েমানুষের জায়গা কোথায় তা কি জানো না?

জানি। সেটা কি বুঝতে পেরেছ ননীবউ?

না-বুঝে যাব কোথায়? দুরমুশ দিয়ে ছ্যাঁচা ছ্যাঁচা করে সংসার জানিয়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া—

বলে থামেন ননীবালা।

ব্রজগোপাল উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকান।

ননীবালা ম্লান হাসি আর চোখের জলে উজ্জ্বল একরকম অদ্ভুত মুখে চেয়ে বলেন, তোমার জন্যও তো কিছু করিনি। খুব স্বাবলম্বী মানুষ হয়েছ, দেখে এসেছি। তবু আমি বেঁচে থাকতে তুমি নিজের হাতে রাঁধলে বাড়লে, কাপড় কাচলে আমি যে পাপের তলায় পড়ি।

॥ একাত্তর ॥

ছেলেটা সারাদিন ঘুমোয়। আর ঘুমের মধ্যে কখনও-সখনও গাল ভরে হাসে, কখনও ভ্রূ কুঁচকে কান্না-কান্না মুখভাব করে।

শীলা বলে, ওদের পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে, জানো!

কথাটা অবিশ্বাস করতে পারে না অজিত। সে যদিও পূর্বজন্ম মানে না, তবু এখন তার মনে হয়—হবেও বা। নইলে এক মাসও পুরো বয়স হয়নি যে শিশুর সে অমন চমৎকার ঘুম-হাসি হাসে কী করে! আধখানা ঠোঁটে বেশ একটু শ্লেষ বা বিদ্রূপের হাসি।

অজিত যেটুকু সময় পায় বিছানার পাশে বসে থাকে। এই এতদিনে সে নিজস্ব একটা মানুষের জন্ম দিতে পারল। নিজস্ব মানুষ, ছেলে। তারই অন্তর্গত বীজ থেকে প্রাণ পেয়ে শীলার জঠর বেয়ে এসেছে। কী সাংঘাতিক কাণ্ড! ভাবতে বসলে থই পাওয়া যায় না। তার ভিতরে ছিল, শীলার ভিতরে ছিল! তাদেরই রক্ত মাংস প্রাণ থেকে, ঠিক যেমন একটা আগুনের শিখা থেকে আর-একটা ধরিয়ে নেওয়া, সে-রকম।

শীলা আজকাল হাঁটাচলা করে অল্পস্বল্প। এ-ঘর ও-ঘর করে। নতুন একটা রান্নার মেয়েছেলে রাখা হয়েছে, বাচ্চা ঝিটা সারাদিন বাচ্চার খিদমদগারি করে।

ছেলের নাম রাখার জন্য একটা পৌরাণিক অভিধান কিনে এনে ক'দিন ধরে ঘাঁটছে অজিত। রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণ যা পাচ্ছে কিনে আনছে। কোনও নামই পছন্দ হচ্ছে না। বই রেখে কখনও ছেলের মুঠো পাকানো ঘুমন্ত হাত দু'খানার দিকে চেয়ে থেকে বলে, ব্যাটা বক্সার হবে নাকি শীলা? সব সময়ে ঘুঁষি পাকিয়ে থাকে কেন?

শীলা বলে, গুন্ডার ছেলে গুন্ডাই হওয়ার কথা।

আমি গুন্ডা?

গুন্ডাই তো। যা গুন্ডামিটা করো আমার সঙ্গে!

অজিত দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বলে, ছেলেটা খুব চিন্তাশীল বলেও মনে হয়। ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবে বলো তো সবসময়ে?

শীলা ধমক দিয়ে বলে, সব সময়ে অত চেয়ে থেকো না তো! বাপ-মায়ের নজর খুব খারাপ। মা-ও সেদিন আমাকে বলে গেছেন, জামাই অত ছেলের দিকে চেয়ে থাকে কেন রে! ও-সব ভাল নয়।

ছেলেটার গা থেকে পাতলা চামড়া উঠছে। তালুতে আর গায়ে চুপচুপে করে তেল মাখানো। ঘানির সরষের তেল টিন ভরে কিনে এনে রেখেছে অজিত। ইটালিয়ান অলিভ অয়েলও। যে যা বলছে কিনে আনছে।

শীলা বলে, আদেখলা।

অজিত বলে, তুমিও কম কি?

দু'জনেই তারপর হাসে।

ঘুমের মধ্যেই বাচ্চাটা দুধ খায়, ঘুমের মধ্যেই কাঁথা ভেজায় দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার, ঘুমের মধ্যেই চমকে চমকে ওঠে।

অজিত বিরক্ত হয়ে বলে, ও এত ঘুমোয় কেন?

শীলা বলে, চুপ চুপ। বাচ্চারা যত ঘুমোয় ততই ভাল। দশমাস ধরে পেটের মধ্যে যা ফুটবল খেলেছে তোমার গুন্ডা ছেলে, ঘুমোবে না?

একটা হালকা বালিশ বুকের ওপর চাপিয়ে রাখে শীলা। অজিত ভয় পেয়ে বলে, সাফোকেশন হবে যে!

না গো, ভার রাখলে আর চমকায় না।

অজিত ছেলেটার শব্দ শুনতে চায়, হাসি কান্না কথা বা যেমন হোক শব্দ। কিন্তু অত ঘুম বলে বাড়িটা নিস্তব্ধ থাকে। বাচ্চাটা কাঁদেও কম। যতটুকু সময় জেগে থাকে ততটুকু সময় ধরে অল্পস্বল্প হাত-পা নাড়ে। ভাল করে কোনও কিছুর দিকে তাকাতে পারে না। কী ভীষণ অসহায়! এ-সব ভাবলে বুকের মধ্যে মায়া চলকে চলকে ওঠে। প্রতিদিন ভয়ংকর প্লাবনের মতো বুক ভাসিয়ে দিয়ে মায়ার জল বাড়ে। পিপাসা বাড়ে। এই তার ছেলে, তার আপন মানুষ। তার সৃষ্ট।

সৃষ্ট? না, তা তো নয়। অজিত ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে বসে। এই ছেলেটার জন্মরহস্যটুকুই মাত্র সে জানে। জানে, সে এর জন্মের কারণ। কিন্তু ওর ওই ছোট্ট শরীরের লক্ষ কলকবজা, ওর চেতনা ও প্রাণ—এ তো তার সৃষ্টি নয়। তাকে দিয়ে কে যেন ওকে সৃষ্টি করেছে। যে করেছে সে কে? ঈশ্বর?

শোনো শীলা।

উঁ।

জায়া মানে জানো?

জানি। বউ।

দূর! হল না।

তবে কী?

জায়া মানে যার ভিতর দিয়ে পুরুষ আবার জন্মায়। এই যেমন আমি তোমার ভিতর দিয়ে ওই ছেলেটা হয়ে জন্মেছি।

ও।

এইসব অদ্ভুত রহস্য ক্রমে ধরা পড়ছে অজিতের কাছে। সে আজকাল অল্পস্বল্প টের পায় যে, বাস্তবতার অতিরিক্ত একটা শক্তির অস্তিত্ব আছে। সে শক্তিই হয়তো প্রকৃতি বা ঈশ্বর।

ক'দিন আগে ছেলেটা খুব হাঁচত। ভয় পেয়ে গিয়েছিল অজিত। খুব শিশুদের সর্দি হলে বাঁচানো মুশকিল। ওরা তো শ্লেষ্মা তুলতে পারে না, দম আটকে মরে-টরে যেতে পারে। শিশুদের সর্দি বড় ভয়ের।

তাই ছেলের হাঁচি দেখে অজিত উদ্বিগ্ন হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, হায় ভগবান! ওর যে সর্দি হয়েছে।

লক্ষ্মণ ঘরে বসে ছিল। বলল, দূর বোকা, ও সর্দি নয়। সদ্য হয়েছে তো, ওদের বুকে গলায় নানা রকম কনজেশন থাকে। হাঁচি দিয়ে বের করে দেয়।

অজিত রুখে বলল, তুই জানলি কী করে? তোর কখনও ছেলে হয়েছে?

ও-সব বুঝতে কমন সেন্সই যথেষ্ট।

পরে অজিত জেনেছে, লক্ষ্মণের কথাই ঠিক। লক্ষ্মণের কমন সেন্স বরাবরই অদ্ভুত। মানুষকে অনেক ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দিতে পারে লক্ষ্মণ। অজিতকে বরাবর দিয়েছে।

ছেলেটার গায়ে একটা অদ্ভুত আঁতুড়ের গন্ধ। এত মিষ্টি গন্ধ আর কখনও পায়নি অজিত। প্রায়ই সে ছেলের শরীরে নাক ডুবিয়ে বুক ভরে গন্ধ নেয়। আর খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওর গা। তেল চোবানো বলে ছেলেটার গলার খাঁজে ময়লা, মুঠো খুললে হাতের রেখায় রেখায় ময়লা জমে থাকতে দেখা যায়। প্রায়দিনই ওকে স্নান করানো হয় না। শীলা গ্যাদড়া বাচ্চাকে নাড়াচাড়া করতে ভয় পায়। দু'-চার দিন পর পর ননীবালা আসেন, রোদ্দুরে নিয়ে গিয়ে গরমজলে স্নান করান। দৃশ্যটা ভয়াবহ। এক হাতের চেটোয় বাচ্চাটাকে অনায়াসে ধরে থাকেন, বাচ্চাটা ন্যাতার মতো বেঁকে ঝুলে কাঁদতে থাকে, অন্য হাতে গামছায় জল নিয়ে ওর শরীর ঘষতে ঘষতে ননীবালা নাতির উদ্দেশে কত যে কথা বলেন। স্নান করিয়ে পাউডার আর কাজল দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যান।

অনেক দিন স্নান হয়নি বাচ্চাটার। ননীবালাকে একটু খবর দিতে হবে।

লক্ষ্মণ দিন দশেক ধরে মুম্বই আর দিল্লি ঘুরে এল। এক বছরের মধ্যেই ও পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে আসতে চায়। সেটা ঠিক করে যাওয়ার জন্যই এবার এসেছে।

দিল্লি থেকে ফিরে একদিন ম্লান মুখে এসে বললে, অজিত, বড় মুশকিলে পড়ে গেলাম।

কীরে?

ভাবছিলাম, এ দেশে একটা চাকরি বা পজিশন পেলে ফিরে আসব। কিন্তু পাচ্ছি না।

কেন?

আমার লাইনের বেশি প্রজেক্ট তো এখানে হয়নি। যা দু'-চারটে আছে সেখানে সব উপযুক্ত লোক রয়েছে। তাই ভাল পজিশন পাচ্ছি না।

তা হলে?

মুশকিল হল। এ-রকম হলে ফিরে আসা শক্ত। ওখানে আমার মাইনেই শুধু বেশি নয়, কাজ করারও অঢেল সুযোগ। কী করি বল তো!

কী করবি?

আমি তো চলে আসতেই চাই। কিন্তু মোটামুটি একটু ভাল জায়গা না-পেলে চলবে কী করে? ওখানে আমি অনায়াসে সিটিজেনশিপ পেয়ে যেতে পারি এখন। ইচ্ছে করেই নিইনি। কিন্তু যদি এখানে কিছু মেটেরিয়ালাইজ না করে তবে বাধ্য হয়ে এবার সেটা নিয়ে ওখানেই থেকে যেতে হবে।

যাঃ।

খুব মন খারাপ হয়ে যায় অজিতের। লক্ষ্মণ আশা দিয়েছিল যে ও ফিরে আসবে। সেটা একটা মস্ত জিনিস অজিতের কাছে। লক্ষ্মণ নিজেও বুঝি জানে না যে ও অজিতের কী ভীষণ প্রিয় ও আপন।

লক্ষ্মণ, এ কিছুতেই হতে পারে না। আমি ভীষণ লোনলি ফিল করি।

লক্ষ্মণ হেসে বলে, জানি।

তোকে আসতেই হবে।

আমিও তো চাই। কিন্তু পারছি না যে।

লক্ষ্মণ প্লিজ! অজিত ভীষণ অস্থির হয়ে বলে।

॥ বাহাত্তর ॥

ননীবালা কেন সুটকেস গোছাচ্ছেন তা অনুমান করতে ভয় পাচ্ছিলেন ব্রজগোপাল। নিপাট ভালমানুষের মতো বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে করে বললেন, শোনো, এখন বয়স হয়েছে। তোমারও, আমারও।

ননীবালা মুখ তুলে বলেন, সে তো জানি। বলছ কেন?

এখন হুট করে কিছু করতে নেই, দৃষ্টিকটু দেখায়।

ননীবালা একটু শ্বাস ছাড়লেন। সুটকেস যেমন গোছাচ্ছিলেন তেমনই গোছাতে লাগলেন। বললেন, হুট করে নয়। অনেক দিন ধরেই এটা ভেবে আসছি। আজকাল আর মন টেকে না এখানে। ছেলেপুলে নাতি-নাতনি সব থেকেও কেমন হাঁফ ধরে যায়। মনে হয় আমি বুঝি বাড়তি মানুষ।

ব্রজগোপাল ধীরগম্ভীর স্বরে বলেন, সে তো ঠিকই। তবু এমন কিছু কোরো না যাতে ওদের সামনে একটা কু-দৃষ্টান্ত থাকে। সংসারে সবসময়েই সব কাজেরই নিন্দে হয়।

ননীবালা তাঁর বিখ্যাত বড় বড় চোখে অপলক চেয়ে রইলেন ব্রজগোপালের দিকে। তারপর আস্তে করে বলেন, আমাকে বোকা ভাবছ! না? ভাবছ আমি এই বুঝি ঘাড়ে চেপে বসলাম পেতনির মতো।

ব্রজগোপাল উদারভাবে হেসে বলেন, আমি এই কথাটারই ভয় পাচ্ছিলাম। তোমাকে তো চিনি। আর তোমারই বা কথা কী, দুনিয়ার বোধহয় সব মেয়েমানুষই ওইরকম করে ভাবতে শেখে। সংসারে কারও কাছে তার ওজন কমে গেল বুঝি কখন।

ননীবালা সুটকেসের ডালা বন্ধ করে বলেন, আমি ঠিক জানতাম, তুমি ভাল মনে আমাকে আর নিতে পারবে না। একেবারেই কি সংসারের বাইরে চলে গেলে? আর কি কখনও বাউন্ডুলেপনা ছাড়তে পারবে না?

ব্রজগোপাল তটস্থ হয়ে বলেন, ও-সব কথা থাক না। আমার কথা তো একটা জীবন ধরে সবাইকে বলে বেড়িয়েছ। আমি যা ঠিক তাই। ও নিয়ে আর উত্তেজিত হোয়ো না। বলি কী, যাবেই যদি তো সবাইকে আগে থেকে বলেকয়ে রাজি করিয়ে তারপর চলো। আমিও তো পথ চেয়েই আছি। বুকে মাঝে মাঝে ঠেলা ধাক্কা লাগছে, কবে কী হয়ে যায়! শেষ বয়সটা না-হয় তুমি আমার কাছেই একটু কষ্ট করে...

ব্রজগোপাল আর বলতে পারলেন না। গলাটা ধরে এল। সহজে বিচলিত হন না। কিন্তু এখন হলেন। বারবার গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন। এ-সব দুর্বলতা কেন যে এখনও রয়ে গেছে! সকালে খুব সুন্দর একটি প্রণাম নিবেদন করে এসেছেন ঠাকুরকে। ভেবেছিলেন, সংসারের কাছে তাঁর সব প্রত্যাশা বুঝি চুকেবুকে গেছে। কিন্তু যায়নি তো। বুকের কোন গর্ত থেকে এই দুর্বলতার কালসাপ বেরিয়ে এল!

ননীবালা অত্যন্ত কূটচক্ষে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ উঠে পাশে এসে বসে পিঠে আলতো হাত ছুঁইয়ে বললেন, কেন অত পাষাণ হওয়ার চেষ্টা করো বলো তো! তোমার মতো মানুষ কি কখনও এ-রকম হতে পারে। সংসারের দিক থেকে যতই চোখ ফিরিয়ে থাকো, তোমাকে আমি চিনি।

ব্রজগোপাল সামলে গেলেন। হেসে বললেন, ভাল, ভাল।

ভালই তো। তুমি ভেবো না, আমি যে তোমার কাছে চলে যাব এ-কথা আমি আগে থেকেই গেয়ে রেখেছি। আমার আর ভাল লাগে না। তোমার ছোট ছেলেটা কোনও দিনই আমাকে দেখতে পারে না। তার ধারণা তোমাকে আমিই পর করেছি। তাই ভাবি, তোমার কাছে গিয়ে থাকলে বোধহয় তার মন পাব। নইলে ও ডাকাত ঠিক আমেরিকা না কোথায় চলে যাবে।

ব্রজগোপাল আবার হেসে বলেন, বেশ ব্যবসাবুদ্ধি তোমার। ছেলের মন পাওয়ার অত চেষ্টা

করো কেন? এটা ঠিক জেনো, তুমি যত ওদের ভালবাসবে তার অর্ধেক তোমাকে ভালবাসার ক্ষমতাও ওদের নেই। স্নেহ নিম্নগামী, এ তো জানোই।

ননীবালা ব্রজগোপালের পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে পানের বাটা খুলে বসলেন।

বললেন, ছেলেদের জন্য অনেক করেছি। তুমি ঠিকই বলেছ, অত করতে নেই। তাই এবার একটু দূরে সরে যেতে চাইছি। তাইতে হয়তো সম্পর্কটা ভাল থাকবে।

ব্রজগোপাল হাসিমুখে মাথা নেড়ে বললেন, কিংবা হয়তো সম্পর্ক থাকবেই না। সোমেন যখন আমার কাছে প্রথম গেল তখন চিনতে কষ্টই হচ্ছিল। বাবা বলে ডাকল, খুব আশ্চর্য লাগছিল শুনে। আমারই ছেলে, তবু সম্পর্ক রাখত না বলে কত পরের ছেলের মতো হয়ে গেছে। ছেলেরা সম্পর্ক রাখবে কেন, ওটা তো তাদের দায় নয়। চোর-দায়ে ধরা পড়েছে যত মা-বাপ।

ননীবালা মুখখানা ম্লান করে বললেন, না গো, ও-রকম ভাবা তোমার ভুল হয়েছে। সোমেন ফিরে এসে থেকেই তোমার কথা কত বলেছে। আমার ওপর সে কী চোটপাট! বড় হয়ে বুঝতে পেরেছে তো বাপ কত আপন! সেই বাপকে সংসার পর করে দিয়েছে এটা ও সইতে পারে না। ওকে খারাপ ভেবো না। একটু রাগী আর গোঁয়ার ঠিকই, কিন্তু মনটা ভাল।

ব্রজগোপাল পায়ের ওপর পা তুলে বসে ছিলেন। গ্রীষ্মকালে ডাবের জল খেলে যেমন ভিতরটা ঠান্ডা হয়ে যায়, এ-কথা শুনে তাঁর ভিতরটাও তেমনি ঠান্ডা হচ্ছিল। কথাগুলি তিনি পান করছিলেন পরম আনন্দে।

বললেন, মায়েদের ওই দোষ। ছেলেদের কেউ কিছু ভালমন্দ বলতে পারবে না, এমনকী বাপও নয়। ওই করেই তোমরা ছেলেপুলে নষ্ট করো।

ননীবালা ব্রজগোপালের কণ্ঠের স্নিগ্ধতা লক্ষ করে হেসে ফেলে বলেন, সেও ঠিক কথা। আমরা মায়েরাই নষ্ট করি। তুমিও তো ওইরকম মায়ের আদর পেয়েই বাউন্ডুলেপনা করে বেড়াতে। সে-কথা ভুলে যাও কেন!

ব্রজগোপাল অন্যমনস্কভাবে মনশ্চক্ষে এক জগদ্ধাত্রীর রূপ দেখতে পেলেন। বয়সের ভার, বিস্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে সেই বিসর্জিত প্রতিমার স্মৃতি আজও দেখা দেয়। গাঢ়স্বরে বললেন, মা! মায়ের মতো জিনিস আছে!

বহুকাল পরে সেই মা-ন্যাওটা শিশুর মতোই বুকটা আকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় মরার তো দেরি নেই। মরে মায়ের কাছে যাব। মা কত নাড়ু মোয়া করে রেখেছে!

ননীবালা বললেন, শোনো, আমি যা ঠিক করেছি তার আর নড়চড় হবে না। আমি যাবই। তুমি একটু বোসো, সোমেন দুপুরে খেতে আসবে। ওকে সব বুঝিয়ে বলে আমি যাব। বীণা আর রণোকে দুই খোট চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। ভয় পেয়ো না, ওরা কিছু মনে করবে না।

যাবেই?

হুঁ। নইলে সম্মান থাকে না। তোমারও আমাকে দরকার। বহেরুর ওই ভূতের রাজ্যে কে তোমাকে দেখে বলো তো! ঘাড়ের বোঝা মনে করো, পেতনি ভাবো, তবু জেনো আমার চেয়ে আপনার তোমার কেউ নেই।

ব্রজগোপাল উত্তর করলেন না। শুধু অস্ফুট 'হুঁ' দিলেন।

ননীবালা উৎকণ্ঠায় বললেন, কী ? কিছু বলছ না যে!

বড় হুট করে ঠিক করলে তাই ভাবছি। ঠিক আছে গুছিয়ে নাও।

ননীবালা অবহেলার ভাব করে বললেন, গোছানোর আর কী! তেমন কিছু নিজের বলতে নেইও। সবই রণোর সংসারের। এই দু'-চারখানা জামা-কাপড়...

কড়া নড়ল। ননীবালা উঠে গিয়ে সদর খুললেন। বিভ্রান্তের মতো সোমেন ঘরে এসে ঢুকেই থমকে গেল।

বাবা।

আয়।

সোমেন ভরদুপুরের ক্লান্ত মুখশ্রী ভেঙে ফেলে খুব খুশির একটা হাসি হেসে বলল, কখন এলেন? কেমন আছেন বাবা!

ব্রজগোপাল মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন।

॥ তিয়াত্তর ॥

ননীবালা সোমেনকে বললেন, তুই স্নান করে আয়। খেতে দিই।

সোমেন জামা-গেঞ্জি ছেড়ে প্যান্ট পরে পাখার তলায় মেঝেয় বসে বলল, উঃ, দাঁড়াও একটু জিরিয়ে নিই। দাদা-বউদিরাও তো দুপুরেই ফিরবে. একসঙ্গে খেতে দিয়ো।

বলে চৌকিতে বসা বাবার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলল, আপনার সেই বুকের ব্যথাটা আর হয় না তো বাবা?

না না। বেশ ভাল আছি।

বলে ব্রজগোপাল চোখ সরিয়ে নিলেন।

সোমেন অন্যমনস্কভাবে মেঝেয় রাখা সুটকেস দেখছিল। মা হয়তো কিছু বের-টের করছিল। হাত দিয়ে সে সুটকেসটা চৌকির তলায় ঠেলে দিল ফের।

ননীবালা পানের পিক ফেলে এসে বসলেন। বললেন, বুঝে-সমঝে থাকিস। তোর তো আবার হুট বলতেই মাথা গরম হয়। কিন্তু মা ছাড়া তো আর কেউ তোমার রাগের মর্ম বুঝবে না। তাই বলছি, রাগ-টাগগুলো এবার যেন কম কোরো।

সোমেন অবাক হয়ে বলল, তার মানে? কীসের রাগের কথা বলছ?

ননীবালা চোখের জল মুছলেন আঁচলে। তারপর ভার-ভার মুখখানা সোমেনের দিকে ফিরিয়ে খুব অস্ফুট গলায় বললেন, আমি চলে যাচ্ছি বাবা।

সোমেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। এতকালের মা, যাকে ছাড়া তার এক মুহূর্ত চলে না, সেই মা কোথায় যাবে?

সে বলল, কোথায়? বাবার কাছে নাকি!

ননীবালা আঁচলে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

ব্রজগোপাল সামান্য অস্বস্তি বোধ করে বললেন, ওর খুব ঝোঁক চেপেছে বনবাসী হবে আমার মতো। আমি বলছিলাম যা করো একটু ভেবেচিন্তে করো। তোমাদেরও মতামতের দরকার। মা-বাপ বুড়ো হলে ছেলেপুলেরাই তাদের অভিভাবক হয়। এখন তোমরা বিবেচনা করে দেখো—

অবাক ভাবটা সামলে নিল সোমেন। হঠাৎ তার খুবই ভাল লাগছিল ব্যাপারটা। এতকাল তাদের সংসারে কোথায় যেন একটা ছেঁড়া তারে বেসুর বেজেছে। কী যেন একটা অসঙ্গতি দৃষ্টিকটু হয়ে থেকে গেছে বরাবর। এতকাল পরে সেটা বড় স্পষ্ট ধরা দেয়। ঠিকই তো! মা কেন বাবাকে ছেড়ে থাকবে! থাকা উচিত নয়। বোধহয় এই একটা কারণেই, মাকে ভালবেসেও এতকাল ধরে মা'র প্রতি একটা অলক্ষ্য বিতৃষ্ণাও রয়ে গেছে তার বুকের মধ্যে। তাই সে মা থাকবে না জেনেও খুব একটা দুঃখ পায় না।

ব্রজগোপালের দিকে চেয়ে সোমেন বলে, আপনার মতই মত।

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, না না, সেটা কোনও কাজের কথা নয়। আমাদের বুড়ো বয়সে কত মতিভ্রম হয়।

সোমেন হাসল একটু। বড় হয়ে প্রথম যেদিন বাবার কাছে গিয়েছিল গাঁয়ে, সেদিনই তার মনে হয়েছিল, এই ব্রজগোপাল মানুষটির মধ্যে কিছু মৌলিক মানবিকতা আছে, যা তাদের নেই। ব্রজগোপাল অনেক কথা বলেন যা গ্রহণীয় নয়, যা কখনও হাস্যকর। তবু এ মানুষটা যে-মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন তা বড় দেশজ।

সোমেন হেসেই বলে, কিন্তু আপনি তো না ভেবেচিন্তে কিছু করেন না। আমরা হুটহাট অনেক কথা বলে ফেলি, তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিই। আপনি সবই আগে থেকে ভেবে রাখেন। মায়ের যাওয়া যদি আপনি ভাল বোঝেন আমারও খুব সায় আছে। আরও আগে হলে ভাল হত। অবশ্য সবচেয়ে ভাল হত, আপনি আমাদের কাছে চলে এলে।

এই কথায় ননীবালা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, না না, সংসারে না থেকে উনি ভালই করেছেন। এ বড় ছোট জায়গা বাবা। এতকাল ধরে দেখছি।

ব্রজগোপাল ছেলের চিক্কণ সুন্দর মুখশ্রী অবলোকন করতে করতে কিছু ধীরস্বরে বলেন, সংসারের বাইরে একটা জায়গা করে রাখা সব মানুষের পক্ষেই দরকার। ঠিক সময় বুঝে সরে যেতে হয়। এই সরে যাওয়াটার মানে অনেকে বোঝে না। আমার মনে হয় সময় মতো সরে যাওয়াটাই হচ্ছে বিচক্ষণের কাজ, তাতে কারও ভালবাসা হারাতে হয় না, নিরন্তর মানুষের সংসারের জায়গা ছোট হয়ে আসে—সেই জায়গা দখল করে থেকে বিরক্তি উৎপাদন করারও দরকার পড়ে না। বানপ্রস্থের ব্যবস্থা খুব মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানসম্মত। বন মানে বিস্তার। সংসার ছেড়ে বৃহৎ সংসারে চলে গেলে আনন্দও পাওয়া যায়। মনটাও সজীব থাকে।

সরে যাওয়ার কথাটা ভালই লাগছিল সোমেনের। বানপ্রস্থের কথাটা খট করে কানে লাগল। বুড়ো বয়সের ওই দোষ। সব প্রাচীন প্রথার মধ্যে আশ্রয় খোঁজার অভ্যাস। তবু বাবাকে ঠিক সে-রকম ভাবতে কষ্ট হয় সোমেনের । যদিও বাবাকে খুব ভাল করে জানা হয়নি তার আজও, কারণ তারা মানুষ হয়েছে মায়ের আঁচলের তলায়। বাবাকে ঠিকমতো চেনাই হয়নি। বাবা শাসন করতেন না, আদরও বড় একটা নয়। তবে খুব শান্ত গলায়, ভালমানুষের মতো কথা বলতেন ছেলেদের সঙ্গে। কারও সম্মান কখনও ক্ষুণ্ণ করেননি। ছেলেপুলেরাও যে সম্মান পাওয়ার অধিকারী এটা ব্রজগোপাল বরাবর বুঝতেন। বাবার হাতে চড়চাপড় বা ধমক খেয়েছে এমনটা মনেই পড়ে না তার। ব্রজগোপাল যখন স্থায়ীভাবে গোবিন্দপুরে চলে গেলেন তখনও তেমন কোনও দুঃখ পায়নি তারা। কিন্তু সোমেন বড় হয়ে ব্রজগোপালকে দেখেই এই নির্বাসিত লোকটির প্রতি বড় একটা আকর্ষণ টের পেয়েছে। সফল এবং ধনী পিতাকে সব ছেলেই কিছু সমীহ করে, ব্রজগোপালের সেদিক থেকে কিছু নেই। যা আছে তার কোনও মূল্য এখনকার সমাজ দেয় না। সে হল চরিত্র। আজ সোমেন বাবার ভিতরে সেই খাঁটি সোনার পুরনো গয়নার মতো অপ্রচলিত জিনিসটির প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করে। বাবার আর-কিছু না থাক, লোকটি বড় ভাল। এ লোকটা ভুলেও এক পয়সা চুরি করবে না, একটা মিথ্যে কথা বলবে না, কাউকে আঘাত করবে না।

সোমেন বলল, কেন বাবা, আপনাকে কি আমরা অনাদর বা অসম্মান করব এই ভাবেন?

না, তা নয়। ব্রজগোপাল হাসেন, তোমরা তা করবে কেন? তেমন বাপের ছেলে নও তোমরা। ব্যাপারটা হল, আমি তো বরাবরই একটু বারমুখী। আমার কেমন আটক থাকতে ভাল লাগে না। কিন্তু তা বলে স্নেহ কিছু কম ছিল না তোমাদের প্রতি, ঠাকুর জানেন। তো আমি ভাবলাম, এই স্নেহটুকুই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সংসারে এই স্নেহটুকু বুকে নিয়েই সরে যাওয়া ভাল। তা হলে সেটুকু বাঁচে। নইলে নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে কবে মন মরে যায়। আমি বাবা, বড় ভিতু মানুষ। স্নেহের কাঙাল। তুমি বরং স্নানটান করে নাও। বেলা হল, আমি বসিয়ে রাখছি।

সোমেন উঠল। মুখ কিছু বিষণ্ণ। আবার বিষণ্ণতার ভিতরেও একটু তৃপ্তিময় আনন্দ।

শরতের বেলায় বড় রোদ। সারা সকালটা সোমেন পুড়েছে ঘুরে ঘুরে। বাথরুমে খুব বেশি জল

নেই। তাই সাবধানে জল বাঁচিয়ে স্নান করছিল। আর ভাবছিল। মা চলে গেলে ঘরটা তার একার হবে। আবোল-তাবোল বকে মাথা ধরিয়ে দিত মা। আর দেবে না। মাকে অনেক বকেছে সোমেন। ইদানীং সবচেয়ে বেশি রাগ হত মায়ের প্রতি। একটামাত্র নিরাপদ রাগের জায়গা। সত্যি কথা, আর কে তার রাগ বা অভিমানকে পাত্তা দেবে? তা হোকগে, সংসারে চিরকাল মা-মা করলে হবেও না। তার সামনে বিপুল পৃথিবী পড়ে আছে। সে না আমেরিকায় চলে যাবে চিরদিনের মতো? সংসারের ছোটখাটো দড়িদড়া ছিঁড়ে এবার জেটি ছেড়ে বারদরিয়ায় গিয়ে পড়তে হবে। সে তো আর ছেলেমানুষ নেই! কয়েকটা দিন একটু ফাঁকা লাগবে, কষ্ট হবে। তা হোকগে।

স্নান করতে করতেই টের পেল, দাদা-বউদি আর বাচ্চারা ফিরেছে। খুব হইচই হচ্ছে।

স্নানের ঘর থেকে বেরোতেই বউদি তাকে নিজের শোওয়ার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। নিচু গলায় বলল, কী ব্যাপার বলো তো! মা নাকি আজই চলে যাচ্ছেন!

তাই তো শুনছি।

রাগটাগ করেননি তো!

আরে না। মা তো অনেক দিন থেকেই যাব-যাব করছে।

বীণা মুখখানা শুকনো করে বলে, সে তো অনেক কথা বলেন রাগের মাথায়। সব কি ধরতে আছে?

সোমেন আস্তে বলল, যেতে দাও। তাতে ভালই হবে।

বীণা মাথা নাড়ল। একটু ধরা গলায় বলল, না সোমেন, এটা ভাল হল না। লোকে মনে করবে, বউ শাশুড়িকে তাড়িয়েছে।

দূর। লোকের ভাবতে বয়ে গেছে। এটা কলকাতা, বনগাঁ নয়।

বীণা তেমনি বিষণ্ণ গলায় বলে, সেটা না হয় মানলাম, কিন্তু আমরাই বা কী করে থাকব? ক'দিন উনি ছিলেন না, তাইতেই বাচ্চারা ঠাম্মা ঠাম্মা করে অনাথ শিশুর মতো ঘুরে বেড়িয়েছে। এখন কী হবে?

সোমেন নিশ্বাস ফেলে বলে, ও-সব সেন্টিমেন্ট ছাড়ো তো। বাচ্চাদের সব সয়ে যায়। তা বলে মাকে আটকে রেখো না। বাবার কথা ভেবে ছেড়ে দাও। একা বাবার বড় কষ্ট।

বীণা উদাস গলায় বলে, কষ্ট হলেও ওঁর সয়ে গেছে। আমাদেরই কষ্ট হবে বেশি।

কথাটা শুনে একটু অবাক মানে সোমেন। বউদির সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক তো কোনওকালে তেমন ভাল ছিল না! মুখ ফসকে সে বলে ফেলল, কষ্ট হবে মানে? মা গেলেই তো তোমার সুবিধে, ক্যাটক্যাট করার লোক থাকবে না।

জলভরা চোখে, কান্না আর ভর্ৎসনা মেশানো চোখে তার দিকে তীব্রভাবে মুখ ফেরাল বীণা। চোখের জল গড়িয়ে নামল, সেটা মুছবার চেষ্টাও না-করে বলল, তাই মনে হয়, না? আমি পরের মেয়ে, তোমাদের মনে তো হবেই। আমার কথা না হয় বাদ দাও, তোমার দাদাকে গিয়ে দেখে এসো, তোমাদের ঘরে মা'র কোলে মুখ গুঁজে কেমন কাঁদছে। পাষাণ গলে যায়। যাও, দেখে এসো।

সোমেন উঠে এল।

সত্যিই দৃশ্যটা সহ্য করা যায় না। চৌকির ওপর মা বসা, তাঁর কোলে মাথা গুঁজে রণেন লম্বা হয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদছে। মা তার চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছে পাথর হয়ে। দু'চোখে জলের ধারা। ছেলেমেয়েরা ঠাকুমা আর বাবার দৃশ্যটার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

রণেন কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমিই তোমাকে তাড়ালাম মা। আমার সংসারে তুমি থাকতে পারলে না মা। কী করেছি বলো, আমাকে কেন ছেড়ে যাচ্ছ?

ননীবালা আকুল হয়ে বলেন, ওরে, ও-সব কী বলছিস? বলিস না, বলিস না। আমি সে-যাওয়া

যাচ্ছি নাকি? বুড়ো মানুষটা গতরপাত করে খায়, তার দিকটা একটু দেখে আসি।

সোমেন কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, এ তোমরা কী শুরু করলে বলো তো? যাবে তো একটুখানি দূরে। এবেলা-ওবেলা ঘুরে আসা যায়।

রণেন মাথা তুলল না। পড়ে রইল।

ননীবালা তার চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে থাকেন।

ব্রজগোপাল খুব গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিলেন। বোধহয় ভাবছিলেন যে, তিনি যখন চলে যান তখন কেউ এভাবে তাঁকে ধরে রাখার চেষ্টা করেনি।

সোমেন বাবার দিকে চেয়ে বলে, বাবা, আপনি একটু দেখুন। এত কান্নাকাটি ভাল লাগে না।

ব্রজগোপাল ছেলের দিকে তাকালেন। মাথা নেড়ে বললেন, ও খারাপ নয়। কান্না জিনিসটা ভাল। তুমি বরং খেয়ে নাও গে। যদি তোমার অসুবিধে না হয়, বরং হাওড়ায় তুলে দিয়ে এসো। তোমার মা যাবেনই, তাঁকে আটকানো যাচ্ছে না।

রণেন মুখ তুলে বলে, বাবা, আমাকেও নিয়ে যান সঙ্গে। আমি মাকে আর আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না।

ব্রজগোপাল এক বার কী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তারপর আবার সময় নিয়ে বললেন, তুমি বড় ভাল মানুষ বাপকুসোনা, তাই অত কষ্ট পাচ্ছ। মনটাকে শক্ত করো। মনকে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। পুরুষ মানুষ, ওঠো।

রণেন কোলে মাথা রেখেই বলে, আমার কেমন যেন মনে হয় বাবা যে, আমি খুব ছোট্ট হয়ে গেছি। আদুরে ছেলে। বড় মা-মা আর বাবা-বাবা করে প্রাণটা।

শুনে বুবাই হেসে ফেলল। টুকাই-ও। শুধু মেয়েটা ঠাকুমার দেখাদেখি কাঁদছিল। মেয়েরা কান্নার অভ্যাস নিয়েই জন্মায়। আর বীণা কখন অলক্ষ্যেতে নিঃশব্দে এসে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, দু'চোখে অঝোর জল, ফোঁপাচ্ছে। একটা হাত বাড়ালেন ননীবালা, বীণা নিঃশব্দে এসে বুক ঘেঁষে বসল।

ননীবালা তাকে বুকের সঙ্গে সিঁটিয়ে নিয়ে বললেন, বউমা, এই একটা অবোধকে রেখে যাচ্ছি, বুক-বুক করে রেখো। আর ওই ছোটটা ওকে ছেলের মতো—বুঝলে? কোনওটাই আমার পাকা মানুষ নয়, ন্যাংলা হাবলা।

বুবাই টুকাই ফের হেসে ওঠে ন্যাংলা হাবলা শুনে। সোমেন ওদের নড়া ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘর থেকে। বাইরের ঘরে এনে ধমক দেয়, হাসছিলি কেন? খুব হাসির ব্যাপার হচ্ছে ওখানে, না? দেব থাপ্পড়?

কাকাকে ওরা ভীষণ ভয় খায়। ভয়ে অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের পাতা ফেলছে না।

যা, ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধো।

সোমেন বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরায় দাদার প্যাকেট থেকে।

এ ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছিল সোমেন, ননীবালা বীণাকে বলছেন, না গো বউমা, হঠাৎ নয়। মনে মনে ঠিকই ছিল। যোগাযোগটা হঠাৎ হয়ে গেল। আজকের দিনটা পঞ্জিকায় সকালে দেখলাম বড় ভাল দিন। অমৃত যোগ আছে আর এই দিনেই হঠাৎ উনিও এসে পড়লেন। ভাবলাম, ঠাকুরই বুঝি যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। তা এই যোগাযোগ ছাড়ি কেন? রোজই যাব-যাব ভাবি, যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। এইবার হঠাৎ মনটা 'যাই' করে উঠেছে যখন, তোমরা তখন আর আটকে রেখো না। এই তো কাছেই, যখন খুশি আসব, তোমরাও যাবে।

খেতে খেতে অনেক দেরি হয়ে গেল। গল্প আর কথা আজ যেন আর শেষ হতে চায় না। বীণা নিজে ননীবালার বিছানা সাজিয়ে দিল, রণেন বাঁধল। গোছগাছেরও শেষ নেই।

কান্নাও চলছে। ফাঁকে ফাঁকে হাসি-ঠাট্টার কথাও। ননীবালা বললেন এক বার, ও বউমা, সব জিনিস যে দিয়ে দিচ্ছ বড়! তোমরাই তো পর করে দিলে দেখি!

এইরকম ভাবে সারাক্ষণ বাড়ি সরগরম রইল। বিস্তর পোঁটলাপুঁটলি বাক্স বিছানা সদরে জড়ো করে রেখে সোমেন ট্যাক্সি ডেকে আনল। কান্নাকাটিটা আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে দিল না সে। মাকে প্রায় কোলে করে টেনে নিয়ে ট্যাক্সিতে বসাল। ননীবালা কাঁদতে কাঁদতে রণেনকে বলেন, বাড়িটা শেষ করিস। পরের বাড়িতে আর কতকাল পরবাসী থাকবি? আমরা যেন দেখে যেতে পারি।

রণেন কাঁদছিল ছেলেমানুষের মতো হাউ-হাউ করে। কান্না দেখেই বোঝা যায়, তার ভিতরটা এখনও সুস্থির নয়। বীণা কাঁদছে, বাচ্চারাও। পাড়া-প্রতিবেশী বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছিল। কয়েকজন বয়স্কা মহিলা চোখের জল ফেলে গেলেন।

গাড়ি গড়িয়াহাটা ছাড়িয়ে এলে আর কাঁদছিলেন না ননীবালা। পানের বাটা খুলে একটা পান খেলেন। সোমেন ড্রাইভারের পাশে সামনে বসেছিল। পিছন ফিরে এক বার মাকে দেখে নিয়ে বলল, উঃ বাবা, তোমরা কাঁদতেও পারো। আমার মাথা ব্যথা করছে।

ননীবালা তাঁর বড় বড় চোখে ছেলেকে স্থিরভাবে একটু দেখে বললেন, শোনো ছোটকা, তুমি মাথা থেকে আমেরিকা তাড়াও।

খুব আদরের সময়ে কখনও-কখনও সোমেনকে ছোটকা বলে ডাকেন ননীবালা।

সোমেন বলে, কেন?

না। অত দূরে তোমাকে ছাড়তে পারব না। তা ছাড়া, রণেনের কী অবস্থা তা তো দেখছই! এ অবস্থায় ওকে ছেড়ে তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না। সুস্থির মাথায় সবটা বিবেচনা করো।

বাঃ, আমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই?

ব্রজগোপাল গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, বাবা, ওটা ঠিক কথা নয়। আমেরিকা তৈরি দেশ, তারা টাকা দিয়ে বিদেশি চাকর রাখবে। আর তোমার দেশ তোমারই, গরিব মায়ের হাল দেখে কুপুত্রই পালায়। পালানোর জন্য যেয়ো না। যদি বোঝো গিয়ে জ্ঞানী মানী হবে তো যেয়ো। সব কাজের পিছনে নিজের উদ্দেশ্যটা যাচাই করা ভাল। উদ্দেশ্য সৎ ও সাধু হলে মঙ্গলার্থে সব কাজই করা যায়। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণও পাপ। আর সৎ উদ্দেশ্যে নারীহরণও পুণ্য।

সোমেন উত্তর দিল না। মনটা খারাপ লাগছে।

হাওড়ায় বড় ঘড়ির নীচে বহেরু দাঁড়িয়েছিল বশংবদ। ব্যাপার দেখে সে হইচই করে উঠল, মা ঠাকরোন যাবেন! অ্যাঁ! চন্দ্রসূর্য ওঠে তা হলে! কী ভাগ্য আমাদের! ও ঠাকুর, কালই রাজমিস্ত্রি লাগাব ঘর পাকা করতে। ব্রাহ্মণকে গৃহদান করব। মহাপুণ্য!

টানা-হ্যাঁচড়া করে সে-ই মালপত্র তুলল গাড়িতে।

সন্ধের মুখে মুখে গাড়িটা ছাড়ল। মা-বাবাকে প্রণাম করে প্রায় চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে এল সোমেন।

তারপরই খুব ফাঁকা লাগতে লাগল। বহুক্ষণ সিগারেট খায়নি। সিগারেট ধরাতেই মাথাটা চন্-ন্ করে পাক খেল একটা। হু-হু করে উঠল বুক। ফাঁকা লাগছে।

অনেক দিন বাদে তার মনে হল, আজ বাসায় ফিরে খারাপ লাগবে। রোজই লাগে। তবু আজ যেন আগে থেকেই লাগছে।

ষোলো নম্বর বাস ধরে সোমেন আজ ইচ্ছে করেই রিচি রোডে নেমে গাব্বুকে পড়াতে না-গিয়ে রিখিয়াদের বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। অনেককাল দেখা হয় না।

॥ চুয়াত্তর ॥

অন্যমনস্ক সোমেন আজও গেট পেরিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল রিখিয়াদের বাড়িতে। হঠাৎ একটা মোটরের হেডলাইট পড়ল এসে সেই লেখাটার ওপর— প্রতিশোধ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ। কমরেড, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো, গড়ে তোলো ব্যারিকেড। লেখাটা নজরে পড়তেই চমকে উঠল সোমেন। এই লেখাটার কথাই চিঠিতে তাকে জানিয়েছিল মধুমিতা। দেওয়ালে এ ক'টা কথা লিখেছিল জিতু নামে একটা ছেলে, যে প্রথম মানুষ খুন করার শক সামলাতে পারেনি। খুন করে নিহত মানুষের হাত কেটে নিয়ে যে শ্রেণীশত্রুর রক্ত-মাংস খেয়েছিল, তারপর উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজও। সেই জিতুকে ভালবাসত মধুমিতা।

জিতুকে চেনেও না সোমেন। তবু আজ মধুমিতার চেয়েও বেশি হঠাৎ করে জিতুর কথা মনে হয়। কেমন ছিল ছেলেটা! সোমেনের মতোই কি? হয়তো এ-রকমই বয়স, একমাথা বোঝাই নানা অবাস্তব স্বপ্ন আর চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াত। রোমান্টিক বিপ্লবী। হঠাৎ কেউ ভুল করে তাকে শ্রেণীশত্রুর রক্তপাত করতে প্ররোচিত করে। সেটা খুবই ভুল হয়েছিল। পৃথিবীতে যারা জন্মায় তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যাদের খুনির ইনস্টিংট থাকে, আর কারও তা থাকে না। সেই জিতুকে এক বার দেখতে খুব ইচ্ছে হয় সোমেনের। ছেলেটা কি আজও বেঁচে আছে? থাকলেও নেই। ও-রকম উন্মত্ত অস্তিত্বের কোনও মানে হয় না। সোমেন শুধু অনুভব করে, দেশময় লক্ষ লক্ষ অল্পবয়সি ছেলে কিছু একটা করতে চাইছে, এমন কিছু—যার জন্য সর্বস্ব পণ করা যায়, প্রাণ দেওয়া যায়, নেওয়া যায়। শুধু সেই মহৎ কারণটি তাদের হাতে দাও, তারা লড়ে যাবে। কিন্তু তা তো হল না। কেউই আদর্শ বলে কোনও জিনিস দিতে পারল না যুবাদের। তারা তাই আদর্শের পিপাসা মেটাতে ভিনদেশ থেকে রাজনৈতিক মত ধার কবে আনল, আর তার জন্যই কত কাণ্ড করল তারা। বেকারকে চাকরি দেওয়ার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তাদের একটা সুন্দর আইডিয়াল দেওয়া, বাস্তবোচিত চিন্তা ও ব্যাপকতার ধারণায় সমৃদ্ধ একটি কার্যকরী আদর্শ। কে বুঝবে সে-কথা? সস্তা কথা শুনে শুনে সকলের কান পচে গেল।

অচেনা এক জিতুর জন্য প্রাণটা হঠাৎ হু-হু করতে থাকে তার। অবশ্য সেই হু-হু করা বুকে মায়ের জন্যও খানিকটা অভাব বোধ আছে, বাবার জন্যও আছে একরকম ব্যথা। আর আছে তার সারা জীবনের নানা ব্যর্থতা ও অসফলতার স্মৃতিও। কোনও কারণে মনে একটু দুঃখ এলেই হাজারও দুঃখের স্মৃতি ভিড় করে আসে।

মধুমিতার চিঠিটার কোনও জবাব দেয়নি সোমেন। ও কেমন আছে?

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে রিখিয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছিল সোমেন। খেয়াল হল, বাড়িটা বড় নিস্তব্ধ। এত চুপ কেন সব? মিটমিট করে ভুতুড়ে সব কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে, বড় বাতিগুলো সব নেবানো। শৈলীমাসির কিছু হয়নি তো? একটু অসঙ্গতি দেখলেই আজকাল কেবল অজানা ভয়ে বুক চলকে রক্ত ঝরে যায়।

রিখিয়া তার ঘরে নেই, পড়ার ঘরেও নয়। একা-একা এ-ঘর থেকে ও-ঘর খুঁজে দেখল সোমেন। চারধারে দামি জিনিস ছড়ানো। ক্যামেরা, ঘড়ি, কলম, ট্রানজিস্টার সেট, স্টিলের জগ। সে যদি এর কিছু তুলে নিয়ে চলে যায় তো কেউ ধরতে পারবে না। বড় অসাবধানী এরা।

সোমেন করিডোরে এসে ডাকল, রিখিয়া।

গলাটা কেঁপে গেল। সোমেন একটু চুপ থেকে আবার ডাকল।

অপ্রত্যাশিতভাবে শৈলীমাসির ঘরের দিক থেকে রিখিয়ার বাবা বেরিয়ে এলেন। খুবই উদ্‌ভ্রান্ত ও অন্যমনস্ক মুখ-চোখ। দরজা খুলে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সোমেনের দিকে। খুবই গম্ভীর তাঁর মুখ।

সোমেন চমকে গিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইল। দু'জন দু'জনের দিকে খামোখা চেয়ে আছে। কেউ কথা বলতে পারছে না। কথা নেই বলে। এমনি সময়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ করে সেই অন্ধ কুকুরটা এসে সোমেনের পায়ে কুঁই কুঁই করে চেটে চেটে লেজ নেড়ে অসম্ভব আদর জানাতে থাকে। কুকুরেরা ভোলে না।

রিখিয়ার বাবা আজও নেশা করেছেন। কুকুরটাকে ধমক দিয়ে বললেন, স্টপ!

সেই স্বর শুনেই বোঝা গেল, গলাটা অন্য রকম।

সোমেনের দিকে চেয়ে বললেন, কুকুরটা তোমাকে চেনে দেখছি! তুমি কি এ বাড়িতে প্রায়ই আসো?

মাঝে মাঝে। শৈলীমাসি আমাকে চেনেন।

উনি হাত তুলে বললেন, বুঝেছি। আর পরিচয় দিতে হবে না। তুমি বোধহয় ওঁর সইয়ের ছেলে! না?

খুব বিস্মিত হয়ে সোমেন বলে, হ্যাঁ।

সে ভাবতেই পারে না যে, এ লোকটার অত মনে থাকে। কিন্তু তার চিন্তাকে আর-এক বার চমকে দিয়ে লোকটা বলে, একদিন সন্ধেবেলা তোমাকে দেখেছিলাম এখানে, সোমেন লাহিড়ী না তোমার নাম?

সোমেন এত অবাক হয় যে, বাতাস গিলে বলে, হ্যাঁ। আপনার আমাকে মনে আছে?

উনি তেমনি একটা উদাসীন ভ্যাবলা চোখে চেয়ে থেকে বললেন, আমার সবই মনে থাকে। এসো। এ ঘরে শৈলী আছে, রাখু আছে। আমরা সবাই বসে একটু গ্যাদারিং করছি। কাম অ্যান্ড জয়েন দি ক্রাউড।

সোমেন দ্বিধাভরে বলল, আমি বরং চলে যাই।

উনি বললেন, যাবে কেন? ইউ আর এ ভেরি হ্যান্ডসাম ইয়ং ম্যান। তবে একটু লিন অ্যান্ড থিন। তবু তোমাকে দেখলেই বেশ একটা ফ্রেশনেস আসে। চলে এসো।

বলে উনি দরজার পাল্লাটা মেলে ধরলেন। কুকুরটা আগে গেল। পিছনে সোমেন।

প্যাসেজ দিয়ে ঢুকলে শৈলীমাসির ঘরের আগে আর-একটা ঘর পড়ে। সেটা বসবার ঘর বলে মনে হয়। এখন সেখানে ধুলো পড়ছে। কেউ ব্যবহার করে না। এদের কত ঘর অব্যবহৃত পড়ে থাকে।

সেই ঘরে এসে রিখিয়ার বাবা একটু দাঁড়ালেন। পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরনে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দামি গ্যাসলাইটার বের করে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তুমি কার কাছে আসো বলো তো? রাখুর কাছে, না শৈলীর কাছে?

সোমেন লজ্জা পেয়ে বলে, কারও কাছে পার্টিকুলারলি নয়। আসি।

ও। তোমার বয়সি আমার একটা ছেলে আছে, জানো?

জানি।

সেটা একটা হতচ্ছাড়া ছেলে। হি রাইটস টু আস অল দি ক্রুয়েল থিংস। সে নাকি আর কখনও আসবে না। আমরা তার প্রতি কোনও অন্যায় ব্যবহার করিনি, স্বাধীনতা দিয়েছি, তার পিছনে টাকাও কম খরচ করিনি। তবু হি হ্যাজ বিকাম আনবিকামিং...

সোমেন ইংরিজি কথাটা ভাল করে বুঝল না। ইংরিজিটা এখনও তার খুব রপ্ত হয়নি। আমেরিকায় যাওয়ার আগে রামকৃষ্ণ মিশনে স্পোকেন ইংলিশের ক্লাসে ভরতি হয়ে শিখে নেবে, এ-রকম ইচ্ছে আছে।

উনি বললেন, আজও তার চিঠি এসেছে। শৈলী খুব কাঁদছে। তুমি এ ঘরে একটু অপেক্ষা করো, আমি শৈলীকে একটু খবর দিই, তুমি এসেছ শুনলে ও নিশ্চয়ই শান্ত হবে।

আমি বরং—

বলে সোমেন উৎসুক হয়ে চলে যাওয়ার কথা বলতে যাচ্ছিল। উনি মাথা নেড়ে বললেন, না, যাবে কেন? উই উইল লাইক ইওর কম্পানি। এ সময়ে আমার ছেলের বয়সি কেউ সামনে থাকলে ভাল লাগবে। তুমি কী করো?

কিছু করছি না।

বেকার?

হ্যাঁ।

সবাই বেকার আজকাল। আমার অফিসে আর কারখানায় কত ছেলেছোকরা রোজ এসে কাজ খুঁজে যায়। অত কাজ কে কাকে দেবে?

সোমেন মৃদু একটু ম্লান হাসল।

কী করবে ঠিক করোনি?

সোমেন একটু ইতস্তত করে বলে, আমি বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

উনি ভ্রূ কুঁচকে বলেন, কোথায়? অ্যাব্রড?

হ্যাঁ। আমেরিকায়।

ওঃ। বলে উনি স্তব্ধ থেকে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর গভীর একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি কয়েকবার গেছি। বেশ ভাল দেশ। যাও।

সোমেন মাথা নত করে।

উনি বললেন, এই বুড়ো বয়সে আবার হয়তো যেতে হবে।

কোথায়?

লন্ডন। ছেলের খোঁজ-খবর করতে। কেন যে আর আমাদের পছন্দ করে না তা জেনে আসতে। আমি নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছি না, শৈলীর জন্য যেতে হচ্ছে। দাঁড়াও ওদের খবর দিই—

বলে উনি ও-ঘরে চলে গেলেন।

মুহূর্ত পরেই রিখিয়া দৌড়ে আসে, পরদা সরিয়েই উদ্‌ভ্রান্ত একটা আনন্দে শ্বাসরুদ্ধ অস্ফুট স্বরে বলে, তুমি!

তুমি শুনে একটু হাসে সোমেন। এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, এই বালিকাটিকে সে...সে বোধহয়...হ্যাঁ...ভীষণ

ভাবতেই সোমেন—যে সোমেন মেয়েদের সঙ্গে বহুকাল ধরে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছে, কারও কারও শরীরও ছুঁয়ে রেখেছে—সেই সোমেনের কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে লজ্জায়। বুকে ডুগড়ুগি বাজে।

সোমেন বলে, কেমন আছ?

এতদিনে মনে পড়ল? কথা বলব না তো, কিছুতেই না।

আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম।

কী নিয়ে শুনি!

সোমেন কী উত্তর দেবে! সে কিছু নিয়েই ব্যস্ত ছিল না, আবার ছিলও।

প্রায় এক মাস। রিখিয়া বলে।

তুমিও তো খোঁজ নাওনি। সোমেন বলে।

রিখিয়া মুখ ভার করে বলে, আমাকে কোথাও বেরোতে দেয় বুঝি! আজকাল খুব কড়া ডিসিপ্লিনে রেখেছে মা। কোথাও ছাড়ে না। দাদা ও-রকম করেছে বলেই এখন আমার ওপর সকলের নজর। বলে মৃদু আদুরে হাসি হাসে। আবার গম্ভীর হয়। বলে, অবশ্য রাস্তাঘাটও ভাল চিনি না। তা হলেও ঠিক একদিন চলে যেতাম ঢাকুরিয়ায়। রোজ ভাবি, আজ আসবে। ওমা, কেউ আসে না।

তুমি কোনও দিন যাওনি বলেই আসিনি। সোমেন মিথ্যে করে বলে। পরমুহূর্তেই যোগ করে দেয়, তুমি না-গেলেও মধুমিতা কিন্তু যেত।

একটু যেন শিউরে ওঠে রিখিয়া। বড় চোখে চেয়ে বলে, কে গিয়েছিল? মধুমিতা?

সোমেন মাথা নাড়ল। মধুমিতার কোনও খবর সে এখনও জানে না। বুকের মধ্যে মেঘের মতো ভয় জমে ওঠে স্তরে স্তরে। আস্তে করে বলল, সে-কথা থাক।

রিখিয়া বোধহয় বুঝল। সেও বলল, থাক গে। কিন্তু আপনার বাসায় যেতে আমার খুব লজ্জা ছিল। মধু তো আমার মতো নয়। ওর কোনও লজ্জা নেই। এমনকী ও স্কুলের দেয়াল টপকে ক্লাস থেকে পালাত ছেলেদের সঙ্গে মিশবে বলে। পুলিশ দেখলে ঢিল ছুড়ত।

তাই নাকি!

রিখিয়া মুখ গম্ভীর করে বলে, আমি অত স্মার্ট নই। আপনি তো জানেন।

আবার আপনি করে বলছ কেন?

রিখিয়া অবাক হয়ে বলে, আপনি করেই তো বলি!

একটু আগেই 'তুমি' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলে যে!

যাঃ! ভুল হয়েছিল তবে।

ভুল!

ভুলই। আসুন, মা বসে আছে আপনার জন্য।

সোমেন ঘরে ঢুকে দেখে, শৈলীমাসি খুব রোগা আর শুকনো হয়ে গেছেন। তাঁর শরীরে যেটুকু জীবনীশক্তি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু সব জমা হয়েছে চোখে। বোঝা গেল একটু আগেও কাঁদছিলেন। এইমাত্র চোখ মুছে হাসিমুখে বসেছেন। চোখ সজল।

ভারী গলায় বললেন, বাবা, তুমি কেন আমেরিকায় যাবে? উনি এসে এইমাত্র বললেন, তুমিও চলে যাচ্ছ।

সোমেন হেসে বলে, এখনও ঠিক নেই, তবে চেষ্টা করছি।

না, না। কেন যাবে? ননী তোমাকে যেতে দিচ্ছে কেন? ও কি রাজি হয়েছে?

না।

ওকে শিগগির একদিন আসতে বোলো। আমি ওকে বলে দেব, যেন কিছুতেই তোমাকে যেতে না দেয়।

কেন মাসি? ছেলেরা কি চিরকাল ঘরে থাকে?

শৈলীমাসি হঠাৎ চুপ করে কী যেন ভেবে বলেন, সে-কথাও ঠিক। ছেলেদের আটকে রেখে আমরা তাদের ক্ষতিই তো করি। কিন্তু, তোমরা সব দূরে গিয়ে পর হয়ে যাও যে! আমার ছেলেটা—বলে শৈলীমাসি বিছানা হাতড়ে একটা এয়ারোগ্রাম খুঁজে পেয়ে সোমেনের দিকে বাড়িয়ে বললেন, দেখো।

সোমেন চিঠিটা নিল না, বলল, থাক মাসি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে থেকে শৈলীমাসি অনেকক্ষণ বাদে বললেন, উনি যাচ্ছেন লন্ডনে। কিন্তু তাতে কিছু হবে না। আমি নিজে যদি যেতে পারতাম! বলে সোমেনের দিকে চেয়ে বলেন, কী করে যাব বলো তো! কত দূর! আমি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে পারি না। পৃথিবীটা যে আমার কাছে কী বিরাট জায়গা হয়ে গেছে তা তোমরা বুঝবে না। কেবল মনে হয় চার দিকটা আমার কাছ থেকে কত কত ভীষণ দূরের হয়ে গেছে!

রিখিয়ার বাবা কোণের দিকে অন্ধকারে একটা ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন, পায়ের কাছে কুকুর, হাতে গেলাস। আস্তে, সেই এড়ানো গলায় বলেন, অত অ্যাটাচমেন্ট বলেই তো ছেলে তোমাকে পছন্দ করে না। ছেলেরা একটু বয়স হলে আর মা-বাপের অতিরিক্ত স্নেহকে ভাল চোখে দেখে না।

তখন তারা অনেকের ভালবাসা আর মনোযোগ চায়। কিন্তু এ-সব সাইকোলজি তুমি তো মানো না।

মানি। শৈলীমাসি বলেন, ওকে ফিরিয়ে আনো, দেখো আমি আর অত ছেলে-ছেলে করব না। করার আর সময়ও নেই। বেশি দিন কি বাঁচব বলে ভেবেছ নাকি তোমরা?

মা, চুপ! রিখিয়া ধমক দেয়।

আজও সেই অদ্ভুত অনুভূতিটা হচ্ছিল সোমেনের। শৈলীমাসির অস্তিত্ব থেকে যেন মৃত্যুর জীবাণু উড়ে আসছে ঝাঁক বেঁধে। শ্বাসে শ্বাসে ঢুকে যাচ্ছে বুকের ভিতরে।

শৈলীমাসি বলেন, যাও সোমেন, রিখিয়া, ওকে নিয়ে যা। রুগির ঘরে অত বসে থাকতে নেই।

সোমেন হাঁফ ছেড়ে উঠে এল।

রিখিয়ার ঘরে এসে উজ্জ্বল আলোয় রিখিয়ার দিকে তাকাতে সংকোচ হচ্ছিল সোমেনের।

রিখিয়া কথা বলছিল না। হুট করে এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে বোধহয় চাকরকে চা খাবারের কথা বলে এল। এসে গোমড়া মুখে বসে থাকল সামনে। অ্যালবামের পাতা ওলটাচ্ছে। উপেক্ষা নয়, অভিমানের ভঙ্গি।

সোমেন বলে, রিখিয়া, মধুমিতা তোমাকে চিঠি লেখেনি?

লিখেছিল। কেন?

এমনিই।

ওর কথা ভুলতে পারছেন না?

সোমেন মাথা নেড়ে বলে, ভুলব কেন? ও একটু অদ্ভুত মেয়ে ছিল।

ওর কোনও খবর পাননি?

না।

আমিও না। ও আসে না। বোধহয়—

বলে খুব বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রিখিয়া চোখ নামিয়ে নিল। বলল, জানাই ছিল।

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?

বলব কেন? আপনি আমেরিকায় কেন যাবেন?

সোমেন বিষণ্ণ মুখে বলে, কেন যাব না বলো তো? কেউ যেতে দিতে চাইছে না। মা না, বাবা না, তোমরা নও। কেন?

উই হ্যাড বিটার এক্সপিরিয়েন্স। কিন্তু সে-কথা থাক।

রিখিয়া অ্যালবাম বন্ধ করে বলে, আমেরিকায় আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে। বিদেশ কার না ভাল লাগে বলুন? কিন্তু এখন আমি মত পালটে ফেলেছি। দাদার জন্যে।

জানি। কিন্তু আমার তো তা নয়!

না হোকগে। আপনি যাবেন না। আমার তা হলে ভীষণ খারাপ লাগবে।

এ খুবই গোলমেলে কথা। কিন্তু সোমেন কথাটা বুঝল। তবু দুষ্টুমি করে বলে, কেন খারাপ লাগবে রিখিয়া?

আমার চেনা-জানা লোকের সংখ্যা খুব কম। আমার ভাল লাগে এমন লোক হাতে গোনা যায়। তার মধ্যেও যদি একজন চলে যায় তো খারাপ লাগবে না!

তোমার ভাল-লাগা লোক কে কে রিখিয়া?

রিখিয়া হাসছিল। এ-কথা শুনে হেসে উপুড় হয়ে পড়ল। বলল, আপনাকে দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে আপনি কিছুতেই আমেরিকায় যাবেন না।

সে কী।

আপনি যেতে চাইছেন না।

কী করে বুঝলে?

আমি বুঝি।

তুমি থট রিডার?

রিখিয়া ঠ্যাং নাচিয়ে বলে, নয় কেন?

সোমেন খুব নিস্পৃহভাবে যেন ভুল বুঝতে পেরে বলে, তাই তো! নয় কেন?

রিখিয়া বলে, বাবা অনেক মহাপুরুষের বই এনে মাকে শোনান। এর মধ্যে একটা বই থেকে বাবা পড়ছিলেন। একজন মহাপুরুষ বলেছেন— আমি যে তোমার অন্তর্যামী তা কিন্তু এমনিতে নয়। তুমি যতক্ষণ আমাকে ভালবাসো ততক্ষণই আমি তোমার অন্তর্যামী। তোমার ভালবাসাই আমাকে অন্তর্যামী করেছে নইলে আমি তোমার কেউ নই।

বলে রিখিয়া হাসল। সোমেন ওর বুদ্ধি দেখে অবাক। তারপর অনেক ভেবে বলল, শোনো রিখিয়া, আমি মাত্র বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমার এক চেনা ভদ্রলোক কতগুলো ফার্মের ঠিকানা দিয়েছেন, আমি অ্যাপ্লাই করেছি আমেরিকায়। সেই ভদ্রলোক ওখানেই থাকেন, তিনি ফিরে গিয়েও চেষ্টা করবেন যাতে আমি একটা চাকরি পেয়ে যাই। ওখানে অনেক প্রসপেক্ট। এখানে আমার কিছু হবে না।

যান না, কে বারণ করছে।

তুমিই তো করছ।

আমার বারণে কার কী যায়-আসে?

সোমেন অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। এই সব ভাবপ্রবণতাকে কি সে প্রশ্রয় দেবে? দিয়ে কী লাভ? সেই গাবলুকে পড়িয়ে জীবন কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রিগ্রেট লেটার পাবে। বয়স গড়িয়ে যাচ্ছে, সরকারি চাকরি আর পাবে না, প্রাইভেট ফার্মেও না। কী হবে থেকে! বড়জোর কয়েকজন মানুষ খুশি হবে।

আমাকে যেতে হবে রিখিয়া।

রিখিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তা হলে আমি খুব কাঁদব।

অনেকটা রাত করে সোমেন বাড়ি ফিরল।

সবাই শুয়ে পড়েছে, বউদি এসে দরজা খুলে দিল। বলল, তোমার খাবার ঢাকা আছে সোমেন।

হুঁ।

তোমার দাদাকে সামলাতে পারছি না। কী কান্না! এ অবস্থায় ওঁকে ফেলে মা'র চলে যাওয়াটা বোধহয় ভাল হল না সোমেন।

সোমেন অন্যমনস্কভাবে বলে, দাদা অত কাঁদছে কেন? আমারও তো মন খারাপ, কাঁদছি না তো।

তোমার সঙ্গে ওঁর তুলনা করছ কেন? ও তো নরমাল নয়। সব সময়ে একটা শিশুর মতো হাবভাব, শিশুর মতোই খুঁতখুঁতে। এখন ওঁর মা বা বাবাকে দরকার। নইলে খুব হেলপলেস ফিল করে।

সোমেন বুঝে মাথা নাড়ল। বউদি চলে গেলে সে একা একা খেয়ে নিয়ে ঘরে এসে সিগারেট নিয়ে বসে। মা'র বিছানাটা ফাঁকা। তার খুব খারাপ লাগছে না। এ ঘরটা আজ থেকে তার একেবারে একার ঘর হয়ে গেল। কেউ ডিস্টার্ব করবে না।

আজ অনেকক্ষণ জেগে থাকতে ইচ্ছে হল সোমেনের। অন্য দিন এ সময়ে ঘুম পায়। মা পানের বাটা নিয়ে কথার ঝুড়ি খুলে বসে। সে-সব কথা শুনতে ইচ্ছে করে না সোমেনের। আজ কেউ বলার নেই, তাই বুঝি ঘুম আসে না।

অনেকগুলো সিগারেট খেল সোমেন। আমেরিকায় যাবে কি যাবে না তা নিয়ে অনেকবার লটারি

করল। ছোট্ট ছোট্ট কাগজে কয়েকবার 'যাব' আর 'যাব না' লিখে কাগজগুলো ভাঁজ করে দু' হাতের তেলো জড়ো করে ভাল করে মিশিয়ে দিয়ে টেবিলের ওপর ফেলল ছড়িয়ে। চোখ বুজে একটা তুলে নিয়ে খুলে দেখল, লেখা আছে— যাব না। দ্বিতীয়বার উঠল— যাব। বারবার তিন বার। তিনবারের বার কাগজ তুলতে যাচ্ছে এমন সময় তাকে ভীষণ চমকে দিয়ে কে যেন কাছ থেকে ডাকল, সোমেন।

সোমেন ঘুরে বসে দেখে, দাদা।

দাদা!

মা চলে গেল? বলে উদ্‌ভ্রান্ত রণেন ঘরের চার দিকে তাকায়।

সোমেন উঠে বলে, রাত একটা বাজে দাদা, ঘুমোবে না?

তুই কী করছিস?

ও কিছু নয়। ঘুম আসছিল না।

আমারও আসছে না। মা যাওয়ার সময় কেঁদেছিল?

হ্যাঁ।

রণেন মায়ের চৌকিতে বসে বলে, আমার হার্ট খুব খারাপ। ডাক্তার বলেছে। আমি মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তা হলে হার্ট আরও খারাপ হবে। আমাকে মা'র কাছে কাল পৌঁছে দিয়ে আসবি।

বাঃ, তা হলে চাকরি করবে না?

চাকরি করব কী করে? শরীর যদি ভাল না থাকে!

বউদি আছে, দেখবে। ডাক্তার ওষুধ দেবে। চিন্তা কী?

না। রণেন খুব জোরে মাথা নাড়ে। বলে, আমি যাবই।

আচ্ছা, এখন গিয়ে শুয়ে থাকো।

রণেন চলে গেল। কিন্তু একটু বাদেই সোমেন শুনল, বাইরের ঘরে রেডিয়োগ্রামে খুব মৃদুস্বরে বাজছে রবি ঠাকুরের নিজের গলায় গাওয়া সেই অবিস্মরণীয় গান— অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ...

চোখ ভরে জল আসে সোমেনের। কী করবে সে? কিছু করার নেই।

তবু উঠে গিয়ে বাইরের ঘরে দেখে, রণেন সোফা-কাম-বেডে বসে আছে চুপ করে। ভূতের মতো। তাকে দেখে ঠোঁটে আঙুল তুলে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করল।

সোমেন আস্তে আস্তে গিয়ে দাদার পাশে বসে থাকে।

গান শেষ হয়। রেকর্ডে পিনের একটা ঘষটানির শব্দ হতে থাকে।

রণেন মুখ ফিরিয়ে বলে, ভাল না?

কী দাদা?

গানটা?

খুব ভাল।

রণেন মাথা নেড়ে বলে, খুব। আমাকে একটা সিগারেট দে। আমার প্যাকেটে আর নেই।

খুব লজ্জা পায় সোমেন। দাদা তার কাছে সিগারেট চাইছে! কত বড় দাদা তার চেয়ে!

তবু সোমেন উঠে গিয়ে নিজের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট এনে দেয় রণেনকে।

সিগারেটটা নিয়ে বসে থাকে রণেন। অনেকক্ষণ বাদে বলে, কাঁদবি না?

কেন কাঁদব?

মা'র জন্য? আয় দুই ভাই মিলে একটু কাঁদি।

সোমেন হেসে ফেলে বলে, পাগলামি কোরো না দাদা। কেঁদে লাভ কী? মা গিয়ে ভালই হয়েছে। নইলে বাবার বড় কষ্ট।

রণেন কয়েকবার ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর অতি কষ্টে সংযত হয়ে বলে, মাকে তুই চিনবি কী করে? তোর বয়সে কত দিন মাকে দেখেছিস! আমি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে...

বলেই রণেন থমকায়, হঠাৎ বলে, কত বয়স হল আমার বল তো! অ্যাঁ!

বীণা অন্ধকারেই নিঃশব্দে উঠে আসে।

কোনও ভূমিকা না করেই এসে রণেনের হাত ধরে বলে, চলো তো।

রণেন সন্ত্রস্ত চোখে তাকায়, তারপর ওঠে। রেডিয়োগ্রামের খুব মৃদু আলোতেও ওর মুখ দেখতে পায় সোমেন। অদ্ভুত একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিদ্ধ মুখ।

সোমেন দাদার মুখটা ভুলতে পারে না। তার সারারাত ভাল ঘুম হল না। আজেবাজে স্বপ্ন দেখে উঠে বসল বার বার। ভোরের দিকে ঘুমোল খানিকক্ষণ। বেলা করে উঠল।

সকালে উঠেই তার মনে হল, দাদা এখনও তার আমেরিকায় যাওয়ার প্ল্যান জানে না। জানলে? আবার চেঁচামেচি করবে, কাঁদবে, বলবে, তুই যাস না। গেলে আমি বাঁচব না। দাদা কীরকম স্পর্শকাতর আর স্যাঁতসেঁতে মানুষ হয়ে গেছে।

সকালবেলাতে আবার সে ভাবতে বসল। কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। কী করবে?

তার এই বয়সে, এখন মাত্র দুটো জিনিস ভাবতে খুব ভাল লাগে। এক হল, রিখিয়ার কথা। আর একটা, আমেরিকার কথা।

একটা শ্বাস ফেলল সে। দুটোই পরস্পরকে শত্রুতা করছে। হঠাৎ কেন যেন খুব বাবার কথা মনে পড়ছিল। খুব ইচ্ছে করছে কাউকে সব উজাড় করে বলতে। সে শুনবে, ভাববে, সিদ্ধান্ত নিয়ে সোমেনকে বলে দেবে পথ। এ-রকম ঈশ্বরের মতো মানুষ একজনকেই সে চেনে। বাবা।

যাবে না কি এক বার বাবার কাছে?

যাবে। আজ না হয় কাল। মা'র জন্য মনটা খারাপ লাগে। মা চলে যাওয়ার পর একটা দিন চলে গেল। আরও দিন যাবে। তারপর আর খারাপ লাগবে না।

॥ পঁচাত্তর ॥

অনেক রকম ভয়ভীতি ছিল ব্রজগোপালের মনে। ঠাকুর যেমন চাইতেন তেমনি জীবনটাকে খুব সাদামাটা করে এনেছিলেন তিনি। খুব কম আয়োজন তাঁর জীবনে। যত অল্প উপকরণে দিন কাটানো যায় ততই মনটা ভাল থাকে, বিষয়লগ্ন হয় না বলেই ঊর্ধ্বমুখী হয়। এখন ননীবালা এলেন, ব্রজগোপালকে বুঝি আবার সংসারী করে ফেলেন।

টর্চ জ্বেলে অন্ধকারে পথ দেখিয়ে রাস্তা থেকে ঘর পর্যন্ত যখন ননীবালাকে নিয়ে আসছিলেন তখনই এ-রকমটা মনে হল। একটু ভয়, একটু সংশয়। অবশ্য ভাল না-লাগলে ননীবালা ফের চলে যাবেন এবং ব্রজগোপালও আবার যেমনকে তেমন হয়ে যাবেন। তবু মনটা উদ্বিগ্ন লাগছিল।

ঘরে একটা চৌকি ছিলই। সেটাতে বিছানা পাতা হল ননীবালার। নিঝুম রাত। ঘুম আসে না নতুন জায়গায়। কয়েক দিন বার বার রাতে উঠে পান খেতেন, ব্রজগোপালকে সজাগ করে বাইরে যেতেন।

ব্রজগোপাল জিজ্ঞেস করেন, মন খারাপ করছে তো ওদের জন্য? বরং আবার কিছুদিন গিয়ে থেকে এসো।

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন, না। এখানে এসে পৌঁছ-সংবাদ দিলাম, সে-চিঠিটারও উত্তর আসেনি। ওরা কি আমার কথা ভাবে নাকি? আমারও আর দরকার নেই যাওয়ার।

ওরা না ভাবুক, তুমি তো মা, তোমার তো আর ছাড়ান-কাটান নেই।

ননীবালা অন্য কথা পাড়েন, শোনো, খুব তো পরের জমিতে আর পরের ঘরে বাস করে কর্তাত্তি করছ, বহেরু চোখ বুজলে উৎখাত হবে। বরং বাস্তুজমিটায় একটু কুঁড়েঘর হলেও তোলো। এ-রকম থাকা আমার ভাল লাগে না। পাকিস্তান হয়ে অবধি পরের দরজায় পড়ে আছি।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন, গুচ্ছের টাকা নষ্ট। আমরা চোখ বুঝলেই সব ফরসা। ছেলেরা কি এত দূর আসবে?

ননীবালা বলেন, আসল কথাটা কী বলো তো? এর আগেরবার এসে বহেরুর মেয়ের কাছে শুনেছিলাম ষষ্ঠীচরণকে নাকি সব উইল করে দিয়েছ!

ব্রজগোপাল মাথা নেড়ে বলেন, দিয়েছি কিছু। দু' কাঠা বাস্তু, সে ওই পুবধারে। ও-জমিটা দিইনি, ও তো তোমার নামে কেনা। কুয়ো কাটিয়ে, বাঁধিয়ে, চারধারে বেড়া দিয়ে যত্নে রেখেছি।

সে বেশ করেছ। এবার ঘর তোলো। বহেরুকে আজই বলব, বাঁশ টিন সব জোগাড় করবে।

বহেরু পরদিন এসে সব শুনল, রামভক্ত হনুমানের মতো। তারপর লাফ দিয়ে উঠে বলল, কর্তার এক পয়সা খরচ করতে হবে না। বাড়ি আমি তুলে দেব।

ব্রজগোপাল ধমক দিয়ে বলেন, তুই তুলবি কেন?

ব্রাহ্মণকে গৃহদান মহাপুণ্য। ও আপনাকে ভাবতে হবে না। আমার কর্মফল কিছু কাটুক। অনেক খুনজখম করেছি কর্তা, এই দুই হাতে আপনার মতো সৎ-ব্রাহ্মণের জন্যও কিছু করি। তারপর আপনি গুরুস্থানীয়ও বটে।

ব্রজগোপাল আরও ধমকালেন। বহেরু শোনে না। সে বলে, বাঁশ টিনের পলকা জিনিস বছর বছর পালটাতে হয়। গতবারে ইট কেটেছিলাম, তার হাজার দশেক পড়ে আছে এখনও। সিমেন্ট না পাই চুন-সুরকির গাঁথনি দিয়ে পাকা ঘর তুলে দেব।

বিশাল দলবল নিয়ে বহেরু গিয়ে জমিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মচ্ছবের মতো ব্যাপার লাগিয়ে দিল, তার চোখে-মুখে একটা প্রচণ্ড আনন্দ। দিনে পাঁচবার এসে ননীবালাকে ডাকে, মাঠান, এসে দেখে যান কেমন হচ্ছে।

ব্রজগোপাল গা করেন না। কিন্তু ননীবালা যান, বলেন, ও বাবা বহেরু, পায়খানা বাথরুম সব অত দূরে করিস না। শহরে থেকে অভ্যাস, সব সেখানে এক ছাদের তলায়। তোদের এখানে শেয়াল কুকুর সাপ ভূতের তো অভাব নেই, রাতবিরেতে বেরোতে ভয় করে। তার ওপর বুড়োবুড়ি, কে কখন হোঁচট খেয়ে পড়ে হাড়গোড় ভাঙি।

বহেরু রাজি, বলে, তা-ই হবে। বাংলো প্যাটার্ন।

শুনে ননীবালা হাসেন। এক ছাদের তলায় হলেই তা বহেরুর কাছে সাহেবি বাংলো। অনেককাল আগে কলকাতার বাসা দেখে ও বলেছিল, এ হচ্ছে বাংলো প্যাটার্ন। কার থেকে যেন শিখেছিল ইংরিজি কথাটা! তাই শুনে কত হেসেছে রণেন আর সোমেন।

ব্রজগোপাল ঘরেদোরে বেশি থাকেন না। বেরিয়ে পড়েন যাজনে। ঘরবাড়ি তাঁর জন্য নয়। মানুষ যে আছে সে হল তার অস্তিত্ব, আর মানুষ যে কিছু হয় সে হল তার বৃদ্ধি। এই অস্তি-বৃদ্ধির মামলোত সংগ্রহ করতে হয় আবার পরিবেশ থেকে। সার কথা, নিজের পরিবেশকে সেবা দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে পরিপুষ্ট করে তোলো। তা নইলে সে যদি শুকিয়ে যায় তো জীবনের রস টানবে কোত্থেকে? তুমিও শুকিয়ে মরবে যে, তা যতই তুমি কেষ্টবিষ্টু হয়ে থাকো। সিধে মানুষ, বড় মানুষ বড় একটা দেখা যায় না আজকাল, সব পোকা লাগা। হাত-পাওলা মানুষও কেমন যেন নুলো-ন্যাংলা. ধনীও ভিখিরির সামিল হয়ে হা-পয়সা জো-পয়সা করে খাবি খাচ্ছে। আজকাল লোকজনের চোখে মুখে সব সময়ই একটা মাতলা ভাব লক্ষ করেন ব্রজগোপাল, কেমন একটা মানসিক নেশার ঘোরে চলেছে। কলকাতার মতো বড় শহরে সে-ভাবটা আরও বেশি। মানুষ বড় তিতিবিরক্ত, রাগী, লোভী, বড় বেশি অস্থির। কীসে ভাল হবে বুঝতে পারে না। যত মানুষ তত

সমস্যা। এইরকম গোলমেলে সমাজে ব্রজগোপাল সুস্থির হয়ে বসে থাকেন কী করে। ঘুরে ঘুরে পচনের ধারাটা দেখেন, লক্ষ করেন কতটা নিরাময়ের যোগ্য, আর কতটাই বা কেটে বাদ দিতে হবে। দেখে শঙ্কিত হন। অবসাদও আসে। ঠাকুরই আবার শক্তি জুগিয়ে দেন। এই বয়সেও ব্রজগোপাল ফের কষ্টসহিষ্ণু হচ্ছেন।

ননীবালা বলেন, অত সইবে না, এখন বসে বিশ্রাম নেওয়ার বয়স।

ব্রজগোপাল শান্ত স্বরেই বলেন, ঠাকুর শরীর দিয়েছেন, বসিয়ে রাখার জন্য নয়, কাজ করার জন্য।

ভূতের বেগার। ধর্মকথা আজকাল কেই বা শুনছে?

ব্রজগোপাল ভেবে বলেন, ঠিক। তবু বলি, আজকাল ধর্মের বড় দাপট বেড়েছে। কত ম্যাজিকওলা দু' পয়সা করছে দেখছ না! দেশে এখন দীক্ষার বান ডেকেছে। গুরু গুরু করে পাগল হচ্ছে লোক। নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে এ-রকম খেপে যায় মানুষ। ম্যাজিক না দেখলে কিছু বিশ্বাস করে না। সবাই কৃপা চাইছে। বোঝে না যে কৃ অর্থে করা, তারপর পা অর্থাৎ পাওয়া। করে না পেলে কি ঠাকুরের কৃপা এমনি হয়! মানুষকে এটুকু বোঝানো দরকার যে সেই চির-রাখাল আজও বসে আছেন কদম্ববৃক্ষের তলায়, কত বাঁশি বাজাচ্ছেন, তবু তাঁর হারানো গোধন দূরের চারণক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবার পথ পাচ্ছে না। তাঁর সেই হারানো গোধন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। আর কী করব?

দু'মাসের মধ্যেও চিঠিপত্র এল না কলকাতা থেকে। কেউ দেখা করতেও এল না। মনটা বড় উচাটন লাগে ননীবালার। দিনরাত প্যাঁচাল পাড়েন, কে কীরকম আছে কে জানে! খবরবার্তা নেই। খোঁজ না নিলি, নিজেরা কেমন আছিস তা তো দু'খোট লিখে জানাতে পারিস?

ব্রজগোপাল শুনে মাথা নেড়ে বলেন, তোমার মন কেমন করছে। যাও বরং গিয়ে দু'-চার দিন থেকে এসো।

ননীবালা ঝামড়ে ওঠেন, কেন যাব? ওদের যদি টান না থাকে তো আমারই বা কী দায় ঠেকেছে? দু'মাস হয়ে গেল! একটা পোস্টকার্ড পর্যন্ত লিখতে পারল না।

ব্রজগোপাল হেসে বলেন, এ হল অভিমানের কথা। ওরা তো দায়িত্বজ্ঞানহীন হবেই। জানা কথা। দায় তোমারই।

ননীবালা মাথা নেড়ে বলেন, না। দেখি, কত দিনে বুড়ো-বুড়ির কথা মনে পড়ে।

সারাদিনটাই প্রায় নয়নতারা এসে ননীবালার আশেপাশে ঘুরঘুর করে। বেড়ালের মতো। বিন্দু আসে রোজ, রান্নার কাঠ দিয়ে যায়, খেতের কলাটা মুলোটা রেখে যায়, কোটা চিঁড়ে, ভাজা মুড়ি পৌঁছে দেয়। আসে মতিরাম বামনবীর, কালীপদ ষষ্ঠীচরণ এসে খেলা করে দোরগোড়ায়। বামুনবাড়ির পেসাদের লোভে হামাগুড়ি দিয়ে গন্ধ বিশ্বেসও এসে বসে থাকে রান্নাঘরের দরজায়। চোখে দেখে না, কিন্তু নাকে গন্ধ টেনে বলে, উরেব্বাস, কী গন্ধ গো মাঠান, তোমাদের চচ্চড়িতে! কোকা, কপিল যেমন-তেমন হোক এক বার দিনান্তে এসে খোঁজ নেবেই। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনে বাতাসা, শসা আর ফলটলের প্রসাদ নিতে সবাই জুটে যায়। হরির লুটের বাতাসা কুড়োতে আসে। এ-সব ভুলে গিয়েছিলেন ননীবালা কলকাতায়। এখানে এসে আবার সব করতে শুরু করেছেন। সকলের সঙ্গে জড়িয়েও পড়েছেন খুব। ছেড়ে যেতে মন চায় না। এ বছর প্রথম দুর্গাপূজা করল বহেরু। পুজোর আগেই চলে এসেছিলেন ননীবালা। দুঃখ ছিল। বহেরুর পুজোয় মেতে গিয়ে সে-দুঃখ ভুললেন। বেশ লাগল গাঁয়ের পুজো, অনেককাল পর। একটু একটু করে কলকাতাকে ভুলছেন। কত বড় জায়গা এটা, আর কী শীতটাই পড়েছে এবার!

বহেরু ময়দানবের মতো খেটে বাড়িটা খাড়া করে দিল। ছাদ ঢালাইয়ের অনেক ঝামেলা বলে ওপরটায় টিন লাগাল। জানালা দরজা বসে গেছে। গৃহ প্রবেশের নেমন্তন্ন করে ফের কলকাতায়

চিঠি দিলেন ননীবালা। বুকটা দুরদুর করে। আসবে তো কেউ?

ননীবালা সবিস্ময়ে একটা জিনিস বুঝতে পারেন। আগে ভেবে রেখেছিলেন যে, হাভাতে স্বামীর ঘর করতে এসে বুড়ো বয়সে বড় অভাবের কষ্ট পাবেন। কিন্তু এসে দেখছেন, কোনও দিন অভাবের ছায়াও মাড়াতে হচ্ছে না। যা চাইছেন তাই জুটে যাচ্ছে। শুধু যে বহেরু দেয় তা নয়, হঠাৎ হঠাৎ কোত্থেকে কোন দূরান্তের মানুষ এসে ঝপাস করে একজোড়া চওড়াপেড়ে শাড়ি পায়ে ফেলে উবু হয়ে প্রণাম করে যায়। কেউ-বা এক ঝুড়ি তরকারি এনে ফেলে গেল। ব্রজগোপাল যাজনে বেরিয়ে যখন ফেরেন তখন কত কী বয়ে আনেন। বলেন, সব জোর করে গছিয়ে দেয়, ফেলতে পারি না। তা দেওয়ার অভ্যাস ভাল। যে দিতে শেখে, তার বুদ্ধি অনেকটা ঠিক আছে। ব্রজগোপাল নিজে গুরু নন, গুরুর নাম বিলিয়ে বেড়ান ঋত্বিক বা পুরোহিত হিসেবে। কেউ তাঁকে গুরু বলে ভুল করলে হেসে বুঝিয়ে দেন—গুরু মানে হচ্ছে ওজনে ভারী। যার জ্ঞানের ওজন, উপলব্ধির ওজন যত বেশি সে তত বড় গুরু। সেই হিসেব ধরলে দুনিয়ার কে গুরু নয় বলো, কাঙালের কাছেও শেখবার আছে, তার নিজস্ব অর্জিত জ্ঞানও তো কম নয়! কিন্তু সদগুরু যিনি, সন্ত যিনি, তাঁর মধ্যে থাকে সর্বজ্ঞত্ব বীজ। আমি তাঁর পাঞ্জাধারী পুরুত, লোককে তাঁর ঠিকানা দিয়ে বেড়াই। তোমরা নিজের চেষ্টায় পৌঁছোও বাবারা। তো পুরুত হয়ে তাঁর যজমান কম নয়। ব্রজগোপালকে হাত পাততে হয় না, লোকে হাত পাতবার আগেই দেয়। তাই ব্রজগোপালের কোনও অভাব নেই।

এইটে দেখে বড় বিস্ময় ননীবালার। হাড়-হাভাতে বাউণ্ডুলে তাঁর স্বামী। তিনি কষ্ট পাবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছিলেন। এসে দেখেন, ঘরে সোফাসেট বা রেডিয়োগ্রাম না থাকলেও ব্রজগোপালের ঘরে লক্ষ্মীর গায়ের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে তরিতরকারি বিলিয়ে দিতে হয়। দু'মাসে প্রায় তিরিশখানা মিহি জমির শাড়ি পেয়েছেন। প্রণামীর টাকা প্রতি মাসেই অন্তত শ'খানেক কেবল তাঁর হাতে এসেছে। ননীবালা এ-সব নিয়ে খুব খুশি। বলেন, তোমার যে খুব রবরবা গো।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন, এ কী দেখছ। বিবেকানন্দের নামে কত হাজার বিদেশি কারেন্সির প্রণামী আসে এক বার জেনে এসো। চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। তাই ভাবি, ফরেন ক্যাপিটালের জন্য হা-পিত্যেশ করে না থেকে যদি একশো বিবেকানন্দ তৈরি হত দেশে তো টাকাপয়সায় ভাসাভাসি কাণ্ড হত। লোককে যদি ধর্মদান করতে পারো তো পঞ্চভূত এসে তোমার সংসারে বেগার খেটে যাবে।

গৃহপ্রবেশের আয়োজন নমো-নমো করে সারতে চাইলেও হল না। ব্রজঠাকুরের বাড়ি হচ্ছে শুনে বৈঁচী, গোবিন্দপুর, বর্ধমান থেকে বিস্তর লোক খোঁজ-খবর করতে এল। জানালা দরজার কাঠ পাওয়া গেল বিনা পয়সায়, রং পাওয়া গেল, সস্তায় কিছু লোহালক্কড়ও দিল একজন। সবাইকে বলতে হয়, তা-ই বললেন ননীবালা, বাদ রাখলেন না।

উৎসবের দিন মচ্ছব লেগে যাবে আন্দাজ করে বহেরু বলে দিল, কর্তা, সোজা খিচুড়িভোগ, লাবড়ার তরকারি, আর চাটনির ব্যবস্থা করুন। শেষ পাতে কিছু মিহিদানা আর দই।

কলকাতার জমিতে বাড়ি হবে-হবে করেও হল না। কত আশা ছিল ননীবালার। এক বার কৌশল করে রণেনের বউ জমিটা নিজেও কিনতে চেয়েছিল। জমিটায় অভিশাপ আছে বোধহয়। কতকাল পড়ে থাকবে কে জানে! ছেলেরা কী করবে তাও ঠাকুর জানেন। কিন্তু এখানে এত দিন পর স্বাধীন হতে পেরেছেন তিনি। যেমন হোক, তবু নিজের বাড়ি। চার দিকে অনেকটা জমি। বাচ্চারা জমি কুপিয়ে এর মধ্যেই গাছ লাগিয়েছে কত! বাড়ি তৈরি শেষ হওয়ার আগেই জমির খেতে ফুল ফল আসতে লেগেছে। এখানে জীবনটা শান্তিতে না হোক স্বস্তিতে কাটবে। একটু একা লাগবে কি! লাগুক। বলতে কী, জীবনটা তো তাঁর একাই হয়ে গেছে। ছেলেরা খোঁজ নিল না।

গৃহপ্রবেশের দিনটায় সকাল থেকে পুজোর শেষ অবধি উপোস করে থাকা ছাড়া আব কোনও

ঝক্কি পোয়াতে হয়নি ননীবালার। রাশি রাশি জিনিসপত্র জড়ো হয়েছে। কে কুটছে, কে বাটছে বোঝা মুশকিল। তবে চেনা-অচেনা সবাই খাটছে। বিশাল এক তেরপলের তলায় যজ্ঞির রান্না হচ্ছে। পুজো চলছে উঠোনে। ব্রজগোপাল নিজে পুজো করলেন না, পুরুত করছে। তিনি গা আলগা দিয়ে বহেরুর উঠোনে বসে আছেন। খোলা রোদে তাঁকে ঘিরে বিস্তর লোক ঠাকুরের কথা শুনছে। উপোসি মুখে কোনও ক্লান্তি নেই, বৈকল্য নেই। পারেও বটে লোকটা—ননীবালা ভাবেন। প্রতি মাসে এক বার করে চতুরহ সহ শিশু প্রাজাপত্য করেন। সে ভারী কষ্টের। প্রথম দিন পূর্বাহ্নে হবিষ্যান্ন মাত্র, দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে এক বার হবিষ্যান্ন, তৃতীয় দিন অযাচিত—অর্থাৎ কেউ ব্রতর কথা জেনে কিছু দিলে তাই দিয়ে হবিষ্যান্ন, চতুর্থ দিন কাঠ-উপোস। ননীবালা আপত্তি করলে বলেন, কত অজানিত অপরাধ করছি প্রতিদিন, তার প্রায়শ্চিত্ত করে রাখি। প্রায়শ্চিত্ত মানে দণ্ড নয়, পুনরায় চিত্তে গমন, স্বাভাবিকতায় প্রকৃতিতে ফিরে আসা।

ননীবালা তত্ত্বকথা বোঝেন না, কষ্টটা বোঝেন। মানুষটা চিরজীবন তাঁর অচেনা রয়ে গেল। এখন অবশ্য আর বাধা দেন না। এখানে এসে বুঝেছেন, ব্রজগোপাল খুব হালকা লোক নন। চার দিকে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়ার লোকের অভাব নেই। ফকিরসাহেব পর্যন্ত এসে কত সম্মান আব আদর দেখিয়ে যান রোজই। স্বামীর সম্মানের ভাগ এই প্রথম পাচ্ছেন ননীবালা। এর আগে কয়েকদিনের জন্য এসে এত বুঝতে পারেননি।

উৎসবের এত হইচইয়ের মধ্যেও ননীবালা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন রাস্তার দিকে। কেউ কি আসবে না? বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। কলকাতার গাড়ির খোঁজ নিচ্ছেন বার বার। মনে মনে নিজেকে বোঝাচ্ছেন— ওরা তো সব দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর চা-টা খেয়ে রওনা হবে, হাওড়া তো কম দূর নয়। হাওড়া থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা গাড়িতে এসে আবার এতখানটা পথ। সময়ের হিসেব করে ননীবালা দেখেন, বারোটা-একটার আগে এসে পৌঁছোবে না কেউ। তবু যদি আসে। কাউকে জোর করার নেই, দাবিদাওয়া নেই, দয়া করে যদি আসে। বড় অভিমান হয় ননীবালার। একটা জীবন বুক দিয়ে ছেলেপুলে আগলে রেখে মানুষ করলেন, ওরা তবু কী করে সব ভুলে যায়!

ব্যাপার-বাড়িতে কিছু গণ্ডগোল হবেই। কপিলের ছেলে গাছে উঠেছিল, পড়ে গিয়ে তার ড্যানা ভেঙেছে! হইচই কাণ্ড। বৈঁচীর হাসপাতালে তাকে নিয়ে রওনা হল ক'জন। এর মধ্যে রব উঠল, নন্দলালের পাঞ্জাবির সোনাব বোতাম চুরি হয়েছে। নন্দলাল থানা-পুলিশ করবে বলে চেঁচাচ্ছে। বিন্দু এসে ননীবালাকে বলে, এ হচ্ছে মেঘু ডাক্তারের ছেলেদের কাজ। ওরা বড্ড চোর! নন্দলাল ঘেমো পাঞ্জাবি খুলে বেড়ার গায়ে রোদে দিয়ে পাশ ফিরতে না ফিরতে চুরি। এত চটপটে হাত আর কার হবে! ফকিরসাহেবের ভুতুড়ে বাড়িতে দিনমানে লোক যায় না, সেইখানে পর্যন্ত গিয়ে ওরা ফকিরসাহেবেব পেতলের মোমদানি চুরি করেছিল। অমন ডাকাবুকো আর কে আছে!

এই সব গোলমালে ননীবালা একটু আনমনা হয়েছেন, ঠিক এই সময়ে নয়নতারা ধেয়ে এসে চেঁচিয়ে বলল, ও মা, তোমার ছেলেরা সব এসেছে, নাতিপুতি সব। দেখো গে যাও, চার রিকশা বোঝাই।

ননীবালা বড্ড তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়েছেন উঠে। মাথাটা চন করে পাক মারল, বুকটায় ধরল চাপ। শ্বাসকষ্ট। উপোসি শরীরের দুর্বলতাও আছে। চোখ অন্ধকার করে ধীরে ধীরে এসে বসে পড়েন ফের। নয়নতারাই এসে ধরে তাঁকে, ও মা, কী হল গো?

ফ্যাকাসে ঠোঁটে ননীবালা বলেন, নয়ন, তুই যা, ওদের নিয়ে আয়। আমার বুকটা—

কিছুক্ষণ কথা বলতে পারেন না। বুড়ো বয়সের শরীর , বেশি সয়-বয় না। নয়নতারা হাপুর-হুপুর হাতপাখার হাওয়া করে, বুক মালিশ করে দেয়। বলে, চিন্তা কোরো না মা, এসেছে যখন সবাই ঠিক তোমার কাছে আসবে।

তবু তুই যা। বলে ননীবালা নিজেই ওঠেন আবার। বলেন, এখন একটু ভাল লাগছে।

ননীবালা বাইরে আসেন। বিশ্বাস হয় না, তবু দেখেন, কুঞ্জলতায় ছাওয়া শুঁড়িপথ ধরে অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে চার দিক দেখতে দেখতে সব আসছে। পথ দেখিয়ে আনছে বহেরু। সে ননীবালার দিকে চেয়ে একটা ডাকাতে হাঁক পেড়ে বলে, মাঠান, সব আসে পড়েছে! দেখেন। জয় ভগবান।

ভগবানের বড় দয়া। বড় দয়া। ননীবালার বুকের অন্তস্থলে থিতিয়ে ছিল চোখের জল। নাড়া খেয়ে তারা উঠে এল। চোখ ঝাপসা, কণ্ঠায় আটকে আছে কান্নার দলা।

প্রথমে সোমেন, তার হাত ধরে টুবাই, পিছনে রণেন, বীণা, বুবাই আর বেলকুঁড়ি। কিন্তু তার পিছনে ছেলে কোলে সুন্দর মেয়েটা কে? ও মা! শীলা নাকি! কী সুন্দর হয়েছে শীলা! কোল ভরা মোটাসোটা ছেলেটাই বা কী সুন্দর! স্বয়ং গোপাল। ও কি অজিত? তাই তো! হায় সর্বনাশ, এ আবার কাকে দেখছেন ননীবালা? এ কি সত্যি? ইলা না! বম্বে থেকে ইলা আবার কবে এল? হাত ধরে গুটগুটিয়ে তার ছেলেও আসছে। ইলার পিছনে ইলার বরকেও দেখা যাচ্ছে যে! এ কি স্বপ্ন দেখছেন ননীবালা? সত্যি তো! ভগবান এটা যেন স্বপ্ন না হয়। এটুকু দয়া করো ভগবান।

রণেনের হাতে বিশাল এক মিষ্টির হাঁড়ি, সোমেনের হাতে মস্ত সন্দেশের বাক্স, রণেন এসে সোজা পায়ের ওপর পড়ে কান্না — মাগো, আমাদের কি আর মনে পড়ে না?

তাকে ধরে তুলবেন কী, তার আগেই রক্তের ছানাপোনারা সব ঘিরে ধরেছে তাঁকে—মা ঠাকুমা ডাকে অস্থির করে তুলল বাতাস। এত সুখ বুঝি সইবে না শরীরে। বুঝি দম ফেটে মরে যাবেন। বুকের ভিতর তুফান ছুটছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে অবিশ্বাস্য আনন্দে। অবিরল বয়ে যাচ্ছে চোখের জল। ফোঁপাচ্ছেন।

ইলা এসে জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। টুবাই কোলে চড়ে বসে থাকে। শীলা তার ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে, বাব্বা ! কী রাস্তা!

ননীবালা একটাও কথা বলতে পারেন না। অবিশ্বাস্যে বোবা হয়ে যান। ছেলেরা-জামাইরা প্রণাম করে যাচ্ছে, আশীর্বাদটুকু পর্যন্ত মনে করতে পারছেন না। কেবল মাথায় হাত রাখছেন। কাঁদছেন। বিশ্বাস হয় না।

ব্রজঠাকুরের ছেলেপুলে শহর থেকে এসেছে শুনে বিস্তর ভিড় হয়ে গেল ঘরের মধ্যে। বহেরুর বউরা সব ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়াল, বড় মেয়ে এল, পড়শিরা এল। বামন মতিরামও ঝলমলে পোশাক পরে এসে কয়েকটা ডিগবাজি দেখিয়ে দিল সবাইকে।

ব্রজগোপাল এসে দাঁড়ালেন একটু দূরে পর মানুষের মতো। তিনি জানেন একটু দূরত্ব থাকলেই সঠিক নিরীক্ষণ হয়। যত মাখামাখি করবে, যত কাছে টানবে, তত দেখাটা হবে অস্পষ্ট। তাঁর মুখে স্মিত সংযত ভাব। ছেলেমেয়ে জামাই আর নাতি-নাতনিরা প্রণাম করছে, তিনি চোখ বুজে দয়াল ঠাকুরকে স্মরণ করছেন। দয়াল, ওরা যেন সুখে থাকে। যেন ওরা কারও দুঃখের কারণ না হয়। ওদের সুখ যেন কাউকে দুঃখী না করে। নিজে সুখী হয়ে ওরা যেন সবাইকে সুখী করে।

এই সুখ-দুঃখের তত্ত্বের মধ্যেই পৃথিবীর সব সত্য নিহিত আছে। বড় শক্ত ব্যাপার। নিজে সুখী হও, সবাইকে সুখী করো—এ কি পারবে তোমরা?

ছোট জামাই বিদেশ ঘুরে এসেছে। হাসিমুখে সে বলল, এ খুব খাঁটি জায়গায় আছেন বাবা। গাছপালা মাটি— এ-সবই হচ্ছে মানুষের এলিমেন্টাল জিনিস।

তোমরা কবে এলে?

আমি বম্বে ফিরেছি দিন-দশেক আগে। লন্ডনের এক কোম্পানি চাকরি অফার করেছে কলকাতায় তাদের অফিসে। তাই চলে এলাম কন্ডিশন দেখতে। মাসখানেক পরে এসে জয়েন করব। কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে উইক এন্ডে চলে আসব এখানে। কী সুন্দর জায়গা!

অজিত বেশি কথা বলে না। ব্রজগোপাল তার দিকে চেয়ে বলেন, অজিত, তোমার শাশুড়ির বাড়ি দেখেছ?

দেখব। বাইরে থেকে দেখেছি। খুব ভাল লাগছে।

ব্রজগোপাল গম্ভীর হয়ে বলেন, ভালই। তিন-চারখানা ঘর হয়েছে শেষ অবধি। আমার প্রথমে খুব ইচ্ছে ছিল এখানে বাড়ি করার, পরে নানা কারণে আর ইচ্ছে হয়নি। তোমার শাশুড়ি এসে পড়ায় শেষ পর্যন্ত হল। অনেকগুলো ঘর আছে, কলকাতার ওপর কখনও বিরক্তি এলে তোমরা চলে এসো এখানে, যত দিন খুশি থেকে যেয়ো।

আসব। জায়গাটা বড় ভাল। অ্যাওয়ে ফ্রম ম্যাডেনিং ক্রাউড।

চলো, দেখবে। বলে ব্রজগোপাল জামাইদের নিয়ে এগোন। চোখের ইঙ্গিতে সোমেনকে ডাকেন, সেও আসে।

নতুন চুনের সোঁদা গন্ধওলা ঘর। চার দিকে জানালা-দরজা খোলা। ফটফটে রোদ আর হাওয়ায় ঝলমল করছে। সামনের ঘরে যজ্ঞ হচ্ছে, পুরুতের মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। গেঁয়ো উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র, তবু শুনতে শুনতে শৈশব ফিরে আসে। ঘুরে ঘুরে ঘরদোর দেখান ব্রজগোপাল। সোমেনের দিকে চেয়ে বলেন, কেমন?

সোমেন তার সুন্দর মুখশ্রীতে চমৎকার হাসির আলোটি ছড়িয়ে দিয়ে বলে, আমাদের কোথাও একটা বাড়ি আছে, এটা ভাবতেই ভাল লাগবে এখন থেকে।

ব্রজগোপাল ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে আস্তে করে বলেন, কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু ওর অর্থ ভাল নয় বাবা, তুমি তো অসহায় নও যে দুনিয়ার কোথাও তোমার আশ্রয় নেই এ বাড়িটা ছাড়া।

আমাদের নিজের বলতে তো কিছু নেই বাবা।

ব্রজগোপাল শ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বলেন, জানি। তবু বলি, পুরুষমানুষ হয়েছ, নিজেকে কখনও নিরাশ্রয় ভেবো না। ঠাকুর সকলের জন্যই সব দিয়ে রেখেছেন, খুঁজে-পেতে অর্জন করে নিতে হয়। আবার স্বার্থপরও হতে নেই। তোমার ঘর যেন হয় মন্দিরের মতো।

ননীবালার কান্না থেমেছে। শরীরে শক্তির জোয়ার এল বুঝি। নাতিদের, ছেলেপুলেদের, নাড়ু-মোয়া দিচ্ছেন, জল গড়িয়ে আনছে নয়নতারা। ননীবালা বলেন, এটুকু খেয়ে নে সব। ভাতে বসতে দেরি আছে।

বীণা বলে, এবার পুজোয় আপনাকে কাপড় দিতে পারেনি আপনার ছেলে। মাইনে-টাইনে সব কেটে নিত তো কামাইয়ের জন্য। এখন কিনে এনেছে।

ননীবালা বলেন, কাপড়! সে-কথা বোলো না বউমা, কাপড়ের অভাব নেই। এসে অবধি এ-পর্যন্ত কতগুলো যে পেয়েছি। এক ছেলে দেয়নি তো কী হয়েছে, কত ছেলে আমাকে দিয়ে যায়।

ঝোলা ব্যাগ থেকে বীণা শাড়ি বের করে দেখায়। বেশ শাড়ি, খুব চওড়া পাড়ে মুগার সুতোর টান রয়েছে। অন্তত ষাট-পঁয়ষট্টি তো হবেই। শীলা আর ইলাও শাড়ি এনেছে। ননীবালা বলেন, তোরা কি আমাকে শাড়িতে ঢেকে দিবি নাকি?

ভারী আনন্দ। ঘর ভরতি আপনজনদের কথার কলরোল, হৃৎপিণ্ডের শব্দ, রক্তের গুঞ্জন। বাতাসটা পবিত্র হয়ে গেল।

শীলার ছেলেটা চিত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। একরাশ জুঁই ফুল পড়ে আছে যেন। ননীবালা বলেন, ও শীলা, আমার এই বরটির নাম কী রেখেছিস শুনি!

শীলা মোয়ায় কামড় দিয়ে বিষম খেয়ে হেসে ফেলল। ননীবালা বললেন, ষাট ষাট।

সামলে নিয়ে শীলা বলে, আবার কী! বাবা নাম লিখে পাঠিয়েছিল, সেই নামই রাখল তোমার জামাই। বলল, শ্বশুরমশাই শাস্ত্রজ্ঞ লোক, জেনেশুনে বুঝেই নাম রেখেছেন নিশ্চয়ই। তাই নাম রাখা হয়েছে ঋতম্ভর।

বেশ নাম। ইলা, তোর ছেলের?

আর বোলো না, আমার শাশুড়ি নাম রেখেছেন ননীচোর। সেই নামই নাকি থাকবে। বড় হয়ে ছেলে আমাদের মারতে আসবে দেখো। চোর-টোর দিয়ে কেউ নাম রাখে! তার ওপর আবার দিদিমার নামও ননীবালা। কিন্তু কে কাকে বোঝাবে! বরং স্কুলে ভরতি করার সময়ে চুপ চুপ করে নাম পালটে দিয়ে আসব।

নাম শুনে সবাই হাসে।

কিছু সময় পার হয়ে যায়। বেলা হল। ননীচোরকে নিয়ে বেলকুঁড়ি বাইরে কাক বক দেখাচ্ছে। ননীবালা তাকে ডাক দিয়ে বলেন, ননীবালাকে চুরি করবি নাকি ও ভাই? নিয়ে যা চুরি করে। তোর দাদু বুড়ো বয়সে একটু কাঁদুক।

শীলা বলে, মা, বেশ তো থেকে গেলে এখানে! এক বার খবরটাও দিয়ে আসোনি! আমি শুনে তো হাঁ। বিশ্বাসই হয়নি প্রথমে যে, তুমি সবাইকে ছেড়ে বাবার কাছে চলে আসতে পারো।

ননীবালা চুপ করে রইলেন খানিক। ভেবে বললেন, হুট করে এলাম বটে, কিন্তু কাজটা খারাপ হয়নি মা। এখানে এসে বেশ আছি। মনটা হু-হু করে বটে, তবু বেশ লাগে। তোরা আসবি, থাকবি, বেড়িয়ে যাবি। হ্যাঁ রে, সোমেন কী বলে। আমেরিকা না কোথাকার পোকা যে ঢুকেছিল মাথায়!

শীলা মাথা নেড়ে বলে, লক্ষ্মণবাবু ফিরে গিয়ে সোমেনকে লিখেছেন— না আসাই ভাল। লক্ষ্মণবাবুও ফিরে আসছেন। চাকরি-বাকরি করবেন না, নিজেই একটা কোম্পানি খুলবেন বলে ঠিক করেছেন এখানে। সোমেনকে সেখানে চাকরি দেবেন।

ওমা, তাই নাকি?

শীলা হেসে বলে, গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। তবে লক্ষ্মণবাবু মানুষটা তো খুব খাঁটি। যা বলেন তাই করেন।

ননীবালা বলেন, সে যেমনই হোক, তুইয়ে-বুইয়ে ভুলিয়ে রাখিস ওকে। কোথাও যেতে দিস না। ওর জন্যই আমার চিন্তা। বলতে কী, ওর জন্যই আমার এখানে আসা।

কেন মা?

ও বড্ড বকত আমাকে। বুঝতাম, বাবাকে আলাদা রেখে মা ছেলের সংসারে থাকে—এটা ও ভাল চোখে দেখে না। তাই বুঝি আমাকে ইদানীং সহ্য করতে পারত না। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সব দিক বজায় রাখতে চলে এসেছি। এখন যদি ও আবার দূরান্তে চলে যায় তবে বড় দুশ্চিন্তা নিয়ে মরব।

ঘুরে ঘুরে সব দেখে সোমেন। এর আগে এমনি এক শীতকালে সে এসেছিল এখানে। এর মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। শুধু সেই বিশাল মানুষ বহেরু একটু যা বুড়িয়ে গেছে। গন্ধ বিশ্বেসেরও বাঁচার শেষ নেই। এখনও টিকে আছে। মচ্ছবের গন্ধে-গন্ধে এসে বসে আছে গাবগাছের তলায়। দিগম্বরকেও ভিড়ের মধ্যে এক-আধবার দেখা গেছে। খোলটা সঙ্গেই আছে, যখন নির্জনতা পাবে বাজাতে বসবে। বিন্দুর সঙ্গেও চোখাচোখি হয়েছে কয়েকবার। সেবার যখন এসেছিল তখন বিন্দুর শরীরের অসহ্য উত্তাপ টের পেয়ে গেছে। এবার তাই লজ্জা-মেশানো ভয় করল তাকে। সে বড় ভিতু। হেমন্ত বা অন্য বন্ধুরা কেউ হলে, এমনকী শ্যামল যদি আসত তা হলেও একটা কিছু প্র্যাকটিকাল প্রেম করতই। সে পারে না। ব্রজগোপালের ছেলে তো, তাই কতগুলো ভয়-ভীতি ছেলেবেলা থেকেই বাসা বেঁধে আছে ভিতরে।

চার দিকেই গুরুজন বলে সে উত্তরধারে কাঁটাঝোপের পাশে একটা ঢিবির ওপর এসে নির্জনে সিগারেট ধরিয়ে বসল। এখান থেকে অনেকটা দেখা যায়। বহেরুর বাড়ি-খেত, আর-একটু দূরে

তাদের নতুন বাড়িটা। যজ্ঞধূমের গন্ধ আসছে, থিক থিক করছে লোকজন। হাল্লা-চিৎকার শোনা যাচ্ছে। শীতের বাতাস এই দুপুরেও হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে, পুকুরের জলে বিশাল জলহস্তীর মতো রণেন সাঁতার কাটছে। না, জলহস্তী বলা ঠিক হল না। রণেন আর তেমন মোটাসোটা নেই। অনেক রোগা হয়ে গেছে। প্রায়ই বলে, আমি মা-বাবার কাছে চলে যাব। এ ছাড়া আর কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। হ্যাঁ, আর-একটা আছে। এখনও রাতের বেলা চুপি চুপি উঠে কলের গান শোনে। নইলে, সবই ঠিক আছে।

সোমেন অনেকক্ষণ বসে থাকে ঢিবিটার ওপর। মনে কত রকমের চিন্তা শরতের মেঘের মতো ছায়া ফেলে যায়। এত চিন্তা সোমেনের ছিল না কখনও। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে। এই তো কিছুদিন আগে ম্যাক্স চলে গেল। তাকে দমদমে তুলে দিতে গিয়েছিল সোমেন, যাওয়ার সময়ে ম্যাক্স তার হাত ধরে বলেছিল, নোংরা গরিব ঠিকই, তবু তোমার দেশের বেশি কিছু শিখবার নেই বিদেশ থেকে, একসেপ্ট সাম টেকনিকাল নলেজ, এনডিভার, অ্যান্ড এ প্র্যাকটিকাল আউটলুক ইন সাম ম্যাটার্স।

কথাটা শুনে খুব অহংকার হয়েছিল সোমেনের। নিজের দেশ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানে না সোমেন, কিন্তু ম্যাক্স জেনে গেছে। ম্যাক্স সারা ভারতবর্ষ কয়েকবার ঘুরেছে, কাশীতে সংস্কৃত শিখে বেদ-বেদান্ত পড়েছে, ভিখিরি কাঙাল থেকে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষদের সঙ্গে অবাধে মিশেছে, উগ্রপন্থীদের সঙ্গে বিপ্লব করতে গিয়ে কিছুদিন জেলও খেটে গেছে। রোগা সাহেবটা অল্প ক'দিনে যা করে গেছে সোমেন হয়তো সারা জীবনেও করতে পারবে না। উলটেপালটে এ দেশকে দেখে গেছে ম্যাক্স। তাই তার কথায় নিজের দেশের ওপর আবার আস্থা ফিরে আসে সোমেনের। লক্ষ্মণকে এইসব কথা বলেছিল সোমেন। লক্ষ্মণ অনেক চিন্তা করে বলেছিল, সেক্স আর টেকনোলজি ছাড়া ওদেশে কিছু নেই, এমন নয় সোমেন। তবে ভাল যা আছে তা সবই একটু থমকে গেছে। কিন্তু যেহেতু ওরা খুব উদ্যোগী মানুষ সেইহেতু যেদিন ভুল ধরা পড়বে সেদিনই ভূতের মতো খেটে ভুল শোধরাতে কাজে লেগে যাবে। আমাদের মতো ম্যাদামারা মানুষ ওরা নয়। বারংবার ম্যাক্সও বলে গেছে— সোমেন, ইওর্স ইজ এ গুড কান্ট্রি। আমি বুড়ো বয়সে বেনারসে এসে সেটল করব দেখো।

বাতাসে সিগারেটটা তাড়াতাড়ি পুড়ে যাচ্ছে। দাদা এখনও সাঁতার কাটছে। বোধহয় বার দুই-তিন পুকুরটা এপার-ওপার করল। আর বেশিক্ষণ জলে থাকলে ওর ঠান্ডা লেগে যাবে। সোমেন তাই ঢিবির ওপর থেকে নেমে আসে আস্তে আস্তে, পুকুরধারে গিয়ে ডাকে, দাদা!

রণেন গলা-জলে দাঁড়িয়ে মুখে জল সমেত বলে, আয় আসবি? তোকে সাঁতার শিখিয়ে দিই।

আমি জানি দাদা। তুমি উঠে এসো।

আর-একটু থাকি। খুব ঠান্ডা।

সর্দি লাগবে যে।

রণেন তার দিকে তাকিয়ে বলে, পাগলের কখনও সর্দি লাগে না, বুঝলি, সর্দি লাগলে পাগলামি সেরে যায়।

সোমেন বিরক্ত হয়ে বলে, তা হলে বউদিকে ডেকে আনি।

রণেন কোমর থেকে গামছা খুলে ছপাং করে জলে লম্বা করে ফেলে বলে, দাঁড়া, উঠছি।

গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল। অনেক লোক জুটে ব্রজগোপালের সামান্য জিনিসপত্র মুহূর্তের মধ্যে বয়ে এনে দিল নতুন বাড়িতে। শীলা আর ইলা সাজাতে লাগল। বীণা রান্নাঘর গুছোয়। বলে, মা, আমাদের একটা জায়গা হল এতদিনে।

ননীবালা গভীর শ্বাস ফেলে বলেন, আর জায়গা! কখনও কি এসে থাকবে বউমা? আমরা

বুড়োবুড়ি মাটি কামড়ে পড়ে থাকব মরা ইস্তক। যদি মনে হয় তো এসো। আমাদের বুক জুড়িয়ে দিয়ে যেয়ো। মা দুর্গার মতো ছানাপোনা নিয়ে ঝুমঝুমিয়ে আসবে-যাবে, তা কি আমার ভাগ্যে হবে বউমা!

সোমেনকে দেখে নিরালায় ডাকেন ননীবালা, বলেন, কীরে, রোগা হয়ে গেছিস নাকি?

না, তোমাদের সবসময়েই রোগা দেখা।

হ্যাঁ রে, একা লাগে না ঘরটার মধ্যে ওখানে, অ্যাঁ? মায়ের কথা মনেও পড়ে না বুঝি?

সোমেন হেসে লজ্জার ভাব করে বলে, পড়বে না কেন?

খুব সিগারেট খাস, না? ঠোঁট কালো হয়ে গেছে। চোখ বসা কেন? রাগবাগ করিস না তো বউদির সঙ্গে?

না না। তুমি যে কী ভাবো!

ননীবালা কাঙালের মতো বলেন, এখন তো তোর হাতে কোনও কাজ নেই, থাকবি এখানে ক'দিন?

এখানে?

তবে কোথায় বলছি! থেকে যা, একটু শরীরটা সারিয়ে দেবখন। আমাদের দু'-দুটো গোরু রোজ পনেরো-যোলো সের দুধ দিচ্ছে। কত তরিতরকারি, মাছ, ফল খায় কে! এত ঘি আর ক্ষীর করে রেখেছি। আজ সবাইকে দিয়ে দিচ্ছি কলকাতার জন্য। তুই ক'দিন থেকে যা।

সোমেন উদাস গলায় বলে, পাগল হয়েছ! কলকাতায় কত কাজ!

আহা! কী কাজ তা তো জানি! একশো টাকার একটা টিউশানি।

সোমেন মৃদু হেসে বলে, না মা, তুমি খোঁজ রাখো না। সেই টিউশানি আছে বটে, আবার এক বন্ধুর সঙ্গে ঠিকাদারির কাজে নেমেছি।

তাই নাকি?

অবশ্য আমার তো টাকা নেই, তাই খুব কিছু হয় না। টাকা থাকলে হত।

তোর বাবার কাছ থেকে নিস।

বাবা! সোমেন অবাক হয়ে বলে, বাবা কোত্থেকে দেবেন?

জবাব দিতে গিয়ে ননীবালার গলাটা অহংকারী হয়ে যায়, তবু আস্তে করে বলেন, তাঁকে ভিখিরি ভাবিস না। আমার এখানে লক্ষ্মীর বাস। চেয়ে দেখিস, দেবেন।

সোমেন মাথা নেড়ে বলে, এখন থাক। পরে দরকার মতো দেখা যাবে।

খাওয়া-দাওয়া সারতেই শীতের বেলা ফুরিয়ে গেল। দূর মাঠপ্রান্তরে সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছায়া। পাখি উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে। দিনশেষ। সারাদিন লোকজন ছিল, তারা সব বিদায় নিয়েছে। কুকুরেরা এখনও ঝগড়া করছে এঁটো পাতা নিয়ে, কাক ওড়াউড়ি করছে। হু-হু করে শীতের বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

মেয়েরা তাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। সাজও শেষ। ছেলেরা জামাইরা পোশাক পরে বসে আছে নতুন বাড়ির বারান্দায়। ননীবালা কাঁদছেন শীলার ছেলেকে বুকে চেপে, অন্য হাতে ধরা আছে টুবাই। আঁচল ধরে টান দিচ্ছে ননীচোর। সারাদিনে তার দিদিমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বেলকুঁড়ি আর বুবাই কাঁদছে, রণেন ভ্যাবলার মতো বাপের পাশে বসে আছে বারান্দায়। দুই জামাই নিচু স্বরে কথা বলছে পরস্পর। সোমেন বাড়ির বাগানে কুয়োর ধারে আড়ালে সিগারেট খায়।

কে যেন রাস্তায় হাঁক পাড়ছে, কলকাতার লোকেরা ফিরবে, চারটে রিকশা নিয়ে আয় গোবিন্দপুর থেকে। ছ'টার গাড়ি ধরবে সব।

সোমেন ঘড়ি দেখে বিরক্ত হয়। খুব বেশি সময় নেই। মেয়েছেলে যেখানে, সেখানেই দেরি।

রিকশা এসে গেল। হর্ন মারছে। ছেলেরা এগিয়ে গেল। মেয়েরা ননীবালাকে ঘিরে কাঁদছে এখনও।

আবার কবে আসবি সব? ননীবালা জিজ্ঞেস করেন।

আসব মা, এখন তো আমাদেরই বাড়ি এটা।

ও-সব মুখের কথা। ননীবালা বলেন, শোন, তোদের বাড়ির সব উৎসব-অনুষ্ঠান যখন করবি, তখন এ বাড়িতে এসে করিস। আমি খরচা দেব। কলকাতার মানুষদের না হয় পার্টি দিবি।

এ-সবই স্তোক। জানেন ননীবালা, ও-রকম হয় না। হবে না। চোখের জলের ভিতর দিয়ে ভাঙাচোরা দেখায় চারধার। সেই অস্পষ্ট দৃষ্টির ভিতর দিয়েই ওরা চলে গেল। রিকশা যোজন-বিস্তৃত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পৃথিবীটা কী বিশাল!

একা-একা ঘরের দিকে ফিরছিলেন দু'জন। ব্রজগোপাল বললেন, আজ আর কোথাও বেরব না।

ঘরে এসে অন্ধকারেই বসলেন ননীবালা। বুকটা খামচে ধরে আছে চাপা একটা দুঃখ, একটা ব্যথা। একটু বাদেই নয়নতারা এসে লণ্ঠন জ্বালে। বিন্দু এসে ননীবালার চুল আঁচড়ে দিতে থাকে। বহেরু এসে বাইরের ঘরে তক্তপোশের তলায় মেঝেতে ব্রজগোপালের পায়ের কাছে বসে থাকে। তত্ত্বকথা শোনে। ষষ্ঠীচরণ তার বইপত্র নিয়ে এসে গুটি গুটি খোলা দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে। মতিরাম আনাচ-কানাচ দিয়ে ঘুরঘুর করে আর কুকুর-বেড়াল তাড়ায়। দিগম্বর খোল নিয়ে এসে বসে বাইরের ঘরের কোণে। ষষ্ঠীর মা আসে খোঁজ নিতে, বহেরুর বউ আসে। ঘর ভরে যায়। মানুষজন বড় ভালবাসেন ব্রজঠাকুর। মানুষজনও তাই তাঁকে ভালবাসে। ননীবালার খারাপ লাগে না। ওরা এসে চলে গেল বলে যে দুঃখটা ছিল তা উবে গেল মুহূর্তের মধ্যে। একটু বাদেই তিনি হেসে কথা বলতে থাকেন। এখানে তিনি কর্ত্রী, ব্রজবামুনের বামনি ঠাকরুন, তাঁর দাম অনেক।

॥ ছিয়াত্তর ॥

রিখিয়াদের বাড়ির ফোন অনেকক্ষণ ধরে বাজল। এ-পাশে সোমেন কান পেতে সেই গুড়ুক গুড়ুক তামাক খাওয়ার মতো শব্দ শুনছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফোন কেউ ধরল না। ঘড়ি ধরে প্রায় সাত মিনিট।

কী আর করে সোমেন, হতাশ হয়ে ফোন রেখে দিল। ওরা হয়তো কেউ বাড়িতে নেই। কিংবা কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি তো! এমনও হতে পারে যে, ফোনটাই খারাপ।

রিখিয়ার সঙ্গে এক বার মুখোমুখি দেখা হলে বড় ভাল হত। কিন্তু আর তো সময় নেই। কাল বিকেলের ডাকে বিজয়নগর ইস্কুল থেকে একটা চিঠি এসেছে! আজকের তারিখে চাকরিতে যোগ দিতে হবে।

জায়গাটা কত দূরে তা সঠিক জানে না সোমেন। তবে, ইস্কুলের চিঠিতে পথের হদিশ দেওয়া আছে। ট্রেনে ক্যানিং, সেখান থেকে লঞ্চ ধরে গোসাবা। গোসাবার ঘাটে ওরা নৌকো রাখবে। নৌকোয় আরও ঘণ্টাখানেকের পথ, তারপর খানিকটা হাঁটা। সুন্দরবনের একদম কোলের মধ্যে।

কত কিছু হওয়ার কথা ছিল সোমেনের। হল না। না হল আমেরিকায় যাওয়া, না হল বন্ধুর সঙ্গে ঠিকাদারি ব্যবসা। লক্ষ্মণদা গিয়ে কোনও আশা ভরসার চিঠি দিলেন না সোমেনকে। বোধহয় ভুলেই গেছেন।

বাড়িটা আজকাল খাঁ-খাঁ লাগে। যত দিন যায় তত মায়ের কথা মনে পড়ে। আর শুধুই মা নয়, আরও একটা কী যেন অভাবের হাহাকার বুকের মধ্যে কুয়ো খোঁড়ে দিনরাত। সেটা যে কী তা বোঝা যায় না, ভাষা দিয়ে কিছুতেই তার চেহারা ফোটে না। মনে হয়, কী যেন নেই, কী যেন থাকার কথা

ছিল। যখন অপালা, পূর্বা, শ্যামলদের সঙ্গে রইরই আড্ডা হয়, সিনেমায় যায়, বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরে, ফুটবল মাঠে গিয়ে চেঁচায়, টেস্ট ক্রিকেট দেখতে ভোর রাতে গিয়ে রঞ্জি স্টেডিয়ামে লাইন দেয়, তখনও হঠাৎ হঠাৎ ওই এক ভুতুড়ে কী-নেই কী-নেই ব্যাকুলতায় বুকটা খালি খালি লাগে।

সোমেন সবচেয়ে কম যায় রিখিয়াদের বাড়িতে। বরাবরই সে স্বভাবে লাজুক। আজকাল সে অমোঘভাবে বুঝে গেছে, রিখিয়ার মতো কেউ তাকে এত চুম্বকের মতো টানে না। সমস্ত কাজকর্ম, অন্যমনস্কতার ভিতরেও অলক্ষিতে তার ভিতরে একটা কাঁটা থর থর করে কেঁপে কেঁপে একটা দিক নির্দেশ করে। যে ঘরে কাঁটাটা গিয়ে কাঁপে সেই হচ্ছে রিখিয়ার ঘর। যখনই এটা টের পেল সোমেন তখনই হাতে-পায়ে লজ্জার ভার এসে চেপে ধরল। আজকাল সে কেবলই ভাবে—ছিঃ, বেশি গেলে ও আমাকে হ্যাংলা ভাববে।

কলকাতায় থেকে আর লাভও নেই সোমেনের। পত্রিকা দেখে মফস্‌সলের স্কুলে কয়েকটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। কয়েকটা স্কুল থেকে ইন্টারভিউ এল। শুধু বিজয়নগর স্কুলই সরাসরি নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। চিঠিটা পেয়ে অনেক ভেবেছে সোমেন। বউদি আর দাদাও শুনেছে।

রাত্রে দাদা খেতে বসে বলল, সুন্দরবন! সেখানে তো খুব বাঘের উপদ্রব হয়েছে শুনি।

বউদি প্রতিবাদ করে বলল, আহা, মানুষ বুঝি তা বলে আর সেখানে নেই!

দাদা মাথা নেড়ে বলে, থাকগে। সোমেনকে যেতে হবে না অত দূরে। মা চলে গেল, বাবা চলে গেল, এখন সোমেন গেলে বাড়িতে টেকা যাবে না। তুই যাবি না সোমেন।

বউদি অবশ্য চুপ করে রইল। কিন্তু সোমেন জানে, বউদির এ-ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। সূক্ষ্ম এক ধরনের অনাদর যেন সে আজকাল টের পায়।

রাতে ঘুম হয়নি। সারারাত প্রায় সিগারেট খেতে খেতে ভেবেছে। যাবে কি যাবে না! এতদিনকার কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবতে বড় কষ্ট হয়। আবার ভাবে, থেকেই বা হবে কী!

খুব ভোরবেলার দিকে হঠাৎ খুব শান্তভাবে সে সিদ্ধান্ত নিল। যাবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে ম্যাক্স-এর একটা সুদূর প্রভাব কাজ করেছিল তার মনে। সে ম্যাক্সকে দেখেছে, পড়াশুনো ফেলে রেখে যখন-তখন বেরিয়ে পড়ত গ্রামে-গঞ্জে, সুদূর দুর্গম অঞ্চলে। পয়সাকড়ির চিন্তাও করত না। কখনও গাড়িতে, কখনও পায়ে হেঁটে, যেমন-তেমন করে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে দেখে গেছে ম্যাক্স। শরীরে কোনও আলস্য ছিল না রোগা সাহেবটার, মনে ছিল না কোনও জড়তা বা বন্ধন। সে যেন এই বিশাল দুনিয়ায় এক সদানন্দ মুক্ত পুরুষ, কোথাও নোঙর বাঁধেনি। অনেক চোখে-দেখা, উপলব্ধি করা জ্ঞান ঝুলি ভরে নিয়ে গেছে ম্যাক্স। সোমেনকে সে প্রায়ই বলত, তোমরা কী করে বসে বসে অলস সময় কাটাও? তোমার দেশের লোকের অনেক কাজ পড়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের কর্মের কথা বলেননি? আর কিছু না পারো, বেরিয়ে পড়ো দেশ দেখতে। তোমার দেশটা কেমন তাও তুমি জানো না সোমেন। শুধু কলকাতা নিয়ে পড়ে আছ।

ম্যাক্স-এর সে-সব কথা বড্ড মনে পড়ে সোমেনের। সত্যিই তো, দেশটার কিছু অন্তত তার দেখা দরকার। তা ছাড়া, ইদানীং সংসারের ওপর তার একটা অবুঝ অভিমান জন্ম নিয়েছে। কেবলই তার মনে হয়, কেউ তাকে বোঝে না, ভালবাসে না, আপন বলে ভাবে না। তার নিজের মানুষ কেউই বুঝি নেই।

বিজয়নগর যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করে সে ভোরে উঠে সুটকেস গুছিয়েছে নিজেই। বিছানা বেঁধেছে।

ঘুম থেকে উঠে বউদি বলল, ও মা! এ কি! যাচ্ছ নাকি?

যাই বউদি। কিছু একটা করা দরকার।

আমি তো তাই বলি। কিন্তু তোমার দাদাকে বুঝিয়ে বলে যাও, নইলে আবার অস্থির হবেন।

রণেন উঠে সব শুনেটুনে কেমন উদাস হয়ে যায়। বলে, চলে যাচ্ছিস? তোকে এখনও আমি খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে পারি।

সে তো রেখেছই। তবু একটু ছেড়ে দাও এবার। ভাল না লাগলে চলে আসব।

রণেন কী ভেবে অনেকক্ষণ বাদে বলল, যা।

ক্যানিং-এর গাড়ি পৌনে সাতটায়। স্টেশনে এসেই রিখিয়ার বাড়িতে ফোন করবে বলে ডাক্তারখানায় গেল। দোকানটা খোলেনি তখনও। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বিপিন কম্পাউন্ডারকে তুলে নিষ্ফল টেলিফোন করে সোমেন ফিরে আসে স্টেশনে। গলায় একটা কান্নার দলা ঠেলা মারছে। চলে যাচ্ছি রিখিয়া।

গাড়ি আসে।

স্বপ্নের ভিতর দিয়ে সোমেন যেতে থাকে। ভাবনার ঘোরের আচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে সে ক্যানিং-এর দীর্ঘ বাঁধের রাস্তা পার হয়। পুরনো আমলের লঞ্চ, জোয়ার ঠেলে ঘাটে ঘাটে ঠেকে আস্তে ধীরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে কলকাতা থেকে দূরে। দেশের গভীর বুকের মধ্যে।

গোসাবার ঘাটে নৌকো ছিল। একজন কালো, লম্বামতো সরল লোক, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, দু'জন মাঝি সমেত অপেক্ষায় ছিল। পরিচয় দেওয়ার আগেই তারা কী করে যেন চিনে ফেলল সোমেনকে। লম্বা লোকটা বলল, যেতে তো দেরি হয়ে যাবে। এখনই বেলা একটা প্রায়। এখানেই এক বাড়িতে আপনার জন্য রান্না করা আছে।

এ জায়গাকে একসময়ে লন্ডন অফ দি ইস্ট বলা হত। হ্যামিলটন সাহেবের কুঠিবাড়ি আছে এখানে। কিন্তু এ গঞ্জে একটুও ভাল রাস্তাঘাট নেই, মোটরগাড়ি বা রিকশাও নেই। এক আদিম পৃথিবীর দরজা খুলে গঞ্জটা বসে আছে। যে-বাড়িতে খেল সোমেন তা গেরস্তবাড়ি। খুব যত্ন করল।

গোসাবা ছেড়ে পড়ন্তবেলায় ছোট নদী বেয়ে নৌকো তাকে নিয়ে চলল কোন অজানা রাজ্যের মধ্যে। দু'ধারে হেতালের বন, গোমো গাছের সারি, শুকনো পাতা ঝরছে। নিশ্ছিদ্র নীরবতা। ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুর মতো হিম শীত।

কলকাতায় এখন আর তত শীত নেই। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ চলছে। কিন্তু এখানে শীতের কামড় বসে আছে। নদীর ওপরে একটু ভাসা বাতাস। ঘোলাটে কুয়াশা। লালচে রোদ গাছগাছালির দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে।

লম্বা লোকটা ওই স্কুলের সেক্রেটারি। বলল, এখন কোনও ভয়টয় নেই। সাপখোপ এ-সময়ে থাকে না।

বাঘ?

লোকটা হেসে বলে, বাঘ কোথায়? সে অনেক দূর সেই রিজার্ভ ফরেস্টে। দুই-আড়াই মাইল হবে।

বাঘের কথা অবশ্য মোটেই চিন্তা করছিল না সোমেন, এমনিই মনে পড়ল বলে বলল। সে ঝুঁকে নদীর ঠান্ডা চলন্ত জলে হাত দিয়ে এককোষ জল তুলে ছিটিয়ে দিল। দুলে দুলে নৌকো যাচ্ছে।

সেক্রেটারির চিঠিতে গোটা তিনেক ভুল ইংরিজি ছিল, মনে পড়ল সোমেনের। একটু হাসি পেল। কিন্তু লোকটা এমনিতে বেশ আলাপী। ভাল লোক, না মন্দ লোক তা বুঝতে কিছু সময় লাগবে সোমেনের।

লোকটা ইস্কুলের এক গণেশবাবুর নিন্দে করছিল খুব। বার বার বলল, ওদের গ্রুপের সঙ্গে একদম মিশবেন না কিন্তু। ইস্কুলটার ওরাই সর্বনাশ করছে।

এ-সব কথা সোমেনের গভীরে পৌঁছোয় না। সে শুধু ভাবে, এখানকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, গভীর নিস্তব্ধতা আর নিঃসঙ্গ সময় তার কেমন লাগবে?

মাইলের পর মাইল কোনও গ্রামের চিহ্ন প্রায় নেই। এক-আধটা ছোট গাঁ-ঘর দেখা যায় বটে,

তারপর অনেকটা ফাঁকা। নদীর ধারে কোনও মানুষ, কুকুর, বেড়াল কিছু চোখে পড়ে না।

নৌকো ভিড়ল এক আঘাটায়। ভাটির টানে জল সরে গিয়ে গোড়ালি-ডুব কাদা বেরিয়ে পড়েছে। টকটকে লাল রঙের হাজার হাজার কাঁকড়া হালকা পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাদার ওপর। মানুষের সাড়া পেয়ে মাটিতে সেঁধিয়ে গেল।

কাদায় পা দিতে হল না সোমেনকে। মাঝি দু'জন তাকে কাঁধে বয়ে পিছল খাড়া পাড় বেয়ে বাঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। মালপত্র তুলে নৌকোটা টেনে হড় হড় করে কাদায় এনে ফেলল। তারপর রওনা দিল সবাই। আদিগন্ত মাঠ ভেঙে পথ আর ফুরোয় না। টিয়ার ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। গভীর ছায়া ঘনিয়ে আসছে মাঠে। দূরে এক সবুজাভ গভীর বনের রেখা দেখা যায়। সেক্রেটারি দেখিয়ে বলল, ওই ওখানে বড় নদীর ধারে রিজার্ভ ফরেস্ট।

সোমেন বৈরাগ্যভরে দেখল। এদিকে রাস্তাঘাট নেই। যানবাহন চলে না। বহেরুর গ্রাম এর তুলনায় অনেক আধুনিক।

সেক্রেটারি বলল, ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এখনও তেমন কিছু হয়নি।

কলকাতা থেকে কত দূরে যে এসে পড়ল সোমেন! শীতের সন্ধ্যার মতোই ভার আর বিষণ্ণ হয়ে গেল মনটা। বড অনাত্মীয় এই গ্রাম। বড় অচেনা। মনটা খারাপ হতেই ফের ম্যাক্স-এর মুখ মনে পড়ে গেল। রোগা, তীব্র কৌতূহলে ভরা একখানা মুখ। পোড়-খাওয়া, রোদে জলে ঘাতসহ একটা চেহারা। পৃথিবীর মানুষ।

ইস্কুলের সায়েন্সরুমের এক পাশে চৌকি পাতা। হারিকেন জ্বলছে।

এইখানেই থাকবেন। ইস্কুলের বেয়ারাও থাকে, রান্নাবান্নাও সেই করে দেবেখন।

সন্ধেবেলা কয়েকজন দেখা করতে এল। অন্য রকম মানুষ সব। কেউ বেশি চালাক-চালাক কথা বলে। কেউ একটু ঠেস দিয়ে দু'-চারটে বাক্য বলে। দু'-একজন বেশ গম্ভীর। সে এসেছে বলে কেউ কি খুশি হয়েছে? কিংবা দুঃখিত? বুঝল না সোমেন। হারিকেনের আলোয় সে তো ভাল দেখতে পায় না। অভ্যাস নেই।

দিন যায়। রাত যায়। ক্যালেন্ডার দেখে না সোমেন। ইস্কুলের সময়ে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে বহু দূর থেকে ছেলেদের আসতে দেখে। যেন ওরা মাটির ভিতর থেকে উদ্ভিদের মতো জন্ম নিয়ে চলে আসছে, আবার ছুটি হলে ফিরে যাবে মাটির তলায়। রাত হলে সারা ইস্কুলবাড়িটায় ফাঁকা নির্জনতায় হাওয়া বয়ে আসে অদূর সমুদ্র থেকে। কত দেশ-দেশান্তরের কথা বলে।

কয়েকবারই পৌঁছ-সংবাদ দেবে বলে পোস্টকার্ডে ঠিকানা লিখে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত কাউকেই চিঠি দিল না। বুকজোড়া কেন যে এই অভিমান! মনে হয়, তাকে কেউ বুঝল না, চিনল না, ভালবাসল না। তার জন্য কে ভাবছে বুকভরা দুঃখ নিয়ে? কেউ না।

সারাটা দিন প্রায়ই কাজ থাকে না। চার-পাঁচটা ক্লাস করে সোমেন। তারপরই কর্মহীনতা। দু'-চারজন তাস খেলতে নিয়ে গেছে কয়েকবার। এক রাতে যাত্রা দেখল। দুটো বিয়ের প্রস্তাব এসে গেল এর মধ্যেই। ছাত্রদের বাড়ি থেকে প্রায় সময়েই নানা রকম ফল, সবজি বা মাছও আসে। মাসখানেকের মধ্যে দু'-চারজন ছেলে লণ্ঠন ঝুলিয়ে চলে এল প্রাইভেট পড়তে, সন্ধেবেলাটায় কাজ পেয়ে বেঁচে গেল সোমেন। মাথাপিছু কুড়ি টাকা মাসে, তাতে প্রায় আশি টাকা বাড়তি রোজগার।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই একদিন ঠিক করল, কলকাতা যাবে। ভেবে শনিবার টিফিনে ছুটি করে নিয়ে সাজগোজও করে ফেলল সে। ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি। হঠাৎ বেরোবার মুখে হার্ট অ্যাটাকের মতো একটা অভিমানের যন্ত্রণা দেখা দিল বুকে। কেন যাব? কার কাছে যাব? আমার তো কেউ নেই।

সাজ খুলে না-ফেলেই অনেকক্ষণ বসে রইল সোমেন। জানালা দিয়ে পুকুরঘাটে গাছের ছায়ায় চেয়ে রইল। একটা গরিব মেয়ে কচুর শাক তুলছে। অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সেদিকে। ভাবল, এ

জায়গায় যত দিন মন না বসছে তত দিন কলকাতায় না যাওয়াই ভাল। তা হলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না।

গেল না সোমেন। সে কাউকে চিঠি দেয়নি, ঠিকানা জানায়নি। সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। এ অবস্থাটা আরও কিছুদিন চলুক। চার দিকে তার খোঁজ হোক। তারপর দেখা যাবে।

একদিন ছুটির দুপুরে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল সোমেন। ব্রাহ্মণভোজনের একটা নিমন্ত্রণ ছিল এক বাড়িতে। খুব খাওয়া হয়েছে। এক টাকা দক্ষিণাও পেয়েছে। একজন বুড়ো লোক নেমতন্ন-বাড়িতে তাকে ডেকে বলল, আমার বাবার বাৎসরিকে মন্ত্রটা সামনের রোববার একটু পড়িয়ে দেবেন মাস্টারমশাই?

সোমেন বলে, মন্ত্র তো জানি না।

লোকটা বিশ্বাস করে না, কেবল বলে, ও আর জানাজানি কী! বিপ্রের ছেলে। আপনারা অং বং যা বলবেন তা-ই মন্ত্র। রক্তটা তো গায়ে আছে।

সোমেন সেই কথা ভেবে আপনমনে হাসে। ক্ষতি কী? একখানা পুরোহিত দর্পণ জোগাড় করে অবসর সময়ে বসে শিখে নেবে। তার বাবা ব্রজগোপাল এ-রকম কত করেছেন।

ভেবেই হঠাৎ থমকে গেল সোমেন। মনটা পাশ ফিরল। বাবা! আরে, সোমেনও যে ঠিক তার বাবার মতোই হয়ে যাচ্ছে। এই রকমই এক অভিমানে তার বাবাও গিয়েছিলেন স্বেচ্ছানির্বাসনে। দূরে বসে একটা জীবন সকলের মঙ্গল চেয়েছেন। ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন, ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

সোমেন ঠ্যাং নাচানো বন্ধ করে উঠে বসল। বুকে একটা চাপা বেদনার দম আটকানো ব্যথা। সবাইকে ছেড়ে সে চলে এসেছে কত দূরে। এই নিঝুম দুপুরে বসে সে হঠাৎ বুঝতে পারে আজ, কারও ওপর রাগ করে থাকার, অভিমান করে থাকার কোনও মানেই হয় না। সেটা ভীষণ বোকামি হবে।

একটা বাঁধানো খাতায় কয়েকটা কবিতা লিখেছিল সে। সেই খাতাখানার মাঝখানে একটা সাদা পাতা বের করে সে গভীর মনোযোগে সুন্দর হাতের লেখায় লিখল— ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

লিখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল লেখাটার দিকে। একসময়ে চোখের জলে দৃষ্টি ছেয়ে গেল। ঝাপসা হয়ে আসে বাক্যটি। সোমেন উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু কাঁদে।

তিন মাস পেরিয়ে চার মাসে পড়ল সোমেনের চাকরি। এবার গ্রীষ্মের ছুটি হবে। বড় অসহায় লাগে সোমেনের। দুঃসহ এই ছুটি কী করে কাটাবে সে।

এর মধ্যে সে অনেকবার গোসাবায় গেছে। সুন্দরবনে ঘুরে বেড়িয়েছে, পক্ষী-আবাস দেখতে গেছে। এ অঞ্চলটা ক্রমশ তার অভিজ্ঞতায় চলে আসছে। স্কুলের সবাই তাকে পছন্দ করছে আজকাল। তার সুন্দর চেহারাটি, তার নম্র কথাবার্তা, এ-সবই তার বরাবরের মূলধন ছিল। কদাচিৎ কেউ তার শত্রু হয়েছে। সোমেন জানে, মানুষকে ভোলাবার সহজাত ক্ষমতা রয়েছে তার। কয়েকটা মেয়ের বাপ বড় জ্বালাতন করে আজকাল, তার বাবার ঠিকানা চায়। এ ছাড়া এ অঞ্চলে তার আর কোনও ঝামেলা নেই। কিন্তু এই ছুটি কাটানো বড় মুশকিল হবে।

কলকাতায় যাবে? না, সেটা ঠিক হবে না। সোমেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

মে মাসের গোড়ায় কলকাতার নামজাদা এক সাপ্তাহিকে তার একটা কবিতা বেরোল। ক্যানিংয়ে লোক গেলে সে মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকা আনিয়ে নেয়। একদিন এ-রকমই আনানো কাগজে নিজের কবিতা দেখে বড় অবাক হয়ে গেল সে। অনেক জায়গায় পাঠিয়েছিল কবিতা, এই প্রথম ছাপা হল বড় কাগজে।

খুব কি আনন্দ হল সোমেনের?

না। কারণ, এখানে তার আনন্দে আনন্দ করার কোনও ভাগীদার নেই। আনন্দ তো একার জন্য নয়।

নিজেকেই সে প্রশ্ন করল, জীবনের সব ক্ষেত্রেই কি কথাটা সত্যি নয় সোমেন? জীবনে একা-একা কোনও উপভোগ হয় না। জীবনে যত রকমের আনন্দ আছে তার সবই ভাগ করে নিতে হয়।

মাঝখানে দাড়ি কেটে ফেলেছিল সোমেন। এখন আবার রাখছে। তার দাড়ির রং অল্প লালচে আর নরম। গালে হাত বোলালে রেশমের স্পর্শ পাওয়া যায়। চুলও ছাঁটে না অনেক দিন। অল্প ঢেউ-খেলানো চুল প্রায় কাঁধে নেমে এল। তার কাছে আয়না নেই। চিরুনিরও ব্যবহার খুব কম। চেহারাটা কেমন দেখতে হয়েছে আজকাল তা তার জানা হয় না। চেহারা নিয়ে কোনও ভাবনাও নেই তার। তাকে সুন্দর দেখলে খুশি হয় এমন মানুষজন থেকে সে বহু দূরে রয়েছে। এখন তার কেমন একটা আপনভোলা অবস্থা।

সে আজকাল মাছের জাল ফেলতে শিখেছে, নৌকো বাইতে পারে, অল্পস্বল্প চাষবাসেরও অভিজ্ঞতা হয়েছে। আগে গাছপালা চিনত না, অড়হর গাছকে ভাং গাছ বলে ভুল করত। এখন সে-সব ভুল বড় একটা হয় না। ইস্কুলের জমি কুপিয়ে চমৎকার বাগান বানিয়ে ফেলেছে। এইভাবে সে এখানকার আবহাওয়ায় নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চাইছে প্রাণপণে। মাঝে মাঝে ভাবে— এখানেই একটা যে-কোনও মেয়েকে বিয়ে করে ফেলি না কেন? হয়ে যাই এখানকার স্থায়ী লোক?

যেই ভাবে অমনি অলক্ষ্যে মেঘগর্জনের মতো ডেকে ওঠে এক অন্ধ ও সতর্ক কুকুর। চোখে ঝলসে যায় একটা ক্যামেরার লেনস। এ তার একটা মনোরোগ। কেন যে বার বার সেই কুকুরটার কথা মনে পড়ে, আর সেই ক্যামেরার মস্ত একচক্ষু গভীর কাচ!

সে কি খুব বিখ্যাত কবি হবে একদিন? কিছু একটা হবে? মানুষের মতো মানুষ কোনও? না কি, হয়ে থাকবে এক অসফল ও অভিমানী মানুষ? কিংবা এক ব্যর্থ প্রেমিক? আস্তে আস্তে সে কি হয়ে যাবে একদিন গেঁয়ো কবিয়াল?

বেশ শোরগোল তুলে রবীন্দ্রজয়ন্তী করাল সে ছেলেদের দিয়ে। গ্রীষ্মের ছুটির দিন নিজের লেখা একটা নাটক অভিনয় করাল। লোক ভেঙে এল দেখতে। সারাক্ষণ দেখলও সবাই চোখ কান মন দিয়ে। খুব একটা আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেল সে। নাটকের পর অনেকে এসে পিঠ চাপড়াল।

তবে কি তার ভবিষ্যৎ বাঁধা আছে নাটকের সঙ্গে?

ঠিক বুঝতে পারে না।

গ্রীষ্মের ছুটি পড়তেই দুরন্ত গরমের মধ্যে সে এক বার বেরোল পদযাত্রায়। গাঁয়ে গাঁয়ে অনেক চেনা হয়ে গেছে। কোথাও তেমন অসুবিধে হয় না। রাস্তাঘাট নেই, যানবাহন নেই, মাঠ-ময়দান পেরিয়ে তবু চলে যেতে আজকাল তার অসুবিধে হয় না। বর্ষার কাদা অনায়াসে ভাঙে। চার মাসে সে এক-জীবনের অভ্যাস অর্জন করেছে।

একদিন গোসাবার নদীর ধারে জ্যোৎস্নারাত্রে বসে ছিল আদিনাথ নামে আর-একজন মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে। গত দু'দিন সে আদিনাথের বাড়িতে আছে। খুব খাতিরযত্ন করে আদিনাথ, কিন্তু তার সঙ্গে সোমেনের মনের পার্থক্য অনেক। সোমেন যেমন গভীরভাবে ভাবতে পারে, অনুভব কবতে পারে, আদিনাথ তা পারে না। রাত বারোটার বিপুল জ্যোৎস্নার রহস্যানুভূতি সোমেন যেমন টের পায়, আদিনাথ পায় না। বার বার সে একটা নৌকো চুরির গল্প বলার চেষ্টা করে অবশেষে কাত হয়ে শুয়ে ঘাসে ঘুমোতে লাগল। একা বসে জেগে থাকে সোমেন। পৃথিবীতে এখন সে সম্পূর্ণ একা। যেখানে সে বসে আছে তার বিশ হাত পিছনে আদিনাথের ঘুমন্ত বাড়ি। কেউ কোথাও জেগে নেই। বসে থেকে সোমেন জলে জ্যোৎস্না দেখে। কোনও মানে হয় না এই জেগে বসে থাকার, তবু থাকে। একটা আচ্ছন্ন মাতলা ভাব। ভিতরে এক অবিরল অস্থিরতা। কেবলই মনে হয়, কী নেই! কী একটা নেই যেন!

সে কি মেয়েমানুষ, সোমেন? নিজেকেই প্রশ্ন করে সে। নিজেই ভেবেচিন্তে বলে, হবেও বা। মেয়েমানুষ বউ হয়ে এসে জীবনের অনেকখানি একাকিত্ব কেড়ে নেয় বটে, কিন্তু সবটুকু কি পারে নিয়ে নিতে? পারবে কি কিশোরী রিখিয়া?

রিখিয়ার কথা কেন যে ভাবে সোমেন! ভাবার কোনও মানেই হয় না। সে তো এক গেঁয়ো ইস্কুলমাস্টার হয়ে গেল ক্রমে। রিখিয়াদের বাড়ির মাপ মতো পাত্র তো সে নয়। তবে ভেবে কী হবে। তার ভাগ্য তাকে সফলতা দেয়নি, কিছুই হতে দেয়নি জীবনে। তবে কেন এই চাঁদের দিকে দু'হাত বাড়ানো ভিখিরির মতো? দেশে তার মতো কত লক্ষ লক্ষ ছেলে তারই মতো অসফল জীবনযাপন করছে। সে তবু যাহোক একটা কাজ পেয়েছে, কত ছেলে তাও পায়নি। গণেশবাবুর দলের সঙ্গে সেক্রেটারির গণ্ডগোল ছিল বলেই সেক্রেটারি তাড়াহুড়ো করে বাইরের ছেলে সোমেনকে চাকরি দিয়েছিল। নইলে এই সামান্য মাস্টারিটুকুর জন্যও উমেদার কম ছিল না, এখানে এসেই সে খবর পেয়েছে। এ কি তার সৌভাগ্য নয়?

সোমেন নিজেকে বলে, এর চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার ছিল না তোমার।

গাব্বুকে এখন কে পড়াচ্ছে? অণিমা কি ফিরল শ্বশুরবাড়ি থেকে? ওর বাচ্চা-টাচ্চা হবে কি? অপালা কি মিহির বোসকে এখনও খেলাচ্ছে? পূর্বার বুঝি এখনও কোনও প্রেম হল না, বিয়ে হবে কি? অনেক দিন হেমন্তকে দেখে না সোমেন, গেস্টকিন ছেড়ে বম্বে যাবে বলেছিল, চলে গেছে নাকি! একে একে বুবাই-টুবাই, বেলকুঁড়ি, ননীচোর, বড়দির বাচ্চাটা সকলের কথা মনে পড়ে।

বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের খাঁজে একটা জোঁক লেগেছে। প্রথম প্রথম এ অঞ্চলে এসে গায়ে জোঁক লাগলে টের পেত না সে, আজকাল পায়। জোঁকটা আঙুলে টিপে ধরে ছাড়িয়ে আনল সে। ছুড়ে জলে ফেলে দিল। তারপর আদিনাথকে ডেকে বলল, চলো, শুয়ে পড়ি ঘরে।

হাই তুলে আদিনাথ উঠে বসে বলল, জ্যোৎস্নায় আর হাওয়ায় ঘুমটা এত জমে!

ঘুমের সঙ্গে জ্যোৎস্নার কী সম্পর্ক তা না-ভেবেই সোমেন অন্যমনস্কভাবে 'হুঁ' দিয়ে হাঁটতে থাকে। তখন টের পায়, বুকে এখনও একখানা আস্ত পাথরের মতো অভিমান জমে আছে। সকলের ওপর, গোটা পৃথিবীর ওপর তার রাগ।

রিখিয়ার ওপরও। কিন্তু রিখিয়া তো কোনও দোষ করেনি। সোমেনের তবু অভিযোগ, কেন রিখিয়া অত বড়লোকের ঘরে জন্মাল? যদি আমাদের মতো ঘরে জন্ম নিতে তুমি রিখিয়া, তবে কবে তোমাকে বউ করে নিয়ে আসতাম এই সুন্দরবনের গাঁয়ে। কুঁড়েঘরে ডেরা বাঁধতাম।

মাস ছয়েক আগে এক শীতের বিকেলে রিখিয়াদের বাড়ি গিয়েছিল সোমেন। সেই শেষবার। তারপর আর যাওয়া হয়নি।

রিখিয়া বসে ছিল দোতলার বারান্দায়, রেলিঙে হাত, হাতের ওপর থুতনি। একটু কৃশ হয়েছে, একটু গম্ভীরও। তাকে ফটক দিয়ে ঢুকতে দেখেই উঠে ঘরে চলে গেল। হাসল না পর্যন্ত। রাগ হয়েছিল সোমেনের।

স্বভাবসংকোচের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে যেমনি দোতলায় পা দিয়েছে সোমেন, অমনি এক কপাটের আড়াল থেকে আধখানা বেরিয়ে এসে থমথমে মুখে রিখিয়া বলল, খুব, না?

কী খুব?

এমনিতেই আমাদের মন ভাল নেই, তার ওপর আবার একজনের এমন অহংকার হয়েছে আজকাল।

সোমেন একটু লাল হয়ে বলে, মন ভাল নেই কেন?

বাবা লন্ডন থেকে ঘুরে এল। দাদা ওখানে বিয়ে করেছে।

ওঃ। সোমেন খুব অবাক হয় না। বলে, আমার অহংকার কীসে দেখলে? বরং আমি লজ্জায় আসতে পারি না।

তুমি ভীষণ অহংকারী।

'তুমি' শুনে কেঁপে গেল সোমেন। কথা এল না মুখে।

রিখিয়া তক্ষুনি ভুল সংশোধন করে বলল, মা পথ চেয়ে থাকে, রোজ জিজ্ঞেস করে, ওরে, সোমেন আসে না? মা'র ধারণা, আমি একজনের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তাই একজন আসছে না।

সেই 'একজন' যে সে নিজেই তা ভেবে এই এত দিন পরেও গা শিউরে ওঠে। মন আনচান করে সোমেনের।

সোমেন রিখিয়ার দিকে চেয়ে বলল, আবার আপনি-আজ্ঞে হচ্ছে কেন? দিব্বি তো তুমি করে বলে ফেলেছ। ওটাই চলুক।

রিখিয়া জিভ কেটে বলে, ওমা, কখন বললাম! যাঃ। ওটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

সেদিন চলে আসবার আগে রিখিয়া পরদার কাছে কেমন একভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। অকপট চোখে নির্লজ্জের মতো দেখছিল সোমেনকে। দুটি বড় বড় চোখ ভরে নিথর মুগ্ধতা। নিচু স্বরে বলল, শোনো, বিদেশে যেয়ো না।

যাচ্ছি না।

আমার মন ভীষণ খারাপ। তুমি কেন আসো না?

সোমেন বলল, লজ্জা করে। ভীষণ।

একদিন তোমাদের বাসায় নিয়েও গেলে না বেড়াতে। বেশ!

সোমেন একটা গভীর শ্বাস চেপে রেখে বলল, নিয়ে যাব একদিন।

দেখব কেমন নিয়ে যাও!

নিশুত রাতে আদিনাথের বাইরের ঘরে একা বিছানায় উঠে বসল সোমেন। চলে যেতে ইচ্ছে করছে। এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

প্রবল মনের জোরে নিজেকে ঠেকাল সোমেন, যেমন স্রোতের উজানে নৌকোকে কষ্টে নিয়ে যেতে হয় তেমনি এক অসম্ভব কষ্টে উজিয়ে আনল নিজের মনকে। তবু স্রোত টানে। অন্ধের মতো টানে।

॥ সাতাত্তর ॥

স্কুল খুলতে আর মোটে দশ দিন বাকি। বাসন্তী থেকে লঞ্চে ফিরতে একটা লোকের বগলে খবরের কাগজ দেখে চেয়ে নিয়েছিল সোমেন। রবিবারের বড় কাগজ দেখতে দেখতে দুইয়ের পাতায় 'নিরুদ্দিষ্টের প্রতি' কলমে চোখ আটকে গেল। এ-কলমে অনেক মজার বিজ্ঞাপন বেরোয় বলে সোমেন নিয়মিত পড়ে। আজ দেখল, প্রথম বিজ্ঞাপনেই তার একটা অস্পষ্ট ছবি, নীচে লেখা— সোমেন, কোথায় আছ ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দাও। সবাই আমরা চিন্তিত। মা-বাবা শয্যাশায়ী। দাদা রণেন।

বিজ্ঞাপন দেখে হঠাৎ হেসে ফেলে সোমেন।

তারপর গম্ভীর মুখে দাড়িতে হাত বোলায়। খবর না-দেওয়াটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

কলেজ-ঘাটে লঞ্চ লাগতেই নেমে পড়ল সোমেন। সেখান থেকেই ক্যানিংয়ের ফিরতি লঞ্চ ধরল দুপুরে।

সন্ধেবেলা যখন ঢাকুরিয়ার বাড়িতে ঢুকছে তখন তার পরনে সাধারণ পাজামা আর পাঞ্জাবি, গালে দাড়ি, কাঁধে ঝোলা, মুখে একটু অপরাধী হাসি।

দাদা বউদি প্রথমে চিনতেই পারেনি কয়েক সেকেন্ড, তারপর হইচই বেধে গেল। রণেন রেগে

গিয়ে চেঁচাতে থাকে, এ তুই কী হয়েছিস! আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার জোগাড়। প্রত্যেক দিন শীলা আর ইলা খবর নিয়ে যাচ্ছে। চার দিকে কান্নাকাটি। তোর বউদির অবস্থা নিজের চোখে দ্যাখ, কী রকম শুকিয়ে যাচ্ছে সব।

কথাটা মিথ্যে নয়। বউদি কেঁদেও ফেলল কথা বলতে গিয়ে। বলল, তোমাকে যেতে তো আমিই বলেছিলাম সোমেন। সেই অপরাধে দিনে দশবার মাথা খুঁড়ছি।

মা-বাবা শয্যাশায়ী বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছ। সত্যি নাকি?

না। খবর দিলে দু'জনেরই স্ট্রোক হয়ে যেত। প্রতি সপ্তাহেই চিঠিতে তোমার কথা লেখেন দু'জনে। তোমার চাকরির খবর দিয়েছি, নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা জানাইনি।

সোমেন ফের আড্ডা দিতে বেরোল। কলকাতাকে অনেক ঘিঞ্জি, ময়লা আর দূষিত বলে মনে হয়। জীবাণুর মতো মানুষ। এ কয় মাসে তো আর কলকাতা পালটায়নি। সোমেনের মন আর চোখই গেছে পালটে।

পরদিন সকালে বউদি সেফটি রেজার, জল আর আয়না সাজিয়ে দিয়ে বলল, জঙ্গল সাফ করো তো বাপু, সুন্দর মুখখানা একটু দেখি। নইলে বুঝতে পারছি না, আমাব দেওরটাই এল, না অন্য লোক দেওর সেজে এসেছে। কী কালো হয়ে গেছ সোমেন!

রোগা হইনি তো বউদি?

না, একই রকম।

সোমেন হাসল। বলল, তার মানে, একটু গত্তি লেগেছে গায়ে কী বলো? তোমরা তো নজর লাগার ভয়ে কাউকে 'মোটা হয়েছ' বলতে পারো না।

থুঃ থুঃ। বলে বউদি গায়ে থুথু ছিটোনোর ভাব করে বলল, রং-টা একদম জ্বলে গেছে। অমন রং কি আর ফিরে আসবে?

নোনা জল-হাওয়ায় ও-রকম হয়। রং দিয়ে হবেই বা কী বলো! কেউ তো পছন্দ করল না।

তাই বুঝি! বলে বউদি ঘরে গিয়ে তক্ষুনি দুটো নীল মুখবন্ধ খাম নিয়ে ফিরে এসে বলল, মনে ছিল না, কত দিন হল এসে পড়ে আছে। ঠিকানার লেখা দেখে তো মনে হয় পছন্দের লোকই লিখেছে।

সোমেন খাম দুটো নিয়ে সন্দেহে বীণার দিকে চেয়ে বলে, খুলে পড়োনি তো!

তেমন ভাব নাকি? আচ্ছা যা হোক। পড়লে পড়েছি। ঠিকানা দেবে না, নিরুদ্দেশ হয়ে থাকবে, তো আমরা করব কী? ঠিকানা জানা থাকলে কবে রি-ডাইরেক্ট করে দিতাম।

রিখিয়ার হাতের লেখা সোমেন চেনে। ঝরঝরে। পরিষ্কার, গোটা গোটা অক্ষর। প্রথম চিঠিটা এসেছিল দু'মাস আগে। ছোট্ট চিঠিতে লেখা-- কত দিন দেখা নেই। ভয় হচ্ছে, বিদেশে চলে যাননি তো? যাবেন না প্লিজ, তা হলে আমার কেউ থাকবে না।...

দ্বিতীয় চিঠিটা বড়। মাত্র সাত-আটদিন আগে এসেছে। রিখিয়া লিখেছে...যদি কখনও এমন ঘটে যে, আপনার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক রইল না। আমার কথা আপনার মনেও পড়বে না, জানি। আমার খুব মনে হবে। একদিন অনেক খুঁজে খুঁজে গিয়েছিলাম আপনাদের বাসায়। শুনলাম, মাস্টারি নিয়ে সুন্দরবনে গেছেন। কী ভীষণ কান্না পেয়েছিল শুনে। ঠিকানাটা পর্যন্ত জানাননি। কত ভয় হয় জানেন না তো। আপনি এ-রকম কেন? যদি চিঠি পান, তবে? তবে কী করবেন? বলে দিতে হবে? নাকি নিজের বুদ্ধিমতো কাজ করবেন? আমি বড় একা। কেন বোঝেন না?...

সোমেন মুখ তুলে বীণাকে বলল, রিখিয়া এসেছিল নাকি বউদি?

বীণা ভ্রূ কুঁচকে বলল, রিখিয়া মানে? মায়ের সেই সইয়ের মেয়ে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মস্ত গাড়ি করে একদিন তোমার খোঁজে এসে হাজির। বাচ্চাদের জন্য এত মিষ্টি আর খেলনা এনেছিল। ও কি তারই চিঠি?

হুঁ। সোমেন আস্তে বলে।

বেশ দেখতে। শ্যামলার মধ্যে মিষ্টি চেহারা। ভীষণ লাজুক। বিয়ে করো না ওকে সোমেন! করবে? তোমার দাদাকে বলি?

দূর! ওরা আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে কেন? আমার কী আছে?

বাজে বোকো না। ভালবেসে বিয়ে করবে, কার কী? দরকার হলে রেজিস্ট্রি করে রাখো, আমি সাক্ষী দেব।

দেবে? বলে হেসে ফেলল সোমেন। বলল, খুব চালাক হয়েছ শহরে থেকে থেকে, অ্যাঁ!

করবে বিয়ে? করো না, লক্ষ্মীটি। দাও তো চিঠিগুলো, দেখি কী লিখেছে।

সোমেন চিঠিগুলো দিয়ে দিল অনায়াসে।

বউদি পড়তে লাগল। পড়ে ভিজে চোখে চেয়ে বলল, আহা রে, কত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসে মেয়েটা। ওকে যদি ফিরিয়ে দাও সোমেন, তোমার সঙ্গে আমি আর কোনও দিন কথা বলব না।

সোমেন চুপ করে রইল।

সোমেন দাড়ি কামাল না, ফরসা জামা-কাপড় পরল না। খুব সাধারণভাবে একদিন চলে গেল রিখিয়াদের বাড়ি। তার শরীর জুড়ে এক তপ্ত জ্বরভাব। সমস্ত স্নায়ুগুলো টনটন করছে এক খ্যাপাটে আবেগে। যে-কোনও সময়ে সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে পারে।

রিখিয়া কোত্থেকে কীভাবে তাকে দেখেছে কে জানে, কিন্তু বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই, নীচের প্রকাণ্ড টবে একটা দেড় মানুষ উঁচু ঘর-সাজানো পামগাছের আড়াল থেকে লুকিয়ে ভরা চোখে দেখছিল তাকে। তখনও হাঁফাচ্ছে রিখিয়া।

সোমেন তাকে দেখতে পায়নি, স্নায়বিক এক অসহ্য তাড়নায় খুব দ্রুত উঠে গিয়েছিল মাঝসিঁড়ি অবধি।

তখন চাপা, জরুরি গলায় রিখিয়া ডাক দিল, শোনো!

খ্যাপা বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়াল সোমেন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, দাড়িতে চুলে এক জবরজং মূর্তি। খুব চেনা লোকও হুট করে চিনতে পারবে না। কিন্তু রিখিয়ার চোখ ভুল করবে কেন! আর, সেই ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যেই এমন একটা সতেজ সৌন্দর্য ফুটে উঠল সোমেনের যা রিখিয়া কখনও দেখেনি। সোমেনের সৌন্দর্যের মধ্যে এতকাল ছোট্ট একটু অভাব ছিল বুঝি, সে অভাব পূর্ণ হয়ে সোমেন এখন কানায় কানায় সেই পুরুষ, যার সম্পর্কে রিখিয়ার আর কোনও দ্বিধা নেই।

পামপাতার আড়ালে খুব সাধারণ একটা সাদা খোলের কালোপেড়ে শাড়ি পরে রিখিয়া দাঁড়িয়ে। হাতে পলার মোটা বালা, কানে পলার টব, এলোচুল ঢলের মতো নেমেছে পিছনে। কচি মুখখানায় একটা হাসি কান্নার আলোছায়া ফুটে আছে।

মাঝসিঁড়ি থেকে নিজের লম্বা চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অপ্রতিভ হাসি মুখে সোমেন নেমে এল হলঘরে। বলল, খুব মুডে ছিলাম, তাই তোমাকে দেখতে পাইনি।

রিখিয়া কোত্থেকে ছুটে এসে এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এখনও হাঁফাচ্ছে অল্প। নাক ফুলে ফুলে উঠছে ঘন শ্বাসে। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে একটু হাসল। তারপর দু'ধারে মাথা নেড়ে বলল, ওপরে যেতে হবে না।

কেন?

পরে যেয়ো। অন্য দিন। তুমি কখনও আমাকে কোথাও নিয়ে যাওনি। আজ নিয়ে যাবে?

শৈলীমাসির সঙ্গে দেখা করব না?

পরে কোরো। আজ আমার অনেক কথা আছে।

কোথায় যাবে?

বাঃ, তার আমি কী জানি? একজন যেখানে নিয়ে যাবে।

তা হলে মাসিকে বলে নাও। পোশাক পালটাবে না?

কিছুই করব না।

সোমেন হেসে ফেলে বলল, একবস্ত্রে চলে যাবে?

রিখিয়ার চোখ ঝিকমিকিয়ে উঠল। বলল, রাজি।

কলকাতার কোথাও বেড়ানোর তেমন জায়গা নেই। লেকে গুচ্ছের লোক আর ফিরিওলা, ময়দানে ভিড়, রাস্তাঘাটে অসম্ভব আলো।

অনেক টাকা ট্যাক্সি ভাড়া গুনল সোমেন। কথা তো ভারী! কখনও দু'জনে বয়সের হিসেব করে অবাক হয়ে দেখল, সোমেনের চেয়ে রিখিয়া প্রায় ন'বছরের ছোট।

থিয়েটার রোডের একটা দামি রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে রিখিয়া হুকুম করল, খাও তো। তোমার খিদে পেয়েছে।

তুমি?

আমি শুধু আইসক্রিম।

এ-রকমই সব তুচ্ছ, সামান্য কথাবার্তা। রিখিয়াকে কুড়ি টাকা দিয়ে একটা চামড়ার ব্যাগ কিনে দিল সোমেন। ফিরিওলা প্রথমে বত্রিশ টাকা দাম চেয়েছিল। রিখিয়া তাতেই রাজি। সোমেন তাকে ঠেকিয়ে দরাদরি করে কিনল।

রিখিয়া অবাক হয়ে বলল, ইস, রোজ আমি তা হলে কত ঠকি!

ভীষণ। আরও ঠকবে তুমি।

কেন ঠকব?

আমাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ বলে।

নতুন কেনা ব্যাগটা ঠাস করে তার পিঠে মারল রিখিয়া। বলল, সেটাই একমাত্র জিৎ। বাবাঃ, যা অহংকারী! পাত্তাই দিতে চায় না।

ঘুরেটুরে একটুও ক্লান্ত হল না দু'জনে। কিন্তু রাত সাড়ে আটটায় সাদার্ন অ্যাভেনিউ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সোমেন বলল, রিখি, এবার বাড়ি যাও, সবাই ভাববে।

রিখিয়া মুখখানা পাশে ঘুরিয়ে তাকাল। মৃদু একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, আগে বলো, আমাদের কী হবে!

বড় জটিল প্রশ্ন। বড় জরুরি প্রশ্ন।

সোমেন তাকায় রিখিয়ার দিকে। কচি বয়সের ভালবাসা আর মায়া মেশানো মুখ। আর-একটু বয়স হলে ও যখন হিসেবি হবে তখন ঠিক এ-রকম বলতে সাহস পাবে না হয়তো। তখন অনেক সুখ-দুঃখের ভবিষ্যৎ-চিন্তা এসে ভর করবে মনে।

সোমেন তার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, রিখি, তুমি আমার দাড়ি সম্বন্ধে আজ একটাও কথা বলোনি।

রিখিয়া হেসে বলল, তাতে কী হবে? আমার ভাল না লাগলে যেদিন কেটে ফেলতে বলব সেদিনই তো তুমি ঠিক কেটে ফেলবে।

তাই বুঝি?

তা নয় বুঝি?

সোমেন একটা শ্বাস ফেলে বলে, হ্যাঁ, তাই।

তবে মশাই? শোনো, কখনও আমার অবাধ্য হবে না।

না হলাম।

সোমেন একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করে। পারে না। সব ট্যাক্সি অন্য লোক নিয়ে চলে যাচ্ছে।

রিখিয়া নিরুদ্বেগে হাঁটে। এক-এক বার হেসে বলে, আমার চেয়ে ওর ভয়টা বেশি হল বুঝি?

শৈলীমাসি ভাববে যে।

কেউ ভাববে না। আমি তো প্রায়ই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসে বা বন্ধুর বাসায় যাই।

সে তো গাড়িতে যাও। আজ তো গাড়ি নিয়ে বেরোওনি, ঠিক ভাববে সবাই।

ভাবুকগে। আগে বলো, আমাদের কী হবে!

সোমেনের মুখ শুকিয়ে যায়। বিবেকানন্দ পার্কের পাশে অন্ধকারে একটু দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরায় সে। ততক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, রিখি, যা স্বাভাবিক তা-ই হওয়া উচিত।

স্বাভাবিকটা কী?

বিয়ে।

এই ছোট্ট কথাটায় যেন ঢেউ হয়ে গেল রিখিয়া। লজ্জায়, হাসিতে ভরে গেল তার মুখ! সামান্য অসংলগ্ন পা ফেলল কয়েকবার। এলোখোঁপা ঠিক করল অকারণে।

রিখিয়া আজ একটুও সাজেনি। সাদামাটা ঘরোয়া পোশাকে বেরিয়ে এসেছে। তবু তার স্বাভাবিক শ্রী থেকে একটা বিকিরণ বেরিয়ে তাকে ঘিরে ধরে।

কিন্তু আমি তো কিছু হতে পারিনি রিখি। আমাকে...

রিখিয়া পাশমুখে তাকিয়ে বলল, হতে বারণ করেছে কে?

কী চাও বলো তো! কেমন চাও আমাকে?

যেমন আছ।

ঠিক?

ঠিক।

যদি সারাজীবন আর সুন্দরবনের মাস্টারি ছেড়ে আসতে না পারি?

রিখিয়ার এখনও হিসেবি বুদ্ধি হয়নি। অকপটে বলল, আমাকে অত ভয় দেখিয়ো না। তুমি পুরুষমানুষ, ভাবনা-টাবনা তোমার। আমি নিশ্চিন্ত।

সোমেন দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, কবে এত পাকলে বলো তো রিখি! এই সেদিনও খুকিটি ছিলে।

এখন আর নেই কিন্তু।

॥ আটাত্তর ॥

ভরদুপুরে ননীবালা কাঁচা আম কেটে রোদে শুকোতে দিয়েছেন। আমশির ডাল ব্রজগোপাল বড় ভাল খান। কিছু কলকাতাতেও পাঠানো যাবে।

ব্রজগোপাল দু'দিন হল যাজনে বেরিয়েছেন। আজ-কালই ফেরার কথা। ননীবালার একটু একা-ফাঁকা লাগে ঠিকই, কিন্তু এখানে জনের অভাব টের পান না। বহেরুর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনি অনবরত আসছে যাচ্ছে। যজমানদেরও আনাগোনা কম কী! তা ছাড়া কামলা, মুনিশ, চাষাভুষোরা অনবরত কাজটাজ করছে। একা লাগে না। পাখি-পক্ষী, কুকুর-বেড়াল, গাছপালা, মাটি-আকাশ নিয়ে বড় প্রাণবন্ত জগৎ। সবাই যেন সঙ্গে থাকে। সঙ্গী হয়।

আমের টুকরো রোদে দিয়ে উঠে আসছেন, উঠোনে একটা লম্বাপানা ফরসা দাড়িঅলা ছেলে হুড়মুড়িয়ে এসে ঢুকেই ডাক দিল, মা!

হাসবেন কি কাঁদবেন তা ভেবে পান না ননীবালা।

ওরে, আয় আয়। বলে নিজে গিয়েই সাপটে ধরেন ছেলেকে। যেন কতকাল দেখেন না।

হাঁকডাক শুনে লোকজন এসে পড়ল। ননীবালা কোকাকে ডেকে বললেন, একটা মাছ পুকুর থেকে ধরে আন তো।

বলে সোমেনের দিকে চেয়ে বলেন, তোর বাবা কিন্তু মাছ ঢুকতে দেয় না বাড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে সোমেন গম্ভীর হয়ে বলল, তা হলে কেন মাছ রাঁধবে মা? রেঁধো না।

বলে কোকাকে ডেকে নিজেই বারণ করে দিল সোমেন।

ননীবালা বলেন, তা হলে কী দিয়ে দুটো ভাত খাবি? ঘি তো খুব ভালবাসিস, গরম ভাতে এক খাবলা তাই দিয়ে খা তো আগে, তারপর দুটো ডাল ডালনা দিয়ে খাস। দুধ আছে।

সোমেন কৃত্রিম রাগ করে বলে, ভাল করে বাসায় পা না দিতেই খা-খা করতে লাগলে!

খাওয়া নিয়েই তো তোর যত পিটির পিটির। কোথায় যেন মাস্টারি পেয়েছিস, সে কি অনেক দূর?

না, কাছেই।

চিঠি লিখতে তোদের যে কী আলিস্যি। হাকুচ কালো হয়ে গেলি কী করে? অমন টকটকে রং একদম জ্বলে গেছে। নিজের ছেলেটা বলে চিনতে কষ্ট হয়। জামাটা খোল তো দেখি, হাড়পাঁজরা কেমন বের হয়েছে।

বোকো না মা। তিন কেজি ওয়েট বেড়েছে।

উরে বাবা, তাই নাকি? হ্যাঁ, কনুইয়ের তিনকোনা হাড় বেরিয়ে আছে। ওয়েট বেড়েছে কি না সে আমি জানি। এখন এখানে ক'দিন থাকবি। ইচ্ছেমতো খেয়েদেয়ে ঘুরে শরীর সারিয়ে তবে মনে করলে যাবি। বুঝেছিস?

সোমেন কেবল হাসে।

ননীবালা বলেন, হাসলে হবে না বাবা। চিরদিন হাসি দিয়ে আমাকে ভোলাও। ক'দিন আমি এখন কাছে কাছে রাখবই। ওই দাড়ি-গোঁফ রেখে সন্নিসী হলে চলবে না। কী, ভেবেছিস কী তুই?

চিরকালই যত গোপন কথা মা'র কাছে বলে সোমেন। আজ দুপুরে মায়ের কাছ ঘেঁষে ছোট্ট শিশুর মতো শুয়ে ছিল। তখন একটি-দুটি প্রশ্নের উত্তরে মা কেমন করে সব কথা বের করে নিল। অবশ্য বলার আগ্রহ সোমেনেরই ছিল আগে থেকে।

শুনে ননীবালা উঠে বসে বললেন, শৈলীর মেয়ের কথা তো তোকে কত জিজ্ঞেস করেছি। তখন গা করতিস না।

এখন কী করব মা?

কী আবার করবি! বিয়ে করবি। আমি আজই শৈলীকে চিঠি লিখব।

দূর। ও-সব কোরো না। ওরা ভীষণ বড়লোক। যদি রিফিউজ করে তো অপমানের একশেষ।

দূর বোকা! ছেলের কোনও কাজে মায়ের আবার মান-সম্মান কী? আমি ওর মেয়েকে ভিক্ষে চাইব।

না মা। অপমান তোমার একার নয়, আমারও। তা ছাড়া, বাবার পরামর্শ আগে নিয়ে নাও।

এর মধ্যে আবার ওঁকে টানিস কেন? উনি সেকেলে লোক। ভাবের বিয়ে শুনলে খুশি হওয়া মানুষ নয়।

সোমেন তবু মাথা নেড়ে বলল, শোনো মা, আমার বুদ্ধি স্থির নেই, তুমিও দুনিয়ার কিছু জানো না। এ-সব ব্যাপারে স্থিরবুদ্ধির লোক চাই। বাবার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি।

বিস্মিত ননীবালা ছেলের দিকে চেয়ে বলেন, ছোটকা, কবে থেকে এত বাপভক্ত হলি বল তো! চিরটাকাল তো মায়ের আঁচলের তলায় বড় হলি, বাপকে চিনলি কবে?

সোমেন পিঠটা মা'র দিকে ঘুরিয়ে বলে, বাঁ ধারটা চুলকে দাও। জোরে।

ননীবালা একহাতে পিঠ চুলকে দেন, অন্য হাতে পাখার বাতাস করেন। বলেন, সব শুনে তোর বাবা যদি অমত করে?

এ-কথার কোনও উত্তর দেয় না সোমেন। বাবার ডায়েরিতে লেখা একটা বাক্য শুধু মনে পড়ে—ভগবান, উহারা যেন সুখে থাকে।

একটু ঝুম হয়ে পড়ে থেকে ভাবল সোমেন। তারপর মুখ তুলে মা'র দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, তুমি কি ভাবো, আমার মনের জোর নেই?

সে আছে থাক। তা বলে অমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটাকে হাতছাড়া করতে হবে নাকি? এই তো বললি, কথা দিয়েছিস। কথার খেলাপ করবি শেষে? তার চেয়ে ওঁকে না জানানোই ভাল।

সোমেন মাথা নেড়ে বলল, না মা, তা হয় না। আমার বড় অহংকার। কোনও অপমান আমার সহ্য হবে না, তার চেয়ে বিয়ে না হওয়া ভাল। সেইজন্যই আমি বাবার পরামর্শ চাইছি।

ননীবালা পাখাটা ফেলে দিয়ে একটু হতাশ গলায় বললেন, তোর মধ্যে ঠিক তোর বাবার ছাপ দেখতে পাই। হুবহু। যে-ই তোর বউ হোক সে বড় কষ্ট পাবে।

ব্রজগোপাল এলেন সন্ধে পার করে। সোমেন বেরিয়েছিল বাঁধের দিকে। বহেরুর খামারবাড়ির অনেক উন্নতি দেখল ঘুরে ঘুরে। গন্ধ বিশ্বেস এখন আর লোক চিনতে পারে না। দিগম্বরের খোলের আওয়াজ বড় মৃদু, তাও ক্বচিৎ শোনা যায়। নানা রকমের লোক আমদানি হয়েছে এখানে। একটা কামারশালা বসিয়েছে বহেরু, একজন পুতুলের কারিগরকে জমি দিয়েছে। একটা পাঁচ মন ওজনের পেল্লায় মোটা লোককে কচ্ছপের মতো ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। বিন্দু সেই আগের বারের মতোই সঙ্গে ছিল আজও। বলল, ও লোকটা সত্যিই একটা আস্ত খাসির মাংস খেয়ে নেয় একবারে।

চিড়িয়াখানায় একটা কাকাতুয়া এসেছে নতুন, সাতশো টাকা দাম। একটা হরিণ এসেছে। একটা বনবেড়াল।

বিন্দু বলল, চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

আর কোথায়? কোকাদাদা বলে দিয়েছে, বাবা মরলে ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। যা চুলের মুঠি ধরে কিল দেয় কোকাদাদা! এখানে ঠাঁই হচ্ছে না। তাই সেই ম্যাদামার্কা লোকটার বাড়িঘরেই যাব, আর জায়গা কোথায়?

বিন্দুকে খুব দুঃখী মনে হল না। নিজে থেকেই বলল, কেবল নয়নদিদিরই গতি হল না। কিলটা, চড়টা খেয়ে মরবে। আমি তবু পালিয়ে বাঁচব।

সন্ধেবেলা ঘরে ফিরতেই বাবাকে দেখে মনটা কেন যে বেশ ভাল লাগল।

প্রণাম আশীর্বাদ সব হয়ে যাওয়ার পর ব্রজগোপাল হঠাৎ খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোমার মা'র কাছে সব শুনেছি। তোমার সৎসাহস দেখে অবাক হই বাবা, এ যুগে কেউ ভাব ভালবাসার ব্যাপারে বাপ-মাকে টানে না, পরামর্শ-টর্শ করে না।

সোমেন মাথা নিচু করে থাকে।

ব্রজগোপাল চৌকিতে সিধে হয়ে বসে গলা সাফ করে নিয়ে বললেন, ছেলেদের অবশ্য কোনও মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া ঠিক নয়। সেটা পৌরুষের বিরোধী। তোমার মা বলছিলেন, প্রস্তাবটি সেই মেয়েই দিয়েছে।

সোমেন চুপ করে থাকে।

ব্রজগোপাল বলেন, ভাল। সে মেয়েটি কি তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে?

কী বলবে সোমেন! ননীবালা বলেন, করে না আবার! ওর মতো চরিত্রওলা ছেলে পাবে কোথায়?

ব্রজগোপাল বললেন, শ্রদ্ধা বড় সাংঘাতিক জিনিস। তোমার সঙ্গে তার বয়সের কত তফাত হচ্ছে হিসেব করেছ?

সোমেন চুপ। ননীবালা বললেন, ন'বছরের মতো। না রে সোমেন?

সোমেন ক্ষীণ মাথা নাড়ে।

আর-একটু হলে ভাল হত। বউ ইয়ার-বন্ধুর মতো হলে ভাল হয় না। বয়সের তফাত বেশি হলে শ্রদ্ধাটা আপনি আসে।

ননীবালা মাঝখানে পড়ে বলেন, তোমাদের সব সেকেলে নিয়ম বাপু।

ব্রজগোপাল মৃদু হেসে বলেন, তুমি কবে থেকে আবার মডার্ন হলে?

ননীবালা লজ্জা পেয়ে পানের বাটা নিয়ে বসেন। বলেন, ছেলে-ছোকরাদের ব্যাপারে অত খুঁত ধরলে হয়!

ব্রজগোপাল লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোতে একটু দূর চোখে চেয়ে বলেন, শিক্ষা, দীক্ষা, আর বিয়ে, এ তিন ঠিক না হলে জাতি পতিত হয়ে যায়। বিয়ে কি সোজা কথা! ওই বিয়ে থেকেই বিপ্লবের শুরু।

সোমেন এক বার তাকাল বাবার দিকে। চোখ সরিয়ে নিল ফের।

ব্রজগোপাল বলেন, মেয়েটির পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব ভাল শুনেছি।

ননীবালাই বললেন, টাকার লেখাজোখা নেই। দেবেথোবে অনেক।

সোমেন রাগত চোখে মা'র দিকে তাকাল।

ব্রজগোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, কাকে দেবে? তোমার ছেলেরা কাঙাল নাকি? বলে একটু চুপ করে থেকে বলেন, ঠাকুর জানেন, আমি কখনও চাইনি যে, আমার ছেলেরা অর্থবান হোক। বরং চিরকাল চাই, ছেলেরা চরিত্রবান হোক, শ্রদ্ধাবান হোক, ধর্মশীল হোক।

সোমেন বাবার মুখের দিকে তাকায়। এই এক মানুষ, যেমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল হয়ে আসছে ক্রমে!

ব্রজগোপাল বললেন, অকপটে বলো বাবা, মেয়ের বাড়ির সচ্ছলতা তোমাকে আকর্ষণ করেনি তো?

না, না। ছিঃ। সোমেন লজ্জায় মরে গিয়ে নিচু স্বরে বলে।

জেনে রাখলাম। এখন নিশ্চিন্তে এগোতে পারি।

ননীবালা জরদার হেঁচকি তুলে বলেন, না হয় কিছুই চাইব না আমরা। কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবের কী করবে?

ব্রজগোপাল তেমনি উদাস ভঙ্গিতে বসে থেকে বলেন, বিষয়আশয়ে অনেক তফাত হয়ে যাচ্ছে দুই পরিবারের। ভয় হয় মেয়েটা এত বড় পরিবর্তন সইতে পারবে কি না। তার মা বাপও যেন খুশি হয়ে মেয়ে দেন তাও আমাদের দেখতে হবে। সবদিক ভেবে দেখি। কাজ বড় সোজা নয়।

সোমেনের মধ্যে একটা মরিয়া ভাব এল। সে হঠাৎ বলল, বাবা, আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন। আমার কোনও মতামত নেই।

এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতায় ব্রজগোপালের মুখ ভরে গেল। মাথা নেড়ে বললেন, তোমার জ্বালাযন্ত্রণা নিয়ে আমার চেয়ে বেশি কেউ ভাববে না। নিশ্চিন্ত থাকো বাবা, তোমার সুখের জন্য, ভালর জন্য যতখানি করা যায় সব আমি দেখব। আমি শুধু বাপের চোখে জগৎ দেখি না, একটা আদর্শের চোখ দিয়ে দেখি। আমাকে দেখতে হবে, তোমার ভিতর দিয়ে যেন পারিপার্শ্বিকের কল্যাণ আসে। সব ঘটনারই ভাল-মন্দ দুটো দিকের জন্যই নিজেকে প্রস্তুত রেখো। যদি মন্দটা ঘটে তা হলেও ভেঙে পোড়ো না।

পরদিন দুপুরে ফিরে যাচ্ছে সোমেন। ব্রজগোপাল রিকশা করে স্টেশন পর্যন্ত এলেন তার সঙ্গে।

গাড়ি আসবার আগ মুহূর্তে শুধু বললেন, স্থির থেকো।

কথাটা বুঝল না সোমেন।

গাড়ি এল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

যত বড় করে সমস্যাটাকে দেখেছিল সোমেন আসলে তা মোটেই তত বড় ছিল না। সে সমস্যাকেই দেখেছিল, ভেবেছিল রিখিয়াকে বিয়ে করার সব দায়িত্বই বুঝি তার। অবোধ মেয়ে রিখিয়া, সে আর কী করবে?

কলকাতার বাসায় ফিরে এসেই সে পেল শৈলীমাসির চিঠি। লেখা— বাবা সোমেন, রিখি আমাকে সব বলেছে। জানো না তো, সে যা চায় তাই হয়। সে তোমাকে চেয়েছে। আমিও কতদিন তোমার কথা ভেবেছি রিখির জন্য। আমার নিজের ছেলে পর হয়েছে। তুমি পরের ছেলে আপন হও। ননীর কাছে চিঠি লিখেছি। রিখির বাবা তোমার বাবাকে চিঠি দিল আজ। কতদিন দেখি না তোমাকে। শুনলাম, খুব কালো হয়ে গেছ? রবিঠাকুরের মতো দাড়ি রেখেছ, তাও শুনেছি। বিয়ের দিন কিন্তু ওভাবে এসো না। তার আগে এসো একদিন, তোমার সন্তপুরুষের মতো মুখখানা এক বার দেখব। আসবে তো?...

চিঠি পড়ে বউদিকে ডেকে দেখাল সোমেন।

বীণা একটা চাপা হর্ষের চিৎকার করে ওঠে। সোমেনের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বলে, আচ্ছা চালাক ছেলে যা হোক। বড়লোকের মেয়েটাকে ঠিক বেঁধে ফেলেছ।

বাঃ রে, তুমিই তো বললে!

না বললে বুঝি ছেড়ে দিতে?

দু'দিন পরেই ব্রজগোপাল আর ননীবালা এলেন।

বাড়িতে উৎসবের হাওয়া বয়ে যেতে লাগল।

সুন্দরবন থেকে আর-এক বার ঘুরে এল সোমেন। শ্রাবণের মাঝামাঝি রিখিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার।

বিয়ের পর বউভাতের দিন ভাড়াটে বিয়েবাড়ির ছাদে তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে অপালা বলল, বিট্রে করলি তো! তোর আশায় ছিলাম ঠিক, এখন মিহির বোস ছাড়া আর কোন শালা বিয়ে করবে আমাকে বল তো!

ভাগ। সোমেন বলে, বিট্রে করেছি বলে দুঃখের তো চিহ্নও দেখলাম না। আট পিস ফিশ ফ্রাই খেলি বসে বসে দেখলাম।

এঃ মা, হোস্ট কখনও খাওয়ার খোঁটা দেয় বুঝি! আর কখনও যদি তোর নেমন্তন্ন খাই দেখিস।

আমিও আর বিয়ে করছি না।

অনিল রায় আজ একদম মদ খাননি। হার্ট অ্যাটাকের পর খানও কম। পাইপ ধরিয়ে ঘুর ঘুর করছিলেন চার দিকে। সোমেনকে ডেকে বললেন, বিয়েতে খাওয়ানোর সিস্টেমটা কেন তুলে দিচ্ছ না তোমরা? নিতান্তই যদি না পার তো বক্স সিস্টেম করো। বাই দি ওয়ে সোমেন, তোমার সেই পুরনো হবিটার কী হবে?

কী হবি স্যার?

সেই যে প্রায়ই একে-ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে।

সোমেন হেসে ফেলে। বলে, হবিটা এখন মিহির বোসকে দিয়ে দিয়েছি স্যার। শুনেছি, ও নাকি প্রায়ই এক বার অপালাকে আর-এক বার পূর্বাকে প্রোপোজ করে। দু'জনেই কেবল রিফিউজ করছে।

পূর্বা তেড়ে এসে বলল, ইঃ, আমাকে করুক তো প্রোপোজ!

করেনি তোকে? সোমেন অবাক।

মোটেই না। অত সাহস আছে?

করলে কী করবি?

অনেক দিন বাদে পূর্বা খুব বুদ্ধি করে উত্তর দিল আজ। ফচকে হেসে বলল, মাইরি, রাজি হয়ে যাব।

দারুণ হাসল সবাই। মিহির বোস নিজেও।

অণিমা আসেনি। ওর বাড়ি থেকে গাব্বু আর তার মা এল। প্রায় দুই ভরি ওজনের সোনার হার দিয়ে গেল। অণিমা পার্সেলে একটা বালুচরি শাড়ি পাঠিয়েছে, চিঠিতে লিখেছে— যাওয়া হল না সোমেন। খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ যাচ্ছে। মেয়েদের যে কত বাধা!

রাতে শুতে গিয়ে আর-এক বিপদ। দুই দিদি আর বিস্তর আত্মীয়া পাশের হলঘরে ডেকরেটারের শতরঞ্জিতে চিল্লাচিল্লি করছে। শতবার তারা এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, ও সোমেন, আমাদের বালিশ কম পড়েছে, দরজা খোল। এমনকী ছোড়দি পর্যন্ত এসে দরজার গোড়ায় বসে গান গাইতে থাকে।

সোমেন গিয়ে দরজা হাট করে খুলে দিয়ে বলে, নে বাপু, কোনও সিক্রেসি রইল না আর। এবার একটু ঘুমোতে দে। বড় ধকল গেছে।

বিয়ের পরই সুন্দরবনে ফিরে গেল সোমেন। একা। মনে একটা লজ্জা আর অপরাধবোধ কাজ করে সব সময়ে। ভাবে, ছিঃ, আমি কেন বড়লোকের ঘরে বিয়ে করতে গেলাম! কী দরকার ছিল? লোকে ভাববে, লোভী সোমেন এইভাবে নিজের প্রবলেম সলভ করে নিল। ভাববে, শ্বশুরের পয়সায় বড়লোক হয়ে গেল সোমেন। ছিঃ ছিঃ, যদি তাই ভাবে?

বড় যন্ত্রণা গেল এদিন। এ-সব যন্ত্রণার কথা কাকে আর জানাবে। রিখিয়াকেই মস্ত চিঠি লিখল সে।

রিখিয়ার এখন কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই। বাপের বাড়ি দু'দিন থাকল, রণেন এসে নিয়ে গেল ঢাকুরিয়ায়। ঢাকুরিয়ায় তিন দিন কাটবার আগেই শীলা এসে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যায় তার বাড়িতে, চার দিন-পাঁচদিন আটকে রাখে। খারাপ লাগে না রিখিয়ার। তার নিজের বাড়িতে এত লোক, এত আদর করার মানুষ সে পায়নি কখনও। মা চিরকাল বিছানায়, বাবা ব্যস্ত, সংসার ছিল গভর্নেস, আয়া, ঝি আর চাকর দারোয়ানের হাতে। এদের বাড়িতে সে-সব নেই। সম্পূর্ণ অন্য রকম লাগে। বড় ভাল লাগে দিদি, বউদি, দাদা ডাকতে।

ব্রজগোপাল এলেন একদিন। রিখিয়াকে দেখে বললেন, মাগো, চেহারাটা ভাল দেখছি না। এরা বিশ্রাম দিচ্ছে না তোমাকে, ওদিকে তোমার শাশুড়িও তোমার জন্য অস্থির। বাক্সটাক্স গুছিয়ে নাও তো। বেলা তিনটেয় অমৃতযোগ।

বিন্দুমাত্র আপত্তি হয় না রিখিয়ার। ব্রজগোপাল অসম্ভব কর্তব্যপরায়ণ মানুষ, নিজেই বেয়াইবাড়িতে ফোন করে অনুমতি নিয়ে আসেন।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ঠিকানায় লেখা সোমেনের চিঠি রি-ডাইরেক্ট হয়ে গোবিন্দপুরে রিখিয়ার হাতে গেল। চিঠি পড়ে রিখিয়া কেঁদে অস্থির। চিঠির শেষে সোমেন লিখেছে, আমি পুজোর ছুটিতে যাব না। এখন কিছুদিন আমাকে দূরে থাকতে দাও। বিয়ের পর থেকে আমার মন খুব অস্থির।...আরও সব অনেক কথা লিখেছে। বড়লোকের ঘরে বিয়ে করা গরিবের ছেলের ঠিক হয়নি। আরও কত কী!

রিখিয়ার কান্না সামলে নিলেন ননীবালা। তারপর গোপনে, চুরি করে বউকে লেখা ছেলের চিঠি পড়লেন দুপুরে। একটা গভীর শ্বাস ফেলে আপনমনে বললেন, বউটাকে কষ্ট দেবে, আগেই জানি। হুবহু বাপের মতো হল কেন যে ছেলেটা!

তারপর ননীবালা রিখিয়াকে স্বামী বশ করার নানা কৌশল শেখাতে থাকেন। কত উপদেশ দেন। সোমেনের স্বভাবের নানা কথা শতখান করে বোঝাতে থাকেন। তাঁর প্রাণে বড় ভয় এই ছেলেটাকে নিয়ে। যত বড় হচ্ছে তত ওর মধ্যে বাপের অবশ্যম্ভাবী প্রতিবিম্ব ভেসে উঠছে।

রিখিয়া সোমেনকে লেখে— শোনো, আমার সত্যিকারের আপনজন কেউ কখনও ছিল না। জন্মের পর থেকে আমি একা। একা-একা খেলতাম, ঘুমোতাম, গান গাইতাম। তেমন আদর পাইনি কারও। মা বিছানায়, বাবা বাইরে, দাদা নিজের পড়াশুনো খেলা আর বন্ধু নিয়ে ব্যস্ত। ভেবেছিলাম, বিয়ে করলে বুঝি এই অসহ্য একাকিত্ব কাটবে। তা বুঝি হল না আমার। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন? কেন তুমি আমাকে বোঝো না একটুও পাগল?...পুজোয় না এলে বিষ খাব...

সোমেন আবার দাড়ি রেখেছে। চুল বড় হয়েছে। গায়ের রং চাষাভুষোর মতো কালো। কিন্তু চেহারাটা অনেক শক্তপোক্ত হয়েছে তার। মেদহীন রুক্ষ পৌরুষের চেহারা। মুখে একটু লজ্জার হাসি নিয়ে পঞ্চমীর দিন এসে গোবিন্দপুরে পৌঁছল। ননীবালা আর রিখিয়া ঢেউ হয়ে এখানে-সেখানে ধেয়ে যাচ্ছেন আয়োজন করতে।

নির্জনে পেয়ে সোমেন রিখিয়াকে বলে, আর কখনও বিষ খাওয়ার কথা লিখবে?

অকপটে রিখিয়া তাকিয়ে থেকে বলে, কেন আসবে না লিখেছিলে?

বড় লজ্জা যে!

ছিঃ। ও-রকম আর ভেবো না। আমি কিন্তু অনেকবার বিষ খাওয়ার কথা ভেবেছি জীবনে। সেটা মনে রেখো।

কেন ভেবেছ?

একা থাকা অসহ্য লাগত যে!

আর ভেবো না।

আমাকে এক বার তোমার ওখানে নিয়ে যাবে না?

সোমেন হেসে বলে, হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছ কতদিন হয়ে গেল, কলেজে ভরতি হলে না যে বড়? ভেবেছ কী?

কী হবে আর পড়ে? আমার ভাল লাগে না। শ্বশুরমশাই বলেছেন, আমি যেন কখনও চাকরি-টাকরি না করি।

চাকরি না করলে। কলেজে ভরতি হয়ে যাও।

রিখিয়া মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

লেখাপড়া অনেক কাজে লাগে।

তা হলে তুমিও এম এ পরীক্ষা দাও।

দেব।

দু'জনে হাসে।

অবসর সময়ে সোমেন তার বাবার সব পুঁথিপত্র খুলে বসে হাঁটকায়। বাবার অনেক লেখাপত্র আছে। টীকা, ভাষ্য, ব্যাখ্যা। সে-সব খুলে পড়ে। ব্রজগোপাল যখন বাসায় থাকেন তখন নিবিষ্ট হয়ে বসে বাবার সঙ্গে সমাজ-সংসারের হাজারও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। ব্রজগোপালের মুখ-চোখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। বলেন, সারাটা জীবন এইটুকুর অপেক্ষায় থেকেছি বাবা। আমার বুড়োবামুনের কথা যদি আমার ছেলেদের কেউ কখনও জানতে চায়। তবে শোনো...

অবিরল বোঝাতে থাকেন ব্রজগোপাল। সোমেন শোনে।

তারপর একদিন বাপের ছায়ার মতো বেরিয়ে পড়ে সোমেন। ব্রজগোপালের সঙ্গে যজমানদের বাড়ি বাড়ি ফেরে। যাজন শোনে, নানা সমাবেশে যায়। ব্রজগোপালের পরিচিতির বহর দেখে বড় অবাক মানে সে। চাষাভুষো থেকে সমাজের সবচেয়ে উঁচুতলার লোক সবাইকেই চেনেন বাবা।

সবাই বাবাকে চেনে এক ডাকে। ব্রজগোপাল হাত পাতলে একবেলায় চার-পাঁচহাজার টাকার দান উঠে আসে।

রহস্যটা সোমেনকে জানতেই হবে।

॥ উনআশি ॥

এ-সব দেখে ননীবালা বড় হতাশ হন।

রিখিয়াকে বলেন, ও বউ, আমার ছেলেকে সামলিয়ো। এ আমি ভাল বুঝছি না। বাপের রোগ।

রিখিয়া অবাক চোখে তাকায় ননীবালার দিকে। বলে, কীসের রোগ মা?

পরভুলানি রোগ মা। ওরা সংসারের কেউ নয়, ওরা সব বিশ্বসংসারের জন্য জন্মেছে।

রিখিয়ার একরকমের লাজুক, মিষ্টি হাসি আছে। মাথা নেড়ে বলে, আমার বেশ লাগে তো।

দু'হাতে রিখিয়ার মুখখানা তুলে চোখের কাছে এনে ননীবালা নিবিড় দৃষ্টিতে দেখেন। রিখিয়া হেসে ফেলে। গভীর শ্বাস ছেড়ে ননীবালা বলেন, তুমি একটু অন্য রকম। তুমি ঠিক আমাদের মতো নও মা।

কেমন মা?

বোধহয় ভাল। খুব ভাল।

রিখিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে, অত ভাবো কেন মা? ওকে পথ খুঁজে নিতে দাও। সবাই এক রকমের জীবন কাটাবে?

রিখিয়াকে তুমি ডাকতে ননীবালাই শিখিয়েছেন ইদানীং। 'তুমি' শুনলে একদম মেয়ের মতো লাগে।

আদর ভালবাসার একটা দলা এল গলায়। এখন কাঁদবেন ননীবালা। তাই রিখিয়াকে ছানার ডালনা রাঁধতে শেখাতে বসেও বললেন, যা তো মেয়ে, ঘরে গিয়ে একটু দুধ খেয়ে আয়।

না, অত খেতে পারি না।

যা না। দুটো হাত ধরছি, যা।

রিখিয়া অনিচ্ছায় উঠে যায়।

ননীবালা কাঠের জ্বাল ঠেলে তুললেন। তারপর আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন ঠায়। দু'চোখ বেয়ে অবিরল জলের ধারা বুক ভাসিয়ে নেয়।

মশলামাখা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে প্রাণভরে ঠাকুরকে ডাকেন, বিড়বিড় করে বলেন, ওদের সুখে রেখো ঠাকুর।

তারপর হঠাৎ মনে হল, কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনাল না তো! ব্রজঠাকুরের বামনি কি শুধু নিজের জনের সুখ চাইতে পারে? তাতে ঠাকুর হয়তো বিমুখ হবেন।

তাই আবার প্রাণভরে দু'হাত জড়ো করে বলেন, ঠাকুর, বিশ্বসংসারের সবাই যেন সুখে থাকে।

জীবনপাত্র
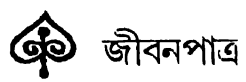
প্রভাসরঞ্জন

নরেনবাবু লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকটা জ্যোতিষবিদ্যা জানুক, আর না-ই জানুক তার মধ্যে বেশ একটা নিরীহ ভাব আছে। আর খুব একটা ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

আমার কোষ্ঠীর ছকটা গত পনেরো বছর ধরে আমার মুখস্থ আছে। কেউ জ্যোতিষ জানে শুনলেই সট সট করে কাগজে ছকটা এঁকে সামনে এগিয়ে দিই। বহুলোক আমাকে বহু রকম কথা বলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সময়ে আমি আশার আলো দেখেছি, কখনও-বা নিভে গেছি। দীর্ঘদিন পর আবার জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে আমি সামান্য কিছু উত্তেজনা বোধ করেছিলাম।

নরেনবাবু একটু আগে অফিস থেকে ফিরেছেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আজকাল। বাইরে এখন মেঘের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরে গুমোট। বাতাস থম ধরা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-এর ভিতর দিকে গলির ধাঁধার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলো-বাতাসহীন ঘর। জানালা-দরজা সবই আছে, তবু আলো বা বাতাস কিছুই আসে না। একটা হলদে বালবের আলো বোধহয় সারাদিনই জ্বলে। বহু আদ্যিকালের একটা পাখা ঘুরছে ওপরে। তার বিষণ্ণ শব্দ হচ্ছে ঘটাং ঘটাং। দেয়ালে পোঁতা গজালের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কাঠের তক্তায় বিস্তর পুরনো পঞ্জিকা জমা হয়ে আছে, বেশ কিছু সংস্কৃত আর বাংলা জ্যোতিষের বই, কয়েকখানা ইংরিজি বইও। পুরনো একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে অসম্পূর্ণ একটা কোষ্ঠীপত্র পড়ে আছে, দোয়াতদান, কলম, ডটপেন, লাল, নীল আর কালো কালির দোয়াত, চশমার খাপ, কোষ্ঠীর তুলোট কাগজ, নোট বই, চিঠি গেঁথে রাখবার কাঠের তলাওলা শিক, তাতে বিস্তর পুরনো চিঠি। এ-সবের মধ্যে নরেনবাবু বেশ মানানসই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোলগাল চেহারা, চোখে-মুখে একটু বেশি লেখাপড়া করলে যেমন অন্যমনস্কতার দাগ পড়ে, তেমন আছে। খুব একটা হাসেন না, তবে মুখে একটু স্মিতভাব। আমার কোষ্ঠীর ছক-আঁকা কাগজটা দেখছিলেন বাইফোকাল চশমা দিয়ে। মাথাটা নিচু, টাকের ওপর কয়েকটা চুল পাখার হাওয়ায় ঢেউ দিচ্ছে।

একটা বছর আট-নয়েকের ছেলে বুঝি টেবিল থেকে নরেনবাবুর অজান্তে একটা ডটপেন নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ফেরত দিতে এসে সুট করে টেবিলের ওপর পেনটা ফেলে দিয়েই দেখি না-দেখি না ভাব করে চলে যাচ্ছিল। নরেনবাবু গম্ভীর মুখটা তুলে বললেন, এই শোন। ছেলেটা একটু ভয়ে-ভয়ে কাছে আসতেই বাঁ হাতটা দিয়ে কষিয়ে একটা চড় দিলেন গালে। বললেন, কত দিন বারণ করেছি, আমার টেবিলে জরুরি সব জিনিস থাকে, হাত দিবি না। অ্যাঁ, কত দিন বারণ করেছি?

চড় খেয়ে ছেলেটার বোধহয় মগজ নড়ে গিয়েছিল, কথা বলতে পারল না। ভ্যাবলার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে হাত মুঠো করে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভিতরদিকের দরজার কেলেকিষ্টি নোংরা পরদাটা সরিয়ে চলে গেল। নরেনবাবু নির্বিকারভাবে আবার আমার ছক দেখতে লাগলেন। না, খুব নির্বিকারভাবে নয়, মাঝে মাঝে দেখছিলাম তিনি আড়চোখে ভিতর-বাড়ির দরজাটার দিকে তাকাচ্ছেন। ওদিক থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন বোধহয়। ছেলেকে চড় মারাটা বোধহয় তাঁর ভুলই হয়েছে।

ভুল যে হয়েছে সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেণ্ড বাদেই। পরদার ও-পাশ থেকে আচমকা এক বিদ্রোহী গলা অত্যন্ত থমথমে স্বরে বলে উঠল, ব্যাপার কী, দাসুকে মেরেছ কেন? গালে গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

নরেনবাবুর বাইফোকাল ঝলসে উঠল, গম্ভীর গলায় বললেন, শাসন করার দরকার ছিল, করেছি। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে নাকি! যাও, ভিতরে যাও।

ইঃ, শাসন! সংসারে কুটোগাছটি নাড়ো না, ছেলেপুলে কোনটা পড়ল, কোনটা কাঁদল তার হদিস জানো না, শাসনের সময় বাপগিরি!

বাইফোকালটা পরদার দিকেই ফোকাস করে মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন নরেনবাবু। আমি বাইরের লোক, তবু আমার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে বলেও তিনি খুব একটা সংকোচ বোধ করছেন, এমন মনে হল না। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, আমার টেবিলের জিনিস তোমাদের কতদিন হাত দিতে বারণ করেছি। এর একটা কাগজপত্র হারালে কী ক্ষতি হবে তা মুখ্যুরা বোঝে না। ফের যদি কখনও কেউ হাত দেয় তো হাত ভেঙে দেব।

ইঃ, মুরোদ কত! গায়ে হাত দিয়ে দেখো ফের, ও-সব ভণ্ডামির জিনিস নুড়ো জ্বেলে পোড়াব। হাবাগোবা সব লোক ধরে এনে দিনমান ধরে কুষ্ঠী না কপাল দেখে ঝুড়ি ঝুড়ি বানানো কথা বলে যাচ্ছে। জ্যোতিষ! ক'পয়সা আসে শুনি? বেশির ভাগ লোকই তো ছোলাগাছি দেখিয়ে সরে পড়ে। কবে থেকে বলছি, মহিন্দির বুড়ো হয়ে দেশে চলে যাচ্ছে, তার কয়লার দোকানটা ধরে নাও, কানু পানু বসে আছে, তারা দেখবে'খন। তা সংসারের যাতে সুসার হয় তাতে আবার কবে উনি গা করলেন! আছেন কেবল তেজ দেখাতে!

বাইফোকালটা খুব হতাশভাবে নেমে পড়ল টেবিলে। নরেনবাবু শুধু বললেন, মেয়েমানুষ যদি সব বুঝত তা হলে দুনিয়াটা অনেক সুস্থ থাকত। বোকা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করার মতো অভিশাপ আর হয় না। যাও, তুমি ভিতরে যাও।

আর তুমি বুঝি বুদ্ধির পাইকিরি নিয়ে বসে আছ! সংসারে মাসান্তে ক'টা টাকা ফেলে দিয়ে অমন ফুল-ফুল বাবুগিরি করে বেড়াতে পারলেই খুব বুদ্ধি হল, না! বোকা মেয়েছেলে! বোকা বলেই তোমার মতো আহাম্মকের ঘর করতে হয়। বুদ্ধিমতী হলে তিন লাথি মেরে সংসার ভেঙে চলে যেত।

বাইফোকালটা আরও নত হয়ে পড়ে। নরেনবাবুর এই বিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হই।

পরদার ও-পাশ থেকে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর সরে গেল। গৃহকর্ম রয়েছে। নরেনবাবু ছক থেকে মাথা তুলে আমাকে বললেন, রবিটা নীচস্থ রয়েছে। মঙ্গলটা পড়ল তৃতীয়ে। একমাত্র শনিটাই যা স্বক্ষেত্রে পঞ্চমে।

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এ-সবই আমার জানা কথা। রবি নীচস্থ, শনি পঞ্চমে।

নরেনবাবু বললেন, কেতুটাই ডোবাচ্ছে। বাঁ দিকের ঘরে পড়ল কি না! বাঁ দিকে কেতু ভাল নয়।

আমি হতাশ বোধ করতে থাকি।

উনি মাথা নেড়ে বললেন, কার্তিক মাসে জন্ম হলে বড় মুশকিল। আমারও তাই। রবিটা নীচে পড়ে থাকলে কী করে কী হবে!

কিছু হবে না?

নরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলেন, এখনই সব বলা যাবে না। আগে নবাংশটা, দেখি। সময় লাগবে। আপনি বরং ও-হপ্তায় আসুন। ততদিনে করে রাখব। তবে বিদেশযাত্রার একটা যোগ আছে। নবাংশটা না করলে বোঝা যাবে না। পাঁচুবাবু আপনার কে হন?

খুব দূর সম্পর্কের দাদা।

নরেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, অনেককাল দেখি না পাঁচুবাবুকে। আগে খুব আসতেন। উনি আমার প্রথম দিককার ক্লায়েন্ট!

উনিই আপনার কথা বলেছিলেন আমাকে। বলতে গেলে উনিই পাঠিয়েছেন আমাকে।

নরেনবাবু মাথা নেড়ে বলেন, বরাবর উনি লোক ধরে নিয়ে আসতেন আমার কাছে। ওঁর ধারণা ছিল, আমি খুব বড় জ্যোতিষী হব। জ্যোতিষীর যে ধৈর্য-স্থৈর্য দরকার, আর হিসেবের মাথা, সে-সব আমার ছিলও। কিন্তু নিজের কোষ্ঠী বিচার করে দেখেছিলাম, আমার দাম্পত্য জীবনটা ভাল হবে না। হলও না। পুরুষমানুষের বউ যদি ঠিক না হয় তো তার সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। এই যে রাস্তায়-ঘাটে অতি সাধারণ সব মানুষকে দেখেন তাদের মধ্যে অনেকের ছক বিচার করলে দেখবেন, অনেকেরই বড় বড় সব মানুষ হওয়ার কথা। কেউ নেতা, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক। বেশিরভাগেরই হয় না কেবল ওই বউয়ের জন্যই। বউ বড় সাংঘাতিক জিনিস। পাঁচুবাবুরও খুব আশা ছিল আমার ওপর। ওই সংসারের জন্যই হল না। তা পাঁচুবাবু আজকাল আর আসেন না কেন?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি, তাঁর আর ভবিষ্যৎ কিছু নেই। হাসপাতালে পড়ে আছেন। মৃত্যুশয্যা।

নরেনবাবু বাইফোকাল খুলে রেখে চোখ দু'টো ধুতির খুঁটে মুছলেন। আবার বাইফোকাল পরে নিয়ে বললেন, বয়স হল। সত্তর-পঁচাত্তর তো হবেই।

তা হবে।

কোন হাসপাতালে?

কবিরাজি হাসপাতাল, শ্যামবাজারে।

নরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, চিনি।

আমি বলি, যাবেন নাকি একদিন দেখতে? খুব খুশি হবেন তা হলে। ওঁর তো কেউ নেই। চেনা লোক কেউ গেলে খুব খুশি হন।

নরেনবাবু উদাস হয়ে বলেন, আমার সময় কোথায়!

বলে একটু চুপ করে থাকেন উনি, তারপর টেবিলের ওপর সেই অসম্পূর্ণ কোষ্ঠীপত্রটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললেন, গিয়েই বা হবে কী? মরুণে মানুষকে দেখতে আমার ভাল লাগে না, মন খারাপ হয়। অনেককাল দেখিনি, ওঁকে খামোখা এখন দেখে মন খারাপ করার মানে হয় না। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা হয় হোক। সেই ভাল। হয়েছে কী?

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, বুড়ো বয়সের নানা রোগ। ভীষণ খেতে ভালবাসতেন, সেই থেকে ডায়াবেটিস হয়েছিল। এখন শোনা যাচ্ছে, ক্যানসারও দেখা দিয়েছে। বাঁচবেন না, তবে এখনও বেশ হাসিখুশি আছেন।

নরেনবাবু এই প্রথম একটু হাসলেন, পাঁচুবাবু বরাবরই সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। ভাগ্যবান। মরাটা নিয়েই আমি ভাবি। কবে, কোথায়, খাবি খেতে খেতে মরব। পাঁচুবাবুর মতো আমি তো আর সদানন্দ পুরুষ নই। এক বার এই গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন থেকে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন শোভাবাজার অবধি নিখুঁতি খাওয়াবেন বলে। অমন নিখুঁতি নাকি কোথাও হয় না। চাচার হোটেলে বহুবার মাংস খাইয়েছেন। নানান শখ-শৌখিনতা ছিল তাঁর, যা দেখে বোঝা যেত ভিতরটা সব সময়ে রসে ডগমগ। প্রায়ই বলতেন, আশি বছর বয়সের পর ধর্মকর্মে মন দেব। খুব বাঁচার ইচ্ছে ছিল, আবার মরতেও খুব পরোয়া ছিল না। প্রায়ই কেওড়াতলা নিমতলা সব ঘুরে বেড়াতেন। কত সাধুসঙ্গ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে টাকা খরচ করতেন। সেই পাঁচুবাবু মৃত্যুশয্যায়। এ কি ভাবা যায়?

পাঁচুদার কথায় আমিও দুঃখিত হয়ে পড়ি। বলতে কী, কলকাতা শহরটা পাঁচুদাই আমাকে চিনিয়েছিলেন। সদানন্দ মানুষ। সংসারে কারও পরোয়া ছিল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের ল্যান্ড

রেভিনিউতে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে বাজার ছিল সস্তাগন্ডা। পয়সার তাঁর ছড়াছড়ি যেত। মনে পড়ল গতকালও পাঁচুদা একটু তেলমুড়ি খাওয়ার বায়না করেছিলেন। সেটা যে খাওয়া বারণ তা নয়। তাঁর স্টেজ-এ কিছুই বারণ নয় আর। যা খুশি খেতে পারেন। ডাক্তাররা অবস্থা বুঝে সব বারণ তুলে দেয়। কিন্তু পাঁচুদার তেলমুড়ি খাওয়ার পয়সা নেই এখন আর।

নরেনবাবু ফের বাইফোকালটা খুলে চোখ মুছে বললেন, নবাংশটা করে রাখবখন। কিন্তু আমি বলি কী, আপনি বরং এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা দেখুন। এক ঝলক বিচার করে যা দেখেছি, হয়ে যাবে।

একটু শিউরে উঠে বলি, বলছেন?

বলছি।

একটা ছোট শ্বাস ফেলে উঠে আসি।

বস্তুত সদ্য সদ্য জীবনের দশ-দশটা বছর নষ্ট করে আমি এই সেদিন সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেছি। কিন্তু সে-কথা নরেনবাবুকে বলার কোনও মানে হয় না। বিদেশে যাওয়াটাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমি তাদের দলে নই।

খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটেছিল। ভিখিরির ছেলে অল্প বয়সেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে শেখে। কারণ তাকে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে না। লক্ষ করে দেখেছি, শীতে বর্ষায় কাঙাল গরিবের শিশু জল নিয়ে খেলা করে, ধুলোবালিতে গড়ায়, যা খুশি খায়, অসম্ভব নিষ্ঠুরতায় মারপিট করে। সে-সবের প্রতিরোধশক্তি ওদের মধ্যে আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। নিদারুণ অভাব ওদের চারপাশের রুক্ষতাকে প্রেমহীন ভালবাসাহীনভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়ে দেয়, অল্প বয়সেই তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধুলো-খেলা করতে করতে উঠে গিয়ে ভিক্ষের হাত পাতে, বিয়েবাড়ির ফুটপাথে রাস্তার কুকুর তাড়িয়ে খাবার খুঁটে আনে, দুধের শিশু মাকে ছেড়ে সারাদিন একা পড়ে থাকে, কাঁদে না। ওই তাদের খেলা ও জীবন। মা-বাবা মরলে ছেলেমেয়ে কদাচিৎ কাঁদে সন্তান মারা গেলে মায়ের শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অকারণ মায়া তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না কখনও।

ভিখিরিদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার মানে এই যে, আমাদের জীবনযাপন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তৈরি করে দেয়। শৈশবে আমার চেতনা হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিলাম যে, খিদে পেলেই খাবার এসে হাজির হয় না। এও জানতাম, ছোটখাটো ব্যথা-বেদনা, খিদে বা মারধরে কাঁদতে নেই। কান্না বৃথা, কেউ সেই কান্না ভোলাতে আসে না। এও জানতাম, আমার বাবার থাপ্পড়ের জোর খুব বেশি, মা'র নিস্পৃহতা ছিল পাহাড়ের মতো অটল। উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরই ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা খুব কম ছিল না। ওই অত লোকের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের আত্মসচেতনতাও অনেক কমে গিয়েছিল। রানাঘাটের কাছে এক ক্যাম্পে তখন থাকি, অনেক উদ্‌ভ্রান্ত লোক চারিদিকে, খাওয়া-পরার কোনও ঠিক নেই। মচ্ছবের মতো দু' বেলা কারা যেন খিচুড়ি খাওয়াতে আসে। খাওয়া বলতে ওইটুকুই। সারাদিন বহুবার খিদে পেত, খিদে মরে যেত। প্রথমে কাঁদতাম খুব, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারতাম কান্নার মূল্য দেওয়ার কেউ নেই। বাবার এক খুড়ি ছিল দলে, খুনখুনে বুড়ি, সেই ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর চোখের কোল ছিল ফোলা, চোখ ঘোলাটে, চোখের দোষেই সব সময়ে অশ্রুপাত করতেন, সেটা কান্না ছিল না। সেই ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বড় একটা পাত্তা দিত না। দরমার বেড়া দেওয়া দমবন্ধ সেই ঘরে আমরা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকতামও না। অনেক আমাদের বয়সি ছেলেমেয়ে জুটেছিলাম সেইখানে। ক্রমে খিদে ভুলে খেলায় মেতে থাকতে শিখেছিলাম। মার্বেল নেই, লাট্টু নেই, ঘুড়ি-লাটাই জোটে না, তবু কত রকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেলা

আমরা তৈরি করে নিতাম। মাটির চাড়া ছুড়ে সিগারেটের খালি প্যাকেট জিতে নেওয়ার খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, দড়ি পাকিয়ে বল তৈরি করে তাই দিয়ে ফুটবল। দেশের বাড়িতে আমরা নাকি তিন বার ভাত খেতাম, তা ছাড়া সারাদিন ধরে মুড়ি-মুড়কি, আমটা জামটা তো ছিলই। সেই সব ভুলতে শিশুদের দেরি হয়নি। আমরা খুব চট করে রুক্ষতাকে টের পেয়ে তা গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রানাঘাটে আমরা অবশ্য খুব বেশি দিন থাকিনি। সেখান থেকে হাবড়া, ব্যান্ডেল, গোসাবা হয়ে আমরা অবশেষে কলকাতায় আসি। বাবা পূর্ববঙ্গে জমির আয় থেকে সংসার নির্বাহ করতেন, খুব বেশি লেখাপড়া বা বৃত্তিগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। চাকরি-বাকরি পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না, উদ্যোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং উদ্বেগে তিনি আরও অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহ-উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সারাদিন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতেন আর বাড়ি ফিরে কেবলই ফিসফাস করে পরামর্শ করতেন সকলের সঙ্গে। পরামর্শের শেষ ছিল না । কার্যকর কিছুই হত না। আমরা কাছাকাছি বয়সের চার ভাই, আর তিন বোন মিলে সাতজন, মা বাবা ঠাকুমা, এক কাকা কাকিমা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে, আবার এক ছোট কাকা—এই বিশাল পরিবার বিনা টিকিটে ট্রেনে, হাঁটাপথে কিংবা যেমন-তেমন ভাবে এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। কলকাতায় আমরা দমদমের কাছে এক খোলা মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা-কাকাদের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল, ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল, ওইভাবে যৌথ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করলে আরও মুশকিলে পড়তে হবে। মেজোকাকা তাঁর পরিবার নিয়ে একদিন ভিন্ন হয়ে গেলেন। শোনা গেল, আদি সপ্তগ্রামে তাঁর এক খুড়শ্বশুরের জমিজমা আর কলাবাগান আছে, তদুপরি তিনি একটিমাত্র সন্তানকে হারিয়ে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কাকাকে তিনি জমি-বাগান তদারকির কাজ দিয়েছেন। কাকা সপরিবারে চলে গেলে পরিবারের লোকের চাপ কিছু কমল। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের বয়সি কাঙাল ছেলেপুলে জুটে যায়। আমরা খুব খেলি। বলতে কী, সেই সময়ে একটা বড়সড় ছেলে আমাদের ভিক্ষে চাইতে শিখিয়েছিল। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে আমরা বড় রাস্তায়, বাজারে এবং রেল স্টেশনে বহুবার ভিক্ষে করেছি। তবে কারও বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করত। আমরা বড়জোর পথচলতি মানুষের কাছে হাত পেতে বলতে পারতাম—দু'টো পয়সা দেবেন? পয়সা পেলে নানা কুপথ্য কিনে খেতাম ছোটখাটো চুরি করতাম কখনও সখনও। লাউটা, মুলোটা, ঘটি কি বাটি পেলে বেচে দিতাম। রেলের কামরায় উঠে খুঁজতাম যাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিস। আমাদের বখে যাওয়ার ব্যাপারটা মা-বাবা কদাচিৎ লক্ষ করেছেন। মা দু'-দুটো কোলের মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত, বাবা অভাবে পাগল, ছোটকাকা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ। তিনি মানুষটা ছিলেন বড় ভাল, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। নীরবে তিনি তাঁর সঙ্গে আনা কিছু পুরনো পড়ার বই বারবার পড়তেন। তাঁর তাড়া খেয়ে আমরা চার ভাই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম। লেখাপড়া আমার খুব খারাপ লাগত না, অক্ষর চেনা রিডিং পড়া যোগবিয়োগ ইত্যাদির মধ্যে আমি কিছু নতুন রকম খেলার রহস্য টের পেয়েছিলাম। ছোটকাকার বিষণ্ণতার গভীরতা আমরা টের পাইনি, যখন পেলাম তখন সেই আত্মহননকারীর দেহটি এক শীতের ভোরে দমদম জংশনের কাছে রেল লাইনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে ছিল। ছোটকাকার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের জনসংখ্যা কমল, আরও কমল যখন আমার বড় দুই ভাই পরপর টাইফয়েড আর উদুরিতে মারা যায়। এইসব মৃত্যু খুবই শোকাবহ বটে কিন্তু তবু বলি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত জীবনে এই রকম শোক যতখানি ধাক্কা দিতে পারত ততটা হয়নি। ক্যাম্পে মৃত্যু দেখে আমরা অভ্যস্ত। শুধু সেই খুনখুনে বুড়ি ঠাকুমা চোখের দোষেই হোক আর শোকেই হোক অবিরল অশ্রুপাত করে বিলাপ করতেন। মা-বাবা অচিরে সামলে উঠলেন। শোকের সময় কই?

শুনতে পেলাম, বাবা কন্ট্রোলের কাপড়ের একটা ব্যবসা পেয়েছেন। সেটা ভাল না খারাপ এ-সব বিচার তখন মাথায় আসে না। একটা কিছু পাওয়া গেছে, একমাত্র সংবাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই

হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েক পদ রান্না হয়, একটু নতুন জামা-কাপড়ের মুখ দেখি। বাবা একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত কিনে ফেললেন। অতিলোভে বোধহয় তাঁতি নষ্ট হল। সে-ব্যবসা বাবার চেয়ে বিচক্ষণতর লোকেরা হাতিয়ে নেয়। একটা রেশনের দোকানে বাবা কিছুকাল চাকরি করলেন। অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। এর পরই বাবা এক বড় উকিলের মুহুরি হলেন। তার পরের পর্যায়ে বাবা স্বাধীনভাবে শিয়ালদা কোর্টে বসে কোর্ট ফি পেতে লাগলেন, দলিল তৈরি, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির দালালি করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দীনদরিদ্রের মতো, খুবই সামান্য খাওয়া-পরার মধ্যে একরকমের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। এক সেই বুড়ি ঠাকুমার অনুল্লেখ্য মৃত্যু ছাড়া আর তেমন অঘটন কিছু ঘটেনি। আমি ছোটকাকার কাছে শেখা সামান্য লেখাপড়ার ব্যাপারটি ভুলিনি। তিনি মারা গেলে তাঁর বইগুলো আমার দখলে আসে। সেগুলো নিয়েই আমার অনেক সময় কাটত। বাবা কোর্টের কাজ পাওয়ার পর, প্রায় দশ বছর বয়সে আমি দমদমের একটা ওঁছা স্কুলে ভরতি হতে যাই। সেই স্কুলে যে যায় তাকেই ভরতি করা হয়, যে-ক্লাসে যার খুশি। নামকোবাস্তে একটা ভরতির পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র। আমি যেতেই তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, আমি কোন ক্লাসে ভরতি হতে চাই। আমি বললাম সিক্সে। তাঁরা কয়েকটা ট্রানস্লেশন জিজ্ঞেস করলে আমি চটপট বলে দিই। একজন মাস্টারমশাই বললেন, বাঃ, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট! আমি ভরতি হয়ে গেলাম। পরের পরীক্ষা থেকেই আমি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকি। স্কুলটা যথার্থ খারাপ বলেই আমার মতো মাঝারি ছাত্রের পক্ষে ফার্স্ট হওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছিল, এভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। প্রায় দিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ক্লাস প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকত মাস্টারমশাইয়ের অভাবে। পড়ানো ছিল খুবই দায়সারা গোছের। আমি তাই বাড়িতে পড়তাম। দমদমের কাছে আমাদের কলোনির পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। চুরি, গুন্ডামি, মারপিট, জবরদখল, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল ঝগড়া এ-সব ছিল আমাদের জলভাত। এই পরিবেশ সহ্য করতে পারতেন না আমার ছোটকাকা। তা ছাড়া জীবনের হতাশার দিকটাও তাঁর সহ্য হয়নি, তাই তাকে মরতে হয়েছিল। আশ্চর্য এই, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁকে আমার বড় বেশি মনে পড়তে থাকে এবং আমার জীবনে তিনিই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। সেই উদ্বাস্তুপল্লীর সবচেয়ে অশ্লীল গালিগালাজ আমার একসময় ঠোঁটস্থ ছিল। বখামির চূড়ান্ত একসময়ে আমি করেছি। কিন্তু ক্রমে আমার এই পল্লীর কুশ্রীতা থেকে মানসিক মুক্তি ঘটে। আমি আমার আর তিন ভাইবোনকেও প্রাণপণে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করতাম। বাবাকে বলতাম, চলুন, আমরা অন্য কোথাও বাসা করি। বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন, তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লেখাপড়া করে। আর কিছুদিনের মধ্যেই জমির স্বত্ব আমরা পেয়ে যাব। মাগনা জায়গা ছেড়ে আহাম্মক ছাড়া কেউ যেতে চায়?

আমি বাবার মতো করে বুঝতে শিখিনি। জমির জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যই জমি। সেই মানুষই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষকেই যদি নীতিহীনতায় পশুত্বে নেমে যেতে হয় তো জমিটুকু আমাদের কতটুকু অস্তিত্বের আশ্রয় হতে পারে? অবশ্য বাবা একটা যুক্তিসিদ্ধ কথাও বলতেন—দেখো, পরিবেশ থেকে পালানোর চেষ্টা কোরো না। সর্বত্রই পরিবেশ একই রকম। যদি পারো, যদি সাধ্য থাকে তো পরিবেশকে শুদ্ধ করে নাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ, আদর্শের কথা ভিতরে সাঁ করে ঢুকে তিরের মতো গেঁথে যেত। তার থরথরানি থাকত অনেকক্ষণ। বুঝতাম, সত্যিই কোথায় যাব? বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে এর চেয়ে ভাল বা সুস্থ পরিবেশ খুব একটা নজরে আসেনি তো! আমাদের কলোনিতে দু'-চারজন ভাল লোক ছিলেন ঠিকই। তাঁরা দশের ভাল করতেন, উপকার করে বেড়াতেন, ঝগড়া কাজিয়া মেটাতেন, তা সত্ত্বেও বলতে পারি তাঁরা আমাদের মধ্যে এমন কিছুর সঞ্চার করতে পারেননি যার দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সংবর্ধিত হই। এ বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যায়, ও-বাড়ির ছেলে

কালোবাজারি করে, অমুকের বউ পরপুরুষের সঙ্গ করে— এই ছিল আমাদের নিত্যকার ঘটনা। প্রচণ্ড অভাবের চাপে মানুষ কত কী করে! এই সব মরিয়া ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া মানুষের কাছে ধরবার ছোঁবার মতো কোনও বাস্তব আদর্শ কেউ দিতে পারেনি। ভাল কথা সবাই বলছে, দেশ জুড়ে বক্তৃতার অভাব নেই, কিন্তু কেউ জানে না কোন পথে, কোন আদর্শে মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তার ওপর নানা বিরুদ্ধ মতেরও জন্ম হচ্ছে রোজ। সেই মতামতের ঝড়ে আমরা আরও উদ্‌ভ্রান্ত। কোন দিকে গেলে ঠিক হয় তা বুঝতে পারি না। তবু দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে যাই। এর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই, ওর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই। কে কেমন বলল সেইটে নিয়ে মাথা ঘামাই। এদিকে দরমার বেড়া বা চালের টিন পালটাতে আমাদের জেরবার হয়ে যায়, পুজোর জামা-কাপড়ের জন্য বাবাকে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখি। পুজো উপলক্ষে জামা-কাপড় কেনা হয় বটে, কিন্তু বছরে ওই এক বারই আমাদের যা কিছু কেনা হয়। সেটা না হলে লজ্জা নিবারণের সমস্যা। আমরা এ-সব নিয়ে ব্যস্ত; এব চেয়ে দূরের বস্তু অর্থাৎ পুরো দেশ কিংবা মানুষের ভবিষ্যৎ—এ-সব আমাদের ভাববার সময় নেই।

প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইনাল পাশ করা গেল। আমাদের পরিবারে এ নিয়ে খুব একটা হইচই করার অবস্থা আমাদের নয়। বাতাসা লুট দেওয়া হল মাত্র। বাবা কিছু বেসামাল রইলেন কয়েক দিন। তাঁর মেজো ছেলে মানুষ হচ্ছে, এ-রকম একটা বিশ্বাস তাঁর হয়ে থাকবে। তখন তিনি প্রায়ই আণায় ছোটকাকার সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, প্রভাসটা ঠিক ছানুর মতো হয়েছে। ছানুও বেঁচে থাকলে আজ কত বড় মানুষ হত। এই তুলনায় কেন জানি না আমি অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ করতাম। কৈশোরোত্তীর্ণ ছোটকাকা কবে মারা গেছেন, তবু আমার ভিতরে ওই মানুষটি এক বিগ্রহের মতো স্থির হয়ে থাকে। ওই সৎ, নিরীহ, মেধাবী মানুষটিকে ভালবাসা আমার শেষ হয়নি। আমার হতভাগ্য পরিবেশে যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে কোমল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, একটা জীর্ণ হলুদ চাদরে খালি গা ঢেকে খুপরির মধ্যে জানালার ফুটোর ধারে একমনে গণিতের বই খুলে বসে আছেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না, খিদের কথা বলতেন না, কখনও কোনও অসুবিধে বা অভাবের অভিযোগ ছিল না। অল্প কথা বলতেন কখনও কখনও আমাদের পড়ানোর পর গল্প শোনাতেন, কিংবা চুপ করে আমাদের নিয়ে বসে থাকতেন । শুনতে এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে কোনও মানুষই তাঁর মতো অত অল্প আচরণের ভিতর দিয়ে অত বেশি শেখাতে পারেনি।

বি এসসি পর্যন্ত পাশ করতে আমার খুব একটা কষ্ট হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিলাম, পরীক্ষার আগে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। তার কারণ, আমরা ভাই-বোনেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাহিদা বাড়ছে, বাবার রোজগার বাড়ছে না। ফলে আমাকে বেশ কয়েকটা টিউশানি নিতে হয়। অপুষ্টির ফলে আমার শরীর ভাল ছিল না, চোখের দোষে মাথা ধরত, লো প্রেশার ছিল, বেশি রাত জেগে পড়াশুনো করতে গিয়ে স্নায়ুর দোষেই বুঝি খুব খিটখিটে আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। মাসান্তে আমার রোজগারের টাকা তখন সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। কম বয়সে এ-সব দায়িত্ব নিয়ে বেশ বুড়িয়ে গেছি অল্প বয়সেই। সে এক রাহুগ্রস্ত যৌবন। ছোটভাইটা বড় হতেই বুঝলাম তার লেখাপড়ার মাথা নেই। বোন দুটোরও প্রায় একই দশা। টেনেটুনে স্কুল ফাইনালটাও যদি পাশ করানো যায় এই ভরসায় আমি ছোটভাইটার পিছনে খুব খাটতাম। সে বখাটে ছেলে ছিল না, আমাকে ভয়ও পেত। কিন্তু তার মাথা পড়াশুনো নিতে পারত না। অবোধ শিশুর মতো সে চেয়ে থাকত আমার দিকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারতাম তাকে। মনে হত এই নির্বোধদের ভরণপোষণ করাই বুঝি হবে আমার একমাত্র কাজ সারাজীবন। তাই ওই রাগ ও বিরক্তি। মন ভাল থাকত না। আই এসসি-র রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমার। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের লিস্টে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ব্যয়সাপেক্ষ পড়াশুনোর অবস্থা নয় বলে পড়িনি। বি. এসসি-র অনার্সটাই

ছিল আশা-ভরসা। কিন্তু ফাইনালের আগে বুঝতে পারলাম, হবে না। আমার মনঃসংযোগ নেই, ধৈর্য নেই, শরীরেও সয় না। অনার্স ছেড়ে বিষণ্ণ চিত্তে পরীক্ষা দিয়ে দেদার নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনে পাশ করলাম। এম. এসসি পড়া হল না। একটা চাকরি পেয়ে গেলাম ডবলিউ. বি. সি. এস পরীক্ষা দিয়ে। তুমুল আনন্দিত হল আমার পরিবার। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, ফিজিক্সের অনার্সটাও হল না, জীবনের অনেক বড় সার্থকতা আমার হাতের নাগাল দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই তুলনায় সরকারি চাকরিটুকু আমাকে কী আর দিতে পারে? তাই তখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিজের পরিবারের প্রতি এক প্রচণ্ড আক্রোশও তখন থেকে জন্ম নেয়। এরা আমাকে এদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে বড় হতে দিচ্ছে না, আমার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ ঘটতে দিচ্ছে না।

এই নির্মম আক্রোশ থেকেই তলায় তলায় আমি গোপনে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। জানতাম, আমি চলে গেলে এদের সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে, সরকারি চাকরির নিশ্চিত আয় এদের আশ্রয় দেবে না। তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে বড় বেশি নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। জার্মানিতে প্রথম একটি চাকরি পেয়ে যাই, তারা যেতে লিখল। গোপনে পাসপোর্ট করলাম, ভিসার আবেদন জমা দিলাম বাড়ির কেউ জানল না। কিছু টাকা জমানো ছিল দু' বছর চাকরির। সেই টাকা দিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বাড়িতে খবর দিলাম। এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। সকলেই এক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। তারা যতদূর সাফল্যের কথা ভাবতে পারে আমি তো ততদূর সফলতা অর্জন করেছি। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অফিসারের সরকারি চাকরি করি গেজেটে নাম ওঠে, আমার জন্য সচ্ছল পরিবার থেকে পাত্রীর খবর আসছে। মা-বাবাও উদ্যোগ করছেন। এর মধ্যে এ কী! তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি এত দূর হৃদয়হীন হতে পারি তাদের ধারণা ছিল না। অবশ্য কেউ কোনও জোরালো আপত্তি তুলল না। আমি অবশ্য তাদের বোঝালাম, আমার এবং সকলের ভবিষ্যতের জন্য এটা দরকার। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। মা তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। বোনেরাও খুশি হয়নি। কেবল ভাইটা খুব খুশি হয়েছিল, দাদা না থাকলে তাকে আর ও-রকম প্রচণ্ড মারধর বকুনি সহ্য করতে হবে না।

জার্মানিতে চলে গিয়েছিলাম দশ বছর আগে। তারা আমাকে শ্রমিকের চাকরি করাত। বহু কষ্টে অনেক চেষ্টায় আমি গেলাম আমেরিকায়। মোটামুটি ভাল খেতাম, পরতাম। মাঝারি চাকরি জুটেছিল। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? তার কী হবে? কেবল ভাল খাওয়া-পরার জন্য তো আমি এত দূর আসিনি। কিছু একটা শিখে, জেনে যেতে হবে যা আমাকে অনেক উঁচুতে তুলে দেবে। অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়েই আমার সময় ফুরিয়ে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হল না। কমপ্রেসর মেশিন সম্পর্কে শিখবার জন্য অবশেষে আমি চলে আসি সুইজারল্যান্ডে। ব্যল শহরে দীর্ঘকাল লেগে থাকলাম একটা কারখানায়। বেতনের প্রচণ্ড অসাম্য। জার্মান, ইটালিয়ান শ্রমিকেরা বেশি অঙ্কের পে-প্যাকেট পায়, আমরা অনেক কম। তবু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। কিন্তু অতবড় কম্প্রেসর তৈরির কারখানার কাজ আমি একা শিখব কী করে! আমার মৌলিক কারিগরিবিদ্যা নেই, পরিকল্পিতভাবে আমি আসিওনি। কেবল ভসভসে আবেগ সম্বল করে এসে চাকরিতে ঢুকেছি। বুঝেছি, কেবল চাকরিই সার হল। এই হতাশা কাটাতে আমি এক জার্মান মেয়েকে দু' বছর বাদে বিয়ে করি। তার দেড় বছব বাদে সে ছেড়ে চলে যায়। আর ততদিনে দশ-দশটা বছর পার হয়ে গেল। খবর পেয়েছি, বাবা-মা এখনও কোনওক্রমে বেঁচে আছে, ভাই রেলের পোর্টার, বোনেরা যে যার রাস্তা দেখেছে। হতাশার ভরে আমি একদিন ফেরবার প্লেনে চাপলাম।

ভোরের প্রথম আলোটি পুবের জানালা দিয়ে এসে আমার জয়পুরি ফুলদানিটার ওপর পড়েছে। ফুলদানিতে কাল সন্ধের রজনীগন্ধা একগোছা। ফুল এখনও সতেজ। কালকের কয়েকটা কুঁড়ি আজ ফুটেছে। সাদা ফুলের ওপর ভোরের রাঙা আলো এসে পড়েছে, জয়পুরি ফুলদানিটার গায়ে চিকমিক করে আলো। ড্রেসিং টেবিলের ওপরেই ফুলদানি, তাই আয়না থেকেও আলোর আভা এসে ওকে সম্পূর্ণ আলোকিত করেছে। তিন আয়নার ড্রেসিং টেবিল ফুলদানি আর ফুলের তিনটে প্রতিবিম্ব বুকে ধরে আছে। একগোছা রজনীগন্ধা চারগোছা হয়ে কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে!

আমার বদ অভ্যাস, খুব ভোরে আমি উঠতে পারি না। আমার বাপের বাড়ির দিকে সকলেরই এই এক অভ্যাস। কেউ ভোরে ওঠে না। আমাদের বাপের বাড়িতে সবার আগে উঠত আমার বুড়ি ঠাকুমা। ভোর চারটেয় উঠে খুটুর-খাটুর করত, জপতপ করত। আর তারপর সাড়ে সাতটা বা আটটা নাগাদ আর সবাই। এ আমাদের ছেলেবেলার অভ্যাস। বিয়ে হওয়ার পর এই বদ অভ্যাস নিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে আমাকে। আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সব রাত থাকতে উঠে ঘর-গেরস্থালির কাজ শুরু করে দিত। প্রথম প্রথম নতুন বউ-পনা দেখিয়ে আমিও ভোরে উঠতাম, কিন্তু তাতে শরীর বড় খারাপ হত। সারাদিন গা ম্যাজম্যাজ, ঘুম-ঘুম, অস্বস্তি। কপালক্রমে আমার বিয়ে হয়েছিল এক ধার্মিক পরিবারে। ধর্ম ব্যাপারটা আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। আমার বাপের বাড়িতে অবশ্য একটু লক্ষ্মীর পট, কালীর ছবি, বালগোপাল বা শিবলিঙ্গ দিয়ে একটা কাঠের ছোট্ট ঠাকুরের সিংহাসন ছিল এবং তার সামনে ঠাকুমা রোজ একটু ফুল জল বাতাসাও দিত। কিন্তু ওইটুকুই। আমাদের আর কারও ধর্মীয় ব্যাপারে কোনও উৎসাহ ছিল না। বড় জোর বৃহস্পতিবার পাঁচালি পড়ত মা, শনিবারে কোনও-কোনওদিন লুট দেওয়া হত। কিন্তু এ সবই ছিল দায়সারা। আমাদের ঠাকুরঘরটাই ছিল শোওয়ার ঘর। সেই ঘরে সবাই জুতো পরেই ঢুকত আর ঠাকুরের সিংহাসনের বাঁ দিকে যে আলনা ছিল তার নীচের তাকে জুতো রাখত সবাই। বাবার গলায় পইতা বলে কোনও বস্তু ছিল না, আমার দাদা বা ভাইদের কারওরই পইতে-টইতে হয়নি। আমাদের কুলগুরু বংশের শেষ গুরু ছিল কেশব ভট্টাচার্য। আমার বয়স যখন তেরো তখন কেশবের বয়স হবে বড় জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ। সে লোকটা ছিল ডাকপিয়ন। মাঝেমধ্যে সে আমাদের বাড়ি এলে আমরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম। সে কুলগুরুর তোলা আদায় করতে বেরোত। যদিও তার শাস্ত্রজ্ঞান ছিল না, তার কাছে ঠাকুমার পর আর কেউ মন্ত্র নেয়নি। কিন্তু ঠাকুমা তাকে ভীষণ শ্রদ্ধাভক্তি করত, ওই পুঁচকে কেশবের পায়ের ওপর উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ ধরে পায়ের ধুলো নিত, নিজে উপোস থেকে সারাদিন রান্নাবান্না করে কেশবকে খাওয়াত. মোটা দক্ষিণা দিত, পালে-পার্বণে ধুতি-চাদর দেওয়া তো ছিলই। বলতে কী, কেশব বেশ সুপুরুষ ছিল। নাদুস-নুদুস চেহারা, ফরসা রং, চোখদু'টো খুব বড় বড়। কিন্তু সে সাজতে জানত না, সাদামাঠা ধুতি, ময়লা পিরান, খোঁচা দাড়ি নিয়ে আসত। সে এসে খুব তাকিয়ে দেখত আমাকে। আমরা যদিও তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতাম, সে কিছু মনে করত না। মান-অপমান বোধ তার খুবই কম ছিল। বরং সে মাঝে মাঝে ভ্যাবলার মতো হাসত। ধর্মের কথা সে জানতও না, বলতও না। সে এলেই আমার দাদা অভিজিৎ চেঁচিয়ে বলত, ওই কেশবশালা এসেছে মাসকাবারি নিতে। ও কেশব, আজ আমাদের জামা-কাপড় কেচে দিয়ে যাবি, বাসন মেজে দিয়ে যাবি। শুনলে ঠাকুমা রাগারাগি করত, কিন্তু কেশব নির্বিকার! সে বরং কখনও-সখনও এমন কথাও বলত, দূর শালা, গুরুগিরির বড় ঝামেলা। সব জায়গায় লোক হুড়ো দেয়।

আমি বাসি কাপড় ছাড়তাম না, পায়খানার কাপড় পালটাতাম না, এঁটোর বিচার ছিল না। ভাত খেতে বসে আমরা সবাই বরাবর বাঁ হাতে জল খেয়েছি। বাবা শুয়োর, গোরুর মাংস খেতেন,

হুইস্কি-টুইস্কি তো ছিলই। আমরা এই পরিবেশে মানুষ হয়েছি। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে আমাদের আদি বনেদি বাড়ি। সেইখানে জন্মে আমরা বড় হয়েছি। কোনও দিন অভাব টের পাইনি। যদিও আমাদের বংশগৌরব আর উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তি সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু আমাদের অসুবিধে ছিল না। বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অনেক টাকা সাধু ও অসাধু উপায়ে আয় করতেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ মানতেন না।

আমাদের পুরনো বাড়িটার নাম আমরা দিয়েছিলাম 'বার্ডস হাউস'। প্রকাণ্ড এজমালি বাড়িটায় যে আমাদের কত দূর ও নিকট সম্পর্কের শরিকেরা বাস করতেন তার আদমসুমারি হয়নি। সারাদিন এত লোকের আর মেয়েছেলের চেঁচামেচিতে বাড়ি থাকত সরগরম। শরিকের ঝগড়া তো ছিলই। কার ভেজা কাপড় কার গায়ে লাগল, কে তার সামনের বারান্দায় টিন দিয়ে ঘিরে নতুন ঘর তোলবার চেষ্টা করছে, কে তার ভাগের জায়গায় বাচ্চাকে হিসি করিয়েছে—এইসব সমস্যা অহরহ সকলের মাথা গরম রাখত।

শোনা যায়, আমার বাবা যৌবন বয়সে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু গোটা ধর্মের প্রতি তাঁর এমন বিরাগ ছিল যে শেষ পর্যন্ত খ্রিস্ট-ভজনাও তাঁর হয়ে ওঠেনি। আমাদের সেই বিশাল এজমালি বাড়িতে আমরা মোটামুটি একঘরে হয়েই ছিলাম, অন্য সবাই আমাদের ম্লেচ্ছ বলে এড়িয়ে চলত।

আমার একুশ বছর বয়েসের সময় বিয়ে হয়। বিয়ে হল এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁরা শ্রীহট্ট জেলার লোক, চৈতন্যদেবের ভক্ত। আমার স্বামী যদিও খুব বড় চাকরি করতেন না, তবু তাঁদের পরিবারটি বেশ সচ্ছল ছিল। আমার স্বামী জয়দেব চক্রবর্তী স্মল স্কেল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রির অফিসার ছিলেন। ছোটখাটো চেহারা, বেজায় ভালমানুষ, তবে কখনও কখনও তাঁকে বদরাগী বলে মনে হত। স্বামী সম্পর্কে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করে বলছি, সেটা খুব ভাল লাগছে না। বরং বলি জয়দেব লোকটা ভালই ছিল। কিন্তু সে যতখানি সুপাত্র ছিল, তার চেয়ে বোধহয় তুলনামূলকভাবে আমি আরও ভাল পাত্রী ছিলাম। চেহারার জন্য আমার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। লোরেটো স্কুলে আমি কিছুকাল পড়েছি। কিন্তু আমার চরিত্রের সুনাম ছিল না বলে সেই স্কুল ছাড়তে হয়। পরে আমি একটা সাদামাটা স্কুল থেকে পাশ করি। তা হলেও আমি গড়গড় করে ইংরিজি বলতে পারতাম, নাচে-গানে ছিলাম চমৎকার, অভিনয়ে সুনাম ছিল। সোজা কথায়, গৃহকর্ম করে জীবন কাটানোর জন্য আমি তৈরি হইনি। তেরো-চোদ্দো বছর বয়স থেকেই আমার নানা রকম লঘু যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এবং লোরেটোতে পড়বার সময়ে আমি যখন ক্রিক রোতে এক মাসির বাড়িতে থাকতাম তখনই আমার কয়েক বার সম্পূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে যায়। আর, এজন্য কখনওই আমার কোনও অনুশোচনা বা প্রতিক্রিয়া হয়নি, কারণ ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারের ঢিলেঢালা নৈতিক পরিবেশে আমি মানুষ। আমার মা খুব উঁচু সমাজের মেয়ে, বাবাও উচ্চাভিলাষী এবং নৈতিক আদর্শবোধ থেকে মুক্ত ছিলেন। কাজেই আমরা শরীরকে শরীর ভাবতেই শিখেছি, তার সঙ্গে মন বা বিবেককে মেশাইনি। এমনকী আমার যৌবনপ্রাপ্তির পর বাবাও অনেক সময়ে আমাকে ফচকেমি করে জিজ্ঞেস করেছেন, কী রে মেয়ে, ক'টা ছেলের বুকে ছুরি মেরেছিস? অর্থাৎ আমরা খুবই উদার পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার বড় দাদা, বাবা এবং মা'র সামনেই সিগারেট খেত। সে কিছু রোগা ছিল বলে বাবা প্রায়ই তাকে বলতেন, তুই মাঝে মাঝে বিয়ার খাস, তাতে শরীরটা অনেক ফিট থাকবে। উত্তরে আমার দাদা অভিজিৎ বলত, দূর, বিয়ার আমার পোষায় না, আমার প্রিয় ড্রিংকস হচ্ছে হুইস্কি।

আমি সুন্দরী ছিলাম, নইলে ওই গোঁড়া পরিবারে আমার বিয়ে হত না। কিন্তু বিয়েটা যে কেন হয়েছিল সেটা আমি আজও ভেবে পাই না। প্রথম কথা, ওর চেয়ে ঢের ভাল বিয়ে আমার হওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, আমাদের দুই পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির এত পার্থক্য যে বিয়ের প্রস্তাবই উঠতে পারে না। তবু হয়েছিল। একদিন কলকাতা থেকে বোধহয় কিছু মার্কেটিং করে দাদার সঙ্গে লোকাল ট্রেনে

ফিরছিলাম, তখন বেলা এগারোটা হবে। ট্রেন ফাঁকা, আর একটা ফাঁকা কামরায় জয়দেবের বাড়ির লোকজন—মা, পিসি, জ্যাঠা গোছের সবাই যাচ্ছে তারকেশ্বরে। আমি তাদের পাশেই বসেছিলাম। বিধবা পিসি আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, আহা মা, বড় সুন্দর দেখতে গো তুমি! কোথায় থাকো বাছা?

এইভাবে পরিচয়। তারপর বলতে কী, তাদের বাড়ি থেকেই লোকজন এসে খোঁজখবর করল, বিয়ের প্রস্তাব দিল। ভাংচি দেওয়ার লোকও ছিল এজমালি বাড়ির শরিকদের মধ্যে। তারা গিয়ে পাত্রপক্ষকে গোপনে জানিয়ে এল যে বাবা খ্রিস্টান, আচার-বিচার মানে না, আমাদের চরিত্র খারাপ। কিন্তু তাতে আটকাল না। আমাকে তাদের বড় বেশি পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। বিয়েটা ভেঙে গেলে অবশ্য ভালই হত। আমার মায়ের অনিচ্ছা ছিল, শুনেছি জয়দেবের বাবারও আপত্তি ছিল। জয়দেবের বাবা গুজগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর বোন, অর্থাৎ জয়দেবের পিসিই তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। অন্য দিকে আমার বাবা হঠাৎ তাঁর হিসেবি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, যে নীতিহীনতা ও অনাদর্শ দিয়ে তিনি তাঁর মেয়েকে মানুষ করেছেন সেগুলি মেয়ের বিয়ের সময়ে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষত, আমাদের তো শত্রুর অভাব নেই। তাই বাবা হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব পাওয়ার পর থেকেই তাঁর স্বভাববিরুদ্ধভাবে আমাকে বিয়েতে রাজি করালেন, দীর্ঘ আলোচনার পর। মায়েরও মত হল। এবং সে-সময়েই মা আমাকে গোপনে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন যে আমি সত্যিকারের কুমারী আছি কি না। তাঁর কোনও কারণে সন্দেহ হয়ে থাকবে। আমি অবশ্য স্পষ্ট জবাব দিইনি। কিন্তু মায়েরা তো বোঝে।

জয়দেবকে আমি খুব নিরাসক্তভাবে বিয়ে করি। পাত্র আমার পছন্দ ছিল না। ছোটখাটো চেহারার পুরুষ এমনিতেই আমি দেখতে পারি না, তার ওপর তার আবার নানা-রকম নৈতিক গোঁড়ামি ছিল। সেগুলি আরও অসহ্য। যেমন, বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যে সে শারীরিক দিক দিয়ে আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি। যেদিন হল, সেদিন মিলনের আগে সে আমার কুমারীত্ব পরীক্ষার চেষ্টা করেছিল । অবশ্য কীভাবে পরীক্ষাটা করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি তখন, পরে বুঝেছিলাম। কিন্তু এটা কোন মেয়ে আজকাল সহ্য কববে?

পরীক্ষা করে অবশ্য সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি কুমারী নই। আর আমিও তার বাতিক দেখে বুঝতে পারছিলাম যে এ লোকটা স্বামী হওয়ার উপযুক্তই নয়। কী করে যে ও আমার সঙ্গে, আমি ওর সঙ্গে ঘর করব সেটা বিয়ের পরেই আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

শ্বশুরবাড়িতে আমার নতুন নামকরণ হল, লতিকা। এটা ওদের বাড়ির নিয়ম, নতুন বউ এলে ওরা তার নাম পালটে নতুন নাম রাখে। এতে আমাদের আপত্তি ছিল। হুট বলতে কেন যে কেউ আমার জন্মাবধি নিজস্ব নামটা বাতিল করে দেবে! আমি যে নিজেকে বরাবর অলকা বলে জানি। অচেনা লতিকা আমি হতে যাব কোন দুঃখে? আমি খুব লাজুক মেয়ে নই, ভিতুও নই, তাই শ্বশুরবাড়ির নিয়মকানুনগুলোর বিরুদ্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলাম। এটা ওরা ভাল চোখে দেখেনি। জয়দেবকে নাম বদলানোর ব্যাপারটা বলতেই ও খুব বিরস মুখে বলল, তোমার নাম বদলে ফেলাই ভাল।

কেন? আমি চমকে উঠে প্রশ্ন করলাম।

তোমার অতীতটা খুব ভাল নয় তো, তাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমার অতীত কি খারাপ?

খুব।

কী করে বুঝলে?

জয়দেব তার বোকা এবং ভাবলেশহীন চোখে চেয়ে বলল, যারা বোঝে তারা ঠিক বোঝে।

আমি কী বলব ওকে, কী বললে ওর চূড়ান্ত অপমান হয় তাই ভাবছিলাম। ও আমাকে বলল, কেন, তুমি কি জানো না?

কী জানার কথা বলছ?

তুমি যে খারাপ?

সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মতো আমার হুট করে চোখের জল আসে না। বরং সে-সব পরিস্থিতিতে আমার একরকমের পুরুষের রাগের মতো রাগ হয়, থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করে।

অবশ্য জয়দেবকে আমি থাপ্পড় কষাইনি, শুধু বলেছি, না, আমি খারাপ বলে নিজেকে জানি না। বরং মানুষকে যারা সাদা মনে গ্রহণ করতে পারে না তাদেরই খারাপ বলে জানি।

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বলল, মানুষকে সাদা মনে গ্রহণ করব! কেন?

কেন করবে না?

কেন করব? মানুষ নিজের সম্পর্কে যা বলে তা কি সব সময় সত্যি হয়?

না-ই হল। ভালমন্দ মিশিয়েই মানুষ, মানুষ হওয়াটাই তার যোগ্যতা।

জয়দেব একটু হাসল। কিন্তু সে ঠিক হাসি নয়। বরং হাসির মুখোশে ঢাকা নিষ্ঠুরতা।

সে বলল, এই যে তুমি, তোমার কথাই যদি ধরা যায়, নিজের সম্পর্কে বলছ যে তুমি খারাপ নও। কিন্তু তোমার শরীর বলছে যে তা নয়।

আমার শরীর কী বলেছে তোমার কানে কানে?

বলেছে যে বিয়ের সময় তুমি কুমারী ছিলে না।

বললাম, গাধার মতো কথা বোলো না, তোমার মতো সন্দেহবাতিক যাদের তারা বিয়ে করে কোন মুখে?

জয়দেব মুখ কঠিন করে বলে, যাদের বাতিক নেই তারাই বোকা, যারা মানুষকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে তারাই অবিবেচক।

তুমি কী করে বুঝলে যে আমি কুমারী ছিলাম না! তুমি কি ডাক্তার না হঠযোগী?

জয়দেব বলে, ডাক্তার বা হঠযোগী হওয়ার দরকার হয় না। একটু সন্ধিৎসু হলেই চলে, আর একটু বুদ্ধিমান হলেই হয়। কেন, তুমি কি অস্বীকার করতে চাও?

নিশ্চয়ই। তুমি পিশাচের মতো কথা বলছ।

না। শোনো, শরীর পরীক্ষা করে সবই বোঝা যায়। তুমি হয়তো জানো না, আমি জানি।

তুমি ছাই জানো। তুমি পাগল, তোমার বাড়িসুদ্ধ পাগল। আমার খুব ভুল বিয়ে হয়েছে, বুঝতে পারছি।

জয়দেব রেগে গেল না। খুব রাগী মানুষ জয়দেবও ছিল না। ওর রাগ খুব ঠান্ডা আর দৃঢ়।

ও বলল, বিয়ে যে ভুল হয়েছে তাতে সন্দেহ কী। পিসিমার জন্যই হল। কিন্তু হয়ে যখন গেছেই তখন এটাকে যত দূর সাকসেসফুল করা যায় সেটা দেখাই আমার লক্ষ্য।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না, সন্দেহ দিয়ে শুরু হলে বিয়ে সাকসেসফুল হয় না। তার চেয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলাই ভাল।

জয়দেব এই প্রথম একটু ভয় পেল যেন, একটু চঞ্চল হয়ে বলল, এ তো সাহেব-রাজত্ব নয় যে যখন-তখন বিয়ে ভাঙা যাবে!

সে তোমরা বুঝবে। আমি বিয়ে চাই না।

জয়দেব আমার দিকে চিন্তিতভাবে চেয়ে বলল, শোনো, সাহেবদের দেশে একটা মানুষের সঙ্গে একটা মেয়েমানুষের বিয়ে হয়, বিয়েটা সেখানে ব্যক্তিগত ঘটনা, তার সঙ্গে পরিবার বা সমাজের তেমন কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের দেশে তো তা নয়।

তত্ত্বকথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তুমি যদি অত বড় অপমানটা আমাকে না করতে তাও না হয় হত। আমি ও-সব বুঝি না, বুঝবও না।

তোমাকে একটু বুঝতেই হবে যে। বলতে গিয়ে জয়দেবের স্বর যথেষ্ট নরম হয়ে এল। তাব মুখ-চোখে ভিতু-ভাবও একটু ফুটে উঠল কি?

আমি শুনতে চাইছিলাম না। উঠে চলে আসছি, জয়দেব তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত ধরে ফেলল। ঝনাৎ করে নতুন চুড়ি-শাঁখায় ভরা হাতটা শব্দ করে উঠল। আমি হাত টেনে বললাম, ছেড়ে দাও।

সেও হাত ধরে রেখে বলল, একটু শোনো, দু'টো কথা...

ও ছোটখাটো মানুষ, আমার হাত ধরে আটকে রাখার মতো যথেষ্ট গায়ের জোরই ওর নেই। নেচেকুঁদে বরং আমার গায়েই তেল বেশি হয়েছে। ঝটকা মেরে প্রচণ্ড রাগে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। তখন সেই আধা-পুরুষটা দু'হাতে আমার কোমর জাপটে ঝুলে পড়ল, বলল, যেয়ো না। শুনে যাও।

ওর পা থেকে কোমর অবধি মেঝেয় লুটোচ্ছে, ঊর্ধ্ব অঙ্গ ঝুলছে আমার কোমর ধরে, হাস্যকর দৃশ্য। কিন্তু আমার হাসি পায়নি। ওর ওই সর্বস্ব দিয়ে ঝুলে থাকা টানে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেতে যেতে আমি ওর মুখে থাবড়া দিলাম কয়েকটা। ও তবু ছাড়ল না। আমি টাল সামলাতে না-পেরে থপ করে বসে পড়লাম মেঝেতে। দরজা অবশ্য বন্ধ ছিল, তখন ছুটির দিনের দুপুরবেলায় বাড়ির বেশির ভাগ লোকই ঘুমোচ্ছে, কথাবার্তা শুনে কেউ কৌতূহলী হতে পারে তো! বিশেষ করে জয়দেব এ সব ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিল। দিনের বেলায় সকলের সামনে আমার সঙ্গে কখনও কথা বলত না। বিয়ের এক মাসের মধ্যেও সে দুপুরবেলা কখনও শারীরিকভাবে মিলিত হয়নি। সে নাকি শাস্ত্রে বারণ আছে। অসহ্য! অবশ্য মিলিত হয়েও সে যে আমাকে সুখী করতে পারত এমন নয়।

যাই হোক, দু'জনে এক অস্বাভাবিক কুস্তির প্যাঁচ কষে যখন বসে বা শুয়ে আছি তখন জয়দেব আমাকে একইভাবে ধরে থেকে বলল, রাগ করে বুদ্ধি হারিয়ো না। বিয়ে ব্যাপারটাকে আমরা সামাজিক কর্তব্য হিসেবে মনে করি, তাতে দুই পরিবারের মান-মর্যাদাও জড়িত। তাই বলি হঠাৎ ডিভোর্সের কথা চিন্তা করে সব ভণ্ডুল কোরো না।

আমাকে চিন্তা করতেই হবে। আর চিন্তাই-বা কী, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

জয়দেব কোমর ধরে পড়ে আছে। সুযোগ বুঝে সে হঠাৎ আমার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে বলল, তাতে তোমার-আমার কারও সম্মান বাড়বে না। লোকে ছি ছি করবে।

সেই মুহূর্তে জয়দেবকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম। লোকটার কিছু দুর্জয় কুসংস্কার আর লোকলজ্জা আছে, যার জন্য ও আমার সব কলঙ্ককেও হজম করে যাবে। এটা বুঝে আমি আর-একটু চাপ সৃষ্টি করার জন্য বললাম, তা হলে বলো, কী করে বুঝলে যে আমি কুমারী নই।

জয়দেব ভীত চোখে চেয়ে রইল একটুক্ষণ, তারপর আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থেকেই হঠাৎ চোখ বুজে বলল, আমার ভুল হতে পারে অলকা।

তার মানে?

তার মানে কুমারীত্ব পরীক্ষার কোনও নিশ্চিত উপায় নেই।

তবে বললে কেন?

দেখলাম, তুমি স্বীকার করো কি না।

আমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের জন্মগত কিছু বুদ্ধি তো থাকেই। এই বোকাটা কী করে ভাবল যে আমি স্বীকার করব? আমি বললাম, কী স্বীকার করব?

জয়দেব হঠাৎ খুব বদলে গিয়ে বলল, আমাকে ক্ষমা করো।

বলতে নেই, সেই ক্ষমা প্রার্থনার কারণটা ছিল প্রবল কামেচ্ছা। হঠাৎ ওই রাগারাগি থেকে শারীরিক টানাটানির ফলে পরস্পরের নৈকট্য, ঘন শ্বাস, দেহগন্ধ, স্পর্শবিদ্যুৎ—সব মিলেমিশে এক প্রবল চুম্বকের ক্ষেত্র তৈরি করে দিল। দেহ-অভিজ্ঞতা তো তখনও আমাদের নতুন, তাই সামলাতে পারল না জয়দেব। ঝগড়াটা শরীরের মিলন দিয়ে শেষ হল।

আবার হলও না।

প্রভাসরঞ্জন

সুইস এয়ারের যে উড়োজাহাজে আমি ফিরছিলাম তাতে খুব একটা ভিড় ছিল না। জানালার ধারে এক জার্মান বুড়ি, তার পাশে এক বুড়ো, পরের সিটটায় আমি। বুড়োর হাতে আর্থারাইটিসের ব্যথা, তাই বুড়ি বুড়োকে কফি কাপ ধরে ধরে খাইয়ে দিচ্ছিল, খাবার মুখে তুলে দিচ্ছিল। বুড়োর মুখেও বোধহয় প্যারালাইসিসের ছোঁয়া আছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুপ গড়িয়ে পড়ে, মাংসের টুকরো হড়াৎ করে কোলের ওপর পড়ে যায়। ন্যাপকিন তুলে বুড়ি বারবার মুখ মুছিয়ে দেয়, আর আমার দিকে অপ্রতিভ হাসি হেসে চেয়ে কেবলই ক্ষমা চায়। বুড়োর কাঠামোটা বিশাল, এক সময়ে যৌবনকালে দাঙ্গাহাঙ্গামা করত বোধহয়। এখন বয়সে বড় জব্দ। কথা এড়িয়ে জড়িয়ে যায়, খুব জোরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে শ্বাস ছাড়ে। অনবরত সেই শব্দে প্রেশারাইজড আবহাওয়ার উড়োজাহাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেও আমি জেগে উঠি। বিরক্ত হই। বুড়ো আমার দিকে একটু একটু অপরাধবোধ নিয়ে তাকায়। বুড়ো-বুড়িকে আমার খারাপ লাগছিল না। বেশ ভালবাসা দু'জনের। আমার জার্মান বউ সিসি আমাকে খুব ভালবাসত, যদি বিয়েটা টিকত আর আমরা এ-রকম বুড়ো হতাম, তবে কি তখনও আমার জন্য এতটা করত সে?

সিসির কথা একটু একটু ভাবছিলাম। ফ্রাঙ্কফর্টে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। জার্মান মেয়েদের মতো গায়েগতরে বিশাল ছিল না, বেশ একটু নরম-সরম ছোট মাপের চেহারা। রোগাটে। সাদাটে, ভাবালু। খুব ভুলো মন ছিল তার। সেইসব দেখে আমি ঝপাৎ করে তার প্রেমে পড়ে গেলাম। সে তো পড়লই, যৌবনকালে ওরা বড় বেশি প্রেমে পড়ে। পরিচয়ের পর প্রেম হওয়ারও আগে আমরা এক বিছানায় বিস্তর শুয়েছি। যাকে ফুর্তিবাজ বলে আমি ঠিক তা নই। বিদেশে মেয়েদের গা-দেখানো এবং গায়ে পড়ার প্রবণতা এত বেশি ছিল যে সেখানে তাদের জলের মতো ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমারও এ-রকম অভিজ্ঞতা কিছু ঘটেছিল। সিসি তাদের মধ্যেই একজন। একসঙ্গে কিছুদিন থাকার জন্য ভূমিকা-টুমিকা করতে হয়নি। এবং কিছুকাল থেকে সরে পড়াতেও বাধা ছিল না। ফ্রাঙ্কফর্টে আমার পনেরো দিনের ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফেরবার আগের দিন অবধি আমি সিসির একঘরের ছোট্ট বাসায় ছিলাম। থাকার খরচটা আমার বেঁচে যাচ্ছিল। ওকে আমার পছন্দও হচ্ছিল খুব। আসার দিন সকালে ঘুম থেকে ভাল করে ওঠার আগে বিছানাতেই ওকে আমি বিয়ের প্রস্তাব দিই। ও খুব হেসে বলল, ঠিক এ-রকম ভঙ্গিতে আর কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে বলে আমি জানি না। সিসি কিন্তু প্রস্তাব পেয়ে ভীষণ খুশি। ওর জীবনে সেটাই প্রথম প্রস্তাব। সেই দিনই রেজিস্ট্রি করে আমি ব্যলে চলে আসি। দেড় মাস পর সিসিও এল, আমরা দু'জনে বেশ একটু কষ্ট করে থাকতাম। কারণ, ও এসে প্রথম প্রথম চাকরি পায়নি। তার ওপর গর্ভবতী। চাকরি পেলেও করতে পারত না। ও তখন রক্তাল্পতায় ভুগছে, সঙ্গে আনুষঙ্গিক নানা অসুস্থতা। আমার বেতন খুব বেশি ছিল না, সিসির চিকিৎসা আর যত্নের জন্য পুরো টাকাটা বেরিয়ে যেত। মাস চারেক পর একটু সুস্থ হয়ে সে ফিরে গেল ফ্রাঙ্কফর্টে, আবার ক'দিন পর এল। আমিও যেতাম। ব্যলেই অবশেষে সে চাকরি পায় আমার কোম্পানিতেই। যথাসময়ে আমাদের এক

পুত্রসন্তান হয়। তার গায়ের রংটা আমার রং ঘেঁষা বটে, কিন্তু দুরন্ত ইউরোপীয় রক্ত শরীরে বইছে, বিশাল ছেলেটা জন্মেই জার্মানদের মতো গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে।

ছেলেটা যখন মাস চার-পাঁচেকের হল তখন সে আমার অতি আদরের ধন। বড়সড় চেহারা, কান্নাকাটি নেই, আমার কোলে উঠলে খুব চেঁচাত আনন্দে। অবিকল কাকাতুয়ার মতো শব্দ করত সে উত্তেজনার সময়ে। টিভি দেখতে খুব পছন্দ করত, কী কারণে জানি না লাইটার বা দেশলাই জ্বাললে খুব ভয় পেত। এরোপ্লেনের আওয়াজ শুনলেই কাঁদো-কাঁদো মুখ হয়ে যেত। তার চার মাস বয়সে রং অনেক ময়লা হয়ে গেল, দাঁত উঠবার সময়ে বেশ রোগাও হয়ে গেল সে। তার প্রিয় খাবার ছিল মিষ্টি, চকোলেট বা ক্যান্ডি পেলে মুখের নাল দিয়ে মাখামাখি করে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চুষতে ভালবাসত। সে বেশ বড়সড় বাচ্চা ছিল, তবু তাকে দেখলেই বোঝা যেত যে সে ভারতীয় সন্তান, মুখে সিসির আদল থাকা সত্ত্বেও।

তার যখন পাঁচ মাস বয়স তখনই সিসি আর আমি আলাদা হওয়ার মনস্থ করি। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা ছিল মর্মান্তিক, বাচ্চাটাকে ছেড়ে কী করে থাকব! সিসিও জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং ভিন্ন জীবনের জন্য খুবই উদগ্রীব। আমার মতো নিস্পৃহ এবং কম আমুদে লোককে সে সহ্য করতে পারত না। যেমন আমি পারতাম না তার অতি উচ্ছল ও খানিকটা নীতিবিগর্হিত চলাফেরা। আমার ভিতরে এক তেমাথাওলা ভারতীয় গেঁয়ো বুড়োর বাস। সে কেবলই সতী-অসতী, ভাল-মন্দ, নীতি-অনীতি বিচার করে যায়। কতবার তার মুখে হাতচাপা দিতে গেছি, থামাতে পারিনি। অশান্তির শুরু সেখানেই! একসময়ে আমার এও মনে হয়েছিল, সিসি চলে গেলেই বাঁচি, দেশে ফিরে একজন বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে সুখে থাকব।

কিন্তু ছেলেটাই মস্ত বাধা।

আমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, আগেই বলেছি। সেটাও এই বিচ্ছেদের আর একটা কারণ। উপরন্তু সিসির বাবা-মা বার্লিন থেকে তাকে ক্রমাগত চিঠি দিচ্ছিল ফিরে যাওয়ার জন্য। সিসি একটা মস্ত ভুল করেছে, তাদের ধারণা। সব মিলিয়ে একটা ঘোঁট পাকাল।

তারপর বিচ্ছেদ। ছেলের নাম রেখেছিলাম নীলাদ্রি। পরে সেই নাম সিসি বদলে দিয়েছিল কি না জানি না। নীলুর জন্য আজও আমার মন বড় কেমন করে।

নীলু তার মা'র সঙ্গে জার্মানি ফিরে গেছে, আর আমার সঙ্গে তার দেখা হবে না! দেখলে চিনবেও না তেমন করে। এতকাল ইউরোপে তবু তার কাছাকাছি ছিলাম। উড়োজাহাজ যখন উড়িয়ে আনছিল আমাকে পুবের দিকে তখন কেবল মনে হচ্ছিল, নীলুর কাছ থেকে কত দূরে সরে যাচ্ছি।

পাশের বুড়োটা আমার হাঁটুতে হাত রাখল হঠাৎ। তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠি। তাকাতেই বুড়ো নাকের বাঁশি বাজিয়ে জড়ানো গলায় কী যেন বলে। আমি অস্পষ্ট শুনতে পাই, হাইজ্যাক!

ততক্ষণে বুড়িও সটান উঠে বসেছে। বুড়িও বলল, হাইজ্যাকারস!

আন্তর্জাতিক বিমানে আজকাল সবসময়েই হাইজ্যাকের ভয়। বিমানের দুর্ঘটনার ভয়ের চেয়ে এই ভয় কিছুমাত্র কম নয়। কোথায় কোন গেরিলা বা লিবারেশন আন্দোলনের বিপ্লবী পিস্তল-বোমা নিয়ে উঠে বসে আছে কে জানে! মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, লাটিন আমেরিকায় সর্বত্রই গভীর অসন্তোষ। দেশপ্রেমিক বা ভাড়াটে গেরিলা সর্বত্রই বিরাজ করছে। কখন কোন বিমানকে ভয় দেখিয়ে তারা অজানা ঠিকানায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ হিসেবে কতজনকে আটকে রাখে বা হত্যা করে তার কোনও ঠিক নেই। তাই আজকাল আন্তর্জাতিক বিমানে উঠলে অনেকেরই বুক একটু ধুকপুক করে।

তাই বুড়ো-বুড়ির চাপা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠে তাকিয়ে সামনের তিন সারি দূরত্বে একজন আরবকে দেখতে পাই। অবশ্য সে আরব কি না তা বলা খুবই মুশকিল, তবে সে যে মধ্যপ্রাচ্যের

লোক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। গাল ও থুতনি জুড়ে চাপা দাড়ি। চমৎকার মোটা গোঁফ। বাচ্চা একটা হাতির মতো তার বিশাল চেহারা। তাকে কয়েকবারই টয়লেটের দিকে যেতে দেখেছি উড়োজাহাজে ওঠার পর থেকে। পেটের রোগ, বহুমূত্র বা বাতিক না থাকলে অতবার কেউ বাথরুমে যায় না। কিন্তু তখন তাকে সন্দেহ হয়নি। এখন দেখি, কাঁধে একটা এয়ার ব্যাগ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে এক দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপে এয়ার ব্যাগটা ঝুলছে, ব্যাগের চেন খোলা, তার বাঁ হাতটা ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো। খুবই সম্ভব, সে ব্যাগের মধ্যে গুপ্ত গ্রেনেড বা পিস্তল ছুঁয়ে আছে, এবং পিছনের দিকে তার কোনও সহ-গেরিলার দিকে তাকিয়ে নিচ্ছে—সব প্রস্তুত কি না।

একটু আগেই নীলুর কথা ভেবে আমার চোখে জল আসছিল। ছেলেকে ইউরোপে রেখে আমি চলে যাচ্ছি। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না, আমার পরিচয় তার জীবন থেকে মুছে যাবে, আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে যাব পরস্পরের কাছে। অথচ সে আমারই বীজ, আমার শরীর থেকে তার অস্তিত্বের জন্ম। এতখানি আমাদের আত্মিক সম্পর্ক, তবু সে আজ আমার কেউ না। খুবই শিশু অবস্থায় সে আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছিল, সেই বয়স পর্যন্ত তার হাবভাব, হাসা-কাঁদা, অবোধ শব্দ সবই আমার ভিতরে টেপ রেকর্ড করা আছে। স্মৃতির বোতাম টিপে দিলেই টেপ রেকর্ড বাজতে থাকে। সবই মনে পড়ে। আমার মাথার ভিতর থেকে একটা প্রোজেকটার মেশিন চোখের পরদার ওপরে তার সব চলচ্চিত্র ফেলতে থাকে। ছেলেটাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না, অধিকারবোধ ছাড়তে চায় না। নীলু আমার ছেলে— এই বাক্যটা ধ্রুবপদের মতো মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফেরে। একটা অসহায় ভালবাসা বাৎসল্য আমাকে খুবই উত্তেজিত এবং অবসন্ন করে দেয়। দেশে ফিরে যাচ্ছি, সেখানেও আমার জন্য কোল পেতে কেউ বসে নেই। আদরে আহ্লাদে আমার দুঃখ ভুলিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পরিবারে ভালবাসার চাষ কম দেখেছি। দুঃখে দারিদ্র্যে হতাশায় আধমরা মানুষ ছিলাম আমরা, পেটের ভাতই ছিল তখন ভালবাসার চরম নিদর্শন।

বাবা-মা বুড়ো হয়েছেন। সংসার প্রায় অচল। প্রথম প্রথম আমি টাকা পাঠিয়েছি। বিয়ে করার পর তাও পাঠাতে পারিনি। কীভাবে সংসার চলে তা আমার জানা নেই, জানতেও চাইনি। ও-সব জানতে গেলে মন ভারাক্রান্ত হয়। তাই না-জানারই চেষ্টা করেছি। বাবার চিঠিতে যে অংশে সংসারের দুঃখের বিবরণ থাকত সেই অংশ আমি বাদ দিয়ে পড়তাম। জানতাম, তাদের জন্য আমার আর কিছু করার নেই, খামোখা তবে তাদের দুঃখের কথা জেনে কী হবে।

এরোপ্লেনে বসে আমি সারাক্ষণ আমার দু'টো জীবনের কথা ভাবছিলাম। স্বদেশে আমার দারিদ্র্যপীড়িত জীবন, বিদেশে আমার নানা আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা। এর ওপর নীলুর স্মৃতি। বিদেশিদের মধ্যে এত বেশি সন্তানস্নেহ বোধহয় নেই। অন্তত আমার মতো পিপাসার্ত পিতৃহৃদয় আমি কারও দেখিনি। নিজের বাপ-মায়ের মধ্যেও পুত্রস্নেহের কোনও বাহুল্য প্রকাশ পেত না। তা হলে আমার এই প্রবল স্নেহ এল কোত্থেকে?

পরে আমি অনেক ভেবে এর একটা উত্তর খুঁজে পাই। আসলে স্বদেশে যারা আমার আপনজন তাদের কোনও দিনই আপন বলে মনে হয়নি। একমাত্র ছোটকাকাকে মনে হত। কেন মনে হত তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল। কিন্তু যেই তাঁকে সত্যিকারের ভালবাসতে শুরু করি সেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আবার বিদেশেও তাই। আমাব ছেলেটিকে বুকে চেপে যখনই ভাবতে শুরু করি এই আমার নিজস্ব সন্তান, তখনই তার ছেড়ে যাওয়ার সময় হল।

আশ্চর্য এই, নীলাদ্রির মুখে আমার ছোটকাকার মুখের ছাপ ছিল। এও হতে পারে, স্নেহের দুর্বলতা থেকেই আমি তার মুখে কাকার আদল দেখতাম। পৃথিবীতে আমার প্রিয় জনের সংখ্যা খুব কম। বাবা-মা'র প্রতি আমার দুর্বলতা বা শ্রদ্ধা খুব বেশি থাকার কথা নয়। শিশুকাল থেকে অভাব,

আর সংসারের ভার কাঁধে বয়ে তাঁদের ওপর আমার বীতশ্রদ্ধা এসে গিয়েছিল। মনে হত আমার কোমরে শেকল দিয়ে সংসারটা কে যেন বেঁধে দিয়েছে, যার জন্য আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, অনার্স ছাড়তে হয়েছিল, জীবনের অনেক সার্থকতা আমাকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল। তাই নিজের আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আমার এক বিরূপ মনোভাবের জন্ম হয়। যখন বিদেশে সিসিকে বিয়ে করলাম তখন সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল, এই বুঝি ভালবাসার আশ্রয় পেলাম। ভুল, খুবই ভুল সেটা। যে ভালবাসার শুরু দেহের প্রেম দিয়ে তার বিয়ে কত দূর নিয়ে যেতে পারে আমাদের। শরীর জুড়োল তো ভালবাসা ফুরোল। আমরা কেবল শরীর দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসার চেষ্টা করেছি। পরস্পরের সান্নিধ্য রাখা ছিল সামাজিক কর্তব্যের মতো। সেখানে বিশাল ও ব্যাপ্ত কর্মময় জীবনে সিসিও যেমন ব্যস্ত, আমিও তেমন, তাই আমাদের পরস্পরের ওপর নির্ভরতা কমে গিয়েছিল। ভারতীয় সংস্কারবশত আমি তার স্বাধীন চলাফেরা বা বহির্মুখিনতা খুব বেশি পছন্দ করতে পারতাম না। তাই সিসি নয়, নীলুই ছিল আমার একমাত্র অবলম্বন। তার মুখের দিকে তাকালে আমার বুক ঠান্ডা হয়ে যেত। তাই নীলু চলে গেলে সারা পৃথিবীতে আমার আর কেউ রইল না।

না বিদেশে, না স্বদেশে, কোথাও আমার কেউ নেই—এ-রকম একটা বোধ আমার বুকে পাথরের মতো জমে আছে। বিদেশে থাকার আনন্দ নেই, স্বদেশে ফেরার আনন্দ নেই। আমার মতো এমন উদ্বাস্তু কে আছে কোথায়। এ-রকম মনের অবস্থায় মাঝে মাঝে আমার মরতে ইচ্ছে করত। কিন্তু মরাটা জীবনে এক বারই ঘটে, তাই সেই নিশ্চিত অভিজ্ঞতাটিকে আমি কিছু বিলম্বিত করছিলাম। দেখা যাক, মরবার আগে কোথাও কোনও ভালবাসা বা প্রিয়ত্বের আলো চিড়িক দেয় কি না। তারপর আমার হাতের মুঠোয় মৃত্যু তো আছেই। এ-রকম মানসিকতা থেকে আমার মৃত্যুভয় কেটে গিয়েছিল। অন্তত কেটে গেছে বলেই ধারণা ছিল আমার।

আরব লোকটা যখন ওইরকম একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঘুরে তার সঙ্গীকে দেখছে আর আমার পাশের বুড়োটার একটা প্রকাণ্ড কাঁপা-কাঁপা ঘামে ভেজা হাত এসে আমার কবজি পাকড়ে ধরল, আর বাঁশির মতো শ্বাস ফেলতে ফেলতে যখন সে বারবার বলতে থাকল, 'আইজ্যাক, আইজ্যাক', তখন অন্য অনেক যাত্রীও তন্দ্রা ভেঙে সচকিত হয়ে বসে পরিস্থিতি লক্ষ করছে। তাদের অনেকের মুখেই ভয়ের পাঁশুটে ভাব, তখন আমিও হঠাৎ টের পেলাম, বাস্তবিক আমি আন্তরিকভাবে কোনও দিন মরতে চাইনি। মনে হল, জীবন কত সুন্দর ও বিশাল ছিল আমার। বয়স পড়ে আছে অঢেল। এখনও চেষ্টা করলে জীবনে কত কী করতে পারি।

আরব লোকটা তার প্রচণ্ড ঘন ভ্রূ দিয়ে ভ্রূকুটি করে 'আলিজা' কিংবা অনুরূপ একটা চাপা ধ্বনি করল। সম্ভবত কারও নাম। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম। একটু আগেই ডিনার হয়ে গেছে, সেই অতি সুস্বাদু খাবারের স্বাদ এখনও জড়িয়ে আছে জিভে। সামান্য একটু মদ খেয়েছিলাম, তার রিমঝিম নেশা এখনও মাথায় রয়ে গেছে। সুন্দর একটা শারীরিক তৃপ্তির পর একটু আগে কফি শেষ করে সিগারেট খেয়েছি। সেইটাই কি জীবনের শেষ পানভোজন? কে জানে, কে বলবে?

ও পাশের বুড়িটা একটা ফোঁপানির শব্দ করল। সাহেব-মেমরা কম কাঁদে। প্রকাশ্যে তো কখনওই কাউকে কাঁদতে দেখিনি। কিন্তু বয়সের দোষে এবং ভয়বশত বুড়ি কাঁদছিল। কথাপ্রসঙ্গে জেনেছিলাম, তাদের ছেলেপুলে নেই, দু'জনেরই আগে এক বার করে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাদের পরস্পরের এই বিয়েটা অনেকদিন স্থায়ী হয়েছে, মৃত্যুর আগে তাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—বলেছিল বুড়ি। বুড়োর গা একটা কম্বলে ভাল করে ঢেকেঢুকে দিচ্ছিল একটু আগে, তাতে আমিও সাহায্য করেছি। আমার জীবনে ভালবাসা নেই বলেই বোধহয় তাদের ওই ভালবাসা আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই তো এরা দুনিয়ার আর কারও পরোয়া করে না, পরস্পরকে নিয়ে কেমন মেতে আছে। প্রিয়জনের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুতেই তো এই পৃথিবী আর জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব

নয়। জীবনের একেবারে শেষভাগেও এই দুই অথর্ব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের বেঁচে থাকাকে একরকম করে উপভোগ করছে দেখে আমার একটু ঈর্ষা-মেশানো আনন্দ হচ্ছিল।

আরব লোকটা কাকে ডাকল কে জানে! কিন্তু পেছন থেকে কোনও উত্তর এল না। আরবটা তখন তার সিট থেকে বেরিয়ে মাঝখানের প্যাসেজটায় দাঁড়াল, তখনও ব্যাগের মধ্যে হাত। খুব সম্ভবত সেই লুকানো হাতটা গ্রেনেডের সেফটি ফিউজ আলগা করছে আস্তে আস্তে। প্যাসেজে দাঁড়াতেই তার বিশাল চেহারাটা আরও বিশাল নজরে পড়ল। তার বাহুর ঘের বোধহয় আমার বুকের সমান হবে। বুকটা মাঠের মতো ধু-ধু করা বিরাট। ইচ্ছে করলে ও বোধহয় ঘুষি মেরেই পলকা প্লেনটাকে তুবড়ে দিতে পারে। কিন্তু আপাতত সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, চোখে ভ্রূকুটি। ডান হাতটা খানিকটা মুঠো পাকিয়ে আছে। যাত্রীরা সবাই দৃশ্যটা দেখছে, কিন্তু কেউ নড়ছে না। কিন্তু অস্ফুট 'হাইজ্যাক' শব্দটা চার পাশ থেকে শুনতে পাচ্ছি। ফিসফাস শব্দ হচ্ছে। একটা বছর ছয়েকের বাচ্চা প্লেনের পিছন দিকে রয়েছে, তার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, পরিষ্কার ইতালিয়ান ভাষায় সে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে, মরে গেলে আমাদের কি রোমে ফিরতে দেরি হবে?

আমাদের দমদমের বাড়িতে একদিন একটা কাক ডানা ভেঙে পড়ে গিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মারা যায়, আর তাকে ঘিরে সারাদিন হাজারটা কাক চেঁচামেচি করেছিল। আমার ছোট ভাই দৃশ্যটা খুব করুণ চোখে দেখেছিল। পরদিন যখন আবার এঁটো-কাঁটা খেতে কাক এসে উঠোনে নামছে তখন সে আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কাককে দেখিয়ে বলল, দাদা, ওই কাকটা কাল মরে গিয়েছিল না রে?

সেই স্মৃতিটা মনে আসতেই এক ঘোর মায়ায় আমার বুক ভরে গেল। শিশুরা তো মৃত্যুকে জানে না! ওই মেয়েটির কণ্ঠস্বর আমাকে যেন চাবুক মারল। নীলুর কথা মনে এল, ছোট ভাইটার কথা মনে এল। স্নেহমায়ায় বুক ভরে গেল। আর ওই তীব্র চেহারার আরব লোকটির দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আমার ভিতরে মৃত্যুভয়ে একটা বিস্ফোরণ ঘটল যেন।

আরবটা এক পা, এক পা করে কয়েক পা এগিয়ে এল। দাঁড়াল। আবার এগোল। দাঁড়াল। সেই একই ভঙ্গিতে তার ডান হাত মুঠো পাকানো। বাঁ হাত ব্যাগের মধ্যে ভরা। একটু বাদেই কিছু একটা ঘটবে। লোকটার মুখে-চোখে এক কঠিন আত্মপ্রত্যয়। মৃত্যুর প্রতি সে নির্মমভাবে উদাসীন। সবরকম বিপদকে নিয়েই সে বেঁচে আছে।

আর তখন হঠাৎ আমার মানসিক একটা বিকলতা ঘটে গেল। হঠাৎ যেন এরোপ্লেনের মৃদু চাপা শব্দ, আর অতি ক্ষীণ থরথরানি থেমে গেল। আর আমি এক স্বপ্নময় দৃশ্যের মধ্যে ঢলে পড়লাম।

সেই দৃশ্যটা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবতাবর্জিত।

দেখি একটা বিচিত্র দেশে আমি পৌঁছে গেছি। এখানে মাটির রং নীল, তার ওপর হলুদ সবুজ লাল গোলাপি, হরেক রকমের ঘন ঘাস গজিয়ে চারধারে যেন এক বিভিন্ন রঙের দাবার ছক তৈরি করে রেখেছে। এইসব রঙিন ঘাসের নিখুঁত চৌখুপির ধারে ধারে নাতিদীর্ঘ গাছে সম্পূর্ণ গোল রামধনু। ছবিতে যেমন সব কাল্পনিক পাখি দেখা যায়, তেমনই সব পাখি উড়ছে চারধারে। আকাশের রং উজ্জ্বল নীল, তাতে গোল গোল সুন্দর নানা বর্ণের মেঘ। তারাগুলো অনেক কাছে কাছে ফুটে আছে। আর প্রতিটি তারার মধ্যেই নাক মুখ চোখ আঁকা। আকাশের এক ধারে এত বড় একটা চাঁদ দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় দিগন্তের প্রায় বারো আনা অংশ জুড়ে আছে। চারধারে ছোট ছোট টিলা রঙিন কাচ আর কাঠ দিয়ে তৈরি বাড়ি। রাস্তা দিয়ে পুতুলেরা হেঁটে যাচ্ছে। দু'টো কুকুর অবিকল মানুষের ভাষায় কথা বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। গ্রোসারি শপ-এর সামনে একটা টেকো পুতুল একটা পাখির সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করছে। তিনজন পরি উড়ে উড়ে রামধনুগুলোয় আরও ভাল করে রং দিয়ে দিচ্ছে। একটা খেলনা মোটরগাড়ি মোরগের ডাকের মতো ভেঁপু বাজিয়ে চলে গেল। চারধারে কী এক অপরিসীম শান্তি, এক মৃত্যুহীন নিরাপদ শাশ্বত জগৎ!

পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, নীলুর জন্য যে-সব ছবির বই কিনে দিয়েছিলাম আমি, তারই কোনওটার মধ্যে এই ছবিটা ছিল। আমি সেইরকমই একটা ছবির মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমি হঠাৎ ডুকরে বলে উঠলাম, নীলু!

আরব লোকটা সেই মুহূর্তেই আবার ডাকল, আলিজা!

এবার পিছন থেকে একটা শব্দ এল। তারপর একটা লম্বা, সুন্দরপানা মেয়ে উঠে এল কোথা থেকে। তারও অবিকল মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা। সে এসে এই বিশাল লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। এই মেয়েটাই কি ওর সহ-গেরিলা?

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অলকা

এই সকালবেলায় আমার ঘরখানা চমৎকার দেখাচ্ছে। সারা দিনের মধ্যে আমার সবচেয়ে পছন্দের সময় হল সকালবেলা। আমি খুব ভোরে উঠতে পারি না বলে আমার একরকম দুঃখ আছে। তবে মাঝে মাঝে বেশ ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ঘরময় সকালের রোদ দেখি। কী সুন্দর যে লাগে ভোরের একটা আলাদা গন্ধ! লক্ষ করে দেখেছি, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মানুষকে সবচেয়ে ভাল দেখায়।

পার্ক সার্কাসের এই ফ্ল্যাটটা প্রথমে ভাড়া করেছিল আমাদের এক মাসতুতো দাদা। আমার বিয়ের ছ' মাস পর আমি আর জয়দেব হানিমুন করতে যাই শিলঙে। বুদ্ধিটা কার ছিল কে জানে। জয়দেবদের পরিবারে হানিমুনের চল ছিল না। কিন্তু আজকাল বাঙালি সমাজে হানিমুনের চল হয়েছে। আমার মনে হয় জয়দেবই আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য পরিবার থেকে কিছুদিন আমাকে নিয়ে আলাদা হতে চেয়েছিল। সেইটেই হল কাল।

শিলঙে আমরা একটি হোটেলের ঘরে দু'টো ঝগড়াটে বেড়ালের মতো দিনরাত ফোঁসফোঁস করতাম। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না।

জয়দেব হয়তো বলল, এক গ্লাস জল দাও তো!

আমার প্রেস্টিজে লাগল, বললাম, গড়িয়ে খাও, নয়তো বেয়ারাকে বলো।

তুমি তো আমার বউ, এটুকু করলে তো দোষ হয় না।

বউ মানে তো ঝি নয়।

একদিন একটা মেয়েকে দেখে জয়দেব বলল, দেখো, মেয়েটি কী সুন্দর!

স্বামী কোনও যুবতীকে সুন্দর দেখলে স্ত্রীর একটু হিংসে হওয়ার কথা, আমার হল না। বললাম, বেশ সুন্দর!

আলাপ করব?

করো না! তবে তুমি তো তেমন স্মার্ট নও, ভাল করে ভেবে-চিন্তে কথা বোলো।

জয়দেব অবশ্য গেল না কথা বলতে। চেরাপুঞ্জি দেখতে গিয়েও খুব তুচ্ছ কারণে একচোট ঝগড়া হল। জয়দেব বলল, চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় এটা কিন্তু সত্যি নয়। আমি রিসেন্টলি একটা বিদেশি ম্যাগাজিনে পড়েছি আর একটা কোনও জায়গায় যেন এর চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়।

চেরাপুঞ্জিতে না হয়ে অন্য কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হলেই-বা আমার ক্ষতি কী? কিন্তু যেহেতু জয়দেব বলছে, সেই হেতু আমার কথাটা ভাল লাগেনি, মনে হয়েছিল ও একটু পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করছে।

আমি বললাম, আন্দাজে বোলো না।

না অলকা, আমি পড়েছি।

মিথ্যে কথা। চেরাপুঞ্জিতেই বেশি বৃষ্টি হয়।

জয়দেব রেগে বলে, আমি বলছি আমি পড়েছি।

পড়লেও ভুল পড়েছ। আমরা ছেলেবেলা থেকেই চেরাপুঞ্জিকে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির জায়গা বলে জানি।

ভুল জানো।

তুমি ভুল পড়েছ।

এইভাবেও আমাদের ঝগড়া হত।

শিলং বা চেরাপুঞ্জির দোষ নেই, ভূগোল বই বা বিদেশি ম্যাগাজিনও দায়ী নয়। আমরা দুজনেই টেলিফোনে দু'টো রং নাম্বার পেয়ে অচেনা লোককে চেনা ঠাওরাবার অভিনয় করছি।

শিলং থেকে দু'জনেই কিছু রোগা হয়ে ফিরে এলাম। শ্বশুরবাড়িতে কিছুকাল থেকে শরীর আরও খারাপ হল। লোকে ভাবল বোধহয় মা হতে চলেছি। ডাক্তার দেখে বলল, না, পেটে ফাংগাস হয়েছে।

শরীর সারাতে বাপের বাড়ি গেলাম। মাসখানেক পর জয়দেব নিতে এল। গেলাম না। জয়দেব তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে কটেজ আর স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর জন্য কী সব কাজ করে বেড়ায়। বাড়িতে খুব একটা থাকে না। শুনলাম, প্রাচীন মন্দিরের ওপর থিসিস লিখছে ডক্টরেট করার জন্য। আমি শ্বশুরবাড়ি যেতে চাই না শুনে রাগ করে বলল, আমি কুড়ি দিন বাইরে বাইরে ঘুরে ফিরলাম, তুমি এ সময়ে যাবে না আমার কাছে?

আমি প্লেটে করে আচার খাচ্ছিলাম, জিভে টকাস টকাস শব্দ করে বললাম, আমাকে দিয়ে তোমার কী হবে? বউগিরি করতে আমার ভাল লাগে না।

জয়দেব আমার আচার খাওয়া দেখছিল। ওই সিরিয়াস অবস্থাতেও ওর মুখ রসস্থ হয়ে গিয়েছিল, মুখের ঝোল টেনে বলল, বউগিরি কথাটা কি ভাল।

আমি হেসে ফেললাম। বললাম, ভাল না মন্দকে জানে! আমার তো তাই মনে হয়।

জয়দেব হাল না ছেড়ে বলল, তুমি কি আমাকে একটুও সহ্য করতে পারো না?

পারতে পারি। যদি তুমি আলাদা থাকো।

আলাদা থাকলে কী হবে?

আমি আলাদা বাসায় স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। তোমাদের বাড়ির অত লোকের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগে না। তুমি আলাদা বাসা করে খবর দিয়ো। যাব।

এই কি শেষ কথা?

হ্যাঁ।

আমার বাড়ির লোক তোমার কী ক্ষতি করেছে?

তা জানি না। তবে যদি আমাকে চাও তো বাড়ি ছাড়তে হবে।

জয়দেব ভাবল। ফিরে গেল। মনে হল, কথাটা সে ভেবে দেখবে।

কিন্তু জয়দেবকে আমি তখনও ঠিক চিনতে পারিনি। বাড়ি ছাড়বার ছেলে জয়দেব ছিল না। ক'দিন পর তার একটা পরিষ্কার চিঠি এল। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে লিখে পাঠিয়েছে—অলকা, বিয়ে ভাঙার জন্য যা করতে হয় তা তুমি করতে পারো। আমি ইনিশিয়েটিভ নেব না। বিয়ে ভাঙা আমি পাপ বলে মনে করি। কিন্তু তুমি যদি চাও তো দাবি ছেড়ে দেব।

চিঠিটা পেয়ে যে খুব উল্লসিত হয়েছিলাম তা নয়। কোথায় যেন আমার মেয়েমানুষি অহংকারে একটু ঘা লাগল। যত যা-ই হোক, এক বার বিয়ে হয়ে গেলেই তো মেয়েরা আর কুমারী রইল না। এই বাংলাদেশে কুমারী যে নয়, সে একা হলে বড় মুশকিল।

এই চিঠি এলে আমাদের পরিবারেও হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাবা যত প্রগতিপন্থী হন, মা যত আধুনিকা হন, মেয়ে বিয়ে ভেঙে স্বামী ছেড়ে চলে আসবে, এটা তাঁরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি।

বাবা উত্তেজিত হয়ে বললেন, চল অলকা, আজই তোকে তোর শ্বশুরবাড়িতে দিয়ে আসি।

মাও বাবার সঙ্গে একমত। আমার ঠাকুমা ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করলেন। দাদাও খুশি নয়।

অথচ আমি-ই বা কেন শ্বশুরবাড়ি যাব?

বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া লাগল। আমি স্পষ্ট বললাম, যদি জয়দেব বাড়ি থেকে আলাদা হয় একমাত্র তবেই আমি ফিরে যেতে পারি।

বাড়ির লোকজন আমার মতে মত দিল না। জোর করতে লাগল। আমি প্রায় একবস্ত্রে মাসির বাড়ি চলে এলাম।

মাসিও বাঙালি হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমাকে চূড়ান্ত প্রশ্রয় দিয়েছে একসময়ে। সব রকম আধুনিকতায় শিক্ষিত করেছে, তবু দেখা গেল আমার এই বিয়ে-ভাঙার ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখছে না। বলল, দূর মুখপুড়ি, স্বামীর সঙ্গে যত ঝগড়াই করিস, বিয়ে ভাঙতে যাস না। এ দেশে যারা বিয়ে ভাঙে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়, হুট করে এই কম বয়সে ও-সব করিস না।

মাসির সঙ্গেও বনল না। অথচ কেন জানি না মনটা বড্ড আড় হয়ে আছে, জয়দেব বা তার পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না।

আমার আর-এক মাসির ছেলে অসীমদা তখন বিলেত যাচ্ছে। বউ-বাচ্চা নিয়েই চলে যাবে। পাঁচ-সাত বছর ফিরবে না। তার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ থাকবে এমন কথা হচ্ছিল। কলকাতায় বাসা পাওয়া প্রচণ্ড সমস্যা বলে তারা ফ্ল্যাটটা ছাড়তে চাইছিল না। তখন আমি অসীমদাকে বললাম, ফ্ল্যাটটায় আমাকে থাকতে দাও।

অসীমদা খুশি হয়ে বলল, তবে তো ভালই হল। কতগুলো দামি ফার্নিচার রয়েছে, তুই আর জয়দেব থাকলে ভালই হবে।

জয়দেব থাকবে না, আমি একা থাকব—এটা আর অসীমদার কাছে ভাঙলাম না।

ওরা যেদিন রওনা হয়ে গেল সেদিন বিকেলে গিয়ে ফ্ল্যাটটা দখল করলাম। জীবনে এই প্রথম একা থাকা। একদম একা। একটু ভয়-ভয় করছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আনন্দও হচ্ছিল। একা আর স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কী যে আনন্দ!

বাড়ি থেকে মা-বাবা আত্মীয়স্বজনরা এসে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক জ্বালাতন করল, আমি জেদবশত গেলাম না। বাড়িতে ফিরে গেলেই ক্রমাগত আমার ওপর নানা দিক থেকে চাপ সৃষ্টি হবে। অনেক ঠেস-দেওয়া বাঁকা কথা, অনেক চোরা-চাউনি আর মুচকি হাসি সইতে হবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি। ফিরে গেলাম না বলে সকলেরই রাগ, মা তো মুখের ওপরে বলেই গেল, তুমি বদমাশ হয়ে গেছ। নষ্টামি করার জন্যেই একা ফ্ল্যাটে থাকবার অত শখ।

ব্যাপারটা তা নয়। বিয়ের আগে যা হওয়ার তা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আমার মনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে! পুরুষদের প্রতি আমার এক ধরনের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, কেন জানি না, জন্মেছে।

একা ফ্ল্যাটে থাকতে হলে চাকরি চাই। কলকাতায় চাকরির বাজার তো তেমন সুখের নয়। তবু চেষ্টা-চরিত্র করে এক চেনা সূত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক অধ্যাপকের বাড়িতে বাচ্চা রাখার কাজ পেলাম। ইংরিজিতে বলে বেবি সিটার। ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করে। স্ত্রী ডাক্তার। তারা মানুষ বেশ ভাল। বালিগঞ্জ প্লেসে তাদের বাড়িতে সকাল আটটা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত সাত আর তিন বছরের দু'টো ছেলেমেয়েকে সামলে রাখতাম। দুপুরের খাবার দিত আর দু'শো টাকা মাইনে। সাত বছরের ছেলেটা কনভেন্টে পড়তে যেত। তাই তাকে বেশি আগলাবার দরকার পড়ত

না। তিন বছরের মেয়েটাকে সারাদিন ঘড়ি ধরে সাজাতাম, খাওয়াতাম, গল্প বলে ঘুম পাড়াতাম। বেশ লাগত। অসম্ভব মিষ্টি আর দুষ্টু মেয়েটা, সাত দিনেই সে আমার বড় বেশি ন্যাওটা হয়ে গেল। তার কচি মুখের দিকে চেয়ে বুকের মধ্যে ঢেউ দিত একটা কথা—আমার যদি এ-রকম একটা মেয়ে থাকত।

যে-সব বাচ্চার মা চাকরি করে তাদের যে কী দুরবস্থা হয় তা এই দু'টো বাচ্চাকে দেখেই বুঝতাম। দু'জনেই কিছু অস্বাভাবিক রকমের চঞ্চল, অভিমানী, আর-নিষ্ঠুরও ছিল। প্রথমে গিয়েই আমি বাচ্চাদু'টোর মধ্যে কেমন ভয়-মেশানো সন্দেহ-মেশানো একরকমের দৃষ্টি দেখেছিলাম চোখে। সারাদিন ওরা মায়ের জন্য অপেক্ষা করত মনে মনে। ডাক্তার-মায়ের ফিরতে রাত হত। তখন মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েও জেগে জেগে 'মা' বলে ডেকে ফের ঘুমোত। অন্য কোনও বাচ্চা দেখলেই মেয়েটা তাকে গিয়ে মারত, খিমচে দিত, চোখে খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করত। সব সময়ে সে যেন তার প্রতি এক অজানা অন্যায়ের শোধ নেওয়ার চেষ্টা করত। বড় কষ্ট হত আমার।

মাস তিনেকের মধ্যেই আমি বাচ্চা দু'টোর আসল মা হয়ে উঠলাম। সারাদিন আমি তাদের নিয়ে থাকি। আমার নিজের ছেলেমেয়ে হলে তাদের নিয়ে কী করতাম সেই ভেবে মায়ের মতো সব হাবভাব করি, বায়না রাখি, শাসন করি। ওরা তাই আমার মধ্যে হারানো মা কিংবা নতুন মা খুঁজে পেল। নিজেদের মা'র জন্য খুব বেশি অস্থির হত না। বরং আমি সন্ধেবেলা চলে আসবার জন্য তৈরি হলে মেয়েটা ভয়ংকর কান্নাকাটি করত। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে আসা মুশকিল হয়ে উঠল। এইভাবেই জড়িয়ে পড়লাম ওদের সঙ্গে। কিন্তু বাচ্চাদের বাবা রোহিতাশ্ব চৌধুরী একদিন আমাকে বললেন, অলকা, আপনি তো খুবই শিক্ষিতা এবং ভদ্রঘরের মেয়ে, এ-কাজ আপনার উপযুক্ত নয়। যদি বলেন তো আপনার জন্য একটা ভদ্রগোছের চাকরি দেখি।

তাই হল। এ-কথার মাস দুয়েকের মধ্যে আমি একটা বাঙালি বড় ফার্মে টাইপিস্ট-ক্লার্কের চাকরি পেলাম। বাচ্চাদের জন্য মনটা খুব ফাঁকা লাগত। ওরা আর একজন বেবি সিটার রেখেছে জেনে মনটাও খারাপ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসি ওদের, এটা-সেটা কিনে দিই। কিন্তু মাতৃত্বের এক অসম্ভব ক্ষুধা বুকের মধ্যে কেবলই ছটফট করে।

জয়দেবের সঙ্গে আমার বিবাহবিচ্ছেদের কোনও সক্রিয় চেষ্টা আমি করিনি। সে বড় হাঙ্গামা। উকিলের কাছে যাও, সাক্ষী জোগাড় করো। তা ছাড়া আমার অভিযোগ-বা কী হবে জয়দেবের বিরুদ্ধে? তাই ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আলাদা আছি বেশ চলে যাচ্ছে, আর কেন মামলার হাঙ্গামায় যাওয়া? জয়দেব তো আমাকে চিমটি দিচ্ছে না!

যুবতী মেয়ে। একা থাকি। আমার কি কোনও বিপদ হয়নি?

হয়েছিল। কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। অসীমদার ফ্ল্যাটে একটা ফোন ছিল, তাতে প্রথম কিছুদিন একটি ভিতু ছোকরা আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করার চেষ্টা করে। আমি ফোন তুলেই গলা চিনেই ফোন ছেড়ে দিতাম। তিন মাস পর সে হাল ছেড়ে দেয়। ওপরতলার এক মহিলার ফ্ল্যাটে মদ আর জুয়ার আড্ডা বসত। এক বার সেখানকার এক মাতাল আমার ঘরের কড়া নেড়েছিল, আমি দরজা খুললে সে আমাকে ধরবারও চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা মাতলামি। পরে সে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিল।

এ-রকম দু'-একটি ছোটখাটো ঘটনা বাদ দিলে আমার জীবন ছিল বেশ নিরাপদ। আমি একা থাকি না দোকা থাকি সেটাও তো সবাই জানত না। কলকাতায় কে কাকে চেনে!

তবে আমি যে-ফার্মে চাকরি করতাম সেই ফার্মের একটি উজ্জ্বল সুপুরুষ আর স্মার্ট ছেলে আমার প্রতি কিছু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার সঙ্গে দু'-একবার রেস্টুরেন্টে গেছি, বেড়িয়েছি এদিক-ওদিক। কিন্তু কী জানি তার প্রতি আমার কখনও কেন আগ্রহ জাগল না!

তবে সে এক বার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

আমার জীবন শুরু হয়েছে কয়েকবার। শৈশবে যে-জীবন শুরু করেছিলাম দেশভাগের পর তা শেষ হয়ে যায়। নতুন এক রুক্ষ ভিখিরির স্নেহহীন জীবন শুরু করেছিলাম। মধ্যে যৌবনে বিদেশে গেলাম নতুন আর-এক রকম জীবন শুরু করতে। কতবার কতভাবে শুরু হল. আবার শেষও হয়ে গেল। এখনও আয়ু অনেকটা পড়ে আছে, কতবার আরও নিজের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে হবে কে জানে?

ফেরার সময়ে সেই এরোপ্লেনেই যেমন, গেরিলারা যদি প্লেন হাইজ্যাক করে নিয়ে যেত, যদি মুক্তিপণ হিসেবে বন্দি করত আমাদের এবং যদি প্রতি ছ' ঘণ্টা অন্তর এক-একজন যাত্রীকে গুলি করে মেরে ফেলত তাদের দাবির বিজ্ঞপ্তি হিসেবে? না, সে-সব কিছুই হয়নি। না হলেও সেই কয়েকটা মুহূর্তের আকণ্ঠ মৃত্যুভয় আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলল।

সেই রূপসী তরুণীটি দৈত্যাকার লোকটির সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কী বলছিল তা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। চোখের পলক না-ফেলে হাঁ করে চেয়ে দেখছি দৃশ্যটা, আমার পাশে বসা বুড়োর নাকে বাঁশির শব্দ হচ্ছে, বুড়ি অস্পষ্ট স্বরে কেঁদে কী যেন বলছে বুড়োকে। প্লেনসুদ্ধ যাত্রীরা আতঙ্কে চেয়ে আছে দৃশ্যটার দিকে।

মেয়েটা কথা বলতে বলতে এক পা দু' পা করে এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। লোকটা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, চোখ দু'খানায় বাদামি আগুন ঝলসাচ্ছে। তারা দু'জন চারদিকের যাত্রীদের চোখকে গ্রাহ্য করছে না, যেন আর-কেউ যে উপস্থিত আছে এ তারা জানেই না।

মেয়েটা খুব কাছাকাছি এগিয়ে গেলে দৈত্য লোকটার চোখ-মুখ হঠাৎ খুব নরম হয়ে গেল। দু'টো প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মতো হাতে লোকটা সেই পলকা মেয়েটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তারপর চকাস চকাস করে চুমু খেতে লাগল।

ঠিক এরকমটার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ডান দিকে একটা লোক হেসে উঠল। পাশের বুড়ি বুড়োকে বলছে, ও গড, হি উইল ব্রেক দ্য গার্লস ব্যাক। পিছন থেকে একটা হাততালির শব্দ আসে। একজন বলে ওঠে, হ্যাপি এন্ডিং। পিছনের ইটালিয়ান বাচ্চাটা বিস্মিত স্বরে বলে ওঠে, ওরা কখন মারবে? চুমু খাওয়ার পর?

দু'জন সুন্দরী হোসটেস এতক্ষণ সামনের দিকে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল এদিকে চেয়ে। এবার তারা প্রাণ পেয়ে হাসিমুখে হঠাৎ এগিয়ে আসে। দৈত্যটির পিঠে টোকা দিয়ে একজন জার্মান ভাষায় বলে, ইচ্ছে হলে আপনি আপনার বান্ধবীকে আলাদা বসতে পারেন। সামনের দিকে একটা টুইন সিট আছে।

লোকটা মেয়েটাকে খানিক নিষ্পিষ্ট করে মুখ তুলে বলে, ড্রিঙ্ক আনো, আমার তেষ্টা পেয়েছে।

পিছনে যেখানে আলিজা বসেছিল তার পাশের সিটে একজন দীর্ঘকায় সুপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের তরুণ ছিল। তাকে কেউ লক্ষ করিনি এতক্ষণ। সবাই ঘাড় ঘোরাচ্ছে দেখে আমিও পিছু ফিরে ছেলেটাকে দেখতে পাই। একটা বাদামি শার্ট গায়ে, গলার টাইটা আলগা, মুখটা অসম্ভব লাল, দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, সে এই প্রেমের দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না, অসম্ভব রেগে গেছে এবং এক্ষুনি সে একটা কিছু করবে।

কী সে করত জানি না, তবে দৈত্যকায় লোকটির বুকে সেঁটে থেকেই মেয়েটা এক বার পিছু ফিরে চেয়ে চোখের একটা ইশারা করল তাকে। সে বসে পড়ল ধীরে ধীরে।

দৈত্য লোকটা সেই মেয়েটিকে নিয়ে আরও সামনের দিকে কোথাও গিয়ে বসল।

আমি হোসটেসকে ডেকে একটু ড্রিংকস চাইলাম। আর সেটি পরিবেশনের সময়ে জিজ্ঞেস করতেই সুন্দরী হোসটেসটি মৃদু স্বরে বলল, লাভ ট্র্যাংগল।

কিন্তু একটু বাদে পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে নিচু স্বরে কী যেন বলল অনেকটা সময়

ধরে। তারপর দেখি, তরুণী হোসটেস ছাইরঙা এক আতঙ্কিত মুখে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে বেতার-ঘরের দিকে। কিছু বুঝতে পারছিলাম না। হোসটেসের মুখের ভাব অনেকেই লক্ষ করেনি। তাই বেশির ভাগ লোক নিশ্চিন্তে বসে আছে। আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

বেইরুটে প্লেন থামতে দরজা খুলে কয়েকজন বিশালদেহী যাত্রী উঠল। তাদের চেহারা হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। উঠে মুহূর্তের মধ্যে তারা প্লেনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে দেখি তাদের হাতে হাতে উঠে এসেছে এল.এম.জি. কারবাইন, থম্‌প্‌সন অটোমেটিক। চারজন সেই দৈত্যের মতো লোকটা আর তার বিস্মিত বান্ধবীকে ঘিরে ফেলল। দু'জন গিয়ে ধরল পিছনের ছেলেটিকে।

বাচ্চা হাতির মতো লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে চাইল। রাগে তার মুখ টকটকে লাল। চেঁচিয়ে সে তার দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন গালাগাল করছিল পিছনের ছেলেটিকে। আর সেই ছেলেটিও কী যেন জবাব দিচ্ছে বেপরোয়া মুখে।

ছদ্মবেশী আর্মড গার্ড তিনজনকেই নামিয়ে নিয়ে গেল মেশিনগান আর অটোম্যাটিকের নল গায়ে ঠেকিয়ে। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে সার্চ করা হল প্লেন। গুঞ্জন শোনা গেল, ওই তিনজনই ছিল গেরিলা। বেইরুটের পর তারা প্লেন হাইজ্যাক করত। প্রেমের ত্রিকোণ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে কী হত বলা মুশকিল। প্রেমে ব্যর্থ পিছনের ছেলেটি হোসটেসকে ডেকে তাদের সব গুপ্তকথা বলে দিয়েছিল।

গেরিলাদের ক্ষেত্রে এ-রকম বড় একটা হয় না, আমি জানি। সর্বত্রই আমি মৃত্যুপণ গেরিলাদের লক্ষ করে দেখেছি। প্রেম তাদের কাছে কোনও সমস্যাই নয়। আমার এখনও মনে হয় ওরা গেরিলা ছিল না। পিছনের ছেলেটি নিজেদের গেরিলা বলে পরিচয় দিয়ে ইচ্ছে করেই গণ্ডগোল পাকিয়েছিল। কিন্তু সত্যিকারের ঘটনা কী তা আমি আজও জানি না। কিন্তু প্লেন বেইরুট থেকে উড়লে মনে হয়েছিল, আমরা আবার জীবন ফিরে পেলাম। আমি যে-জীবন ফিরে পেলাম সেটা কেমন? সে-জীবন শেষ হলেই-বা কী ক্ষতি ছিল?

দমদমের দরিদ্র বাড়িটিতে এসে যখন পৌঁছোলাম তখন আমার বাবা-মা যথাসাধ্য আনন্দ প্রকাশ করলেন । ইতিমধ্যে আমার ছোটভাই একটা বিয়ে করেছে। আমার ভাই, ভ্রাতৃবধূও যথাসাধ্য খুশির ভাব দেখাল। ভাইয়ের সদ্য একটি ছেলে হয়েছে। আমি বিদেশ থেকে কিছু লোভনীয় জিনিস এনেছিলাম। সেগুলো বাড়ির লোকদের বিলিয়ে দিলাম। সবাই অসম্ভব খুশি হল তাতে। একেই তারা ভাল জিনিস চোখে দেখেছে কম, তার উপর এত সব হরেক রকম মহার্ঘ দ্রব্য দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

এই উত্তেজনা বাড়াতে আমার বোনেরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা আর স্বামী নিয়ে চলে এল বেড়াতে। খুবই হতাশ হই তাদের দেখে। দুই ভগ্নিপতির মধ্যে একজনকে দেখলেই মনে হয় লোফার। অন্যজন কিছুটা ভদ্রলোক আর সুপুরুষ হলেও নির্বোধ। কারওরই সংসারের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। মা আমাকে চুপি চুপি জানাল, ছোট জামাই নাকি গুন্ডামি, চুরি, ছিনতাই করে। বড়জন একটা প্রাইভেট ফার্মে কেয়ারটেকার।

এরা সব এক জায়গায় জুটতে খুব হট্টগোল হল। ঝগড়াঝাঁটিও প্রায়ই লেগে যায় দেখলাম। একদিন বাবা খুব গম্ভীরভাবে আমাকে গোপনে ডেকে নিয়ে বললেন, শোনো বাবা প্রভাস, তোমার ছোটভাই আর তার বউ এখন চায় আমি আর তোমার মা আলাদা হয়ে অন্যত্র গিয়ে থাকি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি আর মা যাবেন কেন? এ-বাড়ি তো আপনার, দরকার হলে ওরা চলে যাবে।

সে-সব আইনের কথা শুনছে কে? আমাদের বুড়ো বয়সে আর তেমন তেজ নেই যে গলাবাজি করে গায়ের জোরে দখল রাখব। তার উপর নিজের সন্তান যদি শত্রুতা করে, তবে আর কী করার

আছে? ওরা দু'জনে মিলে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে দিন-রাত। তোমার মা অবশ্য ওদের দিকে টেনে চলেন, কিন্তু তাতেও সুরাহা হবার নয়। যদিও-বা তোমার মাকে ওরা আশ্রয় দেয় আমাকে থাকতে দেবে না।

কথাটা শুনে আমি ভয়ংকর রেগে যেতে পারি না। হঠাৎ কেন যেন নিজের ছেলেবেলার কথা আদ্যন্ত মনে পড়ে! ভাবি, আমাদের নিষ্ঠুর ছেলেবেলা আমাদের স্বার্থপরতা ছাড়া আর কী শেখাবে! আমার ভাই তার নিজের জীবন ও পরিবেশ থেকে সেই শিক্ষাটাই নিয়েছে। ওর বউও খুব উঁচু পরিবারের মেয়ে নয়। কথায় কথায় মা একদিন বলে ফেলেছিলেন. বউমার মা নাকি ঝিগিরি করত। তবে আগে ওরা ভদ্রলোক ছিল, অবস্থার ফেরে এই দশা। সে যাই হোক, আমার ভাইয়ের বউ নিমি খুব খোঁপায়-চোপায় মেয়ে। টকাটক কথা বলে, মেজাজ দেখাতে ভয় পায় না, কাউকে তোয়াক্কার ভাব নেই। এ-ধরনের মেয়েরা সহজেই স্বামীকে বশ করতে পারে। মা-বাবাকে আলাদা করার প্রস্তাবটি হয়তো তার মাথাতেই প্রথম এসে থাকবে। যথাসময়ে আমার ভাই সেই ভাবনায় ভাবিত হয়েছে।

বাবাকে বললাম, বোঝাপড়া করে নিন। আমিও বলব'খন।

বাবা বললেন, এ-বাড়ির অর্ধেক স্বত্ব তোমারও। আমি বলি কী, তুমি যখন এসেই গেছ ভাল সময়ে, তখন বাড়িটা ভাগ করে নাও। আমি তোমার ভাগে থাকব, তোমার মা না হয় তাঁর ছোট ছেলের কাছে ইচ্ছে হলে থাকবেন।

শুনেই আমার গা রি-রি করে ওঠে। এই ঘিঞ্জি কলোনির তিন কাঠা জায়গায় দীনদরিদ্র একটুখানি দরমার বাড়ি—এর আবার ভাগ-বাঁটোয়ারা! তার উপর এখানে স্থায়ী ভাবে থাকার ইচ্ছেও আমার কখনওই হয়নি। নিজের আত্মীয়স্বজন আমার এখন আর সহ্য হয় না।

আমি বললাম, ভাগ-বাঁটোয়ারা করার ইচ্ছে হয় না। এইটুকু জায়গা ভাগ করলে থাকবে কী?

বাবা বলেন, তবে বাবা, তুমি আলাদা কোথাও বাড়ি করো, বুড়ো বয়সে আমি গিয়ে তোমার কাছে শান্তিতে মরি।

আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলি, বরাবরই কি আপনাদের বোঝা আমাকে বইতে হবে নাকি? একটা জীবন সংসারের পিছনে অপচয় করেছি। এখনও কি আমাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না?

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন, তোমাকে কোন কাজে কবে বাধা দিলাম বলো তো! ঠিক কথা তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া হয়নি, কিন্তু অত ভাল সরকারি চাকরি ছেড়ে বিদেশে গেলে, আমরা তো বাধা দিইনি। এত বছর তো আমরা তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকিনি। এই বুড়ো বয়সে এখন আর তোমরা ছাড়া আমাদের অভিভাবক কে আছে।

আমার নিষ্ঠুর মন এখন আর সহজে গলে না। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, আচ্ছা, সুহাসের সঙ্গে কথা বলে বাড়ি ভাগ করে দেব, আপনারা আমার ভাগেই থাকবেন। কিন্তু আমি এ-বাড়িতে থাকব না।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন।

বাসায় খুব একটা ভাল লাগে না। কারণ, এখানে আমার আপনজন বলতে কেউ নেই, সারা পৃথিবীতেই কেউ নেই, একমাত্র নীলু ছাড়া। বোন-ভগ্নিপতিরা চলে গেল, তবু বাড়িতে গণ্ডগোল থামে না। প্রায় সারাদিনই সুহাসের বউ নিমি মা-বাবাকে বকাবকি করে। মা খুব একটা পালটা ঝগড়া করে না, কিন্তু ছেড়েও দেয় না। বাবা মাঝে মাঝে লাঠি হাতে তেড়ে ছেলের বউকে মারতে যায়। অমনি নিমি বেরিয়ে এসে কোমরে হাত রেখে, 'ই-ইঃ মারবে! মারুক তো দেখি!' বলে চেঁচায়। বাবা ভয়ে পিছিয়ে আসে, আর নিমি তখন নাগাড়ে যাচ্ছেতাই বলে যায়। আমি যে বিদেশ-ফেরতা ভাসুর বাড়িতে আছি তা গ্রাহ্য করে না। ঝিয়ের মেয়েই বটে। সুহাস কোথায় কাজ করে তা আমি এখনও ভাল জানি না, তবে যা-ই করে, তা যে খুব উঁচু ধরনের কাজ নয় তা ওর আচার-আচরণ থেকেই

বোঝা যায়। ওর সহকর্মীরা যে নিচুতলার লোক তা সুহাসের কথা শুনলেও টের পাই। কথায় কথায় মুখ খারাপ করে ফেলে। একটু আড়াল হয়ে বিড়ি টানে দেখি। বউকে নিয়ে সপ্তাহে দু'বার নাইট শো দেখতে যায়।

বাড়ির খাওয়াদাওয়া অত্যন্ত নিচু মানের। আমি এসে অবধি বাড়িতে বেশ কিছু সংসার খরচ দিয়েছি, তবু খাওয়ার মান ওঠেনি তেমন। তবে মাঝে মাঝে আমার মুখরক্ষা করতে মুরগি রান্না হয়। প্রথম দিন আমাকে খাওয়ার সময়ে কাঁটা-চামচ দেওয়া হয়েছিল দেখে হেসে ফেলেছিলাম।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি। বাইরে বাইরে খামোখা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। কোথাও যাওয়ার ঠিক থাকে না। চাকরি-বাকরি করব, না ব্যবসা করব, তা নিয়ে ভাবি না। বেশ একটা ছুটি-ছুটি মনের ভাব নিয়ে আছি।

বিদেশে আমার যে টাকা জমেছিল তা নেহাত কম নয়। এ দেশের মুদ্রামানে প্রায় লাখ চারেক টাকা। তাই এখনই চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই।

পাঁচুদার সঙ্গে খাতির ছিল। তার খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম ভদ্রলোক মরতে চলেছেন।

অলকা

উঠে পড়লাম।

বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঝি সরস্বতী আজ আসবে কি না বুঝতে পারছি না। এত বেলা তো সে কখনও করে না! আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। এক রিকশাওলার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার কাছে একশোটা টাকা চেয়েছিল। দেব কোত্থেকে? আমার বাড়তি টাকা যা আছে তা বড় অল্পে অল্পে জমানো। দিই কী করে?

দাঁত মেজে এক কাপ চা করে খেলাম। বিছানা তুলতে ইচ্ছে করছে না। থাকগে, কে-ই-বা আসছে দেখতে! সরস্বতী যদি আসে তো তুলবেখন। সকালের চা করা, বিছানা তোলা এ-সব ও-ই করে।

আমি খবরের কাগজ রাখি না। ছোট্ট একটুখানি একটা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো আছে। সেটাই আমার সঙ্গী। অবশ্য এ ফ্ল্যাটে মস্ত একটা রেডিয়োগ্রাম আছে অসীমদার, কিন্তু সেটার যন্ত্রপাতিতে মরচে ধরেছে, চলে না। আমার ট্রানজিস্টার সেটটারও ব্যাটারি ডাউন। চেরা আওয়াজ আসে। রেডিয়োটা চালিয়ে একটা ফ্যাসফেসে কথিকা হচ্ছে শুনে, বন্ধ করে দিলাম।

আজ ছুটি। কিন্তু ছুটির দিনগুলোই আমার অসহ্য। সময় কাটতে চায় না। শ্রীরামপুরের বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু গেলেই অশান্তি। মাসির বাড়িতেও যাওয়া হয় না। রোহিতাশ্ব চৌধুরীর বাড়িতে যেতে কেমন যেন লজ্জা করে আজকাল. ওদের বাড়িতে বেবি সিটারের চাকরি করেছি বলেই বুঝি এক হীনম্মন্যতা কাজ করে।

মুশকিল হল, আমার বাসাতেও কেউ আসে না। আজ রোববারে কেউ কি আসবে? আসবে না, তার কারণ আমাকে কেউ ভাল চোখে দেখে না। আমার তেমন বন্ধুবান্ধবও নেই। মাঝে মাঝে খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

এখনও বর্ষা নামেনি এ-বছর। গরমকালটা বড় বেশিদিন চলছে। এইসব ভয়ংকর রোদের দিনে ঘরের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছেও হতে চায় না। একা ঘরে সারা দিনটা কাটাবই-বা কী করে?

জানালা-দরজা খোলা। আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে ঘর। আমি বাথরুমে ঘুরে এসে আয়নার সামনে বসে একটু ফিটফাট করে নিই নিজেকে। চুল আঁচড়াই, মুখে অল্প একটু পাউডার মাখি, কপালের একটা ব্রণ টিপে শাঁস বের করি। বেশ চেহারাটা আমার। লম্বা টান সতেজ শরীর. গায়ে

চর্বি খুব সামান্য, মুখখানা লম্বা ধাঁচের, পুরু কিন্তু ভরন্ত ঠোঁট, দীর্ঘ চোখ। নাকটা একটু ছোট কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। গায়ের রঙে জেল্লা আছে।

অনেককাল নাচি না। আজ একটু ইচ্ছে হল। কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটু পা কাঁপিয়ে নিলাম। তারপর কয়েকটা সহজ মুদ্রা করে নিয়ে ধীরে ধীরে নাচতে থাকি। কিন্তু বুঝতে পারি শরীর আর আগের মতো হালকা নেই। বেশ কষ্ট হয় শরীর ভাঙতে, দমও টপ করে ফুরিয়ে গেল। হাঁপিয়ে বসে পড়লাম। তাতেও হল না। পাখা চালিয়ে শুয়ে রইলাম মেঝেয়। ঠান্ডা মেঝে, বুক জুড়িয়ে গেল। শুয়ে থেকে হঠাৎ মনে হল— আজ কেউ আসবে। অনেককাল কেউ আসে না। আজ আসবে। ভাবতে ভাবতে ঝিমধরা মাথায় কখন যে তন্দ্রা এল! সরস্বতী আসেনি, হরিণঘাটার ডিপো থেকে দুধের বোতল আনা হল না। একটু আনাজপাতি, মাছ বা ডিম কিছু আনিয়ে রাখা দরকার ছিল। তাও হল না । সকালের জলখাবার বলতে কিছু খাইনি এখনও, খিদে পেয়েছে। এসব ভাবতে ভাবতেও তন্দ্রা এল। কী আলিস্যি আর অবসাদ যে শরীরটার মধ্যে। বয়স হচ্ছে নাকি! মাগো!

খুব বেশিক্ষণ মটকা মেরে পড়ে থাকা হল না। পিয়ানোর হালকা শব্দ তুলে কলিং বেল পিং আওয়াজ করল। সদর দরজাটা ভেজানো আছে, সরস্বতী হলে বেল না বাজিয়ে হুড়ুম দুড়ুম করে ঢুকে পড়ত। এ সরস্বতী নয়, অন্য কেউ।

দরজা খুলে একটু খুশিই হই। আমার অফিসের সেই স্মার্ট ও সুপুরুষ যুবক সুকুমার দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। যদিও সুকুমারকে আমি সেই অর্থে ভালবাসি না, তবু ওর সঙ্গ তো খারাপ নয়। জানি না বাপু আমাদের মনের মধ্যে কী পাপ আছে। পাপ একটু-আধটু আছে নিশ্চয়ই। নইলে সুকুমারের ওই দুর্দান্ত বিশাল জোয়ান চেহারা আর হাসির জবাব রঙ্গ-রসিকতায় ভরা কথাবার্তা আমার এত ভাল লাগে কেন। আমরা পরস্পরকে 'তুমি' করে বলি, সেটাও পাঁচজনের সামনে নয়, দু'জনে একা হলে তবেই। তা হলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটু পাপ-টাপের গন্ধ পাওয়া যাবে।

বাইরের ঘরে বসে ও তেমনি হাসি মুখে বলল, তোমাকে একটু বিরহী-বিরহী দেখাচ্ছে অলি।

ওর হাসিটা যেন একটু কেমন। মানুষ খুব নার্ভাস হয়ে পড়লে মাঝে মাঝে ও-রকম হাসি হাসে। ওর মতো চটপটে বুদ্ধিমান ছেলের নার্ভাস হওয়ার কথা নয়।

আমি বললাম, বিরহ নয়, বিরাগ। বোসো, আজ আমার ঝি আসেনি; নিজেকেই চা করতে হবে।

ও বিরস মুখ করে বলে, ও, আমি ভেবেছিলাম তোমার বাসায় আজ ভাত খাব দুপুরে। কিন্তু ঝি যখন আসেনি—

কথাটা আমার কানে ভাল শোনাল না। ভাত খাবে কেন? এ-প্রস্তাবটা কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না।

আমি বললাম, আমি নিজে কতদিন না রেঁধে শুকনো খাবার খেয়ে কাটিয়ে দিই! আজও অরন্ধন।

সুকুমার নড়েচড়ে বসে বলল, এসে তোমার ডিসটার্ব করছি না তো?

মোটেই নয়। আজ আমার খুব একা লাগছিল।

আমারও।

মনে হচ্ছিল কেউ আসবে।

সুকুমারের মুখ হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ও বলে, কে আসবে বলে ভেবেছিলে? আমি?

না। বিশেষ কারও কথা নয়। যে-কেউ।

আমার কথা তুমি ভাবো না অলি?

পুরুষমানুষদের এই এক দোষ। তারা চায় মেয়েরা সব সময় তাদের কথা ভাবুক। বড় জ্বালা। জয়দেবও বোধহয় তাই চাইত।

আমি একটু হেসে বললাম, ভাবব না কেন? তবে আমার ভাবনা খুব ভাসা-ভাসা। গভীর নয়।

সুকুমারের স্মার্টনেস আজ যে কোথায় গেল! সে আজ একদম বেকুব বনে গেছে। মুখের রং অন্য রকম, চোখ অন্য রকম। আমি বাতাসে একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

আজ সুকুমার খুব ভাল পোশাক পরে এসেছে। সাদা রঙের ওপর নীল রঙের নকশা করা পাতলা টেরিভয়েলের ছ্যাঁদাওয়ালা জামা, খুব সুন্দর ধূসর রঙের প্যান্ট পরা, পায়ে ঝকঝকে মোকাসিন। হাতে এই ছুটির দিনেও একটা পাতলা ভি আই পি সুটকেস। রুমালে মুখ মুছে বলল, হঠাৎ এলাম বলে কিছু মনে কোরো না।

আমি হেসে বললাম, তুমি এর আগেও এক বার এসেছিলে, তখনও কিছু মনে করার ছিল না। মনে করব কেন?

সুকুমার ভাল করে কথা বলতে পারছে না আজ। আমার দিকে ভাল করে তাকাচ্ছেও না। বলল, ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে আমার।

কেন, খারাপের কী? সদ্য একটা লিফট পেয়েছ!

সুকুমার ব্যথিত হয়ে বলে, সবসময়ে টাকার পয়েন্টে লোকের ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। সে-সব নয়। আমার মনটা ভাল নেই।

কেন?

তোমার সেটা বোঝা উচিত।

আমি এ-ব্যাপারে খানিকটা নিষ্ঠুর। সুকুমার কী বলতে চায় তা আমার বুঝতে দেরি হয়নি। কিন্তু এ-সব প্রস্তাবকে গ্রহণ বা গ্রাহ্য করা আমার সম্ভব নয়। বললাম, তোমার প্রবলেম নিয়ে আমি চিন্তা করব কেন? আমার ভাববার মতো নিজস্ব প্রবলেম অনেক আছে।

অলি, তুমি কিন্তু সেলফ-সেন্টারড।

সবাই তাই। তুমিও কি নিজের স্বার্থ থেকেই সব বিচার কর না?

সুকুমার সিগারেট খেল কিছুক্ষণ। ওর হাত বশে নেই। বলল, সেটা ঠিকই। কিন্তু তুমি যে হ্যাপি নও এটা নিয়েও আমি ভাবি।

আমি হেসে বললাম, সেটা ভাবতে না, যদি আমার ওপর তোমার লোভ না থাকত।

লোভ! বলে আঁতকে উঠল সুকুমার। বলল, লোভ অলি? লোভ কথাটা কত অশ্লীল তুমি জানো? লোভের কথা বললে কেন?

তবে কী বলব, প্রেম? ভালবাসা?

সুকুমার অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে, আমি তো তাই ভাবতাম।

মাথা নেড়ে বললাম, পুরুষমানুষ আমি কম দেখিনি। লোভ কথাটাই তাদের সম্বন্ধে ঠিক কথা। পুরুষেরা মেয়েদের চায় বটে. কিন্তু সে-চাওয়া খিদের খাবার বা নেশার সিগারেটের মতো।

তুমি বড্ড ঠোঁটকাটা। বলে সুকুমার হাসে একটু। বলে, সে থাকগে। তর্ক করে কি কিছু প্রমাণ করা যায়? বরং যদি আমাকে একটা চানস দিতে অলি, দেখতে মিথ্যে বলিনি।

চা করে আনব?

আনো।

চা খেয়ে সুকুমার নিজের হাতের তেলোর দিকে নতমুখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আমার একটু মায়া হল। ও আমাকে ভয় পাচ্ছে। এত বড় চেহারা, এত ভাল দেখতে, তবু একটা মেয়েকে অত ভয় কেন পুরুষমানুষের? নরম গলায় বললাম, কী বলবে বলো।

কী বলব, বলার নেই!

শুধু বসে থাকবে?

না, উঠে যাব এক্ষুনি।

সে তো যাবেই জানি। কিন্তু মনে হচ্ছিল, আজ তুমি কী একটা বলতে এসেছিলে।

সুকুমার হঠাৎ তার যাবতীয় নার্ভাসনেস ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে মরিয়া হয়ে খাড়া উঠে বসল। আমার দিকে সোজা অকপট চোখে চেয়ে বলল, শোনো অলি, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। অনেক চেষ্টা করেছি মনে মনে, পারিনি।

এ-সব কথা শুনলে আমার হাই ওঠে। অবাস্তব কথা সব, একবিন্দু বিষয়বুদ্ধি নেই এ-সব আবেগের মধ্যে। আমি এঁটো কাপ তুলে নিয়ে চলে আসি। বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম একা। ভাল লাগে না।

হঠাৎ সুকুমার ঘরের বাইরের থেকে ভিতরে চলে এল, খুব কাছে পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে আমার দু' কাঁধ আলতো হাতে ধরে অল্প কাঁপা গলায় আর গরম শ্বাসের সঙ্গে বলল, অলি, এর চেয়ে সত্যি কথা জীবনে বলিনি কাউকে। গত তিন রাত ঘুমোতে পারিনি। কিছুই ভাল লাগছে না, তাই আজ দিঘা যাওয়ার টিকিট কেটে এনেছি।

যাও ঘুরে এসো। সমুদ্রের হাওয়ায় অনেক রোগ সেরে যায়, এটাও হয়তো যাবে।

রোগ! কীসের রোগ! আমার কোনও রোগ নেই।

কলের জল পড়ে যাচ্ছে হিলহিল করে। সেই দিকে চেয়ে থেকে বললাম, কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নাও, তোমার হাত ভীষণ গরম।

এ-সব সময় যা হয়, তাই হল। অপমানিত পুরুষ যেমন জোর খাটায়, তেমনি সুকুমারও আমাকে জড়িয়ে ধরল হঠাৎ। একটা বিরক্তিকর অবস্থা।

হঠাৎ সরস্বতীর ভৌতিক গলা চেঁচিয়ে উঠল, উরেব্বাস, এ কী গো!

সুকুমার প্রায় স্ট্রোকের মুরগির মতো অবশ হয়ে টলতে টলতে সরে গেল। সরস্বতী দরজায় দাঁড়িয়ে।

লজ্জায় মরে গিয়ে বললাম, এই হচ্ছে তোমার দাদাবাবু। ফেরাতে এসেছে।

জয়দেব আর আমার বিয়ে ভাঙার ব্যাপার সরস্বতী জানে। তাই সে বুঝল সুকুমারই হচ্ছে সেই জয়দেব। খুব হাসিমুখে বলল, তা হলে এত দিনে বাবুর মতি ফিরেছে, ভূত নেমেছে ঘাড় থেকে!

আমি কথাটা চাপা দেওয়ার জন্য বললাম, দেরি করলে যে বড়! সারা সকাল আমি কিছু খাইনি জানো!

কী করব দিদি, টাকার জোগাড় করতে সেই মোমিনপুর গিয়েছিলাম কুসমীর কাকার কাছে। সে পানের দোকান করে। পয়সা আছে। দয়া-ভিক্ষে করতে পাঁচশোটা টাকা দেবে বলেছে।

আমি বললাম, কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারো তো। বোকো না।

দাদাবাবুর জন্য মিষ্টি-টিষ্টি এনে দেব নাকি? দাও তা হলে পয়সা। চায়ের জল চড়িয়ে দোকান থেকে আসি।

কঠিন গলায় বললাম, না।

বসবার ঘরের ঠিক মাঝখানটায় সম্পূর্ণ গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সুকুমার। ভাল পোশাক, চমৎকার চেহারা, তবু কী অসহায় আর বোকা যে দেখাচ্ছে!

আমি হেসেই বললাম, মাথা ঠান্ডা রেখো, বুঝলে? আমারও তো কিছু নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে।

সে জানি।

ছাই জানো। আমার স্বামী লোকটা খুব খারাপ নয়। অন্তত লোকে তাকে খারাপ বলে না। তবু তাকে আমার পছন্দ হয়নি বলেই তার সঙ্গে থাকিনি। তুমি কি ভাব আমি একা থাকি বলে খুব সহজে বশ করে নেওয়া যাবে আমাকে?

তুমি কখনওই আমাকে বুঝলে না অলি। বোধহয় ভালবাসা তুমি বুঝতেই পারো না। থাকগে, যা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা করে দিয়ো।

সুকুমার চলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, এখন কি সোজা দিঘায় যাবে?

সুকুমার হতাশ গলায় বলল, দিঘায় একা যাওয়ার প্রোগ্রাম তো ছিল না।

তা হলে?

ইচ্ছে ছিল তোমাকেও নিয়ে যাব। দু'টো কটেজ বুক করে রেখেছি, সরকারি বাসে দু'টো টিকিট কেটে রেখেছি। কিন্তু সে-সব ক্যানসেল করতে হবে।

ওর দুঃসাহস দেখে আমি হতবাক। বলে কী! আমাকে নিয়ে দিঘা যেতে চেয়েছিল?

কিন্তু এ বিস্ময়টা আমার বেশিক্ষণ থাকল না। ও-রকম পাগলামির অবস্থায় মানুষ অনেক বেহিসেবি কাজ করে। বললাম, আমাকে দিঘায় নিয়ে কী করতে তুমি?

সুকুমার মনোরুগির মতো হাসল একটু। বলল, আমাকে বিশ্বাস কোরো না অলি। আমার মাথার ঠিক নেই। কত কী ভেবে রেখেছি, কত কী করতে পারি এখনও!

আমি মাথা নেড়ে বললাম, এ-সব ভাল নয়। তুমি আমার ক্ষতি ছাড়া কিছু করতে পারো না আর।

বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছ। আমি নিজেকেও আর বিশ্বাস করি না।

আমি বললাম, দাঁড়াও, এক্ষুনি চলে যেয়ো না।

কেন?

মনে হচ্ছে, তুমি একটা বিপদ করবে। বসে একটু বিশ্রাম করো। আর বরং দুপুরে এখানেই খেয়ে যাও।

সুকুমার বসল।

সুকুমার প্রায়ই এর-ওর হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে। আসলে ও হাত দেখার কিছুই জানে না, কেবল ব্লাফ মারে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীগুলো বানায় বেশ চমৎকার। নতুন ধরনের কথা বলে। কাউকে হয়তো বলে, শীতকালটায় আপনি খুব বিষণ্ণ থাকেন। আমাদের অফিসের বড়কর্তাকে এক বার বলেছিল, সামনের মাসে আপনাকে চশমার পাওয়ার পালটাতে হবে, একটা দাঁত তোলাবেন ফেব্রুয়ারি মাসে। এই রকম সব। অফিসের মেয়েদের হাত দেখে এমন সব কথা বলে যে মেয়েরা পালাতে পারলে বাঁচে। এক বার আমার হাত দেখে সুকুমার বলেছিল, শুনুন মহিলা, আপনার একটা মুশকিল হল আপনি সকলের সঙ্গে বেশ সহৃদয় ব্যবহার করতে ভালবাসেন। স্নেহ-মায়া আপনার কিছু বেশি। কিন্তু তার ফলে লোকের সব সময়ে মনে হয় যে আপনি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন বা প্রেমে পড়েছেন। একটু রূঢ় ব্যবহার করতে শিখুন, ভাল থাকবেন।

কী ভীষণ মিথ্যে কথা, আবার কী ভীষণ সত্যিও! সুকুমারের ওই ভুয়ো ভবিষ্যদ্বাণী তার নিজের সম্পর্কেই কেমন খেটে গেল।

স্নেহবশে মায়ায় ওকে আমি দুপুরে খেয়ে যেতে বললাম। আসলে ওই ছুতোয় ওকে একটুক্ষণ আটকে রাখার জন্যই। নইলে ওর যে-রকম মনের অবস্থা দেখছি, হয়তো রাস্তায় গিয়ে গাড়ি চাপা পড়বে। আর সেই আটকে রাখাটাই বুঝি ভুল হল। সুকুমার ভাবল, আমার মানসিক প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে, আমি ওকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছি।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সুকুমার বাইরের ঘরে বসে সিগারেট ধরাল। সরস্বতী চলে গেছে, কাল সকালে ফের আসবে। যাওয়ার আগে সে সুকুমারের সঙ্গে কিছু তরল রসিকতাও করে গেল আমাকে নিয়ে।

আমি মনে মনে চাইছিলাম সুকুমার এখন চলে যাক। সুকুমার গেল না। সারা বেলা আমাদের খুব একটা কথা হয়নি। আমি রান্নাঘরে রেঁধেছি, সুকুমার বাইরের ঘরে বসে বইপত্র পড়েছে।

দুপুরে রোদ আর গরমের ঝাঁঝ আসে বলে দরজা-জানালা সরস্বতী যাওয়ার আগেই বন্ধ করে

দিয়ে যায়। বেশ অন্ধকার আবছায়ায় সুকুমারের সিগারেট জ্বলছে। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ছুটির দিনে আত্মীয়স্বজন কেউ যদি হুট করে চলে আসে, তো আমার কোনও সাফাই কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সুকুমারকে কী করে চলে যেতে বলি?

মুখোমুখি বসে ছিলাম। বললাম, তুমি কি বিশ্রাম করবে, না যাবে এক্ষুনি?

সুকুমার আয়েসের স্বরে বলল, এই গরমে বের করে দেবে নাকি?

তা বলিনি—বলে অস্বস্তিতে চুপ করে থাকি। ভেবে-চিন্তে বললাম, তা হলে এ ঘরে বিশ্রাম নাও। আমি ও-ঘরে যাই।

শোওয়ার ঘরে এসে কাঁটা হয়ে একটু শুতে-না-শুতেই আবছা একটা মূর্তি এসে হঠাৎ জাপটে ধরল আমাকে। সুকুমার। আমি প্রতিমুহূর্তে এই ভয় পাচ্ছিলাম। ওর শ্বাস গরম, গা গরম, উন্মাদের মতো আশ্লেষ। ও খুনে গলায় বলল, তোমাকে মেরে ফেলব অলি, যদি রাজি না হও আমাকে বিয়ে করতে।

আমার কোনও কথাই ও শুনতে পাচ্ছে না। গ্রাহ্য করছে না আমার কিল, ঘুষি, আঁচড়, কামড়।

হঠাৎ বহুকাল নিস্তব্ধতার পর বিপদসংকেতের মতো টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেই শব্দে চমকে সুকুমার একটু থমকাল। আমি নিজেকে সামলে গিয়ে টেলিফোন তুলে বললাম, হ্যালো।

একটা গম্ভীর গলা বলল, আপনার ঘরে কে রয়েছে?

এত ভয় পেয়েছিলাম যে রিসিভার হাত থেকে খসে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে বলছেন?

উত্তর এল, ওই লোকটাকে ঘর থেকে বের করে দিন।

টেলিফোনটা কেটে গেল আচমকা!

প্রভাসরঞ্জন

সকাল থেকেই আজ মেজাজে আছি। কোনও খুশখবর নেই, মন ভাল থাকার কোনও কারণও দেখছি না, তবু কেন মনটা নবাবি করছে?

ওই একরকম হয় মাঝে মাঝে। বেঁচে থাকাটাকে যখন শবদেহ বহনের মতো কষ্টকর লাগে সব সময়ে, তখন মাঝেমধ্যে বুঝি প্রাকৃতিক নিয়মে মরবার আগে হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠার ছদ্ম লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঈশ্বর করুণাপরবশ হয়ে এক বিন্দু খুশি মিশিয়ে দেন জীবনে। তখন বুঝতে হয় যে কঠিন দিন আসছে!

সে যাকগে। অতীতের চিন্তা আর ভবিষ্যতের ভাবনা দিয়ে এখনকার খুশির মেজাজটাকে নষ্ট করার মানেই হয় না। দীর্ঘদিন ইউরোপে থেকে শিখেছি, বর্তমানটাকে যত দূর সম্ভব উপভোগ করাটাই আসল। যে সময় চলে গেছে বা যে সময় আসেনি, তার কথা চিন্তা করা এক মস্ত অসুখের কারণ। যদি আমুদে হতে চাও তো সে-চিন্তা ছাড়ো।

প্রায় এক মাস হয়ে গেল দমদমের বাড়ি ছেড়ে পার্ক সার্কাসে চলে এসেছি। স্থায়ীভাবে এসেছি এ-কথা বলা যায় না। মা-বাবাকে সে-রকম কিছু বলে আসিনি। তবে দমদমের বাড়িতে আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। সেখানে বড্ড বেশি অশান্তি। আমার ভ্রাতৃবধূটি বাড়িটাকে নরক করে তুলেছে।

একদিন বীভৎস ঝগড়ার পর আমি ভাইকে ডেকে বললাম, পাড়ার পাঁচজনকে ডাকো, বাড়ি ভাগ হোক।

তাতে সুহাসের আপত্তি। সে বলে, ভাগাভাগি কীসের!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, বাবা চাইছেন তোমার-আমার মধ্যে ভাগ করে দিতে।

সে বলল, তুমি তো আর এখানে থাকবে না! চলেই যাবে অন্য কোথাও। তবে ভাগ করব কেন?

সুহাসের বউও তেড়ে এল, আপনার কোনও দাবি নেই। আপনি তো বাইরের লোক হয়ে গেছেন। আমরা থাকি, বাড়িতে আমাদের স্বত্ব বেশি।

কথাটা অযৌক্তিক, কিন্তু এত জোর দিয়ে বলল যে-আমি খুব অসহায় বোধ করতে লাগলাম। আমার মাও, কেন জানি না, বাড়ি ভাগাভাগির বিরুদ্ধে। কেবল বাবা ভাগাভাগি চাইছেন, এবং খুব মরিয়া হয়ে চাইছেন। কাজেই ফের ঝগড়া লেগে গেল।

নিমি আমাকে স্পষ্ট বলল, আপনার তো চরিত্র খারাপ। বিদেশে কী সব করে বেড়িয়েছেন তা কি আমরা টের পাইনি?

সুহাস নিমির পক্ষ নিয়ে বলে, তোমাকে তো ওদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই এসে ঘাড়ে পড়েছ। বেশি স্বত্ব-টত্ব দেখিয়ো না, খারাপ হয়ে যাবে। এ-পাড়ায় এখনও আমার এক ডাকে দুশো লোক চলে আসবে।

সুহাসের কথা শুনে খুব অবাক হই না। এ-রকমটাই আশা করছিলাম এত দিন। আর ও কথাটা ঠিক, এ-পাড়ায় ওর বেশ হাঁক-ডাক আছে।

এ-রকম কুৎসিত পরিস্থিতিতেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি। ঝগড়া, মারামারি, পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা গালাগালি এ-সবই আমাকে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করেছে বহুবার।

ভয়টয়ও বড় একটা হল না। শুধু ঠান্ডা গলায় সুহাসকে বললাম, বাড়ি ভাগ ঠেকাতে পারবে না। দরকার হলে আমি পুলিশকে খবর দেব, বলব যে তুমি আমাকে ওয়ার্নিং দিয়েছ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। সুহাস আর তার বউ ঝগড়ার চোটে প্রায় নাচতে লাগল। সুহাস তড়পায়, পেছন থেকে নিমি তাকে সাহস দেয়। শক্তিদায়িনী নারী কাকে বলে জানলাম! দু'জনেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য, কাপড়-চোপড় গা থেকে খসে পড়ছে প্রায়।

এ-বাড়ি ভাগ করা যে আমার কর্ম নয় তা বুঝলাম। ভীমরুল চাক বেঁধেছে, ঢিল মারলে রক্ষে নেই। বাবাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললাম, দেখছেন তো ওদের অ্যাটিচুড। বাড়ি ভাগ কী করে হবে?

বাবা অসহায়ভাবে বললেন, তুমি আলাদা বাসা করো।

সেই পুরনো কথা। বিরক্ত হয়ে বলি, সেটা সম্ভব নয়। আলাদা বাসা করলেও আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব না। আমার একা থাকা দরকার।

বাবা চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ বাদে বললেন, বাবা প্রভাস, আমি সারা জীবন কখনও সুখে থাকিনি। গত জন্মের দোষ ছিল বোধহয়। তা এখন কী করতে বলো আমাকে? গলায় দড়ি দেব?

আমি কিছু লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি।

বাবা বললেন, তুমি বিদেশ থেকে ফিরে এসেছ দেখে বড় আশায় বুক বেঁধেছিলাম। বিশ্বাস ছিল, তুমি আমাকে ফেলবে না। কিন্তু এখন—

আমি বললাম, তার চেয়ে কোনও বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে—

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, কোনও আশ্রম-টাশ্রমে যদি বন্দোবস্ত হয়, তা হলে?

বাবা মাথা নাড়লেন। চোখে বুঝি জল এসেছিল, সেটা মুছে নিয়ে বললেন, বুঝেছি। আপত্তি কী? তাই না হয় দেখো।

বাবাকে ভরসা দিয়ে বললাম, টাকা যা লাগে আমি কষ্ট করে হলেও দেবখন।

সে জানি। দিয়ো। তোমরা না দিলে গতি কী?

যোগাযোগ করে নানা মুরুব্বি ধরে বাবার জন্য কাশীতে একটা বন্দোবস্ত হল। মাসখানেক আগে

বাবা একখানা তোরঙ্গ আর শতরঞ্জিতে বাঁধা বিছানা নিয়ে ট্রেনে চাপলেন।

মা'র জন্য খুব চিন্তা নেই। মা যেন কীভাবে এই সংসারে প্রোথিত বৃক্ষের মতো রয়েই গেল। সাধারণত শাশুড়ির সঙ্গে বউদের অবনিবনা দেখা যায়। আমাদের বাড়িতে উলটো নিয়ম দেখি। তার মানে এই নয় যে নিমিতে আর মা'তে ঝগড়া হয় না। বরং খুবই হয়। কিন্তু সুহাসের বুঝি মায়ের প্রতি একটু টান আছে। বাড়িতে ঢুকেই বিকট একটা 'মা' ডাক দেয় রোজ। আর-একটা ব্যাপার হল, এ সংসারে হাজারও কাজে মা জান বেটে দেয়। বিনি মাগনা কেবল খোরাকি দিয়ে এমন বিশ্বস্ত ঝি-ই বা নিমি কোথায় পাবে? তাই ঝগড়াঝাঁটি হলে, মাকে ফেলতে চায় না। মায়েরও আবার সুহাসের ওপর টান বেশি। এ-সব টানের কোনও ব্যাখ্যা হয় না। সবচেয়ে অপদার্থ ছেলেটাকেই মা কেন ভালবাসে তা বিশ্লেষণ করা বৃথা।

বাড়ির এই পরিস্থিতিতে যখন আমি বাড়ি ছাড়ব-ছাড়ব ভাবছি, সেই সময়ে মুমূর্ষু পাঁচুদা একদিন আমাকে বললেন, তোর যখন বনছে না তখন আমার বাসাটায় গিয়ে থাক না ক'দিন। তালাবন্ধ পড়ে আছে।

বাঁচলাম হাঁফ ছেড়ে। শোনার পর আর অপেক্ষা কবিনি। সে রাতটা ভাল করে ভোর হওয়ার আগেই পাঁচুদার পার্ক সার্কাসের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি।

ব্যাচেলার মানুষ পাঁচুদা। ঘরে রান্নাবান্নার সব বন্দোবস্ত রয়েছে। আসবাবপত্রও কিছু কম নেই। সারাজীবন নিজের শখ-শৌখিনতার পিছনে অজস্র টাকা-পয়সা ঢেলে গেছেন। টাকা-পয়সা জমাননি বড় একটা। ঠকবাজেরাও লুটেপুটে নিয়েছে। ফ্ল্যাটে এসে শুনলাম ছ'মাসের ভাড়া বাকি পড়ে আছে। অথচ বাথরুমে গিজার, ঘরের মেঝেয় কার্পেট, রান্নাঘরে মিনি রেফ্রিজারেটার—কী নেই?

হাসপাতালে দেখা করতে গেলে পাঁচুদা বললেন, যদি আমি বেঁচে যাই তো আলাদা কথা, নইলে ওই ফ্ল্যাট তোকেই দিয়ে গেলাম। সব জিনিসপত্রসুদ্ধু।

আমি বললাম, অত কিছু বলার দরকার নেই পাঁচুদা। আপনি মরছেন না শিগগির। আপাতত কিছুদিন থাকার জায়গা পেলেই আমার যথেষ্ট।

বাড়িওলাকে ছ'মাসের ভাড়া আমাকে শোধ করতে হল। লোকটা গণ্ডগোল শুরু করেছিল। টাকা-পয়সা খরচ হল বটে, কিন্তু মোটামুটি একটা থাকার জায়গা পেয়ে বড় খুশি লাগল। দমদমের নরক থেকে তো দূরে আছি।

জ্যোতিষ নরেনবাবু কিন্তু মাস দুয়েক আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মাসখানেকের মধ্যে বাসস্থানের পরিবর্তন।

লোকটার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়।

সারাদিন প্রায়ই কাজ থাকে না। রান্নাবান্না করি, খাই। দুপুরে একটু ঘুম। বিকেলের দিকে নরেনবাবু কিংবা পাঁচুদার ওখানে যাই। বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। নিরালা, নির্জন সময় কাটে। বেঁচে থাকার অর্থ নেই।

এ-বাড়ির দোতলা থেকে প্রায়ই একটা মেয়েকে নামতে উঠতে দেখি। চেহারাটা বেশ। বিয়ের বয়স হয়েছে তো বটেই, একটু বেশিই হয়েছে বুঝি। মাথায় সিঁদুর দেখি না। খুব সাজগোজ করে অফিসে যায়। তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনও কেউ আসে না বড় একটা। মেয়েটা আমার মতোই একা কি?

ভেবে ভেবে একটু কেমন হয়ে গেল মনটা, দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে আমার মেয়েদের সম্পর্কে বাঙালিসুলভ লজ্জা-সংকোচ হয় না। আবার কাউকে দু'দিন দেখলেই প্রেমে পড়ে যাওয়ার মতো দুর্বলতাও নেই আমার। বরং মেয়েদের ব্যাপারে আমি এখন অতিশয় হিসেবি।

নীচের তলায় পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক বড় একটা ইংরেজি কাগজের রিপোর্টার। অল্প ক'

দিনেই আমার সঙ্গে বেশ খাতির হয়ে গেছে। তাঁর বউকে বউদি বলে ডাকি। মাঝেমধ্যে মাংস বা মাছ পাঠিয়ে দেন, কফি করে ডেকে নিয়ে খাওয়ান। দু'জনেরই বয়স চল্লিশের ওপরে। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম মধু মল্লিক। নিজের কাজে তাঁর বেশ সুনাম আছে। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান অনেক বার ঘুরে এসেছেন। নিজের কাজকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। আর সেই কারণেই তাঁকে অনবরত বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয়। গত কয়েক মাসে দেখলাম, মধু মল্লিক এক বার দিল্লি-বম্বে, এক বার অরুণাচল প্রদেশ, এক বার ওড়িশা ঘুরে এলেন। তা ছাড়া দিন-রাত অফিসের গাড়িতে শহর চক্কর মারা তো আছেই। বলেন, ভাই, এই চাকরি করতে করতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে দু'দিন ঘরে থাকতে হলে হাঁপিয়ে পড়ি। তাই ভয় হয়, রিটায়ার করলে এক হপ্তাও বাঁচব না।

বউদি সারাদিনই প্রায় একা। তিনটে ছেলেমেয়ে আছে যথাক্রমে চোদ্দো, বারো ও তিন বছরের। ছোটটি ছেলে, বড় দুটি মেয়ে। মেয়ে দু'জন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে মডার্ন স্কুলে। নাচগান শেখে, একজন ওরিগামি শেখে, অন্যজন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস করতে রামকৃষ্ণ মিশনে যায়। বেশ ব্যস্ত তারা। ছোট ছেলেটিকে নিয়ে বউদি খানিকটা নিঃসঙ্গ। আমাকে ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসেন। বেশ একটা মা-মা ভাব তাঁর মধ্যে। মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা। মুখে সর্বদা পান আর হাসি।

সে যাকগে। বউদির একটা সময় কাটানোর শখ আছে। স্বামী খবরের কাগজের রিপোর্টার, বউ পাড়ার যাবতীয় খবরের সংবাদ-সংস্থা। পরিচয় হওয়ার সাত দিনের মধ্যে আমি এ-পাড়ার যাবতীয় খবর জেনে গেছি। তার মধ্যে একটা খবরই কেবল বউদি ভাল করে জানেন না। সে হল ওপরতলার ওই মেয়েটির খবর।

দুঃখ করে বললেন, অলকার বড্ড ডাঁট, বুঝলেন। অসীমবাবুরা যেমন সোশ্যাল মানুষ ছিলেন, বোনটি ঠিক তেমন আনসোশ্যাল। কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না, নিজেকে নিয়ে ও-রকম থাকে কী করে?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই একা থাকতে ভালবাসে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

বউদি হেসে বলেন, আপনি বিদেশে ছিলেন বলেই মেয়েদের একা থাকায় দোষ দেখেন না।

সে অবশ্য ঠিক। আমাকে স্বীকার করতে হয়।

বউদি বললেন, একা কি আর সাধ করে আছে! স্বামী নেয় না, সে এক কথা। আবার শুনি মা-বাপের সঙ্গেও বনিবনা নেই।

দেখতে কিন্তু বেশ।

হ্যাঁ। কিন্তু নাকটা চাপা। রংও এমন কিছু ফরসা নয়।

হাসলাম। মেয়েদের ওই এক দোষ। কাউকে সুন্দর দেখতে চায় না। একটু না একটু খুঁত বের করবেই।

বউদি বললেন, ওকে যে কেন সবাই এত সুন্দর দেখে বুঝি না। আমাদের কর্তাটিও প্রথম প্রথম ওকে দেখে মূর্ছা যেতেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটি কেমন?

বউদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ভাল আর কী! এ-সব মেয়েরা আর কত ভাল হবে? তবু মিথ্যে কথা বলব না। এ-বাড়িতে তেমন কিছু দেখিনি ওর। একা একা চুপচাপ থাকে। কারও দিকে লক্ষ করে না। বরং তিনতলার অবাঙালি পরিবারটা ভীষণ বাজে।

তবু অলকা সম্পর্কে খুব বেশি জানা গেল না। ওর স্বামী কে, কেন তার সঙ্গে ওর বনিবনা নেই, সে-সব জানা থাকলে বেশ হত।

মধু মল্লিক একদিন জিজ্ঞেস করেন, ও মশাই, চাকরি-বাকরি চান নাকি কিছু? আপনার তো বিদেশের টেকনোলজি জানা আছে।

আমি বললাম, কলকারখানার চাকরি করা আর পোষাবে না। ব্যবসা কিছু করতে পারি।

উনি তখন বললেন, জার্নালিজম করবেন? অ'পাতত একটা ফিচার লেখার বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।

রাজি হলাম। টাকার জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্য। গোটা দুই ফিচার লেখার বরাত পেয়ে ক'দিন বেশ ছোটাছুটি আর ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। প্রথম ফিচাবটা ছিল কলকাতার হোটেলের ব্যবসার ওপর, দ্বিতীয় ফিচার ছিল যে-সব ইন্ডাস্ট্রি এ দেশে নেই সেগুলোর ওপর।

প্রথম ফিচারটির মালমশলা সংগ্রহ করতে সারা কলকাতা চার-পাঁচদিন দাবড়ে বেড়াতে হল। তারপর একদিন বসে মধু মল্লিকের টাইপরাইটার নিয়ে এসে লেখা শুরু করলাম। গরম পড়েছে বড্ড। পাখা চালিয়ে ঘরের দরজা খুলে হাট করে বসে কাজ করছি, এমন সময়ে একজন বেশ লম্বা-চওড়া লোককে ওপরতলায় উঠতে দেখলাম। প্রথমটায় কিছু সন্দেহ হয়নি, কিন্তু একটু বাদেই বউদি এসে এক কাপ চা রেখে বললেন, ভাই প্রভাসবাবু, একটু আগে একটা লোক—বেশ সুন্দর চেহারা, অলকার ঘরে ঢুকেছে।

আমি বললাম, ভাই-টাই কেউ হবে।

না মশাই, ভাই-টাই নয়।

তবে?

সেইটেই রহস্য।

ওর স্বামী নয় তো?

না না, স্বামীদের হাবভাব অন্য রকম। এ-লোকটাকে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছিল। প্রেমে পড়েছে এমন চেহারা।

যে খুশি হোকগে। আমি অবহেলাভরে বললাম।

বউদি বিরসমুখে বললেন, ভাবসাব ভাল নয়। একা অসহায় পেয়ে মেয়েটাকে যদি কিছু করে! আমাদের কর্তা থাকলে ঠিক ইন্টারফিয়ার করত। ওর খুব সাহস।

আমি পাত্তা দিলাম না। বউদি চলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে লেখাটা তৈরি করছিলাম। প্রথম ফিচার বেরোবে খবরের কাগজে, একটু যত্ন নিয়ে কাজ করাই ভাল।

দুপুরবেলায় যখন খাচ্ছি, তখন বউদি এসে শেষতম বুলেটিন দিলেন, লোকটা এখনও নীচে নামেনি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তাতে কী?

বউদি হঠাৎ লাজুক স্বরে বললেন, ওপরতলায় একটা হুটোপাটির আওয়াজও পাচ্ছি।

আমি উঠলাম, মধু মল্লিকের ফ্ল্যাট টেলিফোন রয়েছে, বউদিকে বলতেই মেয়েটির ঘরের টেলিফোন নম্বর দিলেন।

আমি টেলিফোন তুলে নম্বরটা ডায়াল করলাম। বউদি অবাক হয়ে দেখছিলেন। তারপর হেসে কুটিপাটি।

অলকা

লন্ড্রিওয়ালা আমার একটি শাড়ি হারিয়েছে। মনটা ভীষণ খারাপ। লন্ড্রিওয়ালা অবশ্য বলেছে, পাওয়া যাবে, ভাববেন না। কিন্তু আমার ভরসা নেই। আজ সকালে গিয়ে লোকটাকে খুব বকাবকি করেছিলাম। প্রথমটা তেমন রা করেনি। তারপর হঠাৎ কথার পিঠে কথা বলতে শুরু করল। বলল, সব লন্ড্রিতেই ও-রকম হয়। আমাদের নিয়ম যা আছে, ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ নিয়ে যেতে পারেন।

আমি অবাক, বলে কী! ধোলাই তো মোটে তিন টাকার, তার দশগুণ হয় ত্রিশ টাকা। কিন্তু আমার চান্দে শাড়িটার দাম পড়েছিল একশো নব্বই, জয়দেব একটা একজিবিশন থেকে কিনে দেয়। খুব বেশি শাড়ি-টাড়ি জয়দেব আমাকে কিনে দেয়নি ঠিকই, কিন্তু যে ক'খানা কিনে দিয়েছিল তার কোনওটাই খেলো ছিল না। এ-সব ব্যাপারে ওর রুচিবোধ ছিল দারুণ ভাল।

শাড়িটার জন্য রাগে-দুঃখে আমি পাগল-পাগল। বললাম, ইয়ার্কি করছেন নাকি? দু'শো টাকার শাড়ির ক্ষতিপূরণ ত্রিশ টাকা? আমি ক্ষতিপূরণ চাই না, শাড়ি খুঁজে দিন।

লন্ড্রিওয়ালাও মেজাজ দেখাল, হারানো শাড়ির দাম সবাই বাড়িয়ে বলে। ও-সব আমাদের জানা আছে। যা নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, শাড়ি পাওয়া যাবে না। যা করবার করতে পারেন, যান।

শেষের ওই 'যান' কথাটাই আমাকে ভীষণ অবাক আর কাহিল করে দিল । লন্ড্রিওয়ালা লোকটার চেহারা ভীষণ লম্বা, কালো, গুন্ডার মতো, বয়সেও ছোকরা। কয়েকদিন কাচিয়েছি এ-দোকানে, খুব একটা খারাপ ব্যবহার করেনি। আজ হঠাৎ মনে হল, এই ইতর লোকটাই বুঝি দুনিয়ার সেরা শয়তান। আমারই বা কী করার আছে? কী অসহায় আমরা! 'যান' বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

রাগে দুঃখে ফেটে পড়ে আমি বললাম, যান মানে! কেন যাব? আপনি যে কাপড়টা চুরি করে নেননি তার প্রমাণ কী? ওয়াশিং চার্জের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিলেই যদি অমন দামি একখানা কাপড় হাতিয়ে নেওয়া যায়—!

লোকটা বুক চিতিয়ে বলল, অ্যাঃ,দামি কাপড়! আমরা ভদ্রলোকের ছেলে, বুঝলেন! দামি জিনিস অনেক দেখেছি, ফালতু পার্টি নই।

দোকানের দু'-একজন কর্মচারী মালিকের পক্ষে সায় দিয়ে কথা বলছে। খুব অসহায় লাগছিল আমার। এ-সময় একজন জোরালো পুরুষ-সঙ্গীর বড় দরকার হয় মেয়েদের।

এ-কথা ভাবতে-না-ভাবতেই হঠাৎ যেন দৈববলে একজন ভদ্রলোক রাস্তা থেকে উঠে এলেন দোকানে। বেশ ভদ্র চেহারা, তবে কিছু রোগাভোগা। চোখে-মুখেও বেশ দুঃখী বিনয়ী ভাব।

লোকটা দোকানে ঢুকে কয়েক পলক আমাকে দেখে নিয়ে মাথা নিচু করে বলল, ট্রাবলটা কী?

শোনাবার লোক পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। অবিরল ধারায় কথা বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে।

লোকটা শুনল। কথার মাঝখানে মাথাও নাড়ল! দোকানদার বাধা দিয়ে নিজের কথা বলতে চাইছিল, কিন্তু লোকটা তাকে পাত্তা দিল না। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনে-টুনে একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, হুঁ।

লোকটাকে আমার চেনা-চেনা ঠেকছিল প্রথম থেকেই। কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু তখন শাড়ি হারানোর দুঃখ আর লন্ড্রিওয়ালার অপমানে মাথাটা গুলিয়ে ছিল বলে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

লোকটা লন্ড্রিওয়ালার দিকে একটু ঝুঁকে খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিস করে কী যেন বলল। লন্ড্রিওয়ালা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, দেখলাম।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি। কিছু শুনতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন লন্ড্রিওয়ালার বন্ধু, আবার আমারও শুভানুধ্যায়ী।

খানিকক্ষণ ওইসব ফিসফাস কথাবার্তার পর হঠাৎ লন্ড্রিওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দিদি, একটা শেষ কথা বলে দেব? আমি একশোটা টাকা দিতে পারি খুব জোর।

আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই। যদিও আমার শাড়িটার দাম অনেক বেশি, তা হলেও সেটা তো অনেক দিন পরেছি। তা ছাড়া ত্রিশ টাকার জায়গায় একশো টাকা শুনে একটা চমক লেগে গেল। তবু বেজার মুখ করে বললাম, তাও অনেক কম। তবু ঠিক আছে।

লন্ড্রিওয়ালা টাকা নিয়ে কোনও গোলমাল করল না, সঙ্গে সঙ্গে একটা ড্রয়ার টেনে টাকা বের

করে দিল। রসিদ সই করে দিলে লন্ড্রিওয়ালা লোকটিকে বলল, প্রভাসবাবু, আপনিও সাক্ষী হিসেবে একটা সই করে দিন।

লোকটা সই করলে আমি নামটা দেখলাম। প্রভাসরঞ্জন। কোনও পদবি লিখল না।

বেরিয়ে আসার সময় প্রভাসরঞ্জনও এল সঙ্গে সঙ্গে। রাস্তায় কাঠফাটা রোদ। এই সকালের দিকেই সারা দিনের অসহনীয় গরমের আন্দাজ দিচ্ছে। আমি ব্যাগ থেকে সানগ্লাস বের করে পরে নিলাম। এখন অফিস যাব, তাই ট্রামরাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার আগে প্রভাসবাবুকে বললাম, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি না এলে লোকটা টাকাটা দিত না।

প্রভাসবাবু মৃদু হেসে বললেন, আপনি কি টাকাটা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন?

আমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। প্রশ্নটার মধ্যে একটু যেন খোঁচা আছে। বললাম, না। কেন বলুন তো!

একটা শাড়ির সঙ্গে কত কী স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। শাড়ির দামটা তো বড় নয়।

আমি মৃদু হেসে বললাম, তাই। তা ছাড়া শাড়িটাও বড় ভাল ছিল।

প্রভাস মাথা নেড়ে বলেন, বুঝেছি। ও টাকা দিয়ে, আর একটা ও-রকম শাড়ি কিনবেন?

কিনতে পারি। কিন্তু একরকম শাড়ি তো আর পাওয়া যায় না। দেখা যাক।

প্রভাসরঞ্জন আমার সঙ্গে ট্রামরাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, শাড়িটা আপনাকে কে দিয়েছিল?

এবার আমি একটু বিরক্ত হই। গায়ে-পড়া লোক আমার দু'চোখের বিষ। বললাম, ওটা আমার খুব পারসোনাল ব্যাপার।

প্রভাসরঞ্জন আমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ সরিয়ে বললেন, আমি অবশ্য আন্দাজ করতে পারি।

করেছিস না হয় একটু উপকার, তা বলে পিছু নেওয়ার কী? পুরুষগুলো এমন বোকা হয়, কী বলব! তবু ভদ্রতা তো আর আমাদের ছাড়ে না। আমার আবার ওই এক দোষ, সকলের সঙ্গে একটু প্রশ্রয়ের সুরে কথা বলে ফেলি। তা ছাড়া, লোকটার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর আন্দাজটা সত্যিই হতে পারে-বা।

বললাম, কী আন্দাজ করলেন?

প্রভাসরঞ্জন মৃদু স্বরে বললেন, আপনার স্বামী।

আমি একটু কেঁপে উঠলাম মনে মনে। কপালে বা সিঁথিতে আমি সিঁদুর দিই না। সম্পূর্ণ কুমারীর চেহারা আমার। তা ছাড়া যে-এলাকায় আছি সেখানকার কেউ আমাকে চেনে না। এ লোকটা জানল কী করে যে আমার একজন স্বামী আছে?

এবার একটু কঠিন স্বরে কথা বলাটা একান্ত দরকার। লোকটা বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

বললাম, আমার স্বামীর খবর আপনাকে কে দিল? আমার স্বামী-টামি কেউ নেই।

লোকটা অবাক হয়ে বলে—নেই! তা হলে তো আমার আন্দাজ ভুল হয়ে গেছে!

হ্যাঁ! এ-রকম অকারণ আন্দাজ করে করে আর সময় নষ্ট করবেন না। পুরুষমানুষদের কত কাজ থাকে। পরের ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা মাথা ঘামায়।

প্রভাসরঞ্জন কিন্তু অপমান বোধ করলেন না। বড্ড গরম আর রোদে ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে যাচ্ছেন। একটা টার্কিশ রুমালে ঘাড়, গলা মুছলেন। পরনে একটা পাজামা আর নীল শার্ট। শার্টের কাটছাঁট বিদেশি। বাঁ হাতে বেশ বড়সড় দামি ঘড়ি। চেহারা দেখে সচ্ছল মনে হয়।

অপমান গায়ে না মেখে প্রভাসরঞ্জন বললেন, আমি আপনার ফ্ল্যাটের নীচের তলায় থাকি। আপনি তো ঠিক চিনবেন না আমাকে। পাঁচুবাবু নামে যে বুড়ো ভদ্রলোক হাসপাতালে গেছেন আমি তাঁরই ফ্ল্যাটে—

আমি হাসলাম। বললাম, ও, ভালই তো। আমি অবশ্য ও-বাড়ির কারও সঙ্গে বড় একটা মিশি না।

ভুল করেন।

কেন?

মেশেন না বলেই আপনাকে নিয়ে লোক খুব চিন্তা-ভাবনা করে, নানা গুজব রটায়।

আমি তা জানি। রটাবেই, বাঙালির স্বভাব যাবে কোথায়? বললাম, আমি ভুল করি না, ঠিকই করি। ওদের সঙ্গে মিশতে আমার রুচিতে বাধে।

প্রভাসরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, সেটা হয়তো ঠিকই। তবে আমি অন্য ধাতুতে গড়া, সব রকম মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

উনি কার সঙ্গে মিশেছেন, কেন মিশেছেন সে-সম্পর্কে আমার কৌতূহল নেই। পার্ক সার্কাসের ট্রামস্টপে দাঁড়িয়ে আমি সানগ্লাসের ভিতর দিয়ে পার্কের দিকে চেয়ে থাকি। একটা কাক বুঝি ডানা ভেঙে কোনও খন্দে পড়েছে, তাকে ঘিরে হাজারটা কাকের চেঁচামেচি। কান ঝালাপালা করে দিল। তবু কাকের মতো এত সামাজিক পাখি আমি আর দেখিনি। ওদের একজনের কিছু হলে সবাই দল বেঁধে দুঃখ জানাতে আসে। মানুষের মধ্যে কাকের এই ভালটুকুও নেই।

ট্রামের কোনও শব্দ পাচ্ছি না। বললাম, তাই নাকি?

এই 'তাই নাকি' কথাটা এত দেরি করে বললাম যে প্রভাসরঞ্জন একটু অবাক হয়ে বললেন, কিছু বললেন?

আমি বললাম, কিছু না।

প্রভাসরঞ্জন আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। রোদ, গরম সব উপেক্ষা করে। আজকাল প্রায়ই পুরুষেরা আমার প্রেমে পড়ে যায়। এঁর সম্পর্কেও আমার সেই ভয় হচ্ছে। বেচারা!

একটু ভদ্রতা করে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম, লন্ড্রিওয়ালা কি আপনার চেনা?

না তো! বলে ফের বিস্ময় দেখালেন উনি।

আমি বলি, আপনার কথায় লোকটা তা হলে ম্যাজিকের মতো পালটে গেল কেন?

ওঃ! সেও এক মজা। ওর দোকানে আমিও কাচাতে-টাচাতে দিই, সেই সুবাদে একটু চেনা। এক বার একটি প্যান্টের পকেটে ভুলে আমার পাসপোর্টটা চলে গিয়েছিল। সেইটে দেখে ও হঠাৎ আমাকে সমীহ করতে শুরু করে।

পাসপোর্ট! আপনি বিদেশে ছিলেন নাকি?

এখনও কি নেই? গোটা পৃথিবীটাই আমার বিদেশ।

ট্রাম কেন এখনও আসছে না এই ভেবে আমি কিছু অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ, আমার মনে হচ্ছিল, এ লোকটা পাগল। এর সঙ্গে আমি এক বাড়িতে থাকি ভাবতেও খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

প্রভাসরঞ্জন হাতের মস্ত ঘড়িটা দেখে কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, আপনার ট্রাম তো এখনও এল না। অফিস ক'টায়?

আমি বললাম, দশটায়। তবে দশ-পনেরো মিনিট দেরি করলে কিছু হবে না।

ব্যথিত হয়ে প্রভাসরঞ্জন বললেন, ওটা ঠিক নয়। দশ-পনেরো মিনিট দেরি যে কী ভীষণ হতে পারে।

আমি হেসে বললাম, কী আর হবে! সকলেরই একটু দেরি হয়। ট্রাম-বাসে সময়মতো ওঠাও তো মুশকিল।

হুঁ। প্রভাসরঞ্জন বললেন, তার মানে কোথাও কেউ একজন দেরি করছে, সেই থেকেই দেরিটা সকলের মধ্যেই চারিয়ে যাচ্ছে। ধরুন একজন স্টার্টার বাস ছাড়তে দেরি করল, ড্রাইভারও একটা পান খেতে গিয়ে দু' মিনিট পিছোল, বাস দেরি করে ছাড়ল, সেই বাস-ভরতি অফিসের লোকেরও হয়ে গেল দেরি। এই রকম আর কী। একজনের দেরি দেখেই অন্যেরা দেরি করা শিখে নেয়।

আমি হাসছিলাম।

উনি বললেন, কী করে অবস্থাটা পালটে দেওয়া যায় বলুন তো?
পালটানো যায় না। ওই বুঝি আমার ট্রাম এল—
হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভিড়, উঠতে পারবেন না।
ভিড় ঠিকই। ট্রাম-বাসের একটু দেরি হলেই প্রচণ্ড ভিড় হয়। তবে আমার অভ্যাস আছে।
চলি। বলেই ট্রামের দিকে এগোই।
প্রভাসরঞ্জন হঠাৎ আমার পিছন থেকে অনুচ্চস্বরে বললেন, সেদিন দুপুরে কে একটা লোক আপনার ঘরে ঢুকেছিল বলুন তো। আপনার স্বামী?
কথাটা শুনে আমি আর ঘাড় ফেরালাম না; শুনিনি ভান করে ভিড়ের ট্রামে ধাক্কাধাক্কি করে উঠে গেলাম ঠিক।
আমার কোনও দিনই তেমন ঘাম হয় না, ইসিনোফিলিয়া আছে বলে প্রায় সময়ই বরং আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ শীত করে ওঠে। কিন্তু আজ আমি অবিরল ঘামছিলাম। সারাদিন বড় বেশি অন্যমনস্কও রইলাম আমি। মনে হচ্ছে, লন্ড্রিতে ওই লোকটার আসা, গায়ে পড়ে উপকার করা আর তার পরের এত সব সংলাপ এ-সবই আগে থেকে প্ল্যান করে করা। এত দিন আমার জীবনটা যত নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন ছিল এখন যে আর ততটা নয় তা বুঝতে পেরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এরা বা এই লোকটা অন্তত আমার বিয়ের খবর রাখে।

সাত দিন কেটে গেছে, প্রভাসরঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় বা নামবার মুখে পাঁচুবাবুর বাইরের ঘর থেকে খুব টাইপরাইটারের আওয়াজ পাই। দরজা ভেজানো থাকে, কাউকে-দেখা যায় না। আমিও তো আমার সিঁড়ির গোড়ায় বেশিক্ষণ থাকি না। বরং ভূতের ভয়ে কোনও জায়গা দিয়ে যেতে যেমন গা ছমছম করে, তেমনি একটা ভাব টের পাই। তাই সিঁড়ির মুখটা খুব হালকা দ্রুত পায়ে পেরিয়ে পক্ষিণীর মতো উড়ে যাই।
আমি খুব সাবধান হয়ে গেছি আজকাল। বাইরের দরজাটায় সব সময় ল্যাচকিতে চাবি দিয়ে রাখি। স্পাই হোল দিয়ে না-দেখে আর নাম-ধাম জিজ্ঞেস না-করে বড় একটা দরজা খুলি না। অবশ্য আমার ঘরে আসবেই-বা কে? শুধু ঝি আসে।
একদিন আমার দাদা অভিজিৎ এল। সে বরাবর রোগা দুর্বল যুবক, শীত-গ্রীষ্মে গলায় একটা উল বা সুতির কম্ফর্টার থাকবেই। ঠান্ডা জলে স্নান করতে পারে না, সারা বছর তার সর্দি থাকে। ডাক্তার বলেছে এ-রোগ সারার নয়।
সকালবেলায় দাদা এসে ঘরে পা দিয়েই ঝগড়া শুরু করল—এ তুই শুরু করেছিস কী বল তো! আমাদের পরিবারটা মডার্ন বটে, কিন্তু তুই যে সব লিমিট ছাড়িয়ে গেলি!
রাগ করে বললাম, ও-কথা বলছিস কেন? একা থাকি বলে যত খারাপ সন্দেহ, না?
বটেই তো। জয়দেবের সঙ্গে না থাকিস আমরা তো রয়েছি। এ দেশের সমাজে একা থাকে কোন মেয়ে?
আমি থাকব।
না, থাকবি না। তোর ঝাটি-পাটি যা আছে গুছিয়ে নে, আমি ট্যাক্সি ডাকি।
নিজের বাড়ির কোনও লোককেই আজকাল আমার সহ্য হয় না। ওরা আমাকে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করতে শেখায়নি। সেটা আজকাল আমি বড় টের পাই। চার দিকে যখন স্বামী-স্ত্রীর বসবাস দেখি তখনই আমার মনে হয়, আমারই যেন কী একটা ছিল না, হয়তো সইবার শক্তি, বহনের ক্ষমতা, যা না থাকলে বিবাহিত জীবন বলে কিছু হয় না।
আমি দাদার জন্য চা করতে গিয়ে মনটাকে শক্ত করলাম খুব।
ফিরে এসে বললাম, জয়দেব বা আর কারও সঙ্গে আমি থাকব না।

জয়দেবেরই বা দোষটা কী?

যাই হোক। সব কি তোকে বলতে হবে নাকি?

কথায় কথায় ঝগড়া লেগে গেল। দাদা খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিল। এই সময় ফোনটা আবার বাজল। দৌড়ে গিয়ে রিসিভার কানে তুলতেই সেই ধীর গম্ভীর গলা বলল, আপনার ঘরে লোকটা কে?

আমি ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বললাম, আসুন না প্রভাসবাবু একটু হেলপ করবেন। এ লোকটা আমার দাদা, বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

টেলিফোনে গলাটা শুনেই আজ আমি লোকটাকে চিনে ফেলেছি। কথা ক'টা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশে হাসি শোনা গেল। প্রভাসরঞ্জন বললেন, বড্ড মুশকিল হল দেখছি! চিনে ফেললেন! দাদা কী বলছেন?

ফিরে যেতে।

তাই যান না।

আমি যাব না। জয়দেববাবুর তো কোনও দোষ নেই।

আপনি সেটা জানলেন কী করে?

খোঁজ নিয়েছি। ইনফ্যাক্ট আমি জয়দেববাবুর সঙ্গে দেখাও করেছি ক'দিন আগে।

মিথ্যে কথা।

না, মিথ্যে নয়। আমি এখন একটা ডেইলি নিউজ পেপারের স্পেশাল রিপোর্টার। মধু মল্লিক যে-কাগজে কাজ করেন।

তাতে কী?

সেই কাগজের তরফ থেকে স্মল স্কেল আর কটেজ ইন্ডাস্ট্রির একটা সার্ভে করেছিলাম। জয়দেববাবু ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক।

আমার কথা উঠল কী করে?

উঠে পড়ল কথায়-কথায়।

দাদা এসে এ-ঘরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফোনের কথা শুনছে। এক বার চোখের ইশারা করে জিজ্ঞেস করল, কে?

আমি হাত তুলে ওকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করে ফোনে বললাম, না, আপনিই আমার কথা তুলেছিলেন।

তাই না হয় হল, ক্ষতি কী?

ক্ষতি অনেক। তার আগে বলুন, আপনার এ-ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট কেন?

প্রভাসরঞ্জন কিছু গাঢ় গলায় ইংরিজিতে বললেন, বিকজ আই হ্যাভ অলসো লস্ট সাম অফ মাই হিউম্যান পজেশনস।

ফোন কেটে গেল।

দাদা বলল, কে রে?

একজন চেনা লোক।

দাদা গম্ভীর হয়ে বলল, চেনা লোক! বাঃ, বেশ। চেনার পরিধি এখন পুরুষমহলে বাড়ছে তা হলে।

আমি ছোট্ট করে বললাম, বাড়লে তোর কী?

আমার অনেক কিছু। সে থাকগে, এ লোকটা তোকে কী বলছিল?

আমি হঠাৎ আক্রোশে রাগে প্রায় ফেটে পড়ে বললাম, তোরা কেউ কি আমাকে শান্তিতে থাকতে দিবি না!

দরজার কাছ থেকে প্রভাসরঞ্জন বললেন, শান্তিতে কি এখনই আছেন? যান তো, একটু চা করে এনে খাওয়ান।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম লোকটার সাহস দেখে।

প্রভাসরঞ্জন

পাঁচুদাকে দেখেই বুঝি যে লোকটার হয়ে গেছে। ব্যাচেলার মানুষ আত্মীয়স্বজন বলতেও কাছের জন কেউ নেই, মরলে কেউ বুক চাপড়াবে না, অনাথা বা অনাথ হবে না কেউ। সেই একটা সান্ত্বনা। তবু একটা মানুষ ছিল, আর থাকবে না, এটা আমার সহ্য হচ্ছিল না। বলতে কী পাঁচুদার জন্য বেশ দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম।

ব্যাচেলারদের বেশি বয়েসে কিছু-না-কিছু বাতিক হয়ই। সম্ভবত কামের অচরিতার্থতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি মিলেমিশে তাদের বায়ুগ্রস্ত করে তোলে। পাঁচুদারও তা-ই হয়েছিল। চিরকাল তাঁর দূর সম্পর্কের যত আত্মীয়স্বজন তাঁর কাছ থেকে পয়সাকড়ি বা জিনিসপত্র হাতিয়েছে। ভণ্ড সাধু-সন্ন্যাসী জ্যোতিষেরাও কাজ গুছিয়েছে কম নয়। পাঁচুদা কয়েকবারই জোচ্চোরদের পাল্লায় পড়ে ব্যবসাতে নেমে ঠকে এসেছেন। তাঁর বাপের কিছু টাকাও তিনি পেয়েছিলেন, চাকরির বেতন তো ছিলই, সব মিলেই বেশ শাঁসালো খদ্দের। লোকে ঠকাবে না কেন? প্রতি বছর মাসখানেক ধরে তীর্থভ্রমণ করতেন। ভারতবর্ষের এমন জায়গা নেই যেখানে যাননি। শেষ বয়সটায় বেশ কষ্ট পেলেন।

আমার মধ্যে একটা পাপবোধ ছিল। আমাদের ছেলেবেলায় যখন প্রচণ্ড অভাবের সময় চলছিল তখন এই পাঁচুদা বেশ কয়েকবার আমাদের অনাহার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই তাঁর প্রতি আমাদের একটা মতলববাজ মনোভাব জন্মায়। পাঁচুদা মানেই হচ্ছে আদায়ের জায়গা। তাই পাঁচুদা আমাদের বাড়িতে এলেই আমরা খুশি হতাম, যখন-তখন তাঁর বাসা বা অফিসে গিয়ে নানা কাঁদুনি গেয়ে পয়সা আদায় করেছি। আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফি তিনিই দেন। আর, আমি তাঁর একটা সোনার বোতাম চুরি করেছিলাম।

এ-সব কথা তাঁকে আর বলার মানে হয় না। তবু যখন শ্যামবাজারের আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়ে এক কঙ্কালসার চেহারাকে দেখি তখনই সেইসব পাপের কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। নিজেকেই বলি, প্রভাসরঞ্জন, পাপের কথা স্বীকার করে নাও, খ্রিস্টানরা যেমন যাজকদের কাছে করে।

আমার কথা শুনে পাঁচুদা হেসে বললেন, যা যা জ্যাঠাছেলে, চুরি করেছিস বেশ করেছিস। সেই চুরির বোতাম আজ তোকে দান করে দিলাম, যা।

ক্যানসারের কষ্ট তো কম নয়। শরীর শুষে ছিবড়ে করে ফেলছে প্রতিনিয়ত। কিছু খেতে পারেন না। যা খান তা উঠে আসে ভেতর থেকে। ক্রমশ শরীর ছেড়ে যাচ্ছে তাঁর সব শক্তি। এখন কঙ্কালসার হাতখানা তুলতেও তাঁর বড় কষ্ট। মাঝে মাঝে দেখি বুকের কম্বলটা টেনে মুখ ঢাকা দিয়ে কাঁদেন। সে-কান্নাও অতি ক্ষীণ। যেন পাঁজরের খাঁচা থেকে এক বন্দি ভোমরার গুঞ্জনধ্বনি উঠে আসে।

পত্রিকা অফিস থেকে আজকাল প্রায়ই নানা জায়গায় পাঠায়। আর দু'-এক মাসের মধ্যেই আমাকে পাকা চাকরিতে নেওয়া হবে। সাংবাদিকের এই চাকরি আমার খুব খারাপ লাগছে না। কিন্তু সব সময়ে একটা এই দুঃখ, আমি নানা দেশ ঘুরে যে প্রযুক্তি শিখেছি তা কোনও কাজে লাগল না। জীবনের দশ-দশটা বছর আমি বৃথা অন্বেষণে কাটিয়ে এসেছি। আয়ুক্ষয়।

সুইজারল্যান্ডে আমাদের কারখানা দেখতে সেবার এক জাপানি প্রতিনিধি দল এল। বেঁটে বেঁটে

চেহারার হাস্যমুখ, বুদ্ধির আলো-জ্বলা ছোট ছোট চোখের মানুষ। প্রত্যেকেই বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তাদের দেশে। কারখানা দেখার অনুমতি চাইল। ওপরওয়ালা আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে ডেকে ওদের কারখানা দেখাতে বলে দিলেন। অনুমতি পেয়ে জাপানিদের চেহারা ধাঁ করে পালটে গেল। পরনের সুট খুলে ওভারঅল পরে নিল সবাই, খাতা-পেনসিল-পেন-কম্পাস সাজিয়ে নিল। তারপর প্রতিটি যন্ত্র আর যন্ত্রাংশের মধ্যে ওরা কালিঝুলি মেখে ঢুকে যেতে লাগল। ভাল করে লাঞ্চ পর্যন্ত করল না। ভূতের মতো শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের সমস্ত রহস্য জেনে নিতে লাগল। পরপর সাত দিন একনাগাড়ে তারা কারখানাটিকে জরিপ করতে লাগল। শেষ দিকে ওদের চলাফেরা, যন্ত্রের ব্যবহার এবং কথাবার্তা শুনে হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমি এ-কারখানায় এতকাল থেকেও যে-সব রহস্য জানি না ওরা অল্প দিনেই তা সব জেনে গেছে।

জাপানিরা দেশে ফিরে যাওয়ার দু' বছরের মধ্যে জাপান থেকেই বিশ্বের বাজারে কম্প্রেসর মেশিন ছাড়া হল। সুইস কম্প্রেসরের চেয়ে তা কোনও অংশে খারাপ তো নয়ই, বরং দামে অনেক সস্তা। এমনকী ওরা সুইস যন্ত্রের নকল করেছে বলেও মনে করার কারণ নেই। যন্ত্রের মৌল রহস্যটা জেনে গিয়ে ওরা ওদের মতো যন্ত্র বানিয়েছে।

এ ঘটনার বছরখানেকের মধ্যেই একটি ভারতীয় প্রযুক্তিবিদের দল সুইজারল্যান্ড যায়। ব্যল-এ এসে তারা আমাদের কারখানাতেও হানা দিয়েছিল। স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, তোমার দেশের লোকদের তুমিই এসকর্ট করে নিয়ে কারখানা দেখাও।

ভারতের লোক এসেছে শুনে আমি খুবই উৎসাহ বোধ করি। দলে একজন বাঙালিও ছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে তিনি একটু অবাক হলেন। কিন্তু তিনি দেশে খুব বড় চাকরি করেন, আর আমি এ-কারখানার একজন স্কিলড লেবার মাত্র। তাই তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি করলেন না, একটু আলগা আলগা ভালবাসা দেখালেন। মোট ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে তাঁরা অত বড় কারখানাটার হাজারও যন্ত্রপাতি দেখে ফেললেন। যা-ই দেখাই তা-ই দেখেই বলেন, ওঃ, ভেরি গুড! হাউ নাইস! ইজ ইট! যন্ত্রপাতি তাঁরা ছুঁয়েও দেখলেন না। তারপর ম্যানেজারের ঘরে বসে কফি খেয়ে চলে গেলেন। পরে স্মিড সাহেব আমাকে ডেকে বললেন, তোমার দেশের লোকেরা এত অল্প সময়ে এত বড় প্রোজেক্টের সব বুঝে ফেলল?

তখন আমি ঠিক করেছিলাম এরা যা করেনি তা আমাকেই করতে হবে। তারপর কিছুদিন আমি একা একা পুরো যন্ত্রপাতির নকশা কপি করতে শুরু করি। এমনিতেই ভূতের মতো খাটুনি ছিল, তার ওপর বাড়তি খাটুনি যোগ হল। হয়তো পেরেও যেতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময় বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় আমার ভিতরকার সব উৎসাহ নিভে যায়। তবু যা শিখেছিলাম, যা কপি করেছিলাম তাও বড় কম নয়। যে-কোনও ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ে আমার প্রযুক্তির ধারণা অনেক প্রাঞ্জল এবং বাস্তব। আমি হাতে-কলমে যন্ত্র চালিয়েছি। যন্ত্রের সব চরিত্রই আমার জানা। এখনও ভারী কম্প্রেসর মেশিনের যে-কোনও কারখানায় আমার অভিজ্ঞতা অসম্ভব রকমের কার্যকরী হতে পারে।

কিন্তু তা হল না। আমি এখন নানা চটুল বা রাশভারী বিষয় নিয়ে খবরের কাগজে ফিচার লিখছি। লিখতে আমার খারাপ লাগে না ঠিকই, কিন্তু সব সময়েই আমার অধীত বিদ্যার অপচয়ের জন্য কষ্ট হয়। যা কষ্ট করে শিখে এসেছি তা এ দেশে কাজে লাগল না। অবশ্য আমি এখানকার কলকারখানায় চাকরি করতে আর উৎসাহীও নই। আমি চেয়েছিলাম নিজেই একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করব।

এখন টাইপ-রাইটারের খটখটানির মধ্যে একরকমের নতুন জীবনের খবর পেয়ে যাচ্ছি। মধু মল্লিক এসে প্রায়ই খবর দেন, আমার ফিচারগুলো কাজের হচ্ছে।

মধু মল্লিক একদিন এসে বললেন, কস্ট অফ প্রোডাকশন কমিয়ে আনার ব্যাপারে আপনার ফিচারটা সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। কিন্তু প্রভাসবাবু, আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার কটেজ আর স্মল স্কেল। শুধু হেভি ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে এ দেশের ইনকাম স্টেবল করা যাবে না। আপনি কি এ-কথা মানেন?

আমি মানি। মধু মল্লিকও মানেন দেখে খুব খুশি হলাম। বললাম, কটেজ বা স্মল স্কেল না থাকলে দেশের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। এ আমি স্বীকার করি। তা ছাড়া এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ওইসব নিয়ে আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওটার খুবই দরকার।

লিখুন না এবার স্মল আর কটেজ নিয়ে। মধু মল্লিক বললেন।

কাজ সহজ নয় তবে আমার অফিস থেকে প্রচুর সাহায্য করা হল এ-ব্যাপারে! কুটির এবং ছোট শিল্পের ওপর পত্রিকা চারটে সিরিয়াল ছাপাবে। আমাকে সে জন্য গোটা পশ্চিমবাংলার গাঁয়ে-গঞ্জে চলে যেতে হল। সরকারি লোকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখা-সাক্ষাৎও করতে হল মেলা।

এই করতে গিয়েই জয়দেবের সঙ্গে দেখা বাঁকুড়ায়। ভারী দুঃখী চেহারার লোক এবং খুবই ভালমানুষ! ডক্টরেট হয়েছেন সম্প্রতি, জানেনও বিস্তর। একখানা নতুন বই লিখেছেন ফোক আর্ট সম্পর্কে। কথায় কথায় বিয়ের কথা উঠতে আমি বলেছিলাম—আমার বউ-ছেলে সব পর হয়ে গেছে। সেই ভ্যাকুয়ামটা পূর্ণ করতে এখন আমার অনেক কাজ চাই। নইলে একা হলেই ভূতে পায়।

জয়দেব আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আমার কেসও আপনার মতো। আমার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু বউ ছিল। প্রায় বিনা কারণে সে আমাকে ছেড়ে গেছে।

যোগাযোগটা খুবই অদ্ভুত। অলকার স্বামীকে যে এত সহজে দুম করে খুঁজে পাব কখনও ভাবিনি। পরিচয় বেরিয়ে পড়তে যখন অলকার খবর দিলাম তখন জয়দেব হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে জিজ্ঞেস করল—ও কি আবার বিয়ে করবে?

না, না।

ওকে বলবেন, মেয়েদের দু'বার বিয়ে হতে নেই। সেটা খুব খারাপ। ও আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমাদের পরিবারে মস্ত ঝড়ের ধাক্কা গেছে। এখনকার ছেলেমেয়েরা তো কখনও সমাজ বা পরিবারের পারসপেকটিভে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবে না। যদি ভাবত তা হলে অলকা অত সহজে ছেড়ে যেতে পারত না। অপছন্দের স্বামীকেও মানিয়ে নিত। আর এও তো সত্যি যে, আজকের অপছন্দের লোক কালই প্রিয়জন হয়ে উঠতে পারে, যেমন আজকের প্রিয়জন হয়ে যায় কাল দু'চোখের বিষ!

সত্যি কথা। সহ্য করা বা বহন করা আজকের মানুষের ধাতে নেই। অপছন্দের জিনিস তারা খুব তাড়াতাড়ি বাতিল করে দেয়। নতুন জিনিস নিয়ে আসে। আর এইভাবেই তাদের স্বভাব হয়ে উঠেছে পিছল ও বিপজ্জনক।

আমি বললাম, আপনি কি এখনও অলকাকে ভালবাসেন?

কেমন একরকম লোভী শিশুর মতো তাকাল জয়দেব। অনেকক্ষণ বাদে মাথা নেড়ে বলল, তাতে কী যায় আসে! ও তো আর আমাকে ভালবাসে না!

আমি চিন্তা করে বললাম, দেখুন, ভালবাসাটা সব সময়েই তো আর হুস করে মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতো বেরোয় না। ওটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। ভালবাসার চেষ্টা থেকেই ভালবাসা আসে।

সে হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই চেষ্টারও অভাব রয়েছে। তিলমাত্র মমতা থাকলে তাকে বাড়িয়ে বিরাট ভালবাসা জন্মাতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই তিলমাত্রও নেই?

আমি ভাবিত হয়ে পড়ি। এবং ফিরে আসি।

কলকাতায় এসেই একটু ঝামেলায় পড়ে গেলাম।

একদিন অনেক রাত অবধি টাইপমেশিন চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়েছি। ভোররাতে এসে ঘুম ভাঙাল সুহাস।

দরজা খুলে তাকে দেখে খুব খুশি হই না, বললাম, কী রে, কী চাস?

মা'র খুব অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। কী করব?

শরীরে একটা ধনুকের টংকার বেজে উঠল। মা!

কথা আসছিল না মুখে। অবশ হয়ে চেয়ে ছিলাম। সুহাস বলল, কিছু টাকা দাও।

টাকা দেব? অবাক হয়ে বলি, টাকা দেব সেটা বড় কথা কী। আগে গিয়ে মাকে একটু দেখি! তুই ট্যাক্সি ডাক তো।

বলে আমি ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় পরছিলাম। সুহাস ট্যাক্সি আনতে যায়নি, দরজার কাছে দোনোমনো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে পড়তে বলল, তুমি বিশ্রাম নাও না! এক্ষুনি যাওয়ার দরকার নেই খুব একটা। অবস্থা যতটা খারাপ হয়েছিল ততটা এখন নয়। তুমি ব্যস্ত মানুষ, দু'-চার দিন পরে যেয়ো।

ওর কথা বুঝতে পারছিলাম না একদম। আবোল-তাবোল বকছে? এই বলল খারাপ অবস্থা, আবার বলছে তত খারাপ নয়। কেমন একটু সন্দেহ হল মনে। বললাম, তোর মুখে সত্যি কথা-টথা আসে তো ঠিক?

বাঃ, মিথ্যে বলছি নাকি?

মা'র অসুখ, তা আমাকে যেতে বারণ করছিস কেন?

তোমার অসুবিধের কথা ভেবেই বলেছি। যাবে তো চলো।

ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়, আমি যাব।

দমদমের বাসার কাছে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছি তখন সুহাস 'এই একটু আসছি' বলে কোথায় কেটে পড়ল। বাড়িতে ঢুকে দেখি মা পিছনের বারান্দায় বসে কুলোয় রেশনের চাল বাছছে।

আমি গিয়ে মা'র কাছে বসতেই মা কুলো ফেলে আমাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলল, ওরা বলে তুই নাকি খুব খারাপ হয়ে গেছিস! কোন এক বিধবা না সধবার সঙ্গে নাকি তোর বিয়ে সব ঠিক?

আমি স্তম্ভিত হয়ে মাকে দেখি। অনেকক্ষণ বাদে বলি, তোমার কী হয়েছে? শুনলাম তোমার খুব অসুখ!

হলে বাঁচি বাবা। সে অসুখ যেন আর ভাল না হয়। কিন্তু গতরে তো অসুখও একটা ধরে না তেমন।

সুহাস আজ সকালে গিয়ে তোমার অসুখের নাম করে টাকা চেয়েছিল।

মা হাঁ করে একটু চেয়ে থেকে বলে, ওর অবস্থা খুব খারাপ বাবা, নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তাই বোধহয় এই ফিকির করেছিল।

রান্নাঘর থেকে নিমি খুব হাসিমুখে এক কাপ চা নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, দাদাকে কতদিন বাদে দেখলাম! খুব ব্যস্ত শুনি!

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, সুহাস কোথায় গেল বউমা?

এসে পড়বে এক্ষুনি। বসুন না।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ও আসবে না, আমি জানি। বউমা, তুমি মা'র কাপড়চোপড় যা আছে গুছিয়ে দাও। আমি মাকে নিয়ে যাব।

মা শুনে কেমনধারা হয়ে গিয়ে বলল, সে কী কথা বলিস! এখন আমি কোথায় যাব?

আমি চড়া গলায় বললাম, যেতেই হবে। এখানে তোমার গুণের ছেলে তোমাকে ভাঙিয়ে ব্যবসা শুরু করতে চলেছে যে! কত বড় সাহস দেখেছ!

অমনি নিমি ঘর থেকে তেড়ে এসে বলল, বেশি বড় বড় কথা বলবেন না বলে দিচ্ছি। আপনার কীর্তিও অনেক জানি!

দু'-চার কথায় প্রচণ্ড ঝগড়া লেগে গেল। পাড়ার লোক এসে জুটতে লাগল চার দিকে।

আমি মাকে বললাম, মা, তোমাকে যেতেই হবে। এ নরকে আর নয়।

বোধহয় আমাকে ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচাতেই মা উঠে গিয়ে একটা টিনের তোরঙ্গ গুছিয়ে নিল। আমি মাকে নিয়ে চলে এলাম।

কয়েক দিন মন্দ গেল না। মা রান্নাবান্না করে, আমি কাজে যাই। মধু মল্লিকের সবাই মা'র দেখাশুনা করে। এমনকী অলকা পর্যন্ত খোঁজখবর নিয়ে যায়। কিন্তু এতসব ভদ্রলোক এবং লেখাপড়া-জানা পরিবেশে থেকে মা'র অভ্যাস নেই। সব সময় তটস্থ ভাব। মাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় অবশ্য আমার ছিল না, দিনরাত ঘুরি, রাত জেগে ফিচার টাইপ করি।

দিন পনেরো পরে মা একদিন মিনমিন করে বলল, প্রভাস, এক বার বরং দমদম থেকে ঘুরে আসি।

গম্ভীর হয়ে বলি, কেন?

মা ভয় খেয়ে বলে, সুহাস আর নিমি যেমনই হোক ওদের ছেলেমেয়েগুলো আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না।

আমি বললাম, মা, সুহাস আর নিমি তোমার ওপর কেমন নির্যাতন করে বলো তো! মারে নাকি?

মা শ্বাস ফেলে বলে, অমানুষের সব দোষ থাকে বাবা। মাকে মারবে সে আর বেশি কথা কী?

তবু যেতে চাও?

ওদের কাছে যেতে চাইছি নাকি! ওই যে ছেলেমেয়েগুলো, ওরা যে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে আমার জন্য কাঁদে।

কাঁদবে না, অভ্যাস হয়ে যাবে।

মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুই একটা বিয়ে কর। তখন এসে পাকাপাকিভাবে তোর কাছে থাকব।

আমি বললাম, বাবার কাছে যাবে মা? চাও তো বন্দোবস্ত করে দিই!

যাব বই কী! যাবখন। শীতটা আসুক।

বুঝলাম, এ-জন্মের মতো সুহাসের হাত থেকে মা'র মুক্তি নেই। সুহাস যেমনই হোক, তার বংশধরেরা মা'র রক্তের স্রোত নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে! আর ফেরানো যাবে না।

মাকে একদিন ফের গিয়ে দমদমের বাড়িতে রেখে এলাম।

এইসব ঝামেলায় আর জয়দেবের কথা তেমন মনে ছিল না। কাজের চাপও ক্রমশ বাড়ছে। হঠাৎ একদিন সাতসকালে জয়দেব নিজেই এসে হাজির।

অলকা

মেঘৈর্মেদুরম্বরম। কাল রাত থেকে বৃষ্টি ছাড়েনি। যেমন ভয়ংকর তেজে কাল রাত ন'টায় বৃষ্টি এল প্রায় ঠিক তেমনি তেজে সারা রাত ধরে বৃষ্টি পড়ল। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, কলকাতা ভেসে যাবে।

একটা গোটা ফ্ল্যাটে সম্পূর্ণ একা থাকতে আমার যে ভয়-ভয় করে তা মিথ্যে নয়। শোয়ার আগে বারবার দরজা-জানালার ছিটকিনি দেখি, খাটের তলা, আলমারির পেছনে এবং আর যে সব জায়গায় চোর-বদমাশ লুকিয়ে থাকতে পারে তা ভাল করে না দেখে শুই না। ভূতের ভয় ছেলেবেলা থেকেই ছিল না, তবে বড় হওয়ার পর কখনও কখনও কী যেন একটা ভূত-ভূত ভয়ের ভাব হয়। বিশেষ করে যেদিন বৃষ্টি নামে। কাল সারা রাতের অঝোর বৃষ্টিতে বারবার জানালার শার্সিতে টোকা পড়েছে বৃষ্টির আঙুলে, দরজা ঠেলেছে উন্মত্ত বাতাস। ঝোড়ো বৃষ্টিতে কলকাতার ট্রাম-বাস ডুবে গেল বুঝি! শহরটা বোধহয় একতলা সমান জলের তলায় নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এমন বাদলা বহুকাল দেখিনি।

ঘুম ভেঙে এক বার উঠে দেখি, রাত দু'টো। শীত-শীত করছিল। বাথরুমে গিয়ে হঠাৎ কেন গা ছমছম করল। একটু শিউরে উঠে প্রায় দৌড়ে এসে বাতি না নিভিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতি জ্বালানো থাকায় ভয়-ভয় ভাবটা কমল বটে, কিন্তু ঘুম আসে না। কোনওখানে মানুষের জেগে থাকার কোনও শব্দ হচ্ছে না। কুকুরের ডাক, বেড়ালের আওয়াজ কিছু নেই। ঘনঘোর মেঘ ডেকে ওঠে কেবল, বৃষ্টির জোর বেড়ে যায়, চারিদিক লন্ডভন্ড হতে থাকে। শুয়ে থেকে বুঝতে পারছিলাম, পৃথিবীতে একা হওয়ার মধ্যে কোনও সুখ নেই। একা মানুষ বড় নিস্তেজ, মিয়োনো।

নরম বালিশ বারবার মাথার তাপে গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ উল্টে দিচ্ছি বারবার। বর্ষাকালের সোঁদা স্যাঁতা এক গন্ধ উঠেছে বিছানা থেকে। কিছুতেই রাত কাটছে না।

এইভাবে রাত আড়াইটেয় বড় অসহ্য হয়ে উঠে বসলাম। বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল কারও সঙ্গে একটু কথা বলতে, কারও কথা শুনতে। কিন্তু আমার তো তেমন কেউ নেই।

জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম। ব্যালকনির দিকে জানালায় শার্সির পাল্লা আছে, অন্যগুলোয় কাঠের পাল্লা। শার্সিতে চোখ রেখে দেখি ভূতের দেশের মতো অন্ধকার চার দিক। নীচের রাস্তায় পরপর আলোগুলোর মধ্যে দু'টো মাত্র জ্বলছে এখনও। সেই আলোয় দেখা গেল, রাস্তায় হাঁটুজল। জলে প্রবল বৃষ্টির টগবগানি। আকাশ একবার-দু'বার চমকায়, গম্ভীর মেঘধ্বনি হয়। বড় একা লাগে।

আমার পরনে নিতান্তই সংক্ষিপ্ত পোশাক। গায়ে কেবল ব্লাউজ, পরনে সায়া। রাতে এর বেশি গায়ে রাখতে পারি না। ঘরের বাতি জ্বালা রেখে এ পোশাকে জানালায় দাঁড়ানো বিপজ্জনক। কিন্তু ওই নিশুত রাতে কে আর দেখবে। আর মনটাও বড় অস্থির তখন। ঠান্ডা শার্সিতে গাল চেপে ধরে বিবশার মতো বাইরে তাকিয়ে থেকে থেকে আস্তে আস্তে জগৎ-সংসারের ওপর এক গভীর অভিমান জেগে উঠল। কেবল মনে হতে লাগল, তোমাদের কাছে আমার আদর পাওনা ছিল। কেন তোমরা কেউ কখনও আমাকে ভালবাসলে না? বলো কেন...?

কখন কেঁদেছি আপনভোলা হয়ে। কাঁদছি আর কাঁদছি। আর কাকে উদ্দেশ করে যেন বিড়বিড় করে বলছি, এবার একদিন বিষ খেয়ে মরব, দেখো।

এ কথা বিশেষ কারও উদ্দেশে বলা নয়। কাকে উদ্দেশ করে বলা তা সঠিক আমিও জানি না। তবে এই প্রচণ্ড বৃষ্টির রাতে যখন চার দিকের সব নাগরিকতা মুছে গিয়ে অভ্যন্তরের বন্যতা বেরিয়ে আসে, যখন মনে হয় এইসব ঝড়বৃষ্টির মতো কোনও অঘটনের ভিতর দিয়েই আমাকে সৃষ্টি করেছিল কেউ, তখন আর কাউকে নয়, কেবল এই জন্মের ওপরেই বড় অভিমান হয়।

একা, বড় একা।

শার্সির কাছ থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসি। সাজানো ঘর-দোর ফেলে অসীমদা কোন বিদেশে চলে গেছে তার পরিবার নিয়ে। হয়তো ফিরবে, হয়তো কোনও দিনই ফিরবে না। এই যে আলমারি, খাটপালঙ্ক, রেডিয়োগ্রাম, নষ্ট ফ্রিজ, টেলিফোন, এরা কারও অপেক্ষায় নেই, এরা কারও নয়। তবু মানুষ কত যত্নে এইসব জমিয়ে তোলে। কান্না পাচ্ছিল। টেলিফোনের সামনে বসে বিড়বিড় করে বললাম, কোনও মানুষকে জাগানো দরকার, আমাকে ভূতে পেয়েছে আজ রাতে, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে, আমি বড় একা।

টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে থাকি। কোনও বিশেষ নম্বর ধরে নয়, এমনি আবোল-তাবোল যে-নম্বর মনে আসছে সেই ধরে আঙুল দিয়ে ডিস্ক ঘুরিয়ে দিচ্ছিলাম।

প্রথমবার অনেকক্ষণ ধরে রিং হল, কেউ ধরল না। আমার ভয় করছিল শেষ পর্যন্ত কেউ কি ফোন ধরবে না?

তৃতীয়বার রিং হতে দু' মিনিট বাদে একটি মেয়ের ঘুম-গলা ভেসে এল—

আমি অলকা।

অলকা। কোন অলকা? এটা ফোর সিক্স ডবল থ্রি...

আমি বললাম, শুনুন, রং নাম্বার হয়নি, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

অবাক মেয়েটি বলল, কী কথা?

আমি বললাম, আপনার কে কে আছে? স্বামী?

আমার বিয়ে হয়নি।

মা? বাবা? ভাইবোন?

বাবা আছেন। এক ভাই। কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো! এত রাতে এ-সব কী প্রশ্ন?

আমার বড় একা লাগছে। ভয় করছে। আপনার নাম কী?

ওপাশের মেয়েটি অবশ্যই খুব ভাল স্বভাবের মেয়ে। অন্য কেউ হলে ফোন রেখে দিত। এ কিন্তু জবাব দিল। বলল, আমার নাম মায়া দাস।

কী করেন?

কলেজে পড়াই। কিন্তু আমার এখন খুব টায়ার্ড লাগছে। আপনি কে বলুন তো!

আমি অলকা। আমি একটা ফ্ল্যাটে একা থাকি। আজ রাতে বড় ঝড়-বাদল, আমার ভাল লাগছে না।

সেই জন্য? আমার ফোন নম্বর আপনি জানলেন কী করে?

জানি না তো! এখনও জানি না। আন্দাজে ছ'টা নম্বর ডায়াল করেছিলাম, নম্বরগুলো মনেই নেই এখন। আপনি রাগ করলেন?

না, রাগ নয়। আমাকে অনেক খাতা দেখতে হচ্ছে। ভীষণ টায়ার্ড।

তা হলে ঘুমোন।

শুনুন, আপনি আমার চেনা কেউ নন তো? ফোনে মজা করার জন্য পরিচয় গোপন রেখে...

না না। সে-সব নয়। আমি আসলে চাইছি, কিছু লোক আমার মতোই জেগে থাকুক আজকের রাতে। আমার কেবল মনে হচ্ছে আমি ছাড়া সারা কলকাতায় বুঝি আর-কেউ জেগে নেই।

ও-পাশে বোধহয় মেয়েটির বাবা জেগে গেছেন। এক গম্ভীর পুরুষের স্বর শুনতে পেলাম, কে রে মায়া? কোনও অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

মায়া বোধহয় মাউথপিসে হাত চাপা দিল। কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তারপর মায়া বলল, আপনার নাম, ঠিকানা কিছু বলবেন?

কেন?

বাবা বলছেন, আপনার কোনও বিপদ ঘটে থাকলে আমরা হেল্প করার চেষ্টা করতে পারি।

অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বিপদ কিছু নেই। শুধু ভয় আছে। ঘুম ভাঙালাম বলে কিছু মনে করবেন না।

আমার বাবা ডি এস পি। কোনও ভয় করবেন না।

ঠিক এই সময়ে মায়ার বাবা ফোন তুলে নিয়ে বললেন, হ্যালো, আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন?

পার্ক সার্কাস। খুব অসহায় গলায় বললাম।

বাড়িতে একা আছেন?

হ্যাঁ।

কেন, বাড়ির লোকজন কোথায় গেল?

একটু চুপ করে থেকে বললাম, আমি একাই থাকি।

মায়ার বাবা একটু গলা ঝেড়ে বললেন, ও। বয়স কত?

বেশি নয়। একুশ-বাইশ।

কী করেন?

একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি।

ঠিকানাটা বলুন।

একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। নার্ভাসও লাগছে খুব। এতটা নাটক না করলেও হত। ঠিকানা দিলে ডি এস পি সাহেব হয়তো থানায় ফোন করে দেবেন, পুলিশ খোঁজ নিতে আসবে। কত কী হতে পারে!

ঝুঁকি না নিয়ে বললাম, কাকাবাবু, মাপ করবেন। অনেক বিরক্ত করেছি।

উনি বললেন, শুনুন, আমার মনে হচ্ছে আপনি কোনও বিপদে পড়েছেন, কিন্তু বলতে সংকোচ করছেন। আমি অ্যাকটিভ পুলিশের লোক, নিঃসংকোচে বলতে পারেন। আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে পারি।

ওঁর এই সহৃদয়তা আমার ভাল লাগছিল। কিন্তু কী করব, আমার যে পুলিশের কোনও দরকার নেই! এই বৃষ্টি-বাদলার রাতে আমি কেবল মানুষের জেগে-থাকার শব্দ শুনতে চেয়েছিলাম মাত্র। হয়তো এটা ভীষণ ছেলেমানুষি। এইভাবে ফোন করে লোককে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। তবু আর তো কোনও উপায় ছিল না।

ভদ্রলোক বারবার 'হ্যালো হ্যালো' করছেন সাড়া না পেয়ে। আমার কানের পরদা ফেটে যাওয়ার জোগাড়। আস্তে করে বলতে হল—না কাকাবাবু, কোনও বিপদ নয়। কেবল ভয়। এখন ভয়টা কেটে গেছে। তারপর ফোনটা নামিয়ে রাখলাম।

বাকি রাতটা আধো-জাগা আধো-ঘুমের মধ্যে কাটিয়ে দিতে দিতে বারবার ডি এস পি ভদ্রলোকের সাহায্য করা, প্রোটেক্ট করার কথাটা মনে পড়ছিল। আমাকে কেউ রক্ষা করুক, ত্রাণ করুক এ আমার অসহ্য। আমি কি অসহায়, অবলা?

ঠিক এই কারণেই প্রভাসরঞ্জনবাবুকে আমি পছন্দ করতে পারি না। যেমন অপছন্দ আমার সুকুমারকে। এমনকী উপরওয়ালার ভূমিকা নেওয়ার একটা অস্পষ্ট চেষ্টা করেছিল বলেই বোধহয় জয়দেবকেও আমি নিতে পারিনি স্বামী হিসেবে। জয়দেবের অবশ্য আরও অনেকগুলো খাঁকতি ছিল।

সকালেও বৃষ্টি ছাড়েনি। এ বৃষ্টিতে ঝি আসবে না জানি। কাজেই সকালে উঠে ঘরদোর সারতে হল নিজেকেই। এক অসম্ভব একটানা প্রবল বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই। আমার ফ্ল্যাট থেকে রাস্তার কোনও গাড়িঘোড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে, নীচের হাঁটুজলে কিছু গরিব ঘরের ছেলে চেঁচাচ্ছে আর জলে খেলছে! কয়েক বার রিকশার ঘন্টির শব্দ হল। কাদের ঘর থেকে উনুনের ধোঁয়া আসছে ঘরে।

চালে-ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে এক কাপ কফি নিয়ে জানালার ধারে বসি। আকাশের মেঘ পাতলা হয়ে আসছে। বৃষ্টির তেজ এইমাত্র খানিকটা কমে গেল। ধরবে। অফিসে যাওয়াটা কি আজ ঠিক হবে? না গেলেও ভাল লাগে না। একা ঘরে সারাদিন। কী করি?

বেলা ন'টায় উঠে স্নান সেরে নিলাম। ভেজা চুল আজ আর শুকোবে না। কিন্তু রাতে ঘুম হয়নি, স্নান না করলে সারাদিন ঘুমঘুম ভাব থাকত। কিন্তু স্নান করেই বুঝলাম, হুট করে ঠান্ডা লেগে গেল। গলাটা ভার, চোখে জল আসছে, নাকে সুড়সুড়, তালুটা শুকনো-শুকনো। ছাতা হাতে অফিসে বেরোলাম তবু শেষ পর্যন্ত।

সিঁড়ির নীচেই প্রভাসরঞ্জন দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার জল দেখছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন, যাবেন কী করে? যা জল!

যেতে হবে যেমন করে হোক।

ট্রাম-বাসও পাবেন না। দু'টো-একটা যা চলছে তাতে অসম্ভব ভিড়। আমি একটু আগে বেরিয়ে দেখে এসেছি।

একটু ইতস্তত করছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে যদি ফিরে আসতে হয় তো যাওয়াও হল না, জল ভেঙে ঠান্ডাও লেগে গেল হয়তো।

প্রভাসরঞ্জন বললেন, খুব জরুরি কাজ নাকি?

জরুরি। একটা ফাইল ক্যাবিনেটের চাবি আমার কাছে রয়ে গেছে।

রেনি ডে-তে কি আর অফিসের কাজকর্ম হবে?

হবে।

এই বলে রাস্তাঘাট একটু দেখে নিয়ে সত্যিই বেরিয়ে পড়ি। রাস্তায় পা দিতে-না-দিতেই একটা পাতলা মেঘের আস্তরণ কাটিয়ে রোদ দেখা দিল। কী মিষ্টি রোদ! গোড়ালিডুবু জল ভেঙে, শাড়ি সামলে কষ্টে এগোতে থাকি। ঠান্ডা জলে পা দিতেই শরীরে একটা শীতের কাঁপুনি দিচ্ছে। দিক। গোটা দুই ট্যাবলেট খেয়ে নেব। ট্যাবলেট-ক্যাপসুলের যুগে অত ভয়ের কিছু নেই।

ভাগ্য ভাল, ডিপোর কাছ বরাবর যেতে-না-যেতেই লেডিজ স্পেশাল পেয়ে পেলাম।

অফিসে এসেই বেয়ারাকে দিয়েই গোটা দশেক ট্যাবলেট আনিয়ে দু'টো খেয়ে ফেললাম। তারপর চা। শরীরটা খারাপই লাগছে। সর্দি হবে।

গামবুট আর বর্ষাতিতে সেজে সুকুমার আজ বেশ দেরিতে অফিসে এল। ও আবার ম্যানেজমেন্টকে বড় একটা তোয়াক্কা করে না। অফিসে ঢুকেই ধড়াচূড়া ছেড়ে সোজা আমার টেবিলের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, দু'টো সিনেমার টিকিট আছে। যাবে? ইংরিজি ছবি।

আমি ওর বিশাল স্বাস্থ্যের চেহারাটা দেখলাম খানিক। এর আগে ওর সঙ্গে কয়েকবারই সিনেমায় গেছি। তখন সংকোচ ছিল না। সেদিন আমার ফ্ল্যাটে সেই কাণ্ড ঘটানোর পর থেকে ও আর বড় একটা কাছে ঘেঁষেনি এত দিন। লজ্জায় দূরে দূরে থাকত। আজ আবার মুখোমুখি হল।

বললাম, আজ শরীর ভাল নেই।

কী হয়েছে?

সর্দি।

ওতে কিছু হবে না। চলো, ঠেসে মাংস খেয়ে নেবে। মাংস খেলে সর্দি জব্দ হয়ে যায়।

হঠাৎ মুখ ফসকে বলে ফেললাম, আর সুকুমার জব্দ হবে কীসে?

সুকুমার দু' পলক আমাকে দেখে নিয়ে অত্যন্ত নির্লজ্জ গলায় বলল, মাংসে। যদি সেই সঙ্গে হৃদয় পাওয়া যায় তো আরও ভাল।

একবার আক্রান্ত হওয়ার পর আমার সাহস কিছু বেড়েছে। বললাম, এত দাবিদাওয়া কীসের বলো তো! বেশ তো আছি। তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো।

আমি আমার মতো নেই।

এটা অফিস, এ-সব কথাও বিপজ্জনক। তাই মুখ নিচু করে বললাম, এ-সব কথা থাক সুকুমার।

থাক। তবে এ-সব কথা আবার উঠবে, মনে রেখো।

আমি ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলাম। পুরুষেরা অসম্ভব দখলদার এক জাত।

দু'টো সিনেমার লাল টিকিট বের করে সুকুমার আমার সামনেই ছিঁড়ল কুটিকুটি করে। আমার টেবিলের উপর ছেঁড়া টিকিটের টুকরো কাগজ জড়ো করে রেখে বলল, জানতাম তুমি যেতে চাইবে না। কিন্তু আমারও তো একটা সুযোগ দরকার।

অফিসে আজ কাজকর্মের মন্দা। লোকজন বেশি আসেনি। বেশ বেলা করে দু'-চারজন এসেছে বটে, তবু বড্ড ফাঁকা ঠেকছে অফিস। নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে বাধা নেই। সত্যি বলতে কী, আমার কথা বলতে ইচ্ছেও করছিল।

বললাম, সুযোগ মানে কিন্তু দখল করা নয়। আমি কারও সম্পত্তি হতে পারিনি, কোনও দিন পারবও না।

তা হলে আমাকেই তোমার সম্পত্তি করে নাও না। চিরকাল তোমার হুকুমমতো চললেই তো হল।

হাসলাম। ছেলেমানুষ!

বললাম, ও-রকম নেতানো নির্জীব পুরুষও মেয়েদের পছন্দ নয়।

তা হলে কী হবে?

কিছু হবে না।

কীসের বাধা অলকা? তোমার স্বামীর কথা ভাবছ?

মাথা নেড়ে বললাম, না। তবে সেটাও ভাবা উচিত। এখনও তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়নি।

করে নাও।

বড় করে একটা শ্বাস ফেলে বললাম, সে অনেক ঝামেলা, দরকারও দেখি না। কিছুদিন গেলেই সে নিজেই মামলা করবে। আমি কোর্টে যাব না, এক্স পার্টি হয়ে ওকে ডিক্রি করে দেব।

সেটা অনিশ্চিত ব্যবস্থা অলকা। উনি যদি মামলা না করেন?

বয়ে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বলেতুমি অত আলগা থেকো না। কেন নিজেকে নষ্ট করছ? আমি যে শেষ হয়ে যাচ্ছি।

কী থেকে কী হয়ে গেল মনের মধ্যে।

মেঘভাঙা অপরূপ রোদের ঝরনা বয়ে যাচ্ছে চার দিকে। অফিসঘরে গনগন করছে আলোর আভা। দু'দিন মনমরা বৃষ্টির পর কী ভাল এই রোদ্দুর! কাল রাতের সেই একা থাকা ভয়ংকর ছবি মিথ্যে মনে হয়। আবার সেই বাসায় আজকেও আমাকে একা ফিরে যেতে হবে। যদি রাতে বৃষ্টি আসে ফের, তবে আবার ঘুম ভেঙে ভূতে-পাওয়া মাথা নিয়ে বসে থাকতে হবে।

হ্যাঁ, ঠিক। প্রোটেক্টার না হোক, আমার একজন সঙ্গী চাই। কাউকে না হলে বাঁচব কী করে?

সুকুমার দেখতে বেশ। তা ছাড়া বড় সরল, সোজা ছেলে! কখনও ওকে খারাপ লাগেনি। আজ অপরাহ্নের আলোয় অফিসঘরে বসে মুখোমুখি ওর দিকে চেয়ে হঠাৎ কী হয়ে গেল। ভাবলাম, কী হবে এত বাছবিচার করে! নিজেকে নিয়ে আর কত বেঁচে থাকা!

বললাম, শোনো সুকুমার, আমি ডিভোর্স চাই।

চাও? ও লাফিয়ে ওঠে।

চাই। আমার স্বামীও চায়। হয়তো ডিভোর্স পেতে কিছু সময় লাগবে।

তারপর কী করবে অলকা?

তারপর করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে সুকুমার। এক দুরন্ত অধৈর্য অনুভব করে বলি।

অলকা, যদি আমরা এক্ষুনি বিয়ে করি, তা হলে?

আমি ক্ষণকাল চুপ করে থাকি। বুকের মধ্যে নানা ভয়, দ্বিধা, সংস্কার ছায়া ফেলে যায়।

তারপর বলি, কয়েকটা দিন সময় দাও।

দিলাম। ক'দিন বলো তো?

দেখি।

একবকম কথা দেওয়াই হয়ে গেল সুকুমারকে! একটু হয়তো কিন্তু রইল, দ্বিধা রইল, তবু ওটুকু কিছু নয়। সে-সব দ্বিধা, ভয় ভেঙে সুকুমার ঠিক সাঁতরে আসবে কাছে।

রাতটা মাসির বাড়িতে গিয়ে কাটালাম। জ্বর এল রাতে। তিনটে দিন বাড়ির বার হওয়া গেল না। অল্প জ্বরেই কত যে ভুল বকলাম ঘোরের মধ্যে!

চারদিনের দিন ফের ফ্ল্যাটে ফিরে এলাম। মাসি আজকাল আর আটকে রাখে না, যেতে চাইলে এক কথায় ছেড়ে দেয়। ঢিলে-বলগার মেয়েকে সকলেরই ভয়।

দোতলার ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা জানালা হাট করে খুলে বন্ধ বাতাস তাড়াই। ধুলো-ময়লা পরিষ্কার করি। রবিবার। তাড়া নেই।

চায়ের জল চাপিয়ে এলোচুলের জট ছাড়াতে একটু ব্যালকনিতে দাঁড়াই।

কলিং বেল বাজল। এ-সময়ে কেউ আসে না। একমাত্র সুকুমার আসতে পারে। তার তর সইছে না।

কাঁপা বুক নিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই সাপ দেখে পিছিয়ে আসার অবস্থা। চৌকাঠের ওপারে জয়দেব দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ কথা ফোটে না কারও মুখে। জয়দেবের চেহারা রোদে পোড়া, তামাটে, কিছু রোগা হয়েছে। মাথার চুল এত ছোট যেন মনে হয় ক'দিন আগে ন্যাড়া হয়েছে। পরনে ধুতি আর ক্রিমরঙা সুতির শার্ট। কিন্তু ধুতিটা এমনভাবে পরেছে যে মনে হয় পাশের ফ্লাট থেকে এল। বাইরে বেরোবার পোশাক নয়।

চৌকাঠের বাইরে থেকে জয়দেব এক পা-ও ভিতরে আসার চেষ্টা করল না। দাঁড়িয়ে থেকে বলল, তুমি এখানে থাকো সে-খবর সদ্য পেয়েছি।

কী চাও?

খুব সাধারণ আলাপচারির গলায় জয়দেব বলল, কিছু চাই না অলকা। তোমার কাছে ডিভোর্সে মত দিয়ে একটা চিঠি দিয়েছিলাম, তার কোনও উত্তর দাওনি। তোমার কি মত আছে?

একটু গম্ভীর হয়ে বলি, দরজার বাইরে থেকে অত জোরে ওসব কথা বলছ কেন? ভিতরে এসো।

জয়দেব এল। কোনও দিকে তাকাল না, ঘরের আসবাবপত্র লক্ষ করল না। খুবই কুণ্ঠিত পায়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বলল, আমি নীচের তলায় প্রভাসবাবুর বাসায় উঠেছি কাল এসে।

প্রভাসের সঙ্গে জয়দেবের চেনা আছে জানতাম। তাই চমকালাম না। দরজা বন্ধ করে এসে জয়দেবের মুখোমুখি বসে বললাম, আমি খুব তাড়াতাড়ি ডিভোর্স চাই।

জয়দেব মুখখানা করুণ করে বলল, তাড়াতাড়ি চাইলেই তো হয় না! কোর্ট থেকে এ সব কেসে বড় দেরি করে। তাড়াতাড়ি চাইলে আরও আগে জানালে না-কেন? কবে কেস ফাইল করা যেত!

আমি মাথা নিচু করে বলি, শোনো, ডিভোর্স পেতে দেরি হোক বা না হোক, আমরা তো একটা এগ্রিমেন্টে আসতে পারি!

কী এগ্রিমেন্ট?

ধরো, আমরা কেউ কাউকে কোনও অবস্থাতেই দাবি করব না! পরস্পরের কোনও ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাব না!

তার জন্য এগ্রিমেন্ট লাগে না অলকা। জয়দেব বলল, আমরা সেই রকমই আছি।

কথার স্বর শুনেই বোঝা যায়, জয়দেবের মন এখন অনেক গভীর হয়েছে। জীবনে কোনও একটা সত্যবস্তুর সন্ধান না-পেলে মানুষ এত গভীর থেকে কথা বলতে পারে না। তাই আমি ওর মুখের দিকে কয়েক বার তাকালাম। ও আমাকে দেখছিল না। চোখ তুলে দেয়ালের মাঝারি উচ্চতায় চেয়েছিল। সেই অবস্থায় চেয়ে থেকেই বলল, তুমি একটি ছেলেকে পছন্দ কর শুনেছি। তাকে বিয়ে করার জন্যই কি এত তাড়া?

সত্যিকারের অবাক হয়ে বলি, না তো! আমি কাউকেই পছন্দ করি না।

সুকুমার না কী যেন নাম, শুনছিলাম। তোমার অফিসের!

ওঃ! বাস্তবিক আমার সুকুমারের মুখটা এখন মনে পড়ল। বললাম, পছন্দ নয়। তবে ওই একরকম।

ভাল।

তুমি ডিভোর্স চাইছ কেন? বিয়ে করবে? বললাম।

ও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, বিয়ে আর না। মুক্তি চাইছি, নইলে বড় কষ্ট হয়।

কষ্ট কীসের?

ওই একটা অধিকারবোধ থাকে তো পুরুষের! সেইটে মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। ডিভোর্স হয়ে গেলে একরকম শান্তি।

ও।

আচ্ছা—বলে জয়দেব কুণ্ঠিত পায়ে উঠল। বলল, উকিলের চিঠি দেব। তুমি কি অ্যালিমনি চাও?

সেটা কী?

খোরপোশ।

না, না! চমকে উঠে বলি।

আচ্ছা তা হলে—

আচ্ছা। বললাম।

দরজা খুলে জয়দেব চলে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওর পায়ের শব্দ যখন নামছে তখন আমি ঘরের মধ্যে চুলের জটে আঙুল ডুবিয়ে বসে আছি। ভাবছি। কত ভাবনা! সে যেন এক আলো-আঁধারের মধ্যে ডুবে বসে থাকা। উঠলাম না, রাঁধলাম না, খেলাম না। শুধু বসে রইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ের আঙুল হৃৎপিণ্ডে টোকা মারল। নড়ে উঠল বুকের বাতাস। সচেতন ভীতগ্রস্ততায় টের পাই—আমি কাউকেই ভালবাসি না। কাউকে নয়। কেবলমাত্র নিজেকে। আমি কোনও দিন কাউকে ভালবাসতে পারবও না।

কী করে বেঁচে থাকব আমি?

পৃথিবীতে কত দুর্যোগের বর্ষা নামবে কত বার! কত একা কাটবে দিন! কাউকে ভাল না বেসে আমি থাকব কী করে?

বিকেল কাটল। নীচের তলা থেকে অহংকারী জয়দেব এক বারও এল না খোঁজ করতে। সুকুমার টেলিফোনও করল না। বড় অভিমানে ভরে গেল বুক। সারাদিন খাইনি, স্নান করিনি, কে তার খোঁজ রাখে!

সন্ধে হল, রাত গড়িয়ে গেল গভীরের দিকে।

শরীর দুর্বল। মাথা ফাঁকা। মনটায় তদগত একটা আচ্ছন্নতা। ভূতে পেয়েছে আমাকে। উঠে গিয়ে ছারপোকা মারবার অমোঘ ওষুধের শিশিটা হাতে নিয়ে টেবিলে বসলাম। চিরকুটে লিখে রাখলাম— আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

লিখে বিছানায় শুয়ে আস্তে শিশির মুখ খুলে ঠোঁটের কাছে এনে পৃথিবীকে বললাম, ভালবাসা ছাড়া কী করে বাঁচি বলো! বাঁচা যায়? ক্ষমা করো।

ঠিক এ-সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল মৃদু সেতারের মতো। উঠলাম না। শিশিটা উপুড় করে দিলাম গলার মধ্যে।

হায়! ফাঁকা শিশি প্রেমহীন হৃদয়ের মতো চেয়ে রইল আমার শূন্য হৃদয়ের দিকে। এক ফোঁটা বিষও ঢালতে পারল না সে। অমৃতও না।

উঠে টেলিফোনটা যখন ধরছি তখন কেন যেন খুব ইচ্ছে করছিল, টেলিফোনে যেন জয়দেবের গলার স্বর শুনতে পাই।

শ্যাওলা

খচাই বুড়োকে নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা বেরিয়ে পড়ল। উঠোনে বার দু'-তিন খুব গমগম হরিধ্বনি দিয়েছিল, পাড়াটা পার হয়েই দলটা ছুটতে লাগল ঘোড়ার মতো।

নীতীন চেঁচাল, ভাল হলে...

বাকি সবাই বলল, সেরে যাবে।

নীতীন— মোটা ভুঁড়ি...

বাকি সবাই— কমে যাবে।

নীতীন— মরল কে?

বাকি সবাই, দোবারের বাপ।

ঝাঁকুনির চোটে খাটিয়ার ওপর খচাই বুড়োর মোটা শরীরটা দাপায়। ইব্রাহিমপুর রোড ধরে সেন্ট্রাল রোডের দিকে ছুটতে ছুটতে চৌদ্দ জোয়ান এক তালে বলতে থাকে, ভাল হলে সেরে যাবে, মোটা ভুঁড়ি কমে যাবে...মরল কে? দোবারের বাপ। বলো ভাই হরি বোল, জোরসে বলো হরিবোল...আউর থোরা হরিবোল...প্রেমসে বলো হরিবোল...বাঁয়ে চেপে হরিবোল...বেজায় ভারী...হরিবোল...

সমর খই ছড়াতে ছড়াতে খ্যা-অ্যা করে হেসে চেঁচিয়ে বলল, গোপলা, অ্যাই গোপলা!

গোপাল খাটিয়ার পায়ের দিকে, বাঁ ধারে। ভাল টানতে পারছে না, কুঁজো হয়ে কেতড়ে খাটিয়ার টানে এগিয়ে যাচ্ছে কোনওরকমে। হ্যাঁদানা গলায় বলল, কীরে, চিল্লাচ্ছিস কেন?

খচাই বুড়ো এখন যদি পটাং করে একখানা লাথ ঝাড়ে তবে কী করবি?

সুহৃদ গামছাটা কোমরে একটু টাইট দিয়ে বলল, ফুটু, দোবার শালা কী করল জানিস? খুচরো পয়সাগুলো আমরা মেরে দেব ভয়ে কৌটোটা নিজের জিম্মায় রাখল, দেখলি তো! আমি দেখে তাজ্জব মাইরি, শালা নিজেই দু'মুঠো পকেটে পুরেছে।

ফুটু বলল, যাঃ, ও-সব বলিসনি। দোবারের মাইরি এনথু শর্ট হয়ে গেল। খচাইয়ের কাছ থেকে কিছু ঝাঁক মারত।

সুহৃদ পেছু ফিরে দেখল, দোবার বাজারের সামনে সেন্ট্রাল রোডের মোড়ে ঠনাঠন পয়সা ওড়াল তিন খাবলা। দেখে সুহৃদ বলল, ইঃ মাইরি, পয়সাগুলো—

পোস্ট অফিসের সামনে কাঁধ বদল। নতুন চারজন দৌড়ের মাথাতেই টপাটপ খাটিয়া ধরে নেয়। কাঁধ ম্যাসাজ করতে করতে গোপাল একটু পিছিয়ে এসে দোবারকে বলল, তোরই তো আজ অকেশন ফ্রেন্ড, পয়সা ওড়াচ্ছিস প্রেমসে। একটা সিগারেট ছাড়।

দোবার গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে পকেট থেকে নতুন প্যাকেট বের করে খুলে একটা সিগারেট দিয়ে বলল, দ্যাখ গোপাল, আজ কিন্তু একটু সিরিয়াস হওয়া দরকার, ডেথ কেস হলে ইয়ার্কি চলে না।

আমি এক বারও মুখ খারাপ করেছি, বল?

তোরটা শুনিনি, কিন্তু বাকিরা করছে।

গোপাল সিগারেট ধরিয়ে বলল, মাই ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। দু'-চারটে স্লিপ করে বেরিয়ে যায় তো

স্লিপ অফ টাং। তোর বাপকে খাটো করার জন্য নয়।

না, তুই ঠিক দোস্ত আছিস আমার। দোবার বলল।

শোন দোবার, আমি কিন্তু এইট বি বাস পেলে উঠে যাব। আবার গোল পার্কে নেমে পড়ব।

না মাইরি। তুই উঠলে বাকিরাও উঠবে। মড়া কি হেঁটে যাবে নাকি তারপর?

ঠিক আছে দোস্ত, কিন্তু শ্মশানে গিয়ে সাঁটাবে তো?

বলেছি তো।

সেন্টুবাবুর মতো একটা রসগোল্লা আর দুটো সিঙ্গাড়া নয় কিন্তু।

না রে, ভরপেট। দোবার ভরসা দেয়। পয়সার কৌটোটা দেখিয়ে বলে, আর মাল ছড়াচ্ছি না। বেপাড়ায় ছড়িয়ে শালা লস। তার চেয়ে দোস্তদের খাওয়ালে পুণ্য হবে।

দলটা উড়ে যাচ্ছে। ওঠা-পড়া করছে স্লোগান, ভাল হলে সেরে যাবে, মোটা ভুঁড়ি কমে যাবে...মরল কে? দোবারের বাপ...বলো হরি হরিবোল...জোরসে বলো হরিবোল...ফিনসে বলো হরিবোল...প্রেমসে বলো হরিবোল...

রাজেশ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চেঁচায়, খচাই বুড়ো...মুখে নুড়ো...

অমিতাভ ধমক দিয়ে বলল, অ্যাই, নো ব্যাড সাউণ্ড।

দোবার খানিক পিছনে। আওয়াজটা শুনে গম্ভীর হয়ে গোপালকে বলল, দেখলি? এইসব হচ্ছে আমার দোস্ত।

গোপাল দার্শনিকের মতো গম্ভীর স্বরে বলল, অন্যের কেস হলে তুইও বলতিস।

কিন্তু দোস্তের বাপ মরলে বলতাম না।

সে অবশ্য ঠিক। রাজেশটার এনথু একটু বেশি।

ঢাকুরিয়াতে কাঁধ বদল। তারপর গড়িয়াহাটায়, ত্রিকোণ পার্কে, সবশেষে রাসবিহারীর মোড়ে।

গোপাল আর কাঁধ দেয়নি। অনেক পিছিয়ে হাঁটছে। খুব খিদে পেয়েছিল বলে একটা দোকানে কোয়ার্টার রুটি কিনেছিল। সেটা অল্প অল্প খেতে খেতে চারদিক দেখতে দেখতে যায়। প্রিয়ায় হেমার মুখ ঝুলছে। একটু দাঁড়িয়ে দেখল। হেমার কি এখনও বাজার আছে? রাজেশের খুব ছিল একসময়ে, এখন অমিতাভ টপ যাচ্ছে। রুটিটা খেতে বেশ লাগে। মিষ্টি-মিষ্টি। কাঁধে বড় ব্যথা। রাজেশ আর অমিতাভর কথা ভেবে পা চলতে চায় না। বেশ আছে মাইরি ফিল্মস্টাররা, হেমার নাকের শ্বাস গালে লাগে ওদের। গোপালের দোস্তদের দলে যে রাজেশ আছে তার চুলের স্টাইল রাজেশ খান্নার মতো বলে সে রাজেশ হয়ে গেছে, আসল নাম রামকুমার। অমিতাভরও একটা আসল নাম কী যেন আছে—মনে পড়ছে না—তবে অমিতাভর সব পার্ট হুবহু নকল করতে পারে বলে ওর নামই হয়ে গেছে তাই।

দেশপ্রিয়র সামনে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু দেখে নেয় গোপাল। রোগাই সে। কালোও। কিন্তু এতেও আটকায় না। কিন্তু মুখখানাই মেরে দিয়েছে। গালে খোঁদল, হনুর হাড় উঁচু। তবে তার চোখ ভাল। কয়েক বার ধরেছিল ফিল্মের লোককে। পাত্তা দেয়নি।

রুটিটার শেষ কামড় খেতে খেতে গোপাল সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে উঠে পড়ল।

কেওড়াতলায় মড়ার গাদি লেগেছে। সব চুল্লি গনগন করে জ্বলছে সন্ধের মুখে। কিছু খাটিয়ায় মড়ারা চিৎপাত হয়ে অপেক্ষা করছে।

দেখেশুনে ফুটু বলল, জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে মাইরি!

শিবাজী খচাই বুড়োর খাটিয়ায় ঠেক দিয়ে বসে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলল, ও-সব বলিসনি। টুপি বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে।

সমর খ্যা-অ্যা করে হাসে, টুপি কী রে! দস্তানা বল। গেলবার সেন্টুবাবু শীতকালে একদিন

ডানহাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা নিরোধ পরে বসে ছিল দেখিসনি? আমরা জিজ্ঞেস করাতে বলল, বড্ড শীত পড়েছে ভাই কী করব বল!

হ্যা-হ্যা হাসি মিলিয়ে যেতে না যেতেই হন্তদন্ত হয়ে অমিতাভ এসে বলল, হিটারে একটা বডি টোস্ট হচ্ছে, আর পাঁচটা লাইনে আছে।

হিটার! হিটার কোথায় পেলি? শিবাজী সোজা হয়ে বসে।

ইলেকট্রিক বে ইলেকট্রিক। বৈদ্যুতিক চুল্লি। সমর বলে দেয়।

ফুটু বিরক্ত হয়ে বলল, এদিকে তো হাউস ফুল! দোবার, তোর বাপ ভাল দিনে পেঁয়াজ কেলিয়েছে। কলকাতায় কি মড়ক লাগল নাকি দোস্ত, এত ডেডবডি জীবনে দেখিনি।

অমিতাভ ঘাটবাবুর অফিসে শবদাহের টাকা জমা দিয়ে এসেছিল। রসিদটা দোবারের হাতে দিয়ে বলল, লে দোবার, তোর বাপের টিকিট।

সমর চোখ মেরে বলল, টিকিট ব্ল্যাকে কিনলি?

দোবার হাসতে যাচ্ছিল, কী খেয়াল হতে খুব গম্ভীরভাবে বলল, তোরা মাইরি ছোটলোক।

এদের মধ্যে আদিনাথ কিছু গম্ভীর আর কাজের লোক। শ্মশানে এসেই সে ধাঙ্গড়দের সঙ্গে শলা-পরামর্শে লেগে গিয়েছিল। এখন ঘুরে এসে বলল, দোবার, ধাঙ্গড়দের গোটা পনেরো টাকা দিলে একটা উনুন খালি করে দেবে।

দোবার একটু মিইয়ে গিয়ে বলল. মাইরি, একস্ট্রা টাকা দিয়ে দেয়নি বাড়ি থেকে। ঘাট খরচার ওপর দু'-পাঁচ টাকার খুচরো যা ছিল।

অমিতাভ গলা বাড়িয়ে এগিয়ে এসে বলে, দোবার, শালা বাপের ডেডবডি সামনে রেখে গুল ঝাড়ছিস! আদিদা ওর পকেট সার্চ করো, কম সে কম ত্রিশ টাকা বেরোবে।

দোবার প্যান্টের পকেট চেপে ধরে তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে বলে, এ অন্য টাকা। যদি দিয়ে দিই তো তোদের খাওয়া মার যাবে।

ছোড় বে। সমর ধমক দিয়ে বলে, দোবারের বাপ কিছুক্ষণ কিউ দিয়ে থাকুক বরং। মরা মানুষের অত তাড়াহুড়োর কী আছে! ধাঙ্গড়দের দেওয়ার চেয়ে আমরা খেলেই বরং লাভ বেশি।

ফুটু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, দোবার, কোম্পানির টাকা নয় তো ত্রিশ টাকা পেলি কোথায়?

সে যেখানেই পাক, তোর বাবার কী? সমর রুখে উঠে বলে, কার কোত্থেকে টাকা আসে তা নিয়ে কথা তুললে ঝাপড় খাবি।

ফুটু পিছিয়ে যায়। সমরটা মারকুট্টা আছে। আদিনাথ দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, খিচাং করিস না, খাবি না তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবি ঠিক কর আগে। যদি খাস তো ধাঙ্গড়দের ঘুষ দেওয়া হবে না, উনুন পেতে ঢের দেরি। আর যদি না খাস তবে তাড়াতাড়ি মড়া পুড়িয়ে বাড়ি যাওয়া যায়।

রাজেশ অন্য একটা খাটিয়ার চারধারে মেয়েদের ভিড় দেখে এগিয়ে গিয়েছিল। একটা কলেজে-পড়া অল্পবয়সি মেয়ে সেই খাটিয়ায় শোয়ানো। ফুলে ফুলে ঢেকে আছে মেয়েটা। মুখখানা টুল টুল করছে সুন্দর। তাকে শেষ দেখা দেখতে এসেছে তার কলেজের মেয়েরা। দু'-তিনজন কাঁদছে, ফুলের মালা বা তোড়া দিচ্ছে! ফুলের ওপর ফুল।

রাজেশ জ্বালা-ধরা চোখে মৃত মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে। একটু বাদেই চমৎকার ওই মেয়েটা আংরা হয়ে যাবে। পুরো ছাই। কোনও মানে হয় না এই অপচয়ের।

শ্মশানের হরেক মড়ার শ্মশানবন্ধুরা এসে ভিড় করতে লেগেছে যুবতী মেয়েটার খাটিয়ার চারদিকে।

ইস!

আহা রে!

চোখ দু'খানা দ্যাখ, কী সুন্দর!

কালো রোগা মতো একটা মেয়ে বুকে বইখাতা বাঁ হাতে চেপে ডান হাতে চোখ কচলাচ্ছে। শ্মশানের ধোঁয়া আর ছাই চোখে গেছে বুঝি! রাজেশ মেয়েটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আলগাভাবে জিজ্ঞেস করে, কীভাবে মারা গেল মেয়েটা? অসুখ করেছিল?

কালো মেয়েটা মুখ ঘুরিয়ে রাজেশকে একটু দেখে নেয়। তারপর খুব হেলাফেলার মতো করে বলে, আগুন লেগেছিল।

কীভাবে?

দেয়ালির দিন। পিদিমের আগুনে শাড়ির আঁচল ধরে যায়।

ও। কিন্তু দেয়ালি তো অনেক আগে চলে গেছে।

মেয়েটা লাল চোখ রুমালে মুছে বলে, চার মাস হাসপাতালে ছিল। সিনথেটিক শাড়ি ছিল, পুড়ে চামড়ায় বসে যায়।

রাজেশ আর-একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, কিন্তু মুখে তো পোড়ার কোনও স্পট নেই।

না। কোমর পর্যন্ত ধরে গিয়েছিল। পরে ঘা হয়ে যায়।

আপনি কোন কলেজে?

বাসন্তী দেবী। ইস এখানে যা ধোঁয়া।

ফাঁকায় যাবেন? চলুন না!

রাজেশ নিজের চেহারা সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত। চুলের কায়দাটা বহুদিনে রপ্ত করেছে। তা ছাড়া বেশ লম্বা সে, স্বাস্থ্য ভাল, মুখখানায় খান্নাজির আদল আসে বলে সবাই বলে। তাই সে একটু সাহস করে বলে ফেলল কথাটা।

মেয়েটা ভিতু। এক বার কটমট করে তাকাল, তারপর একটা মেয়ের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজেশ একটু হাসবার চেষ্টা করে। ফেব্রুয়ারির শুরুতেও এবার তেমন গরম নেই। বরং ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। টান বাতাসে চামড়া শুকিয়ে কটকটে হয়ে আছে। হাসতে গিয়ে রাজেশের ঠোঁট ফেটে জিভে রক্তের নোনতা লাগল।

মরা মেয়েটাকে একটুক্ষণ জ্বালা-ভরা চোখে দেখে রাজেশ। কী সুন্দর। বাড়ি থেকে রওনা করার আগে খুব সাজিয়ে দিয়েছে। মুখে পাউডার, লিপস্টিক, চোখে কাজল, সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ানো। বালিশে ফুলের ফ্রেমে ভরা ভরন্ত মুখ। ঠোঁট পুরন্ত, টানা চোখ, থুঁতনির খাঁজটুকু পর্যন্ত নিখুঁত। এত সুন্দর মেয়েও ছিল কলকাতায়! ফিল্মে নামতে পারত তো!

কাছে-পিঠে একটা উনুন খুঁচিয়েছে ধাঙ্গড়। মেলা ছাই এসে পডছে গায়ে। আগুনের হলকা আসছে, চাপাচাপি ধোঁয়া।

সমর ডাকল, রাজেশ, আই বে রাজেশ।

বোল বে।

বাপের অনারে দোবার ফিস্টি দিচ্ছে। চলে আয়।

রাজেশ যখন ভিড় থেকে বেরিয়ে আসছিল তখনও তার মনে হল. মরা মেয়েটা বড় টানছে। আর-একটু দাঁড়িয়ে গেলে হত।

ঠিক হল বলাই আর শুভাশিস মড়া ছুঁয়ে বসে থাকবে, বাদবাকিরা রেস্টুরেন্ট থেকে ফিরে এলে তারা যাবে। বলাই গজগজ করছিল, কাজেব বেলা বলাই-বলাই আর মজার বেলা নিজেরা।

সমরের তাড়া খাওয়ার পর থেকে ফুটু তেতে ছিল। বলাইয়ের কথা শুনে গরম হয়ে বলল, শুয়োরের বাচ্চা, ফচফচ করবি তো লাথি খাবি।

বলে পা তুলেও ছিল। অমিতাভ তাকে টেনে ধরে বলল, ছোড় বে। এই বলাই, মুখ খুলতে বারণ করা হয়েছে না তোকে!

বলাই কিছু ভিতুগোছের। খুব রেগেমেগে তাকিয়ে রইল ফুটুর দিকে। কথা বলল না।

শ্মশানের ফটকের উলটোদিকে নোংরা দোকানঘর। সেখানে কয়েকজন শ্মশানবন্ধু বসে ছোট দোকানঘরে জায়গা কম ফেলেছে। এরা অবশ্য কেউ বসল না।

সমর বলে, চারটে করে সন্দেশ দিয়ে শুরু কর দোবার।

শুরু মানে? দোবার চোখ পিটপিট করে বলে, ব্ল্যাকমানি নাকি বে? পার হেড পাঁচসিকে বাজেট। খেয়াল রেখে যা খুশি খা।

পাঁচসিকে? ধুস! সুব্রত বলেই বেঞ্চে বসে পড়ে। এতক্ষণ সে বেশি কথা বলেনি। বলেও না। তার চেহারাটা বিশাল। ব্যায়াম করে করে চেহারা বাগিয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি বেশি রাখে না, স্বভাবটাও ঠান্ডা। সারা দিন তার শরীর নিয়ে চিন্তা।

আদিনাথ লোক গুনছিল। বলল, এখানে তো আমরা ন'জন আছি দেখছি। বলাই আর শুভাশিস ওখানে। আর-এক জনের হিসেব কই? বারো জন ছিল তো!

গোপাল! ফুটু চেঁচাল, গোপাল শালা কেটেছে।

সুহৃদ বলল, কাটেনি। কোথায় মাজাকি করছে। আসবে ঠিক।

রাজেশ কথা বলছিল না। মনটা ভীষণ উথাল-পাথাল করে। দুটো সন্দেশ সমেত একটা নোংরা প্লেট তার হাতে ধরিয়ে দিল আদিনাথ। একটা সন্দেশ মুখে তুলেই রাজেশ বুঝল, তার খেতে ইচ্ছে করছে না। এক কামড় সন্দেশ মুখে আটার দলার মতো আঠা-আঠা আর বিস্বাদ ঠেকছে। থুঃ করে সেটা রাস্তায় ফেলে রাজেশ দেড়খানা সন্দেশের প্লেটটা সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, তুই খা।

তুই?

খাব না।

কেন?

ভাল লাগছে না। আদিদা, একটা সিগারেট দাও।

সিগারেট ধরিয়ে দোকানঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাজেশ। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মড়া-পোড়া বাতাসে খুব বড় করে শ্বাস ছাড়ে। হাঁফ ধরে যাচ্ছে কেন? বুকটা হঠাৎ খালিখালি লাগছে কেন? আই বে! হল কী?

একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা হয়। বুকে নয়, শরীরে নয়। তবু বুকেই। শরীরেই। ওই সুন্দর মেয়েটা আংরা হয়ে যাবে? পুড়িয়ে ফেলবে ওকে?

জিভ দিয়ে ঠোঁটের ফাটা জায়গাটা চেটে নেয় রাজেশ। বুভুক্ষুর মতো সিগারেট টানে। অভ্যাসবশে চুলটা ঠিক করে নেয়। মরা মেয়েটা তার চেহারাটা দেখল না। দেখবেও না। মেয়েটা নেই হয়ে যাবে।

হঠাৎ একটা অমানুষিক ইচ্ছে হল তার, গিয়ে মরা মেয়েটার কানে কানে বলে আসে, আই লাভ ইউ।

॥ দুই ॥

তুমি আমাদের কাছে একটা ভিয়েতনাম চেয়েছিলে। তোমাকে তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তুমি ভেবেছিলে লং মার্চ করবে। সে-আয়োজনও করা গেল না শেষ পর্যন্ত। শেষে কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তুমি অন্তত একটা গোষ্ঠী-বিপ্লব করার কথা ভাবতে। সে-পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে গেল। অবশেষে ফেব্রুয়ারির এই বাসন্তী সকালে হারাধনের দোকানে বসে তুমি ওমলেট খাচ্ছ। ওমলেট খাওয়া ছাড়া

আজ আর আমাদের কী-ই বা করার আছে হিরণ্ময়? একাত্তরে চিড়িয়ার মোড়ের কাছে পুলিশের গুলি থেকে বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছিলে, মনে আছে? আজ যে মুরগির ছানাটা ডিম ফুটে বেরোতে পারল না তাকে বরং সেই দিনটির স্মৃতির প্রতি উৎসর্গ করো, তারপর খাও।

এ-সব কথা হিরণ্ময়ের উদ্দেশে হিরণ্ময় নিজেই বলে।

বাজারের দিক থেকে কীর্তনের শব্দ আসছে। আজ কিংবা কাল কবে যেন শিবরাত্রি। কাল রাত থেকে অখণ্ড কীর্তন চলছে। ওমলেটটা খেতে ভাল লাগছিল না হিরণ্ময়ের। ভাজা ভাল হয়নি, পুরু ওমলেটের ভিতরে কাঁচা থকথকে ডিমের ক্বাথ। শালা হারাধনকে একটা থাপ্পড় কষাতে হয়।

ডিমে মাখা নোংরা প্লেটটা সরিয়ে কাচের গেলাসের সবটুকু জল খেয়ে নেয় হিরণ্ময়। বমি-বমি ভাব আসছে। ঘেন্না-ঘেন্না করছে ভিতরটা। মুখ রুমালে মুছে সে অস্ফুট স্বরে বলে, বলাই, চা দে।

প্লেটটা নিতে এসে বলাই বলল, খেলেন না হিরুদা?

হিরণ্ময় চাপা স্বরে বলে, তোর বাপকে খাওয়াস। চা দে তাড়াতাড়ি।

বলাই এমনিতেই ভিতু, তার ওপর হিরণ্ময়কে আরও এককাঠি ভয় খায়। সবাই জানে হিরণ্ময় বিস্তর লাশ ফেলেছে, পুলিশ মেরেছে। "এখনও ওনার তলপেটে লুকোনো অস্ত্র থাকে" বলে সবাই।

বাপের কথায় বলাই রসিকতা ভেবে হি-হি করে হাসল। সে হাসিতে অবশ্য হিরণ্ময়কে খাতির দেখানোর ভাবও ছিল একটু। আর বাপ তুলে কেউ গালাগাল করলে বলাই একটু খুশিই হয়। বেশ হেসেখেলে তার দিন যাচ্ছিল, মাথা নেই বলে তার লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সারা দিন চরকিবাজি করে বেড়াত। ঠিক সেই আনন্দের দিন শুরু হতেই তার বাপ হারাধন তাকে ধরে এনে নিজের দোকানের বয় বানিয়ে আটক করল। ছেলেকে চাকরের কাজে লাগানো নিয়ে কেউ কথা তুললে হারাধন অম্লানবদনে বলে, এ ছেলেটা একটু বুরবক আছে, লেখাপড়া হল না, তাই কাজে লাগিয়েছি। নইলে বখে যাবে। এইসব শুনে বলাইয়ের বড় রাগ হয়। ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা তাকে 'গোবর গোবর' বলে বলে তার নামই হয়ে গেল গুবরে বলাই। বন্ধুরা তাকে হ্যাটা করার জন্যই বলে, বলাইয়ের ট্রানজিস্টার শর্ট আছে। বলাই জানে এ-সব নাহক বলা। তার নিজের বুদ্ধি কিছু কম আছে বলে তো তার মনে হয় না।

হিরণ্ময়ের প্লেটটা ধুতে নিয়ে যাওয়ার সময় একটু আড়াল হয়ে সে কাঁচা ডিমটুকু প্লেট থেকে ছেঁচে নিয়ে খেয়ে ফেলল। এই সময়টায় তার বড় খিদে পায়।

বড় রাস্তাটা চওড়া হচ্ছে, তাই দোকান ভাঙার নোটিশ পড়ে গেছে। হারাধনের মাথায় এখন হাজার চিন্তা। আগে কথা ছিল দোকান ভাঙা হলে অন্য জায়গায় পাকা দোকানঘর দেওয়া হবে। তারপর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও উঠেছিল। তারপর এখন নাকি সাব্যস্ত হয়েছে বে-আইনি দোকানপাটের জন্য কিছুই দেওয়া হবে না। সব দোকানদার মিলে ইনজাংশন বের করেছিল বটে, সেজন্য রাস্তাটা চওড়া হয়ে এসে মাত্র হাত চল্লিশেক দূরে থমকে গেছে। কিন্তু ইনজাংশনও এবার উঠল বলে। মসৃণ, চওড়া কালো রাস্তাটা এসে দোকানপাট ভুঁয়ে মিশিয়ে বেরিয়ে যাবে এবার। হারাধন তাই আজকাল ভাল কথাতেও রেগে ওঠে। কত জনার সঙ্গে যে ঝগড়া লাগছে তার রোজ রোজ। বলাই দিনের মধ্যে বার দশেক চড়চাপড় লাথি আর চুলে টান খাচ্ছে।

হারাধনের শলা-পরামর্শের শেষ নেই। দিনরাত নানা রকম লোকজনের সঙ্গে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর। এখনও একজন র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া শেয়ালের মতো মুখওলা লোকের সঙ্গে বকবক করছে। বলাই গিয়ে বলল, হিরুদার ওমলেটটায় গড়বড় ছিল।

হারাধন একবার কটমট করে তাকায় বলাইয়ের দিকে। তারপর একটু নরম হয়ে হিরণ্ময়কে বলে, কী হয়েছিল?

হিরণ্ময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে উদাস স্বরে বলে, কিছু না। এই বলাই, তোকে কিছু বলতে বলেছি?

বলাই অবাক হয়ে বলে, বাবাকে খাওয়াতে বললেন না?

হারাধন ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যই বলল, যাঃ যাঃ। শুয়োরটা একেবারে ইয়ে।

বলে আবার শেয়ালমুখোর সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

বাজারের দিক থেকে অষ্টপ্রহর কীর্তনের শব্দ আসছে। দিন নেই রাত নেই চলছে তো চলছেই। মাথা ধরে যায়, স্নায়ু অবশ হয়ে আসে। রামের নাম নেই, কৃষ্ণ বা হরির নাম নেই, একপাল কীর্তনিয়া কেবল মড়া-কান্নার মতো হা-আ-আ হো-ও-ও করে চেঁচিয়ে যাচ্ছে খোল কত্তালের শব্দ করে। এক দলের পর আর-এক দল জায়গা নিচ্ছে। কিন্তু গান পালটাচ্ছে না।

কীর্তনের শব্দ বড় অস্বস্তিকর হিরণ্ময়ের কাছে। যখন সে ছোট ছিল তখন জ্যাঠতুতো দাদা মল্লিনাথ টাইফয়েডে মারা যায়। মৃত্যুতে পুষ্করা দোষ হয়েছিল বলে পুরুতের বিধানে বাড়ির একটা ফলন্ত গাছ কেটে ফেলতে হয়। শিবযজ্ঞ নারায়ণযজ্ঞ হয় আর সে সময়ে অষ্টপ্রহর কীর্তন বসেছিল বাড়িতে। মল্লিনাথের সঙ্গে হিরণ্ময় নিজেও টাইফয়েডে পড়ে। পাশাপাশি বিছানায় দুই ভাই তখন শুয়ে শুয়ে কত খাওয়ার গল্প করেছে আর মুখের ঝোল টেনেছে। নির্দোষ বার্লি ছাড়া কোনও খাবার জুটত না তখন।

মল্লিদাদার সঙ্গে এমনিতে খুব একটা ভাব ছিল না হিরণ্ময়ের। জ্যাঠামশাইয়ের অবস্থা তখন বড় খারাপ, একবেলা ভাত জোটে তো অন্যবেলা উপোস। সেই অবস্থায় মল্লিকে পড়াশুনোর জন্য হিরণ্ময়দের বাসায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু মল্লিদাদার প্রতি বাড়ির কারও মায়ামমতা ছিল না একরতি। হিরণ্ময়দের বাড়িতে বড় কষ্ট পেয়েছিল সে। ফাইফরমাস খাটত, কাপড় কাচত, বাজারহাট করত, এমনকী কোনও কোনও দিন ঝি না এলে বাসন পর্যন্ত মেজেছে। ছাতা ছিল না বলে বৃষ্টিতে ভিজত, শীতবস্ত্র ছিল না বলে ঠান্ডায় কষ্ট পেত। হিরণ্ময়রা সেই ছেলেবেলায় মল্লিদাদাকে চাকরের চেয়ে বেশি মনে করত না। দাদা বা আত্মীয় বলে ভাবতে কেউ তো শেখায়নি।

মল্লিনাথের টাইফয়েড হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে হিরণ্ময়ও পড়ল জ্বরে। বেঘোরে জ্বর আর দাস্ত। মল্লিনাথের বিছানা ছিল মেঝেয়, পাশের খাটে হিরণ্ময় শুত, রাতে মা এসে হিরণ্ময়ের পাশে শুত, মল্লিনাথ থাকত একা বিছানায়। তার ওপর প্রতি দিন সকালে ঝি এসে যখন ঘর ঝাঁট দিত মুছত তখন মল্লিকে বিছানা ছেড়ে রোগা দুর্বল শরীরে উঠে বসে থাকতে হত খাটের একধারে। আবার বিছানা পাতা হলে শুত। হিরণ্ময়ের জন্য বেডপ্যানের ব্যবস্থা হল, কিন্তু মল্লিনাথকে যেতে হত পায়খানায়। রোগের খবর পেয়ে জ্যাঠামশাই জেঠিমা এসেছিলেন বটে, কিন্তু ছেলের জন্য এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করার সাধ্য তাঁদের ছিল না।

তবে সেই রোগশয্যাতেই পাশাপাশি থেকে মল্লিদাদার সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গিয়েছিল হিরণ্ময়ের। জ্বরের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার পর দু'জনেই টানা শুয়ে থাকত তখন আর দিন-রাত ক্ষীণ স্বরে গল্প করত। বেশির ভাগই খাওয়ার গল্প।

মল্লির জ্বর নামল না। প্রায় বিশ দিন রোগে ভোগার পর এক দুপুরে সে হিরণ্ময়কে বলল, আমার সব কেমন কেমন লাগছে বুঝলি হিরু।

কেমন?

সে ভারী অদ্ভুত। মাঝে মাঝে যেন শরীর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছি।

যাঃ!

হ্যাঁরে, আর খুব মরা মানুষের স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নও নয়, জেগে জেগেই দেখতে পাই।

তোমার ভয় করে না?

ভয় না। কেমন যেন লাগে।

বিকেলের দিকে মল্লিদাদার জ্বর ছেড়ে গেল। বেশ ঝরঝরে দেখাচ্ছিল তাকে। একবার বলল, কাল ভাত খাব। কিন্তু সেই রাতেই হিক্কা তুলতে লাগল মল্লি। ডাক্তার এসে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হিরণ্ময় দেখে মেঝেতে বিছানা নেই, মল্লিদাদা নেই। সব ফরসা। কান্নার

শব্দ হচ্ছিল না, তবে বাড়িটা দম বন্ধ করে ছিল যেন। পরে শুনেছে মল্লির মৃত্যুতে সে ভয় পাবে বলে বাড়িতে কান্নাকাটি বারণ ছিল।

মল্লির মৃত্যুতে পুষ্কর দোষ হয়েছিল। সেই দোষ কাটাতে যত কিছু অনুষ্ঠান হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাঙ্ঘাতিক ছিল কীর্তন। সেই কীর্তনের শব্দ আজও হিরণ্ময়ের শরীরে আর মাথায় বাসা বেঁধে আছে। কীর্তন শুনলে বড় মন খারাপ হয়ে যায়। টাইফয়েডের ঘোরে আর মল্লিদাদার মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় টানা তিন দিন কীর্তন শুনতে হয়েছিল তাকে।

ওমলেট আর চায়ের দাম দিয়ে হিরণ্ময়ের কাছে খুব বেশি অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু ভাবনারও কিছু নেই। টাকা আসবে। টাকা দেওয়ার লোক আছে।

ভুল হোক, সাচ্চা হোক একটা বিপ্লব তো হয়েছিল হিরণ্ময়! কোন বিপ্লব সাচ্চা তা কে বলবে? আর যদি বলেই কেউ তো সে শুয়োরের বাচ্চা নিজেই কেন করল না কিছু? আমরা তো মায়ের খোকা হয়েই রয়ে গেলাম চিরকাল। দেশবাসীকে ক্ষমা করো হিরণ্ময়, না পারো তো উপেক্ষাই করো। তোমার আঙুলের নখের নীচে নীল ময়লা, গালে দশ দিনের ঝুড়ো দাড়ি। সেই কবে থেকে টেরিনের একটা প্যান্ট রোজ পরছ, কাচা হয়নি বলে সেটা ময়লা হয়ে হয়ে আসল রং চাপা পড়ে গেছে কবে। গায়ে ছাপা খদ্দরের হাওয়াই শার্টটায় তেলচিটে পড়ে গেল, তার ওপর দুটো বোতাম নেই বলে বুকটা হাঁ করে খোলা। কতকাল চুল ছাঁটোনি! রুক্ষ চুল ঘাড় ছাড়িয়ে নেমেছে, এবার জটা বাঁধবে। দু' পায়ের জুতো জোড়া ধুলোকাদা মেখে, চামড়া ফেটে কী হয়েছে দ্যাখো। মোজা থেকে চামসে গন্ধ ছড়ায়। অজানা লোক দেখে ভাবে পাগল।

লোকের আর দোষ কী বলো! রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একা একা বিড় বিড় করে বকো, তা দেখলে পাগল ভাবে না তো কি? সারা দিন নিষ্কর্মার মতো ঘুরে বেড়ানো, রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা— এ-সব তো কেজো লোকের লক্ষণ নয়।

তোমার সমস্যাটা আমরা বুঝি হিরণ্ময়। তুমি চেয়েছিলে নিজের মনের মতো একটা দেশ তৈরি করতে। আমরা তোমার দেশবাসীরা তোমাকে তা করতে দিইনি। মনের মতো দেশ তৈরি করতে পারোনি বলে এ দেশের প্রতি না আছে তোমার কোনও টান, না আছে মমতা। বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেলে তুমি ভেবেছ, এ দেশে আমি কেন কোনও কাজ করব? চাকরি করতে, গৃহস্থালী করতে আজকাল তোমার বড্ড ঘেন্না করে। কিন্তু সে-কথা কেউ বোঝে না। অজানা লোক তোমাকে ভাবে নিষ্কর্মা পাগল।

দীপক পালিত নামে সহযোদ্ধা একটি ছেলে এক বার বলেছিল, হিরু, তুই যা নোংরা থাকিস লোকে পাগল ভাববে, সিরিয়াসলি নেবে না তোকে। বরং একটা কালো চশমা পরিস, তা হলে খানিকটা মিসটিরিয়াস দেখাবে।

হিরণ্ময় হেসে জবাব দিয়েছিল, কালো চশমার বিপদ আছে, লোকে গোয়েন্দা ভাবতে পারে।

দীপক বলেছিল, দূর, গোয়েন্দারা বড় একটা কালো চশমা পরে না। তাতে গোয়েন্দার মতোই দেখায় যে। কেবল সিনেমা আর বাংলা ফিল্মে কালো চশমার গোয়েন্দা দেখা যায়।

গোয়েন্দা সম্পর্কে দীপকের ধারণা ছিল পরিষ্কার। তার পুরো বংশই ছিল পুলিশের লোক। কাকা আই-বি, বাবা সার্কেল অফিসার। তিন পুরুষে ওরা পুলিশ। বিপ্লবের ঝামেলা মিটে গেলে দীপকও পুলিশে ঢুকে গেছে বলে শুনেছে হিরণ্ময়। বহুকাল দেখা হয় না। তবে সেই থেকে পকেটে একটা কালো চশমা রাখে সে। দরকার মতো চোখে পরে নেয়।

পুরনো বাজার ভেঙে রাস্তা চওড়া হচ্ছে এখানে। স্টিম রোলার চলছে, ইট ভাঙছে কুলিরা। আলকাতরা গলাবার তীব্র গন্ধ উঠছে। রবারের জুতো পায়ে হাফ প্যান্ট-পরা কুলিরা টিনের ঝাঁঝরি

থেকে তরল গরম পিচ ছড়াচ্ছে পাথরকুচির ওপর। দেশের খুব উন্নতি হচ্ছে নাকি? অনিচ্ছের চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখে হিরণ্ময় মোড়ে দাঁড়িয়ে।

নবারুণ নামে একটা নতুন ঝা-চকচকে দোকান খুলেছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মতো নতুন দোকান। সামনে কাচের কাউন্টারের গায়ে শো-কেসে বাজারের সবচেয়ে নামী-দামি জিনিস সাজানো। দোকানের মাঝখানে একটা মস্ত সাদা ফ্রিজ। এত জিনিসের স্টক আছে যে, দেখলে মনটা চনমন করে ওঠে। চিজ, নুডল, ওরসেস্টরশায়ার সস, আইসক্রিম তৈরির গুঁড়ো পাউডার— এ-সব কি সাধারণ গেরস্থ-বাড়িতে দরকার হয়? হয় না। তবু নবারুণ থেকে এ-সব জিনিস ঝপাঝপ বিক্রি হয়ে যায়।

দোকানটার দিকে জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে ছিল হিরণ্ময়। ঠিক সে সময়ে দোকান থেকে পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়সের একটি বিবাহিতা মহিলা বেরিয়ে এলেন। দারুণ চেহারা, দারুণ হলুদবরণ শাড়ি। চোখে একটা সব-পেয়েছির ভাব। হাতে নাইলনের জালি ব্যাগে গুচ্ছের জিনিস উপচে পড়ছে। এ পাড়ার নয়, হয়তো বিয়ে হয়ে এ পাড়ায় নতুন এসেছে। পিছনে একটি বছর দুয়েকের ফুটফুটে ছেলের হাত ধরে ঘাগরা আর ছোট জামা-পরা কিশোরী একটি মেয়ে। মেয়েটির মুখখানা মহিলাটির মতোই, আরও একটু কৃশ, কিন্তু সুন্দর। লম্বাটে মুখ, বড় চোখ। বড়লোকের বাচ্চা।

দ্বিতীয়বার তাদের দিকে তাকাল না হিরণ্ময়। কিন্তু হাত দশেক দূর দিয়ে যাওয়ার সময় কিশোরীটি হঠাৎ বলে উঠল, দিদি, দেখ, দেখ।

কী? দিদি ফিরে তাকায়।

সেই পাগলটা।

মহিলা ছেলেমানুষ নন। একঝলক হিরণ্ময়কে দেখেই চাপা স্বরে বলল, যাঃ, বলিস না।

কেন?

ও রকম যাকে-তাকে নিয়ে বলতে নেই। আয় তাড়াতাড়ি। টুম্পাকে কোলে নে না।

কথাটা শুনে হিরণ্ময় দ্বিতীয়বার ওদের দেখল ভ্রূ কুঁচকে। বেশিক্ষণ দেখতে পেল না। ওরা রিকশায় উঠে পড়ল। হিরণ্ময় কালো চশমা খুলে রিকশাটাকে বহু দূর পর্যন্ত চলে যেতে দেখল সেন্ট্রাল রোডের খানাখন্দ পেরিয়ে।

একদল বখাটে ছেলে তাকে পার হয়ে যাচ্ছিল। প্রায় সকলেরই লম্বা চুল, বড় জুলপি, দু'-এক জনের ঝোলা গোঁফ। পরনে রাস্তা-ঝাঁটানো লটর-পটর বেলবটম। সবাই সিগারেট ফুঁকছে। যেতে যেতে দু'-চারজন পাশ-চোখে হিরণ্ময়ের দিকে তাকায়। কেউ আওয়াজ দিল না, তবে খাতিরও দেখাল না। চার-পাঁচ বছর আগেও ছেলে-ছোকরারা তাকে দেখলে ভয়ে কুঁকড়ে যেত। চোখে চোখে তাকাত না। তাও হিরণ্ময় এই এলাকায় তেমন কোনও অ্যাকশন করেনি। শুধু নর্থ রোডের তেমাথায় একবার বোম চালিয়েছিল। তখন বড় মস্তানদের দিন গেছে, হিরণ্ময়রা পলিটিকস করতে গিয়ে যে বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছিল, তাতে মন্ত্রের মতো কাজ হত। মস্তানরা গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে রিটায়ার করেছিল। চৌদ্দ-পনেরো থেকে উনিশ-কুড়ি বছরের নকশালদের কবজায় তখন পুঁটিমাছের মতো গোটা এলাকার প্রাণ।

এখন আবার দিন পালটাচ্ছে। হিরণ্ময় বখাটেদের চেনে। যারা পাশ কাটিয়ে গেল, তাদের চোখে-মুখে বখামির ইতিহাস লেখা আছে। হিরণ্ময় যখন পলিটিকস করত, তখন ওদের দুধে-দাঁতের বদলে বিষদাঁত ওঠেনি। এখন বেশ লম্বা চওড়া হয়েছে। ইচ্ছে করলে হিরণ্ময়কে আওয়াজ দিতে পারত। দিল না, সে ওদের দয়া। তবে একজন জিজ্ঞেস করল, কে রে বে?

অন্য একজন বলল, চেপে যা শালা, তোর কী?

আর একজন চাপা গলায় বলে, হিরুদা বে। চিনিস না তো!

এইটুকু শুনতে পেল হিরণ্ময়। ছোকরাগুলো নারকেল-বাগানের। ওদের জনা দুয়েককে হিরণ্ময় চিনতে পারে। একজন হল বিধুর ভাই দোবার, পরনে গুরুদশার কোরা কাপড়। মুখে একটা ক্যালানে হাসি। আর-একজন ফুটু। ক'দিন আগে নয় নম্বর বাসের দোতলায় বসে ছিল হিরণ্ময়, সামনের সিটে ছিল ফুটু। ফুটুর পাশে একটা ঝি-গোছের মেয়ে। মেয়েটার বয়স অল্প, যৌবনকালে ঝি-দাসীরাও যেটুকু সাজগোজ করে মেয়েটার তাও ছিল না। থানের মতো সাদা আর ময়লা কাপড় পরনে। পিছন থেকে ঘাড়ের রগ দুটো দেখা যাচ্ছিল। পাশমুখ দেখে বোঝা গিয়েছিল, মেয়েটা দুঃখী বটে। আবার বোকাও।

মেয়েটা বলল, ডানলপে তোমার কে আছে?

ফুটু ত্যাড়া গলায় বলে, যেই থাক তোমার অত খতেনের কী? নিয়ে যাচ্ছি সেই ঢের।

রাগ করছ কেন? কার বাড়িঘরে হুট বলতে গিয়ে উঠব!

ভাল বাড়ি। তখন থেকে টিকটিক করছ, এবার চুপ করো তো!

বাসে এখন ভিড় হয়নি তেমন। কোত্থেকে সিঁড়ি কাঁপিয়ে একটা খুনে চেহারার ছেলে উঠে এল দোতলায়, পিছন থেকে হাঁক দিল, স্বপন, সব ঠিক আছে তো!

ফুটুর পোশাকি নাম স্বপনই হবে, সে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

যাচ্ছি তা হলে! বলে ছেলেটা ফের যেমন এসেছিল তেমনি নেমে গেল।

হিরণ্ময় তখনই একটা বদ ব্যাপারের গন্ধ পায়। মেয়েটা ঘ্যানর ঘ্যানর করে কী যেন বলে যাচ্ছিল অনবরত। শ্বশুর, মারধর, দেখো গোছের কয়েকটা শব্দ মাত্র শুনতে পেয়েছিল হিরণ্ময়। হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল পিছন থেকে ফুটুর ঘাড়টা চেপে ধরে। ধরেনি, তার কারণ সে নিজেও তো আর অত ভাল লোক নেই।

॥ তিন ॥

রেডিয়োর ওপর ভেজা গামছা দেখলে আর অবাক হয় না বংশী। বাথরুমে সাবানের তাকে সোনার আংটি কুড়িয়ে পেলেও নয়। তরকারি রাখবার যে প্লাস্টিকের ঝুড়িটা আছে, তার মধ্যে আলু-পটলের নীচে যদি খুচরো পয়সা পাওয়া যায়, তা হলে আজকাল সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়। কিংবা সপরিবারে বেরোনোর সময় যদি তালা পাওয়া যায়, আর চাবি না পাওয়া যায়, তবে বংশী জানে ঠিক আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা ধৈর্যের সঙ্গে খুঁজলে চাবিটা বেরোবে হয়তো আটার কৌটা থেকে, কিংবা ফুলদানির ভেতরে, কি জুতোর র‍্যাকে।

আজকাল সয়ে গেছে বংশীর। কোনও কিছুতেই অবাক হয় না।

শোভেন্দ্রনাথ রেশন আনতে যাবেন বলে তৈরি হয়েছেন। গায়ে হাতে-কাচা পিরান, পরনে ধুতি, পিরানের ওপর কোট, কোটের ওপর চাদর, গলায় কম্ফর্টার, এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে চাল চিনি গমের জন্য হরেক মাপের ব্যাগ। টাকাও গুনে-গেঁথে পকেটে পুরেছেন। রেশন কার্ডটা পেলেই রওনা হন। আজ মঙ্গলবার, সপ্তাহে রেশনের প্রথম দিন। আজ বড় ভিড় হয়। তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারলে কিছু সুবিধা। ঠিক এ সময়ে জানা গেল, রেশন কার্ড পাওয়া যাচ্ছে না।

দীপালি শোওয়ার ঘরে বিছানার তোশক অর্ধেকটা তুলে ফেলে বলল , এখানেই রেখেছিলাম তো! ঠিক মনে পড়ছে।

মেঝেয় বসে খবরের কাগজে শেষবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল বংশী। মুখ ফিরিয়ে দেখল, তোশকের তলায় তার একজোড়া কালো নাইলন মোজা দেখা যাচ্ছে, যা পরশুদিন অনেক খুঁজেও পাওয়া যায়নি। আর পুরো একটা স্ট্রিপ এন্টোরোকুইনল, যা গত সপ্তাহ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না এবং

দীপালি বার বার বলেছে, ও তুমি দোকানেই ফেলে এসেছ।

শোভেন্দ্রনাথ কুণ্ঠিত পায়ে এক বার এ ঘরে এলেন। কথা বড় একটা বলেন না। কিন্তু অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলেন একটু।

বংশী তার বাবার দিকে চাইল। দু'জনের চোখই গম্ভীর এবং উদাস।

বংশী বলল, আপনি বরং আজ আর না গেলেন।

শোভেন—বউমা বলছিল চিনি ফুরিয়েছে।

বংশী—তা আর কী করবেন! কার্ড যদি পাওয়া যায় তবে তো চিনি।

দীপালি দড়াম করে স্টিলের আলমারি খুলে পটাপট কয়েকটা সোয়েটার, গরম জামা নামিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, এখানেই কোথাও আছে। রেখেছিলাম তো! তুমিও একটু খোঁজো না!

বংশী জবাব দেয় না। চোখ কাগজের দিকে নামিয়ে বলে, মোজা দুটো তোশকের তলা থেকে বের করে রাখো।

দীপালি—আঃ, এখন মোজার কথা কেন? কার্ডটা কোথায় তা বলতে পারছে না, কেবল মোজার চিন্তা।

শোভেন বংশীর দিকে তাকিয়ে ছিলেন, বংশীও শোভেনের দিকে তাকাল।

বুড়ো মানুষরা বেশি কথা কইবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শোভেনের হয়েছে উলটো। স্ত্রী বনলতা মারা যাওয়ার পর কমোড পরিষ্কার করার অ্যাসিড খেয়েছিলেন আত্মহত্যা করার জন্য। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ভগবান আর ভাগ্যের ওপর এক অসহায় অভিমানে সেই থেকে তিনি কথা কমিয়ে দিয়েছেন। বুড়ো বয়সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন বলে একটা লজ্জাও আছে। সব মিলিয়ে মানুষটা আর স্বাভাবিক নেই, আবার অস্বাভাবিকও বলা যায় না। খুব একটা মাখেন না কোনও কিছুর সঙ্গে, আবার কর্তব্যেও ত্রুটি নেই। ছোট ছেলের জন্য কোঁচা দুলিয়ে পাত্রী দেখতে যান ঠিকই।

স্কুলে আজ স্পোর্টস আছে বলে জয় বই-খাতা নেয়নি। খুবই আশ্চর্যজনকভাবে তার অ্যালুমিনিয়ামের বইয়ের বাক্সে আচমকা রেশন কার্ড খুঁজে পেল দীপালি। চেঁচিয়ে উঠে বলল, এই তো! বললাম না রেখেছি কোথাও!

গভীর একটা শ্বাস ছাড়ে বংশী। কথা বলে না।

শোভেনও বিনা প্রশ্নে রেশনকার্ড হাত বাড়িয়ে নেন, মৃদুস্বরে বলেন, এটা বরং এখন থেকে আমিই রাখবখন।

খুব ভাল হয় তা হলে বাবা। দীপালি খুশি মুখে বলে, এত বড় সংসারে কোথায় যে কোনটা থাকে তা কি মনে রাখা যায় বলুন!

সংসারের মাপ দীপালি তার সুবিধেমতো ছোট বা বড় করে নেয়। আসলে সংসারে আছে বংশী, দীপালি, জয়, শোভেন্দ্রনাথ আর সব সময়ের একটা ঝি। এটাকে বড় বলো বড়, ছোট বলো ছোট। কিন্তু দীপালি যখন ঝিকে বকে তখন বলে, এইটুকু তো সংসার, ক'টাই বা বাসন তোমাকে মাজতে হয় রেণুর মা! এই ক'টা প্রাণীর জন্য আর কীই বা কাজ! আবার যখন বংশীকে বকে তখন বলে, এতগুলো লোকের সংসার দেখছ তো। সকাল থেকে কেমন চরকির মতো ঘুরতে হয় আমাকে। একদিন এমন শক্ত অসুখ করবে দেখো আমার, বুঝবে তখন ঠেলা। অন্য কোনও বউ হলে দেখতে।

শোভেন্দ্রনাথ রেশনের ব্যাগ নিয়ে রওনা হওয়ার মুখে বংশী একটু আলগাভাবে বলল, অত বোঝা টানবার দরকার কী? ফেরার সময় রিকশা বা কুলি নিয়ে আসবেন বাবা।

শোভেন সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে বললেন, হুঁ।

বলা বৃথা। বংশী জানে, বাবা শরীর থাকতে বোঝা টানা ছাড়বেন না। কুলি বা রিকশা তাঁর কাছে বিলাসিতা মাত্র। শোভেন্দ্রনাথ যানবাহনেরও ঘোরতর বিরোধী, যেখানে হেঁটে যাওয়া সম্ভব,

সেখানে হেঁটেই যাবেন সর্বদা। শরীরের খাটুনিতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

শোভেন্দ্রনাথ বেরিয়ে যেতেই দীপালি ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে বংশীর মাথার চুল মুঠো করে ধরে বলল, যখন রেশন কার্ড খুঁজে পাচ্ছিলাম না তখন চুপ করে গম্ভীরমুখে বসে ছিলে কেন? আর কখনও গম্ভীর হবে?

কোথায় গম্ভীর?

খুব গম্ভীর ছিলে। ভাবছিলে বউটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই?

সে-সব নয়। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন দেখে—

ও-সব শুনব না। বলো আর কখনও মুখ গোমড়া করবে?

তুমি যে সবসময় জিনিস হারাও!

বেশ করি। তবু তুমি রাগ করতে পারবে না।

আচ্ছা না হয় না করলাম রাগ। দেখি—

বলে বংশী একটা চুমু খাওয়ার জন্য দীপালিকে সুবিধেমতো ধরবার চেষ্টা করছিল।

ওই যাঃ, ভাতের ফ্যান শুকিয়ে যাচ্ছে। বলে দীপালি শরীরটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সকালের দিকে স্নান করতে এখনও একটু শীত-শীত করে। ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার শীত এলিয়ে যায়। সারা দিন গরমীভাব।

ন'টার ভোঁ বাজতেই বংশী খবরের কাগজ ভাঁজ করে উঠে পড়ে। ভিতরের বারান্দায় এসে লুঙ্গি ছেড়ে গামছা পরে নেয়। বারান্দার এক কোণে এক চৌকো রোদ পড়েছে। ছোট পেতলের তেলের বাটিটা সেইখানে পড়ে আছে কাল থেকে। একটা কাক তেল ঠুকরে খাওয়ার চেষ্টা করছে। বাটিটা ঠং করে উলটে গেল। দীপালি রান্নাঘর থেকে তাড়া দিল, হুস! তেলের বাটিটা কুড়িয়ে এনে বংশী রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে বলে, মেনু কী?

দীপালি এ সময়টায় একেবারে নাকের জলে চোখের জলে। ঘুম থেকে দেরি করে ওঠে বলে সকালবেলাটায় কাজকর্ম নিয়ে হিমসিম খায়। প্রায় দিনই বংশীর কিছুটা দেরি করিয়ে দেবেই।

প্রশ্ন শুনে দীপালি কড়াইয়ের ডাল সম্বারের কালোজিরে ছেড়ে বলল, আজ খেতে কষ্ট হবে। ডালনাটা করার বোধহয় সময় হবে না। মাছ ভেজে দেব, আর ডাল ভাত। হবে না?

হলেই হয়।

তেলের বাটিটা বাড়িয়ে ধরতেই দীপালি বলে, উঃ, এই কাজের সময়টায় কেন জ্বালাও বলো তো! নিজে শিশি থেকে ঢেলে নাও।

শিশি থেকে তেল নিতে হলে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়। কিন্তু ছোট রান্নাঘরটায় তরকারির খোসা, রাজ্যের বাসন, জল আর কৌটোয় এমন বিটকেল অবস্থা যে পা ফেলার জায়গা নেই। মাঝখানে উনুন কোলে দীপালি বসে আছে।

বংশী পেটে হাত বুলিয়ে বলল, থাকগে, শীত তো কমেই গেল। তেল আজ না মাখলাম।

বংশীর মনটা কেন যেন খারাপ লাগছে। খুব বেশিক্ষণ নয়, সকালের পরই হঠাৎ কেন মনটার মধ্যে একটা চোরা পেরেকের খোঁচা টের পাচ্ছে সে। কিছু একটা কারণ আছে, কিন্তু কারণটা মনে পড়ছে না।

বংশীর এ-রকম হয়। মন-খারাপের কারণটা কখনও কখনও একদম মনে পড়ে না কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে থাকে।

রোদের চৌকোটায় দাঁড়িয়ে বিনা তেলেই শরীরটা মালিশ করতে থাকে বংশী। ছেলেবেলা থেকেই তার শরীরের গঠন ভাল। স্কুল-কলেজে থাকতে বেদম ব্যায়াম করে বেশ মাসল হয়েছিল গায়ে। এখন ব্যায়াম-ট্যায়াম ছেড়ে দেওয়ায় পেশিগুলো মিইয়ে গেছে বটে তবু যা আছে তাও কম নয়। চওড়া কাঁধ, পুষ্ট হাত, আর সবচেয়ে বড় কথা এখনও তার ভুঁড়িটুড়ি হয়নি। পেটটা তক্তার

মতো চ্যাটালো। বহুকাল কারও সঙ্গে মারপিট করেনি বংশী। এক বার করে দেখলে হয়, পারে কি না।

শিরশিরে বাতাস দিচ্ছে। গায়ে কাঁটা দেয়। ঠান্ডা জল গায়ে ঢালতে কষ্ট হবে। তেল ডলে নিলে কষ্টটা হত না। বংশীর কিছুতেই মনে পড়ছে না, তার মনটা কেন খারাপ।

বাবা রেশন আনতে গেলেন। রেশন তুলে একেবারে গম ভাঙিয়ে ফিরতে দেরি হবে। রেণুর মা গিয়ে বড় রাস্তায় থানা গেড়ে আছে, জয়ের ইস্কুলের গাড়ি এলে জয়কে নিয়ে ফিরবে। বাসাটা এ সময়ে ফাঁকা। এই সুবিধাজনক অবস্থায় বংশীর হঠাৎ ইচ্ছে হল দীপালিকে রান্নাঘর থেকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়ে আসে শোওয়ার ঘরে। প্রথম প্রথম এ-রকম সুযোগ পেলে অসময়ের প্রেম তারা অনেক করেছে। একবার ভাতের ফ্যান গালছিল দীপালি, তখন...ওঃ সে কী কাণ্ড! আর-একবার নিমপাতা ভাজা পুড়ে ঝামা হয়েছিল।

বংশীর ইচ্ছেটা হল বটে কিন্তু সে নড়ল না। ইচ্ছেটা ভুরভুরি কেটে আবার মনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আসলে এখন এই প্রেম করতে বড় শরীরের খাটুনি যায়। পরিশ্রম সার বলে মনে হয়।

দীপালি রান্নাঘর থেকে চেয়ে ছিল। মৃদু হেসে বলল , অমন গুন্ডার মতো চেয়ে আছ কেন বলো তো। খাবে যেন আমাকে! না বাবা, তোমার ভাবসাব ভাল নয়, স্নান করতে ঢুকে পড়ো তো।

বংশী একেবারে বুদ্ধুর মতো একটু হাসে। তারপর দুর্ঘটনা এড়াতে বাথরুমে ঢুকে যায়। ঢুকে বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে বারান্দার ওধারে মুখোমুখি রান্নাঘরে দীপালিকে দেখিয়ে একটু নাচে। দু'হাত ওপরে তুলে হো-হো-হো করে চেঁচায়! সেই শিবনৃত্য দেখে দীপালি চোখ পাকিয়েও হেসে ফেলে।

বেরোনোর সময় বংশীর ফরসা রুমাল পাওয়া গেল না। শার্ট পরতে গিয়েও বংশী খুঁত খুঁত করে বলে, কাচানো জামা নেই নাকি? এই নীল শার্টটা বাড়িতে কেচেছ, কিন্তু ইস্তিরি করাওনি। কাল অফিসে দু'-একজন বলছিল, জামাটা পুঁটুলি থেকে বের করেছেন নাকি বংশীবাবু!

দীপালি অসহায়ের মতো বলে, আর তো নেই। নতুন জামা-প্যান্ট করাও বরং কয়েকটা।

নেই? বংশী অবাক হয়ে বলে, খুঁজলে কত বেরোবে দেখো।

গতমাসে তো লন্ড্রিওলা দুটো জামা হারিয়েছে। আর কত থাকবে? যা আছে সব ময়লা।

কাচাওনি কেন?

দীপালি গরম হয়ে বলে, আমি একা কত দিক সামলাই বলো তো!

বংশী কোঁচকানো হাওয়াই শার্টটাই গায়ে দেয়। যে গেঞ্জিটা পরেছে সেটাও ঘামে ভিজে আঠালো হয়ে আছে। কিন্তু গেঞ্জির কথা আর তোলে না সে।

আগুন-গরম ভাত খেয়ে বংশীর গা দিয়ে গরম ছুটছে। মোজা-জুতো পরবার সময় সে বাইরের ঘরের পাখাটা চালিয়ে নিল। আর ঠিক সেই সময়েই তার মনে পড়ে গেল মনটা কেন সকাল থেকে খারাপ লাগছে।

গতবার সে একটা সিলিং ফ্যান কিনেছে শোওয়ার ঘরের জন্য। আজ কাগজে সেই পাখার কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছে পনেরো পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে এ-বছর। তার মানে তিনশো ষাট টাকায় কেনা ফ্যানটা এ-বছর কিনলে পঞ্চাশ টাকারও ওপর কম দামে পাওয়া যেত। বিজ্ঞাপনটা দেখার পর থেকেই মনটা বিগড়েছিল, এতক্ষণ অন্য চিন্তায় চাপা পড়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা।

এক পায়ে জুতোর ফিতে বেঁধে যখন আর-এক পায়েও বাঁধতে যাচ্ছে তখনই আবজানো সদর দরজাটা খুলে দীপালির ছোট বোন রূপালি ঘরে ঢুকল।

আরে, রুপু যে! কী খবর?

রূপালি ভারী ঝলমলে মেয়ে। কালো হলেও টান, লম্বাটে চেহারা। মাথায় ঘন চুল, মুখখানায়

খর বুদ্ধির ঝিকিমিকি। ভারী মিষ্টি দেখতে। তার ওপর ভাল ছাত্রী। ইংরিজিতে হাই সেকেন্ড ক্লাস অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে যাদবপুরে এম-এ পড়ছে।

আজ রূপালির মুখখানা কিছু গম্ভীর। চশমার পিছনে চোখ দু'খানায় কিছু ঘুমহীনতার ক্লান্তি। মুখে খড়ি-ওঠা ভাব। গলার স্বরও ক্ষীণ শোনাল যখন বলল, জামাইবাবু আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। আজ নয়, অন্য দিন বলব।

বংশী ডান পায়ের জুতোটার ফিতে আর বাঁধল না, ছেড়ে ফেলে বলল, তার আর দরকার কী? আজ না হয় অফিসে না গেলাম!

কার সঙ্গে কথা বলছ? বলতে বলতে দীপালি পাশের ঘর থেকে পরদা সরিয়ে উঁকি দিয়ে বলল ও রুপু? জয়ন্তীর বিয়েতে গিয়েছিলি পরশুদিন?

গিয়েছিলাম। ওঃ, বাইরে যা রোদ। বলে রূপালি তার মুঠোভরা রুমালে কপাল মুছতে মুছতে ব্যাগ আর ছাতা সেন্টার টেবিলে রেখে সোফায় বসে।

দীপালি বংশীর দিকে চেয়ে বলে, ও কী? তুমি জুতো-মোজা ছাড়ছ যে! অফিস যাবে না?

না। রূপালি কী যেন বলবে আমাকে। আজ না গেলাম।

ইস যাবে না! ফেব্রুয়ারি মাস মোটে, এর মধ্যে পাঁচ দিন কামাই হয়ে গেছে, সে খেয়াল আছে? ও-সব হবে না। যাও শিগগির অফিসে। ছুটি নষ্ট কিছুতেই করতে দেব না।

বংশী অসহায় মুখ করে বলে, রূপালির জরুরি কথা আছে যে।

না, কিচ্ছু জরুরি কথা নেই। তুমি অফিস যাও, দরকার হলে রূপালি অন্য সময়ে এসে বলবে। কেউ বাসায় এলেই হুট বলতে কামাই করতে দেব না তো আর! যাও অফিসে।

রূপালি কৃশ মুখে হেসে বলল, কথাটা তেমন জরুরি কিছু নয়। পরে একদিন বলব।

বংশী শ্বাস ফেলে বলল, সাসপেনসে রাখলে রুপু! বলে জুতো-মোজা পরল। তারপর বেরিয়ে গেল অনিচ্ছুক পায়ে।

দীপালি বোনের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। খানিক চেয়ে থেকে বলল, তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন? জামাইবাবুকে কী বলতে এসেছিলি?

রূপালি মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে বলল, একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে।

কী হয়েছে? দীপালি খুব শুকিয়ে গিয়ে বলে।

ও ফিরে এসেছে।

প্রথমটায় বুঝতে পারে না দীপালি, দিশাহারার মতো উঠে এসে রূপালির পাশে বসে পড়ে বলে, কে ফিরেছে স্পষ্ট করে বলবি তো! হেঁয়ালি করিস না এখন, বুক কাঁপছে, কী রে?

রূপালি ধীরে মুখখানা ফিরিয়ে এনে বলল, সেই যে হিরণ্ময়।

দীপালি অবাক হয়ে বলে, সে কী? সে তো কোথায় যেন গুলি খেয়ে মরেছিল!

না, সেটা গুজব।

তুই দেখেছিস?

হুঁ।

সত্যিকারের দেখলি, না কি আন্দাজে বলছিস?

আন্দাজে বলব কেন? দেখেছি।

ও মা! তা হলে কী হবে! কিছু বলল নাকি তোকে?

না।

কিছু না?

বললাম তো, না।

কোথায় দেখা হল?

মুখোমুখি দেখা হয়নি এখনও। একদিন দেখলাম যাদবপুরের এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের ধারে বাটার দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। পরশুও দেখেছি। বাজারে।

কিছু বলল তোকে?

না, দেখেনি আমাকে। দেখলেও কাছে আসেনি।

দীপালি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর খুব ক্ষীণ গলায় বলে, ঠিক দেখেছিস তো? ভুল নয়?

রূপালি একটু রেগে গিয়ে বলে, ভুল হবে কেন বল তো। আমি কি চিনি না!

দীপালি দরজাটায় ছিটকিনি তুলে দিয়ে এসে আবার বসল। বসে গলা নামিয়ে বলল, কিন্তু সবাই যে বলেছিল হিরণ্ময় অ্যাকশনে মারা গেছে দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরে নয়, চিড়িয়ার মোড়ে। সে তো সবাই জানে, কিন্তু কেউ তো আর চোখে দেখেনি। গুজব রটেছিল।

তা হলে এত দিন ছিল কোথায়? দীপালি বাতাসকে প্রশ্ন করে।

রূপালি মাথা নিচু করে হাতের তেলোয় থুতনি রেখে বসে রইল। একবার বুঝি রুমালের দলাটা দিয়ে আলতোভাবে চোখের জল মুছল।

দীপালি রূপালির পিঠে হাত রেখে বলল, জামাইবাবুকে সব বলবি?

রূপালি প্রথমটায় কথা বলল না। গলা থেকে কান্নার ভাব তাড়াতে চেষ্টা করল খানিক। তারপর বাধো বাধো স্বরে বলল, ভাবছি কী করব। এতকাল তো সব গোপন করে রেখেছিলাম। যদি ও সত্যিই মরে যেত তা হলে তো কথাটা উঠতই না। কিন্তু এখন কথা উঠবে, লোকে জানবে। এখন তো কাউকে কথাটা বলা দরকার, নইলে একা আমি কিছু করতে পারব না। তোর অমত না-থাকলে জামাইবাবুকে সব বলে হেলপ চাইতে পারি।

দীপালি স্পষ্ট ভয়ের গলায় বলে, ও কী হেলপ করবে? সে গুন্ডা ছেলেটা যদি ছোরা-টোরা মারে?

রূপালি এ-কথায় হাসল না। আস্তে করে বলে, ছোরা মারবে কেন? জামাইবাবুকে তো আর ঝগড়া করতে বলছি না।

না বাবা, ও-সব মস্তানরা ভাল কথাও খারাপ ভেবে নেয়। তা ছাড়া তোর জামাইবাবু পেট-পাতলা মানুষ, সিক্রেট রাখতে পারে না। এ-সব শুনলে হই-চই বাঁধিয়ে দেবে হয়তো। মা-বাবা সবাই জানবে।

রূপালি একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, এখন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে তুই ছাড়া আর কেউ জানে না। বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র বাসবী জানে। কিন্তু তুই বা বাসবী তো আমাকে হেলপ করতে পারবি না। বাসবী বিয়ে হয়ে ডি ভি সি চলে গেছে। তুই সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আমি কাকে ধরব বল তো!

দীপালি হঠাৎ উঠে বলল, দুটো ভাত খাবি আয় তো! এ-সব নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আর তোর জামাইবাবুকে যদি বলতেই হয় তো আমিই বলব, তোর বলে কাজ নেই। আয়।

দীপালি রূপালিকে একরকম জোর করেই খাওয়ার ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

॥ চার ॥

ডান চোখের ছানি অপারেশনের পর থেকেই চোখের সামনে কালো কালো পোকার মতো কী যেন উড়ে উড়ে বেড়ায়। কখনও চুলের মতো কী যেন ভাসতে থাকে। প্রথম প্রথম কালো পোকাগুলোকে উড়ন্ত মশা মনে করে দু' হাতে চড়-চাপড় দিতেন শোভেন্দ্রনাথ। তারপর ভুল ভাঙল। মশা-টশা নয়। চোখের মধ্যেই এই বিন্দুগুলো ভাসে। বিন্দুগুলোকে ঠাহর করে দেখবার চেষ্টা করেন মাঝে মাঝে, তখন সেগুলো দৌড়ে নানা দিকে সরে সরে যায়। আবার ফিরে আসে। ভারী জ্বালাতন। ডাক্তার বলেছিল, ওগুলোর কোনও ওষুধ নেই। সারে যদি তো এমনিই সেরে যাবে। না সারলেও ক্ষতি নেই।

কিন্তু মুশকিল হল, ওই চোখের পোকা নিয়ে শোভেন্দ্রনাথের এক বাতিক হয়েছে। যখন তখন দরকারি কাজের সময় হঠাৎ সব ভুলে ওই পোকাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেন। সেগুলো দৌড়োতে থাকে, আর শোভেন্দ্রনাথ তখন তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে চোখ ফেরাতে থাকেন, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে। এই করতে গিয়ে মাথাটাও নানা দিকে ফিরতে থাকে। কখনও উঁচু করে, নিচু করে, বাঁয়ে ঘুরিয়ে, ডাইনে ফিরিয়ে যখন তিনি চোখের সেই দুরন্ত লেজওলা কালো শয়তানগুলোকে দেখেন তখন লোকে তাঁর দিকে চেয়ে অবাক হয়। ভাবে, পাগল নাকি?

লোকে কী ভাবে তা নিয়ে শোভেনের মাথাব্যথা নেই। আসলে ওই পোকা দেখতে গিয়ে অনেক সময় কাজের ক্ষতি হয়।

রেশনের দোকানে আজ লাইন পড়েছে। বাইরের রোদে খানিকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে শোভেন প্রথম কম্ফর্টার তারপর কোট খুলে ফেললেন। তাও তেজালো রোদে ঘাম হচ্ছিল খুব। সামনে এক জোড়া দোখনো ঝি লাইনে দাঁড়িয়ে কেবল বক বক করে যাচ্ছে। পিছনে কালী কাটরার ছিট কাপড়ের দোকানদার হরিপদ আর একজনকে ডেকে গতকাল চাঁদপুর সম্মিলনীতে কী কী হল তার বিবরণ দিচ্ছিল। শোভেন বড় একটা কথা-টথা বলেন না কারও সঙ্গে। অন্য কেউও সহজে বলে না তাঁর সঙ্গে। লাইনে এই চুপচাপ বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগে না শোভেনের। সময়টা তো কেটে যায়। রোদ, আলো, মানুষ-জন দেখতে পান। রাস্তাঘাটে কত কী ঘটে! একা লাগে না।

বেলা চড়ল, রোদ চড়ল, এক-পা দু'-পা করে লাইন এগোল। সবশেষে টাকা জমা দিয়ে যখন চাল গম চিনির ওজন দেখবেন ঠিক সেই সময়টায় মনঃসংযোগ রাখতে পারলেন না। হঠাৎ নজর চলে গেল চোখের শয়তান পোকাগুলোর দিকে। পোকা দেখতে দেখতে মুখটা ওপর বাগে তুলে ফেলেছেন, ডাইনে ঘোরাচ্ছেন ঘাড়, ঠিক সেই সময়ে রেশন দোকানের কর্মচারী নেপাল চাল গম চিনি মেপে ব্যাগে ভরে ফেলেছে! বলল, নিন দাদু হয়ে গেছে।

শোভেন লজ্জা পেলেন না, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হলেন মনে মনে! একেই তো কেজিতে এক দেড় দু'শো করে কম মাপে এরা, তার ওপর চোখ না-রাখলে পাল্লা কোন দিকে ঝুঁকিয়ে কী মাপ দেবে সে কে জানে! নেপালটা সুবিধের ছেলেও নয়। পাকা হাতের চোর। মনে খুঁতখুঁতুনি নিয়ে শোভেন ডান হাতে সাত কেজি গমের ব্যাগ আর বাঁ হাতে ঠুকরি আতপ চালের হালকা ব্যাগটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

ওই যাঃ! বুড়ো হলেন নাকি! চিনির কৌটো চালের ব্যাগে ভরে নিতে ভুল হয়ে গেছে। নেপাল ডাকছে।

ফিরে চিনির কৌটো নিয়ে বলেন, আজ ময়দা দিল না, সুজিও নেই। ভাবতে ভাবতে হাঁটেন। আজকাল যা-কিছু ভাবেন সবই চাল ডাল সবজি মাছ তেল মশলার ভাবনা। সংসার বা রোজগার কোনওটাই তাঁর নয়, ছেলের। তবু তাঁর মাথা ভরতি এইসব চিন্তা।

রাসু বলে, তোমার মাথাটাই গেছে শোভেন।

ভেবে-চিন্তে শোভেন্দ্রনাথও দেখেছেন, তাঁর মাথাটা সত্যিই গেছে। এককালে এই দুনিয়ার ভালমন্দ নিয়ে কত কী চিন্তা ছিল। পলিটিকস খেলা পুজো গান-বাজনা থিয়েটার বায়স্কোপ মেয়েছেলে সাহিত্য বেড়ানো কত কীসে মাথা ভরে থাকত। আজকাল দুনিয়ার আর কিছুতেই মন যায় না। মনটা খালি কৌটোর মতো ঢাকনা বন্ধ করে দম আটকে পড়ে আছে।

রেশন সেরে গম পেষাই কল থেকে গরম সাদা আটা ব্যাগ ভরে নিয়ে রাস্তায় নামলেন শোভেন। এখনও বেশ ভারী জিনিস বইতে পারেন। হাঁটতেও পারেন খুব। শ্লেষ্মা সত্ত্বেও শরীরটা কিছু খারাপ নয় তাঁর। অবশ্য রাসুর সঙ্গে তুলনা চলে না। রাসুর বয়স তাঁর মতোই, কিন্তু এখনও দানবের মতো চেহারা। পাঁচ-সাতটা ডিম, আধসের মাংস কি কুড়িটা রসগোল্লা চোখের পলকে খেয়ে নিতে পারে। তার থাবড়া খেলে এখনও গড়পড়তা জোয়ানরা মাটি নেবে। মনের জোর সাংঘাতিক।

রাসুর বউ মরেছিল যৌবনকালে, তারপর থেকে বুকে করে দু'টো ছেলেকে মানুষ করেছে। শোভেন যেমন বনলতা মারা যাওয়ার পর খ্যাপাটে হয়ে গিয়েছিলেন, রাসুর ধাত তেমন নয়। বউ মরার পর তার মেয়েমানুষের অভাব হয়নি। ফিরে বিয়ে কবল না বটে তবে ফুর্তি করতে ছাড়ত না। কলকাতার সব ক'টা খারাপ-পাড়া ছিল তার নখদর্পণে।

ছেলেরা বিয়ে করার পর সংসারে অশান্তি। কারও সঙ্গে তখন আর বনে না রাসুর। বউ দু'টো নাকি মহা বজ্জাত। তখন রাসু এসে একদিন বলল, পরশুদিন দুটো ছেলেকেই জুতিয়ে তাড়িয়েছি বউসুদ্ধ। শোভেন অবাক হয়ে বলেন, বলো কী? জুতোলে?

কথার জুতো। চামড়ার জুতোর চেয়ে তার জ্বালা ঢের বেশি। প্রায় ঘাড়ে ধরে বের করে দিলাম। বাড়ি আমার নিজের, পয়সাও আমার নিজের, কার পরোয়া করি হে?

শোভেন নিজের ছেলেদের বড় ভালবাসেন। তাই ছেলেদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার কথায় বিরক্ত হয়ে বললেন, খুব বাহাদুরির কাজ করলে নাকি?

রাসু জ্বলজ্বলে চোখে খানিক শোভেনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, এ কাজ তোমার দ্বারা হওয়ার নয়। তুমি হচ্ছ মেড়া। দেখো না আদিনাথের হাল! তার একটা মাত্র ছেলে, কত আদরে মানুষ করেছে। এখন ছেলে, ছেলের বউ খেতে দেয় না বলে উকিলের কাছে গিয়েছিল ছেলের নামে মামলা করবে বলে। উকিল বলল, আইনে কোথাও নেই যে ছেলে মা-বাপকে খেতে দিতে বাধ্য। কাজেই মামলা হল না। তখন পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ করল, জনে জনে বলে বেড়াতে লাগল। হল কি তাতে কাঁচকলা! ছেলে আর বউ বাড়ি দখল করে গ্যাঁট হয়ে বসে রইল আর আদিনাথ সস্ত্রীক গিয়ে কোন মঠে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে কি বাসন মাজছে। আমার সে-সব নেই। কলজের জোর রাখি, বুঝলে?

রাসুর কলজের জোরের বহর এখানেই শেষ হয়নি। এর মাস দুই পরে ফের বিয়ে করল। বেশি দিনের কথা নয়, গত অগ্রহায়ণে। পাত্রী কিছু ফ্যালনাও নয়, একটা স্কুলের হেড মিস্ট্রেস। বয়স্কা কুমারী, চেহারাও কিছু খারাপ না। এখন বেশ আছে তারা। সিনেমা দেখে, বেড়ায়, বঙ্গসংস্কৃতি থেকে শুরু করে প্ল্যানেটেরিয়াম কিছু বাদ রাখে না। ফূর্তির ধুম লাগিয়েছে। বিয়ের পর শোভেনের কাছে সস্ত্রীক একবার এসেওছিল। স্ত্রীসহ তাকে নিজের বাসায় দেখে শোভেন অপ্রস্তুত। কেবল মনে মনে ভাবেন, না জানি বংশী আর বউমা কী ভাবছে ওদের সম্বন্ধে! হয়তো রাগ করবে কি হাসাহাসি করবে পরে।

ওমা! লজ্জা যা তা শোভেন্দ্রনাথেরই। রাসুর লজ্জাশরমের বালাই নেই। এসে মহা হইচই বাঁধিয়ে দিল। পঞ্চাশটা টাকা ফেলে দিয়ে বংশীকে বলল, যা গিয়ে মোগলাই পরোটা আর মুরগি নিয়ে আয়। আমার বিয়ের খাওয়া।

টাকাটা অবশ্য নেয়নি বংশী। তবে দীপালি সেদিন রান্না করে খুব খাইয়েছিল দু'জনকে।

খেতে বসে রাসু দীপালির দিকে চেয়ে বলল, বউমা, আমার ছেলের বউরা যদি ঠিক এ-রকম

যত্ন করে দু'বেলা দুটি খেতে দিত তা হলেই আর ঝামেলা ছিল না। আর আমার বায়নাক্কাও তো কিছু নেই। জানো তো বিধান রায়ের আমলে আমি একবার ইন্ডিপেনডেন্ট এম এল এ হয়েছিলাম। বনের মোষ তাড়ানোই ছিল স্বভাব। চিরটাকাল বাইরের কাজ আর পলিটিকস করে কেটেছে, ঘরের যত্ন পাইওনি, চাইওনি। কিন্তু আমাকে গুরুত্বটা কম দিতে শুরু করেই ফ্যাসাদ বাঁধাল। ঘরে থাকি না তো থাকি না, কিন্তু যখন ঘরে থাকি তখন আমি বাঘের বাচ্চা—এটা বুঝতে না-পেরেই ওরা চালে ভুল করেছিল। তারপর যখন তাড়িয়ে দিলাম তার কয়েক দিন পর কে যেন এসে বলল আমার ছোট ছেলে নাকি কাকে বলেছে বাবা আর ক'দিন? বাড়ি আর টাকা তো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না! সেই শুনেই মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ঠিক করলাম যদি মরিই তা হলেও যেন ওরা আমার সম্পত্তি নিরঙ্কুশ ভোগ করতে না-পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই রোখেই ফের সংসার করলাম। নইলে এই বুড়োবয়সে বিয়ে করতাম নাকি?

শুনে শোভেন্দ্রনাথ বউমার সামনে লজ্জায় মরে যান আর কী! কিন্তু আশ্চর্য, দীপালি খুব সুন্দর মুখ করে বলল, আপনার আবার বুড়োবয়স কী? আপনি ছেলে-ছোকরাদের হার মানান।

রাসুর বউয়ের বয়স বছর চল্লিশ। গায়ের রংটি কোমল কালো। মুখে শ্রী আছে, তবে ছাত্রী শাসন করতে করতে কয়েকটা রুক্ষ রেখা ফুটেছে মুখে। মাথার চুল ঘন নয়। সে এ-সব শুনে মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল।

কেউ যে-কাজ করলে সবাই নিন্দে-মন্দ করে রাসু তা করলে লোকে ততটা খারাপ দেখে না। রাসুর কপাল। দ্বিতীয় পক্ষের বউ নিয়ে এসে দিব্যি বংশী আর দীপালির সঙ্গে হই-চই করে গেল আর এমনই ঠোঁটকাটা যে যাওয়ার আগে দীপালিকে দরজার আড়ালে নিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বেশ উঁচু ফিস ফিস স্বরে বলে গেল, এবার দেখো, তোমার শ্বশুরকেও সাত পাকে বাঁধবার জন্য কাউকে পাও কি না। লজ্জা পেয়ো না বউমা, সব বুড়োরই বিয়ের ইচ্ছে থাকে। তোমার শ্বশুরেরও আছে। ধরে পড়ো যদি তো দেখবে খুব রাজি।

শোভেন্দ্রনাথ আজকাল সহজে উত্তেজিত হন না, তবু সেদিন শালাকে জুতোতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু তিনি উত্তেজিত হলে হবে কী, রাসু চলে যাওয়ার পরই দীপালি বলে ফেলল, রাসুকাকার সঙ্গে বেশ মানিয়েছিল নতুন বউকে, না?

পাশের ঘর থেকে শোভেন্দ্রনাথ শোনেন বংশী জবাব দিল , বিয়ে করে রাসুকাকা ভাল কাজ করেছেন। চেহারাই পালটে গেছে।

রাসুর কথাই ভাবেন শোভেন্দ্রনাথ। যা করে তা খারাপ হলেও লোকে খারাপ দেখে না। যা করে তা ঢাক পিটিয়েই করে আর সামালটাও দেয় ভাল। পলিটিকস করে করে হাড় পেকে গেছে। অবশ্য কেওকেটা হতে পারেনি কোনও দিন। কিন্তু চব্বিশ পরগনার অনেক জায়গায় মানুষের হয়ে খুব খেটেছে বরাবর। ভূতের বেগার। প্রতিবারই ভোটে দাঁড়িয়ে হারত। সেবার বাংলা বিহার মারজার নিয়ে বাঙালিরা কংগ্রেসের ওপর খেপে যাওয়ায় সেই তক্কে এক দুর্বল কংগ্রেস ক্যান্ডিডেটকে হারিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে জিতে গিয়েছিল রাসু। ওই এক বারই।

সে যা-ই হোক, রাসুর ভোগসুখ দেখে শোভেনের বড় হিংসে হয়। কথাটা মিথ্যে নয় যে বুড়োদের ভিতরে বিয়ের ইচ্ছে থাকে। বনলতা যখন মরল তখন শোভেন সবে রিটায়ার করেছেন। এই তো বছরখানেকের কথা। বউ মরবার সঙ্গে সঙ্গে শোভেন কী যে একটা অন্ধকার দেখলেন চারধারে। তিষ্ঠোতে পারেন না। বুকটা খালি খালি লাগে, মাথাটা ঝিম করে ওঠে থেকে থেকে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে একা বিছানায় চেঁচিয়ে ওঠেন। সেই অবস্থায় এক দুপুরে ভূতে পেল। বেসিনের তলায় অ্যাসিডের বোতল ছিল একটা। বেশি ছিল না তাতে। তলানি একটু অ্যাসিড মুখে ঢেলে দিলেন।

অ্যাসিড যে এত টক হয় আগে জানা ছিল না। সে এক বীভৎস টক। মুখ জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

বেশির ভাগই ফেলে দিলেন, অল্প একটু পেটে গিয়েছিল। চেঁচানি শুনে ছেলে বউ ছুটে এল। মরলেন না, একটা লজ্জা নিয়ে বেঁচে রইলেন। মানুষ আরও কত খারাপ কাজ করে মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছে, তিনি একটুখানি সেই যে মরার চেষ্টা করেছিলেন তার জন্য আজও মিইয়ে আছেন। বনলতার শোকের চেয়েও এখন সেই লজ্জাটাই বেশি। আর যখন খুব একা লাগে, যখন বুকের মধ্যে অনেক কথা ফেনিয়ে গাঁজিয়ে ওঠে তখন মনে হয় বউয়ের মতো আপনজন কাউকে পেলে হত।

ভারী বোঝা টেনে দোতলায় উঠতে কোনও কষ্ট হচ্ছে না। দম ফুরোচ্ছে না। পা কাঁপছে না। শরীর এখনও যথেষ্ট শক্ত আছে। যৌবন-ক্ষমতাও কি নেই? সবই আছে। তবু লোকে বলবে, বুড়োর বিয়ে। রাসুকে বলবে না, কিন্তু তাঁর বেলায় ঠিকই বলবে।

॥ পাঁচ ॥

খুব ভোরবেলা ঘুম ভাঙল কোকিলের ডাকে।

একটু শব্দেই আজকাল ঘুম ভেঙে যায়। সারা রাত কত রকমের যে শব্দ ওঠে চারপাশে, আর কতবার যে ঘুম ভাঙে হিরণ্ময়ের। তবে ঘুমটা তার খুব বড় কথা নয়। বলতে কী এমন অপরিষ্কার আর অস্বস্তিকর ঘুম খুব কম লোকেই ঘুমোয়। ঘুমের মধ্যে প্রায় সময়েই সে ভয়, আতঙ্ক, পড়ে যাওয়া, দৌড়ানো এইসব বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে।

যে ঘরটায় সে শোয় সেটা একটা ভীষণ অবিশ্বাস্য রকমের ছোট দরজির দোকান। লম্বায় পাঁচ ফুট, চওড়ায় আরও কম। কাপড়-কাটা কাঁচি আর ছুঁচ, কাপড়ের টুকরো সব রাখবার জন্য এক ধারে একটা তক্তা পাতা। তক্তার গায়ে একটা পা-মেশিন। রাত দশটা কি সাড়ে দশটায় উপেন যখন কাজ শেষ করে বাড়ি যায় তখন দোকানঘরটা হিরণ্ময়ের দখলে আসে। হিরণ্ময় পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা। তার মানে গড়পড়তা বাঙালির চেয়ে খানিকটা মাথায় উঁচু। সে কতটা লম্বা তা তার মনে পড়ে দরজিঘরে শোওয়ার সময়। মাত্র পাঁচ ফুট বাই সাড়ে চার ফুট একটা কাঠের তক্তপোশে শুতে গিয়ে যে শরীরটাকে তার কত ভাঁজে ভাঁজ করতে হয়!

আপাতত অবশ্য এর চেয়ে ভাল বন্দোবস্তের কথা হিরণ্ময় ভাবতেই পারে না। যাদবপুরের সব এলাকা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। বিজয়গড়ের যে-এলাকায় তার বাসা তার আশেপাশে এখনও বহু চোখ তাকে খুঁজে বেড়ায়। সান্ত্বনা এইটুকুই যে সে অন্তত যাদবপুরের একটা এলাকায় ঢুকতে পেরেছে। পালবাজারে রেল লাইনের ধারে উপেনের দোকানের এই আশ্রয়টুকু এখন স্বর্গের সমান। দিনেরবেলা সে যে সেন্ট্রাল রোডের মোড়ে গিয়ে দাঁড়ায়, এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের দোকানঘরে গিয়ে বা ইউনিভার্সিটির মাঠে গিয়ে কখনও বসে, এইটুকুই অনেক স্বাধীনতা। পরশুদিনও মঙ্গল রায় বলছিল, হিরু, তুমি যে এলাকায় ঢুকেছ তা কিন্তু আওয়াজ দিয়েছে।

কী রকম? হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেছিল।

কী আর বলি বলো! সেদিন কাঠমিস্ত্রি ফ্যাতনের গোলায় কয়েকজন কথা চালাচালি করছিল। তুমি যে মরোনি তাতে অনেকেই খুশি নয়।

হিরণ্ময় সেটা জানে।

রোজ রাতে বাড়ি যাওয়ার সময় উপেন তার সেলাই মেশিনের ওপরের কলটা খুলে একটা ব্যাগে ভরে নিয়ে যায়। এমন নয় যে, হিরণ্ময়কে চোর বলে সন্দেহ করে। আসলে ওটা উপেনের অভ্যাস হয়ে গেছে। হলদি কাঠের পলকা পাল্লা দিয়ে দোকানের দরজা হয়েছে, এ দরজা তিনটে লাথিও সইতে পারবে না। চোরের ভয়ে বরাবরই উপেনের মেশিন, কাঁচি আর কাপড়-চোপড় সব নিয়ে যাওয়ার অভ্যাস।

উপেন চলে গেলে সে অন্ধকার দোকানঘরে একটা মোম জ্বেলে বসে। মোম জ্বালতেই হয়, কারণ বালবটাও উপেন খুলে নিয়ে যায়। এটা না-খুললেও পারত, কতই বা দাম একটা বালবের। কিন্তু বড় সাবধানী মানুষ সে। আর জবরদস্ত গোঁয়ার। যা নিজে ভাল বুঝবে তা-ই করবে। তাই হিরণ্ময়কে মোম জ্বালতেই হয়, ন্যাংটো খাটটার ওপরে বসে সে তখন একটা দুটো তিনটে চারমিনার খেতে থাকে নাগাড়ে। এই সময়ে সে কোনও চিন্তা করে না, স্মৃতিমন্থন করে না, রাগে না, কাঁদে না। দেয়ালের মতো কাঠের মতো নির্বিকার হয়ে থাকে। দরজা বন্ধ, ঘরের বন্ধ বাতাসে মোম জ্বালে। অল্প দূর দিয়ে বোঁ বোঁ ইলেকট্রিক ট্রেন চলে যায় একটা-দুটো। কোথা থেকে বাসন মাজার শব্দ আসে। দুটো অল্পবয়সি ছেলে, বোধহয় কোনও চায়ের দোকানের বয় হবে—এ সময়টা দেদার গল্প জুড়ে দেয় আর মাঝে মাঝে 'আয় তু তু' বলে একটা কুকুরকে ডাকে।

অল্প দূরে একটা পুকুর আছে। পুকুরের পাড়ে একটা টিনের চালওলা লম্বা পাকা ব্যারাকবাড়ি। কয়েকটা দোকানঘর আছে, একটা আশ্রমও আছে সেখানে। পুকুরের ধারে ময়লা পড়ে পড়ে জঞ্জালের পাহাড় জমেছে। কটু গন্ধ আসে মাঝে মাঝে।

দর্জিঘরে মোমের শিখার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে সিগারেট খেতে থাকে হিরণ্ময়। এদিকটা ফাঁকা বলে রাতের দিকে একটু শীত-শীত করে। বহুকাল হল গায়ে দেওয়ার মতো কিছু নেই হিরণ্ময়ের। তবে বন্ধ ঘরে শীত লাগে না বড় একটা।

তিনটে বা চারটে সিগারেটের পর হিরণ্ময় যখন ফুঁ দিয়ে বাতি নেভাতে যায় তখন প্রতি রাত্রে তার মেশিনের চৌকো গর্তটা নজরে পড়ে। মেশিনের পাদানির ওই গর্তটা বড় বিপজ্জনক। এটার ওপরেই সিগারেট আর দেশলাই রাখে সে। রাতে যতবার ঘুম ভাঙে ততবার সিগারেট খাওয়া তার স্বভাব। কিন্তু অন্ধকারে হাতড়ে সিগারেট খুঁজতে গিয়ে বহুবার হাতের ধাক্কায় এই ফুটো দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট পড়ে গেছে। সিগারেটের প্যাকেট পড়লে অসুবিধা ততটা নয় যতটা দেশলাই পড়ে গেলে। সিগারেট পড়লে দেশলাই জ্বেলে খোঁজা যায়। কিন্তু দেশলাই পড়লে অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া এক হাঙ্গামা। মেশিন চালানোর চৌকো পেডালটায় পড়লে পাওয়া যায়, ছিটকে পড়লে ভারী মুশকিল। সিগারেট দেশলাই এক-আধবার তক্তাটার ওপর রেখেও দেখেছে, কিন্তু শোওয়ার পর ঘুমের মধ্যে কখন মাথা বা হাতের চাপে চ্যাপটা হয়ে যায়, কখনও বা পড়ে যায়। নয়তো পাশ ফেরার সময়ে পিঠের তলায় ঘাড়ের নীচে খোঁচা মারে।

এইসব সমস্যাই আপাতত হিরণ্ময়কে ব্যস্ত রাখে। একজন পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি মানুষ সাড়ে চার বাই পাঁচ ফুট তক্তায় কী করে শুতে পারে, মেশিনের ফুটোয় দেশলাই যাতে পড়ে না যায় তার জন্য মানুষের কী করার আছে, বন্ধ ঘরে মোম নিভিয়ে দেওয়ার পর যে পোড়া গন্ধ জমে ওঠে তা কী করে তাড়ানো যায়।

সমস্যা আরও আছে। উপেনের দরজিঘরের দোকানের মেঝেটা পোক্ত নয়। মাটির সঙ্গে প্রায় সমান করে ভিত গাঁথা হয়েছে। ভিতের সিমেন্টও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মাটি। ফাটা, ভাঙা সেই মেঝেয় ইতিমধ্যেই ইঁদুর গর্ত খুঁড়েছে। একটা জল নিকাশের ফুটো দিয়ে বাইরের বহু জীব চলে আসে। ছুঁচো, বাচ্চা বেড়াল, আরশোলা, শোঁয়াপোকা, কালো রঙের ছোট বিছে। রাতে তারা উৎপাত করে। কানে একবার একটা কেন্নো ঢুকেছিল। এই সব মনে রেখেই হিরণ্ময় তক্তাপোশের ন্যাংটো খরখরে কাঠের ওপর গায়ের জামা-কাপড়সুদ্ধ শুয়ে পড়ে। নিজের গায়ের গন্ধ এখন তার সয়ে গেছে, লাগে না তেমন নাকে। তবে দাড়ি-গোঁফগুলো একটু চুলকোয়। মাথায় খুব সম্ভব উকুন হয়েছে। সেগুলোও বড় সুড়সুড়ি দেয়। ছারপোকাও আছে অঢেল। আর আছে মশা, মশা আর মশা। অনন্ত, অবাধ, অবিশ্বাস্য। সারা রাত ধরে তারা শুষে নেয় হিরণ্ময়কে।

তোমাকে একটা ভাল বিছানাও কেউ দিতে পারল না হিরণ্ময়। এমন নয় যে গত পাঁচ-ছয় বছর তুমি বিছানায় শুয়েছ। কিন্তু তবু তোমাকে অন্তত একটা লম্বা চৌকি কেউ দিতে পারত। খুব বেশি

তো চাওনি তুমি হিরণ্ময়। বা হয়তো খুব বেশি কিছু চেয়েছিলে। অল্পে সুখ নেই ঠিকই, তবে দুঃখই বা কী? যে বৃহৎ পাওয়া গেল না তার কথা মনে করে এইসব অল্প পাওয়াকে তুচ্ছ করা যায় হিরণ্ময়? তবু ভাল, এইসব ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকো বলে তোমার কত গুরুতর কথা বিস্মরণ হয়ে যায়, কত খারাপ স্মৃতি আসতে পারে না, কত মুখ মনে করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে না। বরং এর জন্য ওই মেশিনের ফুটো, তক্তপোশের ন্যাংটো কাঠ, ছারপোকা ইঁদুরদের ধন্যবাদ দিয়ো হিরণ্ময়। ওরা তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

হাঁটু মুড়ে চিত হয়ে শুয়ে হিরণ্ময় ভোরের কোকিলের ডাক শুনছিল।

কোকিলের ডাক শুনে তেমন কিছু মনে পড়ল না। শুধু মনে পড়ল, কোকিল ডাকছে। হ্যাঁ, এইটুকু মাত্র। এখনও যে সে কোকিলের ডাককে কোকিলের ডাক বলে চিনতে পারছে। সেইটাই তো এক মস্ত লাভ।

বাসি মুখে সিগারেট বড় বিস্বাদ তেতো কড়া। কাশি উঠল একটা। চোখে জল এল। কাশতে কাশতে সে জিভ থেকে এক কুচি তামাক ফেলে থুঃ করে। মেরুদণ্ডে কাঠ ফুটছে। বালিশ নেই বলে হাতের ওপর শোওয়া অভ্যাস। তাতে মাঝে মাঝে হাতের ডিমে ব্যথা করে। এখন করছিল।

আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারে সে। উপেন আটটার আগে আসে না। কোকিলটা খুব গলা খেলাচ্ছে। উঠছে নামছে তার ডাক। শুনতে শুনতে হিরণ্ময় মোটা প্যান্টের ওপর দিয়ে উরু চুলকোয়। কুঁচকিতে ময়লা জমেছে ঢের। দাদের চাকা দাগও দেখা যায়। কিছু করার নেই। এই সব নিয়েই সে আছে। তা ছাড়া দাদ কিছু খারাপও নয়, চুলকালে ভারী আরাম।

চুলকোতে গিয়ে একটা মনের ব্যথায় হঠাৎ এক পলকের জন্য থমকে গেল বুক। আবার চলল। তবে মনে পড়ল ঠিকই। একটা কথা মনে পড়ে গেল।

উচিত হল না মনে পড়া। হিরণ্ময় পাশ ফিরে শুল আবার। কবে যে, কী করে যে তার সব যৌন অনুভূতি চলে গেল, নিস্তব্ধ আর নিস্তরঙ্গ হয়ে গেল তা সে বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ একদিন টের পেল, সেই মহামূল্যবান ব্যাপারটা আর নেই।

কী করে হল? অনেক ভেবে হিরণ্ময় একটা আন্দাজ করে। সেবার গোসাবায় খুব মার খেয়েছিল বাজারুয়াদের হাতে। সেই মারেই কী? না। তবে? বাঁকুড়া কলেজ হোস্টেলে পুলিশের ভয়ে যেবার দোতলা থেকে লাফ দেয় তখন?

যাকগে।

বেলা হলে ঝামেলা বাড়ে। জলের বড় অনটন এদিকে।

হিরণ্ময় উঠে পড়ে। মোমবাতিটা কাল অনেকক্ষণ জ্বলেছে। গলা মোম স্তূপ হয়ে জমে আছে মেশিনের ওপরের কাঠে। উপেন বিরক্ত হয়, রোজই কাঁচির ডগা দিয়ে মোমের চিহ্ন ঘষে তুলতে তুলতে বলে, কবে যে কাঠে আগুন ধরবে!

হিরণ্ময়ের নখে এখন প্রচণ্ড ধার। লম্বা নখের নীচে নীল ময়লা। মোমটা তুলে মেশিনের ড্রয়ারে গুঁজে দেয় সে। তারপর নখ দিয়ে যতটা সম্ভব মোমের চিহ্ন তুলে ফেলে।

দিনের বেলাটা ভারী চমৎকার। কিছু ভাববার নেই, অঢেল জায়গা চার দিকে ছড়ানো। যেদিকে খুশি, যেখানে খুশি চলে যাও, কোনও বাধা নেই। কিন্তু রাতটার বড় বায়নাক্কা, তখন চারধারে দেয়াল চাই, মাথার ওপর ছাদ চাই, দরজার ছিটকিনি চাই, জানালার গরাদ চাই, বিছানা চাই, বালিশ

লাইনের ধারে পেচ্ছাব সেরে সে বাজারে এসে একটা দাঁতন কেনে। কিনতে গিয়ে মনে পড়ল, পয়সা খুব বেশি একটা নেই। অবশ্য আজই জগুর মাইনের তারিখ। তাই খুব একটা পয়সা নিয়ে ভাবে না হিরণ্ময়।

আলো খুব একটা ফোটেনি এখনও। বেশ শীত-শীত ভাব আছে।

জলের কলে আজ বড্ড ভিড় লেগেছে। হিরণ্ময় সেদিকে এক বার তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে

পুকুরধারে চলে এল। পুকুরের জল বড় নোংরা। সারা দিন জঞ্জাল পড়ছে, জল ঘুলিয়ে থাকে সারা দিন। তবু এই সকালে ময়লা থিতিয়ে খানিক পরিষ্কার লাগছে। জীবাণুর চিন্তা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছে সে। আজকাল যা-খুশি শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারে।

তার শরীরের দুটো জিনিস এখনও চমৎকার। দাঁত আর চোখ। এখনও একদিন দাঁত না মাজলে মুখে দুর্গন্ধ হয় না। আর তার চোখের দৃষ্টি এখনও বাইনাকুলারের মতো। যত দূর পর্যন্ত দেখতে পায় স্পষ্ট পরিষ্কার।

উবু হয়ে যখন মুখ ধুচ্ছিল তখন শুনল পুকুরপাড়ে আশ্রমঘরে কে যেন একা বসে প্রার্থনা করছে চেঁচিয়ে— রাধাস্বামী নাম যো গাওয়ে সোই তরে, কলকলেশ সব নাশ, সুখ পাওয়ে সব দুঃখ হরে...

কথাগুলো সবই প্রায় বুঝতে পারে সে। কেবল 'কলকলেশ' শব্দটার মানে বুঝল না। সুরটা এত সুন্দর যে মনটা ভিজে যায়। উদাস পবিত্র হয়ে যায়। আশ্রম ঘরে সুধাংশু নামে একটা লোক থাকে। ভারী নিরীহ। আলাপ আছে। একদিন বলেছিল, দীক্ষা নেবেন দাদা?

হিরণ্ময় জবাব দিয়েছিল, দীক্ষা তো একবার নিয়েছি, রেডবুক ছুঁয়ে।

বাজারে আর দোকানে জায়গাটা গিজগিজে। সারা কলকাতাই এখন দোকান। প্রত্যেকটা মানুষই হয় ক্রেতা নয়তো বিক্রেতা।

না বেছে যে-কোনও একটা দোকানে ঢুকে পড়ল হিরণ্ময়। চা।

বাজারে গুটি দুই দোকান চেনে হিরণ্ময় যাদের ভিতরের উঠোনে খাটা পায়খানা আছে। চিনতে দেরি হয় না এ-সব। গত পাঁচ বছর ধরে যত জায়গায় গেছে সব জায়গাতেই এ-সব জিনিসগুলো সবার আগে খুঁজে নিতে হয়েছে। অভ্যাসে চোখ তৈরি হয়, অনুভূতি জেগে ওঠে।

চা খেয়ে সে উঠে গেল। প্যান্ট-জামা সুদ্ধু এক মগ জল নিয়ে ঢুকে গেল নির্দিষ্ট জায়গায়।

বেরিয়ে এসে যখন প্যান্টের বোতাম আঁটছিল তখন মনে হল— যাক বাবা, সারা দিনের জন্য ফ্রি এখন। এই প্রাকৃতিক কাজগুলো বড় টেনে রাখে। হাগো, মোতো, খাও—শরীর থাকলে কত রকমের ধকল।

মেশিন, কাপড়, কাঁচি আর বালব নিয়ে উপেন এসে গেছে। বসে জিলিপি খাচ্ছিল। সিগারেটের প্যাকেট নিতে হিরণ্ময় ফিরে এলে উপেন একবার তাকালও না। ধূপধুনোর একটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে দোকানঘরটায়। সকাল বেলাটায় ভারী ভাল লাগে গন্ধটা।

অভ্যাসবশে হিরণ্ময় বলল, সব ঠিক আছে?

হুঁ!

জিজ্ঞেসেরও মানে হয় না, জবাবেরও মানে হয় না। অপমান গায়ে না-মাখতে বহুদিন হল শিক্ষা পেয়েছে হিরণ্ময়। মারধরই গায়ে লাগে না তো অপমান! হিরণ্ময় বলল, ডুপ্লিকেট চাবিটা আজ আমি নিয়ে যাচ্ছি উপেনদা। ফিরতে রাত হবে।

উপেন এ-কথাটা একদম উপেক্ষা করল, জবাবই দিল না।

হিরণ্ময় জবাব প্রত্যাশাও করেনি। উপেন যে তার ওপর বিরক্ত এটা বুঝতে এক লহমাও লাগে না। তবে কিনা উপেনের উপায়ও নেই। দুর্বল লোক, ভিতু। বিয়ে-টিয়ে করেনি, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকত, খেত, পয়সা দিত। সে-বাড়ির একটা বড়সড় মেয়ের সঙ্গে কী করে যেন শরীরের সম্পর্ক হয়ে গেল তার। কিন্তু মানুষটা ধর্মভীরু, ভালমানুষ গোছের। মেয়েটা আর তার বাড়ির সবাই জো পেয়ে ভয়ংকর গণ্ডগোল শুরু করে। পাড়ার ছেলেদের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে মরেই যেত উপেন। ঠিক সেই সময়ে নকশাল ছেলেরা তাকে বাঁচায়। সেই দলে হিরণ্ময় ছিল। আত্মীয়-বাড়ি থেকে উপেনকে তুলে এনে পার্টিতে নাম লিখিয়ে দিল। সেই যে কেঁচিকলে পড়ল উপেন আর ছাড়াতে পারল না। এখনও ভয়ে ভয়ে থাকে। এই বুঝি নকশালরা আসে! এই বুঝি সেই মেয়েটা নিন্দে রটায়।

হিরণ্ময় এও জানে সে চলে গেলে উপেন কালীবাড়িতে ভোগ দেবে। কিন্তু হিরণ্ময়েরও তো বাঁচা দরকার। উপেনের দরজিঘর ছাড়া সে শোবে কোথায়? মানুষের যে রাতের বেলা চারটে দেয়াল, একটা ছাদ আর একটা বন্ধ দরজার দরকার হয়, যদি না হত তবে হিরণ্ময় খামোখা এই বেচারাকে মনের কষ্ট দেবে কেন?

হিরণ্ময় চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে বলল, দোকানঘরটায় থাকছি বলে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না তো উপেনদা?

গলার স্বরটা বেশ মোলায়েম রাখে সে। তবু ঘেন্না ফুটে বেরোয়। মাথা নিচু রেখেই উপেন বলে, না, অসুবিধে কী?

অসুবিধে হলে বোলো। চলে যাব।

হচ্ছে না, বললাম তো।

হিরণ্ময় কিছুক্ষণ স্থবিরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে উপেনের দিকে। তার যে আজকাল রাগ হয় না বড় একটা। লক্ষণটা ভাল নয়। রাগ করতেও কেন যে ঘেন্না ধরে।

সাড়ে আটটায় ন' নম্বর বাস ধরে সোজা ডালহৌসির একটা সরকারি অফিসে চলে এল হিরণ্ময়। জগু এখনও আসেনি। দশটার আগে আসেও না। তবু হিরণ্ময় আগেভাগে এসে গেল জগুকে রাস্তায় ধরবে বলে। লেনদেনের কথা অফিসের চেয়ে রাস্তাতেই হওয়া ভাল। হিরণ্ময় প্রত্যাশা করছে, যে-কোনও একদিন জগু তাকে একটা চড় বা ঘুঁষি মারবে। মারবেই।

ধৈর্য ধরে হিরণ্ময় দাঁড়িয়ে থাকে। সময় যায়। হিরণ্ময় কিছু ভাবতে পারে না আজকাল। মাঝে মাঝে শুধু চারদিকটার ওপর একটা নিস্পৃহতার দৃষ্টি নিয়ে চায়। তার মরবার খুব দেরি নেই সে টের পায়। কিন্তু যত দিন না মরছে তত দিন তো বাঁচতে হবে। বাঁচা মানেই সেই হাগো, মোতো, খাও। প্রথম দুটো অশ্লীল নয়, তিন নম্বরটাই সবচেয়ে অশ্লীল এই দেশে। তার চেয়ে বেশ্যাবাড়ি যাওয়া অনেক সম্মানের।

অফিসের ফটক থেকে অন্তত পঞ্চাশ গজ দূরে হিরণ্ময় জগুকে পেয়ে গেল। জগুও তাকে দেখবে জানত। মুখটায় রস নেই। চোখ মিটমিট করছে।

মুখোমুখি হতে প্রথমে কথা হল না। জগু একটু থেমে পেরিয়ে যেতে যেতে বলল, হিরু, গত মাসে কথা দিয়েছিলি আর আসবি না।

হিরণ্ময় আস্তে করে বলল, এবারই শেষবার।

না হিরু, আর নয়। চলে যা।

বিশ্বাস কর।

জগু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কী বিশ্বাস করব? পার্টির জন্য তুই চাঁদা তুলছিস এ-কথা কি বিলিভেবল?

নয় কেন?

পার্টিই নেই, চাঁদা কীসের? তুই কোথায় চাঁদার টাকা জমা দিস? রসিদ দিস না কেন?

দিলে নিবি?

আলবাত নেব।

হিরণ্ময় আস্তে করে বলে, তোর সই করা পুরনো চাঁদার রসিদের ফয়েল আমার কাছে আছে

সো হোয়াট?

যদি বলিস তো লালবাজারে পাঠিয়ে দেব।

জগু তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর দাঁত কড়মড় করে বলে, ইজ নট ইট ব্ল্যাকমেল?

হিরণ্ময় হেসে বলল, ব্ল্যাকমেল কেন হবে! তুই কি পার্টিকে ভুলে যাচ্ছিস্ জগু? তোর না জান কবুল ছিল!

জগু ছোটখাটো মানুষ। রোগা এবং রাগী। কিন্তু রেগেও সে তো কিছু করতে পারে না! কী করবে? চাপা স্বরে বলল, আমার মতো বহু ছেলেই নকশাল ছিল। এখন তারা সব ছেড়েছুড়ে নর্মাল লাইফ লিড করছে। আমিও তাই করতে চাই।

হিরণ্ময় একটুও রাগে না বা হাসেও না। খুব স্বাভাবিক আলাপ করার মতো নরম স্বরে বলল, তুই ছাড়লেই তো হল না, পার্টি তো তোকে ছাড়েনি। আমাদের নিয়ম হল একবার যে ঢুকেছে তাকে মরা পর্যন্ত থাকতে হবে।

জগুর চোখ জ্বলে ধক-ধক করে, তেজি গলায় বলে, আমি কাউকে বন্ড লিখে দিইনি। কারও ক্রীতদাসও আমি নই। তুই যা।

তুই সরকারি অফিসার জগু, ভুলে যাস না।

তাতে কী?

তোর পুলিশ রিপোর্ট আমরা খারাপ করে দিতে পারি।

ইট ইজ ব্ল্যাকমেল।

না। ও-সব ভাবছিস কেন? সেই নরম গলায় হিরণ্ময় বলে, আমরা তো তোকে অ্যাকশনে নামাচ্ছি না, কাজেও লাগাচ্ছি না। তুই চাকরি করছিস কর, সুখে থাকিস থাক, কেবল মাসের শেষে আমাদের চাঁদাটা দিয়ে দিলেই মিটে গেল। সারা মাসে আর আমাদের মুখ দেখতে পাবি না।

জগু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এ-ব্যাপারটা যেন শেষ করে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি আজই পুলিশের কাছে যাচ্ছি।

বলে হাঁটতে থাকে জগু। হিরণ্ময় তৎক্ষণাৎ ওর পাশে পাশে সমান্তরাল চলতে চলতে বলে, ডেজারটার আমরা সহ্য করি না। মোটে এই ক'টা টাকার জন্য রিস্ক নিবি?

জগু মুখ ঘুরিয়ে হিরণ্ময়ের দিকে চেয়ে বলল, দ্যাখ হিরু, আমার খুব সন্দেহ হয়, টাকাটা পার্টি ফান্ডে যায় না। পার্টির সঙ্গে তোরও যোগাযোগ নেই। টাকাটা অন্য কোথাও যাচ্ছে।

হিরণ্ময় নির্বিকার থাকল; বলল, কোথায় যাবে! পার্টির কাজেই লাগছে। তোকে তো রসিদ দিতেই চাই, তুই নিতে ভয় পাস বলে দিই না, এবার থেকে না হয় তোর নামে রসিদ কেটে দিয়ে যাব।

একটা রসিদ বই ছাপিয়ে নেওয়া অতি সহজ কাজ হিরু। আবার এমনও হতে পারে, তোর কাছে কিছু পুরনো রসিদ বই থেকে গিয়েছিল।

হিরণ্ময় উত্তেজিত হয়ে বলে, মাইরি বিশ্বাস কর, পার্টির কাজেই টাকাটা লাগে।

কী কাজে সেটা স্পেসিফিকালি আমাকে বলতে হবে।

অনেকক্ষণ ধরে একটা ব্যথা টাটাচ্ছিল হিরণ্ময়ের নাভির চারপাশে। লক্ষণটা ভাল নয়। আর-একটা ব্যথা আছে পাঁজরার ঠিক নীচে বুকের কড়ার কাছে। দুটো ব্যথাই চেনে হিরণ্ময়। নাভিতে আমাশার ব্যথা, বুকে অ্যাসিডিটির। দীর্ঘকাল ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয় না, ওষুধের মুখ দেখে না, যা খুশি খায়, যখন খুশি ঘুমোয়। এ-সব তো হওয়ারই কথা। কিন্তু এইসব ব্যথা-বেদনা আজকাল তাকে খানিকটা অসহিষ্ণু করে ফেলেছে। অনেক সময় সে ধৈর্য রাখতে পারে না, এখনও পারল না।

শরীরে হঠাৎ খুব জোর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে বলল, আমি বলছি চাঁদাটা পার্টির কাজে লাগে। হোয়াই ডোন্ট ইউ বিলিভ? কী কাজ শুনবি?

জগু একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। অবাক হয়ে হিরণ্ময়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিছু বলল না। তবে উত্তেজনায় সাদা ঠোঁট দুটো কয়েকবার কাঁপল থরথর করে। কিছু কথা এসেছিল মুখে, বলতে পারল না।

হিরণ্ময় জগুকে দেখল বটে, কিন্তু লক্ষ করল না। সুখে-থাকা লোকদের ওপর তার আক্রোশটা অনেক পুরনো। সেই আক্রোশ তার ভিতরে ফণা ধরে জেগে ওঠে। সে বলল, এই চাঁদায় একজন পার্টির ক্যাডার খায়, পরে, বাঁচে। পার্টিটা তো একটা আইডিয়া মাত্র, ক্যাডার না থাকলে পার্টি হাওয়া। তাই যদি একজন ক্যাডার চাঁদার টাকায় বেঁচে থাকে তবে সেইটেই পার্টিরও বেঁচে থাকা। চাঁদাটা তাই পার্টির কাজেই লাগে। এখন বুঝলি?

স্পষ্ট বোঝা গেল জগু ভয় পেয়েছে। পাওয়ারই কথা। কিন্তু জগু কিছু না বলে আস্তে আস্তে তার অফিসমুখো হাঁটছিল।

হিরণ্ময় পাশাপাশি জগুর ছায়া মাড়িয়ে চলতে চলতে বলে, বালীর গোস্বামীপাড়ার শ্যামলকে সি সি আর লাইনের ধারে কে মেরেছিল জগু?

জগু থমকে যায়। তারপর আবার হাঁটে। ঠিক অফিসের দোরগোড়ায় এসে মুখ ফিরিয়ে বলে, দুটোর পরে আসিস।

তার গলার স্বরে কোনও ঘৃণা ছিল না, রাগ ছিল না। একটা গভীর হতাশার ভাব ছিল।

॥ ছয় ॥

বংশীর মাথার ওপর সব সময় একটা খাঁড়া ঝোলে। সে প্রায়ই হাওয়ার মুখে শুনতে পায় তাকে যে-কোনও দিন আমেদাবাদে বদলি করা হবে। এখানকার কর্তৃপক্ষ তার ওপর খুশি নন।

বদলির খাঁড়াটা যদি কোনও দিন ঝপ করে নামেই তা হলে কলকাতা একেবারে নেই হয়ে গেল। আমেদাবাদের অফিসে যারা যায় তারা আর ফেরে না কোনও দিন।

এই বিশাল বাণিজ্য অফিসে সে ঢুকেছিল রাসুকাকার ব্যাকিং-এ। যখন চাকরি পায় তখনই রাসুকাকা সাবধান করে বলে দিয়েছিল, বংশী, কাজ শিখে নিস কিন্তু। এ-সব কোম্পানিতে এফিসিয়েন্সিই হচ্ছে একমাত্র কথা। বড় মুখ করে ঢুকিয়েছি তোকে, মান রাখিস।

বংশী মান রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হয়নি। কোনও কোনও ব্যাপার আছে যা শুরু থেকেই বিগড়োয়। তার অফিসের ব্যাপারটাও তা-ই হয়ে দাঁড়াল। চাকরিতে ঢুকেই এ গ্রেড কোম্পানির লম্বা বেতন ভোগ করেছে সে, কিন্তু কখনওই স্বস্তি পায়নি। প্রথম থেকেই তার বদনাম রটেছিল ক্লামজি বলে।

মেজো সাহেব সগরের স্টেনো ছিল। তিন মাস পরে তাকে দেওয়া হল অ্যাকাউন্টসে। স্টেনো থাকার সময়ে সে সাংঘাতিক কয়েকটা ভুল ইংরিজি লেখে এবং বাড়িতে স্টেটসম্যান রাখতে শুরু করে।

প্র্যাকটিসও করত। স্পোকেন ইংলিশ শিখতে এক মেমসাহেবের কাছে যেতে শুরু করে। সগর সাহেব তার এই আন্তরিক চেষ্টার খবর রাখেননি। খুব অবহেলায় তাকে অ্যাকাউন্টসে পাঠালেন। কিন্তু সেই যে একটা নার্ভাসনেস তৈরি হল তারপর থেকেই সে অফিসের সব কাজকেই ভয় পেত। অ্যাকাউন্টসেও তার সুনাম হল না। সেখানে বাঘা বাঘা কমার্সপড়া লোক বসে কূট এনট্রি করে, কমার্শিয়াল টার্ম বলে, কোম্পানি আইন তাদের কাছে জলের মতো। তবু বংশী চেষ্টা করেছিল শিখতে। কিন্তু ক্রমেই বুঝতে পারছিল সে গড়ে সকলের নীচে পড়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু বলত না তাকে, ধমকাত না, ভুল ধরত না। কিন্তু বংশী নিজে নিজেই টের পেতে লাগল যে এই সেকশনে সে অ্যাভারেজও নয়। এটা হয়তো একটা মনের রোগ, তবে তার ফলে বংশীর চাকরির জীবনটা হয়ে গেল বিস্বাদ, ভয়ে-ভরা উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন।

অফিসের চ্যাটার্জি সাহেব তার একমাত্র খুঁটি। বছরখানেক আগে তিনি হঠাৎ একদিন ডেকে

পাঠালেন। ঘরে যেতে বললেন, শোনো বংশী, তোমার পারফরম্যান্স ব্রাইট হচ্ছে না কেন বলো তো! আই টুক ইউ টু বি এ ব্রাইট বয়! যাকগে, যদি ট্রানসফার অ্যাভয়েড করতে চাও তো প্রভিডেন্ট ফান্ড সেকশনে ঢোকো। আমার আর ছ' মাস বাকি রিটায়ারের, আমি চলে গেলে তোমাকে বদলি করবেই।

প্রভিডেন্ট ফান্ড শুনে বংশীর ভিতরটা নিভে গেল। ওই সেকশনে কেউ যেতে চায় না। এর আগে দু'জন ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে সরে পড়েছে। বিদিকিচ্ছিরি হিসেবের জঞ্জালে সে সেকশনটা একটা বিভীষিকা।

কিন্তু চ্যাটার্জি সাহেব আর কোনও অলটারনেটিভও দিলেন না। বললেন, যদি ওই সেকশনে কাজ দেখাতে পারো তবে চট করে লিফট পেয়ে যাবে। যারা পি এফ ডিল করে তাদের খাতির না করে কোম্পানির উপায় নেই। যাবে?

ছ' মাস হল বংশী প্রভিডেন্ট ফান্ডে এসেছে। কিন্তু আরও বেশি ম্রিয়মাণ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু ঘটেনি। যেন একটা বিশাল উলের বল ছাড়াতে গিয়ে জট পড়ে গেছে। জটের পর জট। কোনও দিনই ছাড়ানো যাবে না, তবু কেবলই নানা ফাঁক- ফোঁকর দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে ছাড়াতে গিয়ে আরও জট পড়ছে। মাঝে মাঝে হাওয়ার মুখে খবর আসে, আমেদাবাদে যাদের বদলি করা হবে তাদের লিস্ট হচ্ছে। আর তাতে বংশীর নাম আছে। চ্যাটার্জি সাহেব রিটায়ার করেছেন, সগর সাহেব দেশে ফিরে গেছেন, নতুন সাহেব এসেছেন বেদ। বংশীর খুঁটি নড়ে গেছে। খাঁড়া ঝুলছে।

অ্যাকাউন্টসে থাকতেই শুনেছিল কোম্পানির একটা পাঁচ লাখ টাকার বিল আটকে আছে গভর্নমেন্টের কাছে। বিল সেকশন কতগুলো ফ্যাঁকড়া তুলে দু' বছর ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে। তখন প্রায় সময়েই বিলটা নিয়ে কথা উঠত। সাগর নিজে অনেক চেষ্টা করেছিলেন বিল পাশ করানোর। হয়নি।

যে বিল সেকশনে কোম্পানির টাকাটা আটকে আছে সেখানে করুণাময় কাজ করে। মাঝে-মধ্যে টেলিফোনে করুণাময়কে নিজ দায়িত্বে বংশী জিজ্ঞেস করেছে, হ্যাঁরে আমাদের বিলটা কী হল?

অনেক ফ্যাকড়া আছে ভাই। কিন্তু তোরা কি ও টাকার জন্য বেতন পাচ্ছিস না নাকি?

ছোঃ! আমার কোম্পানি কত কোটি টাকা এক্সপোর্ট করে জানিস?

তবে আর বিলটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস কেন? কোম্পানিতে কোম্পানিতে লড়ালড়ি, তোর আমার তাতে কী?

তারপর অন্য দিকে ঘুরে গেছে কথা। বংশী বিলটা নিয়ে মোটেই ভাবেনি কোনও দিন। তবে করুণাময়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলে কথার ছলে বিলটার বিষয়ে জিজ্ঞেস করত মাঝে মাঝে।

আজ অফিসে এসে ফাঁকা টেলিফোনটা পেয়ে কিছু না-ভেবেই ডায়াল করল করুণাকে।

কেমন আছিস?

আর কেমন, যেমন সরকার রেখেছেন। তোর খবর কী?

আর খবর। কেটে যাচ্ছে।

আরে শোন, ভাল কথা। তোদের সেই বিল পাশ হয়েছে। চেক রেডি।

বংশী প্রথমে গা করল না। তবু যেন খুশির ভাব দেখিয়ে বলল, তাই নাকি?

আজই হল। আমার টেবিলেই চেক পড়ে আছে। ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারিস।

আমি গিয়ে কী করব। ও তো কোম্পানির টাকা।

আচ্ছা, তা হলে আমি তোর কোম্পানিকে আর-একটু ঝুলিয়ে তারপর চেক ইসু করব।

বংশী হাসল। দু'-একটা কথাবার্তা বলে টেলিফোন ছেড়ে দিল।

টিফিনে বংশী আড্ডা মারতে আসে পুরনো সেকশন অ্যাকাউন্টসে। আজও এসেছিল। বিজয় মিত্রর সঙ্গে বসে টোস্ট খেতে খেতে গল্প করছিল। এক সময় হঠাৎ বলল, সেই বিলটা পাশ হয়েছে?

বিজয় মিত্র মুখ বেজার করে বলেন, কই আর হল। রোজ বেদ-সাহেব বিলটার খোঁজ করছেন। তাঁকে নানা কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে হেড অফিসে। ওই একটা বিলের জন্য সগর সাহেবের ডিউ প্রমোশনটা পর্যন্ত হল না।

বংশী একটু কূট হাসি হেসে বলল, আমি বিলটা পাশ করিয়ে দিতে পারি।

তুমি? তা সেটা এত দিন বলোনি কেন?

বলিনি, কারণ কোম্পানি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি।

আরে ব্যবহার-ট্যবহারের কথা রাখো তো। সত্যিই পারো? না কি ইয়ারকি করছ?

ইয়ার্কি নয়। পারি, আমার সোর্স আছে।

বিজয় মিত্র সোজা হয়ে বসে বললেন, তা হলে দাঁড়াও একটু বেদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলি। বলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েও বিজয় মিত্র বললেন, তুমি সিরিয়াস তো?

আলবাত।

বিজয় মিত্র ফোন তুললেন। বেদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলে ফোন নামিয়েই বললেন, তুরন্ত সাহেবের ঘরে চলে যাও ভাই।

বেদ সাহেবের চেহারা কেমন? না, যদি শকুন খুব বুড়ো হয় তা হলে যেমন। তার ওপর অর্শ বা ভগন্দর গোছের কোনও একটা অসুখে খুব ভুগছেন বলে সাহেব সব সময়ে সঙ্গে একটা রবারের টিউব রাখেন। অনেকটা মোটরের চাকার টিউবের মতো, তবে ছোট। সেটা ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নিয়ে তার ওপর বসেন। টিউবের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় পশ্চাদ্দেশ থাকে বলে ব্যথা হয় না, বংশী শুনেছে।

এয়ারকন্ডিশন করা ঘরটার চেহারা পুরো মার্কিন ধাঁচের। কার্পেট থেকে শুরু করে সিলিং অবধি ঝাঁ চকচকে। এই ঘরে বুড়ো শকুনকে মানায় না।

বেদ সাহেব তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। ঘরে স্টেনো পর্যন্ত নেই।

বংশীকে বসতে ইঙ্গিত করেই খুব ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে এক প্যাকেট কিং সাইজ পলমল এগিয়ে দিয়ে বললেন, ক্যান ইউ মেক ইট টুডে?

ইয়েস স্যার।

হ্যাভ এ স্মোক।

বংশীর দ্বিধা হচ্ছিল। সিগারেট খাওয়াটা উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিল না। তবু লোভের বশে নিল। ধরাল।

বেদ সাহেবকে যত বুড়ো দেখায় ততটা যে তিনি নন তার প্রমাণ পাওয়া যায় হাসিতে। ভাঙাচোরা, রোগা সিড়িঙ্গে মুখে ঝকঝকে দাঁতের হাসিটা এক ঝটকায় দশ বছর বয়স কমিয়ে দেয়।

বেদ বলেন. টেক মাই কার।

কার? বংশী একটু অবাক।

ইট উইল সেভ টাইম অ্যান্ড হাজার্ডস। আই উইল বি ওয়েটিং।

বংশী একটা ঘোরের মধ্যে নেমে এল। রিসেপশনে দাঁড়িয়েই একটা ফোন করল করুণাময়কে, তুই কোথাও যাস না। থাকিস। আমি চেকটা কালেক্ট করতে আসছি।

করুণা বলল, শালা!

কী গাড়ি! কী গাড়ি! টমেটো রঙের বিশাল মারসিডিস বেনজ। অফিসের দরজায় বশংবদ দাঁড়িয়ে আছে তার জন্য। সাদা ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার তাকে সেলাম দেয়। ড্রাইভারটা কী করে যে চিনল তাকে কে জানে! রহস্য, রহস্য। জীবনটায় যে কত রহস্য রয়েছে এখনও।

গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ধরল ড্রাইভার। বংশী উঠল। তারপর ক্লিক আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। গাড়ির দরজায় যে এত মিষ্টি আওয়াজ হয় জানা ছিল না বংশীর। গাড়ির গদি স্তনের

মতো নরম। হালকা একটা সুগন্ধী ছড়ানো। গাড়ি ছাড়লে কোনও আওয়াজ পেল না বংশী, শুধু কী একটু কেঁপে উঠল। তারপর ভেসে চলল যেমন খালের জলে নৌকো দুলে দুলে যায়।

যখন বাসে বা মিনিবাসে চাপে বংশী তখন রাস্তাঘাটে কত চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু আজ চার দিকে চেয়ে কাউকেই দেখতে পায় না সে। সে যে আজ এক দুর্লভ গাড়ির একমাত্র সোয়ারি হয়ে যাচ্ছে সেটা দেখার মতো চেনামুখ কি পাওয়া যাবে না।

ড্রাইভার নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, স্যার, কোন দিকে যাবেন?

আগে ময়দান।

ড্রাইভার কোনও উত্তর করল না, বশংবদ চালাতে লাগল। সামনের ড্যাশবোর্ডে চেয়ে বংশী চোখ ফেরাতে পারে না। কী ঝকঝকে সব যন্ত্রপাতি, কী দারুণ সব গ্যাজেটস!

বাঙালি ড্রাইভার সম্ভবত আয়নায় তার মুগ্ধভাব দেখল। অকারণেই বলল, এইটাই স্যার একমাত্র ছোট গাড়ি যা ডিজেলে চলে।

ডিজেল?

লাখ খানেক দাম হবে।

এটাও অকারণে বলা। কিন্তু বংশী নড়ে বসে বলল, আমাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ো।

বাঙালি ড্রাইভার মাথা নেড়ে বলল, সেইরকমই অর্ডার আছে।

কী অর্ডার?

সাহেব বলে দিয়েছেন যেখানে যেতে চান সেখানে নিয়ে যেতে।

বলেছে?

হ্যাঁ। গাড়িটা ভাল কি না, সকলেরই চড়তে ইচ্ছে করে।

বংশী এ কথাটার অপমান গায়ে মাখল না। বরং আজকের দিনের অহংকারটা উপভোগ করার জন্য বলল, ঠান্ডা মেশিন চালু করো তো।

ড্রাইভার কয়েকটা সুইচ টিপল, চারটে জানালার কাচ উঠে গেল আপনা থেকেই। একটু পরে ঘাম-ঘাম ঠান্ডা ভাবটা টের পেতে লাগল বংশী। কখনও অফিস থেকে এত সম্মান পায়নি সে।

করুণাময় তাকে দেখে আর একটা খিস্তি দিয়ে বলে, তুমি আমাকে ইয়ে পেয়েছ বাঞ্চোত যে তোমার জন্য বসে থাকব? তখন বললাম চেকটা নিয়ে যা!

আরে ফ্যান্টাসটিক কাণ্ড শোন না, বেদ সাহেবের মারসিডিজ গাড়ি করে এসেছি। আজ আমার ফান্ডা আলাদা।

তাতে আমার কত জল গরম হল! জানিস তোর জন্য আজ টিফিনে পর্যন্ত যাইনি!

তোদের তো বাবা তিনটের পর থেকেই অনন্ত টিফিন, তারপর আর অফিসে ফিরতে হয় না।

সে দিন আর নেই। চা খাবি? আনাই তা হলে।

আগে চেক, পরে চা।

দিচ্ছি বাবা, বলে বাঁ হাতে অবহেলাভরে পাঁচ লাখের সেই চেকটা পেপারওয়েটের তলা থেকে তুলে দেখাল করুণাময় যেন সেটা একটা মরা ইঁদুর। বলল, তোকে বলেই দিচ্ছি, নইলে তোর কোম্পানিকে একটি মাস ঘোরাতাম।

বন্ধুগর্বে ভারী গর্বিত বোধ করল আজ বংশী। করুণাময়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব না থাকলে আজ এতটা ইম্পর্ট্যান্স পেত না, মারসিডিস গাড়ির ভিতরটা কেমন তা জানতেও পারত না।

করুণাময় চেকটা হাতে দিল না তার, খুব অবহেলায় আবার পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রেখে বলল, খবর কী বল, চেহারাটা বেশ রেখেছিস এখনও। আমি তো ডিসেন্ট্রিতে শেষ হয়ে গেলাম।

বংশী কিছুটা অধৈর্য। কোম্পানির চেকটার ব্যাপারে করুণাময়ের কোনও অনুভূতি নেই। নিত্যি সে এরকম কত চেক ইস্যু করছে। কিন্তু বংশীর সব মন-প্রাণ অনুভূতি ওই চেকটার জন্য টনটন

করে। ইচ্ছে করে এক খাবলায় চেকটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরে রাখে।

কিন্তু তা করে না বংশী। উত্তেজনায় দ্রুত শ্বাস, হৃৎপিণ্ডের কিছু বেশি চঞ্চলতা চেপে রেখে বলে, কলকাতায় ডিসেন্ট্রি কার নেই বাবা! আমারও আছে।

ছেলেকে কোন স্কুলে দিলি?

এইরকম সব অকেজো কথা, চেকটা পেতে দেরি হচ্ছে। বংশীর শরীর ছটফট করে, ঘাম দেয়। কথা বলতে বলতেও তার আধখানা মন কল্পনা করতে থাকে, বেদ সাহেবের ঘরে সে গিয়ে চেক নিয়ে দাঁড়িয়েছে, বুড়ো শকুনটা অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে আছে তার দিকে, যেন জায়ান্ট দেখছে।

করুণা চা খাওয়াল, টোস্ট সাধল। বলল, মাঝে-মধ্যে এসে দেখা করে যাস।

বংশী মাথা নাড়ে। আসবে। চেকটা অবশেষে সত্যিই হাতে পায় সে, কোম্পানির হয়ে নিজেই সই-সাবুদ করে।

বেরিয়ে আসার সময় বংশী ভাবে, এবার থেকে বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ-খবর আরও একটু বেশি রাখতে হবে। সলিল আছে ইন্ডেনে। পরিমল একটা বড় খবরের কাগজের প্রিন্সিপাল করেসপন্ডেন্ট। শ্যামল হাইকোর্টের প্র্যাকটিশনার, অরুণ আছে খোদ লালবাজারে। স্বদেশ রোশ কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিটিভ—এখনও মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে মুঠো মুঠো মাল্টিভিটামিন ক্যাপসুল চেয়ে এনে খায় বংশী। বন্ধুদের আরও অনেক বহু ইম্পর্ট্যান্ট জায়গায় বসে আছে। এতকাল এ-ব্যাপারটায় বংশী খুব সচেতন ছিল না। আজ ভাবল, প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখবে। চেনা দিয়ে রাখবে, কবে কখন কাকে দরকার হয় কে জানে! নিয়মিত যাতায়াত বা যোগাযোগ রাখলে কাজের সময় ভারী সুবিধা।

মারসিডিস গাড়িতে আরও কিছু জায়গায় টুঁ মারে বংশী। গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে গিয়ে মহিমের সঙ্গে দেখা করে। খানিক ধানাই-পানাই কথাবার্তার পর বলে, চল, সিগারেট খাওয়াব।

এখানে বসেই খা না, মহিম বলে।

দূর শালা, আয় না, আজ আমি কীসে এসেছি দেখে যা উঁকি মেরে।

মহিম কৌতূহলে উঠে আসে, মারসিডিজ গাড়ি দেখে চোখ বড় করে বলে, কার রে!

সাহেবের।

তোকে দিয়েছে কেন?

দেয়, দেয়। হোলড থাকলে দেয়।

মারসিডিসে চেপে আরও দু'-এক জায়গায় টুঁ দিল বংশী। ধর্মতলার ছোট একটা অফিসে সাত্যকির চাকরি, সেখানে তাকে পাওয়া গেল না, হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে পূর্ণেন্দুর খোঁজ করল, তার মুড ভাল নেই, বউয়ের ফার্স্ট ডেলিভারি কাটিয়েছে। মারসিডিস দেখে কিছু বলতে হয় বলে বলল, তোফা আছিস, এদিকে আমাদের ডি-এ কাটা যাচ্ছে।

ঘুরে-টুরে যখন অফিসে ফিরল তখন ছুটি হতে মোটে এক ঘণ্টা বাকি, একটা চেক আনবার পক্ষে সময়টা বেশিই নিয়েছে।

অফিসের ভিতর দিয়ে যখন বেদ সাহেবের ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন অনেকেই বংশীকে চেয়ে দেখল। দু'-একজন জিজ্ঞেস করল, চেক পেলেন? বংশী কেবল একটু স্মিত হাসল।

বেদ সাহেব অপেক্ষা করছিলেন, আজ স্লিপ দিতে হল না, বেয়ারা দরজা খুলে ধরে বলল, চলে যান ভিতরে, সাহেব বসে আছে আপনার জন্য।

বুড়ো শকুন কী যেন কাগজপত্র দেখছিল, বংশী ঢুকতেই মুখ তুলে চোখের চশমাটা আস্তে-আস্তে খুলে টেবিলে রেখে বলল, ডান ইট বনশী?

ইয়েস স্যার। বংশীর বুকটা দম খেয়ে চার ইঞ্চি বেরিয়ে আছে, আর সেই অবস্থাতেই সে লক্ষ করে বেদ সাহেব যে খুব বুড়ো নন তার আর-একটা প্রমাণ লোকটার চোখ। কটা ধরনের স্বচ্ছ

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর গম্ভীর। যা লক্ষ করে তা নিজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব দিয়ে লক্ষ করে। কিছু একটা ভিতরে না-থাকলে কি আর লোকটা মাগনা এত বড় হয়েছে, ভাবল বংশী।

বেদ সাহেব চেকটা হাতে নিলেন, একপলক দেখলেন। তারপর হেলাভরে টেবিলে ফেলে রাখলেন, যেমনটি করুণাময় রেখেছিল। চেকের সঙ্গে গাঁথা পারটিকুলারসটা উপেক্ষা করলেন।

বংশীর দিকে চেয়ে সেই বয়স-কমানো হাসিটা হেসে বললেন, নাউ সাম কফি।

বলতে হল না, কফি এসে গেল। বেদ সাহেব আবার পলমলের প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। মুখে হাসিটা নেই। গম্ভীর মুখে কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ ফর এভরিথিং।

কফিটা খারাপ নয়, সিগারেটটা খুবই ভাল। কিন্তু বংশী শুধু এটুকুর জন্যই চেক আনার দায়িত্ব নেয়নি, আমেদাবাদের ব্যাপারটা তার মিটিয়ে ফেলা দরকার, কিন্তু এত নগদানগদি কথাটা তুললে একটু ব্যবসার মতো শোনাবে না?

কিন্তু বংশী এও জানে, নাউ অর নেভার। বেদ সাহেবের মুখোমুখি বসে এই যে কফি আর সিগারেট খাচ্ছে, এই দুর্লভতম মুহূর্ত জীবনে আর নাও আসতে পারে। এ-সব লোক হয়তো নগদটাই বোঝে, বাকি-বকেয়া ভুলে যায়।

বংশী তাই নিজেকে একটু নেড়েচেড়ে সোজা হয়ে বসে গলাটা কিছু ভারী করে বলল, স্যার।

ইয়েস! বলে কপালে ভাঁজ ফেলে বেদ সাহেব তাকাল।

বংশীর ভাল লাগল না নজরটা। তবু সে যে একটা কাজ অফিসের হয়ে বাগিয়ে দিয়েছে সেটাও তো ভোলার নয়।

সে আরও সটান হয়ে গলা আরও ভারী করে বলল, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো টু আমেদাবাদ।

কথাটা ভিতরে আঁকুপাঁকু করছিল এতক্ষণ। বলে ফেলেই বংশীর ভিতরটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটা ঘাম দিল যেন।

বেদ সাহেব চেয়ে ছিলেন। হাসলেন না, মাথা নাড়লেন না। খানিক চুপচাপ থেকে মৃদুস্বরে বললেন, সি মি সাম আদার টাইম। আই শ্যাল থিঙ্ক ওভার ইট দেন! গুড ডে।

বংশী বেরিয়ে এল। মুখে কফির মিষ্টি স্বাদটা টকচা হয়ে গেছে। সিগারেটের ফিল্টারটা পুড়ে যাচ্ছে বলে একটা টান মেরে ফেলে দিল বংশী। করিডোরটা পার হতে হতে সে নানা কথা ভাবছিল। আসলে বেদ সাহেব তো কমিটমেন্ট করল না! মশা-মাছি তাড়ানোর মতো ঝাপটা মেরে উড়িয়ে দিল প্রায়। আর কি ওর মনে থাকবে?

বংশী এও ভাবছিল, চার-পাঁচ লাখ টাকার চেক এত বড় একটা সর্বভারতীয় কোম্পানির কাছে কতটুকুই বা! সে এনে না-দিলেও বিধিমতো একদিন ঠিকই চেকটা আসত। তবে হয়তো হেডঅফিস থেকে তাড়া দিচ্ছিল, হয়তো প্রশ্ন তুলেছিল অডিট। কে জানে কী! নইলে চেকটার জন্য বেদ সাহেব তার মারসিডিস ছেড়ে দিত না, কফি সিগারেট খাওয়াত না। নিশ্চয়ই চেকটা খুব গুরুতর কিছু, কিন্তু বংশীর এখন সেটাকে তত কিছু মনে হচ্ছিল না যা ভাঙিয়ে সে আমেদাবাদে বদলি আটকাতে পারে।

বড় কোম্পানিগুলো দুর্গের মতো, আর বংশীরা হল ইঁদুর। দেয়াল ফুটো করবার সাধ্য তাদের নেই। দুর্গের আনাচে-কানাচে তারা ঘুরে বেড়ায় বটে কিন্তু এর সব কায়দা-কৌশল জানে না। দুর্গটা যারা বানিয়েছে আর যারা চালাচ্ছে তারা তাদের লক্ষই করে না ভাল করে।

আজ রাত্রে বংশী একটা স্বপ্ন দেখল। বেদ সাহেব তাদের বাড়ির ভিতরের বারান্দায় বসে হরিণঘাটার দুধের বোতলের ঢাকনি খুলে কাঁচা দুধ খাচ্ছেন। বংশী বার বার বলছে—কাঁচা দুধগুলো খাবেন না স্যার, পেট গোলমাল করবে। সেই শুনে দীপালি খুব রাগ করে বলল, খোকাকে অমন করে বোলো না তো! খাচ্ছে খাক। শুনে বংশীরও বেদ সাহেবকে খোকা বলে ভাবতে কষ্ট হল না।

আর সে শুনল শোভেন্দ্রনাথ বাইরের ঘর থেকে বলছেন, সাহেব খাবে জানলে আর-এক বোতল কিনে আনতাম। ডিপোতে একস্ট্রা দুধ অনেক থাকে।

এটা দেখে ঘুম ভেঙে গেল বংশীর। আসলে স্বপ্নের জন্য নয়, ঘুম ভাঙার কারণ অন্য। জেগে টের পেল দীপালি তার ডান কাঁধে মুখ চেপে বড় বড় গরম শ্বাস ছাড়ছে। সে জাগতেই দীপালি বলে ওঠে, তোমার সঙ্গে একটা খুব জরুরি কথা আছে।

॥ সাত ॥

বেলা চারটে বাজতে না বাজতেই রূপালি দিদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। আর বেলা করলে অফিসের ভিড়ে বাসে উঠতে পারবে না।

সে রসা রোডের দিকে গেল। ওদিকটায় এমনিতেই ট্রামে-বাসে ভিড় লেগে থাকে। সে নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য লেন ধরে ল্যানসডাউন রোডে এইট-বি বাস ধরবে বলে হাঁটতে থাকে।

ফেব্রুয়ারির সূর্য এখনও প্রখর। তবু যাই-যাই শীতের মাঞ্জায় বাতাস ধারালো। গলিগুলো ফাঁকা-ফাঁকা। শুকনো বাতাসে ধুলো উড়ছে।

রূপালির মনটা খুব নির্জন। ভয়-ভয়। হিরণ্ময় ফিরে এসেছে।

হিরণ্ময়ের ফিরে আসা তার কাছে এখন যেমন দুঃখের, এক সময়ে তেমনি দুঃখের ছিল হিরণ্ময়ের চলে-যাওয়াটা। মানুষ কেমন নিজের অজান্তে বদলে যায়, ভেবে এই দুঃখের দিনেও রূপালি মনে মনে হেসে ওঠে। সে কত বদলে গেছে! হিরণ্ময় ফিরে এসেছে বলে তার কত গভীর দুশ্চিন্তা আজ!

গলি দিয়ে এগোলে একটা পার্ক। তার ধার দিয়ে রাস্তা ঘুরে গেছে। পৃথিবীর ওপরের আস্তরণটা ভারী উদাসীন। কিছুতেই ওপরের চেহারা দেখে তার ভিতরের গোলমাল বোঝা যায় না। ওই যে পার্কের বেঞ্চে বা ঘাসে দু'-চারজন গরিব কুঁড়ে লোক গামছা পেতে ঘুমোচ্ছে, রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে ছেলেরা—ওদের দেখলে কি বোঝা যায় যে এখানে মানুষের বেঁচে থাকা বড় কষ্টের? রূপালিকে দেখেই বা কে বুঝবে যে এখন সে তার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে!

সত্তর সালের মাঝামাঝি হবে। জুন মাস কি? হ্যাঁ জুন। তখনকার আমলে হিরণ্ময়ের পেট-কোঁচড়ে রিভলবার থাকত প্রায়ই। হিরণ্ময়ের গেঞ্জি পরার অভ্যাস ছিল না, শার্টের বুকের বোতাম খোলা থাকত বলে অনেকখানি বুক ও পেট দেখা যেত। হাড়ের কাঠামোটি ছিল মজবুত, মাংস বেশি ছিল না। জোরে হাসলে বা গান গাইলে ওর বুকের পাঁজরে একটা স্বাস্থ্যকর ঢেউ দেখা যেত। দুটো কাজের হাত ছিল তার—বোমা বাঁধত, মারত। চোখ দুটোয় অনেক জ্বালা ছিল। ঘৃণা ছিল। বি-এ পড়ত তখন। ছাত্র খুব খারাপ ছিল না। রবীন্দ্রসংগীতের ছিল পাগল ভক্ত। আবার যখন-তখন রবি ঠাকুর সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ কথাবার্তাও বলে ফেলত।

তখনও ইস্কুল ছাড়েনি রূপালি। সেবার তারা হায়ার সেকেন্ডারির টেস্ট পরীক্ষা বয়কট করে। বয়কটে রূপালির প্রথমে সায় ছিল না। রাধেশ্যামদা বুঝিয়ে দিল একদিন, বিপ্লবীকে যে তেষ্টার সময় এক গ্লাস জল দেয় সেও বিপ্লবী। আজকে যেটুকু ত্যাগ করবে তার হাজার গুণ হয়ে ফিরে আসবে।

রাজনীতি রূপালি একদম বুঝত না। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা দাবার মতো। যতক্ষণ দাবা খেলার চাল বোঝা না যায় ততক্ষণ খেলাটায় কোনও কৌতূহল থাকে না। কিন্তু নিয়মটা শিখে গেলে নেশার মতো পেয়ে বসে।

সত্তর সালের জুন মাসে ভীষণ গরম পড়েছিল। সন্ধের দিকে রাধেশ্যামদা এসে বললেন,

রূপালি, চার-পাঁচটা রুটি তৈরি করে দিতে পারিস? একজন কমরেডকে খাওয়াতে হবে।

কমরেডটি সঙ্গেই ছিল। বাইরের ঘরের আলোর চৌখুপি যত দূর গেছে তার বাইরে একটু আঁধারে দাঁড়িয়ে খুব অবজ্ঞার ভঙ্গিতে অন্য দিকে চেয়ে ছিল।

সেই প্রথম দেখা। পরে জানতে পারে, দূরের ছেলে নয়, যাদবপুরের বিজয়গড়ে বাড়ি। তবে সে পাড়া অন্য দলের দখলে বলে পালিয়ে আছে। কোথায় থাকত কে জানে। তবে রাধেশ্যামদা বা অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে প্রায়ই আসত রুটির জন্য। নিজে কোনও দিন চাইত না। কোনও দিন আলোতে এসে দাঁড়াত না। চেনা দিত না। তবু রূপালি চিনে গিয়েছিল।

রাধেশ্যামদার দলের একটি ছেলে খুব কাছ-ঘেঁষতে চাইত তখন। ভরভর করে অজস্র কথা বলত সে, অত কথায় রূপালির মাথা ধরে যাওয়ার জোগাড়। সে ছেলেটা রূপালিকে নকশাল বানাবার জন্য বিস্তর লিফলেট আর পুঁথিপত্র এনে দিত অযাচিতভাবে। কখনও সেগুলো পড়েনি রূপালি, গোপনে রেখে দিত। ছেলেটা তাকে গোপন মিটিঙে যাওয়ার নেমন্তন্ন করত প্রায়ই। রূপালি যেত না। কৃষ্ণা গ্লাস ওয়ার্কসের পিছনে সেন্ট্রাল পার্কে তারা ভাড়াটে বাড়িতে ছিল তখন। এমনিতে শান্ত জায়গা, কিন্তু ছায়ার মতো কিছু রহস্যময় ছেলে-ছোকরার আনাগোনা ছিল। সেখান থেকে যখন যাদবপুরের স্কুলে পড়তে আসত তখন প্রায় দিনই নেই-আঁকড়ে ছেলেটা পিছু নিয়েছে তার। কোথাও ঠিক ওত পেতে থাকত রোজ। কিছুতেই কোনও দিন রূপালি তাকে পছন্দ করেনি। কিন্তু সেই বয়সে সেই ছেলেটাই ছিল তার সবচেয়ে একনিষ্ঠ ভক্ত, তাই তাকে তাড়িয়েও দিত না সে।

একদিন ইস্কুলের রাস্তায় খুব আচমকা লম্বাপানা শক্ত চেহারার সেই রহস্যময় হিরণ্ময় যেন মাটি ফুঁড়ে তার পাশে দাঁড়ায়। একটু হেসে বলে, সুজিত তোমাকে খুব জ্বালাতন করে! তাই না?

রূপালি অবাক। একটু ভয়ে ভয়ে বলল, কই না তো!

ছেলেটার একটু গণ্ডগোল আছে। যাকগে, তুমি ভয়টয় পেয়ো না। অপছন্দ হলে বলে দিয়ো। আর আসবে না।

রূপালি হিরণ্ময়কে সেই প্রথম দিনের আলোয় দেখে। সুন্দর কুচ্ছিৎ কিছুই মনে হয়নি। তবে খুব পুরুষালি লেগেছিল। কোনও ন্যাকামি নেই। কথাবার্তা সংক্ষেপে। মাপা হাসি। যেমন হঠাৎ ভুঁইফোঁড় হাজির হয়েছিল তেমনি আবার বড় রাস্তার লোকজনের মধ্যে টপ করে হারিয়ে গেল।

সেদিনই আবার সন্ধেবেলা এল হিরণ্ময় তাদের বাসায়। আর সেই প্রথম সে একা আসে।

রূপালিদের বাসায় ছেলে-ছোকরাদের আনাগোনা বরাবরের। কেউ কিছু মনে করে না। তার বাবা নিতান্ত ভালমানুষ আর ব্যক্তিত্বহীন। পারতপক্ষে কোনও ব্যাপারে নিজের মতামত দেন না, দিলেও মা'র কাছে ধমক খেয়ে নির্জীব হয়ে যান। তাদের বাড়িতে বহিরাগতের ভিড় প্রধানত দুটো কারণে। এক হল গান, আর-একটা রাজনীতি। বাবা পরাধীনতার আমলে কলেজ ছেড়ে আইন অমান্য করতে নামেন। জেল খেটেছেন, স্বাধীনতার পর ভেবেছিলেন, এবার তাঁর একটা কিছু হবে। কিন্তু কিছু হল না। তবে কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে বরাবরই ছোট মাপের একটু নেতা গোছের হয়ে রইলেন। দু'-একবার বিধানসভার নমিনেশন পেতে পেতেও পাননি। না পাওয়ার কারণ লোকটার সহজ-সংকোচ কিংবা চক্ষুলজ্জা। দাপের লোক হলে ঠিকই নমিনেশন আদায় করতেন, আর হয়তো জিতেও যেতেন। বক্তৃতা তিনি অবশ্য খুবই খারাপ দেন। লোকে তাঁর কথা শুনে মোটেই প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। ব্যক্তি হিসেবে আর ক'টা লোকই বা জেতে, তাদের জেতায় দল।

রূপালির বাবা দেবেনবাবুর তাই রাজনীতিতে উন্নতি হয়নি। তবে তিনি অনেকগুলো সংগঠনের চেয়ারম্যান, সভাপতি, সেক্রেটারি এবং আরও কী কী সব। ছাতুবাবুর গলিতে একটা ইলেকট্রোপ্লেটিং-এর কারখানা আছে তাঁর, তা থেকে মন্দ রোজগার হয় না। অন্তত রূপালিয়া

কোনও দিন পয়সার অভাব তেমন টের পায়নি। বেশ বড় বাড়ি ভাড়া করে তারা থাকে এখনও। দেবেনবাবুর দেদার খরচের হাত, তাই দু' বেলা তারা খায়-পরে ভালই। রাজনীতির সূত্র ধরে সারা দিন লোকজনের আনাগোনার বিরাম নেই। যারা আসে তারা সবাই আর কিছু না হলেও চা-বিস্কুট খেয়ে যায়। সত্তর সাল নাগাদ দেবেনবাবু তাঁর দলেব ওপর বিগড়ে যান। কী কারণে কে জানে, তিনি তখন থেকে নকশালদের হয়ে সাফাই গাইতেন, বলতেন— ওরা তো তবু কিছু করছে! কিন্তু তিনি অতিশয় ভালমানুষ বলে তাঁর কাছে আজও নানা দলের লোক আসে, কারও সঙ্গে বিবাদ নেই।

এই হল রূপালির বাবা। অন্য দিকে গানের সূত্রে তাদের বাড়িতে আরও লোকের আনাগোনা। রূপালির মা অলকা দেবীর প্রথম রেকর্ড বেরোয় ১৯৪০ সালে। চার বছর পর আরও এক বার। ঢাকা রেডিয়ো সেন্টার থেকে প্রায়ই ভজন আর রাগপ্রধান গাইতেন সে আমলে। তবে অলকা দেবী শেষ পর্যন্ত তেমন নাম করতে পারেননি। তাঁর ক্ষোভ—লোকে চান্স দিল না।

সে যাই হোক, তেমন নাম করতে না-পারলেও অলকা দেবী গান ভালই জানেন। আর গান ভালবাসেন পাগলের মতো। দিন নেই রাত নেই যখনই ঝোঁক হল তখনই হারমোনিয়াম বা তানপুরা নিয়ে বসে গেলেন। নয় তো খালি গলাতেই। তাদের বাড়িতে তাই গানাদার, তবলচি, সংগীতরসিকদের ভিড় লেগেই আছে। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত গান আর পলিটিক্সে বাড়ি সরগরম। চেনা-অচেনা লোকের ভিড়। রূপালিরা ছেলেবেলা থেকেই অচেনা লোকের কোলে কোলে ঘুরে মানুষ সম্পর্কে প্রাথমিক সংকোচ কাটিয়ে ফেলেছে।

এ-রকম বাড়িতে সাধারণত চারিত্রিক শুচিবাই কিছু কম থাকে। যুবতী বা কিশোরী মেয়ে কোনও ছেলের সঙ্গে কথা বললে বা মিশলে কারও চোখ কপালে ওঠে না। সন্ধের পর বাড়ি না-ফিরলে কেউ ভাবতে বসে না। অত কথারই বা কি, তার মা অলকা দেবী সম্পর্কেও রূপালি কত কথা শোনে! যৌবনকালে মায়ের নাকি অনেক প্রেমিক ছিল, এখনও দু'-চারজন আছে। রূপালি সে কথা অস্বীকার করে না। যেমন, প্রণবমামা। এ লোকটা সারা জীবন বিয়ে করল না, বুড়ো হতে চলল। এখনও প্রায়ই আসে। কোনও আত্মীয়তা নেই তবু মা আর প্রণবমামা পরস্পরকে 'তুমি' করে কথা বলে। দু'জনের অনেক মান-অভিমানও হয়। বাবা এ-সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এখন এমন হয়েছে যে প্রণবমামা তাদের বাড়ির আপনজন হয়ে গেছে। মা'র আর এক জন আছে কালীমামা। গাড়ি-বাড়িওলা বড়লোক ডাক্তার। নিজে ভারী ভাল গান করেন, তবে ব্যস্ত ডাক্তার বলে গানের লাইন ছেড়ে দিতে হয়েছে। প্রায় রবিবার বিকেলেই হইহই করে এসে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে যান। রাতে প্রচণ্ড খাওয়া-দাওয়া হয়। সেদিন মদের আয়োজনও থাকে। এই কালীমামার মেজো ছেলে বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছে। পাশ করে এখন আরও কী পড়ছে। কালীমামা বলে রেখেছেন, সেই ছেলে ফিরলে রূপালির সঙ্গে বিয়ে দেবেন। এই ছেলের নাম আনন্দ। তাকেও প্রায় শৈশব থেকে চেনে রূপালি। ডাকাতের সর্দারের মতো কালো বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। অনেকটা কালীমামার মতোই। তবে কালীমামা কালো হলেও মুখ-চোখ কেষ্টঠাকুরের মতো সুন্দর, দু'খানা চোখ নজরুলের চোখের মতো বড় বড়। আনন্দ বিলেতে পড়ে আছে দশ বছরেরও বেশি। প্রায়ই শোনা যায়— এবার আসবে।

রূপালিরা ছেলেবেলা থেকেই একটা ভাগ করে নিয়েছে। মায়ের বন্ধুরা মামা, বাবার বন্ধুরা কাকু বা জেঠু। আর অল্প বয়েসিরা সবাই দাদা।

এই দাদা, কাকু, জেঠু আর মামাদের ভিড়ে ভরতি বাড়িতে হিরণ্ময়ের প্রবেশ কেউ তেমন লক্ষও করেনি। আর হিরণ্ময়কে প্রথমে ততটা পাত্তাও দেয়নি রূপালি। কত ছেলে আসে, ও তার মধ্যে একজন বই তো নয়!

কিন্তু হিরণ্ময় নিতান্ত একজন হয়ে থাকতে চাইল না তো! যেদিন একা এল সন্ধ্যাবেলায়, সেদিনও গানের আসর বসেছে বাসায়। রূপালি পড়া করবার চেষ্টা করছিল। এই ভিড়ের বাড়িতে

পড়াশুনো করা তাদের কাছে এক সমস্যা। এক-একটা পরীক্ষায় সাদামাটা ভাবে পাশ করতেও তাদের দম বেরিয়ে গেছে। দিদি দীপালি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করেছিল দু'বারে এবং কম্পার্টমেন্টালে। দাদা রথীন পলিটেকনিক পার হয়ে ব্যবসা করে বাবার সঙ্গে। সোনালিরও পড়াশুনো বেশিদূর হওয়ার নয়, তবে সবাই বলে সে গানে নাম করবে। ছোট ভাই বিলু সামনের বছর পরীক্ষা দেবে। কিন্তু সে খুবই বদ সঙ্গে পড়ে গেছে। তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। তবে সে তার মায়ের অত্যধিক আদরের।

পাড়ার লোকে তাদের বাড়ির নাম দিয়েছে 'বাইজিবাড়ি'! এমন কানাঘুষোও শোনা যায় যে, ছোট ভাইটা নাকি তাদের বাবার সন্তান নয়। রাগে গা জ্বলে যায় রূপালির, কিন্তু কী করার আছে? ভাইটার ওপর বরং আরও স্নেহ গিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ভাবে, কেন এ-রকম বদনামের বাড়ি হল তাদের?

এই সব ভেবে মাঝে মাঝে বড় মন খারাপ হয়ে যায় রূপালির। যেদিন হিরণ্ময় এল সেদিনও মন খারাপ ছিল। একই টেবিলের দু'পাশে সে আর ছোট ভাই বিলু পড়ছে। বিলু পাড়ার একটা বাজে ইস্কুলে পড়ে। তেমন মাথা নেই, মনোযোগও নেই। ভাইটার জন্য রূপালির তাই বেশ দুশ্চিন্তা। রোজ নিজে নিয়ে পড়াতে বসে। ইস্কুলের টাস্ক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সেদিনও বিলুর রাফ খাতা উলটেপালটে দেখতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা পাতায় অনেক কাটাকুটি খেলার ঘর, পেনসিল আঁকা একটা মানুষের মুখ। এ-সব প্রায়ই থাকে। তবে সেদিন আর-একটা নতুন জিনিস দেখা গেল। সেই পাতার একেবারে নীচে ডান দিকের কোণে কে যেন লিখেছে— তোর বাবা কে রে?

বদনাম কত দূর গেছে চিন্তা করে রূপালি রাগে অস্থির। বার বার বিলুর চুলের ঝুঁটি ধরে জিজ্ঞেস করে, বল কে লিখেছে, বল শিগগির। বিলু বলতে পারল না। ক্লাসের কোনও দুষ্টু ছেলে লুকিয়ে লিখে দিয়েছে, বিলু টের পায়নি।

মনটা বিষ হয়ে ছিল সেদিন সন্ধেবেলায়। আর তার একটু পরেই হিরণ্ময় এল।

তাদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হয় রাতে ঘুমোনোর সময়। নইলে ভোর থেকে অনেক রাত অবধি হাঁ করে খোলা থাকে। সারা দিন অবাধে লোক ঢুকছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। এই এত লোকের মধ্যে যদি চোর ডাকাত পাজি বদমাশও কেউ ঢুকে পড়ে তা হলেও কেউ কিছু টের পাবে না।

হিরণ্ময় অবশ্য খোলা দরজা পেয়ে ঢুকে পড়েনি আর পাঁচটা লোকের মতো। তখন হিরণ্ময়ের স্বভাবই হয়ে গিয়েছিল আড়ালে থাকা। সহজে আলোয় আসত না, লোকালয়ে যখন-তখন বেরিয়ে পড়ত না, চেনাও দিত না তেমন কাউকে। রূপালি কখনও দেখেনি হিরণ্ময় সহজে কারও সঙ্গে ভাব করেছে। সন্দেহই ছিল তখন হিরণ্ময়ের নিত্যসঙ্গী।

বাইরে থেকে হিরণ্ময় দু'-চারবার গলাখাঁকারি দিয়েছিল। তাবপর একবার মৃদুস্বরে বলল, ও খুকি!

রূপালি তখন চোখের জল মুছে নিজেকে সামলাচ্ছে। বুকে তখনও রাগের বিষ-ছোবল। থমথমে মুখে উঠে গিয়ে বাইরের ছায়ামূর্তির দিকে চেয়ে তেতো গলায় বলল, আজ খাবার নেই। পয়সা দিচ্ছি, কিনে নেবেন।

বলে নিজের ব্যাগ থেকে দুটো টাকা নিয়ে এসে দরজার ভিতর থেকেই বাড়িয়ে ধরে বলে—নিন।

তখন অন্ধকারে হিরণ্ময়ের সাদা হাসি ঝলসে উঠতে দেখে রূপালি! আর তৎক্ষণাৎ এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা যে কত দূর অভদ্রতা তা বুঝতে পারে সে। তাদের বাড়ি থেকে অতিথি বড় একটা ফিরে যায় না। তাদের খাওয়ার সময়ে রোজই বাইরের দু'-চারজন লোক থাকেই। হুট করে কেউ এলে পাত পেড়ে বসে যেতে বাধা নেই। তা ছাড়া দিনরাত চায়ের জল ফুটছেই ব্যস্ত রেস্টুরেন্টের মতো।

হিরণ্ময় হেসেই বলল, আজ খাব না। এক বিয়ে বাড়িতে খুব খাওয়াবে আজ।

রূপালি টাকাটা মুঠোয় লুকিয়ে বলল, তবে?

এমনি এলাম। খাব না যে তাই জানাতে।

ও।

হিরণ্ময় একটু ইতস্তত করে বলল, তবে আমার কিছু টাকাও দরকার। তুমি দিতে পারবে?

রূপালি একটু বিরক্ত হল। টাকাটা বড় কথা নয়; কিন্তু ও ছেলেটা চাইবে কেন? টাকা চাওয়ার মতো সম্পর্ক তো নয়।

রূপালি গলার তেতো ভাবটা না লুকিয়েই বলে, আমার কাছে তো আর টাকা থাকে না।

এইমাত্র যে টাকা দিচ্ছিলে!

সে তো মোটে দু-টাকা।

ওঃ! ওতেই হয়ে যাবে। পারলে কাল আবার দু'টো টাকা দিয়ো। তারপর আমি টাকা পেয়ে যাব।

এই বলে হিরণ্ময় আলোর চৌখুপির মধ্যে এগিয়ে এল। ঘামে ভেজা চপচপে মুখ। গালে জ্যাবড়া দাড়ি। চোখে এক অস্বাভাবিক ঝকঝকে ভাব। দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু অসম্ভব পুরুষালি। কাছে আসতেই যেন তার গা থেকে একটা গনগনে আঁচ রূপালির গায়ে এসে লাগে।

হিরণ্ময়ের হাতে টাকাটা দেওয়ার সময় সামান্য লজ্জা করছিল রূপালির। খারাপ ব্যবহারটুকু না করলেও পারত সে। ছেলেটা তো নিশ্চয়ই খুব আরামে থাকে না। আজ একে রুটি দিতে কেন যে অনিচ্ছা হল তার তা কে জানে! ছেলেটা কি টের পেল?

কিন্তু রূপালির ধারণাটা ভেঙে দিয়ে হিরণ্ময় টাকাটা প্যান্টের পকেটে পুরে বলে—আমাকে একটু চা খাওয়াতে পারো? নেমন্তন্নর এখনও ঢের দেরি আছে। গেস্টরা সব চলে না-যাওয়া পর্যন্ত কোনও নেমন্তন্ন বাড়িতে আমার ঢোকা বারণ। এগারোটার পরে গিয়ে খাব।

রূপালি জানে যে চা দোকানেই পাওয়া যায়। তবু হিরণ্ময়কে দোকানে যেতে বলল না সে। মৃদুস্বরে বলল, ঘরে এসে বসুন। দিচ্ছি।

ঘরে আসতে একটু দ্বিধা করে অবশেষে ঢুকে পড়ল হিরণ্ময়। বিলুর টেবিলের উলটোদিকে রূপালির চেয়ারটায় বসে যেন সাফাই গেয়ে বলল, চা খেয়েই চলে যাব।

চা আনতে দেরি হয়নি রূপালির। চায়ের জল তাদের বাড়িতে তৈরিই থাকে। চা নিয়ে এসে দেখে হিরণ্ময় বিলুর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে। বলার ভঙ্গির মধ্যে সেই চোর-চোর সংকোচের ভাবটা নেই। রূপালি ঘরে ঢুকতেই অবশ্য খানিকটা জড়সড় হয়ে বসল। একটু লাজুক হাসিও হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনওটাই ওকে মানাল না। রূপালি পরিষ্কার বুঝতে পারল, এ-ছেলেটা ভদ্রতা সভ্যতা তেমন জানে না।

সেই সন্ধেবেলা হিরণ্ময় খানিকক্ষণ ছিল। বিলুকে ছুটি দিয়ে রূপালি বসে বসে কথা বলল ওর সঙ্গে। তেমন কিছু কথা নয়। মনটা খারাপ ছিল, তাই কথা বলে সেটা কাটানোর চেষ্টা। কথার মধ্যে বাধা পড়ছিল বার বার লোকজনের যাতায়াতে।

সেদিন হিরণ্ময় যাওয়ার সময় বলে গেল, তোমাদের বাসায় বেশি আসা আমার পক্ষে সেফ নয়। অনেক লোকের আনাগোনা তোমাদের বাসায়, কবে কে চিনে ফেলে।

রূপালি হেসে বলে, আমাদের বাসায় কিন্তু পুলিশের লোকও আসে।

জানি। হিরণ্ময় সিরিয়াস হয়ে বলে, তাই ভাবছি খুব বেশি আসব না। মাঝে মাঝে আসব।

রূপালির জিভের ডগায় জবাব এসে গিয়েছিল, আসবার দরকার কী? কিন্তু জিভের কথাটা ঠোঁট দিয়ে আটকে রেখেছিল সে।

সে-বয়সে রূপালি ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে প্রচুর মিশেছে। ছেলেদের সম্পর্কে তার তেমন লজ্জা-সংকোচ নেই, কারও দিকে তেমন বেশি কিছু আগ্রহও ছিল না। তা ছাড়া সে তো জানত

আনন্দর সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। সেই ডাকাতের সর্দার বিলেতে পড়াশুনো করছে।

হিরণ্ময় বলে গেল, বেশি আসবে না, কিন্তু পরদিনই স্কুলের রাস্তায় ফের ধরল রূপালিকে। সন্ধের পর এল বাসায়। তারপর আবার। আবার।

রূপালির ব্যাপারটা বুঝতে একটুও সময় লাগেনি। মনে মনে হাসত সে। ওপর ওপর একটু প্রশ্রয়ও দিত। দোষ কী? হিরণ্ময়ের পুরুষ-ভাবটা তার খুব ভালও লাগত।

অল্প বয়সের টান-ভালবাসা ধসের মতো নেমে আসে। হঠাৎ একদিন মনে হয়, আমি ওকে ভালবাসি। আর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক ভূমিকম্পে সারা দুনিয়া লোপাট হয়ে যায়, বুদ্ধি-বিবেচনা যায় গঙ্গার জলে। কেবল সেই পুরুষটি থাকে, পুরুষের কাছে মেয়েটি।

যখন সেই বেনোজল রূপালিকে ভাসাল তার একটু আগেও সে সাবধান হওয়ার সময় পায়নি। দায়ী ছিল হিরণ্ময়ও। সে কেন বাঁকুড়ায় চলে যাবে বলে অমন করে ভয় দেখাল রূপালিকে?

শেষ পর্যন্ত বাঁকুড়ায় চলে গিয়েছিল হিরণ্ময়। কিন্তু তার আগে তারা কাণ্ডটা ঘটাল গিয়ে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে। চূড়ান্ত ছেলেমানুষি যাকে বলে। রূপালি জানে তখনও তার বিয়ের আইনসম্মত বয়সও হয়নি। কাঁপা হাতে সই করে দিল রূপালি। আর তার দেড় মাসের মাথায় চলে গেল হিরণ্ময়।

বিরহ কাকে বলে তা রূপালি অনুভব করেছিল মাত্র মাসখানেক। তারপরই হঠাৎ একদিন হিসেবি বুদ্ধি মাথা চাড়া দিল, জেগে উঠল হারানো বুদ্ধি বিবেচনা। এটা সে কী করেছে? যত দিন গেল ততই তার নিজের কাছে প্রকট হয়ে উঠল নিজেরই বোকামি। যত বার হিরণ্ময়ের কথা ভাবত তত বার কেঁপে উঠত ভয়ে। রেজিস্ট্রির কিছু দিন পরেই সে রাধেশ্যামদার কাছে শুনেছিল হিরণ্ময় একটা খুন করেছে। সেটা সবাই জানে। গোপনে আরও দু'-একটা করে থাকতে পারে।

যখন প্রেমে পড়েছিল তখন এ-ব্যাপারটা তার মাথায় খেলেনি। হিরণ্ময়ের চোখের সেই জ্বলজ্বলে ভাবটা যত বার মনে পড়ে তত বার সে টের পায়, একমাত্র খুনির চোখেই ও-রকম তীব্র দৃষ্টি থাকে।

কিন্তু খুনি বলেও নয়, বিপ্লবী বলেও নয়, হিরণ্ময়কে আসলে রূপালি নিয়েছিল নিরুপায়ের মতো। যখন রেজিস্ট্রি করেছিল তখন রূপালি মাত্র সতেরোয় পা দিয়েছে। তখন তার চিন্তার গভীরতা তেমন ছিল না। ভাব-প্রবণতা ছিল। আর ছিল বদনামের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা তীব্র ইচ্ছে। যত বড় হচ্ছিল রূপালি ততই নিজেদের পরিবার নিয়ে তার লজ্জা আর রাগ বাড়ছিল। তা ছাড়া এ-বাড়িতে নির্জনতা নেই, একাকিত্ব নেই। উন্মাদ গান, উদ্দণ্ড আলোচনা, অজস্র অচেনা মানুষের ভিড়। ক্রমে এ-সবই খারাপ লাগছিল তার। বয়ঃসন্ধির মেয়েদের কখনও একটু গোপন সময়ের দরকার, কখনও চাই একটু অসময়ের ঘুম, নিরিবিলিতে বসে একটু বই পড়া। তার কিছু সম্ভব নয় তাদের বাড়িতে। সে একটা পালানোর অবলম্বন পেয়েছিল হিরণ্ময়ের মধ্যে।

ঠিক হয়েছিল, হিরণ্ময়ের সঙ্গে সেও বাঁকুড়ায় চলে যাবে। কাউকে কিছু জানাবে না।

হিরণ্ময়ের থাকার জায়গার কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না। তখন হিরণ্ময় সেন্ট্রাল পার্ক ছেড়ে কেয়াতলা আর পূর্ণ দাস রোডের মোড়ের কাছে এক মেসবাড়িতে থাকে। একটা দু'-ঘরের ফ্ল্যাটে জনা পাঁচেক চাকুরে ছেলে মেস বানিয়ে ছিল। কোন লতায়-পাতায় সূত্র ধরে সেখানে গিয়ে হিরণ্ময় আড্ডা গাড়ল। একা নয়, তার সঙ্গে আবার নাথু আর দু'জন নকশালও ছিল। হিরণ্ময়ের বন্ধু বা সঙ্গীদের কোনও দিনই ভাল চোখে দেখেনি রূপালি। তাদের হাবভাব কেমন যেন রুক্ষ, কাঠ-কাঠ, সব সময়ে ঝগড়া মারামারি বা হাঙ্গামার জন্য মুখিয়ে আছে। যে মেসবাড়িতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল সেখানকারই দুটো ছেলেকে তারা প্রচণ্ড মার দেয় একবার।

দুপুরের ফাঁকা মেসবাড়িতে হিরণ্ময় রূপালিকে যেতে বলত। বলত, ভেড়ুয়াগুলো দুপুরবেলায় থাকে না। যদি আসতে পারো সে সময় তবে আমাদের ফুলশয্যাটা হয়ে যায়।

রূপালি তখন পাগল। চলে যেত। হিরণ্ময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সেই সময়ে সে লক্ষ করত হিরণ্ময়ের বেঁচে থাকার অভ্যাসগুলির মধ্যে কোনও স্বাভাবিকতা নেই। সে জামা-কাপড় বড় একটা বদলায় না। সারা দিন প্যান্ট পরে কী করে যে একটা লোক থাকে, প্যান্টসহ ঘুমোয়ই বা কীভাবে তা রূপালির মাথায় আসত না। নিজস্ব কোনও বাড়তি জামা-কাপড় তার ছিল না, বিছানা ছিল না, টুথব্রাশ ছিল না, চিরুনি নয়, সাবান নয়, গামছা বা তোয়ালে নয়। পয়সার সমস্যা তো ছিলই। নিজস্ব বলতে গায়ের জামা-কাপড় ছাড়া আর একটা জিনিস মাত্র ছিল হিরণ্ময়ের, একটা ছ'-ঘরা রিভলভার। সেটা যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখত সে, তবে রূপালি জানত। হিরণ্ময় এক দিন বলেছিল, রিভলভারটা খুব এলেবেলে নয়। এ-সব জিনিস নাকি কেবল পুলিশ আর মিলিটারিদের থাকে।

তুমি কোথায় পেলে? রূপালি জিজ্ঞেস করেছিল।

পেয়েছি। হিরণ্ময় এর বেশি কিছু বলত না।

হিরণ্ময়ের অনেকটাই ছিল রহস্যময়। যেমন সেই রিভলভারটা। কোথায় সেটা পেয়েছিল ও, কীভাবে ওর হাতে এল তা কিছুতেই বলত না কোনও দিন। রূপালি এ-ও জানত না রিভলভারটা হিরণ্ময় কোনও দিন কাজে লাগিয়েছে কি না। রূপালি স্পষ্ট জানত না হিরণ্ময়ের বাবা-মা কে, কোথায় থাকে, বাড়িতে কে কে আছে। প্রশ্ন করলে খুব আবছা, অস্পষ্ট জবাব দিত সে, কখনও বা অসন্তুষ্ট হয়ে বলত, তুমি তো আমাকে বিয়ে করেছ, আমার পরিবারকে তো আর করোনি। ও-সব জেনে কী হবে?

কী বলছ! আমার যারা শ্বশুর-শাশুড়ি তাদের কথা জানব না? রূপালি অবাক হয়ে বলত।

আরে ও-সব বাদ দাও। আমিই তাদের বাদ দিয়ে দিয়েছি। বলত হিরণ্ময়।

আর হিরণ্ময়ের সেই অচেনা রহস্যময় আধখানা পরিচয় যত অজানা থাকত ততই অস্থির বোধ করত রূপালি। সে ঠকে গেছে কি না, চূড়ান্ত ভুল করে কিছু করে ফেলেছে কি না তা নিয়ে মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছিল।

দুপুরের মেসবাড়িতে মেসের ছেলেরা প্রায় কেউই থাকত না। থাকত নাথু, ষষ্ঠী আর হিরণ্ময়। দরজা-জানালা বন্ধ করে গ্রীষ্মের দুপুরে তারা হয় ঘুমোত, না হয় চুপচাপ সিগারেট খেত। মাঝে মাঝে বটতলার এঁদো দোকান থেকে ক্ষুদে কাচের গ্লাসে চা আনিয়ে খেত। রূপালি যেত ইস্কুল থেকে পালিয়ে।

প্রায় দিনই দরজা খুলত নাথু বা ষষ্ঠী। নাথুর চেহারা ছিল দেখবার মতো বলিষ্ঠ। ফরসা রং। গায়ে ডিম-ডিম মাংস ফুলে আছে, মুখখানা চৌকো, চোখ দু'খানা ছিল ভীষণ নির্লজ্জ। ষষ্ঠী ছিল রোগা, লম্বা। খুব নির্বিকার ভাব ছিল মুখে। কিন্তু সেই নির্বিকার ভাবের মুখোশটার নীচে ছিল মিটমিটে শয়তানি। দু'জনেই রুপোলিকে খুব চেয়ে চেয়ে দেখত। আর রূপালি হাজির হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ওরা বেরিয়ে যেত মেস থেকে। কাউকেই রূপালি বিশেষ কথাবার্তা বলতে শোনেনি। বোবার মতো নিশ্চুপ ছিল তারা।

ওরা বেরিয়ে গেলে মেসবাড়ির পাঁচ-পাঁচটা খালি বিছানার যে-কোনওটাতে সে আর হিরণ্ময় বসত, শুত ও গড়াত। চুমু খেত, আদর করত পরস্পরকে। প্রথম দেহমিলনের অভিজ্ঞতাও রূপালির সেখানেই। অভিজ্ঞতাটা খুব সুখকর হয়নি। সে এক জ্বালাময় যন্ত্রণার স্মৃতি। তবে হিরণ্ময় সেটা জোর করে আদায় করত না কখনও। ঠিক জন্তুর মতো ছিল না হিরণ্ময়। একটু মায়া ছিল, ভালবাসা ছিল, লজ্জাও ছিল সেই সঙ্গে। কিন্তু বয়সটা তো নিয়ম ভাঙার।

তখন প্রায়ই হিরণ্ময়কে টাকা দিতে হত রূপালির। দিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু কখনও কখনও মন বলত এ লোকটা কি কোনও দিন বউ নিয়ে সংসার করবে? চাকরি করতে পারবে? এর কি কোনও দিন কোনও গতি হবে? ছেলেটা আমাকে কাজে লাগাচ্ছে না তো? এইসব কূট সন্দেহে বড় ওলট-পালট হয়ে যেত রূপালি। তবু বলত, আমি তোমার সঙ্গে বাঁকুড়া চলে যাব। নেবে তো আমাকে?

নেব। হিরণ্ময় সংক্ষিপ্ত জবাব দিত। কিন্তু ওর মুখ-চোখ থাকত অন্যমনস্ক। রূপালি বুঝত না, হিরণ্ময়ের ওকে সত্যিই নেওয়ার ইচ্ছে আছে কি না, না স্তোক দিচ্ছে।

মেসবাড়িতে একটা ছেলে ছিল, অভয়। সে মাস্টারি করত স্কুলে। স্কুলের চাকরিতে হাজারও গণ্ডা ছুটি। তাই সেই নিরালা দুপুরে যখন হিরণ্ময় আর রূপালি ঘনিষ্ঠ সময় কাটাত তখন মাঝে মাঝে উপদ্রবের মতো অভয় হাজির হত হাত দুটি পেতে। কখনও বা গিয়ে রূপালি দেখতে পেত অভয় মেসবাড়িতে আছে।

হয়তো রূপালির যাতায়াত অভয় ভাল চোখে দেখেনি। হিরণ্ময়কে সম্ভবত কিছু বলেছিল। তবে মেসবাড়ির ছেলেরা এ তিনটে ছেলেকে খানিকটা সমীহ করে চলত বলে তেমন জোরের সঙ্গে কিছু বলতে পারেনি নিশ্চয়ই।

একদিন হিরণ্ময় রূপালিকে বলে, অভয়টা খুব পিছনে লেগেছে। ছেলেটা এমনিতে ভিতু কিন্তু মহা পাজি। ছেলেটাকে টিট করে দেব ঠিক, কিন্তু তারপরই এ-জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। কারণ আমাদের সন্দেহ হচ্ছে অভয় পুলিশকে অ্যালার্ট করেছে।

কে জানে কী। এক দিন রূপালি গেছে। গিয়ে দেখে প্রথম ঘরটায় অভয় শুয়ে বই পড়ছে, রূপালি ঢুকতেই বই সরিয়ে এক বার তাকাল। দৃষ্টিটায় তীব্র ঘৃণা।

হিরণ্ময় সেদিন সাংঘাতিক গম্ভীর। পাশের ঘরে রূপালিকে নিয়ে গিয়ে বলল, অভয় খুব বাজে ব্যাপার করেছে জানো? মেসের মেম্বারদের সব বলে দিয়েছে তোমার কথা। এরা কেউ আমাদের ওপর খুশি নয়। কেবল এক জন আছে যে আমাদের দলের ক্যাডার। তার জোরেই আমরা আছি। অন্য সবাই এগেনস্টে।

রূপালি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমাকে নিয়ে কোনও কথা উঠেছে?

উঠেছে। কাল রাতে মেসের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের খুব কথা কাটাকাটি হল। ওরা আমাদের এমনিতে ভয় পায় তাই তেমন বেশি এগোয়নি। কিন্তু পুলিশে জানালে আমাদের বিপদ। ওই অভয়টাই যত নষ্টের গোড়া।

যখন তারা কথাবার্তা বলছিল সে সময়ে হঠাৎ অভয় এসে দরজার বাইরে থেকে ডাকল, হিরণ্ময়, একটু শুনে যাবেন।

গম্ভীর মুখে হিরণ্ময় উঠে গেল।

একা ঘরে রূপালির হাত-পা হিম হয়ে এল। সে কিছুতেই বুঝতে পারল না মেসবাড়িতে সে এলে এদের অসুবিধা কী! তার নিজের বাসায় সারা দিন লোক আসার বিরাম নেই। ছেলেবেলা থেকেই রূপালি সকলের সঙ্গে মেশে। তার মা কত পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে, বেড়িয়েছে। কী হয় তাতে? মেসবাড়ির ছেলেরা এত ছোট মনের মানুষ কেন?

ঘরের বাইরে প্যাসেজে হিরণ্ময়ের সঙ্গে অভয়ের কথা হচ্ছিল। বেশ গরম স্বর। তর্কাতর্কি। তারপরই হঠাৎ মারের আওয়াজ। রূপালি দরজা পর্যন্ত গিয়ে একটা দৃশ্য দেখে ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। হিরণ্ময় অভয়ের বাঁ হাতটা ধরে ঘুরিয়ে মোচড় দিচ্ছে। আর অভয় চাপা গলায় বলছে, ভেঙে যাবে! ভেঙে যাবে!

গেলও। একটু বাদে রূপালি চোখ খুলে দেখল অভয় মেঝেয় পড়ে আছে। তার বাঁ হাতটা দুটো পাক খাওয়া, অবশ। হিরণ্ময় তখন দাঁড়িয়ে অভয়ের মুখে লাথি মারছে।

এতদূর নিষ্ঠুরতা যে কারও থাকতে পারে তা রূপালি কখনও জানত না। সে এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে হিরণ্ময়কে বাধা পর্যন্ত দিতে পারেনি।

সে সময়ে অবশ্য খুব শান্ত মুখে নাথু আর ষষ্ঠী এসে ঢুকল। দৃশ্যটা খুবই নিরুত্তাপ চোখে দেখল একটু। তারপর নাথু এগিয়ে এসে হিরণ্ময়কে সরিয়ে দিয়ে বলল, ঘরে যা। মেয়েটা রয়েছে।

ষষ্ঠী নিচু হয়ে অভয়ের অচৈতন্য শরীরটা টেনে তুলল।

দৃশ্যটা কোনও দিন ভুলতে পারেনি রূপালি। পরেও দীর্ঘকাল তার স্বপ্নে-জাগরণে দৃশ্যটা মনে পড়েছে আর শিউরে উঠেছে শরীর। মন গেছে বিকল হয়ে।

সেই ঘটনার পরই হিরণ্ময় পালিয়ে যায়। বাঁকুড়ায় যাওয়ার আগে দেখা করে গিয়েছিল। কিছু টাকা দিয়েছিল রূপালি। শুনেছিল অভয় হাসপাতালে।

হিরণ্ময়ের সঙ্গে ঠিক দেড় মাসের সেই সম্পর্ক কবে চুকে গেছে। সে চলে যাওয়ার সময় রূপালিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই প্রকাশ করেনি। কে জানে কেন সে সময়ে রূপালিরও যাওয়ার কথা মনে হয়নি।

তার বিরহদশা স্থায়ী হয়েছিল এক মাস। আর সে সময়ও কত সন্দেহ এসেছে মনে, কত দ্বিধা। যার সঙ্গে সে জীবনটাকে বেঁধে ফেলল সে কি সাচ্চা বিপ্লবী, না কি নিষ্ঠুর খুনি? খাঁটি লোক, না মেকি? তাকে ঠকিয়ে গেল না তো?

সন্দেহের কাঁটা বিঁধত অহরহ। তবু প্রথম এক মাস খুব মনে পড়ত হিরণ্ময়ের কথা। একদিন রাধেশ্যামদার কাছ থেকে ঠিকানা জোগাড় করে বিজয়গড়ে গিয়ে হিরণ্ময়ের বাড়ি দেখে এল বাইরে থেকে। তেমন কিছু নয়। টিনের চালওলা পাকা দেওয়ালের বাড়ি। সামনের বারান্দায় একটা কালো মতো মেয়ে মলিন মুখে পায়চারি করছিল। হয়তো সে হিরণ্ময়ের বোন। আর কাউকে দেখতে পায়নি রূপালি এবং এ বাড়িতে যে সে এসে কোনও দিন সংসার পাতবে তাও বিশ্বাস হয়নি তার।

হিরণ্ময় চলে যাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই পাড়ায় পাড়ায় ছেলেধরা পুলিশ হানা দিতে লাগল। রাধেশ্যামদা তার দলবলসহ ধরা পড়ল প্রথম ব্যাচেই। আস্তে আস্তে নকশাল আন্দোলন শ্লথ হয়ে থেমে গেল। হিরণ্ময় ফিরে এল না।

একদিন রাতে শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম আসছে না, রূপালি মাথার তালুতে বার বার হাত দিয়ে দেখে সেখান থেকে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। মাথার ভিতর হাজার দুশ্চিন্তা। তার মধ্যে প্রথম দুশ্চিন্তা হিরণ্ময়। সেদিনই হঠাৎ রূপালির চোখের ঠুলি খসে পড়েছে। কেন যেন মনে হয়েছিল, নিজের প্রতি এক গুরুতর অন্যায় করে ফেলেছে সে। মাথা গরম হওয়ার কারণ ছিল। বিলেত থেকে আনন্দর চিঠি এসেছে সেদিন। কালীমামা সেই চিঠি নিয়ে সন্ধেবেলা তাদের বাসায় এসে মাকে ডেকে বলেছিল, আরে শোনো, আমার ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটা শিগগিরই আসবে লিখেছে। শীতকালটা কাটিয়ে যাবে। যদি এইবারই বিয়ে করে যেতে রাজি হয় তো লাগিয়ে দেব। তোমরা মেয়েকে তৈরি রেখো।

মা আপত্তি করেছিল, সে কী? রুপু এখনও ইস্কুলে পড়ছে, অতটুকু মেয়ে!

আরে রাখো তোমার অতটুকু! মেয়েদের আবার অতটুকু কী! তার ওপর আজকালকার মেয়েরা পেট থেকে পড়েই সেয়ানা।

আনন্দর ওপর যে তেমন কোনও টান আছে রূপালির তা নয়। কিন্তু তবু তাকে জড়িয়ে আনন্দর কথাই তো সে শুনে এসেছে বারবার। ছেলে খারাপ নয়। যত দূর জানে লেখাপড়ায় ভাল, সৎ চরিত্র, খুব পরিশ্রমী আর কম কথার মানুষ। সে আসছে শুনে সেদিন রূপালির যে কী এক বুকের দুরদুরুনি উঠল কিছুতেই তা আর থামে না। আড়ালে গিয়ে অনেক কাঁদলও সে। কিন্তু কান্নার কারণ বুঝল না। সে বয়সটাই এ-রকম। কাকে যে চায় তা কিছুতেই বোঝা যায় না।

সেই মাথা-গরমের রাতটা কাটছিল না কিছুতেই। তাই রূপালি উঠে মাঝরাতে বাইরের ঘরের আলো জ্বেলে বই খুলে বসল। বলতে কী সেই রাতটাই তার জীবনের একটা ছোটখাটো পরিবর্তন এনে দিল। প্রথম বছর পরীক্ষা বর্জন করতে হয়েছিল, দ্বিতীয় বারের হায়ার সেকেন্ডারির টেস্ট মুখিয়ে আছে এখন। রূপালি মনের আর কোনও অবলম্বন না পেয়ে পড়াশুনোয় ডুবে গেল। আর সেই নিরবচ্ছিন্ন পড়াশুনোর মধ্যেই শুনতে পেল আনন্দ শেষ পর্যন্ত আসতে পারেনি।

সে-বছর হায়ার সেকেন্ডারিতে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে রূপালি। ইংরিজিতে শতকরা সত্তর নম্বর।

সেই থেকেই রূপালি ভাল ছাত্রী হয়ে গেল। আর কখনও পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। বয়ঃসন্ধির

চঞ্চলতা গেল কেটে। চোখের দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য এল, চলাফেরায় আত্মবিশ্বাস। কথা কমে গেল। বাড়িতে সবাই তাকে সমীহ করে চলে। এমনকী তার অসুবিধে হয় বলে বাড়ির আড্ডারও কিছু কাটছাট হল। বাবা পাড়ার আর-একটা বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানেই পার্টির লোকজনকে নিয়ে বসতে লাগল। মা'র গানের আসর কমে গেল কিছুটা। গানের কথা উঠলেই বলত, না না, যখন-তখন গান-বাজনা হলে রূপার পড়াশুনোর ক্ষতি হয়।

ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে যখন পড়ছে তখনই একদিন বন্ধুদের সঙ্গে গড়িয়াহাটায় ব্লাউজ কিনতে গিয়ে ষষ্ঠীর সঙ্গে দেখা। আচমকা তাকে দেখে চিনতে পারেনি রূপালি। ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রূপালিকে দেখছিল, প্রথমটা কথা বলতে সাহস পায়নি এবং হয়তো খুব ভাল করে চিনতেও পারেনি। রূপালির স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হয়েছে তখন। ব্যক্তিত্বও বদলে গেছে।

তবে রূপালি যখন ফুটপাথে প্লাস্টিকের ফুল দর করছিল তখন হঠাৎ ষষ্ঠী এগিয়ে এসে বলল, আপনি রূপালি না?

রূপালি একটু অবাক হয়ে তাকাতেই সে একটু ফচকে হাসি হেসে বলল, মনে নেই আপনার? পূর্ণ দাস রোডে সেই মেস বাড়িতে?

রূপালি চিনতে পারল আর তার কান-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সেই তীব্র দৃষ্টিতে। বুকে হাতির পা ফেলল ভয়। সঙ্গে বন্ধুরা রয়েছে, যদি বেফাঁস কিছু বলে ফেলে ছেলেটা?

ষষ্ঠী অবশ্য বোকামি করল না। শুধু চাপা গলায় বলল, হিরণ্ময় মারা গেছে জানেন তো?

রূপালি হতভম্বের মতো মাথা নাড়ল। জানে না।

ষষ্ঠীর ইঙ্গিতে কয়েক পা দূরে গিয়ে বন্ধুদের আড়ালে দাঁড়াল সে। ষষ্ঠী মৃদু হেসে বলল, আমি কিন্তু জানতাম হিরণ্ময়কে আপনি খুব একটা পছন্দ করেন না। তাই ক্যাজুয়ালি ওর ডেথ নিউজটা দিয়ে ফেললাম। কিছু মনে করলেন না তো?

রূপালি খবরটায় দুঃখিত হয়েছে কি না তা নিজেও বুঝল না। কিন্তু হঠাৎ বুক থেকে হাতিটা তার ভারী পা সরিয়ে নিয়েছিল। আর নিশ্বাসের বাতাস ফুসফুসে ঢেউ তুলছিল, ভয় নেই, ভয় নেই।

রূপালিকে চুপচাপ দেখে ষষ্ঠী নিজে থেকেই বলল, নাথুও মরেছে মেদিনীপুরে। হিরণ্ময় দমদমে। দু'জনেই পুলিশের গুলিতে...

এত কথা বলতে ষষ্ঠীকে কখনও শোনেনি রূপালি। তবে কথা শুনে ওকে মোটেই ভয়াবহ মনে হচ্ছিল না, আগে যেমন হত। রূপালির বেশ একটু কষ্ট হল জবাব দিতে। আস্তে করে বলল, ঠিক জানেন?

ষষ্ঠী হেসে বলে, আমাদের খবর কি কখনও ভুল হয়? দয়া করে আমার কথা কাউকে বলবেন না। আমি রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ইলেকট্রিকের কাজ করছি এখন।

রূপালি মাথা নেড়ে বলল, বলব না। আপনিও কিছু বলবেন না তো?

ষষ্ঠী মুখটা করুণ করে বলল, ধ্যুৎ! আপনার লাইফটা আমি খামোখা স্পয়েল করতে যাব কেন? আমার স্বভাব সে-রকম নয়। তা ছাড়া হিরণ্ময় আপনাকে যে-গাড্ডায় নামাচ্ছিল আমি তার এগেনস্টে ছিলাম। আপনি সিওর থাকুন আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোবে না। তা ছাড়া বলেই বা কী হবে। ও তো আর ঝামেলা করতে আসবে না! হি ইজ ডেড।

সেদিন রূপালি যখন বাড়ি ফিরল তখন কারও শোকে তার বুক ভারী ছিল না। দিন যত গেছে তত হিরণ্ময় মুছে গিয়েছিল তার মন থেকে। আর সেই স্মৃতিকে তাড়িয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছিল তার পড়াশুনো। তার ভাল রেজাল্ট। কলেজে সে মিশেছিল চমৎকার সব আধুনিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তারা কালচার্ড, ভদ্র, নম্র স্বভাবের। পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃতিবান ছেলেমেয়েদের সঙ্গ তাকে অনেক বদলে দিয়েছিল। সে তখন নিউ ওয়েভের নাটকে নামে,

বিতর্কসভায় যোগ দেয়। কালচারাল ফাংশনে অংশ নেয়। আগেকার বদনাম-বাড়ির আড্ডাবাজ আর ফচকে মেয়েটা তো সে আর নেই। বুকে একটা অস্পষ্ট ভার টের পেত ঠিকই, কিন্তু ভুলেও থাকত।

যেদিন ষষ্ঠীর সঙ্গে দেখা হল সেদিন বাড়িতে ফিরে আসার পর থেকে জঘন্য স্মৃতিটা তাকে কেবল ছিছিক্কার দিচ্ছিল। কী করে তুমি অত নীচে নেমে যেতে পেরেছিলে রূপালি? কী দিয়ে সেই হৃদয়হীন বাজে ছেলেটা ভুলিয়েছিল তোমাকে? কেন তাকে সব দিয়েছিলে?

একই সঙ্গে সেই স্মৃতির জ্বালা আর মুক্তির আনন্দে পাগল-পাগল হয়ে রইল রূপালি। তারপর যত দিন গেল তত জ্বালা গেল সরে। মুক্তির স্বস্তি এল মনে। না, আর কোনও ভয় নেই। সে নিরাপদ সুখী। সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।

অনার্সে হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে গেল সে। যতটা আশা করেছিল তার চেয়েও ভাল রেজাল্ট। তার এই রেজাল্টে বাড়ির লোক পর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। রূপালি যে এত ভাল ছাত্রী তা কারই বা জানা ছিল!

সবই ভাল রূপালির। দেখতে ভাল, ছাত্রী ভাল, গায় ভাল। বুদ্ধিদীপ্ত তার আচরণ। রূপালি নিজের গরিমা বুঝতে পারত। বুঝতে পারত সবগুলি পাপড়ি মেলে সে আশ্চর্য হয়ে ফুটেছে। মাঝে মাঝে তবু কখনও সেই ভয়ংকর স্মৃতি এসে ছুঁয়ে যেত তাকে। সব ভাল, তবু কেন একটু কীটদষ্ট হয়ে রইল সে।

বাড়ির মধ্যে জানত এক দীপালি। রেজিস্ট্রির কিছুদিন পরেই সে একা এই গোপনীয়তা বইতে না পেরে দিদিকে বলে দিয়েছিল। খুব বকেছিল প্রথমে। তারপর কেঁদেছিল। পরে বলল, কাউকে বলিস না, যেমন করেই হোক এ বিয়ে ক্যানসেল করতে হবে।

তাতে যে মামলা করতে হয়! রূপালি বলেছিল।

মামলা কেন! আমরা রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বলব যে, তুই তখন মাইনর ছিলি। আমাদের প্রমাণ আছে!

কিন্তু সে-সব কিছু করতে হয়নি। পুলিশের গুলি রূপালিকে অবশেষে মুক্তি দিয়েছিল হিরণ্ময়ের হাত থেকে। অন্তত তাই ভেবেছিল সে।

যখন স্বস্তি ও নিরুদ্বেগভাবে রূপালি তার জীবনকে তৈরি করছে, যখন তাকে ঘিরে এক সুন্দর পৃথিবীর বর্ণ, গন্ধ, রূপ দেখা দিচ্ছে ক্রমশ তখনই কবরের ভিতর থেকে গলিত মৃতদেহের মতো উঠে এসেছে হিরণ্ময়।

এখন রূপালি কী করবে?

॥ আট ॥

ফুটু, তোর চোখের কোল বসে গেছে মাইরি। অত সিনেমা দেখিস না।

ফোট বে! তোর চোখের কোল বুঝি ঢেউ দিচ্ছে!

মাইরি বলছি, বিদ্যা! আয়নায় দেখিস। তোর গালের গর্তে এখন তেল রাখা যায়।

ঝাপড় খাবি কিন্তু। শরীর তুলে কথা বলবি না!

আঙুর খাস।

হ্যাঁ, চার দিকে আঙুর ফলে আছে কিনা!

তোর বাবার তো টাকা আছে।

তাতে তোর বাবার কী? বাবার পয়সা দেখাচ্ছে! যাও না আমার বাবার কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে, বাপ-চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে দেবে। আমার বাবাকে তো চেনো না।

বিলু বলল, ভাগ! গত মাসে যে স্ট্রেচলনের প্যান্ট করালি তার টাকা কে দিয়েছিল শুনি!

ফুটু চটে গিয়ে বলে, অ্যাঃ, প্যান্টের টাকা দেবে না তো জন্ম দিয়েছিল কেন? ও-সব বাত ছাড়। এসেনশিয়াল গুডস্ হলে অন্য কথা, আঙুরের কথা তুললে চটি ছুড়ে মারবে।

বিলু ফুটুর শেষ কথাটা শুনতে পেল না। এইট-বি স্ট্যান্ডের ভিতরে ফাঁকা চত্বরটায় প্রচণ্ড রোদ। স্ট্যান্ডে বাস নেই। বিস্তর লোকের ভিড় জমে আছে। দু'খানা দোতলা বাস দাঁড়িয়ে আছে বটে কিন্তু স্টার্টার বলছে দু'টোই ডিফেকটিভ। অবশ্য বিলুদের তেমন তাড়া নেই। একটা মোটে বাজে। সমর, দোবার, রাজেশ আর সুব্রতর আসবার কথা। ওরা এলে সবাই মিলে প্রিয়া সিনেমায় যাবে। বলাই আগে চলে গেছে লাইনে জায়গা রাখতে।

ডিফেকটিভ বাস দু'টোর একটার দোতলায় অনেকক্ষণ ধরে একটা লোক বসে ছিল। বাইরে থেকে আবছা কালো মূর্তিটাকে নিথর হয়ে বসে থাকতে দেখেছিল বিলু। কত বেকার লোক থাকে, সারা দিন এখানে সেখানে, যেখানেই বসার জায়গা পায় সেখানেই খানিকক্ষণ বসে থেকে সময় কাটায়। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ সেই লোকটা নেমে এসে আলোয় পা দিতেই বিলু একটু চমকে গেল। মুখটা চেনা-চেনা। চোখে গগলস, গালে দাড়ি, খুবই নোংরা জামা-প্যান্ট পরা লোকটা খুব ধীরেসুস্থে হেঁটে চত্বরটা পার হয়ে শেডের তলায় ছায়ায় এসে দাঁড়াল। একটু তফাতে। বিলু মুখ ঘুরিয়ে দেখছিল।

ফুটু বলে, কাকে দেখছিস? ভাল মাল?

আরে না। কালো চশমা পরা ও লোকটা কে রে চিনিস?

ফুটু দেখল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, চেনা-চেনা লাগছে আমারও, প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকে এখানে-সেখানে। সেদিন সমর কী একটা নাম বলেওছিল। নকশাল বে।

নকশাল! বিলু চোখ কুঁচকে বলে, তা হলে হিরুদা নয় তো!

হবে! তোর কী?

চেনাচেনি ছোড় বে। দেরি হয়ে যাচ্ছে, এখন ভ্যাজরং ভ্যাজরং করতে যাস না।

আরে না। কিন্তু হিরুদা তো মরে গেছে বলে শুনেছিলাম। পুলিশের গুলি খেয়েছিল।

তবে কি ভূত?

না রে, এ হিরুদাই মনে হচ্ছে।

অন্য লোকও হতে পারে। সিনেমায় দেখিসনি যমজ ভাই নিয়ে ক্যায়সা সব কাণ্ড হয়।

বিলু মাথা নেড়ে বলল, যমজ ভাইয়ের মামলা নয়। হিরুদাই এসেছে। দাঁড়া সিওর হয়ে আসি। বলে বিলু ফুটুকে রেখে এগোল।

সামনে যেতে বিলু খানিকটা ভয় খাচ্ছিল। ভয় খাওয়ার কিছু নেই। হিরুদা মানুষ তেমন খারাপ ছিল না তো! ভিখিরির মতো থাকত, চেয়ে-চিন্তে খেত। এমনকী বিলুর মেজদি রূপালির ওর ওপর একটু টানও টের পেত বিলু। হিরণ্ময় খুনখারাপি করেছিল বলে শুনেছে বিলু, কিন্তু কখনও দেখেনি কিছু। হিরণ্ময় এমনকী মাস্তানিও করত না। বিলুর পরিষ্কার মনে আছে রাজা সুবোধ মল্লিক রোডের ওপর একটা লোহা-লক্কড়ের দোকানের সামনে হিরণ্ময় দাঁড়িয়ে ছিল একদিন। বিলু জানে সে সময়ে হিরুদা মেজদিকে ইস্কুলের রাস্তায় ফলো করত, কথাবার্তা বলত। মেজদির ইস্কুলে যাওয়ার সময়ে তাই রোজ ওখানটায় দাঁড়াত। সেদিনও দাঁড়িয়ে আছে। বিলু মর্নিং স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখে, পাঁচ সাতটা ছেলে কোত্থেকে এসে হিরুদাকে ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে খুব তড়পাচ্ছিল— মেয়েছেলের পিছু নেওয়া শালা বের করে দেব। কোনও দিন যদি আর এখানে দেখতে পাই...। দৃশ্য দেখে বিলু ভয়ে কাঠ। কিন্তু হিরুদা আঙুলও তোলেনি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে গালাগাল হজম করে গেল। তারপর একটু হেসে ভিড় কেটে বেরিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল দক্ষিণ দিকে। কিন্তু পরদিনও আবার শান্তভাবে ওই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল এসে। বিলু মনে করে

সেইটেই হিরুদার সবচেয়ে বড় মাস্তানি। হাঁকডাক নেই, তড়পানো নেই, ঠান্ডাভাবে যে-কোনও গোলমালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতে পারে, ভয় খায় না।

টক করে কথা বলল না বিলু। সামনে দিয়ে দু'-চারবার হাঁটাহাঁটি করে দেখল। না, হিরণ্ময়ের চোখ তার ওপর পড়ছে না। হালকা রঙের গগলস চোখে একটু উঁচু দিকে চেয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। তবে মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ে উঠছে। এক-একবার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে বাতাসে ঢ্যাঁড়া কাটছে। হিরুদাই। কোনও ভুল নেই। তবে মাথার একটু গোলমাল হয়েছে নাকি? বিড়বিড় করছে, আঙুল নাড়ছে!

বিলু সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, হিরুদা না?

হিরণ্ময় সামান্য কৌতূহলে ওর দিকে তাকাল। সময় নিল একটু, তারপর খুব মৃদু একটু হাসির ভাব করে বলল, কেমন আছ বিলু? পাশ করেছ?

সামনের বার পরীক্ষা দেব। আপনি কেমন আছেন?

খুব ভাল।

কবে ফিরেছেন?

হিরণ্ময় যেন একটু অবাক হয়ে বলে, ফিরিনি তো! আমার আবার ফেরা কোথায়? ঘুরতে ঘুরতে এদিকে চলে এসেছি, আবার চলে যাব।

বিলু অবাক হয়ে বলে, বাড়ি ফেরেননি?

হিরণ্ময় একটু হাসল, কিন্তু প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে বলল, তোমাদের এদিককার রাস্তাঘাট খুব ভাল হয়ে যাচ্ছে, কী বলো?

বিলু এ কথাটার মাথামুন্ডু না বুঝেই বলে, হচ্ছে তো! আপনি যে আমাদের বাড়ি গেলেন না! মেজদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হিরণ্ময় খুব অবাক হয়ে বলল, না তো! তোমাদের বাসাটা কোথায় যেন ছিল? সেন্ট্রাল পার্কে, না? সেখানেই আছ এখনও?

না। আমরা কালীবাড়ি লেনে উঠে এসেছি দু' বছর হয়ে গেল। আপনি সেন্ট্রাল পার্কে আমাদের খোঁজ করেছিলেন?

না না। আমি কোথাও খোঁজ করিনি।

একদিন যাবেন কিন্তু!

যাব।

একটা এইট-বি বাস স্ট্যান্ডে ঢুকল এসে। দূর থেকে ফুটু ডাকছিল, আই বে বিলু! দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! সব এসে গেছে।

বিলু বলল, যাই হিরুদা।

হিরণ্ময় এক বার মাথা নাড়ল মাত্র।

বিলু দৌড়ে এসে দুদ্দার ভিড়ের মধ্যে গুঁতিয়ে বাসের পাদানিতে উঠতে উঠতে শুনতে পায় ওপরতলা থেকে সমর চেঁচাচ্ছে, বিলু, ওপরে চলে আয়, জায়গা রেখেছি।

ভিড়ের বাসে জায়গা রাখার নিয়ম নেই, রাখলেও প্যাসেঞ্জার মানে না। জায়গা রাখা নিয়ে একজন ভদ্রলোক বলছে, এটা কি ট্রেনের কামরা নাকি যে, সিট রিজার্ভ করবে? পেয়েছ কী তোমরা?

সমর চোখ রাঙিয়ে বলে, দাদু, তুমি তুমি করে বলবেন না বলে দিচ্ছি! ভাল হবে না।

ফুটু সামনে থেকে বলে, আপনার মতো অনেকে জায়গা পায়নি, সবাই কি ঝগড়া করছে নাকি?

ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে বলে, এটা আমারই পাওনা সিট ছিল, ও ছোকরা আমাকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বসে পড়ল।

সমর এক ঝটকায় বুক চিতিয়ে বলল, বেশ করেছি বসেছি। যান কী করবেন করুন গিয়ে।

ভদ্রলোক সমরের ভঙ্গি দেখে আর কিছু বললেন না বটে। তবে ফুঁসছিলেন। দু'-একজন মধ্যস্থতা করে বলল, যাকগে মশাই, গোলমাল করে কাজ নেই। যাওয়া নিয়ে কথা, বসে হোক দাঁড়িয়ে হোক।

জায়গা-না-পাওয়া ভদ্রলোক শুধু বললেন, আমার ন্যায্য পাওনা মশাই সিটটা। বসল তো বসল, দেখুন আবার পাশের জায়গাটাও আটকে রাখল। এই গরমে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে তবে বাসে উঠেছি! বাসওলাদের কাণ্ডও বলিহারি। এক ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা বাদে বাস এলে যে মানুষের কী অবস্থা হয়!

বিলু উঠে এল। ভিড় ঠেলে গিয়ে সমরের পাশে বসতেই সমর চাপা স্বরে একটা খিস্তি দিয়ে বলল, তোর জন্যই শালা গন্ডগোল, আর-একটু হলেই লেগে যেত। হিরুর সঙ্গে কী কথা বলছিলি বে? চিনিস ওকে?

আমাদের অনেক দিনের চেনা।

ঘ্যাম নকশাল ছিল। বহুত লাশ ফেলেছে।

চেপে যা, কে কোথায় শুনবে।

ফুটু বলল, বলাইটা মাইরি একটা গোবর। গিয়ে হয়তো দেখব লাইন রাখতে পারেনি।

সমর বলে, তোদেরই দোষ। বারোটা টাইম করলে ঠিক হত। আজ লাইনে মারপিট হবেই।

রাজেশ আর দোবার সামনের দিকে একটা সিটে পাশাপাশি বসে আছে। রাজেশের মুখটা গম্ভীর, অন্যমনস্ক। দোবারের পরনে এখনও গুরুদশার কোরা কাপড়। সে এক নাগাড়ে কী যেন বকবক করে যাচ্ছিল, রাজেশ জবাব দিচ্ছে না।

বাসের ওপরতলাটা তেতে আগুন হয়ে আছে। বাস ছাড়বার নামও নেই। ছাড়লে হাওয়া পাওয়া যেত। নীচে স্টার্টারের সঙ্গে প্যাসেঞ্জারদের ঝগড়া হচ্ছে। বাসের যেদিকটায় রোদ সেদিকেই বসেছে সমর। হাত বাড়িয়ে বাসের বডিতে প্রচণ্ড জোরে চাপড় মেরে গুম গুম শব্দ তুলে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আবে শালারা, মাজাকি হচ্ছে নাকি? আমাদের কাজ নেই?

দেখাদেখি সুব্রত, দোবার সবাই বাসের গায়ে চাপড়াতে লাগল জোরে। অন্য প্যাসেঞ্জাররা খুশিই হচ্ছিল তাতে। একজন বলল, আরও জোরে লাগান ভাই, ব্যাটারা আড্ডা মারছে বসে।

চাপড়ানির চোটে বোধহয় ড্রাইভার এসে গেল, কন্ডাক্টর ঘণ্টি মারল।

প্রিয়ার সামনে নেমে ফুটু বলল, লে বে, হাওয়া খা আজ। ভিড় দেখেছিস?

সমর ভরসা দিল, বলাই ঠিক লাইনে সেঁটে আছে। ও যদি জায়গামতো থেকে থাকে তো পেয়ে যাব টিকিট।

ট্রাম-লাইন পেরিয়ে এসে ওরা দেখে হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে লাইনটা খুব টাল খাচ্ছে। লাইনের লোকেরা একে অন্যের কাঁধ ধরে জায়গায় থাকবার চেষ্টা করছে। ঝুলোঝুলি কাণ্ড। দু'জন হোমগার্ড লাঠি আপসাচ্ছে ঘুরে ঘুরে।

লাইনের মাঝামাঝি বলাই চামচিকের মতো সেঁটে আছে ঠিক। দেখে ফুটু বলে ওঠে, পেয়েছি বে।

কিন্তু সকলেই বুঝতে পারছিল আজ লাইন ভাঙবে। একে অমিতাভ বচ্চনের হিট ছবি, তার ওপর মোটে দ্বিতীয় সপ্তাহ। ঘণ্টা চারেক আগে থেকেই লাইন লেগে গেছে।

সমর একটু হেক্কোর আছে। লাইনটা এদিক-ওদিক হচ্ছে, টাল খাচ্ছে, তার মধ্যেই একটা গোত্তা মেরে বলাইয়ের সামনে ঢুকে গিয়ে চাপা স্বরে সবাইকে বলল, আমার পিছনে ঢুকে পড়।

লাইনের ছেলেরা চেঁচাচ্ছে খুব। হোমগার্ড ছুটে এল। সমর কলারটা তুলে বলল, হোমগার্ডপানা অন্য জায়গায় দেখাবে। বেশি গড়বড় করলে জল ভরে দেব।

হোমগার্ড দু'জন একটু লাঠি নাচিয়ে সরে গেল। পিছন থেকে চেঁচানি উঠছিল ঠিকই, কিন্তু এ সময়ে সমরদের দেখাদেখি বাইরের বস্তির ছেলে লাইনে ঢুকে পড়তে থাকে। গায়ে গায়ে মানুষের লাইন তাতে প্রচণ্ড টাল খেতে থাকে। গালাগাল, চেঁচামেচি, আবার হাসির শব্দও শোনা যায়। পাঁচ-সাতটা দুবলা ছেলে লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল চাপ সহ্য করতে না পেরে। সমরেরও বুক ভেঙে যাচ্ছিল চাপে, দাঁতে দাঁত চেপে চেঁচিয়ে বলল, ছাড়িস না কেউ। ধরে থাক ভাল করে।

দোবার পিছন থেকে বলল, রাজেশ শালা কোথায় গেল বল তো! আই বে ফুটু, রাজেশ কাটল কোথায়?

নেই?

না।

সামনের দিকে চাপ খেয়ে লাইন ভাঙছে। আবার জোড়া লাগছে। কিন্তু তাতে দু'-চারজন ছিটকে যাচ্ছে, আবার দু'-চারজন অন্য ছেলে ঢুকে পড়ছে। সমর চেঁচাল, চেপে রাখ সামনের দিকে। লোক ঢুকছে।

হঠাৎ লুঙ্গি পরা গেঞ্জি গায়ে একজন, আর পায়জামা-শার্ট পরা একজন, কালোকোলো চেহারার দু'টো ছেলে দেশপ্রিয় পার্কের রেলিং টপকে এদিকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর সোজা এগিয়ে এল লাইনের দিকে। মুখে কোনও কথা নেই, দু'জনেই এক বার লাইনটা আগাগোড়া দেখে নিয়ে সামনের দিকে গিয়ে একটা ধেড়ে ছেলেকে ঘাড় ধরে বের করে এনে একটা ধাক্কা দিল। ধেড়ে ছেলেটা যেন কিছু হয়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

ফুটু বলল, সমর, কেলো।

চুপ! সমর ধমক মারল।

বিলু বলল, বুঝতে পারবে না।

ছেলে দু'টো একজন-দু'জন করে লাইন থেকে ছেলে বেছে বেছে বের করে দিচ্ছে ঘাড় ধরে। মুখে কথা নেই। যাদের বের করছে তারাও কিছু না-বলে চলে যাচ্ছে—যেন কিছু হয়নি।

কালো ছেলে দু'টোর সঙ্গে বাচ্চা বাচ্চা তিন-চারটে ছেলে জুটে গেছে। তারা বোধহয় লাইনে ছিল, ছিটকে গেছে। তারা এখন দেখিয়ে দিচ্ছিল লাইনে বাইরে থেকে কে কে ঢুকেছে। ছেলে দু'টো নিঃশব্দে ধরে ধরে তাদের বের করছে।

সুব্রত বলল, আমাদের গায়ে হাত দিলে দেখিয়ে দেব।

ফুটু বলল, চোপ বে! ওরা লেক ক্যাম্পের ছেলে, কিছু করতে গেলেই দু'শো মস্তান জুটে যাবে। মুখটা ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। বুঝতে পারবে না।

ছেলে দু'টো লাইন মেরামত করতে করতে কাছে এসে গেল। বাচ্চা একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, মদনদা, এই যে এই চারজন।

বুদ্ধিমানের মতো সমর নিজে থেকেই লাইন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দেখাদেখি বিলু আর দোবার। সুব্রত ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল বোকার মতো। কী একটা বলতেও গেল। লুঙ্গি পরা ছেলেটা ঝেড়ে একটা চড় কষিয়ে বলল, সকালে উঠে রোজ ব্যায়াম করো নাকি ভাই? পায়জামা পরা ছেলেটা সুব্রতর ঘাড়টা ধরে অনায়াসে বের করে আনল লাইন থেকে।

সুব্রত জেদবশত দাঁড়িয়ে রইল ফুটপাথে। পার্কের রেলিঙের ও-পার থেকে সমর ডাকল, চলে আয়।

গোলেমালে বলাই রয়ে গেল লাইনে। মুখ ফিরিয়ে সে এদের দিকে চেয়ে একটু হাসলও। খুব অহংকারের হাসি। তাকে ওরা বের করে দেয়নি।

রাজেশকে দেখা যাচ্ছিল না। ফুটু বলল, ও শালা ঠিক লাইন ম্যানেজ করেছে বললাম।

রাগে অপমানে সবাই গনগনে হয়ে আছে। সমর বলল, ফের রাজেশ রাজেশ করবি তো ঝাপড়

খাবি। রাজেশ লাইন ম্যানেজ করেছে তো তোর বাবার কী?

বিলু তেতো মুখে বলল, মাইরি, তোরা আবার লাগাস না। এখন করবি কী?

সমর বলে, শোনো আমি বলে দিচ্ছি, বলাই যদি পাড়ায় গিয়ে ইনসালটের কথা বলে দেয় তবে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে। বলাইকে ওয়ার্নিং দিয়ে দেবে তোমরা।

দোবার বলে, বলাই ডরফোক আছে। বলবে না। কিন্তু এখন করবি কী?

সমর নির্দ্বিধায় বলল, যার কাছে যা আছে সব ঝেড়ে বের করো। মাল খাব।

সবাই চনমন করে ওঠে। বিনা প্রতিবাদে সবাই পয়সা বের করে হিসেব করতে থাকে। বিলু কোনও দিন খায়নি, তবু একটু ইতস্তত করে পকেটে পয়সা খুঁজতে থাকে।

লাইনের অবস্থা দেখে রাজেশের সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করল না। এক বার সে বলেওছিল সমরকে, দিল আচ্ছা নেহি হ্যায় দোস্ত! সমর কথাটা শুনতে পায়নি, লাইন ম্যানেজ করতে ব্যস্ত ছিল।

রাজেশ দূর থেকেই তার বন্ধুদের দেখল লাইনে ঢুকে পড়তে। চার দিকে ভিড়ে ভিড়াক্কার। কেউ কাউকে চেনে না। রাজেশ এক বার হলের বাইরের হোর্ডিংটার দিকে তাকিয়ে ছবিটা দেখল। বন্ধুরা তাকে লক্ষ করেনি। লাইন দিতে ব্যস্ত।

রাজেশ একটা চাপা শ্বাস ফেলে দেশপ্রিয় পার্কের গেট থেকে পঞ্চাশ গ্রাম গরম চিনেবাদাম কিনে হাঁটতে হাঁটতে কেওড়াতলায় চলে আসে।

চার দিকে পাঁচিল-ঘেরা শ্মশানটা আগুনে রোদে গনগনে তেতে আছে। ছাই উড়ছে। মাতাল একটা ডোম হাল্লা করছে জোব। গোটা ছয়-সাত চুল্লি জ্বলছে। ঘি আর মানুষ পোড়ার কটু গন্ধ। কাঠের ধোঁয়ায় জ্বালা।

সেদিন যেখানটায় সেই কিশোরী মেয়ের খাটটা ছিল সেই জায়গাটা আজ ফাঁকা। রাজেশ চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সেই দিকে। অত সুন্দর মেয়েটা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কবে? ছাই হয়ে যাওয়ার জন্যই কি এই জন্ম-টন্ম শালা? কোনও মানে হয় এ-সব ইয়ারকির?

রাজেশ বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। লতানে গাছে ছাওয়া সুঁড়িপথটা ধরে, দু'ধারে সাজানো কাটা কাঠের স্তূপ দেখতে দেখতে ফিরতে থাকে। এইসব কাঠ রয়েছে মানুষকে ছাই করার জন্য। কেন বে? কেন?

বেশ একটু রাত করে যখন বিলু বাড়ি ফিরছিল তখনও তার মাথা টাল খাচ্ছে। শরীর ঝুল খাচ্ছে এদিক-ওদিক। দু'বার বমি করেছে ইতিমধ্যে। দুনিয়াটা ধোঁয়াটে লাগছে একটু। আলোগুলো ডিম ডিম। মানুষজন চিনতে পারছে বটে কিন্তু সবাইকে একটু জলে-ডোবা মতো দেখায়। চার দিকের শব্দগুলো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে না, সব মিলে রাজারহাটের মতো ভনভন শব্দ। মুখের মদের গন্ধ তাড়াতে জরদা পান খেয়েছে। কিন্তু জরদা খাওয়ার অভ্যেস নেই বলে তখন থেকে হেঁচকি উঠছে বারবার। এইসব অসুবিধে নিয়ে বিলু যখন বাড়িতে ঢুকছে তখন রাত দশটা। তবে তাদের বাড়িতে রাত দশটা মানে ভরসন্ধে।

বিলুদের কালীবাড়ি লেনের বাসাটার একটা সুবিধে যে বাইরের ঘর দিয়ে না-ঢুকলেও চলে। দেয়াল ঘেঁষে ভিতর-বাড়িতে যাওয়ার পথ ধরে বিলু ঢুকে গেল। বাড়িতে যথারীতি লোকজনের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গানের আওয়াজ। ঢোকবার পথেই মেজদির ঘরের জানালা। সবুজ পরদা ফেলা। ওপাশে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে মেজদি পড়ছে। বিলু বা সোনালি কেউ আজকাল আর মেজদির ঘরে বসে পড়ে না। তাদের ঘর আলাদা। মেজদি কথা বলে খুব কম। বাড়ির সবাই আজকাল মেজদিকে ভয় পায়. মেজাজ বুঝে চলে।

ক'দিন হল মেজদির মন-মেজাজ ভাল নেই। খুব গম্ভীর মুখ। খাওয়া-দাওয়া কমে গেছে। রোগাও হয়েছে একটু।

জানালাটা পার হওয়ার সময় ভিতর থেকে মেজদি ঝাঁঝালো গলায় জিজ্ঞেস করল, কে রে?

বিলুর পা আটকে যায়। চোরের গলায় বলে, আমি, বিলু।

মেজদি হাত বাড়িয়ে পরদাটা সরিয়ে তাকে দেখে বলে, কোত্থেকে ফিরলি এখন?

মেজদির গলার স্বর ইস্পাতের মতো কঠিন। রাত করে ফেরা মেজদি পছন্দ করে না। কিন্তু তার চেয়েও আরও বড় সর্বনাশ আজ করে এসেছে বিলু। যদি টের পায়? বিলু জানালা থেকে যতটা পারে পিছনে সরে দেয়ালে সিঁটিয়ে গেল।

মাথাটা ধোঁয়াটে লাগছিল, আবোল-তাবোল কথা আসছে মাথায়। বিলু প্রাণপণে বুদ্ধি ঠিক রাখবার চেষ্টা করে বলল, সিনেমায়।

রূপালি ঝাঁ করে ওঠে, কাকে বলে গিয়েছিলি?

মা। বিলু মাথা নিচু করে বলে।

কানটা ছিঁড়ে ফেলব একেবারে মিথ্যে কথা বললে। সন্ধে থেকেই তো মা তোর খোঁজ করছে। আজ দিদির বাড়িতে না তোর রেশনের বাড়তি চিনিটা পৌঁছে দিয়ে আসার কথা! কাউকে না বলে সিনেমা গেছিস এত সাহস তোর হয় কোত্থেকে?

বিলু মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। আবোল-তাবোল কী সব হচ্ছে মাথার মধ্যে। দেয়ালটায় লেগে থেকে মাথা খাড়া রেখে বলল, মেজদি, আজ হিরুদার সঙ্গে দেখা হল। বলে বিলু ভাবল মেজদি খুশি হবে।

রূপালি তেমনি ঝাঁঝের গলায় বলে, কে হিরুদা?

সেই যে নকশাল হিরণ্ময়দা, সেন্ট্রাল পার্কের বাসায় আসত।

রূপালি সামান্য কেঁপে গেল বুঝি। তবু স্থির গলায় বলল, সে তোকে কী বলেছে?

বলল একদিন বাসায় আসবে।

হিরুদার কথায় মেজদি খুশি হবে বলে ভেবেছিল বিলু। কিন্তু তা হল না। রূপালি সন্দেহের গলায় বলল, তুই ঠিকানা দিয়ে এলি বুঝি?

হিরুদাকে ঠিকানা দিয়েছে কি না তা বিলুর মনে পড়ল না। বলল, মাইরি না। বিদ্যা।

ছোটলোকের ছেলের মতো কিরে কাটতে শিখছিস!

অন্য সময় হলে কিরে কাটার জন্য বিলুকে রূপালি হয়তো মারত। কিন্তু আজ বেশি কিছু বলল না আর। শুধু গনগনে রাগের গলায় জিজ্ঞেস করল, সে তোর কাছে ঠিকানা চেয়েছে?

বিলু এ অবস্থাতেও হাওয়া বুঝে গেল। মেজদি তা হলে হিরুদার ওপর তেমন খুশি নয়। দেয়ালে পিঠ রেখেই সে বলে, না।

তুই ও-রকম জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিস কেন? কী হয়েছে?

কই জড়িয়ে বললাম?

বিলুর মাথা ধমকে চমকে আর ভয়ে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে মেজদির চোখ-কান সজাগ। জানালার আলো থেকে সরে একটু অন্ধকারে গিয়ে বিলু বলে, আমার খিদে পেয়েছে।

রূপালি বলল, খেয়ে আমার ঘরে আসবি।

বাথরুমে গিয়ে বিলু দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর স্নান করতে লাগল প্রাণপণে, বুঝতে পারছিল না তার মুখে গন্ধ আছে কি না এখনও। মদ খাওয়ার সময় খেয়াল হয়নি যে, রাতে তাকে মা'র কাছে শুতে হবে। মা টের পেলে?

অনেকক্ষণ স্নান করে বিলুর মাথা পরিষ্কার হল অনেকটা। চোখ দু'টো ভীষণ ভারী হয়ে ঢুলে আসছে। সে খুব বেশি খায়নি। সবচেয়ে বেশি খেয়েছে সমর আর ফুটু। তবে ওরা প্রায়ই খায়। বিলু যাও খানিকটা দেখাদেখি খেয়েছিল তাও বমি হয়ে বেরিয়ে গেছে। তবু কি মা গন্ধ পাবে? হয়তো পাবে না। মা শুতে আসবে অনেক রাতে। আজ প্রণবমামা কালীমামা দু'জনেই এসেছে। গান এখন

চলবে। ততক্ষণে ভাত খেয়ে একঘুম হয়ে যাবে বিলুর।

স্নানের পর খেতে বসে বিলুর আবার বমি-বমি করছিল। রুটি নাড়াচাড়া করতে করতে ঢুলে পড়ছিল ঘুমে। হঠাৎ দেখে মেজদি দরজায় দাঁড়িয়ে। বিলু ভয়ে তাড়াতাড়ি মুখ নামাল।

রূপালি কাছে এসে পাশের চেয়ারে বসে বলল, এত রাতে স্নান করলি যে!

গরম।

তোর মুখ ও-রকম লাল দেখাচ্ছে কেন? মারধর খেয়েছিস নাকি?

বিলুর একটু রাগ হয়। সে বলে, না, মার খাব কেন?

রূপালি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মাথায় ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে কীসের আড্ডা রে? বদ কতগুলো ছোঁড়াব সঙ্গে তোকে ক'দিন আগেও দেখেছি। তোর ভদ্রলোক বন্ধু জোটে না কেন?

বিলু চুপ করে থাকে।

রূপালি যেমন হঠাৎ রাগে, তেমনি হঠাৎ ঠান্ডা হয়। যেমন একটু চুপ করে থেকে খুব আস্তে করে বলল, খেয়ে উঠে আমার ঘরে আয়, তাড়াতাড়ি।

রূপালি চলে যাওয়ার পরও বিলু অনেকক্ষণ খাওয়ার টেবিলে বসে রইল। মার খেয়েছে বলে কোনও অপমান লাগছিল না বিলুর, বরং এই ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিল যে মেজদি গন্ধ পায়নি।

রাঁধুনি গোপালের মা আরও রুটি দেবে কি না জিজ্ঞেস করতে এলে বিলু মাথা নাড়ে। কিন্তু ওঠেও না। দেড়খানা রুটি পাতে পড়ে আছে। পাতের দিকে চেয়ে থেকে থেকে বিলুর মনে পড়ে তার ছোট্ট বয়স থেকেই ইস্কুল বা সেন্ট্রাল পার্কের ছেলে আর বন্ধুরা বলত সে নাকি তার বাবার ছেলে নয়। ব্যাপারটা খুব বিশ্বাস হত না বিলুর। আজকাল হয়। সে বুঝতে পারে এ বাড়ির কেউ তাকে যথার্থ ভালবাসে না। শুধু মা বাসে।

সোনালি জল খেতে ঢুকে বিলুকে দেখে বলল, খেতে ক' ঘণ্টা লাগে?

ছোড়দি, আমার মশারিটা ফেলে দিবি?

বিশুয়াকে বল। শুবি নাকি?

ঘুম পাচ্ছে ভীষণ।

ক' দিন পর পরীক্ষা চাঁদু? টুকলির দিন আর নেই মনে রেখো।

বিলুর ভীষণ মনে হচ্ছে আজ, এ বাড়িতে কেউ তাকে ভালবাসে না। শুধু মা। কিন্তু মাকে সে পায় কখন?

বিলু উঠে আঁচিয়ে রূপালির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। দেখে রূপালি মুখ নিচু করে লিখছে। এ বাড়িতে সবচেয়ে বেশি যাকে ভয় পায় বিলু সে মেজদি। মেজদির মেজাজের কিছু ঠিক নেই। কখন হাসবে, কখন রাগবে তা বলা মুশকিল।

বিলু ঘরে ঢুকে একটু দূরে দাঁড়ায়।

রূপালি মুখ না-তুলেই বলে, হিরণ্ময়ের সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল?

বাস স্ট্যান্ডে।

তোকে দেখে চিনল?

বিলুর এখন কথা আসছে। মাথা জেবড়ে যাচ্ছে না। মনে পড়ছে। বলল, প্রথমে চিনতে পারেনি। আমি গিয়ে কথা বললাম।

তোকে কথা বলতে বলেছে কে? চেনা দিতে গেলি কেন?

দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে। চেনা-চেনা লাগল, তাই গিয়ে কথা বললাম।

কী বলল?

বলেছি তো।

এ বাড়িতে আসবে বলল?

বিলু একটু মুশকিলে পড়ে যায়। আসবে বলে বলেছে বটে হিরুদা, কিন্তু সেটা নিজে থেকে নয়। তাই বিলু দ্বিধা করে বলে, বলল তো আসবে!

তুই ঠিকানা দিসনি তো!

না।

তা হলে বাসা চিনবে কী করে?

হিরুদা তো লোকাল লোক, ঠিক চিনে নেবে।

রূপালি হঠাৎ মুখ তুলে তাকাল। তার চোখ বিশাল করে খোলা। স্থির চোখে চেয়ে বলল, কাল গিয়ে বলে আসবি, যেন কখনও এ বাসায় না আসে। বুঝলি?

বিলু মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা। কীভাবে বলব?

সে-সব জানি না। দেখা হলে বলবি, আপনি আমাদের বাসায় আসবেন না।

বলব মেজদি বলেছে?

রূপালি একটু চুপ করে থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলে, তাই বলিস। এখন পড়তে যা।

আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

রূপালি আবার বিশাল চোখ করে তাকাল। তারপর হঠাৎ একটু নরম হয়ে বলল, আজ ছেড়ে দিচ্ছি। আর ওই অসভ্য ছেলেগুলোর সঙ্গে যদি কোনও দিন দেখি তবে আস্ত রাখব না।

আর যাব না ওদের সঙ্গে।

যা।

॥ নয় ॥

মাঝ রাতে শোভেন কয়েক বার ডাকাডাকি করলেন, বউমা, ও বউমা! বংশী, এই বংশী!

কেউ জবাব দিল না। ওদের ঘুম খুব গাঢ়। তা ছাড়া দরজায় ছিটকিনি দেওয়া ওপাশ থেকে।

আজ ঘুম আসেনি। পাশের ফ্ল্যাটের কচি বউটার ব্রংকিয়াল অ্যাজমার টান উঠেছে। বহু রাত পর্যন্ত ও-ঘরে সবাই জাগা। অ্যাজমার কথা লুকিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে বলে বউয়ের শাশুড়ি বউয়ের মা-বাবার শ্রাদ্ধ করেছে অনেকক্ষণ। তাই তো শোভেনের ঘুম চটে গেছে। তার ওপর রান্নাঘর থেকে বাসনপত্র নাড়াচাড়ারও যেন একটা শব্দ হচ্ছিল একটু আগে। চোর নয়তো!

সারা দিন শোভেন্দ্রনাথের নানা কাজকর্মে কেটে যায়। নাতিটার সঙ্গে বকবক করাও আছে। কিন্তু এই একা ফাঁকা সময়টা বড় ভয়ংকর।

শোভেন তাঁর পুরনো রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িটা দেখলেন। রাত আড়াইটে। সকালে রাসু আসবে। ছোট ছেলে শঙ্খর জন্য সাঁতরাগাছিতে একটা মেয়ে দেখতে যাওয়ার কথা। রাসুর কোনও বন্ধুর মেয়ে।

শঙ্খটার বিয়ে হয়ে গেলেই হয়ে যায়। বংশীর হয়েছে, চক্রর হয়েছে, বাকি শঙ্খ। শ্রীকৃষ্ণের বংশী, শঙ্খ, চক্র আর পদ্মর সঙ্গে মিলিয়ে ছেলেমেয়ের নাম রাখা হয়েছিল। চক্র আছে এয়ারফোর্সের সিভিলিয়ান স্টোরকিপার হয়ে হাসিমারায়। শঙ্খ গয়ায়। রেলের চেকার। বলতে গেলে তিন ছেলেই উপযুক্ত। কিন্তু উপযুক্ত বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে আজকাল শোভেনের ধাঁধা লাগে একটু। চক্র চিঠিপত্র লেখে না, টাকা পাঠায় না, আসেও না বড় একটা। শঙ্খ আসে বটে কালেভদ্রে, টাকাও পাঠায় কিন্তু সেও পরের ছেলের মতো আলগা হয়েছে আজকাল। বলতে গেলে ছেলেদের তুলনায় শোভেনের মেয়ে পদ্ম ভাল। তার বিয়ে হয়েছে দিল্লির এক অ্যাকাউন্টান্টের

সঙ্গে। ছোকরা কলকাতায় পোস্টেড ছিল। অত ভাল পাত্র শোভেন আশা করেননি। কিন্তু মেয়ে নিজেই পাত্র জোগাড় করে ফেলেছিল। ছেলেটি ইউপি-র ব্রাহ্মণ, তবে কলকাতাতেই জন্ম-কর্ম আর তিন পুরুষের বাস বলে খাঁটি বাঙালি হয়ে গেছে। নাম হরিহর মিশ্র। তার ছেলেমেয়েরা যতগুলো ভাল কাজ করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভালটা হচ্ছে পদ্মর বিয়ে। পদ্ম দিল্লি থেকে প্রতি হপ্তায় পোস্টকার্ড ছাড়ে, বাপকে যেতেও বলে। কিন্তু বংশীর বউয়ের সঙ্গে তার বনিবনা হয় না বলে আসে না।

বনিবনা কথাটা নিয়েও খুব ভাবেন শোভেন। আজকাল কারও সঙ্গে কারও বনিবনা হচ্ছে না।

পাশের ফ্ল্যাটে খানিকক্ষণ চুপচাপ গেল। এই আবার বমির শব্দ আসছে— ওয়া খ্যাক, ওয়া খ্যাক!

নতুন বিয়ের বউ, মোটে চার মাস বিয়ে হয়েছে। শোভেন একটু শিউরে ওঠেন। শঙ্খর জন্য পাত্রী দেখতে যাবেন সকালে। ভাল মতো খোঁজ-খবর নিতে হবে। নইলে ছেলের কপালে কী জোটে এসে!

পাশের ফ্ল্যাট থেকে কথার শব্দ আসে। দরজা খুলে কে যেন বারান্দায় গেল।

এই সব সাড়াশব্দ একরকম ভাল। লোকে জেগে আছে জানলে ভালই লাগে। নিস্তব্ধতাটা বড় অসহ্য।

তিনটে বাজবার পর উঠে শোভেন দাঁত মেজে ফেললেন। শোভেনের চা, সিগারেটের নেশা নেই। তবে গুড়াকু দিয়ে দাঁত মাজাটা অনেক দিনের অভ্যাস। উঠেই একমাত্র নেশা।

রাসু আসবে সাতটা সাড়ে সাতটায়, সাঁতরাগাছি তো কালীঘাট থেকে কম দূরের রাস্তা নয়। ফিরে এসে আবার দুপুরের স্নান-খাওয়া আছে।

ভোরের আলো ফুটবার অনেক আগেই শোভেন তৈরি হয়ে নেন। আসলে দিনটাকে যত বড় করা যায়। রাতটাই তো ভয়াবহ। একা ঘরে ভুতুড়ে চিন্তা আসে সব।

তৈরি হয়ে শোভেন বসে রইলেন। পরনে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি, হাতে ঘড়ি। ভোরের আলো ফোটেনি। শোভেন তবু বসে আছেন। রাসু আসতে কম সে কম তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা দেরি। কিন্তু শোভেন তো ঠিক রাসুর জন্য অপেক্ষা করছেন না, দিনটার জন্যই তাঁর অপেক্ষা। রাত কেটে গেছে, এ-কথা ভাবতে বড় ভাল লাগে। উঠে দরজা জানালা খুলে দিলেন শোভেন। পাশের ফ্ল্যাটের বউটা কি এবার একটু ঘুমোল?

রাতে বংশীরও ভাল ঘুম হয়নি। নানান বাজে চিন্তায় মাথা গরম। এপাশ-ওপাশ করে ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়ল। ক'দিন ধরেই দীপালি রূপালির বিপদের কথা তাকে বলছে। কিন্তু বংশী ভেবে পায় না তার কী করবার আছে। গতকালও বংশী দীপালিকে জিজ্ঞেস করেছে, ঠিক করে বলো রূপালির কি এখন অন্য কারও সঙ্গে কোনও অ্যাফেয়ার আছে!

দীপালি বলে, কী করে বলব! ও তো ভীষণ চাপা মেয়ে, কখনও কিছু ভেঙে বলে না।

বংশী বলে, তা হলে সেই ছেলেটাকেই অ্যাকসেপ্ট করে নিক না! কাণ্ডটা ঘটিয়ে যখন ফেলেছে!

দীপালি কেমন শত্রুতার চোখে তাকিয়ে বলে, ছেলেটাকে তুমি চেনো?

না, কী করে চিনব?

তা হলে বলতে না। সে ছেলে কত খুনখারাপি করেছে, কত ডাকাতি করেছে তার ঠিক আছে কিছু! লেখাপড়া, কালচার কোনওটাতেই রূপালির ধারে-কাছে দাঁড়াতে পারে না। অল্প বয়সের মতিভ্রম, কী করে ফেলেছে আর সেইটেই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে? বেশ লোক তো তুমি! নিজের বোন হলে বলতে পারতে ও-কথা?

বংশী একটু থতিয়ে যায়। সত্যিই তো। তার বোন পদ্ম ভাগ্যক্রমে একটি ভাল পাত্রকে গেঁথে তুলেছিল, নইলে সে যদি কোনও কুপাত্র জোটাত তা হলে বংশী কি মেনে নিত?

বংশী তবু একটু তর্ক বজায় রেখে বলে, ছেলেটাকে তুমি কি দেখেছ?

দেখেছি, তবে ভাল মনে নেই। কেন?

ভাবছিলাম—

ভাবাভাবির কিছু নেই। সে ছেলে অ্যাকসেপটেবল নয়। তা ছাড়া রূপালি তখন মাইনর ছিল। তুমি তোমার উকিল বন্ধুর কাছে একবার যাও।

বংশী বড় একটা শ্বাস ফেলে। বাস্তবিক কথাটা তার খেয়াল ছিল না। তার তো একজন জবরদস্ত উকিল বন্ধু রয়েছে।

বংশী বলে, তোমরা তো বলছ মামলা-মোকদ্দমা করবে না। উকিল দিয়ে কী হবে?

অন্য কোনওভাবে ব্যাপারটা সলভ না হলে মামলাই করতে হবে। আর ছেলেটার সঙ্গে তুমি গিয়ে দেখা করো। সে কী বলতে চায় শুনে এসো।

আমি? বংশী চমকে যায়। বলে, আমি কেন? আমি তো তাকে চিনিই না।

চেষ্টা করলেই পাবে। তবে ঝগড়াঝাঁটি করতে যেয়ো না।

বংশী খুব ভিতু লোক ছিল না কোনও দিন। এক সময়ে সে রাস্তাঘাটে মারপিটও করেছে যার-তার সঙ্গে। সাহসী বলে তার খ্যাতিও ছিল। কিন্তু নকশাল আন্দোলনের সময় যখন কলকাতার অলিতে-গলিতে, রাস্তায়-ঘাটে হরবখত খুন হতে লাগল, তখনই বংশীর সাহসটা গেল চুপসে। মারপিট এক কথা আর খুন সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। একটা লোককে দুটো চড় মারো, একটা ঘুঁসি বসিয়ে দাও, তাতে বংশীর আপত্তি ছিল না। কিন্তু কারও পেটে চাকু ঢুকিয়ে দেবে, গুলি করবে কি বোমা মেরে ছ্যাদড়া-ব্যাদড়া করে দেবে এটা ভাবাই যায় না। বড়বাজারে একবার মশলা কিনতে গিয়েছিল বংশী। তখন দুপুর সবে পেরিয়েছে। মশলাপট্টি ঘুরে মাসকাবারি জিনিসপত্র কিনে সবে বেরিয়েছে তখনই লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে ঘটনাটি ঘটল। হ্যারিসন রোড আর স্ট্র্যান্ড রোডের মোড়ে একটা ট্রাফিক পুলিশ টিংটিং করে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ কোত্থেকে ছ'-সাতজন ছেলে এসে তাকে চোখের পলকে ঘিরে ফেলে। ঘেরবার কায়দাটাই অন্য রকম। সকলেই পুলিশটার দিকে পিছু ফিরে গোল হয়ে দাঁড়াল, তাদের দু'হাতে আড়াআড়ি ধরা দেড় হাত লম্বা ছোরা। সেই ব্যূহের মধ্যে দু'টো ছেলে, পুলিশটার দু'টো হাত চেপে ধরল, একটা ছেলে পিছন থেকে এক হাতে তার থুতনিটা চেপে ধরে মুখটা ওপর দিকে তুলে ধরল, ঠিক যেমন দাড়ি কামানোর সময় গলার দাড়ি চাঁছতে গিয়ে নাপিত তার খদ্দেরের মুখ ধরে ওপরে তোলে। ছেলেটা অবিকল সেই ভাবেই পুলিশটার গলা কামিয়ে দিল যেন। কয়েক সেকেন্ডের মামলা। তারপরই ছেলেগুলো নানা দিকে দৌড়ে চলে যায় ভিড়ের মধ্যে। গলার নলি কাটা পুলিশটা মাটিতে পড়ে দাপাচ্ছে। অবশ শরীরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখেছিল বংশী। তারপরই এক অক্ষম রাগে তার হাত-পা নিশপিশ করে ওঠে। মনে হয়, যদি ওদের একটা ছেলেকেও হাতের কাছে পায় বংশী তা হলে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেয়।

কিন্তু সেই দৃশ্যটা দেখার পর থেকেই বংশীর সাহসটা কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে এল। না, এ যুগটা ফোতো সাহসের যুগ নয়। জান নিয়ে টানাটানি। খুন এখন সস্তা। সেই থেকে বংশী কখনও রাস্তাঘাটে হুজ্জতে যায় না। কেমন একটা প্রাণের ভয় দেখা দিয়েছে। নকশাল আমল কেটে গেল, কিন্তু সেই ভয়টা রয়ে গেল বংশীর।

বংশী বলেছিল, আমি ঝগড়াঝাঁটি করতে যাব কেন? কিন্তু ছেলেটা নিজেই যদি গড়বড় শুরু করে?

সেই ভয় দীপালিরও। সে জানে তার স্বামীটা নরম মেজাজের লোক, যেখানে-সেখানে হাঙ্গামা হুজ্জত বাঁধিয়ে ফেলে। সে অবশ্য এ খবর রাখে না যে, বংশীর সেই সাহস আর নেই। তাই সে বলল, তোমাকে এ-সবের মধ্যে জড়াতে আমি চেয়েছি নাকি? জানি তো তুমি হয়তো মেরেটেরে

বসবে। কিন্তু রূপালির কী হবে বলো তো! বাড়িতে তো কাউকে বলা যায় না। বললে ভীষণ খারাপ ব্যাপার হবে। রূপালি একা ফেস করতে পারবে না। তা হলে বরং আমিই যাব, তোমার গিয়ে কাজ নেই।

বংশী ঝাঁকি মেরে বলে, সর্বনাশ! তুমি কেন? তুমি নয় বাপু, আমিই দেখব কী করা যায়।

সেই থেকে বংশীর দুশ্চিন্তা। কী করবে? কী করা সম্ভব? এক কথা, যাদবপুরে তার শ্বশুরবাড়ি হলেও জায়গাটায় সে খুব পরিচিত নয়। তা ছাড়া যে-ছেলেটাকে নিয়ে সমস্যা সে কেমন ধরনের লোক জানা নেই। তিন নম্বর, যদি ছেলেটা বেগড়বাঁই করেই তবে হয়তো লোকেরা ওর পক্ষই নেবে, বংশীর হয়ে কেউ দাঁড়াবে না।

উকিল বন্ধুর কাছে গিয়েওছিল বংশী। সুজিত সব শুনে বলল, কেস ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু মামলা মানেই তো পাবলিসিটি।

উপায় কী?

বিয়েটা অ্যানালড করে দেওয়া যায় না আপসে? রূপালি তখন মাইনর ছিল তো!

সে কোর্ট বুঝবে।

বংশী হতাশ হয়ে ফিরে এল।

বংশীর জীবনে সবচেয়ে বড় পরামর্শদাতা হল রাসুকাকা। বন্ধুব মেয়েকে শঙ্খর গলায় ঝোলাতে চাইছে। সাঁতরাগাছিতে পাত্রী দেখতে শোভেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাত সকালেই রাসুকাকা হাজির।

বংশী রাসুকাকাকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে পরামর্শ করতে বসল।

শুনে রাসু বললেন, ও-পাড়ার সব আমি চিনতাম। ছেলেটার নাম কী বললি?

হিরু। হিরন্ময় চৌধুরি, খুব ডেসপারেট ছেলে নাকি!

রাসুর মুখে উদ্বেগ নেই। প্রশান্ত হেসে বললেন, ডেসপারেট তো বটেই। সে আমরাও ছিলাম, এখনও আছে। ব্রিটিশ আমলে এই আমিও কিছু কম ডেসপারেট ছিলাম না। এই সেদিন বিধান রায়ের আমলেও লাঠি টিয়ার গ্যাস খেয়েছি।

বুড়ো মানুষদের ওই দোষ, নিজের কথা তুলে ফেলেন যখন তখন। বংশী তাড়াতাড়ি বলল, এ ছেলেটাকে চেনেন নাকি?

রাসু মাথা নেড়ে বললেন, মুখটা মনে পড়ছে না। তবে খোঁজ নিলে বেরিয়ে পড়বে সব। লোক লাগিয়ে দেবখন। অ বউমা, তোমার চা কদ্দুর? বলেই রাসু ফের বংশীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোকে নাকি প্রভিডেন্ট ফান্ডে দিয়েছে?

আর বলবেন না। সে একরকম তবু সয়, কিন্তু শুনছি নাকি আমেদাবাদে এবার ঠেলে দেবেই। এই ক'দিন আগে অফিসের একটা বিল পাশ করিয়ে দিলাম, দে আর নট গ্রেটফুল। বেদ সাহেব মহা হারামজাদা লোক।

কিন্তু এফিশিয়েন্ট, দিল্লিতে খুব নাম করেছিল।

আপনি একটু দেখবেন নাকি, আমেদাবাদটা যদি আটকানো যায়!

সারা দিন তো ওই আমার কর্ম। কারও এটা ঠেকাও, কারও ওটা আটকাও, কারও সেটা চালু করো। এই সব করে নিজের জন্য আর কিছু করা হল না। তোরা সব অপোগণ্ড শিশুর মতো কেন বল তো! হাত পা চোখ কান সব আছে, তবু অন্যের ওপর ঠেক দিয়ে চলবি কেন? হাঁকডাক করে কাজ আদায় করতে পারিস না? আমাকে যেখান থেকে বলিস সেখান থেকে কাজ আদায় করে এনে দেব। তোরা যে কী মিনমিনে পুরুষ হলি আজকাল! একদল মিনমিনে, অন্য দল খুনে।

দীপালি চা নিয়ে এল। রাসু হাত বাড়িয়ে চা নেওয়ার সময় বেশ ভাল করে দীপালিকে দেখে নিলেন। বংশী এ-ব্যাপারটা লক্ষ করে প্রায়ই। রাসুকাকা মেয়েছেলে দেখতে ভালবাসেন। আর

দেখার সময় সম্পর্কটা বড় মনে রাখেন না। বংশী একটু অস্বস্তি বোধ করে বরাবরই। কিন্তু কিছু করারও নেই। দীপালিও তেমন মেয়ে নয় যে, পুরুষ মানুষ তাকালে সে সংকোচ করবে। বরং পুরুষের চোখ সে বেশ উপভোগই করে।

রাসু বললেন, বুঝলে বউমা, তোমার স্বামীটা একটি ম্যাড়া। লোকসমাজে মুখ লুকিয়ে চললে কি কাজ হয়? মাথা উঁচু করে চলা চাই। আমরা ইংরেজ আমলে সাহেব বসদের সঙ্গে হাতাহাতি পর্যন্ত করেছি, আর এরা দিশি সাহেবদের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকে। তা তোমার বোন কী কাণ্ড ঘটিয়েছে শুনলাম!

দীপালি এক বার রোষকষায়িত চোখে বংশীর দিকে তাকাল। কথাটা অন্য কাউকে বলা দীপালির পছন্দ ছিল না। এভাবেই ঘরের কথা হাটে ছড়ায়। দীপালি মাথা নিচু করে বলল, দেখুন না কাণ্ড। রূপালির দোষ নেই, ও তখন ছোট ছিল। ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ওকে দিয়ে সই করিয়েছে।

রাসু হেসে বললেন, ও-সব কথা তো কোর্টে টিকবে না। আর আমারও বয়স হয়েছে, অভিজ্ঞতা থেকে যা শিখেছি তাতে আমিও কথাটা মেনে নেব না। এ সব ব্যাপারে কেউ কাউকে ভোলাতে পারে না। স্বেচ্ছাতেই সবাই সই করে, পরে কপাল চাপড়ায়। ও সব সেন্টিমেন্টাল পয়েন্ট বাদ দাও। বরং তোমার বোনকে এক বার আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়ো। দেখবখন।

রাসু শোভেনকে নিয়ে সাঁতরাগাছি রওনা হয়ে গেলেন। তারপর দীপালি আর বংশীর খুব ঝগড়া লাগল।

॥ দশ ॥

তোমার জাগতিক সম্পদ আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে দ্যাখো হিরণ্ময়। তোমার প্যান্ট-শার্টের তলায় শতচ্ছিন্ন আন্ডারওয়ার আর গেঞ্জি। এ সব আর তোমার পোশাক নয়, এ সব তোমার গায়ের চামড়ার মতো হয়ে গেছে। ডান পকেটে একটা ন্যাকড়ার মতো রুমাল, বাঁ পকেটে কিছু পয়সা। ওঃ তোমার রোদ চশমাকেও ধরো তার মধ্যে। ক'দফা পাচ্ছ হিরণ্ময়? যদি কখনও সর্বহারার শাসন কায়েম হয় তবে তোমার দাবি পাবে অগ্রাধিকার, তুমিই হবে রাষ্ট্রপতি। কারণ তোমার মতো এত হারিয়েছে কে বলো!

কলকাতায় টেলিভিশন এল হিরণ্ময়, রেফ্রিজারেটার সস্তা হয়ে গেল, বাজার ছেয়ে গেল কত রকম ভোগ্যপণ্যে! মদের দোকানে গিয়ে দেখো একবেলায় একজন দেড়-দুশো টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়, কয়েক মুহূর্তের অস্বাভাবিকতা কেনার জন্য। কত দোকান হয়েছে দেখেছ হিরণ্ময়? তুমি জানো স্টেনলেস স্টিলের কেজি কত করে? কিংবা একটা ন'শো বর্গফুট ফ্ল্যাটের দাম? সোনার ভরি কততে উঠল বলো তো! তুমি কি কখনও টের পাবে হিরণ্ময় যে একটা গায়ে মাখার ইমপোর্টেড সাবান চোদ্দো টাকায় বিকোয়? এসপ্ল্যানেডে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখো, কয়েক শো বিদেশি নতুন গাড়ি চলে গেল যার এক-একটার দাম লাখ টাকা ছাড়িয়ে। পেট্রলের দাম তিন গুণ বাড়ল হিরণ্ময়। তবু গাড়ির চলা কি কমছে, কমছে ট্রাফিক জ্যাম?

তুমি কি ভুল লড়াই লড়তে তা হলে? কাদের জন্য লড়াই? তোমার চারদিকে এত সম্পদের আয়োজন দেখে কখনও তোমার মনে হয় না যে, এ দেশে সর্বহারাই মাইনরিটি? ফিরে এসো হিরণ্ময়, ফিরে এসো।

হিরণ্ময়, দ্যাখো! দ্যাখো! সেদিনের সেই চমৎকার কিশোরী মেয়েটি না! হ্যাঁ সে-ই তো! আজও দিদির সঙ্গে মার্কেটিং-এ এসেছে। চার দিকে কেমন মার্কেটিং-এর মচ্ছব পড়ে গেছে, দেখছ?

একদল কেবল পাগলের মতো কাছা খুলে দেদার কিনে যাচ্ছে। আর একদল বেচতে বেচতে গলদঘর্ম হয়ে গেল! মনে আছে শিলিগুড়ির ঠিকাদার অমলেন্দুর কথা! সেদিন এক লাখ টাকার বিল পেমেন্ট পেল অমলেন্দু। নিট পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন হাজার টাকা মারজিন। অমলেন্দুর সেদিন আনন্দে মাথার ঠিক নেই। বিকেলে বউ আর ছেলেমেয়ে নিয়ে বিধান মার্কেটে ছুটল। গিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যা দেখে তাই কিনতে চায়। বউকে মেয়েকে ছেলেকে কেবলই বলে, কেনো, কেনো, কিনে ফেলো! যা খুশি, যত দামের খুশি। বউ তাকে ধমক দিয়ে বলল, যাঃ, ও রকম কোরো না তো! লোকে আদেখলা ভাববে। বেশি এনথু দেখালে দোকানদাররাও দাম চড়িয়ে বসে থাকবে। হিরণ্ময়, সেদিন শিলিগুড়ির বিদেশি জিনিসের চোরাবাজার হংকং মার্কেটে কয়েক হাজার টাকার জিনিস কিনে নিল অমলেন্দু। কাজের জিনিস নয় কোনওটাই, সবই ফ্যান্সি দ্রব্য। তুমি আগাগোড়া তাদের সঙ্গে ছিলে সেদিন, মনে মনে রাগে ফুঁসছিলে অপব্যয় দেখে। আজকাল কোন মানুষ এত জিনিস কিনতে চায় বলো তো?

আজও কি তোমার রাগ হয় হিরণ্ময়? না, হয় না। এখন অনুভূতিগুলোর ধার কমে গেছে। রাগের আছেই বা কী? লোকে যে কেনাকাটা করছে এ তো খুব ভাল লক্ষণ। ক'দিন আগেই তো খবরের কাগজে সর্বভারতীয় বণিক সভার একটা রিপোর্ট দেখেছিলে, মনে নেই? দেশের দিকপাল ব্যবসাদাররা সেদিন বলেছিল, ভারতবর্ষের বাজারে কনজিউমার গুডস এত বেড়ে গেছে যে লোকে কিনে শেষ করতে পারছে না। আর বাজারে যখন ভোগ্যপণ্য বাড়ে তখন ক্রেতাদের আধিপত্যও বেড়ে যায়। দেশের বাজারে তাই তখন বিক্রেতার চেয়ে ক্রেতাদেরই পায়াভারী। আর ক্রেতাদের আধিপত্য বাড়া মানেই দ্রব্যমূল্যের হ্রাস। তাই তো? যদি তাই হয় তো গড়পড়তায় সাধারণ মানুষেরই সুবিধে।

অর্থনীতি তত্ত্ব যাই বলুক, তুমি জানো টেলিভিশন বা ফ্রিজের দাম কমলেও চালের দর নামেনি তেমন। তুমি জানো প্রতি বছর বাড়ছে কাপড় বা জুতোর দাম। চোদ্দো টাকার ইম্পোর্টেড সাবান ঝপাঝপ বিক্রি হয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু তিন টাকার চাল কিনতে এসে একজন শ্রমিক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে চিন্তা করে।

থাকগে হিরণ্ময়। বরং ওই কিশোরী মেয়েটাকে দেখো। কী সুন্দর একটা লেবু রঙের ঘাগরা আর দুধ-সাদা পলিয়েস্টারের জামা পরে আছে ও! প্লাক করা ভ্রু চিকন করে এঁকে এসেছে। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। নতুন খোলস ছাড়লে সাপের গা যেমন ওর গায়ের চামড়া তেমনি সতেজ। ডান হাতে এই বড় একটা অটোমেটিক ঘড়ি। ওর দিদিকে দেখেছ? যেমন সুন্দরী তেমনি সাজতেও জানে। বুক-পিঠে অনেকখানি গভীর করে কাটা ব্লাউজ গায়ে। শাড়িটা বোধহয় জাপানের, জংলা ছাপ তাতে। চুল কিছু খাটো করে ছাঁটা, সঙ্গে বাচ্চাটাকে পাউডারে চুবিয়ে এনেছে। তার পরনের পোশাক দেখেছ? ডোনাল্ড ডাকের ছবিওলা জামা গায়। ও জামাটাও কম দামি নয়।

একটু তাকিয়ে থাকো ওদের দিকে হিরণ্ময়। ভাল লাগবে। সুন্দর যা-কিছু আছে সবই চেয়ে দেখতে হয়। দেখো! দেখো! ওই কিশোরী মেয়েটি তোমাকে পাগল ভাবে। তা তুমি কি আর একটুও পাগল নও? একটু-একটু পাগল তো তুমি ঠিকই।

কিশোরী মেয়েটি তার দিদির সঙ্গে নতুন বড় দোকানটায় ঢুকে গেল। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখল হিরণ্ময়। আজ বড় কটকটে সাদা রোদ উঠেছে। বালি-ভাজা গরম। ঘামে ভেপসে যাচ্ছে হিরণ্ময়ের আ-কাচা কটুগন্ধ জামা-প্যান্ট। দাড়ির গোড়ায় গোড়ায় জমছে ঘাম। কপাল থেকে ঘামের স্রোত নেমে আসছে চোখে।

তবু হিরণ্ময়ের তেমন কষ্ট হয় না। রোদ বৃষ্টি শীত সে অনায়াসে কাটায়। জিলিপি খেয়েছিল সকালে, অম্বলের ঢেকুর উঠল। গলা-বুক জ্বলে যাচ্ছে অম্বলে। কড়ার নীচে ব্যথাটা এইমাত্র শুরু হল।

আগে খুব চার দিকে নজর ছিল হিরণ্ময়ের। আজকাল কেমন ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে সে। অনেকক্ষণ আগেই তার লক্ষ করা উচিত ছিল যে, বাজারের নতুন দোতলা বাড়িটায় উঠবার সিঁড়ির নীচে ছায়ায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন তাকে নজরে রাখছে। হিরণ্ময়ের চোখের দৃষ্টি খুবই ভাল, দেখতে তার ভুল হয় না। তবু রোদ-চশমাটা খুলে হিরণ্ময় ভাল করে দেখল।

ওদের মধ্যে জনা দুয়েককে হিরণ্ময় চেনে। একজনের সঙ্গে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল ছেলেবেলায়। এখন সে বন্ধু না শত্রু তা বোঝা মুশকিল।

অভ্যাসবশেই হিরণ্ময় বুঝতে পারে, এক্ষুনি তার এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার। সে হুজ্জতের গন্ধ পাচ্ছে।

আগের মতো দ্রুত পালাতে পারে না হিরণ্ময়। শরীর মন দুই-ই বড় ধীর হয়ে গেছে। আজকাল ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগে। জোরে হাঁটতে গিয়ে মনে হয়— পণ্ডশ্রম। কোথাও তো যাওয়ার নেই।

বড় দোকানটা থেকে কিশোরী মেয়েটি বেরিয়ে এলে আর-এক বার তাকে দেখত হিরণ্ময়। দেখতে বড় ইচ্ছে করছিল। শুনতে ইচ্ছে করছিল মেয়েটি আজও তাকে পাগল বলে কি না!

কিন্তু অপেক্ষা না-করাই ভাল।

হিরণ্ময় আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। চালপট্টির ভিতর দিয়ে সরু গলি ধরে চলতে চলতে সে আপন মনে খামোখা একবার বলে উঠল, দূর শালা!

এ অঞ্চলে তার চেনা-জানা মানুষ বিস্তর। কাজেই এত দিন অনুপস্থিতির পর ফিরে এসেছে বলে তাকে কেউ কেউ তো নজর করবেই। যারা নজর করে তাদের মধ্যে কিছু আছে নিছক কৌতূহলী, আর কিছু মতলববাজ।

কারও নজরই হিরণ্ময় সইতে পারে না।

এইট-বি বাসের স্ট্যান্ডটাই তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। আস্তে ধীরে হেঁটে হিরণ্ময় চলে এল স্ট্যান্ডে। গোটা দুই খারাপ বাস দাঁড়িয়ে আছে, একটার মেরামতি চলছে। হিরণ্ময় একটা বাসের দোতলায় উঠে গেল। ছায়ার দিকে একটা সিটে বসে রইল চুপচাপ।

এইভাবে বসে থাকতে তোমার কেমন লাগে হিরণ্ময়? কখনও তুমি একা একা থাকতে পারতে না আগে। অনেকক্ষণ নিঃসঙ্গ চুপচাপ নিজের মনে বসে থাকা তোমার অসহ্য ছিল। আজকাল পারো কী করে? একটা সময় ছিল যখন তুমি ভূতের ভয় পেতে। মল্লিদাদা মরে যাওয়ার পর দীর্ঘকাল একা ঘরে শুতে পারতে না। এখন পারো। আজকাল একটিও কথা না বলে তোমার একদিন-দু'দিন কেটে যায়। যদি বা কোনও দিন বলো সে মাত্র দুটি-একটি সংক্ষিপ্ত কথা। এইভাবে একদিন ভাষা ভুলে যাবে না তো হিরণ্ময়! দোতলার সিঁড়ি বেয়ে কে উঠে আসছে! বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পা! শুনছ? সাবধান হতে তোমার আজকাল ইচ্ছে করে না। তুমি নিরুদ্বেগে বসে আছ।

চাপা স্বরে কে ডাকে, হিরু!

হিরণ্ময় উদাস চোখ ফিরিয়ে চায়। শান্তি। কোনও জবাব না দিয়ে হিরণ্ময় আবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। একটু আগে বাজারের সিঁড়ির কাছ থেকে শান্তি তাকে লক্ষ করছিল।

শান্তি কাছে এল। সামনের সিটে বসে শরীর ঘুরিয়ে হিরণ্ময়ের দিকে চেয়ে বলল, কবে এসেছিস?

হিরণ্ময় তার সস্তা সিগারেটে টান দিয়ে বলে, এই তো কিছুদিন।

কেন এসেছিস?

এমনি।

লোকে জানে পুলিশ তোকে মেরে ফেলেছে।

হিরণ্ময় জবাব দিল না।

শান্তি একাগ্র চোখে চেয়ে আছে। বেঁটে ফরসা নাদুসনুদুস চেহারা শান্তির। আগে খুব রোগা ছিল।

পরনে রঙিন খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ধুতি। সকালে দাড়ি কামিয়েছে। খুব দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো মুখভাব।

শান্তি বলল, এভাবে ব্রড ডে-লাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। যে কোনও সময়ে পুলিশ তুলে নিয়ে যাবে।

হিরণ্ময় চুপ করে থাকে। তার যাবতীয় সহযোদ্ধাদের কেউ জেলে, কেউ মারা গেছে, কেউ অন্য দলে ভিড়েছে। কেউ আর অবশিষ্ট নেই। হিরণ্ময় তাই মাথা ঘামায় না।

সে জবাব দিল না দেখে শান্তি নিজেই আবার বলে, যদি পুলিশে নাও ধরে তবু অন্য রকম বিপদ আছে। সেটা কি বোঝাতে হবে?

হিরণ্ময় তার রোদ-চশমার ভিতর দিয়ে শান্তির দিকে চেয়ে রইল। কোনও কোনও লোকের কথার জবাব দিতে তার ইচ্ছে করে না। খুব অভদ্রের মতোই সে চুপ করে থাকতে পারে।

শান্তি বলল, অনেক খুন করেছিস হিরু। সবাই কিন্তু সে-সব ভুলে যায়নি, বদলা নিতে অনেকেই আসবে।

হিরণ্ময় সিগারেট ফেলে দিয়ে আর-একটু হেলে বসে বলল, তোদের এদিককার রাস্তাঘাট খুব ভাল হয়ে যাচ্ছে, না?

অপ্রাসঙ্গিক কথাটা শুনে শান্তি একটু অবাক হয়। তারপর সামান্য উত্তেজনার স্বরে বলে, ছেলেমানুষি করিস না হিরু। চলে যা। এখানে চার দিকে তোকে নিয়ে কথা হচ্ছে। সময় থাকতে চলে যা। কে তোকে এখানে আসার বুদ্ধি দিয়েছে?

হিরণ্ময় জবাব দেয় না। চোখ বুজে থাকে।

শান্তি আস্তে করে বলে, তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমি তোর খারাপ চাইতে পারি না। যদি বাড়ির লোকজনকে দেখতে এসে থাকিস তবে চল আমি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখা করে চলে যা।

হিরণ্ময় চোখ খুলে বলে, তুই সঙ্গে করে নিয়ে যাবি? কেন, তুই থাকলে কেউ আমাকে কিছু বলবে না?

শান্তি আত্মবিশ্বাসের গলায় বলে, না। আমি থাকলে কেউ কিছু বলবে না।

কেন, তুই কি লিডার?

সে যাই হোক। তুই রাজি কি না বল।

আমি বাড়ির কাউকে দেখতে আসিনি।

তবে?

আমি কোথাও আসিনি। ঘুরতে ঘুরতে যখন যেখানে হোক থেকে যাই। আবার চলে যাব কোনও দিন। ভাবছিস কেন?

শান্তি আর সে শান্তি নেই। হয়তো সে এই এলাকার কেওকেটা হয়ে গেছে! খুব দায়িত্বের সঙ্গে সে বলল, কিন্তু মনে রাখিস, আমরা এ অঞ্চলে অশান্তি চাই না। এক সময়ে অনেক গন্ডগোল হয়েছে। যদি আর কিছু হয় তবে আমরা বরদাস্ত করব না।

কী হবে?

সেটা নির্ভর করছে তোর ওপর। আমরা এখনও জানি না তুই এখানে কেন এসেছিস।

শান্তির গলার স্বর রীতিমতো কড়া। হিরণ্ময় টের পায় নীচে শান্তির দলবল দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ইঙ্গিতমাত্র উঠে আসবে। সেই জোরেই শান্তি তাকে শাসন করে যাচ্ছে একতরফা।

হিরণ্ময় আস্তে করে বলে, আমি কিছু করব না।

তার গ্যারান্টি কী?

হিরণ্ময় তেমনি মৃদুস্বরে বলে, গ্যারান্টি কীসের? আমার আর কিছু করার নেই। আমি এখন রিটায়ার্ড।

বলে এই প্রথম হিরণ্ময় একটু হাসে।

শান্তি অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর সিগারেটের প্যাকেট বের করে হিরণ্ময়কে একটা দেয়, নিজে একটা ধরায়। একটু নড়েচড়ে বসে শান্তি বলে, তুই পালবাজারে উপেনের দোকানে থাকিস না?

শুধু রাত্রে।

আমরা সব খবর রাখি। ও জায়গাটা তোর পক্ষে খুব সেফ নয়।

কেন?

কেন-কেন করিস না। সেফ নয় আমি বলছি। শান্তি একটু উষ্মার গলায় বলে।

হিরণ্ময় অসহায় ভাব দেখিয়ে বলে, আর কোথায় উঠব?

অ্যাট লিস্ট আমাকে অ্যাপ্রোচ করতে পারতিস!

তোকে? হিরণ্ময় অবাক হয়ে বলে, কেন, তোকে কেন?

আমি তোকে শেলটার দিতে পারতাম।

হিরণ্ময় আবার টের পায় শান্তি কেওকেটা হয়েছে। এখন হয়তো এই এলাকা ও শাসন করে।

হিরণ্ময় মাথা নামিয়ে বলল, মনে রইল। দরকার হলে যাব।

শান্তি একটু ইতস্তত করে বলে, একটা কন্ডিশনে তোকে আমি এখন থেকেই শেলটার দিতে পারি।

কন্ডিশনটা জানতে ইচ্ছে হল না হিরণ্ময়ের। শুধু চেয়ে রইল।

শান্তি বলল, আমরা কিছু ছেলে মিলে এখানে নানারকম গঠনমূলক কাজ করছি।

'গঠনমূলক' শব্দটা খট করে কানে লাগে। ভীষণ সাধু ভাষা। কোনও কথাতেই হিরণ্ময়ের আজকাল বড় একটা হাসি পায় না। কিন্তু এ-কথাটায় পেল।

সে একটু কৌতূহলের সঙ্গে বলল, গঠনমূলক?

শান্তি তেমনি জোরালো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, আমরা একটা যুব-আন্দোলন গড়ে তুলছি।

'যুব আন্দোলন' কথাটায় আবার হিরণ্ময় প্রায় হেসে ফেলে।

শান্তি হয়তো বুঝতে পারল তার কথা হিরণ্ময়কে তেমন ইমপ্রেস করছে না। তাই হঠাৎ সে আবার একটু ত্যাড়া হয়ে বলে, আমরা তোকে দুটো অলটারনেটিভ দিচ্ছি। আইদার জয়েন আস অর লিভ দিস প্লেস।

হিরণ্ময় মাথা নেড়ে জানাল যে সে বুঝেছে।

শান্তি দাঁড়িয়ে বলল, যদি জয়েন করতে রাজি থাকিস তবে আমার বাড়িতে চলে আয়। আমি তোকে শেলটার দেব। কেউ কিছু বলবে না। একটু ভেবে কাল আমাকে জানাস। বাজারের দোতলায় নতুন কফি হাউসে বিকেলে পাঁচটার পর আমাকে পাবি।

হিরণ্ময় শান্তির দেওয়া সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে বলল, আচ্ছা।

শান্তি বাস থেকে নেমে গেলে হিরণ্ময় একা বসে রইল অনেকক্ষণ। শান্তির কথা সে একদমই ভাবছিল না। তার কেবল মল্লিদাদার কথা মনে পড়ছে। কেন যে সেই লোকটার কথা আজকাল মনে হয় এত!

রাত সাড়ে বারোটায় যখন শুতে এল হিরণ্ময় তখন উপেন সদ্য কাজ শেষ করে উঠেছে। মেশিনপত্র গোছাতে গোছাতে গম্ভীর মুখে বলল, তোমার খোঁজ হচ্ছিল।

কে?

দুটো ছেলে এসেছিল রাতের দিকে। তারা ভাল ছেলে নয়। কাল বিকেলে তোমাকে কফি হাউসে যেতে বলে গেল।

শান্তি লোক পাঠাচ্ছে। হিরণ্ময় খুব অবাক হল না। ওরা জানতে চায় সে রং বদল করতে রাজি

কি না। এই কূট প্রশ্নের উত্তর সে নিজেও তো জানে না। সে কি এখনও পুরনো আদর্শে বিশ্বাসী? না কি নয়? সে আজকাল এ-সব তো ভাবেও না।

উপেন চলে গেলে মোম জ্বালিয়ে হিরণ্ময় বসল। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ জেগে রইল অনেকক্ষণ।

ভোরের দিকে হিরণ্ময় স্বপ্ন দেখছিল। সেই সুন্দরী কিশোরী মেয়েটি একটা নির্জন রাস্তায় তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হিরণ্ময় চেঁচিয়ে বলল, খুকি বলো আমি পাগল! বলো বলো।

মেয়েটি বলছে না। ভয়ে সে কাঠ। তার মুখ সাদা। চোখ বড় বড়। এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

হিরণ্ময় বলে, ভয় পেয়ো না। তোমার মুখে পাগল শুনতে যে আমি ভালবাসি। বলো। এক বার বলো।

মেয়েটা বলছে না। পিছিয়ে যাচ্ছে। কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছে।

উপেন এসে যখন ঘুম থেকে তুলল তখন হিরণ্ময়ের মনে হল, বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘুমের মধ্যে সে যে সব দুঃস্বপ্ন দেখেছে তার মধ্যে এই স্বপ্নটাই ছিল সবচেয়ে ভাল।

স্টেশন রোড থেকে বাস স্ট্যান্ড, সেখান থেকে বাজার, বাজারের এলাকা ছেড়ে ইব্রাহিম রোড ধরে খানিক দূর হাঁটা, কখনও বাসে উঠে জগুর কাছে যাওয়া, কখনও ক্বচিৎ ইউনিভার্সিটির মাঠে পুকুরের ধারে বসে থাকা। খুব বেশি দিন এ-রকম ভাল লাগবে না হিরণ্ময়ের।

অনেক বেলায় হিরণ্ময় টের পেল, আজ রবিবার। আজকাল বার বা তারিখের হিসেব থাকে না। অন্নপূর্ণা বস্ত্রালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চলতি বাসে তেমন ভিড় নেই দেখে একটু অবাক হয়েছিল। পাঁচ নম্বর বাসের জানালা দিয়ে হাসিমুখ বের করে এক ভদ্রলোক রাস্তার এক চেনা লোককে ডেকে বলল, আরে ভাই, আজ রোববার তো আমাদের কী? খবরের কাগজের চাকরিতে কি আর রবি শনি বলে কথা আছে!

তা হলে আজ রবিবার! শান্তির সঙ্গে আজ বিকেলে দেখা করার কথা। দেখা করবে কি হিরণ্ময়? না করলে শান্তি আবার আসবে, লম্বা-চওড়া উপদেশ দেবে, ব্রেন ওয়াশের চেষ্টা করে যাবে। দু'-চার ঘা মার খাওয়া বরং তার চেয়ে ভাল। শান্তিকে কী বলার আছে তার? সে তো কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, এমনকী প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবেনি পর্যন্ত পাঁচ মিনিট। গঠনমূলক আর যুব-আন্দোলন গোছের কথা শুনলে তার যে এখনও হাসি পায়।

॥ এগারো ॥

রাসু এক গালের পান অন্য গালে নিয়ে বললেন, আর তোমরা সব কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়া শিক্ষিতা মেয়ে, তোমরা যদি সেন্টিমেন্টাল হও তা হলে তো মুশকিল। সামান্য ব্যাপারে অত অস্থির হলে চলে! ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়।

রূপালি ভুলের জন্য কাঁদছিল না। তার লজ্জা লোক-জানাজানি হয়ে গেল বলে। এতকাল শুধু দিদি জানত। এখন জামাইবাবু জানেন, রাসুকাকা জানলেন। সে মুখ তুলল না।

বংশী কান্নাকাটি সহ্য করতে পারে না। রূপালিটা ক'দিনে কত রোগা হয়ে গেছে। বিছানায় বসে দু' হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে, ঘাড়ের নলি দু'টো ফুলে উঠেছে। বংশী ওর দিকে না চেয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। দীপালি খাটের ধার ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, কাঁদছিস কেন? আমরা তো আছি।

রাসু চেয়ারে বসে ছিলেন। উঠে রূপালির পাশে এসে বসে মাথায় হাত রেখে বললেন, বলছি তো,

যা চাও তাই হবে। মামলা না করলে না করবে। আমি চারটে ছেলে পাঠিয়ে দেব, তারা ছোকরাকে তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। এমন কড়কানি দেবে যে আর জীবনে তোমার কাছাকাছি আসতে সাহস পাবে না।

রাসু মেয়েছেলেদের ভালবাসেন। এ ব্যাপারে তাঁর কোনও নীতিবোধ কাজ করে না। মেয়েছেলে হল মেয়েছেলে। আগাগোড়া ভোগ্যবস্তু। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। দেখো, চাখো, খাও।

রাসু রূপালির কোমর ধরে মাথায় হাত দিয়ে তাকে সোজা করছিলেন। বললেন, আহা, চোখ মোছো, চোখ মোছো।

বলতে বলতে নিজের রুমাল বের করে সযত্নে রূপালির চোখ মোছালেন। গমগমে স্বরে বলেন, বহু ষন্ডাগুন্ডা টিট করেছি বুঝলে! আমি যখন দায়িত্ব নিচ্ছি তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এখন বলো দেখি সে ছোকরা তোমাকে কী বলতে এসেছে!

কিছু বলেনি। শ্বাসের মতো মৃদুস্বরে রূপালি বলে।

পিছু নিচ্ছে?

না।

তবে?

সে আমাকে এখনও দেখতেই পায়নি।

খোঁজ-খবরও করছে না?

না।

খুব ডেঞ্জারাস ছেলে বলছ?

রূপালি মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল।

খুন করেছে?

জানি না। শুনেছি করেছে।

রাসু রূপালির ঘাড়ে হাত দিয়ে শরীরের সঙ্গে তাকে লাগিয়ে নিলেন। তারপর একটু চিন্তিত মুখে বংশীর দিকে চেয়ে বললেন, বংশী, আমার তো মনে হচ্ছে ছোকরার পিছনে পুলিশেরও নজর আছে। আমি বরং এক বার পুলিশ রেকর্ডটা দেখব'খন। তুই এক কাজ কর, যাদবপুর থানায় একটা খবর দিয়ে রাখ। পলিটিকাল কজ-এ ভরে দেওয়া যাবে। বংশী মাথা নেড়ে বলে, তাতে তো বিয়েটা বাতিল হচ্ছে না।

দীপালি ঝেঁঝে উঠে বলে, যাচ্ছে না মানে! বিয়েটাই তো বে-আইনি। রূপালি তো তখন মাইনর ছিল।

রাসু হেসে বলেন, তোর অত বুদ্ধিমান হওয়ার দরকার কী বল তো বংশী। যা বলছি কর গে। বাদবাকি আমার হেপাজতে ছেড়ে দে। এ মেয়েটার ভার আমি নিচ্ছি।

এই বলে রূপালির পিঠটা আস্তে আস্তে চাপড়ান রাসু। লোল হাসি নিয়ে নতমুখি রূপালির মুখখানা দেখেন মন দিয়ে।

পাশের ঘরে জয় দাদুর সঙ্গে তাসের রং মিলান্তি খেলছে। মাঝখানের দরজা বন্ধ। জয় কয়েক বারই দরজায় ধাক্কা দিয়েছে। খোলা হয়নি। এখন আবার চেঁচাল, মা, বিকেল হয়ে গেছে। আমি দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যাব। আমার জামাপ্যান্ট দাও।

দীপালি চেঁচিয়ে বলল, যা পরে আছ তাই পরেই যাও।

এ তো বিচ্ছিরি হলুদ শার্টটা। লাল শার্টটা দাও না।

রূপালি তার কৃশ মুখখানা তুলে বলে, দিদি, দরজা খুলে দে। তালুইমশাই, জয় ওরা কী সব ভাবছে। আমাদের কথা তো শেষ হয়ে গেছে! আর এ-সব ভালও লাগছে না।

বংশী জানালা থেকে ফিরে বলল, রাসুকাকা, আমি বলছিলাম কী, গুন্ডা লাগানো বা পুলিশ কেস

করার একটা রি-অ্যাকশন আছে। তাতে ছেলেটা খেপে যেতে পারে। ছেলেটা তো এখনও কোনও স্টেপ নেয়নি। তার আগে যদি ওর সঙ্গে এক বার কেউ দেখা করে অ্যাটিচুডটা জেনে আসে।

রাসু নির্বিকারভাবে পান চিবোতে চিবোতে বলেন, সেও হয়।

আপনি যাবেন?

রাসু বললেন, যাব।

দীপালি বংশীর দিকে চেয়ে বলে, তুমিও সঙ্গে যাও। রাসুকাকা সঙ্গে থাকলে ভয় নেই।

ভয়ের কথা ওঠায় বংশী বিরক্ত হল। বলল, আহাঃ, ভয়ের কথা ওঠে কেন?

রাসু উঠে বললেন, কালই তা হলে চল না হয়।

বংশী বলে, কাল তো অফিস।

ছুটি নিবি। এ-সব ব্যাপারে দেরি করা ভাল না। কোর্টে গেলে এক লহমায় বার্থ সার্টিফিকেট দেখিয়ে মাইনর বলে অ্যানালমেন্ট করা যেত। কিন্তু আদালতে যখন যেতে আপত্তি তখন অন্য পন্থা নিতেই হয়। কালই বরং যাওয়া ভাল।

দেখি। বংশী বলে।

দীপালি রেগে গিয়ে বলে, দেখবে মানে! রাসুকাকা আসবেন আর তুমি কাজ দেখাতে অফিসে লেগে থাকবে?

কেউ বোঝে না যে বংশীর কাছে আমেদাবাদ হল এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। বেদ সাহেব কথা দিচ্ছেন না, আশ্বাস দিচ্ছেন না। এমনকী দেখা করতে চাইলে দেখাও করছেন না। শোনা যাচ্ছে, আমেদাবাদের লিস্ট তৈরি হয়ে গেছে। শুধু রূপালির সমস্যা কেন, দেশ জুড়ে যত কিছু ঘটছে তার কোনওটাই এখন বংশীর কাছে কিছু নয়। তার চোখের সামনে সব সময় আমেদাবাদ শব্দটা ঝুলে থাকে। একদিন দুঃস্বপ্নও দেখেছিল, উটের পিঠে করে সে চলেছে। বহু দূর এক মরুভূমি, শেষ নেই তার। সেই মরুভূমির মাঝামাঝি এক জায়গায় উটওয়ালা তাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, ইয়ে হ্যায় আমেদাবাদ। নামিয়ে দিয়ে উটওয়ালা চলে যাচ্ছিল। চেঁচাতে চেঁচাতে উটের পিছনে বংশী দৌড়োতে থাকে। কিন্তু বালিতে পা বসে সে জোরে দৌড়োতে পারে না। বার বার পড়ে যায়। আবার ওঠে। দৌড়োয়। পড়ে। আতঙ্কে অবশ শরীর নিয়ে ঘুম ভেঙে সে উঠে বসে। জোরে পাখা চালিয়ে ফের যখন শুল তখন বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে।

॥ বারো ॥

অলক মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সিনিয়র ছাত্র ছিল। গতবার ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে বেরিয়ে গেল। তাদের ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্ররা কাটখোট্টা নয়। আর্টস বিল্ডিংসে এসে আড্ডা মারে, সোশ্যাল ফাংশনে যোগ দেয়, কবিতা লেখে, সাহিত্য পড়ে।

চৌখস ছেলে বলে ইউনিভার্সিটিতে অলকের খুব নাম এখনও। রেডিয়োর কুইজ প্রতিযোগিতায় অলক কোনও কূট প্রশ্নেই তেমন বিব্রত হয়নি। ডিবেটে সে ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বী। নামকরা সাপ্তাহিক বা রবিবারের সাময়িকীতে সে দুর্দান্ত সব রিভিউ করে। ফিল্ম বোঝে, ছবি বোঝে, গান বোঝে, ইংরিজি বলতে বা লিখতে তার কৃতিত্ব অসামান্য।

কিছু ছেলে আছে যারা দেখতে খুব লাজুক-লাজুক কিন্তু আসলে ভীষণ স্মার্ট। অলক তেমনিই। তার চেহারাটা মাঝারি লম্বা, ফরসা। আভিজাত্যের সুস্পষ্ট ছাপ। মুখশ্রী কোমল, চোখ দুটি মায়ায় ভরা। সব সময়ে একটা শ্লথ হাসি পুরু ঠোঁট দুটিকে ঈষৎ ফাঁক করে রাখে। দীর্ঘ চুলে কপাল আর ঘাড় ঢাকা, মোটা গোঁফ, অল্প একটু নরম লালচে দাড়ি।

ফিল্ম ক্লাবে সেবার বার্গম্যানের ছবি দেখতে গিয়েছিল অনেকের সঙ্গে, দলে অলক ছিল। ফেরার পথে দু'জনে একই বাসে এল। অলক ভাড়া দিল দু'জনের। তখনও কিছু মনে হয়নি রূপালির। গড়িয়াহাটায় নেমে যাওয়ার সময় অলক বলল,রূপালি, তুমি কিন্তু একদম পছন্দ করছ না আমাকে। হ্যাভ আই এ ব্যাড ব্রেথ?

ওঃ নো! বলে রূপালি থাপ্পড় দেখিয়েছিল।

গত বছর পর্যন্ত অলকের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল ইন্দ্রাণী নামে একটি মেয়ে। অলকরা চলে যাচ্ছে পরীক্ষার পর, সে সময়ে ইন্দ্রাণী আর্টস বিল্ডিংসের মেয়েদের জুটিয়ে আলাদা করে অলককে ফেয়ারওয়েল দেবে ঠিক করল। চমৎকার হয়েছিল ছোট্ট অনুষ্ঠানটি। ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক পরে কমনরুমে তারা ত্রিশ-চল্লিশ জন ছেলেমেয়ে জুটল গিয়ে। বক্তৃতা ছিল না, কিন্তু একের পর এক গান ছিল। সেই অনুষ্ঠানে রূপালি গাইল - এতদিনে জানলেম যে কাঁদনে কাঁদলেম সে কাহার জন্য... কিন্তু সেই গানটাই কাল হল রূপালির। ঈশ্বর জানেন, সে গান গাওয়ার সময়ে তার অলকের কথা মনেই হয়নি। কিন্তু এ গানটির অন্তর্নিহিত এক নিবিড় দুঃখবোধ তাকে স্পর্শ করে সেদিন, আর গাইতে গাইতে বোজা চোখের কোল ভরে গেল উষ্ণ অশ্রুতে। কিন্তু হয় না কি এ-রকম? কখনও কোনও গান, কোনও কবিতার কোনও একটু কথা, এক পুকুর জল তুলে আনে না কি বুক থেকে?

কিন্তু সবাই অন্য রকম বুঝল। শান্তনু চেঁচিয়ে উঠল প্রথমে, রূপালি কট! রূপালি কট! তারপর বাদবাকিরা। কী ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল রূপালি! মুখ তুলে আর অলকের দিকে তাকাতে পারেনি। শুধু 'না না' করতে করতে মাথা নিচু করে হেসে গেয়েছিল সে।

এরপরও অলক আড্ডা দিতে আসত প্রায়ই। কিন্তু আড্ডাটা সকলের সঙ্গে দিত না, বাছাই কয়েক জনের সঙ্গে বসত। তারপর কী এক কৌশলে সে গণ্ডিটাকে আরও ছোট করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত একেবারে একা হয়ে গেল রূপালির সঙ্গে। তখন বলত, দেখলে প্রসেস অব এলিমিনেশন কাকে বলে!

অলক তার খুব কাছের মানুষ। বিশ্বাসযোগ্য, প্রিয়, নিকট। তবু একমাত্র নয়। ক'দিন হল একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে অলক গেছে মুম্বাই। সেখান থেকে যাবে বেড়াতে গোয়ায়। এই ক'দিন অলকের অভাবে তো তেমন ছটফটও করছে না রূপালি! অলকও চিঠি দেয়নি। এর অর্থ কি এই যে তাদের দু'জনকে ছাড়াও দু'জনের চলে যাবে?

কিন্তু আবার এখন মনে হয়, হিরণ্ময়ের ব্যাপারটা যদি অলক জানতে পারে? ভেবে ভাবী অস্বস্তি হয় রূপালির। অস্থির লাগে।

দীপালির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে বাস ধরে গড়িয়াহাটায় চলে এল সোজা। অলকের বাড়িতে যেতে একডালিয়া ধরে অনেকটা ভিতর যেতে হয়। বৃথা পরিশ্রম না-করে রূপালি একটা ওষুধের দোকান থেকে টেলিফোন করল ওর বাড়িতে।

না অলক এখনও ফেরেনি। চিঠি দেয়নি। কবে ফিরবে ঠিক নেই।

যাদবপুরে এইট-বি স্ট্যান্ডে এসে বাসটা যখন নিথর হয়ে থেমে গেল, তখনও খানিকক্ষণ সিটে বসে রইল রূপালি। লোকজন সব নেমে গেলে সে আস্তে আস্তে নেমে আসে। অনেক অন্ধকার বাস দাঁড়িয়ে আছে চারধারে, একটা আলো-জ্বালা ফাঁকা বাস দু'-একজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে ছেড়ে গেল। স্ট্যান্ডে ভিড় নেই। এখানে সেখানে আলো আর অন্ধকার পড়ে আছে। রাত প্রায় আটটা।

আজকাল রূপালি এই সব অঞ্চলকে ভয় পায়। কখন কোন জায়গায় হিরণ্ময়কে দেখতে পাবে কে জানে!

আর এ-কথা ভাবতে না ভাবতে হিরণ্ময়কে দেখতে পেল রূপালি।

স্টেশন রোডের দিক থেকে বাস-স্ট্যান্ডের ভিতরে লম্বাটে ছায়ামূর্তিটা হেঁটে আসছে।

ভূত দেখলেও এত চমকায় না মানুষ যতটা রূপালি চমকাল। সমস্ত শরীর শক্ত অসাড় হয়ে গেল তার। এক পা নড়তে পারল না, বিশাল ডবলডেকারের পাশে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। মনে মনে বলল, ভগবান, আমাকে যেন না দেখতে পায়।

দেখতে পেয়েছে কি না বোঝা গেল না। বাস-স্ট্যান্ডে তেমন আলো নেই, খুব অন্ধকারও নেই। মানুষ চেনা যায়। বাসের ছায়াটা তার ওপর পড়েছে। হিরণ্ময় তার দশ হাতের মধ্যে দিয়ে লম্বা পায়ে হেঁটে যাচ্ছে। চেয়ে আছে রূপালি, না চাইতে চেয়েও।

হিরণ্ময় বড় রাস্তার ওপর পড়তেই রূপালির কোথা থেকে যেন এক আশ্চর্য শক্তি এল। মনে হল, এই একটা সুযোগ। এক্ষুনি ওর মুখোমুখি হতে হবে। কী বলবে তা রূপালি জানে না। হিরণ্ময় কী ভাবে তাকে নেবে তাও তার জানা নেই। কিন্তু মনে হল, এক্ষুনি একটা কিছু করা দরকার, নইলে বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে।

আর্তস্বরে রূপালি ডাকল, হিরণ্ময়! হিরণ্ময়!

হিরণ্ময় বড় রাস্তা পার হবে বলে দাঁড়িয়েছে। তার সামনে বাস, রিকশা, মিনিবাসের সার। সিগারেটে টান দিচ্ছে জোর। ফিরে তাকাল না। হয়তো শুনতে পায়নি! হয়তো রূপালির গলার স্বর খুবই ক্ষীণ, অতদূরে পৌঁছয়নি!

রূপালি বাসের ছায়া ছেড়ে প্রায় দৌড়ে এগোয়। ডাকে, হিরণ্ময়!

হিরণ্ময় কি একটু থমকাল? কে জানে! কিন্তু দাঁড়াল না। অজস্র চলন্ত গাড়ির ভিতরে একটু রন্ধ্র পেয়ে পিছল মাছের মতো বেরিয়ে গেল।

রূপালি তখনও বেভুল 'হিরণ্ময়' ডাক ডাকতে ডাকতে এগোচ্ছে। ঠিক বড় রাস্তার ওপরে একটা ছেলে এসে পিছন থেকে তার ব্যাগটা টেনে ধরে বলে, রূপালিদি! কী করছেন?

রূপালি পিছু ফিরে দেখে, সমর।

রূপালি আঁচল তুলে মুখটা মোছে।

সমর বলে, কাকে ডাকতে হবে বলুন, ডেকে দিচ্ছি। ওভাবে যাচ্ছিলেন, আর-একটু হলে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারত।

রূপালি লজ্জা পায় সমর ছেলেটার কথায়। এদের একটা বদমায়েশ দল আছে। বিলু এদের সঙ্গে মেশে সেটা পছন্দ নয় রূপালির। অন্য সময়ে সে ওদের কারও দিকে তাকায় না পর্যন্ত। কথা বলা দূরে থাক। কিন্তু এখন লজ্জা ঢাকবার জন্য বলল, একজনকে একটা কথা বলার ছিল, তাই ডাকছিলাম। তুমি একটা কাজ করো তো, একটা রিকশা ডেকে দাও।

রূপালি যে তাদের পছন্দ করে না এটা সমর জানে। বস্তুত কেউই তাদের পছন্দ করে না। সমরের অনেক দিনের লুকোনো ইচ্ছে ছিল, বিলুর এই শিক্ষিতা দিদিটি তার সঙ্গে এক বার কথা বলুক। কিন্তু রূপালি এত গম্ভীর আর এত ডাঁট নিয়ে চলে যে সমরের সেই সাধ পূর্ণ হওয়ার আশা ছিল না। আজ হঠাৎ এরকম যোগাযোগ হয়ে যাওয়ায় সমযেব মুখ-চোখ খুশিতে ধুয়ে গেল। বলল, একটু দাঁড়ান দিদি, ডাকছি।

সমরের দলবল কোথায় কাছে-পিঠে আড্ডা মারছিল, দেখাদেখি উঠে এল। সমর রাস্তা পার হয়ে ওপাশে গিয়ে রিকশাওয়ালাকে গরম দেখাচ্ছে। রূপালি হঠাৎ টের পায় তার আশেপাশে কয়েকটা ছেলে দাঁড়িয়ে। সকলের নাম জানে না রূপালি, কিন্তু এরা বিলুর সেই বদমাশ বন্ধুরা।

ভারী অস্বস্তি হতে থাকে রূপালির। ওরা কি কিছু দেখেছে? স্টেট বাসটার ছায়ায় সে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর হিরণ্ময়কে ডাকতে ডাকতে বেহেড ছুটে এসেছিল। এ-সব কি লক্ষ করেছে ওরা? কাজটা ঠিক হয়নি রূপালির।

ফুটু তার পান-খাওয়া দাঁত দেখিয়ে বলল, আমরা বিলুর দোস্ত রূপালিদি!

রূপালি মনে মনে বিরক্ত হয়। জবাব দেয় না।

একটি খুব স্বাস্থ্যবান ছেলে এগিয়ে এসে বলে, কোনও বিপদ হলে বলবেন। এখানে আমরা আছি, ঝাড় দিয়ে দেব।

পিছন থেকে আর-একটা ছেলে বলল, বেশি ফাণ্ডা দেখাস না সুব্রত, সেদিন প্রিয়া সিনেমার লাইনে লেক ক্যাম্পের ছেলেদের রোয়াব দেখাতি তো বুঝতাম।

আরে সেটা বেপাড়া। এ পাড়ায় নিয়ে আয় না তোর বাপকে।

উত্তেজিত হয়ে ওঠায় ওরা রূপালির উপস্থিতি ভুলে গেছে। তা ছাড়া ওরা ওরকমই। রূপালি পায়ে পায়ে ওদের কাছ থেকে দূরে সরে আসে। ফুটু দৌড়ে এসে বলে, দাঁড়ান, রিকশা আসছে।

রূপালি দেখে, রাস্তার ওপাশে রিকশাওয়ালার সঙ্গে তুমুল বেঁধে গেছে সমরের। চলন্ত গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে সমর চড় তুলছে, ঘুঁষি পাকাচ্ছে।

রূপালি বলল, ওকে রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে বারণ করো তো! আমি হেঁটে চলে যাচ্ছি।

ফুটু একটু দুঃখিত হয়ে বলল, হেঁটে যাবেন?

রোজ হেঁটেই যাই।

বলে হাঁটতে থাকে রূপালি। মনটা অসম্ভব ভার হয়ে আছে। এই ছেলেগুলো ভাল নয়। রূপালি দেখেছে, ওরা প্রকাশ্য রাস্তায় ছেলেতে-ছেলেতে চুমু খাওয়া-খাওয়ি করে, মেয়েদের দেখলে নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে অশ্লীল ভঙ্গি দেখায়। বন্ধুতে-বন্ধুতে বাপ-মা তুলে খারাপ কথা বলে। ওদের যথার্থ মানুষ বলেই মনে হয় না রূপালির।

রূপালি চলে গেলে অমিতাভ দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে সমরকে ধাক্কা দিয়ে বলে, আবে, হিরোইন চলে গেছে, আর বেশি এনথু দেখাসনি।

সমর চুপসে গেল বটে, কিন্তু হাসলও। রিকশাওয়ালাকে শেষ বারের একটা ওয়ার্নিং দিল সে, রিকশা চালানো বন্ধ করে দেব শুয়োরের বাচ্চা।

রিকশাওয়ালাও একটু তেজ দেখিয়ে বলে, আচ্ছা দেখা যাবে।

সমর অমিতাভর দিকে চেয়ে বলে, দ্যাখ মাইরি, কালীবাড়ি লেন যেতে আশি পয়সা চাইলে! অমিতাভ বলে, ছোড় বে। চল।

রাস্তা পার হয়ে এ-পাশে চলে আসে দু'জন। দলবলে মিশে যায়।

ফুটু বলল, ঘ্যাম মালটা মাইরি।

হাসে না কেন বল তো? সমর জিজ্ঞেস করে।

দোবার মুখ বাড়িয়ে চাপা স্বরে বলে, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অলক রায়ের সঙ্গে আঠা আছে।

শুয়েছে? সুহৃদ জিজ্ঞেস করে।

সুব্রত একটু গুন গুন করে বলে, যাঃ মাইরি! দোস্তের দিদিকে নিয়ে কী হচ্ছে?

সুহৃদ একটা খিস্তি দিয়ে বলে, ছোড় বে, আলো নিবলে সব সমান। দোস্তের দিদি তো কী?

রাজেশ কথাবার্তা আজকাল কম বলে। এখন হঠাৎ সে বলে ওঠে, ওই হিরু শালাকে ডাকছিল কেন বল তো?

হিরু? কোন হিরু? ফুটু বলে।

সমর গরম খেয়ে বলে, হিরুদাকে চেনো না শালা। পুরো নকশাল। বহুত লাশ নামিয়েছে।

ফুটুও গরম খেয়ে বলে, ফালতু কথা বলিস না। নকশাল আছে তো আছে। আমাদের সঙ্গে লাগলে জমি ধরিয়ে দেব।

সমর হেসে বলে, তুই কি ধর্মেন্দর নাকি রে?

সবাই হেসে উঠলে ফুটু রেগে গিয়ে বলে, তাই আছি বে। আমার দাদাও নকশালি ছিল।

যা যা! সুহৃদ খেঁকে উঠে বলে, কেমন নকশাল জানা আছে। নকশালি করে মিনিবাসের পারমিট পেয়ে গেল না?

ফুটু উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, দেখ দোস্ত সবাই, যদি আমাকে নিয়ে বেশি কথা হয় তো আমি তোমাদের সঙ্গে কানেকশন কাট করছি।

সবাই উঠে ফুটুকে ধরে আবার বাস-স্ট্যান্ডের চাতালে বসায়। ক্ষমা চাওয়া-চাওয়ি হয়। ফুটু খুশি হয়ে বলে, আমার কাছে দশটা টাকা আছে। আমি এক বোতল মালের দাম দিতে পারি।

সবাই হই হই করে উঠে পড়ে।

॥ তেরো ॥

সকালবেলা। হিরণ্ময় বেরোবে-বেরোবে করেও একটু বসে আছে দোকানঘরে। উপেন তার মেশিন লাগাচ্ছে। কাপড়-চোপড় গোছ করে সেলাই করতে বসবে এইবার। চায়ের দোকানের বয় যখন চায়ের অর্ডার নিতে এল, তখন এক বার হিরণ্ময়ের দিকে চেয়ে উপেন আলগাভাবে জিজ্ঞেস করল, চা খাবে নাকি?

আনাও। হিরণ্ময় বলে।

উপেন মেশিন লাগিয়ে কাপড়ের বোঁচকাটা খুলতে খুলতে বলে, কাল ওদের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

হিরণ্ময় মাথা নাড়ল।

কী বলল?

হিরণ্ময় কাঁধে একটা ঝাঁকি দিয়ে চুপ করে থাকে। তার শরীরটা ভাল নেই। অম্বল হচ্ছে রোজ। বদহজম হয়ে যাচ্ছে। এ জায়গা তার সহ্য হচ্ছে না।

বাচ্চাটা চা নিয়ে এল। চুপচাপ বসে চা খেতে খেতে রাস্তা দেখছিল হিরণ্ময়। ঠিক এ সময়ে বিনা নোটিসে একটা রিকশা এসে দোকানের সামনে থামে। রিকশা থেকে মা আর ছোট বোন রুমকিকে নামতে দেখা যায়।

হিরণ্ময় উঠল না। এগিয়ে গেল না। যেমন ছিল বসে রইল।

মা আঁচলের গেরো খুলে রিকশাওয়ালাকে পয়সা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। রুমকি দেখিয়ে দিল দোকানঘরটা। মা'র পরনে সাদা খোলের শাড়ি, খুব রোগা দেখাচ্ছে। ক' বছরে খুব বুড়ো হয়ে গেছে চেহারা।

বাধো বাধো পায়ে মা এগিয়ে এসে দোকানঘরের দরজার বাইরে হিরণ্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে চুপ করে। তারপর হঠাৎ বলে, তুই নাকি?

হিরণ্ময় গম্ভীর মুখে বিরক্তির স্বরে বলে, তোমাকে আসতে বলেছে কে?

মা একটু ভয় পেয়ে বলে, তুই এসেছিস শুনলাম। কাল দুটো ছেলে গিয়ে খবর দিল। ওরাও এসেছে সঙ্গে। ওই যে!

মা পিছন দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়। হিরণ্ময় দোকানঘর থেকে মুখ বের করে ছেলে দুটোকে দেখে। অন্য একটা রিকশায় বসে সিগারেট টানছে। শান্তির দলের ছেলে।

হিরণ্ময় মায়ের দিকে চেয়ে বলে, ওরা বলল আর অমনি তুমি চলে এলে!

মা'র চোখে-মুখে অপ্রস্তুত ভাব। মিনমিন করে বলে, তুই এসেছিস জেনে মনটা কেমন করল। খবর-টবর তো দিলি না। সবাই এসে অকথা-কুকথা বলে যায়। বেঁচে আছিস বলে ভেবেছিলাম নাকি!

রুমকি একটু দূর থেকে দাদাকে দেখছে। হয়তো লজ্জা, হয়তো ভয়। হিরণ্ময় তো আর সামাজিক জীব নয়। বহুকাল ধরেই সে লোকসমাজের বাইরে চলে গেছে। বোনের দিকে এক পলক চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় হিরণ্ময়। এদের দেখে তার মনে বিরক্তি ছাড়া আর কোনও ভাব হচ্ছে না। সে মাকে বলল, ও-সব কথা থাক। বাড়ি যাও।

মা ভিখিরির মতো বলে, তুই এক বার যাবি না? উনি বাড়িতে আছেন। ঝুমনি, সুকু সব বসে আছে। দাদা আসবে। সুকুর তো তোকে মনেই নেই, কতকাল হল তুই বাড়িছাড়া বল তো!

হিরণ্ময় বিরক্তির স্বরেই বলে, গিয়ে হবেটা কী? ও-পাড়ায় যাওয়া খুব সেফ নয়। যদি পারি তো পরে যাব এক বার। তুমি চলে যাও।

শরীরটা পাত করেছিস। একবেলা বাড়ির ভাত খেলি না?

উপেন সেলাই থামিয়ে চেয়ে ছিল। এবার বলল, মা যখন বলছেন এক বার না হয় ঘুরেই এসো বাড়ি থেকে।

হিরণ্ময় তার খুনির চোখে এক বার উপেনের দিকে তাকায়, কথার জবাব দেয় না।

মা বলে, শান্তি বলছিল তোর কোনও ভয় নেই।

হিরণ্ময় মাথা নিচু করে নখ দেখছিল মন দিয়ে। হঠাৎ মুখ তুলে বলে, আমার কোনও খোঁজ হয়নি?

মা ইতস্তত করে বলে, আগে রোজ কত কে এসে খোঁজ করত। কত বার পুলিশ সার্চ করে গেল। এখন কেউ আসে না।

হিরণ্ময় মাথা নাড়ল। বলল, ঠিক আছে, তুমি যাও আজ। আর এসো না এখানে। আমি সুযোগমতো দেখা করব গিয়ে।

মা মৃদুস্বরে বলে, বিপদের ভয় থাকলে যাওয়ার দরকার নেই। ওঁর মন খুব অস্থির! তুই যদি বলিস তো উনি এসে এক বার দেখা করবেন।

না। হিরণ্ময় কঠিন গলায় বলে।

বারণ করে দেব তা হলে?

হ্যাঁ, বলছি তো আমিই দেখা করব।

তুই কি এ-রকমই থাকবি? ইস, কত মশা কামড়েছে তোকে!

রুমকি পিছন থেকে এসে মাকে ধরে বলে, মা, চলে এসো। দাদা যখন চাইছে না, তখন ও-রকম করছ কেন? দাদার সুবিধে-অসুবিধে আছে না?

হিরণ্ময় বোনের সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। এখনও বলল না। বলবার ইচ্ছেই হয় না। যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

মা যাওয়ার আগে শেষবারের মতো বলে, গিয়ে কী বলব তা হলে? সবাই আশা করে বসে আছে!

হিরণ্ময় কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও না তোমরা। মরে গেছি বলেই তো জানতে! এখনও তাই ভেবে নাও।

শান্তি যে বলে তোর এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে!

বললে কী হবে! আমি থাকব না।

মা আঁচলে চোখ মুছছিল। ধরা গলায় বলল, মা হওয়ার মতো আর পাপ কী আছে!

রুমকি মা'র হাত ধরে টানছে, চলে এসো মা।

দাঁড়া না! বলে মা তাকে ধমক দেয়, অত অস্থির তো এলি কেন?

মা আবার আঁচলের গেরো খুলে ভাঁজ করা দুটো দশ টাকার নোট বের করে হিরণ্ময়ের হাতটা টেনে গুঁজে হাতটা মুঠো করে দিয়ে বলে, রেখে দে।

হিরণ্ময় টাকাটা বুক পকেটে রেখে দিয়ে বলে, ওই ছেলেগুলোকে বেশি আশকারা দিয়ো না। শান্তিকে তেমন কিছু বলতে যেয়ো না।

আচ্ছা। বলে মা আবার একটু দ্বিধা করে বলে, নোংরা প্যান্ট-শার্ট পরে আছিস। তোর সব জামা-প্যান্ট তো বাড়িতে পড়ে আছে। কয়েকটা পাঠিয়ে দেব?

দরকার নেই।

ময়লাটা পরে আছিস।

তুমি যাও তো এখন।

রুমকি এগিয়ে একটা রিকশা ডাকে। মা চলে যেতে গিয়েও আবার ফিরে এসে বলে, সাবধানে থাকিস। ভয়ের কিছু থাকলে বাড়িতে যাস না, কিন্তু কোথায় আছিস একটা পোস্টকার্ড লিখে জানাস।

দেখা যাবে।

মা চলে গেল। পিছনে আলাদা রিকশায় সেই ছেলে দুটিকে আর দেখা গেল না। মায়ের কথা পাঁচ মিনিটের বেশি মনেও থাকল না হিরণ্ময়ের। আজকাল মনে থাকে না।

দিন পালটে গেছে কত, হিরণ্ময়! বড় আলুনি দিন, বড় আকাল পড়ে গেছে এখন। দিন বদলের সেই দামাল সময় কবে কেটে গেল! তখন ছিল রোজ মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা, বারুদের গন্ধে ভরে থাকত বাতাস, পথে পথে রক্তের ছোপ। ছিল অনুসরণ, ছিল পালিয়ে যাওয়া। তখন শরীরের প্রতিটি স্নায়ু ছিল টনটনে, প্রতিটি পেশি সজাগ। সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙে যেত, আবার বাজারের মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়তে বাধা হত না।

কাল তোমাকে ডেকেছিল রূপালি। শুনতে পেয়েছিলে? পেয়েছ সে তো জানোই। রূপালি তোমাকে কী বলবে বলে ডেকেছিল হিরণ্ময়? তুমি কেন দাঁড়াওনি? মুখোমুখি হতে ভয় পেলে? কেন হিরণ্ময়!

তুমি কি বুঝতে পারছ হিরণ্ময় যে,-সকলেই তোমাকে কিছু না কিছু বলতে চাইছে! কিন্তু মানুষের ভাষা তুমি আজকাল তেমন বুঝতে পারছ না। না কি তোমার এরিয়েল খারাপ হয়ে গেছে? কিংবা ট্রানজিস্টার ডাউন? তোমার ভিতরে শব্দ পৌঁছোয় বটে, কিন্তু ধরা দেয় না। কেন হিরণ্ময়?

শান্তি কাল তোমাকে চার বারে চার কাপ ক্রিম কফি খাইয়েছে, একটা মস্ত মাংসের কাটলেট, তুমি কোনওটাই উপভোগ করে খাওনি। খুঁটে খেয়ে আধ-খাওয়া কাটলেট ফেলে রাখলে। কফির কাপ কোনও বারই শেষ করোনি। বহু বার চেষ্টা করেও তুমি শান্তির একটা কথাও মন দিয়ে শোননি। সে যখন আপস-রফার কথা বলছিল মোলায়েম স্বরে, তুমি তখন কফি হাউসের চার দিকে চেয়ে অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করেছিলে যে, সব লোকজন তোমাকে দেখছে। অত আলো আর অত চোখ তোমার সহ্য হচ্ছিল না কিছুতেই। বার বার শান্তি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি তার কথা বুঝতে পেরেছ কি না কিংবা তার প্রস্তাবে তুমি রাজি কি না। তুমি কোনও বারই জবাব দাওনি। শান্তির সঙ্গে পাঁচ-ছ' জন ছোকরা ছিল। তারা স্থির চোখে লক্ষ করছিল তোমাকে। তাতে তোমার মনঃসংযোগ যাচ্ছিল আরও গুলিয়ে। বার বার নানা রকম টুকরো ছবি তোমার মনের মধ্যে বায়স্কোপের ছবির মতো ভেসে উঠছিল। স্মৃতির মতো নয়, যেন হঠাৎ অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে? সে যেন নিবিয়ে ফেলছে। আর সেই আলোয় এক-একটা দৃশ্য দেখছ। এক বার দেখলে, সোনামুখির কাছে একটা ধানী জমি ধরে তুমি আর বিজু দৌড়চ্ছ। পিছন থেকে তিন-চারটে তির পর পর ছুটে এল। তিরের অভিজ্ঞতা সেই তোমার প্রথম। তীর যে ও-রকম বিদ্যুতের মতো ছোটে কে জানত বলো? তুমি জল-জমা ধানখেতে নেমে যেতে পেরেছিলে। বিজু পারেনি। একটা ঝকঝকে ফলা

তার ডান পিঠে বিঁধে গিয়েছিল। সেই চেঁচানি মনে পড়ে হিরণ্ময়? তুমি এগোওনি। ধানখেতের ভিতর দিয়ে তুমি পালাতে পেরেছিলে। আর-একটা ছবি: সদ্য চাকরি পাওয়া বাচ্চা সাব-ইনসপেক্টর নীলাদ্রিকে চাকু মারছ ঘাড়ে। নীলাদ্রি হাত তোলার সময় পায়নি। ছোরা খেয়ে অনেকক্ষণ হামাগুড়ি দিল সে। ঘাড়টা নড়বড় করছে, রক্ত নামছে কলের জলের মতো। নিজের রক্তে হাত আর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে সে পিচ রাস্তা ধরে খানিক দূর গেল। চেঁচাতে পারেনি। হয়তো তুমি ওর ভোকাল কর্ড কেটে ফেলেছিলে। প্রায় বিশ হাত হামা টেনে সেই বুড়ো খোকা পড়ল মাটিতে।

ঝলকে ঝলকে এই দৃশ্য আজকাল তোমার মস্তিষ্ক বমি করে। তুমি কী করতে পারো হিরণ্ময়? তোমার স্মৃতির কোনও পারম্পর্য নেই আজকাল। ঘোর আবছায়া এক অতীত থেকে কে যেন মাঝে মাঝে টর্চ মারে চোখে।

কিন্তু রূপালি যে তোমাকে ডেকেছিল হিরণ্ময়! মিথ্যে বোলো না, তুমি ঠিকই তার গলার স্বর চিনতে পেরেছিলে। ভুল হয়নি। ভুল হয়নি। রূপালি তোমাকে কিছু বলতে চায়।

সকলেই তোমাকে কিছু বলতে চায় হিরণ্ময়। কিন্তু অচল টেলিফোনের মতো হয়ে গেছ তুমি। রিং বেজে যায়, কিন্তু বার্তা পৌঁছোয় না। এ কেমন?

কেন মল্লিদাদার কথা তোমার এত মনে পড়ে বলো তো? জীবনে সেই প্রথম মৃত্যুকে টের পেয়েছিলে বলে? না কি সেই প্রথম তুমি হঠাৎ একটা ঘরে একা হয়ে যাওয়ার কষ্ট বোধ করেছিলে বলে? না কি সেই প্রথম গরিবের ছেলের ওপর সক্ষমদের নির্যাতন দেখেছিলে বলে?

কাল শান্তিকে তুমি কোনও জবাব দিতে পারলে না ঠিক মতো। গঠনমূলক বা যুব আন্দোলনের মতো অর্থহীন শব্দ তোমার পছন্দ হয়নি। বড় আলুনি লাগে এ-সব। তোমার যত দূর বেঁচে থাকা দরকার তত দূর তুমি বেঁচেছ। পুলিশ তোমাকে ধরতে পারেনি, সে একটা অঘটন মাত্র। তাদের মৃতের খাতায় খুব সময়মতো তোমার নাম উঠে গিয়েছিল বলে তেমন করে তোমার খোঁজ আর তারা করল কই? তাই তাদের হাত থেকে বেঁচে গেলে। সোনামুখির কাছে বিজু তির খেল, তুমি খেলে না। আরও বহু বার এই রকম জীবন-মৃত্যুর লটারিতে জিতে গেছ তুমি। ভেবে দেখতে গেলে তোমার এই বেঁচে যাওয়াটা যেমন বরাত, তেমনি মহার্ঘ তোমার আয়ু। তবু তোমার কেন যে মনে হয় যা করার তা করা হয়ে গেছে, এখন এই গঠনমূলক যুব আন্দোলনের পৃথিবীতে তোমার বেঁচে থাকবার আর কোনও দরকার নেই। বড় আলুনি লাগে।

এই যে এসে বেলাভর বাজারের মোড়ে তুমি দাঁড়িয়ে থাকো হিরণ্ময়, সে কি ওই কিশোরী মেয়েটির জন্য? তার মুখে তুমি কেন বার বার শুনতে চাও 'পাগল' কথাটা? সে আর 'পাগল' বলবে না তোমাকে, জানো না? তার দিদি তাকে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, বলিস না ও-রকম। কবে রেগে গিয়ে তোকে তাড়া করবে।

তবু তুমি দাঁড়িয়ে থাকো রোজ। অপেক্ষা করো। সেই কিশোরীর প্রতি তুমি কি যৌবনের কোনও আকর্ষণ টের পাও? না। হ্যাঁ আমরা জানি, তুমি আর তা টের পাও না। তোমার যৌবন কবে ক্ষয় হয়ে গেছে তাড়া খেতে খেতে, আর তাড়া করতে করতে। তবে কেন দাঁড়িয়ে থাকো? কেন অপেক্ষা করো? তুমি কতদূর মানুষের সমাজের বাইরে চলে গেছ তা কেন বার বার ওই কিশোরীর চোখে দেখে নিতে চাও?

এই বিকেল পাঁচটার ফরসা দিনের আলোয়, রোদে তোমাকে সবাই দেখতে পায়। এ বড় বিপজ্জনক, হিরণ্ময়। ওই দেখো, বিলু আসছে। ও ঠিক তোমার কাছেই আসছে। পালাবে না হিরণ্ময়? দাঁড়িয়ে থাকবে?

বিলুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল হিরণ্ময়, না-চেনার ভান করবে বলে। টিকল না।

বিলু সামনে এসে নিচু স্বরে বলে, হিরুদা, মেজদি একটা চিঠি দিয়েছে আপনাকে।

বলে একটা ভাঁজ করা কাগজ দেয়।

হিরণ্ময় বিনা বাক্যে খুলে দেখে পাতা জোড়া সাদা খাঁ খাঁ করছে। মাঝখানটায় খুব সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা— আমার কিছু কথা আছে। বিলুর সঙ্গে আসবে?

আর কিছু নেই। না সম্বোধন, না ইতি।

হিরণ্ময় চিঠিটা পকেটে রেখে ছোট করে বলল, চলো।

কোথায় তা জিজ্ঞেস করল না৷ কোথাও। জানবার দরকার নেই।

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে ছিল কালীবাড়ি লেন আর বড় রাস্তার মোড়ে। বিলু ট্যাক্সি পর্যন্ত তাকে এনে ছেড়ে দিয়ে গেল।

পিছনের সিটে রূপালি বসে আছে। স্পষ্টই চেনা যায় তাকে। একটু গম্ভীর চেহারা। পড়াশুনোর ছাপ পড়েছে মুখে। তাকাল না। রূপালির পাশে একজন স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক। সামনের সিটে বসা এক বয়সি মানুষ দরজা খুলে নেমে দাঁড়ালেন। বিশাল চেহারা। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের ছাপ মুখে-চোখে।

একটু তাকে দেখে নিয়ে আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে চেনো?

অচেনা লোক প্রথমেই 'তুমি' বললে হিরণ্ময় খুশি হয় না কোনওকালে। সে কথাটার জবাব দিল না। শুধু চোখে চোখে চেয়ে রইল।

বুড়ো লোকটা প্রস্তুত ছিল না ও-ব্যাপারটার জন্য। তাঁর চোখে যে কেউ চোখ রাখতে পারে এটা বোধহয় জানতেন না। গম্ভীর ভরাট গলায় বললেন, আমি রাসু। রাসমোহন দেব।

হিরণ্ময় একটা হতাশার শ্বাস ছাড়ল শুধু। কথা নেই। সবাই তাকে কিছু বলতে চায়। বড় মুশকিল।

লোকটা বলে, তোমার সঙ্গে আমাদের একটু কথা আছে বাবা। এ জায়গায় তো হবে না। ট্যাক্সিতে উঠে পড়ো, অন্য কোথাও গিয়ে নিরিবিলিতে একটু বসি।

কোথায়? খুব অবহেলায় জিজ্ঞেস করে হিরণ্ময়।

বেশি দূর নয়। কালীঘাটে। কোনও ভয়টয় নেই। চলো দেখবে।

ওদিকের দরজা খুলে সেই ভদ্রলোকটি নেমে আসে। ট্যাক্সিটা ঘুরে সামনে এসে হাতজোড় করে বলে, আমি রূপালির ভগ্নিপতি।

হিরণ্ময় তার চোখেও তাকায়। এ লোকটা তেমন আত্মবিশ্বাসী নয়। চোখ সরিয়ে নিল। অস্বস্তি বোধ করছে।

ও। হিরণ্ময় বলে।

রূপালির ভগ্নিপতি বলেন, যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার বাসায় একটু চলুন না। কালীঘাটে।

রাসু তাড়া দিয়ে বলেন, উঠে পড়ো বাবা। কথাবার্তা সব সেখানেই হবে।

হিরণ্ময় অনেককাল ট্যাক্সিতে চড়েনি। চড়তে খুব ইচ্ছে করছিল এখন।

রাসু আর সামনের সিটে উঠলেন না, দরজাটা খুলে ধরলেন হিরণ্ময়ের জন্য। হিরণ্ময় উঠলে তিনি পিছনে রূপালির পাশে গিয়ে বসলেন। দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

ট্যাক্সি চলতেই হিরণ্ময় পিছনের লোকদের কথা ভুলে গেল একেবারে। হু হু করে গাড়িটা যাচ্ছে। বাতাস লাগছে। ইঞ্জিনের গরম ভাপ ঢুকছে প্যান্টের তলা দিয়ে। আবছা অতীত থেকে ঝলকে ঝলকে টর্চের আলোর মতো ঝলকানি আসে চোখের সামনে। দেখে : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের অফিসার অমল দাসের বাড়িতে পুলিশ সার্চ করছে। অমল দাস আর তার বউ তাকে ভরে দিয়েছে গোদরেজের আলমারিতে। চাবি ঘুরিয়ে দিয়েছে। আলমারির ওয়ার্ডরোবের তাকে গরম জামা-কাপড়ের মধ্যে সে হাঁটু মুড়ে হেলান দিয়ে বসা। শ্বাসকষ্ট। গরম। ঘাম। ভারী একটা কোট তার মুখের ওপর থাবা মেরে আছে। যত ঝর সরাতে চায় আবার ফিরে আসে। বেশি

নড়লে শব্দ হবে, ভয়ে নড়ছে না সে। ঘোর অন্ধকার, চাপা বদ্ধ বাতাস আর বাঁকানো শরীর নিয়ে বসে থেকে সে ক্ষীণ শুনতে পায় বাইরে বুটের আওয়াজ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক বার একটা লাঠির আওয়াজ ঠং করে বাজল আলমারির গায়ে। সেই শব্দটা কাঁপিয়ে দিল তাকে। হাতের তেলো ঘামছে। চুলের গোড়া ঘামছে। অসম্ভব ন্যাপথলিনের গন্ধে বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে ফুসফুস। শ্বাস টানতে পারছে না। আকুলি-বিকুলি করছে বুক। তারপর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যেতে থাকে চেতনা। মাথা ঢলে পড়ে। অনেকক্ষণ বাদে পুলিশ চলে যাওয়ার পর যখন তাকে বের করা হয়, তখন মৃত্যুর খুব বাকি ছিল না। ট্যাক্সিতে যেতে যেতে চার দিকে গমগমে জীবনের বয়ে যাওয়া দেখতে সে ওই দৃশ্যটাও দেখতে পেল পরিষ্কার। দেখল : রঘুনাথপুরে কমলাক্ষ সেনের বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে সে আর বিজু মাঝরাতে ঘুম ভেঙে মাদুরের ওপর বসে আছে চুপচাপ। পাশের ঘরে কমলাক্ষ আর তার বউ শরীরের প্রেম করছে সশব্দে। ভোর রাতে কমলাক্ষ তার কাজে বেরিয়ে গেলে বিজু অন্ধকারে একটু হাসল, তারপর সিগারেট ফেলে নিঃশব্দে অন্ধকারে উঠে চলে গেল পাশের ঘরে কমলাক্ষের একা বউয়ের কাছে। হিরণ্ময় কত বার বারণ করেছে! বিজু শুনল না। এক রাতে বিজু ছিল না, আই এফ এ শিল্ডের ফাইনাল দেখবে বলে কলকাতা গেছে। হিরণ্ময় বারণ করেছিল, শোনেনি। সেদিন শেষ রাতে কমলাক্ষ চলে গেলে তার বউ সোজা চলে আসে হিরণ্ময়ের কাছে। প্রথমে সেই বাঘিনীর আক্রমণ ঠেকানোর কী প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু সেই নোনা এলাকার বাঘিনীর মতো মহিলা তাকে ছাড়ল কই? সে কী সাংঘাতিক দাপাদাপি, আশ্লেষ, শ্বাসের ঝোড়ো শব্দ। সহমরণের সেই রাত্রিতে চাবুকের মতো একটা সত্য তার মধ্যে গভীর ক্ষতচিহ্ন ফেলে গেল। কবে কখন সে হারিয়ে ফেলেছে তার যৌন শক্তি। আগে তার সন্দেহ হয়েছিল কয়েক বার, নিশ্চিত ছিল না। সেই রাতে যখন নিশ্চিত বোঝা গেল, তখন কমলাক্ষর বাঘিনী বউ তার দুই গালে ঠাস ঠাস চড় মেরেছিল পাগলের মতো, নখে ছিঁড়ে দিয়েছিল গলা আর বুক। বড় জ্বালা করে আজও। সে দেখতে পায় সেই আধো অন্ধকার ঘর, এলোকেশী ন্যাংটো এক ভয়াবহ মেয়েমানুষ তার লম্বা চুল টেনে ছিঁড়ে দিচ্ছে পট পট করে। চড় মারছে। নখে ছিঁড়ে ফেলছে চামড়া।

পিছনে একটু-আধটু কথার শব্দ হয়। একটা সিগারেট ধরায় হিরণ্ময়। আজকাল হাত কাঁপে, দেশলাইয়ের আগুনটুকুর মধ্যে সিগারেটের ডগাটা কিছুতেই নিতে পারে না। কয়েক বার চেষ্টা করতে হয়। লালায় সিগারেটের গোড়া ভিজে যায়, টানলে চুঁই চুঁই শব্দ ওঠে একটা।

রাসু পিছন থেকে বললেন, আগুনের ফুলকি আসছে হে, সিগারেটটা বরং নিভিয়ে ফেল।

হিরণ্ময় গ্রাহ্য করল না।

বাইরের ঘরে লম্বা একটা লাল রঙের সোফায় বসে আছে হিরণ্ময়। একা। পাশের ঘরে দরজা বন্ধ করে ওরা সব কথাবার্তা বলছে। হিরণ্ময় ঘরটিকে দেখছিল। সুন্দর করে সাজানো একটা বুককেস-কাম-আলমারি, তার ওপর একটা হাইফাই রেডিয়ো। রেডিয়োর পাশে ফুলদানি। স্টিক লাইট জ্বলছে। দেয়ালে চিত্রিত সরা, প্লাস্টারের রবীন্দ্রনাথ। মেঝেয় জুট কারপেট পাতা। এক ধারে ছোট একটা চৌকির বিছানায় চমৎকার বেড-কভার। আলমারির কাচের ভিতর দিয়ে একটা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, টি সেট, স্টিলের বৈদ্যুতিক টি-পট দেখা যাচ্ছে। স্টেনলেস স্টিলের একটা জগও আছে। দামি জিনিস সবই সাজিয়ে রেখেছে দেখানোর জন্য। মধ্যবিত্তের যা মানসিকতা আর কী? দেখাতে চায়, আমরা তত গরিব নই, কিংবা, আমরা বড়লোকদের দলে।

একজন বুড়ো মানুষ বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে এলেন, সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে। ছেলেটা এক বার হিরণ্ময়কে দেখেই দুই লাফে ভিতরের বারান্দায় চলে গেল। বুড়ো মানুষটি ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে বিছানায় বসলেন। তারপর শান্ত চোখে চেয়ে রইলেন হিরণ্ময়ের দিকে।

হিরণ্ময় তাকাল না আর। বুড়োদের সে বেশি পছন্দ করে না। বড় বেশি কথা বলে এরা।

এই বুড়োটা অবশ্য কথা বললেন না। চুপচাপ বসে পকেট থেকে কয়েকটা কাগজের মোড়ক

বের করে খুলে খুলে দেখতে লাগলেন। বোধহয় গরম মশলা বা সরষে।

ভিতরের ঘরের দরজা খুলে আর-একটি মেয়ে মুখ বাড়াল। বোধহয় রূপালির দিদি। সে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, বাবা, আপনি জয়কে নিয়ে একটু সুমনদের বাড়িতে যান তো। ওরা জয়কে ডেকেছে।

বুড়ো মানুষটি মুখ তুলে বললেন, তোমার কালোজিরে আর পোস্ত এনেছি।

রাখুন এখন ওসব। জয়কে নিয়ে একটু ঘুরে আসুন।

যাচ্ছি।

ছেলেটা গোমড়ামুখে ফিরে এল। বুড়ো মানুষটি তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ভিতরের খোলা দরজা দিয়ে রূপালির স্বর শোনা গেল, আমি ওর সঙ্গে আগে কথা বলে নিই।

রূপালির দিদি বলল, না। আগে ওঁরা বলবেন।

বোধহয় কেউ খেয়াল করল যে, মাঝখানের দরজাটা ফাঁক হয়ে আছে। তাই আবার চেপে বন্ধ করে দিয়ে গেল।

হিরণ্ময় পাখার হাওয়া খাচ্ছিল। বহুকাল এমন বাতাস ঝরে পড়ে না তার ওপর। আরামে সে একটু চোখ বুজে থাকে। সকলেই তাকে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু সব কথা কি ঠিকমতো বুঝতে পারবে সে?

অবশেষে দরজা খুলে রূপালির জামাইবাবু বংশী, রাসু আর দীপালি ঢুকল ঘরে। দীপালির হাতে চায়ের কাপ আর মিষ্টির প্লেট। সেন্টার টেবিলে রেখে মৃদু স্বরে বলল, এটুকু খান ভাই।

হিরণ্ময় তাকায়। দীপালিকে সে কখনও দেখে থাকবে আগে। দেখেছেই। মুখটা চেনা।

হিরণ্ময় আপত্তি করল না। বিনা কথায় চায়ে গোটাকয় চুমুক দিল, একটা সন্দেশ খাওয়ার চেষ্টা করল। ভাল লাগল না। সবটাই ফেলে রাখল।

রাসু আর বংশী গোটা ব্যাপারটা দেখছে।

হিরণ্ময় সিগারেট ধরাতেই রাসু নড়ে উঠে বলেন, বুঝলে বাবা, আমরা ছেলেবেলায় বয়স্কদের সম্মান দিতাম। বিড়ি সিগারেট বড় একটা খেতাম না সামনে।

হিরণ্ময় রাসুর দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, কিছু বলতে চান?

রাসু বড় একটা শ্বাস ফেলে বলেন, সিগারেটটা বরং খেয়ে নাও। বলছি।

দীপালি বংশীকে কী একটা ইশারা করল, টের পেল হিরণ্ময়। বংশী বলল, রাসুকাকা, আপনি বরং ও-ঘরে যান, আমি ইনট্রোডাকশনটা সেরে নিই।

এ ওকে ঠেলছে দেখে হাসি পেল হিরণ্ময়ের। ওরা কিছু বলবে। কিছু বলতে চাইছে। নিজের অ্যান্টেনা ঠিক করে নিতে থাকে হিরণ্ময় ব্যাটারি চালু করে, ট্রানজিস্টার মেরামত করতে থাকে।

সে কাউকে চটায় না ফালতু। সিগারেটে কয়েক টান দিয়েই সে সাদা সুন্দর অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে রাসুর দিকে চেয়ে বলে, এবার বলুন।

রাসু খুশি হলেন কি না বোঝা গেল না। পানের ছিবড়েয় রুদ্ধ গলা সাফ করে নিয়ে বললেন, কথাটা হচ্ছে তুমি এখন কী চাও?

বড় মুশকিল হল হিরণ্ময়ের। কী চায় সে? ভাবতে থাকে।

রাসু নিজেই বলেন, শোনো হিরণ্ময়, আমি চল্লিশ বছর ধরে রাজনীতি করছি। হাড় পেকে গেছে। আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না। আমার এলাকায় আমি বিস্তর নকশালকে টিট করেছি।

আরও বলত লোকটা, দীপালির ইশারা পেয়ে বংশী তাড়াতাড়ি মাঝখানে বলে ওঠে, না, না। হার্শনেস নয় রাসুকাকা, মিউচুয়াল।

রাসু এক বার গনগনে চোখে হিরণ্ময়ের দিকে চাইলেন। হিরণ্ময় ঠান্ডা খুনির চোখে তাকানোটা ফিরিয়ে দিল।

বংশী খুব অমায়িকভাবে বলে, ব্যাপারটা হচ্ছে কী, রূপালি এখন বড় হয়েছে, নিজস্ব মতামত তৈরি হয়েছে। বুঝছেন তো?

ফুঃ! কী সব বলছে এরা? হিরণ্ময় তো বুঝতেই পারছে না। নিজস্ব মতামত কারই বা তৈরি হয়নি?

বংশী চেয়ারটা আর-একটু কাছে টেনে আনে। দীপালি গিয়ে জানালা আর দরজার কপাট ভেজিয়ে রেখে আসে।

নিচু স্বরে বংশী বলে, আপনার কাছে আমাদের একটা আপিল আছে হিরণ্ময়বাবু। যা হয়ে গেছে সেটা ভুলে যান।

কী হয়েছিল? হিরণ্ময় সরল প্রশ্ন করে।

ওই যে! দ্যাট অ্যাফেয়ার। রূপালির সঙ্গে আপনি যে একটা রেজিস্ট্রি করে রেখেছিলেন?

দীপালি আচমকা বলে ওঠে, রূপালি তখন মাইনর ছিল। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে।

হিরণ্ময়ের দাড়ির নীচে গাল চুলকোয়। খুব হাসিও পাচ্ছে। রূপালি? ওঃ হ্যাঁ রূপালি।

বংশী আরও কাছে সরে আসে। খুব নিবিড় গলায় বলে, ম্যারেজটা ইললিগ্যাল ছিল, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বিটউইন ফ্রেন্ডস আপনাকে বলছি, রূপালিকে ক্ষমা করে দিন। ওটা আর ঘাঁটাবেন না।

ক্ষমা! হায় হায়! হিরণ্ময় সত্যিই একটু হেসে ফেলে এক বার।

রাসু গমগমে গলায় বলে ওঠেন, সোজা রাস্তায় না হলে আমাদের বাঁকা রাস্তাও আছে।

বংশী বিরক্ত হয়ে বলে, আঃ রাসুকাকা! উনি তো কোনও আপত্তি করছেন না!

আপত্তি করেও লাভ নেই। রাসু কঠিন স্বরে বলেন। হিরণ্ময়ের বেয়াদপিতে তিনি অসম্ভব চটে গেছেন বুঝে বংশী বলল, ওঁকে যা হোক কিছু বলতে দিন রাসুকাকা।

হিরণ্ময় দুটো কাঁধ তুলে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিল। আস্তে করে বলল, সে-কাগজটা আমার কাছে নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে।

এবার রাসু ঠান্ডা গলাতেই বললেন, কাগজটা হারানো বড় কথা নয়। সেটা হারালেও ডুপলিকেট পাওয়া যায়। ও-সব চালাকির কথা বোলো না বাবা, তুমি ছেলেমানুষ নও।

রাসু রাজনীতি করা লোক, সহজে রাগেন না। মাথাটা সব সময়ে ঠান্ডা, সর্বদা হাসিমুখ। কিন্তু আজ কী হল, রূপালির সামনেই ছোকরাটা তাঁকে অগ্রাহ্য করে সিগারেট ধরাল দেখে ট্যাক্সিতেই তিনি চটে গেলেন। এই চটাচটির মানেই হয় না। রোজ হাজার হাজার বাচ্চা ছেলেকে সিগারেট ফুঁকতে দেখছেন রাসু। তারপর ছোকরাকে সিগারেট নেভাতে বললে নেভাল না, রূপালির মতো সুন্দরী মেয়ের সামনে বড় অপমান হলেন রাসু। সেই থেকে মাথাটা বিগড়ে আছে। অবশ্য ব্লাডপ্রেশারটাও মাথা চাড়া দিয়ে থাকতে পারে। কালই এক বার ডাক্তারের কাছে যাবেন। বয়সটা ভাল নয়।

হিরণ্ময় সামনে এক শূন্যতার দিকে চেয়ে রইল। কথা বলল না।

বংশী তার হাঁটু ছুঁয়ে বলল, আমরা ও-ব্যাপারটা ভুলে যেতে চাইছি। মামলা-মোকদ্দমা আমরা কিছুই করব না।

রাসু একটু হেসে হিরণ্ময়কে বললেন, মামলা করলে অবশ্য তোমারই জেল হয় বাবা। নাবালিকা ফুসলানোর দায়ে।

এ-সবই অন্য ধরনের কথা। যখন দিনগুলো ভরা থাকত বারুদের গন্ধে। পথে পথে ছড়িয়ে থাকত রক্তের ছোপ। তখন ছিল তাড়া খেয়ে ফেরা, তাড়া করে যাওয়া। সেইসব দিনে রূপালি তার কাছে ছিল রক্ত-মাংসের জীবিত মানুষ। কবে কেটে গেছে দিন। আজ এই “গঠনমূলক” সময়ে রূপালিকে তার অতীতের এক আবছা ফোটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না তো! এরা এত ভয়

পাচ্ছে কেন? অত উদ্বেগের কী আছে এদের? সে তো রূপালির দিকে ফিরেও তাকায়নি।

বংশী বলল, না, না, মামলা-মোকদ্দমার কথাই ওঠে না। কবেকার এক ছেলেমানুষি কাণ্ড, তার জন্য খামোকা পাবলিসিটি দিয়ে লাভ কী? খবরের কাগজওয়ালারা ওত পেতে থাকে। নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

রাসু ধমক দিয়ে বললেন, মেটাবি কী করে? ও ছোকরার কাছে যতক্ষণ কাগজখানা আছে ততক্ষণ কি আপসে মেটে?

বংশী উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, তা হলে?

রাসু হিরণ্ময়ের দিকে চেয়ে বলেন, আমিও আপসই চাইছি। তবে ব্যাপারটা তুমি পরিষ্কার করে বুঝে নাও বাবা। যদি কোর্টে যাও তো নাবালিকা হরণের মোকদ্দমায় তুমিই ফেঁসে যাবে। তা ছাড়া তুমি অ্যাবসকন্ডার, তোমার বিরুদ্ধে খুনের কেস আছে। জানো বোধহয়? আরও এক কথা। আমি রাসমোহন দেব, এ নামটা আর ভুলে যেয়ো না। আমার বয়স হয়েছে কিন্তু এখনও এক ডাকে হাজার ছেলে জড়ো করতে পারি। যদি গোলমাল করো তবে খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। চার দিকে তোমার কোনও পথ খোলা নেই।

কপাটের আড়ালে, ও-ঘরে দাঁড়িয়ে রূপালি কেঁপে ওঠে। সে সবই শুনতে পাচ্ছে। ওরা ও-সব কী বলছে হিরণ্ময়কে? এ তো বোকাও জানে যে হিরণ্ময় আইনের জোরে কিছুই করতে পারে না। কিন্তু তবু এখনও অনেক কিছু পারে হিরণ্ময়। মেসবাড়ির সেই দুঃস্বপ্নের মতো সব গোপন ঘটনা বলে দিতে পারে। জানাতে পারে অলককে। রূপালির সারাটা জীবন ধরে অশান্তির রন্ধ্রপথ পারে খুলে দিতে। অবিশ্বাস, সন্দেহ আর গোপন ঘৃণার জন্ম দিতে পারে তার ভাবী স্বামীর মনে। চিরকাল তবে জর্জরিত হবে রূপালি। কখনও কেউ আপন করে নেবে না তাকে। নিজের বলে নেবে না।

পরদা সরিয়ে রূপালি দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, জামাইবাবু, আমি ওর সঙ্গে একা একটু কথা বলব। প্লিজ!

বংশী শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায়। রাসু ধীরেসুস্থে উঠে খুব আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বলেন, যা বলার বলো। তবে আমি ফাইনাল বলে দিয়েছি। তোমার ভয় নেই।

দীপালি একটু ইতস্তত করে বলে, আমি থাকব রূপু?

রূপালি আকুল গলায় বলে, না না। তোমরা যাও। আমি একটু একা কথা বলব।

নাটকের দৃশ্যশেষে যেমন কুশীলবরা উইংসের ভিতরে চলে যায় তেমনিভাবে তিনজন ও-ঘরে গেল। দরজা বন্ধ হল। ছিটকিনির সাবধানী শব্দ উঠল একটু। ছিটকিনিটা প্রথমে আটকে দিয়েও কে যেন আবার সতর্কতাবশে তা খুলে রাখল। সাবধান হল, কারণ হিরণ্ময় তো লোক ভাল নয়।

হিরণ্ময় অ্যাশট্রে থেকে পোড়া সিগারেটটা তুলে নিয়ে ধরায়।

রূপালি চৌকির ওপর বড় দীনভাবে বসে আছে। নতমুখে কাঁদছে। কোনও মানে হয় না এর— হিরণ্ময় ভাবল।

অনেকটা সময় নিয়ে রূপালি তার বড় বড় চোখ তুলে তাকায়। ক্ষীণ স্বরে বলে, আমি বড় অস্থির।

হিরণ্ময় জবাব দেয় না।

শোনো হিরণ্ময়, আমাকে বরং মেরে ফেলো। কিন্তু ও-রকম চুপ করে থেকো না। এ-রকম ভয়ংকর তো তুমি আগে কখনও ছিলে না।

একটা গুলির শব্দ হল না? হিরণ্ময় কান খাড়া করে শোনে। না, ভুল। সেই আবছা অতীত থেকে টর্চের আলো জ্বালে কে। সে দেখে : দোতলার গরাদহীন জানালা দিয়ে পর পর তারা চারজন লাফ দিল। সবশেষে ছিল অয়ন। হিরণ্ময় মাটিতে পড়ে দৌড়োতে দৌড়োতে দেখল, সবাই যেমন মাটিতে পড়েছে অয়ন সেভাবে পড়ল না। অয়ন পড়ল লাট খেয়ে, ঘুরতে ঘুরতে। মাথাটা প্রথমে।

ওপরের জানালা দিয়ে পর পর গুলির ঝলকানি আর শব্দ হতে থাকে।

রূপালি চেয়ে আছে। হিরণ্ময় মনঃসংযোগের চেষ্টা করে। অ্যান্টেনা ওপরে তোলে। ব্যাটারিতে চাপড় মারে। এরা কিছু বলতে চায় তাকে। তার সবই শোনা উচিত।

কেন চুপ করে আছ? তুমি কী চাও বলবে না?

হিরণ্ময় রূপালির দিকে তাকায়। ইস্কুলের সেই অকালে পাকা, ছেলে-টলানি রূপালি এ তো নয়! কত ভরভরাট, কত মহিমময়ী। গম্ভীর চোখের তারা। একে তো সে চেনেও না। কোনও সম্পর্ক ছিল না এর সঙ্গে কোনও দিন।

কবে কেটে গেছে সেই সব দিন।

হিরণ্ময় মাথা নেড়ে বলে, ছায়া দেখে ভয় পাও কেন? আমি ফিরে আসব না।

তার মানে?

এখন সবই খুব গঠনমূলক হয়ে গেছে রূপালি। যেমন সমাজ, তেমনি তুমিও। সব জায়গায় রাস্তা চওড়া হচ্ছে, নতুন নতুন দোকান-বাজার খুলছে, বিজ্ঞাপন দেখি, দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তোমারও তাই রূপালি। আগের চেয়ে অনেক বেশি গঠনমূলক হয়ে গেছ তুমি। কত পড়াশুনো করেছ, কত ব্যক্তিত্ব এসে গেছে।

ঠাট্টা করছ?

হিরণ্ময় মাথা নেড়ে বলে, না। তোমাকে বলছি, আমি এ যুগের কেউ নই। আমার বড় আলুনি লাগে। বড্ড বিস্বাদ। ভয় পেয়ো না। আমি আর কেউ নই।

রূপালি মুখ নত করল।

হিরণ্ময় শান্তস্বরে বলে, তোমার আত্মীয়রা অত কথা বলে কেন বলো তো? অত কথা এক সঙ্গে শুনলে আমি বুঝতে পারি না।

তুমি আমার কাছে কিছু চাও না? রূপালি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।

হিরণ্ময় উঠে দাঁড়িয়েও একটু থামে। তারপর ঘাড় কাত করে রূপালিকে দেখে একটু হাসে। আস্তে বলে, কয়েকটা টাকা দেবে?

দেব। দাঁড়াও। বলে উদ্ভাসিত মুখে রূপালি উঠে ছুটে যায় ভিতরের ঘরে।

রাসু, বংশী আর দীপালি আবার নাটুকে লোকের মতো ঘরে এসে দাঁড়ায়।

রাসু গমগমে স্বরে বলেন, এটা ব্ল্যাকমেল নয় তো?

ব্ল্যাকমেল। শব্দটা অনেকক্ষণ বাদে ধরতে পারে হিরণ্ময়। খুব অসহায় লাগে তার।

রূপালি ছুটে আসে প্রজাপতির মতো। হিরণ্ময়ের দুটো হাত তুলে নেয় হাতে। অনেকগুলো দশ টাকার নোট কোথা থেকে খামচে এনেছে। হাতের মধ্যে কড়মড় শব্দে গুঁজে দিয়ে বলে, হিরণ্ময়, রাসুকাকার কথায় কিছু মনে কোরো না। আমি তো জানি তুমি কত ভাল ছিলে! এখনও কত ভাল তুমি! টাকাটা নাও লক্ষ্মীটি! আমি দিচ্ছি, তুমি নাও।

হিরণ্ময় হাসে। টাকাগুলো মুঠো করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলে, নিলাম। মনে করলে কি আমার চলে?

॥ চৌদ্দো ॥

ভোর রাতের দিকে তার দুঃস্বপ্নে ভরা, অস্বস্তিকর ঘুম ঘুমোচ্ছিল হিরণ্ময়। অজস্র মশা পিন পিন করে উড়ে আসে, শুষে খায় তাকে। ঘুমের মধ্যে এপাশ-ওপাশ করে সে। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি শরীর দুমড়ে রেখেও এখানে সেখানে ধাক্কা খায়। কখনও দেওয়ালে, কখনও মেশিনের কানায়।

স্বপ্নের মধ্যেও সে বার বার 'গঠনমূলক' শব্দটা শুনতে পায়। ভয়ে আঁতকে ওঠে সে। উঠে বসে। সিগারেটের জন্য হাত বাড়ায়।

তখনই হঠাৎ নির্ভুলভাবে বুঝতে পারে ঘুমের মধ্যে সে যে শব্দটা শুনেছে তা মোটেই 'গঠনমূলক' নয়। তবে অনেকটা ও-রকমই। সে শুনতে পেয়েছে পুলিশের বুটের শব্দ উঠছে গঠন— মূলক গঠন— মূলক। হ্যাঁ অবিকল ওইরকম শব্দ। যখন হিল ফেলছে তখন শব্দ হচ্ছে গঠন, যখন তুলছে তখন শব্দ হচ্ছে মূলক।

একটা রুলের ছোট্ট ঘা পড়ল দরজায়।

হিরণ্ময় এক লাফে নেমে দরজাটা খুলে দিয়েই অত্যন্ত অভিমানের সঙ্গে বলে ওঠে, আপনারা এত দেরি করলেন কেন বলুন তো!

দেরি! সাব-ইনসপেক্টর মুখে টর্চ ফেলে দেখে অবাক হয়ে বলেন।

হিরণ্ময় হাঁপ ধরা স্বরে বলে, দেরি করবেন না। আমাকে শিগগির গঠনমূলকের হাত থেকে বাঁচান। দোহাই!

বলে হিরণ্ময় লোকটার হাত আঁকড়ে ধরে।

সাব-ইনসপেক্টর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, হচ্ছে, হচ্ছে। অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে বলুন তো?

হিরণ্ময় কী করে বোঝাবে এতদিন সে কী আকুলভাবে পুলিশের অপেক্ষায় ছিল। সেটা অবশ্য সেও আগে বুঝতে পারেনি। এইমাত্র বুঝল।

অতি দ্রুত সে গিয়ে পুলিশের জিপে উঠে পড়ল। সাব-ইনসপেক্টর খুবই বিরক্ত হলেন তার ব্যবহারে। এক বার বললেনও, এমন দেখিনি!